প্রবাসী, ৪৬শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৩

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয় সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

রাজরপ্পা দামোদর গর্ভে ভেড়ানদীর ঝর্ণা (হাজারিবাগ

রাজরপ্পা দামোদর 'গর্ভে'র আর একটি ছবি (হাজারিবাগ)

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৬শ ভাগ
২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৫৩ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলা ও ভারত

"প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" একটি চরম উদ্দেশ্য বাংলাদেশে "পূর্ণ পাকিস্থান কায়েম" করা। বাংলাদেশে আজ দশ বৎসর যাবৎ যে অনাচার, অত্যাচার ও দুর্নীতির স্রোত বহিতেছে তাহারই ঢেউয়ের শিখরে এই বর্ত্তমান মাৎস্যন্যায় আসিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহার পিছনে বাংলার বাহিরের লীগ যুদ্ধ-পরিষদের দীর্ঘকালের ব্যাপক ব্যবস্থা ও আয়োজন রহিয়াছে তাহাও নিঃসন্দেহ। আমাদের সম্মুখে যে স্পেশ্যাল কমিশনের তদন্ত রহিয়াছে তাহাতে কি সিদ্ধান্ত হইবে তাহা বলা যায় না, কেননা সেই তদন্ত নষ্ট করিবার আয়োজনও সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে। প্রথমেই কমিশনের সেক্রেটারীরূপে এমন এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে যাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সততা সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে, কেননা এই শ্বেতাঙ্গ আই. সি. এসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির তীব্র মন্তব্য এখনও আমাদের স্মরণে আছে। তাহার পর গোড়ায় চেষ্টা হইয়াছিল যাহাতে হিন্দু-সাধারণ কমিশনের সম্মুখে লিপিবদ্ধ বর্ণনা বা এজেহার দাখিল করার জন্য যথেষ্ট সময় না পায় এবং যেটুকু দাখিল হয় তাহাও অসৎ রাজকর্মচারীদিগের হাতের কাছে পৌঁছায়। বর্ত্তমানে লীগদলীয় পুলিশ ও অন্য রাজকর্মচারীর দল নানা প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে তদন্তের ফলাফল ন্যায়সঙ্গত না হয়। এই সকল প্রচেষ্টার মধ্যে প্রধান হইল জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ। এই সকল সংবাদপত্রের সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে সরকারী অপকর্ম চালনা সহজ নহে তাহা বলা বাহুল্য; অতএব ঐ শ্রেণীর সংবাদপত্রের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাহাদের কণ্ঠরোধ করাই লীগদলের একমাত্র পথ।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের চক্রান্তের ফলে বাংলাদেশে এখন তাহাদের অনুচরবর্গের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। দুর্নীতি, ঘুষ, যথেচ্ছাচার ইত্যাদির ফলে বাঙালী, হিন্দু-মুসলমান, ক্রমে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে একথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন নহে। বাঙালী মুসলমান দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে প্রায় ২৫ লক্ষ, নিঃস্ব ও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে আরও অর্দ্ধকোটি এবং এখন তাহাদের যে পথে লইয়া যাওয়া হইতেছে তাহাতে তাহাদের চরম দুর্দশা ও দাসত্ব অনিবার্য। পাকিস্থান কায়েম রাখিতে হইলে ইংরেজের প্রভুত্ব কায়েম রাখিতে হইবে, কেননা ইংরেজের অস্ত্রবলের জামানত ভিন্ন পাকিস্থানরূপ অবাস্তব ব্যবস্থার আয়ুষ্কাল তিন দিনও নহে। ইহা সম্ভব যে ইংরেজ চলিয়া গেলে বিপ্লবের রক্তস্রোতে প্লাবিত হইয়া এদেশে কিছুকালের জন্য পাকিস্থান-হিন্দুস্থান সব কিছুই ডুবু-ডুবু হইবে, কিন্তু তাহার শেষ নিষ্পত্তিতে এদেশে একমাত্র অখণ্ড স্বাধীন ভারত—যাহাতে সর্বধর্ম ও সকল জাতির সমান অধিকার থাকিবে—স্থাপিত হইতে বাধ্য। জাতীয়তাবাদী ভারত আজ পঁচিশ বৎসরের সাধনা ত্যাগ ও অহিংস সংগ্রামের ফলে যেখানে পৌঁছাইয়াছে, ছয় মাস বা ছয় বৎসরের নিদারুণ কষ্টের ও দুর্দশার ভয়ে সেখান হইতে সে পশ্চাৎপদ হইবে একথা মনে স্থান দেওয়াও অনুচিত।

সমস্ত ভারতের হিতাহিতের সমষ্টির সম্মুখে বাংলাদেশের মরণ-বাঁচনের প্রশ্নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় না একথা ঠিক। কিন্তু সমস্ত ভারতের কল্যাণ যে মূলনীতির উপর নির্ভর করে সে নীতিকে যদি দৃঢ়ভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের সঙ্গে সংবদ্ধ না রাখা যায় তাহা হইলে বাংলার সর্বনাশের ফলে সমস্ত ভারত বিপন্ন হইতে পারে একথা রাষ্ট্রনেতৃ-বর্গের স্মরণ রাখা উচিত। আমাদের একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে বাংলাদেশকে রক্ষা করা বা বাঙালীকে সাহায্য করার জন্য সমস্ত ভারতের স্বাধীনতার পথে অগ্রগতি রোধ করার কথাকে মনে স্থানও দেওয়া অনুচিত। ভারতের স্বাধীনতার রথের গতি এখন এক মুহূর্ত্তের জন্যও রোধ করা চলিতে পারে না, কেননা ইহার উপর শুধু ভারতের নহে, সমস্ত এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী প্রতিক্রিয়াবাদীর দল ভারতীয় মুসলিম জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের চোখে ধূলা দিয়া নাচাইয়া এদেশের দাসত্ব স্থায়ী করিবার যে চেষ্টা করিতেছে সে চেষ্টার নির্গত বিষে বাংলা

নাজ জর্জরিত, বাঙালী হিন্দু-মুসলমান অতিশয় বিপদগ্রস্ত—যদিও বাঙালী মুসলমান সেকথা এখনও ঠিক বুঝিতেছে না। কিন্তু সে কারণে, বাংলা ও বাঙালীকে বাঁচাইবার জন্ত সমস্ত ভারত কল্যাণের ও প্রগতির পথ হইতে বিচলিত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারে না। কেননা ভারত স্বাধীনতা ও প্রগতির পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইলেই সাম্রাজ্যবাদীগণ ও তাহাদের ক্রীতদাসের দল সকলকাম হইবে। স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলার ত্যাগ ও ক্ষতিস্বীকারের পরিমাণ সারা ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বাঙালীর আত্মবলি ও আহুতির উপরই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছে। সুতরাং বাঙালীকে এখন দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে হইবে যে, "আমাদের বাঁচাইবার ওজুহাতে তোমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না, বাঙালী মরিলে যদি সমস্ত ভারত বাঁচে তবে তাহাই হউক।"

অন্ত দিকে যে সুবিধাবাদের পথে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস এত দিন চলিয়াছে তাহাতে সমস্ত ভারত অদূর ভবিষ্যতে বিপন্ন হইতে পারে একথাও ভারতের রাষ্ট্রনেতাদিগকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া না দিলে বাঙালীর আত্মবলি বৃথায় যাইবে। "বাঙালীকে এখনই সাহায্য করিতে পারা গেল না, কেননা আমাদের যথেষ্ট ক্ষমতা বা সময় ছিল না, সুতরাং সমস্ত ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্ত আমরা বাংলাকে বলি দিতে বাধ্য হইলাম", ইহার অর্থ বুঝা যায়, এবং এরূপ বলি সার্থকও হইতে পারে। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ এবং বর্তমানেও—আমরা দেখিতেছি অন্যরূপ ব্যবস্থা, যাহাকে সুবিধাবাদ ভিন্ন অন্ত কিছুই বলা চলে না। এই ব্যবস্থার অর্থ হইতেছে যে বাংলাকে শত্রুর হাতে তুলিয়া দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা, যদি তাহাতে সে নিরস্ত ও ক্ষান্ত হয়। বলা বাহুল্য এ আশা নিষ্ফল হইতে বাধ্য, কেননা কংগ্রেসের এই কাপুরুষতা দেখিয়া বিপক্ষের সাহস বাড়িয়া যাইবে এবং তাহাদের দাবীর সীমা থাকিবে না। লীগ সর্বতোভাবে অক্ষশক্তির নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পরস্বলোলুপতা, মিথ্যা প্রচার এবং হিংসার সীমা নাই, তাহার দাবী যতই মানিয়া লওয়া যাইবে ততই সে হিংস্র ও শক্তিশালী হইবে। অতএব কংগ্রেসের পক্ষে এখন "Peace at any price" (যে কোন মূল্যে শান্তি কামনা) নীতি গ্রহণ অত্যন্ত বিপজ্জনক ও নিরর্থক। কংগ্রেস স্পষ্ট ভাষায় বলুন "আমাদের হাতে এখনও শক্তি নাই কেননা শক্তি গঠন সময়সাপেক্ষ। সুতরাং আমরা বাংলাকে সাহায্য করিতে বর্তমানে অসমর্থ। সময় আসিলে সে চেষ্টা দেখিব, কিন্তু আমরা লীগের দাবী মানিতে কিছুতেই রাজী হইব না।" বাঙালী সেকথা বুঝিবে এবং যে পাকিস্থানরূপ মহা নরকের যন্ত্রণা সে দশ বৎসর ভোগ করিয়াছে তাহা আরও পাঁচ দশ বৎসর ভোগ করিবে এই আশায় যে, তাহার স্বার্থত্যাগের ও আত্মবলির ফলে সারা ভারতে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা স্থাপিত হইবে এবং ভবিষ্যৎকালে তাহার সন্তান-সন্ততি আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া পৃথিবীতে বাস করিতে পারিবে।

বাংলাদেশ "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" রণাঙ্গন হিসাবে প্রত্যেক প্রতিক্রিয়াবাদীর নিকট যোগ্যতম ভূমি। এইখানে ইংরেজ আজ ৪৫ বৎসর সাম্রাজ্যবাদের "পরোক্ষ সংগ্রাম" চালাইয়াছে। এই প্রদেশ সাম্রাজ্যবাদীর ক্রীতদাসবর্গের এবং বিদেশী ও এদেশী শোষক ও তাহাদের শিবাদলের লীলাভূমিরূপেই দীর্ঘকাল রহিয়াছে। বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মান-সম্ভ্রম অন্ত প্রদেশে বিন্দুমাত্র নাই এবং বাংলার বাহিরে তাহাদের কোনও সহানুভূতি পাইবার লেশমাত্র সম্ভাবনাও নাই। ইংরেজ অনেকদিন আগেই বলিয়াছে "বাঙালীর পক্ষে আবেদন বৃথা" ("Bengalees need not apply")—অবশ্য ক্রীতদাসদিগের ব্যবস্থা আলাদা। কংগ্রেসেও এ কথা উঠিয়াছে যে, "বঙ্গাল উচ্ছন্ন গেলে কিবা আসে যায়" ("What matters if Bengal perishes") এবং লীগের উচ্চতম অধিকারিবর্গের ভালবাসার চিহ্ন বাঙালী মুসলমান পাইয়াছে দুর্ভিক্ষের মধ্যে, যখন এক জনও অবাঙালী মুসলমান, এ দেশের দুঃখে দু-পয়সা উপুড়হস্ত করবার কথা দূরে থাকুক, এখানে আসিয়া দু-ফোঁটা চোখের জলও ফেলিতে পারেন নাই। সুতরাং বাংলাদেশে "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে" প্রতিক্রিয়াবাদী দলের পথ সকল দিক হইতেই পরিষ্কার মনে করায় কিছুমাত্র ভুল নাই এবং যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহাতে সে কথা লক্ষ বার প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। সুদূর করাচী পর্যন্ত বাংলাদেশের লুঠ পৌঁছিয়াছে, শত শত ক্রোশ দূরে অপহৃতা ও ধর্ষিতা হিন্দু স্ত্রীলোকের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইহাতেই প্রমাণ হইয়াছে যে লীগদল কিরূপ নির্বিবাদে ব্যাপক আয়োজন করিয়া "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে" নামিয়াছিল।

বাঙালীকে এখন "বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে" শুনিতে ও বুঝিতে হইবে। সহায়তা দূরের কথা সহানুভূতিও পাওয়া এখন সুদূরপরাহত। কিন্তু মনে বিশ্বাস ও হৃদয়ে জোর থাকিলে ৪০ বৎসর আগে বাঙালী যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিল আজও তাহা পারিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব

কলিকাতার দাঙ্গায় মন্ত্রীমণ্ডল এবং পুলিশ দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে যে শোচনীয় অক্ষমতা দেখাইয়াছে তাহার সমালোচনা করিবার জন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি মুলতুবী প্রস্তাব এবং ব্যবস্থা-পরিষদে দুইটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ভোটের জোরে উভয় ক্ষেত্রেই প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হইয়াছে কিন্তু বক্তৃতা প্রসঙ্গে গবর্মেণ্ট এবং পুলিশ উভয়েরই বহু গলদ ধরা পড়িয়াছে। দাঙ্গা সম্পর্কে লীগের দায়িত্ব অস্বীকার করিবার যে প্রবল চেষ্টা সুরু হইয়াছে, বিতর্কের সময় লীগদলভুক্ত কোন কোন বিশিষ্ট সদস্য এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কয়েকটি স্বীকারোক্তিতে উহা অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে।

ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসদল কর্তৃক দুইটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, একটি সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলের অপরটি প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর বিরুদ্ধে। এই উপলক্ষে যে সব বক্তৃতা হয় তাহার প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মন্ত্রীমণ্ডলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন,

> লীগের বিশিষ্ট নেতাদের বক্তৃতাই মুসলমানদিগকে আইন ভঙ্গ করিতে ও উপদ্রব করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। ১৬ই আগষ্ট তারিখ সর্বসাধারণের ছুটির দিন ঘোষণা করিয়া প্রত্যক্ষভাবে আইন ভঙ্গ করিতে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই কথা হইতেছে এই যে, আইন ভঙ্গ করাই যে মুসলিম লীগের নীতি সেই লীগের হাতে জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় কি না। একাধারে আইনভঙ্গকারী ও রাষ্ট্রীয় বিধান অনুযায়ী আইনের রক্ষক হিসাবে লীগ কাজ করিতে পারে না। কংগ্রেসের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত দত্ত বলেন যে, কংগ্রেস যখন আইন অমান্য করা স্থির করিয়াছিল তখন কংগ্রেসী সদস্যগণ সরকারী পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন, তাঁহারা দোতরফা নীতি অবলম্বন করেন নাই।
>
> আইন ভঙ্গ করিয়া উদ্দেশ্য সাধনের অধিকার যদি কোনও রাজনৈতিক দলের থাকে, তবে জনসাধারণেরও এই দাবী করার অধিকার রহিয়াছে যে, এরূপ দলের হাতে আইন রক্ষার ভার রাখা চলিবে না।
>
> মন্ত্রীমণ্ডল মুসলমানদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিলেন যে, জবরদস্তি করিয়া, লুঠতরাজ করিয়া, এমন কি প্রয়োজন হইলে লোককে হত্যা করিয়া ১৬ই আগষ্টের অনুষ্ঠান সফল করিবার ক্ষমতা তাহাদের রহিয়াছে। লীগের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা হইয়াছিল।
>
> নিম্নলিখিত কথাগুলি অস্বীকার করার উপায় নাই—
>
> (১) হিন্দুদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৬ই আগষ্ট ছুটি ঘোষণা করা হইয়াছিল।
>
> (২) ১৬ই আগষ্ট প্রাতঃকাল হইতেই মুসলমানেরা লাঠি-সোটা ও ছুরিছোরা সহ মিছিল করিয়া বাহির হইয়াছিল এবং দোকানদারদিগকে নিজ নিজ দোকান বন্ধ করিবার জন্য জোরজবরদস্তি করিয়াছিল।
>
> (৩) অসহায় লোকেরা পুলিসের সাহায্য চাহিয়াছিল কিন্তু পায় নাই। পুলিসের হাতে লোক থাকা সত্ত্বেও পুলিস বলিয়াছিল যে, তাহারা নিরুপায়, তাহাদের কিছু করিবার হুকুম নাই। থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারগণের কাছে কোনও সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সংবাদ দিলে তাঁহারা কোনও সাহায্য করেন নাই, বরং তাঁহারা লোককে যেমন করিয়া পারে আত্মরক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন।
>
> (৪) মুসলমান গুণ্ডা ও দুর্বৃত্তেরা অস্ত্র-শস্ত্র বহন করার জন্য লরী ব্যবহার করিয়াছিল। মিঃ সুরাবর্দীর সভাপতিত্বে যে সভা হইয়াছিল সেই সভাতেও তাহারা অস্ত্রশস্ত্র সহ লরী করিয়া গিয়াছিল।

প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত বিমলকুমার ঘোষ বলেন,

> ১৬ই আগষ্ট তারিখে একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও আইনভঙ্গ করার প্রভূত আশঙ্কা সত্ত্বেও পুলিস কমিশনার কেন কলিকাতা পুলিস আইনের ৬২ক ধারা অনুসারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না তাহা প্রধানমন্ত্রী মহাশয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন কি? ঐ ধারাতে বিহিত আছে যে, জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সুবিধারক্ষার্থ যাহাতে শোভাযাত্রাসমূহে সুশৃঙ্খলা থাকে তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করার অধিকার পুলিস কমিশনারের রহিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় অন্যত্র একটা সময়োচিত জরুরী ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ব্যবস্থাটা কি তাহা তিনি খুলাইয়া বলিবেন কি? ১৬ই আগষ্ট প্রাতঃকাল হইতে লুঠতরাজ এবং হত্যাকাণ্ড সুরু হয়, তথাপি সেইদিন বিকালে প্রধানমন্ত্রী মুসলমানদের জনসমাবেশে কেন সভাপতিত্ব করিলেন? শুধু তাহাই নহে একটা উত্তেজিত জনতার সমক্ষে যাহাদের মধ্যে অনেকেই দারুণভাবে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া আসিয়াছে তাহাদের সমক্ষে বক্তৃতা করিয়া প্রধানমন্ত্রী তাহাদিগকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন কেন প্রধানমন্ত্রী তাহা বলিবেন কি? জাতি ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলেই জানেন যে, ১৬ই আগষ্ট তারিখ আইনানুগত নগরবাসীরা পুলিসের সাহায্য চাহিয়াও কোন সাহায্য পায় নাই। অধিক কি কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিস লুঠতরাজে যোগ দিয়াছিল। পুলিসের চক্ষের উপরই মারপিট হত্যাকাণ্ড এবং সম্পত্তি লুঠ হইয়াছে। পুলিস কাষ্ঠপুত্তলিকার মত তাহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে। কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করে নাই। এ সম্পর্কে টেরেটীবাজার লুণ্ঠন এবং আরও সহস্র সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এ সমস্ত অপরাধ পুলিসগ্রাহ্য। শুনিয়াছি যে, এই সমস্ত অপরাধ অগ্রাহ্য করাটা পুলিসের পক্ষেই অপরাধজনক। অতি বিশ্বস্তসূত্রে আমি জানিয়াছি যে, পুলিসের নিকট এমন কি বার বার পুলিস-কর্মচারীর নিকট সাহায্য চাহিয়া উত্তর পাওয়া গিয়াছে যে, তাহাদের কিছু করিবার হুকুম নাই। পুলিসগ্রাহ্য ব্যাপারে এই যুক্তি টিকিতে পারে না। এই সমস্ত ব্যাপারেও যদি পুলিস নিষ্ক্রিয় থাকিয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে পুলিসকে হস্তক্ষেপ না করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী অন্যত্র যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে, যদি

এরূপ কোন নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে পুলিস কমিশনারই তাহা দিয়াছিলেন।

২৩শে আগষ্ট তারিখে সাংবাদিকদের নিকট ব্রিগেডিয়ার সিক্সস্মিথ বলিয়াছেন যে, শুক্রবার বিকালেও পুলিস-বাহিনী সম্পূর্ণ রূপে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। পুলিস ফৌজ বৃদ্ধি করা যে দরকার সে সম্পর্কে অনেক কথা বলা হইয়াছে এবং আমার স্থির বিশ্বাস যে, অপর পক্ষের সদস্যগণ এ সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলিবেন। কিন্তু কলিকাতার শোচনীয় ব্যাপারে প্রধান কথা হইল এই যে, গবর্ণমেণ্টের হাতে যে পুলিস ফৌজ ছিল তাহা যথাসময়ে যথাস্থানে নিযুক্ত করা হয় নাই কেন? যদি তাহা করা হইত, বিশেষ করিয়া জঙ্গী-ফৌজকে যখন ডাকিলেই পাওয়া যাইত তখন যদি তাহা করা হইত, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কলিকাতায় এই বীভৎস কাণ্ড হইত না এবং বহু লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা পাইত। আশঙ্কা-সঙ্কুল অঞ্চলগুলিতে পুলিস ফৌজকে পূর্ণভাবে নিয়োগ করা হয় নাই কেন তাহা প্রধানমন্ত্রী বুঝাইয়া বলিবেন কি?

ব্রিগেডিয়ার সিক্সস্মিথ বলিয়াছেন যে, শিয়ালদহ হইতে হাওড়া পর্যন্ত অঞ্চলটাই ছিল বিঘ্ন-সঙ্কুল।

জঙ্গী-সাহায্য পাইতে বিলম্বের হেতু স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী অন্যত্র বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে তাঁহারা আসিতে রাজী হয় নাই। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার সিক্সস্মিথ বলিয়াছেন ১৬ই তারিখ রাত্রি দ্বিপ্রহরের আগে তাঁহাকে ডাকাও হয় নাই এবং এমন কথাও জানান হয় নাই যে, সৈন্যদের সাহায্য ছাড়া পুলিস অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পারিবে না। প্রধান মন্ত্রীর উক্তির সহিত ব্রিগেডিয়ার সিক্সস্মিথের উক্তির এই যে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহা প্রধানমন্ত্রী দূর করিবেন কি?

ডেপুটি স্পীকার লীগদলভুক্ত সদস্য মিঃ তফজ্জল আলি প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলেন:

হাঙ্গামার সময় পুলিসের নিষ্ক্রিয়তাটা আলোচনার বিষয় হইতে পারে বটে। ১৬ই এবং ১৭ই আগষ্ট তারিখ যে পুলিস কিছু করে নাই তাহা জানা কথা। বক্তা নিজেই এক জন ডেপুটি কমিশনারের কথা জানেন যিনি হাঙ্গামার মধ্যে যাইতে সম্মত হন নাই।

অনাস্থা প্রস্তাব উপলক্ষে বিতর্কের দ্বিতীয় দিন

অনাস্থা প্রস্তাব দুইটি দুই দিন আলোচিত হয়। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মৌলবী ফজলুল হক ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা এবং মিঃ সুরাবর্দীর উত্তর। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ও ঐ দিন বক্তৃতা করেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৬ই আগষ্টের অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সব উদ্যোগ আয়োজন করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন:

ঐদিন প্রাতে খবরের কাগজে লীগের এ্যাম্বুলেন্স কোর সম্পর্কে একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এ্যাম্বুলেন্স কোর কিভাবে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন থাকিবে তাহার নির্দেশ ঐ বিজ্ঞপ্তিতে ছিল। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানান হইয়াছিল যে, ১৭ই আগষ্ট হইতে যখন যেরূপ প্রয়োজন তখন সেইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইবে। লীগ যে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল ইহা কি তাহার প্রমাণ নহে? আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহাশয় বোম্বাইয়ে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতে যাইতেছেন। দেখিতেছি তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। যে মন্ত্রী তাহার অধীনস্থ বেতনখোর পুলিস কমিশনারকে সংযত রাখিতে পারেন না, যে মন্ত্রী নাকি বলেন যে, তিনি নিরুপায়, পুলিস কমিশনার তাঁহার কথা শোনেন না, তিনিই কিনা বাংলাকে স্বাধীন ঘোষণা করার কথা বলেন! তিনি আবার বলেন যে তিনি আইন ও শৃঙ্খলা অমান্য করিবেন। তিনিই কিনা হইতেছেন আমাদের আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগের মন্ত্রী।

২৩শে আগষ্ট তারিখ সুরাবর্দী সাহেব এক শান্তির বাণী প্রচার করিলেন। আবার তাহার আধ ঘণ্টা বাদেই বিদেশী সংবাদপত্রসমূহের জন্য একটি বিশেষ বাণী দিলেন। এই বাণী তাঁহার শান্তির বাণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যদি ঐ সমস্ত কথা বলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল তবে বাংলার লোকের কাছে শান্ত থাকিয়া মিলিয়া মিশিয়া বাস করিবার অনুরোধ জানাইবার বা অর্থ কি?

মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছেন যে, তিনি পুলিস কমিশনারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু যে সমস্ত উদাহরণ আছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, সুরাবর্দী সাহেব পুলিস অফিসারদের কার্যে এমন ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, তাহা এই প্রদেশের স্বরাষ্ট্রসচিবের পক্ষে করা উচিত হয় নাই। রবিবার বৈকালে এক জন ইউরোপীয় পুলিশ অফিসার সাতটি গুণ্ডাকে পার্ক ষ্ট্রীট থানায় লইয়া যান। ১০ মিনিটের মধ্যে মিঃ সুরাবর্দী থানায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে খালাস করিয়া লন। তিনি একথা অস্বীকার করিতে পারেন কি? তাহার পর মিঃ সুরাবর্দী আবার থানায় ফিরিয়া আসেন এবং থানার কর্মচারী-দিগকে এক ঝুড়ি ডিম চুরির অভিযোগে দায়ী করেন। লীগদল গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৫০০ গ্যালন পেট্রল চাহিয়াছিলেন। তাহা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু মন্ত্রীদের নামে কুপন দেওয়া হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রীর নামে ১০০ শত স্পেশাল কুপন দেওয়া হইয়াছিল। পুলিসের নাকের উপরেই এভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আয়োজন করা হইয়াছিল। মুসলমানেরা ভারতের জনসংখ্যার এক-

চতুর্থাংশ। তাহারা মনে করে তাহারা সংখ্যায় এত অধিক যে, হিন্দুদের তাঁবেদারী করিতে তাহারা কদাপি সম্মত হইবে না। যদি সত্য সত্যই তাহারা উহা মনে করে, তবে তাহারা একথা কি করিয়া ভাবিতে পারে যে যেখানকার এক সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের সংখ্যা শতকরা ৪৫ জন সেই সম্প্রদায় অপরের তাঁবেদারী করিবে? যদি মুসলমানেরা মনে করে যে, তাহারা বাংলার হিন্দুদিগকে একেবারে উৎসাদিত করিয়া দিতে পারিবে তাহা হইলে আমি বলি যে, তাহা কখনও সম্ভব হইবে না। সাড়ে তিন কোটি হিন্দুকে উৎসাদিত করা যাইবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, তাহা করিতে গেলে ভারতের শতকরা ৭৫ জন হিন্দু অধিবাসী শতকরা ২৫ জন মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। সত্যকথা যখন এই এবং সকলকেই যখন মিলিয়া মিশিয়া এদেশে বাস করিতে হইবে তখন এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের তাঁবেদার হইবে এই কথা না বলাই ভাল। ভারতের বিপুলসংখ্যক অধিবাসী যাহাতে স্বস্তিতে থাকিতে পারে সেইরূপ একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করাই ভাল।

আমার অভিযোগ এই যে, বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল এই প্রদেশের শাসনতন্ত্রকে ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্ম নিয়োগ করিয়া সুশাসনের মর্য্যাদা নষ্ট করিতেছেন। সেই সংগ্রাম কলিকাতার সংগ্রাম অপেক্ষা অনেক তীব্র হইবে। মৌলবী ফজলুল হক দাঙ্গার পর পুনরায় লীগে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি বলেন:

আমি শুক্রবার সকালে হিন্দু মুসলমান উভয়ের নিকট হইতে কয়েকটি টেলিফোন পাইয়া মনে করিয়াছিলাম যে, ভারতবাসীদের সহনশীলতার অভাবে মাঝে মাঝে যে সমস্ত শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়া থাকে ব্যাপারটা বোধ হয় তাহারই একটি। পুলিসের নিকট সাহায্যের জন্ম আবেদন জানান হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা উত্তর দেয় যে, তাহাদের কিছু করিবার হুকুম নাই। পুলিসের যদি কিছুই করিবার না থাকে তাহা হইলে তাহাদের রাখা হইয়াছে কেন? তাহাদের কিসের জন্ম বেতন দেওয়া হয়? শান্তিরক্ষাই যদি তাহারা না করিতে পারে তাহা হইলে তাহাদিগকে রাখিবার প্রয়োজন কি? আমার বাড়ী হইতে মল্লিকবাজার আধ মাইলের পথ। শুক্রবার বিকালে ঐ বাজার লুঠ হয়। আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতে পাই যে চারদিক হইতে লুঠের মাল লইয়া লোকে দৌড়াইতেছে। পুলিসও সঙ্গে আছে। উন্মাদ জনতার সঙ্গে যোগ দিয়া পুলিসকে বেশ খুশীই দেখা গিয়াছিল। তাহার পর পার্কসার্কাসের বাজার লুঠ হয়। পুলিসের ফাঁড়ীতে এক জন লোক পাঠান হয়। ফাঁড়ীর ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলেন যে, কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে তাহা দেখিবার মত সময় তাহার নাই। মনে হয় কাতায় পুলিসের মধ্যে যেন একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমার বাড়ীর ৪০ গজ দূরেই আর একটা বাড়ী আছে। ১৭ই তারিখ সেই বাড়ীটা লুঠ হয়। কাছেই আছে একটা পুলিসের ফাঁড়ী, ফাঁড়ীর লোক কিছুই করিল না। দেখিলাম লোকে লুঠের মাল লইয়া চলিয়া আসে। প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের এক জন সদস্যকে দেখিলাম একখানি রূপার ট্রে লইয়া বাড়ী ফিরিতেছেন। আমি অবশ্য সমস্ত ব্যাপার দেখি নাই, তবে যতটা দেখিয়াছি তাহাতেই আমি বিবশ হইয়া পড়িয়াছি। গুণ্ডারা আমার বাড়ীর দরজায় ঘা মারিতে-আরম্ভ করিয়া দেয়। আমি প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে করিতেছিলাম যে, এবার বুঝি আমাদের সকলের দফা নিকাশ হইল। আমার মনে হইতেছিল যে, ব্রিটিশ রাজত্ব ত চুলায় গিয়াছেই—না জানি কোন এক শিক্ষিত ("learned") নাদিরশাহ কলিকাতা লুঠ করিতে আসিয়াছে। আমি পুলিস অফিসের সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টা করি। জানি না কণ্ট্রোল রুম কে কণ্ট্রোল করিতেছিলেন। কিন্তু যখনই কোনপ্রকার সাহায্য চাহিয়াছি তখনই উত্তর আসিয়াছে—"আপনার অভিযোগ লিখিয়া রাখা হইল। যথাসময়ে যাহা করার করা হইবে।" গবর্ণরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিলাম। উত্তর পাইলাম—সরকারী কর্মচারী ব্যতীত লাটপ্রাসাদে কাহারও টেলিফোন করিবার অধিকার নাই। কণ্ট্রোল অফিস অবশ্য কণ্ট্রোল করিতেছিলেন না। গবর্ণমেণ্ট হাউস কোন কথায় কাণ দিতে রাজী ছিলেন না। এই অবস্থার মধ্যে হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকিল। ১৬ই তারিখ যদি পুলিস ও মিলিটারী শক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিত তাহা হইলে যে এই সমস্ত ব্যাপার আদৌ ঘটিত না ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। ব্যাপারটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত। কাজেই এই সিদ্ধান্ত না করিয়া থাকা যায় না যে, এতগুলি লোকের প্রাণহানির জন্ম পুলিসই প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী। যদি কোন নিরপেক্ষ তদন্ত হয় আর এ সমস্ত পুলিস অফিসার কে তাহা জানা যায় তাহা হইলে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া নরহত্যা ও নরহত্যায় সাহায্য করার অপরাধে ফাঁসি দেওয়া উচিত

লিপ্টন কোম্পানীর ঘড়ীর দোকানটি লুঠের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ হক বলেন যে, এখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া লুঠ চলিয়াছিল, পুলিসও এই লুঠে যোগ দিয়াছিল। অনেককে রিষ্টওয়াচ লইয়া দোকান হইতে বাহির হইতে দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই পুলিসের লোক।

অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রীর উত্তর

অনাস্থা প্রস্তাবের উত্তরদান প্রসঙ্গে মিঃ সুরাবর্দী যে বক্তৃতা করেন তার সারমর্ম এইরূপ:

কলিকাতায় যে বীভৎস ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে আধুনিক ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। অনেকে বলিয়াছেন আমি হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাইতে চাহিয়াছিলাম; যদি তাই হইবে তবে আমি মুসলমান যেখানে সংখ্যালঘু সেই কলিকাতা শহর বাছিয়া লইব কেন? স্ত্রীলোক ও শিশুদের ঘরে ফেলিয়া ময়দানের সভাতেই বা আসিতে বলিব কেন?

কোন কোন সদস্য বলিয়াছেন মুসলমানেরাই দাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছিল। হাসপাতালে আহত মুসলমানেরাই সর্বাগ্রে ভর্তি হইয়াছে এই অকাট্য সত্য উড়াইয়া দিবার চেষ্টা মিঃ কুণ্ডু করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মুসলমানেরাই মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। সত্যই কি আপনারা বলিতে চান যে হ্যারিসন রোড, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, রাসবিহারী এভিনিউ প্রভৃতি হিন্দু প্রধান স্থানে মুসলমানেরা হিন্দুর দোকান জোর করিয়া বন্ধ করিতে গিয়াছিল? হাওড়া হইতে আগত শোভাযাত্রা হ্যারিসন রোড এবং ষ্ট্রাণ্ড রোডের মোড়ে আটকানো হয়। বেলা তিনটার সময় এক জন ডেপুটি কমিশনারের রক্ষণাধীনে টালিগঞ্জ হইতে আগত একটি শোভাযাত্রা রসা রোডে টালিগঞ্জ পুলের নিকট হিন্দুরা আটকাইয়া দেয়।

১৬ই তারিখ সকাল আটটা হইতেই পুলিস কমিশনার জরুরী অবস্থায় তাঁহার যে কর্তব্য আছে তদনুসারে অতিরিক্ত পুলিস মোতায়েন করিয়াছিলেন। পুলিস কমিশনারের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া আমি সরিয়া পড়িতে চাহিয়াছি বলিয়া অনেকে আমার নিন্দা করিয়াছেন। (ব্যবস্থাপক সভায় মুলতুবী প্রস্তাবের উত্তর দানের সময় মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছিলেন, "কলিকাতায় শান্তিরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পুলিস কমিশনারের, উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার মন্ত্রীদের নাই।") আমি পরিষ্কার ভাষায় জানাইতে চাই যে এরূপ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না।

অতঃপর পুলিস কমিশনারের কার্যের প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন,

"কোন কোন স্থানে পুলিস যদি স্বীয় কর্তব্য পালন না করে তবে তাহার জন্য আমি বা পুলিস কমিশনার কেমন করিয়া দায়ী হইব?

গোলমালের দিন বহু স্থানে ঘুরিয়া স্বচক্ষে সকল অবস্থা দেখিয়া আমি বেলা ২টার সময় লালবাজারে আসি। উভয় দলের মনকষাকষি দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল গোলমাল চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। লালবাজারের কম্পাউণ্ড তখন সশস্ত্র পুলিস ও লরীতে ভর্তি ছিল। আমি তখনই পুলিস কমিশনারকে বলি যে মিলিটারী ডাকা উচিত। বেলা পৌনে তিনটার সময় মিলিটারী কর্তৃপক্ষকে ডাকিবামাত্র আসিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলা হয়। বেলা সাড়ে চারটার সময় মিলিটারী আহ্বান করা হয় এবং তাহাদিগকে নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি খোলা রাখিতে বলা হয়:

(ক) ক্যানিং ষ্ট্রীট—কলুটোলা ষ্ট্রীট—মির্জাপুর ষ্ট্রীট।

(খ) কলুটোলা ষ্ট্রীটের মোড় হইতে বিবেকানন্দ রোডের মোড় পর্যন্ত লোয়ার চিৎপুর রোড।

(গ) অপার চিৎপুর রোডের মোড় হইতে কলেজ (কর্ণওয়ালিস?) ষ্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত বিবেকানন্দ রোড।

(ঘ) কলুটোলা ষ্ট্রীটের মোড় হইতে বিবেকানন্দ রোডের মোড় পর্যন্ত কলেজ ষ্ট্রীট।

(ঙ) হ্যারিসন রোড।

(চ) বিবেকানন্দ রোডের মোড় হইতে কলুটোলা পর্যন্ত সেণ্ট্রাল এভিনিউ।

দাঙ্গার দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি বলেন,

এই ঘটনাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধের তীব্রতা অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের পরস্পরবিরোধী আদর্শ দৃঢ়তা ও উত্তেজনার সহিত তীব্রভাবে প্রচারিত হইয়াছে এবং গৃহযুদ্ধের ভীতিপ্রদর্শন করা হইয়াছে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিগণ এবং মন্ত্রীমিশন নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পরিকল্পনায় ও অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিবার পূর্ব পর্যন্ত এই বিরোধ কাগজেপত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব উপলক্ষে কংগ্রেস ও লীগের কার্যকলাপ আলোচনা করিতে গিয়া মিঃ সুরাবর্দী কংগ্রেসের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া মন্তব্য করেন:

এ বিষয়ে আমি বিশেষ কিছুই বলিতে চাই না। শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ২৯শে জুন তারিখে মন্ত্রীমিশন কর্তৃক লীগ কি ভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে তাহা এখন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। এই নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতায় মুসলিম ভারত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে কেহই কোন দিন স্বপ্নেও ধারণা করে নাই যে ব্রিটেনের তিন জন বিশেষ প্রতিনিধির দ্বারা তাহারা এমন নির্লজ্জভাবে প্রতারিত হইবে। কিন্তু স্বপ্নে যাহা ধারণা করা যায় নাই বাস্তবে তাহাই সম্ভবপর হইল। মন্ত্রীমিশন যে ভাবে লীগকে প্রতারণা করিয়াছে তাহাতে আমি প্রত্যেক ইংরেজকে লজ্জায় মাথা নত করিতে দেখিয়াছি। ব্রিটিশ ধুরন্ধরগণ এই ভাবে মুসলিম লীগকে প্রতারিত করিয়া কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। ইহাতে মুসলমান জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা পাকিস্থান দাবীর সমাধি রচনায় পরিবর্তে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার পথ বাছিয়া লইল। এইরূপ চরম বিশ্বাসঘাতকতার দরুন মুসলমানেরা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে।

প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার মধ্যেই দাঙ্গার দায়িত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্বীকারোক্তি রহিয়াছে। সেগুলি এইরূপ :

(১) দাঙ্গা বাধিবার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিলেন মন্ত্রীমিশন। তাঁহাদের কার্যে মুসলমানেরা অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল এবং এইজন্যই তাহারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে ১৬ই জুনের ঘোষণার ৮ম ধারার ব্যাখ্যা করিয়া মিঃ জিন্না কংগ্রেসকে বাদ দিয়া নিজেই সমগ্র অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। মন্ত্রীমিশন মিঃ জিন্নার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে না পারায় এবং তাঁহার অসহযোগিতার ফলে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিতে বাধ্য হওয়ায় লীগের বিক্ষোভের কারণ ঘটিয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্ট দখল করিয়াছে, মিঃ জিন্না হইতে সুরু করিয়া বহু লীগ নেতা এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান মাত্র এই কথা বলাও তাঁহাদের প্রচারকার্যের একটি প্রধান অঙ্গ। সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কংগ্রেস ইহা তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন কিন্তু দেখাইয়া দিয়াছেন হিন্দুকে। মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবে হিন্দুরা অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই : ক্রুদ্ধ হইয়াছে মুসলমান। সুতরাং দাঙ্গার মূলে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব এই কথা স্বীকার করিলে আক্রমণ কাহারা আগে করিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

(২) ১৬ই তারিখ সকালেই পাকিস্থান এ্যাম্বুলেন্স কোর কেন প্রস্তুত হইয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিল, কেনই বা তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাহা জানিতে চাহিয়া জবাব পান নাই।

(৩) মিঃ সুরাবর্দ্দী ১৬ই তারিখ বেলা দুইটা পর্য্যন্ত চারি দিকে ঘুরিয়া বুঝিয়াছিলেন যে অবস্থা সাংঘাতিক হইয়া পড়িয়াছে, দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়িতেছে, উত্তেজনা এত গুরুতর হইয়াছে যে মিলিটারী ছাড়া পুলিশের পক্ষে শান্তিরক্ষা করা অসম্ভব। তথাপি অপরাহ্ণে কেন তিনি ময়দানের সভা বন্ধ না করিয়া ইহার সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন, ঐ সভায় কেন উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিতে দিয়াছিলেন এবং কেনই বা লাঠি ছোরা লইয়া সভাক্ষেত্রে লোক আসিতে দেখিয়াও তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করেন নাই? ভোর না হইতেই যেখানে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, বেলা ২টার মধ্যে যেখানে অবস্থা পুলিসের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে সেই অবস্থায় গড়ের মাঠের সভা হইতে দিয়া উত্তেজনা আরও বাড়াইবার দায়িত্ব মিঃ সুরাবর্দ্দী বা পুলিস কমিশনার কিছুতেই অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারেন না।

(৪) হ্যারিসন রোড, বহুবাজার, ভবানীপুর, রাসবিহারী এভিনিউ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানেরা হিন্দু দোকান আক্রমণ করিবার সাহস পাইতে পারে না, এই কথা বলিয়া এবং হাওড়া পুলের নিকট শোভাযাত্রা আটকানো ও বেলা তিনটার সময় টালিগঞ্জের শোভাযাত্রায় বাধাদানের উল্লেখ করিয়া মিঃ সুরাবর্দ্দী বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে হিন্দুরাই প্রথম আক্রমণ করিয়াছে। অথচ বক্তৃতায় তিনিই বলিয়াছেন যে বেলা ২টার মধ্যেই অবস্থা সাংঘাতিক দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বেলা সাড়ে-চারটার সময় মিলিটারী পাহারার জন্য তিনি যেসব রাস্তার নাম দিয়াছেন তার মধ্যে বহুবাজার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, রাসবিহারী এভিনিউ, টালিগঞ্জ প্রভৃতির নামোল্লেখ পর্যন্ত নাই এবং তালিকায় নির্দিষ্ট স্থানগুলির অধিকাংশই মুসলমান এলাকা।

(৫) হাসপাতালে আগত প্রথম মুসলমান মুসলমানের দ্বারাই আহত হইয়াছে এই কথা বলা হইলে মিঃ সুরাবর্দ্দী উহা অস্বীকার করেন। বক্তাকে এজন্য উপহাস করিতেও তিনি ছাড়েন নাই, কিন্তু উহা সত্য। মেডিকেল কলেজে নূর মহম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে ১৬ই তারিখ সকাল ৭টা ১৫ মিনিটের সময় ভর্ত্তি করা হয়। উহার ঠিকানা ৬২নং কেশব সেন ষ্ট্রীট এবং এই ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেয় এক জন হিন্দু যুবক ও এক জন শিখ। রাজাবাজারের দিক হইতে আগত এক মুসলমান জনতা নূরমহম্মদকে দোকান বন্ধ করিতে বলিলে সে অস্বীকৃত হয়। তখন তাহাকে ছোরা মারা হয়। সেই এলাকা মুসলমান প্রধান, এখানে কোন হিন্দু নূর মহম্মদকে মারিয়া থাকিলে তাহার পক্ষে পলায়ন করা অসম্ভব হইত, এবং তখনই এই অঞ্চলে দাঙ্গা বাধিয়া যাইত। মেডিকেল কলেজ, ক্যাম্বেল হাসপাতাল এবং বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৬ই তারিখে ভর্ত্তি আহতদের হিসাব আমরা 'মডার্ন রিভিয়ু'র সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। বাংলা সরকার উহার কোন প্রতিবাদ এখনও করেন নাই; ঐ হিসাব এইরূপ :

মেডিকেল কলেজ :

১৬ই সকাল ৭টা ১৫ মিঃ—প্রথম আসে মুসলমান (উপরোক্ত নূর মহম্মদ)

" ৭টা ৩৫ মিঃ—হিন্দু

সারাদিনে আসে হিন্দু—১৭৬

মুসলমান—২০৭

অজ্ঞাত— ৫২

৪৩৫

ক্যাম্বেল হাসপাতাল :

১৬ই সকাল ৯টা—প্রথম আসে হিন্দু

" ৯-৩০— এক জন হিন্দু এক জন মুসলমান

বেলা ১১টার মধ্যে ৭ জন হিন্দু ৭ জন মুসলমান আসে

সারাদিনে আসে—হিন্দু ৬৭

মুসলমান ৬৫

বেলগাছিয়া হাসপাতাল :

১৬ই সকাল ৭টা ৪৫ মিঃ—প্রথম আসে হিন্দু

" ৮টা ৩০ মিঃ—হিন্দু

" ৯টা —২ জন হিন্দু

" ৯টা ৩০ মিঃ—এক জন হিন্দু

এক জন মুসলমান

বেলা ১২টা পর্যন্ত আসে—হিন্দু ১১

মুসলমান ৫

মণ্ডলের সভাপতি তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীর নিকট সভার বিবরণ সহ এক পত্র লেখেন। প্রধান মন্ত্রী ইতিমধ্যে মত পরিবর্তন করিয়া সেইদিন অপরাহ্ণ ৪ টায় রাইটার্স বিল্ডিংএ সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন।

সরকারী আদেশের কয়েকটি দিক ও নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক মণ্ডলের সভাপতির পত্র সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনার পর প্রধান মন্ত্রী সাংবাদিকগণের প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া সরকারী আদেশ জারী করার জন্য খেদ করেন। তবে তিনি জানান যে, প্রেস এডভাইসারি কমিটি যদি মোটামুটি ভাবে আদেশ পালন করিয়া চলে তাহা হইলে কমিটি কর্তৃক প্রচারিত কোনও সংবাদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লওয়া হইবে না, এইটুকু সুবিধা দিতে রাজী আছেন। উপস্থিত প্রতিনিধিগণ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, সংবাদপত্রের অধিকারের উপর ইহা অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ। এই অবস্থায় একান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমরা স্থির করিয়াছি, এই আদেশের বাধাবাঁধন মানিয়া আমরা দাঙ্গাহাঙ্গামা ও গোলযোগ সম্পর্কে কোনও সংবাদ প্রকাশ করিব না। আমরা মনে করি, তথ্যপূর্ণ বিবরণ ও সঙ্গত মন্তব্য বন্ধ করাই এই আদেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

আমরা মনে করি, নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক মণ্ডলের সভাপতি প্রধান মন্ত্রীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতেই প্রেস এ্যাডভাইসরি কমিটি ও সংবাদপত্র সম্পাদকদের মতামত জানা যাইবে। নিম্নে সেই পত্রের নকল দেওয়া হইল :—

প্রিয় মিঃ সুরাবর্দ্দী, অদ্যপ্রাতে প্রেস এ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠক হয়। কমিটির সদস্য নহেন এমন কয়েকজন সম্পাদকও বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আপনি যে আদেশ জারী করা স্থির করিয়াছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এক জন ব্যতীত আর সকলেই মনে করেন আদেশটি অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছনীয়, যে উদ্দেশ্যে ইহা জারী করা হইতেছে তাহা সম্ভবতঃ ইহার দ্বারা সাধিত হইবে না। অতএব আমরা আপনার নিকট নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি :—

বিষয়টি সংবাদপত্রগুলির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, প্রত্যহ সন্ধ্যায় সাত জন প্রতিনিধির এক সভায় সকল সংবাদ পেশ করা হইবে, এই কমিটির বৈঠকে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া মোটামুটি একটি বিবরণ প্রস্তুত করা হইবে, কোনও সংবাদের সত্যতা ঠিকমত নির্ণয় করা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে পরদিনের সভার জন্য উহা রাখিয়া দেওয়া হইবে, এই কমিটির মারফত প্রচারিত না হইলে কোনও সংবাদ প্রকাশিত হইবে না। সন্ধ্যা ৭টায় ষ্টেটসম্যান কার্যালয়ে কমিটির অধিবেশন হইবে।

পত্রটি যাহাতে আপনার নিকট যথাসম্ভব শীঘ্র পৌছিতে পারে সেজন্য ইহা খুব তাড়াতাড়ি করিয়া লেখা হইল। আমি আশা করি, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রস্তাবটি যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে পারিব।

ভবদীয়—

(স্বাঃ) তুষারকান্তি ঘোষ, সভাপতি নিখিল-ভারত সংবাদ পত্র সম্পাদক মণ্ডল, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬।

শনিবারের সাংবাদিক বৈঠকে অর্ডিনান্স জারীর সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর সম্পাদকেরা অমৃত বাজার পত্রিকার সিটি অফিসে সমবেত হন।

এই সভায় অর্ডিনান্সের প্রতিবাদস্বরূপ পত্রের প্রকাশ বন্ধ স্থির হয় এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :

বঙ্গীয় সংবাদপত্র পরামর্শ কমিটি (প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটি) গঠনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল বাংলা গবর্মেণ্ট তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। শান্তিস্থাপনের জন্য সংবাদ-পত্রগুলি সরকার অপেক্ষা কোনক্রমেই কম সচেষ্ট নহে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে যে অর্ডিনান্স জারী করা হইবে তাহাতে স্বীয় উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। এইজন্য কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিবর্গের এই সভা গবর্ণমেণ্টের আদেশের প্রতিবাদে ১লা অক্টোবর হইতে প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিবার জন্য সংবাদপত্রগুলিকে অনুরোধ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই অধিবেশন শেষ হইবার পর-মুহূর্ত্তে উপরোক্ত অর্ডিনান্স জারী তাৎপর্য্যহীন নহে। বাংলা-দেশের হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া কেন্দ্রীয় কংগ্রেস গবর্মেণ্টকে লীগের আবদার মানিয়া লইতে বাধ্য করাই বর্ত্তমান দাঙ্গাহাঙ্গামার মূল উদ্দেশ্য। কলিকাতার পুলিসের প্রায় সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে লীগপন্থী মুসলমান কর্মচারী মোতায়েন করিয়া হিন্দুদের উপর লাঞ্ছনার পূর্ণ আয়োজন করিয়া রাখা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গেও তাহাই করা হইয়াছে। পুলিশ হিন্দুকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা ত করেই না, অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হিন্দুরাই পুলিশের গুলিতে আহত হয়, গ্রেপ্তার হয় এবং হিন্দু গ্রেপ্তার হইলে তাহার পক্ষে জামীনে মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত দুরূহ হয়। এবং ইহাও দেখা গিয়াছে যে লীগের গুণ্ডাদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অগ্রসর হয় নাই, মুসলমান জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ গুলি চালায় নাই এবং লীগ গুণ্ডারা ধরা পড়িলেও জামীনে মুক্তি পায়। লীগ গুণ্ডাদের আক্রমণ হইতে হিন্দুকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা তো নাই-ই, বরং বেপরোয়া গ্রেপ্তার করিয়া আত্মরক্ষায় হিন্দু যেটুকু চেষ্টা করিতে পারিত তাহাও খর্ব করিয়া আনা হইতেছে। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা যেখানে নিষ্ক্রিয়, সেখানে সংবাদপত্রই দেশবাসীর প্রধান ভরসা। ব্যবস্থা-পরিষদ

বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকদের অতিশয় যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া আডনান্সের বলে দাঙ্গার সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করা আমরা কিছুতেই উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। পূর্ববঙ্গের শহরগুলিতে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এখনই হাজার হাজার হিন্দু নরনারীর আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ আসিতেছে। বর্ত্তমান অর্ডিনান্স চালু থাকিলে অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

নূতন প্রেস অর্ডিনান্সে সংবাদ প্রকাশের নমুনা

প্রেস অর্ডিনান্স জারী হইবার পর মঙ্গলবার ১লা অক্টোবর কলিকাতার দাঙ্গার সংবাদ নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশিত হইয়াছে :

গতকল্য কলিকাতায় নয় জন আহত এবং দুই জন নিহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে পাঁচ জন পূর্ব কলিকাতায় দুই দল কুলির এক সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিল ; সেখানে একটি চায়ের দোকানও লুঠ হইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রায় ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

উত্তর কলিকাতায় পুলিশ এক দাঙ্গাকারী জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে, ফলে দুই ব্যক্তি আহত হয়।

২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে মোট হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াইল ৩৮ জন নিহত এবং ১৫২ জন আহত।

এই সংবাদ পড়িলেই প্রথমোক্ত ঘটনা শিয়ালদহে ঘটিয়াছে কি না সে সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগিবে। দুই দল কুলিতে সংঘর্ষ, চায়ের দোকান লুঠ এবং ঘটনাস্থল পূর্ব কলিকাতা—এই তিনটি একত্র হইয়া লোকের মনে শিয়ালদহ সম্বন্ধে ভুল ধারণা অনায়াসেই জন্মিতে পারে। পূজা উপলক্ষে শহরের বহু লোক শিয়ালদহ ষ্টেশন হইয়া দেশে যাইতেছে, সুতরাং তাহাদের উদ্বিগ্ন হইবার কারণও রহিয়াছে। হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশন এবং ষ্টেশনে যাওয়ার পথ নিরাপদ এরূপ ধারণা লোকের মনে জন্মিতে দেওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশের পর বস্তুতঃই আমাদের নিকট ঐরূপ বহু প্রশ্ন আসিয়াছে, এবং আমরা প্রকৃত ঘটনাস্থল জানিতাম বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে পারিয়াছি। কিন্তু সকলের ত সে সুবিধা নাই। শহরের অনেকগুলি স্থান সম্বন্ধেই লোকের মনে আশঙ্কা আছে। ঘটনার সঠিক স্থানের সংবাদ চাপিয়া গিয়া সমস্ত এলাকার নাম করিলে লোকের মনে সমগ্র এলাকাটি সম্বন্ধেই ভ্রান্ত আশঙ্কার সৃষ্টি হইবে। ইহাতে বর্ত্তমান অনিশ্চয়তা আরও বেশী বাড়িবে।

পাটের দর

ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে ভারত সরকার পাটের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর উহার মেয়াদ শেষ হইয়াছে। পাটের দর বাঁধা সম্বন্ধে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আলোচনা চলিতেছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেস সদস্যেরা দাবী করেন যে সর্বনিম্ন দর ৪০৲ টাকায় বাঁধিয়া দেওয়া হউক। মুসলিম লীগ সদস্যেরা তাঁহাদের এক বৈঠকে ইহার অনেক আগেই এক প্রস্তাব পাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে সর্বোচ্চ দর যেন বাঁধা না হয়। বাংলা সরকার এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট বিষয়টি সম্বন্ধে পাটচাষী এবং চটকল মালিকদের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পাটের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন কোন দরই বাঁধা হইবে না, শুধু যে চট ও থলিয়া বিদেশে রপ্তানী হইবে তার মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। ইহারা কারণ এই যে ভারতবর্ষকে এখনও বিদেশ হইতে বহু খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবেই, ঐ সব দেশে ন্যায্য মূল্যে চটের থলিয়া সরবরাহ করিতে না পারিলে খাদ্যবস্তু আমদানী অসম্ভব হইয়া উঠিবে। যে আর্জেন্টিনা এতদিন ভারতবর্ষে ফসল রপ্তানী করিতে রাজী হয় নাই, সেই দেশও অতঃপর ন্যায্য মূল্যে চট ও থলিয়া পাওয়ার আশায় গম পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ভারত সরকারকে যেমন বাঙালী পাটচাষীর স্বার্থ দেখিতে হইবে, তেমনি সমগ্রভাবে ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করিয়া চট ও থলিয়া রপ্তানীর সময় উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ দিয়া তাঁহারা অসঙ্গত কিছুই করেন নাই।

এই ব্যাপারে বাংলার লীগ-মন্ত্রীমণ্ডলী এবং লীগ পত্রিকা-সমূহ কি মনোভাব অবলম্বন করিবেন তাহা আগেই বুঝা গিয়াছিল। ভারত সরকারের যে বৈঠকে পাটের মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা হয় বাংলা সরকারের কোন প্রতিনিধি উহাতে যোগ দেন নাই। ভারত সরকার তাঁহাদের মত জানিবার জন্য কলিকাতায় দূত পাঠাইয়াছিলেন, মন্ত্রীরা তাঁহার সহিতও সাক্ষাৎ করেন নাই। প্রধান মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের সহিত তাঁহারা কোন সহযোগিতা করিবেন না। ভারত সরকারের নিকট হইতে অর্থ অথবা খাদ্য গ্রহণে তাঁহারা আপত্তি করিবেন কি না তাহা অবশ্য তিনি বলেন নাই। তবে পাটের যে ব্যাপারে বর্ত্তমানে পাটচাষীদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহাদের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক ছিল তাহা তাঁহারা করেন নাই। লীগ পত্রিকাগুলি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ধুয়া ধরিয়াছেন যে কংগ্রেস চট ও থলিয়ার দাম বাঁধিয়া দেওয়ায় পাটচাষীর সর্বনাশ হইবে, তাঁহারা পাটের ন্যায্য দামে বঞ্চিত হইবে।

পাটচাষীর সঙ্গে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীগুলি ১৯৩৭ সাল হইতে যে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে তাহা কোনও ক্রমেই চাষীদের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক হয় নাই। প্রথম সাধারণ নির্বাচন হইতেই পাটচাষী পাটের সর্বনিম্ন দাম বাঁধিয়া দেওয়ার দাবী করিয়াছে কিন্তু ইংরেজ-ভোট হারাইবার ভয়ে খাজা-প্রজা কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা তাহা করিতে পারেন নাই। পরে লীগ মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইলে তাঁহারাও উহা করেন নাই। বর্ত্তমানে লীগদল পরিষদে ইংরেজ-ভোটের উপর পূর্বের ন্যায় নির্ভরশীল নহেন

সুতরাং কংগ্রেসের দাবী অনুসারে পাটের সর্বনিম্ন দর তাঁহারা বাঁধিয়া দিতে পারিতেন। তাহা করিলে ভারত সরকারকেও ঐ দর হিসাবেই চট ও থলিয়ার রপ্তানী মূল্য নির্ধারণ করিতে হইত কিন্তু তাঁহারা তাহাও করেন নাই। কংগ্রেসের সহায়তায় পাট চাষীর স্বার্থ রক্ষা হয় সম্ভবতঃ ইহা তাঁহারা চাহেন না। চাষীর সর্বনাশ হয় হউক, তবু কংগ্রেসের সাহায্য তাঁহারা লইবেন না।

পাটচাষীর সহিত ১৯৪০ সাল হইতে লীগদল মিথ্যাচার ও ছলনা করিতেছে। ঐ বৎসর বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা-পরিষদে গৃহীত হইলে পাট চাষের জমি জরীপ করা হয়। কোন অজ্ঞাত কারণে ঐ জরীপ বাতিল করিয়া পর বৎসর পুনরায় নূতন করিয়া জরীপ করা হয় এবং উহার পরিমাণ পূর্ব বৎসরের প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়ায়। তদবধি এই জমির আট আনি পরিমাণ জমিতে চাষের অনুমতি দিয়া কার্যতঃ পূর্বের চাষের পরিমাণই বহাল রাখা হইয়াছে এবং তার জন্য পাটের দাম বাড়িতে পারে নাই। উডহেড কমিশনও তাঁহাদের চূড়ান্ত রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে এই জরীপ সঠিক মনে করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। ইহাতেও বাংলার লীগ নেতারা থামেন নাই। যুদ্ধের সময় আমেরিকার চাপে পড়িয়া ভারত সরকার চট ও থলিয়ার সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেন এবং তদনুসারে পাটেরও সর্বোচ্চ দর স্থির করিয়া দেন। বাংলার লীগ নেতারা এই সিদ্ধান্ত নতমস্তকে মানিয়া লইয়াছিলেন। ইহার প্রতিবাদ পর্যন্ত তাঁহারা করেন নাই। পাটচাষীর স্বার্থ তাঁহারা গত দশ বৎসর নিজেরা রক্ষা করেন নাই। বরং ক্রমাগত নিজেদের দলগত স্বার্থরক্ষার খাতিরে উহা বিসর্জনই দিয়া আসিয়াছেন।

পাটচাষীর বর্তমান অবস্থা শোচনীয়। দাঙ্গার আগে পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে দর উনিশ-কুড়ি টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল, দাঙ্গার পর উহা নামিয়া পাঁচ-ছয় টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ আছে। পূর্ববঙ্গে লুঠতরাজ ও ও অরাজকতার ফলে পাট-ক্রেতাদের দালালেরা হাজার হাজার নগদ টাকা লইয়া বাজারে বসিতে ভরসা পাইতেছে না। পাট যতক্ষণ কেনা না হয় ততক্ষণ উহা মুসলমানদের সম্পত্তি, কেনা হইলেই হইবে হিন্দুর সম্পত্তি। তখন উহাতে আগুন ধরাইয়া দিলে বাঁচাইবার কেহ থাকিবে না। এই শ্রেণীর মনোভাব পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে রহিয়াছে।

এই অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় পূর্ববঙ্গে শান্তি স্থাপন। বাংলা সরকার তাহা পারেন নাই, পারিতেছেনও না। বর্তমান অবস্থাতেও পাটচাষীকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহারা কিছু সাহায্য করিতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কংগ্রেস গবর্মেন্ট রপ্তানী চট প্রভৃতির যে দর নির্ধারণ করিবেন তাহা পূর্বাপেক্ষা বেশী হইবে। তদনুসারে পাটের দর ২৫৲ টাকার বেশী, এমন কি ৩০৲ টাকার কাছাকাছি পড়িতে পারে। বাংলা সরকার চেষ্টা করিয়া এমন ব্যবস্থা করিতে পারিতেন যাহাতে এই সর্বোচ্চ দরই চাষীর নিকট সর্বনিম্ন দর হইতে পারিত এবং চাষীও পাটের ন্যায্য দরই লাভ করিত। পাট ক্রেতাদের নিরাপত্তার এবং ক্রীত পাট নিরাপদে কলিকাতায় আমদানীর ব্যবস্থা তেমন কঠিন কিছু নয়, অসম্ভব তো নহেই। তাহা করিলে চাষী এ বৎসর পাটের ভাল দর পাইয়া হাঁফ ছাড়িতে পারিত। কিন্তু কংগ্রেসের কার্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া মুসলমান চাষীদের নিকট কংগ্রেসকে হেয় করিবার জন্য যে অসহযোগ তাঁহারা করিতে চলিয়াছেন তাহার ফলে চাষীর সর্বনাশ হইবে।

ভারতের খাদ্যবস্তু ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অস্থায়ী সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল বারি খাদ্য ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে প্রেস রিপোর্টারকে বলিয়াছেন যে, নানা কারণে দেশে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থাতেই, যখন ভারতে চাষ-বাসের অবস্থা ভাল, বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করিয়া ডাল ইত্যাদি আমদানী করিতে হয়। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পর হইতে এ সকল বন্ধ হইয়াছে। তাহা ছাড়া বর্তমান সময়ে সামরিক বিভাগগুলি যথেষ্ট পরিমাণে নিজ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য খাদ্যদ্রব্য কিনিতেছেন। এই সমস্ত ক্রীত খাদ্যবস্তুর যথেষ্ট পরিমাণ অংশ শোচনীয়ভাবে অপচয় হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণ ব্যতিরেকেও মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি কারণে খাদ্যদ্রব্য বাজার হইতে সরিয়া যাইতেছে। লাভ করিবার লোভে বিক্রেতাগণ তাহাদের ধর্মবুদ্ধি এবং কর্তব্যবোধ ভুলিয়া যাইতেছে।

তিনি আরও বলেন যে, 'খাদ্য বাড়াও' আন্দোলন আমাদের দেশে একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে। সাধারণভাবে ইউরোপ অথবা আমেরিকার ক্ষেত হইতে যা শস্য উঠে ভারতে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে যুদ্ধের মধ্যে বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও দ্বিগুণ পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে।

জগতের সমস্ত বড় বড় দেশগুলি সমস্ত খাদ্যসম্ভার কিনিয়া সরকারী গুদামজাত করিতেছে। সেসব স্থলে সরকারই এক-চেটিয়া খাদ্য বণ্টক ও সরবরাহকারী। প্রাথমিক ভাবে যাহারা খাদ্য-শস্য উৎপন্ন করিয়া থাকেন, সরকার সেখান হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতেছেন। তাহার পর একটি দাম স্থির করিয়া সেই মূল্যে সকল কিছু অর্থাৎ খাদ্যবস্তু, বস্ত্র ইত্যাদি বণ্টন করিয়া দিতেছেন। ভারতবর্ষও যদি অনুরূপ নীতি গ্রহণ করে তবেই বাঁচিতে পারিবে।

তিনি বলেন যে, বর্তমানে আমাদের সম্মুখে একটি কঠিন কর্তব্য রহিয়াছে। সরকারী সাহায্যে এবং আনুকূল্যে চাষের উপযুক্ত জমিগুলির যতটা সম্ভব উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া পণ্য-প্রস্তুতের জন্যও একটি সংহত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যাহাতে সমস্ত পণ্য একটি বাঁধা

দামে বাজারে বিক্রয় হয়, সে বিষয়ে কড়া দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর কাপড়ের বিষয়েও এ কথা বলিতে হয় যে মাথাপিছু কাপড়ের বরাদ্দ আরও বাড়ান দরকার। গ্রামে পঞ্চায়েত এবং শহরে ভদ্রব্যক্তিগণকে লইয়া সংসদ গঠন করিয়া বস্ত্র-বণ্টনের ব্যবস্থা চালু রাখিতে হইবে। কোন ক্রমেই যেন কোন কোন অঞ্চলে প্রয়োজন অতিরিক্ত পরিমাণ না পাঠান হয়। এ বিষয়ে একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে, যে সমস্ত জামা কাপড় তৈরী অবস্থায় বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশই বাজার হইতে উড়িয়া যায় এবং সুযোগ মত বিক্রেতাগণ গলাকাটা দাম আদায় করিয়া নেন।

তিনি বলেন যে, গবর্ণেমেণ্টের একচেটিয়া ক্রয়নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রথমে যাহাদের হাত হইতে মাল বাহির হয়, তাহাদের কাছ হইতেই সব সংগ্রহ করিয়া ফেলিতে হইবে। শুধু ইহা করিলেই চলিবে না, বণ্টন, সংগ্রহ, সরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ প্রয়োজন।

পরিশেষে অধ্যাপক বাধ বলেন যে, বর্তমান সময়ে মাল অযথা গুদামজাত করা, উচ্চ দামে বিক্রয় করা ও এই সমস্ত জিনিষপত্র বিষয়ে জুয়াচুরীর জন্য যে সমস্ত আইন ও ব্যবস্থা আছে তাহা উপযুক্ত নহে। বর্তমান খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যাদি বিষয়ে যে সঙ্কট দাঁড়াইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক জেলায় স্পেশাল ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক জেলায় বার জন করিয়া উপযুক্ত নাগরিক অথবা আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্য লইয়া 'স্পেশাল পুলিশ' গঠন করা উচিত। নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারের কাজে এই 'স্পেশাল পুলিশ' মাথা ঘামাইবে—তাহারা চোরাবাজার, জুয়াচুরী ইত্যাদির ব্যাপারে বিশেষ করিয়া নজর দিবে। গবর্ণমেণ্টের এখন ডিষ্ট্রীক্ট এ্যাডভাইসরি কমিটি ভাঙিয়া ডিষ্ট্রীক্ট কণ্ট্রোল কমিটি গড়িয়া তোলা উচিত। এই কণ্ট্রোল কমিটি অন্ততঃপক্ষে (১) অনুমতিপত্র দেওয়া ও বাতিল করিয়া দেওয়া এবং (২) অযথা গুদামজাত মালগুলি বাজেয়াপ্ত করা ও পুনর্বণ্টন ব্যাপারে ক্ষমতাশীল থাকিবে।

যুক্তপ্রদেশে খাদ্যসংগ্রহ প্রচেষ্টা

যুক্তপ্রদেশের খাদ্যসংগ্রহ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। গত ৩১শে আগষ্ট তারিখ নাগাদ যে পরিমাণ খাদ্যসংগ্রহের কথা ছিল তাহার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ সরকারী গুদাম-জাত হইয়াছে। প্রথমে যখন এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তখন খাদ্যসংগ্রহ প্রচেষ্টার অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। কৃষকেরা সহজেই চোরাবাজারে যে দাম পাইতে পারিত তাহার অপেক্ষা কম মূল্যে খাদ্যসামগ্রী সরকারকে বিক্রয় করার সম্ভাবনা অনেক কম ছিল। কিন্তু কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত ধৈর্য্যেসহকারে এবং কষ্টসহিষ্ণুতার সহিত ধীরে ধীরে হাজার হাজার টন পরিমাণ শস্য সংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্টের গুদামজাত করাইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশ হইতে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা এখন একেবারে অপসারিত হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসে পণ্ডিত পন্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি যুক্তপ্রদেশে একটিও নরনারী অথবা শিশুকে অনাহারে মরিতে দিবেন না। তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা পাইয়াছে।

পণ্ডিত পন্থ এখন জনসাধারণের খাদ্য-সরবরাহ বিভাগের পরিচালন ব্যবস্থায় আগাগোড়া সংস্কারের দিকে নজর দিয়াছেন। প্রথমে যখন কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী হাতে ক্ষমতা পাইল তখন সিভিল সাপ্লাইয়ের অবস্থা এবং ব্যবস্থা কতকটা খাপছাড়া ধরণের ছিল। খাদ্যসংগ্রহ, বণ্টন ও সরবরাহের ব্যবস্থা দুই জন প্রবীণ কর্মচারীর মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই দুই কর্মচারীকে সেক্রেটারিয়েট এবং এক্সিকিউটিভ দুই ব্যাপারেই মাথা ঘামাইতে হইত। কাজে-কাজেই আসল কাজের ব্যাপারে গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল। পণ্ডিত পন্থ প্রথমে এই দুই কাজকে পরস্পর সংযোগহীন ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন এবং এক জন স্বতন্ত্র 'ফুড কমিশনার' নিযুক্ত করেন। এই ফুড কমিশনারের উপর খাদ্যসংগ্রহ, খাদ্যবণ্টন, বেসামরিক-সরবরাহ, প্রাদেশিক বস্ত্রনিয়ন্ত্রণ ও শর্করা-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে।

ভারতীয় সিভিলিয়ানগণের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুক্ত ভগবান সহায়ের উপর কাজটির ভার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের সহিত কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

ফুড কমিশনারের অধীনে চারি জন কর্মচারী আছেন। এই চারি জন কর্মচারীকে খাদ্যবণ্টন এবং বেসামরিক সরবরাহের ডেপুটি ডাইরেক্টার বলা হয়। তাহারা যথাক্রমে খাদ্যসংগ্রহ, খাদ্যবণ্টন, এবং বস্ত্র ও চিনি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন। বেসামরিক খাদ্যসরবরাহের সেক্রেটারী এখন কেবলমাত্র কাগজপত্র সম্বন্ধীয় কাজই করিবেন।

এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে সুফল ফলিয়াছে এই যে অন্যান্য বছর সামান্য দুর্ভিক্ষ ও বন্যাদিকারণ ঘটিত অবস্থা আসিলেই জনসাধারণের কাতর আর্তনাদের অবধি থাকিত না। কিন্তু বর্তমান বৎসরে বালিয়া জেলার তিন-চতুর্থাংশ, গোরখপুর অঞ্চলের বহুস্থান, কাশী এবং আংশিকভাবে সীতারামপুরে প্লাবন হইলেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে নাই।

মন্ত্রীমণ্ডলী আর একটি বিরাট সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। জেলার সরবরাহ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা প্রায়শঃই স্বজন-প্রীতি ও অন্যায় অপকার্যে দুষ্ট। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের পার্লা-মেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রভান গুপ্তের নেতৃত্বে একটি গুপ্ত কমিটির দ্বারা সম্যক্ পরিদর্শনের পর প্রত্যেক ব্যক্তি কতটা কাপড়, কেরোসিন, চিনি ইত্যাদি পাইতে পারে এবং বিশেষ পার্বণাদি উপলক্ষেই বা কতটা পাইতে পারে তাহার সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে।

খাদ্যসংগ্রহ ব্যাপারে জনসাধারণের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। জনসাধারণ-গঠিত একটি পুনর্বিচারি কমিটি ক্রমাগত

সরবরাহ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর আলোচনা ও প্রয়োজনমত নিয়মাবলীর পরিবর্তনের সুপারিশ করিবে। লাইসেন্স কমিটি নামে আখ্যাত একটি কমিটি সমস্ত খাদ্য সরবরাহের দোকানগুলির খোঁজখবর লইবে এবং তাহাদের হিসাবপত্র দেখিবে। তাহাদের অনুমোদনেই দোকানগুলিকে রেশন দ্রব্যাদি সরবরাহের অনুমতি-পত্র দেওয়া হইবে। তাহার ফলে সময় সময় যে রাজনৈতিক স্বার্থদুষ্ট নেতারা আত্মস্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহারও সুরাহা হইবে।

আরও একটি কমিটি গঠিত হইবে খাদ্যদ্রব্যের উপযুক্ততা পরীক্ষার জন্য। এ বিষয়ে সাহায্যের জন্য প্রদেশের পাঁচটি প্রধান কেন্দ্রে ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হইবে। খাদ্য সরবরাহের দোকান হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া যদি প্রয়োজন বোধ হয় তবে বাজার হইতে সরাইয়া দেওয়া হইবে।

সিভিলসাপ্লাই ব্যাপারের নানা কর্তব্যচ্যুতি এবং দুর্নীতি ইত্যাদির জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। এ বিষয়ে এগার জন কর্মচারীর ইতিমধ্যেই শাস্তি হইয়াছে।

বস্ত্রশিল্পের অবস্থা

ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের নূতন সংস্কার পরিকল্পনার কথা কটন-ওয়ার্কিং পার্টির এক রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও তাহাকে বয়ন-শিল্প সম্বন্ধে সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থা বলা যায় না, তথাপি বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা হইতে আমাদেরও অনেক কিছু শিখিয়া লইবার আছে। কেবলমাত্র যে কলকারখানা বিষয়ের উন্নয়ন-প্রচেষ্টার পরিকল্পনা ইহাতে আছে তাহাই নহে, ইহার মধ্যে সমগ্র বৈষয়িক ব্যাপারের প্রতিও নজর দেওয়া হইয়াছে।

শুধু আমাদের কেন, ব্রিটিশ বয়ন-শিল্পেরও বর্তমান ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে প্রাচীন বলা যাইতে পারে। ১৯৩০ সালে যে অনুসন্ধান কার্য্য হইয়াছিল তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে বিলাতের প্রায় ⅔ হইতে ¾ অংশ পরিমাণ যন্ত্রাদি বিশ বছরেরও বেশী পুরাতন। আমাদের অবস্থা তো আরও খারাপ। মোটামুটি ভাবে যন্ত্রগুলি যে কেবলমাত্র পুরাতন তাহাই নহে, বর্তমান সময়ের হিসাবে এক রকম কাজের বাহিরেও বটে। সুতা কাটার ব্যাপারে যদিও 'মিউল স্পিণ্ডলস্' ব্যবহারের দ্বারা কতকটা আধুনিকতা বজায় আছে, বয়ন ব্যাপারে মোটেই সে কথা খাটে না। কারণ শতকরা ৫টি স্বয়ংক্রিয় মাকু তাঁতের ব্যবহার আছে। এই হিসাবে আমেরিকায় শতকরা ৭৫টি ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা। কেবলমাত্র যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পেই যে সংস্কার সম্প্রতি আবশ্যক তাহা নহে শ্রমিক চাঞ্চল্যের জন্যও ইহার প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

যদি আমেরিকার পদ্ধতি অনুযায়ী নূতন যন্ত্র স্থাপন ও সংস্কার ব্যবস্থা করা হয় তবে সুতাকাটা বিভাগে শতকরা ৩৮ ভাগ, বয়ন বিভাগে শতকরা ৬২ ভাগ, এবং পরিচালন বিভাগে শতকরা ৮০ ভাগ শ্রমিকের প্রয়োজন কমিয়া যাইবে। যে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজ হইবে তাহাতে শতকরা ৫২½ ভাগ এবং যে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ হইবে, তাহাতে শতকরা ৪০ ভাগ শ্রমিকের প্রয়োজন থাকিবে না।

'প্লাট রিপোর্টে'র অনুমোদন অনুসারে অন্যান্য সংস্কার-ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিকদের বিশ্রাম করিবার জন্য স্থান, বৈদ্যুতিক এয়ার-কণ্ডিশন করার ব্যবস্থা, শ্রমিকদের দুর্ঘটনার প্রতিকারে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য শ্রমব্যাপারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিবার আয়োজন হইতেছে। হিসাব করিলে দেখা যায় সুতাকাটার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি একরকম সম্পূর্ণ ভাবেই টেক্সটাইল মেসিনারী লিমিটেডের হাতে। বর্তমান সময়ে এই কোম্পানীর সামর্থ্য অনুযায়ী বৎসরে ১০ লক্ষের কিছু বেশী সংখ্যক তকলি পাওয়া সম্ভব। তবে এই কোম্পানী শীঘ্রই তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী বর্ধিত করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করেন। 'ওয়াইণ্ডিং ও বিমিং' বিভাগের যে সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈয়ার হয়, তাহাতে দেশের চাহিদা কোন প্রকারে মিটিতে পারে। সাধারণ অবস্থায় ওয়ার্প ওয়াইণ্ডিং যন্ত্রের শতকরা ৪৫ ভাগ এবং ওয়েফ্‌ট ওয়াইণ্ডিং যন্ত্রের শতকরা ২৫ ভাগ বাহিরে রপ্তানী করা হইয়া থাকে। বয়ন বিভাগে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির জন্য নর্থপ-কোম্পানী ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে ৬০০০ মাকু সরবরাহ করিবার আশা দেন। তাহার মধ্যে ২০০০ মাকু বাহিরে রপ্তানী হইবে। উদ্বৃত্ত যাহা থাকিবে তাহার দ্বারা আয়ার্লণ্ড ও ব্রিটেনের যুক্তরাজ্যেরই চাহিদা মিটান সম্ভব নহে। ফিনিশিং সেকশনের কাজের যন্ত্রাদির জন্য ৬টি কারখানা আছে। ইহারা বিভিন্ন প্রকারের ফিনিশিঙের যন্ত্রাদি তৈয়ার করিয়া থাকে। যুদ্ধ-পূর্ব সময়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রের যেটুকু অভাব ঘটিত তাহা জার্মানী হইতে আনাইয়া লওয়া হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ঠিক পরিমাণ মত যন্ত্রাদি আমাদের ভাগ্যে মিলিবে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব চাহিদা মিটাইবার পর ব্রিটেন হইতে যন্ত্রাদি রপ্তানীর জন্য আর কিছুই উদ্বৃত্ত থাকা সম্ভব নহে। এই বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট চিন্তা করিবার আছে, কারণ আমাদের দেশের নূতন যন্ত্র বসাইতে ও সংস্কার করিতে এই সমস্ত খুঁটিনাটির প্রভাব যথেষ্ট। নূতন যন্ত্র বসাইবার ব্যয় যথেষ্ট। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের পূর্বে যে ব্যয় সম্ভব ছিল, এখন তাহা হইতে সুতাকাটা যন্ত্রাদির ব্যাপারে ৬৫%, এবং স্বয়ংক্রিয় মাকু বসাইতে ৫০%, ব্যয় অধিক পড়িবে। ল্যাঙ্কাশায়ার মার্কা মাকুর জন্য ৭০% হইতে ৮০%, ওয়াইণ্ডিং ব্যাপারে ৭০% এবং ফিনিশিঙের যন্ত্রাদির জন্য ৭৫% হইতে ১০০% ব্যয়ভার বাড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

দেশীয় বস্ত্রশিল্পের দিকে লক্ষ্য করিতে হইলে প্রথমে বর্তমান অবস্থার একটি সামগ্রিক খুঁটিনাটি হিসাব লইতে হইবে। তাহার পরে নূতন যন্ত্র সংযোজন ও সংস্কার ব্যবস্থা করা সম্ভব।

বোম্বাইয়ের কমার্স পত্রিকা এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য দেশীয় কারখানাগুলির স্বত্বাধিকারিগণের প্রতিনিধি লইয়া একটি সমিতি গঠন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। যাহাতে ব্রিটেনের কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির উদ্বৃত্তগুলি এ দেশে আনা যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। এ বিষয়ে এক সঙ্গে সবকিছু করা সম্ভব নহে; সুতরাং যাহাতে ধীরে ধীরে ব্যবস্থা করিয়া উঠা যায় সেই চেষ্টাই আগে করা কর্তব্য।

বস্ত্রসরবরাহ সমস্যা

গত কিছুকাল হইতে বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে জনসাধারণের নানা প্রকারের আপত্তি-আলোচনা শুনা যাইতেছে। যে বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আজ প্রায় তিন বৎসর কাল ধরিয়া চলিয়াও জনসাধারণকে তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে দিতে পারিতেছে না, তাহার নিন্দা তো করিবারই কথা।

বোম্বাই মিল-মালিক সমিতির সভাপতি স্যর বিঠল চন্দাবরকার গত সাম্বৎসরিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের সরবরাহের সহিত এখন আর বিশেষ পার্থক্য থাকিবে না। সেই অনুপাতে সরবরাহ করিতে মিলগুলি এখন প্রায় সমর্থ। এই উক্তির ফলে জনসাধারণ মনে করিয়াছিল যে তাহারা যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের মত এবং সেই পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু গত ৩।৪ মাসের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে স্যর বিঠল চন্দাবরকারের ন্যায় বিশেষজ্ঞের আশা ফলবতী হয় নাই।

কাপড়ের কলগুলি এ বিষয়ে একমাত্র অপরাধী নহে। বর্তমান বস্ত্রনিয়ন্ত্রণের ফলে কাপড়ের কলগুলি প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিমাণ মত বস্ত্র বয়ন করিতে পারিতেছে না। ইহার উপর আছে শ্রমিক ধর্মঘট এবং চোরাবাজার। কোন কোন কারখানার বস্ত্র চোরাবাজারে যায় ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান আবশ্যক। সম্প্রতি কতকগুলি কারখানা হাত-বদল হইয়াছে। এখানে অনুসন্ধান করা কর্তব্য যে এই মালিক পরিবর্তনের দ্বারা কোন প্রকার চোরাবাজারী-সরবরাহের সুবিধা হইয়াছে কিনা।

বর্তমানে শহরগুলির খুচরা সরবরাহ ব্যাপারেও গণ্ডগোল আছে। কতকগুলি পার্বত্য দেশীয় অঞ্চলে এবং কতকগুলি গ্রাম এলাকায় এমন অবস্থাও ঘটিয়াছে যে সেখানে কেবলমাত্র খুচরা সরবরাহ ব্যাপার ছাড়া পাইকারী বিক্রয়েও চোরাবাজার হইতেছে। যাহাই ঘটিয়া থাকুক এ বিষয়ে কোন প্রকার সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব কিনা তাহা প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের দেখা দরকার, বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ সমিতির হাতে উহা ছাড়িয়া রাখা যায় না। দুই বৎসর আগে কতকগুলি প্রদেশ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের নজির দেখাইয়া যাহাতে বস্ত্রবণ্টন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে আসে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ সমিতির সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রদেশের হাতে বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ ভার আসার পরেও বিশেষ কিছু উন্নতি দেখা যায় নাই।

কলিকাতা শহরের বস্ত্রবণ্টন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে চোরাবাজার এবং নিয়ন্ত্রিত দোকান দুই প্রকারই সমানতালে চলিতেছে। কিন্তু বাংলা সরকার চোরাবাজার দমনের কোন প্রকারের ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। দোকানগুলিতে অনবরতই ভীড় ও লম্বা লাইন কেন হয় সে কথা কে বলিবে?

উড়িষ্যার রাজধানী

উড়িষ্যার রাজধানী শেষ পর্যন্ত ভুবনেশ্বরে স্থাপিত করাই স্থির হইল। বহুদিন যাবৎ উড়িষ্যার রাজধানীর স্থান নির্বাচন চলিতেছিল, কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় নাই। এতদিনে তাহা হইল। প্রথমে একটি কমিটি কটকের তুলসীপুর অঞ্চলকে রাজধানীর জন্য নির্বাচন করিলেন। বিশেষজ্ঞরা উহা অনুমোদন করিলেন না। তারপর একবার বহরমপুরের নিকটবর্তী রাঙ্গাইলুন্ডা, একবার খুর্দার নাম হইল। কটকের নাম আবারও উঠিল। কিন্তু ইহাদের একটিও শেষ পর্যন্ত সর্বজনসম্মত হইল না। আবার কমিটি বসিল। স্থির হইল যে, ইহা কটকের বিপরীত দিকে মহানদীর অপর পারে চৌদুয়ার রাজধানী হইবে। সম্প্রতি উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মহতাব এই সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিয়া ভুবনেশ্বরে রাজধানী স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের সম্মতি প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাহা লাভও করিয়াছেন। ভুবনেশ্বর প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত পুরাতন স্থান। উড়িষ্যার রাজধানী নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা উহার আছে। দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর কাল ধরিয়া রাজধানী নির্বাচনের পরিশ্রম এতদিনে সাফল্যমণ্ডিত হইল।

৭ প্রমথ চৌধুরী

বিগত ১৬ই ভাদ্র, সোমবার রাত্রে ৭৮ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী পরলোকগমন করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে যশোহরে—পাবনার বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। স্যর আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। জন্মস্থান যশোহর হইলেও তাঁহার বাল্য ও কৈশোর কৃষ্ণনগরেই কাটে। প্রেসিডেন্সী কলেজের তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া প্রমথ চৌধুরী বিলাত যাত্রা করেন। তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়াছিলেন কিন্তু কোর্টে কখনও প্র্যাকটিস করেন নাই। তিনি এক-সময়ে প্রবাসী সম্পাদক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন। এই দুই ভিন্নপ্রকৃতি পুরুষের

এক বিষয়ে যথেষ্ট মিল ছিল ; উভয়েই রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ভক্ত হইয়াও উভয়েই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর সহিত প্রমথনাথের বিবাহ হয়। ফরাসী সাহিত্যের ভক্ত বলিয়া চৌধুরী-দম্পতির খ্যাতি আছে। এই ফরাসী সাহিত্যে অনুরাগ ও অভিজ্ঞতা প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরচনার রূপে একটা অপূর্বতা এবং অভিনবত্ব আনয়ন করিতে সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী। তিনি প্রবন্ধকার, সমালোচক, কথাসাহিত্যিক, দার্শনিক এবং কবি। "পদচারণ", "সনেটপঞ্চাশৎ" প্রভৃতি তাঁহার কবিতার বই। শেষোক্ত পুস্তকের চতুর্দশপদীগুলি বাংলায় সনেটকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রমথনাথ পণ্ডিত ছিলেন। বাংলা, সংস্কৃত, ফরাসী এবং ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার সমান অধিকার ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক হইয়াও কথাসাহিত্যে তাঁহার একান্ত নিজস্বতা তাঁহাকে একটি স্বতন্ত্র স্থান দান করিয়াছে। ঘোষাল এবং নীললোহিতের সৃষ্টি তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। "চারইয়ারী কথা" সাহিত্যের এক অভিনব বস্তু। এমনতর ছোট গল্প তাঁহার পূর্বে বা পরে আর কেহ লেখে নাই, তিনিও আর লেখেন নাই। জীবনের প্রতি নূতন দৃষ্টি—শুধু গল্পকেই নয় তাঁহার সকল রচনাকেই অভিনবত্ব দান করিয়াছে। তিনি অনেক সময় "বীরবল" ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখিতেন ; গদ্যে তিনি যে নবরীতির বাক্‌ভঙ্গী প্রবর্তন করেন তাহা "বীরবলী ভাষা" নামে পরিচিত। পূর্বে প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও চলিত ভাষায় লিখিবার রীতি লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বীরবল চলিত ভাষাকে জাতে তুলিলেন। সাধু ও সংস্কৃত শব্দ বর্জন করিয়া নয়, কথ্য ভাষার ক্রিয়াপদকে লেখ্য ভাষায় প্রয়োগ করিয়া তিনি ভাষাকে লঘুভার ও ক্ষিপ্রগতি করিলেন। রস, রসিকতা, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ প্রয়োগে 'বীরবল' সিদ্ধহস্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় সমকালে ১৩২১ সালে প্রমথ চৌধুরী "সবুজপত্র" প্রতিষ্ঠা করেন। "সবুজপত্র"-প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করে। এই পত্র প্রকাশ করিয়াই তিনি চলিত ভাষায় লিখিবার রীতি প্রচার করেন। এই পত্রে তিনি শিখাইলেন, সুষ্ঠু করিয়া বলিতে পারিলে সকল বস্তুই উপভোগ্য হয়, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন হইতে ভারতবর্ষের ভূগোল পর্যন্ত সকল বিষয়কেই সাহিত্যরসে অভিষিক্ত করা যায়। সাহিত্যে তাঁহার দানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "জগত্তারিণী পদক" প্রদান করেন। পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৯৪১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে এক বিরাট সভায় "প্রমথ জয়ন্তী" অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার রচনারীতি, তাঁহার ভাব-স্বাতন্ত্র্য এবং তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য বঙ্গ-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

লালগোলার মহারাজা

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত লালগোলার মহারাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় গত ১৮ই আগষ্ট নিজ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স একশত ছয় বৎসর হইয়াছিল। আজীবন মিতাচার অভ্যাস এবং স্বাস্থ্যের নিয়মাদি পালন হেতু তিনি এরূপ দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্তও তিনি সবল সুস্থ ও কর্মক্ষম ছিলেন। বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন। স্বাভাবিক বিনয় ও ঔদার্যগুণে তিনি আপামর-সাধারণের শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জন করেন। সাধারণ জমিদারদের ন্যায় কলিকাতার মত বড় শহরে ভীড় না জমাইয়া নিজ জমিদারী ও আবাসস্থল লালগোলায় তিনি আজীবন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়, বিশেষ করিয়া নিজ জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত জনসমাজের কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম বয়স হইতেই তিনি দানশীলতার পরিচয় দিতে থাকেন। তিনি নিজ ব্যয়ে বহু রাস্তাঘাট মন্দিরাদি নির্মাণ, পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার, নূতন জলাশয় খনন, এবং দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ইণ্ডিয়ান নেশন্যাল কংগ্রেস, এমন কি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠারও বহু পূর্বে যখন জেলায় জেলায় রাষ্ট্রীয় সভা প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ হয় তখন বহরমপুরেও একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হইয়াছিল এবং যুবক যোগীন্দ্রনারায়ণ তাহার একজন উদ্যোগী কর্ণধার হন।

বঙ্গভারতীর প্রতীক কলিকাতার মূল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যোগীন্দ্রনারায়ণের নিকট অশেষভাবে ঋণী। বর্তমান পরিষদ-ভবনের দ্বিতল নির্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তিনি একাই বহন করেন। পরিষদ কর্তৃক বৌদ্ধগান ও দোহা, সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (তিন খণ্ড) ও ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শন (পাঁচ খণ্ড) মুদ্রণ ও প্রকাশার্থ যাবতীয় ব্যয় অন্যূন ত্রিশ হাজার টাকা যোগীন্দ্রনারায়ণ দান করিয়াছিলেন। অন্যান্য পুস্তক প্রকাশের জন্যও তিনি ১৩২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সাত হাজার নয় শত টাকা দান করেন। অবশেষে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত তের হাজার টাকা দ্বারা পরিষদের একটি গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল গঠিত হয়। এই তহবিলের উপস্বত্ব হইতে এযাবৎ বাঙ্গালা শব্দকোষ (চারি খণ্ড), চণ্ডীদাসের পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নেপালে বাঙ্গালা নাটক, ন্যায়দর্শন (প্রথম ভাগ), সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দুই খণ্ড) প্রভৃতি বাংলা ভাষার অমূল্য গ্রন্থরাজি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিখ্যাত গ্রন্থাগারটির সম্পূর্ণ বন্ধকী স্বত্ব পরিষদে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রয়াণে বাঙালী তথা বঙ্গভারতী একজন পরম হিতকারী বান্ধব হারাইল।

বৈদিক আর্য এবং ইরাণীয় আর্য

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

"বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক আর্য" প্রবন্ধে (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩) ধর্ম্মসংক্রান্ত, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবাদের ফলে বৈদিক আর্যগণ ইরাণীয় আর্যদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সিন্ধু উপত্যকা অভিমুখে চলিয়া আসেন এবং এই বিবাদ জরাথুষ্ট্রের ধর্ম্মসংস্কারের আন্দোলনের মূল কারণ,—এই মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনা-প্রসঙ্গে এইরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে দেবধর্ম্ম ও অসুরধর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধ আবেস্তার প্রাচীনতম অংশে দেখা যায় তাহা ইরাণীয় বা আবেস্তিক আর্য এবং বৈদিক আর্যগণের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ বা বিচ্ছেদের সমসাময়িক ব্যাপার নহে, এই বিরোধ অনেক পরের ঘটনা। অর্থাৎ, কেহ কেহ যেরূপ মনে করেন, জরাথুষ্ট্রের আন্দোলনের ফলে বৈদিক আর্যগণ ইরাণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন নাই, ভারতীয় আর্যগণের ধর্ম্মের প্রচার প্রতিরোধ করিবার জন্য জরাথুষ্ট্রের আন্দোলনের উৎপত্তি হইয়াছিল। ঋগ্বেদে ও আবেস্তার ভাষা এবং ধর্ম্মের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা হইতে এই অনুমানের সপক্ষে যতখানি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আর কোন প্রমাণ এই অনুমানের সপক্ষে পাওয়া যায় কিনা দেখা প্রয়োজন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে জরাথুষ্ট্রের ধর্ম্মসংস্কারের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ইরাণীয় আর্য ও বৈদিক আর্যগণের সম্পর্কের আলোচনা করা হইবে।

বৈদিক আর্যগণের সহিত তাহাদের ইরাণীয় জ্ঞাতিদিগের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল বালখে এইরূপ অনুমানের কারণ সহজে বুঝা যায়। পূর্ব্ব ইরাণ বা বালখ জরাথুষ্ট্রের জন্মভূমি এবং আবেস্তা ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল বালখে। বৈদিক ভাষার সহিত যে সাদৃশ্য জরাথুষ্ট্রের রচনা বলিয়া অনুমিত আবেস্তার প্রাচীনতম অংশ গাথার ভাষায় দেখা যায় সেই গাথার ভাষা ইরাণীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলি পূর্ব্বশাখাভুক্ত। গাথার রচনা কালে এই ভাষার সহিত বৈদিক ভাষার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। এই বিচ্ছেদ অবশ্য গাথা রচনার পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল, কারণ বৈদিক ভাষায় আদিশাখার প্রাচীন বৈশিষ্ট্য বেশী দেখা যায় এইরূপ বলা হইয়াছে। জরাথুষ্ট্রের সময় পর্য্যন্ত বৈদিক আর্যগণ বালখে থাকিলে ভাষার এই বিচ্ছেদ ঘটিবার কোনই কারণ থাকিত না। তারপর ইরাণীয় ভাষা গোষ্ঠীর পশ্চিমশাখার ভাষার যে নিদর্শন হাকামনি সম্রাটগণের লেখনগুলিতে দেখা যায় পণ্ডিতগণের মতে পূর্ব্ব-ইরাণীয় ভাষার সহিত সম্পর্কিত হইলেও তাহা কতকটা সেমিটিক মিশ্রিত। জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে প্রাচীন ইরাণীয় প্রচলিত মত গ্রহণ করিলে (খৃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে) এই সকল লেখনের সময় গাথার রচনার কাল হইতে দুই শত বৎসরের পরবর্ত্তী দাঁড়ায়। সংক্ষেপে বলা যায় যে যে সকল প্রমাণ পণ্ডিতগণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বিচার করিলে জরাথুষ্ট্রের ধর্ম্মসংস্কারের আন্দোলনের সঙ্গে বৈদিক আর্যগণের সহিত ইরাণীয় আর্যগণের বিচ্ছেদের কাহিনীকে কোনমতে যুক্ত করা যায় না। যুক্ত করা হইয়াছে আর্যবাদ সম্বন্ধে পূর্ব্বগঠিত মতবাদের প্রভাবে।

সে যাহা হউক, ভাষায় আবেস্তার প্রাচীনতম অংশের সহিত এবং আবেস্তার ধর্ম্মের সহিত বৈদিক ভাষা ও ধর্ম্মের যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ব্যাকট্রিয়া বা বালখ আবেস্তিক আর্য ও বৈদিক আর্য উভয় দলের প্রাচীন বাসভূমি ছিল। এই মূল আর্য জাতির উৎপত্তি বালখে অথবা তাহারা অন্য কোন স্থান হইতে বালখে আসিয়াছিল কিনা এ প্রশ্নের আলোচনা এখানে করা হইতেছে না।

বালখের যে আর্যজাতিকে আবেস্তিক আর্য বলা হইয়াছে তাহারা ইরাণীয় গোষ্ঠীর একটি শাখা। বালখ বা ব্যাকট্রিয়া ইরাণ বলিতে যে অঞ্চল বুঝায় তাহার পূর্ব্বাঞ্চলের একটি অংশ মাত্র। সাধারণতঃ ইরাণ অর্থে পারস্য মনে করা হয় কিন্তু পারস্য, পারসিশ, পার্শ বা ফার্স মিডিয়ার দক্ষিণে, সুসার দক্ষিণ-পূর্ব্বে ও কারমেনিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত বৃহত্তর ইরাণের একটি প্রদেশ মাত্র। এই পার্শ প্রদেশের নাম হইতে দেশের পারস্য নাম আসিয়াছে। বৃহত্তর ইরাণ ককেশাস হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উচ্চভূমির অঞ্চল। বর্ত্তমান পারস্যের ভৌগলিক সীমানা উত্তর-পূর্ব্ব, পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিমে কিছু পরিবর্ত্তন সহ বৃহত্তর ইরাণের সীমানা। এই অঞ্চলের পূর্ব্বাংশে বালখ, সুগদা আরিয়া বা হারি, আরাকোশিয়া ও ড্রানজিয়ানা লইয়া গঠিত। পশ্চিমাংশে ইরাক আজেমী, কুর্দ্দীস্থান, আজারবাইজান লইয়া গঠিত মিডিয়া। মিডিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমানা আর্মেনিয়ার মধ্যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

মিডিয়া হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত উচ্চভূমির অধিবাসীদিগকে প্রাচীন ইরাণীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা বলা হয়। প্রাচীন ইরণীয় ভাষা-গোষ্ঠীর পূর্ব্বশাখার ব্যাকট্রিয়ার ভাষা খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে অপ্রচলিত হইয়া যায়। জেন্দাবেস্তার জেন্দ অংশের ভাষা পহলবী। ব্যাকট্রিয়ার প্রাচীন ভাষা ব্যতীত সুগদী (সগডিয়ানায় ব্যবহৃত), খাওলী

(জাবুলিস্থানে ব্যবহৃত), সকজাই (শকস্থানে ব্যবহৃত), হিরহবই (আরিয়া বা হিরাট অঞ্চলে ব্যবহৃত) ভাষাও অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম শাখার তিনটি মাত্র ভাষা প্রচলিত, ফার্সী (পারসিপোলিস বা ইস্তাখারে ব্যবহৃত), দারী বা পূরবীয়া ভাষা (বালখ, বোখারা, মার্ভ ও বাদাকসানে ব্যবহৃত), এবং পহ্লবী (রায়, ইস্পাহান ও দিমুর জেলায়) ব্যবহৃত। কেহ কেহ বলেন দারী ও ফার্সী একই ভাষা। ইরাণীয় ভাষাগোষ্ঠীর এই সকল শাখা ব্যতীত সম্পর্কিত ভাষাও কতকগুলি আছে, পশ্চিম অঞ্চলের আর্মানী ও ওসেটিক (ককেশাসের কয়েকটি ক্ষুদ্র উপজাতির মধ্যে ব্যবহৃত) ও পূর্ব্বাঞ্চলের পুস্তু। পামীরের ও হিন্দুকুশের কতকগুলি উপজাতির ভাষা ইরাণীয় ভাষাগোষ্ঠীর সম্পর্কিত।

প্রাচীন ইরাণী ভাষার পূর্ব্ব শাখার একটি মাত্র দলিল বর্ত্তমান; উহা গাথা ও আবেস্তার ভাষা। পশ্চিম শাখার (পারস্য ও মিডিয়ায় ব্যবহৃত) ভাষাগুলির মধ্যে মাত্র একটি প্রাচীন নিদর্শন অবশিষ্ট। ইহা হাকামনি সম্রাটদিগের লেখন। সাসানীয় আমলে পরিবর্ত্তিত রূপে এই প্রাচীন ভাষা পহ্লবী নামে পরিচিত হয়। ইহার বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত রূপ ফার্সী ভাষা। কেহ কেহ বলেন, পহ্লবী ও প্রাচীন ফার্সী এক নহে. প্রাচীন ফার্সীর নাম ফার্সী কাদিন এবং পহ্লবী ও উহা পাশাপাশি বর্ত্তমান ছিল।

ভাষার দিক দিয়া দেখা যাইতেছে যে পশ্চিমে ককেশাস হইতে পূর্ব্বে আফগানিস্থান অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং কাশ্মীরের সীমানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ইরাণী ভাষাগোষ্ঠীর শাখা ও ঐ গোষ্ঠীর সম্পর্কিত ভাষাভাষীর অঞ্চল। বলা বাহুল্য ইরাণী ভাষা-গোষ্ঠীর অধ্যুষিত এই অতি বিস্তৃত ভূভাগ প্রাচীন ইরাণীয় আর্য জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল এ কথা বলা হয় না। না বলিবার কতকগুলি কারণ আছে। একটি কারণ এই যে. দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে সেমেটিক ও উত্তর-পূর্ব্ব হইতে মোঙ্গল, উজবেগ, শক, হূন প্রভৃতি বিভিন্ন যাযাবর জাতির তরঙ্গ পুনঃপুনঃ ইরাণ প্লাবিত করিয়াছে। এই সকল জাতির অনেকে ভারতের ইতিহাসে সুপরিচিত।

এইবার এই পটভূমিতে ইরাণের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে।

সমগ্র এশিয়াখণ্ডের মধ্যে ইরাণ বা পারস্য একমাত্র দেশ যাহা সুদূর অতীতকাল হইতে য়ুরোপের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিয়াছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী সংগ্রাম চালাইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পশ্চিম-এশিয়ায় বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া। প্রাচীন বাবিলোনীয় ও আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতন হইলে মিডিয়ান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইল। ঐতিহাসিকগণের মতে ডিওসেস বা ডাজাকাকু মিডিয়ান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আসিরীয় সম্রাট সারগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া নিজ রাজ্যে লইয়া গিয়া আটক করেন খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তিনি পলায়ন করিয়া স্বদেশে চলিয়া আসেন এবং একবাটানায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা সমগ্র পারসিশ দখল করেন। আসিরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী নিনেভে অবরোধ করিবার কালে তিনি নিহত হন। তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাট (কিয়াকজারেস খৃঃ পূঃ ৬২৫-৫৮৫) নিনেভে অধিকার ও ধ্বংস করেন। আসিরীয়া ব্যতীত আর্মেনীয়া ও কাপাডোসিয়া (এশিয়া মাইনর) তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইঁহার রাজত্বকাল মিডিয়ান সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ। তাঁহার পুত্র আষ্টিয়াজেশের (বাবিলনীয় লেখনের ইস্টুভিগু) রাজত্বকালে পার্শের অন্তর্ভুক্ত আনসানের হাকামনি বংশীয় রাজা সাইরাসের নেতৃত্বে পার্শের অধিবাসীবৃন্দ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মিডিয়ার সম্রাটের সৈন্যদলের একাংশ বিদ্রোহী হইয়া সাইরাসের সঙ্গে যোগদান করে ও সম্রাটকে বন্দী করিয়া সাইরাসের হাতে সমর্পণ করে। এই ভাবে মিডিয়ার সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল ও হাকামনি সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় আরম্ভ হইল। (খ্রীঃ পূঃ ৫৫০) ঐতিহাসিকগণের মতে সাইরাস কর্ত্তৃক মিডিয়া বিজয়ের অর্থ ইরাণীয় সাম্রাজ্য ইরাণীয় গোষ্ঠীর এক জাতির হাত হইতে অন্য জাতির হাতে গেল, ইহার অর্থ এই নহে যে মিডিয়ার সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল। পারস্যের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক ব্যবস্থাসমূহ মিডিয়ার ব্যবস্থার অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। সাইরাস রাজ্যলাভ করিয়া লিডিয়ার প্রসিদ্ধ রাজা ক্রিসাসকে পরাজিত করিয়া রাজধানী সার্ডিস অধিকার করিলেন। বাবিলোন, সিরিয়া ও ফিনিসীয়ার নগরগুলি তাঁহার দখলে আসিল। পূর্ব দিকে খাহবারিজম (খিভা), সুগদা (বোখারা ও সমরকন্দ) ও সম্ভবতঃ বালখ, আরিয়া (হিরাট) ও আরাকোশিয়া (কান্দাহার) সাইরাসের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো ও নিয়ারকাসের মতে সাইরাস ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। সাইরাসের মৃত্যু সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। অনুমান করা হয় ইরাণের মালভূমির উত্তরের মরুভূমি অঞ্চলের দাহী বা অন্য কোন যাযাবর জাতির সহিত সংঘর্ষে আহত হইয়া সাইরাস মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উপরের বিবরণ হইতে তিনটি জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ, ইরাণীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় পূর্ব্ব ইরাণ

বা বালখ হইতে বহু দূরে, পশ্চিমে ককেশাস ও কাস্পিয়ান সাগরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে। দ্বিতীয়তঃ, ইরাণীয় জাতি খ্রীঃ পূঃ ৫৪০ অব্দের মধ্যে এশিয়া মাইনরের উপকূল পর্য্যন্ত গ্রীক রাজ্যগুলি অধিকার করিয়া য়ুরোপীয়দিগের অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার জন্য সার্ডিসে সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপিত করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, সাইরাসের মৃত্যুর কাহিনী হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ঐ সুদূর প্রাচীন কালে উত্তরের মরু অঞ্চলের (নর্দার্ন ডেজার্টস) যাযাবর গোষ্ঠীগুলি কি ভাবে সামরিক শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল। অকসাস নদীর বাম তীর হইতে পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত দাহী ও সিথিয়ান নামে পরিচিত যাযাবর গোষ্ঠীগুলির অধ্যুষিত অঞ্চল। মিডিয়ার সম্রাট কিয়াকজারেস যখন নিনেভে অবরোধ করিয়াছিলেন এই সিথিয়ানগণ কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব্বতীর ধরিয়া হির-কানিয়ার মধ্য দিয়া নামিয়া আসিয়া মিডিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ইহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অবরোধ উঠাইয়া সম্রাটকে দেশে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ইরাণী সাম্রাজ্যকে প্রথম হইতে এক চক্ষু এশিয়া মাইনরের দিকে ও অপর চক্ষু উত্তর-পূর্বের মরু অঞ্চলের দিকে আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছিল।

একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে প্রথম দারিয়ুস (দারায়াবাহু) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৫২১)। রাজত্বকালের প্রথম দিকে তাঁহাকে কতকগুলি আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। পূর্ব্ব-ইরাণের বাহিয়জদাত (Vahyazdata) বিদ্রোহী হইয়া আরাকোশিয়া আক্রমণ করেন। তারপর চিত্রতহ্মের (Chitratahma) অধীনে সগরতিয়াইয়ের (Sagartii) যাযাবর জাতি (পার্শের উত্তর-পূর্ব্বে) বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহের নেতাদিগের নাম লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে জার্মান পণ্ডিত স্পিগেল সাইরাসের অথবা কাইরুসের নাম (Kuru, Kurush) ভারতবর্ষের কুরু হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। সাইরাসের পরবর্ত্তী কাম্বিসেসের (Cambyses) নাম দারিয়ুসের লেখনে কাম্বুজিয় (Kambujiya)। দারিয়ুসের রাজত্ব কালে ভারতবর্ষের সহিত ইরাণীয় সাম্রাজ্যের প্রথম সংযোগ স্থাপিত হয়। সেনাপতি স্কিলাকস (জাতিতে গ্রীক বা কারীয়ান) পাকতিয়ানগণের (Pactyans—Pakhtu) দেশ হইতে রওনা হইয়া মোহনা পর্য্যন্ত সিন্ধু নদীতে অভিযান পরিচালনা করিলেন। ফলে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত অঞ্চল ইরাণীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। পারসি-পোলিসের লেখনে ভারতবর্ষের এই অঞ্চল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে মগধে শিশুনাগ বংশের রাজত্ব কাল এবং বুদ্ধদেব সবে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন।

এশিয়া মাইনরের ঘাঁটির দিকে ফিরিলে দেখা যায় যে দারিয়ুস বসফোরস প্রণালীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের দানিউব নদী পর্য্যন্ত অভিযান করেন (খ্রীঃ পূঃ ৫১৫)। হেরোডোটাসের মতে এই অভিযান ডন ও ভল্গা নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল সিথিয়ান জাতি। কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর ও দক্ষিণ তীর বাহিয়া ককেশাস অতিক্রম করিয়া সিথিয়ানগণ এই সময়ে দক্ষিণ রুশিয়ায় আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। দারিয়ুসের সৈন্যবাহিনী হেলেস-পণ্টের নগরগুলি, উপকূল ভাগের সকল গ্রীক নগর, থ্রেস ও মাসিডন দখল করিল। ইহাই য়ুরোপের ভূভাগে ইরাণীয় জাতির রাজ্য বিস্তৃতির শেষ সীমা। খ্রীঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে মারাথনের যুদ্ধে গ্রীকগণ ইরাণীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত করিল।

তার পর গ্রীক শক্তি সংহত হইয়া উঠিল মাসিডনের রাজা ফিলিপের অধীনে। মাসিডনের তরুণ বীর আলেক-জাণ্ডার হেলেসপণ্ট অতিক্রম করিলেন খ্রীঃ পূঃ ৩৩৪ অব্দে; মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া অতিক্রম করিয়া গ্রীক-বাহিনী ঝটিকার বেগে আসিরীয়ায় উপস্থিত হইল। গৌগামেলার প্রান্তরে তৃতীয় দারিয়ুসের অধীনে পারস্ক-বাহিনী দ্বিতীয় বার পরাজিত ও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, হাকামণি সম্রাট মিডিয়ায় পলায়ন করিলেন। আলেকজাণ্ডার বিনা আঘাতে বাবিলোন ও সুসা অধিকার করিলেন, পারসিপোলিসের রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠিত, রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত জোরোষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মের অমূল্য গ্রন্থরাজি, এবং উহাদের রক্ষক পুরোহিত দলের সহিত সমগ্র রাজপ্রাসাদ ভস্মীভূত করা হইল। গৌগামেলার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আলেকজাণ্ডার আপনাকে এশিয়ার সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ভাগ্যাহত হাকামনি সম্রাট মিডিয়া হইতে ব্যাকট্রিয়ায় পলায়ন করিলেন। ব্যাকট্রিয়া ও সুগদার শাসনকর্ত্তা বেসুস (Bessus) সম্রাটকে ধৃত করিয়া পার্থিয়ায় সরাইয়া লইয়া গেলেন এবং সেখানে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। হাকামনি রাজবংশ এইভাবে লুপ্ত হইল।

ব্যাকট্রিয়ার শাসনকর্ত্তা বেসুশকে সাহায্য করিয়াছিলেন আরিয়ার শাসনকর্ত্তা। প্রথম আর্ত্তাজারেকসাসের রাজত্ব কালে ব্যাকট্রিয়া একবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। ব্যাকট্রিয়ার এই বিশ্বাসঘাতক শাসনকর্ত্তা বেসুশ আলেক-জাণ্ডারের হাতে পড়িলেন। একবাটানায় লইয়া গিয়া আলেকজাণ্ডার প্রথমে তাঁহার নাসিকা ও কর্ণদ্বয় কর্ত্তন করিলেন, তারপর সমবেত মীড ও পারসীকগণের সমক্ষে তাঁহাকে হত্যা করা হইল। বেসুশের প্রধান অপরাধ

তৃতীয় দারিয়ুসকে হত্যা করা নয়, দারিয়ুসকে হত্যা করিয়া চতুর্থ আর্তাজারেকসস উপাধি ধারণ করিয়া বেসুশ আপনাকে পারস্যের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

প্রথম দারিয়ুসের আমলে পূর্ব্বাঞ্চলে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সমগ্র আফগানিস্থান, উপজাতীয় এলাকা এবং সিন্ধুদেশ ইরাণীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। উত্তরে সগডিয়ানা, ব্যাকট্রিয়া ও আরিয়া (হরিরুদ নদী পর্য্যন্ত), দক্ষিণে আরাকোশিয়া ও ড্রানজিয়ানা, পূর্ব্বে পারোপণিসাদি। সগডিয়ানা বর্ত্তমান বোখারা ও সমরকন্দ, আরিয়া হিরাট, আরাকোশিয়া কান্দাহার, ড্রানজিয়ানা সিস্তান ও পারোপণিসাদি কাবুল প্রদেশ। পূর্ব্ব-ইরাণ বলিতে কাবুল বাদে মোটামুটি এই কয়টি প্রদেশ ও বালখ বুঝাইত। মৌর্য্য আমলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সীমানা হিরাট পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল এবং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গজনীর তুর্কী রাজবংশের অভ্যুদয় কাল পর্য্যন্ত কাবুল প্রদেশ হিন্দুরাজাদিগের অধীনে ছিল। সে যাহা হউক, হাকামনি বংশের আমলে পূর্ব্ব-ইরাণের সগডিয়ানা, ব্যাকট্রিয়া, আরিয়া প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া একবাটানা ও পারসিপোলিসের কেন্দ্রীয় শাসন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। আলেকজাণ্ডার ব্যাকট্রিয়ায় প্রবেশ করিলে সগডিয়ানা ও আরিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। সগডিয়ানার ১২০০০ স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীকে নিহত করিয়া আলেকজাণ্ডার নগর ও গ্রামগুলি ধ্বংস করিয়া দিলেন, সকল পুরুষ অধিবাসী হত হইল। আরিয়ার অধিবাসীদিগকে অতি নির্ম্মম শাস্তি দেওয়া হইল। এদেশের স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলিতে পোরাসের প্রতি আলেকজাণ্ডারের উদার, সহৃদয় ব্যবহারের গল্প প্রশংসার সহিত স্থান পাইয়াছে। এই ব্যবহার গ্রীক বীরের উদার,সহৃদয় স্বভাবের পরিচায়ক নহে, কূটনীতির পরিচায়ক। মুক্তি পাইয়া পোরাস ইহার পরে তাঁহার স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে সসৈন্যে আলেকজাণ্ডারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মাসাগা দুর্গের ৭০০০ ভারতীয় সৈন্যকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা (গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মতে, "এই নির্বিচার হত্যার কারণ ইহারা স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে বিদেশী বিজেতাকে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক ছিল"), সিবি (Siboi) ও মালব (Malli)-দিগকে বর্ব্বরোচিত নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা প্রভৃতি ঘটনা আলেকজাণ্ডারের উদারতা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক নহে।

হাকামনি সম্রাটগণের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আলেকজাণ্ডার তাঁহাদের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হাকামনি দরবারের ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর দরিদ্র মাসিডোনের অল্পবয়স্ক যোদ্ধার মাথা বিগড়াইয়া দিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। অবশেষে আপনাকে জুপিটারের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া আলেকজাণ্ডার নূতন সাম্রাজ্যের প্রজাদিগের নিকট দেবতার প্রাপ্য সম্মান দাবি করিলেন। পারস্য, মিডিয়া, এক কথায় সমগ্র পশ্চিম-ইরাণ এই দাবী বিনা বাক্যে মানিয়া লইল, আপত্তি জানাইল পূর্ব্ব-ইরাণ। ঐতিহাসিকের ভাষায় "The eastern Iranians of Bactria, Sogdiana, Aria, Arachosia, Drangiana ··· opposed the conqueror · The Arians rose again and again." ভারতবর্ষে, "In India the Brahamans had been the soul of a still more vigorous resistance; they preached revolt to the rajahs of the Lower Indus and were the object of Alexander's special severity" অর্থাৎ ভারতবর্ষে আরও তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ, দৃঢ় প্রতিরোধ জাগিয়া উঠিল। এই প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রেরণা যোগাইলেন ব্রাহ্মণগণ। সিন্ধু উপত্যকার পশ্চিমভাগের রাজাদিগের ব্রাহ্মণগণ বিদ্রোহের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে লাগিলেন। এইজন্য আলেকজাণ্ডারের সকল আক্রোশ আসিয়া পড়িল ব্রাহ্মণদিগের উপর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গ্রীক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যাকট্রিয়া ও সগডিয়ানার ইরাণীগণ তাহাদের পুরাতন শত্রু মরু অঞ্চলের যাযাবর জাতিদিগের সাহায্যলাভ করিয়াছিল। শক ও দাহীগণ বেসুশকে সাহায্য করিয়াছিল।

সেলুসিড বংশীয় আন্তিওকাসের রাজত্বকালের শেষের দিকে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক শাসনকর্ত্তা দিওদোতাস ব্যাকট্রিয়া, সগডিয়ানা ও মার্জিয়ানা (অকসাস নদীর পশ্চিমে) লইয়া গঠিত নূতন ব্যাকট্রিয়ান রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন (খ্রী: পূ: ২৪৬)। পূর্ব্ব-ইরাণ একরকম স্থায়ীভাবে পশ্চিম-ইরাণ হইতে পৃথক হইয়া গেল। ইহার পর অল্পসময়ের জন্য একবার আরসকিডান বংশের প্রথম মিথ্রিদেতেসের আমলে ও একবার সাসানীয় বংশের প্রথম খসরু আমলে ব্যাকট্রিয়া পশ্চিম-ইরাণের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তরের মরু অঞ্চলের যাযাবর জাতিসমূহ পূর্ব্ব-ইরাণ প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

এইবার ইরাণীয় আর্যজাতির প্রসঙ্গে ফিরা যাউক।

ঐতিহাসিকের মতে সগডিয়ানা, ব্যাকট্রিয়া, আরিয়া, আরাকোশিয়া ও ড্রানজিয়ানার প্রাচীন অধিবাসী ইরাণীয় গোষ্ঠীর পূর্ব্বশাখাভুক্ত। সগডিয়ানা বর্ত্তমানে রুশিয়ার অধীন উজবেগিস্থানের মধ্যে, ব্যাকট্রিয়া, আফগান তুর্কিস্থান, আরিয়া ও আরাকোশিয়া আফগানিস্থানের প্রদেশ। আরিয়া পূর্ব্ব-পারস্যের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দ্রানজিয়ানা বা সিস্তান আফগানিস্থান ও পারস্তের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে সগডিয়ানা ও ব্যাকট্রিয়ায় উজবেগগণ প্রবল। বাদাকসান ও ওয়াখান এখন একটি পৃথক প্রদেশ, অধিবাসীরা ফার্সী ভাষাভাষী। ওয়াখানের কতক অংশ এবং সমগ্র উত্তর-পামীর রুশিয়ার অধীন তাজিকীস্থানের অন্তর্ভুক্ত। অধিবাসীরা ফার্সী ভাষাভাষী। আরিয়ায় চাহার আইমক, তাজিক ও হাজারাগণ সংখ্যায় প্রবল। দ্রানজিয়ানার অধিবাসীর মধ্যে আফগান, বেলুচ তাজিক প্রভৃতি আছে। জাতি হিসাবে এই কয়েকটি অঞ্চলের অধিবাসীর মধ্যে তাজিকগণকে প্রাচীন ইরাণী জাতির বংশধর বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদের ভাষা ফার্সী এবং হিরাটের তাজিকগণ আপনাদিগকে ফার্সীওয়ান বলিয়া পরিচয় দেয়।

জেন্দাবেস্তায় airyno danhavo অর্থাৎ আর্যদিগের দেশের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ এই আর্যদিগের দেশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ব্যাকট্রিয়া, পার্শ বা পারস্ত ও মিডিয়া। অর্থাৎ বালখ বাদে সমগ্র পূর্ব-ইরাণ আর্যদেশের গণ্ডী হইতে বাহিরে পড়িতেছে। পূর্ব ইরাণের মাত্র ব্যাকট্রিয়া আর্যদিগের দেশ, এই মতের সমর্থন কোথাও পাওয়া যায় না, জেন্দাবেস্তার সাক্ষ্যে এই মতের কিছুমাত্র ভিত্তি নাই দেখা যায়। জেন্দাবেস্তার সাক্ষ্যের কথা পরে বলা হইবে, এখানে হাকামণি লেখনের একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পারস্ত হাকামণি রাজবংশের উৎপত্তিস্থান। হাকামণি সম্রাট্ প্রথম দারিয়ুস আত্মপরিচয় দিয়াছেন "Aryan, son of an Aryan; Persian, son of a Persian." এই আত্মপরিচয়ের কোন সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ করিতে হইলে বলিতে হয় দারিয়ুস পারশীক বটেন, আর্যও বটেন কিন্তু পারশীক ও আর্য একার্থবোধক নহে; অর্থাৎ সকল পারশীক আর্য না হইতেও পারেন। পার্শের সকল অধিবাসী আর্য হইলে দারিয়ুসের এইভাবে আত্মপরিচয় দিবার কোন অর্থ হয় না। শুধু দারিয়ুস যে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে, হাকামণি-আমলের অনেক প্রধান ব্যক্তি আর্যপদের সহিত সংযুক্ত এইরূপ নাম গ্রহণ করিতেন, যথা, Ariobarzanes Ariyabanus ইত্যাদি।

দারিয়ুস মিডিয়ার রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। তাঁহার পিতা হিসটাসপেস মিডিয়ার রাজবংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। হেরোডোটাস এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে মীডদিগের প্রাচীন নাম ছিল Arioi বা আর্য। পারস্তের বর্তমান ইরাক আজেমী প্রদেশ, আজারবাইজান ও কুর্দীস্থানের অংশ লইয়া মিডিয়া গঠিত ছিল। এই অঞ্চলের কিয়দংশ এখন তুর্কীপ্রভাবান্বিত। মীডগণ খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করে। বাবিলোনের বেরোসস একটি কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন যে মীডগণ বাবিলোন অধিকার করিয়াছিল এবং আট জন মীড রাজা ২০০ বৎসরের অধিককাল বাবিলোন শাসন করিয়াছিলেন। অনুমান করা হয় যে ইহা খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের ব্যাপার। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের মতে খ্রীঃ পূঃ ১৯২৬ অব্দে আনাতোলিয়া ও সিরিয়ার হিটাইটগণ হাম্মুরাবির বংশকে বাবিলোনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। কাসাইটগণ একবার অনুমান খ্রীঃ পূঃ ২০১২ অব্দে বাবিলোন আক্রমণ করে, ৩০০ বৎসর পরে দক্ষিণ বাবিলোনের রাজা Ea-gamilকে পরাজিত করিয়া তাহারা স্থায়ীভাবে সমগ্র বাবিলোন অধিকার করিয়াছিল। সে যাহা হউক, ইতিহাসে মীড ও পারশীক বরাবর স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিচিত। মিডিয়া হইতে মীডগণ কোন সময়ে পূর্ব মুখে অভিযান করিয়া পূর্ব-ইরাণে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল এ কথা বলা হয় নাই। কিন্তু দেখা যায় যে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের ইতিহাসে মিডিয়ার স্থান গুরুত্বপূর্ণ। আজারবাইজানের প্রকৃত নাম আতরবাইজান। আতর অগ্নির ইরাণীয় নাম। আতরবাইজানের অর্থ অগ্নির মন্দির। অর্থাৎ আজারবাইজান অগ্নি-উপাসনার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। গ্রীক-আমলে আতরবাইজান Atropatene নামে পরিচিত হয়। সে যাহা হউক, হেরোডোটাসের উল্লিখিত Arioi নাম সত্বেও মীডগণ আর্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল ইহা জানা যায় না। প্রথম দারিয়ুস যে আমি আর্য বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন সেই আর্যের সহিত মিডিয়ার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না, কারণ মিডিয়া তখন বিজিত প্রদেশ। তাহা ছাড়া দারিয়ুসের জন্মস্থান পার্শে, মিডিয়া নহে।

দেখা যাইতেছে airyao danhavo বা আর্য দেশের মধ্যে কোন্ কোন্ দেশ ছিল তাহা নির্দেশ করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ মিডিয়া, পার্শ ও ব্যাকট্রিয়া লইয়া আর্যদেশ গঠিত ছিল বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে পার্শ এবং মিডিয়াকে আর্য দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে হেরোডোটাসের একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি এবং মীড ও পারশীকগণ যে আর্যগোষ্ঠীয় জাতি ছিল এই প্রচলিত মত ছাড়া আর কোন জোরালো যুক্তি পাওয়া যাইতেছে না। মীড ও পারশীকগণ আর্যগোষ্ঠীর জাতি ছিল ভাষাবিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের এই মত অপ্রতিবাদে গ্রাহ্য করিয়াও আর্য দেশের মধ্যে পার্শ ও মিডিয়া ছিল কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার প্রচুর অবসর রহিয়াছে।

এখন পূর্ব-ইরাণের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক।

পশ্চিম আফগানিস্থানের যে অংশের সীমানা দক্ষিণে হিন্দুকুশের শাখা কোহ-ই-বাবা ও পূর্বে হরিরুদ নদী তাহার

গ্রীক নাম আরিয়া। আরিয়ার অধিবাসীর হরৈ বা হারি হইতে আরবী নাম হিরাট আসিয়াছে। ষ্ট্রাবোর মতে আবেস্তার airyao danhavo বা airiyana বলিতে পূর্ব-ইরাণের অন্তর্ভুক্ত আফগানিস্থান, বেলুচীস্থান প্রভৃতি বুঝায়। প্লিনি আরিয়ানা বা আইরিয়ানা এবং আরিয়া অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। গ্রীক আমলে হিরাটের অধিবাসী আরিয়ান (Arian) নামে পরিচিত ছিল। মিডিয়া হইতে পারস্ত পর্যন্ত অঞ্চল যখন গ্রীকদিগের পদানত আরিয়া তখন পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ করিয়াছে। সেলুকস নিকেটর চন্দ্রগুপ্তের হস্তে পরাজিত হইয়া আরিয়া হইতে সরিয়া গেলেন, খোরাসানের সীমানা পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল।

আরিয়ার অধিবাসীদিগকে হৈরভ, হারে বা হারি বলা হইত। সিরিয়া, মিশর ও মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের সম্পর্কে হারি বা খারি (Harri, Khari) জাতির নাম উল্লেখিত হইয়াছে। হারি রাজা (মিটানী) Saussatar-এর নাম পণ্ডিত কোনোর মতে সংস্কৃত সৌক্ষত্র হইতে অভিন্ন। প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ায় এবং হিক্সস (Hyksos)-দিগের মধ্যে শাসকগোষ্ঠী ছিল হারি বা খারি এইরূপ বলা হইয়াছে। এই হারি বা খারিকে আর্যগোষ্ঠীয় বলা হইয়া থাকে। প্রশ্ন উঠিতে পারে পূর্ব-ইরাণের এই হৈরভ বা হারির (পরে আরিয়ান) সঙ্গে খ্রীঃ পূঃ ১৪শ শতাব্দীর পশ্চিম-এশিয়ার ইতিহাসের হারি বা খারি গোষ্ঠীর কোন সম্পর্ক আছে কিনা। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ যাহাদিগের নাম আর্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এইরূপ একটি জাতিকে পশ্চিম-আফগানিস্থানে পাওয়া যাইতেছে ইহা নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য বিষয়। সাসানীয় বংশকে কাদিসিয়া এবং নেহাভেন্দের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আরবগণ পারস্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার পরে হিরাট তাহাদিগের পূর্বাঞ্চলের প্রধান ঘাঁটি হইল। হিরাট অতিক্রম করিয়া আরব-শক্তি সহজপথে পূর্ব দিকে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, পামীরের উত্তর দিয়া উত্তর-পূর্বের পথে আরবগণ মধ্য-এশিয়ার মধ্যে অগ্রসর হইয়াছিল। পশ্চিম-আফগানিস্থানের এই অঞ্চলেরমধ্যে ইরাণীয় গোষ্ঠীর ও ফার্সী ভাষাভাষী জনসংখ্যা বর্ত্তমানেও প্রবল। খুব সম্ভব গ্রীকদিগের আরিয়ান নাম ইরাণীয় গোষ্ঠীর এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্লিনি আবেস্তার আইরিয়ানা নাম আরিয়ার সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন বলিয়া তাঁহার সমালোচনা করা হইয়াছে; কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় এরূপ মনে করাতে প্লিনির বিশেষ ত্রুটি ঘটিয়াছে বলা যায় না।

এই আরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া ভেন্দিদাদে উল্লিখিত অহুরামাজদারসৃষ্ট ষোলটি অঞ্চলের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। এই ষোলটি অঞ্চলকে ষোলটি আর্য-বসতি (Aryan settlements) বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে এবং জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের পশ্চিমমুখী গতি হইতে বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আর্য জাতির সম্পর্ক এবং আর্য দেশের অবস্থান সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করা সম্ভব পরে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। এই প্রসঙ্গে এখানে বলা যাইতে পারে যে ভেন্দিদাদের এই তালিকায় পারস্তের রাঘ বা রায় জেলার পশ্চিমে অহুরামাজদারসৃষ্ট কোন অঞ্চল বা আর্য বসতির উল্লেখ দেখা যায় না এবং অহুরামাজদারসৃষ্ট অঞ্চলগুলির তালিকায় মিডিয়ার কোন উল্লেখ নাই, পারস্তের নামও নাই, উহা ভাষ্যকার যোগ করিয়াছেন।

হর্ষ-বিষাদ

শ্রীমহাদেব রায়

আকাশে-ভুবনে এ শুভ লগ্নে, হে শরৎ, তব সুষমা-ছটা,
প্রান্তরে-বনে আগমনে তব শ্যাম-কান্তির বিপুল ঘটা,
বহু সন্তাপ সহিয়া অতীতে আসিয়াছ পুনঃ দীপ্ত বেশে,
শ্যাম-মনোহর লাবণির ঢেউ বহিছে আবার সোনার-দেশে।

শ্বেত বাস কাশে ফুটিল আবার শুভ্র স্নিগ্ধ সুষমা-রাশি,
কমল আননে উঠিল ফুটিয়া অমিয়-মাখানো মধুর হাসি,
হংস-কাকলী তীর নিতম্বে কল-নির্ঝরে মোহন তানে,
বিষাদ-ভুলানো গীতিকার সুর ধ্বনিল মধুর হর্ষ গানে।

মুগ্ধ-দৃষ্টি দিগ্-দিগন্তে হেরি' আজ শ্যাম-শোভার ছবি,
লুব্ধ হৃদয়ে রহে বিস্ময়ে তব আনন্দে মগ্ন কবি,
লয়ে কোল-ভরা প্রান্তর-শোভা শরৎ আবার এসেছ ঘরে,
তবু কেন আজ বিষাদে মাতার তপ্ত অশ্রু নয়নে ঝরে?

অন্নপূর্ণা এসেছে অন্ন চির-দুঃখিনী মায়ের ঘরে,
'আনন্দময়ী'-নামে কলঙ্ক-অশ্রু যে তবু নয়নে ঝরে,
'সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা' রূপ গীতি-রব শারদ-গানে,
এ কি আতঙ্কে শঙ্কিত-হিয়া কাঁদিছে বঙ্গ বাঁচিতে প্রাণে।

ষ্ট্রাইক্

শ্রীতারাপদ রাহা

উপরে মিটিং হচ্ছে,—সর্বমঙ্গলা বিদ্যাপীঠের এক্‌সিকিউটিভ কমিটির মিটিং। মিনিট পনর আগে সেক্রেটারি এসে গেছেন। গালফুলো অধ্যাপক এসেছেন,—ওঁকো রায়বাহাদুর এসেছেন, ষ্টেশনের দোকানের ম্যানেজার মিঃ মজুমদার এসেছেন, সরকারের তরফ থেকে মিঃ আলি এসেছেন, ডাঃ ঘোস এসেছেন। স্কুলের হেড্‌মাস্টার ও দুই জন রিপ্রেজেন্‌টেটিভও এসে গেছেন,—এবার দুই দিক থেকে ভাইস্‌-প্রেসিডেন্ট মিঃ রাহুত ও প্রেসিডেন্ট মিঃ তলাপাত্রের মোটর এসে হাজির হ'ল।

নামলেন দু'জন মোটর থেকে,—দারোয়ান, দপ্তরী ও বেয়ারা সেলাম করে একপাশে সরে দাঁড়াল। খটাখট জুতোর শব্দে নিজেদের আগমনবার্তা সূচিত করে সিঁড়ি-পথে উপরে উঠে গেলেন তাঁরা।

নীচের আপিস ঘরের পাশের অন্ধকার কামরা থেকে সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন পাঁচটি মূর্তি। পাঁচটিই মাস্টার। ক্লার্ক আর দারোয়ানের সায় আছে—এঁরা মিটিং ঘরের নীচে স্পাইরেল সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মিটিঙের আলোচনা শুনবেন: টিচার্স রিপ্রেজেন্‌টেটিভদের কাছে মিটিঙের কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলতে চান না,—বলেন, মানা আছে—সে সব 'এক্সট্রিমলি কন্‌ফিডেন-সিয়াল্'।

আরে রেখে দে তোর 'কন্‌ফিডেনসিয়াল' মিটিঙে কি হ'ল যদি না-ই জানাবি তোরা—তবে যাস কেন তোরা মিটিঙে,—মাস্টারদের তরফ থেকে লোক পাঠাবার তবে দরকার কি?

যাক্, এবার আর কেউ তাদের মুখাপেক্ষী নয়—মিটিঙের আলোচনা নিজেদের কানে শুনবারই ব্যবস্থা করেছেন মাষ্টার মশায়রা। মিটিঙের আলোচ্য বিষয় মাষ্টারদের কাছে এবার জরুরী: আলোচ্যের মাঝে রুটির কথা আছে এবার,—তা ছাড়া কয়েকজনের ব্যক্তিগত দরখাস্ত আছে। ওঁরাও শুনতে এসেছেন।

অশোক—বেচারা অশোক—পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে পায় আর মাগ্‌গি ভাতা আট টাকা। মাস তিনেক আগে বাপের শ্রাদ্ধে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে দু-শ টাকা কর্জ করেছে সে। পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের মাস্টার বাপের আবার শ্রাদ্ধ কেন যে করে সেই আশ্চর্য। প্রতি মাসে বেতন থেকে দশ টাকা করে কেটে নেওয়া হচ্ছে তার। তার আবেদন—দশ টাকার বদলে পাঁচ টাকা করে কাটা হোক তার।

নরেশবাবুর মেয়ের বিয়ে। মাস্টারের মেয়ের বিয়ে আগে যেখানে পাঁচ-শ টাকায় হ'ত—এখন লাগবে সেখানে দু-হাজার। হোক দু-হাজার,—তিন বছর খোঁজাখুঁজির পর মনোমত পাত্র যখন জুটেছে—তখন দিতে হবে ত বিয়ে! মাস্টারের মেয়েরাও আবার চিরকাল কুমারী থাকতে চায় না! নরেশ বাবু তাই প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে চার-শ টাকা কর্জ চেয়েছেন।

নূতন মাস্টার শচীন ফার্ষ্ট ক্লাস বি. টি.। এক বছর আগে পঞ্চাশ টাকায় তাকে চাকরি দিয়ে বলা হয় কনফার-মেশানের সময় তাকে আর দশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কনফারমেশান ছ-মাস পরেই হবার কথা ছিল,—হয় নি তা। আজ এক বছর পরে তার কনফারমেশানের কথা আবার উঠবে মিটিঙে। সেও শুনতে এসেছে।

আর এসেছেন হীরেনবাবু ও সুশোভন।

পঞ্চান্ন বছরের পরই স্কুল থেকে রিটায়ার করবার কথা: একেবারে গবর্ণমেন্ট সার্ভিস আর কি! এর পর যাঁরা চাকরি করতে চান স্বাস্থ্য ভাল থাকলে তাঁরা 'এক্সটেনসনে'র জন্য দরখাস্ত করে দেখতে পারেন। হীরেনবাবুর পঞ্চান্ন পূরে গেছে দরখাস্ত করে জানতে এসেছেন—ফলাফল।

সুশোভন এসেছে সবার মিলিত স্বার্থের কথা শুনতে। তারই চেষ্টায় দরখাস্ত গেছে সকল মাস্টারের স্বাক্ষর নিয়ে: প্রার্থনা—মাগ্‌গি ভাতার টাকাটা সবার বেতনভুক্ত করে দেওয়া হোক—তার উপর নূতন করে মাগ্‌গি ভাতা দেওয়া হোক দশ টাকা করে। ইচ্ছা করলে এ টাকাটা স্কুল দিতে পারে মাস্টারদের—কারণ গত দু-বৎসরে স্কুলে টাকা জমেছে প্রায় হাজার ত্রিশেক। ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে অনেক।

মিটিং সাড়ে সাতটায় সুরু হয়ে গেল। পাঁচটি জীব স্পাইরেলে কম্পিত বক্ষে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে।

প্রথমেই উঠল শচীনের কনফারমেশানের কথা। গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে মিঃ তলাপাত্র হাঁকলেন,—শচীন চক্রবর্তীর সম্বন্ধে হেড্‌মাস্টারের রিপোর্ট কি?

হেড্‌মাস্টার নূতন লোক, এ স্কুলে এসেছেন মাত্র মাস-তিনেক,—বললেন—আমি মাসতিনেক মাত্র তাঁকে দেখেছি—আমার 'ইম্‌প্রেশন'—মোটামুটি ভাল।

মাত্র মাসতিনেকে কারো সম্বন্ধে ঠিক ইমপ্রেশন হয় না,—আরও কিছু দিন দেখুন,—

চোখ মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল শচীনের: স্কাউণ্ড্রেল,—চীট্ ফাঁকি দিয়ে এক বছরের ওপর কাজ করিয়ে নিলে আমায়! রেজিগ্‌নেশান দেব আমি,—কালই দিচ্ছি, দেখি লোক কোথায় পায়;—চার চারটে কাগজে এক হপ্তা এ্যাড্‌-ভার্টাইজমেন্ট দিয়ে ত এপ্লিকেশন আসে তিনখানা,—তার একটা কানা,—একটা খোঁড়া, একটা হয়ত চলনসই।

মনে করেছেন সেই দিনই আছে: চিরকালই অত্যাচার চালাবেন একদল শিক্ষিত লোকের উপর।

সুশোভনের মুখ অসম্ভব গম্ভীর: ঝড়ের পূর্বাভাস। হীরেনবাবুর মুখে ব্যঙ্গের হাসি দেখা দিয়েছে: অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। অন্যান্য মাস্টারের মুখ দেখে কিছু বুঝা যায় না।

এর পর উঠল নরেশবাবুর টাকা ধার নেওয়ার প্রশ্ন।

গম্ভীর কণ্ঠ হুঙ্কার দিলে—কত টাকা ?

সেক্রেটারী এপ্লিকেশন দেখে বললেন, চার-শ টাকা মেয়ের বিয়ের জন্য চেয়েছেন—দু-বছরে চব্বিশ ইনস্টলমেন্টে শোধ দেবেন।

যুদ্ধের সময় কত টাকা নিয়েছেন ?

ছ-শ।

আছে কত টাকা ওঁর হিসাবে ?

ছ-শ বিরাশি টাকা চৌদ্দ আনা ছ-পাই।

না,—অত টাকা পেতে পারেন না উনি। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে নিতে হলে—মাত্র একচল্লিশ টাকা সাত আনা তিন পাই উনি পেতে পারেন। স্কুল কনট্রিবিউশনে হাত দেবার অধিকার ত ওঁর নেই—ওঁর ভাগের ছ-শ টাকা ত উনি এর আগে খেয়ে ফুরিয়েছেন।

টিচার্স রিপ্রেজেনটেটিভ নন্দবাবু বিনীত ভাবে বললেন, কিন্তু ইমারজেন্সী পিরিয়ডে না খেয়ে ত উপায় ছিল না, সার!

হাঁ—ঠিক,—কিন্তু এখন আবার কেন ? মেয়ের বিয়েতে অত টাকা?—যার যেমন সামর্থ্য তেমনি বিয়েই দেওয়া উচিত।

স্পাইরেল সিঁড়িতে—দপ্ করে জ্বলে উঠল একবার নরেশবাবুর চোখ,—পূর্বপুরুষের সংস্কার মত পৈতেতে হাত দিচ্ছিলেন তিনি,—অভিশাপ দেবেন।—কিন্তু না—লাভ নেই,—ক্ষমাই পরম ধর্ম, তা ছাড়া অভিশাপ ফলে না আজকাল,—যদি ফলত তবে গত দুর্ভিক্ষে লক্ষ উপবাসীর অভিশাপে তলাপাত্রের দল ভস্ম হয়ে যেত।

সুশোভন নিজে বিয়ে করে নি,—তবু নিজেকে নরেশবাবুর স্থানে বসিয়ে ভেবে নিলে একবার ব্যাপারটা। তার ইচ্ছা করছিল উপরে ছুটে গিয়ে বাঘের মত একবার গলা চেপে ধরে: টাকা দিবি নে,—তোর বাপের টাকা? মাষ্টারের টাকা মাষ্টারে নেবে—তা তোর কি,—শহরের আর দুটো স্কুলের লক্ষ টাকার উপর—কি করে নিজের কাজে লাগিয়েছিস,—জানে না শহরের লোক—না ?

স্পাইরেলে দাঁড়িয়ে কথা বলতে নিষেধ ছিল—তবু একটু করুণ দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে নরেশবাবুর মুখ থেকে অস্ফুটকণ্ঠে বেরিয়ে এল,—নারায়ণ! হীরেনবাবু তার মুখে হাত দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিলেন।

উপরে—তালপাত্রের একাদশ রত্নের সভায় নরেশবাবুর মেয়ের বিয়েতে তাঁরই নিজের ফাণ্ড থেকে এক চল্লিশ টাকা সাত আনা ন'পাই মঞ্জুর হ'ল। পরের আইটেম্ হচ্ছে—মাষ্টারদের বেতন বৃদ্ধি ও মাগ্‌গি ভাতা।

প্রেসিডেন্ট হাঁকলেন,—নেক্‌স্‌ট আইটেম প্লিজ্?

সেক্রেটারী খাতা দেখে বললেন—এবার টিচারদের ইনক্রিমেন্ট আর ডিয়ারনেসের জন্য আবেদন।

ডিয়ারনেস ত দেওয়া হচ্ছে তাদের!

হাঁ—হচ্ছে—ওর চেয়ে বেশি প্রার্থনা করছেন তাঁরা ?

কত ?

ওঁদের দেওয়া হচ্ছিল আট টাকা—ওটা ফ্লাট রেটে সবাইকে—ইনক্রিমেন্ট দিয়ে—অর্থাৎ পে-এর সঙ্গে কনসলিডেটেড্ করে নূতন করে ডিয়ারনেস্ চাইছেন—আরও দশ টাকা।

এক অদ্ভুত হাসিতে মিটিং ঘর কেঁপে উঠল—যে হাসি শুধু ঐ এক দল লোকই হাসতে পারে: ফ্লাট রেটে ইনক্রিমেন্ট—, বুড়িমুড়কির এক দর—আবার তার উপর ডিয়ারনেস্! প্রিপস্টারাস্!

স্পাইরেল সিঁড়িতে পাঁচটি মূর্তি দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে—উত্তেজনায় তাঁদের সবার শরীর কাঁপছে: এত টাকা রয়েছে স্কুলের—মাষ্টারদের দিতে চায় না—টাকা দিয়ে ওরা করবে কি!

টিচার্স রিপ্রেসেনটেটিভ নন্দবাবু আমতা আমতা করে বললেন—এ দুঃসময়ে সার—ওটা সবাইকে একটা 'রিলিফ' বলে বিবেচনা করুন, সার—টিচারদের বাঁচিয়ে রাখুন।

বুঝলাম—কিন্তু মাত্রা আছে ত—আর সবাইকে সমান কি করে হয়—গত ইনক্রিমেন্টে যারা এক টাকা পেয়েছে তারাও আট টাকা পাবে?—কেন?—তাদের নামে যে কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট আছে—আমার ত মনে হয় তারা কোন ইনক্রিমেন্টই পাবে না।…আর সবাই আট টাকা—এ কি মগের মুলুক না কি ?

নন্দবাবুর স্বরে মিনতি ঝরে পড়ছে যেন: কিন্তু সার—বড্ড দুঃসময় পড়েছে যে,—in consideration of these bad days—sir!

Bad days!—Don't you feel—worse days are coming?

অন্ধকার স্পাইরেলে পাঁচটি মূর্তির মনোভাব একমাত্র ভগবানই বোধ হয় কিছু অনুভব করতে পারবেন: অনেক আশা করে এসেছেন আজ তাঁরা। সুশোভনের চোখ দুটি হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলছে: শালা—স্কাউণ্ড্রেল—worse days—এর চেয়ে worse days আবার কি আসবে—if worse days come—better arrangement should be made. ছেলেদের মাইনে বাড়িয়ে দিবি। লোকে—চালের দাম, ডালের দাম, তরিতরকারি, মাছ জামা কাপড়ের দাম—চার পাঁচ গুণ বেশি দিতে পারে—ছেলে পড়ানোর দাম ডবল না হোক—দেড়গুণ দিতে বাবা কি?…ষ্ট্রাইক্ করে না

এরা—ষ্ট্রাইক্!—কুলি মজুর—বাটার কর্মচারী—পোষ্টাপিস—ব্যাঙ্ক—রেলওয়ে—ট্রাম—সবাই ষ্ট্রাইক্ করতে পারে—মাষ্টারেরা পারে না—কেন? এরা কি মানুষ নয়—মানুষের মত বাঁচতে চায় না এরা···কি করা যায়—ষ্ট্রাইক্!—এখান থেকে এই স্কুল থেকেই সুরু করতে হবে ষ্ট্রাইক্—

উত্তেজনায় কাঁপছে সুশোভন। এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাবে না কি সে!—গিয়ে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে আসবে! কেন আসে এরা কমিটিতে—দেশকালপাত্র ভেবে বিধিব্যবস্থা করবার যাদের সাহস নেই—প্রাণ নেই।

ওদিকে নন্দবাবু বলে চলেছেন—কিন্তু, সার, ভেবে দেখুন—আমাদের ভেতর এক জন মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে পান—এই দুর্দিনে—চার পাঁচটি ছেলেপিলে নিয়ে কি খাওয়া চলে তাদের?

দু'বেলা না হোক এক বেলাও ত চলে।

দাঁতে দাঁত ঘষা লাগল সুশোভনের—মুখ থেকে—একটু জোরেই বেরিয়ে এল—শালা!

নরেশ বাবু—ডান হাতে তার মুখ চাপা দিয়ে ধরলেন।

আর দাঁড়াতে চায় না সুশোভন: নিজেকে সে আর সামলে রাখতে পারছে না—ষ্ট্রাইক্—একমাত্র ওষুধ ষ্ট্রাইক্—কাল থেকেই সুরু করতে হবে। টাকা থাকতে টাকা দেবে না—এক বেলা খেয়ে না কি মাষ্টারি করতে হবে—শালারা! সমস্ত শরীরের মাঝে যেন একটা বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে। সবাইকে হাত দিয়ে সরিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছিল সুশোভন—নরেশ বাবু তার হাত ধরে ঠেকালেন—শেষ শুনে যান সুশোভন বাবু—আর বেশি দেরি নেই—

ও সব আপনারা শুনুন—আমার শোনা হয়ে গেছে।

সুশোভন চলে গেল। আর চারটি মূর্তি দাঁড়িয়ে মিটিঙের শেষ শুনে গেলেন। অশোকের মাইনে থেকে দশ টাকার পরিবর্তে সাড়ে আট টাকা করে কেটে নেওয়া হবে—তা'লেই দু'বছরে শোধ হবে দেনা। হীরেন বাবু—এক বছরের এক্স্‌টেনসান পেলেন। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি আর হ'ল না—মাগ্‌গি ভাতা বাড়ল—অতি কষ্টে আর দু'টাকা। ডিয়ারনেস্‌কে—কনসলিডেটেড্ করলে—পার্ম্যানেন্ট একস্‌পেণ্ডিচার বেড়ে যায়: আর বছর যে স্কুলের আয় কমে যাবে না এ কথা কে বলতে পারে—তা ছাড়া খরচ আছে না?—ছেলে বাড়ছে—চারটি ঘর বাড়াতে হবে—ফার্নিচার—তা ছাড়া—সিঙ্কিং ফাণ্ড আছে—বেতন বৃদ্ধি অমনি বললেই হ'ল?—স্কুলের জন্ত মাষ্টার—না মাষ্টার পুষতে স্কুল?

অসহায় চারটি মূর্তি নিদারুণ গাত্রদাহ নিয়ে রাত্রি সাড়ে ন'টায় ফিরে গেল। সুশোভনটা যে কোথায় গেল!

সুশোভন কিছু আগে বেরিয়েছে প্যাইরেল থেকে—মনে মনে হিসাব করতে করতে চলেছে সে—কত টাকা আছে তার—কৌমার্য জীবনে—একটা সুবিধে হয়েছে তার—কিছু টাকা হাতে আছে তার। কত দিন লড়তে পারবে সে—ক'জন শিক্ষকের অন্ততঃ মাসখানেকেরও ভাল ভাতের ব্যবস্থা করতে পারবে?—তা ছাড়া—তা ছাড়া সুমিত্রা আছে—সুমিত্রা সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তন করতে রাজী আছে সে—সুমিত্রা যদি তাকে সাহায্য করে। কত আছে তার!

ভাবতে ভাবতে চলল সুশোভন।

রাত্রি ন'টার একটু পরে—একটি মেয়ে-বোর্ডিঙের তেতালায় গিয়ে হাজির হ'ল সে। তেতালার একটি মাত্র ঘরে—একা থাকে সুমিত্রা বোস।

সুমিত্রা শিক্ষয়িত্রী—ঘরে দরজা দিয়ে স্কুলের খাতা করেক্ট করছিল; দরজায় টোকা শুনে জিজ্ঞাসা করলে—কে?

অতি পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠস্বরে উত্তর হ'ল: দরজা খোল।

বুকটা একটু কেঁপে উঠল: দেড় মাস আগে—একরকম নির্লজ্জের মত সুমিত্রা যখন সুশোভনকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে তার—সুশোভন একবার তাকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছিল। বোঝাপড়া একরকম শেষই হয়ে গিয়েছিল। আজ আবার—

দরজা খুলে সুশোভনের মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে গেল সুমিত্রা—এ কি মুখ!—কি অসুখ করেছিল না কি তোমার?

না—বেশ ভাল আছি। এক কাপ চা করো। বলে জুতো খুলে সুশোভন বিছানায় গা দিয়ে বালিশটা টেনে নিলে।

সুমিত্রা কুজো থেকে কেটলিতে জল ঢেলে—স্টোভ ধরাতে গেল। সুশোভন তার দিকে চেয়ে বললে—নিজেরই বা এমন চেহারা হয়েছে কেন?

তোমার গুণ!

আমার গুণ নয়—গুণ মাষ্টারির।

স্টোভের উপর কেটলি চাপিয়ে সুমিত্রা বললে—মাষ্টারি কাজটা হয়ত নিজেও খারাপ মনে করো না—করলে নিজে আসতে না এ লাইনে—আমিই না হয় বোকা মেয়ে—ভুল করে না হয় আমি আসতে পারি···আর তা ছাড়া কি করবারই বা আমার ছিল?

সুশোভন ঠিক করে এসেছিল নিজেকে কিছুক্ষণ চেপে রাখবে,—ঝোঁকের মাথায় কোন কিছু বলা ঠিক নয়। তাই সে চুপ করে রইল।

সুমিত্রা জবাবের জন্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে বললে—এখন দেখছি বিয়ে করার আগে কোন মেয়ের এ লাইনে আসা উচিত নয়।

কেন,—হঠাৎ এ কথা মনে হবার কারণ?

ব্যঙ্গ আর রহস্য মিশ্রিত অদ্ভুত এক হাসির রেখা খেলে গেল সুমিত্রার ঠোঁটে: বিভা-দির কথা শোন নি?

না,—কি হ'ল আবার তার ?

এখানকার আগী টাকার চাকরি ছেড়ে—একশো টাকার হেড মিস্ট্রেসের পদে গিয়েছিল মডেল গার্লস স্কুলে—প্রায় বছর-খানেক আগে,—মনে আছে ত ?

—হাঁ।

সেখানে গিয়ে আরও উন্নতি হয়েছে তার।

কোন্ দিকে ?—মাইনে বেড়েছে ?

উন্নতি সব দিকেই : মাইনে ত বেড়েছেই,—তা ছাড়া—

হেঁয়ালি রেখে খোলসা করেই বল না, বাপু!

মাসখানেক আগে সেক্রেটারিকে বিয়ে করতে হয়েছে তার।

আবার অস্বাভাবিক হয়ে উঠল সুশোভনের চোখ মুখ : কত বয়স সেক্রেটারির ?

তা আর বলো না,—বয়স বছর পঞ্চাশ,—বাড়ীতে আগেকার বুড়ি বউ,—ছ'সাতটা ছেলেমেয়ে।

স্কাউণ্ড্রেল,—ওকে গুলি করে মারা উচিত—

সুশোভন শুয়ে ছিল,—উত্তেজনায় উঠে বসেছে এবার।

সুমিত্রা গরম চায়ের পেয়ালা সুশোভনের হাতে দিয়ে মৃদু হেসে বললে,—নাও,—খেয়ে মাথা একটু ঠিক করে নাও,—খবর আরও আছে।

আবার কি খবর ?

চা শেষ না করলে—বলব না আমি,—বলে' সুমিত্রা নিজের পেয়ালা তুলে নিলে।

নীরবে মিনিটখানেক ধরে চলল চা খাওয়া—সুমিত্রা এক-দৃষ্টে চেয়ে আছে সুশোভনের দিকে,—সুশোভন মুখ নীচু করে পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ভাবছে।

পেয়ালা শেষ করে পাশের টিপয়ে ঠক্ করে রেখে সুশোভন চোখ তুলে বললে,—এবার বল তোমার আরও খবর।

সুমিত্রা সুশোভনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে, নমিতা-দি ছুটি নিয়েছে তিন মাসের, আমি এখন একটিং হেডমিসট্রেস।

বেশ ত—কনগ্রাচুলেশানস্।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে সুমিত্রা বললে,—তুমি ত প্রায় দেড় মাস এ মুখো হও না,—বন্ধুর মত যে একটু পরামর্শ দেবে—তাও আশা করতে পারি না—

তোমার পদোন্নতি,—সাময়িক পদোন্নতি হয়ত একদিন স্থায়ী হয়ে যাবে—এতে আবার পরামর্শ দেবার কি আছে ?

সব কথা জান না তুমি—তাই তুমি একথা বলতে পারছ।

বল,—সব খোলসা করেই বল,—আমিও আজ খোলসা কথাই বলতে এসেছি,—তোমার সব কথা শুনে…

মুহূর্তের জন্য সুমিত্রা একবার সুশোভনের দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব একটু বুঝতে চেষ্টা করলে—তারপর বললে,—স্কুলের টিচারদের আর এ মাইনেতে চলে না,—তাই নমিতা-দি সেক্রেটারির সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়েছিলেন—

ব্যথিত হয়ে উঠল সুমিত্রার মুখ।

কি,—থামলে কেন,—বলে যাও—সুশোভন তাড়া দিলে।

সেক্রেটারি তাকে অপমান করেছে।

মানে ?

মানে—তাকে বলেছে,—দুপুরে আসবেন,—দুপুরে কেউ বাড়ি থাকে না,—তখন আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনব।

সুশোভন উত্তেজিত হয়েই ছিল—এ কথায় উত্তেজনা তার আরও বেড়ে গেল—তবু বাইরে তা প্রকাশ না করে সে বললে,—দুপুরে কেউ বাড়ি থাকে না মানে ?—

মানে,—সেক্রেটারি বিপত্নীক,…

শিকারী বাঘের মত দুটো চোখ জ্বলে উঠল সুশোভনের। সুমিত্রার দিকে চেয়ে বাঘের আওয়াজের মত আওয়াজ করে বললে,—দুপুরে দেখা করার ভার তোমার উপর পড়ল না কি তাই—

সুমিত্রার দুই চোখও দপ করে জ্বলে উঠল এবার : আমাকে এমনি করে অপমান করতে এসেছ না কি আজ ?

সুশোভন সুর নামিয়ে—সুমিত্রার হাত ধরে তার পাশে বসিয়ে বললে, ভুল—ভুল বুঝেছ তুমি—তোমার—আর শুধু তোমার কেন—তোমার আমার তোমাদের আমাদের সকল অপমানের জ্বালা মিটাতে এসেছি আমি।

সুমিত্রা বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল সুশোভনের দিকে, কিছুই বুঝছে না সে।

বলছি সব—তুমি বল ত তোমার স্কুলের টিচারদের বেতন বৃদ্ধির কি ব্যবস্থা করেছ তুমি ?

সুমিত্রা ম্লান মুখে বললে—বিশেষ কিছুই হয় নি, দরখাস্ত করেছিলাম আমরা অনেক কিছুই দাবি করে। কিন্তু সব ভেস্তে গেল, সেক্রেটারী খাপ্পা হয়ে আছে—

কেন—খাপ্পা কেন ?

তাকা,—

ওঃ—তা নমিতাদির কথা নিয়ে তোমরা কমিটিতে তোলপাড় করলে না কেন ?

তোমরা পুরুষ—বুঝবে না, এ নিয়ে তোলপাড় করা ভাল নয়, যারা মাষ্টারি করতে আসে তারা সবাই ত আর চিরকাল কুমারী থেকে শুকিয়ে মরতে চায় না—তা ছাড়া জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না।

সুশোভন মনে মনে বললে—তা যায় কি না দেখে নিচ্ছি আমি! মুখে বললে—তা তোমাদের দরখাস্তের ফল কি হ'ল, বেতন ও মাগ্গিভাতা বাড়ল কিছু ?

বেতন কিছুই বাড়ে নি—মাগ্গিভাতা দু' টাকা বেড়েছে, অথচ স্কুলে টাকা জমেছে অনেক—কলকাতার ত লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে!

তা ও টাকা দিয়ে কি করবে ওরা,—তুমি ত হেড মিস্ট্রেস হয়ে মিটিং এ্যাটেণ্ড করেছ!

হ্যাঁ করেছি। ও টাকা দিয়ে স্কুলের বাড়ি করবে ওরা।

ব্যঙ্গের হাসি হাসল সুশোভন; তা বটেই ত—এই মাগ্‌গির বাজারে—বাড়ি 'ক্যা-ন'ট' ওয়েট, রিকসাওয়ালা, সব্‌জিওয়ালা, মাছওয়ালা, পান-সুপারিওয়ালা 'ক্যা-ন'ট' ওয়েট, ট্রাম, পোষ্টাপিস, ইভন্ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ক্যা-ন'ট ওয়েট—ওনলি টিচার্স ক্যান—কি পেয়েছে ওরা আমাদের বল ত?…আর ওরা আসেই বা কেন কমিটিতে—বল ত?

অতি দুঃখেও সুমিত্রা হাসলে: আসে মান বাড়াতে: কি, না আমি অমুক স্কুলের মেম্বার হয়েছি, সেক্রেটারি হয়েছি, প্রেসিডেন্ট হয়েছি—মিটিঙে যেতে হয় আমায়!… তা ছাড়া মাষ্টার-মাষ্টারনীরা এসে সেলাম করে, বাড়িতে ঘোরে। এসবে কি কম লোভ মানুষের! যাদের 'মেরিট' আছে তারা নিজের শক্তিতে রিসার্চ করে, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন করে, শিল্প সাহিত্য করে, দেশসেবা করে—মানুষের কাছে বাহবা সম্মান পায়—অথচ সবারই ত সে ক্ষমতা নেই, তাই এ সহজ পন্থা। আমি শুনেছি কি না মেয়েদের মুখে—আমি এক আত্মীয় বাড়িতে—বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম, সেখানে একটি মহিলার সঙ্গে পরিচয় হ'ল—তিনি আমার পরিচয় শুনে বললেন—ও ঐ স্কুলে, ওখানে ত আমার স্বামী মেম্বার! সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

যেন বাড়ির এক দাসীর সঙ্গে খেতে বসেছেন তিনি এই রকম ভাব, তাই না?

অনেকটা তাই।

তা ত হবেই—রিকসাওয়ালা পর্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখে এদের। আমাদের স্কুলের অশোক এক রিকসা করে কিছু মাল আর বোনকে নিয়ে আসছিল তার বাড়িতে। পথে নেশা চেপেছে। লটবহর ভিড়িয়ে নামা হাদামা বলে রিকসাওয়ালাকে দুটো পয়সা দিয়ে বললে—দু'পয়সার বিড়ি নিয়ে আয় ত বাবা!

ধুম পিয়েগা বাবু?—সিজিয়ে—বলে কতুয়ার পকেট থেকে দিব্যি একটা পাসিংশো বের করে দিলে অশোকের হাতে!

অশোক ত অবাক্। অশোক জিজ্ঞাসা করলে, রোজ কেতনা কামাতা তোম্?

কুচ্ ঠিক নেহি হৈ বাবু—কোভি দশ রূপেয়া হোতা—কোভি আট নয় রূপেয়া হোতা—দোবেলামে যো রূপেয়া মালিককো দেনে পড়তা!

অশোক এসে আমাদের বললে—শুনে আমার মনের ভাব এমন হ'ল যে বলি—বাবা তুই রিকসে চেপে বস, আমিই টানি।

সুমিত্রা একদৃষ্টে সুশোভনের মুখের দিকে চেয়ে তার কথা শুনছিল, এইবার বললে—শুনে রক্ত গরম হয়ে যায়।

সুশোভন বিপুল আগ্রহে সুমিত্রার হাত দুটি ধরে একরকম পাগলের মত বলে উঠল—সত্যি বলছ, রক্ত গরম হয় তোমার?

তা হয় বই কি—মানুষ ত!

ওঃ বাঁচলাম,—আমরাও মানুষ, আমাদেরও রক্ত গরম হয়।…তোমার কাছে আজ ভিক্ষা চাইতে এসেছি আমি, সুমিত্রা!

কি পাগলের মত বকছ,—তুমি আজ প্রকৃতিস্থ নেই দেখছি।

প্রকৃতিস্থ আমি সত্যিই নেই,—কিন্তু পাগলের মত বকছি না আমি,—তোমার কাছে ভিক্ষা আমি সত্যিই চাই।

সুমিত্রা হেসে বললে,—কি চাই বল?

চাই আমি তোমার সব,—তোমার সাহায্য, তোমার অর্থ, তোমার পরিশ্রম—চাই আমি তোমার নিজেকে…

সুশোভনের দুই বজ্রমুষ্টির মাঝে বন্দিনী সুমিত্রার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে,—চোখে এসে গেছে তার জল। সেই চোখেই সে সুশোভনের দিকে চেয়ে বললে,—তোমার কথা ঠিক বুঝে উঠছি না যে আমি—

সুশোভন সুমিত্রার হাতে আরও জোরে চাপ দিয়ে বলল,—আমার জীবনের ধর্ম খুঁজে পেয়েছি, সুমিত্রা—তা সাধন করতে সহধর্মিণী চাই,—তুমি আমার তাই হবে।

সুমিত্রা তবুও সুশোভনের মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে রয়েছে দেখে সে পাগলের মত বলে উঠল,—কাল থেকে ষ্ট্রাইক্ সুরু করতে চাই ইস্কুলে ইস্কুলে,—মেয়েদের স্কুলে চালাবে তুমি,—ছেলেদের স্কুলে আমি—

মাত্র দুই জনে?

হাঁ,—ইচ্ছা থাকলে দুই জনেই হয়,—তুমি বলে দেবে দশ জনকে, আমি দশ জনকে,—দুই দশে কুড়ি—স্কুলের অর্দ্ধেক টিচার ষ্ট্রাইক্ করলেই স্কুল হবে না,—তার পর দিন দেখবে—দু'শো,—পর দিন দু'হাজার, তার পর বিশ হাজার,—দশ দশ গুণ করে বেড়ে যাবে প্রতিদিন,—তুমি দেখে নিও—

কি করে চলবে এদের?

আধপেটা খেয়ে ত এরা আছেই,—না হয় সিকি পেটা কিছু দিন খাবে,—তোমার আমার যা আছে তা দেব এদের—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুমিত্রা বললে,—সে আর কতটুকু?

ভিক্ষে করব এদের জন্যে,—তা ছাড়া টিউশন ত সবারই করতে হয়। তা দিয়ে কিছু দিন লড়তে পারবে।

সুমিত্রা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে,—ধীর চিত্তে ভেবে দেখ,—পারবে?

তুমি সাথী হলে নিশ্চয়ই পারব।

আমি তোমার চিরকালের সকল কাজের সাথী।—কিন্তু আমাদের ত এসোসিয়েশান আছে—তাদের এক বার বলে কয়ে কাজে হাত দিলে হ'ত না?

শুনবার সঙ্গে সঙ্গে আবার কঠোর হয়ে উঠল সুশোভনের মুখ:—ওদের কেরামতি ইমারজেন্সি পিরিয়ডে দেখা গেছে—'এ সেট্ অব্ ইমবেসিলস্'—ওরা জানে কেবল সরকারের কাছে—এক টাকা মাসিক ভিক্ষার জন্যে ক্যা ক্যা করে ঘুরে বেড়াতে,—আর টেষ্ট-পেপার আর টেক্সটবুক ছাপিয়ে করেকটা ঘরের খাঁ পুষতে।...ও সব দিয়ে চলবে না,—দুর্গত,—অবমানিত,—অনাহারক্লিষ্ট টিচারদের নিয়ে আমরাই নূতন এসোসিয়েশান গড়ে তুলব।

তোমার মনে হয় তারা সাড়া দেবে?

নিশ্চয়,—শত বার সহস্র বার সাড়া দেবে তারা,—নানা খোলায় জলে তারা শুকনো খড় হয়ে আছে—শুধু একটা স্ফুলিঙ্গ চাই।...তুমিই ত একটু আগে বললে—রক্ত গরম হয়ে ওঠে,—কারণ তুমি মানুষ।—তারাও মানুষ।...লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে,—আর দশ জন মানুষের মত বাঁচতে চায় তারা—

কিন্তু মানুষের মত বাঁচবার দাম কে দেবে তাদের—সরকার?

সরকার কেন,—যারা রিকসাওয়ালাকে দিয়েছে, সব্জি-ওয়ালাকে দিয়েছে, মাছওয়ালাকে দিয়েছে,—তারাই। শুধু চাইতে জানা চাই,—knock and the door will be opened.

স্বার্থগৃধ্নু দুরন্ত সভ্যতা!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সান্ত্বনার স্নিগ্ধ বাণী সৌহার্দ্দ্যের শান্ত সুর,
ভ্রাতৃত্বের স্নেহ অনুরাগ
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দিনে ছিলনাক' লেশ মাত্র ভাগ,
নৃশংস হত্যার মোহে লুণ্ঠনের সমারোহে।
রক্তস্নাত দিক্‌চক্রবালে
হিংসার কুটিল মেঘে ভয়াতুর দিবস-শর্ব্বরী
শ্রেণী-স্বার্থ কূটচক্রজালে লক্ষ নর হত্যা করি
গৃহহারা পথ হারা অনাথার অভিশাপ বরি
হে পাশবিক সভ্যতা! এ কি রূপে দিলে দেখা তুমি
দগ্ধ করি মোর জন্মভূমি!

স্বজন বিরহে আজ জীবনের ভগ্ন ঘাটে
অসহায় শিশু সম আমি,
লক্ষ লক্ষ অভাগার আর্ত্তনাদ শুনি দিবাযামী।
আশ্রয় খুঁজিয়া মরে প্রাণধারণের তরে
আহত বিহঙ্গ অবিরত;
বিরাট ধ্বংসের বুকে রাজপথ বিধুর বিনত।

এ বঙ্গের রাজধানী ভস্মীভূত বহ্ন্যানলে,
শবস্তূপে রাজ্যলক্ষ্মী কাঁদে।
ঈদের রজনী যায় মৌন অশ্রু বরিষণ সাথে,
চাঁদে কালো ঘন ছায়া পড়ে।

স্বদেশের ভাগ্যাকাশে তারা-দল ওঠে ত্রাসে;
কে জানে কখন বন্ধু! আশ্বিনের রুদ্র ঝড়ে
কেতকীর বনে ঘোর এনে দিবে পূতিগন্ধময়
প্রেতের উল্লাস রুদ্ধশ্বাস ভরা পথে!
সোনার সংসার ভাঙি কুলবধূ এনে গৃহ হ'তে
করেছ কতনা হত্যা! কত শিশু-শোণিতের স্রোতে
ভাসায়েছ দেশ! একি তব পৈশাচিক পরিচয়
স্বার্থগৃধ্নু দুরন্ত সভ্যতা!
বীভৎস উগ্রতা তব নির্ব্বাসিত করে মানবতা।

পাশাপাশি ভিন্নধর্ম্মী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে যারা
শান্তির স্নিগ্ধতা লয়ে সখ্যসূত্রে করে এলো বাস,
অবিশ্বাসে ত্রস্ত হ'ল তারা।
এ বঙ্গের জলবায়ু মৃত্তিকারে নিয়ে বারো মাস
করেছে সংসার। এই শ্যামা জননীর স্তন্যপানে
হয়েছে বর্দ্ধিত,—দুরন্ত সভ্যতা! কেন পশ্বাচার
শিখায়েছ শান্তি-স্নিগ্ধ নিরীহ মানব-প্রাণে?
ইতিহাসে র'বে লেখা কলঙ্কিত তব ব্যবহার;
ভাবী যুগ-যাত্রাপথে দিলে বন্ধু! অশ্রু-অন্ধকার
তব দিবা-স্বপ্ন অবসানে।

আঁধারের দূরবীন

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নৈসর্গিক ঘটনাবলীর খুবই সামান্য অংশ মানুষের অনুভূতির কাছে ধরা পড়ে। বিধাতা চাহিয়াছিলেন তাঁহার সৃষ্টিকে 'বিচিত্র ছলনা-জালে ঢাকিয়া' রহস্যঘন করিয়া রাখিতে, মানুষের বোধের শক্তি তাই সীমাবদ্ধ। আমরা চোখে যাহা দেখি,

সুপারসকোপ
আমেরিকায় ব্যবহৃত আঁধারের দূরবীন

কর্ণে যাহা শ্রবণ করি, স্পর্শ করিয়া যাহা অনুভব করি তাহার বাহিরেও রহিয়াছে কত না ঘটনা—মানুষের ইন্দ্রিয়কে তাহারা ফাঁকি দিয়া চলে। শুধু বিধাতার দান লইয়া দুরাকাঙ্ক্ষ মানব চিরদিন তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই। যান্ত্রিক আবিষ্কারের অগ্রগতি মানুষের বোধের সীমাকে বহুল পরিমাণে বর্ধিত করিয়াছে, তাই প্রকৃতির বিধানে যাহারা গোপন সঞ্চারে আনাগোনা করিত তাহাদের অনেকে ধরা পড়িয়াছে যন্ত্র-ফাঁদে। মানুষের দৃষ্টি আজ প্রসারিত হইয়াছে দূরত্বের বাধা ও আঁধারের অন্তরালকে অগ্রাহ্য করিয়া।

গ্যালিলিও দূরবীন নির্মাণ করিয়াছিলেন সে কাহিনী পুরাতন। সেদিন সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষ এক ধাপ অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল সত্য কিন্তু তখনও বিধাতা বোধ হয় আপাত পরাজয় সত্ত্বেও মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিলেন। মানুষের যান্ত্রিক চক্ষু দূরবীন, দূরকে নিকটে লইয়া আসিতে সক্ষম হইয়া থাকিলেও এই সাফল্যের গণ্ডী ছিল সঙ্কীর্ণ। আমাদের দৃষ্টিশক্তির মূল কথা আলো। দূরবীনের সাহায্যে এমন সব বস্তুকেই দেখা সম্ভব ছিল যাহারা নিজেরা জ্যোতিষ্মান হইয়া কিংবা অন্য কোন আলোর উৎস হইতে আলো গ্রহণ করিয়া থাকিলেও দূরত্বের জন্য উহাদের দেহ হইতে আগত স্বল্প আলোক আমাদের চক্ষুতে কোন সাড়া জাগাইতে সক্ষম ছিল না; দূরবীনের মধ্যবর্তিতায় এই জাতীয় দূরের বস্তু হইতে আগত আলো একসঙ্গে বেশী করিয়া ধরিয়া লইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু আলো যেখানে নাই নয়ন সেখানে অন্ধ, দূরবীনের সহায়তা সেখানে নিষ্ফল ও অর্থহীন। এত করিয়াও মানুষ প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বিরতি নাই, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি পরাভব মানিতে জানে না। তাই মানুষের চোখের শক্তি আজ অন্ধকারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে না। বাইনাকুলার যন্ত্রের মতনই একটি যন্ত্র চক্ষুতে লাগাইয়া মানুষ আজ অন্ধকারের ভিতরেও দূরবর্তী বস্তু দেখিতে পাইতেছে। হেড লাইট ছাড়াও মোটর গাড়ী অন্ধকারের ভিতর ছুটিয়া চলিতেছে।

অন্ধকারে কোন বস্তুকে দেখিতে হইলে তাহার উপর আলো নিক্ষেপ করিতে হয়। আলো নিক্ষেপের ব্যবস্থা অবশ্য ক্রমে উন্নত হইয়াছে এবং তাহার ফলে অনেক দূরে অবস্থিত বস্তুর উপরেও আলো ফেলিয়া অন্ধকারকে আংশিক জয় করা সম্ভব হইয়াছে। সার্চ লাইট, টর্চের আলো ইহারা এমনই অন্ধকারকে পরাভূত করিবার উপায় স্বরূপ এবং এগুলির দ্বারা অন্ধকারে অবস্থিত বস্তুকে দৃষ্টিগোচর করা সম্ভব। সন্ধানী আলোর সহযোগিতায় অন্ধকারেও পশুপক্ষী শিকার করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। অনুরূপ প্রক্রিয়াকে অন্ধকার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শত্রুর উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য ব্যবহার করিতে গিয়া দেখা গেল যে উহা সর্বথা কার্যকরী নহে। কারণ সন্ধানী আলো ফেলিবামাত্র অপর পক্ষ আততায়ীর অস্তিত্ব টের পাইয়া গেল এবং আত্মরক্ষার সুযোগ পাইল। অন্ধকারের গোপনতার ভিতর শত্রু নিপাত করিতে হইলে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় হইতে পারে যদি আক্রমণকারীর দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মানুষের চক্ষুর সে ক্ষমতা কোথায়? কোন কোন শ্বাপদ নাকি আঁধারেই ভাল দেখে। প্রাকৃতিক বিধানে মানুষ কিন্তু সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। কিন্তু এতকাল পরে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বিধাতার পরিকল্পনা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অথবা বলিতে পারি, পরস্পরের সহিত বিবদমান তথাকথিত আধুনিক সভ্য মানুষ শ্বাপদের বৈশিষ্ট্যটুকুও আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। পশুর মত হানাহানি যেখানে করিতে হইবে সেখানে পশু-ধর্ম পালন না করিলে চলিবে

ইনফ্রা-রেড দূরবীনের কার্য-প্রণালী

কেন ? তাই গোপনে শত্রুকে আঘাত করিবার জন্তই আবিষ্কৃত হইয়াছে আঁধারের দূরবীন।

'বিপুলা এ ধরণীর কতটুকু জানি'—বিধিদত্ত চক্ষুর্দ্বয়ের সাহায্যে মানুষ যত কিছু দেখিয়া থাকে তাহার ভিতরে সৃষ্টির অনেক রহস্যই বাদ পড়িয়া যায়। ঈথর-সমুদ্রে ছোট বড় বিভিন্ন মাপের ঢেউগুলি যে শক্তি বহন করিয়া লইয়া যায় তাহাদের মধ্যে গোটাকয়েক মাত্র মানুষের চোখে আসিয়া সাড়া জাগাইয়া বিচিত্র বর্ণবিভূতি সৃষ্টি করে। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও অনেক তরঙ্গ আছে চক্ষুদ্বারা যাহার অস্তিত্ব আমরা টের পাই না। প্রদীপ যখন জ্বলে কিম্বা সূর্য যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন প্রদীপ বা সূর্যের দেহাভ্যন্তরে পরমাণুর যে কম্পন আরম্ভ হয় তাহাই উদ্বেলিত করে ঈথর-সমুদ্রকে এবং পরমাণুর শক্তি ঢেউয়ের মালায় বিচ্ছুরিত হয় দূর হইতে দূরান্তরে। পরমাণুর কাঁপুনিরও রকমফের আছে, কখনও উহারা কাঁপে দ্রুততালে, কখনও বা ঠাট বিলম্বিত। ইহারই ফলে ঢেউয়ের আকৃতি কোনটি ছোট, কোনটি বড়। এই ঢেউয়ের কতকগুলি মাত্র চোখে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাহাদের নাম আলো। ঢেউয়ের আকৃতি অনুযায়ী অনুভূতির পরিবর্তন হয়, কোন আলো সবুজ, কোনটি লাল, হলদে বা বেগুনী। একই সঙ্গে সপ্ত রশ্মির মিলিত অনুভূতিই সাদা আলো। কিন্তু এই দৃশ্যমান আলোর ঢেউ ছাড়াও ঈথরে আরও ছোট বড় তরঙ্গের উদ্ভব সম্ভব। সূর্য কেবল আলো দেয় না, সূর্য হইতে তাপও বিকীর্ণ হয়, যে আগুনে আলো উৎপন্ন হয়, সেখান হইতে তাপও পাওয়া যায়। আলো ও তাপ মূলতঃ একই ব্যাপার—পরমাণুর কম্পনের ফলেই উহাদের উৎপত্তি। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ স্পন্দনে ঈথরে যেসব ঢেউ উঠে উহাদের মধ্যে যেগুলি বড় উহারাই তাপের তরঙ্গ। ইহাদের চেয়ে যাহারা ছোট তাহারা আলোর তরঙ্গ। ইহা অপেক্ষাও আরও ছোট ঢেউ আছে তাহারা আলট্রা ভায়লেট রশ্মি, রণ্টজেন রশ্মি, গামারশ্মি প্রভৃতি নামে পরিচিত। দৃশ্যমান আলোর রশ্মির চেয়ে যাহাদের তরঙ্গ বড় সেই তাপের রশ্মির বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ইনফ্রা-রেড রশ্মি অর্থাৎ লাল উজানী আলো। ইনফ্রা-রেড তরঙ্গের চেয়েও বড় তরঙ্গে প্রবাহিত হয় বেতাররশ্মি। তাপ ও আলোর তরঙ্গ মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, বাকী সবগুলিই মানুষের ইন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিয়া চলে। যন্ত্র-কৌশলে উহাদের যাওয়া-আসা আমরা জানিয়া লইতে পারি। পদার্থের পরমাণুর স্পন্দন হইতে উদ্ভূত যে শক্তিস্রোত ঈথরে তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত হয় উহারা মূলতঃ একজাতীয় ও সমধর্মী। চক্ষুতে-আপাত-অদৃশ্য ইনফ্রা-রেড রশ্মিকে অবলম্বন করিয়া মানুষের দৃষ্টিকে প্রেরণ করা হইয়াছে অন্ধকারের ভিতর দিয়া।

সূর্যালোকে যে ইনফ্রা-রেড রশ্মি থাকে সে জাতীয় তাপের রশ্মি যান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও উৎপন্ন করা সম্ভব। যেমন করিয়া সন্ধানকার্যের জন্ত দৃশ্য আলোককে প্রতিফলকের সাহায্যে দূরে প্রেরণ করা হয় সেইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা ইনফ্রা-রেড রশ্মিকেও দূরে অবস্থিত কোন বস্তুর উপরে নিক্ষেপ করা যায়। দৃশ্য আলোর মতই এই অদৃশ্য রশ্মিও বস্তুটির উপর হইতে ঠিকরাইয়া সকল দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই বিক্ষিপ্ত রশ্মি-গুলিকে যন্ত্রের সাহায্যে দৃশ্যমান করিয়া তোলাই আঁধারের দূরবীনের কাজ।

দূরবীনে যখন আমরা কোন দূরবর্তী বস্তুকে দেখি তখন ঐ বস্তু হইতে যে আলোর রশ্মিগুলি চতুর্দিকে ছড়াইয়া যায় তাহারই কতকগুলি দূরবীনেও প্রবেশ করে। দূরবীনের সম্মুখে যে লেন্সখানা থাকে উহার কার্যকারিতায় এই আলো কেন্দ্রীভূত হইয়া দূরবীনের অভ্যন্তরে একটি উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। লেন্সের কাজ মূলতঃ লক্ষ্যবস্তু হইতে বেশী আলো সংগ্রহ করা। এমনই ব্যবস্থা রহিয়াছে আঁধারের দূরবীনে। একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, লালউজানী বা

ইনফ্রা-রেড রশ্মি অদৃশ্য হইলেও উহারা দৃশ্য আলোকের মত গুণবিশিষ্ট। উহারাও কোন বস্তুর উপর পতিত হইয়া বিক্ষিপ্ত বা প্রতিফলিত হয়, কিংবা লেন্সের ভিতর দিয়া চালিত করিয়া উহাদিগকেও আলোকরশ্মির মত 'ফোকাস' বা কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব। আঁধারে ব্যবহৃত দূরবীনের কয়েকটি পৃথক পৃথক অঙ্গ আছে। ইহার একটি অংশে অদৃশ্য লালউজানী আলো উৎপন্ন করিয়া তাহাকে সার্চলাইটের মত প্রতিফলকের সাহায্যে লক্ষ্য বস্তুর উপর ফেলা হয়। লক্ষ্যবস্তু হইতে প্রতিফলিত হইয়া যে রশ্মিগুলি ফিরিয়া আসে তাহাদিগকে সাধারণ দূরবীনের মতই লেন্সের সাহায্যে ধরিয়া লওয়া হইল। লেন্সদ্বারা কেন্দ্রীভূত রশ্মি অতঃপর পতিত হয় একটি বিশেষরূপে নির্মিত পর্দার উপরে। সাধারণ দৃশ্যমান আলো এই প্রকার লেন্সদ্বারা কেন্দ্রীভূত হইলে কেন্দ্রস্থানে লক্ষ্যবস্তুর একটি ক্ষুদ্র অথচ খুব উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব রচনা করিত এবং সেই প্রতিবিম্বের আলো দূরবীনের পশ্চাদ্‌ভাগের লেন্সে প্রবেশ করিয়া বৃহত্তর প্রতিবিম্বে পরিণত হইত ও লেন্সের পিছনে চোখ রাখিয়া উহাকে দেখা যাইত। ইনফ্রা-রেড রশ্মিরও অনুরূপ অবস্থা ঘটে কিন্তু সম্মুখস্থ লেন্সের প্রভাবে উহার যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় উহা মানুষের চোখে ধরা পড়িবার মতন নয়। সেইজন্য পিছনের লেন্সে পাঠাইবার পূর্বে ইহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার জন্য অন্য প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়।
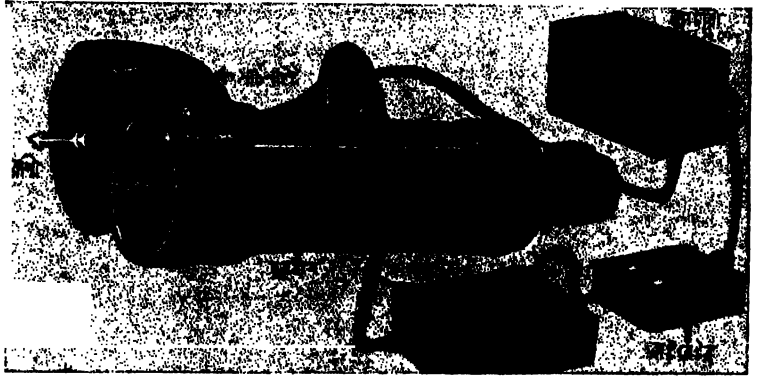
ইনফ্রা-রেড দূরবীনের বিভিন্ন সরঞ্জাম

সোডিয়ম পটাসিয়ম, সিজিয়ম জাতীয় কতকগুলি পদার্থ আছে উহাদের বিশেষ গুণ এই যে উহাদের উপর সাধারণ দৃশ্যমান আলো ফেলিলে উহারা ইলেকট্রন মুক্ত করিয়া দেয়। দৃশ্য আলোক ভিন্ন লালউজানী আলোর এ-ধরণের ক্ষমতা ছিল না বলিয়াই জানা ছিল। সম্প্রতি উদ্ভাবিত আঁধারের দূরবীনকে পুরাপুরিভাবে কার্যকরী করিবার জন্য এমন ধরণের আবিষ্কার করিতে হইয়াছে যাহাতে ইনফ্রা-রেড রশ্মির প্রভাবেও কোন না কোন পদার্থ হইতে ইলেকট্রন মোচন করা সম্ভব হইয়াছে। এই আবিষ্কারের স্বরূপ এখনও সম্যক্ জানা যায় নাই—তবে খুব সম্ভব ইনফ্রা-রেড রশ্মি প্রভাবে ইলেকট্রন উৎপন্ন করিবার জন্য সিজিয়ম ব্যবহৃত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত লেন্সদ্বারা কেন্দ্রীভূত ইনফ্রা-রেড রশ্মির প্রতিবিম্বকে এবম্বিধ পদার্থে নির্মিত পর্দার উপরে ফেলা হয়। এই পর্দার নাম ফোটো-ক্যাথোড। লক্ষ্যবস্তুর যে স্থান হইতে যে পরিমাণ রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া আসিয়াছে ফোটো-ক্যাথোডের উপরকার ইনফ্রা-রেড প্রতিবিম্বের অনুরূপ অংশে তদনুযায়ী রশ্মি কমবেশি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ইনফ্রা-রেড রশ্মির তীব্রতা অনুযায়ী পর্দার বিভিন্ন অংশ হইতে নির্গত] ইলেকট্রনের সংখ্যা কমবেশি হইয়া থাকে। পর্দা হইতে বিমুক্ত ইলেকট্রন-স্রোতকে শক্তিশালী (সতর হাজার ভোল্ট) তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে ফেলিয়া সম্মুখ দিকে চালিত করা হয়। এই ইলেকট্রন রশ্মিকে আবার কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে।

তড়িৎ বা চৌম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে ইলেকট্রন স্রোতকে বাঁকানো বা নোয়ানো যায়। এই উদ্দেশ্যে বিশেষরূপে স্থাপিত তড়িৎ-ক্ষেত্রের নাম বৈদ্যুত লেন্স। যেমন করিয়া আলোর রশ্মিকে কাচের লেন্সের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করা হইয়া থাকে তেমনি ইলেকট্রন রশ্মিকেও চৌম্বক লেন্সের প্রভাবে আবার অন্য একটি পর্দার উপরে কেন্দ্রীভূত করা হইয়া থাকে। এই পর্দায় এমন জিনিষ থাকে যাহারা ইলেকট্রনের আঘাতে আলোক প্রদান করে। যেখানে ইলেকট্রন আসিয়া ধাক্কা খায় সেখানেই দৃশ্য আলোক উৎপন্ন হয় কিন্তু ইলেকট্রনের সংখ্যানুযায়ী আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়ে কমে। এই আলোকের জন্য পর্দার উপরে একটি ছবি ফুটিয়া উঠে। মনে রাখিতে হইবে পর্দার ছবির আলোকবিন্যাসের জন্য দায়ী ইলেকট্রন রশ্মি, আবার ইলেকট্রন রশ্মির নির্গমন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে লক্ষ্যবস্তু হইতে প্রতিফলিত ইনফ্রা-রেড রশ্মিদ্বারা। সুতরাং পর্দায় আলোছায়ার যে ছবি তৈয়ারি হইতেছে উহা লক্ষ্য-বস্তুর অবিকল প্রতিকৃতি বটে।

সাধারণ দৃশ্য আলোকের দূরবীনের সঙ্গে এই দূরবীনের কার্যপ্রণালীর ও বিভিন্ন অংশের সাদৃশ্য থাকিলেও ইনফ্রা-রেড রশ্মিকে ইলেকট্রনরশ্মি ও তৎপর আলোতে রূপান্তরিত করিবার জন্য ইহার সঙ্গে একটি অতিরিক্ত অংশ জুড়িয়া দিতে হইয়াছে। পর্দায় যে আলোছায়ার ছবি ফুটিয়া উঠে উহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার জন্য যে ব্যবস্থা তাহা সাধারণ দূরবীনে ব্যবহৃত পশ্চাদ্‌ভাগের লেন্সের ব্যবস্থার অনুরূপ।

বিগত মহাসমরের সময়ে জার্মেনী এবং অন্যান্য দেশে এই প্রকার দূরবীন নির্মিত হইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে
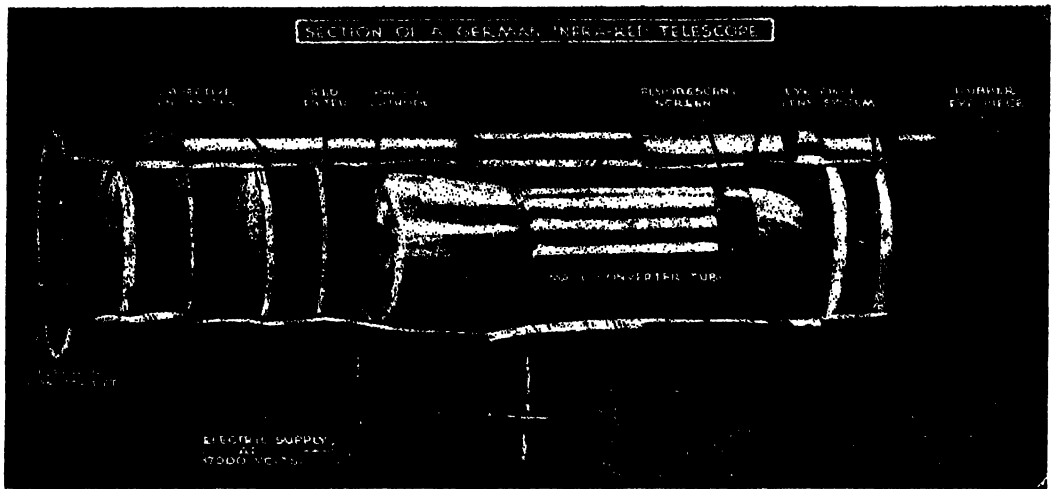
জার্মান ইনফ্রা-রেড দূরবীনের অভ্যন্তর ভাগ

অন্ধকারে শত্রুকে আক্রমণ করা সম্ভব হইয়াছিল। রাইফেল, মেশিনগান কিংবা ট্যাঙ্কের সঙ্গে এইগুলিকে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাইফেলে ব্যবহৃত যন্ত্রের নামও দেওয়া হইয়াছিল 'ভ্যামপীর'। সকল সরঞ্জামসহ ভ্যামপীরের ওজন ছিল পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড। এক জন পদাতিক সৈনিকের পক্ষে এই ভার বহন কষ্টসাধ্য ছিল নিশ্চয়ই; কিন্তু ইহার অন্য কোন উপায়ও ছিল না, কারণ দূরবীনকে চালু করিবার জন্য কয়েকটি বিভিন্ন যন্ত্র দরকার। ইনফ্রা-রেড রশ্মি ও সতর হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিবার জন্য একটি বার ভোল্টের ব্যাটারী ও ভাইব্রেটর যন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইগুলি বহন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ভ্যামপীর যন্ত্রের সাহায্যে সত্তর গজ দূর হইতে অন্ধকারে বন্দুকের নিশানা করা চলে। মোটর গাড়ী বা ট্যাঙ্ক শুধু এই দূরবীনের সাহায্যে সম্পূর্ণ অন্ধকারের ভিতরেও ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে চলিতে পারে। ট্যাঙ্কের সহিত ইনফ্রা-রেড সার্চলাইট সংযোগ করিয়া হাজার গজ দূর হইতে শত্রুর সন্ধান করা সম্ভব। সমুদ্রোপকূলে আরও বৃহদাকার সার্চ-লাইটের সাহায্যে সাত মাইল দূরবর্তী জাহাজকে আক্রমণ করা যাইতে পারে।

জাপানী যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যরাও এই প্রকার দূরবীন ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ওকিনাওয়ার যুদ্ধে নৈশ আক্রমণ-কার্যে এই দূরবীন সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ইনফ্রা-রেড বা তাপরশ্মির সাহায্যে ফোটো তোলার কাজ ইতিপূর্বে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার ফলে কুয়াসা, ধোঁয়া কিংবা ধূলাবালির অন্তরালে দূরবর্তী অস্পষ্ট দৃশ্যের সুন্দর ফোটো তোলা চলিত। ইনফ্রা-রেড দূরবীনের আবিষ্কারে এক্ষণে এই সকল দৃশ্য চোখেই দেখা যাইবে। সুতরাং সামরিক প্রয়োজনীয়তায় এই আবিষ্কারের সূচনা হইয়া থাকিলেও সাধারণ মানুষের জীবনেও ইহার উপযোগিতা আছে বলিয়া মনে করা হইতেছে। পুলিসের পক্ষে অন্ধকারে চোরডাকাত প্রভৃতির উপর নজর রাখিতে বা সন্ধান করিতে এই যন্ত্র সাফল্যের সহিত ব্যবহার করিবার সুযোগ আছে।

সার্জেণ্ট শিক্ষা-পরিকল্পনার কয়েকটি দিক

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

ভারতের শিক্ষা-পরিকল্পনার ইতিহাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের রিপোর্টের (সার্জেণ্ট-স্কীমের) মত এত ব্যাপক পরিকল্পনা পূর্বে রচিত হয় নাই। প্রায় দুই শত বৎসরকাল ইংরেজ রাজত্ব চলিতেছে, ইহার মধ্যে ভারতবাসীর শিক্ষা-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বহু রিপোর্ট রচিত, প্রকাশিত এবং লাল ফিতার বন্ধনে সমাধিস্থ হইয়াছে। এই সকল শিক্ষা-পরিকল্পনা উডের ডেসপ্যাচ হইতে স্যাডলার কমিশন ও মিস্ সাহেবের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে রিপোর্ট পর্যন্ত—ভারতীয় শিক্ষার কোন কোন অংশে আলোক সম্পাত করিয়া যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কার সাধনের নির্দেশ করিয়াছিল। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষের শিক্ষাকে একটি ক্রমগতিশীল, নিরবচ্ছিন্ন ধারা (continuous process) মনে করিয়া জীবনের প্রায় সকল স্তরের শিক্ষাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। তাই দেখা যায় নার্সারি শিক্ষা হইতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, টেকনিকাল ও চারুশিল্প শিক্ষা, শিক্ষকের ট্রেনিং, গণশিক্ষা, ইস্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য, মূক-বধির প্রভৃতি বিকলাঙ্গ ছাত্রদের শিক্ষা, ক্রীড়া-কৌতুক, যুবকদিগের কর্মপ্রাপ্তিতে সহায়তা করিবার জন্য নিয়োগ-কমিটি (Employment Bureaux) এবং শিক্ষাপরিচালন (administration) সমস্যা বিবেচনা করিয়া শিক্ষাবোর্ড ভারতবাসীর জাতীয় শিক্ষাকে সমগ্রভাবে ধরিয়া সুনির্দিষ্ট রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহারা ইহার বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কেহ কেহ পরিকল্পনার ত্রুটি হিসাবে দেখাইয়াছেন যে ইহাতে ধর্মশিক্ষা, বালিকাদিগের শিক্ষা, পরীক্ষা গ্রহণ প্রণালী আলোচিত হয় নাই।

এই পরিকল্পনাকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে, শিক্ষাসংক্রান্ত সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ইহাতে আশা করিলে ভুল করা হইবে। তাহা ছাড়া পরিকল্পনা কাগজে কলমে নিখুঁত হইলেই আপনা হইতেই তাহা সার্থক হইয়া উঠে না; তাহাকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়া অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করাই প্রকৃত বাস্তববাদীর কর্মপ্রণালী। ভারতের ন্যায় বহুধর্মের দেশে বিদ্যালয়ে দলগত ধর্মশিক্ষার প্রবর্তন এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। শিক্ষাবোর্ড বিবেচনা করিয়া পরে এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিবেন। সমগ্র পরিকল্পনা বিচার করিয়া এ কথা অসংকোচে বলা যায় যে, ভারতের জাতীয় শিক্ষার ব্যাপক কাঠামো রচনার কাজে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ড যে বলিষ্ঠ প্রেরণার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার যোগ্য। বোর্ডের ৪১ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জন ইউরোপীয় এবং ২৭ জন ভারতীয়।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ইহার আন্তরিকতা। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ, ইহার অধিবাসীরা দারিদ্র, অধিকাংশ অশিক্ষিত, বিদ্যার অভাবে ম্লান মূক, অর্থাভাবে নিরানন্দ দুঃখময় জীবনযাপনে অভ্যস্ত, ইহাদিগকে স্বাস্থ্যে সম্পদে বলীয়ান করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষাবিস্তার দ্বারা দেশে নবজীবন সঞ্চার করিতে হইবে। পরিকল্পনার ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে, অর্থাভাবের ওজুহাতে বহুদিন হইতে এদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা বিরাজ করিতেছে। জগতের অন্যান্য সভ্য স্বাধীন দেশ যখন শিক্ষাপ্রসার দ্বারা প্রজা-সাধারণকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে, তখন ভারতবর্ষ যদি শিক্ষা প্রসার সম্বন্ধে সচেতন না হয় তবে চিরদিন তাহাকে সকলের পিছনে পড়িয়া থাকিতে হইবে। ভারতের সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে-কোন সভ্য দেশের পক্ষে যেরূপ শিক্ষা ন্যূনতম প্রয়োজন তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায়। ইহার ফল সুদূর-প্রসারী এবং ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ। ভারতের ভাবী নাগরিকগণ যখন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আবশ্যক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কতক বা মাধ্যমিক ইস্কুলে, শিল্প বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া দেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতির কাজে ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিবে তখন ভারতবর্ষের অবস্থা বর্তমানের মত ম্রিয়মাণ, হীন থাকিবে না। ভারতবর্ষ যদি শিক্ষায় অগ্রসর ও আর্থিক অবস্থায় সচ্ছল হইয়া উঠে তবে তাহার ফল শুধু ভারতের সমাজের উপরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। কাশ্মীর ও জম্মুস্টেটের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ কে জি সৈয়িদীন বলিয়াছেন :

> You cannot possibly keep the one-fifth of the human race—once it has been educated—in poverty, ill-health and political subjection. They will demand—and get—their legitimate cultural, social and material rights.

একবার শিক্ষিত হইয়া উঠিলে পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ জনগণকে দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা ও রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতার মধ্যে দাবাইয়া রাখা সম্ভব নয়। তাহারা তাহাদের ন্যায়-সঙ্গত সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও জাগতিক অধিকার দাবি করিবে এবং আদায় করিয়া ছাড়িবে।

এ দেশের আর্থিক দুরবস্থা বিবেচনা করিয়া ভারতের কল্যাণের জন্য জনসাধারণের যে শিক্ষার নিম্নতম প্রয়োজন (Minimum requirement) তাহারই বিষয় পরিকল্পনায় আলোচিত হইয়াছে। তবু দেখা গিয়াছে, পরিকল্পনা পূর্ণভাবে চালাইবার সময় বার্ষিক খরচ পড়িবে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। প্রজার পালন এবং তাহার সর্ববিধ উন্নতির ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য; প্রজার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করাও গবর্ণমেণ্টের নৈতিক দায়িত্ব। ভীরু অর্থনীতিক হয়ত এত মোটা টাকার অঙ্ক দেখিয়া চমকিয়া উঠিবেন, কিন্তু অন্যান্য দেশের শিক্ষাবাবদ ব্যয়ের তুলনায় ৩০০ কোটি টাকা খুব বেশী নয়। ভারতবর্ষে শিক্ষার খরচ জনসংখ্যার মাথাপিছু বার্ষিক ।১৫, ইংলণ্ডে বার্ষিক খরচ অধিবাসীর মাথাপিছু ৩২৸০। ব্রিটিশ ভারতে প্রায় ৩০ কোটি লোকের জন্য বৎসরে সরকারী তহবিল হইতে খরচ হয় ১৬॥ কোটি টাকার মত; কেবল বৃহত্তর লণ্ডনেরই শিক্ষার ব্যয় ইহার চেয়ে বেশী! ব্রিটেনের সাড়ে চার কোটি অধিবাসীর জন্য বার্ষিক খরচ হয় ১৫০ কোটি টাকা। ইহার উপর যুদ্ধোত্তর যুগে আরও ১০০ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ করা হইয়াছে। কাজেই টাকার প্রশ্ন তুলিয়া অত্যধিক খরচের ওজুহাতে পরিকল্পনাকে চাপা দেওয়া চলিবে না। এতদিন সস্তার শিক্ষাব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে; সস্তার যে অবস্থা হয় এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। মিঃ সার্জেণ্ট বলিয়াছেন যে, ভারত যদি প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থা চায় তবে তাহাকে অন্যান্য দেশের উদাহরণ অনুসরণ করিয়া যথোপযুক্ত ব্যয় করিতেই হইবে। এখানেই হইবে সরকারের সদিচ্ছার অগ্নিপরীক্ষা।

শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্যও শিক্ষাবাবদ খরচের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শিক্ষা দেশবাসীর পক্ষে বিলাসমাত্র নয়; ইহা সমাজের এবং দেশের সর্বপ্রকার উন্নতির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। অন্যান্য স্বাধীন দেশে শিক্ষার খরচকে মনে করা হয় জাতীয় কল্যাণকামনায় মানুষ তৈয়ার করার জন্য অগ্রিম দাদন (national investment); দেশ শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ টাকা খরচ করে, শিক্ষিত নাগরিক তাহাদের প্রতিভাকে পূর্ণতা দিবার সুযোগ পাইয়া কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধনের মধ্যে দিয়া প্রতিদানে তাহা বহু গুণ ফিরাইয়া দেয়। আমাদের দেশের অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দুইয়ে একটি দুষ্টচক্র রচনা করিয়াছে। ভারতবাসী অশিক্ষিত—কারণ দরিদ্র বলিয়া তাহার অধিবাসীরা শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিতে পারিতেছে না। ভারত দরিদ্র, কারণ অশিক্ষিত বলিয়া জনগণ অর্থোপার্জন করিবার সুযোগ পাইতেছে না। সাহসিকতার সঙ্গে এই দুষ্টচক্র ভেদ করিয়া জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া না তুলিতে পারা পর্যন্ত এই আর্থিক অসাচ্ছল্য ও অসহায় অবস্থা অনন্তকাল ধরিয়াই চলিতে থাকিবে, কেননা, যাহারা দেশের প্রকৃত ধন উৎপাদক তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া প্রভূত অর্থোৎপাদনে নিয়োজিত না করা হইলে আর্থিক সচ্ছলতা কোথা হইতে আসিবে? দেশবাসীর সুশিক্ষার জন্য শিক্ষাখাতে অর্থ দাদন না করিয়া কোন দেশই জাতীয় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। লর্ড ওয়াভেল ভারতের বড়লাট হইয়া আসিবার প্রাক্কালে বিলাতে এক ভোজনসভায় ভারতবাসীর উদ্দেশে আশার বাণী প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধকালীন আপদ দূর করিবার জন্য সমর-রত দেশসকল উন্মত্তের মত অকাতরে অর্থ ব্যয় করে কিন্তু শান্তিকালীন আপদ (evils of peace) যথা অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, রাস্তাঘাটের অসুবিধা, দারিদ্র্য প্রভৃতি দূর করিবার জন্যও অনুরূপভাবে অর্থ ব্যয় করা কর্তব্য। এতৎসত্ত্বেও ভারতের সকল রকম 'আপদ' সিন্ধবাদ নাবিকের ঘাড়ে অপদেবতার মত অচল হইয়া বিরাজ করিতেছে।

কোন পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে রচিত হইলেই তাহা উপকারে আসে না। মানুষের কল্যাণে তাহাকে বাস্তব রূপ দেওয়াতেই পরিকল্পনার সার্থকতা। ইহার জন্য যেমন সহানুভূতিশীল, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গবর্ণমেণ্টের কর্তব্যনিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক তেমনি প্রয়োজন জনসাধারণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও সহযোগিতা। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার স্থলে ব্যাপক এবং দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ শিক্ষার জন্য তীব্র আন্দোলন এখন পর্যন্ত দেশবাসী আরম্ভ করে নাই। সত্য বটে, নেতাদের মধ্যে অনেকে বলিয়াছেন দেশের গবর্ণমেণ্ট লোকায়ত্ত না হইলে জাতিগঠনমূলক কোন কাজ আশানুরূপ ভাবে করা যাইবে না, অপর দেশ শোষণকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মাত্রই জানে শাসিতের অজ্ঞতার মধ্যেই শাসকের শক্তি নিহিত; কাজেই পরাধীন জাতিকে শিক্ষায় উন্নত করিয়া তোলার অর্থই হইল আপন হাতে সাম্রাজ্যবাদের মূল উচ্ছেদ করা। এরূপ অবস্থায়, রাজনৈতিক নেতাদিগের মতে, স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করাই সর্বপ্রধান কর্তব্য। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় ভাবিয়া দেখিবার আছে। স্বাধীনতা ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ হইলে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কার্যের অবাধ সুযোগ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু স্বরাজের মধ্যে এমন কোন যাদুদণ্ড নাই যাহার প্রভাবে রাতারাতি সকল সমস্যার সমাধান হইয়া ধরায় স্বর্গধাম স্থাপিত হইতে পারে। বরং বহু জটিল এবং অচিন্তিতপূর্ব সমস্যা বাঁধভাঙা বন্যার জলের মত নূতন গবর্ণমেণ্টকে চারিদিক হইতে অভিভূত করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে।

স্বরাজ লাভের পর জাতিগঠনমূলক কাজে অগ্রসর হইবার আশায় অপেক্ষা করিয়া না থাকিয়া পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করা হইলে অধিকতর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইবে। এই প্রসঙ্গে সার মরিস গায়ার নিখিল-ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে যে সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল অভাব অসুবিধা হাওয়ায় মিলাইয়া যায় না, বা তাহাদের মীমাংসা সহজ হইয়া আসে না, এবং পূর্ব হইতে প্রস্তুত না থাকিলে অনেক সময় যে নবঅর্জিত স্বাধীনতা বিপন্ন ও দেশ বিশৃঙ্খলার কবলে নিপতিত হয় তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ সার মরিস বর্তমানের দুইটি দেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি চীন দেশ। ওখানে মহা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে এক প্রাচীন রাজবংশের ক্ষমতা লোপ করিয়া গণতন্ত্র (রিপাব্লিক) স্থাপিত হইল, কিন্তু এরূপ বিরাট পরিবর্তনের সহিত সংশ্লিষ্ট জাতিগঠন সংক্রান্ত অন্যান্য পরিবর্তনের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দেশবাসীর সম্মুখে না থাকায় বা তদনুযায়ী কোন কাজ পূর্বাহ্ণেই আরম্ভ না হওয়ায় প্রায় দুই দশক ধরিয়া গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী অশান্তি লাগিয়াই আছে। নূতন অবস্থার মধ্যে সকল দিক সামঞ্জস্য করিয়া এক মহাজাতি গঠন করা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া দেশকে উন্নত ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া গড়িয়া তোলা এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, চেকোস্লোভাকিয়া। অষ্ট্রিয়ার রাজবংশের অধীন থাকা কাল হইতেই এদেশে স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠে এবং বেনেস, ম্যাসারিক প্রভৃতি দূরদর্শী নেতার পরিচালনায় স্বরাজসাধনার অঙ্গ হিসাবে ভবিষ্যৎ স্বাধীন রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারিত ও অনুসৃত হইতে থাকে। এই ভাবে পরাধীন থাকা অবস্থাতেই চেকগণ স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে। ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই কোনরূপ অন্তঃকলহ, বিশৃঙ্খলা বা সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি না করিয়াই তাহারা ইউরোপের প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলির অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইল।

অন্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে আমাদিগকে এখন হইতেই কর্মতৎপর হইতে হইবে। স্বরাজ লাভের পর সকল সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া ভ্রান্ত আশায় বসিয়া না থাকিয়া সংগঠন-পরিকল্পনাকে এখন হইতে কাজে রূপান্তরিত করিতে বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক। ইহার জন্য প্রবল জনমত গঠন করা দরকার আর চাই শিক্ষা-সংস্কারের দাবি করিয়া দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন। অর্থাভাবের অজুহাতে পরিকল্পনাটি যাহাতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সরকারী দপ্তরে সমাহিত না থাকে সে বিষয়ে জনসাধারণকে সজাগ হইতে হইবে। সমগ্র পরিকল্পনাকে একই সঙ্গে সারা দেশে চালু করা সহজসাধ্য নয়; কাজেই বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে বিচার করিয়া নির্বাচিত অঞ্চলে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। কথা উঠিতে পারে যে সকলের পক্ষে সমান সুবিধা দেওয়া যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে শুধু কোন বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীর জন্য শিক্ষার সুব্যবস্থা করা সমীচীন হইবে কি? কিন্তু ভবিষ্যতের আশায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা অপেক্ষা অল্পপরিসর স্থানেও নূতন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় এই কারণে যে, তাহাতে বাস্তবের নিকষপাথরে পরিকল্পনা পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে; দেশের পক্ষে আদর্শ স্কুল কিরূপ, আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থাই বা কিরূপ হইবে তাহার নমুনা দেখিতে পাইলে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়া শিক্ষাপ্রসারের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবে। এই ভাবে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে প্রসারিত করিয়া নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা সমগ্র দেশেই ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে।

বর্তমান ভারত ভাবী এক নূতন জীবনের সন্ধিস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিপুল সম্ভাবনাময় জীবন তাহার সম্মুখে, কিন্তু পথ কোমল কুসুমাস্তীর্ণ নহে। রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বহুবিধ সমস্যার কণ্টকজালে আচ্ছন্ন ভূমিতে ভারতবাসীকে বলিষ্ঠ দেশপ্রীতি ও উদার শুভবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া সাম্য, মৈত্রী ও একতার ফসল ফলাইতে হইবে। দেশবাসীর শিক্ষার উপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের মধ্যেও দেশবাসীকে শিক্ষাবিস্তার-কার্যে ব্রতী হইতে হইবে। কেননা, প্রচেষ্টাবিহীন জনগণের সুনিদ্রায় অতিবাহিত রজনীর শেষে উন্নতির সূর্য আপনাআপনি আসিয়া উদয় হয় না। যেমন চেষ্টা তদনুরূপ তার সিদ্ধি একথা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সত্য কোন দেশের জাতীয় জীবনেও তেমনি অমোঘভাবে সত্য।

শিল্পের দরদ

শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন

বহু প্রাচীন কালে লুং মেন পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে ছিল এক বিশাল কিরি গাছ—অরণ্যের সত্যিকারের রাজা। গাছটি যেন আকাশের তারার সঙ্গে কথা বলার জন্যেই মাথা উঁচু করে ছিল আর তার বাদামী রঙের শিকড়গুলি চালিয়ে দিয়েছিল মাটির বুকে যেখানে গভীরে শুয়ে আছে রূপালি দৈত্য। এক দিন ঘটনাচক্রে এক মস্ত যাদুকর ঐ বিশাল বনস্পতিকে কেটে এক অপূর্ব বীণাযন্ত্র তৈরি করলেন—এর তন্ত্রীতে সুরের ঝঙ্কার তুলতে পারবে শুধু জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীণকার।

বহুকাল বীণাটি চীনের সম্রাট্ পরম যত্নে সাদরে রক্ষা করলেন—কত গুণী বীণাটি বাজাতে চেষ্টাও করলেন, কিন্তু বিফল হল সকল প্রয়াস। তাঁদের চরম সাধনার ফলে যে ব্যঙ্গের সুর বীণার তারে ধ্বনিত হ'ত তাই দিয়ে তাদের মনের ভাব ফুটিয়ে তোলা চলত না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল, বীণা কারো কাছে মাথা নোয়াল না।

অবশেষে এক দিন এলেন গুণীর সেরা গুণী Pei Woh—কোমল করে তিনি তুলে নিলেন যন্ত্রটিকে। পাকা সওয়ার দুরন্ত অবাধ্য ঘোড়াকে যেমন করে পোষ মানায় তেমনি করে পরম স্নেহে তিনি বীণাটির তারে মৃদু মৃদু আঘাত করলেন। তাঁর হাতের ছোঁওয়া লেগে বীণার বুকে জেগে উঠল সুরের ঝঙ্কার—গানের মূর্ছনা। সে গানে ছিল প্রকৃতির বর্ণনা, বিশাল পর্বতের কথা, নির্ঝরিণীর কলতানের বারতা। বাজনা শুনে গাছের সব পুরনো স্মৃতি জেগে উঠল। তার শাখায় শাখায় বসন্তের মধুর হিল্লোল খেলে গেল। কোথাও ঝরণার জলধারা উথলে উঠছে, নেচে নেচে তারা যেন ফুলের কুঁড়িতে কুঁড়িতে হাসির তুফান তুলে গেল। তার পর বীণা গেয়ে উঠল গ্রীষ্মের গান—অগণিত পতঙ্গের গুন গুন ধ্বনি। বৃষ্টি-ধারার মৃদু গুঞ্জন, কোকিলের কুহুতান, সবটা মিলে এক মায়া-লোকের সৃজন হ'ল। আবার ঐ শোন, বাঘের গর্জন, আর পাহাড়ের উপত্যকা থেকে তার প্রতিধ্বনি। শরৎকাল, নিঝুম রাতে শিশিরভেজা ঘাসে ঘাসে চাঁদের আলো ধারাল ছুরির মতো চক্ চক্ করে উঠছে। তার পর আসে শীত; হিমের হাওয়ায় দলে দলে হাঁস উড়ে চলে, আর গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় হয় শিলাবৃষ্টির শব্দ—যেন কার আকুল আনন্দের প্রকাশ।

এবার Pei Woh তাঁর সুর বদলে ধরলেন প্রেমের গান। গভীর চিন্তায় মগ্ন, প্রেমে বিভোর বালকের মতো অরণ্যানী হেলছে দুলছে। ঊর্ধ্বে আকাশের গায়ে উজ্জ্বল এক খণ্ড মেঘ যেন কোন গরবিণী; কিন্তু আস্তে আস্তে মেঘের ছায়া দুরাশার মত কালো হয়ে ওঠে। আবার পরিবর্তন; এবার গুণী গাইলেন যুদ্ধের গান—বেজে উঠল অস্ত্রের ঝনঝনা, ঘোড়ার পায়ের খট্‌খটাখট্। এবার উঠল লুং মেনের ঝড়, পাহাড়ের বুকে শত শত বাজ ভেঙ্গে পড়ে যেন, যেন আকাশের বুক চিরে বেরিয়ে আসে বিদ্যুল্লতা। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করেন, গুণীর এই সিদ্ধির মূলে কি সে রহস্য? "সম্রাট", তিনি বললেন, "তাঁরা গেয়েছিলেন নিজেদের গান, তাই বিফল হয়েছিল তাঁদের প্রয়াস। আমি বীণাকেই পথ ছেড়ে দিয়েছিলাম—বেছে নিক সে গানের যোগ্য বিষয়, আর বীণা বাজাতে গিয়ে আমার খেয়ালই ছিল না কে যন্ত্র আর কে যন্ত্রী, কে বীণা আর কে বীণকার।" এই গল্পটি থেকে শিল্পের রসবোধের রহস্য কি তা বোঝা যায়। আমাদের সূক্ষ্মতম অনুভূতির তন্ত্রীগুলি যাতে একতালে বেজে ওঠে তাতেই হ'ল শিল্পের চরম সার্থকতা। Pei Woh হলেন প্রকৃত শিল্প আর আমরা লুং মেনের বীণা। সুন্দরের মোহন তুলির যাদু স্পর্শে আমাদের জীবনের গোপন স্বপ্ন তন্ত্রীগুলি জেগে ওঠে। তার আহ্বানে আমাদের হৃদয়-বীণা স্পন্দিত হয়, ধ্বনিত হয়। মন থেকে মনে চলে কথা। অব্যক্তকে শুনি আর অদৃশ্যের দিকে চেয়ে থাকি। গুণী আমাদের হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে আঘাত দেন যার খবর আমাদের অজানা। দীর্ঘ-কালের কত বিস্মৃত ঘটনা তখন নূতন অর্থ নিয়ে সামনে এসে ভিড় করে। ভয়ের কবলে রুদ্ধ কত আশা-আকাঙ্ক্ষা তখন নূতন বেশে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। আমাদের মনই হ'ল শিল্পীর পট আমাদের সুখ দুঃখ তাঁর তুলির রং; আর আনন্দের আলো, দুঃখের ছায়া—এই হ'ল তাঁর শিল্পের বিষয়-বস্তু। আমাদের নিয়েই শ্রেষ্ঠ শিল্পী মেলে দেন তাঁর সৃষ্টির মেলা, আমাদের হৃদয়েই চলেছে তাঁর রসের খেলা আবার আমরাই দেখছি তাঁর শিল্পসৃষ্টির মূলে। শিল্পীর শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি আমাদের, আবার আমরাও শিল্পীর।

শিল্প-সম্ভোগের জন্য চাই শিল্পীর মনের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা "একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দু'জনা।" স্রষ্টা যেমন দেবার কৌশলটি জানবেন, দ্রষ্টার মনেরও থাকা চাই এমন অবস্থা যাতে শিল্পীর হাত থেকে দান গ্রহণ করবার যোগ্য অধিকারী তিনি হন। চা-শিল্পী Kobori Enshu নিজে এক জন বাক্যরসিক, বড় সুন্দর কথা কবি বলে গিয়েছেন, খুব সুন্দর একখানা ছবি দেখতে হলে এমন ভাবে যাবে যেন মস্ত কোন রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ। উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি বুঝতে হলে তার কাছে নিজেকে নত করে, রুদ্ধ শ্বাসে শুনতে হবে তার ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিতটি কি। বিখ্যাত এক জন সুং সমালোচক একটা ভারি চমৎকার স্বীকারোক্তি করে গেছেন। তিনি বলেছেন, যখন বয়স অল্প ছিল তাঁর

ছবি দেখলে চিত্রকরের সুখ্যাতি করে'ছি, আর আজ পরিণত বয়সে নিজেরই তারিফ করি যে অমন গুণীরা আমায় আকর্ষণ করেছিলেন। ভারি দুঃখের কথা যে আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই শিল্পীদের মনের ভাবটিকে বুঝবার চেষ্টা করি। বদ্ধমূল অজ্ঞতার বশে আমরা তাঁদের এটুকু সৌজন্যও দেখাই না আর সেজন্যেই সৌন্দর্যের বিপুল সম্ভার আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। গুণীর হাতে অফুরন্ত ঐশ্বর্য, কিন্তু রসবোধের অভাবে সুধাসাগরের পারে বসেও আমরা থাকি তৃষিত।

রসের অনুভূতি যার আছে, সুন্দর তার কাছে বাস্তব হয়ে ওঠে আর শিল্পীর সঙ্গে তার নিবিড় সৌহার্দের বন্ধন গড়ে ওঠে। গুণীরা, শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা অমর, কারণ তাঁদের স্নেহ, প্রেম, আশা-আশঙ্কা সবকিছুই যুগে যুগে আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকে। বীণাবাদকের হাতের চেয়ে তার হৃদয়টি, বাজনার আঙ্গিকের চেয়ে বাদক লোকটি আমাদের মনকে বেশী স্পর্শ করে—শিল্পীর আহ্বান যত মানবতার আদর্শে পূর্ণ হবে ততই গভীর সাড়া তিনি পাবেন আমাদের কাছ থেকে। শিল্পীর সঙ্গে আমাদের এই গোপন বোঝাপড়াটি আছে বলেই না কাব্যে উপন্যাসে নায়কনায়িকার সুখে আমরা হাসি আর তাদের দুঃখে কাঁদি। চিকামাৎসু (জাপানের সেক্‌সপীয়র) বলেন যে, নাটক রচনার একটি প্রধান গুণ হ'ল নাট্যকারের সঙ্গে পাঠক ও শ্রোতার ঐকান্তিক যোগাযোগ। তাঁর অনেক শিষ্য নাটক লিখে তাঁকে দেখান, কিন্তু মোটে একটি নাটক তাঁর মনোমত হয়েছিল। সেই নাটকটি অনেকটা সেক্‌সপীয়রের *Comedy of Errors*-এর মত - অদ্ভুত সাদৃশ্যের জন্য দুটি যমজ ভাইয়ের নাকাল হওয়ার কাহিনী। চিকামাৎসু বলেন, এতে নাটকের প্রকৃত ভাবটি রক্ষা হয়েছে, কারণ এর মধ্যে শ্রোতৃমণ্ডলীর কথা বিবেচনা করা হয়েছে। অভিনেতাদের চেয়ে দর্শকেরা বেশী জানে তারা বুঝতে পারছে কোথায় ভুল হচ্ছে আর তাই যে বেচারীরা ভুল করে দুর্ভোগ ভুগছে তাদের জন্যে দুঃখ পাচ্ছে।

দর্শক ও শ্রোতার সহানুভূতি পেতে হলে ইসারা-ইঙ্গিতের কত দরকার তা বড় বড় শিল্পীরা প্রাচ্য, প্রতীচ্য সর্বত্রই কখনো ভোলেন নি। শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা আমাদের কাছে যে গভীর চিন্তা ও বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেন কে না তার বিশালতায় বিস্মিত হয়? তাঁরা যেন আমাদের কত আপনার আর কত তাঁদের দরদ—সে তুলনায় বর্তমানের ক্ষুদ্র শিল্পীদের দান কত তুচ্ছ কত প্রাণহীন! তাঁদের মধ্যে ছিল প্রাণ থেকে প্রাণে সজীব আবেদন আর এঁদের যেন আইনমাফিক অভিবাদন। আঙ্গিকে বদ্ধদৃষ্টি আধুনিক শিল্পী নিজেকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। লুং মেনের বীণা বাজাতে যারা ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল তাদেরই মত সে কেবল নিজের কথা বলে। তার দৃষ্টি হয়ত অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত কিন্তু অন্তরের আবেদন যে ততই কম। আমাদের জাপানীদের একটি প্রবাদ আছে যে, নিতান্ত অহঙ্কারী লোককে কোন মেয়ে ভালবাসতে পারে না। কেননা, তার মনে এমন ফাঁক কোথায় যেখানে নাকি ভালবাসার জায়গা হবে, শিল্পেও আত্মাভিমানের স্থান নেই—শিল্পস্রষ্টা বা দর্শক কারো পক্ষেই তা শুভ নয়। শিল্পসম্ভোগের জন্য সমধর্মী আত্মার মিলনের মত সুন্দর জিনিস আর নেই। এই মিলনের ক্ষণটিতে শিল্পানুরাগী আপনাকে অতিক্রম করে যান। তিনি তখন বাস্তবজগতে থেকেও যেন থাকেন না। অনন্ত তাঁকে আভাসে ধরা দেয়, কিন্তু সে আনন্দ তিনি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন না, কারণ চোখের যে বাণী নেই। বাস্তবের শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে তিনি ভাবলোকে ছন্দের জগতে বিচরণ করেন। তখনই তো শ্রেষ্ঠ শিল্প হয়ে ওঠে অধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত আর মানুষকে মহৎ করে তোলে। এজন্যেই তো শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি পবিত্র জিনিষ। প্রাচীনকালে জাপানীরা শিল্পীর অবদানকে পরম সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন। চা-শিল্পীরা আধ্যাত্মিক সম্পদের মত সঙ্গোপনে তাঁদের সম্পদগুলিকে রক্ষা করতেন—অনেক সময় একটার পর একটা, একটার মধ্যে আর একটা, এমনি করে বিস্তর বাক্স খুলে তবে পাওয়া যেত সেই মণিকোঠা যেখানে রেশমের নরম আবেষ্টনের মধ্যে সযত্নে রাখা হয়েছে সেই পরম পবিত্র বস্তু। লোকচক্ষু কচিৎ কখনো তা দেখতে পেত—যদি কখনো খোলা হ'ত সে কেবল দীক্ষার্থীর জন্যে।

চা-গৌরবের যুগে টাইকোর সেনাপতিরা যুদ্ধজয়ের পুরস্কার হিসেবে জায়গীর পেলে তত খুশী হ'ত না যত হ'ত উৎকৃষ্ট শিল্পের একটা নিদর্শন পেলে। এমনি সব সেরা বস্তুর হারিয়ে যাওয়া আর ফিরে পাওয়া নিয়েই তো আমাদের বহু জনপ্রিয় নাটক লেখা হয়েছে। এক নাটকে আছে, একদিন সামুরাইয়ের অসাবধানতার দরুন রাজা Hosokawa-র প্রাসাদে আগুন লেগে গেল—ঐ রাজবাড়ীতেই রক্ষিত ছিল Sesoon-এর আঁকা বিখ্যাত Dharuma-র ছবিখানা। সামুরাই ঠিক করলেন যেমন করেই হোক ছবিখানা বাঁচাতে হবে; জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছবিটি খুলে ফেললেন কিন্তু দেখেন, তখন বেরুবার সব পথই অগ্নিশিখায় অবরুদ্ধ। ছবিটি রক্ষা করা ছাড়া অন্য চিন্তা তাঁর নেই, পাগলের মত তিনি তরবারি দিয়ে নিজের পেট চিরে ফেলে নিজের জামার হাতা দুটি দিয়ে তাকে মুড়ে পেটের মধ্যে পুরে দিলেন। আগুন নিভল। ভগ্নস্তূপের মধ্যে পাওয়া গেল সেই সামুরাইয়ের অর্দ্ধদগ্ধ শবদেহ আর দেখা গেল তার পেটের মধ্যে ছবিটি রয়েছে অটুট। এসব গল্প অবশ্য অতি বীভৎস, কিন্তু আমরা দেখি, কি গভীর আদর ছিল শিল্পের আর কি গভীর শিল্পানুরাগ এই বিশ্বাসী রক্ষক সামুরাইয়ের।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, শিল্পের মূল্য নির্ণয় হবে তার আবেদনের পরিমাণে—এ আবেদন, শিল্পের ভাষা সার্ব্বজনীন হতে পারত যদি আমাদের অনুভূতি আর ভাবগুলি সার্বজনীন হ'ত। আমাদের সহজ প্রকৃতি, ঐতিহ্য ও আচারের

প্রভাব, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বংশগত পার্থক্য এরা সবাই আমাদের রসবোধের গণ্ডী ছোট করে আনে। আমাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যও এক হিসেবে বুদ্ধিকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলে; আর তখন আমাদের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে যে সৌন্দর্যবোধ তা অতীতের সৃষ্টির মধ্যে নিজের চরিতার্থতা খুঁজে নেয়। এ কথা সত্যি যে চর্চা করলে আমাদের শিল্পসম্ভোগের শক্তি বাড়ে আর তার ফলে আগে যাতে আনন্দ পাই নি, তখন তাতে সৌন্দর্য আর রসের সন্ধান পাই। কিন্তু সত্যি বলতে কি, বিশ্বমুকুরে আমরা নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখি, কে কি দেখবে তা নির্ভর করে নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। চা-শিল্পীরা সযত্নে শুধু নিজেদের অনুরাগ বুঝে দ্রব্য সংগ্রহ করে গেছেন।

এ প্রসঙ্গে Kobori Enshu-র একটা গল্প মনে পড়ে গেল। Enshu-র অপূর্ব সংগ্রহ দেখে শিষ্যেরা তাঁর রুচির সুখ্যাতি করছিল। তারা বলছিল, "এর প্রতিটি জিনিস এমন যে লোকে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। দেখা যাচ্ছে, Rikyu-র চাইতে আপনার রুচি অনেক ভাল, কারণ তার জিনিস হাজারে মোটে এক জন লোকের ভাল লাগে।" গভীর দুঃখে Enshu বললেন, এতেই বোঝা যাচ্ছে আমি কি সামান্য। মহান্ শিল্পী Rikyu-র সাহস ছিল কেবল নিজের রুচি অনুযায়ী জিনিসকে ভালবাসবার—আর আমি অজ্ঞাতসারে করে গেছি পাঁচ জনের মনস্তুষ্টি। বাস্তবিক Rikyu ছিলেন চা-শিল্পীদের মধ্যে হাজারে এক জন।

দুঃখের বিষয়, বর্তমান সময়ে আর্টের জন্য যে উৎসাহ দেখা যায় তা বাহ্যিক। তার মূলে অন্তরের অনুভূতির একান্ত অভাব। আমাদের এই বর্তমান ডিমোক্র্যাসির যুগে লোকে খোঁজে কোন্ জিনিসটি জনপ্রিয়—নিজের মনের ভাব সম্বন্ধে থাকে উদাসীন। তারা চায় দামী জিনিস, ফ্যাসানমাফিক জিনিস—চায় না সুন্দরকে, খোঁজে না শোভন বস্তুকে। জনসাধারণের কাছে তো প্রাচীন ইতালীয় ছবি বা Ashikaga শিল্পীদের ছবির চাইতে সচিত্র সাময়িক পত্রিকায় আঁকা আধুনিক কালের বাণিজ্যশিল্পের দাম বেশী—এ সবই তাদের চোখ ভুলায়, মনের খোরাক যোগায় কিনা সন্দেহ। ভাল ছবির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের চেয়ে শিল্পীর নামই তাদের কাছে বড়। তাই দেখেই চীনের এক বিখ্যাত রসজ্ঞ সমালোচক অভিযোগ করে বলেছিলেন, লোকে চিত্র-সমালোচনা করে কান দিয়ে। সত্যিকারের এই রসবোধের অভাবেই আজ সর্বত্রই পাওয়া যাচ্ছে শিল্প-সমালোচনার নামে বিকৃত রুচির পরিচয়।

আর একটি ভুল সাধারণত করা হয় আমরা আর্টের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বকে ভুল করে মিলিয়ে ফেলি। পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা ও দরদ মানবচরিত্রের একটি অমূল্য সম্পদ—পারলে এ গুণটি আরও বাড়ান উচিত। ভবিষ্যতের জ্ঞানের পথ খুলে দেবার জন্য অতীতের গুণীগণ আমাদের চির নমস্য। শতাব্দীর পর শতাব্দীর সমালোচনার পরেও যে তাঁরা সগৌরবে অটুট খ্যাতি ভোগ করে আসছেন, এটাই তো তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। কিন্তু কেবল কালের প্রাচীনত্বেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিরিখ হতে পারে না। সৌন্দর্যের মাপকাঠির দিকে চেয়ে ইতিহাসের মানদণ্ডকে যদি আমরা বড় করি তা হলে ভুল করব। শিল্পীর মৃত্যুর পর তার সমাধিতে ফুল দিয়ে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তা ছাড়া বিবর্তনবাদের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা জাতি দেখতে গিয়ে ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ দেখার চোখ হারিয়ে ফেলেছি। সংগ্রহ-কারক নমুনা-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু ভুলে যান একটা বিশিষ্ট সময় বা জাতির জীবনের মর্মকথা বুঝতে হলে মাঝারি গোছের দশটি নমুনার চেয়ে ঢের বেশী শিখতে পারবেন যদি সে যুগের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তিনি সংগ্রহ করতে পারেন। শিল্পসৃষ্টিকে বিশেষ কোন গোষ্ঠীতে ফেলার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে আমরা আনন্দ পাই বড় কম। সৌন্দর্যের মাপকাঠির চেয়ে বিজ্ঞানের আঙ্গিক অনুযায়ী সাজাতে গিয়ে অনেক মিউজিয়মের সৌষ্ঠবের হানি হয়েছে।

জীবনের কোন বিশেষ ক্ষেত্রেই সমসাময়িক শিল্পের আবেদনকে অগ্রাহ্য করা চলে না। আজকের যা শিল্পসৃষ্টি তাই তো সত্যি আমাদের নিজস্ব; হোক না তা আমাদের প্রতিচ্ছবি। তার নিন্দায় আমাদেরই ত্রুটি ধরা পড়ে। আমরা বলি এ যুগের শিল্পসৃষ্টি হয় নি: সেজন্য দায়ী কারা? আর একটা সত্যি লজ্জার কথা যে আমরা পুরাতনের এত বড়াই করি, কিন্তু নিজেদের সম্ভাবনার বিষয়ে অন্ধ হয়ে আছি। কত উদীয়মান শিল্পী সমসাময়িক বিরুদ্ধ সমালোচনায় পীড়িত ও বিদ্রূপবাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভাবে, তার উত্থানের আশা সুদূরপরাহত। আত্মকেন্দ্রিক যুগে আমরা তাদের কি অনুপ্রেরণা দিচ্ছি? আমাদের কৃষ্টির দৈন্য দেখে অতীত কাল হয়ত আমাদের জন্য অনুকম্পা বোধ করে আর ভাবী কাল নিশ্চয় আমাদের শিল্পের দৈন্য দেখে ব্যঙ্গ করবে। জীবনে সুন্দরকে হত্যা করে আমরা আর্টকেই বিনাশ করছি। মনে সাধ হয় আমাদের এই সমাজবৃক্ষের কাণ্ড থেকে আজ তৈরি হোক এক মহান্ বীণা, আর প্রতিভার যাদুস্পর্শে তার তন্ত্রীগুলি সুরে ছন্দে ধ্বনিত হয়ে উঠুক।*

*জাপানী লেখক ওকাকুরার রচনা হইতে।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৭

আজ আট দিন হইল টুলু মাষ্টারমশাইয়ের বাসায় অন্তরীণ হইয়া আছে, একেবারেই বাহির হয় না। অবশ্য স্ব-ইচ্ছায়ই, তবে ইচ্ছাটা অবস্থাগতিকে। বাড়ি থেকে বাহির হইতে সাহস হয় না। প্রাণের ভয়—না, সে ভয়বরং এইখানেই বেশী, সঙ্গীর মধ্যে তো ঐ এক পাগল—তাও দেড়শ' হাত দূরে, একটা কিছু ঘটিলে বাহিরের জগতে তাহার এতটুকুও সাড়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই। টুলু এ বিপদের দিকটা ভাবেও না একরকম; ঠিক সাহস নয়, তবে এই ক'টা দিনের অভিজ্ঞতায় নিজের সম্বন্ধে এক ধরণের বৈরাগ্য আনিয়াছে। কাজ লইয়া একটা নেশা জাগিয়াছে মনে—আরও বেশী কাজ, আরও বড় কাজ; কিন্তু সেই কাজের জন্যই যে প্রাণটাকে চারি দিক থেকে ঘিরিয়া-ঘুরিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে এ কথা কখনও মনে হয় না। অবস্থাটাকে বৈরাগ্য না বলিয়া এক ধরণের বিস্মৃতি বলাই ভাল, তীব্র কর্মলিপ্সার মধ্যে অন্য কিছুই আর মনে থাকে না। বড় আলোর ছায়াও হয় ঘন—প্রাণের অনুভূতিটা সেই ঘন ছায়ায় পড়িয়া গেছে।

টুলু বাড়ি ছাড়ে না অন্য কারণে; ওর ভয়—বাসা ছাড়িলেই ম্যানেজার নিজের লোক বসাইয়া দিবে, তা যদি নাও করে সদর দরজায় নিজের তালা ঝুলাইয়া তাহাকে বেদখল করিবে। উকিলের ছেলে, টুলু অন্তত এটুকু জানে যে এ বাসায় তাহার কোন অধিকার নাই। একটু অধিকার বোধ হয় দিয়াছিল মাষ্টারমশাইয়ের চিঠি—তাও 'বোধ হয়' খুব কৃতনিশ্চয় নয় টুলু; তা সে চিঠিও তো ম্যানেজার হস্তগত করিয়াছে। আর সে হাত যে কত শক্ত হওয়া সম্ভব টুলু তাহা ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তাতেও বুঝিয়াছে, তাহার পর চম্পার কাছেও আঁচ পাইয়াছে।

সমস্ত দিন বাসায় বসিয়া বসিয়া হাঁপ ধরে। যে কাজের জন্য এত আকূতি তাহার যেন নাগালই পাইতেছে না। খনিতে প্রবেশ করিয়া যেন মনে হইয়াছিল এবার আরম্ভ করা গেল কিছু হীরককে অবলম্বন করিয়া; হীরক কিন্তু হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ফসকাইয়া গেল। বস্তির পথ বন্ধ। ম্যানেজার সাধ্য-মত বাধা দিবে। বাধা অগ্রাহ্য করিয়াও টুলু নামিত কাজে, কেননা তাহার কাজই দাঁড়াইল তো বাধা অগ্রাহ্য করা; কিন্তু ঘটনাচক্রে বাসা লইয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। বাকি ছিল চম্পা—মাষ্টারমশাই চিঠিতে যে তিনটি কাজের ইঙ্গিত দিয়া-ছিলেন তাহার মধ্যে অন্যতম। বেশ ভাল ভাবেই আরম্ভ করিয়াছিল; চম্পাকে বালিয়াড়ির পথ থেকে যে রাত্রে ফিরাইয়া আনে, সে রাত্রের পুলক-স্পন্দনের কথা টুলু কখনও ভুলিবে না, একটা রাজ্য জয় করার উল্লাস বোধ হয় এই ধরণেরই কিছু। সে উল্লাস কিন্তু পরদিনই ভাঙিয়া গেল ম্যানে-জারের বাসায়। সে দিন সেখানে চম্পার নির্লজ্জ মোহ-বিস্তারের চেষ্টা দেখিয়া নিরুপায় নীরবতার মধ্যে একটা সংস্কৃত প্রবাদ বারবারই মনে পড়িতেছিল—অঙ্গারং শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি—অঙ্গারের খনিতে চম্পায় একেবারে অন্ত-স্তল পর্যন্ত অঙ্গার হইয়া গেছে, ও কালিমা ঘুচিবে না, কোন উপায় নাই। টুলুর রাত্রের জয় করা রাজ্য দিন হইতে না হইতে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।…কিছু হয়তো বলিত না টুলু—বলার আর সম্বন্ধই নাই কোন, তবু স্কুলের পথে চম্পা আবার জোর করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—শেষ পর্যন্ত অন্তরের বিতৃষ্ণাটা টুলু না প্রকাশ করিয়া পারিল না।…ওদিকেও আর কাজ নাই। যোগসূত্র ছিঁড়িয়া গেছে।

তাহা ভিন্ন আর একটা কথা; চম্পাকে টুলুর যেন ভয় হয় আজকাল—হীরক…বেশ একটা স্পষ্ট কাজ, বস্তিও স্পষ্ট কাজ, কিন্তু চম্পা একটা রহস্য; বালিয়াড়ির পথের চম্পা, খনির চম্পা, ম্যানেজারের বাসার চম্পা, আর—আর টিলার পথের চম্পা—সব যেন আলাদা। কে জানে এ রহস্যের আরও কত রূপ আছে? একটা অশান্তি জাগায়, মনে হয় ও দূরে দূরেই থাক, যদি কাছে আসিয়াই পড়ে, সেসময় যেন মাষ্টারমশাইও থাকেন টুলুর কাছেপিঠে—কেন যে এমনটা মনে হয় টুলু ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

চারি দিক ভাবিয়া দেখিতে গেলে বেশ বুঝা যায় আসল গোল বাধিয়াছে মাষ্টারমশাইয়ের অনুপস্থিতি লইয়া। যেমন সূত্রপাত হইয়াছিল, তিনি উপস্থিত থাকিলে আজ অনেকটা পথই অগ্রসর হইতে পারিত। ঠিকানা পর্যন্ত রাখিয়া গেলেন না যে সে অবস্থাটা জানায় টুলু, পরামর্শ লয়। কি ভাবিয়া যে কি কাজ করেন মাষ্টারমশাই, বোঝা যায় না।

যতটা পারে সময়টা বই পড়িয়া কাটায়। বইগুলা বেশীর ভাগ দুষ্প্রবেশ্য—রাজনীতি, সমাজতন্ত্র এই সব লইয়া মোটা মোটা ইংরেজী বই বেশির ভাগ; কিছু কিছু কৌতূহল উদ্রেক করে—তবে বুঝিবার চেষ্টাতেই প্রায় সব শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। তবু সম্বল বলিতে, সাথী বলিতে ঐ ক'খানি।

একটি জায়গায় যাইতে লোভ হইত, স্কুলে। আজকাল গরমের জন্য সকালে স্কুল বসিতেছে। প্রত্যূষে পল্লের দিক থেকে ছেলেরা আসে, টিলার রাস্তাটা মুখর করিয়া; বস্তির দিক থেকেও কিছু কিছু আসে, আর মাত্র দুটি ছেলে যায় তাহার বাসার সামনে দিয়া; বালিয়াড়ির পথে, অনেক দূরে নাকরেল বলিয়া একটা গ্রাম আছে—সেইখান থেকে আসে তাহারা। এক দিন ডাকিল টুলু, পরিচয় লইল, একটু গল্পও করিল। রাত থাকিতে তাহাদের মা উঠাইয়া দেয়, জোর

হওয়ার আগেই মুড়ি-মুড়কি খাইয়া উহারা বাহির হইয়া পড়ে, আসিতে ঠিক এক ঘণ্টা লাগে।...উহারা জাতিতে মাহিষ্য---বাপ রাণীগঞ্জের একটা কি খনির আপিসে কেরাণী ছিল। গত বৎসর মারা গেছে। সেই থেকে উহারা গ্রামে চলিয়া আসিয়াছে---মা, একটি বড় বোন—স্কুলে পড়িত রাণীগঞ্জে, আর তারা এই দুটি ভাই।...দু'জনেই খনির ম্যানেজার হইবে-- মার তাই ইচ্ছা।...ছোট গ্রাম তাহাদের ; না, আর কেহই পড়িতে আসে না তাহাদের গ্রাম হইতে।...বড় ছেলেটিই বেশী গল্প করিতেছে, ছোটটি বলিল—"আগের মাস থেকে তো আরও আসবে দাদা, সে কথা বললে না ?" বড়টি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া টুলুর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"সে যখন আসবে তখন আসবে, কি বলেন ? দিদি সবার বাড়ি গিয়ে ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে বলে না তাদের ?---ও সেই কথা বলছে।"

স্কুলের ঘণ্টা বাজিতে ছেলে দুটি চলিয়া গেল।

বড় সুন্দর লাগিল টুলুর। হাফপ্যান্ট আর কামিজ-পরা ছেলে দুটি, ভাল করিয়া চুল আঁচড়ানো, ঘরে তৈয়ারি দাচেলের মতো থলে, তাতেই বই স্লেট, দুটি থলের ওপরই নামের তিনটি ইংরেজী আদ্য অক্ষর রঙীন সুতা দিয়া তোলা। এই আধা পাড়াগাঁয়ে ছেলে দুটি একটু বেমানান ; শুধু তাই নয়, অজপাড়াগাঁয়ে এর চেয়ে বেমানান একটি রুচিসম্পন্ন ছোট পরিবারের ছবি চোখের সামনে আনিয়া দেয়---বড় কৌতূহল হয়।

বিকালে কিছু বিস্কুট আনাইয়া রাখিল। পরদিন সকালে ছেলে দুটিকে দিল। একটি সলজ্জ হাসির সঙ্গে তাহারা গ্রহণ করিল। আরও গল্প হইল আজ—বাড়ির গল্প, গ্রামের আরও সবাইদের গল্প। ছোট ছেলেটি বেশীর ভাগ ঘাড় হেঁট করিয়াই ছিল, হঠাৎ একবার মুখ তুলিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বড়টির দিকে চাহিয়া বলিল---"দাদা !"

বড়টি ফিরিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিল ; ছোটটি চোখের একটু ইঙ্গিতের মতো করিয়া আরও কুণ্ঠিত ভাবে বলিল —"সেই যে···সেকেণ্ড মাষ্টারমশাই বলেছিলেন-- "

"ও !" বলিয়া একটা যেন ভুল শুধরাইয়া লইয়া ছেলেটি উঠিয়া পড়িল, ছোটটিও উঠিল। টুলু বলিল---"বোস' না খোকা আর একটু, এখনও ত ঘণ্টা হয় নি।"

বড়টি যেন একেবারে কি রকম হইয়া গেল, ঘাড়টি অল্প বাঁকাইয়া ম্লান হাসিয়া বলিল --"না, আমরা যাই। আপনি ফুল নেবেন ?"

কি একটা মিষ্ট গন্ধের বুনো ফুল কাল হাতে দেখিয়া টুলু প্রশংসা করিয়াছিল, আজ একগোছা আনিয়াছে, চৌকির উপর রাখিয়া, আর একবার ঘাড় ফিরাইয়া অপ্রতিভভাবে হাসিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

উহারা চলিয়া যাইতে টুলুর হুঁস হইল। সেকেণ্ড মাষ্টার আজকাল হেড মাষ্টারের জায়গায় কাজ করিতেছেন, উপর হইতে তাঁহার উপর কোন আদেশ পৌঁছিয়াছে, টুলুর সঙ্গে ছেলেদের মেশা মানা। ম্যানেজারের সঙ্গে যে দিন দেখা হয় তাহার পর তৃতীয় দিনের কথা এটা, টুলুর ইচ্ছা ছিল সকাল বেলাটা স্কুলে গিয়া কাটাইবে, জনচারেক শিক্ষক আছেন, আলাপ করিবে, এক আধটা ক্লাসও লইবে সেকেণ্ড মাষ্টারকে বলিয়া---বেশ কাটিয়া যাইবে সকালটা। স্কুল জিনিসটা কূট-নীতির সঙ্গে এত নিঃসম্পর্কিত বলিয়া ওর বিশ্বাস ছিল যে, এ সম্ভাবনার কথাটা মনেই উদয় হয় নাই।---যাক্, অত হুমকির পরেও দুই দিন ম্যানেজারের তরফ থেকে কোন সাড়া শব্দ না আসায় টুলু বেশ একটু ধোঁকায় পড়িয়া গিয়াছিল ; তাহা হইলে এখন যেরূপ দেখিতেছে একেবারে বনিয়া নাই সে। তবে, শত্রু হিসাবেও লোকটার প্রতি একটু শ্রদ্ধা হইয়াছিল, কিন্তু আক্রোশ মিটাইবার পদ্ধতি দেখিয়া সে শ্রদ্ধার অনেক-খানিটাই নষ্ট হইয়া গেল। ম্যানেজার অমন গম্ভীর ব্যাপার-টাকে যেন মেয়েলি কাণ্ডে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। মেয়েরাই পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া হইলে নিজের নিজের সন্তান-দের বলিয়া দেয়-- ওর বাড়ি যাস নি, কথা কসনি ওদের সঙ্গে ...সকালটা এখন এমনই কাটে, বসিয়া গড়াইয়া, খানিকটা বই পড়িয়া। স্কুল বন্ধ হইবার প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে বনমালী ভাত লইয়া আসে ; সমস্ত দিনের মধ্যে এই সময়টুকু টুলুর যা একটু ভাল ভাবে কাটে, আহার্যের স্বাদিষ্টতার জন্য নয়-- কোনটাতে নুন কম, কোনটাতে ঝাল বেশি, কোনটা আবার নুনের চোটে মুখে দেওয়া যায় না। সময়টুকু লোভনীয় বন-মালীর গল্পের জন্য। গল্পের বিষয়ও এমন কিছু নয়, তবে ভাষা ! -- বড় চমৎকার লাগে এখানকার ভাষাটা টুলুর—বড় সুরেলা ! —একটু অনুস্বরের ছুটটা বেশি, মাঝে মাঝে শব্দগুলা হঠাৎ দ্বিত্ব হইয়া যায় আর তার সঙ্গে থাকে একটি চমৎকার টান ; হাজারই বুড়ো হোক কেউ, মনে হয় যেন ছেলেমানুষের আধ-আধ বুলি ; বাংলা বিহারের সীমাভূমির ভাষা বলিয়া এক আধটা হিন্দি শব্দও আসিয়া পড়ে মাঝে মাঝে---"ঝপন দিবলাম মিনারিট হইছেঁ, তা আপ্‌নে নাতনি দিখবেক নাই ? কি কথাঁ---টি বুলছ তুমি !..."

শুধু ভাষার জন্যই অন্ত এক এক সময়ও ডাকিয়া লয়। নিজেও বলিবার চেষ্টা করে।

বনমালী মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলে---"উ তুমি পারবেক নাই। ই আমাদের মেটোঁ ভাষা আছে, তুমাদের লয়্যে—ম জবানে আসবেক কুথাঁ থিকে গো ?"

কষ্ট হয় বিকাল বেলাটায়। দিনের মধ্যে বিকাল সময়টাই বড় উদাস, ঐ সময় মানুষ নিজের নিজের কাজের শেষটুকু গুটাইয়া আনিতে থাকে ব্যস্ত, পরস্পরকে সঙ্গ দিতে পারে না ; এ দিকে প্রকৃতিকেও যায় না পাওয়া, কাজের ক্ষিপ্রতার মধ্যেও মানুষের নিজেকে একটু নিঃসঙ্গ বলিয়া মনে হয়। যাহার

হাতে কাজ নাই সে তো নিজের কাছে নিজে দুর্বহই হইয়া পড়ে।…বনমালী এই সময়টা পরদিনের জন্ত স্কুলে ঝাঁট-পাট দেয়, বেঞ্চিগুলা গুছাইয়া-সুছাইয়া রাখে। একটু বাগানের মত আছে স্কুলের সঙ্গে, সেইটুকুতেও এই সময়টাতেই দেখিয়া শুনিয়া নিজের দিনের মজুরি শেষ করে। টুলু বিছানায় পড়িয়া জানালা-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে; ঢেউ-খেলানো নিচু জমির উপর দিয়া অনেক দূর দৃষ্টি যায়; সঙ্গে সঙ্গে জীবনের উপর দিয়াও।…কি করিতেছে জীবনটাকে লইয়া?—এখন পর্যন্ত ত এই তরঙ্গায়িত ঊষর ভূখণ্ডের মতোই নিষ্ফল; কখনও কি ফল ফলিবে এ জীবনে?…এক এক দিন নৈরাশ্য আরও নিবিড় হইয়া গিয়া ঔদাসীন্যে দাঁড়ায়, ফল ফলিয়াই বা ফল কি? সন্ন্যাসীদের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া যদি কিছু পাইতই, ধরো যদি চরম বস্তুই পাইত ত কি সার্থকতা ছিল তাহাতে? আর আজ ছুটিয়াছে কর্মের উন্মাদনায়, ধরা যাক চম্পারা ফিরিয়াছে, চরণদাসেরা নেশা ছাড়িয়া একটা উন্নত জীবনের সন্ধান পাইয়াছে, শিশুরা সুস্থ, সুশৃঙ্খলিত শিক্ষার সংস্পর্শে তাহাদের জীবন ধীরে ধীরে কল্যাণে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু তাহাতে টুলুর কি?…কি পাইল সে?—যশ? প্রতিপত্তি? অন্ত কোন জীবনের পাথেয়—অন্য কোন লোকে?…কি ফল তাহাতেই বা?…বড় রহস্যময় বলিয়া মনে হয় জীবনকে—কি যে চায়! সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—কেনই বা যে চায়!

সন্ধ্যার একটু আগে স্কুল আর সামনে খানিকটা বাসায় পায়চারি করে, এই সময় এক আধজন লোক চলে,—বেণীর ভাগই গঞ্জের দিক থেকে বালিয়াড়ির দিকে। মানুষ না দেখিয়া দেখিয়া এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই নিত্যদিনের অতি-সাধারণ মানুষগুলিকেও বড় চমৎকার লাগে—শুধু চলার পথে তাহাদের ঐ অঙ্গভঙ্গী, পায়ে পায়ে তাহাদের বাড়ির দিকে আগাইয়া যাওয়া—এইটুকুই যেন পরমাশ্চর্য ঘটনা বলিয়া মনে হয়; টুলু একটু দূরে থাকিয়া পিছনে পিছনে যায়, সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে—টিলা ঘুরিয়া ঐ নামিয়া গেল, আবার ধীরে ধীরে উঠিতেছে, তাহার পর দূরের ঐ টিলা—তাহার পিছনেই অদৃশ্য হইয়া গেল—কর্মজীবন আরও দূরে, আরও দূরে—গৃহের শান্তি আরও নিকটে আসিয়া পড়িতেছে; বৈকালের এই নিরর্থক জীবনই সন্ধ্যামুখে যেন একটু অর্থবান হইয়া ওঠে।

বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া আসিলে, টুলু কাঞ্চনতলাটিতে গিয়া বসে। সমস্ত দিনরাতের মধ্যে এই সময়টুকুর দিকে যেন সতৃষ্ণ নয়নে থাকে চাহিয়া। পশ্চিমে খণ্ডমেঘের মধ্যে বিচিত্র বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে সূর্য অস্ত যায়, দূরে শুশুনিয়া পাহাড়ের উপর খুব হালকা একটা গোলাপী আভা কাঁপিতে থাকে। বস্তিটায় ঘরে-ফেরা আর গৃহস্থালীর একটা অস্পষ্ট চাঞ্চল্য উঠে। বালিয়াড়ির পথে লোকের চলাচল আর একটু যায় বাড়িয়া, গতি আর একটু হইয়া পড়ে দ্রুত।…এদিকে একটা মিষ্ট হাওয়া উঠে, তার নরম দোলনিতে এক-আধটা কাঞ্চনের ফুল টুপ টুপ করিয়া পড়ে ঝরিয়া।

জীবনের যেটুকু পায় তাহা পূর্ণও নয়, স্পষ্টও নয়—দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত থাকিয়া একটু আধটু আভাস দিয়া যায় মাত্র; কিন্তু লাগে বড় চমৎকার; এই বিরাটত্বের মধ্যে বসিয়া জীবনে যেটুকু পায় তাহার একটা পূর্ণ, বিরাট রূপ দেখিতে ইচ্ছা করে। থাকিয়া থাকিয়া নিতান্ত অহেতুক ভাবেই মনটা আনন্দের আবেগে ছল-ছল করিয়া উঠে—টুলু বারবারই মনে মনে প্রার্থনা জানায়—হে দেব, যশ নয়, প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা নয়, কোন অমৃত-লোকের পাথেয়ও আমি চাই না; আমায় শুধু চারি দিকের এই জীবনকে পূর্ণতর করে তুলতে দাও, আমার জীবনের সার্থকতাই হোক ঐটুকু—ওর অতীত আর কি চাইবারই বা আছে দেখি না ত…

সন্ধ্যা একটু গাঢ় হইয়া আসিলেই এই সংসার আবার অন্য রূপ ধরে,—ভয় হয় ম্যানেজারের লোক আসিয়া বাড়ি দখল করিল না ত?…ধীরে ধীরে সব দরজায় নিজেদের কুলুপ আঁটিয়া তাহাকে নিতান্তই নিঃসাড়ে বেদখল করিয়া গেল না ত?

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া টুলু ধীরে ধীরে নামিয়া আসে।

১৮

আট দিনের দিন মাষ্টারমশাইয়ের নিকট হইতে একটি খাম পাওয়া গেল। ভিতরে সেক্রেটারির নামে আর একখানি দরখাস্ত, আরও দশ দিনের ছুটির জন্য। টুলুকে লেখা চিঠি বলিতে কিছু নাই, একটা ছোট কাগজে, সেক্রেটারির কাছে নিজে বা বনমালীকে দিয়া দরখাস্তটা পৌঁছাইয়া দিবার কথা; তাহার পরেই আশীর্বাদ। আগের চিঠির মতই ঠিকানার নামগন্ধ নাই। খামের উপর বর্তমান পোষ্ট আপিসের ছাপ।

চিঠি না পাওয়ায় মনটা খারাপ ছিল, পাইয়া কিন্তু আরও খারাপ হইয়া গেল, বিশেষ করিয়া কোন ঠিকানা-না থাকার জন্য। প্রথমটা মনে হইল মাষ্টারমশাইয়ের এটা অবিশ্বাস; না অবিশ্বাস হয়, অবহেলা।…মনকে বুঝাইল—ভুলও হইতে পারে, কিম্বা দরকার মনে করেন নাই। এতেও কিন্তু যে অনাত্মীয়তার ভাবটা ফুটিয়া রহিল তাহা পীড়াই দিল মনকে, একটা অভিমান লাগিয়া রহিল।

চিঠিতে আর একটা জিনিস যাহা দাঁড় করাইল তাহা অধৈর্য। যে সপ্তাহটা কাটিয়াছে সেটাও বেশ শান্তিতে কাটে নাই, তবে একটা আশা ছিল—একটা সপ্তাহ—কোন রকমে কাটিয়া যাইবে, তাহার পর মাষ্টারমশাই ত আসিয়াই যাইতে-ছেন। আরও দশ দিনের ছুটির কথায় হাঁপ ধরিয়া গেল, মনে হইল সে যেন একটা জায়গায় বন্দী হইয়া গেছে। বন্দী

মনের প্রতিক্রিয়া বিদ্রোহ, টুলু মরিয়া হইয়া উঠিল,—না, দশটা দিনের কথা দূরে থাক, সে আর একটা দিনও এ ভাবে কাটাইতে পারিবে না। আজ বাহির হইবেই। বাড়ি বেদখল হয়, আসিয়া উৎপাত লাগাইবে, একাই হোক, পাঁচ জনকে জড়ো করিয়াই হোক; তাহার পরিণাম যাহা হয় হোক না কেন। এ রকম নিশ্চেষ্ট জীবন আর এক দিনও সে সহ্য করিতে পারিবে না।

চিঠিটা পাইল বেলা প্রায় বারোটার সময়। তখনই একটা রসিদ লিখিয়া বনমালীকে ম্যানেজারের বাসায় পাঠাইয়া দিল; বলিল রসিদটা যেন দস্তখত করাইয়া ফিরাইয়া আনে।

বনমালী ফিরিল প্রায় চারিটার সময়, বলিল—"রসিদটি দিলেক নাই।"

"তুই তা হলে…" বলিয়া টুলু চুপ করিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল বনমালী তাহা হইলে চিঠিটা দিল কেন; প্রশ্নটা নিরর্থক জানিয়া আর শেষ করিল না। রাগে কান দুইটা পর্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, মনে হইতেছে যে বনমালীর মারফত এই অপমানটা পৌঁছিল তাহার কাছে; তাহাকে দিয়াই সুদে আসলে সেটা ফেরত দেয়,—টাটকা টাটকিই। কি উপায়ে, ভাবিতে গিয়া এখনই যে সঙ্কল্পটা মনে মনে আঁটিতেছিল তাহার কথা মনে পড়িয়া গেল, বনমালীর দিকে গম্ভীরভাবে চাহিয়া বলিল—"আমি একটু বাইরে যাব আজ বনমালী, তুই বাড়িটা একটু আগলাতে পারবি?"

বনমালী বলিল—"তা যাও না ক্যানে, আমিও ত তাই বুলছিলাম,জোয়ান মরদ হয়েঁ বাবুটি নতুন বৌয়ের মুতোন ঘরে বসে থাকে ক্যানে গো?…তুমি যাও, বাড়ি কুঁথায় যাবে?"

টুলুর একটু হাসিও পাইল, দুঃখও হইল—তাহার সম্বন্ধে চমৎকার ধারণাটি দাঁড়াইয়াছে ত বনমালীর মনে! বলিল—"বাড়ি আর কে উঠিয়ে নিয়ে যাবে? তা নয়, তবে জিনিসপত্র সব ফেলে ছড়িয়ে হঠাৎ চলে গেছেন মাষ্টারমশাই, লক্ষ্য রাখতে হবে ত?"

"তা তুমি যাও, তেনার জিনিসে কে হাতটি দেয় আমি দিখবো বটে—সে আমি দিখবো, তুমি যাও, মাষ্টারমশাইয়ের জিনিসে কে হাতটি দিবেক গো? বনমালী বোষ্টোম জিন্দা থাকতেঁ…তুমি যাও ক্যানে—কোন্ সমুদ্ধিটি হাত দেয় আমি দিখবো না? হঁ!—বনমালী মরে গেইছেঁ গো?"

টুলু একটু আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। বনমালী রীতিমত চটিয়াই উঠিয়াছে, চাটালো বুক আর ছিনে মাথা লইয়া গোখরোসাপের ফণার মত তাহার ঈষৎ বক্র শরীরটা অনেকটা সোজা হইয়া উঠিয়াছে, মুখটা রাঙা, চোখে বিদ্যুৎ—ফণা যেন ছোবল মারিতে উদ্যত হইয়াছে।…বড় আশ্চর্য বোধ হইল টুলুর, কোথায় চোর, কোথায় মাষ্টারমশাইয়ের শত্রু তাহার ঠিক নাই, শুধু উদ্দেশেই এই রকম নিরীহগোছের লোকটা একেবারে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।…টুলু মুখটা ফিরাইয়া কি ভাবিতে লাগিল—অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া গেছে—বহুদূর চলিয়া গেছে তাহার মনটা। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা অমূল্য বস্তু কুড়াইয়া পাইয়াছে যেন, সেইটাকে ঘিরিয়া তাহার কল্পনা হইয়া উঠিয়াছে সচেতন। সেই কল্পনা বাস্তবে কি রকম দাঁড়াইবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যই টুলু মুখটা ঘুরাইয়া বলিল—"মাষ্টারমশাইকে তুমি কি রকম ভক্তি কর আমার অজানা নেই বনমালী, কিন্তু তুমি ত একা, ধর উপর খনির কোন লোক বা কয়েকজন লোক এসে হঠাৎ বাড়িটার ওপর চড়াই করলে…"

বনমালী অতিরিক্ত বিস্ময়ে টুলুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল একটু, যেন বাকস্ফূর্তির মত অবস্থা হইলে বলিল—"তুমি কি বুলছ বাবুমশয়? খনির লোক মাষ্টারমশাইয়ের বাসায় চড়াইটি করবেক! উ তো দেবতাটি আছেঁ গো, খনির কোন্ সুমুদ্ধি উঁর উবগারটি না পাইছেঁ? বিন্দাবনের বৌয়ের বেমারিতে মাষ্টারমশাই ডাগদর-দাবাইয়ের পাই-পাইটি খরচ দিলেক নাই? ছুদ্রন্তের ছাওয়াল যখন মরবার পারা, উ মাষ্টারমশাই আপ্‌নি যেঁয়ে বাঁচালেক নাই? লক্ষ্মণ পাঁজার ঘর জ্বলে গেলোক, সিটি না হয় কোম্পানী আবার তুলে দিলেক, জিনিষ-পত্তোর কে ট্যাকা দিয়ে কিনে দিলেক গো?…"

টুলু নিশ্চল হইয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল, বনমালী লম্বা একটা ফিরিস্তি আওড়াইয়া বলিল—"হ, মাষ্টারমশাইয়ের বাড়ি চড়াই করবেক! উ ঢাক বাজায়েঁ দিলেক নাই তো কি? আমি ই হাতে করে দিয়েঁ এসেছিঁ বটে, আমি জানি না? —আর উ জানে না? উ গো, যিটি উপরে বসে বসে ভালো মন্দ সবটি খাতায় জমা করছে…"

কতকটা রাগের ওপরেই এই পর্যন্ত বলিয়া বনমালী একটু ঠাণ্ডা হইল; তাহার পর টুলুকে আশ্বাস দিয়া বলিল—"না গো, আপনি যাও ক্যানে কুথা যাবে, উ দেবতাটি আছে, সারা খনি উকে দেবতাটি মনে করে, উর বাড়িতে কে ঢুকবেক গো?

টুলু আবার একটু কি ভাবিল, তাহার পর বলিল—"তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ধর্ উনি বাড়ি নেই, শত্রুতা করে কেউ লোক লাগিয়ে দিলে—খনির লোক না হোক্, অন্য লোকদেরই।

বনমালী আবার বিস্মিতভাবে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"হ! উনির শত্রু কে বটে গো? উনির শত্রু কে বটে?"

"শত্রু সবারই হয় বনমালী, মানুষ মাত্রেরই শত্রু আছে।"

"মানুষের থাকবেক নাই কেন গো? মানুষের আছে, কিন্তু উ তো দেবতা বটে।"

একটা মস্ত বড় সুযোগ আপনা হইতে হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, টুলু কোন রকমে প্রকারান্তরে ম্যানেজারের

কথাটা আনিয়া ফেলিয়া ভাবগতিকটা একটু বুঝিয়া লইতে চায় ; বলিল—"কিন্তু দেবতারও তো শত্রু আছে বনমালী।"

"দেবতার শত্রু কে গো ? তুমি কি কথাটি বুলছ ?"

"কেন, দত্যিরা, রাক্ষসেরা ; রামচন্দ্রের শত্রু রাক্ষসদের রাজা রাবণ ছিল না ?"

"হ ছিল, থাকবেক নাই ক্যানে ? তা হিথায় রাকোস কুথা মিলবে বটে ?"

অনেকটা কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, টুলু একটু চুপ করিল, আর কতটা অগ্রসর হওয়া চলে যেন ঠিক করিতে পারিতেছে না, তাহার পর বলিল, "রাবণের ভাই অহি রাবণের নাম শুনেছ বনমালী ?"

"হ, পাতালের রাজা অহি রাবণ ; নাম শুনবোক নাই ? কত যাত্রা দিখলাম বটে, ই গঞ্জডিহিতেই কত যাত্রা দিখলাম।"

খুব পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে, টুলু আবার একটু থামিল, তাহার পর বলিল—"এখানে যেমন যাত্রা দেখেছিলে তেমনি পাতালও তো রয়েছে।"

বনমালী মুখ তুলিয়া চাহিতে বলিল—"কেন তোমাদের খনি ; পাতাল তো আর গাছে ফলে না।"

বনমালী একটু ভাবিয়া যেন মিলাইয়া লইয়া চোখ দুইটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল—"হ, খনিটি পাতাল বটে ; খনিটি পাতাল বটে···তা রাজা কুথা গো ?"

প্রশ্নটা করিয়াই বনমালীর চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ওর মতো দুর্বল মস্তিষ্কেও এক এক সময় হঠাৎ বুদ্ধির স্ফুরণও হয় ; মাথাটা দুলাইয়া দুলাইয়া একটু হাসিয়া বলিল—হ বুঝছি, আপুনি ম্যানেজার বাবুকে বুলছ—ম্যানেজারবাবুটি রাজা হইছে অহি রাবণ হইছে আমি বুঝছি···"

শেষটা এই রকম আপনা হতেই হঠাৎ আসিয়া পড়ায় টুলু একটু থতমত খাইয়া গেল, সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"না তা কি বলতে পারি ? রাজা না হয় হ'ল, তা বলে অহি রাবণ কি বলতে পারি ?"···

বনমালী কিন্তু নিজের ভালেই চলিয়াছে, বলিল—"তা বুলবেক নাই ক্যানে গো ? আপুনি জানো নাই তাই বুলবেক নাই, আমরা জানি, বুলবোক নাই ক্যানে ? উ লোকটি মন্দ বটেক, কত খুন করেছে, কত সব্বনাশটি করেছে, আপুনি জানো নাই তাই বুলবেক নাই, আমরা জানি বুলবেক নাই ক্যানে গো ?

টুলু খানিকক্ষণ বলিয়া যাইতে দিল, তাহার পর আসল কথাটা আনিয়া ফেলিল, বলিল—"আমি অবশ্য বলছি না অহি রাবণ, তবে তোমার কথাই ধরে বলি—বেশ, ম্যানেজারই যদি কোন কারণে লোক পাঠিয়ে শত্রুতা করতে চায়, অত কথা কি, এই আমিই মাষ্টারমশাইয়ের হুকুমে তাঁর বাড়ি আগলাচ্ছি—আমাকেই যদি ওঁর পছন্দ না হয় বাড়ি ছাড়া করতে চায় লোক পাঠিয়ে···"

বনমালী আবার বুকে চাড়া দিয়া কতকটা সোজা হইয়া উঠিল, চোখ মুখ সেই রকম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল—"হ, পাঠাক্ ক্যানে লোক, বনমালী মরে গেইছে বটে ! আজতক আমায় খনির লোক বনমালী খুড়ো বলে ডাকে, আমার ছেলে চরণকে সর্দার বলে মানে বটে ! আপুনি অমন কথাটি বুলো নাই বাবুমশয়, আমার মাথাটি কাটা যায় বটে। মাষ্টারমশাই আপুনিকে সুদ্ধু আমার হাঁথে রেখে গেল—বুঝলে বনমালী, ই ছোকরাটি আমার আপ্পুন জন—ছাওয়ালের পারা, তুমি দেখবেক।···আপুনিকে বাড়িছাড়া করে কুন সুমুন্দী আমি দিখবোঁ···হ দিখবোঁ আমি !"

১৫

অনেকগুলা কথা নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই জানা গেল, মাষ্টারমশাইয়ের চরিত্রের একটা গভীরতম রহস্য পর্যন্ত ; অবশ্য বেশি আশ্চর্য হইল না টুলু।

বাহির হইয়া প্রথমে গেল কর্তাপাড়ায় কাকার বাড়ি। দিন-চারেক হইল মেয়েরা হঠাৎ দেশে চলিয়া গেছে। কাকার সঙ্গে দেখা হইল, দোকানে বাহির হইবার জন্য তৈয়ার হইতে-ছিলেন। মুখটা বেশ ভার ভার। বলিলেন—"চিরকালটা ভবঘুরের মতন ঘুরে বেড়াবি—কেন বাড়িতে থেকে সেবাব্রত হয় না ?"

সেবাব্রত কথাটায় বেশ জোর দিলেন।

টুলু মাথা নিচু করিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

কাকা একটু থামিয়া বলিলেন—"ম্যানেজার বাবুর কাছে সব শুনলাম। কিন্তু আমার এখানে যা কিছু ঐ খনির ভরসাতেই···"

টুলুর মুখ দিয়ে হঠাৎ বাহির হইয়া গেল—"তা হলে কি এ বাড়ি বন্ধ হ'ল আমার ?"

কাকা অসংযতভাবেই চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"তার মানে তাই হল ? খুব তার্কিক হয়েছিস মাষ্টারের শাকরেদি করে ?—যাদের নিয়ে সব, তাদের সঙ্গে একটু মানিয়ে চলতে হবে না ? এই দুশো মাইল দূরে কত কাঠখড় পুড়িয়ে, লোকের কত সাধ্যিসাধনা করে একটা আস্তানা দাঁড় করিয়েছি, হাঘরেদের সঙ্গে হাঘরে হতে গিয়ে সেটা নষ্ট করতে হবে ? দাদাকে লিখেছি, এইখানে এসে থাক, ওসব চলবে না।"

রাগের ঝোঁকেই যেন একটু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

ঠাকুর চাকর ছিল, ভালরকম করিয়া কিছু জলযোগ তৈয়ার করাইয়া পরিতৃপ্তভাবে আহার করিয়া টুলু বাহির হইয়া গেল। আজ মনটা বেশ প্রফুল্ল, কোন কথা গায়ে মাখিতে ইচ্ছা করিতেছে না।

অনির্দিষ্টভাবে খানিকটা ঘুরিয়া বেড়াইল—বাজারে শুধু কাকার দোকানের দিকটা বাদ দিয়া। রোদ মন্দ কড়া নয় তখনও, কিন্তু কড়া কথার মতো রোদও আজ যেন কড়া লাগিতেছে না, মনে হইতেছে এসব অবাস্তব, ঘাড়ে আসিয়া পড়িবেই, তবে গা পাতিয়া লইয়া আস্কারা দিবার দরকার নাই।...ভিতর থেকে জাগিতেছে কাজ করার আনন্দ—না পাইয়াও যাহাতে এত আনন্দ, সমস্ত মন আজ যেন তাহাই হাতড়াইয়া খুঁজিতেছে।

বাজার থেকে গেল বস্তির দিকে। প্রথমটা মনে হইল ভিতরে প্রবেশ করিবে না, তাহার পর কি ভাবিয়া প্রবেশ করিয়াই ফেলিল। প্রবেশ করিয়াই সেদিনকার আসা আর আজকের আসার মধ্যে বেশ একটা প্রভেদ উপলব্ধি করিল। আজ অনেকের দৃষ্টিতে কৌতূহলের সঙ্গে একটা সম্ভ্রমের ভাব রহিয়াছে। সেদিনে খনির মধ্যে হীরক সম্পর্কিত ব্যাপারে অনেকগুলি লোক সমবেত হইয়াছিল, টুলুকে দেখিয়াছিল, টুলু বুঝিল এ তাহারই জের। কয়েকজনই বর্ষীয়ান তাহাকে বেশ ঝুঁকিয়া প্রণাম করিল, এক জন বারান্দা হইতে একটু নামিয়া মৃদু হাস্য সহকারে প্রশ্ন করিল, "কোথায় আগমন হলেন কর্তার?"

টুলু বলিল—"এই একটু বাজার থেকে ফিরছি—ভাবলাম এ দিক হয়েই যাই না হয়।"

একেবারে অকারণে এই রৌদ্রে এতটা পথ ঘুরিয়া যাওয়া নিজের কাছেই কেমন বোধ হওয়ায় কতকটা যেন অজ্ঞাতসারেই জুড়িয়া দিল—"সেই খোকাটি কেমন আছে?"

লোকটি অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিল, আরও আগাইয়া আসিয়া বলিল—দিখবেন তারে? তাই বলি, কর্তা খামোকা এমন রোদে বস্তিতে আলেন ক্যানে..."

এতটা ভাবিয়া বলে নাই, টুলুর মুখটা একেবারে শুকাইয়া গেল,—মনে পড়িল ছেলে লইয়া চম্পার সেই উগ্র মূর্তি মেয়েটির মুখ খামচানো,—আসিয়া আলুথালু বেশে নালিশ করিতেছে—"দেখোঁ, ছাওয়াল কেড়ে নিলেক! আমার জাম্মা ছিঁড়্যা দিলেক!...আমার চুল ছিঁড়্যা দিলেক!...উই চম্পা—চরণদাসের বিটি!..."

আমতা আমতা করিয়া লোকটাকে বলিল—"না, ইয়ে—দেখবার তত দরকার নেই...তোমার গিয়ে আছে কেমন ছেলেটি?..."

লোকটি বুঝিল, একটু ভয়-ভাঙানো গোছের হাসির সঙ্গে বলিল—"না, আপুনি আসুন আজ্ঞে—চরণদাসের বিটি পাগলি আছেঁ—সিদিনটি খেয়ালের মাথাঁয় অমোনটি কর্যেছিল—কিছু বুলবেক নাই...আপুনি আসুন আজ্ঞে—দিখবেন বৈকি..."

বস্তিতে এখনও সবাই কাজ থেকে ফেরে নাই, তবু মেয়ে পুরুষে ছেলের বুড়োর অনেকগুলি লোক জমা হইল। এক জন স্ত্রীলোক বলিল—"আর উ তো পেল্লাদের বৌকেই আবার দিয়ে দিলেক গো।"

লোকটি বলিল—"ঐ শুনুন আজ্ঞে; উ পাগলীটি আছেঁ। আপুনি দিখুন—অতো দয়াটি করলেন—দিখবেন নাই?"

আর একটি মেয়ে সাহস দিবার ভঙ্গিতে বলিল—"আর চম্পা এখন কোথায় গো?—সে তো খনিতে বটে।"

সবাই অগ্রসর হইল। পিছনে চাপা গলায় আলোচনা হইতেছে—"হঁ, ই বাবুই তো ট্যাকা দিলেক, বুললে আরও দিবো তু পুষ ক্যানে..."

"ইরা দেবতা আছে গো, মানুষটি লয়..."

"তা হবেক নাই?—মাষ্টারমশাইর আপ্‌ন জন যে...স্কুলটিতেই থাকা করে..."

কয়েকটা বাসার বারান্দা থেকে ছেলেমেয়েরা দ্রুতভাবে ঘরে ঢুকিয়া গিয়া মায়েদের ডাকিয়া আনিল, কেহ চেনে, কেহ চেনে না, কেহ শুধু কৌতূহল লইয়া, কেহ কৌতূহলের সঙ্গে একটি শ্রদ্ধার স্মিত হাস্যের সঙ্গে আসিয়া বারান্দার খুঁটা ধরিয়া দাঁড়াইল, কেহ নামিয়া আসিয়া সঙ্গ লইল। চাপা প্রশ্ন হইতেছে—"কে বটে গো? কি হইছেঁ?" চাপা উত্তর হইতেছে।

সঙ্কোচ বোধ হইতেছে, তবু বড় ভাল লাগিতেছে টুলুর; সবাই গরীব, বেশীর ভাগই ন্যাকড়া-পরা, অপরিচ্ছন্ন; তবে সবার মধ্যে থেকে একটি অনাবিল শ্রদ্ধা আর প্রীতির ধারা তাহার উপর উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে—কথায়, চাহনিতে, হাসিতে এমন কি সঙ্গে থাকার আগ্রহের মধ্যেও।

ছিয়াত্তর নম্বরের সামনে আসিয়া পড়িল।

"কুথা গো বৌ—ছাওয়ালটিকে বের কর্...চম্পার ছাওয়ালটিকে বের কর্...হীরাটিকে বের কর..." বলিতে বলিতে কয়েকজন মেয়ে বারান্দায় উঠিয়া পড়িল, কয়েকজন ভিতরে ঢুকিয়া গেল। একটু পরেই পেল্লাদের বউ একটি ফুলকাটা পরিষ্কার কাঁথায় মোড়া, রাঙা সালুর জামা পরানো চোখে কাজলটানা শিশুকে কোলে করিয়া সামনে আসিয়া মৃদু হাসিয়া লজ্জিতভাবে দাঁড়াইল। এক জন বর্ষীয়ান বলিল—"ঈস্ রে! চম্পার দশ দিনের পোলার ভাব্যো—ন'টি দিখো!...অ রে!"

সবাই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একটা অদ্ভুত ধরণের—নিতান্তই নূতন ধরণের অনুভূতিতে টুলুর মনটা পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে—এই শিশুটিকেই না সে সেদিন কয়লার ধূলি থেকে নিজের করিয়া তুলিয়া লইয়াছিল?—তারপর চম্পা লইল কাড়িয়া।...সমস্ত ঘটনাটা কেমন যেন রহস্যময় বলিয়া মনে হইতেছে। সেদিন যাহা করিয়াছিল এত কিছু ভাবিয়া করে নাই, খনির সেই আবহাওয়ার মধ্যে অত বড় একটা ট্র্যাজেডিতে অভিভূত হইয়া নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়া তুলিয়া লইয়াছিল ছেলেটি। আজ একেবারে অন্যরকম, মনের ভাবটা গোলমালের মধ্যে গুছাইয়া বুঝিতে পারিতেছে না, তবে মনে হইতেছে—সেদিনের দয়া আজ কি করিয়া মমতায় পরিণত হইয়া গেছে—কেউ নয় অথচ মনে হইতেছে আমারই তো—আমারই তো—আমিই তো তুলিয়া লইয়াছিলাম...

আর, চমৎকার ছেলেটিও, যেন টানিতেছে ; অন্যমনস্ক ভাবেই টুলু দুই পা আগাইয়া যাইতে মেয়েটিও ভুল বুঝিয়া ভুল করিয়া বসিল, বারান্দা থেকে নামিয়া পড়িয়া ছেলেটিকে সামনে বাড়াইয়া ধরিল। টুলু একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া ক্ষণ-মাত্রের জন্ত একটা দ্বিধায় পড়িয়া গেল, তাহার পরই হাতটা বাড়াইয়া একটু হাসিয়া বলিল—"দেবে ?—তা দাও।...কি চমৎকার হয়েছে ছেলেটি। সুন্দর চুলের..." শেষের কথাটি বলিতে বলিতে সবার দিকে ঘুরিয়া চাহিতেই আরও অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া গেল : সমস্ত দলটি—ছেলে বুড়ো সবাই, একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেছে—আর মুখে বিস্ময়, প্রশংসা আর আনন্দের কি যে একটা অপরূপ মিশ্রণ—যেন সবাই সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত, কল্পনার অতীত কোন দৈব লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছে।

একটুর মধ্যে ফিস্‌ফিসানি আর চাপা মন্তব্য আরম্ভ হইয়া গেল—"দেবতাই তো আছেঁ গো, উনিদের কাছে ছোট বড়োটি আছেঁ নাকি ?...হঁ, তুরা কি বুলিস গো।...চম্পা কেড়ে লিলেক, না তো উ তো রাজাটি হোত বটে...আর, পোলা—তারা তো দেবতা গো, দেবতার কোলটি পালেক নাই..."

টুলু এমন একটা সঙ্কোচের মধ্যে পড়িয়া গেছে, কি যে করিবে স্থির করিতে পারিতেছে না, এমন সময় আর একটি শিশু-কণ্ঠে কান্নার রব উঠিল। প্রহ্লাদের ছেলেটি বোধ হয় ঘুমাইতেছিল, জাগিয়া উঠিয়া মাকে কাছে না পাইয়া চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে।

টুলু যেন বাঁচিল, ছেলেটিকে বাড়াইয়া দিতে দিতে বলিল—"ওটি বুঝি তোমার ছেলে ?"

মেয়েটি হাত বাড়াইয়া লইতে লইতে মুখটা একটু নিচু করিয়া হাসিল, কিছু উত্তর করিল না।

ছেলেটিকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টুলুর সে সঙ্কোচের ভাবটা কাটিয়া গেছে ; একটু হাসিয়া বেশ সহজভাবেই বলিল—"তা নিয়ে এসো, ওটিকেও একবার দেখি।"

দলটা আবার নিশ্চুপ হইয়া গেল।...দেবতার লীলার কি শেষ নাই ?

মেয়েটি কিছু না বলিয়া একভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল, শুধু হাসিটি যেন একটু ম্লান, সেই বর্ষীয়ান লোকটি বলিল—"নিয়ে আয় না গো, বাবুমশয় বুলছে..."

মেয়েটি নড়িল না, বলিল—"হঁ, আমার পোলা উনি কি দিখবেন ?—উ মিতিনের পোলার পারা নাকি ?—গরীবটি—কালোটি—জামা নেই শরীলে..."

টুলু হাসিয়া বলিল—"তা হোক, নিয়ে এসো, না দেখে নড়ব না আমি।"

একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। মেয়েদেরও কয়েকজন তাগাদা দিল—"আর না নিয়ঁ।...আবার দাঁড়ায়েঁ থাকে দেখোঁ।..."

একটি মেয়ে মায়ের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই ভিতরে চলিয়া গেল এবং ছেলেটিকে উঠাইয়া আনিল। মাস পাঁচ-ছয়ের ছেলেটি : কালোই, কিন্তু স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যে যেন ভরপুর হইয়া আছে। জামাটামা গায়ে নাই, তবে কোমরে একটা রূপার গোট ঝক্ ঝক্ করিতেছে। বাহিরে আসিয়া হঠাৎ এরকম ভিড় দেখিয়া টানা টানা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া অবোধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"দাও আমায়।"—বলিয়া টুলু বেশ সহজেই ছেলেটিকে চাহিয়া লইল ; হীরকের মতো একেবারে কাদার ড্যালা নয়, একটু প্রাণের চাঞ্চল্য আছে, বেশ সহজেই টুলু একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আদর করিল, প্রকৃতই শিশু-সঙ্গের আনন্দে বুকে বারদুয়েক চাপিয়া ধরিল, তাহার পর বোধ হয় মনের আবেগে এদের ভাষা নকল করিয়াই বলিল—"ইটি তো নাড়ু-গোপালটি আছেঁ বটে গো।"

এমন কিছু হাসির কথা নয়, তবে অন্তরের আনন্দকে মুক্ত করিয়া দিবার এক সুযোগ পাইয়াই যেন সমস্ত দলটা হাসিতে ভাঙিয়া পড়িল। কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে আনন্দের চোটে কুঁজা হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে দুলিয়া দুলিয়া বলিতে লাগিল—"আমাদের কথাঁ বুলছেঁ গো বাবুটি...নাড়ু-গোপালটি আছেঁ বটে নাড়ু-গোপালটি আছেঁ বটে...টুলু যেন একেবারেই মিশিয়া গেছে এদের সঙ্গে, সঙ্কোচের আর এতটুকুও কোথাও নাই, চারি দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"এত হাসি কেন তোমাদের গো ? নয় নাড়ুগোপালের মতন ? কেমন গোল গোল হাত, গোল গোল পা—"

মেয়েটি লজ্জিতভাবে বারান্দার এক পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, টুলু তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমার ছেলের দিব্যি করে চূড়া বেঁধে দিও গো, ঠিক নাড়ুগোপালটির মতন দেখতে হবে।"

হাসির যেন পথ খুঁজিতেছে সবাই—আবার হাসি ছল-ছলিয়া উঠিল।...চূড়া বেঁধে দিস...খোকাটির চূড়া বেঁধে দিবে।"

টুলু ছেলেটিকে ফিরাইয়া দিয়া, তাহার পর পকেটে হাত দিয়া ভিতরেই ব্যাগের মুখে খুলিয়া দুইটা টাকা বাহির করিল, মেয়েটির দিকে বাড়াইয়া বলিল—"এই ধরো, তোমার ছেলেটিকে হীরার মতন একটা জামা করে দিও...নাও, নেবে বৈকি..."

মেয়েটি নড়িল না, একবার দেখিয়া লইয়া লজ্জিতভাবে মুখটি গুঁজিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। যে মেয়েটি শিশুটিকে লইয়া ছিল সে শিশুর হাতটা বাড়াইয়া ধরিল, বলিল—"লিবেক, লিবেক নাই ক্যানে গো ? আপুনি দাও ক্যানে, জামা করায়েঁ দিবেক।"

টাকা পাইয়া শিশুটি মুখে পুরিতেই এক জন বলিয়া উঠিল—"হঁ, জামা পেটের মধ্যে ঢুকলোক।"

আবার একটা হাসির লহর উঠিল।

টুনু আবার পকেটে হাত দিয়েছে, সমস্ত অন্তরাত্মা চাহিতেছে হীরুকের হাতেও দুটি টাকা দেয়, কিন্তু কোথা থেকে সেই সঙ্কোচ আসিয়া জুটিয়াছে আবার, হাতটা কোন মতেই যেন বাহির করিতে পারিতেছে না। একটি মেয়ে বলিল—"আর হীরাটির কি দোষ হইছে গো?"—বলিয়াই হাসিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

"হীরা বাবুরও চাই? তা এই নে।...ওর বরং একটা গোট করে দিস, কেউ কারুর হিংসে করবে না তা হলে।"

দুইটা টাকা বাহির করিয়া দিতে অপর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল—"দু ট্যাকায় গোট হয় নাকি গো?"

...বলিয়াই হাসিয়া প্রথম মেয়েটির ঘাড়ে মুখ গুঁজিয়া দিল।

হয় না যে টুনুর তো জানা, তবে দুই শিশুর মধ্যে ইতর-বিশেষ করিতে রাজি হইল না। হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, আমি বেশি দিই আর তোদের চম্পা এসে সেদিনকার মতন রসাতল কাণ্ড করুক—"বড় মানুষটি হইছে। ট্যাকার গুমোর দেখাইছে।"

নিজেও হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, ওদের কেহও বাদ গেল না।...হাসির জাত নাই, হাসিতে হাসিতে সব যেন একাকার হইয়া গেল।

বস্তি থেকে এদিক দিয়া স্কুলে যাইবার পায়ে-হাঁটা পথ আছে দুইটা,—একটা একটু সোজা, সেটা দিয়া চম্পা রোজ যায়, আর একটা একটু ঘুরিয়া। বোধ হয় এত শীঘ্র বাসায় ফিরিবার ইচ্ছা না থাকায় টুনু দ্বিতীয় পথটাই ধরিল। এই পথে বস্তি আর স্কুলের মাঝামাঝি একটা প্রকাণ্ড বট গাছ আছে, এই বিরলপাদপ দেশে বড় বিশিষ্ট দেখায়। তাহার তলাটিতে আসিয়া টুনু একটা পাথরের উপর বসিল। মনটা আজ পূর্ণ হইয়া আছে—এ ধরণের পূর্ণতা টুনু জীবনে আর কখনও অনুভব করে নাই। এই পূর্ণতার পরিধির মধ্যে আজ সমস্তকেই টানিয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছে—কোথাও কিছু একটুকেও বাদ না দিয়া—। অতীত জীবনের দিকে চাহিয়া কেবলই মনে হইতেছে (কাহার সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া হইয়াছিলাম বাহির) আজ বস্তির মাঝে মনে মনে ঐ বাধাহীন, জাতিহীন, পূর্ণ মিলনের মধ্যে যাঁর আনন্দময় রূপকে প্রত্যক্ষ করিলাম, আশ্রমে আশ্রমে কি তাঁহার সন্ধানেই বৃথা অন্বেষণে ঘুরিয়া মরিয়াছি? এত সহজের জন্য অত তপস্যার কিই বা প্রয়োজন? তিনি যখন এমনি করিয়া পথের ধুলা মাড়াইয়া চলিয়াছেন তখন কি ফল তোমার দৃষ্টিকে অমন আকাশ-লগ্ন করিয়া?

জায়গাটি বড় স্নিগ্ধ। বস্তির আর এদিক ওদিকের যত কিছু গরু-বাছুর, ছাগল, ভেড়া এই কেন্দ্র করিয়া সমস্ত দিন থাকে চরিতে, তাদের রক্ষী ছেলেমেয়েরা এর ছায়ায় করে খেলা। টুনু নিজের আনন্দকে কেন্দ্র করিয়া অনেকক্ষণ রহিল বসিয়া। আর সব খেলা সাধারণ, একটি খেলার দিকে বিশেষ করিয়া টুনুর নজর গেল, বড় নূতন ধরণের খেলা, যেমন নূতন, তেমনি মর্মস্পর্শী।

কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভিক্ষে-ভিক্ষে খেলা করিতেছে। বটগাছের ধারেই একটা খোয়াই, সুতার মতো একটা জলের ধারা আছে, কোথাও কোথাও তাহাই একটু মোটা হইয়া গিয়া খানিকটা করিয়া জল জমিয়াছে; এইটা হইয়াছে বরাকর গাং, এক দল যেন সেই গাঙে মেলায় স্নান করিতে যাইতেছে, আর পাঁচ-ছয়টি ছেলেমেয়ে—যাহারা একেবারেই ন্যাকড়া-পরা তাহারা হইয়াছে ভিখারী; সারি সারি বসিয়াছে, যাত্রীদের কাছে বিনাইয়া বিনাইয়া ভিক্ষা চাহিতেছে—যে যত বিনাইয়া বলিতে পারিতেছে তাহার যেন তত বাহাদুরি—"এ বাবুমশয় গো, একটা পয়সা দি—ন বটে, দু'দিন খেতে পাই নাই গো...দাও মা, তুমার কোলে রাঙা সোনা দিবেক মা গঙা...দুটি পয়সা দাও বটে গো—"

একটা ছেলের মাথায় নূতন আইডিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ উঠিয়া পড়িল এবং কোমরের ন্যাকড়াটুকু খুলিয়া ফেলিয়া সামনে বিছাইয়া বসিল, বাস্তবের সঙ্গে কতটা মিল আনিয়া ফেলিয়াছে সেই গর্বে সবার দিকে চাহিয়া বলিল—"তুরা দেখ, কাপড়টি না থাকলে উরা দিবে কুথায়?"

তিনটি ছেলে, বাকি ছেলে দুইটিও বিবস্ত্র হইয়া সামনে কাপড় পাতিল। দুটি মেয়ে একটু লজ্জিত ভাবে হাসিয়া আরও গুটাইয়া-সুটাইয়া বসিল। আবার ভিক্ষা চাওয়া চলিল। একটি মেয়ে হঠাৎ উঠিয়া পড়িল এবং পাশের ছেলেটির ন্যাকড়াটা খপ করিয়া তুলিয়া লইয়া খোয়াইয়ের দিকে ছুটিল। ছেলেটি ওর ভাই—"দিদি, দিদি গো!"—বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মেয়েটি দাঁড়াইল না—"তু খোস ক্যানে, আমি সবাইকে হারায়ে দিব, তু দিখবি..." বলিতে বলিতে ছুটিয়া গেল। একটুর মধ্যেই ন্যাকড়াটা ভিজাইয়া সবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সেটা গায়ে মাথায় জড়াইয়া বসিয়া পড়িল এবং দুলিয়া দুলিয়া কাতরানি আরম্ভ করিয়া দিল। একটি যাত্রীছেলে আহ্লাদে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল—"হুঁ—তু ঠিক তুর দিদিমার পারা হইছিস বটে!"

বড় কৌতূহল হইল টুনুর; মেয়েটিকে ডাকিল। সে একটু ভ্যাবচাকা খাইয়া গেলে ছেলেটি বলিল—"যা না, কিছু বুলবেক নাই।"

মেয়েটি একটু কুণ্ঠিত পদে আসিয়া দাঁড়াইতে প্রশ্ন করিল—"তুই কার মেয়ে?"

মেয়েটি ঘাড় নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া আড়চোখে এক বার সঙ্গীদের পানে চাহিল, ছেলেটি বলিল—"উ কারুর মেয়ে লয় গা, উর দিদিমার নাতনি বটে।"

টুনু মেয়েটিকেই প্রশ্ন করিল—"তোর বাপ মা নেই?"

মেয়েটি এক বার ঘাড় নাড়িল, তাহার পর বলিল—"না।"

'দিদি'মা কি করে ?"

"ভিকে।"

ছেলেটি বলিল—"সিটি আগে খনিতে কাজ করত; চোখ গেইছেঁ।"

টুলু মেয়েটিকেই প্রশ্ন করিল—

"কোথায় ভিকে করে ?"

"বাজারে!"

"খনির বাবুরা খেতে দেয় না ?—ম্যানেজার বাবু ?"

মেয়েটি একটু অবোধভাবে শুধু মুখ তুলিয়া চাহিল। ছেলেটি বলিল—"উ কাজ করে নাই, খেতে দিবেক ক্যানে গো ?"

টুলু আবার মেয়েটিকেই প্রশ্ন করিল—

"উটি তোর ভাই ?"

"হুঁ।"

"কোথায় থাকিস তোরা ?"

"কুথাও লয়।"

"গায়ে ভিজে ন্যাকড়া জড়িয়েছিস কেন।"

"দিদিমাটি জড়ায় বটে।"

"কেন ?"

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল সেই ছেলেটি, বলিল—

"চণ্ডাল রোদটি বটে যে গো, সিখানে গাছ নাই, ভিজা কাপোড়টি জড়ায়ে বসে থাকে।…বুড়ি কতো চালাকটি বটে!"

এত গাম্ভীর্য ওর সহিতে পারে না, শেষের কথায় সবাই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। দলটা আসিয়া জমিয়াছিল—"চালাকটি বটে!…বুড়ি চালাকটি বটে!"—বলিতে বলিতে সমস্ত দলটা যেন হাসিতে ছিন্নভিন্ন হইয়া জড়াইয়া পড়িল।

টুলু স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল, চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে, যা বোধ হয় বহু—বহু দিনই হয় নাই উহার। মেয়েটির পিঠে হাত দিয়া একটু কাছে টানিয়া লইল, বলিল—"না, ওরকম করে ভিক্ষে-ভিক্ষে খেলিস নি…মা-লক্ষ্মী তা হলে ভিক্ষে দেন না।"

শেষের কথাটায় নিজেই একটু যেন চমকিত হইল,—মাষ্টারমশাইয়ের মুখের এমন ঠাকুর-দেবতা ঘেঁসা ব্যঙ্গটা তাহার মুখে হঠাৎ আসিয়া পড়িল কি করিয়া!

একটু অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিল, হাতটি পিঠেই আছে; তাহার পর বলিল—"তোর দিদিমাকে কাল সকালে মাষ্টার-মশাইয়ের বাসায় নিয়ে আসবি।…ঐ স্কুল দেখতে পাচ্ছিস তো ?—তার পাশেই ওই বাসা।" ক্রমশঃ

পারাবত

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

উড়ে যায় শাদা পারাবত।
নীল শূন্য ভেঙে দিয়ে ডানায় ডানায়
ভেসে চ'লে যায়:
স্বর্গগামী রথ।
ডানার ঝাপট লেগে: রথের চাকার তলে গুঁড়ো-
গুঁড়ো পথ।
উড়ে যায়, উড়ে যায় শাদা পারাবত।

স্বর্গ সে কোথায় ?
শুধুই অসীম শূন্যে ডানা ঝাপ্টায়
পারাবত দু'টি শাদা-শাদা;
(স্বর্গ কি কোথাও আছে ? সে প্রশ্নের হয় না সমাধা)
তবু বুঝি স্বর্গ থাকে নীল-নীল মেঘে-মেঘে বাঁধা।

পারাবত উঠে চ'লে গেছে,
উড়ে-উড়ে স্বর্গ-সিঁড়ি পার কি হয়েছে ?
গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে কি বাধা সে তাহার,—
শত-শত মেঘ-অন্ধকার ?
তারপর বুঝি আছে স্বর্গের সীমানা!
জানি না, উধাও শুধু পারাবত-ডানা।

পারাবত নয়-নয় আমাদের মন,
হৃদয়ের নীল শূন্যে করে বিচরণ।

কামিনী রায়

(১৮৬৪-১৯৩৩)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত জীবনী

কামিনী রায়ের জীবদ্দশায়, ১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় "আলো ও ছায়া-রচয়িত্রী" নামে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; ইহা সম্ভবত. সম্পাদিকা স্বর্ণ-কুমারী দেবীর রচনা। ইহা হইতে কামিনী রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৈদ্য-পরিবারে কামিনী দেবীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বনামখ্যাত গ্রন্থকার চণ্ডীচরণ সেন। কামিনী দেবীর পিতামহ ও পিতামহী অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ ও ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রভাব তাঁহাদের পুত্রের ও কিয়ৎপরিমাণে পৌত্রীর জীবনে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।...

"কামিনীর চারি বৎসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ হয়। মাতার নিকটেই তিনি বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ ও শিশুশিক্ষা ২য় ভাগ শেষ করেন। দেড় বৎসর ধরিয়া শিশুশিক্ষাখানি ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে বইখানি আদ্যোপান্ত তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। মাতা যখন রন্ধনশালে রাঁধিতেন বা শ্বশুরের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকিতেন, কামিনী তখন মাটির দোয়াতে স্বগৃহে ও স্বহস্তে নির্ম্মিত এক দোয়াত কালি ও এক তাড়া তালপাতা ও একটা খাকের কলম লইয়া লিখিতে বসিতেন। লেখাপড়া শেষ হইলে তালপাতাগুলি গুছাইয়া একটা বস্তনীর মধ্যে ভরিয়া তদুপরি কলম রাখিয়া ও কলমের উপর ললাট রাখিয়া নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করিতেন—

> "লাগ্ লাগ্ সরস্বতী মোর কণ্ঠে লাগ্
> যাবজ্জীবন তাবৎ থাক্
> আমার ভাগ্যে গুরুর যশ
> দিনে দিনে বিদ্যা বাড়িতে থাক।"
> "স্বং স্বং সরস্বতী নির্ম্মল বরণে
> রত্ন বিভূষিত কুণ্ডল কর্ণে
> উজ্জ্বল মুকুতা গজমতিহারে
> দেবী সরস্বতী বর দেও আমারে
> বীণাপুস্তক রঞ্জিত হস্তে
> ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।"

"স্কুলে আসিবার কিছু দিন পরেই অপার প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান পাইলেন। পিতা তাঁহাকে গণিত এমন সুন্দর শিখাইয়াছিলেন যে, ক্লাসে সে সময়ে কেহই গণিতে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তাঁহাদের গণিতের শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ বসু তাঁহাকে গণিতের পারদর্শিতার জন্য লীলাবতী আখ্যা দিয়াছিলেন। ১৪ বৎসর বয়সে মাইনর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই সময় কামিনীর পিতা জলপাইগুড়ির মুন্সেফ। পিতা চিরকালই অধ্যয়নশীল ছিলেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ক গ্রন্থরাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ রুচি থাকাতে এই সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক তাঁহার পুস্তকাগারে ছিল। মাইনর পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে আসিয়া কামিনী সমস্ত সময়ই এই পুস্তকাগারে কাটাইতেন।

"বাল্যকাল হইতেই কামিনী ভাবুকতাপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয় ছিলেন।

"অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কামিনী প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। পদ্য রচনা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত উপহার দিলেন। তাঁহার যখন নয় বৎসর বয়স তখন তাঁহার পিতা দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁ সবডিভিসনে মুন্সেফ হইয়া যান। সে সময়ে সে স্থানে যাইতে হইলে কতকটা পথ গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত; সপরিবার তথায় যাওয়া সুবিধাজনক নহে বলিয়া স্ত্রী ও কন্যাগণকে কেশববাবুর ভারতাশ্রমে রাখিয়া পিতা একাই কর্ম্মস্থানে গেলেন। ইহার কিছু দিন পরে কামিনী [মিস একরয়েড-প্রতিষ্ঠিত] হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়ে বোর্ডার হন। ছয় মাস কাল এখানে থাকিয়া তাহার পর আবার পিতার কর্ম্মস্থান মাণিকগঞ্জে ফিরিয়া আইসেন। ইহার পরবর্তী দেড় বৎসর কাল পিতাই কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রতি দিন সকালে উপাসনার পরই হয় বাইবেল না হয় অন্য কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে অংশ-বিশেষ কন্যার পাঠের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন; *Morning & Evening Meditations* নামক পুস্তক হইতেও প্রতি দিন একটি করিয়া কবিতা মুখস্থ করিতে দিতেন। যেখানে যাহা কিছু সুন্দর পড়িতেন, কন্যাকেও সেগুলি পড়াইতেন। ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল সব বিষয়ই নিজেই পড়াইতেন। বার বৎসর বয়সের সময় আবার কামিনীকে বোর্ডিঙে পাঠান হইল। স্কুলে পাঠাইবার সময় পিতা কন্যাকে বলিয়া দিলেন যে সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে, "My life has a mission."

"ষোড়শ বর্ষে [১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন ফিমেল স্কুল হইতে] কামিনী প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি বাঙ্গালা ভাষাই দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর দুই বৎসর পড়িয়াই [১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন স্কুল হইতে] F. A. পরীক্ষা দেন এবং [দ্বিতীয়

বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া] সংস্কৃত ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। আবার দুই বৎসর পরে [১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন কিমেল স্কুল হইতে] B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষায় দ্বিতীয় ক্লাস অনার পাইয়াছিলেন।...

"১৮৮৬ সালে কামিনী বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রণীত 'আলো ও ছায়া' ১৮৮৯ সালে বাহির হয়।...কোন সমাজের কোন দিকই কামিনীর ভাল করিয়া দেখিবার অবসর বা সুবিধা ঘটে নাই। সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার বড়ই কম। তাঁহার আদর্শ বেশীর ভাগ ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্য-জগৎ হইতে লব্ধ ও কল্পনা-প্রসূত। কাজেই তাঁহার কবিতাগুলি পুরাতন ছাঁচে ঢালা হইতে পারে নাই।

"১৮৯৪ সালে ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত কামিনীর বিবাহ হয়। ইনি বহুপূর্ব্ব হইতেই কামিনীর গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হইবার পর ইংরাজীতে তাহার এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। বিবাহের পর কামিনীর কেবল একখানি পুস্তক 'গুঞ্জন' বাহির হইয়াছে। কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার কোন বন্ধু অনুযোগ করাতে, কামিনী তাঁহার সন্তানগুলিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "এইগুলিই আমার জীবন্ত কবিতা।" স্বামিসেবা, গৃহকর্ম্ম ও সন্তানপালনই তাঁহার নিকট পত্নী ও জননীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় এবং তাহাতেই তাঁহার সমুদয় অবসর ও শক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে।"

কামিনী রায়ের সুখের সংসারে সহসা শোকের গভীর ছায়া পড়িল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামীকে হারাইলেন। ইহার চারি বৎসর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোকেরও মৃত্যু হয়। আঘাতের পর আঘাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এত শোক-দুঃখের মধ্যেও তিনি সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত হন নাই। শেষ জীবনে তিনি জনহিতকর কার্য্যে —বিশেষ করিয়া নারীকল্যাণ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ (১১ আশ্বিন ১৩৪০) তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল।

কবি কামিনী রায়

সাহিত্য-সেবা

কামিনী সেন আট বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার "সুখ" নামে সুপরিচিত কবিতাটি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিবার ছয় মাস পূর্ব্বে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রচিত হয়। পর-বৎসর তাঁহার পিতা মেদিনীপুরে বদলি হন। এই সময়ে স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্র 'মেদিনী'তেই বোধ হয় তাঁহার রচনা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন :—

"'মেদিনী' নামে মেদিনীপুরে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। পিতা তাহার জন্ত আমাকে কবিতা দিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে "প্রার্থনা" ও "উদাসিনী" শীর্ষক দুইটি কবিতা দিয়াছিলাম, ইহাদের একটিও 'আলো ও ছায়া'য় স্থান পায় নাই।...'আলোচনা' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রসন্নময়ী দেবীর লিখিত "কেন মালা গাঁথি—কুমারীর চিন্তা" শীর্ষক কবিতা পড়িয়া আসিয়া পর দিন "সঞ্জীবনী-মালা" লিখি। প্রসন্নময়ী প্রবীণা বিবাহিতা—কুমারীর চিন্তা লিখিলেন, আমি কুমারী হইয়া প্রবীণার মত তাহার উত্তর দিলাম। এ এক তামাসা!"* ('বঙ্গের মহিলা কবি', পৃ. ৮১)

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কামিনী সেনের 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয়। পুস্তকে রচয়িত্রী-হিসাবে তাঁহার নাম ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, "প্রথম জীবনে, কেবল প্রতিকূল সমালোচনা বা উপেক্ষার ভয়ে নহে, এক দারুণ লজ্জাবশতঃই আপনার নিভৃত চিন্তাগুলি অবগুণ্ঠন-মুক্ত করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতাম না। সেই লজ্জা ও ভীরুতা দূর করিবার জন্ত আমার নাম, ধাম ও নারীত্ব গোপন রাখিয়া, কোন পূজনীয় পিতৃবন্ধু কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 'আলো ও ছায়া'র পাণ্ডুলিপি লইয়া যান" ('অর্ঘ্য': নিবেদন)। হেমচন্দ্রের লিখিত ভূমিকা সহ পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় হেমচন্দ্র লেখেন :—

"এই কবিতাগুলি আমাকে বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে; স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীর ভাবে পরিপূর্ণ যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। ফলত বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি।

কবিতাগুলি আজকালের 'ছাঁচে' ঢালা।...বস্তুতঃ কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা, এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি। পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি। আর, বলিতেই বা কি স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে!"

'আলো ও ছায়া'র এমন কোন কোন কবিতা আছে যাহা বিষয়-গৌরবে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বগামী। কবি একখানি পত্রে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে জানাইয়াছিলেন :—

"আমার মনে হয় আমি কিছু অকাল-পক্ক ছিলাম। কতকগুলি বিষয় আমি রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কিন্তু তিনি যখন লিখিয়াছেন অনেক সুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন। যাহা শীঘ্র বাড়ে, তাহা শীঘ্রই নষ্ট হয়, প্রকৃতির মধ্যে ইহা সর্ব্বদাই দেখি। অশ্বত্থ বটাদি বনস্পতি ধীরে বাড়ে, যত দীর্ঘায়ু হয়, লাউ কুমড়া শশা অন্ত শাকাদি সে রকম হয় না। দু দিনে বাড়ে দু দিন বাদে মরে। যে সব ছেলে precocious তাহাদের মধ্যে কেহই বড় হইয়া বড়লোক হয় না। আমার মধ্যেও একটা precocity ছিল, কিন্তু বয়সের সঙ্গে শক্তি বৃদ্ধি দেখা গেল না। অবশ্য সারাজীবন কতকগুলি প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়াই আসিতে হইয়াছে। সাহিত্যের সাধনা ও অনুশীলনের সুযোগ ঘটে নাই। মনের জড়তাও ছিল।"—'বঙ্গের মহিলা কবি', পৃ. ৮৩-৮৪।

'আলো ও ছায়া' অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা লাভ করিল; কবির নাম বেশী দিন গোপন রহিল না। কাব্যখানি সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। অতঃপর মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় 'আলো ও ছায়া'-রচয়িত্রীর রচনা মাঝে মাঝে আমাদের নজরে পড়ে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' প্রকাশিত হইলে, উহার প্রথম বর্ষে (ইং ১৮৯০) কামিনী সেনের "যমুনা-কল্পনা" ও চতুর্থ বর্ষে (ইং ১৮৯৩) "ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ" প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মাল্য ও নির্ম্মাল্য' তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল; তিনি মহিলা-কবিদের শীর্ষস্থানীয়া বলিয়া পরিগণিতা হইলেন।

শেষের দিন সমীপবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া কবি তাঁহার প্রকাশিত-অপ্রকাশিত বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি কোনরূপ নির্ব্বাচন না-করিয়াই 'দীপ ও ধূপ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার যশ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে—কেহ কেহ এরূপ অনুযোগ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন :—

"যে যাত্রার পর প্রত্যাবর্ত্তন নাই, তাহার জন্ত উন্মুখ হইয়া আছি; বাছাবাছির দিকে মন দিতে পারিতেছি না। দেশান্তরে যাইবার সময় কেহ যেমন বহু দিনের সঞ্চিত অনেক কাজের এবং অকাজের সখের জিনিষ প্রতিবাসীদের মধ্যে বিলাইয়া যায়, তাহাদের দামের কথা ভাবে না, অন্ততঃ কিছু দিন কাজে আসিবে বা ভাল লাগিবে এই মনে করিয়াই খুশী হয়, আমার এই কবিতাগুলিও সেইভাবেই দিয়া আমি খুশী।"

যাহা আছে রেখে যাই, বাছিতে সময় নাই,
বুঝি না জমেছে কীত বড়;
কি যে তার দামী, কি যে ফেলো,
কি যে শুধু কথা এলোমেলো,
কতটুকু প্রাণহীন কতটুকু বাঁচিবার মতো।

("অনির্ব্বাচন")

* 'নীহারিকা'-রচয়িত্রীর (প্রসন্নময়ীর) রচনাটি ১২৯২ সালের বৈশাখ-সংখ্যা (ইং ১৮৮৫) 'আলোচনা'য় প্রকাশিত হয়। উত্তরে কামিনী সেন পরবর্ত্তী ভাদ্র-সংখ্যা 'আলোচনা'য় "জনৈক বঙ্গ মহিলা" এই নামে "কোন্ প্রাণে গাঁথ মালা আর? (সন্ন্যাসিনীর উক্তি)" লিখিয়াছিলেন; ইহাই "সঞ্জীবনী মালা" নামে 'আলো ও ছায়া'য় মুদ্রিত হইয়াছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে সম্মান

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক' দান করিয়া কামিনী রায়কে সম্মানিত করেন। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও তাঁহাকে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

গ্রন্থাবলী

কামিনী রায় যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। বন্ধনীমধ্যে সন-তারিখযুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **আলো ও ছায়া** (কাব্য)। ইং ১৮৮৯ (১ নবেম্বর)। পৃ. ১৬৮।

ইহার পরিশিষ্ট ভাগে দুইটি খণ্ডকাব্য—মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীক মুদ্রিত হইয়াছে।

২। **নির্ম্মাল্য** (কাব্য)। ? (১ এপ্রিল ১৮৯১)। পৃ. ৮০।

৩। **পৌরাণিকী** (কাব্য)। ১৮১৯ শক (ইং ১৮৯৭)। পৃ. ৬০।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় সমালোচিত।

৪। **গুঞ্জন** (শিশুরাজ্যের কবিতা)। ১৩১১ সাল (১৫ মে ১৯০৫)। পৃ. ৬৬।

৫। **ধর্ম্মপুত্র** (গল্প)। ১৩১৪ সাল (১৫ জুলাই ১৯০৭)। পৃ ৪২।

"কাউন্ট টলষ্টয় প্রণীত [Godson] গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনুবাদিত।"

৬। **অশোক-স্মৃতি** (জীবনী)। (২ জুন ১৯১৩)। পৃ. ৩২।

৭। **শ্রাদ্ধিকী** অর্থাৎ শ্রাদ্ধবাসরে বিবৃত কতিপয় সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। ইং ১৯১৩ (৪ জুন)। পৃ. ১০৩।

ইহাতে কবির পিতা—চণ্ডীচরণ সেনের জীবনচরিতও আছে।

৮। **মাল্য ও নির্ম্মাল্য** (কাব্য)। ইং ১৯১৩ (২৫ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৬০।

৯। **অশোক-সঙ্গীত** (সনেটগুচ্ছ)। ইং ১৯১৪ (২৩ ডিসেম্বর)। পৃ. ৫৮।

"অশোক-সঙ্গীত শোকার্ত্ত হৃদয় হইতে উত্থিত।"

১০। **অম্বা** (নাট্যকাব্য)। ইং ১৯১৫ (৮ এপ্রিল)। পৃ. ১০৪।

ইহা ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত।

১১। **সিতিমা** (গদ্য নাটিকা)। ইং ১৯১৬ (১৭ এপ্রিল)। পৃ. ৬২।

১২। **Some Thoughts on the Education of our Women.** 1918. p. 27.

১৩। **বালিকা শিক্ষার আদর্শ**—অতীত ও বর্ত্তমান (নিবন্ধ)। ? (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ৩৫।

১৪। **ঠাকুরমার চিঠি** (কবিতা)। ? (১৭ মে ১৯২৪)। পৃ. ২৩।

১৫। **দীপ ও ধূপ** (কাব্য)। ইং ১৯২৯। পৃ. ১৭৬।

১৬। **জীবনপথে** (সনেটগুচ্ছ)। ইং ১৯৩০। পৃ. ৭০।

পত্রাবলী

আমরা কমিনী রায়ের দুইখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পত্র দুইখানি 'হেমচন্দ্রে'র গ্রন্থকার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষকে লিখিত। কি সূত্রে হেমচন্দ্রের সহিত কবির আলাপ-পরিচয় হয় এবং হেমচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাই বা কিরূপ ছিল, পত্র দুইখানি হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

হাজারিবাগ
২রা মার্চ, ১৯১৮

মান্যবরেষু— … …

আপনি কবিবর হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখিবেন জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু আমি তাঁহার জীবনের কথা কিছুই জানি না। বাল্যকাল হইতে তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়াই তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি আমার পিতৃদেবের 'বন্ধু' ছিলেন ঠিক এ কথাও বলা যায় না। আমার পিতৃদেবের পাঠ্যাবস্থায় তিনি হেমবাবুর নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য পাইয়াছেন এই কথা শুনিয়াছি।

আমি জীবনে একদিন মাত্র তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। তখন 'আলো ও ছায়া' যন্ত্রস্থ।

আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয় ইতিপূর্ব্বে আমার কবিতার খাতাগুলি লইয়া তাঁহাকে দেখিতে দেন এবং তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। আমি অবশ্য ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতাম না। খাতাগুলি আমি ডাক্তার পি. কে. রায়কেই দেখিতে দিয়াছিলাম।—কবিবর কতগুলি কবিতার উপরে 'সুন্দর' Beautiful ইত্যাদি এবং খাতার উপরে A true poet লিখিয়া দুর্গামোহন বাবুর হাতে ফিরাইয়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "এ ছেলেটি কে হে?" দুর্গামোহন বাবু বলিলেন "ছেলে নয় মেয়ে।" তিনি অতিশয় আনন্দ এবং বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমার কবিতা তাঁহার মত লোকের ভাল লাগিয়াছে জানিয়া আমার ভয় ও সঙ্কোচ কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। তিনি ভূমিকা লিখিয়া দিবেন জানিয়া কবিতাগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইতেও আর দ্বিধা রহিল না। যখন কয়েক ফর্ম্মা ছাপা

হইয়াছে, একদিন সকাল বেলা মিসেস পি. কে. রায় (৺দুর্গা-মোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা) আমার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার পত্রে জানিলাম আমার সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে কবিবরকে তাঁহারা আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি কলেজের কাজ হইতে ছুটি লইয়া তাঁহাদের রডন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে আসিলাম। সেখানে হেমচন্দ্রের সহিত উমাকালী মুখোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়েরা আসিয়াছিলেন। কবি তাঁহার নব-রচিত গঙ্গা-স্তোত্রটি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। আহারের পর উমাকালী বাবু তাঁহাকে তাঁহার নিজের কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে বলিলেন। তিনি কবিতাবলী হইতে "হায় বসুন্ধরা তোমার কপালে" ইত্যাদি কয়েক ছত্র পড়িয়া বলিলেন, "না, মিস সেনের কবিতা হইতে পড়ি।" তখন খুব ভাবের সহিত 'বর্ষ-সঙ্গীত' পড়িয়া শুনাইলেন।

এই দেখাসাক্ষাতের পর তিনি আমাকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সে স্নেহপূর্ণ চিঠিগুলি সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি আমার চিঠি পড়িয়া আমার কবিতার মত আমার গদ্য-রচনারও খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। আসল কথা তিনি দোষ খুঁজিতেন না, গুণ খুঁজিতেন; সৌন্দর্য্য দেখিবার চেষ্টা থাকিলে সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

তাঁহার প্রথম লিখিত ভূমিকাতে আমার নারীত্বের উল্লেখ ছিল বলিয়া উহাতে আমার আপত্তি হয়। তিনি সেই জন্য দ্বিতীয় বার ভূমিকা লিখিয়া দিলেন। উহাই 'আলো ও ছায়া'র দিকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার এই বিশ্বাস।

তিনি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত 'আলো ও ছায়া'র সমালোচনাগুলির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন এবং কোন কাগজে সমালোচনা বাহির হইলে সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত আমাকে জানাইতেন। কয়েক মাস পরে হঠাৎ তিনি চিঠি লেখা কেন বন্ধ করিলেন জানি না। একবার উত্তর না পাওয়াতে আমিও আর লিখিতে সাহস পাই নাই। 'নির্মাল্য' ও 'পৌরাণিকী' প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে পাঠাইয়াছি, কিন্তু তিনি প্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই। হয়তো চক্ষুপীড়ার জন্যই চিঠি লিখিতে পারেন নাই।

আমি বাল্যকালে কল্পনা-জগতে, আমার দিবাস্বপ্নে তাঁহাকে আমার পিতা বলিয়া কল্পনা করিতাম। সত্য সত্যই তিনি আমার মানস-পিতা। কিন্তু তিনি যে আমার কবিতা পড়িবেন এবং প্রশংসা করিবেন এ কথা আমার 'নিশার স্বপ্নের'ও অগোচর ছিল। কি সূত্রে তাঁহার উজ্জ্বল নাম আমার প্রথম পুস্তকের সহিত গ্রথিত হইল মনে করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

আমি তাঁহার সম্বন্ধে কখনও কিছু লিখি নাই, অথচ আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। তাঁহার বাক্যেই আমার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাই বিশ বৎসর পরে, 'আলো ও ছায়া'র ৬ষ্ঠ সংস্করণের সময় তাঁহার নামেই 'আলো ও ছায়া' উৎসর্গ করিলাম।"*

আমি তাঁহার কথা লিখিতে গিয়া 'আলো ও ছায়া'র কথাই লিখিলাম। তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে আজ কিছু বলিতে পারিতেছি না। সময়ান্তরে লিখিব। ইতি—

শুভার্থিনী
শ্রীকামিনী রায়

১৮, বেলতলা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।
১১ই জুলাই ১৯২৩।

মাতবরেষু—... ...

হেমচন্দ্রের কবিতা বাল্যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে আমার পিতৃরূপে কল্পনা করিয়াছি, এ সকল কথা এক সময়, অর্থাৎ 'আলো ও ছায়া'তে তাঁহার প্রথম লিখিত ভূমিকা পড়িবার পর, তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে যাহা পাইয়াছি গ্রহণ করিয়াছি, সমালোচনা করিবার ইচ্ছা কখনও হয় নাই, এখনও হইতেছে না। পিতা মাতা বা ধাত্রীকে যেমন মানুষ চিরদিন ভালবাসে, তাহাদের গুণাগুণের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করে না, আমারও কতকটা সেই রকম।

হেমচন্দ্রের কবিতার সমালোচনা করিয়া বর্ত্তমানে কাহাকেও তাঁহার কাব্যের প্রতি অনুরাগী করিতে পারিব সে বিশ্বাস আমার নাই। যাঁহারা তাঁহার কবিতা পূর্ব্বে ভালবাসিয়াছেন,

---

* ৬ষ্ঠ সংস্করণের 'আলো ও ছায়া' "পিতৃপ্রতিম ভক্তিভাজন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়"কে এই ভাবে উৎসর্গ করা হইয়াছে:—

বিশাল তরুর ঘন পল্লব মাঝার,
লুকাইয়া ক্ষুদ্র তনু, ঢালে গীতধার
ব্যাধের অলক্ষ্যে থাকি, যথা ক্ষুদ্র পাখী,
সেইরূপ আপনাকে লুকাইয়া রাখি'
তব স্নেহ-পত্রচ্ছায়ে, গেয়েছিল গান
লাজুক এ ভীরু কবি খুলি কণ্ঠ, প্রাণ।
তোমার আশ্বাস, স্নেহ, আশীর্ব্বাদ তব
সমুজ্জ্বল প্রভা দিয়া রাখিয়াছে নব
বিংশতি বরষ ধরি' যেই গীতহার,
আজ লোকান্তর হ'তে তাই উপহার
লহ এ ভক্তের হাতে;—আজ মনে হয়
তবে বুঝি নিতান্তই অযোগ্য তা' নয়;
বিংশ বরষের মম পুরাতন গীত
ভকতি-চন্দন-লিপ্ত, নব-সুবাসিত
পাবে তুমি, আশা এই। আছে আশা আর,
পৌঁছে ধরণীর বার্ত্তা মৃত্যুর ওপার।

তাঁহারা এখনও ভালবাসিতেছেন। নব্যতন্ত্রের সাহিত্য-বিলাসীগণ তাঁহার খুঁতগুলিই ধরিবেন এবং হয়তো গুণের যথেষ্ট সমাদর করিবেন না। সেজন্ত আপনার আমার ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই। এক এক সময়ে এক একটা বিশেষ ধরণের লেখা সাধারণের নিকট প্রিয় ও আদরণীয় হইয়া উঠে। আজকাল রবীন্দ্র যুগ—এ যুগে 'আর্টে'র দিকেই, বিশেষ রবীন্দ্রের আর্টের দিকেই মানুষের অধিক মনোযোগ। কবিতার প্রভাব (effect) কানের উপর যতটা, ততটা প্রাণের উপর হয় কি না কেহ দেখে না।

রবীন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে হেমচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার জলন্ত স্বদেশপ্রীতি, নারীজাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ণ অকপট সহানুভূতি, দেশাচারের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার, জাতীয় পরাধীনতায় ক্লেশ ও লজ্জাবোধ—এ সকল তাঁহার মত তেজস্বিতা ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহার পূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এখনকার বিচারে তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক ত্রুটি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমরা সেকালে কলা-কুশলতা (art) হইতে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় (heart) দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার জলদগম্ভীর ভাষা শুনিয়া আমাদের তরুণ প্রাণ আনন্দ ও উৎসাহে নৃত্য করিয়া উঠিত। সেকালে মানুষের চিন্তা ও ভাব ভাষার ভিতর দিয়া আপনাকে ঠেলিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিত; আজকাল যেন বাছা বাছা বাঁধা বুলি আগে সাজাইয়া রাখিয়া চিন্তা ও ভাবকে তাহাদের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বসাইবার চেষ্টা হয়। সেই জন্ত ভাব জমাট হয় না, ভাসা ভাসা থাকিয়া যায়। কবিতাটি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া, চক্ষে কর্ণে কেবল মিষ্ট ভাষাটুকুই ঠেকে, মনের ভিতরে গভীর সাড়া পাওয়া যায় না।

এই কথাগুলি লিখিতে লিখিতে মনে হইতেছে যেন বক্তব্যটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি নাই, নিজেকে ভুল বুঝাইতেছি। কেহ হয়তো মনে করিবেন আমি রবীন্দ্রনাথকে অগভীর বলিতেছি। কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, গীত-রচনায় অদ্ভুত অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। তাঁহার লেখনীস্পর্শে শুষ্ক বিষয়ও সরস ও মধুর হয়, যাহা কিছু তাঁহার কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হয়, সঙ্গীতের রূপ ধারণ করে। কিন্তু গীতি-রচনায় তাঁহাকে মাপ-কাঠি করিয়া অন্য সকলকে মাপিতে গেলে এবং তাঁহার অনুকরণে তাঁহার ব্যবহৃত পদগুলি সংগ্রহ করিয়া গান ও কবিতা রচনা করিতে গেলে পূর্ব্ব-কবিদের প্রতি এবং নিজেদের প্রতি অবিচার করা হয়। আজকাল কিন্তু তাহাই হইতেছে। তিনি যে রুচির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইংরাজীতে বলিতে গেলে তিনি যে 'স্কুলের' প্রবর্ত্তক, তাহা গভীরতা ও সজীবতার তত সন্ধান করে না, মিষ্টতা চাহে, স্পষ্টতা চাহে না। ছন্দ, সুর, নিখুঁত মিল, উপলাহত গিরি-স্রোতের কল-কল ধ্বনি, ইন্দ্রধনুর নানা বর্ণের ক্ষণিক খেলা, আবছায়া স্বপ্নের আবেশ এই সব তাহাদের মতে কবিতায় একান্ত আবশ্যক উপাদান। এগুলি উপাদান বটে এবং অতিশয় উপভোগ্য তাহারও ভুল নাই, কিন্তু কেবল এই-গুলি দিয়াই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, আরও কিছু চাই। সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, আশা আকাঙ্ক্ষা, গভীর আনন্দ ও তীব্র বেদনা এই সকল দিয়া যে মানবজীবন তাহার একটা জাগ্রত অস্তিত্বও আছে—এবং তাহার একটা সরল সবল প্রকাশের উপযোগী কবিতাও আছে ও থাকিবে।

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম এবং স্পষ্টকে অস্পষ্ট ও সরলকে জটিলও হয়তো করিলাম। এইখানে অন্তকার মত শেষ করি।

কাল চিঠিখানা আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারি নাই। অন্য কাজে উঠিয়া যাইতে হয়। আজ লিখিতে বসিয়া অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তবুও একটা কথা বাকী রহিয়া গেল, সেটা এই, 'মহাকাব্য' এখন out of fashion. কবিতার গুণ দোষ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা গীতি-কবিতারই কথা।

বিনীতা
শ্রীকামিনী রায় *

কামিনী রায় ও বাংলা-সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে-কয়জন মহিলা-কবি বাংলা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কবি কামিনী রায়ের স্থান তাঁহাদের মধ্যে নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। স্বাভাবিক প্রতিভার সহিত উচ্চশিক্ষার সংযোগ ঘটাতেই তাঁহার রচনা মার্জ্জিত ও শিল্পসুষমামণ্ডিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। গত শতাব্দীর শেষ পাদে 'আলো ও ছায়া'-রচয়িত্রী বাংলা-সাহিত্য-সমাজে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, আজ আমরা তাহা অনুমান করিতে পারিব না। কবিবর হেমচন্দ্র-লিখিত 'আলো ও ছায়া'র ভূমিকাতেই সাহিত্যরসিকদের তৎ-কালীন হর্ষ-বিস্ময়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় মিলিবে।

"আঁধারের কীটাণু আমরা
দু-দণ্ড আঁধারে করি খেলা,
অন্ধকারে ভেঙে যায় হাট,
জীবন ও মরণের মেলা।"

অথবা

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

* পত্র দুইখানি ১৩৪২ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'বিচিত্রা' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

বাঙালী নারীকণ্ঠে এই সরল মধুর ও বিচিত্র সুর রবীন্দ্র-প্রতিভার নব-অভ্যুদয়-যুগে বিস্ময়কর ঠেকিবার কথাই। "চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ," "মহাশ্বেতা," "পুণ্ডরীক" প্রভৃতি সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে গৃহীত চরিত্র-বিষয়ক কবিতাও বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অভিনবত্ব সঞ্চার করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, কবি কামিনী রায় যে সুবিপুল সম্ভাবনার মধ্যে তাঁহার কাব্য-জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তী কীর্তি তদনুযায়ী হয় নাই। তথাপি 'আলো ও ছায়া,' 'মাল্য ও নির্মাল্য' ও 'দীপ ও ধূপে'র কবি কামিনী রায় চিরদিন সগৌরবে বাংলা-কাব্য-সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

হাজারিবাগ ভ্রমণ

শ্রীপরিমল গোস্বামী

শেষ পর্ব

হাজারিবাগ রোডে থানোয়ার রোডই সবচেয়ে প্রশস্ত এবং দীর্ঘ। আমরা পরদিন সন্ধ্যায় এই পথে বেড়িয়ে এলাম। এ পথের দুধারেও অনেক বাঙালীর বাড়ি। এক মাইলের কিছু বেশী গিয়ে আমরা দু-জনে একটা কালভার্ট-ব্রিজের উপর বসলাম, আর দু-জন আরও দূরে চলে গেলেন। পুব আকাশে কালো মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়েছিল, সমস্ত প্রান্তর অন্ধকারে ঢাকা। পথে লোকজন তখন খুব সামান্যই চলছে। দু-এক জন মাত্র বাঙালী ভদ্রলোক ও মহিলাকে দেখা গেল সেই অন্ধকার পথে দীর্ঘ দূর ভ্রমণ করতে। পথে যাবার সময় ডানদিকের বাড়িগুলো যেখানে শেষ হয়ে গেছে তার কাছাকাছি দেখলাম রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাইন। উঁচু-নীচু পথ, লোকালয় ছাড়িয়ে শূন্য প্রান্তরের বুকে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে সেই অন্ধকারে, তা আর দেখা গেল না। হাওয়া বেশ জোরে বইছিল, আর কি ঠাণ্ডা সে হাওয়া, একটু বসতেই বেশ শীত করতে লাগল। এপ্রিল মাসের ষোল তারিখেও এখানে এমন ঠাণ্ডা থাকতে পারে তা ভাবতে পারি নি। শুনলাম সাধারণত এ রকম থাকে না, এবারেই শুধু গ্রীষ্ম আসতে একটু দেরি আছে।

আমাদের হাজারিবাগ রোডে থাকার এইটেই শেষ দিন। পরদিনই আমরা হাজারিবাগ শহরে যাব এই রকম আলোচনা করছিলাম, কিন্তু কে কোথায় গিয়ে উঠব সেই হ'ল এক সমস্যা। প্রত্যেকেরই পৃথকভাবে ওঠবার জায়গা আছে, কিন্তু হাজারিবাগের মতো শহরে সবাই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকলে প্রত্যেকেরই মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, কারণ হাজারিবাগ শহরে এসে কি কি দেখব, কোন্ কোন্ জায়গায় যাব, তার কোনোটাই আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট ছিল না, প্রতি মুহূর্তে আলাপ-আলোচনা ক'রে সে সব ঠিক করছিলাম। সেজন্যে সব সময়েই আমাদের একসঙ্গে থাকা দরকার, অন্তত কাছাকাছি।

রাজরপ্পা ছিন্নমস্তা মন্দিরের পাশে দামোদর 'গর্ভ' (হাজারিবাগ)

স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র গুপ্তের বাড়িতে ওঠবার একটা দাবি ছিল আমার, কেননা তাঁর নিমন্ত্রণ আমি বহু পূর্বেই

গ্রহণ করেছিলাম। শহরে যেখানেই উঠি, তাঁদের বাড়িতে অন্তত এক দিনের জন্তেও আমাকে থাকতে হবে এটা প্রায় ঠিক ছিল। সমস্তা হ'ল কি ক'রে সবাই কাছাকাছি থাকা যায়। এ সমস্তার একটা মীমাংসাও হয়ে গেল। খানোয়ার রোডে আমাদের সান্ধ্যভ্রমণের শেষে আকাশে মেঘের আড়ালে যে চাঁদ ঢাকা পড়েছিল, সে চাঁদ দৃশ্যমান হতে দেরি হ'ল বটে, কিন্তু তার আগে এই পথে যাত্রারম্ভে আর এক চাঁদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে হাজারিবাগ শহরের সমস্যাটা সমাধানের একটা কিনারায় এসে গেল। চাঁদ রবির বন্ধু। তিনিও পরদিন সকালে শহরে যাবেন এবং আমাদের সবাইকে তাঁদের বাড়িতে উঠতে হবে এই রকম অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাকে অনুরোধ না ব'লে প্রায় আদেশ বলা চলে। আমি যে অন্যত্র উঠব তা তখন আর তাঁকে বললাম না।

রাজরপ্পা ছিন্নমস্তার প্রাচীন মন্দির (হাজারিবাগ)

আমরা সেই রাত্রেই স্টেশনে এসে বাস্ কোম্পানির সঙ্গে কথাবার্তা বলে সীট রিজার্ভ করে এলাম। স্টেশন থেকে ট্রেনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রথমে যে বাস্ শহরে যায় তাতে যাওয়া সম্ভব হ'ল না, কারণ যে সব ট্রেন-প্যাসেঞ্জার একেবারে হাজারিবাগ শহরের টিকিট কেনে তাদের জন্তে জায়গা ছেড়ে দিতে এই মোটর কোম্পানি বাধ্য। সে রকম প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা কত হবে তা না দেখে এরা আগে কোন কথা দিতে পারে না। সেজন্যে আমরা দ্বিতীয় আর একটি বাস্ কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করলাম। এরা হচ্ছে মাড়োয়ারি মোটর-প্রতিষ্ঠান। শুনলাম এদের গাড়ি সকাল আটটায় ছাড়বে।

১৭ তারিখে যথাসময়ে এসে বাসে উঠলাম। তার আগে স্টেশনের দোকান থেকে কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। চাঁদবাবু আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে ওখান থেকে প্রকাণ্ড এক মাছ সঙ্গে নিয়ে উঠলেন বাসে। বাস ছাড়তে ছাড়তে সাড়ে আটটা হয়ে গেল। সে দিনও সকালে বেশ শীত ছিল, তাই কোনো কষ্টই হ'ল না শহরের পথে এগিয়ে যেতে। সদা-হাস্যময় চাঁদের সঙ্গ আমাদের সবাইকে পুলকিত করল, তিনি সমস্ত পথ নানা রকম গল্প করে আমাদের পথশ্রম লাঘব করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও হাজারিবাগ শহরের পথে আমাদের অদৃষ্টে সে দিন যে সামান্য কিছু দুর্ভোগ ছিল তা তিনি খণ্ডন করতে পারলেন না। আমাদের বাহক-বাসখানা ঘণ্টাখানেক এগিয়ে যাবার পরেই বিগড়ে গেল। শোনা গেল চাকা খুলে নতুন চাকা পরাতে হবে। সব শেষ হতে আধঘণ্টা লাগল। কিন্তু আবার কিছু দূর গিয়েই গাড়ির ইঞ্জিন আর চলে না। তখন যন্ত্রীরা ইঞ্জিন মেরামতের কাজে লাগল। এইভাবে, পথের মাঝখানে, বাসের সাধারণ থামবার জায়গার বাইরে, ইঞ্জিন ও চাকার গোলমালে আমাদের চার বার থামতে হয়েছিল। পথের মাঝখানে এ ভাবে অকারণ থামায় আমাদের অন্য কোনো রকম অসুবিধা হয় নি একমাত্র দেরি হওয়া ছাড়া। পথের দৃশ্য এতই চমৎকার যে ওর যে-কোন জায়গায় নেমে কিছুকাল কাটিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

পথের দুধারে বড় বড় বটগাছ, নিমগাছ এবং আমের গাছের সারি। কখনও শালবন, কখনও খোলামাঠ—দূরে ছোট ছোট পাহাড়। তার উপর, বেলা বাড়ছে কিন্তু সে পরিমাণে গরম বাড়ছে না বলে আমাদের কোন কষ্টই হচ্ছিল না।

বাংলাদেশ থেকে নতুন এ পথে এলে এ রকম অভিনব আবহাওয়া, এ রকম পাহাড়-অরণ্যের দৃশ্য, এ রকম চলতি

টাটানগরের পথে (হাজারিবাগ)

পথের ক্রম পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্য যে খুবই ভাল লাগবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ রকম তরঙ্গায়িত পাহাড়িয়া পথের কল্পনা বাংলাদেশে বসে করা যায় না। লোকালয়ের চিহ্ন-হীন উদ্দাম অরণ্যশোভা প্রতিমুহূর্তে একটা শিহরণ জাগিয়ে তুলছিল মনের মধ্যে। সমস্ত আকাশ কালোমেঘে ছেয়ে গিয়ে প্রবল ঝড় এবং বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে চললে নিজেকে যেমন পরিচিত জগৎ থেকে সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মনে হয়, এখানকার অরণ্যদৃশ্যেও মনে তেমনি উদাস করা এবং পরিচিত জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটি গভীর বেদনামিশ্রিত আনন্দের উদয় হয়। অত্যন্ত আধুনিক কালের মোটর বাসে আমরা আধুনিক কালের যাত্রীরা শহরে চলেছি এ ঘটনা নিতান্তই অবান্তর, নিতান্তই বাইরের। মনোজগতের বিরাটত্বের কাছে এ সব অতি তুচ্ছ। নতুনকে হঠাৎ গ্রহণ করা বিষয়ে মনের কৃপণতা আছে বলে যে একটি কথা শুনতে পাওয়া যায় সে কথার কি কোন দাম আছে? মন তো বিনা বাধায় এই আদিম পৃথিবীর উদ্দাম উদার রূপকে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করলে। কিংবা এ চির পুরাতন, এরই সঙ্গে মনের চির আত্মীয়তা। তাই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আজন্ম অপরিচয়ের বাধা ঘুচিয়ে জীবনের যে-কোন লগ্নে বা তিথিতে অকস্মাৎ যদি তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ান যায় তা হলে তাকে পরম আত্মীয় বলে চিনে নিতে তার এক মুহূর্ত দেরি হয় না। বিদেশে নতুন পারিপার্শ্বিকে হঠাৎ যদি আমাদের দৈনন্দিন কাজের সহস্র স্মৃতিবিজড়িত অতিপরিচিত আপিস-গৃহটি আবির্ভূত হ'ত তা হলে মনের অবস্থা কি হ'ত তা কল্পনা করতে বেগ পেতে হবে না। অথচ আমাদের জীবনে আপিস কত সত্য!

হাজারিবাগ শহরে পৌঁছে আমরা বাস্-স্টেশন থেকেই পৃথক হয়ে গেলাম। চাঁদবাবু শেষ পর্যন্ত মাছের দোহাই পাড়লেন, বললেন শহরে এ রকম মাছ দুর্লভ, আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। আমি একখানি রিক্‌শ নিয়ে দ্বিজেনবাবুর বাড়িতে এসে উঠলাম বারোটার কিছু পরে। রোড স্টেশন থেকে শহরে আসবার বাস্-পথ চল্লিশ মাইলের কিছু বেশি হবে। এতটা পথ এসেও মনে বা দেহে কোনো ক্লান্তিই অনুভব করি নি, এটা আমার মতো ক্ষীণজীবীর পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। আরও একটি ভয় ছিল, ভেবেছিলাম, চার দিন হাজারি-বাগ রোডে কাটিয়ে নতুন জায়গার দৃশ্যে মনের ক্ষুধা যে পরি-মাণে নিবৃত্ত হয়েছিল, পাকস্থলীর ক্ষুধা সেই পরিমাণে বেড়ে যাওয়াতে শহরে এসে বিপদে পড়ব, হয় তো অতিথি হিসাবে আত্মসম্মান বজায় রাখতে পারব না, শেষ পর্যন্ত একটি বেদনা-ময় স্মৃতি নিয়ে কলকাতা ফিরে যেতে হবে। কিন্তু দেখা গেল দেহের সম্মানজ্ঞান মনের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী। শহরে এসে কোন্ অজ্ঞাত কারণে পাকস্থলী অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতে লাগল, কলকাতা থাকতে যেমন, এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেমনি, সে পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করেই খুশি হ'ল। সঙ্গীদের কাছে পরে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে জানতে পারি, তাঁদের অবস্থাও ঠিক আমারই মতো। শহরে এসে তাঁদেরও আহারের পরিমাণ অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হয়েছিল।

দ্বিজেনবাবু কিছুকাল পূর্বে অসুখে ভুগেছিলেন, কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ সেরে ওঠেন নি, গিয়ে দেখলাম শয্যাশায়ী অবস্থায় পড়ে আছেন। অতিথিবৎসলকে এ ভাবে দেখে বড় দুঃখ হ'ল। তাঁর কন্যা শ্রীমতী মায়া 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক ভাবে "বিহারের লোক-সঙ্গীত" লিখছিলেন। সেইগুলো পড়ে বিহারের পল্লীজীবনের প্রতি একটি আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। ভেবেছিলাম এই উপলক্ষে হাজারিবাগ থেকে

ওদের পল্লীজীবনের কিছু ছবি তুলব, কিন্তু তা আর সম্ভব হ'ল না। দ্বিজেনবাবু অসুস্থ ছিলেন, তদুপরি আমাদের সময় ছিল অত্যন্ত কম। ওখানে গিয়ে বোঝা গেল বেশ কিছুকাল ওখানে না থাকলে দূর পল্লীতে গিয়ে পল্লীজীবনের কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ঐ গানগুলোর ভিতর দিয়ে বিহারের জলমাটির কাছাকাছি যে মানুষ বংশপরম্পরায় বাস ক'রে এসেছে, তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার একটি অপরূপ ছবি ফুটে ওঠে। এদিক দিয়ে বাংলাদেশের পল্লীবাসীদের সঙ্গে ওদের লেশমাত্র পার্থক্য নেই। ওদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের এমন সরল সহজ মধুর গান যে সব অজ্ঞাত অখ্যাত কবি রচনা করেছেন, তাঁদের কথা ভাবলে বিস্ময় জাগে।

হাজারিবাগ শহরে দেখবার মত বিশেষ কিছু ছিল না। শহরের ভিতরে একটি বড় মন্দির ছিল, নাম তেলীমন্দির, সেইটির ছবি নেওয়া গেল। লেকের ধারে গিয়েছিলাম এক দিন, কিন্তু তার কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। সেইখানে সরু বাঁশের একটা ঝাড় পর পর অনেকগুলো ছিল—দেখতে বেশ লাগল। তারই মাত্র একটি ছবি নিলাম। ১৯ তারিখের সকালে এসেছিলাম এদিকে। সেই দিনই আমরা হাজারিবাগ ছাড়ব এই রকম ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। হাজারিবাগ শহরে এসে এখান থেকে কি ভাবে কোথায় যাব তা আগে কিছুই ঠিক করা সম্ভব হয় নি। অনেক সময় গল্প বা উপন্যাস আরম্ভের সময় কি ভাবে তা শেষ হবে, লেখকেরও তা জানা থাকে না, লিখতে লিখতে কিছু দূর এগিয়ে গেলে তার পর একটা বিশেষ পরিণতির দিকে ঠেলে নেওয়া যায়। আমাদের এই ভ্রমণও অনেকটা সেই রকম। হাজারিবাগ শহর পর্যন্ত এসে, এখান থেকে নানা সুবিধা-অসুবিধার কথা আলোচনা ক'রে ঠিক হ'ল আমরা রামগড় হয়ে কলকাতা যাব। নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় এজন্যে যে উদারতা দেখালেন তার জন্যেই আমাদের এই পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করতে পারল। পূর্ব দিন সন্ধ্যায় ঠিক হয়ে গেল আমার সঙ্গী বন্ধুরা বেলা বারোটায় আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন দ্বিজেনবাবুর বাড়ি থেকে।

এলাহাবাদের কংগ্রেস-কর্মী ভূতপূর্ব কাকোরীবন্দী মন্মথ গুপ্ত সম্প্রতি জেল থেকে মুক্ত হয়ে এসেছিলেন হাজারিবাগে দ্বিজেন বাবুর বাড়িতে। হিন্দি ভাষায় উপন্যাস এবং গল্প লেখক হিসেবে ইনি খ্যাত। উর্দু জানেন, বাংলাও ভাল জানেন। ইনি বাংলা ছোট গল্প অনেক অনুবাদ করেছেন হিন্দি সাময়িক পত্রিকার জন্যে। আমাদের অনেকের গল্পই হিন্দিতে অনুবাদ হয়ে বহু হিন্দি মাসিকপত্রে ছাপা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, অথচ আমরা কিছুই জানি না। প্রকাশকেরা সেজন্যে ঋণ পরিশোধ অথবা ঋণ স্বীকার দূরের কথা, মূল লেখককে এক সংখ্যা কাগজও পাঠানো দরকার মনে করেন না, এটা বড়ই বিস্ময়কর মনে হ'ল। মন্মথ বাবুর কাছ থেকে এই সংবাদটি পাবার পর আমার মনে হয়েছে বাঙালী লেখকদের তরফ থেকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখা যাঁদের পেশা, তাঁদের লেখার কপিরাইট অগ্রাহ্য ক'রে হিন্দি সাহিত্যের ব্যবসায়ী দু'পয়সা ক'রে নিচ্ছেন, ঠকছেন বাঙালী লেখকেরা। বাঙালী লেখককে না জানিয়ে তাঁদের অনুদিত গল্পের বইও প্রকাশিত হয়েছে কি না কে জানে!

২০ এপ্রিল তারিখে বেলা ১টায় হাজারিবাগ থেকে নীরদ বাবুর গাড়িতে আমরা চার জন রামগড় রওনা হলাম। এ পথের দৃশ্য আরও চমৎকার। একেবারে শালবনের ভিতর দিয়ে পাহাড়িয়া পথ। একবার উপরের দিকে উঠছি, একবার নীচের দিকে নামছি। ঢেউ-খেলানো আঁকাবাঁকা পথ পাহাড় কেটে কেটে তৈরি হয়েছে। এই রকম ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে আমরা পৌঁছে গেলাম রামগড়ের দামোদর-সেতুর উপরে। এইখানে গাড়ি থেকে একটুখানির জন্যে নামা গেল। এখানে নদী বেশ প্রশস্ত, কিন্তু তখন জল খুব বেশি ছিল না। শুকনো নদীর পাথরের বিছানা বেরিয়ে পড়েছে দুপাশে। সেতুর অপর পারে বন্দুকধারী প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে।

কংগ্রেস অধিবেশনে বিখ্যাত রামগড় যুদ্ধ উপলক্ষে সেনানিবাসে পরিণত হয়েছে। নদী পার হয়ে দেখি সে এক আশ্চর্য কাণ্ড। রামগড় যেন একটি প্রকাণ্ড শহর। অতি প্রশস্ত পালিশ করা পথ। পথে অবিরাম মিলিটারি লরি যাতায়াত করছে। ব্রিটিশ সৈন্যরা চলাফেরা করছে। রাস্তার ধারে কত রকম দোকান। হেয়ার-কাটিং সেলুন, রেডিও যন্ত্র মেরামতের দোকান ইত্যাদি ইত্যাদি। পথের বাঁ পাশে পুরনো রামগড়, ডান পাশে নতুন রামগড়।

আমাদের গাড়ি বড় রাস্তা থেকে বাঁয়ের দিকের একটি পথে গিয়ে নীরদ বাবুর কাঠের গোলায় গিয়ে হাজির হলাম। নীরদ বাবু আমাদের জন্যে শুধু গাড়িই দেন নি, রামগড়ে থাকবার জায়গা এবং খাবার সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। আমরা তাঁদের আপিস-ঘরে জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে সোজা রওনা হলাম রাজরপ্পার অভিমুখে। সেইখানকার বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির নাকি দেখবার মতো জিনিস। রামগড় থেকে জায়গাটা ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু পথ সব জায়গায় ভাল নয়। এক এক জায়গায় বহু নীচে নেমে প্রায় খাড়া উপরে উঠতে হয়। তিন চার জায়গায় এই রকম সব খাল পার হতে হয়। তা ছাড়া সে পথে আর কোনো অসুবিধা নেই। পথের দুধারের দৃশ্য নতুন ক'রে বর্ণনা করব না। পথে অনেকগুলো বিয়ের শোভাযাত্রা চলেছিল। প্রত্যেকটি যাত্রীর পরনে হলুদ রঙের জামা ও ধুতি। এ রকম দশ-বারোটা দল দেখা গেল।

গোলাবাজার নামক একটি জনবহুল জায়গার ভিতর দিয়ে আমাদের যেতে হ'ল। বেলা তখন চারটে হবে। সেখানে হাট বসে গেছে। বহু লোকের ভিড়।

গোলাবাজার ছাড়িয়ে খুব বেশী দূর যেতে হ'ল না। কিন্তু সেই মহুয়া-অরণ্যের ভিতর দিয়ে যেতে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। অনেক সাঁওতাল মেয়েকে বোঝা মাথায় হাটের পথে আসতে দেখা গেল, কিন্তু মোটর গাড়ি আসতে দেখে বহু দূর থেকে তারা সবাই প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল। যে পথে আমরা যাচ্ছিলাম, সে পথ মোটর গাড়ি যাবারই পথ, বহুকাল ধরে অনেকেই সে পথে মোটর গাড়িতে যাতায়াত করেছে এবং সাঁওতাল মেয়েরাও সেখানকার নতুন লোক নয়। তবে কেন এ রকম হ'ল। ভেবে একমাত্র উত্তরই মনে আসে। যুদ্ধের সময় হয় তো সৈন্যদের বা সামরিক বিভাগের লোকদের হাতে এরা এমন উৎপীড়িত হয়েছে যার ফলে মোটর গাড়ি এদের কাছে এখন বিভীষিকা। রামগড়েও এ রকম অত্যাচার হয়েছে পরে শুনেছি। সেখানকার পুরনো বাজারের প্রবেশপথে সৈন্যদের প্রবেশ নিষেধ সাইন দেওয়া আছে দেখলাম। সেটা নিরর্থক নয়। বিশেষ করে চীনা সৈন্যদের সম্পর্কে এখানকার লোকদের ধারণা খুব ভাল নয়। সামরিক বিভাগের দেশী লোকেরাও এখানকার স্ত্রীলোকদের প্রতি কি রকম দুর্ব্যবহার করে তার নমুনা কিছু নিজের চোখেও দেখেছি।

ছিন্নমস্তা মন্দির দামোদর নদীর গর্জ-এর উপর অবস্থিত। আর একটি নদী এসে পড়েছে দামোদরের এই খাদে মন্দিরের সম্মুখ দিয়ে। সে নদীটি এখন ক্ষীণ ধারা মাত্র কিন্তু তার প্রশস্ত বক্ষের স্রোতে পালিশ-করা প্রকাণ্ড এক এক খণ্ড পাথর পাশাপাশি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে আছে। ক্ষীণ স্রোত এঁকে-বেঁকে তার ভিতর দিয়ে গিয়ে দামোদরে পড়েছে। এক জায়গায় এই জলধারা প্রচণ্ড বেগে জলপ্রপাতের আকারে গিয়ে ঢলে পড়ছে গর্জ-এর মধ্যে। আমরা খুব সাবধানে এক পাথর থেকে আর এক পাথরে পার হয়ে যাচ্ছিলাম। পা ফস্কালে মাথা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এইখানকার দৃশ্য সব দিকেই অতি চমৎকার। তখন প্রায় সন্ধ্যা। তদুপরি সূর্য ছিল মেঘে ঢাকা; সে জন্যে এখানকার কোটোগ্রাফ আলো-ছায়ার মিলনে যতখানি জীবন্ত হতে পারত তা হ'ল না। তবু চার-পাঁচখানা ছবি নিলাম সেই ক্ষীণ আলোতে।

মন্দিরের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। প্রাচীন মন্দির, কিন্তু তার সিঁড়ি ও সম্মুখ ভাগের সমস্তটা গাঁথুনিই আধুনিক কালের। মন্দিরের পাশে যাত্রীদের থাকবার মতো একখানি ঘর আছে। মন্দিরের পূজারী বাঙালী।

আমরা সেখানে আধ ঘণ্টা থাকবার পরেই আকাশে বৃষ্টির মেঘ জমে এল, কাজেই তখনই ফিরে আসতে হল ওখানকার সব কিছু ভাল ক'রে না দেখেই। ক'দিন ধরেই হাজারিবাগে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল, হাওয়াও সেজন্যে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। রাত্রে খাবার জন্যে আমাদের কিছু ভাবতে হয় নি—যাঁদের উপর সে চিন্তার ভার ছিল, তাঁদের আশঙ্কা সত্য প্রমাণ ক'রে আমরা চার জনেই এক দিন পরে আবার হাজারিবাগ রোডের মাত্রায় আহার করলাম। সমস্ত দিনে প্রায় আশী মাইল মোটর ভ্রমণ ক'রে এবং রাত্রে অতিমাত্রায় ভোজন ক'রে ভেবেছিলাম রাত্রে খুব ঘুম হবে। কিন্তু ঠিক বিপরীত হ'ল। আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ে তর্ক আরম্ভ হ'ল—বিষয়গুলো কিছু নতুন নয়—তবু তাতে যা উত্তেজনা সৃষ্টি হ'ল তা নিদ্রার পরিপন্থী। তর্কের প্রধান বিষয় ছিল আর্ট ও আর্টিষ্ট। এর প্রধান উদ্যোক্তা কিরণকুমার এবং আমি। রবি বিষয়টি অর্থনীতির দিকে টানতে লাগলেন এবং সুধাংশুপ্রকাশ বিজ্ঞানের দিকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুধাংশুপ্রকাশের নাক ডাকতে লাগল, তাতে তর্কটা এক-চতুর্থাংশ মাত্র সরল হ'ল। যে তিন-চতুর্থাংশ জটিলতা অবশিষ্ট রইল তাতেই রাত্রি শেষ হয়ে এল।

রাজরপ্পা যাবার পথে রামগড় থেকে মাইলদেড়েক দূরে চমৎকার একটি শিবমন্দির দেখেছিলাম। সকালে বেরিয়ে গিয়ে তার ছবি নিতে হবে ঠিক করলাম। আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। এই মন্দিরটি ফাঁকা মাঠের মধ্যে বড় রাস্তা থেকে সামান্য একটু দূরে অবস্থিত। এই অঞ্চলে ছোট ছোট প্রাচীন মন্দির অনেক আছে। পূজারী সবই বাঙালী এবং জানা গেল এই উপলক্ষে এইখানে এক-শ' ঘরের বেশী বাঙালী ব্রাহ্মণ এখন স্থায়ী ভাবে বাস করছে। মন্দিরসংখ্যা তিন-শ' থেকে চার-শ'। সে রকম ছোট ছোট মন্দির অনেকগুলো দেখলাম, কিন্তু এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে মনে হ'ল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম আগে। বিগ্রহের সম্মুখে ফাঁকা উঠান এবং চারদিকে পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ। চারদিকেই ঘুরে ঘুরে বহু দূরের দৃশ্য দেখা যায়। নীচের তলাতেও অনেকগুলো কুঠরি। মন্দির পুরনো হয়ে এসেছে। নিয়মিত পুজো হয় না। কোনো ভক্ত মাঝে মাঝে এসে হয় তো কিছু নিবেদন ক'রে যায়। মন্দিরের বাইরে সবটাই চাষের জমি। জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান বুনবে বলে দু-এক খণ্ড জমি চাষ করা হচ্ছিল, তারই একটা ছবি গত সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।

রামগড়ের প্রকাণ্ড হাট বসছিল তখন থেকেই। চারদিক থেকে বহু গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে জিনিসপত্র আসছিল। বেলা তখন সাড়ে এগারোটা। এরই মধ্যে দেখি হাটের জায়গায় বেশ ভিড় জমে গেছে। আমরা বারোটার মধ্যেই ফিরে এলাম আমাদের আস্তানায়। সেই দিনই অপরাহ্ণে কলকাতা ফেরবার ট্রেন বি এন আর লাইনের। ওখানে ই আই আর লাইনেরও ষ্টেশন আছে, কিন্তু বি এন আর বেশি সুবিধাজনক মনে হওয়াতে এই পথেই আসা ঠিক হ'ল।

হাজারিবাগ গিয়েছিলাম ই আই আর-এর মধ্যম শ্রেণীতে, ফিরলাম বি এন আর-এর তৃতীয় শ্রেণীতে। রামগড় ষ্টেশনে খুবই ভিড় ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড় কমে গেল, আমরা বাঙ্কের উপর বিছানা পেতে রাখলাম। এই পথের দৃশ্যও অতি চমৎকার, বিশেষ করে মুরি জংশনের পর থেকে বড়

বড় পাহাড়ের দৃশ্য ছবিতে ধরে রাখবার মতো। এই পাহাড়-গুলোর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল---এতে গাছপালার চিহ্ন নেই। সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে এই পাহাড়ের দৃশ্য ঠিক ছবিতে দেখা বিলাতী ল্যাণ্ডস্কেপের দৃশ্যকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। চলন্ত ট্রেনের ভিতর থেকেই একখানি ছবি তুলে নিলাম। সূর্য মেঘে ঢাকা পড়েছিল পাহাড়ের মাথায়। সেই দিকেই ক্যামেরা ফিরিয়ে তুললাম সেই পাহাড় ও মেঘের সিলুয়েট্।

ইতিমধ্যে দেখি রবি আমাদের এক ভ্রমণ-সঙ্গীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। সে এখানকার আদিবাসী। তারা একদল মেয়েপুরুষ তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে বহুদিন পরে দেশে ফিরে চলেছে। বাংলা ভাষাতেই সে কথা বলছিল, অবশ্য তাদের নিজস্ব উচ্চারণে। নাম তার বনমালী। দেশে তার বাড়ি আছে, দু-এক খণ্ড জমি আছে—তারই 'মায়াজালে' সে আবদ্ধ। তার মুখে তার অতি সরল উচ্চারণে এই 'মায়াজাল' কথাটিতে চমকিত হলাম। যে সংস্কৃতির পরিচয়, যে জীবন-দর্শনের সহজ সরল রূপ আমরা আমাদের দেশের অশিক্ষিত পল্লী-কবির গানে শুনি—যা সরল পল্লীবাসীর সমস্ত জীবনের অঙ্গ—তারই একটি প্রত্যক্ষ রূপ ফুটে উঠল বনমালীর ঐ কথাটির ভিতর দিয়ে। প্রাচীন ভারতের একটি চেহারা চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অপরূপ মাধুর্যমণ্ডিত তার রূপ। মনে হ'ল হাজারিবাগ ভ্রমণ সম্পূর্ণ সার্থক হ'ল।

দুর্নীতি

আর্যকুমার সেন

বিধাতাপুরুষের রচিত গল্পে সব সময়ে নীতিকথার অবকাশ থাকে না, কারণ তিনি ইসপ অথবা বিষ্ণুশর্মা নহেন। মানুষের ক্ষুদ্রবুদ্ধি দিয়া বিধাতার কার্যকলাপের ভালমন্দের বিচার করার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া শুধু যেমন ঘটিয়াছিল, তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। নীতি-উপদেশ ইহার মধ্যে নাই, থাকিতে পারে না।

কালাচাঁদ জাতিতে বৈষ্ণব, সাবেক পেশা পালোয়ানী, হাল পেশা চোরাই আফিমের আমদানী ও বিতরণ। এবং সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যিক পেশা হিসাবে গুণ্ডার সর্দারি। কারণ চোরাই আফিমের কারবার কলেজে-পড়া কেরাণী দিয়া সম্পন্ন করানো সম্ভব নহে, ফলে বাধ্য হইয়া গুণ্ডার সহায়তা লইতে হয়। সাবেক নিবাস নবদ্বীপ, বর্ত্তমান বাসস্থান শ্যামবাজার।

কান্নু শেখের জাতির পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন, সাবেক পেশা পালোয়ানী, বর্ত্তমান পেশা চোরাই কোকেনের আমদানী ও বিতরণ; সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডার সর্দারি। যেহেতু আফিম ও কোকেন, দুইটি জিনিসের ব্যবসায়েই কার্যপদ্ধতি মোটামুটি একই প্রকারের, কান্নুর পক্ষেও যথেষ্ট পরিমাণে গুণ্ডার সহায়তা অপরিহার্য। হাল সাকিন চিৎপুর। সাবেক সাকিন সম্ভবত বাংলাদেশেরই কোন অঞ্চলে, বর্ত্তমানে উচ্চারণটি একটু উর্দ্দু ঘেঁষা হইয়া পড়ায় নির্ণয় করা দুরূহ।

উভয়েরই বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে। উভয়েই কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে একই ওস্তাদের কাছে কুস্তি করিতে এবং শরীর চর্চা করিতে শিখিয়াছিল। তাহার পরবর্তী যুগের শিক্ষা কাহার পদপ্রান্তে বসিয়া, কেহ জানে না। কর্মপ্রবাহে দু'জনে দুই দিকে ভাসিয়া গেল, দেখাসাক্ষাৎ বড় একটা হইত না। এক জনের মূলধন কোকেন, অপরের আফিম, সুতরাং জীবিকা অর্জন ক্ষেত্রে রেষারেষি ছিল না। বরং এক ওস্তাদের সাকরেদ বলিয়া যতটা বন্ধুত্ব থাকা উচিত, খানিকটা ছিল।

কালাচাঁদ পরম বৈষ্ণব, কাজেই ছোরাছুরি প্রভৃতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রের পক্ষপাতী ছিল না। বিশেষ করিয়া, লাঠির ঘায়ে এবং কখনও কখনও শুধু গলা টিপিয়া এবং বিনা রক্তপাতে যখন একটা লোককে অনায়াসে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করা যায়, তখন ছোরার ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। নেহাৎ দায় ঠেকিলে অগত্যা কালাচাঁদ ছোরা ব্যবহার করিত, কিন্তু কাটাকুটির ব্যাপারে "জাতবৈষ্ণব" সুলভ বিতৃষ্ণা থাকায় বলিত "বানানো"।

কান্নু শেখের অবশ্য ওসব অর্থহীন প্রেজুডিস্ ছিল না। লাঠি হাতে বাহির হইলে লোকে দেখিতে পায়, ছোরা অক্লেশে লুকাইয়া রাখা চলে। সম্মুখযুদ্ধে লাঠি ব্যবহার করার সুবিধা বেশী, আচমকা জখম করিতে হইলে ছোরাই প্রশস্ত। কান্নু অপক্ষপাতে দুইই ব্যবহার করিত।

কান্নু দীর্ঘকায়, ক্ষীণকটি, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। কালাচাঁদ অপেক্ষাকৃত খর্বদেহ, বিশালবক্ষ, ক্ষীণকটি, এবং মাথা কামানো। উভয়ের দেখাশোনা বড় একটা হইত না, কিন্তু পরস্পরের নামের উপরে শ্রদ্ধা ছিল।

পৃথিবীতে শান্তিপ্রিয় পুরুষ জাতির মধ্যে তথাকথিত অবলা নারী জাতি সর্বদাই বিভেদ রচনা করিয়া থাকে। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ডের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত এ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই, সম্ভবত ভবিষ্যতেও হইবে না। এক্ষেত্রেও হইল না।

শহরে নূতন নারীরত্নের আবির্ভাব হইল, নাম চাঁদবাই। সে হিন্দুও নহে, মুসলমানও নহে, পতিতা। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের কোনও হিন্দু রইসের ঔরসে (সম্ভবত, কারণ

এ সকল কথা জোর করিয়া বলা কঠিন) জনৈকা বাইজীর গর্ভে তাহার জন্ম। সুতরাং ধর্মের কোনও বালাই তাহার ছিল না, এবং মায়ের দূরদৃষ্টি বশত নামও এমন পাইয়াছিল, যাহা হিন্দুরও হইতে পারে, মুসলমানের হওয়াও আশ্চর্য নয়।

এই চাঁদবাইকে লইয়া কালু শেখ ও কালাচাঁদের বিরোধ বাধিল। গোটাকয়েক মাথা ও অসংখ্য সোডার বোতল কাটিবার পর উভয়েই লক্ষ্য করিল, এ রমণীরত্ন তাহাদের কাহারও জন্ত নহে, প্রবাদ-প্রসিদ্ধ "নেপো" আসিয়া আগেই দই মারিয়াছে। এক্ষেত্রে নেপো আসিল বোম্বাইয়ের ইসমাইল্ ফিল্ম কোম্পানীরূপে। চাঁদবাই নাম বদলাইয়া দময়ন্তী দেবী হইল, এবং "মহাসতী সাবিত্রী" নামধেয় ছবিতে সাবিত্রীর ভূমিকায় মর্মান্তিক অভিনয় করিয়া নাম করিয়া ফেলিল। ফলে অচিরকালমধ্যে সে জনৈক ফিল্ম-ডাইরেক্টরের পরিণীতা স্ত্রী এবং সঙ্গে সঙ্গে হিজ্ হাইনেস্ অব্ বোম্বাগড়ের রক্ষিতা হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিল। অর্থাৎ কালাচাঁদ অথবা কালু শেখ, কাহারও অঙ্কশায়িনী হইল না।

কলহের বিষয়বস্তু নেপো কর্তৃক অপহৃত হওয়ায় যুদ্ধ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রহিল, খবরের কাগজে যাহাকে বলে সশস্ত্র নিষ্ক্রিয়তা। গত কয়েক বছরে মধ্যে মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ ঘটিয়াছে, দুই দলের দলপতির গায়ে আঁচড়ও লাগে নাই। মরিল উভয় পক্ষের কতকগুলি নিরীহ আফিম ও কোকেন বিক্রেতা, চাঁদবাই সম্বন্ধে ঔৎসুক্য থাকিলেও আশা যাহাদের কোনদিনই ছিল না।

কয়েক বছর কাটিল। যুদ্ধের সময়ে আফিম ও কোকেনের দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও উভয়ের আর্থিক কোনরূপ অসচ্ছলতা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ দুই ব্যবসায়ের সমগোত্রীয় যুদ্ধকালীন ব্যবসায় অসংখ্য ছিল, হইতে পারে তাহাদেরই কোনও একটা অবলম্বন করিয়া উভয়ে কায়ক্লেশে দিন গুজরান করিয়াছে।

অবশেষে একটি বিশেষ সময় আসিল। সাল ও তারিখ শিশুতেও জানে, কাজেই পরিষ্কার করিয়া লেখা অনাবশ্যক।

কালু থাকিত মুসলমানপাড়ায় এবং কালাচাঁদ থাকিত হিন্দুপাড়ায়। উভয়েই ভাবিল চাঁদবাই সংক্রান্ত ব্যাপারটার শোক ভুলিবার সুযোগ আসিয়াছে। ফলে কালুর সাকরেদগণ ছোরা শানাইতে লাগিল এবং বৈষ্ণব কালাচাঁদের দেহরক্ষিগণ লাঠিতে তেল মাখাইতে আরম্ভ করিল।

একদা রাত্রে কালাচাঁদ তাহার শিষ্যবৃন্দকে ডাকিয়া কহিল, "বন্ধুগণ, যুদ্ধকাল উপস্থিত। বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইয়াছি কালু শেখের পাড়ায় তিনটি হিন্দুনারীকে "বানাইয়া" শিককাবাবে পরিণত করা হইয়াছে। এ গুণ্ডামির উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে।"

শিষ্যগণ লাঠি আস্ফালন করিয়া স্ব স্ব রুচি অনুসারে বলিল, "হর হর মহাদেও", "জয় কালী কলকাত্তাওয়ালী!" পরম বৈষ্ণব কালাচাঁদ যথারীতি নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া কানে আঙুল দিল।

ওদিকে কালু শেখ সাকরেদগণকে ডাকিয়া বলিল, "পেয়ারে ভাইসব, কালাচাঁদের পাড়ায় নিরীহ মুসলমানগণের উপরে তুমুল অত্যাচার হইয়াছে। চারিটি মুসলমান শিশুকে তাহারা কালীর নিকট বলি দিয়া কোপ্তাকারী বানাইয়া খাইয়াছে। এ গুণ্ডামির শাস্তি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।"

সাকরেদগণ জিকির দিল, "আল্লা হো আকবর!" কালু কোনো কথা না বলিয়া নির্বিকার ভাবে গড়গড়া টানিতে লাগিল।

বলা নিষ্প্রয়োজন, দুইটি সংবাদই মিথ্যা। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়?

সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল, এবং গভীর রজনীতে কালু শেখ চল্লিশ জন প্রিয় সাকরেদকে লরীতে বোঝাই করিয়া শ্যামবাজার অভিমুখে, এবং কালাচাঁদ সমসংখ্যক প্রিয় শিষ্যকে লরী বোঝাই করিয়া চিৎপুর অভিমুখে চলিল। জনশূন্য রাস্তা ধর্মসংক্রান্ত বাণীতে মুখর হইয়া উঠিল, এবং ভীত নগরবাসিগণ দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

উভয় পক্ষের দেখা হইল মাঝপথে বড় রাস্তার উপরে।

আবার "আল্লাহো আকবর" এবং "হর হর মহাদেও" ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইল, এবং বীরগণ লরি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইল।

নিমেষে গোটাকতক মাথা কাটিল, এবং কতকগুলি পঞ্জরে ছুরি বিঁধিল। কালাচাঁদ কালুর মাথায় লাঠির বাড়ি মারিল, কিন্তু কালু হুঁশিয়ার লোক, মাথা বাঁচাইবার বন্দোবস্ত পূর্বাহ্নেই করিয়া রাখিয়াছিল। অদূরদর্শী কালাচাঁদ ন্যাড়া-মাথা ঢাকিবার কোনো চেষ্টা করে নাই, কাঁধে এক ঘা ছোরা খাইয়াও লড়িতেছিল, কিন্তু কেশবিহীন মস্তকে ভীমবেগে দুই তিন ঘা লাঠি খাইয়া সে ধরাশায়ী হইল। মাথা কাটিয়া রক্ত ছুটিল।

ব্যাপারটা কত দূর গড়াইত বলা যায় না, সহসা কে যেন বলিল "পুলিস!" নিমেষে লরী দুইটি অদৃশ্য হইল, এবং ক্ষণকালের মধ্যে রাস্তায় গোটাকয়েক রক্তাক্ত হত ও আহত দেহ ভিন্ন আর কিছু রহিল না। কালু শেখ একটা অদ্ভুত কাজ করিয়া বসিল। রাস্তার ধারের একটা ছোট দরজা কাঁধের এক ধাক্কায় ভাঙিয়া কালাচাঁদের হতচেতন দেহটা অবলীলাক্রমে তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

পুলিশ নহে, মিলিটারি। একটা ব্রেন্ ও দুইটা স্টেন্গানের গুলি ছুটিল, পথচারী একটা নিরীহ কুকুর মরিল, এবং কর্তব্য সমাপনান্তে সাঁজোয়া গাড়ি চলিয়া গেল। এ পাড়াটা সেই রাত পর্যন্ত মোটামুটি শান্ত ছিল, অকস্মাৎ কয়েক মিনিটে প্রলয় ঘটিয়া গেল। পাড়ার লোকে তারকব্রহ্ম নাম জপিতে লাগিল।

জ্ঞান হইলে চোখ মেলিয়া কালাচাঁদ ভাবিল নিজেরই বাড়ি। মাথাটা তখনও পরিষ্কার হয় নাই এবং দেওয়ালে টাঙানো জার্মানীতে ছাপা নগ্ন নারীমূর্ত্তিগুলি তাহার পরিচিত। কালাচাঁদ ও কালু শেখের শিল্প বিষয়ে রুচি একই প্রকারের।

কাঁধে ও মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, তবু মুখ ফিরাইয়া এদিক ওদিক দেখিয়া বুঝিল, এ তাহার ঘর নহে। কারণ তাহার ঘরে উভয় পার্শ্বে নারীমূর্ত্তির মাঝখানে রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনের একখানি ছবি আছে, এখানে তাহা নাই।

কালাচাঁদ যে কয়েক ঘা খাইয়াছিল, তাহা সাধারণ বাঙালী হিন্দু মুসলমানকে পরলোকে পাঠাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। কিন্তু সে সাধারণ মানুষ নহে, হতজ্ঞান হইলেও কোৎ হইবার কোন লক্ষণ দেখায় নাই।

বেলা অনেক হইয়াছে, জানালা দিয়া ঘরে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। কালাচাঁদ উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

এমন সময় দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল কালু শেখ।

এক মুহূর্ত্তে রাত্রের ব্যাপারের অনেকাংশই কালাচাঁদের মনে পড়িয়া গেল। কালু কহিল, "এই যে, হোঁশ্ হয়েছে, খোদা রেখেছেন।"

কালাচাঁদ কহিল, "শা—লা! আমাকে এখানে গুম্ করেছিস্ খুন করবার জন্তে!"

একটা টুল টানিয়া বসিয়া কালু বলিল, "তওবা, খুন করবার হলে অনেক আগেই খতম করে দিতে পারতাম।"

"তবে আমাকে এখেনে এনেছিস্ কেন? কি করে আনলি?"

"সে সব কথা পরে হবে। এখন তুই শালা একটু খেয়ে নে দেখি!"

চটিয়া কালাচাঁদ বলিল, "আমি জাত বোষ্টম, আমি তোর বাড়িতে খাব? কি করব, নেহাৎ জখম হয়ে পড়ে আছি, না হলে তোর জিবটা টেনে ছিঁড়তাম।"

হাসিয়া কালু বলিল, "পাগল হলি নাকি? তোকে কি আমি গোশ্ত্ খেতে বলছি, না ভাত খেতে বলছি? কাঁচা দুধ আর মেওয়া আনানো আছে, ওতে তোদের জাত যায় না। নে খেয়ে ফেল।"

কালাচাঁদ কিছুক্ষণ ভাবিল, তার পর বলিল, "কই, দে!"

"ঐ যে কুরসীর উপরে আছে, উঠে খা।"

কালাচাঁদ অতি কষ্টে উঠিল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে সের দুই কাঁচা দুধ, দশ-বারোটা আপেল, গোটা আষ্টেক কলা এবং পরিশেষে চার বোতল সোডা খাইয়া শুইয়া পড়িল।

কালু কহিল, এখন কেমন লাগছে?

মন্দ না। তবে কাঁধটা টনটন করছে আর মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

যাবেই ত! তুই শালা এত বুদ্ধু লোক আর তুই এলি কিনা খালি মাথায় লড়তে। আর পড়লি শেষটায় শালা রমজানের চোট খেয়ে! তওবা!

কালাচাঁদ চুপ করিয়া রহিল।

কালু আপন মনে বলিতে লাগিল, গোলাম হোসেনের কাছে দুজনে একসঙ্গে সাকরেদি করেছি, চোট্ খেতিস্ আমার হাতের, আফশোষ ছিল না। ঐ শালা রমজান, যাক শালা টেঁসেছে।

কালাচাঁদ কহিল—আমাকে এখেনে আনলি কি করে?

সে অনেক কথা, পরে শুনিস্। কালু শেখ পারে না এমন কাজ নেই। কেবল ঐ সাঁজোয়া গাড়ির গুলিগুলো হজম হয় না। শুনেছি বড় লাগে।

দুই জনে একসঙ্গে হাসিল। অনেক বছর আগের মত।

কালাচাঁদ কহিল—এটা তোর বাড়ি?

ঘাড় হেলাইয়া কালু জানাইল হাঁ।

তুই হিঁদুকে রেখেছিস্ কেউ জানে?

কালুর মুখে চিন্তার ছায়া পড়িল। কহিল, জানে কয়েক শালা। কিন্তু তুই ভাবিস্ নে, কালু শেখের হাত থেকে মানুষ ছিনিয়ে নিতে মোষ ডর খায় বুঝলি?

খানিকক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল, পরে কালাচাঁদ কহিল, ডাক্তার ডাকিস নি ত?

পাগল! ও সব ঝামেলায় গেলে জানাজানি হয়ে যাবে। দরকার কি? গোলাম হোসেন ওস্তাদের সাকরেদ তুই, ঐটুকু জখমের জন্তে তোর ডাক্তার হেকিম লাগে না।

খুশি হইয়া কালাচাঁদ কহিল, ঠিক বলেছিস্। কিন্তু আমাকে এখেনে আনলি কেন তা ত বললি নে? এক ওস্তাদের সাকরেদ বলে?

তাতে থোড়াই বয়ে গেছে। আসল কথা হচ্ছে তোর সঙ্গে আমার ঝগড়া কাজিয়া আছে, খুনোখুনি করতে হয় আমরা করব। তুই রমজানের লাঠি আর সাঁজোয়াগাড়ির গুলিতে মরলে আমার চলে কি করে? লড়ব কার সাথে? ঐ শেয়ালগুলোর সঙ্গে?

সহসা কালাচাঁদ ডাকিল দোস্ত।

কালু চমকিত হইয়া বলিল, চোপ রও শালা, কে তোর দোস্ত? আমি তোর দুষমণ।

সহাস্যে কালাচাঁদ কহিল—ঠিক কথা। তুই আমার দুষমণ, আমি তোর দুষমণ। দোস্তি টোস্তি পোষায় না আমাদের। এখন আমি জখমি, তুই গোলাম হোসেনের সাকরেদ, জখমী লোককে মারতে তোর হাত উঠে না (কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে)। আমরা হলাম গিয়ে শের, শেয়ালের সঙ্গে মারপিট করা আমাদের চলে না। আমাদের দু'জনের দাঙ্গা আর এক দিনের জন্তে মুলতুবি রইল।

বলিয়া বৈষ্ণব কালাচাঁদ মুসলমান কালু শেখের শয়নগৃহে তাহারই শয্যায় পাশ ফিরিয়া শুইয়া পরম নির্ভরতার সহিত ঘুমাইয়া পড়িল।

মার্কিণ বৈমানিক বাণিজ্য-পথ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

যুদ্ধোত্তর যুক্তরাষ্ট্রে বৈমানিক বাণিজ্য পথের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রাগ্‌যুদ্ধ কালের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে শুধু যে বিমান-যাত্রীদের সংখ্যা বাড়িয়াছে তাহা নয়, আকাশ-পথে পণ্যদ্রব্য আমদানি রপ্তানির সুবিধার জন্যও সেদেশে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে এবং কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই নানা কোম্পানি গড়িয়া উঠিতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ইহাতে মাল ভাড়া অবশ্য রেলপথের তুলনায় সামান্য বেশী পড়ে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ইহা প্রচুর লাভজনক। কাজেই এই বিষয়ে ব্যবসায়ীমহলে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। তদুপরি সৈন্যবাহিনীর ভূতপূর্ব্ব বৈমানিকগণ কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক নূতন বিমান-পথ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিমান-যোগে মাল প্রেরণের কাজ পূরাদমে চলিতেছে এবং ইহাতে বিশেষ প্রতিযোগিতার ভাবও দেখা যাইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের সকল শ্রেণীর, বিশেষতঃ তাজা তরিতরকারির, এবং পুষ্প এবং ফলমূলাদির কারবারীগণ বিমানযোগে মালপ্রেরণের সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে ক্রমশঃ অধিকতর ওয়াকিবহাল হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহাতে অনেক মূল্যবান সময় বাঁচে, জাহাজে করিয়া দূরদূরান্তের গঞ্জে মাল পাঠাইবার সময় তাহা পচিয়া যাইবার যে আশঙ্কা থাকে এই ব্যবস্থা দ্বারা তাহাও নিরাকৃত হয় এবং যে সমস্ত বাজারে মাল প্রেরণ করিতে আগে বহু সময় লাগিত এখন সেই সকল স্থানে আকাশ-পথে তাহা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাঠানো যায়।

একটি আকাশ-যানে সাধারণতঃ সাড়ে ছয় টন মাল বোঝাই করা হইয়া থাকে। আকাশ-পথে মাল চালান দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা বলেন যে, ভবিষ্যতে মাল ভাড়া আরও কমিবার সম্ভাবনা আছে যদি না মাল বোঝাই করার খরচ অত্যধিক বাড়িয়া যায়। এই ক্রমোন্নতিশীল শিশু-শিল্পের পরিপুষ্টির জন্য সরকারের পৃষ্ঠ-পোষকতা এবং ইহার উন্নতির সহায়ক আইন প্রণয়ন যে অত্যাবশ্যক সে-কথাও তাঁহারা বলিয়াছেন।

যুদ্ধের পূর্ব্বে আকাশ-পথে যাতায়াতকারী মালগাড়ীর সংখ্যা ছিল খুব কম। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দেও বাণিজ্য ব্যপদেশে আকাশ-পথে যাতায়াত বা বিমানে মাল প্রেরণের বিশেষ রেওয়াজ না থাকিলেও সৈন্য এবং নৌ-বাহিনী বিমানযোগে সমরোপকরণ সরবরাহ করিয়া যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাফল্যের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। ফলে আকাশ-পথে মাল প্রেরণের উপযোগিতাও প্রমাণিত হইয়াছিল। যুদ্ধকালে কতকগুলি বিমান-পথের উপর দিয়া মাঝে মাঝে প্রচার-কার্য্য ব্যপদেশে কতকগুলি আকাশ-যান যাতায়াত করিত। যুদ্ধান্তে দেখা গেল যে, ঐ সমস্ত পথকে অব্যবহৃত অবস্থায় না রাখিয়া এগুলির উপর দিয়া পণ্যদ্রব্যে বোঝাই মালগাড়ীসমূহ চালাইবার ব্যবস্থা করিলে বাণিজ্যিক ব্যাপারে বিশেষ লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

নবপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক বিমান-পথের কর্ত্তৃপক্ষ, 'মেইন ষ্টেট' হইতে নিউ ইয়র্ক সিটি পর্য্যন্ত জীবন্ত গলদা চিংড়ী আকাশ-যানে চালান দেওয়া ইত্যাদি কোন কোন ব্যবসায় যে কিরূপ লাভজনক হইতে পারে গোড়ার দিকেই তাহা আঁচ করিতে পারিয়াছিলেন। রেলপথে ঐ সমস্ত চালানী মৎস্য যথাস্থানে পৌঁছিতে বহু সময় লাগে এবং গাড়ীভাড়ার অর্দ্ধেকেরও বেশী খরচ পড়ে আনুষঙ্গিক চুঙ্গি, বরফ এবং সামুদ্রিক গাছগাছড়া ইত্যাদির জন্য। একে তো রেলপথে ঐ সমস্ত মৎস্য প্রেরণ ব্যয়সাধ্য, তদুপরি ১৮ ঘণ্টা ট্রেনে বাক্সবন্দী থাকার দরুণ পচিয়া যাওয়ার আশঙ্কাও বিদ্যমান। আকাশ-পথে কিন্তু যে সমস্ত মোটা কাগজের আধারে করিয়া চিংড়ী মৎস্য চালান দেওয়া হয় সেগুলিতে বরফ দিবার দরকার হয় না, এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে মাত্র দুই ঘণ্টা সময় লাগে বলিয়া সেগুলি পচে না কিংবা শুকাইয়াও যায় না।

যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যিক বিমান-পথের পরিকল্পনাকারীগণ ছোট ছোট মালগাড়ীর পরিবর্ত্তে ১০০ হইতে ৫,০০০ পাউণ্ড মাল বহনক্ষম বহুসংখ্যক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আকাশ-যান চালু করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এতকাল যাত্রী-বিমানের সহিত সংশ্লিষ্ট আধারগুলিতেই কিছু কিছু মাল বোঝাই করা হইত। কিন্তু যাত্রী-বিমানের সঙ্গে যাহাতে মালবোঝাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'এয়ার ক্র্যাফ্ট' জুড়িয়া দেওয়া যায় সম্প্রতি সেই চেষ্টাই বিশেষ ভাবে চলিতেছে। ইতিমধ্যে যাবতীয় বিমান-পথের কর্ত্তৃপক্ষগণ মালভাড়ার তালিকাও প্রকাশিত করিয়াছেন। এই কার্য্যের সূচনা হয় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। তখন হইতেই বিশেষজ্ঞগণ বাজার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, পচনধর্ম্মী দ্রব্যাদি টাট্‌কা রাখিবার উপায় উদ্ভাবন, প্যাকিঙ তৈরি এবং বিমানে মাল চালান দেওয়ার সুব্যবস্থা ইত্যাদি লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন।

আকাশ-পথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভাবী প্রসার নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। (১) দ্রুত মালভাড়া হ্রাস করা, (২) বিক্রেয়-দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং (৩) বিমানপথে মালগাড়ী চলাচলের সুব্যবস্থা। এখন যে অতিরিক্ত পরিমাণ ভাড়ার হার নির্দিষ্ট আছে তাহা যদি বহুল পরিমাণে কমাইতে হয় তাহা হইলে নব-পরিকল্পিত 'অল-কারগো এয়ারক্রাফট'গুলিকে চালু করিতে হইবে। সম্প্রতি যে একশতটি ছোট ছোট আকাশ-পথে মালগাড়ী চলাচলের জন্য উৎসাহী ব্যক্তিগণ টাকা খাটাইতেছেন তন্মধ্যে অধিকাংশের জন্যই খুব অল্প মূলধন আবশ্যক।

ভূতপূর্ব্ব সামরিক বিভাগের বৈমানিকগণ আশা করেন যে, ২৫,০০০০,০০০ ডলার মূলধন দ্বারাই মাল বোঝাই দুই তিনটি বিমান চলাচলের উপযোগী একটি লাইন নির্ম্মাণ এবং তাহাকে চালু রাখা সম্ভবপর। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দ্রুত মাল চলাচলের জন্য এক একটি লাইনে দুই কিংবা তিনটি বিমান যথেষ্ট নহে। অভিজ্ঞ বৈমানিকগণের অভিমত এই যে সুষ্ঠুভাবে কার্য্য পরিচালনার্থে প্রত্যেক লাইনের জন্য অন্ততঃ ছয়টি কি সাতটি এয়ার-ক্রাফ্ট আবশ্যক।

মালগাড়ীবাহী বিমানে একটি ট্রাক হইতে ক্যালিফোর্ণিয়ার ফলমূল ও তরিতরকারী বোঝাই করা হইতেছে। পূর্ব্ব যুক্তরাষ্ট্রের গঞ্জগুলিতে এই সমস্ত মাল খালাস করা হইবে।

ভবিষ্যতে বিমানযোগে পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানির মাশুল এবং ভাড়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে সরকারের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা আছে। এ পর্য্যন্ত সরকারী বিমান বিভাগ এ বিষয়ে আদৌ অবহিত হন নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই সমস্ত মালবাহী আকাশ-যানের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান এবং বিমান-পথসমূহও রেলগাড়ী প্রভৃতি সাধারণ যানবাহনের লাইনগুলির সমপর্য্যায়ে উপনীত হইতেছে। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট যেমন রেলপথে এবং রাজপথে যাতায়াতকারী মালবাহী গাড়ীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন তেমনি সবগুলি না হইলেও, অন্ততঃ কতকগুলি 'কারগো লাইনকে' নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করিতে পারেন।

চালানী পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ যত বাড়িবে এবং মালগাড়ীকে যতই বৃহদাকারে তৈরি করা হইবে ভাড়াও সেই পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। সম্প্রতি একটি সি-৫৪ মালবাহী বিমান ১৮,০০০ হইতে ১৯,০০০ পাউণ্ড মাল বহন করিয়া থাকে। ইহাতে নিম্নতম ভাড়া লাগে প্রত্যেক টন-মাইলে ১৩ সেণ্ট হিসাবে। কোন কোন লাইনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন সি-৪৭ বিমান, ৫,০০০ হইতে ৬,০০০ পাউণ্ড মাল বহন করিয়া যাতায়াত করে। সেগুলিতে ভাড়া লাগে প্রতি টন-মাইলে ২০ সেণ্ট করিয়া। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বিমানগুলিতে ভাড়ার হার আরও বেশী, প্রতি টন-মাইলে ২৭ সেণ্ট করিয়া। এই সকল মালগাড়ীতে করিয়া কত যে রকমারি পণ্যদ্রব্য চালান দেওয়া হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই, যথা—পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘড়ী, ফলমূল ও পুষ্পাদি। যে সকল পচনধর্ম্মী পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করা হয় ভেকের পা তাহাদের অন্যতম।

বর্ত্তমানে বিমান-মাল গাড়ী যে স্তরে পৌঁছিয়াছে তাহাতে যাবতীয় পণ্যদ্রব্য উৎপত্তি-স্থান হইতে সরাসরি বিমানযোগেই লক্ষ্যস্থলে পাঠানো হইবে। অন্য কোনও যানবাহনের প্রয়োজন হইবে না। ভবিষ্যতে গ্লাইডারসমূহ কি ভাবে ব্যবহৃত হইবে তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা এখনও করা হয় নাই। বিমান-মালগাড়ীর পরিচালকগণ একপ্রাও মনে করেন না যে, আকস্মিক কারণ ব্যতীত মালপত্রাদি নামানোর জন্য বর্ত্তমানে প্যারাসুট ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, মার্কিন রেলপথের মালিকরাই আকাশ-পথে এই অভিনব ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী কুতূহলী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, বিমান-পথ চালু হওয়ার দরুন ইতিমধ্যেই তাঁহাদের শতকরা ষোল ভাগ যাত্রী কমিয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে উহা আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এক্সপ্রেসযোগে দ্রুত মাল আমদানি-রপ্তানির লাভজনক ব্যবসা দ্বারা এতদিন তাঁহারা বেশ দু-পয়সা কামাইতেন। এখন বৈমানিক প্রতিযোগিতার দরুন এই ব্যবসায়ের কি পরিমাণ যে তাঁহাদের হাতছাড়া হইয়া যাইবে তাহা ভাবিয়া তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই অভিনব ব্যবস্থার দরুন পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও মালপত্র বহনকারী বাষ্পীয় বাহনসমূহের উপর অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইবে। ইতিমধ্যেই আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-ক্ষেত্রে বিমান-পথে

ব্যাপকভাবে মাল চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং হইতেছে। প্রাগ্‌যুদ্ধকালে সমুদ্রের উপর দিয়া মাত্র ৮০,০০০ মাইল ব্যাপী আকাশ-পথে মাল চলাচলের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু যুদ্ধকালে মার্কিন বিমান-বহরের কর্তৃপক্ষ সৈন্য এবং নৌ-বাহিনীর সহযোগিতায় সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ২০০,০০০ মাইল বিমান-পথ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সম্প্রতি সমুদ্রপারের বিভিন্ন দেশ হইতে মার্কিণ সিভিল বিমান-বিভাগের দপ্তরে যে একশতটি আবেদনপত্র আসিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, যুদ্ধোত্তর-কালে সমগ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিতে হইলে ১৪০,০০০ মাইল বৈদেশিক বিমান-পথ নির্ম্মাণই যথেষ্ট। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট মার্কিণ শিল্পপতিদের সমুদ্রের পরপারবর্ত্তী দেশসমূহের গঞ্জগুলিতে দ্রুত মাল চালান দেওয়ার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

মার্কিণ 'এয়ার ট্রান্সপোর্ট' এসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, ১৯৪৬ ইংরেজীর শেষ ভাগে অথবা ১৯৪৭-এর সুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের দেশচর এবং সমুদ্র-পরপারগামী এই উভয়বিধ বিমানের সংখ্যা হইবে ১২৩৯ খানি এবং তাহা সবসুদ্ধ ৪৯,১৫৭ জন যাত্রীকে লইয়া বৎসরে ১০,০০০০,০০০০ মাইল আকাশ-পথ অতিক্রম করিবে। অর্থাৎ যুদ্ধের আগেকার তুলনায় যুদ্ধোত্তরকালে বিমান-বহরের সংখ্যা তিন গুণ এবং তাহাদের যাত্রীবহন-ক্ষমতা সাত গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

যাত্রী এবং মালগাড়ীবাহী বিমান-পথ সম্প্রসারণের বিপুল ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ১৯৪৬ ইংরেজীর ১৩ই মে তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কর্ত্তৃক প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের স্বাক্ষরিত একটি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, তাহাতে আগামী সাত বৎসরকাল সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বিমান-বন্দর নির্ম্মাণের জন্য মোট ৫০০ লক্ষ ডলার মঞ্জুর হইয়াছে। বর্ত্তমানে ১৬,০০০টি বিমান-পথের জন্য মাত্র ৪১,০০টি বিমান-ঘাঁটি আছে। বিগত দশ বৎসর বিমানের কার্য্যকারিতা আগেকার তুলনায় হাজার গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু যাত্রীদের অবতরণের এবং বোঝাই মাল খালাস করা ইত্যাদির সুব্যবস্থা কিছুমাত্র বাড়ে নাই বলিলেই চলে।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিমান-জগতে নবযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। যদিও ইহা এখনো পরিকল্পনাকারীদের আশার অনুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই, তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, ইহার অগ্রগতি অব্যাহতভাবেই চলিয়াছে এবং সকল দিক দিয়াই আকাশ-যানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়, অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত আকাশ-পথে মাল চলাচলের ব্যবস্থার সফলতা সম্বন্ধে যতই সংশয় বিদ্যমান থাকুক না কেন, একটি বিষয়ে কিন্তু তিলমাত্রও সংশয় নাই। তাহা এই যে, ভাড়া যদি হ্রাস পায় এবং বিমান-পরিচালন-ব্যবস্থার উন্নতি হয় তাহা হইলে মার্কিণ ব্যবসায়ীগণ এবং জনসাধারণ বহুদূরবিস্তৃত আকাশ-পথে দ্রুত মাল চালান দেওয়ার সুযোগ এবং সুবিধা লাভ করিয়া অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ ভাবেই উপকৃত হইবে।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

আত্মার বলে বলীয়ান যারা তারাই প্রকৃত বীর,
সত্যের বলে সাধনা তাদের ধৈর্য্যের বলে ধীর।
অসহ ক্লেশ সহিতে তাদের আত্মায় রহে বল,
স্বাধীন আত্মা তাদেরই লভ্য বলহীনে নিষ্ফল।
সত্যে যাদের অচল শ্রদ্ধা তারা আলোকের স্তম্ভ,
সত্য যুগের তারাই সাক্ষী, নাশে মিথ্যার দম্ভ।
হত্যা করিয়া নিজে হত হয় রক্তে ভিজায় মাটি
মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া করে পাপ লয়ে ঘাঁটাঘাঁটি।

বিলুপ্ত তারা বিস্মৃত তারা, তারা ধ্বংসের শেষ,
নিঃশেষে তারা মুছি চলে যায় চিহ্ন রাখে না দেশ।
সত্যের জয় হবে নিশ্চয় অক্ষয় বীজ মন্ত্র
সে মন্ত্র-বলে কি সুকৌশলে গাঁথা এ বিশ্ব-তন্ত্র।
তার পানে চাও দৃষ্টি মিলাও যজ্ঞে যোগাও হবি
আত্মায় সবে সাক্ষাৎ পাবে সত্য দৃষ্টি লভি।

জন যাত্রী অথবা ১৬ টন মাল বহনক্ষম চারিটি এঞ্জিনবিশিষ্ট মার্কিন বিমান। ইহা ৩০,০০০ ফুট উর্দ্ধে ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে উড়িতে পারে

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান দেওয়ার জন্ত একটি মালবাহী বিমানে পার্শেল বোঝাই করা হইতেছে

দুর্গোৎসব-প্রশ্ন

(প্রথম প্রকরণ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

বহু বিজ্ঞ জনে দুর্গাপূজার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বিজ্ঞয়া দশমীর শবরোৎসব দেখিয়া মনে করিয়াছেন, কিরাত ও শবর জাতির একটি উৎসব মার্জিত হইয়া দুর্গাপূজায় পরিণত হইয়াছে। কেহ নবপত্রিকা দেখিয়া বুঝিয়াছেন, শরৎকালে আশুধান্য সংগ্রহ হয়, দুর্গাপূজা নবান্নের উৎসব। কাহারও মতে বসন্তাগমে আমরা যেমন বসন্তোৎসব করি, শরৎ ঋতু দেখিয়া তেমন শরদোৎসব করি। এইরূপ, যিনি দুর্গোৎসবের যে অঙ্গ দেখিয়াছেন, তিনি তেমন অন্ধের হস্তী-দর্শন করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর হইতে দুর্গাপূজার পূর্বে ভক্ত ও ভাবুক দেবীর পুরাণোক্ত মহিমা কীর্তন করিতেছেন। কোন কোন পণ্ডিত বৈদিক গ্রন্থে ও পুরাণে দেবীর নামোল্লেখ প্রদর্শন করিতেছেন। এতদ্দ্বারা দেবী-কল্পনার প্রাচীনতা জানিতে পারিতেছি, কিন্তু দুর্গাপূজা ও উৎসবের উৎপত্তি ও স্বরূপ পাইতেছি না।

বাস্তবিক প্রশ্নটি সোজা নয়। দুর্গাপূজা ও তৎকালীন উৎসব, এই দুই অঙ্গের উৎপত্তি ও প্রকৃতি চিন্তা করিতে হইবে। ইহাদের আনুপূর্বিক ইতিহাস সঙ্কলন দুঃশক্য। কারণ আমাদের অধিকাংশ পূজায় বহু প্রাচীন স্মৃতি জড়িত আছে। সে প্রাচীন যে কোন্ অতীত কালের সাক্ষী, কোন্ মানব-চিত্ত বৃত্তির বাহ্য প্রকাশ, তাহা বলিবার উপায় নাই। কালে কালে দেশে দেশে পূজা-পদ্ধতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পুরাতন অনুষ্ঠান গিয়াছে, নূতন আসিয়াছে, তথাপি নূতনে পুরাতনের চিহ্ন কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। কারণ মানবের স্বভাব এই, নূতন কিছু করিতে হইলে পুরাতনকে আশ্রয় করে।

দেবীর পূজার উৎপত্তি ও স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে পূজা-প্রকরণ অনুধাবন কর্তব্য। কিন্তু পূর্বকালের পূজা-পদ্ধতি কিছুই জানা নাই। এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি। যথা—(১) আশ্বিন শুক্ল নবমীতে ষোড়শোপচারে সমারোহে দেবীর পূজা বিহিত, কিন্তু পূজারম্ভের কয়েকটি দিন আছে। তবে অষ্টমী নবমীর মাহাত্ম্য সন্ধিক্ষণে কেন? ভাদ্র কৃষ্ণ নবমী, আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদ ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমী হইতে পূজা আরম্ভ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন দিনে পূজারম্ভের হেতু কি? কেবল অষ্টমীতে, কেবল নবমীতে পূজা করা যাইতে পারে। এত দিনের মধ্যে সপ্তমী অষ্টমী নবমী মাত্র এই তিন দিন প্রতিমায় পূজা হইয়া থাকে। অধিকাংশ গৃহে আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূজা আরম্ভ হইয়া থাকে। অবশিষ্ট দিনে জলপূর্ণ ঘটে দেবীর পূজা হয়। জলপূর্ণ ঘট, মুখে আম্র-পল্লব, কিসের দ্যোতক? ঘটে পটে প্রতিমায় দেবীর পূজা করা যাইতে পারে। যদি ঘটে পূজা সিদ্ধ হয়, প্রতিমার প্রয়োজন থাকে না। ষষ্ঠীর সায়ংকালে বিল্ববৃক্ষমূলে, তদভাবে যুগ্মফলযুক্ত বিল্ব-শাখায় দেবীর বোধন এবং আমন্ত্রণ ও অধিবাস হয়। ইহার অর্থ কি? তবে কি প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত পূজা বৃথা হইতেছিল? বোধন শব্দের অর্থ কি? দেবীকে জাগরিত করা? তিনি কি এত দিন নিদ্রিত ছিলেন? নিদ্রা হইতে পারে না। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী জগজ্জননী তাঁহার নিদ্রায় প্রলয় হয়। বোধন সময়ে বিল্ববৃক্ষে পূজা করিতে হয়। বিল্ববৃক্ষ অম্বিকার প্রিয়। ইহার কারণ কি? আরও, বিল্ববৃক্ষের সমীপে নবপত্রিকা স্থাপন করিতে হয়। নাম নবপত্রিকা, কিন্তু নয়টি বৃক্ষের পত্র না হইয়া নয়টি বৃক্ষ কিম্বা নয়টি বৃক্ষের শাখা রজ্জুর দ্বারা বাঁধিয়া স্থাপিত হয়। সে নয়টি বৃক্ষ এই—রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান ও ধান্য। নব পত্রিকার অর্থ কি? বাঁকুড়ায় কেহ কেহ প্রতিমায় পূজা না করিয়া নবপত্রিকায় পূজা করেন। অতএব মনে হয়, নবপত্রিকা দুর্গার স্বরূপ বা নবদুর্গা। তাহা হইলে প্রতিমার প্রয়োজন কি? নবদুর্গাই বা কি? বিল্বশাখা ও নবপত্রিকা স্থাপনের নিমিত্ত চণ্ডীমণ্ডপ হইতে পৃথক্ এক স্থানে সূত্র-বেষ্টনদ্বারা এক বস্ত্র-গৃহ নির্মিত হয়। ইহারই বা হেতু কি? এই গৃহে অলক্তক, সূত্র ও ছুরিকা রাখা হয়। এ সকলের প্রয়োজন কি? সপ্তমীতে নবপত্রিকা চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হয় এবং প্রত্যেক বৃক্ষ পূজিত হয়। নবমীতে পূজার সময় ছাগ বলিদানের পূর্বে (কোথাও পরে) ইক্ষু ও কুষ্মাণ্ড বলি দেওয়া হইয়া থাকে। পশুবলির সহিত এই দুই উদ্ভিদের বলি বিসদৃশ নয় কি? কুমারী পূজা দুর্গাপূজার এক বিশেষ অঙ্গ। কুমারী পূজার হেতু কি? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন উদিত হয়।

উৎসব সম্বন্ধেও প্রশ্ন আছে। দুর্গাপূজার পূর্বে পথ-

ঘাট গৃহ পরিষ্কৃত, চণ্ডীমণ্ডপে বনমালা লম্বিত, মণ্ডপের দুই পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ রোপিত হয়। পুরাকালে ধ্বজা উত্তোলিত হইত। বহুকাল হইতে আর হয় না। নববস্ত্র পরিধান উৎসবের এক প্রধান অঙ্গ। আমরা লক্ষ্মী সরস্বতী পূজা করি, কিন্তু তদুপলক্ষে নববস্ত্র পরিধানের রীতি নাই। স্থান-বিশেষে শ্যামা-পূজার সময় ও বিষ্ণুর দোলযাত্রার সময় নব-বস্ত্র পরিধানের বিধি আছে। দশমী তিথিতে দেবীর বিসর্জনের পর নদীতে কিম্বা তড়াগে দেবীর প্রতিমা, বিল্বশাখা ও নবপত্রিকা নিক্ষিপ্ত হয়। তখন জল ও কাদা পরস্পরের গাত্রে নিক্ষিপ্ত হয়। আর সে সময়ে অশ্রাব্য অকথ্য ভাষা প্রয়োগদ্বারা শবরোৎসব হয়। ইহা উৎসবের এক অঙ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে। [দক্ষিণ রাঢ়ে জল কর্দম নিক্ষেপ ও ক্রীড়া-কৌতুক আছে, কিন্তু অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ কখনও শুনি নাই। কভু প্রচলিত ছিল কিনা, সন্দেহ।] তদনন্তর গৃহে আসিয়া গুরুজনকে প্রণাম, বন্ধুজনের পরস্পরের কুশল-সম্ভাষণ ও সকলে সিদ্ধি-পানের ব্যবস্থা আছে। এখানে জিজ্ঞাস্য অন্য দেবীর পূজায় শবরোৎসব হয় না, সিদ্ধি পানও হয় না। দুর্গোৎসবে হয় কেন? দশমীতে দেশীয় রাজ্যে নীরাজন হয়। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মার্জিত, তৈললিপ্ত, অশ্ব-গজাদির গাত্র ধৌত, অলঙ্কৃত, পদাতি রণসজ্জায় ভূষিত হয়। মন্ত্রদ্বারা তাহাদের পূজা হয়। অপরাহ্নে রাজা কিম্বা সেনাপতি যুদ্ধযাত্রা করেন। সে দিন যাত্রা করিয়া রাখিলে পরে আবশ্যক কালের যুদ্ধে জয়লাভ হয়।

সিংহ-বাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী রণচণ্ডী রূপে দশভুজার পূজা হয়। প্রতিমায় যে বীর ও রৌদ্ররস প্রকটিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে বাৎসল্য রসে পরিণত হইয়াছে। কবে হইতে কেন চণ্ডী শিবের ঘরণী হইলেন, বঙ্গের ইতিহাস-বেত্তারা অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা জানি না। যজমান গৃহী ও গৃহিণী মনে করেন, পার্বতী উমা পিতৃগৃহে তিন দিন আসিয়াছেন। তিন দিন থাকিয়া কন্যা শ্বশুর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহিণী কন্যাকে নির্বঞ্ছন* করেন। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে থাকে, আর বলেন, মা আসছে বছর আবার আসিবে। পাঁজিতে দুর্গা-প্রতিমার চিত্রে শিবের অনুচর নন্দীকে মেলানি মোট বাঁধিতে দেখা যায়। এ সব কোথা হইতে কবে আসিল?

মহাভারতের বিরাট পর্বে ও ভীষ্ম পর্বে, দুই স্থানে দুর্গার স্তব আছে। মহাভারতে এই দুই স্তব প্রক্ষিপ্ত বিবেচিত হয়। প্রক্ষিপ্ত হউক, অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন। সেই দুই স্তব পাঠ করিলে আরও অনেক প্রশ্ন উদিত হয়। কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—বিরাট পর্বের ৬এর অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "হে যশোদা-নন্দিনি, নারায়ণ-প্রণয়িনি, কংসধ্বংসকারিণি কৃষ্ণে, হে বালার্ক সদৃশে চতুর্বক্ত্রে! বিন্ধ্যাচল আপনার শাশ্বত বাসস্থান।" দুর্গা যশোদা-গর্ভসম্ভূতা, ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও অন্য পুরাণেও আছে। ইনি কংসাসুর বধ করিয়াছিলেন? দুর্গার এক নাম বিন্ধ্যবাসিনী কেন হইল? সেইখানেই আছে, কংস তাঁহাকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে তিনি আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন। ভীষ্মপর্বে [২৩-এর অধ্যায়] অর্জুন বাসুদেবের বাক্যানুসারে স্তব করিতেছেন, "হে গোপেন্দ্রানুজে, নন্দগোপকুলসম্ভবে, কোকমুখে! তুমি জম্বু, কটক ও চৈত্যবৃক্ষের সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থান কর। হে কান্তারবাসিনি, তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে যেন জয়লাভ আমরা করিতে সমর্থ হই।" দুর্গা চতুর্মুখা। ব্রহ্মা চতুর্মুখ। কারণ চারি বেদ তাঁহার মুখ-কমল হইতে নির্গত হইয়াছে। মহেশ্বর মহাকাল, চতুর্যুগ নিরীক্ষণ করেন। দুর্গা কালী তাঁহারও চতুর্মুখ হইতে পারে। কিন্তু এমন প্রতিমা দেখিতে পাই না। দুর্গা কোকমুখা। কোক, বন্যকুক্কুর বলা হইয়াছে, দুর্গার মুখ কুকুরের তুল্য। শিবা শব্দে দুর্গা ও শৃগালী বুঝায় ইহার কারণ কি? তিনি থাকেন কোথায়? কান্তারে জম্বু, কটক ও চৈত্যবৃক্ষ সন্নিধানে। জম্বুগাছ জামগাছ, কটক—কতক, অরিষ্ট, রিঠা, চৈত্যবৃক্ষ অশ্বত্থ বোধ হয়। দুর্গা ও কালী স্বরূপতঃ একই। বঙ্গদেশে অনেক স্থানে শ্মশান-কালীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরে মূর্তি নাই, নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শ্মশানকালী নাম আছে। বোধ হয় কান্তারে ঐ সকল বৃক্ষের সমীপস্থ কালী পরে শ্মশান-কালী নাম পাইয়াছেন। কোন্ প্রদেশে এই দুই স্তব রচিত হইয়াছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মহাভারতে বনপর্বে (২২৯-এর অধ্যায়) আরও আশ্চর্য কথা আছে। দুর্গা মহিষাসুর বধ করেন নাই, কার্তিকেয় করিয়াছিলেন।

এইরূপ বিরোধের মীমাংসা করিতে গিয়া পুরাণ-কারেরা বলেন কল্পান্তরে দেবী নানা মূর্তি ধারণ করিয়া নানা অসুর বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কল্পান্তর সামান্য কথা নয়। ব্রহ্মার এক দিনের নাম কল্প। ব্রহ্মার সৃষ্টি যত কাল থাকে তত কাল এক সৃষ্টি লয় পাইয়া আর এক সৃষ্টি আরম্ভ হইলে কল্পান্তর বলা যায়। আমরা দুই-চারি শত বর্ষের কথা স্মরণ রাখিতে পারি না। কল্পান্তরে কি হইয়াছিল কে

---

* লোকে বলে, বরণ। কিন্তু বিসর্জনকালে বরণ হইতে পারে না। প্রাচীন সাহিত্যে "নিছিয়া ফেলিল পান" সেই কর্ম। আমায় ভোজ্য তাম্বুল প্রভৃতি দেবী-প্রতিমার সম্মুখে ধরিয়া প্রতিমার পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হয়। সব মঞ্চ ধাতু পূজায়। কেহ কেহ নির্মঞ্ছন বলেন। কিন্তু মঞ্ছ ধাতু আছে কি?

জানিতে পারে? বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্ত্তী প্রদেশে দুর্গার কীর্তির সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী প্রচলিত ছিল পুরাণ-কারেরা সে সকল স্ব স্ব বুদ্ধি ও কল্পনাবলে লিখিয়া গিয়াছেন। পরে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেরা পূজা-পদ্ধতিও দুর্গা-মাহাত্ম্যের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন।

কালী ও দুর্গাপূজায় জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। শাস্ত্রকারেরা দেবী পূজায় এই অধিকার দিয়াছেন, একথা বলিতে পারা যায় না। সঙ্কটকালে ও যুদ্ধোদ্যমে দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা সকলেই করিতে পারে ও করিয়া থাকে। অধিক কালের কথা নয়, ডাকাতেরা কাটারীতে কালী পূজা করিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত।

বাঙ্গালী কালী পূজা করেন। আশ্চর্যের বিষয়, দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে কেরল দেশে কালীপূজা বহু প্রচলিত আছে। এমন গ্রাম নাই যে গ্রামে কালীপূজা ও তৎসম্পর্কে উৎসব হয় না।* ভারতের পূর্বোত্তর অংশে আসামে ও বঙ্গদেশে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কেরলে একই দেবীর পূজায় প্রায় একই প্রকার উৎসব হইয়া থাকে। কিন্তু আসাম বিহার ও বঙ্গ ব্যতীত আর কুত্রাপি মৃন্ময়ী দশভুজার পূজা হয় না। ইহারই বা হেতু কি?

দুর্গাপূজার পদ্ধতিতে অনেক দেশাচার বিধিবদ্ধ হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দুর্গাপূজাতত্ত্ব ও দুর্গোৎসব তত্ত্ব লিখিয়াছেন। তিনি চারি শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। তিনি কোন কোন বিধানের পৌরাণিক প্রমাণ তুলিতে পারেন নাই। সে সে স্থলে ইহাই আচার বলিয়াছেন। দেশাচারের উৎপত্তি নির্ণয় দুঃসাধ্য। দেশাচার ব্যতীত কুলাচার আছে। প্রসিদ্ধ পুরোহিত-বংশের এক এক দুর্গা-পূজার পদ্ধতির পুথি আছে। তদনুসারে পুরোহিত যজ-মানের দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন। সপ্তমীতে পশু বলির বিধান নাই। কিন্তু কোন কোন বাড়ীতে ছাগ বলি হইয়া থাকে। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম এত প্রচলিত করিয়াছিলেন যে দুর্গাপূজায় পশু বলি উঠিয়া গিয়াছে। এক কায়স্থ জমিদার-বাড়ীতে নবপত্রিকায় দুর্গা-পূজা হয়, পশু বলি হয় না। কিন্তু অন্ন ও মাগুর মাছের ঝোল ভোগ দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুরের এক ভট্টাচার্যের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। ধাতুনির্মিত দশভুজা প্রতিমা আছে। তদুপরি একটি মৃন্ময় নারীমুণ্ড স্থাপিত হয়, প্রতিমা বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে। ইহার নাম মুণ্ড পূজা। পশু বলি নাই, কিন্তু বিসর্জনের সময় পান্ত-ভাত ও পোড়া চেং মাছ জামিরের রস ও নুন মাখিয়া ভোগ দেওয়া হয়। কন্যা পতি-গৃহে যাইতেছেন, অন্ন ভোজন করিয়া যাইবার রীতি নাই, তিনি দই ও মুড়কির ফলার করিয়া যান। এইরূপ নানা স্থানে নানাবিধ কুলাচার পূজার অঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

প্রতিমা-নির্মাণেও দেশাচার প্রচল হইয়াছে। রাঢ় দেশে সূত্রধর প্রতিমা-নির্মাণ করে। কারণ সূত্রধর সেকালের ইঞ্জিনিয়ার। প্রতিমা-নির্মাণে মাপ-জোখের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কলিকাতা ও পূর্ববঙ্গে কুম্ভকার, এবং পূর্বদিকে মৈমনসিং ও ত্রিপুরায় গ্রহাচার্য প্রতিমা-নির্মাণ করেন। প্রতিমা-নির্মাণ শিল্পকর্ম। বিশ্বকর্মার পূজা না করিলে শিল্পকর্মে অধিকার জন্মে না।

বঙ্গদেশে মৃন্ময়ী দশভুজার পূজা অধিক পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা শূলপাণি কৃত "দুর্গোৎসব বিবেক" নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। শূলপাণি বঙ্গীয় নিবন্ধকার ছিলেন। তিনি চতুর্দশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে ছিলেন। মিথিলার কবি বিদ্যা-পতি "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" লিখিয়াছিলেন। তিনিও এই শতাব্দে ছিলেন। ইঁহাদের পূর্বে বঙ্গীয় ভবদেব ভট্ট দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি একাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে ছিলেন। তিনি কতিপয় পূর্ববর্তী স্মৃতি-কারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দুর্গার প্রতিমা পূজার লিখিত নিদর্শন দশম খ্রীষ্ট-শতাব্দের সেদিকে পাওয়া যায় নাই। এই পূজা কোথা হইতে আসিল?

নিবন্ধ থাকিলেও দুর্গাপূজা অধিক প্রচলিত ছিল না। লোকবল ও ধনবল না থাকিলে এই পূজা সম্পন্ন হইতে পারিত না। ইহার পরিবর্তে লোকে মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা করিত। এই পূজা আট দিনে সম্পন্ন হইত।

প্রায় শত বৎসর পূর্বে রাঢ়দেশে অনেক বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। বর্তমানে তাহার এক আনা মাত্র আছে কিনা সন্দেহ। শরৎঋতু যমদংষ্ট্রা, লক্ষ্মীও চঞ্চলা। ম্যালেরিয়ায় ও কালদোষে যাবতীয় উৎসব শ্রীহীন ও লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে।

---

* Kali Cult in Kerala—Bulletin no. 4 of the Sri Rama Varma Research Institute—Cochin. এই প্রবন্ধে অনেক মালয়লী শব্দ আছে, সমুদয় বিবরণ বুঝিতে পারা যায় না। ইহার পরে Kali Worship in Kerala by Dr. C. Achyuta Menon M.A., Ph.D. Published by the Madras University, English Translation of the Original Malayli Text বাহির হইয়াছে। আমি দেখি নাই। কেবল বই-পড়ায় ব্যাপার সম্পন্ন হইবে না। কালী পূজায় অভিজ্ঞ কোন বাঙ্গালী কেরল দেশে গিয়া পূজা ও উৎসব দেখিয়া দুই দেশের অনুষ্ঠান মিলাইলে বঙ্গের ইতিহাসের একটা গুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। কেরলের কালী পূজায় তান্ত্রিকমন্ত্র কোথা হইতে গিয়াছে? কেরলীদের সহিত বাঙ্গালীর আরও সাদৃশ্য আছে।

পূর্ববঙ্গে গ্রামে গ্রামে অনেক বাড়ীতে দশভুজার পূজা হইয়া থাকে। সে দেশ নিশ্চয় ধন্ত। দুঃখের বিষয় আমি সে দেশের দুর্গাপূজা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। পশ্চিম-বঙ্গের আর সে দিন নাই। এখন গ্রাম উৎসবহীন নিরানন্দ। সে উৎসাহ সে ভক্তি সে আনন্দ সে 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' ধ্বনি আর নাই। "গিরি হে, গৌরী আমার এসেছিল," এই হৃদয়স্পর্শী গানও নাই। এখন যাঁহারা পূজা করিতেছেন, তাঁহারা পিতৃপুরুষের অনুষ্ঠিত ব্রত পালন করিতেছেন। অধিকাংশ স্থলে মহানবমীতে ঘটে পূজা করিয়া নিয়ম রক্ষা করিতেছেন।

কয়েক বৎসর হইতে নগরে নগরে সার্বজনীন দুর্গাপূজা হইতেছে। সে কালে আমরা যাহা বারোয়ারী বলিতাম এখন তাহা সার্বজনীন নাম পাইয়াছে। কারণ বার শব্দ সংস্কৃত। ইহার অর্থ সমূহ, সমূহ মিলিয়া যে পূজা, তাহা বার-আরি, বারোয়ারি পূজা। বারোয়ারি কালীপূজা প্রচলিত ছিল। গ্রামস্থ সকলে মিলিয়া কালীপূজা করিত। বিশেষতঃ মহামারী হইলে গ্রামস্থ সকলে মিলিয়া রক্ষাকালীর পূজা করিত। সার্বজনীন হউক, বারোয়ারি হউক, কবি বলিয়াছেন "শক্তিপূজা মুখের কথা নয়।"

এখনকার ইংরেজী পড়া যুবকেরা দেবদেবীর পূজার অর্থ বুঝিতে পারে না। কেহ কেহ মনে করে কুসংস্কার। অনেকে পূজা শব্দের অর্থও জানে না। মনে করে পুষ্প নৈবেদ্য না দিলে পূজা হয় না। মহাত্মা গান্ধী বঙ্গদেশে আসিলে সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার পূজা করিয়াছিল। আচরণ দ্বারা, কেহ তাঁহার প্রিয় চরকায় সুতা কাটিয়া, কেহ তাঁহার কর্ম নির্বাহের নিমিত্ত অর্থ দিয়া পূজা করিয়াছিল। লাটসাহেব নগরে আসিবার পূর্বে পথ পরিষ্কৃত ও জলসিক্ত, পথের দুই পার্শ্বে বনমালা লম্বিত, স্থানে স্থানে তোরণ নির্মিত, সভামণ্ডপ সুসজ্জিত হয়। আগমন কালে তূর্যধ্বনি হয়, বাদিত্র আগমন ঘোষণা করে। তিনি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্তব করেন, তাঁহার গুণ ও কর্ম কীর্তন করেন। ইংরেজীতে বলি address পাঠ করেন। স্তবের শেষে বর প্রার্থনা করেন। আমাদের জলকষ্ট হইয়াছে জল দান করুন, আমরা ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতেছি, চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, আমাদের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিউন ইত্যাদি। আমরা গুরুজনের পূজা করি, বন্ধুর পূজা করি। আচরণদ্বারা প্রসন্ন করিয়া গুরুজনের আশীর্বাদ, বন্ধুজনের সহৃদয়তা কামনা করি। যাহা হইতে উপকার আশা করি, তাহা আমাদের পূজার্হ। আমরা গাভীর পূজা করি। গাভীর দ্বারা আমাদের কি উপকার হয়, তাহা স্মরণ করি। গৃহের অঙ্গনে তুলসী গাছ পালন করি, দেখিলে হরি স্মরণ হয়। ইহার মধ্যে কু কোথায়? বর্ষে বর্ষে এক নির্দিষ্ট দিনে রবীন্দ্রনাথের পূজা হইতেছে। তাঁহার চিত্র পুষ্পমালা বেষ্টিত হইয়া উচ্চ মঞ্চে স্থাপিত হইতেছে। ভক্তেরা তাঁহার স্তব করেন। কেহ কি চিত্রের পূজা করেন? তবে চিত্র কেন? পুষ্পমালা কেন?

দুর্গাপূজা জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার এত কল্পান্তর ও আনুষঙ্গিক অসংলগ্ন অঙ্গ দেখিলে মনে হয়, এই পূজা একদেশে প্রবর্তিত ও বর্দ্ধিত হয় নাই। নানা দেশের প্রচলিত বিধি ও আচার যুক্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিকেরা এই সকল আগন্তুক অনুষ্ঠান দেখিয়া উৎপত্তি চিন্তা করিয়াছেন। কেবল শাখা-পল্লব দেখিলে এইরূপ ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। আমি ছয়টি প্রবন্ধে মূল ও মূল হইতে শাখা অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি। ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে। সুধী ও স্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয়েরা কৃপাপূর্বক ভ্রমসংশোধন করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

খবর : সাইবেরিয়ায়

(পুস্কিনের "Message to Siberia"র অনুবাদ)

শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাইবেরিয়ার গহন খনির গহ্বরে
ধৈর্য্য তোমার গর্বে রহুক উন্নত ;
তিক্ত শ্রমের শেষ নহে তীব্র ব্যর্থতা—
বিদ্রোহী মন করে না কখনো মাথানত।

বোবা অসহায় চাপা আঁধারেই মুখ রেখে
দুর্ভাগ্যের ভগিনী সে আশা নন্দিতা,
হৃদয়ে তোমার সাহসদীপ্ত হানে কথা—
শোন গো বন্ধু, আসছে সে দিন বাঞ্ছিত।

স্বাধীন আমার সঙ্গীত আর উচ্ছ্বাস—
স্পর্শ-উজল ভালবাসা তার, মিতালি যার,
অতিক্রান্ত অন্ধকারের সব দুয়ার ;
ছুঁয়েছে সে প্রেমে শয্যা তোমার লাঞ্ছিত!

ভারি শৃঙ্খল ঝুলেছে উঁচে, ছিঁড়বে সে—
ঝংকারে হবে সকল দেয়াল কম্পিত ;
প্রভাতে মুক্তি করবে ও অভিনন্দিত—
ভ্রাতা ফিরে দেবে তরবারি তব, হও দীপ্ত হে সুহৃ!

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিবৃত্ত

শ্রীরেণু দাসগুপ্তা, এম্-এ

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাণিজ্য সম্বন্ধ বহু শতাব্দীর। বৈদেশিক বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা ভারতবর্ষ বহুকাল অবধি করিয়া আসিয়াছে। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বিদেশী বণিক ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য সময়ে কৌটিল্যের বিবরণ হইতে এই সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ জানা যায় :—

" . . . The Government did its best to foster foreign trade by inviting merchants from abroad to reside in its territory or finding out markets for the goods produced at home.

To encourage foreign merchants, they were invited and privileges and exemptions were granted to them . . .

The existence and the settlement of foreign merchants in the country is also testified by the Greeks who visited India. According to a fragment of Megasthenes one of the Boards of the Municipal Administration of the city of Pataliputra was in charge of the property of foreigners in case of their death in India, and provided arrangements for their safety during their stay in India."

(*Kautilya*—Narayan Chandra Bandyopadhyaya)

তাৎপর্য্য :—"বৈদেশিক বাণিজ্যকে উৎসাহান্বিত করিতে সরকার হইতে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করা হইত। বিদেশী বণিকগণকে রাজ্য মধ্যে বাস করিবার ও দেশীয় বাণিজ্যের সহিত কারবার চালাইবার জন্য সাদরে আহ্বান করা হইত।

বিদেশী বণিকদিগকে উৎসাহান্বিত করিবার জন্য তাহাদিগকে বিবিধ সুবিধা প্রদান ও কর হইতেও অব্যাহতি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। গ্রীক পর্য্যটকদিগের বিবরণ হইতেও ভারতে বিদেশী বণিকগণের অস্তিত্ব ও বসতি সম্বন্ধে জানা যায়। মেগাস্থিনিসের বিবরণের কোন অংশ হইতে ইহাও জানা যায় যে পাটলিপুত্রের পৌরসভার অন্যতম কার্য্যনির্ব্বাহক সংসদের হস্তে বিদেশীগণের মৃত্যুর পর উহাদের সম্পত্তির ব্যবস্থা অথবা উহাদের জীবিত কালে ধন সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থার ভার অর্পিত ছিল।"

খ্রীষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সহিত রোম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বাণিজ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। এই বাণিজ্য জল ও স্থল উভয় পথেই চলিত। প্রাচীনকালে উট প্রভৃতির দ্বারা বাণিজ্য চালান হইত। স্থলপথে ব্যবসায়ের কিয়দংশ আফগানিস্থান, পারস্য ও এশিয়া মাইনরের ভিতর পড়িয়াছিল। আরব, তুর্কী ও তাতার জাতীয় লোকেরা যখন এই সকল দেশ জয় করিয়া লইল সেই সময় ইউরোপীয় বণিকদের প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য লোপ পায় এবং পুরাতন পথে মাল চলাচলও সেই সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই বাণিজ্য কিঞ্চিৎ পুনরুজ্জীবিত হইলেও সপ্তম শতাব্দীতে মিশর ও পারস্য আরবগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইলে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে সকল আদান প্রদানের সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। এই সময় ভারতীয় পণ্যদ্রব্য মুসলমান বণিকগণের মারফত পাশ্চাত্য বণিকদের হাতে পৌঁছিতে লাগিল এবং ভিনিসের বন্দরে এই সকল মাল আসিয়া পৌঁছিত বলিয়া ভিনিসীয় বণিক ও মুসলমান বণিকগণের একচেটিয়া ব্যবসায় হইয়া পড়ায় ইহাদিগের প্রচুর লাভ হইতে লাগিল। মাল চলাচলের স্থলপথ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ইউরোপীয় বণিকগণ জলপথে মাল প্রেরণের ও ব্যবসায় চালাইবার বিষয় চিন্তা করিতেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজগণের ভিনিসীয় অর্থ-সম্পদের ও বাণিজ্যের প্রতি ঈর্ষামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিয়া উঠে এবং এই অতি লাভজনক বাণিজ্যের অংশ কি উপায়ে ইহারা গ্রহণ করিতে পারে ইহাও তাহারা চিন্তা করিতে থাকে। পর্ত্তুগালের প্রিন্স হেনরি দি নেভিগেটার ভারত ও পর্ত্তুগালের মধ্যে সরাসরি জলপথ আবিষ্কারের জন্য সারা জীবন চেষ্টা করেন এবং ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার সাহসিক নাবিকবৃন্দ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর বার্থালমিউ ডিয়াজ বাত্যাহত হইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ পার হইয়াছিলেন এবং ইহার দশ বৎসর পর ভাস্কো-ডা-গামা জাঞ্জিবারের দুই শত মাইল উত্তরে পৌঁছিয়া তথায় সুদক্ষ নাবিকগণের সহায়তা লাভ করেন এবং সুরাটের হিন্দু নাবিকেরাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া ভারতবর্ষে লইয়া আসে। এইরূপে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তিনি ভারতের কালিকাট বন্দরে উপনীত হন। কালিকাটের জামোরিন উপাধিধারী হিন্দুরাজা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করেন। পূর্ব্ববর্ত্তীদের রীতি অনুযায়ী ইনিও বৈদেশিক বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। পর্ত্তুগালের রাজার নিকট ভাস্কো-ডা-গামার হস্তে তিনি নিম্নোক্তরূপ পত্রও প্রেরণ করিয়াছিলেন :—

"In my Kingdom there is plenty of cinnamon, cloves, peper and ginger. I seek from thy Kingdom gold, silver, coral and scarlet cloth."
—E. Marsden.

তাৎপর্য্য :—"আমার রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে দারুচিনি, লবঙ্গ, মরিচ এবং আদা আছে। ইহার পরিবর্ত্তে আপনার রাজ্য হইতে আমি স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল এবং লালবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র পাইতে চাহি।"

কিন্তু পরবর্ত্তী পর্ত্তুগীজগণের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে ইঁহারা যে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নের উক্তি হইতে বুঝা যাইবে :—

"This Portuguese adventurer (Albuquerque), afterwards Governor, captured Goa in 1506 and in 1510 plundered the town of Calicut and burnt the palaces of its Kings, thus showing gratitude to the Zamorin who patronised the Portuguese in their endevour to trade with India—Major B. D. Basu.

তাৎপর্য্য :—"উদ্যোগী পর্ত্তুগীজ নেতা আলবুকার্ক পর্ত্তুগীজ অধিকৃত ভারতের তদানীন্তন-শাসনকর্ত্তারূপে যথাক্রমে ১৫০৬ ও ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ানগরী অবরোধ ও লুণ্ঠন করিয়া, রাজপ্রাসাদ দগ্ধ করিয়া দিয়া, জামোরিন রাজগণের পর্ত্তুগীজ ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতার যোগ্য প্রতিদান দিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।"

১৫০০ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এক শত বৎসর ভারতবর্ষের সহিত পর্ত্তুগীজদের একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল (১)। মিশর, আরব ও ভারতের মুসলমানেরা পূর্ব্বে ভারত মহাসমুদ্রের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজদের সহিত এই সময় উহাদের প্রবল বিরোধ বাধিল। পর্ত্তুগীজদের মধ্যে প্রবল মুসলমান বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। তৎকালে ভারত সম্বন্ধে পর্ত্তুগাল নৃপতির মনোভাব ও ভারতীয়দের প্রতি পর্ত্তুগীজদের আচরণ সম্বন্ধে নিম্নের উক্তি হইতে সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় :—

"The Portuguese, who hated all Musalmans, and killed them without mercy, usually were on good terms with the Hindus. The King of Portugal, with papal sanction, assumed the lofty style of 'Lord of the Conquest, Navigation and Commerce of Ethiopia, Arabia, Persia and India'—a proceeding which shows that his ambition was not limited solely to commercial gain"—Vincent A. Smith.

তাৎপর্য্য :—"পর্ত্তুগীজগণ মুসলমান-বিদ্বেষী ছিল এবং মুসলমানদিগকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিত ; তবে সাধারণতঃ মোটামুটিভাবে ইহারা হিন্দুদিগের প্রতি সদ্ভাবসম্পন্নই ছিল। পোপের অনুমতিক্রমে 'পর্ত্তুগালরাজ ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষের রাজা, নৌ ও বাণিজ্যের সর্ব্বাধিনায়ক' এই গৌরবান্বিত উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন—ইহার দ্বারা কেবল যে বাণিজ্যলব্ধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই তাঁহার উচ্চাভিলাষ সীমাবদ্ধ ছিল না তাহাও বুঝিতে পারা যায়।"

পর্ত্তুগীজ অধিকৃত ভারতের দ্বিতীয় গভর্ণর আলবুকার্ক পূর্ব্বাঞ্চলে এক পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্য স্থাপনের সংকল্প করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমগ্র বাণিজ্য অধিকার হইতে মুসলমানদিগকে বঞ্চিত করিয়া সম্পূর্ণ বাণিজ্য যাহাতে ইউরোপীয় বণিকদিগের করায়ত্ত হইতে পারে সেই দিকেও তিনি যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। প্রাচ্যে পর্ত্তুগীজদের প্রভাব ও বাণিজ্যে উহাদের বিরাট লাভের কথা অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের কর্ণগোচর হইতে অত্যধিক বিলম্ব হইল না। সম্পদের আতিশয্য যে তাহাদের প্রতিপত্তি-হীনতার কারণ ঘটাইয়াছিল *Rise of the Christian Power in India* গ্রন্থে সেই সম্বন্ধে এইরূপ জানিতে পারা যায় :—

"The Portuguese waved in impertance in the East as they grew rich and rolled in wealth." The Portuguese . . . "entered India with the sword in one hand and the crucifix in the other; finding much gold, they laid aside the crucifix to fill their pockets, and not being able to hold them up with one hand—they were grown so heavy, they dropped the sword too; being found in this posture by those who came after, they were easily overcome".

তাৎপর্য্য :—"ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য্যে ভাসমান পর্ত্তুগীজগণের প্রাচ্যে অধিকার শীঘ্রই হ্রাস পাইল ; ইহারা এক হস্তে তরবারি ও অপর হস্তে ক্রুশ ধারণ করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। ভারতের সম্পদের আতিশয্য দেখিয়া ইহারা ক্রুশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পকেট পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে এই অগাধ সম্পদ এক হস্তে ধারণ করা অসম্ভব দেখিয়া এবং নিজেদের সম্পদাতিশয্যে ও ভারবৃদ্ধি হইবার দরুনও অতঃপর তরবারিও পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই অবস্থায় ইহাদের পরবর্ত্তীদিগের পক্ষে ইহাদিগকে পরাজিত করা অত্যন্ত সহজসাধ্য হইল।"

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, পর্ত্তুগীজদের প্রাচ্য বাণিজ্যলব্ধ বিরাট্ ঐশ্বর্য্যের কাহিনী অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। অতঃপর ইহারাও এই অতিলাভজনক একচেটিয়া বাণিজ্যের অংশ গ্রহণে উদগ্রীব হইয়া উঠিল এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, জার্ম্মানী, সুইডেন প্রভৃতি দেশ এই জন্য তৎপর হইয়া উঠিল।

এই সময় ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথের যুগ। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই যুগ এক চিরস্মরণীয় অধ্যায়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও নৌশক্তিতে শক্তিমান ইংলণ্ডে এই সময়ই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়। স্পেনের অজেয় নৌবাহিনী বিজিত হওয়ায় সমুদ্র-রাণী ইংলণ্ড নৌশক্তিতে ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিগণিত হইল। ফলে ইংরেজের বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হইল। ষোড়শ শতাব্দের "সমুদ্র-কুকুরগণ" (Sea dogs) ও সার ফ্রান্সিস্ ড্রেক, হকিন্স, মার্টিন ফ্রবিশার, সার ওয়াল্টার র‍্যালে প্রমুখ ইংরেজগণ এই যুগে ইংলণ্ডের ব্যবসা তথা সাম্রাজ্য বিস্তারের

(1) They came out with the intention of trading in the East and they were content when they succeeded in that object. For over a century they monopolised the profitable traffic of the Indian Seas and the Portuguese adventurers astonished Europe with the colossal and gigantic fortunes they had rapidly amassed—*Rise of the Christian Power in India.*—By Major B. D. Basu.

পথ উন্মুক্ত করিলেন। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে লিসবন-গামী একখানা পর্ত্তুগীজ জাহাজ স্যর ফ্র্যান্সিস্ ড্রেক কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। এই লুণ্ঠনের দ্বারা প্রাপ্ত চার্ট হইতে তাঁহারা উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া ভারতের গুপ্ত-সমুদ্র পথের সন্ধান লাভ করিলেন। "By land and sea a Virgin queen I reign"—এই উক্তি যাঁহার যোগ্য পরিচয়, সেই রাণী এলিজাবেথ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে (১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর) "Society of Adventurers" অথবা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক একটী ব্যবসায়ী সঙ্ঘকে এক সনন্দ দান করিয়া নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের গোড়া পত্তন করিয়া যান। (২)

২১৭ জন অংশীদার ৬৮৩৭৩ পাউণ্ড মূলধন দিয়া এই কোম্পানী গঠন করে; তখন ইহার নাম ছিল The Governor and the Company of Merchants of London Trading with the East Indies"; পনর বৎসরের জন্য ইহারা প্রথম একচেটিয়া অধিকার পায়। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে সুরাট বন্দরের তাহারা ফ্যাক্টরি বা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। সুরাট বন্দরের এই বাণিজ্যকুঠিই ভারতের ভাবী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রথম অধিকৃত ভূমিখণ্ড ("The site of this factory was the first piece of land owned by the Englishmen in India)। ইহারা যে সকল জিনিষের ব্যবসা করিত তাহা এই:—

Pepper, rice, cotton, indigo, ginger, spices, cocoanuts and the poppy and sugar cane from which opium and sugar are made, do not grow in cold countries like England; and in old times beautiful muslin and cotton and silk cloths were made in India better than in England. On the other hand, these traders brought to India wollen cloth and copper and quick silver and iron and steel goods which could not be had in this country."—E. Marsden.

তাৎপর্য্য:—"মরিচ, ধান্য, তুলা, নীল, আদা, মশলা, নারিকেল, আফিম ও চিনি প্রস্তুতের জন্য ইক্ষু ও পোস্ত ইংলণ্ডের ন্যায় শীত প্রধান দেশে জন্মিতে পারে না। প্রাচীন কালে ভারতে ইংলণ্ড হইতে উৎকৃষ্টতর মস্‌লিন, সূতি ও রেশমী বস্ত্র নির্ম্মিত হইত। অপর পক্ষে এই সকল বণিক ইয়োরোপ হইতে পশমী কাপড়, তাম্র, পারদ, লৌহ এবং ইস্পাত-নির্ম্মিত পণ্য ভারতে পাওয়া যাইত না বলিয়া ঐ সকল এদেশে লইয়া আসিত।"

ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পর্ত্তুগীজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ইউরোপের কয়েকটি জাতিই তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজ-সৃষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভিন্ন এই সকল দেশেও বণিকসংঘ গড়িয়া ওঠে ও পর্ত্তুগীজদের তদানীন্তন দুর্ব্বলতার সুযোগও ইহারা উত্তমরূপে গ্রহণ করে।

"But towards the end of the century, the plundering of the Portuguese and Spanish empires had begun. By Drake's attack on Nombre deDios, the Spanish treasure city, in 1572, his voyage round the world (1577-1580), and the work of Sir John Hawkins in establishing England's share in the profitable slave trade, the supremacy of Spain was eventually overthrown. Meanwhile the weakness of the Portuguese empire encouraged the Dutch and the English to trade in the East Indies and eventually to rob Portugal of all his possessions . . ."—*Concise History of the World*—by Sir J. A. R. Marriott)

(ক) ইংরেজের পর প্রাচ্যে বাণিজ্য ব্যপদেশে ওলন্দাজগণের ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গড়িয়া উঠে। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে এই কোম্পানী গঠিত হয়। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে যবদ্বীপের বাটাভিয়া এই কোম্পানীর হেড কোয়ার্টার্স রূপে গড়িয়া উঠে। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে মালাকা, মশলা দ্বীপ ও সিংহলে ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর অবসান হয় ও ওলন্দাজ সরকারের অধীনে চলিয়া যায়।

(খ) ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। বাংলাদেশের শ্রীরামপুরে দিনেমার অধিকৃত স্থান ছিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমার ফ্যাক্টরীগুলি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট বিক্রীত হয়।

(গ) ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে La Compagnie des Indes—ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয় এবং করমণ্ডল উপকূলে ইহারা পণ্ডিচেরী প্রাপ্ত হয়। তদানীন্তন ভারতীয় রাজনীতির বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণে ইংরেজ ও ফরাসীদের বিরোধের কাহিনী ও ফরাসী পরাজয়ের ঘটনা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

(ঘ) ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে সুইডিস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়।

(ঙ) অস্‌টেন্‌ড্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অষ্ট্রিয়ান বণিকসংঘ কর্ত্তৃক ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদিগকে খুশী করিবার জন্য সম্রাট্ ষষ্ঠ চার্লস ইহা বন্ধ করিয়া দেন। (৩)

---

(2) The Directors of this company, on consultation, resolved, "not to employ any gentleman in any place of charge" and requested "that they might be allowed to sort their business with men of their own quality lest the suspicion of the employment of gentlemen being taken hold upon by the generalite, do drive a great number of adventurers to withdraw their contribntions" (Minues, 3rd October, 1690 quoted in Bruce's Annals of the Hon'ble East India Company, Vol I, page 128)—*Rise of the Christian Power in India*—by Major B. D. Basu.

(৩) (১) জ্ঞান-ভারতী—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
(২) Oxford History of India—V. A. Smith

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ইংরেজগণ সুরাট বন্দরে প্রথম কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু এই স্থানে তাহারা পর্ত্তুগীজদের নিকট হইতে প্রবল বাধা পায়। অতঃপর ইহারা গুজরাটের মোগলশাসকের নিকট হইতে সুরাট, ক্যাম্বে প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করে। এই সময় পর্ত্তুগীজদের সহিত ইহাদের এক বিরাট জলযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এইরূপে কালক্রমে ইংরেজের প্রথম অধিকৃত ও আশ্রয় স্থান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে পরিণত হয়। সুরাটস্থিত ফ্যাক্টরীতে ইংরেজ বণিকেরা সারা বৎসর যাবৎ বিবিধ দেশীয় পণ্যদ্রব্য দেশীয় ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া মজুত করিয়া রাখিত এবং ইংলণ্ড হইতে জাহাজ আসিলে ঐ সকল জাহাজে আনীত মালগুলি পূর্ব্বোল্লিখিত গুদামে রাখিয়া সম্বৎসর ব্যাপী মজুত গুদামের মাল ঐ সকল জাহাজেই স্বদেশে প্রেরণ করিত। কুঠি ও গুদাম দস্যুর আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করার নিমিত্ত চারি পাশে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া বন্দুকাদি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত রাখিত।

অতঃপর ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজদের সহিত ইংরেজদের যে নৌযুদ্ধ ঘটে ইহাতে পর্ত্তুগীজগণ নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়ে এবং ফলে ইংরেজগণের পর্ত্তুগীজ-ভীতি চিরতরে লোপ পায়। এই খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সভায় সার টমাস রোকে দূত প্রেরণ করেন; ইনি কোম্পানীর জন্ত বিবিধ সুবিধা আদায় করিতে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে ইংরেজগণ ভারতের পশ্চিম-উপকূলে ও ত্রিবাঙ্কুরে কুঠি নির্ম্মাণ এবং বঙ্গোপসাগরে নিজেদের পথ সুগম করিতে সমর্থ হয়।

এদিকে প্রাচ্যের সহিত ব্যবসায়ে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রচুর লাভ হইতেছে দেখিয়া অন্যান্য ইংরেজ-বণিকেরাও ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠে এবং তাহারা আরও কোম্পানী গঠন করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ভারতে ব্যবসা আরম্ভ করে। প্রায় এক শত বৎসর বিভিন্ন ইংরেজ কোম্পানী ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ১৭০২ হইতে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমস্ত কোম্পানী একত্রিত হইয়া যায় এবং ইহার নাম ইউনাইটেড ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অথবা অনারেবল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হইয়া যায়। কথিত আছে, সেকালের সাধারণ ভারতীয়গণ ইহাকে "জেহান্ কুম্পানী বাহাদুর"ও বলিত এবং সাধারণের ধারণা ছিল ইহা ইংলণ্ডের কোন ধনী অভিজাত ব্যক্তি অথবা রাজকুমারের আখ্যা-বিশেষ।

বর্ত্তমান ভারতের তিনটি সর্ব্বপ্রধান বন্দর মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা সম্রাট আকবরের সময় অজ্ঞাত, অখ্যাত, ক্ষুদ্র নগণ্য গ্রাম ছিল। ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটের চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের গ্রাম মাদ্রাজ ক্রয় করিয়া নিজেদিগকে সুরক্ষিত করিবার জন্ত কোম্পানী সেন্ট জর্জ নামক সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করে। সুরাট ইংরেজদের সর্ব্বপ্রথম লব্ধ ভূমিখণ্ড; মাদ্রাজও সেইরূপ ইংরেজের সর্ব্বপ্রথম অধিকৃত ভূখণ্ড এবং ইহাই উত্তরকালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হয়। ("Thus England acquired her first proprietary holding on Indian soil and the foundation of the Presidency of Madras was laid")। সেই বিশৃঙ্খলার দিনে বহু হিন্দু অধিবাসীও কোম্পানীর সুরক্ষিত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে; ঐ স্থানে তাহারা ব্যবসায়াদি কাজকর্ম্মও করিতে থাকে। ইংরেজ ফ্যাক্টরীর যে অংশে এই সকল ভারতীয় বণিক ও অন্যান্য লোক বাস করিত সেই স্থানগুলিকে কোম্পানী হইতে বলা হইত "Black Town"।

ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ ট্যানজিয়ার ও বোম্বাই লাভ করেন। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী বার্ষিক মাত্র দশ পাউণ্ড খাজনায় বোম্বাই দ্বীপ লাভ করে।

সম্রাট শাহজাহানের দুহিতা জাহানারা এক সময় গুরুতররূপে অগ্নিদগ্ধ হন; দরবারের চিকিৎসকবৃন্দ তাঁহাকে আরোগ্য করিতে অকৃতকার্য্য হইলে সম্রাট এক জন সুবিজ্ঞ ইংরেজ চিকিৎসক পাঠাইবার জন্ত সুরাট বন্দরে সংবাদ প্রেরণ করেন। জেব্রিয়েল বাউটন নামক এক জন ইংরেজ চিকিৎসক প্রেরিত হন এবং ইঁহার সুচিকিৎসার গুণে সম্রাট-দুহিতা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করেন। সম্রাট যোগ্য পুরস্কার প্রদান করিতে উদ্যত হইলে দেশপ্রেমিক ইংরেজ চিকিৎসক কোম্পানীর তরফ হইতে বাংলায় ব্যবসা চালাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং অন্যান্য কয়েকটি সুবিধাও বাংলায় ব্যবসায়ের জন্ত চাহিয়া লন। সম্রাট সানন্দে ফরমান প্রদান করিলে বাউটন স্বয়ং উহা সহ বাংলার সুবাদার সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র শাহসুজার রাজমহল-স্থিত দরবারে উপস্থিত হন। শাহসুজার অন্যতমা প্রিয়া মহিষীকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিলে তথা হইতেও ইনি কোম্পানীর জন্য বাংলায় ব্যবসা করিবার যাবতীয় সুবিধা লাভ করেন (*Rise of the Christian Power in India*—Major B. D. Basu.)

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কোম্পানীর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী জব চার্ণক কলিকাতা নগরীর পত্তন করিলেন। সম্রাট শাহজাহা-নের জীবিত কাল পর্য্যন্ত ইংরেজগণ বাংলায় বিনা বাধায় ব্যবসায় চালাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু আওরংজেবের রাজত্ব-কালে শায়েস্তা খাঁ ইহাদিগকে প্রচুর শুল্ক দিতে বাধ্য করায় ইহাদিগকে বাংলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু কর হইতে রেহাই পাইবার প্রতিশ্রুতি পাইয়া ইংরেজগণ ফিরিয়া আসিয়া হুগলী হইতে পনর ক্রোশ

মূল্যে তিনটি গ্রাম ক্রয় করিয়া ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের প্রতিষ্ঠা করে।

আওরংজেবের মৃত্যুর পর চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতের নানা স্থানে যে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল ইংরেজ বণিকেরা সে সম্বন্ধে মাথা ঘামায় নাই। কলিকাতার জন্য বাংলার নবাবকে এবং মাদ্রাজের জন্য কর্ণাটের নবাবকে বার্ষিক কর দিয়া ব্যবসা লইয়া আবদ্ধ থাকাই তাহাদের কাজ ছিল।

"The merchants of the East India Company were too busy piling up wealth to harbour any thoughts of gaining political glory"—Harold Wheeler.

১৬৮০ হইতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্যবসায় ভিন্ন ইংরেজদের আর কিছুই ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বী পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকদিগের সহিত জলযুদ্ধ, দস্যুদের উৎপাত হইতে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ও ভারতীয় নৃপতিগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করা ভিন্ন আর কোন যুদ্ধে ইহারা লিপ্ত হয় নাই। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী কর্ত্তৃক সুরাট ও কারওয়ার আক্রান্ত হইলে সার জর্জ অক্সিনডেন মারাঠিদিগের হস্ত হইতে দুর্গ রক্ষা করায় আওরংজেবের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। শিবাজী ছয় দিন যাবৎ সুরাট লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ঢাকা, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, আমেদাবাদ, বরোচ, টেলিচারি, কোচিন, মসলিপত্তন, ভিজিগাপটম প্রভৃতি স্থানেও ইংরেজদের ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয়। প্রত্যেকটি নগর অসংখ্য গুদামে পূর্ণ হইত এবং দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত রাখা হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কোম্পানীর ব্যবসা নিষ্কণ্টকরূপে চলিতে থাকে; কিন্তু এই সময় একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের ফরাসীদের সহিত যে যুদ্ধ বাধে তাহা শেষ হইতে না হইতেই নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পরাজয়ের পর কোম্পানী কর্ত্তৃক সৃষ্ট নূতন নবাব মীরজাফর কোম্পানীর হস্তে ২৪ পরগণার জমিদারী সমর্পণ করেন। ভারতে ইহাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম রাজ্যাধিকার প্রাপ্তি।

ইহার পর এক শত বৎসর পর্য্যন্ত (১৭৫৭-১৮৫৭) কোম্পানী কর্ত্তৃক ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার সর্ব্বজনবিদিত। ক্লাইভের সময় হইতে লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সমুদয় যুদ্ধ করিয়া কোম্পানী বৃটিশ আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে ঐ সকলই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ছিল। সমগ্র ভারত-শাসনের কল্পনা তখন পর্য্যন্ত কোম্পানী করিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয় না। তবে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে আমেরিকার উপনিবেশসমূহ হস্তচ্যুত হওয়ায় ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া সেই ক্ষতিপূরণের অভিপ্রায় ব্রিটিশ জাতির ছিল বলিয়া *Rise of the Christian Power in India* গ্রন্থে লেখক নিম্নোক্ত রূপ লিখিয়াছেন :—

"The ministry, at the head of which was Mr. Pitt, were crest-fallen on the loss of their American colonies. To compensate for this loss, they were dreaming of founding an Indian empire".

তাৎপর্য্য :—"যে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কর্ণধার ছিলেন মিঃ পিট, আমেরিকার উপনিবেশসমূহ হস্তচ্যুত হওয়ায় উহা একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই ক্ষতি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা করিতে আরম্ভ করেন।"

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতেই যুদ্ধবিজয়ের দ্বারা কোম্পানীর রাজ্যসীমা প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।(৪) কিন্তু ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলির নীতিসমূহই ভারতে ব্রিটিশ রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়াছিল। উহার পর লর্ড ডালহাউসির কার্য্যধারাই ভারতের অবশিষ্ট অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে সার্ব্বভৌম শক্তিতে পরিণত করে।

এই স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি ব্যবসায়ীসংঘ মাত্র ছিল—উহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নহে। ইহা ইংরেজ বণিক-শ্রেণীর একটি প্রাইভেট কোম্পানী এবং অংশীদারদের দ্বারা নির্ব্বাচিত বোর্ড অফ্ ডিরেক্টারগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। ইংলণ্ডের ডিউক, আর্ল, লর্ড শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়গণ গঠিত এই সকল অংশীদারকে ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া পার্লামেণ্ট হইতে রাজকীয় সনন্দ লইতে হইত। এই সনন্দের বলে ইহারা সৈন্য সংগ্রহ, নৌবহর সংরক্ষণ, মুদ্রা প্রস্তুত, দুর্গ-নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যগুলি করিতে অধিকারী হয়। এইরূপ সনন্দ প্রাপ্তি ব্যতীত ইহারা ব্যবসায় চালাইবারও অধিকার লাভ করিতে পারিত না। রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে পনর বৎসরের জন্য ইহারা প্রথম সনন্দ লাভ করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সনন্দ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যই কোম্পানীকে এইরূপ অধিকার প্রদান করে। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ হইবার পর প্রতি কুড়ি বৎসর অন্তর কোম্পানীর নূতন সনন্দ প্রাপ্তির দ্বারা যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহা এইরূপ :

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রথম রাজ্যশাসন ক্ষমতা হাতে পাইবার পর ব্যবসায় ও মূলধন সংক্রান্ত কতকগুলি অসুবিধার

(৪) He (Lord Cornwallis) was the first Governor General to add territories to the company's dominions by means of conquest: Neither Clive nor Warren Hastings obtained an inch of land in India by conquest— Major B. D. Basu.

সম্মুখীন হইতে হয়। পূর্ব্বে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ যেরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে ব্যবসায়ের জন্ত মনোনিবেশ করিতে পারিত অতঃপর তাহা করিতে না পারায় ব্যবসায় তথা শাসনসংক্রান্ত অসুবিধার দরুন ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং এক্ট পাস হয়।

কোম্পানীর গবর্ণর-জেনারেল পার্লামেণ্ট হইতে নিযুক্ত হইলেও তিনি কোম্পানীরই বেতনভোগী কর্ম্মচারী ছিলেন। যুগপৎ শাসন ও ব্যবসায় উভয়ই তাঁহাকে করিতে হইত ("He had both to trade and to rule")। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পিটের ইণ্ডিয়া বিল পাস হইবার পরও কোম্পানী দেশের শাসক ও বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকারী হইয়াই থাকিল। গবর্ণর-জেনারেলকে দুই কার্য্যই করিতে হইত। ("The Governor-General still had to trade as well as to rule")। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পুনরায় সনন্দ প্রদান করা হয়। পূর্ব্বোক্ত কারণে কোম্পানী ব্যবসায়ের অধিক উন্নতি করিতে পারে নাই। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বহু ইংরেজ বণিকের অস্তিত্বও সে সময় ছিল এবং এই সকল বণিক ভারতবর্ষের সহিত স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক ছিল। সুতরাং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় সনন্দ বদলের সময় প্রত্যেক ইংরেজ স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবার অধিকার পায় এবং কোম্পানীর বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লোপ পায়। কিন্তু ইহাতেও অন্তান্ত ইংরেজ বণিকেরা উপকৃত হইল না। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যে সনন্দ প্রদত্ত হয় ইহাদ্বারা কোম্পানী আর ব্যবসা চালাইতে পারিবে না—এই আদেশ বিধিবদ্ধ হইয়া গেল; ইহার পর যে কোন বণিক কোনরূপ অনুমোদন ব্যতীতই ভারতে বাণিজ্য করিবার অধিকারী হইল। (৫)

ইহার পর বৃটিশ বণিকদের ব্যবসায়ে প্রভূত লাভ হইতে লাগিল। ইহারা স্বাধীন ইংরেজ বণিক ছিল বলিয়া অতঃপর ব্যবসায়েই সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিল; দেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা রহিল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর। এখন হইতে গবর্ণর-জেনারেলের দেশ-শাসনই কর্ত্তব্য হইল ("From the year 1833 the Governor-General had only to rule not to trade")।

প্রাচীনকালে প্রতীচ্যের সহিত ভারতবর্ষ রেশম, মসলিন, মূল্যবান মণিমুক্তা, মশলা, হস্তিদন্ত ইত্যাদি পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায় করিত, কিন্তু এই সময় হইতে ভারতের রপ্তানী দ্রব্য সবই কাঁচা মাল এবং ভারতে আগত পণ্যদ্রব্য সবই শিল্প-জাত দ্রব্য হইতে লাগিল। এই সকল ব্যবসায়ের ফলে ভারতবর্ষ কেবল মাত্র কৃষি-প্রধান দেশে এবং বিলাত শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হইল।

সর্ব্বশেষ সনন্দ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হয়। ইহার প্রধান পরিবর্ত্তনদ্বারা ভারত-সরকারের কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা পার্লামেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করে। ইহার পূর্ব্বে এই সকল নিয়োগ ব্যাপারে ডিরেক্টরগণের স্বজন-পোষণ-নীতি প্রচলিত ছিল।

পলাশীর যুদ্ধের এক শত বৎসর পর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের ফলে কোম্পানীর শাসনকালের সমাপ্তি ঘটে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের রাজ্যশাসন-নীতি সমর্থন করিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি হাউস্ অফ কমন্‌স্-এ এবং ১১ই ফেব্রুয়ারি হাউস্ অফ লর্ডস্-এ সুবৃহৎ আবেদন-পত্র দাখিল করিলেন, কিন্তু উহা অগ্রাহ্য হইল এবং ঐ খ্রীষ্টাব্দেই পার্লামেণ্টে "ভারতবর্ষের উৎকৃষ্টতর শাসনের জন্ত আইন" পাস হইল। ভারতবর্ষ সাক্ষাৎ ভাবে ইংলণ্ডের রাজশক্তি তথা পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন হইল। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে গঠিত ক্ষুদ্র এক বণিকসংঘ রাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তে এক বিশাল সাম্রাজ্য উপহার দিল। এই সাম্রাজ্য-প্রাপ্তির গৌরব ব্রিটিশ রাজশক্তির নহে; কারণ রাজশক্তি ইহা অর্জ্জন করে নাই। বণিকেরা বণিকবৃত্তি অব্যাহত রাখিয়া কি ভাবে এবং কি উপায়ে ইহা অর্জ্জন করিয়াছিল নিম্নোক্ত উক্তির দ্বারা তাহা প্রকট হইয়া উঠে:—

"These successes were not gained directly by the forces of the King of England; they were gained by the East India Trading Company, which had been originally at the time of its incorporation under Queen Elizabeth no more than a company of sea adventurers. . . . And now this trading company with its tradition of gain, found itself dealing not merely in spices and dyes and tea and jewels, but in the revenues and territories of princes and the destinies of India. It had come to buy and sell, and found itself achieving a tremendous piracy. There was no one to challenge its proceedings. Is it any wonder that its captains and commanders and officials, nay even its clerks and common soldiers came back to England loaded with spoils? Men under such circumstances, with a great wealthy land at their mercy, could not determine what they might or might not do."—*Outline of History*—H. G. Wells.

---

(৫) ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বহু ইংরেজের ঈর্ষার কারণ অযৌক্তিক নহে—ইহা ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের উক্তিদ্বারা উপলব্ধি করা যায়। নিম্নের উক্তিও উহারই যথার্থতা প্রমাণ করিতেছে:—

(a) "To the bulk of the English people India was a remote, fantastic, almost inaccessible land to which adventurous poor young men went out, to return after many years very rich and very choleric old gentleman".

(b) "Englishmen at home were perplexed when presently these generals and officials came back to make dark accusations against each other of extortions and cruelties".—*The Outline of History*—H. G. Wells.

তাৎপর্য্য :—"ইংলণ্ডের রাজশক্তি দ্বারা এই সমুদয় সাফল্য অর্জ্জিত হয় নাই। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে অনুমোদন প্রাপ্ত সমুদ্র অভিযানকারীদের দ্বারা গঠিত একটি বণিক-সংঘ—ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ব্যবসায়ী সংঘদ্বারাই—ইহা অর্জ্জিত। অধুনা এই সকল বণিক অসীম লাভের মধ্যে উপলব্ধি করিল কেবলমাত্র মশলা, রং, চা, কিম্বা মণিমুক্তার ভিতরেই তাহাদের কার্য্যধারা সীমাবদ্ধ নাই; ভারতের রাজন্য, রাজন্যবর্গ এবং ভারতের ভাগ্যেরও তাহারা নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তা। ইহারা ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু প্রচণ্ড লুণ্ঠনবৃত্তির মধ্যে নিজদিগকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিল। তাহাদের কার্য্যাবলীকে প্রতিরোধ করিবার কেহই ছিল না। ইহা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সামরিক বেসামরিক পদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ এমন কি সামান্ত কেরাণী, সাধারণ সৈনিকও বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য সহ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। এই রূপ অবস্থা ও ঘটনাপরম্পরায় বিশাল ও ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা হইয়া কোন্‌টি করণীয় এবং কোন্‌টি করণীয় নহে তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া কোন লোকের পক্ষেই সম্ভবপর নহে।"

যে বণিক সম্প্রদায়ের প্রথম প্রাপ্ত ভূখণ্ড সুরাট বন্দর, প্রথম অধিকার মাদ্রাজ ও প্রথম রাজ্যপ্রাপ্তি ২৪ পরগণার জমিদারী, সেইরূপ একটি বণিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রাপ্তি জগতের ইতিহাসের অন্যতম বিচিত্র কাহিনী।

সন্তরণে স্বাস্থ্যরক্ষা

শ্রীশান্তি পাল

আমরা ডাঙার মানুষ হইলেও জলের সহিত আমাদের মিতালি সৃষ্টির প্রথম হইতেই আছে। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যাহাদের জীবনের অধিকাংশ সময় জলের উপর কাটিয়া যায়। জলের দৌলতে তাহারা তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে। সুতরাং জলে বাস করিতে গেলে সন্তরণ-বিদ্যা ভাল করিয়া শিখিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া প্রথমেই মনে হয় মানুষ কখন হইতে সাঁতার কাটিতেছে।

সেই আদিম বর্ব্বর যুগে গিরি-গুহাবাসী মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী যেরূপ ছিল তাহাতে আমরা সহজে ধরিয়া লইতে পারি যে, যখন তাহারা পাথর হইতে অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া পশু-পক্ষী শিকার করিত, চকমকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালিত, বৃক্ষ-বল্কল ও পশুলোম পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিত তাহার পূর্ব্বেই স্বাভাবিক সংস্কারবশে তাহারা সাঁতার কাটিতে শিখিয়াছিল। কেননা, মানুষ জন্মের পর হইতেই যে কোন অবস্থায়ই চেষ্টা করে বাঁচিয়া থাকিতে। এই বাঁচিয়া থাকার জন্য সে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করিতে চায়। তাই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া মানুষ আজ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

সন্তরণ সেই আদিম যুগ হইতেই মানুষের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। তবে আজকাল সাঁতারে অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্ত্তন হওয়ায় ইহার রূপ অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। দেশে দেশে বালক-বালিকা প্রৌঢ়-যুবা সকলের মধ্যে সন্তরণের অনুশীলন এবং প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে প্রচুর উৎসাহ দেখা দিয়াছে।
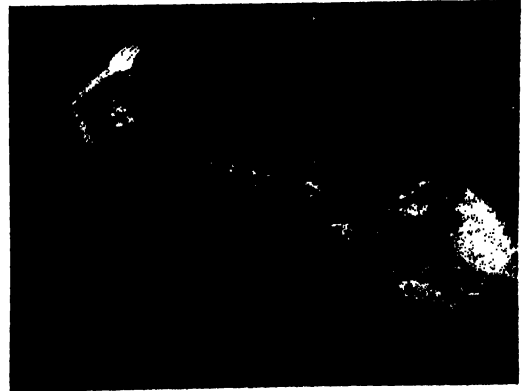
এক-হাতি পিঠ পাড়ি—লীলা হালদার

সাঁতার বলিতে আমরা কি বুঝি? যে কৌশলের সাহায্যে মানুষ জলের উপর স্বচ্ছন্দে ভাসিতে, ঘুরিতে-ফিরিতে, এবং নিজেকে নিরাপদে পরিচালিত করিতে পারে সাঁতার বলিতে আমরা তাহাকেই বুঝি। এই সন্তরণ-বিদ্যাটি মানুষকে শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু জীবজন্তুদিগের মধ্যে ইহা সহজাত সংস্কার। শারীরবৃত্তবিদেরা বলেন যে, মানুষের শরীর জল অপেক্ষা লঘু। জীব-জন্তুর শরীরও তাই। তবে মানুষের বিপদ হইল তাহার মাথা লইয়া। শরীরের

মধ্যে মানুষের মাথার দিকটা নাকি জল অপেক্ষা আয়তনের অনুপাতে কিঞ্চিৎ ভারী।

বাঁক-ফেরের শেষ ভঙ্গী লীলা হালদার

মানুষের দেহ জলে ছাড়িয়া দিলে তাহার মাথা এবং পা ঝুলিয়া নীচের দিকে চলিয়া যায়; কিন্তু তাহাতে মানুষ তো বাঁচিতে পারে না, জল খাইয়া, পেট ফুলিয়া ও দম বন্ধ হইয়া মানুষের মৃত্যু হয়। সেইজন্য কেমন করিয়া জলের উপর মাথা তুলিয়া, দেহটিকে ভাসাইয়া রাখিতে পারা যায় তাহা মানুষকে শিক্ষা করিতে হয়। ইহাই হইল সন্তরণের বর্ণপরিচয়। তবে অধিকাংশ জলজানোয়ারদের সুবিধা হইল এই যে, তাহাদের শরীরের মাথার দিকটা মানুষের মাথার মত এতটা ভারী নহে। তাই তাহাদের জলে ছাড়িয়া দিলে মাথাটা জলের উপর স্বাভাবতঃই ভাসিয়া থাকে। সেইজন্য তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে বা গ্রহণ করিতে কোনই কষ্ট হয় না।

জল-ক্রীড়ায় আনন্দ পাইতে গেলে ভাল করিয়া সাঁতার শিখিতে হইবে। সেই সনাতন পদ্ধতির সাঁতার নহে—আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্মত সাঁতার। জলময় অঞ্চলে বাস করা অথবা যাতায়াত করিবার কথা ছাড়িয়া দিই, স্বাস্থ্যের দিক হইতেও সাঁতার কাটা একান্ত আবশ্যক। সন্তরণ অপেক্ষা ভাল ব্যায়াম আজ পর্য্যন্তও পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নাই। একথা বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। শারীরতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, জলের উপরকার বাতাসে প্রচুর 'অক্সিজেন' আছে। সেই বায়ুমণ্ডলে নাকি রোগ-বীজাণুর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। তবে এখানে জল বলিতে আমরা সমুদ্র, বড় নদী, হ্রদ, স্বচ্ছসলিলা প্রশস্ত দীর্ঘিকা প্রভৃতির নির্ম্মল বারির কথা বলিতেছি—কাঁচা কুয়া ও এঁদো-পুকুরের জলকে বুঝাইতেছি না। সাঁতারে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম যথেষ্ট হয়।

সাঁতারের সময় প্রচুর অক্সিজেন শরীরের ভিতর গিয়া রক্তকে পরিষ্কৃত করে, নির্ম্মল করে, তাজা করে। সন্তরণ দ্বারা আর একটি সুফল লাভ হয়। সাঁতার কাটিলে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পেশীগুলিতে রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং সেগুলি বেশ পরিপুষ্ট হয়। সাঁতারে পায়ের 'সোলিয়াস' ও 'গ্যাস-ট্রোক-নেমিয়াস' সক্রিয় হওয়ায় পায়ের ডিম বেশ সুডৌল হয়। বুকের 'পেকটোরালিস' পেশীদ্বয় এবং বাহুর 'ডেলটয়েড' 'ট্রাই-সেপ্‌স', 'বাইসেপ্‌স', 'ফ্লেক্সোরাস-ডিজিটোরাস' প্রভৃতি পেশীগুলি বেশ পরিপুষ্ট হয়। শরীরের কোন চর্ম্মরোগ হয় না। সাঁতারুদিগকে অন্যান্য ব্যায়াম অনুশীলনকারীদের তুলনায় অধিকতর দীর্ঘজীবী হইতে দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে সন্তরণে কোন্ বিশিষ্ট পদ্ধতিটি সাঁতারুর গ্রহণ করা উচিত। আমাদের বিবেচনায় প্রথমেই 'ক্রল' সাঁতার শিক্ষা করা সমীচীন। আমরা এই ক্রল সাঁতারের নাম 'মকর-পাড়ি' বা 'হামা-পাড়ি' দিয়াছি। এই হামা-পাড়িতে কি অল্প পথ, কি দূর পথ স্বচ্ছন্দে সাবলীল গতিতে ও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমে যাওয়া যায়। আমরা পঞ্চাশ গজ হইতে ত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত জলপথ এই পদ্ধতিতে অতিক্রম করিয়াছি। ইহার কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। শচীন নাগ, মদন সিং, রাজারাম সাহু, প্রফুল্ল ঘোষ, দিলীপ মিত্র, দুর্গাদাস, লীলা হালদার, বাণী ঘোষ প্রভৃতি বিখ্যাত সন্তরণকুশলীরা এই হামা-পাড়িতে নৈপুণ্যের ফলেই বাংলার সন্তরণ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সন্তরণ-অনুশীলন করিয়া অটুট স্বাস্থ্য, শক্তি ও দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী হইয়াছেন।
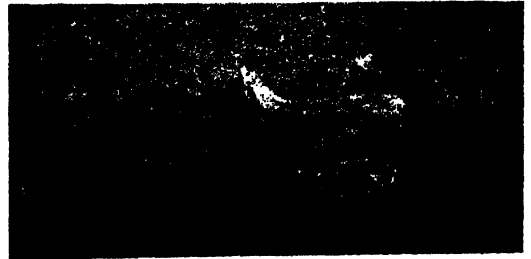
শান্তি পাল ও লীলা হালদার

এই সকল সন্তরণবিদের ন্যায় কুশলতা লাভ করিতে গেলে সাঁতারুকে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। যাঁহারা 'কম্পিটিশন' বা সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবেন তাঁহাদের এই নিয়মগুলি না মানিলে চলিবে না। প্রথমতঃ, হাত-পাড়ি বা পা-পাড়িগুলি সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে অভ্যাস করিতে হইবে। তারপর সন্তরণ-প্রতিযোগিতার জলপথের দূরত্বটি পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারণ করিয়া ক্ষিপ্রতার চর্চ্চা করা বিধেয়। এই সকল বিষয়ে নিজ নিজ সমিতির শিক্ষকদের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সন্তরণ-প্রতিযোগিতার সময় কখনই মানসিক ধৈর্য্য হারানো উচিত নহে। ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব করিয়া

এরূপ গতিতে পাড়ি দেওয়া উচিত, যাহাতে সহজে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ্যস্থলে গিয়া পৌঁছিতে পারা যায়। লক্ষ্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যেন সাঁতারুর গতিবেগ মন্দীভূত না হয়, মধ্যপথে সে যেন হাঁপাইয়া না পড়ে। প্রতিযোগিতায় এই ভাবে গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া আগাইয়া যাওয়া অবশ্য খুবই কঠিন ব্যাপার; দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে ইহা আয়ত্ত হয়।

লেখক

দৌড়ের সময় দম ও শক্তিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছনো পর্য্যন্ত তাহার সদ্ব্যবহার করা যায়। দমের অপব্যয়, অতি-ব্যয় ও অতিরিক্ত কার্পণ্য —এই তিনটিই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্যলাভের অন্তরায়।

আমরা অনেক প্রতিযোগিতায় দেখিয়াছি সাঁতারু প্রথমেই পুরা দমে সাঁতার সুরু করিয়া দিয়াছে, ফলে লক্ষ্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে হাঁপাইয়া পড়িয়াছে। আবার কখনও বা এমন একটি আশ্চর্য্যরকমের 'সমাপ্তি' দিয়াও আশানুরূপ ফল পাইল না। ইহার কারণ কি? কারণ, শেষের দিকে জোর দিবে বলিয়া দমটি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সময় মত কাজে লাগাইতে পারিল না। অন্যান্য সাঁতারুরা পূর্ব্বেই লক্ষ্যে পৌঁছিয়া গেল। উক্ত দম সঞ্চয়কারীর 'ফিনিশ' বা সমাপ্তি দেওয়া হইল না। সাঁতারুর সবচেয়ে বড় গুণ হইল ধৈর্য্য। দ্বিতীয় গুণ গতির মান নির্দ্ধারণ, এবং তৃতীয় গুণ হইল কৌশল।

আর একটি বিষয় সাঁতারুর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলা উচিত। তাহা হইল পরিমিত আহার, নিদ্রা ও ব্যায়াম। জীবনীশক্তি উৎপাদন, দৈহিক ক্ষয়পূরণ ও উত্তাপ সংরক্ষণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যগুলি টাটকা ও সহজপাচ্য হওয়া চাই। সাঁতারুর প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে কিছু কাঁচা বা সিদ্ধ শাক-সব্‌জী থাকিলে খুব ভাল হয়। আমাদের খাদ্য-দ্রব্যের ভিতর নিম্নলিখিত ছয় প্রকার উপাদান থাকিতে দেখা যায়, যথা (১) শর্করা জাতীয়, (২) আমিষ জাতীয়, (৩) স্নেহ জাতীয়, (৪) ধাতবলবণাদি,—'সোডিয়াম,' 'পটাসিয়াম', 'ক্যাল-সিয়াম' 'ম্যাগনেসিয়াম' লৌহ প্রভৃতি ধাতুঘটিত লবণ, (৫) জল, ও (৬) ভিটামিন।

সাঁতারুর নিত্যকার খাদ্যের মধ্যে উপরোক্ত উপাদান-গুলিই যাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় থাকে, সেদিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত। শর্করা ও স্নেহ জাতীয় উপাদান শরীরের প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী খাইলে সেই অতিরিক্ত উপাদান অনাবশ্যক চর্ব্বিতে পরিণত হইয়া পেশীসমূহের উপরিভাগে সঞ্চিত হয়। নিত্যকার সাঁতার অভ্যাসে শরীরের অল্পস্বল্প চর্ব্বি তেমন কিছু ক্ষতিকর হয় না বটে, কিন্তু কিছুদিন সাঁতার অভ্যাস না করিয়া শরীরে অধিক মাত্রায় চর্ব্বি জমিতে দিলে সাঁতারু অল্প দিনের মধ্যেই সন্তরণ এবং অন্যান্য শ্রমসাধ্য ব্যায়ামে অপটু হইয়া পড়ে। অধিক চর্ব্বি শরীরকে শুধু অসুস্থই করে না, ভারীও করে। ইহা সাঁতারুর পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

সাঁতারের পরিশ্রমের গুরুত্ব অনুযায়ী সাধারণ খাদ্য অপেক্ষা সামান্য বেশী পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য সাঁতারুর প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু অযথা কতকগুলি গুরুপাক খাদ্য খাইয়া পরিপাক-যন্ত্রকে পীড়িত করা কখনই উচিত

এলোপাথির একটি ভঙ্গী—লীলা হালদার
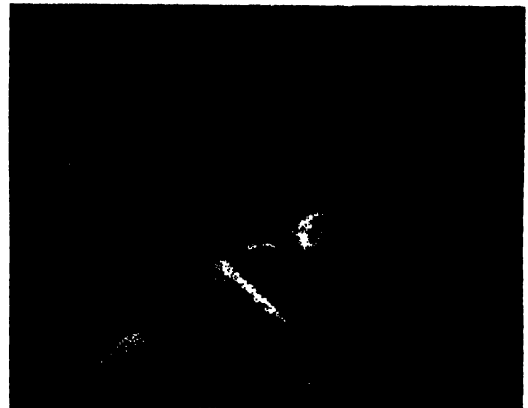
নহে। সাঁতারুর সর্ব্বদাই মনে রাখা দরকার যে, যাঁহারা অন্যান্য ব্যায়ামাদির চর্চ্চা করেন তাঁহাদের ন্যায় ততটা প্রচুর খাদ্যের আবশ্যক তাঁদের হয় না। স্থূলকায় বা মেদবহুল দেহ না হইলে সাঁতারুর পক্ষে নিত্য কিছু কিছু দুধ, ঘি, মাখন প্রভৃতি স্নেহ জাতীয় নিরামিষ খাদ্য খাওয়া দরকার। আমিষ জাতীয় খাদ্য—ডিম, মাছ, ছানা, মাংস প্রভৃতি সাঁতারুর

প্রাত্যহিক খাদ্যের সহিত নিজ নিজ পরিপাক শক্তি অনুযায়ী খাওয়াই উচিত।

গোড়ার দিকে সাঁতারুর পক্ষে দেহের ওজন স্বাভাবিক ওজনের অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেই ভাল হয়। কারণ, অতিরিক্ত সাঁতারজনিত ক্ষয়ে দেহ যাহাতে স্বাভাবিক অবস্থায় আসে সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখা দরকার। নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোন খাদ্যে বেশী পরিমাণে শর্করা 'কার্বোহাইড্রেট', কোন খাদ্যে বেশী পরিমাণে আমিষ 'প্রোটিন' আবার কোনটিতে বেশী পরিমাণে স্নেহ 'ফ্যাট' জাতীয় উপাদান আছে। দাল, কড়াই, ছোলা, মটর প্রভৃতি খাদ্যে কয়েক প্রকার লবণ ব্যতীত আমিষ ও শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় উপাদান অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ আছে। দালে যে প্রোটিন জাতীয় উপাদান থাকে তাহা মাছ ও মাংসের প্রোটিন অপেক্ষা অধিকতর দুষ্পাচ্য। এক পোয়া মাছ বা মাংস অথবা দুইটি ডিমের ভিতর যেটুকু আমিষ জাতীয় উপাদান থাকে সেই পরিমাণ আমিষ উপাদান প্রায় দেড় পোয়া দালের মধ্যে থাকে। অথচ প্রথমোক্তগুলির যে কোনটি সুস্থকায় ব্যক্তি মাত্রেই অতি সহজেই খাইয়া হজম করিতে পারে ; কিন্তু এক বা দেড় পোয়া দাল অতিবড় ব্যায়াম-বীরের পক্ষেও হজম করা অতিশয় কঠিন। ছোলা মুগ প্রভৃতি কড়াই জাতীয় খাদ্য অল্প জলে এক দিন ভিজাইয়া রাখিলে কল বা অঙ্কুর বাহির হয়। সেইরূপ কলযুক্ত ছোলা বা মুগে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন সাঁতারুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য।

সাঁতারুকে সকাল বেলায় সাঁতার অনুশীলনের পর এক মুঠা কলযুক্ত ছোলা বা মুগ-ভিজা কিঞ্চিৎ আখের গুড় বা মধু মিশ্রিত করিয়া খুব চিবাইয়া খাইতে হইবে। বাজারের প্রস্তুত ভেজাল ঘি-তেলে ভাজা কোন খাবার ভুলেও খাওয়া উচিত নয়। প্রাত্যহিক আহারের সময় অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই অতিরিক্ত মাত্রায় জল খাওয়া অনুচিত। দুই-এক ঘণ্টা পরে যত খুশী জল পান করা চলে। তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। কাগজী বাদামের সরবৎ কিঞ্চিৎ কাঁচা দুধ মিশাইয়া সন্তরণ অনুশীলনের অব্যবহিত পরে খাইতে পারা যায়। কিম্বা নিজের রুচি ও ধাত অনুযায়ী 'এগ্‌ফ্লিপস'—এক পোয়া হইতে আধসের গরম দুধে একটি কাঁচা মুরগীর ডিম ভাল করিয়া ঘুঁটিয়া—খাওয়া চলে। মাখন-মিছরি, টোষ্ট বা মোহনভোগ জাতীয় খাদ্যও নিষিদ্ধ নহে। তবে ঘি মাখন যেন ভেজাল না হয় এবং অতিরিক্ত মাত্রায় খাওয়া না হয়।

সাঁতারুর আহার্য্যের নিত্য পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে। যাহারা সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবে বিশেষ করিয়া তাহারাই যেন এই সকল নিয়ম অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করে। প্রতিযোগিতার দিন তাহারা যেন উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার্য্য গ্রহণ না করে। প্রতিযোগিতায় নামিবার অন্ততঃ পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রতিযোগী তাহার নিত্যকার আহার সমাধা করিয়া লইবে। সিগারেট, চা, কফি, কোকো প্রভৃতি একেবারে বর্জ্জন করিতে পারিলে সাঁতারুর পক্ষে ভাল হয়। মাদকদ্রব্য বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত।

দোনলা জাহাজ—বাহাদুরি-সাঁতারের একটি ভঙ্গী

সাঁতারের খাদ্য সম্পর্কে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, ব্যায়াম সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ অবহিত হওয়া দরকার। শারীরবৃত্তবিদগণ বলেন যে, ব্যায়ামে মাংসপেশীর দেহযন্ত্রে মৃদু দহনক্রিয়া সুরু হয়, ফলে পেশীতে বেশী পরিমাণে 'কার্ব্বন ডায়কসাইড' সৃষ্টি হয়। ঐ গ্যাস রক্ত প্রবাহের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া শ্বাস-যন্ত্রে যায়। সেখান হইতে তাহা নিশ্বাসরূপে বহির্গত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বায়ু হইতে অক্সিজেন দ্বারা শ্বাস-যন্ত্র পরিপূরিত হইয়া উঠে, এবং সেখান হইতে তাহা রক্তপ্রবাহদ্বারা সমস্ত শরীরে চলাচল করে। এই কার্ব্বন ডায়কসাইড গভীর ও ঘন ঘন নিশ্বাসের সহিত দ্রুত নির্গত না করিলে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং রক্তের মধ্যে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। ব্যায়ামের পর পেশীগুলি অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে দেহের স্বাভাবিক তাপ ও পেশী সঞ্চালনের ক্ষমতা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসে। জলে থাকার জন্য এই উত্তাপবৃদ্ধি সাধারণতঃ বুঝিতে পারা যায় না। আনন্দের আধিক্যবশতঃ বেশীক্ষণ সাঁতার কাটিলে শরীরও অজ্ঞাতসারে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

সাঁতারুর পক্ষে প্যারালাল বার, হরাইজেণ্টাল বার, রিং, বারবেল, ডাম্বল প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রমসাধ্য ব্যায়ামের চর্চ্চা নিষিদ্ধ, সন্তরণ-কুশলতা লাভ করিবার ও সাধারণ স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন তাহা কেবলমাত্র সাঁতারের দ্বারাই লাভ করা যায়, সেজন্য অন্য ব্যায়ামের চর্চ্চা অনাবশ্যক। তবে শীতকালে প্রতিদিন বেশ খানিকটা জোরে

হাঁটা, একটু আধটু লাফ-ঝাঁপ দেওয়া, আস্তে আস্তে দৌড়ান, অথবা সুবিধা থাকিলে নৌকায় দাঁড়টানা—এই ধরণের

লীলা হালদার

কিছু কিছু ব্যায়ামের চর্চ্চা করা যাইতে পারে। সাঁতারুর শরীরের পেশীগুলি রবারের মত স্থিতিস্থাপক (elastic) হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লঘু ব্যায়ামে শরীর খুব কর্ম্মঠ থাকে এবং সাঁতান্তে নূতন শক্তি ও আগ্রহে পুনরায় সাঁতার অনুশীলন করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যে নিত্য স্নানের পূর্ব্বে সরিষার তৈল মর্দ্দন করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। সাঁতারুর সাঁতার অনুশীলনের সময় সম্বন্ধেও নিয়মানুবর্ত্তিতা মানিয়া চলা উচিত। প্রতিদিন একই সময়ে নিজের শক্তি ও দম অনুযায়ী পরিমিত মাত্রায় সাঁতার কাটা আবশ্যক। যে কোন সময়ে ও অপরিমিত মাত্রায় সাঁতার কাটা এবং অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘকাল জলে পড়িয়া থাকা এই সমস্তই স্বাস্থ্যের পক্ষে সমান ক্ষতিকর।

নিদ্রার কারণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল কম হইলে ঘুম আসে। আমরা যখন জাগ্রত থাকি বা চিন্তায় মগ্ন থাকি তখন মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল অপেক্ষাকৃত বেশী হইতে থাকে এবং সে সময় শরীরের অন্য স্থানের রক্ত চলাচল অপেক্ষাকৃত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। জাগ্রত অবস্থায় ক্রমাগত বহির্জগতের সংস্পর্শে আসায় ও পেশীসমূহকে ক্রিয়াশীল রাখিতে রাখিতে দিনান্তে মস্তিষ্ক অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। ফলে মস্তিষ্কে পূর্ব্বের মত রক্ত যায় না এবং ইচ্ছা না থাকিলেও ঘুম আসিয়া পড়ে।

সাঁতারুর ঘুমের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। সাঁতারের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করিতে একমাত্র সুনিদ্রাই পারে। সুনিদ্রাই শরীরকে ক্লান্ত অবস্থা হইতে পুনরায় চাঙ্গা ও কর্ম্মঠ করিয়া তোলে। রাত্রিকালে আহারের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে এবং মধ্য রাত্রের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে শয্যা গ্রহণ করা স্বাস্থ্যপ্রদ। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিতে হইবে। সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে দিবানিদ্রা যেমন পরিবর্জ্জনীয় তেমনি রাত্রিকালীন নিশ্চিন্ত নিদ্রা বাঞ্ছনীয়। সাঁতারুদিগের দৈনন্দিন সাঁতার অনুশীলনের পর অন্তত পক্ষে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল সমস্ত শরীরকে এলাইয়া দিয়া বিশ্রাম করিবে। এমন কি এ সময় কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করাই সমীচীন। এই নিয়মটি প্রতিপালন করিলে সাঁতারুর শরীরের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিবে।

সাঁতারুর সর্ব্বদাই মনে রাখা দরকার যে, সাত-আট ঘণ্টা ঘুমাইয়াও যদি সে বুঝিতে পারে যে, শরীরের অবসাদ বা গ্লানি সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই তাহা হইলে সেই দিন তাহার প্রাত্যহিক সাঁতার অনুশীলন একেবারে বন্ধ রাখা উচিত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনই জলে নামা বিধেয় নহে। ইহার অন্যথা করিলে সাঁতারে দক্ষতালাভ বা ক্ষিপ্রতাবৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা বরং বিপরীত ফললাভ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, ডাঙায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ব্যায়ামচর্চ্চা

ব্যাকষ্ট্রোকের একটি ভঙ্গী—লীলা হালদার
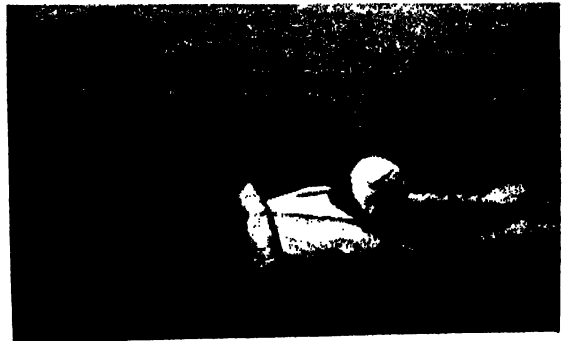
করিলে যে পরিমাণ পরিশ্রম হয় তাহার চতুর্গুণ হয় ঐ পরিমাণ সময় সন্তরণে। সন্তরণে অন্যান্য ব্যায়াম অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ পাওয়া যায় বলিয়া আমরা অনেক সময় মাত্রা ছাড়াইয়া যাই। তাহার ফলে জড়তা আসে, স্নায়ুগুলি ঝিমাইয়া পড়ে। আবগাহন স্নানে স্নায়ুগুলি শীতল হওয়ায় স্বভাবতই মানুষকে যেমন কর্ম্মে উদ্যমশীল করে তেমনি কর্ম্মান্তে তাহার সুনিদ্রা লাভেরও সহায়তা করে। সন্তরণে মাংসপেশীর অত্যধিক সঞ্চালনের জন্য শরীরে নিত্য-সঞ্জাত আবর্জ্জনারাশি ঘর্ম্ম ও নিশ্বাসের মধ্য দিয়া নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়।

সংঘাত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভ্রাতুষ্পুত্র মিহিরবিকাশের উপনয়ন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবের পরের দিন—চারিপাশে উৎসবের আবর্জ্জনা জমিয়া বাড়ীটাকে বড়ই মলিন করিয়া তুলিয়াছে। মিহির ব্রহ্মচারী অবস্থায় একক এক কক্ষে বাস করিতেছে। যাহাকে ঘিরিয়া এতদিন উৎসব চলিয়াছে সে আজ নির্ব্বাসিত, তাই মনটা স্বভাবতঃই কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করে।

বৈঠকখানায় বসিয়া তিন ভাই আড্ডা দিতেছিলাম—যে অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে তাহা সুসম্পন্ন হইল কিনা তাহাই বিতর্কের কথা। ধানায় কালিয়াটা আর একটু ঝাল হইলে আরও উৎকৃষ্ট হইত কিনা এই সভায় তাহাই স্থিরীকৃত হইতেছিল। যাহাই হউক প্রতিবেশীরা প্রত্যক্ষে অন্ততঃ কোন ত্রুটি ধরেন নাই ইহাই পরম পরিতোষের বিষয়।

বড়দারই ছেলে মিহির। বড়দা সহসা বলিলেন—যাক্ এবারটা ঠিক মনের মত হয় নি, মিহিরের বিয়ের পরে বৌ-ভাতটা যা দেব তাতে আর কিছু বাকি রাখবো না। মিষ্টিই অন্ততঃ দশটা পদ থাকবে—

ধীরে ধীরে মিহিরের বিবাহের বৌভাত কিরূপ হইবে এই প্রসঙ্গ ক্রমে বৌ কি রকম হইবে এই প্রসঙ্গে রূপান্তরিত হইল। বড়দার কনে নির্ব্বাচন ব্যাপারে আমার কোন আস্থা ছিল না তাই বলিলাম—বৌভাত কেমন হবে তা না হয় ঠিক ক'রো কিন্তু বৌমাটিকে আর তুমি ঠিক করতে যেও না। ওটা আমার হাতেই দিও। দুটো বিয়ে ত দিলে তাতেই তোমার সব পরিচয় পাওয়া গেছে।

দুইটি বিবাহ বলিতে আমার ও মেজদার বিবাহ—এই দুইটিই যে খুব সুখের হয় নাই এ অভিযোগ আমরা উভয়েই করিয়া থাকি, সম্ভবতঃ সকলেই বিবাহের কর্ত্তৃপক্ষকে এরূপ বলিয়া থাকে। মেজদা আমাকে তাই অনুমোদন করিয়া বলিল—হ্যাঁ, ওটা তুমি পারো না। মেয়েটা দেখেশুনে আনার ভার আমাদেরই রইল।

বড়দা হাসিয়া বলিলেন—শিক্ষিতা, দু'চারটে পাসকরা বৌ নিয়ে যে সকলেই স্বর্গসুখ ভোগ করছে এমনও ত মনে হয় না। সুখশান্তি ভাগ্য—

—ভাগ্য সন্দেহ নেই, তবে বাজারের হিসাবটা অন্ততঃ রাখতে পারে কিনা, চিঠির ঠিকানা লিখলে যথাস্থানে পৌঁছায় কিনা এটা দেখে ত ঠিক পাওয়া যায়।

বড়দা বলিলেন—থাম, সবই দেখা গেছে—প্রজাপতি-নির্ব্বন্ধ সবই।

আমি বলিলাম—তা হোক্, মিহিরের বৌ অন্ততঃ বি-এ পাস না হলে হবেই না, সেই সঙ্গে দেখতে হবে মা-লক্ষ্মীটি একটু গান জানবে, একটু সেতার বাজাতে জানবে। সংসারের সমস্ত খবরদারী করতে হবে ত! সে যখন সংসারের বড়বৌ—

বড়দা বলিলেন—ওসব হয় হোক্, কিন্তু যখন সন্ধ্যায় আমার আফিঙের নেশাটা জমবে তখন বৌমাকেই ত কল্‌কে ভরে দিতে হবে। ওঁরা ত কোষ্ঠির মতে বহু আগেই সরে পড়ছেন—

মেজদা কহিলেন—না, তোমার আইডিয়াটাই বড় ইন্‌-ডিসেণ্ট। গ্রাজুয়েট বৌমা সে তোমার তামাক সাজ্‌বে, চাকর থাকুক না একটা। ছেলে যখন সাতাশ বছর বয়সে এক হাজার টাকা রোজগার করবে, তখন চাকরই ত থাকবে—

—ওইটেই ত বুঝলে না। ঠাকুর ত একটা আমিও রাখতে পারি কিন্তু তোমার বৌদি তবে রাঁধেন কেন? ওতে তৃপ্তি নেই, তা হলে হোটেলে বাস করা আর সংসার করা এক কথাই হয়ে দাঁড়ায়।

আমি বলিলাম—না, ওসব হবে না। বরং বৌমা সন্ধ্যায় নিত্য গান শোনাবে, শুনতে শুনতে ঝিমিও, এটা তবু যেন মানায়—

বড়দা সহসা অন্যমনস্ক হইয়া কহিলেন—তত দিন কি আর বেঁচে থাকবো? ধর আরও পনর বছর। পঞ্চান্ন বছর—এত আয়ু ত আমাদের বংশে কারও নেই। আর বিয়ে দিতে যেতে পারবো না,—তোমরাই ত দেবে—

আলোচনার কথাটা ক্রমে গুরুত্ব লাভ করিল প্রসঙ্গ হইল শিক্ষিতা বধূ সংসারের পক্ষে ভাল না স্বল্পশিক্ষিত বধূই ভাল। বড়দা ভাগ্যবাদী, তাঁহার কোন মতামত নাই। মেজদা ও আমি শিক্ষিতা বধূর পক্ষপাতী। আমি বলিলাম—বৌমা সংসারের ম্যানেজার হবে, শিশুগণের শিক্ষার ভার নেবে, হিসাবপত্র রাখবে—

বড়দা বলিলেন—বেশ, তবে কষ্ট করে ছেলে মানুষ করলাম তার লাভটা কি? যদি বুড়োবয়সে সেবা-শুশ্রূষাই একটু না পেলাম।

—সেটা পাবে বই কি? তবে তামাক সাজা নয়—

বাড়ীর ভিতরে আহারের ডাক পড়িল, আলোচনাটা তখনও চলিতেছিল। বড়বৌদি কহিলেন—হ্যাঁ, বি-এ পাস বৌ আন, আর আমাদের খেন্না করুক, আমরা ওসব চাই না। এমন বৌ আনতে হবে যে সংসারের কাজে লাগে—

এমন আলোচনা আজ নূতন নয়, বহু দিন বহু ভাবে হইয়া গিয়াছে। মিহির বহু টাকা পাইবে এবং আমাদের বৃদ্ধ বয়সে আফিং বাবদ যথেষ্ট পেনসন দিবে এটা একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছিল, এখন বৌমাকে লইয়াই গোলযোগ। কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম শিশুর নখের উপর পিতামাতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে। আমাদের জীবনের যত ব্যর্থতা তাহা যেন মিহির ও তাহার পত্নীর চারি পাশ ঘিরিয়া সার্থক হইবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে—তাই এই আলোচনা নিত্যই আমরা

করিয়া থাকি এবং এই আলোচনার মাঝেই যেন জীবনের অপূর্ণতা পূর্ণ হইয়া উঠে।

দিন চলিয়া যায়—ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় সেদিন যে শিশু ছিল আজ সে কেমন ভদ্রলোক হইয়াছে। মানুষ যেন বাইশ বছর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, তাহার পরই অকস্মাৎ এক দিন সে বৃদ্ধ হইয়া যায়। মিহিরও দেখিতে দেখিতে যুবক হইয়া উঠিল, পাস করিল এবং কোষ্ঠির মতানুযায়ী হাজার না হউক পাঁচ শত টাকা রোজগার করিবে। সে ইঞ্জিনিয়ার—বিহারের লোহকারখানায় চাকুরীর সংবাদ আজই মাত্র আসিয়াছে।

মনে মনে একটু ক্ষোভ না ছিল এমন নয়। ঘর-সংসার করি, স্নেহ-মমতাও আছে তবুও পত্নী যথেষ্ট শিক্ষিত নয় বলিয়া একটা ক্ষোভ হয়ত নির্জ্জনে মনে আছে, তাই মিহিরের জীবনে বি-এ পাস বৌমা আরোপ করিয়া আমরা আনন্দ পাইতে চাই। আমি চাই বৌমাটিকে সঙ্গীতজ্ঞা ও সুষ্ঠু গৃহকর্ত্রী রূপে, মেজদা চান তাঁর নথিপত্র ঠিকঠাক গোছাইয়া রাখিতে, আইনের কেতাব ঠিকঠিক আনিয়া দিতে, বড়দা সন্ধ্যার সময় চান এক ছিলিম তামাক, আফিঙের তাগাদে মধুপর্ক করিতে। মিহিরের কর্মক্ষম হইবার সঙ্গে আমাদের মাথা খারাপ হইয়া উঠিয়াছে।

মিহিরের এইবার বিবাহ দিতে হইবে—

বৈঠকখানায় আবার তেমনি আলাপ হইতেছিল। বড়দা বলিলেন—এবার তা হলে মেয়ে দেখো। আমার পছন্দ ত পাকিস্ত হয়ে গেছে, এবার তোমরা

মেজদা কহিলেন—হ্যাঁ, তোমার ও তামাদি হয়ে গেছে, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে হবে—বি-এ পাস ত চাই—তা ছাড়া গানবাজনা জানা, দেখতে সুন্দরী—

আমি বলিলাম—সর্ব্বাগ্রে দেখতে হবে, বনেদি বংশ কি না। হঠাৎ-বড়লোক বংশকে বড় ভয় করি—তাদের মত সঙ্কীর্ণ মন আর হয় না

—সেটা ত নিশ্চয়ই,—আর তোমাদের বৌদিদির যদি কিছু ফরমাইস থাকে

আমি কহিলাম—বিবাহ ঠিক হচ্ছে এ সংবাদটা মিহিরকে জানিয়ে, আজকালকার ছেলে, মতামত নিয়ে তবে মেয়ে দেখলে হয় না—বড়দা গড়গড়ার নল ফেলিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন—আমার ছেলে আমি বিয়ে দেব, তোমাদের ভাই-পো তোমরা বিয়ে দেবে—এতে আবার তার মতটা কি?

—কিন্তু আজকালকার ছেলেদের মত যদি বলে বসে ব্যাচিলর থাকব—

—থাকলেই হ'ল, টাকা পয়সা খরচ করে মানুষ করলাম, আর বিয়ে করার মত সহজ কাজটা করেও ছেলে আমাদের উপকার করবেন না—বেশ।

মেজদা কহিলেন—ওটা ফ্যাসন হয়েছে কিনা। যাই হোক, ছোটবৌকে দিয়ে জানিয়ে দাও যেন ছুটির যোগাড় রাখে, বিয়ে ঠিক হচ্ছে।

বড়দা উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—যাম্ হরি যাম্, টাকা ত চাচ্ছি না আমরা, বিয়ে করে বৌ এনে দিতে বলছি—বৌ না হয় নাই সে চাইবে—কয়েকটা মন্ত্র না হয় সে দয়া করে পড়ে দেবে।

মেয়ে দেখা আরম্ভ হইল।

মেজদা তাঁহার প্র্যাক্টিস ফেলিয়া ছুটেন, আমি চাকুরী ফেলিয়া ছুটি। বড়দা মৌতাত ফেলিয়া চিঠি লেখেন। এমনি ব্যস্ততার মধ্যে একদিন অকস্মাৎ পত্র আসিল—

মিহির লিখিয়াছে—আমাদের আদেশে সে সব কাজই করিতে প্রস্তুত কিন্তু ঐ বিবাহটা ব্যতীত। যদি প্রয়োজন হয় সে ব্যবস্থা সে নিজেই করিবে। আমাদের ব্যস্ত হইবার কিছু নাই।

বড়দা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—আমার ছেলের বিয়ে ব্যস্ত আমি হব না—সে হবে? ওসব কিছু না—তোমরা ঠিক করে কেবল কান ধরে নিয়ে এসে বিয়ে দেব।

আমরা সমস্যা আশঙ্কা করিয়া মিহিরকে দীর্ঘ পত্র দিলাম। কিন্তু চিরবাধ্য মিহির দৃঢ়ভাবে তাহাও অস্বীকার করিল। তাহার কি যুক্তি আছে সে-ই জানে।

বড়দাকে সংবাদটা স্পষ্টতঃ বলিলাম না কিন্তু ঘুরাইয়া বলিলাম। বড়দা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কেবল বলিল,—আর ক-বছর? না হয় পাঁচ বছরই বাঁচব, সেটাও যদি সারা জীবনের মতই যায়—তাতেই বা আর অভিযোগ কি?

মেজদা ক্ষণেক বসিয়া থাকিয়া কহিলেন—আমারও হয়ত আর দু-চার বছর আছে। রোজ সন্ধ্যায় ভাবি কি জান? বৌমা টেবিলে চা দিতে যাবে, আমি বলব, বৌমা রেজিষ্ট্রেশন এই দাও ত: আবার বলব—বৌমা এভিডেন্স এই। এই সামান্য জিনিষটা জীবনে হবে না মনে করে যেন মনে হচ্ছে জীবনটাই বৃথা। ঐ একটি আকাঙ্ক্ষা নিয়েই যেন বেঁচে-ছিলাম জীবনে—আমার ত ছেলে নেই।

আমার মনের গহনে সন্ধান করিয়া দেখিলাম সন্ধ্যায় গানের আসরটি হবে না মনে করিয়া যেন জীবনটাকে ব্যর্থ মনে হইতেছে। আশ্চর্য্য! আমরা কি জীবনে অমনি এক একটি ক্ষুদ্র আশাকে মাত্র অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছি—নিজের জীবনের অতীতে অন্যের জীবন ঘেরিয়া আপনার আকাঙ্ক্ষাকে আরোপ করিয়াছি এবং তাহাকে পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছি?

জীবনটার মাঝে গভীর দৃষ্টি দিয়া দেখিলে যেন তাহাকে সত্যই খুব রহস্যময় বলিয়া বোধ হয়—রঙীন কাচের মাঝ দিয়া ছেলেমেয়েকে আমরা যেন কত সুন্দরই দেখি। ভাবিতে ভাবিতে বড়দার প্রতি করুণা হয়।

হঠাৎ মেজদার অসুখ হইল এবং দুই-তিন দিনের মধ্যেই

চিকিৎসকগণ গুরুতর বলিয়া যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু অসুস্থতা গুরুতর হইলেই তাহার কলাফল অমোঘ হইতে পারে, তাই মেজদা যেন বড়ই ভাঙিয়া পড়িলেন। তাঁহার একটা ধারণা হইল যে এবার তাঁহার রক্ষা নাই, জীবনের এই শেষ রোগ।

মাঝে মাঝেই মেজদা বলিতেন—সকলকে টেলিগ্রাম কর, একবার দেখে যাই। মিহিরকে টেলিগ্রাম কর।

কিন্তু একদিন মেজদার অবস্থা সত্যই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল এবং আমরা তাঁহার ইচ্ছামত টেলিগ্রামও করিলাম।

মেজদা মাঝে মাঝে চোখ মেলিয়া চাহিয়া কি যেন খুঁজিতেছিলেন, আমি প্রশ্ন করিলাম, কি ?

দাদা বলিলেন—মিহির এসেছে ?

—না, সন্ধ্যার গাড়ীতে আসতে পারে।

একটু থামিয়া কহিলেন—বৌমাটিকে আর দেখে যেতে পারলাম না।

মনে হয় ঐ একটা মাত্র অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বন্ধনে তাঁহার প্রাণ যেন কণ্ঠে আসিয়া ঠেকিয়াছে, কিছুতেই বাহির হইতেছে না। পরের মেয়ে ঘরে আসিবে, ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে, তথাপি কি দুরূহ আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া যেন একটু বিকল বলিয়া মনে হইল, মেজদা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছেন, তবে ডাক্তার বলিয়া গিয়াছে ভয়ের কিছু নাই। হঠাৎ মিহির আসিয়া উপস্থিত হইল, অবস্থার কথা জানাইয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে নিষেধ করিলাম।

কিছুক্ষণ পরে দাদা জাগিয়া পানীয় চাহিলেন—পানীয় দিলাম এবং ইঙ্গিতে মিহিরকে নিকটে ডাকিলেন। মিহিরের কোলের উপরে হাতখানি রাখিয়া দাদা চুপ করিয়া রহিলেন—রোগপাণ্ডুর মুখের কোটরগত চক্ষু দুইটি যেন সজল হইয়া উঠিল, কহিলেন—মিহির, তোর বউ দেখতে পেলাম না বলেই যেন প্রাণটা বেরুচ্ছে না—

বড়দার চক্ষুও সজল হইয়া আসিয়াছিল, তিনি বলিলেন—না না, তুই সেরে ওঠ, মিহির নিশ্চয়ই বিয়ে করবে—

মিহির চুপ করিয়া বসিয়া রহিল মাত্র—কোন জবাব দিল না।

যাহাই হউক মেজদা আরোগ্য লাভ করিলেন।

মিহির বাড়ী হইতে যাইবার আগে নাকি বলিয়া গিয়াছে বৌমার জন্যে যদি প্রাণটা আর কিছুদিন আটকে থাকে, দু'চার বছর বেঁচে থাকেন সেইটেই ত লাভের।

বাঙালীর ছেলে কোন দিনই নিজের জন্য বিবাহ করে না, নেহাৎ বাপ-মায়ের জন্যেই করে। মিহিরও তেমনি একদিন আমাদের জন্যই বিবাহ করিতে রাজি হইল—সঙ্গে সঙ্গে আমিও কনে দেখিতে লাগিয়া গেলাম এবং বি-এ পাস মেয়েও পাওয়া গেল।

আমি কনে দেখিতে গেলাম।

সত্যই সুন্দরী, বি-এ পাস করিয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কি আছে, তবুও কন্যাপক্ষের ইচ্ছায় তাহার সেতার বাজনা শুনিলাম। আসিবার আগে মালশ্রীকে ডাকিয়া বলিলাম—মালশ্রী কি বা বলব। তোমাকে ঘরে নিতে পারলে সত্যিই খুশী হব। আমাদের ঘর-সংসারের সকল কথাই হয়ত শুনেছ, তোমার শ্বশুর তিন জনও শিক্ষিত যদিও নেহাৎ সেকেলে।

মেয়েটি সামনে একখানা তক্তপোষে বসিয়া আছে, কথাটা শুনিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া যেন একটু হাসিল।

—তোমার যে তিনটি শ্বশুর হবে তাদের জন্যে তোমার কিন্তু যথেষ্ট দুরূহ কর্ত্তব্য আছে, এই তিনটি অথর্ব বুড়োর জন্যে তা কি করতে পারবে ?

কন্যাপক্ষের অনেকেই বলিলেন, নিশ্চয়ই পারবে, সেবা-পরায়ণতাই ওর বিশেষ গুণ।

আমি বলিলাম—তা নয়, মালশ্রীর মুখেই শুনতে চাই।

মেয়েটি স্মিতহাস্যে কহিল—পারব।

—না জেনেই যখন বললে—পারবো তখনই সন্দেহ হয়। কর্ত্তব্য দুরূহ—তোমার যিনি আপন শ্বশুর হবেন, তাঁর সখ বি-এ পাস বৌমার হাতের এক ছিলিম তামাক খাবেন—চাকরের হাতের তামাক আর ভাল লাগে না। মেজ শ্বশুরের ইচ্ছা তাঁর আইনের বই তুমি এগিয়ে দেবে, আর আমার ইচ্ছা সন্ধ্যায় তুমি গান শোনাবে,—এত বদখেয়াল কি তুমি একা সামলাতে পারবে ?

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি স্মিতহাস্যে সলাজ কণ্ঠে কহিল—পারব।

—ব্যস, তবে ত আর অসুবিধা নেই। হাঁ, তবে ভরসা তোমার এই যে এ বুড়ো তিনটে খুব বেশীকাল ধরাধামে থাকবে না।

স্বেচ্ছায় সে জবাব দিল,—থাকবেন বৈ কি ?

সানন্দে ফিরিয়া আসিলাম এবং এক শুভদিনে শুভমুহূর্ত্তে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

আগ্রহের আতিশয্যে নব-বধূমাতাকে দ্বিরাগমনের পরে অবিলম্বেই আনা হইল এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অবশ্য কর্ত্তব্যগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হইল। বড়দা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—বৌমা, তোমার প্রথম কর্ত্তব্য কি জানো ? যার জন্যে বেঁচে আছি—সন্ধ্যার সময় যখন আফিমের ঝিমটুকু বেশ জমে ওঠে তখন তোমাকে ছিলিম সেজে দিতে হবে আমি খাবো—পারবে ? কেমন ক'রে কি করতে হয় আজ শিখে নেবে—কেমন ?

বৌমা বলিল, হ্যাঁ, পারব বই কি।

মেজদা বলিলেন—তোমার আইডিয়াটা বড় ইনডিসেন্ট। তামাক রামা সাজবে বরং বৌমা অন্য কিছু করুক না।

বড়দা একটু থতমত খাইয়া বলিলেন—তা যদিও একটু বেমানান হয়—তা—আচ্ছা তুমি কাগজ পড়বে আমি শুন্‌বো—

বৌমা একটু হাসিয়া কহিল—কেন? তামাক সাজ্‌লে ত অপমান নেই কিছু—

মেজদা কহিলেন—না থাক্‌, ওটা ভাল দেখায় না হ্যাঁ, সন্ধ্যায় আমায় এক কাপ চা দেবে আর ডাকলেই আইনের বই বের ক'রে দেবে। এস লাইব্রেরিতে, কোথায় কি আছে দেখিয়ে দিতে হবে ত।

আমি বলিলাম—তাই করো না কেন; বৌমা যখন গান করবে তখন কিন্তু ডাক্‌তে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি—

—আচ্ছা, তা হবে—

আমাদের দাবি জানানো হইয়া গেল—বৌমা স্মিতহাস্যে সকলের প্রস্তাবই গ্রহণ করিল। কয়েক দিন পরে—

বৌমা বড়দার নিকটে বসিয়া কাগজ পড়িতেছিল, মেজদা চা পান করিতে করিতে ডাকিলেন, বৌমা এভিডেন্স এক্ট-খানা দাও ত?

বৌমা বই দিয়া পুনরায় কাগজ পড়িতেছিল, মেজদা উঠিয়া আসিয়া কহিল—দাদা, তোমার কি অন্যায় বল ত। ছেলে-মানুষ, এত বড় একখানা কাগজের আগাগোড়া যায় বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত তোমাকে পড়ে শোনাতে হবে, এ কি ও পারে?

বড়দা বলিলেন, ও, তাই ত, আচ্ছা, তবে—

মেজদা বলিলেন, এস বৌমা, আমার ঘরে বসে বই পড়, বইটই এগিয়ে দেবে—

বৌমা একটু হাসিয়া মেজদার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিল, বড়দা করুণ ভাবে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—আচ্ছা, আমিই পড়ছি কাগজ, কাগজে কিছু থাকে না—

মেজদার ঘরে বসিয়া বৌমা কি যেন একটা সেলাই করিতেছিল, মেজদা বলিলেন—রেজিষ্ট্রেশন এক্টখানা দাও ত—

বৌমা ভারী বইখানা দাদার টেবিলে রাখিয়া আবার সেলাই করিতে বসিতেছিল আমি বলিলাম—মেজদা, বৌমা ছেলেমানুষ, অতবড় কাগজখানা যদি সে না পড়তে পারে তবে ওই আধমণ বইগুলো টেনে আনতে পারে? এস বৌমা, ওসব তোমার দরকার নেই তুমি গান করবে এস।

মেজদা একটু হাসিয়া বলিলেন—তা যাও বৌমা, বইগুলো সত্যিই বড্ড ভারী।

বৌমা হাসিয়া কহিল—চলুন।

আমি বলিলাম, এই কি একটা ব্যবস্থা, সকলে এমন টানা-টানি করলে কি ছেলেমানুষের প্রাণ বাঁচে—এক মুহূর্ত্ত অবসর নেই।

মেজদা বলিলেন, আচ্ছা যাও, যাও বৌমা, তবে চা-টা তুমিই দিও।

মোটের উপর বৌমাটির অবসর রহিল না। তিন শ্বশুরের আব্দারের অন্ত নাই, শাশুড়ীগণের চিঠিপত্র লিখিতে হয়, বড়-গিন্নীকে মহাভারত শুনাইতে হয়। আমার একটু ফুলবাগান ছিল, বৌমার নিকটে না শুনিয়া যেন গাছ লাগানো সম্ভব হয় না। কিন্তু বৌমাটি আমাদের হাসিয়া সকলেরই আদেশ পালন করে, কোন ক্ষোভ নাই, বিরক্তি নাই, আলস্য নাই।

সে শিক্ষিতা—হয়ত সে জানে, বোঝে যে এই বাড়ীর প্রাণীগুলি মিহিরকে ঘিরিয়া যে স্বপ্ন রচনা করিয়াছে আজ বৌমাটির কাছে যেন তাহা পাইতে চাহিতেছে। তাহার সাহচার্য্য তাহার সান্নিধ্য যে বাড়ীখানির অঙ্গে একটা আনন্দ ও সুখাবেশের প্রলেপ দিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে এই কাড়াকাড়ি, এই একটু সেবা ও সান্নিধ্য পাইবার আগ্রহকে সে যেন অন্তর দিয়া দেখিয়াছে তাই তাহার ক্লান্তি নাই—আপনাকে বিলাইয়া দিয়া সে সকলকেই খুশী করিয়াছে, করিতে চাহিতেছে। সে হয়ত জানে, জীবনের শত ব্যর্থতা শত বেদনায় পঙ্গু এই বৃদ্ধ অন্তরগুলি যেন তাহারই অপেক্ষায় বাঁচিয়া আছে—তাই তাহারও কার্পণ্য নাই।

বড়দা বলেন—মা আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী। মেজদা বলেন, অভয়দাত্রী, আজকাল যে সওয়াল-জবাব করি, একবার শুনে এস—বৌমা বই দেয়, আমি পড়ি—আর কি মামলায় হারি কখনও। বৌমা আসবার পর পচা মোকদ্দমাও তাজা করেছি—আয় বেড়েছে কত!

আমি শুধু বলি, আমার বাগানে কি সুন্দর ফুল ফুটেছে দেখেছ—নাইট্রেট, এমোনিয়াম সাল্‌ফেট দিয়ে যা হয় নি—

আমরা যেন বৌমার সান্নিধ্যের মাঝেই জীবনের পরিপূর্ণতা পাইয়াছি—

মিহির পত্র দিয়াছে।

বাসার ঠাকুর পলাইয়াছে, চাকর চুরি করে। খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ কষ্ট হইতেছে ইত্যাদি কিন্তু কি হইলে যে এ সমস্ত অসুবিধা দূর হইতে পারে তাহা কিছুই জানায় নাই। আমি বড়দাকে বলিলাম—মিহিরের বিদেশে কষ্ট হচ্ছে, বৌমাকে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার, নইলে—

বড়দা একটু ভাবিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, দরকারই ত।

মেজদা বলিলেন—না না, খাওয়া-দাওয়ায় কষ্ট হ'লে স্বাস্থ্য টিকবে কেন? তা ত বটেই—

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমাদের মত বুড়োদের আব্দার রক্ষার জন্যেই ত ওদের জীবন নয়, ওদেরও ত সাধ-আহ্লাদ আছে—

বড়দা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—হ্যাঁ পাঠিয়েই দাও।

কথাটা জানাজানি হইল। বৌমা কহিল—থাকি না আরও কিছুদিন, আপনাদের বড় কষ্ট হবে যে!

বড়দা একটু হাসিয়া বলিলেন—এতদিন সে কষ্ট যে দেখেছে সে-ই এখনও দেখবে মা, তাই বলে কি মিহির কষ্ট পাবে আমরা বেঁচে থাকতে—

মেজদা বলিলেন—তুমি আর কি করবে মা, একা তো আর সব কূল রক্ষা করা যায় না—

যাইবার দিন স্থির হইল।

প্রাঙ্গণে পাল্কী অপেক্ষা করিতেছে, গৃহদেবতা ও খাশুড়ী-গণকে প্রণাম করিয়া বৌমা আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রণাম করিল। সজল চোখ দুইটি মেলিয়া কহিল—আপনাদের বড় কষ্ট হবে, আমাকে আবার কবে আনবেন?

মেজদা কহিলেন, আনবো বৈ কি মা, দু-এক মাস পরেই নিয়ে আসব—

বড়দা কহিলেন—এস বৌমা, গৃহলক্ষ্মী আবার গৃহে আনব, আবার আনন্দ হবে—কথাটার শেষের দিকটা যেন জড়াইয়া আসিল, বড়দা যেন আশা করিতে পারিতেছেন না যে পুনরাগমন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবেন। পুনরায় আর আশা হইবে না—

পাল্কীতে উঠিবার সময় বড়দা মাথার উপরে কম্পিত হাত-খানি রাখিয়া কহিলেন—তোমরা সুখী হ'য়ো—আশীর্ব্বাদ করি।

পাল্কী ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণ পার হইয়া রাস্তায় পড়িল। গৃহিণীগণ অন্দরে ফিরিয়া গেলেন। বড়দা আসিয়া তাঁহার কক্ষে ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িলেন, চাকর তামাক দিয়া গেল কিন্তু তবুও কেন যেন উদাস দৃষ্টিতে কোন্ দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাকর কহিল, বাবু তামাক

বড়দা কহিলেন—থাক, তামাক খাব না।

মেজদা তাঁহার লাইব্রেরি-কক্ষে দাঁড়াইয়া শূন্য চোখে বই-গুলির দিকে চাহিয়া আছেন—তাহারা যেন কয়েকদিনের জন্য প্রাণ পাইয়াছিল আজ অকস্মাৎ নিষ্প্রাণ হইয়া গিয়াছে।

অদূরে তখনও পাল্কীর ও-হো-হো অস্পষ্ট শোনা যাইতেছে। এই বেহারারা যেন বক্ষের শব্দস্পন্দনের স্থূলতায় রচিত পঞ্জর ছিন্নভিন্ন করিয়া, পদতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অত্যন্ত নির্ম্মম পদক্ষেপে। শূন্যগৃহকোণে বড়দার অশ্রুসজল দীনকণ্ঠ যেন বার বার আশীর্ব্বাদ করিতেছে—'তোমরা সুখী হ'য়ো, তোমরা সুখী হ'য়ো'।

স্বাধীনতা-সূর্য্য

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এ কি এ দুর্য্যোগ! আজ চারিদিকে নামে অন্ধকার,
অন্ধকার নেমে আসে অসহায় মানুষের মনে,
পথচারী ত্রস্ত পথে, স্বস্তি নাই শান্ত গৃহকোণে,
নগর অরণ্য সম, শুদ্ধ পল্লী শঙ্কার আধার।
জাতির ভ্রাতৃত্ব কারা মোহে মত্ত করে অস্বীকার?
হিংস্র তমিস্রার জীব বাঁকে বাঁকে রহি' সঙ্গোপনে
শোণিত-লোলুপ ফেরে অলক্ষিতে নিঃশব্দ-চরণে।
দীর্ঘ শতাব্দীর ত্যাগ—আজ কোন মূল্য নাই তার?
আঁধার ঘনায় যদি বিদ্যুৎ আকাশ ফেলে চিরি,
অবিশ্বাসী মন ভরে সন্দেহ ও বিদ্বেষ-জঞ্জালে,
অগ্রসর হও পথে, যেয়ো না যেয়ো না আর ফিরি,
সকল কলঙ্ক হবে বিধৌত প্রবহমান কালে।
কে বলে বিলুপ্ত দিক—তমসা দিগন্ত ফেলে ঘিরি?
স্বাধীনতা-সূর্য্য ওই উঁকি মারে মেঘ-অন্তরালে।

বৃহত্তের পরিচয়

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বৃহত্তে চেনো নি তুমি, ক্ষুদ্রে তব হ'ল পরিচয়;
সম্প্রদায়গত স্বার্থ—সেই হ'ল সকলের বড়,
তারি লাগি আত্মদ্রোহ, তারি লাগি হানাহানি কর?
যে দেশে তোমার বাস সে দেশ তোমার দেশ নয়?
পিতৃভূমি পুণ্যস্থান, অন্য ভূমি জন্মভূমি হয়?
পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বৃথা আপনার স্থান খুঁজে মর,
মন হোক্ মোহমুক্ত, আদর্শ সে হোক্ মহত্তর,
দল নয়—দেশ দেশ, সমগ্র জাতির হোক জয়।
হিংসার তাণ্ডবে শুধু বাড়িবে দেশের দুর্ব্বলতা,
কার লাভ হবে এতে? অন্তর্দ্বন্দ্ব এ কি রক্তক্ষয়ী!
নিরপেক্ষ হাসি হেসে ভেদ চায় যাহারা সর্ব্বথা,
আমি নয়—তুমি নয়, হে বিমূঢ়, তারা হবে জয়ী।
দেশ সত্য, ভেদ মিথ্যা, দূর হোক্ ব্যর্থতার ব্যথা,
হে জননী জন্মভূমি, নমঃ নমঃ, হে মহিমময়ী!

বাদশাহী আমলের কাহিনী

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

সৈয়দ মুসা বাদশাহী দরবারে চাকরি করিতেন, নিবাস বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত কাল্পী শহর, বাপের নাম সৈয়দ নৌকরী। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি একদিন সৈয়দ মুসা একাকী আগ্রা শহরের রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার শিকারী চোখ দুইটি ডাইনে বাঁয়ে গৃহস্থ বাড়ীর ছাদ ও জানালার ফাঁকে কি যেন অন্বেষণ করিতেছিল। হিন্দু মহল্লার মধ্য দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ এক বাড়ীর ছাদের উপর মোহিনীকে দেখিয়া মুসা প্রেমে পড়িলেন, অথচ উভয়ের মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান। মোহিনী হিন্দু গৃহস্থের কুলবধূ, স্বর্ণকারের মেয়ে, সোনার মত রং, ছাঁচে ঢালা গড়ন—অপূর্ব্ব সুন্দরী। সেই যুগে আগ্রা শহরের স্বর্ণকার মহিলাগণের রূপের খ্যাতি ছিল।*

২

বাদশাহী ফৌজের সহিত জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত রণথম্ভোরে যাত্রা করিবার জন্য সৈয়দ মুসার উপর হুকুম হইয়াছিল। মোহিনীকে দেখিয়া তাহার যাত্রা ভঙ্গ হইল। কোন অছিলায় সৈয়দ মুসা আগ্রা শহরে থাকিয়া গেলেন। মোহিনীর বাড়ীর কাছেই যমুনার পারে তিনি এক বাড়ী ভাড়া করিলেন, নিকটেই তাঁহার বন্ধু মীর সৈয়দ জালাল উদ্দীন মুতাওয়াক্কিলের বাড়ী। মুসা নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই, কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষায় তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ কাহিল হইয়া উঠিল। কয়েকজন দরদী বন্ধুর সহিত দুই-এক বার নৈশ অভিসার করিয়া তিনি হয় পাহারাওয়ালা না হয় মোহিনীর বাড়ীর লোকজনের হাতে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পিঠের ব্যথা সারিলেই আবার তাঁহার অবুঝ মন কেমন করে। এই ভাবে দুই বৎসর চারি মাস কাটিয়া গেল। দূর হইতে মোহিনীকে তিনি দেখিয়াছেন, মোহিনী সাড়া দিয়াছে, মালিনী মাসী মারফত খবরাখবর চলিয়াছে।

এক দিন রাত্রির অন্ধকারে মোহিনী বাড়ীর ছাদ হইতে নীচে দড়ি ঝুলাইয়া দিল। দড়ি বাহিয়া সৈয়দ সাহেব উপরে উঠিলেন, মোহিনী সৈয়দ মুসার সহিত গৃহ ত্যাগ করিল। এক বন্ধুর বাড়ীতে তাহারা তিন দিন পলাইয়া রহিল। সৈয়দ মুসা এবং মোহিনীর ত্রিরাত্র নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হয় নাই। মোহিনীর শ্বশুরপক্ষের লোকজন খবর পাইয়া ঐ বাড়ীর চারি দিকে কড়া পাহারা বসাইল এবং কোতোয়ালীতে মামলা রুজু করিবার ভয় দেখাইল। নানা রকম মিথ্যা কথা বলিয়া মুসার ছোট ভাই হিন্দুদিগকে প্রতারিত করিবার চেষ্টায় ছিল। ইংরেজ আইনে এরূপ ব্যাপার লইয়া কোন মোকদ্দমাই চলিতে পারে না—মোহিনী সুন্দরী বোরখা পরিয়া আদালতের কাছে একবার মনের কথা খুলিয়া বলিলেই আসামী খালাস, অধিকন্তু শোভাযাত্রা সহ নগর পরিক্রমা। কিন্তু এই প্রকার প্রেমের বাতিক দমন করিবার জন্য আকবর বাদশাহ আইন জারি করিয়াছিলেন, কোন হিন্দু স্ত্রীলোক মুসলমানের সঙ্গে পলাইয়া গেলে, কিম্বা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া তাহার পরিবারবর্গকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।* ইহার উপর কাজীর আদালতে মুসলমান আইন অনুসারে মুসলমানের জন্য ব্যভিচারের দণ্ড। সুতরাং কোন প্রকারে অব্যাহতি নাই দেখিয়া মোহিনীর মাথায় নূতন বুদ্ধি গজাইল। সৈয়দ মুসাকে কোন প্রকারে প্রবোধ দিয়া গোপনে রহস্যজনক ভাবে মোহিনী রাত্রির অন্ধকারে নিজের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সকলকে অবাক করিল। ভাব-গোপন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অশিক্ষিতপটুত্বে সৃষ্টির মধ্যে স্ত্রীজাতির সমকক্ষ নাই। মোহিনী নির্ব্বিকার চিত্তে অনর্গল এক পরীর গল্প শুনাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিল। যথা—

---

* বৈরাম খাঁর পুত্র খান-খানান আব্দুর রহীম "নগর শোভা" নামক হিন্দী কবিতায় লিখিয়াছেন—

পরমরূপ কঞ্চনবরণ, শোভিত নারী সুনারি
মানোঁ সাঁচে ঢারিকে, বিধিনা গঢ়ী সুনারি।

[অর্থাৎ পরমরূপবতী কাঞ্চনবরণী স্বর্ণকার-নারীকে বিধাতা যেন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছেন।]

* দ্রষ্টব্য—If a Hindu woman fell in love with a Musalman and entered the Muslim religion, she should be taken away by force from her husband and restored to her family. [Lowe, Badayuni Eng. trans. vol. II, p. 406]

কোন অবস্থায় বাদশাহকে এই আইন প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল উহা উল্লেখ না করিয়া ঐতিহাসিক আকবরের প্রতি অবিচার করিয়াছেন।

"সেই দিন রাত্রিতে যখন আমি ঘুমাইতেছিলাম হঠাৎ জাগিয়া দেখিতে পাইলাম ঘরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুন্দর পুরুষ সবই মানুষের মত কিন্তু ডানা পালক আছে। সে আমাকে বাহু করিয়া পাগার উপর তুলিয়া উড়িয়া চলিল। ইহার পর দেখিতে পাইলাম পরীর আজব শহর—চারি দিকে দিব্যপরী, সুন্দরী পরীরা আমার সেবা করিবার জন্ত দাঁড়াইয়া আছে। আমি কিন্তু কান্না-কাটি করিয়া অস্থির। মাকে দেখিবার জন্ত প্রাণ বাহির হইতে চায়, ভায়ের শোকে ছাতি ফাটিবার উপক্রম, বাবাজীর কথা মনে পড়িতেই দুঃখের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তিন দিন অবিশ্রান্ত কান্না এবং ছটফটানি। পরীরা অবশেষে দয়াপরবশ হইয়া ডানায় তুলিয়া এই জায়গায় আমাকে আবার রাখিয়া গিয়াছে।"

বলা বাহুল্য, প্রগতির যুগে পরীর প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেও এখনও গ্রামাঞ্চলে ইহাদের কথা শুনা যায়। কিন্তু মুসলমান আমলে যত্র তত্র "দেও", পরী জীন। ঐতিহাসিক বলিয়াছেন বোকা হিন্দুরা মোহিনীর এই গালগল্প বিশ্বাস করিয়া বসিল; কিন্তু তবুও জালিম কাফেরগণ সাতরাজার মাণিক মোহিনীকে উপরের তলায় এক কোঠায় তালা চাবি বন্ধ করিয়া রাখিত। ওদিকে আসল ব্যাপার লইয়া মহল্লার লোকজন কানাঘুষা করিতে লাগিল। কেলেঙ্কারী প্রকাশ হইবার ভয়ে মোহিনী সুন্দরী দূতীর মারফত সৈয়দ মুসাকে খবর পাঠাইল, "ব্যাপার অনেক দূর গড়াইয়াছে। তুমি শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাও। একজন বন্ধুকে বলিয়া যাইও যেন আমার কথা দিনের দিন তোমাকে জানাইতে পারে।"

৪

মোহিনীর কথা মত সৈয়দ মুসা আগ্রা ছাড়িয়া রাজপুতানার দিকে শাহী ডেরায় গা ঢাকা দিলেন। শহর হইতে আপদ দূর হওয়ায় মোহিনীর ঘরে তালা চাবির প্রয়োজন ফুরাইল। এই সুযোগে সৈয়দ মুসার আগ্রানিবাসী বন্ধুর সহিত মোহিনী দ্বিতীয় বার বাড়ী হইতে পলাইয়া গেল। বন্ধু ছদ্মবেশে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইতেই ভিখারী বিদায়ের অছিলায় মোহিনী নীচে গিয়াছিল, আর ফিরিল না। তিন দিন এক দরদী আশ্রয়-দাতার গৃহে লুকাইয়া থাকিয়া সৈয়দ মুসার সহিত মিলিত হইবার জন্য মোহিনীকে বোরখা পরাইয়া বন্ধু বিয়ানা ও ফতেপুর সিক্রীর দিকে চলিয়াছিল। নাছোড়বান্দা স্বর্ণকারেরা সন্ধান পাইয়া আসামী ধরিবার জন্য ছুটিল। বোরখার ভিতর হইতে মোহিনীর রূপ ফাটিয়া পড়িতেছিল। হিন্দুরা চেঁচামিচি করিতেই শহর-কোতোয়াল পালোয়ান জামালের সাস্ত্রীগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। তাহারা মোহিনীকে হিন্দুগণের হেফাজাতে ছাড়িয়া দিয়া দোস্তকে শ্রীঘরে লইয়া চলিল। অনেক দিন আনুষঙ্গিক আরামের সহিত কয়েদখানায় থাকিয়া বন্ধু কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিল।

সৈয়দ মুসা এই সময় বাদশাহী ফৌজের সহিত সফর করিতেছিলেন। দুঃসংবাদ পাইয়া তিনি আগ্রা শহরে ফিরিলেন, শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। বিরহতাপে মজিয়া বদায়ুনীর ভাষায় মুসার দেহ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর চাঁদের ন্যায় সরু হইয়া গেল। সৈয়দ মুসার উন্মাদ-অবস্থা। কখনও নিজের গলায় ছুরি বসাইতে চায়, কখনও পাগলের মত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মোহিনীকে দেখিবার জন্য রাস্তায় ছুটিয়া যায়। তাঁহার ভাই-বেরাদরগণ কখনও ভাল কথা, কখনও গালাগালি, কখনও বা ভয়প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিত। কারণ, এইবার আঁধার ঘরে মোহিনী সুন্দরীর হাতে শিকল পড়িয়াছে; চারি দিকে জটিলা কুটিলার পাহারা।

৫

সৈয়দ মুসার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার আর এক জন অতি দরদী বন্ধু কাজী জামালের দয়া হইল। কাজী সাহেবের নিবাস সরকার কাল্পীর শিব-কাণপুর পরগণা, কার্য্যোপলক্ষ্যে আগ্রায় থাকিতেন। কাজী জামালের কিঞ্চিৎ কবিখ্যাতি ছিল, হিন্দী ভাষায় কবিতা লিখিতেন। এইবার তিনি মোহিনী হরণের ভূমিকায় নামিলেন।

একদিন সূর্য্যাস্তে মগরীবের নমাজের পর আগ্রা শহরে মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। শহরের রাস্তার মধ্য দিয়া এক অশ্বারোহী বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে, অশ্বারোহীর পশ্চাতে উপবিষ্টা এক জন যুবতী স্ত্রীলোক। এক দল হিন্দু তাহাদিগকে তাড়া করিয়া চলিয়াছে, তামাশা দেখিবার জন্য লোকজন চারি দিক হইতে বাহির হইয়া রাস্তার মোড়ে ভিড় জমাইয়া সাবাস সাবাস চীৎকার ছাড়িতেছে। অশ্বারোহী বেগতিক দেখিয়া শহরের বাহিরে উত্তরগামী কাঁচা রাস্তা ধরিল। জমিতে জলসেচ করিবার জন্য কৃষকেরা রাস্তার ধারে নালা কাটিয়াছিল, ভয়চকিত অশ্ব আরোহীদ্বয়কে লইয়া এক খাদে পড়িয়া গেল। পলায়নের উপায় নাই দেখিয়া যুবতী ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সঙ্গীকে বলিল, "জান বাঁচাও, খবর দিও।" গর্ত্তে পতিত বউচোর কাজী জামালের কি দশা হইল জানা নাই, তবে মোহিনীকে শিকলে ঝুলাইবে না বুঝিতে পারিয়া এই বার তাহার পায়ে বেড়ী দেওয়া হইল। এই সংবাদ পাইয়া সৈয়দ মুসার নির্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল।

৬

মোহিনীর কি হইল? যাঁহারা জানিবার জন্য উৎসুক তাঁহারা Lowe সাহেব কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত বদায়ুনীর ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ (পৃঃ ১২০-২৫) পাঠ করিতে

পারেন ; কিন্তু মূল উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতা পরিশিষ্টে নাই। সৈয়দ মূসার ছোট ভাই সৈয়দ শাহী মূসা-মোহিনীর কেলেঙ্কারী অবলম্বন করিয়া একটি ফার্সী কবিতা লিখিয়াছিলেন, নাম 'দিলফেরেব' বা 'মন-মোহিনী'। উক্ত অংশে বদায়ুনী দিলফেরেব হইতে অনেক কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। মোহিনীর কাল্পনিক পরিণাম মূল উপাখ্যানে সংযোজনা করিলে ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এই আশঙ্কায় উহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"দুনিয়ার হাট হইতে দোকানপাট গুটাইবার পর সৈয়দ মূসার 'জনাজা' বা শবানুগমনের মিছিল বাহির হইল। মোহিনীর বাড়ীর সামনের রাস্তা ধরিয়া শবযাত্রা অগ্রসর হইবার সময় ছাদের উপর হইতে পায়ে শিকল-বাঁধা মোহিনী কিছুক্ষণ 'প্রেমের শহীদ' সৈয়দ মূসার শেষ যাত্রা দেখিতেছিল। হঠাৎ চীৎকার করিয়া মোহিনী ছাদ হইতে রাস্তায় লাফাইয়া পড়িল, শিকল কাটিল, তবু পা মচকাইল না। মোহিনী এইবার সোজা মূসার কবরের দিকে দৌড়াইল, পাগলিনীকে কেহ বাধা দিল না। মোহিনী নির্জ্জনে কবরের ধারে বসিয়া এক খণ্ড পাথর দিয়া বুকে আঘাত করিত, মুখে মূসার নাম, এবং রাই উন্মাদিনী পালার বিরহ-বিলাপ। এই অবস্থায় এক দিন মোহিনী পাগলী ধার্ম্মিক মীর সৈয়দ [সেই কাজী ?] জলালের নিকট উপস্থিত হইয়া জমায়েতের সামনে কলমা পরিয়া ইসলাম কবুল করিল এবং 'মূসা' 'মূসা' ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে মরিয়া গেল।"

আকবরশাহী আমলে মুসলমান সমাজে প্রেমব্যাধির প্রকোপ কিঞ্চিৎ অধিক লক্ষিত হয়। যৌবনে স্বয়ং আকবর বাদশাহ আগ্রা শহরে কিছু কিছু দুষ্কর্ম করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। মোল্লাদের মধ্যে প্রবীণ দল অপেক্ষাকৃত নির্ম্মলচরিত্র ছিলেন, বৃদ্ধেরা যাহাকে ব্যভিচার মনে করিতেন, বদায়ুনী-প্রমুখ নবীন দল সেই ব্যাপারকে প্রেমের বিকার বলিতেন। একজন শেখজাদা দরবারী আমীর মকবুল খাঁর নর্ত্তকীকে চুরি করিয়াছিল কিন্তু পরিজনবর্গের আপত্তিতে তাহাকে বিবাহ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিল। নবীনের দল [বয়সে নয়, ভাবে] ফতোয়া দিলেন, আত্মহত্যাকারী "প্রেমের শহীদ" মহাপুণ্যবান্, সুতরাং যে স্থানে যে অবস্থায় শেখজাদা নর্ত্তকীর জন্য নিজের বুকে ছুরি চালাইয়াছে সেই জায়গায় রক্তমাখা কাপড়চোপড় সমেত তাহাকে মাটি দিতে হইবে! কিন্তু প্রধান সদর বৃদ্ধ শেখ আবদুন্নবী প্রেমের মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া ধমকাইলেন, মৃত ব্যক্তি অশুচি এবং ব্যভিচার পাপে লিপ্ত হইয়া মরিয়াছে। এই প্রকার প্রেম-ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক সংঘবদ্ধ সমাজ এবং দারুণ প্রহার। এই কথা সরলপ্রাণ ঐতিহাসিক বদায়ুনী নিজে অকপটচিত্তে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিকের অভিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে। সংক্ষেপে ব্যাপারটি এই—

মোল্লা বদায়ুনী কিছুদিন কনৌজের অন্তর্গত কসবা মাকনপুরে শাহ-মাদার সাহেবের "মজার" বা কবর-তীর্থের তত্ত্বাবধায়ক (মহান্ত) ছিলেন। সমাগত যাত্রিগণের সাহায্য এবং গরীব দুঃখীকে দান-খয়রাত দেওয়াই ছিল তাঁহার কাজ। পরিষ্কার করিয়া না বলিলেও বুঝা যায় তাঁহার একটু রূপের নেশা ছিল—উহার উপর আবার সুফিয়ানা মৌতাত, তবে তিনি কোন দিন হারামের পথে পা দেন নাই।

একদিন মাদার সাহেবের মকবরায় যাত্রিগণের মধ্যে এক অসামান্যা সুন্দরী মুসলমান যুবতীকে দেখিয়া মোল্লা সাহেবের মতিভ্রম উপস্থিত হইল। ইহার ফলে একটা হাঙ্গামা বাধিল এবং যুবতীর আত্মীয় পুরুষগণ মোল্লা সাহেবের মাথায় হাতে পিঠে তলোয়ারের নয়টা কোপ বসাইয়া দিল। মোল্লা সাহেব লিখিয়াছেন উহার মধ্যে সাতটি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, কেবল চামড়া কাটা। কিন্তু অষ্টম কোপে তাঁহার বাঁ হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর শিরাগুলি কাটিয়া গিয়াছিল এবং নবম কোপে মাথার খুলি কাটিয়া মস্তিষ্কের কিছু ঘি বাহির হওয়ায় তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। কেয়ামতের পূর্ব্বে মোল্লা সাহেব আর জাগিবেন না ভাবিয়াই তাঁহার মাশুক বা প্রিয়তমার গোঁয়ার সঙ্গীদল বোধ হয় মুণ্ডটি না কাটিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। আঘাতের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির উদয় হইল। তিনি শপথ করিলেন এ যাত্রা রক্ষা পাইলে মক্কা যাইবেন এবং হজ সমাপ্ত করিয়া নবজাত শিশুর মত "মাসুম" বা নিষ্পাপ হইয়া ফিরিবেন। কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া মোল্লা সাহেব নিজ বাটী বদায়ুঁ শহরে ফিরিলেন। সেখানে আবার পীড়িত হওয়ায় এক জন অস্ত্রচিকিৎসক তাঁহার মাথার খুলির ঘায়ে আবার অস্ত্রোপচার করিল—মোল্লা সাহেব প্রায় যাইবার পথে। এই সময়ে একদিন সুষুপ্তি অবস্থায় তাঁহাকে ফেরেশ্তা বা দেবদূতগণ আশমানে উঠাইয়া বাদশাহী দরবারের মত এক আদালতে উপস্থিত করিল। সেখানে চারি দিকে বা-কায়দা সিপাহী-সান্ত্রী, দপ্তরী-কেরাণী লেখার কাজে ব্যস্ত, মসনদের উপর একটি কিতাব!*

যাহা হউক, ইহার পরে আকবর বাদশার চাকরি আরও কিছু দিন বাহাল রাখিবার জন্য যমদূতগণ মোল্লা সাহেবকে আবার দুনিয়ায় ফেরত লইয়া আসিয়াছিল। ইহা না হইলে "মোহিনীর প্রেম" মাঠে মারা যাইত, কোন ইতিহাসে উহার হদিস মিলিত না।

* Lowe, Badayuni ii, pp. 140-142.

বাঙালী-প্রতিভা

শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি

যুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী ও সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত বাংলার মহাশ্মশানে বসিয়া বাঙালী প্রতিভারই বন্দনাগীতি গাহিতে বসিয়াছি। বিদেশী শাসকের সাম্প্রদায়িকতারূপ মহা আয়ুধে যে জাতির অস্তিত্বই হয়ত অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে, তাহার প্রতিভার কথা লিখিতে চেষ্টা করা হয়ত বাতুলতারই নামান্তর।

বাঙালী যে জাতি হিসাবে মরিয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? এ জাতির প্রাণশক্তির যদি বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট থাকিত তাহা হইলে সদ্য-সমাপ্ত মহাযুদ্ধের কালে সে যে চারিত্রিক দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছে তাহা দিত না। বিদেশী শাসকের সাময়িক প্রয়োজনে সে তাহার ক্ষেত-খামার এমন কি বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত কখনও বিনামূল্যে, কখনও বা নামমাত্র মূল্যের বিনিময়ে পরিত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিবাদের একটি অঙ্গুলিও উত্তোলিত করে নাই। অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজনে এই জাতির তরুণ-তরুণী যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা হীন কাজই করিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসী যখন যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক কার্য্য—যথা মারণাস্ত্র লইয়া বিদেশী রাজার শত্রুসংহার করিয়াছে, বাঙালী তখন সেই বিদেশী রাজার স্বার্থের জন্য আগ্নেয়াস্ত্রবিহীন ইউনিফর্মে সজ্জিত হইয়া কেবল মিস্ত্রী ও কেরাণীর কাজ করিয়াছে। ১৩৫০-এর মহামন্বন্তরে একমুষ্টি অন্নের অভাবে লক্ষ লক্ষ বাঙালী বিনা প্রতিবাদে পথের প্রান্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু জীবন ধারণের জন্য খাদ্যকণাটুকুরও দাবী জানায় নাই। কলিকাতার রাজপথে একদিকে কঙ্কালসার ডেষ্টিটিউটদিগের শোভাযাত্রা, অন্যদিকে বাঙালী বিত্তশালীগণের সুবেশে সজ্জিত হইয়া পথ অতিবাহন রঙ্গালয়গুলির দ্বারে দ্বারে আর্টপিপাসু মনুষ্যগণের জনতা। জাতির এমন ঘোর দুর্দিনে একদিনের জন্যও জাতির অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানেরা তাহাদের আনন্দ-বিলাস স্থগিত রাখেন নাই। জনগণের খাদ্য ও বস্ত্র লইয়া যে নিষ্ঠুর লীলা চলিয়াছে, সেই দুঃশাসনের কলঙ্কের একটা মোটা রকমের অংশীদার কি বাঙালীই নহে?

এ জাতির এবম্বিধ মৃত্যু যে আসন্ন, তাহা বহুপূর্ব্বেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র জানাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙালী যেরূপ বংশগতভাবে চাকুরীজীবী হইয়া পড়িতেছে, এবং তাহাতেই যে তাহার মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিবে, তিনি তাহা বারবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার কোনরূপ অতিক্রম করিয়া যে কোন রকমের একটি চাকুরী সংগ্রহ করার জন্য এমন লজ্জাজনক আগ্রহ ভারতের অন্য প্রদেশবাসিগণ দেখায় নাই। সত্যকার জীবনযুদ্ধে, প্রতিযোগিতার নির্ম্মম দ্বন্দ্বে যে ইহাই [illegible] বাঙালী তাহা ভাবিয়া দেখে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হইবার কৌশলই বাঙালী ছাত্রগণ আয়ত্ত করিয়াছে; জ্ঞানার্জ্জনের কোন প্রয়াসই তাহাতে প্রকাশ পায় নাই। অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য বাঙালী ছাত্রেরা যেমন লজ্জানুভব করে না, তেমনই সেই জ্ঞানের পরিচয়পত্র-দাতা বাঙালীর বিশ্ববিদ্যালয়েরও কোন লজ্জার বালাই নাই। অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও দোষযুক্ত শিক্ষার জন্য বাঙালী ছাত্র যদি জীবন-যুদ্ধে হারিয়া যায় তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণের কি আসে যায়? তাঁহারা ত আর শুধু দেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা-ধারী নহেন। বিদেশী ভারতীয় প্রসাদলাভের নানা পরিচয় তাঁহাদের নামের শেষে শোভা পাইতেছে। তাঁহারা তাঁহাদের অসম্পূর্ণ বিদ্যা বিদেশ হইতে সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছেন, দেশের গবর্ণমেন্ট না হয় বিদেশী অধ্যুষিত, কিন্তু যেখানে স্বদেশীয়দিগের যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে সেখানে এমন অনাচার এমন অপ্রতিহতভাবে চলে কি করিয়া? যে জাতির মৃত্যু আসন্ন, সেই জাতিই শিক্ষার নামে এমন একটা জীবন-মরণের সমস্যায় এরূপ অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিতে পারে।

সত্যকার জ্ঞান লাভের প্রতি অবজ্ঞার ফলে আমরা শুধু যে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছি তাহা নয়, আমরা আদর্শহীনও হইয়া পড়িয়াছি। বাঙালী মহাপুরুষগণের জীবন ও কীর্ত্তিকাহিনী আজ বাঙালীর কাছে অবজ্ঞার বিষয়। একদিকে জীবনযুদ্ধে বাঙালী যতই পিছু হটিতে লাগিল, ততই তাহার জাতীয়তাবোধ লোপ পাইতে লাগিল। সে এক মেকী বিশ্বমানবতার উপাসক হইয়া পড়িল। এই চারিত্রিক অধঃপতন ও আদর্শহীনতা অনিবার্য্যরূপে তাহার দেহ ও আত্মা পর্য্যন্ত নষ্ট করিল। তাহার সাহিত্য, শিল্পকলা, রঙ্গমঞ্চ, কোন কিছুই এই চারিত্রিক অধঃপতন ও আদর্শহীনতার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাইল না। বাঙালীর সর্ব্বনাশের ডালা পূর্ণ হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী প্রতিভার যে অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল কালক্রমে তাহার ধারকগণের প্রায় সকলেরই তিরোধান ঘটিল। সেই গৌরবময় যুগের স্মৃতিই আমাদের দুঃখ ও সান্ত্বনার একমাত্র অবলম্বন হইল।

বাংলার শেষ গৌরবরবি অস্তমিত হইবার পর, আমরা একরূপ নৈরাশ্য ও সংশয়ের ঘনান্ধকারেই দিনাতিপাত করিতেছিলাম। জাতির জীবনে যে আবার কোন দিন শুভলগ্ন আসিবে, আবার যে মুমূর্ষু বাঙালী কোন মহাপুরুষের বাণী ও ব্যক্তিত্বের মায়াদণ্ড স্পর্শে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত জাগিয়া উঠিবে, সে আশা আমরা ত্যাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভৃতি ভারতের নব জাগরণের

যে স্রোতধারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বুঝি জাতির কর্মদোষে তাহা এমন শোচনীয় ভাবে অকালেই শুকাইয়া গেল। কিন্তু আমাদের সমস্ত আশঙ্কা ও সন্দেহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া একদা লাঞ্ছিত ও নিন্দিত সুভাষচন্দ্র এক মহনীয় রূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। সবিস্ময়ে জাতি দেখিল, তাহার প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ না থাকিলেও, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত আজও তাহা প্রবহমান ও এখনও এক মহাসৃষ্টির বীজাধার। আজাদ হিন্দ ফৌজ, আজাদ হিন্দ প্রচেষ্টার বিস্ময়কর কাহিনীতে আজ ভারতের প্রতি গৃহ মুখরিত। সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কেবল উত্তমচাঁদবর্ণিত নেতাজীর পলায়নকাহিনী পড়িতে পড়িতে মনে পড়িয়াছে, অতীতে কতকটা এমন ভাবেই আর এক জন বাঙালী মহাপুরুষ জাতির সংস্কৃতির বিজয়াভিযান করিয়াছিলেন। গৈরিকবসন পরিহিত পরিব্রাজক বিবেকানন্দের প্রতিভা উজ্জ্বল মুখখানির কথা মনে পড়িল। নিঃস্ব, সহায়সম্বলহীন বিবেকানন্দ সেদিন এমনি ভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দুঃখিনী ভারতের মর্মকথা বিশ্বের দরবারে ব্যক্ত করিবার জন্য ভারত ত্যাগ করিয়াছিলেন। মনে পড়িল "আর্দনেল অব ডেমোক্রেসী" আমেরিকার হোটেলে আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হইয়া শীতের তুষারাস্তীর্ণ রাজপথে তাঁহার রাত্রিযাপনের কাহিনী, আমরা বুঝিলাম জাতি হিসাবে বাঙালী মরিলেও যে দুর্বার প্রাণশক্তি তাহার অতীতকে এত গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহার অফুরন্ত ধারা আজও তাহার ধমনীতে প্রবাহিত; তাহার স্পন্দন আজিও থামিয়া যায় নাই। জাতির নবজাগরণের রক্তিম উষায় এক জন অবাঙালী মনীষী বাঙালীর ললাটে বিজয়টিকা দিয়া বলিয়াছিলেন, "What Bengal thinks today India thinks tomorrow"। ১৩৫৩ সালের প্রারম্ভে দেখিলাম বাঙালীর সে গৌরব অক্ষুন্ন আছে।

বাঙালী প্রতিভার মূলকথা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এই জাতির যুগবিপ্লবকারী কার্য্যকলাপের পশ্চাতে এমন একটা গভীর ভাবাবেগ আছে—যাহা পর্ব্বতকন্দর হইতে বহির্গত সিন্ধুগামিনী প্রবলা স্রোতস্বিনীর মত দুর্জ্জয় বেগে দুই তীর প্লাবিত করিয়া ভাবের বন্যা আনয়ন করে। এই ভাবাবেগের খরস্রোতে বাধার ঐরাবতও তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যায়। বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া সুভাষচন্দ্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক বাঙালী মহাপুরুষের চরিত্রে এবম্প্রকার ভাবাবেগ পরিলক্ষিত হয়, কবি তাঁহার কাব্য সৃষ্টির পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যে বেদনা ও প্রেরণা অনুভব করেন, তাহাই বাঙালী প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইহার সহিত কবির সৃজনী প্রতিভার এক আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। ইহার কারণ বোধ হয় বাঙালী কবির জাতি।

ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কাব্য ও গানের এত উন্নতি হয় নাই। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব গীতিকারগণের মন্দিরা-নিক্কণে তখন বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত; বাউলের একতারায়, রামপ্রসাদী ও কীর্ত্তনের মৃদঙ্গতালে, ভাটিয়ালির ছল ছল সুরে বাংলার পথ-প্রান্তর, মন্দির-অঙ্গন, নদীতীর গুঞ্জরিত; রাখালের মেঠো সুরে ও বাঁশের বাঁশীতে প্রভাত সন্ধ্যা সব সময়ই গীতিমুখর, অর্থাৎ ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাস এই কাব্য ও গানের ইতিহাস, কবিধর্ম বাঙালী প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইহা তাহার অস্থিমজ্জায় অবিচ্ছেদ্যরূপে বিজড়িত।

ইংরেজাধিকারের পরে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালী সংস্কৃতির এই একমুখী ধারা বৈচিত্র্যের আবর্ত্ত রচিয়া বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল, বাঙালী বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতির অনুশীলন আরম্ভ করিল। শুধু যে লব্ধ জ্ঞানের অর্জ্জনেই সে মনপ্রাণ নিয়োজিত করিল তাহা নহে, ঐ সব ক্ষেত্রে সে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার বিস্ময়কর পরিচয় দিল।

তাহার সাহিত্যসাধনায় নবজন্ম হইল। গীতিকাব্য নানা রূপে রূপায়িত হইল। মাইকেল মধুসূদন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য "মেঘনাদ বধ" রচনা করিলেন। রবীন্দ্রনাথ দীনা বাংলা ভাষাকে বিশ্ব-সভায় বরণীয়া করিয়া তুলিলেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অজস্র কবির কলকাকলীতে বাংলার শ্যামলকুঞ্জ মুখরিত হইয়া উঠিল। বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হইল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি যে ভিত্তি স্থাপন করিলেন, তাহার উপর বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কর্তৃক বাংলা গদ্যের মর্ম্মর প্রাসাদ নির্মিত হইল। এতদিন বাংলার ললিতকলা আলিপনা, ঘট ও পটেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী, সুধাংশুশেখর চৌধুরী প্রভৃতির সাধনায় তাহা চরমোৎকর্ষ লাভ করিল। দর্শনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অরবিন্দ ঘোষ, বিজ্ঞানে রাধানাথ শিকদার, আনন্দমোহন বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন। শিক্ষা, সমাজসেবা, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, সুবোধ বসুমল্লিক, রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি অগণিত বীর ভক্ত সন্তান বঙ্গজননীর চরণকমলে অর্ঘ্যদান

করিলেন। ফাঁসির মঞ্চে যে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরেরা জীবনের জয়গান গাহিলেন—সেই ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্লকুমার চাকী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, দীনেশ গুপ্ত প্রভৃতি বাঙালীরই সন্তান। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস বাঙালী জাতির নবজাগরণের বা রেনেসাঁরই ইতিহাস।

এই অসাধ্য সাধন এই বিপুল বিজয়-গৌরব লাভ বাঙালীর পক্ষে সম্ভব হইয়াছে তাহার এই ভাবাবেগ ও প্রেরণার জন্য যাহাকে আমি খাঁটি কবিধর্মের সহিত তুলনা করিয়াছি। কবি যেমন হিসাব করিয়া কাব্য রচনা করেন না, একটি স্বর্গীয় ভাবাবেশের ফলেই যেমন তাঁহার "মানস তরঙ্গতলে বাণীর সঙ্গীত শতদল" জাগিয়া উঠে— বাঙালীও তেমনি একটি মহান আদর্শ বক্ষে লইয়া সম্পূর্ণ বেহিসাবীর মতোই কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে; ব্রত উদযাপনের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে।

বাঙালী তাহার বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়কেই প্রাধান্য দিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে কোন বাঙালী মনীষীর কার্য্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হইলেও ভিতরে তিনি হৃদয়াবেগই অনুভব করিয়াছেন। তর্কের বাক্যজাল অপেক্ষা প্রেমের মন্ত্রকেই বাঙালী সাধনার উৎকৃষ্টতর পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সে কখনও খাঁটি রাজনীতিক বা diplomat হইতে পারিবে না। সে আসলে প্রেমিক, সে তাহার হৃদয় দিয়াই জাতির তথা বিশ্বের কল্যাণ কামনা করে। বাঙালী বিপ্লবী কিন্তু সেই বিপ্লবের পশ্চাতে থাকে বাঙালীর হৃদয়াবেগ, প্রেম ও কবিসুলভ সৃষ্টিধর্ম্ম।

তাই দেখি বাঙালীর সর্ব্ববিধ সাধনার সহিত তাহার সাহিত্যসাধনাও পাশাপাশি চলিয়াছে। যখন সে সমাজসেবা করিয়াছে তখনও সাহিত্য তাহার অন্তরের বস্তু। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে দেখি যখন তিনি সরকারী কার্য্যে বা সমাজ-সংস্কারে ব্যস্ত তখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁহার কবিমানসের সৃষ্টিকার্য্য চলিয়াছে। "শকুন্তলা" ও "সীতার বনবাস" তাহার ফল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনে দেখি, যখন তিনি পদার্থবিদ্যার দুরূহ প্রশ্ন সমাধানে ব্যস্ত বা উদ্ভিদ জীবনের গভীরতম রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য সাধনারত তখনও তাঁহার কবিধর্ম্ম অলস হইয়া থাকে নাই। অবসর সময়ে তিনি চলিয়াছেন "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে", তাঁহার "অব্যক্ত", "রাণী সন্দর্শনে" প্রভৃতি রচনা তাঁহার কবিচিত্তেরই প্রকাশ। চিত্তরঞ্জন যখন মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির দুরাকাঙ্ক্ষা লইয়া সর্ব্বস্বের বিনিময়ে দুঃখ ও বেদনাকেই বরণ করিয়া লইলেন, তখনও সেই অসহ্য দুঃখকষ্টের ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যেও তাঁহার কবিচিত্তের সৃষ্টিসাধনা চলিয়াছে। "সাগর-সঙ্গীত" প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার নিদর্শন। মানবীয় জ্ঞানের সর্ব্ববিধ শাখায় যিনি পারঙ্গম, সেই ঋষি জ্ঞানতপস্বী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যে "The Quest Eternal." রচনা করিলেন সে ত বাঙালী প্রতিভার কবিধর্ম্মেরই সাক্ষাৎ ফল। বাঙালীকে জাতীয়তাবোধ শিক্ষা দিতে গিয়া রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত কথা"য় যাহা লিখিলেন সে ত উৎকৃষ্ট কাব্যই। নীরস রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা কালেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাংলার অগ্নিযুগের ঋষি অরবিন্দ ঘোষ দর্শনের যে পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন তাহাদের ভাষা কাব্যেরই ভাষা, বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকগুলি সাহিত্যের দিক দিয়াও অমর সৃষ্টি। ইঁহারা যদি কেবলমাত্র সমাজসেবী, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হইতেন, তাহা হইলে ইঁহারা ইঁহাদের অমূল্য চিন্তারাশি নীরস গদ্যেই লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন। কিন্তু যেহেতু ইঁহারা বাঙালী সেই হেতু ইঁহাদের গ্রন্থরাজি একদিকে যেমন অসাধারণ চিন্তার আধার, অন্যদিকে তেমনি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নিদর্শন। বাংলাসাহিত্যের যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস কোনদিন লেখা হয় তাহা হইলে ঐতিহাসিককে ইঁহাদের রচনার কথা উল্লেখ করিতেই হইবে।

পরিশেষে আমি এই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই যে বাঙালী প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাহার চিত্তের গভীর ভাবাবেগ, প্রেম ও কবিসুলভ এক উন্মাদিনী শক্তি যাহা তাহাকে যুগে যুগে নব নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে; ঘরছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া করিয়া সত্য ও সুন্দরের কঠোর সাধনায় নিয়োজিত করিয়াছে। এই কবিধর্ম্মের জন্যই সে বারে বারে নূতনের স্বপন দেখিয়াছে, তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছে; শুভ কল্যাণকর বিপ্লবের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে। বাঙালী যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে এই অজেয় প্রাণশক্তি, গভীর ভাবাবেগ, সর্বজয়ী আত্মবিসর্জ্জনকারী প্রেম ও অনন্যসাধারণ কবিসুলভ সৃজনীশক্তির জন্যই বাঁচিয়া থাকিবে।

বিহারের লোকসঙ্গীত

শ্রীমায়া গুপ্ত

বিবাহ

বিহারের বিবাহ-উৎসব সঙ্গীতের পরিচয় পূর্বে দিয়েছি। তার কিছু সংযোজন প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গে বিবাহে সঙ্গীতের প্রচলন আছে—ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই এর জনপ্রিয়তা। ব্রাহ্ম বিবাহে সময়োচিত উৎকৃষ্ট রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনেছি। প্রচলিত লোকসঙ্গীতকে বহু দূরে অতিক্রম করে এগুলি কাব্যধারার প্রগতিকে অগ্রসর করে এনেছে। বিশেষতঃ কেবলমাত্র নিয়ম রক্ষার্থে এ সঙ্গীত নয়, সঙ্গীতের প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করে এগুলি চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

বিহারের বিবাহ সঙ্গীতে একদা এই চিত্তহারিণী গুণাবলী ছিল এবং সেকালের রুচিবোধে গাইবার ভঙ্গী, গানের ভাষা ও ভাব সবই মনোহর ছিল। কাল অগ্রসর হয়েছে, মানুষের রুচি পরিবর্তিত হয়েছে, তার জীবনযাত্রার মান পরিবর্তিত, কোথাও বা পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। তবে বহুক্ষেত্রে তার রুচি উন্নত-তর হয়েছে। কিন্তু লোকসঙ্গীতে বিপ্লবকারী পরিবর্তন হয় নি। এই সকল কারণে লোকসঙ্গীত যে ভাবে গাওয়া হয় তা আধুনিক চিত্তে বহুক্ষেত্রেই মনোহারী হয় না। কাব্যদেবী অপরূপ স্বরব্রহ্মের চাপে দমবন্ধ হয়ে পড়েন, সুরও বহু প্রাচীন কণ্ঠের প্রতাপে লজ্জিত হয়ে প্রস্থান করেন এবং গায়িকামণ্ডলীর অজ্ঞতাবশতঃ অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়ে ভাষা অথমনর্থ ঘটিয়ে থাকেন হয়ত বা নিরর্থক হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে বৃদ্ধারা যথেষ্ট সজাগ ও অপেক্ষাকৃত নির্ভুল।

একটি গানের পরিচয় দিচ্ছি প্রথমে। বিবাহ মণ্ডপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—

> করিল বনকে বাঁশ কাটায়বৈ
> বন্ রন্ধ্ লাকে বাঁশ মণ্ড্বা ছাওয়ায় রে,
> উপরে চুরয়ে হংস শ্বেত রে।
> গাইল গোবর অঙ্গন নিপায়ল
> গজমোতি চৌকে পুরায়ল রে।
> আনি বৈঠায়ো দুলারু দুলাহ্ বা
> মোতি অঞ্জুরী ভরয়ো রে।
> আনি বৈঠায়ো দুলারী বেটিয়া
> সিন্দুর মাংগে ভরয়ো রে।

"করিল (কচি বাঁশের মুকুলকে করিল বলে) বনের বাঁশ কেটে বনরন্ধের (?) বাঁশে মণ্ডপ ছাওয়া হ'ল, উপরে দুলছে শ্বেত হংস। গোবর দিয়ে অঙ্গন লিপ্ত করা হ'ল, মৃণ্ময় গজগুলি সাজান হ'ল মণ্ডপের তলে।

বরকে এনে মণ্ডপে বসান হ'ল, তাকে অঞ্জলী ভরে রত্ন দান করা হ'ল, আদরিণী কন্যাকে এনে বসান হ'ল, তাঁর সিঁথীতে সিন্দুর ঢালা হ'ল।"

মাটির হাতী তৈয়ারী করে বিবাহ মণ্ডপে রাখা এখানে প্রচলিত। হস্তীগুলির মাপ এক একটি বড় ভেড়ার মত হয়ে থাকে। পুরাকালে রাজকীয় বিবাহ-সমারোহে হাতী ঘোড়ার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। বর্ত্তমানেও এইরূপ আছে। অথবা এও হতে পারে যে হাতী সুলক্ষণ জন্তু বলে ভারতে এবং প্রাচ্য জগতের বহু দেশে সমাদৃত, সেইজন্যই বিবাহ উৎসবে মৃণ্ময় হাতী রাখা থাকে সম্প্রদানকালে।'

আর একটি গানের পরিচয় দিচ্ছি। বিবাহের সূচনায় গানটি রচিত। নামগুলিতে রামায়ণের স্পর্শ আছে। বহু সঙ্গীতই এই রীতিতে রচনা হয়েছে—

> কোন বন বোলৈ কারী কোয়লিয়া,
> কোন বন বোলৈ ময়ূর।
> দরবারে বোলে রাজা জনক
> ধিয়া ভেলৈ বিহাবন যোগ।
> বিজুবন বোলৈ অপ্পা ডাঘে কোয়লিয়া
> আপন মহলে বোলে রাণী
> ধিয়া ভেলৈ বিহাবন যোগ।
> চার বন খোজলু হে বেটি
> কঁহু ন মিলৈ জামাইয়া।
> যাইও হে রাজা অযোধ্যা নগরীয়া
> বঁহা হৈ সুন্দর রঘুনাথ।
> শাঁবর বাবা মত জনু বোলিহো
> শাঁবর হৈ রঘুনাথ।

বসন্তের সমাগমে কন্যা মিলনব্যাকুল, পিতা মাতা বুঝেছেন কন্যা বিবাহযোগ্যা হয়েছেন। কিন্তু খুঁজে খুঁজে বর পাওয়া যায় না। কন্যা বলছেন, "হে পিতা অযোধ্যা নগরে রঘুনাথের সংবাদ নাও। কিন্তু রঘুনাথ শ্যামবর্ণ বলে যেন তুমি অপছন্দ ক'রো না।"

কন্যার এমন সপ্রতিভ ব্যবহার এই গানটির একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। গানটি classic পর্যায়ের।

আর একটি গান আছে সেটি মহাদেবকে বিষয়বস্তু ক'রে। বরটি নেহাত মহাদেবের মতই বাঘছাল পরা—

> ভৈঁসোয়া চঢ়ল আয়ে মহাদেব বর
> বাঘছাল পিন্ধল হে।
> যিনি বর খোজলৈ বাবা, জনম ভিখারী
> সেহ মোর বৈরী হে।
> কোন নিরবুধি ভরল হুঁকার হে ?

জননী কন্যার অভিযোগ শুনে উত্তর দিচ্ছেন—

তোর লাগি বেটী মাঘ নাহাইলু
তোর লাগি করলুঁ এতোয়ার হে।
তোর মিলে কয় গোবিন্দ হে।
জনমল দেলু বেটী করম আপন
কা বিধি লিখল লিলার হে।
সোনাবা আনিয়ে ভিখ্‌ দৈতে যো বেটী
মিলি সৈতো রাজ কুআর হে।
খুপহ ঝারকে ভিখ দেলা হে বেটী
মিলি গেলো জনম ভিখারী হে।

"বৃষিযারোহণ করে মহাদেব বিবাহ করতে এসেছেন, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। কন্যা ক্ষোভে বলছেন, 'যিনি আমার পতি মনোনয়ন করেছেন তিনি আমার বৈরী। কোন নির্বোধ এই বিবাহে মত দিয়েছে?'"

জননী কন্যার অনুযোগ শুনে উত্তরে বলছেন, "বাছা তোমার জন্যে মাঘ মাসের দারুণ শীতে স্নান করেছি, পুণ্য রবিবার ব্রত পালন করেছি, যাতে তোমার নারায়ণের মত স্বামী লাভ হয়। কিন্তু তোমার জন্মের সঙ্গে নিজ কর্মফলের যোগ্য ললাটের লিখন নিয়ে এসেছ। যদি স্বর্ণ ভিক্ষা দিতে তবে রাজপুত্র স্বামী লাভ করতে। কিন্তু তুমি সুর্প ঝেড়ে ভিক্ষা দিয়েছ তাই তোমার ভিক্ষুক স্বামী লাভ হয়েছে।"

তারপর কন্যা মুখের অঞ্চল সরিয়ে বরের মুখ দর্শন করলেন, দেখলেন বর 'কাঞ্চন কুমার'। জানতে পারলেন বর বৃদ্ধ নয়। তখন উল্লাসে গদগদ হয়ে যে বর খুঁজেছে তাকে বরদান করতে তৈরী হলেন, পিতার চরণে মার্জনা ভিক্ষা করলেন—

"আঁচর আড়ত দেখৈ ছুলহিন্‌ উমর বরকে,
লহসি চরণ ছুঁয়ে জনক কে,
ব্রাহ্মণে দেই রতন ভার।"

এ গানটী যেন কতকটা সান্ত্বনা। বর অসজ্জিত, কিন্তু বৃদ্ধ বা কুরূপ নয় এ কথা জানার আনন্দ কম নয়। হয়ত কন্যার মনে আশার সঞ্চার করবার জন্যেই এই সঙ্গীতটি। হয়ত এমন একটি সুরও প্রচ্ছন্ন আছে যা বলে—আপাতদৃষ্টিতে অসুন্দর যা তার অন্তরালে অনন্ত মাধুর্য্য লুকিয়ে আছে, সুতরাং নিরাশ হ'য়ো না।

অল্প বয়সের বর-কন্যার অভাব অপ্রতুলতা এখনও বিহারে নেই, এমন কি সরদা আইন সত্ত্বেও বছরে বহু শিশু-বিবাহ হয়ে থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে তো যৌবন বিবাহের প্রচলনই ছিল না, শৈশবেই অথবা কৈশোরেই বিবাহ হয়ে যেত। বিপত্নীকের বিবাহে খুব ধুমধাম বড় হয় না। তথাকথিত ছোট জাতির ঘরে বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্তার দ্বিতীয় বার বিবাহের রীতি আছে, তবে তা নেহাতই 'সাগাই'—বিবাহের চেয়ে সংক্ষিপ্ত, অনুষ্ঠানের ঘটা নেই।

শিশু বর কন্যার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত গানগুলিতে—

রাহে বাটে অহে মালিন, পোখর কাটায় লৈ
উড়ত সুগা পউটী চঢ়ি বৈঠলে,
সুগাওয়া লে খৈবো বরিয়াত।

তারপর— অহি সবে পরছন আয়লৈ
বেটী মায় মুহাবা নিরখ,
ঐসন ছুলারু বর কবহু ন দেখলুঁ
সুগা লেলৈ এলে বরিশত।

অভিমানে কিশোর বর পাখীটা ছেড়ে দিয়ে বলছে—

বনকে সুগাওয়া অব বন চলি গেলা
কৌন কলঙ্ক হমে লাগে?

বিবাহ মণ্ডপের কাছে কিছু গর্ত্ত খুঁড়ে জল ভরা হয়, অর্থাৎ পুকুরের পরিবর্ত্তে এতেই কাজ চলে। সেখানে যখন বরযাত্রী এল একটি টিয়াপাখী এসে বসল বরের হাতে, বর ঐ টিয়া পাখী নিয়েই বিবাহের আসনে বসেছেন।

তারপর বর বরণ করতে যখন সব এলেন, শ্বশ্রূমাতা এই ছেলেমানুষী কাণ্ড দেখে রুষ্ট হয়ে বলছেন, এমন আদুরে বরও জন্মে দেখি নি পাখী হাতে বিবাহ করতে এসেছে।

অভিমানে পাখীটি ছেড়ে দিয়ে বর বললেন—বনের পাখী বনেই চলে গেল আর তো আমায় কোন কলঙ্ক দেবার নেই।

সুন্দর চিত্রটি। শ্বশ্রূমাতা এক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠোরা হয়েছেন সন্দেহ নেই। একমাত্র কিশোর জামাইকেই এইরূপ বাক্য-বর্ষণে আপ্যায়িত করা যেতে পারে, বয়ঃপ্রাপ্ত জামাতাকে এরূপ সম্ভাষণ করবার দুঃসাহস তাঁর হ'ত না হয়ত।

আর একটি গান আছে বর বিবাহের পর কোহবার (বাসর) ঘরে যাবেন না—কি চাই? চাই একটি ছুরী, সেটি 'নিয়ে তবে তিনি ছাড়বেন বর বেঁকে বসিলেন—'

ভেলৈ বিহা বর কোহবার না যায়
ছুরী লাগি রুসল দামাদ ভারী হে
ছুরীয়া যে দেলহ তাক হাঁথ
লহসি চলল কোহবার হে।

শিশু বরকে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু বেঁকে বসলেও বিপদ।

তারপর কন্যা বিদায়ের চিরন্তন অশ্রুময় ছবি। এ ছবি ঠিক বাংলার মতই সমস্ত ঘরে ঘরে। একদা পঞ্জাবের একটি বিবাহ দেখবার সুযোগ হয়েছিল, কন্যা-বিদায়ের সময়কার দৃশ্য দেখে হঠাৎ ভুলই হয়ে গিয়েছিল যে এই বিচিত্র বেশধারিণী কন্যা জননী, আত্মীয়মণ্ডলী বঙ্গনারী বা বিহারিণী নয়—বিহার ও বঙ্গদেশ হতে বহু দূরে পঞ্জাব!

কন্যা-বিদায়ের গানের পরিচয় এখানে দেওয়া হ'ল।

শীরি হে কমল দাহ, উটিয়ে গেলো রে চাঁদ,
সম্‌খী বিদায় মাগে পহলিয়ে সাঁঝ।

সাঁহুকর অঙ্গন বহুত পরিবার,
জামাই অঙ্গনে রহে ঠাঢ়—
জলদিসে বিয়া সাঁপর।

কমল শুকিয়ে গেল দিনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, চাঁদ উঠে গেল আকাশে, বৈবাহিক মহাশয় সন্ধ্যার পূর্বেই বধূ নিয়ে প্রস্থান করবার জন্ম উৎসুক হয়েছেন। ছোট অঙ্গনে পরিবারের আত্মীয় বন্ধু সব দাঁড়িয়ে আছেন—বিদায়দৃশ্য দেখতে। এবার কন্যা বিদায় কর।

দান দাহেজ বাবা বহুত দেলো রে
ধিয়া সাঁপেরিয়া সভে বুলায়ে।
"গাইয়া বাছিয়ো বাবা খুঁটাওয়া লাগাল
ধেনুয়া হমর সঙ্গে চলি যায়।"
লালে লাল ডোলিয়া সবুজ ওহার
বহি পর চলল রে ধিয়া শশুরার।

প্রচুর দানসামগ্রীর সঙ্গে পিতা কন্যা সমর্পন করেছেন—কন্যাকে বিদায় দিচ্ছেন। কন্যার বিদায় হচ্ছে লাল পালকীতে, তার ঢাকনা সবুজ রঙের। কন্যা যাত্রা করেছেন, বাড়ীর গাভী কন্যার পিছনে পিছনে চলে যাচ্ছে দেখে কন্যা পিতাকে ডেকে বলছেন, বাবা আমার আদরের গাভীটিকে ডেকে খুঁটিতে বেঁধে রাখ, না হলে আমার সঙ্গ সে ত্যাগ করবে না।

তারপর
এক কোশ যায় বেটী দুয়ে কোশ যায়,
ভাণ্ডিয়া উঘারি চিতাবে নৈহর পরিবার।
সাগুরে ভাইয়া ধর ঘুরিহে,
রোয়ত হৈ ঘর বৈসি মায়।
তোহার লিখল ভাইয়া বাবাকে হে রাজ।
হমর লিখল এ হে পরদেশ।

পালকী চলেছে এক ক্রোশ দুই ক্রোশ, পিতৃগৃহের আত্মীয়েরা সঙ্গে চলেছেন, ছাড়তে প্রাণ চায় না। পালকীর টোপ তুলে আদরিণী কন্যাকে বার বার দেখছেন।

কন্যা বলছেন, ভাই, এবার ঘরে ফিরে যাও, ঘরে বসে জননী কাঁদছেন। তুমি গৃহে থাকতে পারবে, কারণ তুমি পুত্রসন্তান · আমার অদৃষ্টে সকলকে ছেড়ে পরদেশই আছে।

জননী কাঁদছেন—
কাহা তোহে ছোড়ল হে ভিয়ারা হমার।

প্রতিবেশিনী সান্ত্বনা দিচ্ছেন—
"যে কর বাঁধালি বাছোয়া সেহ লেলে যায়"
ভাঁড়াসা বৈঠল রোয়ে কুসুমিনি মায়
কাঁহ ন শুনিহে বেটী তোর নুপুর ঝঙ্কার।

"কন্যাকে আমার কার ঘরে পাঠালে"—প্রতিবেশিনী সান্ত্বনা দিচ্ছেন যার অদৃষ্টের সঙ্গে তাকে বাঁধলে তারাই কন্যাকে নিয়ে গেল।' কিন্তু মন মানে না—মা কাঁদছেন 'বাছা তোর পায়ের নুপুরের শব্দ কোথাও শুনতে পাইনে।'

নবজাতক

পূর্বে একবার সোহর গানের কিছু পরিচয় দিয়েছি, এখানে সোহর গানের কয়েকটি উল্লেখ করতে চাই। শিশুর আগমনে উৎসবের সমারোহ পড়ে যায়, দরিদ্র গৃহেও এর ব্যতিক্রম হয় না। তবে আয়োজন সেখানে নেই, আছে গৃহ-পরিবার ও প্রতিবেশিনীদের শুভৈষণা। জননী ও শিশুকে অভিনন্দন জানাবার জন্য যে সমবেত সঙ্গীত গাওয়া হয় সে-গুলির নাম 'সোহর'।

সোহরের বিচিত্র গান আছে। কখনও প্রসূতি যেন গাইছেন, কখনও পৌত্রের মুখদর্শন করে পিতামহী গাইছেন, কখনও বা অন্যান্য আত্মীয়া বা শুভাকাঙ্ক্ষী বান্ধবী ও প্রতিবেশিনীরা গান করছেন।

এই গানটি নব প্রসূতির পক্ষ হতে গাওয়া হয়, এ তাঁর পুত্র কামনার কাহিনী।—

অঙ্গন বৈসালুঁ দেব সুরয মানাই
এক পুত দেহ, চৌকা চঢ় বৈঠতুঁ হে।
সুরয মানাওলুঁ, বাবু জনম লৈ
বাজে আনন্দ বাধাওয়া।
ঘোড়ীয়া পবাই লৈ ঘোড় সারিয়া
ভৈঁস পাবাই লৈ বাধান।
চঢ়ত লাল ঘোড়া বাছোয়া পর
খেলতৈ চিকন কড়রুয়া।

"অঙ্গনে উপবেশন করে সূর্য্যদেবের আরাধনা করেছি পুত্র লাভের জন্য। পুত্রবতী হয়ে শুদ্ধ হব এবং রন্ধন করে সকলকে ভোজন করাবার অধিকার লাভ করব। সূর্য্য-কৃপায় পুত্র লাভ করেছি, আনন্দধ্বনি হচ্ছে। আমার শিশুর জন্মের সঙ্গে ঘোটকী এবং বাথানে মহিষেরও শাবক জন্মাল। আমার বাছা ঘোড়ার শাবকের উপর চড়বে এবং চিকন মহিষ শাবকের সঙ্গে খেলা করবে।"

শ্বশ্রূ বলছেন—
ঘোড়ীয়াকে দেবৈ খাস ভুষা,
ভৈঁষিয়া মহিলওয়া।
বধুয়াকে দেব আদরক, মধ, পিপর হে।

"ঘোটকীকে খাস ভুষি দেব, মহিষকে দেব খোল এবং বধূমাতাকে দেব আদ্রক, মধু, পিপুল (প্রসূতির পথ্য)।" এই গানটিতে মানব-শিশু ও পশু-শাবকের মধ্যে এক বন্ধনের পরিচয় আছে।

এবার একটি গানের পরিচয় দিচ্ছি। গানটি সন্দিগ্ধচিত্ত শ্বশ্রূ ও কৌতুকময়ী বধূর গান।

ঘর পৈসী বহুরিয়া নেহারল সাস,
"চিঠি আয়ল চিঠি আয়ল।
বহুয়া কৌন চোর আয়ল ঘর তোর
রতমারী রহল গরভ।"

বধূ বলছেন—

"শাশু সোনেকে জালওয়া বানায়ব
চোরওয়া বাঝায়ব,
লানবৈ শাশু তোর পাশ।

এবং স্বর্ণকারকে ডেকে অনুরোধ করছেন,

"মোর লাগি সোনার ভাই, জালি বনা দেহ
বাঝায়ব চোর,
চিন্হায়ব শাশু কৌন চোর আয়ে ঘর মোর।"

তারপর—

"আধারাতি বিতালৈ পহর রাতি বিতলৈ,
ললনা ভৌঁরকে রূপে চোর আকে পেসালৈ,
সোনে জাল বাঝাই গেল।"

চোর ধরে শ্বশ্রূকে ডেকে বেহায়া বধূ বলছেন—

"কনে গেলা কিয়া ভেলা
শাশুহে ঠাকুরাইন্
এহি চোর ঘর মোর ঢুকালে।"

জালবদ্ধ পুত্রকে দেখে লজ্জিতা ও পরাজিতা শ্বশ্রূ বলছেন

"হে বেটা ধর এইলে,
পুতহু বড় সেয়ান,
ছিন্ লেভো বেটোয়া হমার।"

শ্বশ্রূ দেখছেন বধূ গর্ভবতী। বলছেন বধূ বড়ই মন্দ, বড়ই বেহায়া— তুমি কার সন্তানের জননী?

বধূ বলছেন, সেই চোরকে ধরে তোমায় এনে দেব। হে শ্বশ্রূমাতা আমায় একটি জাল তৈরী করিয়ে দাও। স্বর্ণকারকে ডেকে বললেন, ভাই আমায় চোরধরা সোনার জাল তৈরী করে এনে দাও, চোর ধরে শ্বশ্রূমাতাকে তার পরিচয় দেব।

তারপর রাত্রি গভীর হয়েছে, লুব্ধ ভ্রমর ঘরে এসেছে এবং যথাবিধি জালে আটকা পড়েছে। লজ্জাহীনা বধূ শ্বশ্রূকে ডেকে বলছেন—ওগো শ্বশ্রূঠাকুরাণী তুমি কোথায়। এসে দেখো এই সেই চোর যার সন্তানের আমি জননী।

অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ জননী জালবদ্ধ পুত্রকে দেখে অভিযোগ করছেন, বাছা ঘরে এলে তুমি, বধূ বড় চালাক, আমার বাছাকে কেড়ে নিয়েছে।

শ্বশ্রূর নিরুপায় মুখচ্ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বধূর হাতে জব্দ হয়েছেন। যেমন শ্বশ্রূ তেমনি তাঁর যোগ্য বধূ। শাশুড়ী-বৌয়ের চিরন্তন অধিকার-সমস্যা এই ঘরোয়া গানটিতে ফুটে উঠেছে। প্রৌঢ়া জননী পুত্রের উপর আধিপত্য হারাবার ভয়ে ব্যাকুল হয়ে বধূর প্রতি বিরাগ পোষণ করছেন। অপর দিকে যুবতী বধূ এর প্রতিবাদে সগৌরবে শ্বশ্রূপুত্রের হৃদয় হরণ করে বিজয়িনী হচ্ছেন। করুণ এবং কৌতুক রসে গানটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

আধুনিক রসবিচারে গানটিতে কিছু অশ্লীলতার আভাস প্রকট হয়েছে মনে হয়। স্মরণ রাখতে হবে যে এ গানগুলিতে পুরুষদের বিশেষ স্থান নেই, অঙ্গনে গাওয়া হয় নারীমহলে। পুরুষেরা এ গানগুলি অবহিত চিত্তে শোনবার সুযোগ কমই পেয়ে থাকেন। বধূ ও শ্বশ্রূর বাগ্‌বিতণ্ডা কৌতুকপ্রিয় প্রতিবেশিনীদের সরস রঙ্গ-রচনা।

এবার আর একটি গানের পরিচয় দিচ্ছি, গানটি যেন একটি বিশেষ কাহিনী। জঙ্গলে দেখা হ'ল, নারী নৃত্য করে আগন্তুকের চিত্ত জয় করলেন, এবং একত্র বসবাস আরম্ভ হ'ল। ভগ্নী গৃহ হতে ভাইকে পত্র লিখছেন, "ভাই জংলী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে চলে এস, না হলে জাতিচ্যুত হবে।' ভাই লিখছেন 'না বোন, জংলী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারি না, জাতি যায় যাক। আমার নয়নাভিরাম পুত্রের জননীকে ত্যাগ করা সম্ভব নয়।'

কহাকে জংলী পাতুরিয়া
কহাকে রে নারি,
নাচে লাগল জংলী পাতুরিয়া
রিঝায়ল চিত নাচি নাচরে।
ভগ্নী লিখলেন—ভাই ছোড় দেহু জংলী তিরিয়া
ধরম বাচত তবহি।
ভাই লিখলেন—নহি ছোড়ব জংলী তিরিয়া
ধরমবা বাচে না বাচে
জংলীকে জনমল হরিলবা দেখৈ
আখে সোহন লাগে।"

শিশুর জন্মের প্রভাব জননীর সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনে যথেষ্ট। একদা দৃঢ় অনুশাসন দ্বারা জনমত তৈরি করে প্রজাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে নীতির গৌরব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এ তারই নিদর্শন। তবে এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে স্নেহ বা প্রীতির সম্পর্ক বহুক্ষেত্রে তৃতীয় জনকে কেন্দ্র করে নিবিড় হয় এবং সেই কারণেই নবজাতকের এত মাহাত্ম্য।

ভারতের বহু প্রদেশেই প্রচলন আছে কন্যার সন্তান জন্মাবার পূর্ব্বে তার গৃহে কন্যার পিতামাতা অন্ন গ্রহণ করেন না। এ রীতির মূলে যে বস্তু আছে তা এই বিশ্বাসের অন্তর্গত যে শ্বশুর গৃহে কন্যার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয় সন্তানের জননীরূপে, কেবলমাত্র বধূরূপে নয়। কন্যার অধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত পিতা কন্যার গৃহে আতিথ্য দাবী করতে কুণ্ঠিত হন।

শিশু-নাট্য ও তাহার ব্যবহার

শ্রীঅমরমোহন মুখোপাধ্যায়

সভ্যতার আরম্ভ থেকেই মানুষের মনে গল্প শোনবার স্পৃহা সঞ্চার হয়েছে এবং সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার সহিত যুক্ত হয়েছে "গতি"মূলক গল্প অথবা নাটক দেখার প্রবৃত্তি। নাটক দেখার ফলে মানুষের যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দের লোভে মঞ্চ ও তৎসংযুক্ত শিল্পকে সে বরাবরই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, যে-কোন প্রকারেই হোক না কেন, নাটক বা অনুরূপ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা সকল জাতির মানুষই অনুভব করেছে এবং নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের সাহায্যে সেই প্রয়োজনীয়তাকে শিল্প-রূপ দিয়েছে। নাটকের উৎপত্তি ও উন্নতির ইতিহাস এক হিসাবে সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস।

শিশুর মনেও সেই প্রবৃত্তির বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাদের পুতুল-খেলার ভেতর, তাদের নানা ক্রীড়া-কৌতুকের ভেতর আমরা মানুষের, অভিনয়-বৃত্তির প্রথম বিকাশ দেখতে পাই। প্রায় প্রত্যেক শিশুই শৈশবে নানা ব্যাপারের অভিনয় করে থাকে। শিশুদের জগৎ কল্পনা দিয়ে গড়া, বাস্তবের সঙ্গে তার মিল নেই। এই কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য্যের দরুণই তারা মলিন বস্ত্রধারী বালককে "রাজা" বলে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে; ডাক্তার পিতার জামা-কাপড় পরিধান করে কত বালকই না তার ভগ্নীর পুতুল-শিশুর রোগ উপশম করতে আসে। এ সমস্তের পেছনে রয়েছে সেই প্রবৃত্তি যাকে ইংরেজীতে বলা চলে "impersonate" করবার অর্থাৎ অন্য ব্যক্তি সাজবার ইচ্ছা, যার যথার্থ পরিণতি ঘটে অভিনয়ে। কল্পনাশক্তির সহায়তায় অবাস্তব ব্যক্তি বা ঘটনাও তাদের নিকট এত সত্য ও জীবন্ত হয়ে ওঠে যে সেগুলোর অস্তিত্ব সম্ভব কিনা সে প্রশ্নও তাদের মনে উদয় হয় না। যে ক্ষমতার সাহায্যে উত্তর জীবনে বড় অভিনেতা হওয়া যায়, এটা তারই পূর্ব্বাভাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিশুদের এই সহজাত ক্ষমতার স্বাভাবিক বিকাশের কোনো ব্যবস্থাই নাই।

উপরোক্ত প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রত্যেক শিশুর মধ্যে সুপ্ত থাকে "spirit of exhibitionism" অর্থাৎ নিজকে জাহির করবার চেষ্টা। সে সর্ব্বদাই দেখাতে চায় সে একজন কেউ-কেটা—সে অবজ্ঞা বা উপেক্ষার পাত্র নয়। তারও যে একটা বিশেষ মূল্য আছে প্রতি পদে সে সকলের কাছে তা প্রকাশ করতে চায়। ভাল পোশাক বা খেলার জিনিষ পেলে তো কথাই নেই, সে তার বন্ধুদের ঐ সমস্ত বস্তু দেখায়। বিশেষতঃ নিজের কৃতিত্ব বা বিশেষত্বের পরিচয় দিয়ে সে গর্ব্ব অনুভব করে। ভুল পথে চালিত হলে এই আত্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা বৃথা গর্ব্ব, অহমিকা, দম্ভ প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়। সৎপথে পরিচালিত হলে কিন্তু এই আত্মপ্রচার প্রবৃত্তি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে, তাকে আত্ম-নির্ভরশীল ও আত্মশক্তিতে আস্থাবান করে তোলে। এখন কথা হচ্ছে যে, আমরা শিশুদের এই স্বাভাবিক বৃত্তি-গুলিকে কিরূপে ঠিক পথে চালিত করতে পারি? এর উত্তর হচ্ছে, তাদের উপযোগী অভিনয় শিক্ষাদান দ্বারা। আমরা যদি স্কুলে পড়বার সময়ই বালক-বালিকাকে বিভিন্ন ভূমি-কায় অভিনয় করবার সুযোগ ও সুব্যবস্থা করে দি তা হলে এই ইচ্ছাগুলো ঠিক পথে পরিচালিত হয়ে তাদের জীবনকে সাফল্যলাভের পথে অনেক দূর এগিয়ে দেবে। এমন কি, উপযুক্ত অভিনয়-কলা শিক্ষাদ্বারা অনেক মুখ-চোরা লাজুক ও ভীরু শিশুও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং চটপটে হয়ে উঠতে পারে। শিশু-নাট্য অভিনয়ের সার্থকতা সেইখানেই। স্কুলের গতানুগতিক নীরস পাঠ্যতালিকার চাপে তাদের যে-সকল শক্তি নিষ্পেষিত হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি বিকশিত হয় অভিনয়-কলার সাহায্যে। তাতে তারা একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ-দুই-ই লাভ করে। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী বা শেক্সপীয়রের নাটকগুলো তাদের কাছে কত উপভোগ্য হয়ে উঠে, যখন তাদের অভিনয়ের উপযোগী করে সেগুলোর নাট্য-রূপ দান করা হয় এবং তারা নিজেরা সেগুলোর অভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই কথা ওঠে—শিশুদের জন্য কিরূপ নাটক লিখিত হবে। একথা বলা অনাবশ্যক যে বড়দের নাটক তাদের উপযোগী নয়। 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ', 'বলিদান' বা 'দুর্গাদাস' প্রভৃতির মত নাটক তাদের কাছে শুধু অচলই নয়, এগুলো তাদের পক্ষে বেশ ক্ষতিকরও বটে। রোমান্স, প্রণয়ঘটিত ব্যাপার ইত্যাদিই অধিকাংশ সামাজিক নাটকের উপজীব্য; শিশু-নাট্যশালায় সেগুলোর অভিনয় কিছুতেই চলতে পারে না। শিশুদের নির্ম্মল চিত্তে এগুলোর অভিনয়ে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং কিরূপ নাটক শিশুদের উপযোগী সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা করা দরকার। শিশুদের জন্য সামাজিক নাটক লেখায় নাট্যকারকে বিশেষ সাবধানী হতে হবে। ঐতিহাসিক কাহিনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ভৌগোলিক বিবরণ এমন কি রূপকথা অবলম্বনেও শিশু-নাট্য রচিত হতে পারে। শিশুদের জন্য লিখিত ঐতিহাসিক নাটক এরূপ হওয়া উচিত যে তা শুধু তাদের বীরত্বের আদর্শেই অনুপ্রাণিত করবে না, ভারতীয় তথা জাগতিক সভ্যতার পেছনে যে বিরাট্ শক্তি ক্রিয়াশীল তার প্রতিও তাদের শ্রদ্ধাবান্ করে তুলবে, বিশ্ব-সভ্যতার বহুধাবিচিত্র বিকাশ তার মনে যুগপৎ আনন্দ ও

বিস্ময়ের সঞ্চার করবে। বিশেষতঃ ভারতের বৈজ্ঞানিকদের এবং শিল্পী ও লেখকদের জীবনী থেকে তারা শুধু কর্ম্মের প্রেরণা লাভ করবে না, তারা শিখবে নিজেদের ভিতরকার মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধা করতে—মানুষজাতির শুভ বুদ্ধিতে আস্থাবান্ হতে। এরূপ নাটকের অভিনয় দর্শনের ফলে শিশুদের মনের ভেতরকার সুপ্ত সংপ্রবৃত্তিসমূহ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠবে এবং এই সমস্ত মহৎ জীবনাদর্শ থেকে তারাও মহত্তর জীবন গঠনের প্রেরণা লাভ করবে—এক কথায় সে বড় হতে শিখবে। তার Complex বা গূঢ়েষাগুলি দূরীভূত হয়ে তার সমস্ত শক্তির Sublimation বা বিশোধন তখনই সম্ভব হয়ে উঠবে।

সামাজিক নাটকও শিশুরা অভিনয় করতে পারে। যে সমস্ত নীতি সর্ব্বদেশের ও সর্ব্ব কালের মনুষ্য-সমাজকে আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করছে সেই সব নীতির প্রচার শিশুনাট্যে থাকা উচিত, অবশ্য নাটকের রস যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। অভিনয়-কলার সাহায্যে শৈশবে যদি এ সমস্ত নীতিকথা তাদের কোমল অন্তরে বদ্ধমূল করে দেওয়া যায় তা হলে সেগুলো হবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের অমূল্য পাথেয়।

তার পরের প্রশ্ন—শিশু-নাট্যের চরিত্রগুলি কিরূপ ভাবে অঙ্কিত হওয়া উচিত? খুব জটিল চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাতের সূক্ষ্মতা শিশুর পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। শিশুরা পছন্দ করে এরূপ চরিত্র—যারা শৌর্য্য, বীর্য, উদ্যমশীলতা ইত্যাদি গুণের দরুন তাদের কল্পনাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। রামায়ণ-মহাভারতের বহু চরিত্রেই এই সকল গুণ আছে বলে তারা শিশুদের কাছে বিশেষ প্রিয়। রূপকথার কাহিনীও শিশুকে বাস্তব জগতের উর্দ্ধে কল্পলোকে নিয়ে গিয়ে আনন্দ দান করে বলে সকল দেশেই শিশুমহলে রূপকথার এত আদর। শিশুদের মনস্তত্ত্বের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না থাকলে সার্থক শিশু-নাট্য রচনা করা যায় না। ইংরেজী নাটক peter pan বা বেলজিয়ান নাট্যকার মেটার-লিঙ্কের "ব্লু বার্ডে"র পেছনে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও শিশু-মনস্তত্ত্বের সহিত নিবিড় পরিচয়ের নিদর্শন সুপরিস্ফুট। শিশুদের 'emotional values" বা ভাবাবেগের মূল্য এবং শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকলে শিশু-নাট্য রচনায় সাফল্য লাভ করা যায় না। প্রথমেই নাট্য রচনা-রীতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রচলিত শিশু-নাটকগুলি রচনা-রীতি ইত্যাদির দিক দিয়ে সাধারণ নাটকেরই অনুরূপ। বিভিন্ন দৃশ্যের ভিতর দিয়ে কাহিনীর অগ্রগতি, সংলাপ ও গীত-বাদ্য—শিশু-নাট্যে এগুলরও প্রয়োগ অবশ্যই থাকবে। তবে বড়দের নাটকে কাহিনীর যে জটিলতা থাকে, শিশু-নাট্যে তা না থাকাই সমীচীন এবং সংলাপের ভাষাও অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল হওয়া প্রয়োজন, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বীভৎস দৃশ্য শিশু-নাট্যে না থাকাই শ্রেয়ঃ। সর্ব্বোপরি শিশু-নাট্য রচনায় নাট্যকারকে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। শিশুদের অভিনয়ের জন্য আজগুবি কাহিনী পূর্ণ নাটক রচনা করা কিছুতেই চলবে না। বাংলার অনেক আধুনিক শিশু-নাট্যকারই এ বিষয়ে অবহিত নন। শিশুদের মনে যে কৌতূহল থাকে, নাটক পাঠে বা নাট্যাভিনয়ে তা যাতে স্বাভাবিকভাবে চরিতার্থ হয় সেই দিকেই নাট্যকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এবার আসে শিশু-নাট্যের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গ। অনেক নাট্যকারের পক্ষে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ শিশুদের উপযোগী নাটকে কিরূপ শব্দ ব্যবহার করা যায় অনেক সময় তার সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা অনেক নাট্যকারেরই থাকে না। তাঁরা ভুলে যান যে, অধিকাংশ শিশুরই শব্দ-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি কম এবং অধিকাংশ গাল-ভরা সংস্কৃত শব্দের মানে তাদের না জানাই সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, গদ্য অপেক্ষা ছন্দোবদ্ধ বাক্য শিশুর কাছে অধিকতর প্রিয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করা শিশুর পক্ষে দুরূহ। অতএব নাট্যকারকে, যতদূর সম্ভব সহজ সরল শব্দ ব্যবহার করে, ছন্দোবদ্ধ বাক্যে এমন ভাষায় নাটক রচনা করতে হবে, যা শিশুমনকে শুধু এক অপূর্ব্ব রস-মাধুর্য্যেই পরিপূর্ণ করবে না, তার মুখ দিয়ে স্পষ্টরূপে উচ্চারিতও হবে। সাধারণ নাট্যকারের পক্ষে এরূপ ভাষার ভেতর দিয়ে বিভিন্ন রসের পরিবেশন প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে; কিন্তু রবীন্দ্র-নাট্যের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে এ বিষয়ে তাঁর নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হতে হয়। "ডাকঘর" নাটকে অমল ও সুধার মুখ দিয়ে যে ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, তার সরল মাধুর্য্য অননুকরণীয়, তাতে কঠিন শব্দের ব্যবহারও খুব কম, "শারদোৎসবে"ও তাই। কিন্তু এই ভাষা শুষ্ক, নীরস ও বৈচিত্র্যহীন নয়—তা অপূর্ব্ব প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ এবং শিশুর মনকে দোলা দিতে সমর্থ। আধুনিক শিশু-নাট্যকারদের ভাষায় এই সরলতা ও প্রাণমাতানো শক্তির অভাব পরি-লক্ষিত হয়। আধুনিক শিশু-নাট্যকারদের রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষা বিশেষভাবে অনুধাবন করা উচিত। এ প্রসঙ্গে তাঁর গানের ভাষার কথাও মনে পড়ে। এত অল্প কথায় এরূপ ভাবাবেগ সৃষ্টি আর কয়জন কবি করতে পেরেছেন—

> আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়
> লুকোচুরি খেলা।
> নীল আকাশে কে ভাসালে
> সাদা মেঘের ভেলা।

বা,

> লেগেছে অমল, ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া
> দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।...ইত্যাদি

ভাষার পরেই আসে সংলাপের কথা। অনেক শিশু-নাট্যে

দেখি পাত্র-পাত্রীর সংলাপ এত বেশী দীর্ঘ ও জটিল যে শিশু বা বালকদের পক্ষে তা মনে রেখে মঞ্চে আবৃত্তি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিশু-নাট্যের সংলাপ কখনও এরূপ হওয়া সঙ্গত নয়। এক জনের মুখে প্রতিবারে দুই তিনটি বাক্য—এই যথেষ্ট এবং সেগুলো যেন এরূপভাবে রচনা করা হয় যে, পূর্ব্বের কথার সঙ্গে পরবর্তী কথার যোগসূত্রটি বালকেরা সহজে ভুলে না যায়। অতি দীর্ঘ স্বগত উক্তিও বর্জ্জনীয়। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে এক নিশ্বাসে এক শ' লাইন 'সলিলোকি' আওড়ানো শিশুদের পক্ষে বিরক্তিকর এবং শিশু-নাট্য দর্শকদের পক্ষে হাস্যকর। নাট্য-রচনা কালে নাট্যকার যেন এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হন। আর একটি কথা। শিশু-নাট্য কত দীর্ঘ হওয়া উচিত? পঞ্চাঙ্ক নাটক হওয়া উচিত না একাঙ্কিকা? আমরা জানি যে, শিশুরা সাধারণতঃ চঞ্চলমতি ও কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ মনঃসংযোগ করতে পারে না। সে অবস্থায় দীর্ঘ পঞ্চাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করবার বা অভিনয় দেখবার ধৈর্য্য তাদের নেই। সুতরাং শিশু-নাট্য এরূপ হবে যে তাতে শিশুদের ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে—সাধারণতঃ দু' ঘণ্টায় নাটক শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। অভিনয়ের দিক থেকে দেখতে গেলেও ক্ষুদ্র নাটকের আবশ্যকতা বেশী---কারণ এক সঙ্গে অনেকক্ষণ অভিনয় করা শিশুদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এতক্ষণ শিশু-নাট্যের বিষয়বস্তু, ভাষা ও রূপের কথা বললাম। এবার আসে নাটককে মঞ্চস্থ করার কথা এবং সেটি বিশেষ ভাবে স্কুলের কর্তৃপক্ষদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কোন্ সময় ও কোন্ অবকাশে নাটকের অভিনয় হবে। পাঠ্যপুস্তকের চাপে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের সময় খুব কম, তার ভিতর আবার তারা অভিনয়ই বা কখন করবে? প্রাতে ছাত্রেরা সাধারণতঃ লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকে, সন্ধ্যায় খেলাধুলা করে। এমতাবস্থায় অভিনয়ের সুযোগ বা অবসর তাদের কোথায়? কাজেই ছুটিগুলোই অভিনয় করবার পক্ষে প্রশস্ত সময়। আমাদের স্কুলগুলিতে ছুটির সংখ্যা কম নয় এবং ছুটির সময়টা নষ্ট না করে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ডেকে এনে যদি মহড়া দেওয়ার এবং অভিনয় করানোর ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে হয়ত বা কতকটা সুবিধা হয়। বিশেষ করে দুর্গাপূজা, বড়দিন ইত্যাদি দীর্ঘ অবকাশগুলোতে এ ব্যবস্থা অনায়াসেই হতে পারে। সময় সময় ভূগোল ইতিহাস বা বিজ্ঞানের ঘণ্টায় পড়ানো বাদ দিয়েও ছেলেদের দিয়ে মহড়া দেওয়াবার ব্যবস্থা হতে পারে।

এবার রঙ্গমঞ্চের কথা সম্বন্ধে আলোচনা করব। ভাড়া করে মঞ্চের আসবাবপত্র এনে মঞ্চ প্রস্তুত করে অভিনয় করা ছোট ছোট বালক-বালিকাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব স্কুলে স্থায়ী ষ্টেজ থাকা আবশ্যক। প্রথমেই হয়ত প্রত্যেক স্কুলের পক্ষে মঞ্চ প্রস্তুত করানো সম্ভব নয়, সেই অবস্থায় কয়েকটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ সমবেত চেষ্টায় কোন বিশেষ স্কুলে নাট্যগৃহ নির্ম্মাণ করতে পারেন। বিভিন্ন স্কুলের ছেলেরা সেখানেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অভিনয় করতে পারে। অবশ্য, প্রত্যেক স্কুলেরই নিজস্ব নাট্যগৃহ থাকা প্রয়োজন। দৃশ্যপট ও রূপসজ্জা সম্বন্ধেও সেই কথা। প্রয়োজন হলে বিভাগীয় ইনস্পেক্টর সরকারী ব্যয়ে দৃশ্যপট তৈরি করিয়ে নিয়ে, প্রয়োজনমত বিভাগের স্কুলগুলোকে সামান্য ভাড়ায় ব্যবহার করতে দিতে পারেন। তা হলে ছেলেদের আর বাজার থেকে সস্তা দরে কেনা ওঁচা দৃশ্যপট ব্যবহার করতে হবে না। প্রেক্ষাগৃহ প্রস্তুত করবার সময়ে সর্ব্বদা এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে সকলের পেছনের সারিতে উপবিষ্ট দর্শকেরাও যেন শিশু-কণ্ঠের অভিনয় শ্রবণ করতে পারে। সুতরাং হলগুলো বড় আকারের হওয়া সমীচীন।

এখন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে, শিশু-নাটকগুলির প্রযোজনা কারা করবেন এবং নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় বালক-অভিনেতা নির্ব্বাচনই বা কি প্রণালীতে হবে। অবশ্য, স্কুলের নীচের শ্রেণীর ছাত্রদের অভিনয়ে নাটকের প্রযোজনা শিক্ষক মহাশয়দেরই করতে হবে, যদিও সময় সময় উচ্চশ্রেণীর কৃতী বালকদের দ্বারা নিম্নশ্রেণীর বালকদের ভূমিকা মুখস্থ করানোর কাজ চলতে পারে। এরূপ দু'একটি ছাত্র প্রত্যেক স্কুলেই পাওয়া যাবে, যাদের স্বাভাবিক অভিনয়-দক্ষতা আছে---অভিনয়ে তাদের সহায়তা অপরিহার্য্য। ভূমিকা বিতরণের সময় ছাত্রদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হলে শিক্ষক-মহাশয়েরা যেন ভাল করে বুঝিয়ে দেন যে, নাটকে রাজার ভূমিকা যেরূপ প্রয়োজনীয় ভিখারীর ভূমিকাও সেইরূপ। সুযোগ ও সুবিধা থাকলে বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সঙ্গে একযোগেও ছেলেরা নাটকের অভিনয় করতে পারে।

উপসংহারে এ বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীন দেশে নাট্যগৃহ প্রায় সকল বিদ্যালয়েরই অপরিহার্য্য অঙ্গ। শিশু-নাট্যাভিনয় আন্দোলন প্রসারলাভ করলে শিশুদের ভিতর পারস্পরিক সহৃদয়তা ও সহানুভূতি বৃদ্ধি তো হবেই, উপরন্তু বহিরাগত দর্শকবৃন্দের সহিতও তাদের যোগসূত্র স্থাপিত হবে। আমাদের দেশের শক্তিমান নাট্যকারেরাও তাঁদের শক্তি বিকাশের নূতন পথ খুঁজে পাবেন। শিশু-নাট্যের সার্থকতা সেইখানেই।

আধুনিক মারাঠী কবি

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

বাংলাদেশের নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে প্রচলিত হিন্দী, উর্দু, আসামী ও উড়িয়া ভাষার কবিদের কাব্যের সহিত আমাদের অল্পবিস্তর পরিচয় সাধিত হয়েছে, কিন্তু সুদূর মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের কবিদের অবদান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ। ভক্ত-কবি তুকারাম সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় দু'একটি কবিতা রচিত হয়েছে, কিন্তু আধুনিক মারাঠী কবিদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা নেই। ঐ সব ভাষায়ও বর্তমানে বহু প্রতিভাশালী কবি কবিতা রচনা করেছেন। তাঁদের রচিত কাব্যগ্রন্থ উপরোক্ত ভাষাসমূহকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করেছে।

বর্তমান মারাঠী সাহিত্য প্রগতিশীলতার জন্যে খুব প্রসিদ্ধ না হলেও, তাতে এমন সব শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের লেখনী পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতিগঠন ও জনগণের কল্যাণসাধন। তাঁদের জীবনও দেশহিতে উৎসর্গীকৃত।

যুগে যুগে সাহিত্যের রূপ ও প্রকাশভঙ্গী বদলায়—এই পরিবর্ত্তন ঘটে সমসাময়িক জীবনযাত্রার আদর্শ ও সামাজিক বিবর্ত্তন অনুসারে। দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে।

পুরাতন ও নূতন মারাঠী সাহিত্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আজ যা নূতন ও চমকপ্রদ, দু-দিন বাদে তা পুরনো, মলিন ও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে, প্রাচীন মারাঠী সাহিত্যের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বলে কুসুমাগ্রজ প্রভৃতি পুরনো আমলের কবিদের কথা বাদ দিয়ে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মারাঠী কবিদের কথাই এখানে উল্লেখ করব।

এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মারাঠী কাব্যে অনুদূত শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, বসন্ততিলক, দ্রুতবিলম্বিত প্রভৃতি ছন্দে রচিত কবিতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সব বিভিন্ন ছন্দে রচিত কবিতা এত নিখুঁত, শ্রুতিমধুর ও বাণীলাবণ্যমণ্ডিত হয়েছে যে পড়তে গেলেই কাণ ও মন উভয়েই যুগপৎ মুগ্ধ হয়ে যায়। চতুর্দ্দশপদী কবিতা বা সনেটও মারাঠী সাহিত্যে অজস্র রচিত হয়েছে।

এ ছাড়া কোনও কোনও কবি সম্পূর্ণ নিজস্ব নব নব ছন্দেরও প্রবর্ত্তন করেছেন—সেগুলোও বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রে ছোট বড় অনেক কবিই আছেন, কিন্তু যশোবন্ত, মাধব জুলিয়ন, গিরীশ ও বীর বিনায়ক সাভারকার—এই চারজনই হচ্ছেন বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মারাঠী কবি। এঁদের রচিত কাব্য কালজয়ী হবার দাবি রাখে।

বীর সাভারকারকে আমরা হিন্দুমহাসভার প্রখ্যাত সভাপতি ও প্রখ্যাতনামা বিদ্রোহী নেতা বলেই জানি, কিন্তু তিনি যে বর্ত্তমান মারাঠী সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলেও মহারাষ্ট্র-দেশে সর্ব্বজনসমাদৃত—তা আমরা অনেকেই জানি না। একথা মানতেই হবে যে, বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তাঁর ন্যায় প্রতিভাশালী কবি আর কেউ নেই। এই বিদ্রোহী কবির জ্বালাময়ী অপূর্ব্ব কবিতাসমূহে দেশমাতৃকার বন্দনা গান উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ও আত্মাবমাননার গ্লানি থেকে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি যেন অচিরে মুক্তিলাভ করে—তাঁর মনের এই একান্ত কামনাই তাঁর কবিতাগুলোর ভেতর দিয়ে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

মারাঠী সাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতি বীর সাভারকারের ঐকান্তিক ও প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলেই সম্ভব হয়েছে। তাঁর মতে স্বদেশ ও সাহিত্যের উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত—স্বদেশের উন্নতি করতে হলে প্রথমে সাহিত্যের বনিয়াদ দৃঢ় করে গড়ে তুলতে হবে। প্রকাশভঙ্গী, বিষয়বস্তু, ছন্দবৈচিত্র্য সবই তাঁর একান্ত নিজস্ব—অন্য কবির ছাপ তাঁর কবিতায় পড়েনি। তাঁর নিজের আবিষ্কৃত বিচিত্র ও লালিত্য-পূর্ণ ছন্দ মারাঠী সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করেছে। এ ছন্দের নাম 'বৈনায়ক' ছন্দ। এই ছন্দে রচিত কবিতা তার পঠন-পাঠনে মারাঠী কাব্যরসিকদের অপার আনন্দ দান করে। সাভারকারের কবিতা থেকে তাঁরা শুধু যে কাব্যামৃত রসাস্বাদনই করেন তা নয়, সেগুলো তাঁদের দেশাত্মবোধেও অনুপ্রাণিত করে তোলে।

আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত, কারারুদ্ধ সাভারকারকে জীবনে অশেষ দুঃখ বরণ করে নিতে হয়েছিল; এক সময় এমন সম্ভাবনাও দেখা গিয়েছিল যে তিনি আর মুক্ত আকাশের নীচে এসে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন না, কারাপ্রাকারের অভ্যন্তরেই তাঁর অমূল্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এই সঙ্কট সময়ে শৃঙ্খলিত দেশজননী ও মুক্তিসন্ধানী দেশবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর মনে যে সব ভাবনার উদ্রেক হয়েছিল সেগুলোকেই কাব্যরূপ দান করে তিনি স্বদেশবাসীর চিত্ত জয় করেছেন। তাঁর রচিত অখিল হিন্দু-বিজয়ধাম নামক বিখ্যাত সঙ্গীত সমগ্র ভারতে সমাদৃত এবং বহু জনসভায় গীত হয়েছে। সাভারকারকে যখন তাঁর জন্মভূমি থেকে চিরতরে বিদেশে নির্বাসিত করা হয় তখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করার প্রাক্কালে তিনি সাগর তলমলনা নামক যে কবিতাটি রচনা করেন—ভাষার ঐশ্বর্যে প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে বিষয়বস্তুর গৌরবে তা অমর হয়ে থাকবে এবং যুগ যুগ ধরে ভারতের নরনারীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে।

কবিবর যশোবন্ত (মারাঠী ভাষায় বলে যশ্‌বন্ত) আধুনিক

মারাঠি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর রচিত বহু কাব্যগ্রন্থ মহারাষ্ট্র দেশে সর্বত্র সমাদৃত। কিছুদিন আগে প্রকাশিত তাঁর কাব্যকিরীট নামক কাব্যগ্রন্থ বরোদার গায়কোয়ারের নিকট অজস্র ও অযাচিত পুরস্কার লাভ করেছে। প্রজা ও জনসঙ্ঘের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বতন্ত্রতা লাভ, এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিপাদ্য। জনৈক মারাঠি সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন যে, যশোবন্তের প্রধান কৃতিত্ব হ'ল তাঁর অপূর্ব প্রকাশ-ভঙ্গী, ভাব-কল্পনার ঐশ্বর্য এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাশৈলী যা পাঠকের মনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে।

কবি মাধব জুলিয়ন মারাঠি সাহিত্যে নবযুগ প্রবর্তকদের অন্যতম। তিনি একাধারে পণ্ডিত ও কবি। গভীর সহৃদয়তা, এবং বিচিত্র মধুর শব্দচয়ননৈপুণ্য তাঁর বিশেষত্ব। তাঁর আধুনিক রুচিসম্মত কবিতাবলী বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

সমাজ-সংস্কার-প্রয়াসী কবি গিরীশ গেয়েছেন জনজাগরণের গান। পুরাতন সমাজের ইমারত এখন জীর্ণ ও ধ্বংসপ্রায়, সুতরাং তাকে ভেঙে ফেলে তিনি চান নূতন সমাজ সৃষ্টি করতে—যা দেশের দরিদ্রতম অধিবাসীকেও রক্ষা করতে পারবে। মারাঠি সাহিত্যের এক জন সমঝদার তাঁকে অতি আধুনিক উগ্রপন্থী কবি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচিত বহু কাব্যগ্রন্থের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেছে। সব চাইতে অধিক প্রশংসা পেয়েছে তাঁর আধুনিকতম গ্রন্থ 'মানস মেঘ'—যাতে তাঁর কবি-প্রতিভার পরিচয় সুপরিস্ফুট।

মাধব রাও ভাবে আর এক জন বড় মারাঠি কবি। এই প্রগতিপন্থী কবির কবিতা আধুনিক যুগোপযোগী বলে বিশেষ লোকপ্রিয় হয়েছে। মহারাষ্ট্রের এই জনপ্রিয় কবি অকালে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশে হাহাকার পড়ে যায়—বিশেষ করে তরুণদের মনে কবির অকাল প্রয়াণ গভীর রেখাপাত করে। কিন্তু ভাবে অমর হয়ে থাকবেন তাঁর মধুর মর্মস্পর্শী গানগুলোর ভেতর দিয়ে। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-পুস্তক 'কি বাজন' জনগণের চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করবে। এ পুস্তকের গানের ভাষা, রচনা, সুর ও তাল সবই তাঁর নিজের সৃষ্টি।

মারাঠি সাহিত্যে সন্তবাণীর প্রভাব অপরিসীম। এমন কি আধুনিক কবিগণও সে প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি।

সান্ত্বনা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

নিজের পানে যখনি চাহি তখনি মনে হয়
কালের বুঝি শাসন এসে তুলিছে বুকে ঝড়,
তোমার পানে যখনি চাহি, সে ভাবে আসে জয়—
কাপেতে পশে কেমন যেন কানন-মর্মর।

দুয়ার দেশে ছলনা বশে ঘুরে যে যায় দূতী—
তার সে বাণী জানি না জানি আভাসে বুঝি সুর,
গ্রীষ্ম তাপে দগ্ধ দেহে জ্বালার অনুভূতি
তোমার দেহের শীতল ছোঁয়ায় হ'ল কি সুমধুর।

কতো না হ্রদ, কতো না লীলা, কতো সে শাল-বন
বিজন পথে স্মৃতির সাথে গড়িল মন্দির,
আমারে তারাই বিদায়-বেলায় পরালো অঞ্জন,
তোমারি তবু ভরিয়া গেছু তাদেরি মঞ্জীর !

খাদ্য ও টনিক

আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো সময়ে একটি উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অসুখেই হউক বা সুস্থ অবস্থাতেই হউক, যখনি কোনো কারণে আমাদের জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ একটী টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার প্রধান একটি কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন আহার্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনে দৈনিক আহার্য্যের এই অক্ষমতা টনিকের দ্বারা পূরণ হয়।

কিন্তু টনিক যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন তাহার একটী দোষ এই যে উহা দ্বারা কোনো স্থায়ী ফল লাভ হয় না। সাময়িক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহা বিশেষ কার্য্যকরী হইলেও উহার প্রভাব অল্পকালেই নিঃশেষিত হয়। একমাত্র সুনির্ব্বাচিত কোনো খাদ্যদ্বারাই দৈহিক পরিপুষ্টির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর।

স্তানা-ভিটা এই সকল কারণেই একটী আদর্শ পানীয় রূপে পরিগণিত। ইহা একাধারে একটী শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটী উৎকৃষ্ট খাদ্যকে আশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে। তাই ইহার নিয়মিত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার গড়িয়া ওঠে।

স্তানা-ভিটা সুনির্ব্বাচিত ও মূল্যবান উপাদানসমূহের সুষম সমন্বয়ে প্রস্তুত। ইহাতে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, ভিটামিন "বি" কমপ্লেক্স, মল্টযুক্ত সয়াসীম ও অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাযথরূপে বিদ্যমান। ইহা সুস্থ কি অসুস্থ যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী। বিশেষ করিয়া রোগান্তে, প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে, বার্দ্ধক্যে এবং বর্দ্ধিষ্ণু শিশু ও মস্তিষ্কজীবির পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়া স্তানা-ভিটা রোগান্তে ও বর্দ্ধিষ্ণু শিশুদের পক্ষে একটী আদর্শ খাদ্য ও টনিক। রোগবিধ্বস্ত শরীরের দ্রুত সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করিতে ও শিশুদের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য-গুণটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায় তাই প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত স্তানা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি সহজেই আমরা এই ভিটামিন যথাযথরূপে পাইতে পারি। অধিকন্তু খাঁটি দুগ্ধ ও কোকো থাকাতে স্তানা-ভিটা মস্তিষ্ক, পেশী ও অস্থি গঠনও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য করে।

স্তানা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিষ্কজীবিদের পক্ষে অপরিহার্য্য। বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কের পুষ্টি ও শক্তি-বর্দ্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মল্টযুক্ত সয়াসীম স্তানা-ভিটার আর একটী অপূর্ব্ব সম্পদ। বস্তুতঃ পক্ষে সয়াসীম খাদ্যতত্ত্বের এক বিস্ময়কর অবদান। উদ্ভিজ্জ জাতীয় হইলেও ইহা আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ। স্তানা-ভিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ ও উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন সম্পদে ইহাকে অতুলনীয় বলা চলে। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে প্রোটিন ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও স্নায়ুমণ্ডলীর সুষ্ঠু পোষণ ও সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই অনুপাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন ২·৫ গ্রাম প্রোটিন। প্রোটিনের এই অপরিহার্য্য দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ১·৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি কাপ স্তানা-ভিটাতে অন্যান্য নানা মূল্যবান্ উপাদান ছাড়াও একটী ডিমের সমান প্রোটিন থাকে। প্রত্যহ দুই কাপ স্তানা-ভিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। উপরন্তু মল্ট ও সয়াসীম থাকাতে স্তানা-ভিটা কেবল যে সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অন্যান্য খাদ্য পরিপাক করিতেও এই অপূর্ব্ব খাদ্য-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে।

প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে জননীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঐ সময়ে নিয়মিত স্তানা-ভিটা ব্যবহার করিতে দিলে যাবতীয় অশুভ উপসর্গ হইতে সহজেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। স্তানা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো ও অন্যান্য মূল্যবান উপাদান থাকাতে ইহা দ্রুত মাতৃদেহের সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করে। চর্বি, প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ গঠনোপযোগী ও শক্তিবর্দ্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত সহজপাচ্য অবস্থায় স্তানা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়।

স্তানা-ভিটা কি সুস্থ কি অসুস্থ সকলের পক্ষেই সমান উপকারী। যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। স্তানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও সুমিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্তিদায়ক। ইহা গরম বা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে।

বিজ্ঞানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধের বিষবাষ্পের জালে বিজ্ঞানের চর্চ্চা কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে, সাধারণ লোক বিজ্ঞান ও মারণ-শাস্ত্রকে এক পর্য্যায়ে ফেলিয়াছে। কিন্তু আমরা আজ যে জীবনযাপন করিতেছি তাহার দ্রব্যসম্ভার যে বিজ্ঞানের দান তাহা ভাবিয়া দেখি না। মাথার উপরে বৈদ্যুতিক আলো, করাচীর ব্যবসায়ীর সহিত নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া আলোচনা, বোম্বাই হইতে এরোপ্লেনে পেনিসিলিন আনা, মহামারীর হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য ভ্যাক্সিন ইত্যাদি আমাদের সুখসুবিধা বিজ্ঞানীর দান। কিন্তু যুদ্ধের সময় বিপদ এড়াইবার জন্য বিজ্ঞানচর্চ্চার ও বিজ্ঞানীর সমাদর হয় এবং তাহাদের সর্ব্ব চেষ্টা রাজনীতির কূটজালে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হয়। ফলে বিজ্ঞানের ভীষণ রূপটা আমাদের চোখে পড়ে। গত যুদ্ধ (১৯১৪-১৮) হইতেই বিজ্ঞানের কৌশলে যে অনেক অসম্ভাব্য ব্যাপার সহজ করা যায় সেই বোধ রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মনে জাগিয়াছিল, প্রয়োজনের তাগিদটা এই যুদ্ধে খুব অনুভব হয় এবং সেইজন্যই গবেষণার কেন্দ্রগুলি রাষ্ট্রের নিজ দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের চর্চ্চার ব্যবস্থা ও বিজ্ঞানীর গবেষণার ফল ব্যবহার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনেও স্বাভাবিক কৌতূহল জাগিয়াছে এবং সেইজন্য 'এটম বম'-এর বিভীষিকার ছায়ায় বিজ্ঞান চর্চ্চার আয়োজন ও শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। বিজ্ঞানকে যুদ্ধের সময় আমরা যে রকম খাটাই শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সেই অনুপাতে তাহাকে রাষ্ট্রব্যবস্থা হইতে প্রায় তাড়াইয়াই আড়ালে রাখি এবং রোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর দিকে লোককে নিঃশব্দে আগাইয়া দিই।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার মুখে বহুবিধ লোকের মিলিত সাধনা রহিয়াছে। এই মিলন দেশপাত্র ভুলিয়া শুধু জানিবার কৌতূহলের বলে গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির সংঘর্ষের মাঝে বিজ্ঞানের মিলন যে জগতের সম্প্রীতির পথে আমাদের অনেক ধাপ আগাইয়া দিয়াছে তাহা খুব স্পষ্ট হয় নাই। মানুষের সভ্যতা যেমন জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে সেইভাবে মানুষের জ্ঞানের স্বাধীন মিলনই সভ্যতার সঙ্কটকে দূরে রাখিতে পারিবে।

ভারতে বিজ্ঞান সাধনার গতি অতি শ্লথ। জ্ঞানীর জাগতিক প্রয়োজন অতি অল্প.....এই বোধেই মনে হয় যে, যে অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন সেই রকম ব্যবস্থা বিজ্ঞানের ছাত্র পায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোনক্রমে কাঠামো বজায়

জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা বলে ...

সামুদ্রিকরত্ন, এম্-আর্-এ-এস্ (লণ্ডন) ; বিশ্ববিখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট মহোদয় যুদ্ধারম্ভকালীন মহামান্য ভারতসম্রাট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা করিয়া এই ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন যে

"বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।"

উক্ত ভবিষ্যবাণী মহামান্য ভারতসম্রাট মহোদয়কে ও ভারতের গভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। তাঁহারা যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮× ×-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-ও-৩৯-টি নং চিঠিসমূহ দ্বারা উহাদের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই ভবিষ্যবাণী সফল হওয়ায় ইঁহার নির্ভুল গণনা, অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির আরও একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল।

এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ স্বাধীন রাজ্যের নরপতিগণ এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা—**ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর** প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিভূরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ—যিনি এই ভয়াবহ যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবসেইমাত্র ৪ ঘণ্টা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভের ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন এবং আঠারজন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শদাতারূপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

ইঁহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী ভারতীয় পণ্ডিত-মহামণ্ডলের সভায় প্রভাবান্বিত হইয়া একমাত্র ইঁহাকেই **"জ্যোতিষশিরোমণি"** উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল :

হিজ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন—"পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—মুগ্ধ ও বিস্মিত।" হার্ হাইনেস্ মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন—"তান্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—"শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব।" সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—"পণ্ডিতজীর ভবিষ্যবাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন—"তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।" বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কত বলেন—"পণ্ডিতজীর গণনা ও তান্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব এস, এম্, দাস বলেন—"তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।" ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন—"শ্রীমান রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইঁহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা।" উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন—"আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।" বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্যার সি. মাধবন্ নায়ার কে-টি বলেন—"পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।" চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন—"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যাজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।" জাপানের ওসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—"আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজার জন্য ৭৫্ পাঠাইলাম।"

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারাণ্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—ধনপতি কুবের ইঁহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য ঐশ্বর্য, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রী লাভ করেন। (তন্ত্রোক্ত) মূল্য ৭।৶৹। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯।৶৹, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য। **বগলামুখী কবচ**—শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সুফললাভ, আকস্মিক সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কর্ম্মোন্নতিলাভে ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য ৯৶৹, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪৶৹ (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন)। **বশীকরণ কবচ** ধারণে সবাই বশীভূত ও স্বকার্য সাধনযোগ্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১১।৹, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪৶৹। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১০৫ (গ্র) গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস" (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫

সাক্ষাতের সময়—প্রাতে ৮।৹টা হইতে ১১।৹টা। ব্রাঞ্চ অফিস—৪৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা

ফোন : কলিঃ ৫৭৪২। সময়—বৈকাল ৫।৹টা হইতে ৭।৹। লণ্ডন অফিস :—মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েষ্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন

রাখিতে পারিয়াছে কিন্তু দেশের শিল্পনেতারা বা রাষ্ট্রনেতারা দেশের কল্যাণে বিজ্ঞানের দাম যে কিছু আছে এবং হইতে পারে তাহা ভাবেন নাই। বিদেশীর অনুকরণে বিদেশ হইতে সাজসরঞ্জাম আনিয়া 'দেশী' ছাপে মাল বিকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন শিল্পপতিরা এবং তাঁহাদের এই ভঙ্গুর ব্যবস্থার স্থিতি ও "উন্নতি" কল্পে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ কর (protective tax) বসাইয়া রাষ্ট্রনেতারা কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

বিদেশে যেমন রাষ্ট্রের অর্থানুকূল্যে গবেষণার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে, শিল্পপতিরাও তাঁহাদের নিজ নিজ শিল্পের উৎকর্ষের জন্ত নিজস্ব কেন্দ্র বা সমধর্মীরা একত্র হইয়া এক কেন্দ্রীয় গবেষণাগার তৈয়ারী করিয়া লইয়াছেন। এ ছাড়া কোন ধনী সাধারণ গবেষণার জন্ত (অর্থাৎ কোন বিশেষ শিল্পদ্রব্যের উদ্দেশ্যে নহে) বিপুল ব্যয়ে বিজ্ঞানচর্চ্চার আয়োজন করিয়া সেই দেশের বিজ্ঞানীদের জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ দিয়াছেন। নূতন শিল্পও সেই সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতের শাসনব্যবস্থা জটিল—প্রাদেশিক ঈর্ষা, সম্প্রদায়গত হীনবুদ্ধি, কেন্দ্রীয় সরকারের জোড়াতালি—এই সব প্রতিকূল ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের নিরঙ্কুশ যাত্রা সম্ভব নয়। বিলাত হইতে রয়েল সোসাইটির সম্পাদক ও পার্লামেন্টের সভ্য অধ্যাপক হিলকে ভারত-সরকার আমাদের দেশের বিজ্ঞানের সাধনাকে কাজে লাগাইয়া মধ্যযুগীয় ভারতকে কতকটা আধুনিক করিবার প্রয়াসে উপায় নির্দ্ধারণের জন্ত আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার আগে অবশ্য সরকারী দপ্তরে স্যার এস. এস. ভাটনগরকে ডিরেক্টর করিয়া এক গবেষণার বোর্ড তৈয়ারী হইয়া যুদ্ধের টুকিটাকি তাগিদ মিটাইবার জন্ত কাজ করিতেছিল। এই বোর্ডের কার্য্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাহার গঠনতন্ত্র সামরিক প্রয়োজনে রচিত হইয়াছিল। হিল সাহেব বড়লাটের সভার সভ্য আর এক জন বাড়াইয়া সেই আসনে বিজ্ঞানের এক পুরোহিতকে বসাইবার পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় এবং রাজস্বের শতকরা এক ভাগ ব্যয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। রাষ্ট্রব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে মর্য্যাদা যদি বিজ্ঞানকে পাইতে হয় তাহা হইলে খালি সরকারী আওতায় ২০০।২৫০ বিজ্ঞান-কর্ম্মীর কাজের সৃষ্টি করিলেই চলিবে না, দেশময় যেখানে বিজ্ঞানের গবেষণা হয় বা হইতে পারে এবং যেখানে বিজ্ঞানের স্থান হয় নাই বা প্রয়োজনটা আতিশয্য বলিয়া মনে হইয়াছে কিন্তু হওয়া অতি প্রয়োজনীয় সেই সব ক্ষেত্রে তদারক ও অর্থপুষ্টি করিবার ব্যবস্থা আগে দরকার। আমরা বিজ্ঞানের চর্চ্চার কেন্দ্র কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। কৃষি বিভাগে শিল্পকেন্দ্র, স্বাস্থ্য (কেবল রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা নয়, রোগের কারণ উচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা) বিভাগ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রাস্তা-ঘাট দেশরক্ষা, ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্রেই আমাদের

মধ্যে এখনও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ফুটিয়া উঠে নাই। ১৮৯০।৯৫ সালে যে ব্যবস্থা ও আয়োজন ছিল সেই ব্যবস্থা বজায় রাখাই যেন ১৯৪৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কর্ম্মলিপ্ত বিজ্ঞানীদের কাজ। আপিস ও ফাইল লইয়া বিজ্ঞানচর্চ্চার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে এবং সেইজন্যই সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাগণ কোন ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিক 'অকেজো' বিভাগে ছাঁটাই করেন। একদিকে যেমন অর্থকৃচ্ছ্র তার জন্য উদ্যম ও উৎসাহ নিবিয়া যায় আর একদিকে যেটুকু অর্থ সরকার বাহাদুর জোগান তাহারও কোন ফল দর্শায় না বলিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর শোচনীয় দশা দেখি এই দুর্ভাগা ভারতবর্ষে।

সরকারী দপ্তরে বর্ত্তমানে বিজ্ঞানকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেশের উন্নতিতে নিয়োগ করা যায় কিনা সেই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। কোন কেন্দ্রীয় পরিষদের পক্ষে সর্ব্বভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য হইবে না। আবার প্রাদেশিক ভিত্তিতে বিজ্ঞানের প্রসার সম্ভব নহে। অনেক ব্যাপারের মূলনীতি ঠিক করিতে হইবে অবিভাজ্য ভারত হিসাবে, কিন্তু তাহার প্রয়োগকালে ব্যবস্থার তারতম্য করিতে হইবে প্রদেশের বিজ্ঞানীদের। গবেষণার কেন্দ্র প্রদেশে প্রদেশে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সবজান্তা সিভিল সার্ভিসের ছায়া যাহাতে বিজ্ঞানের আলোককে ঢাকিয়া রাখিতে না পারে সেইজন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে বিজ্ঞানীর পরামর্শকে ভিত্তি করিয়া কাজ করিতে হইবে। শতকরা ১ টাকা হিসাবে প্রথম দিকে মোট রাজস্ব হইতে বিজ্ঞানের জন্য বরাদ্দের কথা ছিল--- সাহেব বলিয়া গিয়াছেন এবং সিভিল সার্ভিসের বার মাসের আর্থিক অনটনের চাপের ভিতরে যেন বিজ্ঞানের জন্য এই সামান্য অর্থের ব্যবস্থাটা না মারা পড়ে। দেশকে যদি গড়িতে হয় তাহা হইলে নূতন দৃষ্টি লইয়া কাজে নামিতে হইবে। সেই দৃষ্টির অভাব আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেদের চোখেও। প্ল্যানিং বা ডেভেলপমেন্ট এই নামে বিভাগ খুলিয়া অতি অর্ব্বাচীন বা অজ্ঞ লোকের হাতে সামান্য টাকা দিয়া খানকয়েক রিপোর্ট লিখিয়া সুদিনের আশায় বসিয়া আছি। কিন্তু সুদিন যে গড়াইয়া যাইতেছে তাহা দেখিতে পাইতেছি না। বিলাত হইতে কল কিনিয়া চিমনি বসাইয়া দেশে টাকা রোজগার করিলে যখন রাজস্ব বাড়িবে তখন বিজ্ঞানের "ন্যায়-সঙ্গত" মর্য্যাদা দিব এই ভাবে আমরা বিভোর হইয়া আছি।

অধিকার ভেদ এবং মর্য্যাদাবোধ আমাদের মনোজগতে নাই। টাকার কুমীর সর্ব্ববিদ্যার ছাপ লইয়া বসিয়া আছে, কারণ তাহার টাকার জোরে অনেক পণ্ডিতকে সে কাজে লাগাইতে পারে। বর্ষার নদীকে অর্থের বিনিময়ে লোক খাটাইয়া বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু সেই জলের তোড়ে শক্তি উৎপাদন করা বা জল দিয়া পাশের অনুর্ব্বর জমিকে চাষের উপযোগী করিয়া তোলা জ্ঞানের অধিকারীর কর্ম্মস্থল। বিজ্ঞানীকে মর্য্যাদা আমরা দিতে পারি নাই এবং তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রেও ঢুকিতে দিই নাই। বিজ্ঞানের চর্চ্চাকে নিভৃত চিন্তার সামিল বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি এবং দেশের কাজে বিজ্ঞানীর কাজ প্রয়োজনীয় বলিয়া ভাবি নাই। আজ আমেরিকার নদীর জলের ঐশ্বর্য্যসম্ভার (টেনিসি ভ্যালি অথরিটির কার্য্যকলাপ) দেখিয়া বিজ্ঞানীর খোঁজ করিতে যাই বাহিরে। আমাদের দেশের লোকের সংখ্যানুপাতে শিক্ষক নাই, চিকিৎসক নাই, তাই উপযুক্ত সংখ্যক ও কর্ম্মকুশল বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর কথা ত ভাবিতেই পারি না। বিরাট্ আকাশের নক্ষত্র-খচিত রূপ আমাদের সামনে নাই। কয়েকটি ধূমকেতুর আলোকচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছি এই আলো ম্লান হইয়া যাইতেছে কেন। বিদেশের মানুষ বৈজ্ঞানিকের মেলা বসাইতে পারিল কেমন করিয়া? সভ্যতার শীর্ষে আমরা ছিলাম আর আজ সভ্যতার সরঞ্জাম জোগাড় করিবার জন্য বিদেশে ছুটিতে হইতেছে। সামান্য জ্ঞানের ভাণ্ডারটাও ভরিয়া রাখিতে পারি নাই।

অনিন্দ্য
অলকের
আকর্ষণ
কেশতৈল
অনুরূপা কেমিক্যাল :: কলিকাতা

পুস্তক-পরিচয়

লুপুংগুটু—শ্রীননীমাধব চৌধুরী। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

লুপুংগুটু গল্পের বই। নয়টি ছোট গল্প ইহাতে আছে। প্রথম গল্পটির নামে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। নামটি একটু অদ্ভুত ধরণের। কোল ভাষায় 'গুটু'র অর্থ গ্রাম। লুপুংগুটু চাইবাসার নিকটবর্ত্তী একটি কোলপল্লীর নাম। দাদার বিবাহের পর ছুটিতে বৌদিদির সঙ্গে খেলু অর্থাৎ তাহার ক্ষুদ্র দেবরটিও সিংভূমে বেড়াইতে গিয়াছিল। গল্পের মধ্যে এই প্রথরবুদ্ধি সরল কৌতুকপ্রিয় শিশুপ্রকৃতি বালকটি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ননীমাধব বাবুর প্রবন্ধ অনেকেই পড়িয়াছেন। কিন্তু সে সব রচনা তাঁহাকে বৈদিক গবেষকরূপেই পরিচিত করিয়াছে। কেহ কেহ তাঁহাকে মোপাসাঁ ও রুশোর অনুবাদক বলিয়াও জানেন। কিন্তু তাঁহার গল্পের হাত যে কত মিষ্ট এই বইখানি না পড়িলে তাহা বুঝা যাইবে না। সবগুলি গল্পই প্রায় চৌদ্দ পনের বৎসর পূর্ব্বে রচিত। অনেকগুলি লেখা অধুনালুপ্ত "ছোট গল্পে" প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রবাসী"তে প্রকাশিত "কীর্ত্তিনারায়ণ" গল্পটিতে প্রাচীন জমিদার বংশের অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই ধরণের রচনায় ইহা অগ্রদূত বলিলেও চলে। "সুমতি", "বয়োধিকা", "সত্যানুসন্ধান", "যুগপ্রবর্ত্তক" প্রভৃতি গল্পে লেখকের ব্যঙ্গবিদ্রূপের ক্ষমতাও প্রকাশিত হইয়াছে। শেষ গল্প "কনকলেখা"র লেখক হিন্দুযুগের একটি ছবি আঁকিয়াছেন, রচনাভঙ্গীর মধ্য দিয়াও সে যুগের স্বাদগন্ধ পাওয়া যায়। গল্পগুলি মোটেই গতানুগতিক নয়। কল্পনার বৈচিত্র্যে এবং রচনাভঙ্গীর অভিনবত্বে "লুপুংগুটু"র গল্পগুলি বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। "লুপুংগুটু" ছোটগল্পলেখক হিসাবে গ্রন্থকারকে উচ্চাসনে আসীন করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নিশার স্বপন—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা। শ্রীকালী প্রকাশালয়, ১৪ বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা, পৃ ১৯৫।

লেখক ইহার পূর্ব্বে আরও দুইখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন,—ইহা তাঁহার তৃতীয় উপন্যাস। আশা করিয়াছিলাম পাকা হাতের রসঘন কাহিনী পড়িয়া আনন্দলাভ করিব, কিন্তু বইখানি পড়িয়া নিরাশ হইতে হইয়াছে। উপন্যাসের ঘটনা-কাল বিগত তেরশ পঞ্চাশ সাল, পটভূমি বাংলার পল্লী, বিশিষ্ট চরিত্র—গ্রামের সেবাব্রতী তরুণ সম্প্রদায়, ধ্বংসোন্মুখ জমিদার ও তাঁর ভাগিনেয়ী,—হালের বড়লোক মিলিটারী কনট্রাক্টর প্রভৃতি। কাহিনীকে চিত্তাকর্ষক করিবার যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও লেখক

রসসৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ভাষা দুর্ব্বল। বানান ভুল অজস্র,—যথা—রাশিকৃত, দারিদ্র, স্বাতন্ত্র, বক্তব্য, উপর্যোপরি,—ইত্যাদি।

বন্ধনহীন গ্রন্থি—শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত। দেবশ্রী সাহিত্য সমিতি। ১১ এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

লেখক নবীন। কাহিনী-গ্রন্থনে বা প্রকাশ-ভঙ্গীতে নিজস্ব একটি রীতি এখনও তাঁর আয়ত্ত হয় নাই। শরৎচন্দ্রের রচনা-রীতির দ্বারা তিনি অত্যধিক প্রভাবিত। তথাপি ছোট ছোট ঘটনাগুলি বিশেষভাবে দেখিবার দৃষ্টি তাঁর আছে। লেখার মধ্যে দরদ এবং মনস্তত্ব বিশ্লেষণের প্রয়াস আছে, টাইপ সৃষ্টির চেষ্টাও প্রশংসনীয়। জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার সঙ্গে এগুলি যুক্ত হইলে তিনি যশ অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

সপ্তস্বরা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গল্পগুলি ভারতী মাসিক পত্রিকায় ১৩০৩ হইতে ১৩১১ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার পাঠক-সমাজে এগুলি যে ভাবেই সমাদৃত হউক—পড়িতে বসিয়া আজিকার দিনেও রীতিমত বিস্ময় লাগে। কোন গল্প ভাবের অভিনবত্বে—কোনটি বা বাচন-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে ও মাধুর্য্যে বাংলা কথা-সাহিত্যের এক প্রান্ত উজ্জ্বল করিয়া আছে। এ কালের মন লইয়া সে কালের কথা-সাহিত্যের বিচার সহজ-সাধ্য নহে, কিন্তু অধিকাংশ গল্পই যে রসোত্তীর্ণ একথা অস্বীকার করা চলে না। এই রচনাগুলির মধ্যে লেখক বহুকাল জীবিত থাকিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

এশিয়ার নবজাগরণ—সুধাংশু সাহিত্য মন্দির। ১০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৫২, মূল্য ১।০।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের জাগরণের কথা বলিতে গিয়া আলোচ্য পুস্তকে স্বদেশের তরুণগণকে এই জাগরণে সাড়া দিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। এই পুস্তক বিক্রয়ের লভ্যাংশ সমস্তই আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহায্য-ভাণ্ডারে দেওয়া হইবে।

বাংলার কুটীর-শিল্প—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৮৮, মূল্য ।৶০।

'জ্ঞান-ভারতী' গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। পৃথিবীতে যন্ত্রের যুগ চলিয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় বাংলাদেশ আজও বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। কোন কোন শহরে আধুনিক যন্ত্রযুগের কারখানা চলিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিরাট্ দেশের অগণিত পল্লীতে জনসাধারণ দারিদ্র্য, দুঃখ, অভাব, অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতার মধ্যে কালযাপন করিতেছে। অথচ ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাংলা দেশ শিল্পীর দেশ ছিল। অবশ্য যে শিল্প তখন ছিল তাহা কুটীর বা গৃহ-শিল্প। পাশ্চাত্ত্যের যন্ত্রশিল্প যে শিল্প-বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্লাবনে এ দেশের কেন, পৃথিবীর সব দেশের গৃহ-শিল্প ভাসিয়া গিয়াছে। একমাত্র জাপানই আধুনিক বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠার সহিত গৃহ-শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আংশিক ভাবে সফল হইয়াছে। এই গরীব দেশে জাতিকে বাঁচাইতে হইলে গৃহ-শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা যে আবশ্যক তাহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না দেশের লোকের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইবে ততদিন গৃহ-শিল্পের পুনরুত্থান সম্ভব নহে। দেশকে ভালবাসিলে উহার শিল্প ও শিল্পীকে ভালবাসিতে হয়, লেখক ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বস্ত্র-শিল্প, শর্করা-শিল্প, ধাতু-শিল্প, মৃৎ-শিল্প, কাগজ-শিল্প, দারু-শিল্প, লবণ-শিল্প, চর্ম্ম-শিল্প, ও অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প যথা

পাটি, বাঁশ, বেত, সোনার জিনিষ, হুকা-কল্কে প্রভৃতির কথা, টোল ও হাতার বাট ও মিষ্টান্ন প্রভৃতির কথা লেখক সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। লেখক সঙ্কীর্ণ অর্থে 'শিল্প' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি বলিতে চান যে, বাংলার কুটীর-শিল্প এতদিন প্রকৃতই বাঙালীর অভাব পূরণ করিত এবং চাহিদার যোগান দিত। আজ বাঙালী তাহার কুটীরজাত স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি দরদ হারাইয়াছে, বিশেষ ভাবে পাশ্চাত্ত্যের পণ্যসম্ভার-মোহে মজিয়াছে। বিদেশী শাসিত রক্ষণ-শুল্ক বর্জ্জিত দেশে একমাত্র দেশের লোকের দরদ ও নিষ্ঠাই স্বদেশী কুটীর শিল্পের জীবনদান করিতে পারে। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মহাপরিনিব্বান সুত্তং—রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্নমহাস্থবির বিনয় বিশারদ সঙ্কলিত ও অনূদিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমৎ প্রিয়দর্শী ভিক্ষু, সদ্ধর্ম্মোদয় পালি টোল, রাজানগর, পোঃ আঃ রাজাভুবন, চট্টগ্রাম। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থে বঙ্গাক্ষরে মহাপরিনিব্বান সুত্তের পালি মূল ও টীকা-টিপ্পনী-সহ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরেজী, সিংহলী ও বর্মী-অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক হইতে পাঠান্তর পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনুবাদ সুবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে পাদটীকায় ও পরিশিষ্টে পারিভাষিক শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক উপাখ্যানাদি দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য দার্শনিক-তত্ত্ববহুল গ্রন্থ কখনও সাধারণ গ্রন্থের মত সরল ও সহজবোধ্য হইতে পারে না; তথাপি আলোচ্য গ্রন্থের ভাষার মধ্যে মধ্যে যে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইল তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। আশা করি, অনুবাদক মহাশয় ভবিষ্যতে এদিকে একটু দৃষ্টি রাখিলে এই জাতীয় গ্রন্থের দ্বারা বাংলার সাহিত্য-ভাণ্ডার প্রকৃত পুষ্টিলাভ করিবে।

সত্য বটে, কিছু কিছু বৌদ্ধগ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু বিশাল বৌদ্ধ-সাহিত্যের অধিকাংশই এখনও বাঙালী পাঠকের নিকট অপরিচিত। শুধু ব্যক্তিগত বিক্ষিপ্ত প্রয়াসে এই অভাব সহজে ও শীঘ্র দূরীভূত হইবার আশা নাই—এজন্য চাই সংঘবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত ব্যাপক প্রচেষ্টা।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ—শ্রীসুনীলচন্দ্র বিশী ও শ্রীঅসিত-কুমার রায়। প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী। সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭ পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য ১।• টাকা।

নির্জ্ঞান মনের রহস্য আবিষ্কার বর্ত্তমান জগতের অন্যতম প্রধান যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক বিষয়। ইহা মনোবিজ্ঞান এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। ইহার আবিষ্কর্ত্তা ফ্রয়েড চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। নির্জ্ঞানে মানুষের মনের গহনে সুপ্ত পশু প্রবৃত্তির নগ্ন স্বরূপকে পরিপূর্ণ ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া তিনি অনেকেরই নিন্দাভাজন হইয়াছেন সত্য, কিন্তু একথাও খাঁকার্য্য যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার অনুগামীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে এবং তাঁহার মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত ও জয়যুক্ত হইতেছে। বাংলা-সাহিত্যে ফ্রয়েড-প্রবর্ত্তিত মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনাকারীদের মধ্যে ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু, ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র প্রধান। তাঁহারা এ সম্বন্ধে বাংলাভাষায় দু-একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে সাধারণ পাঠকের উপযোগী আরো পুস্তকাদি রচিত হওয়া আবশ্যক। সুখের বিষয় বিজ্ঞান-বিভাগের কোনো কোনো ছাত্রও সম্প্রতি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমালোচ্য পুস্তকখানি ডক্টর ক্লিফোর্ড এ্যালেন এম, ডি প্রণীত *Modern Discoveries in Medical Psychology* গ্রন্থের দুইটি অধ্যায়ের (চতুর্থ ও পঞ্চম) অনুবাদ। ইহাতে ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত মনঃসমীক্ষণ, কামশক্তির স্বরূপ সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্য, স্বপ্নবিশ্লেষণ, ভুল-ভ্রান্তি, রসিকতা, মানসিক রোগ-লক্ষণ প্রভৃতির প্রকৃত অর্থ ও মনঃসমীক্ষকদের আবিষ্কৃত বিবিধ তথ্য—এক কথায় মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে মোটামুটি প্রায় সকল তথ্যই সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এই দুরূহ এবং জটিল বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ দুটির অনুবাদ এত সহজ, সরল ও স্বচ্ছন্দ হইয়াছে যে, সাধারণ পাঠকেরও অনায়াসে বিষয়-জ্ঞান হইবে। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে ফ্রয়েডের জীবন-কথাও সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ফ্রয়েডের একটি রেখা-চিত্র এই পুস্তকের সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছে এবং ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্রের সুলিখিত ভূমিকাটি এর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। পরিশিষ্টে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষার একটি নির্ঘণ্ট দেওয়ায় পুস্তকখানি পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। মুদ্রণ-পারিপাট্য এবং বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচন ইত্যাদি নানা দিক দিয়া 'বাংলা বর্ণলিপি'র প্রকাশক সংস্কৃতি বৈঠক বাংলাদেশে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন।

ইতালীর সেরা গল্প—অনুবাদক শ্রী[illegible]কুমার বসু। বুক ষ্ট্যাণ্ড, ১।১.১এ, বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।• টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যের একটি শুভ লক্ষণ এই যে ইহার অনুবাদ বিভাগ দিন দিন সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিতেছে। ফলে ইংরেজী অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের পক্ষে মাতৃভাষার সাহায্যেই বিশ্ব সাহিত্যের বহু অমূল্য গ্রন্থের রসাস্বাদন করিবার সুযোগ হইয়াছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে ইংরেজী ছাড়া ফরাসী, রুশীয় এবং নরওয়েজীয়ান কথা-সাহিত্যের সহিতই আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। মোপাসাঁর গল্প, টলষ্টয় ও গোর্কির উপন্যাস, টুর্গেনিভের গল্প,
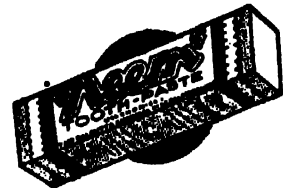
হুট হামস্থনের উপন্যাস ইত্যাদি সম্বন্ধে বাংলা সাময়িক পত্রাদিতে আলোচনা হইয়াছে প্রচুর এবং ঐ সকল লেখকের রচনার কিছু কিছু অনুবাদও হইয়াছে। সে তুলনায় ইতালীয় সাহিত্যের সহিত আমাদের পরিচয় তত গভীর নয়, অথচ দুনিয়ার সাহিত্য ও শিল্পকলার ভাণ্ডারে ইতালীর অবদান উপেক্ষণীয় নয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বসু ইতালীর কথা-সাহিত্যের একটা দিকের সহিত বাঙালী পাঠক-সাধারণের পরিচয় সাধন করাইবার জন্য যে কয়টি গল্প অনুবাদ করিয়াছেন সেগুলি শুধু ইতালীর কেন, বিশ্ব-সাহিত্যের সেরা গল্পের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। রবীন্দ্রবাবু নিজে শিল্পী এবং সাহিত্য-রসিক বলিয়া এই গল্প-সঞ্চয়নে নিখুঁত নির্ব্বাচন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সব কয়টি গল্পই মনে গভীর রেখাপাত করে এবং মানুষের মন যে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক সে-কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিদেশীয় সাহিত্যের আকর হইতে রত্নরাজি আহরণপূর্ব্বক মাল্যাকারে গ্রথিত করিয়া লেখক বঙ্গবাণীর গলায় পরাইয়া দিয়াছেন। এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গল্প জননৎসিওর (ডেনানথসিও নহে) 'ক্যানডিয়ার শেষ পরিণতি' যেন এই মণিহারে মধ্যমণির মত দোদুল্যমান।

আজকাল অনেক অনুবাদ-গ্রন্থে দেখিতে পাই, অনুবাদকের নামের আড়ালে আসল লেখক চাপা পড়িয়া যান। অনুবাদকের নাম মূল গ্রন্থের লেখকরূপে যেন পুস্তকের মলাটে এবং ললাটে নির্লজ্জভাবে জল জল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া পাঠককে বিভ্রান্ত করে। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু পরের মালকে নিজের বলিয়া চালাইবার এ অপকৌশল অবলম্বন করেন নাই। টাইটেল পেজে নিজের নামের আগে অনুবাদক কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

নেতাজী—শ্রীগোপাল ভৌমিক। শ্রী পাবলিশিং কোং, ২০৩,৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৪ পৃষ্ঠা. মূল্য ২৲।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজীর সম্বন্ধে অসংখ্য বই বাজারে বাহির হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবনের ঘটনাবলী-সম্বলিত সুলিখিত ও সুচিন্তিত বই বাংলাভাষায় দু-একখানির বেশী চোখে পড়ে না। বহু আয়াস ও শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক একখানি নির্ভরযোগ্য তথ্যপূর্ণ সুভাষ-জীবনী রচনা করিয়া গ্রন্থকার সত্যই আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। জন্ম হইতে তিরোধান পর্য্যন্ত নেতাজীর আদ্যোপান্ত জীবন-কাহিনীর প্রায় সমস্ত উপাদানই লেখক একত্র সংগৃহীত করিয়াছেন, তদুপরি তাঁহার জীবনের সাধনা ও মূলনীতি, তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ ও পন্থা বিশ্লেষণ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা-অর্জ্জনের পথে তাঁহার অবদানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার একজন সুকবি ও সুলেখক, সাংবাদিক মহলে তাঁহার নাম আছে, সুতরাং তাঁহার লিখিত জীবনীখানি যে সাধারণ পাঠক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ্ প্রভৃতি সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে ইহা আশা করা যায়। নেতাজীর কয়েকখানি সুন্দর প্রতিকৃতি পুস্তকের শোভা-বর্দ্ধন করিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে নেতাজীর সর্ব্বাধিনায়ক বেশে

সুপরিচিত একখানি আবক্ষ ও একখানি পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্ত্তি পুস্তকের কোথাও চোখে পড়িল না, এই হিসাবে গ্রন্থখানি বিষম ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছে বলিতে হইবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১.০।

যদি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে রাশীকৃত পুস্তকের মধ্যে এমন একখানির নাম করিতে বলা যায়, যাহা প্রত্যক্ষদর্শনের ফলে জীবন্ত ও প্রাণবান, সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা ও বিশ্লেষণের গুণে ধারাল মন্তব্যে পূর্ণ, মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনে অকুণ্ঠ ও মুক্তকণ্ঠ, তবে দেশবন্ধু ও যতীন্দ্রমোহনের প্রিয় শিষ্য সুভাষপন্থীর বিরুদ্ধবাদী কংগ্রেসকর্ম্মী কর্ত্তৃক লিখিত এই পুস্তকখানির নাম করিতে হইবে। লেখক সুদীর্ঘকাল সুভাষচন্দ্রের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ও অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নেতাজীর চরিত্র ষ্টাডি বা অধ্যয়ন করিবার পক্ষে প্রচুর সুযোগ ঘটিয়াছিল, বস্তুতঃ তাঁহার নিরপেক্ষ লেখনীর মুখে সুভাষ-চরিত্রের নানা বিভিন্ন দিক সুস্পষ্ট ও সুব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানি পড়িতে দেশের চিন্তাশীল ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন পাঠকমাত্রকেই অনুরোধ করিতেছি।

বাংলার মা ও বোনেদের প্রতি—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। প্রকাশক—ভারত সম্পদশ্রী লিঃ, ১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

নেতাজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ উক্ত নামে বেণু পত্রিকায় ১৩৩৭ সালের বৈশাখে প্রকাশিত হইয়া ছিল। গ্রন্থকার নানা টীকা-টীপ্পনী সংযোগে ঐ প্রবন্ধটির ব্যাখ্যাপূর্ব্বক সমগ্র প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন, পরিশিষ্টে বাংলার তরুণী ছাত্রী ও জননীদের উদ্দেশ্যে তাঁহার রচিত নানা পুস্তক হইতে তাঁহার বিভিন্ন বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন। তরুণ বাংলার ছাত্র ও ছাত্রী সমাজের মুখপাত্র ও দুর্দ্দান্ত বিপ্লবী যৌবনের প্রতীক সুভাষচন্দ্রের প্রত্যেক রচনাই এখন বেদাক্ষর জ্ঞানে তরুণ বাংলার অবশ্যপাঠ্য। বিশেষতঃ নারীবাহিনী ও নারীকর্ম্মী সংগঠনে তাঁহার উপদেশ অবশ্য গ্রহণীয়। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় ঝাঁসীর রাণীবাহিনীর কুমারী বেলা দত্ত, রেবা, সিপ্রা, মায়া গাঙ্গুলী ও লক্ষ্মী স্বামীনাথনের মত বীরাঙ্গনাগণ ভারত-জননীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

ঝাঁসীর রাণী-বাহিনী—শ্রীকালিদাস ঘোষাল। ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং, ১০৫ কটন ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ৪৲

ঝাঁসীর রাণী-বাহিনীভুক্ত একজন নারী-সেবিকা ও সৈনিকের ডায়েরী বা দিনলিপি—উপন্যাস অপেক্ষা রোমাঞ্চকর—আজাদ হিন্দ ফৌজের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকাহিনীর বর্ণনায় নাটকের মত চমকপ্রদ—ভারতের মুক্তি-কামনায় উদ্বুদ্ধ সিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়গণের উন্মাদনা ও উদ্দীপনাপূর্ণ দিনগুলি ইহাতে অসামান্য নৈপুণ্যের সহিত ডায়েরীর আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্যানুগত্য ও পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া কবিত্বপূর্ণ ভাব ও ভাষার রঙীন মনোহর সূত্রে গাঁথিয়া গ্রন্থকার প্রত্যক্ষদর্শী নারী-সৈনিকের এই অনবদ্য রোজনামচার ডালি সাজাইয়াছেন, প্রচুর চিত্র ইহার বাহ্যশোভা অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়াছে। মূল্য কিছু কম করিলে ইহার অধিক প্রচার হইত।

আজাদ হিন্দ ফৌজ—শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ রায় ও পরিতোষ ধর। ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং, ১০৫ কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

ইহাতে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু তথ্য ও সংবাদ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবে। অনেকগুলি ফটো ও প্রতিলিপি পুস্তকের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

সর্ব্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র—শ্রীফণিভূষণ রায় ও মণি বাগচি। বুকষ্টাণ্ড ১১১১-এ বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৷০।

উচ্চাঙ্গের শিল্পী-পরিকল্পিত এই গ্রন্থের মলাটের সৌন্দর্য্য প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ইহার মুদ্রণ-পারিপাট্য ও আভিজাত্য পাঠকের দ্বিতীয় লক্ষণীয় বস্তু। পরিশেষে ইহার শ্রদ্ধাঞ্জলিপুত, উচ্ছ্বসিত অথচ সংযত লিপিকুশলতা পাঠককে সচকল ও ভাবোদ্বেলিত করিবে। প্রথমে সংক্ষেপে সুভাষচন্দ্রের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া পরে তাঁহার শেষজীবনের কীর্ত্তিস্তম্ভ আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠনে সর্ব্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গীন কর্ম্মকুশলতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'এদের নমস্কার' অধ্যায়ে ক্যাপ্টেন মোহন সিং, রাস-বিহারী বসু, শা নওয়াজ, সেহগল, ধীলন ও লক্ষ্মী স্বামীনাথন, বেলা দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট নায়কনায়িকাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শেষ অধ্যায়ে সুভাষচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রচারিত বাণী পুস্তকের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। মূল্য কিছু কম করিলে ভাল হইত।

নেতাজী—শ্রীশৈলেশ বিশী। প্রবর্ত্তক পাবলিসার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।৵০।

নেতাজীর জীবনের ঘটনাসকল নাটকীয় উপাদানে পূর্ণ, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে নাটকখানি রচনা করিয়া গ্রন্থকার মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। নাটকীয় সংলাপ, দৃশ্যসংস্থান, চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনাবিন্যাসে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। নাটকটি মঞ্চস্থ করিলে দর্শক-মহলে বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে, ইতিমধ্যে গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পাঠক তৃপ্তিলাভ করিবেন।

ছোটদের নেতাজী—শ্রীসত্যকুমার নাগ। চয়নিকা পাবলিশিং হাউস, ৪২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

ছোটদের জন্য লিখিত নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও পরিচালনা সম্বন্ধে দ্রুত সংক্ষিপ্ত রচনা।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা ও কথা—ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, মূল্য দশ পয়সা।

পুস্তিকাতে লক্ষ্মী-সঙ্গীত, পূজা-বিধি, ব্রতকথা, স্তবস্তুতি একাধারে থাকায় লক্ষ্মীভক্ত নরনারীর খুবই উপকারে লাগিবে।

চ.

দেশ-বিদেশের কথা

ভবানীচরণ লাহা

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ভবানীচরণ লাহা বিগত ১৭ই ভাদ্র ৬৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি যে শুধু একজন প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পীই ছিলেন তাহা নয়, তাঁহার ন্যায় রসজ্ঞ শিল্প-সমালোচক, বিভিন্ন শিল্পকলার সমঝদার পৃষ্ঠপোষকও বিরল। তিনি ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব ফাইন আর্টস, আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি একজিবিশন প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্ট ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল 'সোসাইটি অব ওরিয়েণ্ট্যাল আর্টস' ইত্যাদি নানা কলাশিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার গভীর যোগ ছিল। নিজের যোগ্যতার দরুন তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার অঙ্কিত বহু ছবি প্রকাশিত হইয়াছিল। তা' ছাড়া তিনি চিত্রকলাবিষয়ক একখানা উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীর পরোপকারবৃত্তিও ছিল প্রবল। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সক্রিয় সংস্রব ছিল।

ভাগীরথী শিল্পাশ্রম

গত পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় ভাগীরথী শিল্পাশ্রম নামক অনাথ আশ্রমটি কর্ণেল ডি. এন. ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্ত্তমানে এই আশ্রমে ১৬৮টি বালক-বালিকা প্রাথমিক শিক্ষার সহিত তাঁত, রেশমকীট পালন প্রভৃতি নানাবিধ কুটির-শিল্প শিক্ষালাভ করিতেছে। ভবিষ্যতে ঐরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক-বালিকাগণকে প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ী সমন্বিত জমিজমা দিয়া একটি আদর্শ গ্রাম গঠন করা এই আশ্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ভাগীরথী নদীর তীরে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ স্থানে, কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল দূরে বি. এ. রেলওয়ের শিমুরালী ষ্টেশন হইতে ১ মাইল ব্যবধানে ৩০/ বিঘা জমির উপর এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি এই আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে পিতৃমাতৃহীন এবং অসহায় হইয়া পড়িয়াছে এরূপ ২০।২৫টি (৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক) বালক-বালিকাকে আশ্রমে ভর্ত্তি করিয়া লইতে চাহেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহিলে আশ্রমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্তা লাবণ্যকণা বসুর সহিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

ভাগীরথী শিল্পাশ্রম, পোঃ শিমুরালী, নদীয়া।

পত্নী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সহ প্রমথ চৌধুরী
(ইঁহার সম্বন্ধে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য)

চিত্রপরিচয়

রামকিরী একটি রাগিণীবিশেষ। মতান্তরে ইহাকে রাম-কলীও বলা হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহার ধ্যান নিম্নলিখিতরূপ :—

হেমপ্রভা ভাস্বরভূষণা চ
নীলং নিচোলং বপুষা বহন্তী
কান্তে সমীপে কমনীয়কণ্ঠা
মানোন্নতা রামকিরী মতেয়ম্ ॥

অর্থাৎ হেমকান্তি দ্যুতিমণ্ডিত ভূষণধারিণী নীলবসনা কমনীয়কণ্ঠা মানোন্নতা রামকিরী কান্তসকাশে বিরাজমানা।

দামোদর মিশ্রকৃত সঙ্গীতদর্পণম্

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বুদ্ধদেবের জাতকর্ম্ম

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ধানক্ষেতের পাশ দিয়া পদব্রজে গান্ধীজীর গোপাইরবাগ যাত্রা

লাকসাম ষ্টেশনে সমবেত হিন্দু-মুসলমান জনতার সম্মুখে গান্ধীজী বক্তৃতা করিতেছেন

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৬শ ভাগ ২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র অবতারণায় আমরা লিখিয়াছিলাম, "অতীত ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করাই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, কেননা বাংলা, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান বাঙালীর বাসভূমি, যে পথে চলিয়াছে তাহাতে বাংলাদেশ থাকিতে পারে কিন্তু বাঙালীর অস্তিত্ব লোপ অসম্ভব নহে, এবং সে ঘটনা সুদূরভবিষ্যতে ঘটিবে এ কথা ভাবিয়া মনকে আশ্বাস দেওয়া চলে না।" লিখিবার সময় আমরা বুঝিয়াই লিখিয়াছিলাম যে বাঙালীর মরণ-বাঁচনের সন্ধিক্ষণ আসিতে খুব বেশী দেরি নাই, তবে ইহা সত্য যে আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই যে উহা আসন্নপ্রায়।

লীগ দলের কার্য্যক্রম হিটলার-মুসোলিনীর অক্ষশক্তির অনুকরণে পরিকল্পিত। মেকি ও সাচ্চার পার্থক্যের জন্য সকল প্রকার বাদসাদ দিয়াও যাহা থাকে তাহাও অতি ভয়ঙ্কর, কেননা, ঐ মেকির পিছনে আছে বিদেশীর তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি এবং সাম্রাজ্যবাদের পঞ্চাশ বৎসরের আয়োজন। লীগের অভিযান প্রতিরোধের জন্য কি ব্যবস্থা, কি আয়োজন আমাদের আছে তাহার বিচার অপ্রিয় হইলেও, করা প্রয়োজন হইয়াছে। বাংলার কর্ণধারগণ এতদিনে "নিজের দল ভারী করা" ও চক্রান্তকারী চেলা-চামুণ্ডার উদরপূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছু ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছেন কি? আমরা বুদ্ধিমান জাতি, কূটতর্ক ও মিথ্যা যুক্তির অবতারণায় আমরা সকলেই পঞ্চানন। তাহার সঙ্গে আছে স্কুলকলেজ বন্ধ করা, ষ্ট্রাইক, হরতাল ইত্যাদি যারা পিতামাতা ও কর্ম্মচালকদিগের পূর্ব্বজন্মের ঋণ পরিশোধের সহজ ব্যবস্থা, তাহাতেও যদি কিছু না হয় তবে আছে ভাবের উচ্ছ্বাস ও সর্ব্বশেষে আর্ত্তনাদ। স্বপক্ষের লোকের দোষত্রুটি—তাহা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক—প্রচার করিয়া, উঁচু মাথা নত করাইয়া, ও মিত্রকে শত্রুতে পরিণত করিয়া, সহজেই আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। এই ত সেদিন কত সহজে পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে প্রচুর মিথ্যার অভিযান চলিয়া গেল কিন্তু সে অভিযানের লাভ-লোকসান হিসাব করিল কে? "বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি" এ কথা বাঙালীর মাথায় ঢুকিবে কবে? বর্ত্তমানে আমাদের অবস্থা শঙ্কাপূর্ণ সুতরাং আক্ষেপে সময় নষ্ট করা বৃথা। এখনও যদি আমরা স্থির ভাবে কি কর্ত্তব্য কি উপায়, তাহা ভাবিতে না পারি তবে সর্ব্বনাশ। এতদিন আমরা কল্পনার রাজ্যে বিহার করিয়াছি, এখন বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসা নিতান্তই প্রয়োজন।

বাংলার হিন্দু-মুসলমান

বাংলার সীমানা লইয়া গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। গণপরিষদের অধিবেশন আসন্ন। উহা বর্ত্তমান প্রাদেশিক সীমারেখা মানিয়া লইয়া উহারই ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। এই সীমারেখাগুলি কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসারে অঙ্কিত হয় নাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসকদের সুবিধানুসারে উহার সৃষ্টি হইয়াছিল। কংগ্রেসের গঠন পরিকল্পনায় ব্রিটিশ ভারতের প্রথানুসারে প্রদেশ বিভাগ করা হয় নাই, উহা অনেকটা অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করা হইয়াছে।

ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাংলা এক ও অবিভক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাংলা অবিভক্ত রাখিবার বিরুদ্ধে দুইটি বৃহৎ যুক্তি দেখা যাইতেছে এবং কিছু দিন যাবৎ উহা প্রকাশ্যে আলোচিতও হইতেছে। প্রথমটি অন্ধ ধর্ম্মোন্মাদগত, দ্বিতীয়টি শাসনতান্ত্রিক। নোয়াখালীর ঘটনায় একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী মুসলমানদের শতকরা ৯০ জন ধর্ম্মান্তরিত মুসলমান ইহা স্বীকার করিলেও দেখা যাইতেছে হিন্দুবিদ্বেষ তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে প্রবলভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। বাংলায় মুসলমান আমলের ইতিহাস রিয়াজুস সালাতিন গ্রন্থে দেখা যায় দুই বার এখানে ব্যাপক ধর্ম্মান্তরকরণের চেষ্টা হইয়াছিল এবং এই দুই অভিযানেরই নায়ক ছিলেন ধর্ম্মান্তরিত হিন্দু সন্তান, এক জন রাজা গণেশের পুত্র সুলতান জালালুদ্দীন, অপর ব্যক্তি ব্রাহ্মণতনয় মুর্শিদকুলি খাঁ। মুসলমান সমাজে এখন যাহারা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে দুইটি জিনিষ সব চেয়ে বেশী লক্ষণীয়—প্রথম, পরধর্ম্মের প্রতি তাহার গভীর বিদ্বেষ; দ্বিতীয়, ভিন্ন ধর্ম্মের অপহৃতা নারীকে গৃহে আনয়ন করার আগ্রহ। মুসলমানেরা এদেশে আসিবার পর হইতেই হিন্দুর দেবমন্দির ও বিগ্রহের উপর আক্রমণ আরম্ভ হয়।

ইংরেজের প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পুনর্বার জাগিলে পরে এত দিন এদেশে মন্দির ভাঙাই চলিতেছিল, গত দুই মাসে উহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে দুই সম্প্রদায়েরই পরস্পরের ধর্মস্থানের উপর আঘাতে। প্রভেদ এই যে, পরিবারের কোন তরুণ কোন নারীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া ঘরে আনিয়া তুলিবে, বাঙালী হিন্দু ইহা কল্পনা করিতেও পারে না কিন্তু মুসলমান সমাজে ইহা স্বাভাবিক ঘটনা দাঁড়াইতেছে।

নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু অধিবাসীকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা হইয়াছে এবং বহু "বিশিষ্ট" মুসলমানও হিন্দু নারী অপহরণে সহায়তা করিয়াছে। নরহত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি অপেক্ষা এই দুই ঘটনাকেই আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি। পূর্ববর্ণিত ইতিহাস মনে রাখিলে ইহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করাও কঠিন হইবে না। বাংলার হিন্দুই শুধু মুসলমানকে ভাই বলিয়া মনে করিবে, তাহার সহিত রক্তের সম্পর্ক খুঁজিয়া লইয়া তাহাকে আপন ভাবিতে চাহিবে, আর মুসলমান শুধু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করিয়া স্বধর্ম বিস্তারের সুযোগ খুঁজিবে—এই মনোবৃত্তি বজায় থাকিতে দুই সম্প্রদায়ে মিলনের আশা সুদূরপরাহত। নোয়াখালির আঘাতেই বোধ হয় হিন্দু বাংলার ইতিহাসে প্রথম বার ভাবরাজ্য হইতে বাস্তবতার কঠিন ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। এই প্রথম সনাতন ব্রাহ্মণ সমাজ ধর্মান্তরিত হিন্দুকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্বধর্মে ফিরিবার অনুমতি দিলেন এবং বাংলার হিন্দু সমাজ অপহৃতা নারীকে নিজ নিজ পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিবার পথ খুলিয়া দিল। ধর্মান্তরকরণ ও নারীহরণ দ্বারা মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টার পথে এত দিনে কাঁটা পড়িল।

বাংলার জনবসতিতে নূতন সমস্যা

বাংলার হিন্দু মুসলমান পরস্পরের প্রতি এত বিদ্বেষ বুকে লইয়া বর্তমানে একসঙ্গে বাস করিতে পারিবে কি না তাহা বিশেষভাবে বিবেচনার বস্তু। ভাষা ও সংস্কৃতিতে সব বাঙালী এক ইহা ঠিক, কিন্তু ধর্মের নামে যে বিচ্ছেদ ও বিবাদ আজ দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কি অস্বীকার করা চলিবে? বিশ্বের মুসলমান সমাজে একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে আজও যেন ইঁহারা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছুক। বিংশ শতাব্দীতেও আমরা তুরস্ক, আরব, মিশর প্রভৃতি রাষ্ট্রকে বিশ্বসভায় পাঁচ জনের হইয়া বা দশ জনের স্বার্থ লইয়া কথা বলিতে দেখি না। এদেশের তো কথাই নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলমানেরা ইংরেজী বিদ্যালয় বর্জন করিলেন, ফল বিষময় হইল তাঁহাদেরই পক্ষে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরেও আজ মৌলবী ফজলুল হক অধ্যাপক জুবেরি প্রভৃতিকে দেখি স্বতন্ত্র মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। দশ জনের সহিত একই বিদ্যালয়ে ও কলেজে পড়িয়া মুসলমান ছাত্রেরা যে সময় অন্যের সমকক্ষতা অর্জন করিতেছে, ঠিক সেই সময় স্বতন্ত্র স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কূপের মধ্যে তাহাদিগকে ঠেলিয়া দেওয়ার অর্থ বাংলার মুসলমান সমাজকে আরও এক শতাব্দীর পিছনে রাখিয়া দেওয়া।

বাংলার মুসলমান সমাজে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে অনেক সময় তাহাকেই নবজাগরণ বলিয়া ভুল করা হয়। বস্তুত, ইহা নবজাগরণ নহে। ম্যাকডোনাল্ডী বাঁটোয়ারার কল্যাণে মুসলিম লীগের হাতে দেশের শাসনযন্ত্র আসিয়া গিয়াছে, ফলে সমগ্র বাংলার রাজস্ব আজ লীগের করায়ত্ত। এই রাজস্ব এবং সমগ্র শাসনযন্ত্র লীগের হাতে আসিবার পর তাঁহাদের সহস্র সহস্র অনুচরের পক্ষে চাকুরী ও নানাবিধ ব্যবসার লাইসেন্স প্রাপ্তির সুযোগ ঘটিয়াছে। চাকুরীর মধ্যে শতকরা বোধ হয় ৮০টি সাময়িক; কণ্ট্রোল ও রেশন প্রভৃতির পরিসমাপ্তি ঘটিলেই এই সমস্ত লোক বেকার হইবে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসাদারদের অবস্থাও তাহাই। ইহাদ্বারা কতকগুলি লোক অর্থবান হইয়াছে কিন্তু মুসলমান-পরিচালিত শিল্প বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইহার দ্বারা বেশী বাড়ে নাই। কণ্ট্রোল ও রেশন উঠিয়া গেলেই ইহারও অবসান ঘটিবে। শাসনযন্ত্র লীগের করায়ত্ত হওয়ার ফল হইয়াছে এই যে নিজের দেশের সরকারী চাকুরী ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুর প্রবেশ-পথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। হিন্দুর ভাগে বড় বড় ব্যবসায়ের যে সামান্য কয়েকটি লাইসেন্স জোটে তাহাও বাঙালী হিন্দু পায় না, পায় অবাঙালী ভিন্ন প্রদেশবাসী। সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক কারণে অযোগ্য লোক নিয়োগ ও যোগ্যতর লোককে অতিক্রম করার ফলে সমগ্র শাসনযন্ত্রের দক্ষতা তো কমিয়াছেই, লীগ-কর্তৃক নিযুক্ত ও লীগের প্রতি অনুরক্ত কর্মচারীদের দ্বারা উহা অধিকৃত হওয়ায় শাসনযন্ত্র বর্তমানে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র প্রদেশের জনসাধারণের সেবক না হইয়া শুধু এক সম্প্রদায়ের স্বার্থবাহী ও অপর সম্প্রদায়ের পীড়নের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙালীর ভাষা, শিক্ষা, চাকুরী ও ব্যবসায়ের উপর আক্রমণ কিছুদিন যাবৎ বেশ পরিকল্পিত ভাবেই আরম্ভ হইয়াছিল। এবার এই আক্রমণ সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করিয়াছে। লীগ মুখপত্রগুলি বাঙালী হিন্দুকে বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া বিহার, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রকাশ্যে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের হিন্দুপ্রধান প্রদেশের মুসলমান অধিবাসীদের বাংলায় আনিয়া বসানো হইবে, কাজেই বাঙালী হিন্দুর স্থান বাংলায় হইবে না। 'আজাদ' পত্রিকার এই প্রকাশ্য প্রচারে যাঁহাদের চোখ খোলে নাই, ইহার পর কিসে ও কবে তাঁহাদের চৈতন্য হইবে তাহা আমরা জানি না। বিহারের ঘটনার পর বাংলা-সরকার কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ এম. এম. খাঁকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু বিহার-সরকার আপত্তি করায় তাঁহাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে। সংবাদপত্রে

প্রকাশ, মিঃ খাঁর সেখানে যাওয়ার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিহারী মুসলমানদের বুঝাইয়া পশ্চিম বাংলায় আসিয়া বসবাস করিতে রাজী করান। এই চেষ্টার যে বিবরণ দৈনিক 'ভারতে' প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :

> বিহারের দাঙ্গা এবং লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্গতিকে লীগ-নেতারা রাজনৈতিক সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহিতেছেন। উঁহারা এখন প্রমাণ করিতে লাগিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানেরা বাস করিতে পারে না এবং হিন্দুরাও পারে না যেখানে মুসলমান বেশী সেখানে মুসলমানদের সহিত বাস করিতে।
>
> লীগনেতারা ধরিয়া লইয়াছেন, হিন্দু ও মুসলমান আর কখনও একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতে পারিবে না। তাই তাঁহারা মুসলমানদের একত্রে এক জায়গায় রাখিবার কথা চিন্তা করিতেছেন।
>
> নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, লীগের বড় বড় নেতারা তিনটি প্ল্যান লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম প্ল্যান অনুসারে মুসলিম আশ্রয়প্রার্থীদের বাংলায় আসিয়া বসবাস করিতে বলা হইবে। প্রকাশ, বাংলার প্রধান মন্ত্রী সহীদ সাহেব এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, বর্দ্ধমানের পানাগড়ে আমেরিকান সৈন্যদের জন্য যে মিলিটারী শহর তৈরি হইয়াছিল কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে আশ্রয়প্রার্থীদের সেখানে স্থান দেওয়ার অনুমতি পাওয়া যাইবে। সেখানে প্রায় এক লক্ষ লোকের স্থান হইতে পারে। ঐ লোকদের জন্য কিছু পতিত জমি চাষের যোগ্য করার সম্ভাবনাও আছে। বিহারের কোন কোন লীগনেতা মনে করেন যে পশ্চিম বঙ্গে একবার স্থান পাইলে জমি দখল করিতে তাহাদের বেশী বেগ পাইতে হইবে না।
>
> লীগের দ্বিতীয় প্লান হইতেছে আশ্রয়প্রার্থীদের পূর্ণিয়ায় স্থান করিয়া দেওয়া। পূর্ণিয়ায় মুসলমানেরা অন্যান্য এলাকার তুলনায় কিছু বেশী আছে। উহা মুসলমান-প্রধান উত্তর বঙ্গের সংলগ্নও বটে।
>
> তৃতীয় প্লানটি হইল মুসলমাদের কয়েকটি গ্রামে একত্র করা। হিন্দু-প্রধান বিহারে উহা কয়েকটি দ্বীপের মতন হইবে।

পূর্ববঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গের বহুস্থানে মুসলমানেরা সংখ্যাগুরু। পশ্চিমবঙ্গেই শুধু তাহারা সংখ্যালঘু। উপরোক্ত উপায়ে গবর্ণমেন্টের সহায়তায় পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলিতে মুসলমান বসাইয়া ঐগুলিকেও মুসলমান সংখ্যাগুরু জেলায় পরিণত করিতে পারিলে সমগ্র বাংলায় বাঙালী হিন্দুর স্থান কোথাও থাকিবে না। বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা দুইটিকে এই ভাবে মুসলমান সংখ্যাগুরুত্বে পরিণত করা সময়সাপেক্ষ হইলেও হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া ও বীরভূমের চেহারা বদলাইয়া ফেলা খুব কঠিন কাজ হইবে না। গবর্ণমেন্ট হাতে থাকিলে বাধা দিবারও কেহ থাকিবে না।

বাংলার সীমানা

বাঙালী হিন্দুর উপর এই সর্বগ্রাসী আক্রমণ রোধ করিবার উপায় কি ? নোয়াখালীর ব্যাপারে বাংলার লীগ গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য ও পক্ষপাতিত্ব যে-ভাবে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, শাসনযন্ত্রের চূড়ান্ত অপব্যবহারকেও লীগ সর্বাধিনায়কেরা যেভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাঙালী হিন্দু এখনও সাবধান না হইলে পূর্ববঙ্গের হিন্দু ত বাঁচিবেই না, সমগ্র বাংলার হিন্দু সমাজকেও ঐ সঙ্গে গলায় পাথর বাঁধিয়া বঙ্গোপসাগরে ডুবিতে হইবে। সমগ্র বাংলায় হিন্দু সমাজ কি উপায়ে রক্ষা পায় তাহাই আজ সর্বাগ্রে বিবেচ্য। আমাদের মনে হয় বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব ও উপায়ের বিষয় স্থির ভাবে বিচার করা প্রয়োজন হইয়াছে।

বঙ্গবিভাগের স্বপক্ষে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যুক্তি এই যে হিন্দুর রাজত্বে যে ভাবে হিন্দু দলনকার্য চলিতেছে অবিলম্বে তাহা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বাংলার রাজস্বের শতকরা তিন-চতুর্থাংশ অথবা তারও বেশী হিন্দুরা দিয়া থাকে। যথাযথভাবে বঙ্গবিভাগ হইয়া গেলে এই রাজস্বের উপর লীগের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে না।

দ্বিতীয় যুক্তি বাঙালী হিন্দুর ভাষা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলতার ও অনাবশ্যক বৈদেশিকতার যে ছাপ লীগ শাসনের ফলে বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার ফলে সুশিক্ষা দান অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিণাম এখনই অনুভূত হইতেছে, অধিকাংশ বাঙালী তরুণ কুশিক্ষার ফলে চপল ও তরলমতি হইয়া উঠিয়াছে এবং কোন স্থায়ী সৎকার্য তাহাদের দ্বারা করানো কঠিন হইতেছে।

তৃতীয় যুক্তি বঙ্গবিচ্ছেদের ফলে পশ্চিমের বাঙালী হিন্দু শক্তিশালী হইয়া উঠিবে ও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতে পারিবে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুর উপর অত্যাচার হইলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু আজ দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করা ছাড়া আর কোন পথ খুঁজিয়া পায় না। কলিকাতার দাঙ্গার পর লীগ গবর্ণমেন্ট আসাম ও উড়িষ্যাবাসীদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনেক বেশী সচেতন হইয়াছে। বিহারের ঘটনার পর বিহারীদের উপর অত্যাচার নিবারণেও হয়ত তৎপর হইবে কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দু দলনে বাধা পাওয়ার ভয় তাহার নাই।

আপাততঃ এই তিনটি যুক্তিই আমরা বঙ্গবিভাগের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। এখনই ইহাতে অগ্রসর না হইলে বাঙালী হিন্দুর নিজস্ব আবাসভূমি (Homeland) পর্যন্ত বজায় থাকা কঠিন হইবে। এ ক্ষেত্রে শুধু এই কথা বিবেচ্য যে ইহা-দ্বারা পাকিস্থান মানিয়া লওয়া হইল কি না। পাকিস্থানের অর্থ স্বতন্ত্র ও পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের

সহিত যাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। বাংলার সীমানা নূতন করিয়া আঁকিয়া বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুই প্রদেশে পরিণত করিলে ভারতবর্ষে প্রদেশের সংখ্যা একাদশটির স্থলে দ্বাদশটি হইবে, তার বেশী কিছু হইবে না।

অন্তর্বর্তী গবর্মেণ্টে মুসলিম লীগের প্রবেশ

মন্ত্রীমিশন তাঁহাদের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণাপত্রে মুসলিম লীগের পাকিস্থান দাবিকে অযৌক্তিক ও অবাস্তব বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর সকলের আগে মুসলিম লীগই ঐ ঘোষণা গ্রহণ করেন। মিঃ জিন্না ১৬ই জুনের ঘোষণা-পত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাই মানিয়া লইয়া লীগের হাতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ভার ছাড়িয়া না দেওয়ায় লীগনায়ক ক্রুদ্ধ হইয়া বোম্বাইয়ে লীগ কাউন্সিলের সভা ডাকিয়া মিশনের ১৬ই মে ও ১৬ই জুন দুই তারিখের দুইটি প্রস্তাবই পরিত্যাগ করেন। ইহার পর কংগ্রেসের হাতে অন্তর্বর্তী গবর্মেণ্ট গঠনের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হইলে মিঃ জিন্না উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন এবং লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করিয়াই অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের পাঁচ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। লীগ-বিরোধী কোন মুসলমানকে অন্তর্বর্তী সরকারে সহ্য করা হইবে না বলিয়া মিঃ জিন্না যে জিদ ধরিয়াছিলেন, তাহাও টিকিল না, মিঃ আসফ আলি রহিয়া গেলেন। মিঃ আম্বেদকরের সাহায্যে বিলাতের চার্চিল দল হিন্দু সমাজে ভাঙন ধরাইবার যে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে লীগ প্রতিনিধি হিসাবে অন্তর্বর্তী সরকারে প্রেরণ করিয়া মিঃ জিন্নাও আবার একবার সেই একই খেলা দেখাইয়াছেন। দৈনিক 'ভারতে' লীগের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উহার সারাংশ এইরূপ :

মন্ত্রীমিশন ১৬ই জুন তারিখে যে প্রস্তাব করেন তাহাতে মুসলিম লীগের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিতে অস্বীকার করা হয়। তাহার পরই আরম্ভ হয় একটা কুৎসিত চক্রান্ত। যখন তদারকী সরকার গঠনের কথা হয় তখন কায়েমী স্বার্থে স্বার্থবান ব্যক্তিবর্গ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে কিন্তু তার পরই যখন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয় তখন কলিকাতায় মহাহত্যালীলা সংঘটিত হয়। মুসলীম লীগের সম্মতি ও সহযোগিতা ব্যতীত যাহাতে কংগ্রেস রাজকার্য গ্রহণ না করে তাহার জন্য তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই ঐ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। কিন্তু অকুতোভয় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু তৎপ্রতি দৃকপাত না করিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেন।

অবস্থাদৃষ্টে প্রগতিবিরোধী দল তাঁহাদের কার্যপদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেন। ফলে মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যবনিকার অন্তরালে একটা অপচেষ্টা চলিতে থাকিল। শোনা যায়, প্রথমে গবর্মেণ্ট বলিয়াছিলেন যে, মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কি না হইবে তাহা একমাত্র নেহরু-গবর্মেণ্টেরই বিবেচ্য। বড়লাট পণ্ডিত নেহরুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি যদি লীগ কর্তৃপক্ষের সহিত কথা পাড়েন তাহা হইলে পণ্ডিতজীর কোন আপত্তি আছে কিনা। পণ্ডিত নেহরু নাকি উত্তর দেন যে, মুসলিম লীগ যদি অন্তর্বর্তী সরকারকে মন্ত্রিমণ্ডল হিসাবে গণ্য করিয়া লয় এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ মানিয়া লয় তাহা হইলে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

কিছুকাল পর পণ্ডিত নেহরুকে জানান হয় যে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। সরল-প্রকৃতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ধরিয়া লন যে, লীগ পূর্ব-কথিত সর্ত মানিয়া লইয়াছে। তার পর যখন দপ্তর বণ্টনের কথা ওঠে তখন পণ্ডিত নেহরু বিস্মিত হইয়া পড়েন। তিনি পররাষ্ট্র বিভাগ, দেশরক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং রেলওয়ে বিভাগের দপ্তর লীগের হস্তে অর্পণ করিতে অস্বীকার করেন এবং বর্তমানে লীগ সদস্যগণ যে কয়টি বিভাগ পরিচালনা করিতেছেন সেই কয়টি বিভাগ তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত হন। শুনা যায় যে, স্বরাষ্ট্র বিভাগ লইয়া খুব একটা টানা-হ্যাঁচড়া হইয়া গিয়াছে। ঐ বিভাগটি মুসলীম লীগের হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব কেহ কেহ সর্দার প্যাটেলের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ বলিয়া গণ্য করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অনমনীয় ভাব অবলম্বন করেন এবং বড়লাটকে বলেন তিনি যেন ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলকে জানাইয়া দেন যে, যদি তাঁহার প্রস্তাব সমর্থিত না হয় তাহা হইলে মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিবেন। প্রথম প্রথম বড়লাট নাকি বলেন যে, তিনি তাহাই করিবেন। কিন্তু তাহা করিতে গেলে অবস্থাটা সঙ্গীন হইয়া পড়িত। তাহা করিলে হয় মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হইত নতুবা বড়লাটকে লাটগিরি ছাড়িয়া যাইতে হইত। শেষ পর্যন্ত বড়লাট আর অত দূর অগ্রসর হইলেন না।

কিন্তু মিঃ লিয়াকৎ আলি খান যখন সাংবাদিকদের নিকট বলিলেন যে, অন্তর্বর্তী গবর্মেণ্ট বড়লাটের শাসন-পরিষদ ছাড়া আর কিছুই নহে এবং বড়লাট এই সরকারের প্রধান তখন পণ্ডিত নেহরুর চক্ষু খুলিয়া গেল। নেহরু গবর্মেণ্ট ইহার একটা মীমাংসা করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। পার্লিয়ামেন্টের গত অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার সময় রাজা ঘোষণা করেন যে, নবগঠিত ভারত-সরকার অন্তর্বর্তী সরকাররূপে এবং মন্ত্রি-মণ্ডলরূপে গণ্য হইবে। এই ঘোষণার পর এ সম্পর্কে বিতণ্ডার অবসান ঘটিল। রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্‌গণ এক বাক্যে এ কথা বলিতেছেন যে, পণ্ডিত নেহরু এখানে অপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

গণপরিষদ পণ্ড করার চক্রান্ত

অতঃপর ভারত লিখিতেছেন :

১৬ই আগষ্ট এবং তৎপরবর্তীকালের কলিকাতার যে

দুর্বিপাক ঘটিয়া গিয়াছে সে সমস্ত ঘটনার পর পণ্ডিত জবাহরলাল দেখিতে পান যে, কলিকাতাবাসীদিগকে তিনি কোন সাহায্যই করিতে সমর্থ নহেন—এ বিষয়ে তাঁহার হাত পা বাঁধা। পণ্ডিতজী এক জন উচ্ছ্বাসপ্রবণ লোক; সুতরাং উক্ত অবস্থায় পড়িয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠেন। এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার পাইবার জন্ত তিনি ব্রিটিশ সরকারের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। এই আলোচনার শেষ না হইতেই নোয়াখালির ঘটনা সমগ্র পৃথিবীকে সচকিত করিয়া তুলিল। অল্পকাল মধ্যেই উপদ্রব প্রসারলাভ করিল—কলিকাতা মহানগরীতে দ্বিতীয় দফা উপদ্রব আরম্ভ হইল। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জানাইলেন যে, যথোচিত ক্ষমতা পাইলেই অথবা দেশে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থ বড়লাটের যে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে সেই দায়িত্ব পালনে বড়লাটকে সম্মত করাইতে পারিলেই তিনি কলিকাতায় আসিতে প্রস্তুত। পণ্ডিতজীর এই দৃঢ়তার ফলে শেষ পর্যন্ত নাকি এই মর্মে একটা আপোষরফা হয় যে, মন্ত্রিমণ্ডলের পরামর্শ অনুসারেই বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। ইহাতে বড়লাটের ক্ষমতা কিঞ্চিৎ খর্ব হইল বটে, কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলের হাতেও কিছুটা ক্ষমতা আসিল। এই ক্ষমতা লাভের পর পণ্ডিত নেহরু কলিকাতায় আসিলেন।

জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ কি ভাবে চলে তাহার একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী কলিকাতায় আসিয়া বলেন যে, উপদ্রব নিবারণের জন্ত সৈন্যদিগকে কি ভাবে নিয়োগ করা হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। একটা কথা উঠিয়াছিল যে, বাংলা-সরকারই যখন সৈন্ত নিয়োগ কার্য পরিচালনা করিতেছেন তখন দেশরক্ষা-সচিবের এ বিষয়ে কিছু করিবার অধিকার নাই কিন্তু দেশরক্ষা-সচিবের উক্ত মন্তব্য হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কলিকাতায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নীরব হস্ত কি প্রকারে কার্য করিতেছিল।

পণ্ডিত নেহরু কলিকাতা হইতে বিমানযোগে পাটনায় গমন করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, যদি উচ্ছৃঙ্খলা বন্ধ না হয় তাহা হইলে সামরিক বিভাগ আকাশ হইতে বোমা বর্ষণ পর্য্যন্ত করিতে পারে। সম্প্রতি ভারতসচিব কমন্স সভায় বলিয়াছেন যে, ভারত-সরকার যদি ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে তিনি বাধা দিবেন না। এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, আপৎকালীন অবস্থায় ভারত সরকারের যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে আগষ্ট মাসে কলিকাতায় যখন হাঙ্গামা সুরু হয় তখন তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা নেহরু গবর্মেণ্টের ছিল না। এ বিষয়ে বড়লাটকে অবহিত করিবার ক্ষমতা নেহরু গবর্মেণ্ট গত অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে লাভ করেন এবং সেই ক্ষমতা বিধিমত প্রয়োগ করেন। বিহারে নাকি সামরিক আইন জারী করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু পণ্ডিত নেহরু উহাতে দৃঢ় অসম্মতি জানাইবার ফলেই ঐ আইন জারী হয় নাই।

কংগ্রেস-বিরোধীরা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, গণ-উপদ্রবের দ্বারা ভারতের প্রগতি বন্ধ করা যাইবে না এবং সেজন্যই নাকি তাহারা রব তুলিয়াছে যে, একটা বড় সম্প্রদায়কে বাদ দিয়া যেন গণ-পরিষদের অধিবেশন না করা হয়। এই রবের মুখ বন্ধ করিবার জন্য নেহরু গবর্মেণ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টও যে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ চালাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে পার্লিয়ামেণ্টের উদ্বোধন দিবসে রাজার অভিভাষণে। অবহিত পর্যবেক্ষকগণ দৃঢ়তার সহিত এই কথাই বলিতেছেন যে, রাজার পর পর দুইটি অভিভাষণের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতের প্রশ্ন ব্রিটিশ সরকারের নিকট আজ একটা বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, অতঃপর ব্রিটিশ শ্রমিক গবর্মেণ্টের অকপটতা সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করা চলে না।

এক্ষণে গণপরিষদের আসন্ন অধিবেশনের পথ উন্মুক্ত। আত্মকলহের দোহাই দিয়া ভেদনীতির সেই পুরাতন খেলা শেষ হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী কমন্স সভায় সাফ বলিয়া দিয়াছেন যে, সকল গবর্মেণ্টের আমলেই ভারতে এরূপ হাঙ্গামা ঘটিয়াছে। এ কথার অর্থ এই যে, এ সমস্ত হাঙ্গামার ফলে প্রস্তাবিত পথ পরিহার করা হইবে না।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও দুর্মতিদিগের চেষ্টার ত্রুটি নাই। প্রশ্ন তোলা হইয়াছে যে, গণপরিষদ আহ্বান করিবে কে এবং কে-ই বা উহার উদ্বোধন করিবে। রাজনীতিক মহল বলেন যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা-প্রণয়নকারী পরিষদের নির্ব্যূঢ় ক্ষমতা যখন শ্রমিক গবর্মেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে তখন আর এ বিষয়ে ব্রিটিশ ভাইসরয়ের কোন হাতই নাই।

প্রগতিবিরোধীদের খেলার আর একটা দিক আছে। বিলাতের সানডে টাইমস্-এর নয়াদিল্লীস্থ প্রতিনিধি সেই দিকটা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুসলিম লীগ নাকি গণপরিষদে যোগ দিবার মূল্য-স্বরূপ সকল প্রদেশে সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের দাবি করিতেছেন। তাঁহারা নাকি তলে তলে এই ভয় দেখাইয়াছেন যে, অন্যথায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্রসার লাভ করিবে। কংগ্রেসের সোজা উত্তর নাকি এই যে, যদি সকল প্রদেশে সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের অভিলাষ মুসলিম লীগের থাকে তাহা হইলে আনুষ্ঠানিকভাবে সে প্রার্থনা কংগ্রেসকে জানাইতে হইবে।

লীগের আর একটি দাবি হইতেছে এই যে, তাহাদিগকে গণপরিষদের 'খ' খণ্ড গঠন করিতে দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম পাকিস্থানের ভিত্তিস্থাপন করিতে দিতে হইবে। রাজনৈতিক মহল এই চালের মধ্যে দুর্বু

পাঠানদের সমর্থনলাভের জন্ত লীগের চেষ্টার আভাস দেখি-তেছে। এ সম্পর্কে কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলিতেছেন যে ব্রিটিশ ভাইসরয় সঙ্গত কার্য করিতেছেন না।

এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ হাই-কমিশনার রূপে মিঃ টেরেন্স সোনের আগমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য করা যাইতেছে। ভারত সম্পর্কে তাঁহার কার্যের স্বরূপ কি হইবে, এখন হইতে শ্রমিক গবর্মেণ্টের নিকট ভারতীয় ব্যাপারে তিনি দায়ী থাকিবেন, না বড়লাট দায়ী থাকিবেন এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। মিঃ সোন বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পূর্বেই এক জন ব্রিটিশ হাই-কমিশনার নিয়োগ একটা বিরাট পরিবর্তনের লক্ষণ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে ভারতবর্ষের জন্ত একটা সর্বসম্মত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়নে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে আপোষ-আলোচনার জন্তই তিনি এদেশে আসিয়াছেন।

পণ্ডিত নেহরু নাকি ৯ই ডিসেম্বর তারিখে গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর। সুতরাং পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে, ঐ তারিখে নিশ্চয়ই গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে এবং ভারতের ইতিহাসে একটা যুগপরিবর্তন হইবে।

ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক বিবর্তনের মর্ম বুঝিতে হইলে দুইটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথম কথা এই যে, নেহরু গবর্মেণ্ট গঠন করিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে প্রথম সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধীরে ধীরে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের দ্বারা এই গবর্মেণ্ট ইতিমধ্যেই নিজ ক্ষমতা প্রসার করিয়া লইয়াছেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এক্ষণে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের নীতি অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব এবং গণপরিষদ গঠন তাহার প্রমাণ। বহুকালের বহু জয়-পরাজয়ের পর আজ একটা সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য গণপরিষদকে বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। আমাদের নবজীবনের ধারা নির্দেশ করিতে অনেক বেগ পাইতে হইবে, অনেক সময় লাগিবে, কিন্তু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দুর্দিনের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া ভারতবাসীরা এবার জয়ের শিখরে পৌঁছিতে সমর্থ হইবে।

ব্রিটিশ সাংবাদিক কর্তৃক লীগের সমালোচনা

মিঃ এইচ এন ব্রেল্‌সফোর্ড স্বনামখ্যাত সাংবাদিক। মিঃ জিন্না ও লীগের বর্তমান কার্যকলাপ তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া তাঁহার এক প্রবন্ধ সম্প্রতি কলিকাতার 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সর্বাগ্রে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে, যে নৈতিক সাহস তাঁহাকে ভারতবর্ষের বর্তমান সন্ধিক্ষণে নেতার আসন গ্রহণে প্রেরণা দিয়াছে তিনি তাহাতে যুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার বিশ্বাস আজিকার জগতে সর্বাপেক্ষা সাহসী ব্যক্তি পণ্ডিত নেহরু।

পণ্ডিতজী যে পদে আসীন তাহা গর্ব করার মতই। তাঁহার তুল্য দায়িত্বসম্পন্ন পদ কোন ভারতবাসীই বহুদিন গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ওয়াশিংটন, মস্কো, লণ্ডন ও নানকিঙে তাঁহার মত লোক তিন-চার জনের বেশী নাই যাঁহারা তাঁহার মত গুরুদায়িত্বসম্পন্ন কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই জবাহরলালের মত নূতন করিয়া কিছু গড়িবার সুযোগ পান নাই। লেনিনের মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্যন্ত চল্লিশ কোটি মানুষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে একটি নূতন জাতি গড়িয়া তোলার বিরাট কাজে আর কে হাত দিয়াছেন? আজিকার ভারতের সকল সমস্যার দিকে তাকাইলে একথা বলিতেই হয় যে বীরোচিত সাহস বিনা এমন কাজে হাত দেওয়া মোটেই সম্ভবপর নহে। বর্তমানে ভারতবর্ষকে তাহার দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। পুরুষ-পরম্পরা ধরিয়া বিদেশী শাসনের ফলে ভারতের উপর যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা আজ মনে রাখিয়া নিজ প্রগতিকে ব্যাহত করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য।

এই অনৈক্য রূপ গ্রহণ করিয়াছে অত্যন্ত অল্প কয়দিন আগে। পেশোয়ারে যখন মুসলিম লীগ পতাকা তলে সমবেত জনতা জবাহরলালকে 'ফিরিয়া যাও' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে তখনই এই অনৈক্যের বীজ বপন করা হয়। তখন তাহারা কি ভাবিয়াছিল যে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান মন্ত্রীকে তাহারা এই প্রকারে কি অপমান করিয়াছে? শুধু কি তিনি দেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রী, মহাত্মা গান্ধীর পরে তিনিই দেশের প্রধান নাগরিক। যে সময়ে ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবে নির্বাচিত 'ডেলিগেশন' আমেরিকার ইউনাইটেড নেশনের অধিবেশনের উদ্দেশে সবেমাত্র যাত্রা করিয়াছে তখনই তাহারা এই কাণ্ড করিয়া বসিল।

মুসলিম লীগ যদি দেশের এক জন জাতীয় প্রধান মন্ত্রীর সহিত এমন ব্যবহার করিতে পারে তাহা হইলে তাহার দেশ-প্রেম সম্বন্ধে সংশয় স্বাভাবিক কথাই। ইংলণ্ডে, আমেরিকায় এমন কি ফ্রান্সের দলগত রাজনৈতিক রীতিনীতি অনুসারে এই ব্যাপার অত্যন্ত গর্হিত। কারণ দেশের জাতীয় প্রধান-মন্ত্রীর সহিত কোন দলই এমন ব্যবহার করিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। এই সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িলে জবাহরলালের ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, মুসলীম লীগ কুখ্যাত হইয়াছে সংশয় নাই,-তবে সবচেয়ে লজ্জার কথা এই যে সমগ্র ভারতবর্ষ জগতের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে।

অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলীম লীগ সদস্যেরা যোগদান করিবে, এই খবর যখন ব্রিটেনে প্রচারিত হইল তখন ইংরেজ জনসাধারণ ক্ষণকালের জন্ত এক স্বস্তিকর সন্তোষ অনুভব করিয়াছিল। ভারতে দুই দলের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে যে দুষ্কৃতিগুলি ঘটিয়াছে তাহার পরে দুই দলের মধ্যে এমন অপ্রীতিকর মানসিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা আগে কখনও ছিল না। ভূপালের নবাব মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যে আপোষের জন্ত ধৈর্য সহকারে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন তাহাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। মুসলীম লীগ কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করিবার সময় জবাহরলালের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই, লর্ড ওয়াভেলের আমন্ত্রণেই আসিয়াছে।

ইহার অর্থও অত্যন্ত পরিষ্কার। লীগ কংগ্রেসের সহিত কোয়ালিশন করে নাই। তাহারা কোন সাধারণ নীতি বা কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে একমত হইয়া সরকারে যোগ দেয় নাই। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, দুইটি দলে যৌথ দায়িত্বের কথার চেয়ে দুই বিরোধী দলের মধ্যে সজ্ঘর্ষের কথাই এখানে বড় হইয়া উঠিবে। দুই দলের সদস্য পালাক্রমে একবার করিয়া শাসন-পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেন্টের আসন গ্রহণ করিবেন, লীগের এই অদ্ভুত প্রস্তাবে এই কথাই মনে হয় যে, অন্তর্বর্তী গবর্ন্মেণ্টে কোন প্রধান মন্ত্রী রাখা ইঁহাদের অভিপ্রেত নহে।

তাহা হইলে ব্যাপারটি দাঁড়াইল এই যে শাসনকার্যে বিরোধ বাধাইবার এবং ওয়াভেলের সালিশীতে উহা মিটাইবার আয়োজনই ইহাতে করা হইল। এই ব্যবস্থার ফলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা, বরং পিছাইয়াই যাইবে।

মুসলীম লীগের প্রচারপত্র 'ডনে' প্রকাশিত হইয়াছে যে, লীগ কংগ্রেসের মতই স্বাধীনতাকামী। এই কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে জিন্নার নেতৃত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেই, যতই না কেন তাঁহার ব্যক্তিগত আকর্ষণী ক্ষমতা থাক্। আসলে বিশাল হিন্দু কৃষক শ্রমিক ও দরিদ্র জনগণের মতই মুসলমানগণও আর বিদেশী শাসন দীর্ঘদিন সহ্য করিতে রাজী নহে।

মিঃ জিন্নার অবলম্বিত পন্থার অর্থ আমাদের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। হয় তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বাধীনতাকে ঠেকাইবেন, না হয় চিরদিনের জন্ত তাহার পথ বন্ধ করিয়া বসিবেন।

যদি তাঁহার মতলব এই হয় যে তিনি মরিয়া হইয়া টোরী দলকে সমর্থন করিবেন তাহা হইলে তিনি বর্তমানে যাহা করিতেছেন তাহার চেয়ে বেশী কিছু করিতে পারিবেন না। যে সম্প্রদায় চায় যে হিন্দু-মুসলমানের শান্তি বিধানের জন্য চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত থাক্ তাহারা কোন দিনই এতটুকু শান্তি আনিতে পারিবে না। ইহার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে পূর্ববঙ্গের বর্বরোচিত ঘটনাগুলিতে। পূর্ববঙ্গের ঘটনাগুলি পূর্ব-পরিকল্পিত এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেও আমার কথার অর্থ এই নহে যে মুসলীম লীগের 'হাইকমাণ্ড' এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও দায়ী। তবে এ কথা সত্য যে লীগ-প্রচারিত বাণীর ফলেই ঐ ভয়াবহ কাণ্ডের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছে। দেশের ইতিহাস-প্রণেতা এই কথাই জিজ্ঞাসা করিবেন যে মিঃ জিন্না এই বিপর্যয় রোধ করিবার জন্ত কি ব্যবস্থা পূর্ব হইতে অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের কোন মুক্তিবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীর মতলব অনুসারে এই সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়া থাকিলেও তাহা তীব্র ভাষায় নিন্দনীয়। ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার নামে এমন একটি অস্ত্র তৈরি হইয়াছে, যে অস্ত্রের দৌলতে মিঃ চার্চিল একদা সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু উভয় সম্প্রদায়কেই ইচ্ছামত চালাইয়াছেন।

আমার মনে হয় এই প্রকারের নীতি কখনও সাফল্যলাভ করিতে পারে না। মিঃ চার্চিল ব্রিটিশ জনসাধারণের চিন্তাধারা হইতে অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর পিছাইয়া গিয়াছেন। কেবল ভারতবর্ষ নহে, মিশরের উপর হইতেও পরাধীনতার জোয়াল তুলিয়া লওয়ার অভিপ্রায়ের দ্বারা ব্রিটেন তাহার বর্তমান জনমত প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছে যে ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে গায়ে পড়িয়া তাহার উপর মোড়লী করিতে যাওয়া সুখকর হইবে না।

মিঃ জিন্না হয়ত মনে করেন যে টোরী সম্প্রদায় আবার ভবিষ্যতে ক্ষমতা লাভ করিবে। এই ধারণা ভ্রান্তিকর। তাহা ছাড়া যদিও টোরী সম্প্রদায় সত্যই ক্ষমতা পায় তাহা হইলেও পাকিস্থানের আশা নিরর্থক। কারণ সময় কাটিয়া গেলেও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আয়তন ও আকৃতি বদলাইয়া যাইবে না। তাহা ছাড়া টোরী গবর্ন্মেণ্টও শ্রমিক গবর্ন্মেণ্টের মতই সামরিক কর্তৃপক্ষের উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষ অখণ্ড রাখা সম্বন্ধে সামরিক কর্তৃপক্ষ একমত।

পাকিস্থানের সম্ভাবনা একেবারেই নাই; গত কিছু দিনের পরিস্থিতি পাকিস্থানের সম্ভাবনাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে। বাংলাদেশের লীগ সরকারের কার্যাবলী হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে লীগ সরকার হয় খুনাখুনি হাঙ্গামা নিবারণ করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক, নয় অক্ষম।

আমি মিঃ জিন্নাকে এই কথাই বলিতে পারি যে মহাত্মা গান্ধী দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাওয়ার পরিবর্তে যদি তিনি সেই সমস্ত স্থানে যাইতেন তাহা হইলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিত।

কংগ্রেস দুর্গতদের সাহায্য করিতেছে। অথচ মুসলীম লীগেরই এই কার্যগুলি করা উচিত ছিল। এই প্রকারে মুসলীম লীগ আপনার অতীতের কলঙ্ক অপনোদন করিতে পারিত।

গান্ধীজী ও পণ্ডিত নেহরু

বিলাতের 'সোশ্যালিস্ট লীডার' পত্রে এক প্রবন্ধে মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে গান্ধীজী ও পণ্ডিত নেহরুর কার্যের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের সারমর্ম প্রদত্ত হইল। ব্রকওয়ে লিখিতেছেন :

"পণ্ডিত জবাহরলাল শুধু মাত্র নূতন ভারতবর্ষের স্রষ্টা বলিয়াই নয়, নূতন পৃথিবীর স্রষ্টা বলিয়াও ভবিষ্যতের ইতিহাসে সম্মান লাভ করিবেন—যে আন্তর্জাতিক আদর্শবাদ আজ পৃথিবীর পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয়, একমাত্র নেহরুরই সেই মনোভাব বর্তমান। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘেও তাঁহার কণ্ঠস্বর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিনিই তাঁহার লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীকে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারিবেন।...পণ্ডিতজীকে বলা যাইতে পারে, ভারতের নূতন জাতীয়তাবাদের মূর্তপ্রতীক। কিছু কাল পূর্বেও ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবেই থাকিতে প্রস্তুত ছিল। পণ্ডিত নেহরু এবং তাঁহার নেতৃত্বে নবীন ভারত স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কিছুতেই মিটমাট হইবে না।... গান্ধীজী ভারতবর্ষে আত্মমর্যাদাবোধ, মানবিক ক্ষমতা এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির চেতনা জাগ্রত করিয়াছেন বলিয়া চিরকাল স্মরণীয় থাকিবেন। গান্ধীজী জনমনকে উদ্বোধিত করিয়াছেন। জবাহরলাল তাঁহার সৃষ্টিধর্মী মন লইয়া ভাবী ভারতের যে পথ নির্মাণ করিলেন, সেই পথে গান্ধীজীর উদ্বোধিত জনগণ যাত্রা করিবে। জবাহরলালের মত গভীর এবং বিস্তৃত জ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতিক আর একজনও বর্তমান পৃথিবীতে আছেন কিনা সন্দেহ করি। শুধু মাত্র পৃথিবীর ইতিহাসে নয়, বিভিন্ন দেশবাসীর জীবনধারা সম্পর্কেও তাঁহার জ্ঞান গভীর। পৃথিবীর সর্বত্র নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। অতীতকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীকে কি নূতন পথনির্দেশ করিতে পারেন—তাহা দিয়াই জবাহরলালের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে।"

সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় বাংলার রেলপথ

ভারত-সরকারের রেলপথের ভারপ্রাপ্ত সচিব মিঃ আসফ আলি ও ডাক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীর যে বিবরণ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে বর্তমান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সম্বন্ধে বহু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা এবং পূর্ববঙ্গের কতক অঞ্চলের রেলপথ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপারে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশন অঞ্চল রক্ষা করিবার যথোপযুক্ত পুলিসের ব্যবস্থার অভাব ঘটিয়াছিল।

আসাম-বাংলা রেলপথের পূর্ববঙ্গ ভাগের রেলওয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে পুলিস আছে তাহা উপযুক্ত নহে—হঠাৎ কোন বিপদ ঘটিয়া উঠিলে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা কঠিন। রেলপথের ভারপ্রাপ্ত সচিব এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সরকার যথাসম্ভব শীঘ্র উন্নত ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করিতেছেন।

রেলপথ-সচিব বলেন যে, গত ১৭ই আগষ্ট তারিখে চট্টগ্রামে রেল কর্মচারীদের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। ২৯শে আগষ্ট এক দল জনতা কর্মচারিগণের কোয়ার্টারগুলি আক্রমণ করে ও লুঠপাট চলিতে থাকে। পূর্ববঙ্গের আরও একটি ষ্টেশনের নিকট ২০০ সংখ্যক গুণ্ডার একটি দল অপেক্ষা করিতে থাকায় সেই ষ্টেশনের কাজ বন্ধ রাখা হয়।

কলিকাতা ও অন্যান্য বহু অঞ্চলে রেলকর্মচারিগণ হাঙ্গামার জন্য কর্মে যোগ দিতে পারে নাই। গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে মৈমনসিংহের বাহাদুরাবাদ ষ্টেশনটি লুণ্ঠিত হয়। শিয়ালদহ ষ্টেশনের 'পারশেল-শেডে' ১৭ তারিখ হইতে ১৯ তারিখের মধ্যে যে লুঠপাট হইয়াছিল তাহাতে আনুমানিক তিন লক্ষ টাকার মত ক্ষতি হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মিঃ আসফ আলি জানান যে, চলন্ত রেলগাড়ী অথবা ষ্টেশন প্লাটফরম ইত্যাদি স্থানে নিহত ও আহত যাত্রীদের সংখ্যা সঠিক ভাবে জানা যায় নাই। তবে একটি ঘটনা জানা যায়: কোন রেলকর্মচারীকে সস্ত্রীক রেলভ্রমণকালে ট্রেন হইতে জোর করিয়া হিঁচড়াইয়া টানিয়া নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বহু যাত্রী আহত ও নিহত হইয়াছে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। কখনও রেল-কামরা হইতে নামিবার সময় কখনও বা প্লাটফরম হইতে বাহির হইবার সময় ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে। এই সমস্ত ছাড়া ট্রেনে লুঠপাট, আক্রমণ ও স্ত্রী অপহরণের বহু ঘটনা ঘটিয়াছে মিঃ আসফ আলি স্পষ্ট ভাষায় এই কথা বলেন।

মিঃ আসফ আলিকে আর একটি প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছেন যে ভারত-সরকার রেলপথের শৃঙ্খলা শাসন ও আকস্মিক ঘটনাগুলির নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে যে পুলিস প্রহরার ব্যবস্থা আছে তাহা যথেষ্ট নহে বলিয়া মনে করেন। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের অত্যাচরিত অঞ্চলগুলির সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রযোজ্য।

সচিব মহাশয় আরও একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান যে গত আগষ্ট মাসের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিবার আগেও আসাম-বাংলা রেলপথের ঢাকা ও মৈমনসিংহের কোন অঞ্চলে প্রায়ই দলবদ্ধ গুণ্ডা-আক্রমণ দেখা যাইত। তিনি বলেন যে আসাম-বাংলা রেলপথের জেনারেল ম্যানেজারের রিপোর্টে জানা গিয়াছে যে উক্ত বিভাগে গুণ্ডামি, অত্যাচার ও অন্যান্য অপকর্মের ফলে রেল চলাচল অনেক সময়েই ব্যাহত হইয়াছে।

জেনারেল ম্যানেজারের মতে মৈমনসিংহের ভৈরববাজার

অঞ্চলে রেল-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অস্ত্র-সজ্জিত পুলিস ব্যবহার প্রয়োজন। রেলওয়ের রক্ষা কার্যের জন্য অন্ততঃ দুই শত জন সামরিক প্রহরীর ব্যবস্থা এখানে অবশ্য প্রয়োজন।

সচিব মহাশয় বলেন যে জেনারেল ম্যানেজারের এই নির্দেশ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কারণ শান্তির সময়ে রেলওয়ের শাসনের জন্য সামরিক কর্মচারীর ব্যবস্থা আইনসঙ্গত নহে। অবশ্য এই ব্যাপারে বাংলা-সরকারকে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বারংবার সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। শেষ পর্যন্ত ভৈরববাজারে অস্ত্রসজ্জিত সামরিক প্রহরার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যুদ্ধের সময়ে আসাম-বাংলা রেলপথের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ভার সামরিক প্রধান প্রধান কর্মচারিগণের উপর থাকিত। রেলওয়ের অনেক প্রধান কর্মচারীও সামরিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। এখনকার অবস্থায় সরকারের স্থির করা কর্তব্য যে সেই মিলিটারী নীতি অবলম্বন করা হইবে কিনা। রেলওয়ে এবং অন্যান্য জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এখন একান্তই প্রয়োজন।

বর্তমান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ইত্যাদি কারণে রেলপথ ও যানবাহনের অসুবিধার জন্য ডাক বিভাগেরও বহু অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। ডাক বিভাগ পুলিস সাহায্য ব্যতীত নিজেদের কাজ নিরাপদে সম্পন্ন করিতে পারিতেছে না। পূর্ববঙ্গের বহু জেলা পুলিস হেড কোয়ার্টার হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। সে বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। যুদ্ধের সময়ে রেলওয়ের মত ডাক বিভাগেও সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। এখানেও এখন অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন।

বাংলা-সরকারের হস্তে পাটচাষীর স্বার্থ

কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের ভার গ্রহণ করিবার পরেই তাঁহাদিগকে পাটের দর নির্ধারণ করা হইবে কি না এই প্রশ্ন বিবেচনা করিতে হয়। যুদ্ধের সময় বাংলা-সরকারের সম্মতিক্রমে বড়লাটের শাসন পরিষদ পাটের দর এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন যে উহাতে ষোল আনা লাভ ছিল ব্রিটেন ও আমেরিকার, ক্ষতি হইয়াছে চাষীর। ইহার বিস্তারিত আলোচনা আমরা পূর্বে বহুবার করিয়াছি। অন্তর্বর্তী কংগ্রেস গবর্মেণ্ট কার্যভার গ্রহণ করিবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতরক্ষা আইনের মেয়াদ শেষ হইবার কথা, সুতরাং নূতন করিয়া তাঁহাদিগকে এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যে স্থান আছে তাহা এবং বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর কথা বিবেচনা করিয়া রপ্তানী চট ও বস্তার মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা কংগ্রেস গবর্মেণ্ট যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং সমগ্র বিষয়টি আলোচনার জন্য বাংলা-সরকারকে আহ্বান করেন। বাংলা-সরকার এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসী দল পাটের নিম্নতম মূল্য চল্লিশ টাকা নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিলে লীগের ভোটের জোরে উহাও প্রত্যাখ্যাত হয়। কলিকাতার দাঙ্গা এবং পূর্ববঙ্গে অনিশ্চিত অবস্থার জন্য পাটের দর অসম্ভবরকম পড়িয়া যায়। বাংলার লীগ সরকার ইহা দেখিয়াও কোন প্রতিকারে অগ্রণী হইলেন না। কিছুদিন হাত গুটাইবার পর অবাঙালী দালালেরা যখন দেখিল যে পাটের মূল্য অসম্ভব নামিয়া গিয়াছে তখন তাহারা ক্রয় আরম্ভ করিল এবং অল্পদিনের মধ্যে দরিদ্র চাষীর সারা বৎসরের একমাত্র অর্থকরী ফসল পড়তারও কমে হাতছাড়া হইয়া গেল। এইভাবে চাষীর হাতের মোট তিন-চতুর্থাংশ পাট বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াও প্রধান মন্ত্রী বক্তৃতা ছাড়া উহা রোধ করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে মণকরা তের-চৌদ্দ টাকা দরে পাট ক্রয় দালালদের পক্ষে কঠিন হইত।

পাটচাষীদের অধিকাংশই মুসলমান এবং তপশীলী সম্প্রদায়ের লোক। ইহাদের দুর্দশা ভাঙাইয়া যাহাদের রাজনীতি, সেই লীগ-নেতারা চাষীর সাহায্যে অগ্রসর না হইয়া এবারও তাহাদেরই দুর্দশাকে কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারের মূলধন করিয়া তুলিতে ছাড়েন নাই। কংগ্রেস গবর্মেণ্টের মূল্য নির্ধারণের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু মূল্যের পরিমাণ তাঁহারা বাংলা-সরকারের সহিত পরামর্শক্রমেই স্থির করিতে চাহিয়াছিলেন। বাংলা-সরকার উহাতে যোগ না দিয়া কংগ্রেসের সহিত কেবল বাক্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং উহার দ্বারা অযথা কালক্ষেপ করিয়া অবাঙালী দালালদের সস্তায় পাট কিনিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। এই অবস্থা দেখিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই ভারত-সরকার জানাইয়া দেন যে রপ্তানীযোগ্য চট ও বস্তার দরও তাঁহারা বাঁধিবেন না। চাষীকে ন্যায্য দর পাইতে সাহায্য করিবার ক্ষমতা আছে বাংলা-সরকারের, ভারত-সরকারের নহে। বাংলা-সরকার ভারত-সরকারের নিকট যাহা চাহিয়াছিলেন তাঁহারা তাহা পাইয়াছেন কিন্তু চাষী পাটের দর পায় নাই। ফলে দালালদের আশার অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তির পথ খুলিয়া গিয়াছে। লীগওয়ালা ও অবাঙালী দালালদের পক্ষে ইহা অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ। এই দুইয়ের মধ্যে মিলনের অভাব গত দুর্ভিক্ষের বা যুদ্ধের সময়েও দেখা যায় নাই। বাংলা-সরকার এ বৎসর পাট লইয়া যাহা করিলেন তাহার পিছনে যে গভীরতর কোন কারণ ছিল না, কার্য দেখিয়া তাহা বলা কঠিন।

সুন্দরবনের ভাগচাষী

চব্বিশ পরগণা জেলা কৃষক-সমিতির সম্পাদক জানাইতেছেন :

চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের অধি-

বাসীদের শতকরা প্রায় ৮০ জন ভাগচাষী। ইহারাই বন্য-জন্তুর সহিত লড়াই করিয়া এবং হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়া আজ সুন্দরবনকে আবাদী করিয়াছে। জমিদার এবং তাহাদের নায়েব ও সাঙ্গপাঙ্গের শোষণ ও জুলুমে সুন্দরবন যাহারা হাসিল করিল তাহারা সর্বহারা, ভাগচাষীতে পরিণত হইয়াছে।

মধ্যস্বত্ব লোপ করিয়া গোটা সুন্দরবন সরকার কর্ত্তৃক খাস করার প্রাথমিক কাজরূপে গত ১২ই অক্টোবর হইতে চব্বিশ পরগণার সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশে জরিপের কাজ সুরু হইয়াছে। গত ১৯২৪-৩৩ সালের সার্ভে ও সেটেলমেন্টের সময় ডিরেক্টর অব ল্যাণ্ড-রেকর্ড নির্দেশ দেন যে, সকল ভাগচাষীর নামে খতিয়ান খুলিতে হইবে। ফলে 'এ' ও 'বি' ব্লকের ৮৭৮টি খতিয়ানের মধ্যে ৬৮০টি ভাগচাষীর নামে খতিয়ান হয়। বাকী ১৯৮টির মধ্যে ১৪০টি ক্যানিং এলাকায়। যখন 'সি' প্লটের খতিয়ান হইতেছিল তখন প্রজাস্বত্ব আইনের ৩ (১৭) ধারামতে ভাগচাষীদের অস্বীকার করা হইল। ফলে অতি অল্প খতিয়ান ভাগচাষীর নামে হইল।

গত ১লা নবেম্বর তারিখে, ভাগচাষীদের সম্বন্ধে সরকারী মনোভাব জানার জন্য জেলা কৃষক-সমিতির তরফ হইতে শ্রীরাসবিহারী ঘোষ সুন্দরবন সেটেলমেন্ট অফিসারের সহিত দেখা করিলে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান আইনে ভাগচাষীর স্বত্বের কোন উল্লেখ না থাকায় ভাগচাষীর নামে খতিয়ান হইবে না। তিনি আরও বলেন, সেটেলমেন্ট শেষ হইতে প্রায় ৩ বৎসর সময় লাগিবে। ভাগচাষীর স্বত্ব যাহাতে স্বীকৃত হয় সেজন্য কৃষক-সমিতি আন্দোলন করার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন এবং আশা করেন যে, এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

বাংলা-সরকারের অন্যান্য কাজের ন্যায় এই কার্য্যেও প্রথম হইতেই শৃঙ্খলার অভাব দেখা যাইতেছে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য জমি জরীপ চারিটি স্থানে সুরু হইয়াছে কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় কর্মকর্ত্তাদের কাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা গোড়া হইতেই দেখা দিতেছে। ভবিষ্যৎ ভুমি-ব্যবস্থায় ভাগচাষীর স্বত্ব কি হইবে তাহা লইয়া প্রায় দশ বৎসর যাবৎ শুধু আলোচনাই চলিতেছে।

সামরিক বিভাগের উদ্বৃত্ত মাল বিক্রয়

আমেরিকা এবং ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের অব্যবহৃত অনেক উদ্বৃত্ত সামরিক দ্রব্যাদি এখনও ভারতবর্ষে পড়িয়া রহিয়াছে। আমেরিকান গবর্ন্মেণ্টের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি ভারত-সরকার কিনিয়া লইয়াছেন। এই সমস্ত দ্রব্যাদির বিলি-বন্দোবস্ত এবং বিক্রয়-ব্যবস্থার জন্য অন্তর্বর্ত্তী সরকার এক 'ডিসপোসাল কমিটি' গঠন করিয়াছেন। কমিটির সদস্য সর মরিস গয়্যার, শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবাচার্য এবং শ্রীযুক্ত বুখানিজম্ এই কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে এই দ্রব্যাদি ছড়াইয়া আছে। অনেক মাল আসাম ও ব্রহ্মদেশের সীমান্তের দুর্গম স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। এই বিষয়ে যে মোটামুটি হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে আমেরিকার ৬,২৮,০০০ টন এবং ব্রিটিশের ১৫,১৩,০০০ টন পরিমাণ মাল অবশিষ্ট পড়িয়া আছে। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের উদ্বৃত্ত মালের দাম প্রায় ২১১ কোটি টাকা বলিয়া বলা হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের যে মালের দাম ৩৪ কোটি টাকা তাহা ২৪ কোটি টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছে। ডিসপোসাল কমিটির অধীনে ১৩৪ জন গেজেটেড কর্মচারী ও এই বিষয়ক অন্যান্য কার্য্যের জন্য ২০০০ কর্মচারী লওয়া হইয়াছে।

ডিসপোসাল কমিটির ব্যবস্থাদির কার্য্যে অনেক অসুবিধা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত কাজের অসাধুতারও অবসর যথেষ্ট আছে। প্রথমতঃ, মালপত্রের মধ্যে অনেক যন্ত্রপাতি বিচ্ছিন্ন ভাবে নানা স্থানে পড়িয়া আছে। সমস্ত জিনিষ একত্র না করিলে তাহার সঠিক মূল্যও বুঝা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, ডিসপোসাল বোর্ড এই সমস্ত জিনিষপত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে বা অনেক সময়েই পরিমাণ সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ দিতে পারে না। কাজে কাজেই ক্রেতার পক্ষে অনেক সময় জিনিষপত্র কেনা এক কষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাড়াতাড়ি এই জিনিষপত্রগুলি বিক্রয় করিবার পূর্বে অনেক কিছুই ভাবিবার আছে। আবার দীর্ঘ দিন ধরিয়া 'টেণ্ডার' আহ্বান করিয়া মালপত্র বিক্রয় করাও মুশকিলের ব্যাপার। গবর্ন্মেণ্ট এ বিষয়ে নিয়ম করিয়াছেন যে যাঁহারা পূর্বে দাবি করিবেন তাঁহারা পরবর্ত্তী খরিদ্দারের চেয়ে আগে এবং কম দামে জিনিষগুলি পাইবেন। এ বিষয়ে ডিসপোসাল ডাইরেক্টরেট যাহাকে পূর্বের দাবিদার বলিবেন, তাহাই সকলকে মানিয়া লইতে হইবে। ইহারই মধ্যে অসাধুতার ফাঁক রহিয়া গিয়াছে বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। অনেকেই বাংলা এবং আসাম অঞ্চলের ৩৫০০০ আমেরিকান ভ্যান লরীগুলির বিক্রয় ব্যাপারটিতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রাক্তন ডিসপোসাল বোর্ডের কার্যকলাপ সন্দেহজনক হইয়া উঠাতেই কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্ট বর্ত্তমান কমিটি গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নূতন ডিসপোসাল কমিটির একটি কর্ত্তব্য হইবে সমস্ত অসাধুতা ও অন্যায় ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া এবং যাহাতে ভবিষ্যতে ঘুষ, চুরি ও পক্ষপাতিত্ব আর ঘটিতে না পারে তাহার প্রতি যত্নশীল হওয়া। ঘুষ ও চুরির তদন্তের জন্য এই বিভাগের সহিত জড়িত নহেন এমন ব্যক্তি নিয়োগের প্রয়োজন আছে। তাঁহারা

খুঁটিনাটি বিষয়ে দেখাশুনা করিলে জনসাধারণের মনে আস্থা জন্মিবে। তাহা ছাড়া, এই কমিটির অপর একটি কর্তব্য বড় বড় বিক্রয় ও সেই সম্বন্ধীয় কার্যাবলীর মাসিক ও পাক্ষিক বিবরণী সকলের নিকট প্রকাশ করা। জনসাধারণ সেই রিপোর্টের জন্য আগ্রহসহকারে অপেক্ষা করিবে এবং এই ভাবে রিপোর্ট প্রকাশ আরম্ভ হইলে ডিসপোসালের পুকুরচুরি বন্ধ হইবার পথ হইবে। গত যুদ্ধের মিউনিশন বোর্ডের কেলেঙ্কারির পুনরভিনয় এবারও সমান তালে হইতে থাকিলে ইতিহাসের শিক্ষার কোনই মূল্য থাকে না।

শর্করা উৎপাদন ও বিক্রয় সমস্যা

কানপুরে 'সুগার টেক্‌নোলজিষ্ট এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া'র পঞ্চদশ বাৎসরিক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত আর. সি. শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন যে, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় ও শুল্ক-নীতির সংশোধন এবং দেশে যে সমস্ত নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির আমদানী প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে তাহার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিলে চিনির ও অন্যান্য শিল্পাদির অবশ্যম্ভাবী উন্নতি দেখা দিবে।

শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব বলেন যে ১৯৪৫-৪৬ সালে ৯,৪৮,০০০ টন পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে ও ১৯৪৬-৪৭ সালে যথাক্রমে ৯১,৭১,০০০ টন ও ১২,৭০,০০০ টন পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে ১৯৪৫-৪৬ সালের চিনির উৎপাদনই সবচেয়ে কম। সারা ভারতে যে জমিতে আখের চাষ হইয়া থাকে, তাহা ৪২.৫ লক্ষ একর হইতে ৩৮.৪ লক্ষ একরে নামিয়া আসিয়াছে। আখের চাষের এই হিসাবে, সবচেয়ে বেশী পরিমাণ জমিতে চাষ কমিয়াছে যুক্ত প্রদেশে। যুক্ত প্রদেশই চিনি উৎপাদনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। কম জমিতে চাষ হওয়ার অনেক কারণ দেখান হইয়াছে—শীতকালের বর্ষাভাব তন্মধ্যে প্রধান। কিন্তু শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব মনে করেন যে অন্যান্য দ্রব্যাদি, বিশেষ করিয়া প্রধান খাদ্যদ্রব্যগুলির দাম অত্যধিক পরিমাণে চড়িয়া যাওয়াই ইহার প্রধান কারণ। খাদ্যবস্তুর দুষ্প্রাপ্যতা এবং বেশী দাম হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া গেলে, আখ-চাষীদের পক্ষে অধিক ব্যাপক-ভাবে আখের চাষ সম্ভবপর হইবে এবং সহজেই চিনির কারখানাগুলি অধিক পরিমাণে সরবরাহ পাইবে। ১৯৪৩-৪৪ সালের সামরিক চাহিদা মিটাইবার জন্য যে ৯৯,০০০ টন চিনির প্রয়োজন ছিল তাহা ১৯৪৫-৪৬ সালে ৩৫,০০০ টনে নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং এই উদ্বৃত্ত অংশটি- বে-সামরিক ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। বর্তমান বৎসরে আখের দাম মণকরা ১।০ আনা করিয়া ধার্য হওয়াই স্বাভাবিক।

গবর্মেন্ট কর্তৃক স্থাপিত সুগার-প্যানেলে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব বলেন যে সুগার-প্যানেল আগামী বৎসরে চিনির উৎপাদন বাড়াইবার কথা অনুমোদন করিয়াছে। যদিও সুগার-প্যানেলের রিপোর্ট এখন প্রকাশ্যে বাহির হয় নাই তবু তিনি আশা করেন যে, ১৮,৫০,০০০ টন পরিমাণ চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে। আরও বেশী পরিমাণ চিনি উৎপাদন করিবার জন্য নূতন কলকারখানাও স্থাপন করা হইবে। নূতন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে স্থির হইয়াছে বাংলা, বোম্বাই, পঞ্জাব ও মাদ্রাজে তিনটি করিয়া এবং আসাম, বিহার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা, সিন্ধু, বরোদা, হায়দ্রাবাদ এবং ত্রিবাঙ্কুরে একটি করিয়া কারখানা স্থাপন করা হইবে। মোট ২০টি নূতন কারখানা স্থাপন করার কথা হইয়াছে।

এ বিষয়ে যন্ত্রপাতির অভাব একটি সমস্যার কথা এবং উহা সংগ্রহ এক দুরূহ ব্যাপার। বর্তমানে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় তাহার মূল্য যুদ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় অত্যধিক। তাহা ছাড়া অর্ডার দিলেও এই সমস্ত মাল অল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া কঠিন। ভারতবর্ষে যদি এই সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈয়ার না হয় তবে অল্প সময়ের মধ্যে যে সমস্ত কারখানা প্রতিষ্ঠা করার কথা হইতেছে তাহা সম্ভবপর হইবে না। এখন আমাদের উচিত যাহাতে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈয়ারের কারখানা খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্থাপিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকার পুরাতন বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির সংস্কারে মন দিয়াছেন। গত মাসে 'ট্রেড পলিসি কমিটি'তে বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত ভাবা বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের নিজের স্বার্থের কথা ভাবিয়াই তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি স্থির করা হইবে। আন্তর্জাতিক সভার আলোচনার সুর ধরিয়া ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে আর কখনও ব্রিটেন বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে নিজের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ করিবে না। যাহাই হউক, কারখানা স্থাপনের জন্য অবিলম্বে যন্ত্রপাতি আমদানী অত্যন্ত প্রয়োজন সে কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না।

চিনির কারখানার শ্রমিক সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব বলেন যে যুদ্ধোত্তর সময়ে অন্যান্য কারখানার ন্যায় ভারতের কয়েকটি চিনির কারখানাতেও গোলযোগ দেখা যায়। বিশেষভাবে যুক্ত প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে এই গোলযোগ জটিল হইয়া উঠে। শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত সিব্বনলাল সাক্সেনা এ্যাডজুডিকেটারের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে মালিকের প্রতি পক্ষ-পাতপূর্ণ বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব বলেন যে প্রত্যেক শ্রমিকের সহিতই উপযুক্ত সহৃদয় ব্যবহার করিবার প্রয়োজন আছে। কংগ্রেস গবর্মেণ্ট যদি আখ-চাষীদের সুবিধার জন্য উপযুক্ত দাম বাঁধিয়া দেন তাহা হইলে কারখানাগুলিও তাহার শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতি নজর দিবার সুযোগ পাইবে। বর্তমানে কারখানাগুলি ইচ্ছা করিলে শ্রমিকগণের প্রাপ্য মজুরি বাড়াইয়া দিয়াও যথেষ্ট লাভ রাখিতে পারে। যে

কোন সভ্য দেশের পক্ষে শ্রমিক সম্প্রদায় অপরিহার্য প্রয়োজন; যদি প্রয়োজন হয় তবে তাহাদের ন্যায্য মজুরি বাড়াইবার জন্য চিনির উৎপাদন-ব্যয় সামান্য কিছু বাড়িলেও তাহাতে আপত্তি করা উচিত নয়। দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের জীবন ধারণের পদ্ধতিই যদি উচ্চতর না হইয়া উঠে তবে সে দেশের শিল্পোন্নতির প্রয়োজন কিসে? এ বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়ার অনুসৃত নীতিলক্ষ্য করিবার মত। সেখানে শ্রমিক সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে চিনির দাম বেশী রাখা হইয়াছে।

খাদ্য-পরিস্থিতি

আইন-পরিষদে খাদ্য সম্বন্ধীয় এক বিতর্ক সভার উদ্বোধন করিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ খাদ্য-পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক হিসাবনিকাশ দাখিল করিয়া ভারতবর্ষ গত দুই মাসে প্রায় অনশনের মুখ হইতে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করেন। প্রথম দিকে ধারণা করা হইয়াছিল যে ৭০ লক্ষ টন চাউলের ঘাটতি পড়িবে—তাহার মধ্যে ৪০ লক্ষ টন পরিমাণ চাউল বিদেশ হইতে আমদানী করা সম্ভবপর হইবে। বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও আমদানীর পরিমাণ কিছুতেই ১৭ লক্ষ টনের বেশী করা যায় নাই। ভাগ্যক্রমে আমদানী চাউলের অভাব দেশের মধ্যে খাদ্যসংগ্রহের দ্বারা মিটানো গিয়াছে। যাহাই হউক, দেশে কংগ্রেস গবর্মেণ্টগুলির নিজেদের অক্লান্ত চেষ্টায় আমদানী চাউলের দ্বিগুণ পরিমাণ চাউল দেশের মধ্য হইতেই সরকারের গুদামজাত হইয়াছে। ইহাতেই বর্তমান বৎসরের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রায় মিটিয়া আসিয়াছে।

আগামী দুই মাসের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। শুধু তাহাই নহে, সমস্ত ১৯৪৭ সাল রীতিমত সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে এই সাবধানতা আরও পরবর্তী সময়ের জন্যও অবলম্বন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য বিভাগের যদি আর একটু ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি, অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা থাকিত তাহা হইলে হয়ত এ বছরেই খাদ্য-সঙ্কট প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইত। আগে হইতে তাঁহারা কিছুই করেন নাই বলিয়া সমস্ত দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর। পৃথিবীর আর কোন দেশেই খাদ্য রেশন অথবা সেই সম্বন্ধীয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা করিতে এত দীর্ঘ সময় লাগে নাই। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে ১,৫০ লক্ষ লোকই কেবলমাত্র খাদ্য-রেশন ব্যবস্থার অধীনে আসিয়াছে। কেবল মাত্র যাহারা শহর অঞ্চলের অধিবাসী তাহারাই ব্যক্তিগত ভাবে এই সুবিধা ভোগ করিতেছে। গ্রামাঞ্চলের লোকদের এ বিষয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটিতেছে তাহা অনুধাবনযোগ্য। তাহারা অনিয়মিত ভাবে যে সামান্য চার পাঁচ আউন্স চাউল পাইয়া থাকে তাহাকে হাস্যকর ব্যবস্থা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? এ বিষয়ে আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে বাজারে যে ২৪০ লক্ষ টন পরিমাণ উদ্বৃত্ত চাউল বিক্রয়ের জন্য আসিয়া থাকে তাহার মধ্যে কেবলমাত্র ৪০ লক্ষ টন পরিমাণ খাদ্যের বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খাদ্যবিভাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী বছরের জন্য আরও কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

একটি কথা ভুলিলে চলিবে না যে কৃষিপ্রধান দেশে এক-চেটিয়া খাদ্যসংগ্রহ ও বণ্টন সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার নহে। বরং অস্বাভাবিকই বটে। যে দিক দিয়াই বিচার করা হউক না কেন এ কথা খুবই সত্য যে যাহাতে দেশ আমদানী ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী না হয়, এবং খাদ্য ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে তাহাই কাম্য। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেই সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী দুই প্রকারেরই পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি ব্যাপকভাবে জল-সেচনের বন্দোবস্ত করিয়া যাহাতে অব্যবহৃত চাষের জমিগুলির সদ্ব্যবহার করা যায় ও উন্নত চাষবাস-ব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান যায় তাহার উপায় গ্রহণ করিতেছেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সাহায্যে চাষের উন্নতির জন্য যে সব বড় বড় জল-সেচন ব্যবস্থা হইবে তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। জল-সেচনের জন্য বড় বড় পরিকল্পনা ছাড়াও ছোটখাট সাহায্যের জন্য কূপ, পুষ্করিণী ও টিউবওয়েল বসাইতে হইবে।

কৃষকেরা যাহাতে সস্তায় জমির সার পায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হইবে। তবে ভারত-সরকারের কার্যপদ্ধতি এত মন্থর যে তাঁহাদের স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনাগুলি শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদী হইয়া পড়ে। আর দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাগুলি সেক্রেটারীয়েটের ফাইল ও খোপরেই বন্দী হইয়া থাকে—বাস্তবতার সহিত সম্পর্ক বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। উন্নত পরিকল্পনা বজায় করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে কাজগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং কি ভাবে কতটা অগ্রসর হইয়াছে। গত ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় দেশে অ্যামোনিয়াম-সালফেটের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে একাদিক্রমে দীর্ঘ তিন বছর কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু আজও পর্যন্ত ঠিক নাই যে কবে অ্যামোনিয়াম-সালফেট উৎপাদনের ব্যবস্থা বাস্তবে রূপায়িত হইবে।

ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার

খাদ্যসচিব ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দিল্লীর পুসা ইনষ্টিটিউটে একটি বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর ভাণ্ডারের সুব্যবস্থার অভাবে ৩০ লক্ষ টন খাদ্যবস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে যদিও এই ক্ষতিটি সম্পূর্ণ ভাবে রোধ করা সম্ভবপর নহে তাহা হইলেও সঞ্চিত ফসল জমা রাখিবার জন্য ভাল গুদাম নির্মিত হইলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যবস্তু বাঁচিয়া যাইতে পারে।

তিনি দেশীয় রাজ্য ও প্রদেশগুলির গুদাম কর্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, আপনারা যে সমস্যার সহিত বিজড়িত তাহা আজিকার ভারতের একটি প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যাপার। যে পরিমাণ খাদ্যবস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে রোধ করা অসম্ভব হইতে পারে কিন্তু যদি সেই পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশও রক্ষা পায় তাহা হইলে প্রায় ৭০ লক্ষ লোকের খাদ্যের অভাব মিটিয়া যাইবে। আমাদের উদ্দেশ্য খাদ্যবস্তু বিষয়ে ভারতবর্ষ যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইয়া যায় সেই চেষ্টাই করা। আমাদের সেই উদ্দেশ্য সফল করার ব্যাপারে একটি উপায় হইবে যাহাতে খাদ্যবস্তু কোন প্রকারে অপচয় বা নষ্ট না হইয়া যায়।

ভারতবর্ষে যে শস্য উৎপাদিত হয় তাহা চাষী সম্প্রদায়ের নিকটই প্রথম দিকে থাকিয়া যায়। কেবলমাত্র এই উৎপাদিত শস্যের সামান্য একটি অংশ বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে। সুতরাং ভাণ্ডার-ব্যবস্থার দুইটি দিকের কথা আমাদের ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। প্রত্যেক ছোটখাট চাষীরই খাদ্যবস্তু গুদামজাত করিয়া রাখার ব্যাপারে নজর রাখিতে হইবে যাহাতে পোকামাকড়, জলবৃষ্টি বা অন্যান্য আবহাওয়াজাত কারণে ইহা নষ্ট না হইয়া যায়। তাহাদের এমন ভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে অর্থব্যয় ও অন্যান্য দিক হইতে কোন অসুবিধা উপস্থিত না হয়। আর যে সমস্ত বড় চাষী বা বড়দরের ব্যবসায়ী ও গবর্মেণ্ট শস্যের গুদাম করিবেন তাঁহাদেরও একই সমস্যা, যদিও তাঁহাদের ছোটখাট চাষী বা ব্যবসায়ীদের চেয়ে সব দিক দিয়াই সুবিধা বেশী।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, আমি জানি আমাদের কৃষক সম্প্রদায় এই সমস্যার সুব্যবস্থার বিষয়ে অজ্ঞ নহে। একথাও বলা চলে না যে আমাদের চাষীরা এ বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছে। তাহারা তাহাদের নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিয়াছে ও কোন কোন স্থানে তাহারা সাফল্যও লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশের আবহাওয়ার বৈষম্য অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যবস্তু বিভিন্ন গুণের হইয়া থাকে। কাজেকাজেই কোন একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া সকল সমস্যার সুরাহা করা সম্ভব নহে।

গুদামসমূহের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টরের একটি প্রধান কর্তব্য—ছোটখাট চাষীগণ যে পদ্ধতিতে মাল ভাণ্ডারজাত করিয়া থাকে তাহার উন্নতি বিধান করা। গুদাম-কর্মচারীদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন যে তাহাদের আরও একটি কর্তব্য—মাল গুদামজাত করার ব্যাপারে কতকগুলি রীতি হাতে-নাতে শিখাইয়া দেওয়া, কেন না কতকগুলি পুরাতন অচল পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া নূতন উন্নত ধরণের পন্থা শিখান প্রয়োজন।

খাদ্যদ্রব্য উপযুক্ত ভাবে ভাণ্ডারজাত করিয়া রাখার ব্যাপারটি ব্যবসায়ীদের 'কোঠা' এবং 'খাটিবে'র দিকে নজর দেওয়ার চেয়ে বেশী প্রয়োজন। সাধারণ লোকদের, সহজ ভাষায় ও ধৈর্যসহকারে, হাতে-কলমে বুঝাইয়া দিতে হইবে। কাজে কাজেই গ্রাম্য চাষীদের সহিত যাহাতে প্রত্যক্ষ সংযোগ বজায় থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি থাকা দরকার।

তিনি বলেন, একটি কেন্দ্রস্থানে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যবস্তু ভাণ্ডারজাত করিয়া রাখার বিষয়ে আমি বলিয়াছি। একটি স্থানে খাদ্য গুদামজাত করিয়া রাখিতে হইলে যে সমস্ত সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে তাহার প্রতিকারের উপায় গুদাম কর্মচারিগণের অজানা নাই। ইঁহাদের কর্তব্য অসীম। গবর্ণমেণ্টের হাতে যত দিন খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ভার থাকিবে, শুধু যে তত দিনই তাহাদের কর্তব্যপরায়ণতার দরকার তাহা নহে, খাদ্যনিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যাইবার পরেও দেশের খাদ্যবস্তুর সঞ্চয় অপচয় ব্যাপারে তাঁহাদের বহু কর্তব্য আছে।

তিনি আশা করেন যে কর্মচারিগণ যখন নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবেন, তাঁহারা যে শিক্ষা ও নির্দেশ লাভ করিলেন তাহা বিশেষ বিশেষ অবস্থার সহিত হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এ বিষয়ে কতকগুলি অসুবিধা আছে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, তিনি অসুবিধার কথাগুলি এড়াইয়া যাইতে চাহেন না। গুদাম কর্মচারিগণ বিশেষজ্ঞ হিসাবে উন্নত পদ্ধতি সম্বন্ধে সকলকে উপদেশ দিবেন।

আমাদের দেশেও ইউনাইটেড নেশন্‌স্‌ ফুড এণ্ড এগরিকাল-চারাল অরগ্যানাইজেশন বর্ণিত বিশ্ব-খাদ্যভাণ্ডারের অনুরূপ একটি ভাণ্ডার স্থাপন করিতে পারিলে ভাল হয়। হঠাৎ প্রয়োজন ঘটিলে ও আকস্মিক ভাবে বিপদ আসিলে সেই ভাণ্ডার হইতে খাদ্য গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু এই সঙ্গে একটি বিষয়ে আমাদের বিশেষ নজর দিতে হইবে যাহাতে এই ভাণ্ডারের জন্য মূল্যের অযথা উত্থান বা পতন না ঘটে। যাহাই হউক, ভারতে যে আধুনিক পদ্ধতিতে শস্য-ভাণ্ডার স্থাপনের প্রয়োজন আছে তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

শিক্ষার পুনর্গঠন

১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে সার্জেণ্ট রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণ ভাবে এই রিপোর্টে প্রদত্ত নীতি ও উদ্দেশ্য-গুলিকে স্বীকার করিতেই ভারত-সরকারের প্রায় দুই বছরকাল সময় লাগিয়াছে। তাহার পর প্রাদেশিক সরকারগুলি যাহাতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেই আরও এক বছর কাটিয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় মোটামুটিভাবে এই কার্যে ১২৫ কোটি টাকা লাগিবে। এই বিবৃতিতে আরও প্রকাশ যে, প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃক প্রেরিত অনেক পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। উপযুক্ত মনে হইলে আগামী বৎসরের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক না ঘটিলে সে-গুলি কার্যকরী হইবে। যাহাই হউক, বুনিয়াদী শিক্ষার উন্নতির জন্য যে পরিকল্পনা হইয়াছে তাহাতে সর্বসমেত ৫৬·১৫ কোটি

টাকা ব্যয় হইবে। প্রাথমিক মূলধন হিসাবে ২০'৫২ কোটি টাকা ও পরে ধারাবাহিক ভাবে খরচ হইবে ৩৬'৪৩ কোটি টাকা। প্রদেশগুলিতে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়ার যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে তাহা লইয়া মত-বিরোধ দেখা দিয়াছে। প্রস্তাব আসিয়াছে একেবারেই ৬ হইতে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত একটানা ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে না। ইহাকে দুইটি বিভাগে ভাগ করিয়া প্রথমে ৬ হইতে ১১ বছর পর্যন্ত ও পরে ১১ হইতে ১৪ বছর পর্যন্ত আলাদা ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। প্রথম বিভাগের উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে ছাত্র-ছাত্রীদের অক্ষর পরিচয় করানো। অনেকের ধারণা যে ৬ হইতে ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেদের যদি একই বিভাগে লইয়া বুনিয়াদী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয় তাহাতে হয়ত ক্ষতির আশঙ্কা আছে। কারণ যদি কোন কোন অঞ্চলে অর্থাভাবে বা অন্য কোন কারণে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়া উঠিতে না পারে তাহা হইলে সেইস্থান পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি হইতে পিছাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। কারণ একথা সহজেই অনুমেয় যে শহর অঞ্চলে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার চেয়ে গ্রামাঞ্চলে উহা করিয়া তোলা ঢের বেশী শক্ত। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে এ বিষয়ে শৈথিল্য দেখা দিবে একথা ভাবিলে কিছু অন্যায় করা হইবে না। তাহার চেয়ে যদি ৬ হইতে ১১ বছরের ছেলেদের জন্য বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা ও পরবর্তী বয়সের জন্য সাবালকী-শিক্ষার (Adult Education) ব্যবস্থা করা হয় তাহাতে উন্নতির আশা আছে। এই ব্যবস্থা সমস্ত দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইলে তবেই আশু উন্নতি সম্ভব হইবে।

এই শিক্ষা-পরিকল্পনার আর একটি অংশের অনুমোদন অনুসারে স্থির হইয়াছে যে ব্যবহারিক ও বাণিজ্য-শিক্ষার জন্য প্রতি বছর ৫০০ ছাত্রকে বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইবে যাহাতে তাহারা উন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ৫ বছরে মোটামুটিভাবে ৩'৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। আমরা আশঙ্কা করি যে জনসাধারণের অর্থ এই প্রকারে অপচয় হইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ একথা সত্য যে এই সমস্ত ছাত্রের মধ্যে সকলেই যে তাহাদের শিক্ষা শেষ হইলে তাহাদের ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্তভাবে কিছু বলা যায় না। দেখা গিয়াছে যে এই সব ছাত্র বিদেশ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া এ দেশে আসিয়া এখনও সকলের আগে চাকুরির সন্ধান করে। নূতন শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে ইহাদেরই আগ্রহ সবচেয়ে কম। এই বিষয়ে বিশেষ অবহিত ভাবে বিবেচনা করা উচিত। যে সব ছাত্রের গবেষণার দক্ষতা ও আন্তরিকতার পরিচয় এদেশে পাওয়া যায় নাই, তাহাদিগকে বিদেশে পাঠান উচিত নয়। যে সমস্ত ছাত্রকে প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কার্য প্রদান করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে অথবা যাহারা নিশ্চিতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিবে বলিয়া জানা যাইবে কেবল তাহাদেরই ব্যবহারিক ও বাণিজ্য শিক্ষার জন্য বাহিরে পাঠাইবার ব্যবস্থা হউক। দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্ভার ও সুলভ সুযোগগুলির সাহায্যে যাহাতে দেশেই গবেষণা-কেন্দ্র খুলিয়া ছাত্রদের উচ্চ ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় সেই দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষই এক দিন এশিয়ার ব্যবহারিক শিক্ষা-কেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারে। টেকনিকাল স্কুল কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে শীঘ্রই স্থাপিত হইতে বা পুনর্গঠিত হইতে পারে তাহার আশু ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। প্রাদেশিক-সরকারগুলি যে সাবালকী শিক্ষার পরিকল্পনা খুব উৎসাহের সহিত গ্রহণ করেন নাই তাহা বুঝা যায় যখন দেখি সমস্ত দেশের জন্য প্রাথমিকভাবে কেবলমাত্র ২'১০ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হওয়ার প্রস্তাব উঠিয়াছে। এ বিষয়ে আর একটি কথা, গ্রাম ও মফস্বল অঞ্চলে শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য যাহাতে উপযুক্ত পাঠাগার গড়িয়া উঠে তাহার দিকেও নজর দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

যুক্তপ্রদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন

যুক্তপ্রদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের কার্যকরী-পন্থা নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

দুই মাসকাল পূর্বে যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন স্থির হইয়াছিল যে এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হইবে। এই কমিটির সদস্য নিয়োগে প্রায় দুই মাস সময় লাগিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যুক্তপ্রদেশ সরকার সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধীরভাবে এই গুরু দায়িত্ব পালন করিতে ইচ্ছুক।

এই কমিটি প্রায় ২০,০০,০০০ জমিদারের ভাগ্য-নির্ণয় করিবে। কমিটিতে জমিদারী সম্বন্ধে জড়িত ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইয়াছে কিন্তু কংগ্রেস ও সরকারী সদস্যের সংখ্যার অনুপাত সে তুলনায় অনেক বেশী।

এই কমিটি জমিদারী প্রথা বিলোপসাধন সম্বন্ধীয় খুঁটিনাটি-কর্তব্যগুলি স্থির করিবে। রাষ্ট্র ও চাষীর মাঝখানে জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি যতরকমের মধ্যবর্তী উপস্বত্বভোগী আছে তাহাদের সকলের অপসারণের পন্থা কমিটি নির্ধারণ করিবে। এই কমিটি জমিদারী প্রথার পরিবর্তে অন্য উপযুক্ত প্রথা, অথবা নূতন পন্থায় জমি বিলিব্যবস্থা বিবেচনা করিবে না। "চাষী ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী উপস্বত্বভোগী" এক ব্যাপক সংজ্ঞা। অযোধ্যার তালুকদার হইতে আরম্ভ করিয়া আগ্রার জমিদার এবং কুমায়ুনের চাষী সম্প্রদায় সকলেই ইহার অন্তর্গত। মধ্যস্বত্বভোগী বলিতে ঠিক কাহারা সেকথা পরিষ্কার করিয়া বুঝা কঠিন। তাহা ছাড়া, যে সমস্ত জমিদার নিজের জমি নিজেরাই চাষবাস করিয়া থাকেন তাঁহারাও মধ্য-

মধ্যভোগীর পর্যায়ে পড়িবেন কি না কমিটি তাহা স্থির করিবেন। কমিটির প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য মধ্যস্বত্বভোগী বলিতে কি বুঝায় তাহার একটি নির্দিষ্ট অর্থ স্থির করা।

তাহা ছাড়া মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারিত করিলে জমির অধিকারী হইবে কে? যদি চাষী জমির অধিকারী না হইয়া গবর্মেণ্ট জমির মালিক হন তাহা হইলে চাষীরা হয় তো সন্তুষ্ট হইবে না। কারণ কংগ্রেস তাহাদের আগে হইতেই বুঝাইয়াছে যে জমিদারী প্রথা উঠিয়া গেলে জমি চাষীদেরই হইবে।

বাজেয়াপ্ত জমিদারীর ক্ষতিপূরণের পরিমাপ স্থির করাও একটি কঠিন ব্যাপার। সম্পত্তির বাৎসরিক দামের দশ হইতে বিশগুণ পর্যন্ত মূল্যের মাপে ক্ষতিপূরণ স্থির করিলে অযৌক্তিক হইবে না। বাংলাদেশে ফ্লাউড কমিশনও তাহাই করিয়াছেন। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণটি এককালীন ভাবে দেওয়া হইবে না। মিঃ রফি আহমদ কিদওয়াই বলিয়াছেন যে অল্পবিত্ত জমিদারগণকে ধনী জমিদারগণের তুলনায় বেশী অনুপাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

ক্ষতিপূরণ ও সেই সম্বন্ধীয় অন্যান্য ব্যবস্থা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। মফস্বল অঞ্চলের শাসন ও রাজস্ব আদায়ে কি ভাবে কর্মচারী নিয়োগ করা যায় কমিটিকে তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

জমিদারী প্রথা বিলোপসাধনের ফলে জমিদারগণ পৈতৃক সম্পত্তি হারাইবেন। এত দিন এই সম্পত্তিই তাঁহাদের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় ছিল। এ বিষয়ে আপত্তি জানান হইয়াছে ও দুই-একটি প্রতিবাদ সভাও ডাকা হইয়াছে। অনেক স্থলেই বলা হইয়াছে যে স্বেচ্ছাচারী কংগ্রেস সমাজের একটি অংশের উপর অন্যায় ও অবিচার করিতেছে। জমিদারগণের দাবির একটি খসড়া ও একটি প্রতিনিধিদল মহাত্মা গান্ধীর নিকট পাঠাইবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিয়া জমিদারেরা বিরোধের পথ পরিহার করিয়া কংগ্রেস গবর্মেণ্ট ক্ষতিপূরণ হিসাবে যাহা দিবেন, তাহাই লইতে মনস্থ করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে ভবিষ্যতে যদি বামপন্থী কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয় তবে তাহাদের কাছে হয়ত বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর চেয়ে কম সহানুভূতিই মিলিবে। কমিটির কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

বাংলাদেশে ১৯৩৮ সাল হইতেই জমিদারী বিলোপের আয়োজন চলিতেছে কিন্তু উহা এখনও কাগজেপত্রেই সীমাবদ্ধ। ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করিবার কোন আন্তরিক ইচ্ছা বাংলা-সরকার প্রকাশ করেন নাই।

পরলোকে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়

অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল স্বদেশসেবার পর পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ২৬শে কার্তিক মঙ্গলবার অপরাহ্নে ৪-১০ মিনিটের সময় কাশীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৫ বৎসর।

অবিচলিত নিষ্ঠার দ্বারা একজন মানুষ কি পরিমাণ সাফল্য লাভ করিতে পারেন, মালবীয়জীর সাধনা ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিবে। তাঁহার জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় বিষয় ছিল এই যে তিনি রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুতভাবে গঠনমূলক কাজও করিয়া যাইতেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার অমরকীর্তি। মালবীয়জী কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা উভয় প্রতিষ্ঠানেরই সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহাতে অনেকে বিস্ময় বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু দেশপ্রেমের সহিত স্বজাতি-হিতৈষণার মূলতঃ কোন বিরোধ নাই। তাই দেশপ্রেমিক হইয়াও তিনি স্বজাতিসেবকও হইতে পারিয়াছিলেন। এমন এক সময় ছিল যখন মিঃ জিন্নাও লীগ ও কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মালবীয়জীর স্বজাতি-হিতৈষণায় ক্ষুদ্রতা বা সঙ্কীর্ণতার বাষ্পমাত্রও ছিল না, তাই তিনি স্বজাতির সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশেরও অকৃত্রিম সেবক হইতে পারিয়াছিলেন এবং এইজন্যই অনেক বিষয়ে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহার ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে প্রগাঢ় সৌহার্দ্য প্রথম পরিচয়ের পর হইতেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অমলিন থাকিতে পারিয়াছিল।

১৮৬১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর মালবীয়জী জন্মগ্রহণ করেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি অযোধ্যায় "হিন্দুস্থানী" নামক দৈনিক হিন্দী পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। আড়াই বৎসর দক্ষতার সহিত "হিন্দুস্থানী" সম্পাদনার পর তিনি আইন পরীক্ষা পাস করেন। ৩১ বৎসর বয়সে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন।

১৮৮৬ সাল হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রায় প্রত্যেকটি কংগ্রেস অধিবেশনেই যোগদান করিয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করিতেন। স্বায়ত্তশাসনের জন্য তিনি অবিরাম সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। ১৯০২ সালে তিনি যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও দৃঢ়ভাবে জাতীয় সম্মান ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। এই সময় ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া সরকারের দমননীতিতে চঞ্চল হইয়া উঠে।

ভারত সচিব লর্ড মর্লি কার্যভার গ্রহণ করিয়াই ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কারের দিকে মনঃসংযোগ করেন। আমলাতন্ত্র পৃথক নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু লর্ড মর্লি ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সংযুক্ত ও পৃথক—এর মাঝামাঝি এক নূতন ধরণের নির্বাচনের সুপারিশ করেন। কিন্তু বড়লাট লর্ড মিণ্টো ও আমলাতন্ত্রের বিরোধিতায় তাহা কার্যে পরিণত হইতে

পারে নাই। ফলে ১৯০৯ সালের ২৫শে মে তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতিসহ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এই অবস্থায় ১৯০৯ সালে তিনি লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং তীব্র ভাষায় মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কারের প্রতিবাদ করেন। তৎপর বৎসর (১৯১০) তিনি বড়লাটের আইন-পরিষদে প্রবেশ করিয়া সরকারের মুদ্রাযন্ত্র নিয়ামক আইন ও রাজদ্রোহমূলক আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহারই প্রতিবাদের ফলে ভারতের বাহিরে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রেরণের ব্যবস্থা রহিত হয়। ১৯১৬ সালের ১৭ই নবেম্বর লীগ-কংগ্রেস যুক্ত কমিটি ভারতের ভাবী শাসন-সংস্কারের খসড়া প্রণয়ন করেন। অক্টোবর মাসে পণ্ডিত মালবীয় প্রমুখ বড়লাটের আইন-পরিষদের ১৯ জন নির্বাচিত সদস্য যুদ্ধপরবর্তী শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে এক লিপি সরকারে পেশ করেন। পণ্ডিত মালবীয় সমগ্র ভারতবর্ষ সফর করিয়া অসীম ধৈর্যের সহিত কংগ্রেসের দাবি প্রচার করিতে থাকেন। এই সময় হঠাৎ মিসেস এনি বেসান্ট অন্তরীণ হন। ১৯১৭ সালে ১০ই আগষ্ট পণ্ডিত মালবীয় এলাহাবাদের এক জনসভায় তীব্র ভাষায় সরকারের এই গর্হিত কার্যের প্রতিবাদ করেন। সরকারের দমননীতিতে বিচলিত না হইয়া নির্ভীক পণ্ডিত মালবীয় শাসন-সংস্কারের জন্ত জোর প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন। ১৯১৮ সালে জুলাই মাসে মিঃ মণ্টেগু শাসন-সংস্কার সম্বলিত প্রস্তাবের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত মালবীয় প্রস্তাবটি সংশোধনের দাবি জানাইয়া এক দীর্ঘলিপি প্রকাশ করেন।

মণ্টেগু শাসন-সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। এক দল প্রস্তাবটি বর্জন ও আর এক দল গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। পণ্ডিত মালবীয় উভয় দলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। এই সময়ে লোকমান্ত তিলক দিল্লী কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করাতে পণ্ডিত মালবীয়কেই দিল্লী কংগ্রেসের মূল সভাপতি করা হয়। পণ্ডিত মালবীয় সভাপতি হিসাবে যুক্ত কর্মপন্থার উপর জোর দিয়া এবং ভারতের স্বায়ত্তশাসন অধিকার দাবি করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। কিন্তু ভারতবাসীর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯১৯ সালে ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে মণ্টেগু চেমস-ফোর্ড শাসন-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই সময় পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। পণ্ডিত মালবীয় ডায়ারী হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্ত পঞ্জাব প্রবেশ করিতে যাইয়া ব্যর্থকাম হন। অবশেষে কংগ্রেস সাব-কমিটি মালবীয়জীর সহায়তায় ডায়ারী অনাচারের লোমহর্ষক বিবরণ জনসমাজে প্রকাশ করেন। দেশের এই দুর্দিনে কংগ্রেস তথা জাতি মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় অহিংস অসহযোগ আরম্ভ করে। পণ্ডিত মালবীয় দুই বার কারাবরণ করেন। ১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ইংলণ্ডে গমন করিয়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।

পণ্ডিত মালবীয় কংগ্রেসসেবী হইলেও হিন্দুত্ব বোধকে কোন মতেই বিসর্জন দিতে পারেন নাই। গোঁড়া হিন্দু হইলেও তিনি শুদ্ধিসংগঠন, অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। হরিজনদের জন্ত তিনি একটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাকে সমাজের অন্ততম স্তম্ভ বলিয়া মনে করিত।

কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁহার মনে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের স্বপ্ন জাগে। তাঁহার বন্ধু মুন্সী মাধোলাল তাঁহার মনোভাব জানিয়া অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলেন। কিন্তু ইহার অল্প পরই কাশীতে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়াতে তাঁহার পরিকল্পনা তখন কার্যকরী হয় না। কিন্তু ১৯০৪ সালে কাশীতে কাশীর মহারাজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তাঁহার নূতন একটি পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞান, শিল্প, কলা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশিক্ষা এবং সংস্কৃত পঠনের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দু যুবকদিগকে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রানুসারে জীবনযাপন করার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলাই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সরকারী অনুমোদন লাভের প্রশ্ন উঠিলে বেদাধ্যয়ন শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা হইতে বাদ দিতে হয়।

অতঃপর মালবীয়জী কি ভাবে সমগ্র দেশ ভ্রমণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করেন তাহা সুবিদিত। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে সতত কর্মব্যস্ত থাকিতে হওয়ায় তাঁহাকে বিরাট আইন ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে হইল। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইল এবং ভারত-সরকার বিষয়টি হাতে লইলেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহাকে এই কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া প্রকৃত ভারত-বন্ধুর কাজ করেন। অবশেষে ১৯১৫ সালে ২২শে মার্চ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বিল পরিষদে উত্থাপিত হইল এবং যথাকালে উহা আইনে পরিণত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মালবীয়জী উহার উন্নতিকল্পে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন।

কিছুদিন যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তাহার উপর নোয়াখালীতে দাঙ্গাহাঙ্গামার বিবরণ শুনিবার পরই তাঁহার অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। নোয়াখালীর ঘটনায় তাঁহার মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং তিনি সবিশেষ মর্মবেদনা অনুভব করেন। এই অসুস্থতাই ক্রমে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

শাহজাদা দারাশুকোর জীবনী

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

তৃতীয় অধ্যায়

দারার মনসব ও সুবাদারী

১

দারার মনসব ও সুবাদারী আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মোগল সাম্রাজ্যে অভিজাত শ্রেণী সম্বন্ধে কয়েকটি গোড়ার কথা বলা আবশ্যক। মোগল সাম্রাজ্যে অভিজাত শ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; পুরুষানুক্রমিক ভূস্বামীবর্গ এবং সম্রাট্ দরবারের উপাধিপ্রাপ্ত সামরিক অসামরিক উচ্চ শ্রেণীর রাজপুরুষগণ। প্রথমোক্ত অভিজাতবর্গের মধ্যে সাধারণতঃ হিন্দু সামন্তরাজগণই ছিলেন প্রধান। মুসলমান আমলে মুসলমানদিগের মধ্যে পুরুষপরম্পরা জন্মগত অধিকারে সৃষ্ট কোন জমিদার শ্রেণী ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যে স্বয়ং সম্রাট্ই একমাত্র প্রভু, যুবরাজ হইতে দীনতম ব্যক্তি সকলেই প্রজা এবং আজ্ঞাবহ ভৃত্য। তিনি অন্নদাতা, নিমকের মালিক, প্রজার ধন মান-ইজ্জৎ, এবং ধর্ম্মের রক্ষক। প্রজাগণের মধ্যেই গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাব অনুযায়ী শ্রেণীসংস্থাপনে তাঁহারই একমাত্র অধিকার, রাজসেবা ছিল আভিজাত্য লাভের প্রশস্ত পথ, এবং রাজার নিকটতম অতি বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকে রাজসংসারে এক-একটি "পোষাকী" পদ ও কার্য্যভার প্রদান করা হইত। ইয়োরোপের মধ্যযুগের সামন্ত দরবার এবং মিশরের ফাতেমী খলিফার দরবারের ন্যায় হিন্দুস্থানে সুলতানী আমলে সুলতানের খাস ভৃত্যগণ অভিজাত শ্রেণীর মুখপাত্র ছিলেন, পদবীও প্রায় অনুরূপ ছিল। সুলতানী দস্তার-খানের (আধুনিক খানার টেবিল) চাশনীগীর (যিনি প্রত্যেক পেয়ালা বা থালি পরিবেশনের পূর্ব্বে চাখিয়া দেখিতেন), সর্-দোয়াতদার (প্রধান মস্যাধার রক্ষক), হস্তী ও অশ্বশালার রক্ষকের পদ অতি সম্মানজনক ছিল। সম্রাট্ প্রথম চার্লস শিকার হইতে ফিরিবার পর তাঁহার ডান পায়ের এবং বাঁ পায়ের বুট জুতা খুলিবার পুরুষানুক্রমিক অধিকার (Grand Jack boot of the Empire) যেমন আভিজাত্যসূচক ছিল, সুলতানী আমলে সুলতানের ঘোড়ার অস্থায়ী সহিসের পদও (মীর আখোর) তদ্রূপ একটি বিশেষ অধিকার এবং শ্লাঘনীয় পদ বিবেচিত হইত। মোগল আমলে সম্রাট্ই ছিলেন সাম্রাজ্য, বাদশাহী দরবার শাহীমহলের প্রতিচ্ছবি এবং বিরাট্ সংস্করণ মাত্র। মোগল দরবারের মীর-সামান পদে নিযুক্ত হইতেন এক জন অতি উচ্চপদস্থ আমীর; কাগজে-কলমে শাহীমহলের যাবতীয় সরঞ্জাম—বাদশাহী "তোষাখানা"র (Wardrobe) সকল জিনিষের তত্ত্বাবধায়ক। অতীতকে উপহাস করিয়া "মীর সামান" বা "খান্-ই-সামান" "খানসামায়" প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে বড়লোক সাহেব-সুবার অনুরূপ পরিচর্য্যা করিতেছে। প্রাক্-মোগল যুগের "সরবত-দার" পানীয় পরিবেশক ইত্যাদি খেতাব মোগল যুগে না থাকিলেও বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে উচ্চপদস্থ আমীরগণ ঐ কাজ করিতেন।

সম্রাট্ আকবর সর্ব্বপ্রথম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে অভিজাতবর্গের মধ্যে "শ্রেণী" বা "গ্রাত" এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে লঘিষ্ঠ গরিষ্ঠ স্থান নির্ণয় এবং বেতন নির্দ্ধারণের জন্য সওয়ার নির্দ্দিষ্ট করিয়া মনসবদারী প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। মনসবদারীর বাহিরে অন্য অন্য কোন শ্রেণীর পদের অস্তিত্ব ছিল না। সরকারী বেতনভুক্ অসামরিক এবং সামরিক উভয় শ্রেণীর কর্ম্মাধ্যক্ষ, এমন কি খ্যাতনামা কবি, চিকিৎসক, চিত্রশিল্পী, রাজস্ব বিভাগের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীবর্গ, কবুতরখানার ভৃত্যবর্গ পর্য্যন্ত সকলেই ক্রমশঃ এই মনসবদারী ব্যবস্থার আওতায় আসিয়া পড়িল। সামরিক বিভাগে অশ্বারোহী যোদ্ধার অধিনায়কগণ আকবরশাহী "দহ-বাসী" হইতে "দহ-হাজারী" পর্য্যন্ত ছেষট্টি ভাগে বিভক্ত ছিল, কিন্তু সাধারণতঃ কোন সামন্ত কিংবা সেনানায়ককে "পাঁচ হাজারী"র ঊর্দ্ধে মনসব প্রদান করা হইত না। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে মনসব ক্রমশঃ ফাঁপিয়া ষাট হাজারী পর্য্যন্ত হইল, কিন্তু সাত হাজারীর ঊর্দ্ধতন মনসব সম্রাটের পুত্র, পৌত্র, শ্যালক, শ্বশুর কিংবা সম্রাজ্ঞী ভিন্ন প্রজাসাধারণকে দেওয়া হইত না। সামরিক বিভাগের প্রত্যেক শ্রেণীর মনসবদারকে কোন্ শ্রেণীর কয়টা ঘোড়া, হাতী, উট, খচ্চর এবং গরুর গাড়ী রাখিতে হইবে নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু কয় জন অশ্বারোহী সৈন্য কোন্ শ্রেণীর মনসবদার প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার "তাবিন" (Contingent) অনুযায়ী রাখিতেন উহার হিসাব আজ পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক সঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। মোটামুটি বলা যাইতে পারে "সদী" [একশতী মনসবদার] হইতে ঊর্দ্ধতন প্রত্যেক মনসব বা Command একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সামরিক ইউনিট ছিল। নমুনাস্বরূপ আইন-ই-আকবরী হইতে আমরা "সদী", "হাজারী" এবং "দহ-হাজারী" মনসবদারের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) "সদী"—ঘোড়ার সংখ্যা ও শ্রেণী—
ইরাকী ২+মুজন্নস ২+তুর্কী ২+ইয়াবু ২+
তাজী ২=১০টি ঘোড়া
হাতী বিভিন্ন শ্রেণীর ৪টি
উট ২টি
গরুর গাড়ী ৫টি
মাসিক বেতন—
প্রথম শ্রেণী—৭০০৲
দ্বিতীয় " —৬০০৲
তৃতীয় " —৫০০৲
(২) "হাজারী"
ঘোড়া—(ইরাকী ১০+মুজান্নস্ ১০+তুর্কী ২১+
ইয়াবু ২১+তাজী ২১+জঙ্গলা ২১)=
মোট ৪
হাতী—(শেরগীর ৭+সাদা (শ্বেতবর্ণ নয়) ৮+
মণ্ডোলা ৭+করাহা ৭+কণ্ডুর কিয়া ২)=
মোট ৩১
উট—২১ কাতার অর্থাৎ ২১টা
খচ্চর—৪½ কাতার (বোধ হয় ৫টিতে এক কাতার)
অর্থাৎ ২১টা
গরুর গাড়ী—৪২
মাসিক বেতন—
প্রথম শ্রেণী—৮২০০৲
দ্বিতীয় " —৮১০০৲
তৃতীয় " —৮০০০৲
[৩] দহ বা "দশ হাজারী"
ঘোড়া—ইরাকী ৬৮+মুজন্নস ৬৮+তুর্কী ১৩৬+
ইয়াবু ১৩৬+জঙ্গলা ১৩৬)=মোট ৫৪৪
হাতী—(শেরগীর ৪০+সাদা ৬০+মণ্ডোলা ৪০+
করাহা ৪০+কাণ্ডুরকিয়া ২০)=মোট ২০০
উট—১৬০ (কাতার)
খচ্চর—৪০ কাতার অর্থাৎ আনুমানিক ২০০
গরুর গাড়ী—৩২০
মাসিক বেতন ৬০ ০০০ টাকা।

আকবরনামার "পরিশিষ্ট" আইন-ই-আকবরী পুস্তকের সরকারী হিসাব অনুযায়ী এক-এক জন মনসবদারের আনুমানিক মাসিক ব্যয় :—

(ক) ঘোড়া

একটি ইরাকী [অর্থাৎ আরব দেশজাত কিংবা তাদৃশ গুণসম্পন্ন] ঘোড়ার মাসিক খাদ্য-ব্যয়—৭২০ দাম বা ১৮৲ [যথা দৈনিক ৬ সের দানা ২½ দাম; ঘি ২ দাম, চিনি ১৭॥ এবং ১৫ সের ঘাস ৩ দাম। ইহা ছাড়া "জীন" খরচ (ঘোড়ার চিরুণী, নাল, গামছা ইত্যাদি বাবত মোট) ৭০ দাম বা ১৸০)

• একটি মুজন্নস (ইরাণী-তুর্কী দো-আঁশলা) ঘোড়ার মাসিক ব্যয় ১৪৲ (৫৬০ দাম)

একটি তুর্কী (তুরাণ দেশ হইতে আমদানী) ঘোড়ার মাসিক ব্যয় ১২৲

একটি ইয়াবু (তুর্কী এবং হিন্দুস্থানী দো-আঁশলা) ঘোড়ার মাসিক ব্যয় ১০৲

একটি তাজী (মত্রজন্ম ভবেত্তাজী) মত্র অর্থাৎ পশ্চিম পঞ্চনদ দেশজাত উৎকৃষ্ট ঘোটকী ৮৲

একটি জঙ্গলা (দেশী মাঝারি)

(খ) হাতী

শেরগীর শ্রেণী—মাসিক ব্যয় ৩০।০ (১২১০ দাম)

সাদা (সাধারণ)—মাসিক ব্যয় ২০৲

মণ্ডোলা " " ১৫৲

করাহা " " ১৩৲

কাণ্ডুরকিয়া " " ৭॥০

(গ) উট

একটির মাসিক ব্যয় ৮৲

(ঘ) গরুর গাড়ী

প্রত্যেক গাড়ীর জন্য বরাদ্দ ১৫৲ (৪টি বলদের খোরাকী ১২৲, চাকার চর্ব্বি, মেরামত ইত্যাদি ৩৲)

উল্লিখিত খরচবাদ ঘোড়সওয়ার, চাকর-বাকর ইত্যাদির বেতন ও মজুরি মোটামুটি নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) অশ্বারোহী, ইরাণী-তুরাণী মাসিক ২৫৲; হিন্দুস্থানী ২০৲

(২) একটি শেরগীর অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর হাতীর মাহুত, "ভৈ", মেঠ ইত্যাদি পাঁচ জন চাকর। মাহুতের মাসিক বেতন ৪॥০; "ভৈ" মাসিক বেতন ২॥৵০, মেঠ দৈনিক মজুরী চারি দাম বা ৵২॥০

(৩) প্রত্যেক দুইটি ঘোড়ার জন্য একজন সহিস,
মাসিক বেতন ৩।০
আস্তাবলের ভিস্তী (১৫ ঘোড়ার আস্তাবল)
মাসিক বেতন ২।০
আস্তাবলের ফর্‌রাশ (সরঞ্জাম রক্ষক)
মাসিক বেতন ৩.০
আস্তাবলের ঝাড়ুদার " " ১৸৶১০
কুলীর মজুরি দৈনিক ২ দাম আনুমানিক ১৭॥
[৪০ দামে এক টাকা হিসাবে]

(৪) প্রত্যেক ৫০টি উটের জন্য একজন "সর্‌বান্", এবং উহার অধীনে পাঁচ জন চাকর।
"সর্‌বানে"র বেতন মাসিক ৫৲
প্রত্যেক চাকর দৈনিক ২ দাম বা ৵১০

খরচপত্র বাদ দিয়া মনসবদারগণের লাভ বিশেষ কিছুই থাকিত না। এ জন্য প্রথম প্রথম মনসবদারগণ মিলিটারী ঠিকাদারগণের ন্যায় সরকারকে ঠকাইবার জন্য অনেক কাণ্ড করিতেন, বদায়ুনীর ইতিহাসে উহার সবিস্তার উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তীকালে সামরিক বিভাগে দুর্নীতি দমন করিবার উদ্দেশ্যে আকবর বাদশাহ সুলতানী আমলের "দাগ" [ঘোড়ার গায়ে সরকারী মার্কা] এবং "চেহারা" [সিপাহীর অঙ্গাবয়ব বর্ণনা বা হুলিয়া] পুনঃপ্রবর্ত্তিত করেন। এক জন পাঁচ হাজারী মনসবদার সাধারণতঃ এক হাজার অশ্বারোহী নিজ তাবিনে রাখিলেই বোধ হয় পাঁচ হাজারীর বেতন পাইতেন। ছোট বড় সকল মনসবদার একমাত্র সম্রাটের আজ্ঞাধীন। প্রয়োজনমত কোন অভিযানে দশ হাজারী মনসবদারের অধীনে এক হাজারী, সাত হাজারীর অধীনে সাত শতী মনসবদারকে কাজ করিবার হুকুম সম্রাট্ দিতে পারিতেন, কখনও কখনও এক জন উচ্চপদস্থ সর্ব্বাধিনায়কের নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিবার জন্য দুই বা ততোধিক কিঞ্চিৎ নিম্নপদস্থ (যথা এক জন সাত হাজারীর অধীনে "চার হাজারী" হইতে "হাজারী" পর্য্যন্ত) মনসবদার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইলে এই অধীনস্থ মনসবদারগণকে "কৌমকী" বা সাহায্যকারী সেনানায়ক বলা হইত। প্রধান সেনাপতি সাধারণতঃ এইরূপ "কৌমকী" মনসবদারের কোনরূপ গুরুতর শাস্তিবিধান করিতে পারিতেন না, সম্রাটের কাছে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা শান্তির সময়ে প্রত্যেক মনসবদারকে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণের যানবাহন, রসদ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইত। বাদশাহ হুকুমজারি করিয়াই প্রায় খালাস। এইজন্যই পাঁচ হাজারী মনসবদারকে এক হাজার ঘোড়ার জন্য পাঁচ হাজারীর বেতন দেওয়া হইত।

২

বাদশাহী আমলে সরকারী কোষাগার হইতে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য দুই রকম বৃত্তি এবং বেতনের ব্যবস্থা ছিল। কেহ কেহ প্রথমে দৈনিক ভাতা পাইতেন (যথা, উজীর সাদুল্লা খাঁ) পরে তাঁহারা মনসবদার পদে উন্নীত হইতেন। যাঁহারা ভাতা পাইতেন তাঁহাদিগকে "রোজিনাদার" বলা হইত। মনসব প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শাহাজাদাগণ দৈনিক ভাতা পাইতেন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি হইতে ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর পর্য্যন্ত শাহজাদা দারা দৈনিক এক হাজার টাকা ভাতার "রোজিনাদার" ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুজাকে শাহজাদাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দশ হাজারী মনসব প্রদান করিয়া দাক্ষিণাত্য অভিযানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ঐ বৎসরের ৫ই অক্টোবর শাহজাহানের চান্দ্র মাসানুযায়ী জন্ম দিনের দরবারে দারা প্রথম মনসব লাভ করিলেন—বার-হাজারী ["জাত"] ছয় হাজার "সওয়ার" এই উচ্চতম পদমর্য্যাদার সহিত দিল্লী সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী শাহজাদাকে সরকার হিসারের (বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত) ফৌজদারী প্রদত্ত হইল। হুমায়ুঁ বাদশাহ হইতে শাহজাহান পর্য্যন্ত সম্রাটগণ রাজ্যারোহণের পূর্ব্বে স্ব স্ব পিতার নিকট হইতে সরকার হিসার জায়গীরস্বরূপ পাইয়া আসিতেছিলেন। এইজন্য "ফৌজদার-ই-হিসার" যেন শাহী আমলের প্রিন্স অব ওয়েলস অর্থাৎ সম্রাটের মনোনীত যুবরাজ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নিউ ইয়ার্স ডে এবং সম্রাটের জন্মদিন গেজেটের ন্যায় সম্রাট আকবরের সময় হইতে নওরোজ-দরবার, এবং সৌর ও চান্দ্র মাস অনুসারে গণিত সম্রাটের জন্মতিথিদ্বয় উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত "ওজন-ই-শম্‌সী" এবং "ওজন-ই-কমরী" —এই তিন বার প্রতি বৎসরে মনসব, খেতাব ও ইজাফার (মনসবদারগণের পদবৃদ্ধি) তালিকা বাহির হইত। জন্মতিথিদ্বয়ে "ওজন" বা তুলাপুরুষ-দানের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আকবর বাদশাহ প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন,* এবং উহা আলমগীরশাহী আমলের প্রথম কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই জন্মতিথিদ্বয়ের প্রকাশ্য দরবারে "নওরোজ" দরবারের ন্যায় অভিজাতবর্গ এবং প্রত্যর্থীগণের নিকট হইতে বাদশাহ নজর গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে খেলাত প্রদান করিতেন, এবং "ওজনে"র দ্রব্যাটি দীনদুঃখী ফকিরকে খয়রাত এবং সাধারণের হিতার্থে চিকিৎসক ও আলেমগণকে দান করা হইত। রাজস্ব এবং বিজয়লব্ধ

* সৌর জন্মতিথিতে সম্রাট আকবরকে নিম্নলিখিত দ্রব্যের দ্বারা ওজন করা হইত—যথা স্বর্ণ, পারদ, রেশম, গন্ধদ্রব্য, ভেষজঔষধি, ঘি, লৌহ, পারসার, সাতপ্রকার খাদ্যশস্য, লবণ, তুতিয়া [Ruh-i-tutiya ?] ইত্যাদি। এই দিনে সম্রাটের যত বৎসর বয়স পূর্ণ হইত তত সংখ্যক ভেড়া ছাগল ও পাখী,—যাহারা এই সমস্ত প্রতিপালন করে তাহাদিগকে দান করা হইত, এবং বহুসংখ্যক ছোট জানোয়ারকে বন্ধনমুক্তি দেওয়া হইত। চান্দ্র জন্মতিথিতে সম্রাটকে রৌপ্য, রাঙ (tin), বস্ত্র, সীসা, ফল, তরিতরকারী এবং সরিষা তৈলের দ্বারা ওজন করা হইত। উভয় পর্ব্বেই সাল্-গিরা উৎসব হইত। অন্দর মহলে রক্ষিত একটি রজ্জুতে প্রতি বৎসর সৌর-চান্দ্র বৎসর হিসাবে এক-একটি গ্রন্থি যোগ করিয়া বয়সের হিসাব রাখা হইত। আকবরের সময় দানসামগ্রীর অধিকাংশ ব্রাহ্মণগণ পাইতেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বে ব্রাহ্মণের ভাগ ক্রমশঃ কম হইতে হইতে শাহজাহানের রাজত্বে শূন্যে পরিণত হইল (লাহোরী, বাদশাহনামা)। [ওজনের জন্য দ্রষ্টব্য *Ain*, ii—Blochmann, p. 266-67, footnote.]

ধনের এক অংশ দিল্লীশ্বর এই ভাবে প্রজাগণকে পুনঃপ্রদান করিতেন—"সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।"

৩

ইহার পর শাহজাদা দারার মনসব অস্বাভাবিক রকম দ্রুত গতিতে বাড়িয়া কয়েকটি ইজাফা বা প্রমোশনের পর পাঁচ বৎসর পরে দাঁড়াইল, বিশ হাজারী জাত ও দশ হাজার সওয়ার। এই পাঁচ বৎসরের পরবর্ত্তী দশ বৎসর অর্থাৎ ১৬৩৮ হইতে ১৬৪৮ পর্য্যন্ত যুবরাজের "জাত" বাড়ে কমে নাই বটে, কিন্তু "সওয়ার" কয়েকবার বাড়িয়াছিল, এবং এই "সওয়ার"-এর মধ্যে ছিল কয়েক হাজার "দো-আস্পাহ", "সে আস্পাহ"। মনসবের শ্রেণী বা "জাত" না বাড়াইয়া অনুগৃহীত কিংবা সুদক্ষ মনসবদারের বেতন ও জায়গীর বৃদ্ধি করিয়া পুরস্কৃত করিবার ইহাই ছিল ব্যবস্থা। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দারার 'জাত' বিশ হাজারী হইতে ত্রিশ হাজারী এবং আট বৎসর পরে ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ত্রিশ হাজারী হইতে চল্লিশ হাজারী হইয়া গেল। এই সময়ে শুজা ও আওরঙ্গজেবের মনসব একুনে দারার মনসব অপেক্ষা কম ছিল। কনিষ্ঠ হইলেও দাক্ষিণাত্য এবং মধ্য এশিয়া অভিযানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া আওরঙ্গজেব অপেক্ষাকৃত অলস স্বভাব শুজার সহিত সমান পদমর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। দারাকে সর্ব্ববিষয়ে সম্রাট কনিষ্ঠ কুমারগণের নাগালের বাহিরে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঊর্দ্ধে রাখিয়াছিলেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাট শাহজাহানের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের অশুভ সূচনা-স্বরূপ রোগশয্যা গ্রহণের কয়েক দিন পরে "পিতৃভক্তি ও শুশ্রূষা"র পুরস্কারস্বরূপ শাহজাদা দারা পিতার নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজারী মনসব এবং ভ্রাতৃবিরোধের প্রাক্কালে ষাট হাজারী "জাত", চল্লিশ হাজার "সওয়ার" (উহার মধ্যে ত্রিশ হাজার "দো-আস্পাহ", "সে-আস্পাহ") লাভ করিয়াছিলেন।

দারার মনসবের হিসাব-নিকাশ হইতেই বুঝা যায় বাদশাহী আমলের ইতিহাস এই যুগে কি প্রকার দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। মনসবদারী প্রথার "জাত", "সওয়ার", "দো-আস্পাহ", "সে আস্পাহ" ইত্যাদি মারপ্যাচ বুঝিবার মত কাগজপত্র বোধ হয় উজীর সাদুল্লা খাঁর পেশদস্ত বা পেশকার রাজা রঘুনাথের বংশধরগণ* আগুন পোহাইয়া নিঃশেষ করিয়াছেন। জয়পুরে শেষ পর্য্যন্ত যাহা ছিল তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন নিজাম বাহাদুরের অজ্ঞাত পুরাতন দপ্তর একমাত্র ভরসা। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্লকম্যান এবং ডাঃ পল হর্ণ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত গবেষকগণ "জাত", "সওয়ার", "দো-আস্পাহ" (দুই ঘোড়া), 'সে-আস্পাহ' (তিন ঘোড়া) ইত্যাদির বেতন, প্রত্যেক মনসব অনুযায়ী ঘোড়সওয়ার এবং ঘোড়ার সংখ্যা নিরূপণ করিতে গিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণের গবেষণায় অধিক আলোকপাত হইবে কিনা ভবিতব্যই বলিতে পারেন।

৪

সম্রাট্ শাহজাহানের ৬৬তম চান্দ্র জন্মতিথি (শনিবার, ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) শাহজাদা দারার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। মহারাণা রাজসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শাহানশাহ তাঁহার নবনির্ম্মিত রাজধানী দিল্লী-শাহজাহানাবাদের দেওয়ান-ই-আম প্রাসাদে এই জন্মতিথি উৎসবের দরবারে শাহজাদা দারাকে 'শাহ-বুলন্দ-ইকবাল" উপাধি দান করিয়াছিলেন। দরবার বসিবার পূর্ব্বে শাহী "জামদারখানা"* বা বসনাগার হইতে আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের মণিমুক্তাখচিত বাদশাহী পোষাক দারার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া শাহজাদা সম্রাটের তুলাপুরুষ-দান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইলেন। "ওজন" ব্যাপার সমাপ্ত হওয়ার পর শাহানশাহ তাঁহার উষ্ণীষ হইতে "সর্‌বন্দ" [উষ্ণীষ বন্ধনী] খুলিয়া নিজ হস্তে পুত্রের পাগড়ীতে বাঁধিয়া দিলেন। দুই লহর দামী মুক্তার মালা এবং গোলাপী রঙের একটি বড় বৈদূর্য্যমণি [রুবী] এই সর্‌বন্দে ছিল—মূল্য সাড়ে চার লক্ষ টাকা। উক্ত খেলাত এবং "সরবন্দ" ব্যতীত নগদ ত্রিশ লক্ষ টাকা শাহজাদাকে 'ইনাম' দেওয়া হইল। মসনদ-ঝরোকা বা সিংহাসন-অলিন্দে সেই দিন ময়ূর-সিংহাসনের† পার্শ্বে শাহানশাহর হুকুমে একটি সুবর্ণনির্ম্মিত রাজপীঠ স্থাপিত হইয়াছিল। শাহানশাহ পুত্রকে "শাহ-বুলন্দ ইকবাল" উপাধি দ্বারা অভিহিত করিয়া উক্ত সুবর্ণপীঠে উপবেশন করিবার আদেশ দিলেন। স্বভাবনম্র যুবরাজ সম্রাটের সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করিতে বিলক্ষণ ইতস্ততঃ

* কটক শহরে সার যদুনাথের প্রতিবেশী ছিলেন রাজা রঘুনাথের অন্যতম বংশধর লালা ব্রিজনারায়ণ। রঘুনাথের পরিবারের এক শাখা নিজাম-উল-মুল্‌কের সহিত দাক্ষিণাত্য চলিয়া গিয়াছিলেন। এই শাখার শেষ খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন পরলোকগত মহারাজ সার্ কিষণপ্রসাদজী। ব্রিজনারায়ণজীর কাছে তাঁহার পূর্ব্বজগণের এক বংশতালিকা দেখিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার আমল পর্য্যন্ত ঘরবোঝাই বাদশাহী সেরেস্তার কাগজপত্র তাঁহাদের বাড়ীতে ছিল। তাঁহারা ছোট কালে নষ্টপ্রায় ঐ সমস্ত কাগজ পোড়াইয়া অগ্নিসেবা করিয়াছেন।

* "জামদারখানা তু বসনাগারং"—রাজব্যবহারকোষ

† ময়ূর সিংহাসন কিংবা মুসলমান আমলের কোন মসনদের পায়ায় সিংহমূর্ত্তি ছিল না এবং উহার গঠনও চেয়ারের মত নহে (*Vide* Sarkar, *Studies in Mughal India.*)

করিয়া আপত্তি জানাইলেন ; কিন্তু পিতার একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধে তাঁহাকে বসিতেই হইল।

ঐতিহাসিক ওয়ারেস্‌ লিখিত বাদশাহনামায় এই ঘটনার যেরূপ বর্ণনা আছে শাহজাদার পীর মোল্লা শাহ বদ্‌খশীর নিকট লিখিত দারার এক চিঠিতে উহাই সঠিক এবং বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। দারা গুরুকে জানাইতেছেন —

[দরবারে খেলাত বিতরণ, পদোন্নতি ইত্যাদির পর] আলা হজরত বলিলেন, "বৎস! আমি সঙ্কল্প করিয়াছি আজ হইতে কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া হাত দেওয়া হইবে না। খোদাতালার অসীম অনুগ্রহে তোমার মত পুত্র পাইয়াছি, ইহার জন্য তঁাহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ।" দরবারের পর শাহান্‌শাহ্‌ ওমরাহ্‌ এবং দরবারীগণকে হুকুম দিলেন তাঁহারা শাহজাদাকে এই নূতন সম্মানপ্রাপ্তির জন্য মোবারকবাদ জানাইতে পারেন। বিশ দিন পরে (২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৬৫৫ ইং) স্বয়ং সপরিষদ সম্রাট শাহজাদা দারার দৌলতখানায় পদার্পণ করিয়া পুত্রকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। [সেকালের] নূতন দিল্লীতে যমুনাতীরে যে অনুপম প্রাসাদে শাহজাদা বাস করিতেন, তিনি উহার নাম রাখিয়াছিলেন "নিগমবোধ-মঞ্জিল"। এইখানে তিনি এই সময় উপস্থিত অর্থ এবং ভাবী অনর্থকে উপেক্ষা করিয়া পরমার্থ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, অবশ্যম্ভাবী ভ্রাতৃবিরোধের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার আয়োজন না করিয়া শাহজাদা তখন যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ, ভগবদ্‌গীতা এবং প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক অনুবাদে ব্যস্ত ছিলেন।

৫

শাহজাদা দারাশুকোর সুবাদারী—

১। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে রাজশ্যালক শায়েস্তা খাঁর স্থলে যুবরাজ দারা সুবে এলাহাবাদের সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। আকবরশাহী আমলে সুবে এলাহাবাদের পূর্ব্ব সীমা সুবে বিহার, পশ্চিমে সুবে আগ্রা, উত্তরে সুবে আউধ বা অযোধ্যা, দক্ষিণে "বন্ধু" বা বর্ত্তমান বান্দা জিলা। সুবে এলাহাবাদ দশটি সরকার এবং ১৭৭ পরগণায় বিভক্ত। ইহার রাজস্ব ২১ কোটি ২৪ লক্ষ ২৭,৪১৯ দাম বা আনুমানিক টাকা ৫৩,১০,৬৮৫।৵৯ পাই* চুণার, কাশী, গাজীপুর, জৌনপুর, কালঞ্জর, কারা-মাণিকপুর, কোরা (ফতেপুর) প্রভৃতি এই সুবার অন্তর্গত। পিতা শাহজাহান প্রিয়তম পুত্র দারাকে দরবারে রাখিয়া নায়েব-সুবেদার দ্বারা সুবার শাসনকার্য্য চালাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তদনুসারে শাহজাদা তাঁহার অন্তঃপুররক্ষী বিশ্বস্ত খোজা বাকী বেগকে সুবে এলাহাবাদের নায়েব-সুবেদার নিযুক্ত করিলেন। অর্থনৈতিক কিংবা সামরিক দৃষ্টিতে শাহজাদা তাঁহার অধীনস্থ কোন প্রদেশের মূল্য যাচাই করিতেন না। এলাহাবাদের সুবাদারী লাভ করিয়া তিনি সুপ্রসিদ্ধ উদার মতাবলম্বী সূফী সাধক শেখ মুহিবুল্লা এলাহাবাদীকে এক পত্র লিখিয়া সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছিলেন। পরে দারা ইঁহাকে উপ-গুরু রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দারা-মুহিবুল্লার তত্ত্ব-বিচার-বিষয়ক পত্রাবলী অত্যন্ত উপদেশপূর্ণ। এই সুবার অন্যতম আকর্ষণ ছিল কাশীধাম* এবং তথাকার পণ্ডিত মণ্ডলী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতি দারার শ্রদ্ধা ও দাক্ষিণ্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কবীন্দ্রাচার্য্য সরস্বতী এবং পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ (তৈলঙ্গবাসী) বাদশাহী দরবারে গমন করিয়াছিলেন।

২। এলাহাবাদের সুবাদারীর দুই বৎসর পরে (মার্চ্চ ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) সুবে লাহোর অর্থাৎ পঞ্চনদ প্রদেশ শাহজাদা দারাকে দেওয়া হইল। এই প্রদেশের পশ্চিমে মুলতানের উপবিভাগে সিন্ধুনদ, পূর্ব্বে শতদ্রু, উত্তরে কাশ্মীরের প্রবেশদ্বার ভীম্বর গিরিবর্ত্ম, দক্ষিণে বিকানীর ও রাজপুতানার মরুভূমি। আকবরশাহী আমলে ইহার আয়তন কিঞ্চিৎ বড় ছিল।

এই সময়ে শাহজাদা আওরঙ্গজেব প্রধান সেনাপতি রূপে মধ্য-এশিয়ার বলখ্‌ রাজ্য জয়ে নিযুক্ত ছিলেন। কুমার দারাকে লাহোরে রাখিয়া আওরঙ্গজেবকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সম্রাট কাবুল শহরে বৎসরাধিককাল ডেরা করিয়াছিলেন। রণসম্ভার, খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার ভার ছিল লাহোরের সুবাদারের উপর। ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এলাহাবাদের ন্যায় পঞ্চনদ প্রদেশও দারার অধীনে ছিল। লাহোরের উপকণ্ঠে অধুনাতন মিঁয়ামীর ষ্টেশনের নিকট ছিল শাহজাদার "দাদাপীর" মিয়া-মীরের আস্তানা। ইঁহার শিষ্য মৌলানা শাহ বদ্‌খশী দারার দীক্ষা-গুরু। লাহোর শহরের নিয়ুলো নৌলাখা মহল্লায় যোগসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী বাবা লালের সহিত হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে রায় চন্দ্রভান

* *Ain-i-Akbari*, Blochmann & Jernett, part ii, pp. 157-168.

* কাশীতে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তথাকার "দারানগর" মহল্লায় বসিয়া দারাশুকো ১৩৮ জন পণ্ডিতের সাহায্যে উপনিষদের ফার্সি তর্জ্জমা করিয়াছিলেন (*Benares District Gaz.* p. 196)। সুপণ্ডিত মহেশ দাস তাঁহার এক প্রবন্ধে অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন "উপনিষদ" দিল্লীতেই অনূদিত হইয়াছিল, কাশীতে নহে (Vide *Modi Memorial Volume*, pp. 622-633; Bombay, 1930)। আমি সমসাময়িক কোন ইতিহাসে দারার কাশীযাত্রার হদিস পাই নাই, কিন্তু এই বিষয়ে নেভিল সাহেবের জনশ্রুতি গ্রহণ করিয়া ভুল করিয়াছিলাম; পরে সংশোধন করিয়াছি (Vide *Dara Shukoh* p. 22. footnote, p. 150)।

ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শাহজাদার নয় দিন ব্যাপী তর্ক চলিয়াছিল। রায় যাধবদাস কর্তৃক উভয় পক্ষের প্রশ্নোত্তর নাদির-উল-নুকাত নামক পুস্তিকায় ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। নানা কারণে লাহোরের সহিত দারার বহু স্মৃতি বিজড়িত। শহরের উন্নতি কল্পে তিনি কয়েকটি "চক্" (একাধিক রাস্তার সংযোগস্থলে নির্মিত সুপরিসর বাজার) নির্মাণ করিয়াছিলেন। লাহোরবাসিগণ উদারহৃদয় দানশীল দারাকে মনেপ্রাণে ভালবাসিত। সাম্রাজ্য লাভ করিবার পর "কাফের" দারার স্মৃতি লাহোরবাসীর মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য আওরঙ্গজেব বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বিরাট "বাদশাহী মসজিদ" নির্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, লাহোরবাসী মুসলমানগণের নিকট এই মসজিদ "আক্কেল-দমা" নামে কুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। শিখগণের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ইংরেজ সরকার মুসলমানদিগকে এই মসজিদের অধিকার দান করিবার পরেও আক্কেল গুড়ুম হইবার ভয়ে কুসংস্কারাবদ্ধ কোন কোন মুসলমান এইখানে নমাজ করিতে আপত্তি করিত* বলিয়া এক সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন।

৩। সুবে গুজরাট—

১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত দুই সুবার সহিত সুবে গুজরাটের শাসনভার যুবরাজ দারার উপর অর্পিত হইয়াছিল। সুবে গুজরাটের আয়তন বুরহানপুর হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৩০২ ক্রোশ; বিস্তৃতি রাজপুতানার জালোর হইতে কাম্বে উপসাগরের তীরবর্ত্তী বন্দর "দামন" (বর্ত্তমানে পর্তুগীজ অধিকার) পর্য্যন্ত ২৭০ ক্রোশ এবং "ইডর" রাজ্য হইতে কাম্বে পর্য্যন্ত ৭০ ক্রোশ। আকবরশাহী আমলে ইহার রাজস্ব ছিল এক কোটি নয় লক্ষ বিশ হাজার পাঁচ শত সাতান্ন টাকা আট আনা (কাফি খান)। গুজরাটের নিতান্ত বিশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা সুব্যবস্থিত করিবার উদ্দেশ্যে শাহজাদা দারা তাঁহার সুদক্ষ নায়েব-সুবাদার বাকী বেগকে সুবে এলাহাবাদ হইতে গুজরাটে বদলী করিলেন। শাহজাদার সুপারিশ অনুসারে শাহানশাহ বাকী বেগকে বাহাদুর খাঁ খেতাব দান করিয়াছিলেন। দারা স্বয়ং গুজরাটে পদার্পণ করেন নাই। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ এবং দুই বৎসর পরে কনিষ্ঠ শাহজাদা মুরাদবখ্‌শ গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই সুবে গুজরাটের বদলে সুবে মুলতান এবং কাবুল দারাকে দেওয়া হইল।

আকবরশাহী আমলে সিন্ধুপ্রদেশ জয়ের পূর্ব্বে মুলতান স্বতন্ত্র সুবা ছিল না; লাহোরের অধীনে উহা একটি "সরকার" বা জিলা হিসাবে গণ্য হইত। সিন্ধুর স্বাধীন নরপতি মীর্জ্জা জানী বেগ রাজ্যচ্যুত হইবার পর সিন্ধু এবং মুলতানকে লইয়া সুবে মুলতান গঠিত হইয়াছিল। পঞ্জাবের অন্তর্গত ফিরোজপুর হইতে কচ্ছগাণ্ডবা (বেলুচিস্থান) এবং মক্‌রাণের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত এই সুবার দৈর্ঘ্য ৬৬০ ক্রোশ, এবং মুলতানের নিকটবর্ত্তী খটপুর হইতে জয়সলমীর রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি ১০৮ ক্রোশ। এই প্রদেশের রাজস্ব তিন লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচ শত নব্বই টাকা আট আনা।

আকবরশাহী আমলে কাশ্মীর ও কান্দাহার কাবুল সুবার অন্তর্গত ছিল। শাহজাহানের সময়ে কাশ্মীর একটি স্বতন্ত্র সুবা হইয়াছিল। শাহজাহানের সময় অচিরস্থায়ী সুবে কান্দাহার হস্তচ্যুত হওয়ায় পর কাবুল, গজনী, পেশাওয়ার, সওয়াত উপত্যকা এবং বন্নু জিলা লইয়াই সুবে কাবুল বহাল রহিল। দারার কান্দাহার অভিযানের সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান শুকো কাবুলের নায়েব-সুবাদার ছিলেন। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহার অভিযানে ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিবার সময় দারা সুলেমান শুকোর স্থলে বাহাদুর খাঁকে কাবুলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাহাদুর খাঁ লাহোরে বদলী হওয়ায় তাঁহার স্থানে রুস্তম খাঁ বাহাদুর ফিরোজ-জঙ্গ কাবুলের নায়েব-সুবাদার নিযুক্ত হইলেন।

বাংলা এবং উড়িষ্যার সুবাদার শাহ শুজা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সুবে বিহার পাইবার জন্য লালায়িত ছিলেন। তিনি সুবা হাতে পাইলে শাহ শুজা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে এই আশঙ্কায় ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পিতার নিকট হইতে বিহার প্রদেশ দারা নিজের নামে লিখাইয়া লইলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই শাহ শুজা বিদ্রোহী হইয়া বলপূর্ব্বক বিহার প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিলেন।

উপরিকথিত সুবাসমূহ ব্যতীত সম্রাট যুবরাজ দারাকে আরও দুইটি লাভজনক পদ প্রদান করিয়াছিলেন। কোয়েল (বর্ত্তমান আলীগড়) সরকারের ফৌজদারী এবং আগ্রা-দিল্লীর মধ্যবর্ত্তী বাদশাহী রাস্তার "রাহদারী" বা পথরক্ষক পদের আয় ছিল মোট সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা। এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দারাকে অর্পণ করিয়া শাহজাহান পরোক্ষ ভাবে রাজধানী দিল্লী ও আগ্রার কর্তৃত্ব তাঁহাকেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কোয়েল (আলীগড়) সরকারের ফৌজদার ছিল প্রকৃত পক্ষে যমুনার অপর পারে আগ্রা ও দিল্লীর পূর্ব্বদিকবর্ত্তী দোয়াব-জিলার সর্ব্বময় কর্ত্তা। চম্বল নদীর তীরবর্ত্তী আগ্রার অনতিদূরে ঢোলপুর ঘাট হইতে বাদলী (দিল্লীর ছয় মাইল উত্তরে) পর্য্যন্ত বাদশাহী রাস্তার "রাহদার" উত্তর এবং দক্ষিণ দিক হইতে রাজধানীদ্বয়ের প্রবেশ-পথে প্রহরীস্বরূপ। সুবে এলাহাবাদ, মালব, আজ-

* *Lahore Gazetteer*, 1883 pp. 24, 176

মীর লাহোর হইতে কোন শত্রুর পক্ষে বর্ত্তমান আলীগড় জিলার ফৌজদার এবং উক্ত বাদশাহী সড়কের প্রহরীকে এড়াইয়া দিল্লী-আগ্রা প্রবেশ করা অসাধ্য ব্যাপার। সরকারী ডাক চলাচলের ইহাই ছিল প্রধান রাস্তা। সম্রাট শাহজাহান কুমার চতুষ্টয়ের স্বভাব এবং মতিগতি লক্ষ্য করিয়া যেন ভাবী অনর্থের আশঙ্কায় শাহজাদা দারাকে এই উভয় পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। পুত্রগণের মধ্যে এই কার্য্যের জন্য দারা যোগ্যতম না হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যক্তি। যোদ্ধা এবং শাসক হিসাবে দারার জীবন ঘটনাবহুল কিংবা বৈচিত্র্যপূর্ণ নহে। আকবরশাহী আমলের শাসনতন্ত্র একটি স্বয়ংক্রিয় বিরাট্ যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া দারার অনুপস্থিতি এবং অমনোযোগ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের প্রধান সুবাসমূহ তাঁহার নামে নায়েব-সুবাদারগণ নির্ব্বিঘ্নে শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

উলুখড়

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বদ্যিনাথ নাপিতের বাড়িটা গ্রামের একটেরে। ওর বাড়ির পশ্চিম দিক থেকে আরম্ভ হয়েছে দু'ক্রোশব্যাপী বিলের মাঠ। তার আগে কেরামত মিঞার গোটা দুই বাঁশঝাড়ের পিঠে চাটুজ্যেদের দেড় হাজারী আমবাগান। দক্ষিণ দিকে পড়ে মুসলমান পাড়া। বলতে গেলে কোঠাঘর ওদের কারও নেই। কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ গরুর গাড়ির গাড়োয়ান; কেউ বা করাতি আর ঘরামিগিরি করে দিন গুজরাণ করে। মেয়েরাও বসে থাকে না।

ক্রোশটাক পথ গেলেই গঙ্গার ওপারে বর্দ্ধমান জেলা পড়ে। সেখানে ধান আর আলু পাওয়া যায় সস্তায়। গরুর গাড়ি বোঝাই করে এপারের গাড়োয়ানরা ওপার থেকে আলু আর ধান নিয়ে আসে। আলুটা সম্পন্ন গৃহস্থেরা বেশি করেই কিনে রাখেন, বাজারে বিক্রীর জন্য কড়েরাও কেনে। আর ধান কিনে দিনমজুরি করে খায় যে সব লোক—কি হিন্দু—কি মুসলমান—সকলেই। না কিনলে সকালে পান্তা ভাত আর বিকেলে মজুরি করে এসে তপ্ত ভাত—এক এক জনের প্রায় এক সের চালের দাম সামান্য দিনমজুরির পয়সায় কুলোবে কি করে। কাজেই প্রায় সকলের বাড়িতে ঢেঁকি আছে। মেয়েরা ধান ভানে।

কিন্তু সে সব সোনার দিনও আর নেই। চালের বরাদ্দ হয়েছে—দু' বছরের ওপর। শহরে মজুররা তো আধ-পেটা খেয়ে আছে—পাড়াগাঁয়েও অগ্নিমূল্যে কিনতে হচ্ছে। অবশ্য মজুরিও হয়েছে আবার ডবল। কিন্তু জিনিসের দাম যা বেড়েছে—তাতেও মজুরি বাড়লেই বা দুঃখ ঘুচছে কই। তার উপর আর এক উৎপাত এক বছরের ওপর সুরু হয়েছে। এক জেলা থেকে আর এক জেলায় ধান চাল কিছুই নাকি ওপর-ওয়ালার হুকুম ভিন্ন নিয়ে যাওয়া চলবে না। গাড়োয়ানরা প্রথম প্রথম আলুর বস্তার সঙ্গে ধানের বস্তা পাচার করত। তার পর ঘাটে বসেছে পুলিস পাহারা। তা সে সব কাটাবার মন্ত্রও ওরা জেনে নিয়ে মাল গস্ত করত। তার পর পুলিসের বড়কর্ত্তা এক দিন নিজে এসে আস্তানা গাড়লেন, পারঘাটায়। এ সত্ত্বেও মাল যে আসছে না তা নয়—কিন্তু চুনোপুঁটিদের পক্ষে সেদিকে হাত বাড়ানো বামনের চাঁদে হাত দেওয়ার মত। নিরুপায় শ্রমিক-বধূরা ওপর পানে চেয়ে নালিশ জানায়—গালি দেয় তাদের—যারা মানুষের অন্ন মারবার জন্য এমন ষড়যন্ত্র করেছে। তারা ভেবেই পায় না—মাত্র এক ক্রোশ দূরের ওই শহর থেকে মাল আনা নিষিদ্ধ হয়েছে কোন্ কানুনের বলে! মাঝখানে একটা নদী আর পারানির ব্যবস্থা না থাকলে ওরা কানুনকে কি আমলে আনত। রাতারাতি খালি করে ফেলতে পারত গুদাম। কিন্তু পারানি নৌকা ভিন্ন আরও নৌকা রয়েছে, রাত-বিরেতে পারঘাটা না হোক আঘাটায় নৌকা লাগিয়ে—ধান বা পাটের জমি ভেঙ্গে মাল আনার চেষ্টা যে না হয়েছিল তা নয়, বেশি দিন চলে নি সে কৌশল। আজকাল মহাজনের আড়তে বসেছে পাহারা—নদীর ঘাটে-অঘাটে আছে পাহারা। ওরা আগে এত সতর্ক ছিল না, কিন্তু রাত-বিরেতে একটু কষ্ট করে বার হতে পারলেই ট্যাঁক ভারি হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট—তাই কষ্টকে ওরা কষ্ট বলে গ্রাহ্যই করে না।

যাই হোক, মজুররা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না। এ বিষয়ে বদ্যিনাথ আর রহমতের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। বলতে গেলে পিঠাপিঠি বাস দু'জনের। মাঝখানে কাদি মত এক টুকরো জমিতে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থ গাছ। তার নীচেয় আধ ভাঙ্গা দরজা। এক কালে হয়তো ওর কদর ছিল—আজকাল এখানে শ্রদ্ধা-ভক্তির নিদর্শন বড় একটা দেখা যায় না। আসলে অশ্বত্থতলায় প্রত্যহ যা জমে—তা নাপিত-বাড়ি আর করাতি-ঘরামি-মিস্ত্রি বাড়ির ছেলেমেয়েদের খেলার আসর। রহমতের ছেলেমেয়েরা আনে কাঠের গুঁড়ো—যা কাজ শেষে থলে বোঝাই করে রহমৎ বাড়িতে নিয়ে আসে উপরিপাওনা হিসাবে। এগুলি যারা ধুপ তৈরি করে—তাদের বেচে দিলে ট্যাঁকেও কিছু আসে। বদ্যিনাথের

ছেলেমেয়েরা ছোট খোন্তা বা শাবল এনে অশ্বথতলা খুঁড়ে মাটি বার করে—পেতলের ঘটিতে করে আনে জল। তারপর জলে মাটিতে মেখে তৈরি করে ছোট ছোট কাদার গুলি। তার চার ধারে কাঠের গুঁড়ো মাখিয়ে দিব্যি লাড্ডু বানিয়ে ময়রা দোকানের কেনা-বেচা সুরু করে। আরও অনেক খেলা আছে—তার মধ্যে এইটি হ'ল প্রধানতম। সংগৃহীত কাঠের গুঁড়ো কমলে রহমৎ যা তা বলে গাল দেয় ছেলে-মেয়েদের—আর তাতেই ওদের খেলায় আমোদটা হয়তো বাড়িয়ে দেয়।

বদ্যিনাথ বলে, ও গুয়োটার জাতই ওই রকম করাতি ভাই। কোথায় বাদাড়ে একটা লাউয়ের চারা লক্‌লকে ডগা মেলে কাদা মাখামাখি হচ্ছিল—তুলে এনে উঠোনের এক ধারে বসালাম—দিব্যি মাচা তৈরি করে দিলাম—আর গুয়ো-টারা কিনা তাই উপড়ে রান্না রান্না খেলা করছে। ক্ষেতি অপচো ওদের ধম্ম।

রহমৎ বলে, সাধ করে গাল দেই ভাই, রোজি রোজ-গারের তো এই ছিরি! চালে আগুন লেগেছে, দুনিয়ার জিনিষে আগুন লেগেছে—এমন করে খোদা সব দিক দিয়ে আমাদের মারছে।

বদ্যিনাথ বলে—খোদা মরুক ভাই মানুষই মারছে। এই তো একক্রোশও নয় কালনা, মানষে ধান চাল আনতে পারে না কেন? বেং তোর আইন—বলে একটা অশ্লীল উক্তি করলে।

রহমৎ বলে, দেখে নিয়ো বদ্দি ভাই—এমন ধারা গোনা (গুনাহ) চিরকাল থাকবে না।

আরও অনেক আক্ষেপ কটূক্তিতে ওদের আলাপ-আলো-চনা সুদীর্ঘ হতে পারত—কিন্তু বদ্যিনাথের বউয়ের তীক্ষ্ণ গলার স্বর ভেসে এল, মাগো মা, জাত জন্ম সব গেল! এ পাড়ায় বাস করলে শতেকখোয়ার হবে না তো কি তোলা থাকবে।

বদ্যিনাথের মেয়ের গলা শোনা গেল, কি মা, কি হয়েছে?

কি হয়েছে! চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পাওনা বুঝি কোথাকার। একটু রোদ হয়েছে দেখে ধানগুলো রোয়াকে দিয়েছিলাম শুকোতে, কোথা থেকে এক পাল কুঁকড়ো এসে গব গব করে গিলতে সুরু করেছে। মর মর এখানে কেন, মনিবের সঙ্গে কবরখানায় যাও না।

রহমৎ হেসে বললে, জরু বড্ড রেগেছে বদ্দি ভাই। আর সত্যি—এত ধালাতন করে কুঁকড়োতে—ধুয়ে খেতে দেয় না।

বদ্যিনাথ বললে, তা যাই বল—ভারি নোংরা কিন্তু। ওসব না পোষাই ভাল।

রহমৎ বললে, না পুষলে খাব কি। ডিম বল—ধাড়ী বল বেচে টেচে পরণের কানিটা আসটা যোগাড় করতে হয়—। আর মাংস তো আর পয়সা দিয়ে কেনবার সাধ্যি নেই—মাঝে মাঝে মুখ বদলানোও চলে। পরে হেসে বললে, খাবে একদিন সাঙাৎ—ভারি উত্তম মাংস।

বদ্যিনাথ প্যাচ্ প্যাচ্ করে মাটিতে থুথু ফেলে বললে, ওয়াক্ থু—শুনলে বমি আসে।

রহমৎ হাসতে হাসতে বললে, বড় বড় বাবুভাইয়া তোপা-তাল্লা করে দিচ্ছে বলেই তো কুঁকড়োর দাম আগুন। মনিষ্যি জম্মে সব জিনিস যদি না খেলে তো খোদাকে জবাব দেবে কি?

বদ্যিনাথের গরু গিয়েও এক একদিন রহমতের নড়বড়ে বেড়া ভেঙে ঝিঙের চারায় লাউয়ের ডগায় মুখ দেয়। রহমতের বউও ছেড়ে কথা কয় না—বাপ চৌদ্দপুরুষ তুলে গাল দেয়। বদ্যিনাথের বাড়ির প্রান্ত থেকে সে গাল প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। এসব ঘটে দুপুরের মুখে। বদ্যিনাথ আর রহমৎ কাজে বেরিয়ে গেলেই—হাতে যদি ধান সেদ্ধ কাপড় সেদ্ধ আর টুকিটাকি কাজ না থাকে তো দু'পক্ষের বাক্যযুদ্ধ দীর্ঘতরই হয়। প্রতিবেশীরা সহানুভূতি দেখানোর ছলে দু'পক্ষে যোগ দিয়ে ব্যাপারটাকে ঘোরালো করে তোলে। হিন্দুর দেবতা—বা মুসলমানের আচার-আচরণ এসব এমন ইতর গালিগালাজের মারফত ছড়িয়ে পড়ে—যার এক কণা কানে গেলে মাথায় রক্ত চড়ে ওঠে। কিন্তু ঝগড়া শুধু ঝগড়াই। ওর মধ্যে দেবতা ধর্ম্ম আচার আচরণকে টেনে আনলেও কেউ সেটা গভীরভাবে গ্রহণ করে না।

রহমৎ বলে, মাগীনরা অমনি সারাদিন চেঁচিয়ে মরে—ভাল করে খেতেও পারে না। হেসে বলে, তা সে ভালই—একটা দিনের খোরাক বাঁচলে লাভ বৈ লোকসান নেই।

বদ্যিনাথ বলে, ধর্ম্মের ওরা বোঝেই বা কি—ভাই গলা ফাটিয়ে পাড়া মাত করে।

ধর্ম্মের মর্ম্ম বদ্যিনাথ বা রহমৎ যা বোঝে তা পীরের দরগায় শিরণি দেওয়া—বারোয়ারি তলায় মাথা নোয়ানো—সন্ধ্যের সময় বা সকালে—নমাজ পড়া—পূজো করা আর কোরাণ শরীফ বা ভাগবত শুনতে বসে ধান চাল কাঠ কলাই—নিজ নিজ সংসারের কথা ফুসফাস করে আলোচনা। এর বেশি বোঝবার অবসরই বা কোথায় এদের। যে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন—তিনিই তো তাদের কাঁধে চাপিয়েছেন নানান রকমের ঝঞ্ঝাট। উদয়াস্ত পরিশ্রম না করলে তিনি তো আর আসমান থেকে আশরফি বোঝাই কলসীটা উপুড় করে ঢেলে দেবেন না ওদের কুঁড়েঘরের জঠরে। সমাজের যাঁরা বড়লোক—তাঁরা কত রকমের জাঁকজমকের মধ্যে ধর্ম্মকে কাঁপিয়ে তুলছেন। নতুন মন্দির বল, মসজিদ বল, গরীব কাঙালী খাওয়ানো বল, কোরান পাঠ বা কথকতা দেওয়াই বল—কি না করছেন তাঁরা। বেহেস্তবাস খোদা যাঁদের দৌলতখানার ওপর আশরফির জালাটা উপুড় করেই রেখেছেন—তাঁরা করবেন বৈ কি এসব। ঘেটে-খাওয়া দিন-

মজুরের পয়সায় দু' পয়সার বাতাসা বা পাটালি কিনে হরির লুট বা পীরের শিরণি দেওয়া ছাড়া—এদের দ্বারা কতটুকুই বা সম্ভব।

যাই হোক—যা এরা বোঝে না বা জীবনধারণের অনুপান হিসেবে কচিৎ কদাচিৎ ব্যবহার করে তার জন্য এদের মাথা-ব্যথাও কম।

কিন্তু সম্প্রতি মাথাব্যথা সুরু হয়েছে।

এক দিন বদ্যিনাথ রহমতকে বললে, আচ্ছা ভাই—আজকাল তোমার ছেলেমেয়েদের অমন বিট্‌কেল বিট্‌কেল নাম রাখ কেন?

রহমৎ বললে, মৌলবীরা বলে দিয়েছে যে। বলে খবরদার হিঁদু নাম রাখিস নে।

বদ্যিনাথ হেসে বললে, জাত যাবে বুঝি?

রহমৎ বললে, তুমিও যেমন বদি ভাই—নাম নিয়ে ত মানুষের ভারি কাম—রাখলেই হ'ল একটা। এই যে ছাগলটাকে ডাকি—আয় ছিলি পাতা খাবি আয়। প্যা প্যা করতে করতে ওকি ছুটে আসে না? বলে হা হা করে হাসতে থাকে।

পাশাপাশি বাস করতে গেলেই ঝগড়াটা আসটা লেগেই থাকে—তা বলে দু' বাড়ির ভাব-সাবও কম নয়। বদ্যিনাথের ছেলেমেয়ের আমাশয় করলে রহমতের বউ খট করে ছাগলের দুধ নিয়ে আসে, রহমতদের অসুখবিসুখে বদ্যিনাথের বউও গরুর দুধ দিয়ে সাহায্য করে। এ ছাড়া চাল-ডাল আনাজ-পাতির বিনিময় তো আছেই। চিরাচরিত সংস্কারবশতঃ ছোঁয়াছুঁয়ির বিধানটা এরা মানে। তবে সহজ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মত তার মধ্যে দোষের কিছু দেখে না। মেয়েদের মধ্যেই জাত-বিচারটা বেশি। রহমতের বাড়ি থেকে এলেই বদ্যিনাথের বউ মাথায় ঘড়াকতক জল ঢালবেই আর গঙ্গাজল ছিটিয়ে সব কিছু শুদ্ধ করে নেবেই। ছেলে-মেয়েরা অনবরত মেশামেশি করে বলে, অতটা শুদ্ধাচারে তাদের রাখা চলে না। তবে হাত পা ধোয়া বা মাথায় গঙ্গা-জল ছিটানো—এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবার জো নেই। বদ্যি-নাথের বউ ভাঙ্গা চালাটায় বসে রাঁধলেও সদর দরজার ওপর দৃষ্টি ওর প্রখর। কে আসছে—কে বার হয়ে যাচ্ছে, এক দিকে রান্না সামলে অন্য দিকে সেটুকু তার নজর এড়াবার জো নেই। যাহোক, আজকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মত টিক্ টিক্ করতে হয় না। ওরা বাড়িতে ঢুকেই দাওয়ায় বসল ঘড়ার জলে পা ধুয়ে—কুলুঙ্গির ওপর গঙ্গাজলের ঘটিটি থেকে অল্প একটু জল মাথায় ছিটোয় তবে ঘরে ঢোকে। পুরুষদের অত বালাই নেই বিচারের। ওরা দোকানের খাবার পর্য্যন্ত এক সারে বসে খায়—কেবল তামাক খাবার সময় হুঁকোটার দিকে একটু নজর রাখে। কলকের যে আগুন জলে তা সব সময়েই শুদ্ধ—আর হুঁকোতে জল না থাকলে জাত-বিচারে বাধে না। আর ছোঁয়া-লেপার বিধি-বিধান মানতে গেলে বদ্যিনাথের জাত-ব্যবসায় তুলে দিতে হয়। বেলা দুটো তিনটে পর্য্যন্ত শুচি-অশুচি, ভদ্র-অভদ্র যে-কোন লোককে ক্ষৌরি করে—এক পয়সার তেল ব্রহ্মতালুতে দিয়ে—পুকুরে স্নান করে তবে ও বাড়িতে ফেরে। এত বেলা পর্য্যন্ত বিড়ি তামাক না খেয়ে একটানা কাজ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব কি? মাঝখানে এই অবস্থাতেই জলখাবার (মুড়ি, পকান্ন বা জিভে গজা) খেয়ে বাটি দুই জলও তো খেতে হয়। না খেলে …কিন্তু এসব নিয়ে ওদের মাথা ঘামে না। ধর্ম্মের একটা বাঁধাধরা ছক আছে—সামাজিক নিয়মে বা জাত-ব্যবসায়ের চাপে যেটুকু সুবিধা অসুবিধা তা দেহ-ধর্ম্মের অন্তর্গত বলেই সেই ছকের দাগে পা ফেলে চলতে পারলেই এরা ইহকাল ও পরকাল দুই করা হ'ল ভেবে খুশীমনে দিন কাটায়। তার বাইরে যেটা—সেই নিয়েই আন্দোলন বা মাথাব্যথা।

আজকাল দিন বড় খারাপ পড়েছে। এই বাঁধা-ধরা ছকের দাগগুলো জোর করে মুছে দেবার চেষ্টা চলছে। কারা চেষ্টা করছে তা বদ্যিনাথ বা রহমৎরা জানে না। বহুপুরুষ পাশাপাশি বাস করে—এমন নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত ওরা ছিল যে ভাবতেই পারে নি, তুচ্ছ সব ব্যাপার এমন ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে।

সেবার কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়ে গেল। বদ্যিনাথের বয়স তখন পঁচিশ, রহমতেরও ঐ রকম। ওরা তো হেসেই অস্থির।

রহমৎ বলেছিল, ওসব বদলোকের কাজ বদি ভাই।

বদ্যিনাথ বলেছিল, না মিঞা, শহরের আজব কারখানা। কে কার কড়ি ধারে কেনে—কাজেই তোমার জান গেল কি আমার দৌলত গেল ওদের তো কচু।

রহমৎ বলেছিল, ওরা কারা ভাই?

বদ্যিনাথ খানিক ভেবে জবাব দিয়েছিল, ওরা—হ'ল গিয়ে গুণ্ডা। লোককে খুনজখম করা হল ওদের ব্যবসা।

রহমৎ বলেছিল, তাই বল, নইলে মানুষ কখনো মানুষকে খামকা মারতে পারে। মানুষের খুন দেখলে মানুষের কলজে ঠাণ্ডা মেরে যায় না।

তার পর কত বছর গেছে। শহর এগিয়ে এসেছে এই পাড়াগাঁর পানে। রহমৎ বদ্যিনাথরা অনেক কিছু দেখছে—শুনছে, তবু ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারছে না—এও সম্ভব কিনা। চিরকাল প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় হিন্দুরা মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে যায়। বিজয়া দেখতে হিন্দু ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মুসলমান ছেলেমেয়েরাও ভিড় জমায়। এটাকে ওরা দেশের পরব বলেই জানে—জাতির পরব বলে আমল দেয় না। সবাই তেলে ভাজা খাবার কিনে খায়, এক পয়সায়

বাঁশী বা বেলুন কিনে আমোদ করে, বিশেষ রকমের সাজসজ্জা ক'রে ঠাকুর দেখতে আসে। একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ নিয়ে খুশী-মনে ঘরে ফিরে এই বিষয়ের আলোচনাও করে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত।

বছর কতক আগে মসজিদের সামনে বাজনায় আপত্তি উঠল। অবশেষে আপোষ হ'ল—সারা রাস্তা বাজনা বাজিয়ে মসজিদের বিশ হাত আগে ও বিশ হাত পিছে বাজনাটা থামাতে হবে। একটা বিদারণ-রেখা মনের মধ্যে যে পড়ল—সেকথা অস্বীকার করে লাভ নেই।

বদ্যিনাথ বললে, এটা কি ঠিক হ'ল রহমৎ ভাই।

রহমৎ বললে, আমরা আর কতটুকু বুঝি বদ্যি ভাই, যারা বুঝদার—কানুনওয়ালা—

বদ্যিনাথ চটে উঠে বললে, ছুতোরি কানুন! যা চিরকাল হয়ে আসছে—

রহমৎও অশ্রাব্য গাল দিয়ে চিরকালের বিধানকে উল্টে দেবার চেষ্টা করলে। কথান্তর হতে মনান্তর হ'লই। পুরো একটি দিন বদ্যিনাথের ছেলেমেয়েরা দরগাতলায় খেলা করতে গেল না। ওদের বাড়ির উত্তরে যে ষষ্ঠীতলা আছে—আর কয়েকটি ছেলেমেয়ে জুটিয়ে খেলা করলে। কিন্তু তাতে ওদের খেলা জমল না।

পরের দিন দরগাতলায় গিয়ে বদ্যিনাথের আট বছরের মেয়ে সুবি বললে, এই দেলজান—খেলবি ?

দেলজান ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, না ভাই বাপজান মানা করেছে।

দেলজানের মা দাওয়া থেকে বেরিয়ে এসে বললে, হুঁ—মানা করেছে! তামাম দিন ধরে বসে বসে আমার জান খাও। যা—বলছি।

দেলজানের এটুকু আপত্তি ছিল না। ছুটে যেতে যেতে বললে, বাপজান যদি শুধোয়—

দেলজানের মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, শুধোবে! ইঃ—বলে মরদের ইদিকে নেই উদিকে খুরোদ কত! ইঃ—

তার পর দিন রহমৎ বললে, ও বদ্যি ভাই—দাড়িটা খানিয়ে দাও না।

বদ্যিনাথ ক্ষুর ভাঁড় নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বললে, মুখটুকু চেঁচে তুলে দেব কিন্তু।

রহমৎ বললে, চাচা কি বলছিল জান—ওসব বড় বড় কথা বড় বড় লোকরা বুঝুক গে। আমরা খেটে খাই আমাদের অত হ্যাংনামে কাজ কি!

যা বলেছ! বদ্যিনাথও হাসলে।

দিনকতক পরে হাঙ্গামা একটু বাধল। শালের ব্যবসায়ে কিছু টাকা পুঁজি করে বিলায়েৎ হোসেন ফিরে এল দেশে। সব দেখে শুনে সে বললে, ছি ছি—একি অবস্থা তোদের! হিন্দু বাড়ি যাতবিত্তি করে আছিস বলে ধর্ম্মকে একেবারে বরবাদ দিয়েছিস! পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়িসনে—রোজাটাও পালিস নে! ছি—ছি!

দরগায় দরগায় ঘটা করে একদিন শিরনি দেওয়া হ'ল। মসজিদে মসজিদে কোরানের বয়েৎ পাঠ আরম্ভ হ'ল। বেশ উৎসাহের সঞ্চার হ'ল চারিদিকে।

বদ্যিনাথ বললে, এসব ভাল মিঞা। ধর্ম্মের আলোচনা যত বেশি হয়—

রহমৎ বললে, আলবৎ। কিন্তু বড় শক্ত ধর্ম্মরে ভাই। একটু ফুসফাস্ করবার যো নেই—মিয়ারা চটে আগুন!

যাই হোক—ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে ঐক্যবোধ সবার মনেই ক্রিয়া সুরু করলে।

সব পাড়ায় অবাধগতি বদ্যিনাথের। একদিন হিন্দু পাড়ার সমাজপতি কালীপ্রসাদ তাঁর বৈঠকখানা থেকে ডাকলেন বদ্যিনাথকে। প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ঘর—লোকে ভর্ত্তি। কি একটা আলোচনা হচ্ছিল হঠাৎ থেমে গেছে—তার থমথমে ভাবটা এখনও মিলায় নি—সেটা ঘরে ঢুকেই বদ্যিনাথ অনুভব করলে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে সে মেঝের এক ধারে বসল।

তার পর বদ্যিনাথ—দেশের হালচাল কি!—গড়গড়ার নলটা তাকিয়ার ওপর ঠেস দিয়ে রেখে কালীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

আজ্ঞে আপনাদের ছি-চরণের আশীর্বাদে খবর ভালই।

কালীপ্রসাদ একটু চড়া গলায় বললেন, তোমার কথা জিজ্ঞেস করি নি। সে তো দেখছিই চোখে—হিন্দু-মুসলমান মুচি-মুদ্দফরাস সবাইকে ক্ষৌরি করে বেশ দু' পয়সা ট্যাঁকে তুলছো। বলি একটা হাঙ্গামা বাধলে টাকাটা সামলে রাখতে পারবে তো ?

জাতিগত ধূর্ত্তামির প্রবাদটা মিথ্যা নয়—বদ্যিনাথ বিনীত হাস্যে ঘাড় নামিয়ে বললে, আজ্ঞে অপনাদের কৃপা থাকলে—

কালীপ্রসাদ নলটা তুলে নিয়ে সজোরে কয়েকটা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, তাই রেখো। তোমার স্যাঙাৎরা ক্ষেপলে কে তোমায় বাঁচায় দেখা যাবে। বলি নাপিতের ছেলে হয়ে—এমন আকাট তো দেখি নি বাপু। ওদের মধ্যে ফিসফাস্ সলাপরামর্শ কি সব চলছে খবর রাখ—না ক্ষুরভাঁড় বগলে করে গলা কাটবে এই ফিকিরে টো টো করে ঘোরো ?

বদ্যিনাথ বললে, আজ্ঞে—একথা ঠিক, আগেকার মত মনের মিল কারও নেই। ফুসফাস্—হাঁ—তা হয় বৈ কি। কিন্তু সত্যি বলতে কি সবাই তো বড় বড় কথা বোঝে না।

না বুঝুক—কিন্তু বুকে ছুরি বসাবার আগে মুখের শয়তানী হাসি তো বুঝতে পারে। একটু থেমে বললেন, তোমার স্যাঙাৎদের বলো—বিলায়েৎ হোসেনকে যেন এবার কমিশনার ইলেকশনে ভোট না দেয়। নজর মিঞা অশিক্ষিত হলেও দিলটা ওর ভাল, ওকে যেন ভোট দেয়।

আজ্ঞে তা বলবো।

আর শোন। কালীপ্রসাদ বদ্যিনাথের দিকে একটু সরে এলেন—বদ্যিনাথও উদ্যতফণা সাপের মত তক্তপোষের ধার ঘেঁষে ঘাড়টাকে কাৎ করলে। তারপর ফুস্‌ফাস্‌ সলা-পরামর্শ অনেকক্ষণ ধরে চলল।

ইলেক্‌শনটা কোনরকমে কেটে গেল। বিলায়েৎ হোসেনেরই জয় হ'ল। কি করে জয় হ'ল এ অবান্তর প্রশ্ন করে লাভ নেই—তবে সকলেই বলাবলি করতে লাগল নজর মিঞার নজর আর একটু উঁচু হলে কি হ'ত বলা যায় না। ভোটনদী পার হবার উদ্যোগ ওর তেমন ছিল না। সেকালের ছেঁড়া সতরঞ্চি পেতে লোক বসিয়ে—একখিলি পান ও গোটাকতক বিড়ি—বদনায় করে খানিকটা জল আর খেলো হুঁকোটা (তাও মাত্র একটা) বারকতক হাত ফেরাফিরি করলেই ও-নদী পার হওয়া যায় না। বড় বড় পাসি কেটে সোডা লেমনেড পান সিগারেট—অঢেল বিলিয়ে—গাড়িতে চাপিয়ে—মুখে চোঙ লাগিয়ে চিৎকার করে অপর পক্ষ এক এলাহী কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল, যার ফলে—মোট কথা কম যাই হোক মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যেও দলীয় মনোভাব পৌর ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেবার জন্য ধীরে ধীরে মাথা তুলছে।

বদ্যিনাথ বললে, তোমাদের আব্দার মন্দ নয় রহমৎ—চাষের জমি কমিয়ে কবরের জমি বাড়িয়ে দাও!

রহমৎ বললে, আব্দার কিসে! কবরের জমি না হলে মানুষকে কি করে গোর দেবে?

উত্তর একটা বদ্যিনাথের ঠোঁটের আগায় আসছিল—সামলে নিলে। আজকাল রহমৎ একরকম হয়ে গেছে। ঠাট্টা-তামাশা বোঝে না—গোসা করে শুধু শুধু।

বদ্যিনাথ বললে, ওর চেয়ে আমাদের ব্যবস্থা ভাল, জমি নষ্ট হয় না।

রহমৎ বললে, তুমি আমি তো সবই বুঝি, ওসব বিষয়ের কথা না বলাই ভাল।

বদ্যিনাথ বললে, আমরা ভাল-মন্দ কিছুই বুঝি না? বাঃ রে একটু থেমে বললে, এবার কোরবানিতে নাকি উট জবাই হবে।

হেসে বললে রহমৎ, হাঁ—উটের মাংস নাকি খেতে ভাল।

কালে কালে কতই দেখব—বলে বদ্যিনাথ মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

বিলায়েৎ যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। কাছে এসে বললে, নাপতের পো কি বলছিল রে রহমৎ?

রহমৎ বললে, না—ও একটা কথা।

কথা তো জানি—কিন্তু কথাটা কি। ধমকের সুরে বিলায়েৎ প্রশ্ন করলে।

ধমক খেয়ে থাবড়ে গেল রহমৎ। আম্‌তা আম্‌তা করে বললে, এই কবরে অনেক জমি যায়—

হুঁ—তা বলবে বৈ কি। ওরা চায় আমাদের ঐ ধর্মকে উচ্ছেদ করে গাঁয়ে একাধিপত্য করে। শোন্‌। না—চ দেখি পাড়ার মধ্যে সবাইকে নিয়ে মজলিস বসাতে হবে।

রহমৎ বেগতিক দেখে সরে পড়ছিল—বিলায়েৎ খপ করে ওর হাতখানা সাপ্‌টে ধরে বললে, চল্‌।

তারপর দিনকতক কালীপ্রসাদের বৈঠকখানায় আর বিলায়েৎদের দরগাতলায় রীতিমত সলাপরামর্শ চলতে লাগল। গুজবের পাখায় ভর করে আসন্ন সঙ্কট দ্রুত এধার-ওধার আনাগোনা সুরু করে দিলে।

তার পর এল সুভাষ-জন্মতিথি। জয় হিন্দ—আর বন্দে-মাতরম্‌ ধ্বনি পাড়া কাঁপিয়ে গাঁ কাঁপিয়ে উত্তেজনার ঝড় বইয়ে দিলে।

তারপর মন্ত্রীমিশন এলেন বিলাত থেকে। বড় কিছু একটা জিনিষ—সেটা স্বাধীনতাই হবে—দেবার জন্য হিন্দু-মুসলমানদের ভেতর থেকে বাছা বাছা লোকদের ডাকলেন দিল্লীতে। বাদ-বিতণ্ডায় আবহাওয়া গরম হয়ে উঠল। সেখানকার গরম আব-হাওয়াতে তিষ্ঠোতে না পেরে সিমলার ঠাণ্ডায় টেনে নিয়ে গেলেন বৈঠক। সেখানেও পাঁচ কষাকষি দরদস্তুর টীকা-টিপ্পনিতে বৈঠক ফেঁসে যায় যায় হ'ল। কংগ্রেস মুখ ফেরালে—লীগ হাত বাড়ালে। কিন্তু হেস্তনেস্ত একটা করবার জন্য ওদেশের কর্তারা পণ করে বসলেন। সংখ্যা-সাম্যের ভিত্তিটা শিথিল হতেই কংগ্রেসের বিরোধিতা কেটে গেল কিন্তু লীগের হ'ল গোসা। মন্ত্রীমিশন কোন রকমে নিজেদের দায়িত্ব বড়-লাটের বিবেচনার ওপর ফেলে দিয়ে সরে পড়লেন—গরম দেশের গরম আবহাওয়া থেকে।

এত যে খবর—সত্য অর্দ্ধসত্য মিথ্যা গুজব ইত্যাদি জাতিতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে কাগজে আর লোকের মুখে পরিবেশিত হতে লাগল—তার ক্রিয়া ব্যর্থ হ'ল না। কোথায় দিল্লীর দপ্তরে দুই দলের মনকষাকষির ব্যাপার—গুজবে সংবাদে গড়িয়ে এল এই গাঁয়ের বুকে। ছড়িয়ে পড়ল লোকের মনে মনে বিষের ক্রিয়া সুরু হ'ল। আত্মগৌরবে ঘা লাগল—ওদের দল এদের দলের উপর টেক্কা মারলে বলে। স্বাধীনতার অর্থ কি যারা মাথা খুঁড়েও বুঝতে পারে না—তারাই চোখা চোখা বুলি আওড়াতে লাগল।

একদিন বদ্যিনাথ বললে, কি রহমৎ ভাই, চুল ছাঁটবে না?

না।

দাড়ি কামাবে না?

না।

কেন ভাই—গোসা কিসের?

গোসা কিসের আবার—কামাব না—খুশী আমার। ব্যস। রহমৎ চলে গেল।

বদ্যিনাথের পাশে এসে দাঁড়াল তার জ্ঞাতি ভাই-পো রতন। বললে, কাকা—ওদের নাপিত এসেছে আলাদা, সেই ত কামাচ্ছে।

ঘটে।

ওরা বলছে—হিঁদুদের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখবে না।

বজ্রিনাথ দু' চোখ কপালে তুলে রতনের কথা শুনতে লাগল।

বিস্ময় আরও বাড়ল—একা বজ্রিনাথের নয় সারা গাঁয়ের—যখন শুনলে ক'দিন ধরে কলকাতার বুকের ওপর একটা দানবীয় কাণ্ড ঘটে গেছে। ক'দিন পরে কাগজ এলে জানা গেল এই কাণ্ডে লোক মরেছে পাঁচ হাজারের ওপর—জখম হয়েছে প্রায় পনেরো হাজার।

সবাই বললে, কাগজে কি আর বেশী করে লিখতে পারে, আদ্ধেক কলকাতাই হয়ত-বা সাবাড় হয়ে গেল। হিসাব আরম্ভ হ'ল কোন্ সম্প্রদায়ের কত জন। কারা আগে আক্রমণ করেছে কোন্ দলকে। পুলিস আছে—সৈন্য আছে আইন-কানুনের ভার নিয়ে স্বয়ং লাটসাহেব ও মন্ত্রীরা আছেন যেখানে—সেখানে এমন নৃশংস ব্যাপার ঘটল কি করে? গ্রামের হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

কালীপ্রসাদ বজ্রিনাথ আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের ডাকিয়ে বললেন, শুনেছিস তো সব—এখন কি করবি ঠিক করলি?

বজ্রিনাথ হাত জোড় করে বললে, কি করব হুজুর কলকাতার মত হলে—

কালীপ্রসাদ বললেন, বাস করিস ত ওদের পাড়ার গায়ে—কোন সাহসে মেয়েছেলে নিয়ে এখনও দিব্যি ঘুম মারছিস রাতে?

বজ্রিনাথ কাঁপতে লাগল ঠক ঠক করে। কাঁদকাঁদ স্বরে বললে, কোথায় সরাব মেয়েছেলে—কোন কুলে ত কেউ নেই। তা ছাড়া গরু—দু-চারখানা বাসন-কোসন বাক্স-বিছানা একটা লাউগাছ—

ছুত্তোরি লাউগাছ! যদি বাঁচিস পরাণে ত লাউ খাবি—না—আহাম্মুখ কোথাকার, যেখানে হোক ওদের সরিয়ে দে—ভলান্টিয়ার দলে নাম লেখা।

বাড়ি আসতেই বজ্রিনাথের বউ বললে, ওগো এই মাত্তর রহমতের বউরা চলে গেল। বললে, বুন—এখানে থেক না—দিনকতক গা-ঢাকা দাও। হাংনাম মিটলে এসো।

কোথায় গেল?

কে জানে—ওর কুটুম বাড়ি না খালার বাড়ি।

বিকেলে নাপিত পাড়াটা খালি হয়ে গেল।

আজকের সন্ধ্যের অন্ধকার বড় বেশি ঘন হয়ে গাঁয়ের মাথায় চেপেছে। আকাশ পরিষ্কার—নক্ষত্রে ঠাসা—ভাদ্র মাসের গুমোটে গাছের পাতাটি নড়ছে না। ওধারে মুসলমান পাড়াটাও ঘুমিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। না-দেখা যায় ছিটে-বেড়ার ফাঁকে কেরোসিন ডিবিয়ার হাওয়ার-কাঁপা বিচ্ছিন্ন আলো—না শোনা যায় রুগ্ন ছেলের ভাত খাবার জন্য ঘ্যান-ঘেনে বায়না। মুরগী আর ছাগলগুলোকে পর্য্যন্ত বিপদের গণ্ডীর ওপারে সরানো হয়েছে। বিরাট অশ্বত্থ গাছটা সজাগ প্রহরীর মত এপাড়া ওঁপাড়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু-পাড়ার ভাবগতিক দেখছে। ওর শাখা থেকে—পাতা থেকে অন্ধকার-মাখা সারা দেহ থেকে সন্দেহ-বিষের বাষ্প এধারে-ওধারে ছড়িয়ে পড়ছে।

বজ্রিনাথের পাশে রতন এসে দাঁড়াল। হাতে তার একখানা দা। বললে, যদি আসে ত এর বাড়ি কষে এক ঘা বসালে—

বজ্রিনাথ নিঃশব্দে হেসে বললে, তার চেয়ে লম্বা লাঠি এক গাছা তৈরি করে নিস রতনা—পাল্লায় অনেক দূর পাবি। আমার বল্লমটা দেখেছিস ত?

বাঃ—দিব্যি শান দিয়েছ ত কাকা।

বজ্রিনাথ আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বললে, আজ সারা দিন পাথরের ওপর বালি দিয়ে দিয়ে ঘষেছি—শান কি অমনই হয়!

ওদিকে রহমতের পাশে দাঁড়িয়ে তার প্রতিবেশী রহিম।

রহিম বললে, নাপিতের পো ইয়া সড়কি বানিয়েছে—দেখিস নি?

রহমৎ বললে, সড়কি! এই থান ইঁটের কাছে জারিজুরি চলবে না কারও—হুঁ।

আচ্ছা ওদের দলের কাছে পারব ত আমরা?

আলবৎ পারব। শুকরা থেকে ভাল দেখে থান ইঁট বোঝাই কর দিকি দরগাতলায়।

যাই বল রহিম চাচা আমার মাছ-মারা কোঁচাটা নেব—এক ঘা বসালে কোন সুমুন্দির আর চ্যাঁ-কোঁ করতে হবে না। বলে আর একজন হাসলে।

এ ধারের লোক দেখলে অন্ধকারে কয়েকটা ছায়া চলা-ফেরা করছে—ওধারের লোকেরা গুণতে সুরু করেছে ততক্ষণ, এক—দুই—তিন—

অশ্বত্থ গাছের মোটা গুঁড়ির ফাঁকে এক জোড়া চোখ জল জল করে জ্বলে উঠল।

বজ্রিনাথ বল্লমটা উঁচিয়ে ধরে ফিস্ ফিস্ করে বললে, রহমৎ না?

আগুন নিভে গেল—খস্‌খস্ শব্দ উঠল কিছু চলে যাওয়ার। রতন হেসে বললে, দূর—ও একটা শেয়াল।

বজ্রিনাথ আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে শেয়ালের চোখ অত বিশ্রী ভাবে জ্বলে? মানুষের মনের আগুন পশুর চোখে আশ্রয় নিয়েছে কোন্ লগ্নে? আশ্চর্য্য বলতে হবে।

দিনের আলোর তবে সাহস আসে। সারারাত জেগে

শরীর টলছে—মাথা ঘুরছে। নিজের ঘরে নিশ্চিন্তে শুয়ে একটু চোখ বুজবে সে ভরসাটুকুও আজ নেই।

গ্রামের মাঝামাঝি বারোয়ারি তলায় দু' দলের বৈঠক বসেছে। শান্তি-বৈঠক। সমাজের মাথা যাঁরা তাঁরা একটু উঁচুমত জায়গায় চাতালের ওপর বসেছেন তাঁদের ঘিরে বসেছে বদ্যিনাথ-রহমতের মত কম-বুঝিয়েদের দল। ওরা ভাবছে এতকাল পাশাপাশি বাস করে সুখে-দুঃখে কলহে আড্ডা-ইয়ার্কি দিয়ে কেউ কাউকে চিনতে পারে নি—আশ্চর্য্য বলতে হবে। যাতে ভুল না বুঝে পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারে তারই আলোচনা করছেন সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা। এত দিনের স্নেহ-সখ্য-প্রীতির মধুর সম্পর্ককে এক মুহূর্ত্তে নষ্ট করে দিয়ে যে দুশমনটা এগিয়ে এসেছে—তাকে মিলিত শক্তি নিয়ে হটিয়ে দিতে হবে গ্রামের বাইরে। এ দুশমন চাইছে এক পক্ষ দিয়ে অন্য পক্ষকে উচ্ছেদ করতে। এক পক্ষের উচ্ছেদ হলেই অন্য পক্ষের শান্তি ফিরে আসবে ? না—না। শহরে যে আগুন ছড়িয়ে শহরকে তার মানুষকে —মানুষের মনুষ্যত্বকে—ন্যায় নীতি ধর্ম্ম বিবেক সব কিছুকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে সে আগুনকে যে করে হোক গাঁয়ের সীমানা পার হতে দেওয়া হবে না। তাই সব—পণ কর—

এমদাদ মিঞা, মৌলবী রহিমতুল্লা, বিলায়েৎ, কালীপ্রসাদ, বরদা নন্দী, হরিশ মুখোপাধ্যায় এঁরা বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগ করে ভাববিভোর জনতার মন থেকে সন্দেহের অঙ্কুর নষ্ট করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

রহমৎ বললে রহিমের কানে কানে, দেখ চাচা, কালীবাবুর গোঁফ কেমন নেতিয়ে পড়েছে·

বদ্যিনাথ বললে, দেখ রতন—বিলায়েতের চোখ দুটো যেন ঝিমিয়ে আসছে। বক্তিমে করছে না ঢুলছে ?

বক্তৃতায় কারও মন গলছে কিনা কে বলবে। দু' পক্ষের হাতের লাঠির ডগা অল্প অল্প কাঁপছে। ভাবের ঘোরে কিংবা অজানা ভয়ে অথবা সুপ্তোত্থিত কোন বৃত্তির তাড়নায়। কত দিনের প্রশান্তিতে শব্দ উঠেছে কে তার হিসাব রাখে। এ ঝড় থামানো কারও সাধ্যায়ত্ত কিনা সে বিচারও ভবিষ্যতের—তবে এই মুহূর্ত্তে এই ধরণের বক্তৃতা ছাড়া শান্তি-সম্মেলনের নেতারা আর কিই-বা করতে পারেন।

জয়ী কা'রা ?

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

একই দেশে জন্মলভি জন্মভূমির জ্যেষ্ঠভ্রাতার ঐক্যস্নেহের দাবী
নিত্য যারা করল অস্বীকার,
সভ্যতারি স্রষ্টা ভ্রাতার সৃষ্টিকরা কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিরি 'পরে
আঘাত যারা হান্‌লো বারংবার।
অজ্ঞানতার অন্ধকারে ছন্দহারা নিত্য যারা মগ্ন ছিল ঘুমে
তখন তাদের উদ্বোধনের গানে,
জাগিয়েছিল জ্যেষ্ঠ যারা, জন্মভূমির মুক্তি লাগি' স্বাধীনতার বেদী
করল গঠন আত্মবলিদানে।
অগ্রগামীর সাহিত্য ও শিল্প দিয়া মন্ত্রো করি দীর্ঘবছর ধরি
উঠলো যারা ক্রমোন্নতির ধাপে,
তারাই যদি হিংসাতে হয় হত্যারত কৃষ্টিগুরুর রক্তপানের লাগি'
লিখতে সে লাজ হস্ত আজি কাঁপে।
মুক্তিদিনের রাষ্ট্রবেদীর জ্যেষ্ঠভ্রাতার ঐক্যস্নেহের মৈত্রীদাবী যারা
দুর্নীতিতে করল অস্বীকার,
সভ্যতারি মুখোস থেকে বর্বরতার স্বরূপ খুলি' গুণ্ডা এবং ছোরার
সকল ঋণের দিল পুরস্কার !
এক দিকেতে বিদ্যাজ্ঞানে সিদ্ধমহান নির্য্যাতিত তাপস বড়ো তাই
অন্য দিকে হত্যালীলার জয়,
ব্যাঘ্রনীতির দন্তনখের মানবনীতির সঙ্গে রণে আজকে কেবা জয়ী ?
ব্যাঘ্রজয়ী ?—কক্ষণো তা' নয়।
মানব চেয়ে ব্যাঘ্র বলি, মানব তবু শ্রেষ্ঠ হ'ল সোনার সমাজ রচি'
ব্যাঘ্র তবু থাকলো মহাবনে,
ব্যাঘ্র হ'ল দুর্জ্জয় অতি, জ্ঞানার্জ্জনে মানব হ'ল নীতির বলে বলী,
ব্যাঘ্র তবু জিতলো না কো রণে।
ধর্ম্মে জ্ঞানে তপস্যাতে নীতির সুতায় লক্ষ কোটি জীবন যেথায় গাঁথা
মানবসমাজ সেই তো পুণ্যধাম,
হিংসা এবং বর্বরতার গুণ্ডামিতে পূর্ণ যেথা সে তো পশুর সমাজ
কলঙ্কিত থাকবে তারি নাম।
মর্ত্ত্যে যদিই দম্ভে চলে হত্যা, এবং বর্বরতা দংষ্ট্রা নখের খেলা,
মানব তাতে করবে নাকো ভয়,
ব্যাঘ্রনীতির দস্যুতাতে গুণ্ডামি ও ছোরার ঘায়ে মহান মানবতার
কক্ষণো না ঘটবে পরাজয়।
লেলিয়ে দিয়ে ব্যাঘ্রে সাপে কোনও জাতির ধ্বংস লাগি'
চালায় যারা শাসন
তারাই শেষে বিশ্বে হবে হীন,
অস্ত্রবিহীন হয়েও যারা শ্রেষ্ঠ নীতিসভ্যতাতে, সর্বজয়ীর বেশে
মর্ত্ত্যে তারাই বাঁচবে চিরদিন।

পুরী ও ভুবনেশ্বর ভ্রমণের স্মৃতি

নূরল আলম চৌধুরী

আকস্মিকতা আর দৈব এ দুটি শব্দের পরস্পরের মধ্যে ব্যাপক অর্থে একটা মিল রয়েছে। মানুষের জীবনে আকস্মিকতা ও দৈবের মূল্য বা প্রভাব অনস্বীকার্য্য। দৈবের প্রভাবে মানুষের জীবনে কোন সময় ধ্বনিত হয় সুমধুর ছন্দের কলগীতি, আবার কোন কোন সময় সেই অদৃশ্য শক্তির প্রভাবেই মানুষের জীবন দুশ্চিন্তা আর বিরক্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। জীবনে আকস্মিকতার মূল্যও ঠিক তদ্রূপ, তাও এক সময়ে আনে সুখ, কোলাহল ও আনন্দ আবার অন্য সময়ে এর প্রভাবে মানুষের সচ্ছল জীবনগতিতে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়ে সেই জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ, তবুও আকস্মিকতা ও দৈব এ দুটির মধ্যেই রয়েছে রোমাঞ্চ—কোন কোন সময় নূতনত্বের আগ্রহ।

গৌরী মন্দির, ভুবনেশ্বর

আমার বন্ধুস্থানীয় আত্মীয় শাজাহান আজ এক সপ্তাহ হ'ল আমার কার্য্যস্থল জলপাইগুড়িতে বেড়াতে এসেছে। ৩রা ফেব্রুয়ারি রবিবার দু'জনে প্রাতে চা খাচ্ছি। হঠাৎ শাজাহান প্রস্তাব করলে, কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে পুরীতে বেড়াতে যেতে হবে। বন্ধুর আকস্মিক প্রস্তাবে মনটা সত্যই সাড়া দিয়ে উঠল এবং সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করতে মনে অনুভব করলাম অপরিসীম আগ্রহ। একেই বলে আকস্মিকতা—এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যার কোন নামগন্ধ নাই অথচ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে যা মনে এনে দেয় চঞ্চলতার একটা গভীর আলোড়ন। অপর কথায় এই আকস্মিকতার প্রভাবেই মনে সৃষ্টি হয় অভূতপূর্ব্ব একটা রোমাঞ্চ বা পুলক। কর্ম্মক্লান্ত দিবসের মধ্য থেকে কয়েক দিনের অবসর নিয়ে বাইরে একটু ঘুরে আসা শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল সত্য; কিন্তু সেই প্রয়োজনের তাগিদের চেয়েও প্রবল হয়েছিল আর একটি তাগিদ যাকে বলা যেতে পারে মানসিক। শারীরিক তাগিদ বহুদিনই উপেক্ষা করে এসেছি; কিন্তু আজ আকস্মিক আহ্বানে ছন্দহীন জীবনে ছন্দের যে কলধ্বনি ভেসে এল তার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। একাধারে প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্য ও মহিমার একাংশ এবং প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যের অন্যতম লীলাক্ষেত্র দেখবার জন্য মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

এখানে একটা বিষয় বলে রাখি; বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বরঞ্চ আমার দিক থেকে সেটাই নিরাপদ। পুরীতে যখন যাই তখন ভাবি নি যে, সেই ভ্রমণ-কাহিনী কোন দিন লিখব। কাজেই আমার দ্রষ্টব্য স্থান ও অভিজ্ঞতাগুলোও সে সময় নোট-বইয়ে টুকে রাখি নি। আজ হঠাৎ কোন কারণে মনে একটা আবেগ এসেছে। এটাও আকস্মিক। তাই আজ তিন মাস পূর্ব্বেকার বৃত্তান্ত লেখবার জন্য লেখনী ধরেছি, কাজেই সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করবার শক্তি আমার হবে না, সব কিছু চিন্তা করে মানস-নয়নে আনা আজ অসম্ভব হবে। মন যার গুরুত্ব স্বীকার করেছে—যে সব চিন্তা, ভাব মনে গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হয়েছিল, এবং মন-প্রাণ যাকে তখন মনে রাখবার উপযুক্ত বলে স্বীকার করেছিল, আজ শুধু তাই মনে আছে। হয়ত সে সময় মন এমন অনেক আকস্মিক আঘাত পেয়েছে যার প্রভাব ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু কোন দাগ বসাতে পারে নি—তা আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা অভিজ্ঞতা পুরনো হলে আলোচনা করতে মনে একটা পুলক জাগে, স্মৃতিরসে নিমজ্জিত ঘটনাগুলো সময়ের দীর্ঘতার সঙ্গে সঙ্গে মিষ্ট থেকে মিষ্টতর হয়ে ওঠে।

এক মাসের ছুটি নিয়ে ১৯৪৬ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রাত্রি পৌনে দশটার দার্জ্জিলিং মেলে জলপাইগুড়ি ছাড়লাম এবং পরদিন ভোর সাতটার সময় লৌহদানব আমাদের শিয়ালদহে এনে হাজির করল। কিন্তু ষ্টেশনে পৌঁছে এক বিপদের সম্মুখীন হতে হ'ল। সুভাষচন্দ্র কর্ত্তৃক গঠিত আই এন. এ.-র ক্যাপ্টেন আব্দুর রসিদের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে বিরাট আন্দোলন সুরু হয় তার প্রচণ্ড আঘাতে

তখন কলকাতায় নাগরিক জীবনের শান্তি ব্যাহত হয়ে সেখানে বিরাজ করতে থাকে শঙ্কা ও ক্ষোভের বহ্নি, আজ কয়েকদিন থেকে সেই বিক্ষোভের দরুন কলিকাতার বুকে যানবাহন চলাচলও একরূপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শান্তিপ্রিয় নাগরিক জীবনে বয়ে যাচ্ছে অশান্তির ঢেউ। ট্রাম বাস একদম বন্ধ, ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী ও রিক্সা দু' একখানা যা চলছে তার চালকগণ সুবিধা পেয়ে ন্যায্য ভাড়ার পাঁচ-সাত গুণ বেশী হাঁকছে। পূর্ব্বেই ঠিক হয়েছিল কলকাতায় কয়েকদিন অপেক্ষা করে শাজাহানের ছুটি মঞ্জুর হলে দু'জনে একসঙ্গে পুরীর দিকে যাত্রা করব। এখন গন্তব্য স্থল ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনস্থ আমাদের কলকাতার বাসা; কিন্তু গাড়ী পাওয়া এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, অগত্যা পায়ে হেঁটে বাসার অভিমুখে রওনা হলাম।

যাক, মহানগরীর অশান্ত ভাব কতকটা শান্ত হয়ে এলে ১৮ই ফেব্রুয়ারি সোমবার পুরী রওনা হব স্থির হ'ল। কিন্তু যার আকস্মিক প্রস্তাবে আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে সুরের মূর্চ্ছনা বেজে উঠে ভ্রমণের নেশায় আমাকে মাতিয়ে তুলেছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাকে আর সঙ্গী হিসেবে পাওয়া গেল না; কেননা, অনিবার্য্য কারণবশতঃ সে ছুটি পায় নি। কি আর করি! অগত্যা সঙ্গীহীন একাই যাব মনস্থ করলাম।

রাত পৌনে নটায় পুরী এক্সপ্রেস ছাড়বে। কাজেই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আহারাদি পর্ব্ব সমাধা করে বাসা থেকে বের হলাম, বিদায় দিতে সঙ্গে চলল শাজাহান, ভাই মেজু, আর আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিলন। কি একটা পর্ব্ব দিন, প্ল্যাটফরমে ভয়ানক ভিড়, গাড়ী ছাড়বার দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে আমরা ষ্টেশনে পৌছি, কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হ'ল না, প্ল্যাটফরমের গেট তখনও খোলা হয় নি। যাত্রীরা ভয়ানক উৎকণ্ঠা নিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আমরাও গেটের প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে গেট খুলবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। দূর থেকে ভিড়ের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে, গেটটা মাঝে মাঝে সামান্ত খুলছে আবার তখনই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটু কৌতূহল হওয়ায় ব্যাপার কি দেখবার জন্ত অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে গেটের নিকটবর্ত্তী হলাম, দেখি একজন রেলকর্ম্মচারী অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য নিয়ে গেটের সম্মুখে দণ্ডায়মান রয়েছেন। অভিজ্ঞ যাত্রীরা, যাঁরা ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় বিচার করে সময় বা সুযোগ নষ্ট করবার পক্ষপাতী নন, তাঁরা সেই দণ্ডায়মান রেলকর্ম্মচারীটির গা ঘেঁষে কি গোপন আলোচনা করছেন। দু' মিনিট পরেই তাঁদের জন্ত গেট খুলে যায় এবং তাঁরা প্ল্যাটফরমে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই গেট আবার পূর্ব্ববৎ বন্ধ হয়ে যায়, রেলের মহাপ্রভুটিও পৃথিবীর সমস্ত গাম্ভীর্য্য মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কাণ্ড দেখছিলাম, কি আর করব! এক ঘণ্টা পর গাড়ী ছাড়বার নির্দ্দিষ্ট সময়ের যখন আধ ঘণ্টা বাকী তখন প্ল্যাটফরমের গেট খুলে গেল। অগণিত যাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও প্ল্যাটফরমের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

গাড়ী সবেমাত্র প্ল্যাটফরমে এসেছে, কিন্তু এরই মধ্যে তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর সব কয়টি কামরাই ভর্ত্তি হয়ে গেছে। আমরা ভিড় ঠেলে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে থাকি। ভিড় দেখে মনে হ'ল যাত্রীদের চেয়ে তাদের বিদায় দিতে যারা

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, ভুবনেশ্বর। পাশে লেখক দণ্ডায়মান।

এসেছেন—তাদের সংখ্যাই বেশী। নতুবা প্ল্যাটফরমে যে পরিমাণ লোক-সমাগম হয়েছিল পাঁচটা রেল গাড়ীতেও তাদের স্থান সঙ্কুলান হ'ত কিনা সন্দেহ। সর্ব্বত্রই ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি। অত্যধিক ভিড়জনিত কষ্ট হলেও নানা শ্রেণীর যাত্রীদের ট্রেনে ওঠানামা, কুলির সঙ্গে ভাড়ার দর নিয়ে বচসা এবং সর্ব্বোপরি তাদের অকারণ ব্যস্ততা সত্যই উপভোগ্য হয়েছিল। যাক, কোনক্রমে এঞ্জিনের নিকটবর্ত্তী একটি মধ্যম শ্রেণীর কামরায় বসবার মত একটু স্থান করে নিলাম। গাড়ীতে ভয়ানক ভিড়। গাড়ীর মধ্যে বিশ-পঁচিশ জন লোক স্থানাভাবে দাঁড়িয়েও রয়েছে এবং তার মধ্যে চার-পাঁচ জন মহিলাও আছেন।

জানালা খুলে দেখি বাইরে ভীষণ অন্ধকার। অগত্যা কামরার যাত্রীদের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে গাড়ী কোঁস কোঁস শব্দে চলেছে। সময়ও একে একে প্রহর পেরিয়ে যাচ্ছে। গাড়ী ছাড়বার সময় যেভাবে বসেছিলাম ঠিক সেই ভাবেই বসে আছি, একটু উঠে দাঁড়িয়ে শরীরের জড়তাটা দূর করে নেবার জায়গাও হ'ল না—

পাছে অন্যে জায়গাটুকু দখল করে নেয়। গাড়ী খড়গপুর, বালেশ্বর, কটক—একটির পর আর একটি ষ্টেশন পার হয়ে চলল। এত কষ্টের মধ্যেও অপরিচিত অঞ্চলে ভ্রমণ কালে অনাস্বাদিত রসের পরিচয় লাভের আনন্দে আমার মন ভরপুর হয়ে উঠেছিল। শেষ রাত্রে শ্রান্তি অনুভব করে জানালায় মাথা রেখেছিলাম, একটু তন্দ্রার আমেজও এসেছে। গাড়ী

ভুবনেশ্বর মন্দির ও বিন্দু সরোবর

কখন যে খুরদা জংশনে এসে পৌঁছল টের পাই নি। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম পূব আকাশে সূর্য্যের লাল আভা দেখা দিয়েছে। একটু পরেই গাছের ডগায় আলোর সুকোমল পরশ লাগিয়ে নিজেরই রঙে রাঙানো মেঘের ফাঁক দিয়ে রবি ফুটে উঠবে আকাশের গায়ে। তাকিয়ে দেখি সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে ও মাথায় টেরী কাটা এক পাণ্ডা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, মনে মনে বিরক্ত হলাম। শুধালাম, 'তোমার কি প্রয়োজন?'

সে নাছোড়বান্দা। 'বাবু আমি পুরীর জগন্নাথদেবের পাণ্ডা। জগন্নাথজী দর্শন করানোই আমাদের কর্তব্য।'

—'আমার পাণ্ডা লাগবে না।'

বিরক্তিপ্রকাশ করলেও লোকটি যাবে না, কি মুশকিল!

—'যাও বললেই কি চলবে হুজুর; পুণ্য স্থানে পুণ্য করতে যাচ্ছেন, রাগ করলে কি চলে!'

কিন্তু আমার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে শেষে পাণ্ডা মহারাজ চলে যায়।

পুরী ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই কুলির মাথায় বিছানা আর সুটকেসটি চাপিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামলাম। সেই মুহূর্তেই একটি লোক প্রশ্ন করলে -'কোন হোটেলে যাবেন বাবু?' বলেই একখানা ছাপানো হ্যাণ্ডবিল আমার হাতে দিলে। হ্যাণ্ডবিলটি আমার গন্তব্যস্থল বীচ হোটেলের। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম,—'আমি তো বীচ হোটেলেই যাচ্ছি।'

—'তবে আপনি কি জলপাইগুড়ি থেকে আসছেন।'

উত্তর দিলাম—'হাঁ'।

'ও! তা হলে আপনাকে নেবার জন্যেই ম্যানেজার বাবু আমায় পাঠিয়েছেন'— বলেই ষ্টেশনের দরজা পেরিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করে মালপত্র চাপিয়ে দিল। আমি উঠে বসলে গাড়ী মন্থর গতিতে বীচ হোটেলের দিকে চলল। তন্ময় হয়ে রাস্তার দু'ধারের দৃশ্যাবলী দেখতে লাগলাম। পুকুরের প্রায় মধ্যেই মন্দির দেখতে পেলাম। উড়িষ্যায় একেই বলে চন্দনযাত্রার মন্দির— কিছু দূর যাবার পরেই বৃক্ষকাণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। এরই জন্য পুরীধাম আজ হিন্দুদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। এই চূড়া দর্শনেই ভাবাবেগে অধীর হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের সমস্ত দেহ থর থর করে কেঁপে উঠেছিল—তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। পুরী ষ্টেশন থেকে বীচ হোটেলে যাওয়ার পথে গাছপালার ও বাড়ীঘরের ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্রের অনন্ত বিস্তীর্ণ বারিরাশি নয়নপথে পড়ছিল। নূতন পরিচয়ের আশায় ও আনন্দে মন পুলকে শিউরে উঠল।

বীচ হোটেল একেবারে সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। ষ্টেশন থেকে হোটেলের দূরত্ব দু' মাইলের অধিক হবে না; কিন্তু আমাদের সেখানে পৌঁছুতে লাগল প্রায় ৪০ মিনিট।

হোটেলের প্রোপ্রাইটার-ম্যানেজার বেশ অমায়িক লোক। তাকে পূর্ব্বেই পত্র লিখেছিলাম। দোতলায় কোন সিট খালি ছিল না। কাজেই নীচের তলাতেই দু' সীটের একটি কামরায় আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হ'ল। সম্মুখের জানালা দিয়ে তাকালেই অগাধ বারিরাশি ও নীল তরঙ্গের খেলা নয়নপথে পড়ে মনে এনে দেয় অকল্পিত স্নিগ্ধ আবেশ। সমুদ্রের যে এত সৌন্দর্য্য তা কল্পনাও করতে পারি নি। এখানে প্রকৃতির অসীম উদারতা ও ধীর প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের মধ্যে কবি-মনের অফুরন্ত খোরাক লুকায়িত রয়েছে, যার আস্বাদ লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

অল্পক্ষণ পরেই চা এল। চা-পর্ব্ব সমাধা করে স্নানের জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। হৃদয়ে অপরিসীম আগ্রহ, অথচ মনে ভয়ের সঞ্চারও যে হয়েছিল তা না বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। যাক, শুনলাম এখানকার নুলিয়ারা স্নানার্থীদের অতি সাবধানে স্নান করিয়ে দেয়। এদের আসল ব্যবসা সমুদ্রে মাছ-ধরা। এরা খুব বলিষ্ঠ, এদের দেহ নিকষকালো, ম্যানেজারবাবুকে বলায় তিনিই আমার স্নান করাবার জন্য সন্ন্যাসী নামে একটি নুলিয়াকে নিযুক্ত করে দিলেন।

সমুদ্রের তীরে গেলাম, সৃষ্টির বিচিত্র লীলা দেখে মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। কোন্ অনন্ত পারাবার থেকে তরঙ্গগুলো গর্জ্জন করতে করতে ছুটে এসে বালুচরে লুটিয়ে পড়ছে! এত ক্ষোভ, এত রোষ যেন মন্ত্রবলে শান্ত হয়ে যাচ্ছে এক নিমেষে। দেখতে ও ভাবতে সত্যই চমৎকার। দেখলাম এক স্থানে দু'জন মহিলা দুটি অল্পবয়স্কা বালিকাকে নিয়ে স্নান

করছেন সঙ্গে একটি নুলিয়াও রয়েছে। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা যে এদের আছে তা স্নানের ভঙ্গী দেখলেই উপলব্ধি করা যায়। আমার নুলিয়াটির নিকট থেকে জানতে পারি, এরা আমাদের হোটেলের অদূরবর্ত্তী 'ইওর হোম' নামে আর একটি হোটেলের বাসিন্দা। বেশী লোক এক সঙ্গে স্নান করাতে মনে একটু সাহস পাওয়া যায়, তাই নুলিয়ার পরামর্শে ঐ দলের নিকটবর্ত্তী হয়ে সমুদ্র-তরঙ্গে গা ঢেলে দিলাম। ঢেউগুলো একটির পর একটি অবিরাম আসছে। নুলিয়ার পরামর্শ মত কোন সময় লাফ দিই, কোন সময় ডুব দিই। লাফ দেওয়া আর ডুব দেওয়া নির্ভর করে ঢেউয়ের রকমফেরের ওপর। অল্পক্ষণ মধ্যেই কৌশলটা শিখে নিলাম। আজকে যতক্ষণ সমুদ্রে ছিলাম নুলিয়ার হাত ধরেই রেখেছিলাম, পরে অবশ্য আর ওর হাত ধরে স্নান করতে হয় নি, সে অদূরে দাঁড়াত, আর আমি নিশ্চিন্ত ভাবে ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করতাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পর হোটেলে ফিরলাম। সমুদ্রের জল ভয়ানক লবণাক্ত। সমস্ত গা লবণে ভরে গেছে। কাজেই বাথরুমে গিয়ে কুয়োর জলে শরীরটা পুনরায় ধুয়ে ফেললাম। তারপর আহার-পর্ব্ব শেষ হলে নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

বিকেলে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই। বহু স্ত্রী-পুরুষ সমুদ্রের ধারে ধারে বেড়াচ্ছেন, সীজন টাইম বলে এখন যাত্রীদের সমাগম খুবই বেশী। ভারতের বহু প্রদেশের লোকই দেখলাম, তার মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। কত রকমের লোকই না সমুদ্রতটে দৃষ্ট হয়! জীবনের প্রান্ত-সীমায় পৌঁছে বৃদ্ধ এসেছেন বাতের আক্রমণের লাঘব করতে, চাকুরীজীবী ভদ্রলোক এসেছেন কর্ম্মক্লান্ত জীবনের মাঝখান থেকে বিরাম নিয়ে একটু শান্তির আকাঙ্ক্ষায়, কলেজের ছাত্রেরা এসেছেন ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে, আর নব-বিবাহিত দম্পতি এসেছেন প্রকৃতির খেলা-ঘরে 'মধুচন্দ্র' যাপন করবার উদ্দেশ্যে। মোটের ওপর প্রত্যেকের হৃদয়েই রয়েছে অসীম আগ্রহ ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ। দেখতে দেখতে গোধূলি নেমে এল। পশ্চিম-গগনের ললাটে দেখা দিল শুক্র তারা। তার নীচে অতি ক্ষীণ লালের রেখা দেখিয়ে দিচ্ছিল রবির বিদায়ের পথ। আমি বেড়াতে বেড়াতে হোটেল থেকে বেশ দূরে এসে পড়লাম। বি. এন. আর. হোটেলের নিকটবর্ত্তী একটি নির্জন স্থানে বালুর ওপর পা ছড়িয়ে বসলাম। এরই মধ্যে চারদিকে চাঁদের হাসি ফুটে উঠেছে। আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একাকী মনোহর দৃশ্য দেখতে থাকি। দু-বছর আগে আমার একজন আত্মীয় পুরীতে গিয়ে জ্যোৎস্নারাতে সমুদ্রের দৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এক পত্রে লিখেছিলেন, "স্বচ্ছ নীল আকাশের সঙ্গে গভীর কালো সমুদ্রের মিল দেখলে মনে হয় আকাশ যেন সমুদ্রকে গভীর স্নেহের সঙ্গে চুম্বন করছে। তাদের মধ্যে যে অনন্ত প্রেম তা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, আকাশ অসীম ও চিরস্থায়ী, সমুদ্রও তাই, ঠিক তেমনই আকাশ ও সমুদ্রের মধ্যে যে প্রেম তাও অসীম ও অনন্ত।" আজ নির্জনে রূপালী চাঁদনির নীচে সমুদ্রতটে বসে তাঁর সেই কথা কয়টি মনে হচ্ছে। চতুর্দ্দিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। অনন্ত নীল আকাশ নিকষকালো সমুদ্রের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে; সত্য সত্যই অপরূপ।

সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য—পুরী

ফেনিল ঢেউগুলো সমুদ্রের বুক চিরে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে যখন কালো স্বচ্ছ সমুদ্রের বুকে একটা রূপোর লাইন টেনে দেয় তখন দৃশ্যটা দেখতে এত সুন্দর যে ভাষায় মনের ভাবের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। প্রকৃতির এরূপ উন্মুক্ত প্রসারে এমন সৌন্দর্য্য ও আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায় যার তুলনা নেই। আমি তন্ময় হয়ে প্রকৃতির সেই অপরূপ রূপ কতক্ষণ উপভোগ করেছিলাম সঠিক ভাবে বলতে পারব না।

সেই রাত্রেই একজন বোর্ডারের নিকট শুনলাম যে এখানে প্রাতে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য নাকি অতি চমৎকার। এ দৃশ্য উপভোগ করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না এবং যে ভাবেই হোক কাল প্রাতে সূর্য্য ওঠার পূর্ব্বে উঠতেই হবে মনে মনে সঙ্কল্প করে আহারাদির পর বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

অতিমাত্র উৎসাহের জন্য রাত্রে ভাল করে ঘুম হয় নি। প্রাতে পৌনে পাঁচটার সময়েই ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে নিলাম। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে দেখে গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বেই আমাদের হোটেলের সম্মুখে বালুচরে গিয়ে বসলাম। আমার হৃদয়ে গভীর আগ্রহ; অনাস্বাদিত আনন্দরস পান করতে আমি উৎসুক। রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে তরল হয়ে গেল, পূর্ব্ব দিকটা বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে। কিন্তু চতুর্দ্দিকের ঘোলাটে ভাবটা তখনও কাটে নি। বাঁ দিকে ছোট-বড় বাড়ীগুলো একটির পর একটি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ডান দিকে তরঙ্গগুলো ক্রমাগত গর্জ্জন করছে। সে কটা

অলৌকিক মুহূর্ত। পৃথিবীর ওপর থেকে অন্ধকারের পর্দাটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, অভিভূতের মত পূর্ব্ব দিকে তাকিয়ে আছি, মুহূর্ত পরে দেখা গেল, সমুদ্রের এক স্থান থেকে নানা বর্ণের কয়েকটি রশ্মি আকাশের গায়ে ওপর দিকে ছিটকে পড়ছে। তার পরেই সমুদ্রের ঢেউগুলোর মধ্য থেকে বেরুল একটি রক্ত পিণ্ড; সেই পিণ্ডটি কোন অদৃশ্য যাদুকরের মন্ত্রবলে
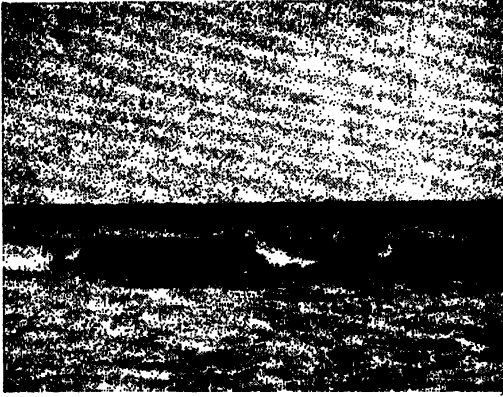
সমুদ্রের ঢেউ ভাঙছে

৪

ক্রমশঃ বড় হতে হতে কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই প্রথমে একটি থালা ও তৎপর গোলাকৃতি ধারণ করল। এরূপে সূর্য্যদেব ধীর মন্থর গতিতে আবির্ভূত হয়ে পূর্ণ সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠলেন। আমি তন্ময় হয়ে ঐ অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হ'ল, মানুষ এমন মনোরম প্রভাত যদি জীবনে একদিনও উপভোগ করতে না পারে তবে তার বৃথাই পৃথিবীতে আগমন।

এভাবে প্রকৃতির খেলা দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। অন্য কোন কাজ নেই, ভাবনা নেই।

হোটেলে মাণিক সেন নামে আমার সমবয়সী একটি যুবকের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হ'ল।

এ পর্য্যন্ত পুরীর অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখবার সময় বা সুযোগ করে উঠতে পারি নি। এখানে আসার অষ্টম দিবসে বেলা ১১টার সময় আমি ও মাণিক একখানা ঘোড়ার গাড়ী করে বের হই, প্রথমেই আমরা জগন্নাথদেবের মন্দির, দেখতে যাই। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরের সম্মুখস্থ সিংহদ্বারেই শ্রীচৈতন্য ভাবাবেগ সংবরণ করতে না পেরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন বলে কথিত আছে। প্রকাণ্ড মন্দির, আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। প্রাঙ্গণে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আট দশ জন পাণ্ডা পিছু নিয়ে প্রাণটা কণ্ঠাগত করবার উপক্রম করেছিল আর কি! অতিকষ্টে তাদের হাত এড়িয়ে অগ্রসর হলাম। মন্দিরগাত্রে বহু মিথুন-মূর্ত্তি খোদিত রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও কলাকুশলতার প্রমাণ এগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়। মন্দির-প্রাঙ্গণটি চতুষ্কোণ, আয়তন ২২২×২৯৩ গজ। এই প্রাঙ্গণটি সুউচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। বাইরের প্রাচীরের পর মধ্যে অন্য একটি প্রাচীরের অভ্যন্তরে মূল মন্দির অবস্থিত। জগন্নাথের মন্দির প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত—বিমান, দর্শনগৃহ, নাটমন্দির ও ভোগ-মণ্ডপ। মূল মন্দিরটারই নাম দেওয়া হয়েছে বিমান, এরই অভ্যন্তরে রয়েছে আসল মূর্ত্তি—উচ্চতা ২১৪ ফুট ৮ ইঞ্চি। মন্দির-প্রাঙ্গণে ছোট ছোট আরো কয়েকটি মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। সঠিকভাবে জানা না গেলেও খ্রীষ্টাব্দের ১১০০ সনের কাছাকাছি কোন সময়ে উড়িষ্যারাজ চোড়গঙ্গ কর্ত্তৃক ঐ মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন।

এর পর আমরা মার্কণ্ড সরোবর দেখতে চললাম, সরোবরের দৃশ্য দেখে মনটা সত্যই পুলকিত হয়ে উঠল। প্রকাণ্ড সরোবর, চারিটি পাড়ই পাথর দিয়ে বাঁধানো; আর উপর থেকে জলের ভিতর পর্য্যন্ত প্রত্যেক পাড়েই রয়েছে থাকে থাকে সিঁড়ি। সম্মুখে দেখলাম একটি ছোট কুঠরি। প্রশ্ন করে জানলাম, ওটা নাকি যমের মাসী আর পিসির মন্দির।

সেখান থেকে আমাদের গাড়ী পূর্ব্ব দিকে চলল। অল্পক্ষণ পরেই নরেন্দ্র সরোবর-তীরে পৌঁছলাম, এটি মার্কণ্ড সরোবর অপেক্ষা অনেক বড়, দৈর্ঘ্যে ২৯১ গজ ও প্রস্থে ২৪৮ গজ। এই সরোবরেরও চারিদিক পাথরে বাঁধানো এবং চারি পাড়েই রয়েছে পাথরের সিঁড়ি। নরেন্দ্র সরোবরের মধ্যে একটি দ্বীপের ওপর চন্দনযাত্রার মন্দির আর গঙ্গাদেবীর মন্দির আছে। পুরীতে এই নরেন্দ্র সরোবরের সঙ্গেই চৈতন্যদেবের স্মৃতি ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। চৈতন্যদেবের জলকেলির স্মৃতি এর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এই সরোবর-তীরে বৈষ্ণবগণ পাথরের বাঁধানো ঘাটে একত্রিত হয়ে ভাগবৎ পাঠ করতেন; আর তৎ-শ্রবণে শ্রীচৈতন্য ভাবাবেগে অধীর হয়ে পড়তেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত, সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অনুভব করলাম যেন চতুর্দ্দিকে একটা পবিত্র, স্নিগ্ধ, শান্তিময় আবহাওয়া বিরাজ করছে।

এর পর আমাদের দ্রষ্টব্য স্থান হ'ল আঠার নালা। এটি একটি পাথরের পোল এবং পুরীর সিংহদ্বার-স্বরূপ। বাংলাদেশ থেকে একটি পথ এই আঠার নালার উপর দিয়েই এসে পুরীতে প্রবেশ করেছে। বুড়িমা নামক একটি ক্ষুদ্র নদীর উপর অবস্থিত এই পোলটি ২৯০ ফুট লম্বা—খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ঐ পোল দেখার পর আমাদের গাড়ী চলল গুণ্ডিচাবাড়ীর দিকে। এটাকে জগন্নাথের মাসীর বাড়ীও বলা হয়। এর চতুর্দ্দিক সুউচ্চ প্রাকারে বেষ্টিত, সিংহ-দরজার মাথায় মন্দিরের মত চূড়া, মন্দির-প্রাকারে কতকগুলো হনুমান বসে রয়েছে দেখতে পেলাম। আমরা জগন্নাথের মন্দির দেখে আসবার সময় পাশের দোকান থেকে কিছু খোয়া

সঙ্গে করে এনেছিলাম। এবার গাড়ীর মধ্যে বসেই সেগুলো খাওয়ার উদ্দেশ্যে টুকরিটি হাতে নিলাম। কিন্তু হায়! মোয়া আমাদের ভাগ্যে নেই! টুকরিটি হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি হনুমান এক লম্ফ দিয়ে গাড়ীতে উঠে এসে নিমেষে মোয়ার টুকরিটি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। হনুমানটি মন্দির-প্রাকারে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তভাবে মোয়া গলাধঃকরণ করতে আরম্ভ করল; কি আর করি! হতভম্ব হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকি। যাক এরপর আমরা মন্দিরদর্শনে মনোযোগ দিলাম। এটি নাকি পূর্ব্বে কাঠের তৈরি ছিল। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। বর্ত্তমানে এটি প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি চূড়াবিহীন আড়ম্বরহীন মন্দির। গুণ্ডিচা মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি ছোট মঞ্চের উপর দুখানি পদচিহ্ন দেখা যায়। লোকের নিকট প্রশ্ন করে জানলাম সেগুলো নাকি শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্ন। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য নাকি স্বহস্তে গুণ্ডিচা মার্জ্জন করতেন। কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির মতে এই গুণ্ডিচা মন্দির-প্রাঙ্গণেই শ্রীচৈতন্যের দেহ সমাহিত হয়। তাঁরা পদচিহ্নদ্বয়কে চৈতন্যদেবের সমাধির নিদর্শন বলে মনে করেন। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল, আমরা আর কোথাও না গিয়ে গাড়ী করে হোটেলে ফিরে এলাম।

পুরীতে আগমনের তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে আর একটি বাঙালী হিন্দু ভদ্র পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। 'ইওর হোম' নামক হোটেলের যে পরিবারটিকে প্রথম দিবসে সমুদ্রে স্নান করতে দেখেছিলাম আমি তাদের কথাই বলছি। সেদিন থেকে প্রায় প্রত্যহই স্নানের সময় তাদের দেখতে পাই। ক্রমে একদিন সমুদ্র-সৈকতেই স্নানের সময় ছোট বালিকা দুটি বুলু ও টুলুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। এর পর পুরীতে যে ক'দিন ছিলাম প্রত্যহ একসঙ্গে সমুদ্রের নীল তরঙ্গের সঙ্গে খেলা করতাম। ক্রমে ক্রমে ওদের সঙ্গে ভাব বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। প্রাতে ও বিকেলে সমুদ্র-সৈকতে বেড়ানোর সময় তারাই হ'ল আমার সাথী। প্রত্যহ এদের শিশুসুলভ সহজ ভাব-ভঙ্গী দর্শনে, প্রাতে সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়োবার সময় এদের কচি মনের স্ফূর্তি ও আগ্রহ দেখে আমার নিজের মনও হাল্কা হয়ে এসেছিল। সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্না-বিছানো বালুচরে বসে বুলু, টুলু ও তাদের ছোট ভাই কালু ও মনুর সঙ্গে গল্প করতাম। ভূতের গল্প থেকে আরম্ভ করে শিকারের গল্প কিছুই বাকী থাকত না। প্রশ্ন করলেই উত্তর পেয়েছি তারা ভূতের গল্প শুনবে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই এদের শিশু-মনের সরলতা আমার হৃদয় এরূপভাবে আকর্ষণ করল যে এদের মধ্যেই এ বিদেশে আমার ছোট ভাইবোনের সন্ধান পেলাম। ওদের মা, বাবা, দিদি, মাসি সকলেই পুরীতে এক সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সময় ও সুযোগ অভাবে তাদের সঙ্গে তখন বিশেষভাবে পরিচিত হতে পারি নি। পুরীর বালুচরে এদের কুড়িয়ে পেয়েছিলাম আমার ছোট্ট বন্ধু, সাথী, আর ভাই-বোন হিসেবে, তাই আজ ভুলতে পারি নি এদের কথা।

এখানে এসে কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এবং তাদের আমন্ত্রণে ২রা মার্চ শনিবার
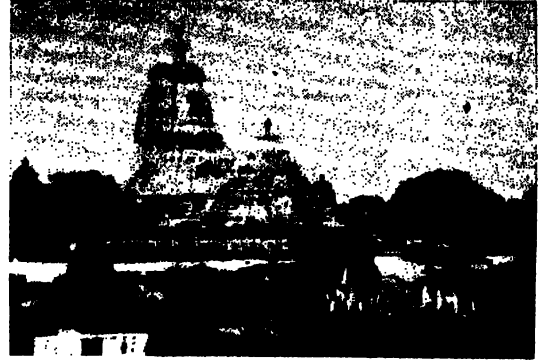
বিরাট প্রাকার বেষ্টিত জগন্নাথদেবের মন্দির, পুরী

ফটো—এম, এ, চৌধুরী

লোকনাথের মেলা দর্শন উদ্দেশ্যে বের হই। আমার সঙ্গে ছিল বন্ধু মাণিক, আমাদের হোটেল থেকে লোকনাথের দূরত্ব প্রায় চার মাইল হবে। আমরা একখানা রিক্সা ভাড়া করে অপরাহ্ণ ৩টার সময় যাত্রা করি, লোকনাথে পৌঁছুতে আমাদের দু' ঘণ্টার বেশী সময় লেগেছিল। লোকনাথের মেলা পুরীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোৎসবগুলোর মধ্যে একটি, এবার এখানে যে মেলা হয়ে গেল, এত অধিক জনসমাগম নাকি ইতিপূর্বে লোকনাথে আর কোন দিন হয় নি। জনসংখ্যা হিসেব করে বলবার উপায় নেই, রাস্তার দু-পাশে এবং চারদিকে তাঁবু ও অস্থায়ী ঘর-বাড়ী তৈরি করে মেলা বসেছে। চারদিক জনাকীর্ণ। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। পথচলা কঠিন, জন-স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হ'ল, ক্রমেই জনতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। মেলায় পুরুষের তুলনায় উড়িয়া নারীদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, সন্ধ্যার পর দেখা গেল স্থানে স্থানে নারীরা তেলের ছোট ছোট প্রদীপ জ্বালিয়ে মাটির ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে। এভাবে প্রদীপ জ্বালিয়ে জাগরণেই নাকি তারা রাত্রি যাপন করবে। প্রশ্ন করে জানলাম শিবকে তুষ্ট করবার এটা একটা প্রথা। আমরা দাঁড়িয়ে থেকে এদের কার্য্যকলাপ, যাত্রীদের গতিবিধি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলাম। এদের অনেকেই এসেছে পুণ্যসঞ্চয় করতে; আর আমার উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ও আনন্দ উপভোগ। অসংখ্য ধর্ম্ম-পিপাসু নরনারীর ঐকান্তিক ধর্ম্ম-নিষ্ঠার নিদর্শন দেখাও আমার কম লাভ নহে। যেখানে মেলা বসেছে তার অদূরেই লোকনাথের মন্দির এবং তারি পাশে দেখতে পেলাম একটি সুন্দর সরোবর; রাত্রি হয়ে গেল বলে মন্দিরটি ভাল করে দেখবার সুযোগ হ'ল

না। মেলার এক প্রান্তে পুরীর বিভিন্ন সরকারী আপিসের কর্মচারীরা আলাদা আলাদা তাবু খাঁটিয়ে খাওয়া-দাওয়া ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেছেন। কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের কর্মচারীরা আহার করতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও অধিক রাত হয়ে গেল বলে তাদের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। মেলা থেকে বের হয়ে যখন হোটেলে ফিরি তখন রাত প্রায় নয়টা।

আমার ছুটি শেষ হয়ে এসেছে, শীঘ্রই কর্মস্থলে ফিরে যেতে হবে। ভুবনেশ্বর দেখবার আর লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। আমি ও বন্ধু মাণিক ৯ই মার্চ প্রাতের গাড়ীতে সে স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। এবার আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীরই টিকিট কাটলাম; প্রায় ৮টার সময় ট্রেন খুরদা রোড জংসনে পৌছল। এখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম, আবার ট্রেন চলতে আরম্ভ করল, বেলা সাড়ে আটটার সময় আমরা ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামলাম। সঙ্গে কোন মালপত্র ছিল না, শুধু একটি ছোট জীপ্-ব্যাগ। সেটি হাতে নিয়ে প্ল্যাটফরমে নামার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তিন-চারটি পাণ্ডা এসে আমাদের ঘিরে ধরল। প্রত্যেকের একই অনুরোধ, তাকেই যেন আমাদের গাইড করে সঙ্গে নিয়ে যাই। এত করে বুঝালাম যে আমাদের গাইডের কোন দরকার নেই তবুও তারা ছাড়বে না, অতঃপর একটিকে সঙ্গে নিতেই হ'ল।

ছোট্ট একটি ষ্টেশন, তার বাইরেই রিক্সা পাওয়া যায়, এক খানা রিক্সা বার আনা ভাড়ায় ঠিক করে আমি ও মাণিক তাতে উঠে বসলাম। আর পাণ্ডা রিক্সার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলল। মাথার উপরে রোদ এরি মধ্যে বেশ কড়া হয়ে এসেছে। লাল কাঁকর বিছান পথ, পথের দুই পার্শ্বে কোন কোন স্থানে বড় বড় বৃক্ষ, আবার কোন স্থানে রয়েছে ফাঁকা ধু ধু মাঠ, পথে লোকসমাগম খুবই কম, চতুর্দিকে বিরাজ করছে নিস্তব্ধ শান্তি, অদূরেই ডানদিকে রয়েছে রেল-লাইন। দেখলাম আমরা যে ট্রেনে এসেছি সেখানা সর্পিল গতিতে এঁকে বেঁকে নিজ গন্তব্য স্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়ে বৃক্ষের আশেপাশে দু' চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির দেখতে পেলাম। আমরা নীরবে দু' পাশের দৃশ্যাবলী দর্শন করতে করতে অগ্রসর হচ্ছি, কারও মুখেই কোন কথা নেই, চতুর্দিক নীরব নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার মধ্য থেকে বিরহী পাখীর 'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও' ডাক ভেসে এসে ঐ নীরবতা ভঙ্গ করছে। মোটের উপর পথের দৃশ্য পরম রমণীয় ও উপভোগ্য। এ ভাবে অগ্রসর হয়ে আমরা ষ্টেশন থেকে এক মাইল দূরবর্তী বেশ বড় প্রস্তরনির্মিত একটি মন্দিরের নিকটবর্তী হলাম। এটি রাস্তার ডান পার্শ্বেই অবস্থিত, পাণ্ডাটির নিকট প্রশ্ন করে জানলাম ঐ মন্দিরের নাম ভুবনেশ্বরের মাসীর বাড়ী।

ভুবনেশ্বরের জলবায়ু অতি চমৎকার, পেটের অসুখে এখানকার ঝরণার জল মহৌষধ বিশেষ। তাই অনেক বাঙালী পরিবার স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় এখানে এসে বাসা বেঁধেছেন। ভুবনেশ্বরের মাসীর বাড়ী থেকে অগ্রসর হয়ে আমরা পথের ধারে এরূপ দু-চারটি বাঙালী পরিবারের বাসস্থান দেখতে পেলাম। আলাপ করবার ইচ্ছে হ'ল; কিন্তু সময় হয়ে উঠবে না বলে ক্ষান্ত হলাম, উড়িষ্যা ধর্মশালার জন্ত বিখ্যাত। ভুবনেশ্বরেও কয়েকটা বেশ বড় বড় ধর্মশালা আছে, সেগুলোতেও নাকি অনেক বাঙালী পরিবার থাকেন। বিদেশে বাঙালীর সন্ধান পেলে হৃদয়ে যেন একটা অকারণ আনন্দানুভূতির সঞ্চার হয়। যাক, আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই গৌরী মন্দিরের নিকটবর্তী হলাম। মন্দিরটি বেশী বড় নয়। এরই প্রাকার-সংলগ্ন কয়েকটি কামরায় বাস করে কয়েকটি পরিবার। গৌরী মন্দিরের সংলগ্ন গৌরীকুণ্ডের জল অতি স্বচ্ছ।

এর পর আমাদের দ্রষ্টব্য স্থান হ'ল, সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির—এটি গৌরী মন্দিরের নিকটেই অবস্থিত, মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। সিদ্ধেশ্বরী মন্দির আর গৌরী মন্দিরে গঠনকৌশল প্রায় এক রকম। মন্দিরসংলগ্ন সিদ্ধেশ্বরী কুণ্ড নামে একটি কুণ্ড আছে। এই সিদ্ধেশ্বরী আর গৌরীকুণ্ডের জলই নাকি ভুবনেশ্বরের মধ্যে বিখ্যাত। পুরীতে হোটেলে দেখেছি লোকেরা এই কুণ্ডগুলোর জলই হাঁড়িতে করে সেখানে নিয়ে যায় বিক্রয় করতে। আমাদের সঙ্গে একটি জলের বোতল ছিল, সিদ্ধেশ্বরী কুণ্ড থেকে জল নিয়ে নিলাম।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির থেকে আমরা হেঁটেই অগ্রসর হলাম ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখতে—খুব বেশী দূরে নয়, মাত্র পোয়া মাইল হতে পারে। ভুবনেশ্বরের বাজারের ওপর দিয়ে অদূরবর্তী ভুবনেশ্বর মন্দিরের পথে অগ্রসর হলাম। মন্দিরটি আকারে বৃহৎ, চতুর্দিক সুউচ্চ প্রাকারে বেষ্টিত। এটি তৈরি করতে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা খরচ হয়েছে বলে জানা যায়। মন্দিরের সদর দরজা কেন জানিনে বন্ধ ছিল; এর এক দিকে রয়েছে মিনারের মত একটি উচ্চ স্থান। আমরা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে সেখানে উঠলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে সমগ্র ভুবনেশ্বরের দৃশ্য দেখতে পেলাম, ঠিক যেন ছবির মত। বাজারে জনস্রোত চলেছে সার বেঁধে। এক দিকে দেখলাম, যতদূর দৃষ্টি যায়, সবুজ বৃক্ষ; লতাপাতা—কে যেন একটি দিগন্তপ্রসারী সবুজ আস্তরণ বিছিয়ে রেখেছে। ওরই মাঝে মাঝে বাড়ীঘরের ফাঁকে ফাঁকে ভুবনেশ্বরের মাসীর বাড়ী, গৌরী মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের চূড়াগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের নিকটবর্তী বৃহৎ বিন্দু সরোবরটি দেখতে সত্যি অতি মনোরম। তা নয়নকে মুগ্ধ করে, মনকে টেনে নিয়ে যায় সুদূর কল্পলোকে। উড়িষ্যার অন্যান্য সরোবরের মত এই বিন্দু সরোবরের মধ্যস্থলেও একটি দ্বীপ রয়েছে—চন্দনযাত্রার একটি সাদা মন্দির। এ সব নয়নমুগ্ধকর রমণীয় দৃশ্য দর্শনে আমার সৌন্দর্য্যবোধ পরিতৃপ্ত হ'ল।

যাক্, ট্রেনের সময় হয়ে এল বলে এবার আর বিশেষ কিছু দেখবার সুযোগ হ'ল না। পাণ্ডাকে এক টাকা বখশিস দিয়ে অপরাহ্ণ তিনটার সময় পুনরায় রিক্সা করে আমরা দু'জনে ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করলাম। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি, পুরীগামী ট্রেন আসতে এখনও প্রায় এক ঘণ্টা বাকী। ষ্টেশনের একটি বাঙালী হোটেলে কোনক্রমে আহারপর্ব শেষ করে নিলাম, যথাসময়ে ট্রেন এলে তাতে উঠে বসলাম।

পুরীতে এর পর মাত্র এক দিন ছিলাম, ১১ই মার্চ পুরী এক্সপ্রেসে পুরী ছেড়ে কলকাতা যাত্রা করলাম। সেখানে যাদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল—যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল, জানি নে জীবনে আর কোন দিন তাদের সঙ্গে সাক্ষাত হবে কিনা। আমি চললাম আমার গন্তব্যস্থলে। কারো স্মৃতি হয়তো অচিরেই বিস্মৃতির অতলে মিলিয়ে যাবে; আবার কারো স্মৃতি হয়তো জীবনভোর হৃদয়ে বয়ে নিয়ে জীবনপথে চলতে হবে। জগতের রীতিই এই! মোটের উপর পুরীতে তিন সপ্তাহ অবস্থান করে ঐ স্থান ত্যাগ করবার সময় মনে হ'ল যেন নানা ভাবে সেখানকার সঙ্গে আমার মন মায়াজালে জড়িত হয়ে পড়েছে।*

---

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রথম পাঁচখানি আলোকচিত্র শ্রীমাণিক সেন কর্ত্তৃক গৃহীত।

সমাবর্ত্তন অভিভাষণ

শ্রীব্রজসুন্দর রায়

অধুনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমাবর্ত্তন উপলক্ষে দেশের প্রসিদ্ধ বক্তা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন। এই প্রকার উপদেশদান একটি অতীব প্রাচীন রীতি। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্র যখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে যাইতেন, তখন অধ্যাপক গৃহস্থাশ্রম প্রবেশার্থী ছাত্রকে এই নূতন জীবন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া একটা কর্ত্তব্য মনে করিতেন। কেননা, এই সম্বন্ধে তাঁহার ছাত্র অনভিজ্ঞ এবং এই প্রকার উপদেশ তাহার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছাত্রাবস্থায় বিবিধ গ্রন্থ পাঠ করিলেও ছাত্রগণ যে গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হইতে পারে নাই, তাহা অধ্যাপকগণ জানিতেন। ভবিষ্যৎ জীবন অজ্ঞাত এবং বিপদ-আপদ ঘটা অসম্ভব নহে। তজ্জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী উপদেষ্টা ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে প্রিয় শিষ্যদিগকে কতকগুলি সাবধানবাক্য বলিতে চেষ্টা করিতেন। ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় তাঁহারা হয়ত কি আদর্শের সেবা করিবেন এবং কিরূপে জীবিকার্জ্জন করিবেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ উপদেশ গ্রহণের আবশ্যকতা বোধ নাও করিতে পারেন। তথাপি সন্নীতি ও সদ্ধর্ম্ম বিষয়ে মানুষের সর্ব্বদাই দৃষ্টির প্রসারতা আবশ্যক। মানুষ অবশ্য সকল বিষয়েই নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া জীবনপথে চলিবে, ইহাই অভীপ্সিত; তথাপি জ্ঞানবৃদ্ধ হিতাকাঙ্ক্ষী লোকদিগের উপদেশে আমাদের উপকারই হয়। মানুষের পতন সকল অবস্থায়ই সম্ভব, সুতরাং কেহ যদি সেই পতন হইতে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেন, তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন।

প্রাচীন সময়ে রাজনীতি এবং অর্থনীতি বিষয়ে এদেশের চিন্তা-প্রণালীতে এখনকার ন্যায় অনিশ্চয়তা ছিল না। কোন প্রকার সামাজিক বিপ্লবের বিষয়ও বিজ্ঞগণ চিন্তা করিতেন না। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কতকগুলি পন্থা নির্দ্দিষ্ট ছিল। অধ্যাপকগণ এবং তাঁহাদের অন্তেবাসী ছাত্রগণ তজ্জন্য শাস্ত্রানুগামী ছিলেন এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুশীলনই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এখন আমাদিগকে জীবিকা সংগ্রহের পথ নিজের বিদ্যা বুদ্ধি এবং সুযোগ অনুসারে নির্দ্ধারণ করিতে হয়। অনেকে পথ দেখিতেই পাই না এবং সমস্ত জীবন অপথে-কুপথে বিচরণ করি। আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সকল বিষয়েই অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার সমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খাইতেছি। পূর্ব্বতন ছাত্রগণের জীবন আমাদের জীবন অপেক্ষা অনেক নিরাপদ ছিল। সুতরাং আমাদের জন্য যে আরও অধিক উপদেশের প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল রাজনীতি বা ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই ছাত্রগণের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয় না। তাহাদিগকে এরূপ কিছু বলা আবশ্যক যাহাতে তাঁহারা কিঞ্চিৎ স্থায়ী পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারে। যে শিক্ষা তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাভ করিতেছেন, বা করিয়াছেন, তাহার পূর্ণতা এবং অপূর্ণতা সম্বন্ধেও তাঁহাদিগকে উপদেশ দান অপ্রয়োজনীয় নহে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষা যে আমাদের দেশীয় নীতি ও ধর্ম্মের সঙ্গে কি ভাবে সমন্বিত করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কথার বিশেষ মূল্য আছে। এখন বিজ্ঞ উপদেষ্টাগণ সমাবর্ত্তন উপলক্ষে যে সকল বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা দ্বারা আমাদের ছাত্রগণ যে বিশেষ উপকৃত হয়েন, তাহাও মনে হয় না। অনেক উপদেষ্টার বক্তব্য বিষয় অস্পষ্টই থাকিয়া যায়। নিম্নে আমি উপনিষদ্ হইতে একটি সমাবর্ত্তন অভিভাষণ উদ্ধার করিয়া দিলাম। পাঠক মহাশয় দেখিবেন, যে এই উপদেশটিতে এমন কতকগুলি নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে,

যদ্বারা ছাত্রগণ আজও উপকৃত হইবেন। ইহাতে ছাত্রগণ যে জ্ঞানার্জ্জনে উৎসাহিত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এদেশে জ্ঞানলাভে অদম্য উৎসাহ ছিল এবং জ্ঞানলাভ করিয়াই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে হয়, এমন কি জ্ঞানে আত্মিক মুক্তিলাভ হইবে, এইরূপ ধারণা ছাত্রগণ পোষণ করিতেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিয়া অধিকাংশ ছাত্র জ্ঞানলাভে বীতস্পৃহ হইয়া পড়ে। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আঃ বাঁচিলাম মনে করেন।

উপদেশ

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যংবদ। ধর্ম্মংচর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।" সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবোভব। পিতৃদেব ভব। আচার্য্য দেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মানি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। [illegible] ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্ম বিচিকিৎসা বা বৃত্তিবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তাঃ আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথাতে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তাঃ আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্। তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষঃ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ।

(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

অনুবাদ

বেদাধ্যাপনান্তে আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন। সত্য বলিবে। ধর্ম্মাচরণ করিবে। বেদাধ্যয়নে ঔদাস্য করিবে না। আচার্য্যকে উপযুক্ত ধন দক্ষিণা-স্বরূপ দান করিয়া অর্থাৎ গুরুদক্ষিণা দানান্তে গুরুগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্তানসূত্র কর্ত্তন করিবে না। অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্তানোৎপত্তির উপায় অবলম্বন করিবে। সত্য হইতে বিচলিত হইবে না। মঙ্গললাভে ঔদাস্য করিবে না। বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনে ঔদাস্য করিবে না। দেব ও পিতৃকার্য্যে ঔদাস্য করিবে না। মাতাকে দেববৎ পূজা করিবে। আচার্য্যকে দেববৎ পূজা করিবে। অতিথিকে দেববৎ পূজা করিবে। যে সকল কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সেই সকল কর্ম্ম করিবে। অন্য অর্থাৎ নিন্দনীয় কর্ম্ম করিবে না। আমাদের যে সকল কর্ম্ম সৎ সে সকলই তোমার কর্ত্তব্য, অন্য অর্থাৎ বিপরীত কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন কোন ব্রাহ্মণ আছেন, আসনাদিদ্বারা তাঁহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। বুদ্ধির সহিত দান করিবে। [পাত্রাপাত্র বিবেচনা কর্ত্তব্য]। লজ্জা অর্থাৎ বিনয়ের সহিত দান করিবে। ধর্ম্মভয়ের সহিত দান করিবে। মিত্রভাবের সহিত [অর্থাৎ সহানুভূতির সহিত] দান করিবে। যদি তোমার কর্ম্ম বা আচার বিষয়ে সংশয় হয়, তবে সেই স্থানে বা কালে যে সকল বিচারক্ষম, অক্রুরমতি, ধর্ম্মকাম, অন্যকর্ত্তৃক যাগাদি কার্য্যে নিযুক্ত বা স্বাধীন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেই বিষয়ে তদ্রূপ আচরণ করিবে। কোন কোন ব্যক্তি দ্বারা অভিযুক্ত কর্ম্ম বা আচরণ সম্বন্ধে সেই স্থানে বা কালে যে সকল বিচারক্ষম, অক্রুরমতি, ধর্ম্মকাম, অন্যকর্ত্তৃক যাগাদি কার্য্যে নিযুক্ত, বা স্বাধীন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই সকল বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেই সকল বিষয়ে সেরূপ আচরণ করিবে।

ইহাই আদেশ। ইহাই উপদেশ। —(তত্ত্বভূষণ)

এই উপদেশটি আমাদের নিকট অমূল্যই মনে হয়, কেননা, মানুষের পক্ষে সর্ব্বদাই এইরূপ উপদেশের প্রয়োজন রহিয়াছে। যাঁহারা সমাবর্ত্তন-উপদেশ ছাত্রগণকে দান করার জন্য আহূত হয়েন, তাঁহারা যদি ঋষির এই উপদেশটি মনের সম্মুখে রাখিয়া ছাত্রগণকে আজকালের সময়োপযোগী কথা বলেন, তাহাতে যুবক যুবতীগণ উপকৃত হইবেন, আশা করা যায়। জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ লোকেরা ছাত্রগণকে আরও জ্ঞানার্জ্জনে উৎসাহ দিলে, ফল ভাল হইবে। সংসারধর্ম্ম কিভাবে তাহারা আচরণ করিলে, সমাজের মঙ্গল হইবে, সেই বিষয়েও জ্ঞানবৃদ্ধের কথার মূল্য আছে। মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ ত লোকেরা আগ্রহের সহিত শুনে, কেননা তাহারা বিশ্বাস করে তিনি তাহাদের মঙ্গলকামী। উপদেষ্টারা যদি নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা যুবকযুবতীদিগকে প্রেমের সহিত বলিতে পারেন, তবে তাহারা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিবে।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে পুঁজিপতিদের উৎপাদন-অপচয় ও দারিদ্র্য

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

গ্রীষ্মমণ্ডলের কিঞ্চিৎ বাহিরের মণ্ডলকে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল বলা হয়। এই ভূভাগের জলবায়ু উষ্ণমণ্ডলের আবহাওয়ার মত শক্তিহারক নহে। আর সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া অত্যন্ত উষ্ণতা এ মণ্ডলে দেখা যায় না। বৎসরে অনধিক চারি মাস এই মণ্ডলে শীতকাল থাকে—শীত খুব বেশী না পড়িলেও এই সময় গরম খুব কম থাকে। এই মণ্ডলের কোন কোন অংশে শীতকালে কুয়াশাও দেখা যায় এবং এই সময় বৃক্ষাদির উৎপাদনও সাময়িক ভাবে হ্রাস পায়।

তুলা

এই মণ্ডলে যথেষ্ট সূর্য্যালোক পাওয়া যায় বলিয়া এবং গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে যথেষ্ট বারিপাত হওয়ার দরুন প্রভূত পরিমাণ তুলার চাষ হয়। তুলা ব্যতীত সভ্য মানুষের চলে না। ভারতের আবিষ্কৃত এই তুলাই সভ্যতার আদিম যুগ হইতে মানুষের নগ্নতা ঢাকিবার জন্য বহু প্রকারের বস্ত্র ও আভরণ যোগাইতেছে। আজ প্রায় পৃথিবীর এক শতটা দেশে তুলার চাষ হয়। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একাই মোট উৎপাদনের এক শত ভাগের ষাট ভাগ সরবরাহ করে। আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল হইতে তুলার চাষ প্রায় ১৪০০ মাইল পশ্চিম পর্য্যন্ত চলিয়াছে। মেক্সিকো উপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে ৪০০ মাইল পর্য্যন্ত এই তুলার চাষ বিস্তৃত। এই তুলার চাষের বিস্তৃত ভূভাগ যুক্তরাষ্ট্রের কটন বেল্ট নামে পরিচিত। বৎসরে এই স্থানে এক কোটি হইতে এক কোটি ষাট লক্ষ গাঁট তুলা উৎপন্ন হয়। আমেরিকার পরেই তুলা উৎপাদনের দ্বিতীয় স্থান দখল করিয়াছে ভারতবর্ষ—যদিও পরিমাণে ইহা আমেরিকার অর্দ্ধেক মাত্র। আমেরিকায় উৎপন্ন তুলার তিন-চতুর্থাংশ বিদেশে চালান হয় এবং এইজন্যই যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর তুলার বাজার নিয়ন্ত্রিত করে।

আমেরিকায় যখন প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় তখন ঔপনিবেশিকেরা বেপরোয়া ভাবে তুলার চাষ চালায়। ফলে কর্ষিত জমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতে থাকে। ঔপনিবেশিকেরা এই ভাবে ভার্জিনিয়া হইতে টেক্সাস্ পর্য্যন্ত নির্ম্মম চাষ চালাইয়া যায়। অফুরন্ত জমি এইরূপে পতিত ও অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। বাধ্য হইয়া তখন ঔপনিবেশিকগণ তুলার 'ক্ষেতি চাষ' আরম্ভ করে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক সস্তায় পাওয়া যাইত না। কাজে কাজেই জাহাজ ভর্ত্তি নিগ্রো দাসগণকে আফ্রিকা হইতে আনা হইতে লাগিল। এইরূপে আমদানী-করা নিগ্রো এবং তাহাদের হতভাগ্য বংশধর ক্রীতদাসেরা ২৫০ বৎসর ধরিয়া আমেরিকায় তুলা-চাষীর শ্রমিক যোগাইল। তুলা চাষের ব্যাপারে ক্রীতদাস পদ্ধতি নিতান্তই যেন স্বাভাবিক পরিণতি হইয়া পড়িয়াছিল। সস্তা ক্রীতদাস ছাড়া এত সস্তায় তুলা সংগ্রহ কে করিবে? একজন কর্ম্মঠ নিগ্রো ক্রীতদাসের জন্য বার্ষিক খরচ হইত মাত্র ১৫ ডলার। প্রথমে যে সকল শ্বেতাঙ্গ চাষী নীতির দিক দিয়া ক্রীতদাস নিয়োগে আপত্তি করিয়াছিল তাহারাও প্রতিযোগিতার চাপে নিজেদের বিবেককে অগ্রাহ্য করিয়া দাস ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যাহারা তাহাতে রাজী হইল না তাহাদিগকে তুলা চাষের জমি বিক্রয় করিয়া দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল।

বড় বড় তুলা চাষের মালিকেরা দূরে শহরে বাস করিত এবং শ্বেতকায় তত্ত্বাবধায়কগণের উপর কার্য্যের ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত। ইহাতেই এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার অমানুষিকতা ও ক্রীতদাসের প্রতি অত্যাচার বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কচিৎ কখনও চাষের মালিকেরা আবহাওয়া প্রীতিকর থাকিলে তাহাদের 'এষ্টেটে'র কাজকর্ম দেখিতে আসিত কিন্তু এরূপ সাময়িক পরিদর্শন দ্বারা তুলা চাষের অপব্যয় ও নিগ্রো দাসের প্রতি নিষ্ঠুরতার কিছুমাত্র লাঘব হইত না।

আইনের চোখে ক্রীতদাস-প্রথা লোপ পাইয়াছে কিন্তু পুরাতন ব্যবস্থার অনেক দোষক্রটি আজ পর্য্যন্ত লোপ পায় নাই। জমি, বীজ, চাষের যন্ত্রাদি এবং জানোয়ারের মালিক একই ব্যক্তি এবং উৎপন্ন তুলার একটা মোটা অংশই তাহার প্রাপ্য। চাষের জমিগুলি প্রায়ই ছোট ছোট এবং এখানে দশ লক্ষেরও বেশী লোক চাষীর কাজ করে। তাহাদের অধিকাংশই নিগ্রো। ইহাদের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ নিজেরাই জমির মালিক আর সকলে খাজনা দিয়া জমি চাষ করে।

রায়ত ও জমির মালিক হিসাবে এই দুই রকম ব্যবস্থায় সাধারণতঃ চাষের কার্য্য চলিয়া থাকে। এক শ্রেণীর রায়তের নাম "ক্রপার" (cropper)। ইহারা জমির সারের ও তুলার জাঁট ছাড়াইবার (ginning) খরচের অর্দ্ধেক নিজেরা বহন করে এবং উৎপাদিত তুলার অর্দ্ধেক পাইয়া থাকে। আর এক শ্রেণীর রায়তকে 'ভাগী রায়ত' (share tenants) বলা চলে। ইহাদের তুলা ছাড়াইবার (mule) ও অন্যান্য যন্ত্রাদি আছে। ইহারা 'ক্রপার' অপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর। উৎপন্ন তুলার এক-চতুর্থাংশ ইহারা জমির মালিককে দিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা ভূমি ও মূলধনহীন নেহাতই দিনমজুর মাত্র।

ভাগী রায়ত, 'ক্রপার' ও দিনমজুর—চাষের কয়েক মাস ইহাদের কাহারও বিশ্রাম নাই। ইহাদের পরিবারে সকলেই সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে। এত পরিশ্রমেও 'ক্রপারে'র দেনার ভার কখনও লাঘব হয় না। কাঠের তৈরি ছোট ঘরে তাহার বাস। গ্রীষ্মকালে সে গরমে ছটফট করে এবং প্রচণ্ড শীতে গৃহ গরম করিবার সঙ্গতি পর্য্যন্ত তাহার নাই।

তুলাচাষীকে প্রথম শোষণ করে অবশ্য জমির মালিক। দক্ষিণ দেশের কোন এক ষ্টেটের গবর্ণর সত্যই বলিয়াছেন যে 'নিগ্রো হাল ছাড়ায় (বেপরোয়া চাষ দ্বারা), জমির মালিক হাল ছাড়ায় নিগ্রোর…(চাষীর)।' দারিদ্র্যের দরুন চাষী স্থানীয় দোকানদার (store keeper) অথবা মহাজনের নিকট হইতে ক্ষেতের উৎপন্ন তুলা বন্ধকী রাখিয়া উচ্চ সুদে কর্জ্জ করে। দৈনন্দিন খরচ যোগাইবার জন্য বাধ্য হইয়া সে দোকানদারের নিকট উৎপন্ন তুলার কিয়দংশ বিক্রয় করে। এইরূপে গ্রাম্য দোকানদার তুলার ব্যাপারী হইয়া দাঁড়ায়। অজ্ঞ বলিয়া চাষী পৃথিবীর বাজারদরের খবর রাখে না, সুতরাং অল্প মূল্যে বিক্রয় করে।

তুলার ব্যাপারীর পরবর্ত্তী মুনাফাখোর তুলার ফাটকা ব্যবসায়ী। সে তুলার দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বেশী মুনাফা কামায়। কপাল বড় জোর ভবিষ্যতে 'ভাগী রায়ত' হইতে পারে। কতকটা দেনার ভার কমাইতেও সক্ষম হয়। ইহার বেশী সৌভাগ্য তাহার হয় না। কিন্তু মুনাফাখোরের দল বাড়িয়াই চলে, ফাটকা ব্যবসায়ীর পর আসে বিদেশে চালানকারী। তাহারও পরে আরও এক দল আছে যাহারা তুলা হইতে নানা দ্রব্য প্রস্তুত করে। এতগুলি মুনাফাখোরের পাল্লায় পড়িয়া তুলার চাষী আজও প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বের নিগ্রো ক্রীতদাসের মতই অসহায় ও নিষ্পেষিত।

অথচ তুলার উৎপাদক ও সর্ব্বশেষে তুলাজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীদের অর্থাৎ খাদকদের (consumer) মধ্যে কোন যোগাযোগ না থাকায়, তুলাচাষীর মন্দ ভাগ্য তুলার দামের উঠা-নামার অনিশ্চয়তার উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে। ১৯৩১ সালের মন্দার সময় তুলার দাম বারো বৎসর পূর্ব্বেকার উচ্চ মূল্যের এক-ষষ্ঠাংশ হইয়া যায়। ইহার পর হইতে দরের উঠা-নামা চলিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধে আবার দাম একেবারে উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। দাম বাড়িলেই চাষের জমির পরিমাণ বাড়ে। তুলার উৎপাদন অতিরিক্ত বাড়িলে আবার দাম পড়িয়া যায়, সুতরাং অনেক তুলা মাঠ হইতে সংগ্রহই করা হয় না এবং এইরূপে দাম পড়িয়া যাওয়া নিবারণ করা হয়। এইরূপে তুলার উৎপাদন কমাইয়া দাম বাড়ানো হয়। ইহার উপর আবহাওয়ার দরুণ উৎপাদনের বাড়তি-কমতি আছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর তুলার দর বাড়িলে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরের চৌদ্দ বৎসর অনেক অবিক্রীত তুলা মজুত থাকিতে আরম্ভ হয়। ১৯২৯ সনে যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট স্থির করেন যে, অতিরিক্ত উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত ৬০ লক্ষ গাঁট তুলা সরকারী খরচায় কিনিয়া ধরিয়া রাখা হইবে। যদিও ঐ মালের দাম তুলার মালিকগণকে অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু ইহাতে উৎপাদক ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। খাদকের চাহিদা হ্রাস পাইলেও গুদামের মাল বাড়িয়াই চলিল। ১৯৩২ সালে দেখা গেল হাতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ তুলার গাঁট জমিয়াছে—ইহা প্রায় এক বৎসরের উৎপাদনের সমান।

তিন বৎসর অবশ্য পোকা লাগিয়া (boll weevil) তুলার উৎপাদন-হ্রাসে কতকটা সাহায্য করিয়াছিল। শেষকালে সরকারকে অতিরিক্ত উৎপাদন বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে হইল। চারি বৎসর পর্য্যন্ত উৎপাদকগণের নিকট হইতে তুলা কিনিয়া গুদামজাত তুলা বিক্রয়ে অসমর্থ হইলে পর গবর্ণমেণ্ট সরকারী অর্থ খরচ করিয়া তুলা চাষ বন্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। তুলাচাষীগণকে পূর্ব্বাপেক্ষা কম জমিতে চাষ করিতে বলা হইল এবং গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক অকর্ষিত একর পিছু ২০ ডলার পর্য্যন্ত খেসারত দিলেন। এই ব্যয়ের কিয়দংশ তুলা-শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর কর বসাইয়া আদায় করা হইল। এজন্য আবার তুলানির্ম্মিত দ্রব্যের দাম বাড়িল এবং তুলাজাত দ্রব্য কম বিক্রয় হইল। ফলে কাঁচা তুলার চাহিদা আরও হ্রাস পাইল।

উক্ত ব্যবস্থায় প্রথম বৎসর ১ কোটি ৫ লক্ষ একর জমি চাষ করা হইল এবং চাষীদিগকে জমি চাষ না করার জন্য খেসারত দেওয়া হইল ১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার। কিন্তু তুলা উৎপাদনের পরিমাণ অতি ধীরে ধীরে কমিয়াছিল। খারাপ আবহাওয়া, অনাবৃষ্টি, অতিরিক্ত গ্রীষ্ম, ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি ধূলি-ঝটিকা (dust storm) এই তুলা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে মানুষের সহায় হইয়াছিল। ১৯৩৪ সালে তুলার জন্য চাষের জমির পরিমাণ বাড়াইয়া ১ কোটি ৪০ লক্ষ করা হইল। ইহাও পরিকল্পনার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

এই সম্পর্কে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ইংলণ্ড তাহার সাম্রাজ্যের ব্যবসা বজায় রাখিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে তুলার আমদানী কমাইতে বাধ্য হইয়াছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহির্বাণিজ্যের তুলার ব্যবসায়ে ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয়। ইহা ব্যতীত ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান, উগাণ্ডাতেও তুলার চাষ সুরু হইয়াছে। ব্রেজিল তুলার চাষ আরম্ভ করিয়াছে এবং ইহার তুলা চাষের জমির পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষাও অধিক। ব্রেজিলে বিদেশী মূলধনের সাহায্যে বহু তুলার কলও স্থাপিত হইয়াছে।

তামাক

তুলাচাষের প্রসঙ্গে তামাকের কথাও আসিয়া পড়ে। পৃথিবীর বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে তামাক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা বলাই বাহুল্য। তামাক উৎপাদন ও রপ্তানি বিষয়েও আমেরিকা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তামাকের চাষ কটন বেল্টের পূর্ব্বাংশের অর্দ্ধেক দেশ জুড়িয়া এবং আরও কিছু উত্তরের ষ্টেট্-সমূহে হইয়া থাকে। তুলার চাষ যে সকল অবস্থা, অপব্যয়, অনাচারের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে তামাকের চাষও সেইরূপ ভাবেই হইয়াছে। কিছুদিন হইল তামাক ব্যবসায়েও অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য মন্দার পড়িয়াছে—৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক-পাতা

পৃথিবীর বাজারে অবিক্রীত পড়িয়া ছিল। হাজার হাজার একর জমির তামাকচাষ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সিগারেট প্রস্তুতকারিগণের উপর কর বসাইয়া তামাক-চাষের জমির মালিকগণকে খেসারত দেওয়া হইয়াছিল।

তুলা ও তামাক উভয় দ্রব্যের ব্যাপারেই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা চরমে পৌঁছিয়াছে, পৃথিবীর বাজার লইয়া সর্ব্বদা কাড়াকাড়ি। শেষ পর্য্যন্ত এই বাণিজ্যিক লড়াই মহাযুদ্ধে পরিণত হয়। ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি শুষ্ক (dry) দেশগুলি অর্থাৎ গ্রীস ও তুরস্ক এক প্রকার তামাক উৎপাদন করে যাহা বাজারে 'টার্কিস' বলিয়া পরিচিত। ইহার সহিত যুক্তরাষ্ট্রের 'ভার্জিনিয়া'র কোন প্রতিযোগিতা নাই। এককালে ইটালী যুক্তরাষ্ট্রের বড় খরিদ্দার ছিল, এখন গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে এদেশ তামাকচাষের উৎসাহ দিতেছে এবং আমেরিকা হইতে তামাক আমদানী বহুল পরিমাণে কমাইয়া দিয়াছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইটালীর পথ ধরিয়াছে। ইংলণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকায় ও রোডেসিয়ায় এবং ফ্রান্স আল্‌জিরিয়ায় তামাকের চাষ বাড়াইয়া চলিয়াছে। অবশ্য এই সকল স্থানে যুক্তরাষ্ট্রের মত আবহাওয়া বা চাষের সুবিধা নাই তবুও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে এই অপচয়মূলক তামাকের চাষ বাড়িয়া চলিয়াছে। ধনতন্ত্রের ইহাই উৎপাদন রীতি—সঙ্গে চলে অন্ধ ও স্বার্থদুষ্ট জাতীয়তার মোহে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অপচয়।

ধান্য

অর্দ্ধ গ্রীষ্মমণ্ডলের আর্দ্র দেশসমূহে উৎপন্ন আর একটি খাদ্য-শস্য ধান্য। শ্বেতজাতির প্রধান খাদ্য যেরূপ গম, দক্ষিণ-এশিয়ার বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর প্রধান খাদ্য সেরূপ চাউল। সমস্ত পৃথিবীতে উৎপন্ন ধান্যের তিন-চতুর্থাংশ ভারতবর্ষ ও চীনদেশে জন্মে অথচ এই বিপুল পরিমাণ ধান্য পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে না, উৎপাদিত হইয়া নিজ নিজ দেশেই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। বরং জনসংখ্যার অনুপাতে এই সকল দেশে ধান্য উৎপাদন কম হয় এবং কিছু পরিমাণ খাদ্য বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়।

চীনদেশে অগণিত ছোট ছোট ক্ষেত্রে ধানের চাষ হয়। চাষীরা অতি দরিদ্র, আধুনিক যন্ত্রপাতির ধার ধারে না। বহুপুরাতন দেশে স্বভাবতঃই ভূমির উর্ব্বরতা কম এজন্য কৃষকেরা মানুষের এবং সকল রকম জানোয়ারের পুরিষ পচাইয়া জমির সাররূপে ব্যবহার করে। চীনে জমির সারের জন্য মানুষের পুরিষ বিক্রয় হয়। ভূপর্য্যটক শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস সাইকেলে চীনের গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিবার সময় এইরূপ সার-প্রয়োগে কৃষিকার্য্য নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছেন। পরিশ্রমী চীনা চাষী পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ চালাইয়া সুবৎসরে কোনরূপে পরিবার প্রতিপালন করিতে—হয়ত বা কিয়ৎ-পরিমাণ ধান্য বিক্রয় করিতেও সক্ষম হয়। ফসলের সময় চাষী এক পিকুল (Picul) ধান দশ ডলারে বিক্রয় করে। উহাই আবার বৎসরের অন্য সময়ে—যখন চাউলের দর চড়ে, আটাশ ডলার দরে কিনিতে বাধ্য হয়। দুর্ব্বৎসরে এই পরিশ্রমী চীনা কৃষকের পুরস্কার ক্ষুধা, অনশন ও মৃত্যু।

অথচ চীনদেশের গ্রামে লোকসংখ্যা বিপুল, কোন কোন স্থানে এক বর্গমাইলে ৭০০০ জন। এইজন্য দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর। অবশ্য অনাবৃষ্টি এবং বন্যার জন্য চীনদেশে ফসল নষ্ট হয় এবং দুর্ভিক্ষ হয়।

যখন দৈবদুর্ঘটনা ঘটে তখন লোকের আর বাঁচিবার উপায় থাকে না। আইনকে ফাঁকি দিয়া মহাজনেরা সে দুর্দ্দিনেও জাপানে বেশী লাভের আশায় চাউল চালান দেয়। গ্রাম্য ব্যাঙ্কগুলি চাউল কিনিবার জন্য কৃষককে শতকরা এক শত টাকা বা উহারও বেশী সুদে টাকা ধার দেয়। যখন সকল খাদ্যই নিঃশেষ হইয়া যায় তখন চীনা চাষী গৃহের দ্রব্যাদি, বাড়ীঘর, এমন কি সন্তান বিক্রয় পর্য্যন্ত করিয়া খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে ; কিন্তু তাহাতেও না কুলাইলে তাহাকে অনশনে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মন্বন্তরে বাঙালী এইরূপ দৃশ্যই নিজ দেশে দেখিয়াছে। অবশ্য খাল খনন, অরণ্য রোপণ (afforestation), কর্জ্জ পাইবার সুব্যবস্থা এবং চলা-চল-ব্যবস্থার উন্নতিদ্বারা দুর্ভিক্ষনিবারণের উপায় করা যাইতে পারে, কিন্তু যে দেশে বিদেশী পুঁজিপতির স্বার্থ প্রবল সেখানে জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। ভারতবর্ষেরও ঐ একই ভাগ্য, ঐ চরম দুর্গতি। নামে মাত্র চীন স্বাধীন, আসলে সে দেশ পাশ্চাত্ত্য পুঁজিপতিদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

অথচ ধান্যচাষের ও চাষীর অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। আমেরিকার 'কটন বেল্টের' দক্ষিণে এবং অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ক্যালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্বারা আধুনিক পদ্ধতিতে ধান্যের চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শ্রমিককে অতিরিক্ত মজুরি এবং সুখ-সুবিধা দিয়াও ধানের চাষ লাভজনক হইতে পারে। এই অঞ্চল হইতে এশিয়ার বাজারের প্রতিযোগিতায় কিছু পরিমাণ চাউল রপ্তানী সম্ভব হওয়াতে প্রমাণিত হয় যে চাষীকে বঞ্চিত না করিয়াও ধান্য চাষ ও ধান্যচাষীর অবস্থার উন্নতি সম্ভবপর।

চীনা চাষীর কথা বলিতেই হিন্দুস্থানের চাষীর কথা আসিয়া পড়ে। তাহারও অবস্থা চীনা চাষী হইতে উন্নত নহে। জমিদার বা গবর্ণমেণ্টের খাজনা দিয়া এবং মহাজনের সুদ দিয়া তাহার জীবনধারণ করা প্রায় অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় তাহার পক্ষে চাষের জন্য আধুনিক যন্ত্রাদির বা জমিতে সারের ব্যব-হারের প্রশ্ন আসে না। চাউলের উৎপাদন ও খাদ্য-রূপে ব্যবহার হিসাবে চীনের পরই ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষে উৎপাদিত চাউল তথা খাদ্যশস্য ভারতবর্ষের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী না করিলে চলিত না। মহাযুদ্ধের পর অবস্থা আরও বদলাইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশের বাড়তি চাউলের আশা

প্রায় লোপ পাইয়াছে। সুতরাং ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভারত-বাসী জাভা, শ্যাম, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টাইন এবং রুশিয়ার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত পৃথিবী যখন খাদ্যসঙ্কটের সম্মুখীন তখনও পুঁজিপতিগণের মুনাফার বিরাম নাই, বাড়্তি অঞ্চলের অপচয় ও অপব্যয় সমভাবেই চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

চা

এই মণ্ডলের আর একটি উৎপন্ন পণ্য চা। আসাম চা-উৎপাদন বিষয়ে ভারতবর্ষের তথা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঞ্চল। এখানে চা-কুলীর শোষণ কুখ্যাত চা-চাষের সহিত এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট যে এ বিষয়ে নূতন করিয়া বলা বাহুল্য। উত্তর ও মধ্য ভারত হইতে অজ্ঞ স্ত্রী-পুরুষকে আড়কাঠিগণ মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া আসামের চা-বাগানে লইয়া যাইত। একবার ইহাদের হাতে পড়িলে আর নিষ্কৃতি ছিল না। আসামের চুক্তিবদ্ধ কুলীপ্রথা দাসত্বপ্রথার আধুনিক সংস্করণ মাত্র। বর্ত্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে চায়ের বাজার মন্দা হইলে চা-বাগানের মজুরদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। বহু আন্দোলনের পর ১৯৩৩ সনের আইন বলে চা-কুলী এখন স্ত্রী-পুত্রসহ তিন বৎসর বাগানে কাজ করিবার পর দেশে ফিরিবার অধিকার পাইয়াছে। ভারতীয় শ্রমিককে শোষণ করিয়া এবং আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতির সাহায্যে ইউরোপীয় চা-ব্যবসায়ী পৃথিবীর বাজারে চীন দেশীয় চাকে হঠাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৮৬৯ সালে ইংলণ্ড ভারতের এক কোটি পাউণ্ড চা আমদানী করিয়াছিল। ঐ বৎসর চীন হইতে আমদানী হয় দশ কোটি পাউণ্ডের অধিক। ত্রিশ বৎসরে ভারতীয় চায়ের আমদানী চৌদ্দ গুণ বাড়িয়া যায় এবং চীনা চায়ের আমদানী চারি ভাগের তিন ভাগ হ্রাস পায়। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই ভারতের চায়ের রপ্তানী ত্রিশ কোটি পাউণ্ডে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু ব্যবসায়ের উন্নতির অনুপাতে চা-কুলীর ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হয় নাই। পুঁজিপতিগণের সম্পদবৃদ্ধি ও শ্রমিকের দারিদ্র্য ইহাই বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য।

ঋতুলক্ষ্মী

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

চলে যায় ঐ যে মেয়ে
নির্ঝরিণীর ছন্দে গেয়ে—
যৌবনেরি মর্ম্মবাণী
জানি তাই সত্যি জানি
সেই সে বাণী
সে যেন চোখের হাসি
দূরের বাঁশী
দখিন হাওয়ার মর্মরানি
অশোকের ফুটল কলি
পলাশের আগুন রাঙা—
ফুলে তার বন রেঙেছে
চরণের আল্‌তা রাঙা
বুঝি তার ছাপ লেগেছে
তাই রেঙেছে—
ভিজে পায় বুলিয়ে গেছে
দিগবিদিকে—
পাগল পরী আগল ভাঙা।
চাতকী উঠল মেতে—
ঈশানের কাজল নিশান
উড়ল মেঘের বৃষ্টি পেতে
যদি না বিন্দুবারি
পায় সে তারি—
হর্ষে লোভে উড়বে তবু
পোড়ে তো পুড়বে পাখা
বজ্রশিখায়—
হায় রে পুড়ে মরবে তবু।
ফাগুনের আগুন গেল
মলয়ের শিহর তোলা
মাধবীর কুঞ্জ বনে
দোলে ঐ দোলন দোলা
সবুজের দোবজা গায়ে—
এল আজ মেখলা ছায়ে—
ঘন ঘোর কালবোশেখী
তাইতো দেখি—
রক্তের লহর উথলে পায়ে
ভুলে আজ বর্ষারাণীর
ঝরঝরাণির—
নৃত্যলহর ডাইনে বাঁয়ে
চলে যায় ঐ সে মেয়ে—
ঐ যে মেয়ে—
যায় সে চলে—
এগিয়ে চলে
যেন কোন মুক্ত বেণী—
বৈরাগিণী
পিছন ফিরে—
যায় না চেয়ে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতের পঠনপাঠন

শ্রীরমা চৌধুরী

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক না রেখে ইচ্ছামূলক বিষয়ে পরিণত করাই উচিত কি না, এ বিষয়ে বর্ত্তমানে অনেকেই আলোচনা করছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যসূচীর কিছু পরিবর্ত্তন যে অত্যাবশ্যক, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। কারণ, এই পরীক্ষার অবশ্যপঠনীয় বিষয়ের সংখ্যা ও পঠনীয় অংশ যে সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একটু গুরু ভারই হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই প্রসঙ্গেই সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক বিষয়ের তালিকা থেকে সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জন করে, ছাত্রছাত্রীদের ভার লাঘব করার প্রশ্ন উঠেছে।

এস্থলে প্রথম প্রশ্ন এই যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাধ্যতামূলক বিষয় নির্ব্বাচনের মূল নিয়মটি কি? এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান নেই। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, যে যে বিষয়ের অন্ততঃ কিছু জ্ঞান সকলের পক্ষেই অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেই সেই বিষয়ই কেবল বাধ্যতামূলক করা ন্যায়সঙ্গত। আমাদের বিশ্বাস যে, এই অবশ্যপ্রয়োজনীয়তার কষ্টিপাথরে যাচাই করেই ইংরেজী, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়কে প্রবেশিকা স্তর পর্য্যন্ত, এবং ইংরেজী ও বাংলাকে 'ইণ্টারমিডিয়েট' পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

তারপরে, এ স্থলে দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে যে, 'অবশ্য প্রয়োজনীয়তা'র প্রকৃত অর্থই বা কি? সাধারণ ভাবে আমরা বলে থাকি যে, যা মানুষকে 'মানুষ' হতে সাহায্য করে, তাই হ'ল মানুষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। পুনরায় এস্থলে প্রশ্ন উঠে, 'মানুষ হওয়া'র প্রকৃত অর্থটাই বা কি? এস্থলেও, সাধারণ ভাবে আমরা আর্থিক উন্নতি করাকেই 'মানুষ হওয়া' বলি। যেমন, আমরা বলি 'অমুক বিধবার ছেলেটি মানুষ হয়ে মায়ের দুঃখ ঘুচিয়েছে।' এখানে মানুষ হওয়ার অর্থ—বেশ ভাল একটি চাকুরী জুটিয়ে মায়ের অর্থচিন্তা দূর করা। সাধারণ মানুষের পক্ষে এইটাই হ'ল চরম 'মানুষ হওয়া'।

অবশ্য এরকম 'মানুষ হওয়া'কে আমরা তুচ্ছ বলে তাচ্ছিল্য করতে পারি না। কারণ, সকল যুগেই জগতের মূল কথা হ'ল বাঁচ্‌বার জন্য সংগ্রাম (struggle for existence), এবং এই সংগ্রাম জয়ের প্রথম কথাই হ'ল আর্থিক সাচ্ছল্য, অন্নবস্ত্রের সংস্থান—এ হলে তবেই অন্য সব কথা উঠে। আর্থিক সাচ্ছল্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেও, দৈহিক কষ্ট সম্পূর্ণ মেনে নিয়েও যে মানুষ বড় হয় নি, তা নয়—সকল দেশেই সকল যুগেই তার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণের পক্ষে যে এ নিয়ম খাটে না, তা বলাই বাহুল্য। সেজন্য সাধারণ ভাবে এই আর্থিক উন্নতিকে মানুষের অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলির মধ্যে একটি প্রধান উপায়, মানুষের মানুষ হওয়ার উপায়গুলির মধ্যে একটি প্রথম উপায় বলে মেনে আমাদের নিতেই হবে নিঃসন্দেহ।

সঙ্গে সঙ্গে এটাও কিন্তু সমান সত্য যে, আর্থিক ও দৈহিক প্রয়োজনই মানুষের প্রয়োজনের সবটুকু নয়। মানুষ পশুর প্রায় দেহধারী হ'লেও দেহসর্ব্বস্ব নয়। দেহ ছাড়াও মানুষের যা আছে আর পশুর যা নেই, তাকে আমরা বলি বিচারবুদ্ধি, এবং যার জন্য এই বিচারবুদ্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভব, তাকে বলা হয় মন ও আত্মা। সেজন্য দৈহিক প্রয়োজনের তাগিদে যেমন মানুষ অন্নবস্ত্রের সন্ধানে ছোটে, তেমনি আত্মার প্রয়োজনের তাগিদেও তাকে ছুটতে হয় দর্শন, ধর্ম্ম, কাব্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভৃতির পশ্চাতে। সুতরাং মানুষের যা অবশ্য প্রয়োজনীয়, তার দুটি সমান দিক্—দৈহিক প্রয়োজন ও আত্মিক প্রয়োজন। এ কারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের পক্ষে কি কি বিষয়ে জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্যক, এই আলোচনা ও বিচার কালে এই দুই রকমের প্রয়োজনই স্মরণে রাখা উচিত। কিশোরবয়স্ক ছাত্রছাত্রীগণের যে আত্মিক প্রয়োজন কিছুই নেই, এ কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না। তারাই হ'ল জাতির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা স্থল—সেজন্য তাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই হওয়া উচিত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একমাত্র লক্ষ্য। তাদের এমন ভাবে গড়ে দিতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজেদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান নিজেরা করে নিতে পারে। এছাড়া, তাদের এমন ভাবেও অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে তারা কেবল আজীবন অন্নবস্ত্রের চিন্তাতেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত না থেকে অন্যান্য উচ্চ দিকেও মনোনিবেশ করতে পারে।

এখন দেখা যাক্, সংস্কৃতের পঠনপাঠন এই দুই দিক থেকে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় কি না। প্রথমতঃ, এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বর্ত্তমানে সংস্কৃত পাঠের আর্থিক মূল্য 'কাণাকড়ি'ও নেই। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইংরেজী, এমনকি, বাংলাতেও 'ডিগ্রি' থাকলে যেস্থলে নানা বিভাগে ভাল চাকুরী পাওয়া সহজ হয়, সেস্থলে সংস্কৃতের 'ডিগ্রি'ধারীর চাকুরীর আশা অতি অল্পই। প্রথমতঃ, সংস্কৃতে 'ডিগ্রি'ধারীর কেবল শিক্ষাবিভাগেই যা একটু চাকুরী পাবার আশা আছে—'স্কুল-কলেজে' শিক্ষক বা অধ্যাপকরূপেই মাত্র—কিন্তু সাধারণতঃ অন্য কোনো বিভাগের উপযুক্ত বলে তিনি বিবেচিত হন না। অথচ ইংরেজী বা ইতিহাসে ডিগ্রিধারীরা শিক্ষাবিভাগ ছাড়াও অন্যান্য বহু সাধারণ বিভাগে (ব্যাঙ্ক, বীমা, সওদাগরি অপিস, কারখানা প্রভৃতি) চাকুরী পেয়ে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাবিভাগেও অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে

সংস্কৃত শিক্ষক বা অধ্যাপকের সংখ্যা বড় কম, বেতনও কম, পদমর্য্যাদাও তাই। যেস্থলে অন্যান্য বিষয়ে নূতন পদের সৃষ্টি করা হয়, সেস্থলে সংস্কৃতের পদ বাড়ান ত দূরে থাক্, ছাত্রসংখ্যার অত্যল্পতার ওজুহাতে তা কমানই হচ্ছে। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃতে 'ডিগ্রি'র মূল্য যে কিছুই নয়, এই ভাবটিও যেন লোকের মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়াচ্ছে—এটা যেন অতি তুচ্ছ, অতি সহজ বিষয়, এর প্রথম শ্রেণী যেন ইংরেজী বা অর্থনীতির প্রথম শ্রেণীর থেকে অনেকটাই নীচু। অপরপক্ষে সংস্কৃতাভিজ্ঞ লোক যে 'টিকিধারী' অর্ব্বাচীন পণ্ডিত অর্থাৎ পণ্ডিতমূর্খই মাত্র, চাকুরী ও সমাজ উভয়ক্ষেত্রেই তাঁরা সম্পূর্ণ মূল্যহীন, এই মনোভাবও আজকাল অতি ব্যাপক। পূর্ব্বে অন্ততঃ বাংলা ভাষার দিক্ থেকে সংস্কৃতের অবশ্য প্রয়োজনীয়তাস্বীকার করা হ'ত, কারণ সংস্কৃতকেই বাংলার মূলভিত্তি বা প্রাণশক্তি বলে মেনে নিতে কেউ দ্বিধা করতেন না। কিন্তু সম্প্রতি হয়েছে আর এক নূতন বিপদ—বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যিকগণ সংস্কৃতকে আর কোন মতেই বাংলার মূলভিত্তি বলে মেনে নিতে রাজী নন। উপরন্তু, বাংলা যে সর্ব্বপ্রকারেই সংস্কৃত-নিরপেক্ষা, সম্পূর্ণ স্বাধীনা ভাষা, তাই প্রমাণ করতে তাঁরা উঠে পড়ে লেগে গেছেন। এমনকি, আজকাল বাংলা লিখতে গেলে (দর্শন প্রভৃতি নিগূঢ় বিষয়েও) অতি সাবধানে লিখতে হয় শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দাদি যথাসম্ভব পরিবর্জ্জন করে, না হলেই সর্ব্বনাশ! 'পণ্ডিতি কচকচি' নামে তা অশেষ নিন্দাভাজন ও সর্ব্বজনবর্জ্জনীয় হবে! এই ভাবে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু উভয়ের অহেতুক আক্রমণে উদ্‌ভ্রান্তা জননী দেবভাষা হয়ে পড়েছেন একেবারেই 'একঘরে'।

সুতরাং বর্ত্তমানে যে সংস্কৃত পড়ে আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক সম্মানের বিন্দুমাত্র আশা নেই, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেইজন্যই যে প্রবেশিকা স্তরেও পর্য্যন্ত সংস্কৃতকে সম্পূর্ণ ইচ্ছামূলক করতে হবে, সেও ত কোন সুযুক্তির কথা নয়। সুযুক্তির কথা হচ্ছে একমাত্র এই যে; সংস্কৃত পাঠে চাকুরী ও যশের আশা নেই বলে সংস্কৃতকেই সমূলে উচ্ছিন্ন না করে, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার এরূপ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি করা উচিত যাতে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের চেয়ে অধিক অসুবিধা ভোগ করতে না হয়। সংস্কৃত শিক্ষাকে যদি অন্যান্য সব দিক থেকে অত্যাবশ্যক বলেই গ্রহণ করা হয়, তা হলে বর্ত্তমানে সমাজ তাকে কোনই মর্য্যাদা দিচ্ছে না এই ওজুহাতে তার মর্য্যাদা আরও কম করবার চেষ্টা না করে সে যাতে পূর্ব্বসম্মান ফিরে পায় সেই চেষ্টাই করা উচিত।

এখন আমাদের এই প্রধান প্রশ্নটির সমাধান করতে হবে —বর্ত্তমান যুগেও অল্পবিস্তর সংস্কৃত জ্ঞান অন্ততঃ সকল হিন্দুর পক্ষেই অত্যাবশ্যক কিনা। জানি, অনেকেই এ কথায় শিউরে উঠবেন জানি, সকলের মাঝখানে আমাদের ক্ষীণকণ্ঠ চাপা পড়ে যাবে, তবুও সেই ক্ষীণকণ্ঠেই আমরা যথাসম্ভব জোরেই বলব যে, সংস্কৃত পাঠ আমাদের পক্ষে অতি মঙ্গলজনকই শুধু নয়, অত্যাবশ্যকও। অতি সংক্ষেপে তার কয়েকটি প্রধান কারণের উল্লেখ করছি :

(১) সংস্কৃতই হ'ল আমাদের যুগযুগান্তব্যাপী প্রাচীন সভ্যতার প্রধান বাহন। 'কৃষ্টি', 'সংস্কৃতি' প্রভৃতি কথাগুলি আজ লোকের মুখে মুখে, কিন্তু সত্যই 'কৃষ্টি' প্রভৃতির কতটুকু মর্য্যাদা আমরা দিচ্ছি যখন আমাদের অতি নিজস্ব কৃষ্টিকেই আজ আমরা করছি এই ভাবে অবহেলা? প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টিকে বাদ দিয়ে আমাদের কৃষ্টির মানেই বা কি থাকবে, তাও ত বোঝা দুষ্কর। অবশ্য, কেবল প্রাচীনকেই আঁকড়ে থেকে, কেবল বিগত সুখ-সৌভাগ্যের জন্যে হা-হুতাশ করেই আমাদের জীবনটা কাটুক, এ কথা বলা আমাদের একবারও উদ্দেশ্য নয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ও ব্যবসায়ের যুগের সঙ্গে তাল রেখে আমাদের চলতে নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু অপর দিকে, প্রাচীনকে কেবল প্রাচীন বলেই ঘৃণা ও ত্যাগ করাও চরম নির্বুদ্ধিতা সন্দেহ নেই। বিশেষ ভাবে, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে কেবল 'মৃত' ভাষা বলে অবহেলা করার চেয়ে অন্যায় আর কিছুই হতে পারে না। কারণ, সংস্কৃতের মত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভাষা ও সাহিত্য জগতে দ্বিতীয় আর নেই। দেশে সংস্কৃতের আদর না থাকলেও, কতিপয় দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের অক্লান্ত উদ্যমে যে সব সংস্কৃত পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে, তার সংখ্যাও কম নয়, লক্ষাধিক ত হবেই। এ ছাড়া কত লক্ষ সংস্কৃত পুঁথি আজও অমুদ্রিত, অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে; এর চেয়েও অনেক বেশী কত লক্ষ যে ধ্বংস হয়ে গেছে, তারও ত ইয়ত্তা নেই। এই ত গেল সংখ্যার কথা। সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্যের কথা ভাবলেও ঠিক তেমনি বিস্ময়ে হতবাক্ হতে হয়। প্রথমে কেবল ধর্ম্ম ও দর্শন বিভাগের কথাই ধরা যাক্। বৈদিক সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ শ্রৌত-গৃহ্য-ধর্ম্ম-সূত্র, ষড়্‌দর্শন, ব্যাকরণ, শৈব-বৈষ্ণব দর্শন প্রভৃতি তাদের ভাষ্য, টীকা ইত্যাদি সমেত যে অতি বিশাল, অতি নিগূঢ় সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে, তার সঠিক ধারণা করাও কঠিন। বস্তুতঃ, কেবল ধর্ম্ম ও দর্শনেই ভারতের পুণ্যশ্লোক ঋষিদের যে দান, তার তুলনা জগতের ইতিহাসেই নেই। এ ছাড়া, অন্যান্য অসংখ্য বিভাগেও তাঁদের দান অতুলনীয়—যথা, কাব্য, গদ্য, স্মৃতি, পুরাণ, অলঙ্কার, ছন্দ, সমাজতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, অভিধান, শব্দশাস্ত্র, ব্যাকরণ, কামশাস্ত্র, এমনকি, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকাংশই কালের প্রকোপে আমাদের নিকট থেকে চির বিলুপ্ত হয়ে গেলেও যা জানা গেছে তার থেকেও জোর করে বলা চলে যে, জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল বিভাগেই ভারতীয় মনীষীদের দান অতি বিশাল। বস্তুতঃ, সংখ্যার দিক্ থেকে এরূপ বিপুল প্রাচুর্য্য, বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে এরূপ

অসীম বৈচিত্র্য, ভাবের দিক্ থেকে এরূপ সুগভীর নিগূঢ়তা, ভাষার দিক থেকে এরূপ মনোহারী মাধুর্য্য পৃথিবীর কোনো ভাষারই নেই। কেবল প্রাচীন বলেই কি এই অপূর্ব্ব রত্নগুলিকে—যা আমরা অতি সৌভাগ্যক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি—এরূপে অবহেলা ভরে পরিত্যাগ করতে হবে? আর সব কথা ছেড়ে দিলেও, 'জ্ঞানের জন্যেই জ্ঞান' এই দিক থেকেও ত সংস্কৃত পাঠের মূল্য অসীম। যা জাগতিক দিক থেকে মূল্যবান বা অর্থকরী নয়, যা ব্যবহারিক দিক থেকে কার্য্যকরী নয়, তাই যে সম্পূর্ণ অবহেলার যোগ্য—এ মত যে আমাদের ভ্রান্ত বলে মনে হয়, তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। জ্ঞান, সৌন্দর্য্য, কল্যাণ—মানব জীবনের এই তিনটি শাশ্বত প্রেরণা বা উদ্দেশ্য। এদের সাহায্যে যদি ধন-দৌলত, স্বাস্থ্য-যশ প্রভৃতি ব্যবহারিক লাভ হয় ত ভালই, কিন্তু এদের একমাত্র মূল্য কেবল তাতেই নয় নিশ্চয়ই। যথা, দর্শনালোচনায় বা কাব্য পাঠে যে অপার্থিব আনন্দ লাভ করা যায়, তা সাধারণ সংজ্ঞানুসারে ব্যবহারিক বা অর্থকরী না হলেও, কে তাকে মূল্যহীন বলতে সাহস করবে? সুতরাং, যা তত্ত্বীয় বা অব্যবহারিক (theoretical), যা ব্যবহারিক, বা দৈহিক ও পার্থিব প্রয়োজনের সাধক (practical) নয়, তা সম্পূর্ণ মূল্যহীন, এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। সেহেতু সংস্কৃত পাঠ কেবল তত্ত্বীয় দিক্ থেকে মূল্যবান হলেও, তার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা কম হ'ত না। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, দেহাত্মবান্ মানবের কাছে দৈহিক ও পার্থিব সুখ ও উন্নতিই সবটুকু নয়—আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি ও উন্নতিও অনেকটা। সেইজন্যই নানা দেশের দার্শনিক, ধর্ম্মপিপাসু, কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ জ্ঞান, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ লাভের আশায় আমাদের এই সংস্কৃতের নিকটই যুগে যুগে হাত পাততে লজ্জা বোধ করেন নি।

(২) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃত পাঠের মূল্য কেবল তত্ত্বের দিক্ থেকেই নয়, এর একটি ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার দিকও আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন এক দিকে ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে অতি উচ্চ, নিগূঢ়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনাদি আছে, যার সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক, ব্যবহারিক জীবনের সম্পর্ক অতি অল্পই, তেমনি অন্য দিকে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট বহু কার্য্যকরী বিদ্যার বিবরণও আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর পাই। যথা, রসায়ন, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, স্থাপত্য, কৃষি, আয়ুর্ব্বেদ, পশু চিকিৎসা, বৃক্ষচিকিৎসা, যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যবহারিক শিল্প; নৃত্যগীত, অভিনয়, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি ললিতকলা। সাধারণতঃ, কেবল বিদেশিগণের নয়, আমাদের নিজেদেরও সংস্কৃত সভ্যতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা আছে যে, এ কেবল তর্ক শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'কচকচি' মাত্র, কিন্তু মানব জীবনের প্রাত্যহিক সমস্যা সম্বন্ধে এ সম্পূর্ণ নীরব। এহেতু আমরা মনে করি যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কেবল জপতপে কালক্ষেপ করতেন এবং জগৎকে মিথ্যা মায়া বলে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেন—দর্শন ও ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের সাক্ষাৎ উপলব্ধি থাকলেও, সাধারণ ব্যবহারিক শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে ছিলেন তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এই ধারণা যে কত দূর মিথ্যা তা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা কেবল জ্ঞানীই ছিলেন না, কর্ম্মীও ছিলেন; কেবল সংসারত্যাগী তপস্বীই ছিলেন না, সাম্রাজ্যকামী রাজা ও যোদ্ধাও ছিলেন; কেবল ভাববিলাসী কবিই ছিলেন না, বস্তুতান্ত্রিক ব্যবসায়ীও ছিলেন। তত্ত্বের দিক থেকে যেমন তাঁরা অতুলনীয় দর্শন ও ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য প্রণিহিত করে গেছেন, ব্যবহারের দিক থেকেও তেমনি তাঁরা বহু প্রয়োজনীয় শিল্পাদি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী লিপিবদ্ধ করেছেন। যথা, বাৎস্যায়নের "কামসূত্র" অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এতে নারীদের শিক্ষণীয় চৌষট্টী কলার উল্লেখ আছে—এর মধ্যে রন্ধন, বেত্রশিল্প, তক্ষণ (ছুতোরের কাজ), যন্ত্রপরিচালন, স্থাপত্যবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, বৃক্ষচিকিৎসা প্রভৃতি বহু কার্য্যকরী বিদ্যা; নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কন; মাল্যগ্রথন, কাব্য রচনা, তিলকরচনা প্রভৃতি ললিতকলা ও নানাবিধ ক্রীড়া ব্যায়াম ও যন্ত্রবিদ্যার উল্লেখ আছে। অন্যান্য গ্রন্থেও এ সবের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং, সংস্কৃত সভ্যতা যে সম্পূর্ণ রূপে অব্যবহারিক ও পার্থিব দিক থেকে নিষ্প্রয়োজন, এ ধারণা অজ্ঞতাপ্রসূতই মাত্র। এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সংস্কৃত পাঠের ব্যবহারিক মূল্যও প্রচুর।

(৩) আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দিক থেকেও অল্পবিস্তর সংস্কৃত জ্ঞান প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষেই অত্যাবশ্যক। আজ পর্য্যন্ত আমাদের সব ধর্ম্মাচারই—যাগযজ্ঞ, হোমতর্পণ, শ্রাদ্ধবিবাহাদি সবই সংস্কৃতের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। কারণ, পূজার্চ্চনায়, বিবাহাদি শাস্ত্রীয় সংস্কারে উচ্চার্য্য মন্ত্র, পঠনীয় স্তব প্রভৃতি বেদ, উপনিষদ, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি থেকেই গৃহীত। কিন্তু সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ আমাদের কাছে এ সবই হয়ে দাঁড়িয়েছে কতগুলি অবোধ্য কথার 'কচকচানিই' মাত্র। ভারতীয় সভ্যতায় সবচেয়ে বড় অধিকার বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার এবং এই অধিকার তিনিই পেতেন যিনি ছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞানকুশল। ভারতীয় নারীরা জ্ঞানবিজ্ঞানে পেছিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে (নিজেদের দোষে অবশ্য নয়, সামাজিক অবস্থার প্রকোপে) মন্ত্রোচ্চারণেরও অধিকার হারিয়েছিলেন। আজ আমরা স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে হয়ে দাঁড়িয়েছি এই অনধিকারীদেরই দলভুক্ত। কারণ, মন্ত্রাদির নিগূঢ় অর্থের কথা ত দূরে থাক, সংস্কৃত শব্দের সোজা অর্থ পর্য্যন্ত আজ আমরা বুঝি না। গৃহ্যসূত্রাদির মতে অর্থ না বুঝে মন্ত্রোচ্চারণ করা অতি ঘোরতর পাপ। আমরা কি এই পাপ প্রত্যহই করছি না? অতএব, মন্ত্র, স্তবাদি বুঝবার মত সংস্কৃত জ্ঞান প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষেই অত্যাবশ্যক। যদি এই সব ধর্ম্মাচারকে একেবারে বাদ দিতে চান, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যদি এ সব রাখতে হয় ত ভাল

করেই রাখা কর্ত্তব্য। মন্ত্রাদি অবশ্য বাংলায় অনুবাদ করা চলে, কিন্তু তাতে মূলের গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্যের অবশিষ্ট আর কিছুই থাকবে না, সুনিশ্চিত।

(৪) পরিশেষে আর একটা কথা সম্বন্ধে নিবেদন করতে চাই, অর্থাৎ বাংলা ভাষার দিক্ থেকে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। এককালে যেমন বাংলা না জানাটাই ছিল শিক্ষিত সমাজের প্রধান গর্ব্বের বস্তু, আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে সংস্কৃত না জানাটা ঠিক সেই রকম। আজ তাই বহু বাঙালী সাহিত্যিক—তাঁরা যে এক অক্ষরও সংস্কৃত জানেন না এবং কোনও সংস্কৃত নিয়মাদি মানেন না, এই কথা সময়ে অসময়ে প্রচার করে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। কিন্তু আমরা ত তাঁদের এই অহেতুক সংস্কৃত-বিদ্বেষের কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই না। কারণ, যিনি যাই বলুন না কেন, বাংলা ভাষা চিরদিনই সংস্কৃতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, সংস্কৃতই বাংলার প্রাণশক্তি। বাংলার অধিকাংশ শব্দই শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ বা তার রূপভেদ, বানানও তাই। বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের সমাস, সন্ধি, লিঙ্গ প্রভৃতির নিয়ম আজও বহু ক্ষেত্রে মানা হয়। নবনির্ম্মিত বাংলা পরিভাষা প্রায়ই প্রাচীন সংস্কৃত পরিভাষা বা তার রূপান্তর মাত্র। এক্ষেত্রে সংস্কৃতকে সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জন করে বাংলার প্রগতি অসম্ভব। অবশ্য, এ কথা আমাদের বলা উদ্দেশ্য নয় যে বাংলা ও সংস্কৃত এক ও অভিন্ন। অপরাপর ভাষার মত বাংলারও একটি নিজস্ব রূপ ও বৈশিষ্ট্য আছে। সব বাংলা শব্দই সংস্কৃত নয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক বিভক্তিসম্বন্ধীয় সব নিয়মও বাংলায় সর্ব্বত্র খাটে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এও অবশ্যস্বীকার্য্য যে বাংলা ভাষা স্বীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও সংস্কৃত ভাষারই আশ্রিত, এবং এই আশ্রয়েই তার গৌরব বর্দ্ধিত ও প্রকৃত প্রগতি সাধিত হবে। বাংলাকে সংস্কৃতের জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রী বলেই পরিগণনা করা হয়। মায়ের কাছে সন্তানের ঋণ স্বীকারে যেমন লজ্জার কিছুই নেই, সংস্কৃতের কাছে বাংলার ঋণ স্বীকারেও তেমনি বাংলার অগৌরবের কিছুই নেই। উপরন্তু এরূপ একটি অতি সমৃদ্ধ ভাষার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট বলে বাংলারও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এটা অবশ্য স্বীকার্য্য যে সংস্কৃত জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষা। এরূপ সুকঠোর নিয়মবদ্ধ অথচ এরূপ সুমিষ্ট, এরূপ সংযত অথচ এরূপ ভাবগর্ভ ভাষা জগতে আর দ্বিতীয় নেই। আমরা যদি বাংলাকে শব্দসম্পদে ধনী, ব্যঞ্জনায় সুগভীর ও শ্রুতিতে সুমধুর করতে চাই ত সংস্কৃতই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। অতএব বাংলা ভাষা শিক্ষার দিক্ থেকেও সংস্কৃত শিক্ষার মূল্য সমধিক।

এরূপে তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, প্রাত্যহিক ও ভাষাসম্বন্ধীয় প্রত্যেক দিক থেকেই সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজন কম নয়। তাই যদি হয়, তবে প্রত্যেক হিন্দু ছাত্রছাত্রী যাতে অন্ততঃ কিছু সংস্কৃত বাধ্যতামূলক ভাবেই শেখে তার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এজন্য প্রবেশিকা পর্য্যন্ত সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক বিষয় রূপেই রাখা কর্ত্তব্য। অবশ্য, প্রবেশিকা পর্য্যন্ত যে সংস্কৃতজ্ঞান ছাত্রছাত্রীরা লাভ করে, বিশাল সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডারের তুলনায় সে অতি সামান্য। কিন্তু অন্য সব বিষয়ের সম্বন্ধেও ত সেই একই কথা খাটে। একবার ভাল করে 'গোড়াপত্তন' করিয়ে দিতে পারলে, অনেক ছাত্র-ছাত্রীই পরে স্বেচ্ছায় আরও বিশদভাবে সংস্কৃতচর্চ্চায় অবহিত হবেন, নিঃসন্দেহ।

অনেকে হয়ত বলতে পারেন যে, এমন করে জোর করে শেখান, ধরে বেঁধে গেলানর কোন সার্থকতা নেই—সংস্কৃত না হয় ইচ্ছামূলকই রইল, যার সেদিকে প্রাণের টান আছে, সে তা স্বেচ্ছাতেই নেবে। কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে ইংরেজী বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতিকেই বা বাধ্যতামূলক করার দরকারটা কি? অনেক ছাত্রকেই ত অঙ্ক বা ইতিহাস প্রভৃতি বেঁধে ধরেই শুধু নয়, মেরে ধরেও শেখাতে বা গেলাতে হয়। একই ভাবে সংস্কৃতশিক্ষার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলে, ছাত্রছাত্রীদের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলকই রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতকে ছাত্রপ্রিয় করবার চেষ্টাতেও অবিলম্বে অবহিত হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। অন্যান্য বিষয়ে যেমন নানারকম বিজ্ঞানসম্মত, উন্নত শিক্ষা-প্রণালীর প্রচলন করা হচ্ছে, সংস্কৃতেও অবিলম্বে তাই করা উচিত। তা হলে যে সংস্কৃতের প্রতি শিক্ষার্থীদের বিরাগ বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অপর পক্ষে, সমাজেও যাতে সংস্কৃতের সম্মান ও অর্থ-নৈতিক মূল্য বৃদ্ধি পায়, সে ব্যবস্থাও অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তা হলেও আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হবে। যা হোক, এই সব ব্যবস্থা সময় ও ব্যয়সাধ্য—বর্ত্তমানে অল্প সময়ে হবার আশা নেই। কিন্তু সেজন্য ছাত্রছাত্রী ও সাধারণের বিরাগ ও তাচ্ছিল্যের ওজুহাতে যদি আজ সংস্কৃতকে ইচ্ছামূলক বিষয়ে মাত্র পর্য্যবসিত করা হয়, তা হলে বর্ত্তমান অবস্থায় সংস্কৃতের পঠনপাঠন যে বাংলা দেশ থেকে অচিরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেটা যে হবে জাতির পক্ষে কত বড় দুর্ঘটনা, তা বলা অসম্ভব। বিশেষতঃ, এই বাংলা দেশই ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার অন্যতম প্রধান স্তম্ভরূপে সেই কৃষ্টি ও সভ্যতার বাহন সংস্কৃতকে চিরকাল অতি যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা ও পরিপুষ্ট করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীদের দান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে। বিখ্যাত বৈদিক ঋষি দীর্ঘতমা, সাংখ্যদর্শন প্রবর্ত্তক মহামুনি কপিল, বৈশেষিক দর্শনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার শ্রীধর, সুবিখ্যাত মীমাংসকাচার্য ভবদেব, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেব, তান্ত্রিকগণ, নব্যন্যায়কারগণ, নব্যস্মার্ত্তবৃন্দ, বহু বৈষ্ণব ও শৈব লেখক, প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতা চক্রপাণি, বিখ্যাত ছন্দঃকার গদাদাস, শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যকার জয়দেব, প্রাচীন দূতকাব্যকার

যোগী প্রভৃতি সকলেই ছিলেন বাঙালী। এরূপে বাঙালীরা চিরকালই ছিলেন সংস্কৃত শিক্ষায় অগ্রণী, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের বহু বিভাগই তাঁদের অতুলনীয় দানে পরিপুষ্ট হয়েছে। দেবভাষাপূত সেই দেশ থেকে যে আজ সংস্কৃতের পঠনপাঠন ক্রমশঃ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? সেজন্য আমরা দেশের সব সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তির পক্ষ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি যেন তাঁরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতকে ইচ্ছামূলক বিষয় মাত্রে পর্যাবসিত করে বাংলা দেশে সংস্কৃত শিক্ষায় মৃত্যুবাণ না হানেন।

পদ্মলোচন

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

নূতন চাকরটাকে নিয়ে মহা বিপদেই পড়া গেল। ভাল করে কথা বোঝে না, বোঝবার কোন চেষ্টা যে আছে, তাও মনে হয় না।

চাকরটার নাম পদ্মলোচন। লোচন পদ্মের মত ত নয়ই, বরঞ্চ একে 'কুৎ-কুতে' বলা যেতে পারে, এ বললে অন্যায়ও হয় না। অত্যন্ত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দুটি চোখ। চোখের ভ্রূ অতিশয় সরু এবং অস্পষ্ট। কষ্ট করে দেখলে, তবে নজরে পড়ে।

পদ্মলোচনের দুষ্টামি বুদ্ধিরও অন্ত নেই। বাড়ীর ঝি শঙ্করী, এবং বামুন হরিঠাকুরের সঙ্গে সময়ে-অসময়ে ঝগড়া করা ওর একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। একটা না একটা ছুতো করে ওদের পেছনে লাগে।

সেদিন শঙ্করী বাসন মেজে রোয়াকের ওপর ধুয়ে রাখছিল আর পদ্মলোচন পরিষ্কার কর্সা নেকড়া দিয়ে সেগুলো মুছে রান্নাঘরে পৌঁছে দেবার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছিল। এক সময়ে ও হঠাৎ বলে উঠল, হুঁ! বাসন মেজেছে! গতরটাই যা দেখতে! কাজের বেলায় কিছু নয়। বাসন মাজা বলে একে? সকৃড়ি তো কড়্-কড়্ করচে!

কথাটা শঙ্করীর কানে গেল। কলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পদ্মলোচনের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, বললে—কি বললি?

পদ্মলোচন তৎক্ষণাৎ বললে, যা বলবার তা বলেছি। কিন্তু তুমি যে বড় চোখ পাকিয়ে কথা বলছ। কেন, মারবে নাকি?

শঙ্করীর তুলনায় পদ্মলোচন বছর পাঁচ-ছয়ের ছোট। শঙ্করী বললে, মারতে পারি নে মনে করেছিস? ঐ তো তোর হাড়গিলের মত চেহারা। এক চড়েই মুণ্ডু পারি ঘুরিয়ে দিতে। বাসনে সকৃড়ি কড়্-কড়্ করছে। মাজ না তুই বাসন হতভাগা!

ওদিকে রান্নাঘরের মধ্যে হরিঠাকুর তখন ছোট পিঁড়েটা একটা তাক থেকে পেড়ে নিয়ে বসবার উপক্রম করছিল। শঙ্করীর কথা শুনে ফিক্ করে নিঃশব্দেই একটুখানি হাসল। বললে, শঙ্করী ঠিকই বলেছ। কাল থেকে পদ্মলোচনকেই বাসন মাজতে দিও। আর ওর কাজটা তুমিই করো।

শঙ্করী এবং হরিঠাকুরের মধ্যে মনে হয়, একটা প্রীতির ভাব আছে। থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। আমার বাড়ীতে ওরা দু'জনেই বহু বছর ধরে কাজ করে আসছে। সেইজন্তে ঐ নূতন চাকরটার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি হলে শঙ্করী হয় হরিঠাকুরের পক্ষ নেয়, নয়তো হরিঠাকুর শঙ্করীর হয়ে চাকরটার সঙ্গে ঝগড়া করে। ফলে দেখা যায়, পদ্মলোচনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে ওঠে। বেচারা একা আর কতক্ষণ এদের দু'জনের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে?

পদ্মলোচন কিন্তু হরিঠাকুরের কথা শুনে নিরতিশয় অপ্রসন্ন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে বললে, তুমি থাম হরিঠাকুর, তোমায় তো কোন কথা বলি নি।

হরিঠাকুর পিঁড়ির ওপর ভাল করে বসে বিকৃত স্বরে বললে, থামব? কেন থামব শুনি? তুই তো সেদিন ঢুকেছিস্ এ বাড়ীতে। আমরা এখানে ক'বছর আছি জানিস্? দশ বছর! দশ বছর এখানে কাজ করছি। ওর হয়ে কথা বলব না তো তোর হয়ে কথা বলব?

পদ্মলোচন বাসনের বোঝা বয়ে রান্নাঘরে নিয়ে আসতে আসতে হরিঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললে, ঠাকুর, বেশী বক্ বক্ করো না বলছি। রাগলে রক্ষা থাকবে না। রাগলে একেবারে জাত কেউটে।

শঙ্করীর এতক্ষণে বাসন ধোয়া শেষ হয়েছে, সে চৌবাচ্চার ছিদ্রের নেকড়া খুলতে খুলতে পদ্মলোচনকে লক্ষ্য করে বললে, এখানে মরতে এসেছিস কেন্‌রে হতভাগা? যা না, দেশের জঙ্গলে।

শঙ্করীর শ্লেষোক্তি শুনে রাগের মাথায় পদ্মলোচন দুম্ করে রান্নাঘরের এক কোণে হাতের বাসনগুলি নামিয়ে রাখলে। তারপর শঙ্করীর দিকে মুখ করে রক্তচক্ষে বললে, ভাল হবে না কিন্তু শঙ্করীদি, আমার পেছনে লাগা?

ওদের দু'জনের ঝগড়ার মধ্যে ওদিকে হরিঠাকুর বাসনগুলো কখন না-জানি গুছিয়ে দেয়ালের ধারে রাখছিল। হঠাৎ একখানা থালার দিকে নজর পড়ায় সে শঙ্করীকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, থালাখানা কাটালে কে?

চৌবাচ্চায় নূতন নেকড়া লাগিয়ে শঙ্করী সোজা হয়ে

দাঁড়াল। হরিঠাকুরের দিকে মুখ করে বললে, থালা কেটেছে? তা হলে ওটা পদ্মলোচনেরই কাজ। বাসনগুলো রাগের মাথায় ও-ই তো একটু আগে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

হরিঠাকুর শঙ্করীর কথা সমর্থন করল। গাল ফুলিয়ে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললে, তাই তো। এ তো পদ্মলোচনেরই কন্ম দেখছি। বাবা, পদ্মলোচন! এবার চল দেখি গিন্নীমার কাছে। চল, শেষে হয়তো আমাদেরই দু'জনের ওপর দোষ পড়বে।

এই বলে হরিঠাকুর সত্য সত্যই পদ্মলোচনের একখানা হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসতে লাগল ওপরে।

বারান্দায় চেয়ারে বসে ওদের ঝগড়া শুনছিলাম। ঝি, চাকর আর ঠাকুরের ঝগড়ায় কোন দিনই আমি কথা বলি নে। চাকরটা আমার এখানে মাস তিনেক হ'ল এসেছে। পূর্ব্বে কোন জায়গায় কাজ করে নি। আমার এখানেই হাতেখড়ি। বয়স বছর বাইশের বেশী নয়। আমাদের পাড়ায়ই বাজার, কিন্তু দোকানগুলো এখনও ভাল করে চেনে না। বোকা, কিন্তু বোকাই আমার ভাল। আমার যেমন পদ্মলোচনের ওপর একটা মায়া পড়ে গিয়েছে, গৃহিণীরও তদ্রূপ। ঘর মুছতে বললে, পদ্মলোচন বাল্‌তি বাল্‌তি জল ঢেলে সারা ঘরখানায়ই নদী-নালা বইয়ে দেয়। জামা লণ্ড্রীতে কাচতে দিয়ে আসতে যদি ওকে বলা হয়, তবে ও জামার পরিবর্ত্তে সদ্য-পাতা পরিষ্কার ধব্‌ধবে চাদরখানা বেমালুম তুলে নিয়ে সেখানে দিয়ে আসে। কাপড় ছাদ থেকে তুলে, কুঁচিয়ে রাখতে বললে, পদ্মলোচন কলে গিয়ে শুকনো কাপড় ভিজিয়ে এনে আবার শুকোতে দিয়ে আসে। এমনি সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ওর। গৃহিণী এ সব সহ্য করতে পারেন না। অত্যন্ত তিরস্কার করেন, কিন্তু তিরস্কার করে নিজেই ব্যথিত হয়ে পড়েন।

তা যাই হোক, হরিঠাকুরে টানতে টানতে পদ্মলোচনকে আমার সুমুখেই এনে হাজির করল। বললে, থালাখানা পদ্ম-লোচন আছড়ে ভেঙেছে বাবু।

আমি কথা বলবার পূর্ব্বেই গৃহিণী ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় এলেন। বললেন, তোমাদের ব্যাপার কি বলতো, ঠাকুর? খেটে-খুটে একটুখানি শুয়ে দু' চোখ বুজবারও উপায় নেই তোমাদের জন্যে? বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়েছে! দিনরাত্রি খালি ঝগড়া আর ঝগড়া! বাড়ী থেকে লক্ষ্মী তাড়াবার মতলব?

হরিঠাকুর ধমক খেয়ে একটা ঢোক গিলে বললে, আমার কোন দোষ নেই গিন্নীমা। ঐ পদ্মলোচনটাই যত নষ্টের গোড়া। খালি শঙ্করীর পেছনে লাগে।

পদ্মলোচন দাঁত খিঁচিয়ে বললে, শঙ্করীর পেছনে লাগি? কেন লাগব না শুনি? একশ বার লাগব। বাসন মাজে, না ছাই! শুধু একবার হাতখানা বুলিয়েই, জল দিয়ে ধুয়ে তুলে দেয়। বলুক না? বেশ করব, বলুব!

হরিঠাকুর গৃহিণীর মুখপানে দৃষ্টি ন্যস্ত করে বললে দেখলেন, কথার রকমটা একবার দেখলেন গিন্নীমা?

—দেখেছি।

এই বলে গৃহিণী মুখ ফিরিয়ে চাকরটার দিকে চাইলেন। বললেন, তুই হতভাগা ওদের সঙ্গে লাগতে যাস্ কেন বলত?

পদ্মলোচন মুখভার করে বললে, আমি লেগেছি নাকি?

গৃহিণী ধমক দিলেন। বললেন, ফের মিথ্যে কথা? এই তো তুই বললি, একশ'বার লাগব!

-- আজ্ঞে, একশ'বার লাগব বলেছি নাকি গিন্নীমা!

হরিঠাকুর বললে, মিথ্যে কথা। আমাদের সঙ্গে ও একটা না একটা ছুতো করে ঝগড়া করে। ওকে মানা করে দিন গিন্নীমা। আজকে ঝগড়ার মাথায়, রাগ করে আপনার ভাত খাবার থালাখানাই ভেঙে ফেলেচে। নিয়ে আসব, দেখবেন?

এই বলে সে অনুমতির অপেক্ষামাত্র না করেই ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শঙ্করী আর হরিঠাকুর মনে মনে ভেবেছিল—ঐ থালা-খানাকে কেন্দ্র করে পদ্মলোচনের তিরস্কার এবং লাঞ্ছনার অন্ত থাকবে না। বস্তুতঃ ওরা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত। ওরা এ বাড়ীতে অনেক দিন ধরে কাজ করছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পদ্মলোচনেরই জোর বরাত। তাই ওরাও মনে মনে তাকে হিংসা করে।

কিন্তু পদ্মলোচনকে তিরস্কার বা লাঞ্ছনা কোনটাই ভোগ করতে হ'ল না। এদের নালিশ সত্ত্বেও আসল ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে গৃহিণীর দেরি হ'ল না। শঙ্করীকেও কিছু বললেন না। শুধু আর একখানা থালা কাঠের সিন্দুক খুলে বের করে দিলেন।

দিন কয়েক পরে, একদিন দুপুরে বিছানায় শুয়ে কাগজ পত্র দেখছিলাম। এমনই সময়ে হঠাৎ পদ্মলোচন কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘরে ঢুকল। ওকে এই অবস্থায় আশা করি নি। বললাম, কি রে কি হ'ল?

পদ্মলোচন হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল, বললে-- আমার টৈতন কেটে নিয়েছে বাবু।

এই বলে ও আমার দিকে পিছন ফিরে মাথাটা দেখালে। সত্যই তো! বেচারার অমন সাধের শিখাটির মধ্যে দিয়ে কে কাঁচি চালিয়ে দিয়েছে। হাসি পেল, কিন্তু হাসি চেপে প্রশ্ন করলুম, কে তোর টিকি কাটলো রে?

পদ্মলোচন সেই ভাবেই কাঁদতে কাঁদতে বললে, শঙ্করী-দিদি কেটে নিয়েছে, বাবু।

—কি করে কাটলো?

—কাঁচি দিয়ে বাবু।

কাঁচি দিয়ে টিকিটা কেটে নিয়ে গেল, আর তুমি চুপ করে রইলে?

—কি করব বাবু। আমি কি জানতে পেরেছিলাম?

ঘুমচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে দেখি হাতে একটা কাঁচি, শঙ্করীদিদি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দেখলাম ওর হাতে চুলের গোছার মত কি একটা। তখন উঠে বসে মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম—আমার চৈতন নেই। কি সর্ব্বনাশ হ'ল বাবু! আমার মানত করা চৈতন।

—মানত করা চৈতন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু। মানত করা চৈতন। বাবা তারকনাথকে দেবার চৈতন। আজ পাঁচ বছর ধরে রেখে আসছি, বাবু। আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল বাবু।

চেঁচামেচি শুনে গৃহিণী ছুটে এলেন ঘরে। বললেন, কি হ'ল রে, পদ্মলোচন? চেঁচাচ্ছিস কেন?

পদ্মলোচন গৃহিণীর পায়ের নীচে বসে পড়ল। ক্রন্দনজড়িত স্বরে বললে, আমার চৈতন নেই।

—চৈতন নেই?

গৃহিণী আমার দিকে চাইলেন।

হাসি গোপন করে ব্যাপারটা খুলে বললাম।

শুনে গৃহিণী হাসি চাপতে পারলেন না।

পদ্মলোচনকে উদ্দেশ করে বললেন, তাতে আর হয়েছে কি বাবা? চৈতন গেছে, আবার হবে। এবার আরো বড় করে চৈতন রেখ। বাবা তারকনাথ তখন ডবল চৈতন নিয়ে, তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন।

পদ্মলোচন হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে, তা কি হয়, গিন্নিমা। কিন্তু আমি আর এখানে থাকব না। আমার মাইনে দিন চুকিয়ে। শঙ্করীদিদি আপনাদের পুরনো লোক, আপনাদের আদরের। আমার চৈতন গেল অথচ ওকে আপনারা কিছু বললেন না।

এবার হাসলাম। বললাম, আচ্ছা তুই এখন যা। শঙ্করীর বিচার পরে হবে। তুই যা।

—আমার মাইনে, বাবু?

ধমক দিলাম। বললাম, থাম হতভাগা! টিকির জন্যে তুই চাকরি ছাড়বি? যাবি কোথায় শুনি? দেশে? দেশ তো দুর্ভিক্ষে ছারেখারে যাবার জোগাড়! খাবি কি?

পদ্মলোচন মাথার পিছনে হাত বুলোতে বুলোতে নিঃসঙ্কোচে বললে আজ্ঞে বাবু, দেশে যাব না তো! দেশে যাব কার টানে? কেউ তো নেই! অন্য জায়গায় কাজ করব বাবু।

আমি কথা বলবার পূর্ব্বেই গৃহিণী ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, পাখা গজিয়েছে তোমার। কাজ শিখে এখন অন্য স্থানে কাজ করব বাবু। আস্পর্দ্ধা বেড়েছে!

গৃহিণীর এই তিরস্কার শুনে পদ্মলোচন ক্ষণকাল নীরবে আনত মুখে বসে থেকে হঠাৎ এক সময়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমার চৈতন গেল এখানে থেকে আর করব কি, গিন্নিমা? আমি এখুনি চললাম। আমার শুধু তারকেশ্বরে যাবার ভাড়াটা দিন।

বললাম, তারকেশ্বরে কি করতে যাবি?

—মাথার চুল দিয়ে আসতে। চৈতন গেছে—মাথার চুল দিয়ে বাবা তারকনাথ যদি তুষ্ট হন।

বেটার বুদ্ধির দৌড় দেখে দুঃখ হ'ল, হাসিও পেল। বললাম, আচ্ছা, তাই না হয় দেওয়া যাবে'খন। এখন তুই একবার বাজারে যা, দেখি। বড় খিদে পেয়েছে।

এই বলে একটা টাকা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

পদ্মলোচন কোন আপত্তি করল না। টাকা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চলে গেলে ওরই কথা ভাবতে লাগলাম। যেমন বোকা তেমনি অকর্ম্মা পদ্মলোচন তবুও ওর ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছে। শঙ্করী এবং হরিঠাকুর আমার এখানে বহুদিন যাবৎ কাজ-কর্ম্ম করে আসছে কিন্তু ওদের ওপর এমন মায়া তো হয় নি। ওরা কাজের লোক, কাজ করে ভাল। পদ্মলোচন কাজের পরিবর্ত্তে অকাজই করে বেশী। তত্রাচ ওকেই যেন বেশী ভাল লাগে। বোধ হয় ওর সরলতার জন্যেই ওকে এমন ভাল লাগে!...

চৈতন কাটা যাওয়ায়, দিনকয়েক শঙ্করী এবং হরিঠাকুরের সঙ্গে পদ্মলোচন কথা কয় নি। এখন আবার একটু একটু করে কথাবার্ত্তা চলতে লাগল।

* * *

টিপ-টিপ করে সেদিন বেলা বারোটার পর থেকে বৃষ্টি পড়া সুরু হয়ে গেল। শঙ্করী যখন কাজে এল, তখন বেলা ছটা। বৃষ্টি তখনও থামে নি। বরঞ্চ বৃষ্টির ফোঁটা পূর্ব্বের চেয়ে আকারে বড় বলা যেতে পারে। পদ্মলোচন বাসন মাজার শব্দ পেয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, শঙ্করীদিদি, ভিজে ভিজে বাসন মাজছো। সর্দ্দিতে তো গলার স্বর ভেঙে গেছে। শেষে জ্বরে পড়বে?

শঙ্করী কিক্ করে একটু হাসল। বললে, ওরে বাসরে! দরদ যে উথলে পড়ছে গো! এত দরদ কোথায় ছিল? মাজ্ না তুই বাসন। দেখি, তোর দরদটা সাচ্চা কিনা!

—পারি না? নিশ্চয় পারি। উঠে এস তুমি।

শঙ্করী বাসন মাজতে মাজতে বললে, থাক! ঐ ভাল! আর বাসন মাজতে হবে না! বাবুর পেয়ারের চাকর। অত কষ্ট করতে দেখলে, এখুনি বাবু বকাবকি করবেন।

পদ্মলোচন দাঁড়িয়ে ছিল সিমেন্ট করা চাতালটার ওপর। এবার তারই এক পাশে বসে পড়ল। বললে, সত্যি, বাবু আমায় খুব ভালবাসেন। সেদিন তুমি আমার তারকনাথের মানত করা চৈতনটা কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে পালালে বাবুর কাছে কেঁদে পড়লুম আমি। উনি আমার দয়া করলেন। গত সোমবার দিন ঘটা করে আমার কাটা চৈতনের কল্যাণে বাবা তারকনাথের মন্দিরে পুজো পাঠিয়ে দিলেন।

আমি যেতে চাইলাম। গিন্নীমা রাজী হলেন না, বললেন— তুই পথ-ঘাট চিনিস নে। শেষে কি হারিয়ে যাবি?

শঙ্করী আবার হাসল। বললে, কি বরাত করেই না তুই এ-বাড়ী ঢুকেছিলি! তোর চৈতন কেটে নিয়ে গেল ইঁদুরে, ঘুমের ঘোরে তুই হতভাগা সব দোষ চাপালি আমার ঘাড়ে। আমি বকুনি খেয়ে মরলুম। তুমি হচ্ছ কর্ত্তাগিন্নির আদুরে চাকর। তোমার জন্তে তারকনাথে ঘটা করে পুজো পাঠানো হ'ল। সত্যি বলছি পদ্মলোচন, তোর মত বোকা যদি হতুম।

পদ্মলোচন সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, ইঁদুরে চৈতন কেটে নিয়েছে মানে?

—ইঁদুরেই তো কেটেছে।

—হুঁ, ইঁদুরে কেটেছে! কেটেছো তুমি। আমি নিজের চোখে দেখলাম।

—ছাই দেখেছ। বলে এখানকার ইঁদুরগুলো ঘুমিয়ে পড়া মানুষের ঠ্যাং পর্য্যন্ত কামড়ে ধরে।

পদ্মলোচন কথাটা বিশ্বাস করতে পারলে না। বললে, ধেৎ! আমি এ কথা বিশ্বাস করি নে।

—না করলি তো বয়েই গেল!

এই বলে শঙ্করী পুরু পুরু ঠোঁট দুখানি ঈষৎ প্রসারিত করল।

এর পর মিনিট কয়েক নীরবতায় কেটে গেল।

একসময়ে পদ্মলোচন বলে উঠল, শঙ্করীদিদি, তোমার বাসাটা কোথায় গো?

শঙ্করী বললে, কেন বল দেখি।

পদ্মলোচন জবাব দিলে, মানুষের অসুখ-বিসুখ আছে ত। ধরো তোমার হ'ল অসুখ। তুমি কাজ করতে এলে না। তখন তোমার বাসাটা জানলে আমি খোঁজ-খবর নিতে পারি ত?

—ও: এই! বলে শঙ্করী আবার দাঁত বের করে নিঃশব্দেই হাসল।

—হাসছো যে?

—এমনি! হাসি পেল, তাই হাসছি। দেখ পদ্ম, তুই অসম্ভব বোকা! এত বোকা মানুষের কলকাতায় না আসাই উচিত ছিল।

এই বলে শঙ্করী ঝাঁটা দিয়ে উঠানের জল নর্দমার দিকে ঠেলে দিতে লাগল।

দিন পনেরর মধ্যেই পদ্মলোচনের বেশ কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। আগে ছোট-ছোট চুল ছিল মাথায়। এখন বড় বড় চুলের মধ্যখান দিয়ে লম্বা টেরী কাটে। চৈতনের বালাই আর নেই। পূর্ব্বে যে ওর চৈতন ছিল, এখন তা বুঝা যায় না। আগে সব সময়েই ওকে বাড়ীতে পাওয়া যেত। এখন কাজের সময়েও দেখা পাওয়া যায় না। ছট করে গিয়ে উঠে শঙ্করীর বাড়ীতে। পদ্মলোচন আবার সুর ভাঁজতেও সুরু করে দিয়েছে। কাজে-অকাজে ওর মুখে গানের সুর শোনা যায়।

সেদিন বাইরে বেরিয়েছিলুম। ফিরে এসে দেখি পদ্মলোচন ড্রেসিং টেবিলের সুমুখে গদীমোড়া চেয়ারটার ওপর বসে, আয়নার মুখ দেখতে দেখতে, পাউডার মাখছে। ফিটফাট জামা কাপড়। ভাল করে নিরীক্ষণ করলুম। পাঞ্জাবী এবং ধুতি আমারই। কাল লণ্ড্রী থেকে আনিয়ে চেয়ারটার ওপর রেখেছিলুম। তুলতে বোধ করি গৃহিণীর খেয়াল হয় নি। কাজের চাপে ভুলে গেছেন মনে হ'ল।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেই বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকলুম, পদ্মলোচন?

পদ্মলোচন অকস্মাৎ ঘুরে আমার দিকে চাইল এবং পর-মুহূর্ত্তেই চেয়ার পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আজ্ঞে?

—লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা কোথাকার! এ কি হচ্ছে শুনি?

পদ্মলোচনের লজ্জা হওয়া ত দূরের কথা, দাঁত বার করে হাসতে লাগল। বললে, কি বাবু?

বলেই চোখ নীচু করে নিজের দেহের ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। বললে, আজ্ঞে বাবু, আজ শঙ্করীদিদি নেমন্তন্ন করেছে কি না। ওর বাড়ীতে খেতে হবে। আমার জামা-কাপড় একেবারে ছেঁড়া, বাবু। তাই, আপনার ধুতি আর পাঞ্জাবী পরেছি।

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার ডান হাতখানা পদ্মলোচনের শীর্ণ গালের উপর বজ্রের মত গিয়ে পড়ল। সে প্রচণ্ড চপেটাঘাত ও বরদাস্ত করতে পারলে না। ছিটকে গিয়ে পড়ল ওদিককার দরজার ওপরে এবং খোলা একখানা পাল্লার খোঁচায়, চক্ষের পলকেই পদ্মলোচনের কপালের এক পাশ কেটে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল।

রাগের মাথায় এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলাম। শেষে ডাক্তার ডাকতে হ'ল, ঔষধ দিয়ে কপালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হ'ল, আচ্ছা এক ফ্যাসাদে পড়া গেল।

এই প্রহারের তাড়সে পদ্মলোচনের জ্বর এল। খুব জ্বর।...

শঙ্করী একদিন পদ্মলোচনের ঘরে ঢুকে তার শিয়রের পাশে বসল। বললে, পদ্ম, এখন কেমন আছিস?

পদ্মলোচন লেপের ভিতর থেকে মুখটা বের করে, চিঁ চিঁ করে বললে, ভালই আছি। শঙ্করীদিদি তবু ভাল যে তুমি আমায় দেখতে এলে।

শঙ্করী ওর গায়ের লেপটা সরিয়ে একপাশে রাখলে। বললে, লেপ গায়ে দিয়ে পড়ে আছিস কেন? শীত করছে?

—এখন করছে না। আগে করছিল।

শঙ্করী সে কথার জবাব দিলে না। শুধু ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

পদ্মলোচন বললে, অমন করে কি দেখছ, শঙ্করীদিদি?

শঙ্করী চোখ ফিরিয়ে অন্ত দিকে চাইলে। একটা দুষ্ট

নিঃশ্বাস ওর বুকখানা মথিত করে বাইরে বেরিয়ে এল। বললে, তুই কত রোগা হয়ে গেছিস পদ্ম।

—রোগা? কই না তো।

—না হলেই ভাল।

কিছুক্ষণ চুপ চাপ্।

পদ্মলোচন বললে, লেপটা গায়ে দিয়ে দেবে, শঙ্করীদিদি?

—কেন, আবার শীত করছে?

—হ্যাঁ।

শঙ্করী ভাল করে লেপটা চাপা দিয়ে একটু নড়ে চড়ে বসল। বললে, তুই ভাল হয়ে ওঠ্ পদ্ম, তোকে আমি পয়সা খরচ করে 'নদের নিমাই' যাত্রা শোনাব।

—সত্যি? সত্যি বলছ, শঙ্করীদিদি?

—হাঁ রে সত্যি কথা।

পদ্মলোচন নিরুত্তরে শুধু লেপটা ওপর দিকে একটু টেনে নিলে।

ক্ষণকাল পরে পদ্মলোচন বললে, পা দুটো যেন দেহ থেকে খসে যাচ্ছে, শঙ্করীদিদি। অসহ্য কামড়ানি।

—পা কামড়াচ্ছে? টিপে দেব?

এই বলে শঙ্করী উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করে পদ্মলোচনের পা টিপে দিতে লাগল।

পদ্মলোচন হাঁ হাঁ করে উঠল। বললে, কর কি শঙ্করীদিদি? আমার পায়ে হাত দিও না।

শঙ্করী সে কথায় কর্ণপাতও করল না। পদ্মলোচনের পা টিপে দিতে দিতে বললে, তা হোক, তুই এখন চুপ করে শো দেখি। অনেকক্ষণ বকর-বকর করছিস। এখন একটু ঘুমো।

এই সময়ে হরিঠাকুরের পায়ের খড়মের শব্দ একটু একটু করে ঘরখানার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল এবং ক্ষণকাল পরে দেখা গেল, সে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ভিতর পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখনই রাগে ফুলতে ফুলতে যেদিক দিয়ে এসেছিল, সেই দিকেই মুখ করে ফিরে যেতে লাগল।

সন্ধ্যার পর টেম্পারেচার নিতে এসে দেখি, তখনও শঙ্করী বিছানার এক পাশে বসে পদ্মলোচনের পদসেবা করছে।

বর্ত্তমান কালের মহাসমর ও প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবী দুইটি প্রলয়ঙ্কর মহাসমরের বিভীষিকা দেখিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-সমর সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আবার তৃতীয় মহাসমরের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই সেদিন প্রশান্ত মহাসাগরের বিকিনি প্রবাল-বলয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম আণবিক বোমার যে জমকালো মহড়া হইয়া গেল ইহা ঘনায়মান তৃতীয় মহাযুদ্ধের কৃষ্ণচ্ছায়াই সূচনা করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিস্কো শহরে বিয়াল্লিশটি ছোটবড় জাতি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে একটি সনদ সহি করিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও পৃথিবীর পরাধীন, পরতন্ত্র ও পরপদানত জাতিগুলির মনে এই সনদের স্থায়িত্ব এবং পরিণাম সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কা ও সন্দেহ জাগিতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জেনিভা সম্মেলন, জাতি-সঙ্ঘ, নিরস্ত্রীকরণ-সভা, কেলগ্ প্যাক্ট প্রভৃতির শোচনীয় ব্যর্থতা দেখিয়া সানফ্রান্সিস্কোতে রচিত সনদের পরিণাম সম্বন্ধেও মনে সংশয় জাগিলে কোন দোষ দেওয়া যায় না। এবারও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের আলোচনা-সভাগুলিতে এবং প্যারিসে আহূত শান্তি সম্মেলনে বৃহৎ শক্তিত্রয়ের (আমেরিকা, ইংলণ্ড ও রাশিয়া) মতিগতি দেখিয়া বিশ্ব-শান্তি ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহই জাগিতেছে। যতদিন প্রবল প্রতাপশালী প্রধান রাষ্ট্রগুলির পররাজ্যলোলুপতা, সাম্রাজ্যবাদী নীতি, লুণ্ঠন, শোষণ ও পীড়নের ছদ্মবেশে দুর্বল জাতিগুলির উপর অভিগিরি, কৃষ্ণকায় জাতিগুলির প্রতি শ্বেতকায় জাতিগুলির তথাকথিত ভগবদ্দত্ত দায়িত্ব প্রভৃতি হীন স্বার্থকলুষিত উগ্র সাম্রাজ্যবোধ বিদ্যমান থাকিবে তত দিন পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তার আশা করা বৃথা। বৃহৎ শক্তিত্রয় জাতিবর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে সকল জাতির স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সমানাধিকারের প্রতি কি প্রকৃতপক্ষেই আগ্রহশীল? যদি তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে ও আন্তরিকতার সহিত পৃথিবীর প্রকৃত শান্তি ও মঙ্গল কামনা করেন তবেই তাঁহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক যুদ্ধের বীভৎস রূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। শুক্রনীতিসার, কামন্দকীয় নীতিসার, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, মহাভারত, গৌতম ধর্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বর্ত্তমান কালের মত প্রাচীন কালেও জল, স্থল, আকাশ ও ভূগর্ভে যুদ্ধ হইত। সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি সম্বন্ধে

মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে তাহাদিগকে জলে, স্থলে, আকাশে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহাদের অভিযান-পথ সুস্পষ্টরূপে পরিকল্পিত, অঙ্কিত ও নির্দ্ধারিত করিতে হইবে ; স্থলে রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য, জলে যুদ্ধজাহাজ এবং আকাশে বিমান অগ্রসর হইবে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অষ্টম ও দশম অধ্যায়ে উক্ত আছে, "ভূগর্ভে পরিখা খনন করিয়া এবং তথায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ চালাইতে হইবে।" গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আকাশ ও পরিখা-যুদ্ধকে বর্ত্তমান যুগের লোকেরা আজগুবি কল্পনা বলিয়া মনে করিত। কিন্তু ইহা এখন বাস্তব ব্যাপার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের চোখের সামনে জল, স্থল, আকাশ ও ভূগর্ভের বিভিন্ন রণাঙ্গনে নরহত্যার তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হইয়াছে, নিত্য নূতন ভীষণ মারণাস্ত্রসমূহের আবিষ্কার এবং সেগুলির নিষ্ঠুর ও নির্বিচার প্রয়োগদ্বারা ধ্বংস-কার্য্যের অমানুষিক লীলা ব্যাপকভাবে ও অপ্রতিহত গতিতে চলিয়া মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা চিরতরে লিপ্ত হইয়াছে।

কৌশল, কূটনীতি ও চাতুর্য্যের প্রয়োগ যুদ্ধের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এইগুলি যুদ্ধের পক্ষে অপরিহার্য্য। পরিকল্পনা সুচিন্তিত হইলে সাধারণতঃ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় না। প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহে এরূপ দৃষ্টান্তের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বৃত্র, রাবণ ও তাড়কাকে বধ করিবার জন্য ইন্দ্র, রাম এবং কৃষ্ণ কৌশল, চাতুর্য্য ও কূটনীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরাক্রমশালী বালী, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, বাতাপী, ইল্বল প্রভৃতিও এইরূপে নিহত হইয়াছিল। কূটনীতির প্রয়োগ দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। কামন্দকীয় নীতিসারে প্রাচীনকালের কূটযুদ্ধের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কূটযুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে কামন্দক বলিয়াছেন —"দেশ ও কাল অনুকূল হইলে এবং শত্রুর প্রকৃতি-ভেদ করিতে পারিলে রাজা প্রকাশ্য যুদ্ধ করিবেন ; কিন্তু দেশ ও কাল প্রতিকূল হইলে এবং শত্রুর প্রকৃতি ভেদ করিতে না পারিলে রাজা কূটযুদ্ধ করিবেন। গিরিকন্দরাদি-পথে অভূমিষ্ঠ (উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত নয়) অতএব অসাবধান শত্রু-সৈন্যকে বধ করিবে। আর ভূমিষ্ঠ অর্থাৎ উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত শত্রু-সৈন্যকে উপজাপ করিয়া বধ করিবে। সম্মুখে এক দল সৈন্য যুদ্ধের জন্য রাখিবে এবং আর একদল বলবান্ বেগগামী বীরসৈন্য দ্বারা পশ্চাৎদিক হইতে শত্রুসৈন্যদলকে আক্রমণ-পূর্ব্বক দুই দিক হইতে বিধ্বস্ত করিবে। অথবা পশ্চাৎদিক হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, শেষে সম্মুখ হইতে শক্তিশালী সৈন্যদ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক বিব্রত করিয়া বধ করিবে। ইহাও দুই দিক হইতে আক্রমণ। সম্মুখদেশ বিষম হইলে পশ্চাৎ হইতে বেগবান হইয়া বধ করিবে ; আর পশ্চাৎ দিক বিষম প্রদেশ হইলে সম্মুখ হইতে বধ করিবে। এইরূপে পার্শ্বের বিষয়ও বুঝিতে হইবে। অসার সৈন্যের মধ্যে সারবান্ সৈন্যবল লুকাইয়া রাখিয়া যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধে অসার সৈন্যের বিনাশে শত্রুসৈন্য শিথিলপ্রযত্ন হইলে তখন ঐ শত্রুসৈন্যকে সিংহের ন্যায় উল্লম্ফন করিয়া প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা নিহত করিবে। কুয়াসা, অন্ধকার, কাল-পরিচ্ছদ, গর্ত্ত, অগ্নি, পর্ব্বত, বন, নদী—এই সকলের ছলে বা ছলে কূটযুদ্ধ করিয়া শত্রুকে পরাজয় বা বিনাশ করিবে। চরদ্বারা শত্রুর প্রচার অবগত হইয়া রাজা অতিশয় সতর্কতা ও উৎসাহের সহিত যে উপায়ে শত্রুবধ করিবেন, শত্রুর নিকট হইতেও সতর্ক রাজা তদ্রূপ স্বপক্ষের নিধনের আশঙ্কা করিবেন।"

যুদ্ধ-বিগ্রহ যে অতিশয় নিষ্ঠুর ও ধ্বংসকারী ব্যাপার তৎ-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যুদ্ধের মত নিষ্ঠুর ও প্রলয়ঙ্কর কার্য্যও সর্ব্বজনকল্যাণবিধায়ক ধর্ম্মের প্রভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত হইত। বর্ত্তমান যুগে প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধের আদর্শ বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে স্বজনগণকে যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া ক্ষত্রিয়বীর অর্জ্জুন বিষণ্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন না। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণে অসমর্থ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার উপদেশ ভিক্ষা করিলেন। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিদ্ দার্শনিক ও তত্ত্বদর্শী শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তের অভীঃমন্ত্রদ্বারা অর্জ্জুনের ক্লৈব্য ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া তাঁহার অন্তরে আত্মবিশ্বাস ও শক্তিসঞ্চার করিলেন। আত্মা অবিনশ্বর, দেহের সহিত ইহা বিনষ্ট হয় না। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান পরম ধর্ম্ম। ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইলে স্বর্গলাভ হয়, আর জয়ী হইলে পৃথিবীতে প্রভুত্ব ও যশঃ অর্জ্জিত হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে কোনো দেশের যোদ্ধৃগণ এরূপ ধর্ম্মনীতির উপদেশ শুনিতে পায় নাই। প্রকৃতপক্ষেই এরূপ উচ্চ নীতি-জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধ বর্ত্তমানকালে দেখা যায় না।

যুদ্ধ-বিগ্রহের ফল কখনও শুভ হয় না—ধ্বংস ইহার অপরিহার্য্য পরিণতি। প্রাচীন ভারতে ধর্ম্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রথা, আইন-কানুন ও সমাজ-ব্যবস্থা দ্বারা যুদ্ধে ধ্বংসের পরিমাণকে অনেকাংশে লঘু করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। প্রচলিত আইন-কানুন ও সমাজনীতিগুলি উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ পরিচালিত হইলে জনগণের দিক হইতে তীব্র সমালোচনা, বিক্ষোভ ও অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিত। জনগণের ঈদৃশ বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সম্বন্ধে ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিবেকবুদ্ধি সম্যক্‌রূপে সচেতন ছিল এবং ইহার তীব্র প্রতি-ক্রিয়াও পরিলক্ষিত হইত। তৎকালে নিন্দা এবং লজ্জার আশঙ্কাও ছিল। আজকাল এগুলি কল্পনার খেয়াল বলিয়া উপেক্ষিত হয়। এগুলি মানিয়া চলিলে নাকি নারীসুলভ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। নির্দ্দোষ নিরস্ত্র নাগরিক ও গ্রামবাসিগণের উপর

অতিশয় মারাত্মক বিস্ফোরকের নির্ব্বিচার বর্ষণ আধুনিক যুদ্ধে বিজয় লাভের এক মহা গৌরবজনক উপায় বলিয়া অভিনন্দিত হয়। আজকাল বিস্ফোরকের আক্রমণ হইতে নারীকেও বাদ দেওয়া হয় না; নির্দ্দোষ শিশুরও অব্যাহতি নাই। সাহসী ও বলবানেরা ইহাকেই হয়তো বীর-ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। প্রাচীনকালে যুদ্ধ হইত সমানে সমানে—ইহাই ছিল প্রকৃত শক্তির পরীক্ষা। আজকাল ইহা বৈজ্ঞানিক কৌশল, কৃতিত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির পরীক্ষা এবং আকাশমার্গ হইতে নির্ব্বিচার, নিষ্করুণ ও অমানুষিক নরহত্যার তাণ্ডবলীলায় পর্য্যবসিত হইয়াছে!

প্রাচীন ভারতে যুদ্ধ কি কি ধর্ম্মানুমোদিত ও মর্য্যাদাসম্পন্ন উপায়ে পরিচালিত হইত উহা নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে আমাদের শাস্ত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং তাহাতে আমরা পররাজ্যগ্রাসী, পরপীড়ক, দরিদ্রশোষক, বস্তুতান্ত্রিক আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব স্পষ্টরূপে জানিতে পারিব।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যুদ্ধে ধর্ম্মের অনুশাসন মানিতে হইবে কেন? ধর্ম্মানুমোদিত আইন-কানুন, রীতি-নীতি মানিয়া চলিলে যুদ্ধোদ্যম ও যুদ্ধপরিচালনা কি শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না? যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য যদি হয় শত্রুর পরাজয় ও নিপাত,তবে কি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দয়ামায়া বিসর্জ্জন দিয়া সকল প্রকার সুযোগ, কৌশল, চাতুরী, কূটনীতি ও কার্য্যকর উপায় অবলম্বনীয় নহে? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে প্রাচীন ভারত কম্বুকণ্ঠে বলিতেছে যুদ্ধ ধর্ম্ম-নীতি-ন্যায়-সত্য-মর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তবেই যুদ্ধের মত অনিবার্য্য অশুভ বস্তু হইতেও মানবকল্যাণকর উচ্চ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। আদিম অসভ্য জাতিসকলের হিংস্র যুদ্ধের নিষ্ঠুর প্রথাগুলিকে চিরতরে বিদায় দিয়া সভ্য মানবের মর্য্যাদাসম্পন্ন সর্ব্বজনগ্রাহ্য ধর্ম্ম-নীতি-ন্যায়-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-কানুনগুলি অবলম্বন করিলেই মানব-কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

আধুনিক অনেক ইউরোপীয় সেনাধ্যক্ষ প্রাচীন ভারতের যুদ্ধের উচ্চ আদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ব্যূহরচনা বর্ত্তমান সমরকৌশল অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। মনুসংহিতায় বরাহ, মকর, সূচী, পদ্ম প্রভৃতি ব্যূহের উল্লেখ আছে এবং তদুপযোগী যুদ্ধের বিস্তৃত নির্দ্দেশও দেওয়া হইয়াছে। যেদিক হইতে বিপদের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশী সেই দিকেই সেনাধ্যক্ষ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী সৈন্য পরিচালনা করিবেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আট দিকেই সৈন্য প্রেরণ করিবার তৎপরতা দেখাইবেন। যেদিক হইতে শত্রুর আক্রমণ আসে সেই দিকেই সৈন্যগণ অগ্রসর হইবে। অপ্রত্যাশিত আক্রমণ যাহাতে না হইতে পারে তজ্জন্য পাশের দিকে এবং পশ্চাৎ ভাগেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। শত্রু যদি সংখ্যায় বেশী ও অধিকতর পরাক্রমশালী হয়, তবে শত্রুর সম্মুখে বেশীসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখিতে হইবে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তাড়াতাড়ি সৈন্যদলকে সরাইয়া লইতে হইবে। শহর অথবা দুর্গ দখল করিতে হইলে, অথবা শত্রুসৈন্যের ব্যূহ-মধ্যে পথ করিয়া যাইতে হইলে দুই দিকে ধারালো তরবারির আকারে বজ্রব্যূহ রচনা করিয়া আক্রমণ করিতে হইবে। কামানও গোলাগুলির মুখে আক্রমণ করিতে হইলে সর্পব্যূহের আকারে আক্রমণ করিতে হইবে অর্থাৎ সৈন্যগণ মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইবে অথবা বৃদ্ধ পঙ্গু অশ্বারোহী সৈন্যগণকে পুরোভাগে এবং যুবা সৈন্যগণকে মধ্যভাগে স্থাপন করিবে। গোলন্দাজ, অশ্বারোহী, রথারোহী সৈন্যগণ সমতল ক্ষেত্রে, নৌ-সৈন্য জলে, হস্তী অগভীর জলে, তীরন্দাজগণ বন-প্রদেশে, ঢাল-তরবারিধারী সৈন্যগণ মরুভূমিতে যুদ্ধ করিবে। মনুসংহিতায় সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহাদিগকে উত্তম খাদ্য দিতে হইবে, বিশ্রাম উপভোগ করিবার সুযোগ দিতে হইবে এবং যুদ্ধকার্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিতে হইবে।

কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে সৈন্যগণের গুণাবলীর মান বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "পুরুষ পরম্পরাগত শৌর্য্য বীর্য, অনুগত স্বভাব, সন্তোষ, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বিদেশে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা, অপরাজেয়তা, তিতিক্ষা, সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধে বিচক্ষণ-কৌশল, বিপর্য্যয়ের ভিতরও অবিচল রাজানুগত্য"—এই সকল গুণের অধিকারী হইবে সৈন্যগণ। যাহারা যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত, অভিজ্ঞ, দক্ষ, ন্যায়পরায়ণ, নির্ভীক, ভাবপ্রবণতাশূন্য এবং বৃক্ষের মত অবিচল তাঁহারাই সেনাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। এই সকল সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, বিজ্ঞান বা কলা হিসাবে প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ কিরূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিরূপে মহাবীর সেকেন্দর যুদ্ধের এই শ্রেষ্ঠ আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে প্রতীচ্যে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কিরূপে ইউরোপীয় দেশগুলি স্থানীয় অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ও খাপ খাওয়াইয়া অদ্যাবধি ভারতীয় যুদ্ধনীতি ও আদর্শ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে—ইহা ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের যুদ্ধের অনন্যসাধারণত্ব কেবল উহার উচ্চ মান ও আদর্শে নিহিত নয়। এই উচ্চ মান ও আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ এক উন্নততর নৈতিক পবিত্রতা ও শুভতার উচ্চ বেদীতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতীয় যুদ্ধের জন্য এই সকল সভ্য রীতি-নীতি

নির্দ্ধারিত ও উপদিষ্ট হইয়াছিল—সমশ্রেণীভুক্ত সৈন্যগণের মধ্যে যুদ্ধ চলিবে ; যোগ্যতা, উদ্যম, শক্তি এবং যুযুৎসা বিবেচনা করিতে হইবে। যথোচিত বিজ্ঞপ্তি না দিয়া আক্রমণ করিবে না। ভয়ে লুক্কায়িত জনগণকে আক্রমণ করিবে না। নিরস্ত্রীকৃত অথবা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে না। রথচালক, বাদক, রসদ-বাহকদিগকে আক্রমণ করিবে না। মনুসংহিতায় উক্ত আছে—গোপন অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিষ-প্রয়োগের দ্বারা শত্রুকে বধ করিবে না। ভূমিতে শায়িত, উপবিষ্ট, করযোড়ে অবস্থিত, উলঙ্গ, জীর্ণ-শীর্ণ, নিদ্রিত, অরক্ষিত আলুলায়িত কেশ, আশ্রিত, দর্শকমাত্র, অন্যের সঙ্গীমাত্র, বিপন্ন, অসহায়, ভয়াকুল, সাংঘাতিকরূপে আহত, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নপর শত্রুকে বধ করিবে না। গৌতম ধর্ম্মসূত্র নির্দ্দেশ করিতেছে—নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে যুদ্ধ পরিচালনা করিবে, যতদূর সম্ভব ঘৃণা ও হিংসার ভাব পরিবর্জ্জন করিবে। যে শত্রু নিরস্ত্র, অশ্ব ও সারথিবিহীন, করযোড়ে দণ্ডায়মান, আলুলায়িতকেশ, যুদ্ধে অনিচ্ছুক, ভূমিতে বা বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট তাহাকে, বার্ত্তাবহকে এবং ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না। মহাভারতের ভীষ্ম ও দ্রোণপর্ব্বে উক্ত আছে—শত্রুপক্ষীয় ভূপাতিত এবং আহত সৈন্যগণকেও সযত্নে শুশ্রূষা করা উচিত। প্রাচীন হিন্দুগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কেবল দৈহিক বল অপেক্ষা সত্য, দয়া ও ধর্ম্মানুসরণের দ্বারা যুদ্ধে অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায়। যদিও সকল বর্ণের লোকই যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিত, তথাপি যুদ্ধ একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্মগত অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইত। যুদ্ধ শত্রুকে পরাজিত করিবার অধম উপায়, ভেদনীতি মধ্যম উপায়, এবং শত্রুর নিকট হইতে সন্ধির প্রস্তাব ও কর গ্রহণ উত্তম উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে সাম, দান বা ভেদনীতি দ্বারা এবং যেখানে এই সকল উপায় ব্যর্থ হয় কেবল সেখানে শেষ অবলম্বন-স্বরূপ যুদ্ধ পরিচালনা দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহের প্রশমন করিবার জন্য রাজগণকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। মনুসংহিতায়ও এই একই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যখন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিত, তখন প্রাচীন ভারতের রাজন্যবর্গ যুদ্ধক্ষেত্র মনোনীত করিতেন, যোদ্ধৃগণের শিবির সন্নিবেশ করিতেন এবং শুভ দিন দেখিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিতেন। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিত। সূর্য্যোদয়ে রাজা, সেনাপতি ও সৈন্যগণ উপাসনা, প্রার্থনা, দান, ধ্যান ও তর্পণাদি সম্পন্ন করিতেন এবং তৎপর যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন। সূর্য্যাস্তে সেনাপতিগণ বিশ্রামের আদেশ দিতেন। মহাভারত পাঠে আমরা জানিতে পারি, কুরুক্ষেত্র মহাসমরে প্রতিদিনের যুদ্ধশেষে পাণ্ডব ও কৌরবগণ স্ব-স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরস্পর আলাপ-আলোচনায় নিযুক্ত হইতেন, সুগন্ধি জলে স্নান করিতেন, যন্ত্রকাল গান ও অন্যান্য নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ করিতেন এবং তৎপর নিদ্রা যাইতেন। দুই পক্ষের উজ্জ্বল মশালের আলোকে উদ্ভাসিত শিবিরের মধ্যে সৈন্য, অশ্ব এবং হস্তীসকল নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে ও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিত। বিশ্বাসঘাতকতা-দুষ্ট আক্রমণের কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবিত না। এই সময়ে তাহারা শত্রুতা প্রায় ভুলিয়া যাইত। এক দিনকার দৃশ্য বড়ই উদ্দীপনাময়। যেদিন জয়দ্রথ যুদ্ধে নিহত হইলেন, সেদিন সংগ্রাম খুব কঠোর ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল এবং অর্জ্জুন তাঁহার সৈন্যগণকে অপরাহ্ণে অত্যধিক ক্লান্ত, অবসন্ন ও ধূল্যবলুণ্ঠিত দেখিয়া নিদ্রা যাইতে অনুমতি দিলেন। দুর্য্যোধনও তদ্রূপ আদেশ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দিনের বেলায় উভয় পক্ষকে এরূপে পাশাপাশি নিশ্চিন্তমনে নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে শায়িত দেখা একটা অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তাহারা নির্বিঘ্নে নিদ্রাভিভূত ছিল। তারপর সৈন্যগণ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। রাত্রিতে ব্রাহ্মণগণ পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন এবং রাজা ও সেনাপতিগণ ব্যতীত কেহই পরদিন প্রাতঃকালের যুদ্ধ সম্বন্ধে মাথা ঘামাইলেন না। যোদ্ধৃগণ আবার জয়লাভের নিমিত্ত দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন। শুদ্ধ, সৌম্য ও শান্ত অর্জ্জুন শ্রীদুর্গার নিকট প্রার্থনা করিলেন।

প্রাচীন ভারতের যুদ্ধবিগ্রহে আর একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যুদ্ধ করিবার সময়েও তরুণেরা বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুগণের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। দুর্য্যোধনের নিকট হইতে বিরাটের গোধন-উদ্ধারের জন্য মৎস্যদেশে যে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই যুদ্ধে অর্জ্জুন বৃহন্নলার ছদ্মবেশে উত্তরকে সারথি করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এরূপ কৌশলের সহিত তাঁহার তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে প্রথমতঃ দুইটি তীর দ্রোণের পাদস্পর্শ করিল এবং অপর দুটি তাঁর কর্ণ প্রায় স্পর্শ করিয়া সবেগে ছুটিয়া গেল। তীর দুটি যেন দ্রোণের কর্ণে চুপি চুপি অর্জ্জুনের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিল। ভীষ্ম, অশ্বত্থামা ও কৃপের প্রতিও তিনি এরূপ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে যুযুধান সৈন্যগণ পরস্পরের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহার রথ হইতে অবতরণ করিয়া, সংযতবাক্ হইয়া করযোড়ে শত্রুর মধ্যভাগে অবস্থিত ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও যুদ্ধের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। দ্রোণ, কৃপ ও শল্যের নিকটও তিনি পর পর এরূপ আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি চাহিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল আকাশ-কুসুম বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধ হইতে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, নীতি, মানবতা সম্পূর্ণ রূপে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। আধুনিক যুদ্ধে সমরনায়কগণই ঈশ্বরের আসন দখল করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশ ও আদেশই এখন যুদ্ধ পরিচালনায় একমাত্র নিয়ামক—উহা যতই ধর্ম্ম, নীতি ও মানবতার বিরোধী হউক। গোপন অস্ত্র, বিষাক্ত বাষ্প, আণবিক বোমা, রাসায়নিক যুদ্ধ,

যথাতথা নির্ব্বিচারে বোমাবর্ষণের দ্বারা লোকালয় ধ্বংস—এগুলিই আধুনিক যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার। দুর্ব্বার ঘৃণা, হিংসা, লোভ ও জিঘাংসা চরিতার্থ করিবার তাণ্ডব লীলাভূমি আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্র।

প্রাচীন ভারতে যুদ্ধরত লোকদিগকে শান্তিপ্রিয় সাধারণ অধিবাসিগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে যুযুধান ও অ-যুযুধানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। সকলকেই যুদ্ধে কোন-না-কোন অংশ গ্রহণ করিতে হয়, কাহারও অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই। চক্ষের পলকে ইহা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে এবং আন্তর্জ্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে। প্রাচীনকালে শত্রু সাধারণতঃ লুণ্ঠতরাজে লিপ্ত হইত না অথবা কোন জাতির খাদ্য-সম্ভার বিনষ্ট করিত না। লোকালয় হইতে বহুদূরে যুদ্ধক্ষেত্র নির্ব্বাচিত হইত। আধুনিক যুদ্ধে জনাকীর্ণ নগর, শস্যভাণ্ডার, শিল্পালয়, কলকারখানাই আক্রমণের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যবস্তু। কোন দেশ বা জাতির কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পসম্পদ নষ্ট করিয়া দেওয়াই শত্রুর প্রধান লক্ষ্য থাকে।

আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিরন্তন প্রাণবস্তু। এই আধ্যাত্মিকতাই সত্য প্রেম ন্যায় সৌভ্রাত্র সহিষ্ণুতা এবং মানবতাই ভারতীয় জীবনের প্রতি স্তরে, এমন কি যুদ্ধবিগ্রহেও ভারতীয়গণের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিত। ইহাই মানবীয় সভ্যতার বিবর্ত্তনে হিন্দু-চিন্তাধারার বিশিষ্ট অবদান। পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের ভিতর ভোগের উগ্রতা দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,—"পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলি যেন সজীব আগ্নেয়গিরির মুখে অবস্থান করিতেছে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলি যদি তাহাদের উগ্র ভোগের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ না করে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।" অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঋষির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। গত মহাসমরে ইউরোপীয় জাতিগুলি পরস্পর যুদ্ধ করিয়া ধ্বংসের শেষসীমায় উপনীত হইয়াছে। যত দিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্ত্য সমরনায়ক ও রাষ্ট্রনেতৃগণ ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা গ্রহণ না করিবেন, তত দিন তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধ-বিগ্রহ মানবের অনিষ্ট সাধনই করিবে, এবং তাঁহাদের শান্তিস্থাপনের সমস্ত প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হইবে। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাই জগতকে যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

শীতকালের শাকসব্জী উৎপাদন

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতার দিনে "বেশী খাদ্যশস্য জন্মাও"—"বেশী করে শাকসব্জী ফলাও" বলে সকলেই ফতোয়া দিচ্ছেন, কিন্তু হাতে-কলমে করার উপদেশ খুব কমই শুনতে পাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিছু জানালে অনেকের উপকার হতে পারে ভরসায় আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। জমির সার, জল ও ভাল বীজ ছাড়া উপযুক্ত সময় একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। ভাল বীজের চারা, উত্তম সার ও উপযুক্ত পরিমাণ জলের ব্যবস্থা হলেও উপযুক্ত সময়ে নির্দ্দিষ্ট বীজ বোনা বা চারা লাগানো না হলে ষোল আনার জায়গায় দুই আনা ফলন হওয়া যে অসম্ভব সে বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণা খুব বেশী লোকের আছে বলে মনে হয় না। বস্তুতঃ শহরতলী বা অন্য জায়গায় চাষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-বর্জ্জিত শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত যাঁরা বেশী শাকসব্জী ফলানোর উপদেশ শুনে নিজেদের বসতবাটী-সংলগ্ন অল্প জায়গাটুকুর সদ্ব্যবহারের জন্য যত্নবান হয়ে উঠেছেন তাঁদের পক্ষে কয়েকটি কথা জেনে রাখা বিশেষ দরকার বলে মনে করি। শীতকালের শাকসব্জীর মধ্যে ফুলকপি, মূলো, পালংশাক, টম্যাটো, পেঁয়াজ এবং ওলকপির চাষ খুব সোজা এবং বাড়ীর প্রাঙ্গণে সময়মত চাষ করলে এগুলি প্রায়ই বিফল হয় না।

ফুলকপির চাষে সময় একটি বড় বিবেচ্য বিষয়। একই জমিতে পনের-কুড়ি দিনের বিলম্বে বসানো চারা কিছুতেই আগে লাগানো চারার সঙ্গে পেরে ওঠে না। ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় তৃতীয় সপ্তাহে বসানো জলদি ফুলকপির চারা কার্ত্তিক মাসের শেষের দিক থেকেই ফুল দিতে আরম্ভ করে। খানিকটা গোবরের সার দিয়েও মাঝে মাঝে গাছগুলোর গোড়া আলগা করে দিয়ে নূতন মাটি একটু শুকিয়ে উঠলেই নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হয়। বৃষ্টির পরে পাতাগুলির দিকেও একটু লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, এক প্রকার সবুজ রঙের লম্বা লম্বা পোকা পাতাগুলি খেতে থাকে। সাধারণতঃ সকালবেলায় তারা পাতার নীচে আত্মগোপন করে থাকে। কোন সুন্দর সতেজ পাতায় ছিদ্র দেখলে বা কাল কাল বড়ি বড়ি মল দেখলেই পাতাগুলো উলটে দেখা দরকার। সাধারণতঃ বসতবাটী-সংলগ্ন স্থানের ফুলকপির চারায়, বিশেষতঃ কার্ত্তিকের শিশির পড়ার আগে, এই পোকাগুলির দৌরাত্ম্য বেশী হয়—সবচেয়ে বেশী আক্রমণ করে সাধারণতঃ বেশী বৃষ্টির পরেই। এই সময় শুঁয়াপোকাও ফুলকপির চারা খেয়ে নষ্ট করে দেয়। সুতরাং ভাল জমি, প্রচুর সার থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত তদারকের অভাবে ফুলকপির চাষে ব্যর্থমনোরথ হতে হয়।

অনেকে বলতে পারেন ভাদ্রমাসে প্রায়শঃ বৃষ্টি হয়, সুতরাং জল দি ফুলকপি লাগানোর জমিতে চাষের ব্যবস্থা হবে কি করে? বেশী জমি হলে চাষের প্রশ্ন আসে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি বসতবাটী-সংলগ্ন উঁচু এবং বড়জোর কয়েক কাঠা মাত্র জমির উদ্দেশ্য করেই প্রধানতঃ বলছি। সাধারণতঃ এ-সব জমিতে বর্ষাকালে নটে ডাঁটা, ঢেঁড়স বা বর্ষাতি মূলো থাকে। সুতরাং ভাদ্রের প্রথমে সেগুলো প্রায় শেষ হয়ে আসে বা সামান্ত যা অবশিষ্ট থাকে তা তুলে ফেলে দিয়ে কিছু ঘাস থাকলে পরিষ্কার করে রৌদ্রবহুল দিন দেখে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে দিলেই চলে। এ সময় সার না দিলেও ক্ষতি নাই। কোদাল দিয়ে বেশী মাটি কোপাবারও দরকার নাই। তারপর শুকনো খটখটে দিন দেখে পূর্ব্ব থেকে নিজে ফুলকপির চারা না করলে বাজার থেকে চারা এনে বিকেলে ঐ জমিতে দেড় হাত তফাতে তফাতে বসাতে হয়। পরদিন যদি বেশী রৌদ্র হয় তবে সকালে রৌদ্র উঠার আগেই চারাগুলো কলার খোলা কেটে বা কাগজের ঠোঙা দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। অবশ্য বিকালে রোদ পড়ে গেলেই ঢাকনাগুলো আবার খুলে দিতে হয়। পর পর তিন-চার দিন পর্য্যন্ত ঐ ভাবে চারাগুলো ঢেকে দেওয়া দরকার। তারপর চারাগুলো দাঁড়িয়ে গেলে নীচের দু-একটি পাতা ঝরে যায় ও নূতন পাতা গজাতে থাকে। দিনসাতেক পরে চারাগুলোর গোড়া খুব সাবধানে নিড়ানি বা খুরপি দিয়ে আলগা করে দিতে হয়। মাঝে মাঝে ঘাস বা অন্ত আগাছা জন্মালে সেগুলো তুলে ফেলে দেওয়া ভাল। শেষে বেশী বৃষ্টির পরগাছের গোড়ার মাটি শক্ত হয়ে গেলে রৌদ্র উঠার পর মাটি একটু শুকিয়ে গেলে আবার নিড়ানি দিয়ে সাবধানে আলগা করে দিতে হয়। এইভাবে চারাগুলো বেড়ে প্রায় আধ হাত উচু হলেই প্রত্যেক চারার গোড়া থেকে দুই ইঞ্চি দূরে চারিপাশ খুঁড়ে, তিন-চার ইঞ্চি গভীর ও দুই-তিন ইঞ্চি প্রশস্ত গর্ত্ত খুঁড়ে তার মধ্যে পচা গোবরের সার দিয়ে সেগুলো আবার মাটি দিয়ে ঢেকে দিলে পরে বৃষ্টি পেয়ে বা বৃষ্টি না হলে মাটি শুকিয়ে গেলে জল দিলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে চারাগুলো সতেজ সবুজ পাতা মেলে উঠতে থাকে। আগেই বলেছি শুঁয়ো পোকা বা ফড়িং প্রভৃতির উপদ্রব হচ্ছে কি না দেখার জন্ত রোজই সকালে একবার বাগানে গিয়ে গাছগুলো তদারক করা দরকার। পাকা পাতাগুলোকে গাছের তলায় জমতে না দিয়ে পৃথক একটি গর্ত্তের মধ্যে ফেলে দিলে পাতা-সার হয়—তারপর গাছের গোড়ায় পাতা পড়লে পোকার উপদ্রবও বেশী হতে পারে। মাস দেড়েক পরে গাছগুলোর চারপাশে এবার আরও একটু দূরে এবং অপেক্ষাকৃত গভীর গর্ত্ত করে গোবরের সারে ভর্ত্তি করে ঝুরো মাটি চাপা দিলে এবং নিয়মিত জল দিলে ফুলকপির ফলন খুব ভাল হয়। যাঁদের জায়গা কম তাঁরা ঐ পদ্ধতিতে চাষ করলে এক এক ফুট ব্যবধানে চারা বসিয়েও ভাল ফসল পেতে পারেন। আমার প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক পর্য্যাপ্ত গোবরের সার প্রয়োগে খুব ঘন ঘন চারা বসিয়ে পাঁচ-ছয় হাত প্রশস্ত ও দশ-বার হাত লম্বা এক ফালি জায়গা থেকে অপর্য্যাপ্ত ফুলকপি উৎপন্ন করতেন। অবশ্য গাছ বেশী ঘন হলে ফুল খুব বড় হয় না তবে অল্প লোকের পরিবারে এ প্রকার ফুল প্রত্যেক দিনই দু-একটি পাওয়াতে বেশ পুষিয়ে যায়। ভাদ্রের প্রথম দিকে চারা লাগালেও শতকরা কুড়ি-পঁচিশটার বেশী বাঁচানো বড় শক্ত, বিশেষতঃ যদি চারা বসানোর পরেই উপর্য্যুপরি কয়েক দিন প্রচুর জল হয়। অবশ্য এ সময়ে চারা বসালে ফুল আগে পাওয়া যায় এবং গাছগুলো বড় হওয়ায় ফুলও তদনুপাতে বড় বড় হয়। তার পর ঐ ফুলকপি উঠে গেলে লেট ফুলকপি বা ওলকপি ঐ জায়গায় বসানো যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত একটু বেশী জায়গা থাকলে একবারে সব জায়গায় চারা না বসিয়ে তিন-চার বারে ৫০।১০০ করে চারা কিনে পনের-কুড়ি দিন পর পর বসানো ভাল। নতুবা একসঙ্গে লাগালে অধিকাংশ গাছে একসঙ্গে ফুল ফুটে যায়—কিন্তু ঐরূপ সময়ের ব্যবধানে লাগালে অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্য্যন্ত বাগানে কপি পাওয়া যেতে পারে। যে ফুলকপিতে মাঘ মাসে ফুল ধরে সে সব চারাও আশ্বিনের শেষ থেকে কার্ত্তিকের মধ্যেই বসিয়ে দিতে হয়। যদিও প্রকৃত পক্ষে শিশির পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলকপির চারাগুলো সতেজ হয়ে বাড়তে থাকে তবুও দেখা গেছে কার্ত্তিকের রৌদ্র পেয়ে চারাগুলো সুদৃঢ় হয়ে না উঠলে শিশিরে সম্যক্ বেড়ে উঠতে পারে না। একই বীজ থেকে উৎপন্ন চারা আশ্বিনের মাঝামাঝি ও অগ্রহায়ণের শেষভাগে বসিয়ে ফুলের অসম্ভব পার্থক্য দেখা গেছে। শেষোক্ত সময়ে বসালে চারাগুলো সরু সরু হয়ে উঠে পনের-কুড়ি দিনের মধ্যেই সুপারির আকারের ছোট ছোট ফুল ধরে।

ফুলকপির চারা সংগ্রহের কথা

কলকাতার নামকরা নার্শারির লেবেল-আঁটা বীজ থেকে উৎপন্ন চারা এবং কলকাতার হাটের চারার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখি নি। তবে হাটের চারা থেকে যুদ্ধপূর্ব্ব কয়েক-বৎসর যেরূপ বিরাট আকারের ফুলকপি পেয়েছি—যুদ্ধের কয়েক বৎসর অনুরূপ ভাবে চাষ করেও ঐ চারা থেকে আর আগের মত বড় ফুল পাই নি। সম্ভবতঃ বাইরের আমদানী বীজের অভাবে এরূপ ঘটেছে। ইতিমধ্যে নার্শারির বীজের চারা করেও ভাল ফুল দেখা যায় নি। যাদের জায়গা অল্প তাদের পক্ষে হাটের চারা কিনে লাগালেই ভাল মনে হয়। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, ভাদ্র মাসে চারা বসাতে হলে আকাশের অবস্থা লক্ষ্য করে চারা সংগ্রহ করা আবশ্যক। কয়েক দিন বেশী বৃষ্টির পর যখন বোঝা যাবে যে আগামী পাঁচ-ছয় দিন আর বৃষ্টির আশঙ্কা নাই সেই সুযোগে চারা বসানো প্রয়োজন। কারণ চারা বসানোর পরই বেশী বৃষ্টি হলে চারা-

গুলো পচে যায়। যদি আবহাওয়া নির্দ্ধারণে ভুল হয়ে যায়—চারা কিনে আনার পরই বৃষ্টিবাদল সুরু হয় তা হলে চারাগুলো যথাস্থানে না বসিয়ে খানিকটা বেশী উঁচু জায়গা দেখে তিন-চার ইঞ্চি দূরে দূরে সব চারা বসিয়ে রাখতে হবে। বৃষ্টি ছেড়ে যাওয়ার পর ক্ষেতের কর্দ্দমাক্ত ভাব কেটে মাটি অনেকটা ঝুরঝুরে হলে সেই উঁচু জায়গাতে সাময়িক ভাবে বসানো চারাগুলো মাটিসমেত তুলে এনে ক্ষেতে যথাস্থানে সারি করে বসিয়ে দিতে হবে। যদি ক্ষেত বেশী স্যাঁতসেঁতে থাকে তবে চারাগুলো ধ'রে গিয়ে কয়েকটি নতুন পাতা বার হবার পর অর্থাৎ সাময়িক ভাবে বসানোর বিশ-পঁচিশ দিন পরেও ঐ ভাবে তুলে এনে ক্ষেতে উপযুক্ত গর্ত্ত করে ভিতরে চারার চার পাশে গোবরের সার দিয়ে সারমাটি চাপা দিলে চারা তাড়াতাড়ি সতেজে বেড়ে উঠবার সুযোগ পায়। ফলতঃ সময় চলে যাচ্ছে অথচ জমির স্যাঁতসেঁতে কর্দ্দমাক্ত ভাব কাটছে না দেখলে এরূপ ভাবে চারা তৈরি করে নিলে সময়ের অসুবিধা বেশী ক্ষতি করতে পারে না। গোবরের সার বেশী পাওয়া না গেলে অ্যামোনিয়াম ফসফেট বা তদভাবে অ্যামোনিয়াম সালফেট ধুলোমাটির সঙ্গে পাতলা করে মিশিয়ে ঐভাবে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য সকল রকম সারই যাতে গাছের গায়ে না লাগে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, কারণ গোবরসার খৈল বা কৃত্রিম সার গাছের কাণ্ডের গায়ে ঠেকলে তার ঝাঁঝে গাছ মরে যায়। নূতন যাঁরা চাষ করেন জল সম্বন্ধেও তাঁদের শিক্ষণীয় আছে। জল দরকার বলেই বেশী জল ঢেলে কাদা করে ফেলা সঙ্গত নয়। চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোড়ায় মাটি দিয়ে ঢেকে দিলে গাছে জোর বাঁধে। বসতবাটী-সংলগ্ন উঁচু জমিতে প্রায় রোজই একবার, সাধারণতঃ বিকেলে জল দেওয়া ভাল। অবশ্য অপর্য্যাপ্ত জলে সার দ্রবীভূত হয়ে বেশী মাটির নীচে চলে গেলে গাছগুলো সারের উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। যে-কোনও ফসলেই, বিশেষতঃ ফুলকপি ক্ষেতে রৌদ্রের খুব দরকার। ক্ষেতের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে বড় গাছ বা বড় ঘর থাকলে তার ছায়া যতদূর পড়ে ততদূর ভাল ফুলের আশা কম—সুতরাং সেরূপ জায়গায় টম্যাটোর চারা বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ঐ গাছগুলো কম রৌদ্রেও মোটামুটি ফল দিতে পারে। কার্ত্তিকের মধ্যে চারা না পুঁতলে টম্যাটো গাছ ভাল হয় না—ফলও ভাল দেয় না। যাঁদের জায়গার অভাব তাঁরা টবেও টম্যাটোর চারা বসিয়ে ফল পেতে পারেন। গত বৎসর আমার বাসায় ২ ফুট লম্বা ও ১ ফুট ব্যাসযুক্ত একটি টিনে (ড্রামে) বসানো একটি টম্যাটো গাছ থেকে অনেক ফল পেয়েছি। টম্যাটো লতাগুলি ঠেকনা দিয়ে খাড়া করে রাখা দরকার। ছায়াতে উৎপন্ন লতানো গাছের টম্যাটো অপেক্ষা খাড়া গাছের ও রৌদ্রবহুল জায়গার টম্যাটোতে ভিটামিন 'সি' বেশী থাকে। ভিটামিন 'সি' এবং 'এ'-র আধার হিসাবে টম্যাটো বড় উপকারী ফল। অবশ্য বিবিধ লবণ পদার্থ ও শর্করাও টম্যাটোতে বেশ পাওয়া যায়। ভিটামিন 'সি' দাঁত ভাল রাখে, রক্ত পরিষ্কার করে ও কাজের স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি করে, ভিটামিন 'এ' চোখের পক্ষে উপকারী, সুতরাং শীতকালে সকলেরই, বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের রোজই টম্যাটো খেতে দেওয়া ভাল। পালং শাকেও ভিটামিন 'সি' এবং ক্যারোটিন থাকে এই ক্যারোটিন থেকেই মানুষের শরীরের মধ্যে ভিটামিন 'এ' জন্মে। তদ্ভিন্ন পালং শাকে লবণ পদার্থ অনেকটা পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে স্যাপোনিন (saponin) নামে যে পদার্থটি থাকে তাতে কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে। সুতরাং প্রত্যহ কিছু কিছু শাক খাওয়া সকলের পক্ষেই দরকার। বিশেষতঃ মাছের তেল সহযোগে ঘণ্ট করলে পালং শাকে খুবই উপকার হয়। কারণ ক্যারোটিন তেলে দ্রবীভূত হয়েই শরীরে প্রবেশ করে। যাঁদের জায়গা নিতান্তই অল্প তাঁরা ফুলকপির সারির মাঝে মাঝে যে ফাঁকা জায়গা থাকে তাতে পালঙের বীজ বুনে দিতে পারেন। কপিতে ফুল ধরার আগেই শাক খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। পালং উঠে গেলে জায়গাটি ভাল করে খুঁড়ে মাটি দুধারে ফুলকপির গাছের গোড়ায় দেওয়া যেতে পারে। পালং বীজগুলি শক্ত আবরণের মধ্যে থাকায় বীজ বুনার আগে এক দিন ভিজিয়ে রেখে দিলে তাড়াতাড়ি অঙ্কুর বার হয়। বাগানে চড়ুই পাখীর উপদ্রব থাকলে কয়েক দিন নারিকেলের পাতা বা অন্য কিছু দিয়ে পালঙের চারাগুলি ঢেকে রাখা দরকার—নতুবা পাখীতে খেয়ে ফেলে। পালংও আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করে কার্ত্তিকের মাঝামাঝি বুনলে ভাল শাক হয়। মাটি খুব সারালো হলে অগ্রহায়ণ মাসে বুনেও শাক ভালই পাওয়া যেতে পারে—অন্যথা গাছগুলোতে তাড়াতাড়ি ফুল ধরে যায়। এর পরে আসে মূলোর চাষের কথা। মূলোর বীজও পালঙের মত আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কার্ত্তিকের মধ্যে বুনলে ফসল ভাল হয়। মূলোর চাষে মাটি খুব ধুলো ধুলো হওয়া ভাল। চার-পাঁচ পাতা হলেই দুর্ব্বল চারাগুলি তুলে শাক খাওয়া উচিত। ফাঁকা জায়গা খুঁড়ে দিলে অপর মূলোগুলি বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। মূলোর ক্ষেতে কপিক্ষেতের মত বেশী জল দেওয়ার দরকার হয় না।

বীট ও গাজরের চারাও তৈরি মাটিতে কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই বসানো ভাল। বেশী দেরি হলে শীতের মধ্যে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় না, কাজেই ফলনও সন্তোষজনক হয় না। শাক-সব্জী যখন শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় তখন যাঁদের জায়গা প্রায় নাই তাঁরা উঠানে বা ছাদে মাটি ফেলে—তিন-চার ইঞ্চি গভীর মাটি হলেই চলে—পেঁয়াজ লাগিয়ে দিতে পারেন। পেঁয়াজপাতা শীঘ্র শীঘ্র পাওয়া যায়। অন্য শাকের সঙ্গে মিলিয়ে ভেজে খেলে বেশ মুখরোচকও বটে। তারপর পেঁয়াজ-কলিও খুব উপাদেয়। কলকাতার পাশে যাঁদের বাড়ী বা বাসা তাঁরা বীজ-পেঁয়াজ কিনতে গেলে দেখবেন সের পিছু

দশ বার আনা দাম চাইবে কিন্তু যদি আশ্বিনের মাঝামাঝি বা কার্ত্তিকে বাজারের পচা পেঁয়াজের দোকানে যান তবে চার-পাঁচ আনা বা ছ-তিন আনা সেরেই পাবেন। যদি শক্ত ও মাঝারি সাইজের এই পচা পেঁয়াজ এনে বসানো হয় তবে শতকরা দশটি পেঁয়াজ পচে গেলেও এতে পুষিয়ে যায়। মাটি সরস থাকলে পেঁয়াজ-ক্ষেতে, বিশেষতঃ চারা বার হবার সময় কদাচ জল দিবেন না। গত বৎসর তিন হাত চওড়া পাঁচ হাত লম্বা একটি জায়গায় বাজারের দুই সের পচা পেঁয়াজ চার আনা সের দরে বসিয়ে আমি বহু দিন পেঁয়াজপাতা এবং অনেক পেঁয়াজকলি পেয়েছি—শেষে পেঁয়াজও পাঁচ-ছয় সের হয়েছিল। অবশ্য ঐ জায়গায় পূর্ব্ব বৎসর গোবরের সার দেওয়া ছিল এবং গাছগুলো বড় হয়ে উঠলে যখনই ক্ষেত শুকিয়ে গেছে কিছু কিছু জল দেওয়া হ'ত। বেশী জায়গা না থাকলে বীজ থেকে চারা করে পেঁয়াজের চাষের আয়োজন না করাই উচিত।

ওলকপির চাষ সবচেয়ে সোজা। জমিতে সামান্য সার থাকলেই বেশ ওলকপি জন্মে। আশ্বিনের শেষ সপ্তাহ থেকে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ওলকপির চারা বসান ভাল। কারণ শীতের মধ্যে যে ওলকপি পাওয়া যায় তার স্বাদ ভাল হয়। ফুলকপি উঠে গেলে অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসেও ওলকপির চারা বসিয়ে ওলকপি পাওয়া যায়। এমন কি বৈশাখ পর্য্যন্তও আমার বাগানের ওলকপি খেয়েছি। গরম পড়ে গেলে ওলকপির স্বাদ ভাল হয় না তবে পেঁয়াজ সহযোগে কুচি করে কাটা ওলকপি ভেজে খেতে বেশ ভাল লাগে।

ফুলকপি উঠে গেলে সেই ক্ষেতে ওলকপি ভিন্ন বৈশাখী বেগুনের চারাও বসানো যেতে পারে। লেট ফুলকপি উঠে গেলে সেই জায়গায় ঢেঁড়স বসালে ফাল্গুনের শেষ বা চৈত্র মাস থেকেই ঢেঁড়স পাওয়া যায়।

ঘাতক ও পালক

শ্রীমহাদেব রায়

তীক্ষ্ণ-তরবারি-করে নর-রুধিরের
পিপাসা উল্লাসে, দম্ভে করিয়া প্রকাশ,
দলে-দলে মত্ততায় আশায় কিসের
ছুটিল ঘাতক-কুল দানবের দাস ?
দুগ্ধ-পোষ্য—জননীর স্নেহের আধার
ক্ষীরাধারে লগ্ন-মুখ উঠে চমকিয়া,
ক্ষীর-ধারা বহিবে কি, বহে রক্ত-ধার—
খড়্গাঘাতে তৃপ্ত তব পিশাচের হিয়া।
মর্ম্মদাহী উরঃ-ক্ষত যাতনা ভুলিয়া,
কাতরে কাঁদিল মাতা—লহ প্রাণ মোর
লহ বিত্ত, এ কুসুমে নিও না ছিঁড়িয়া,
করিলে না কর্ণপাত নির্ম্মম কঠোর।
অগ্নি-কুণ্ডে দিয়া স্নেহ-পুত্তলিরে বলি,
আহত মাতার বক্ষে পুনঃ খড়্গ হানি,
গৃহে-গৃহে বিচরিলে শত প্রাণ দলি ;—
এ হিংস্র নির্দ্দেশ কোথা কে দিল না জানি।
অভিনব হত্যালীলা মহানগরীর
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি' করে শ্বাস-যন্ত্র-রোধ,
বিলুণ্ঠনে, অগ্নিদাহে স্বগৃহ-বাসীর
অকাতরে সর্বনাশ সাধিলে নির্বোধ।
রাজ-রক্ষী সন্নিকটে দাঁড়াইয়া হাসে।
এ লীলার অন্তরালে রক্ষক ভক্ষক,
মিথ্যা রক্ষণের ছল। ভক্ষণের আশে
পুচ্ছ-বাসে গর্ত্তকোষে লুকায়ে তক্ষক।

ইন্ধন যোগালো যারা হিংসার বহ্নিতে,
রচিতে নিষ্ঠুর হস্তে এ মহাশ্মশান,
উন্মাদের রাষ্ট্র অপকৌশলে রচিতে,
লোভ-হত বিজ্ঞতার ভানে হত-জ্ঞান,
আজও কি প্রত্যক্ষ নাহি করে—মেলি আঁখি,
চালক-পালক পোষ্য শাসিত-কুলের ?
সাধিতে আপন ধ্বংস আর কত বাকি
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম রচি' অহি-নকুলের ?
করিবে কে পরিমাণ এ সর্বনাশের ?
অগ্নি-গর্ভে অমূল্য সম্পদ্ রাশি-রাশি
হইয়াছে ভস্ম-শেষ—মহাতরঙ্গের
গর্ভে লুপ্ত কত প্রাণ, কত যায় ভাসি।
রাজপথ শব-শয্যা—যেন প্রেতপুরী
নামিল অবনীতলে ধরি রুক্ষ বেশ ;
লুণ্ঠনের সঞ্চয় করিয়া ভূরিভূরি
হইবে রচনা কোথা সুবর্ণের দেশ ?
কাঁদিছে সোদর কত আশ্রয়-আশায়,
'খোদা'-'ভগবান' ডাক শোন পাশাপাশি,
মাতৃজাতি পীড়নের তীব্র বেদনায়
গোপনে খসিছে বিসর্জ্জিয়া অশ্রুরাশি।
সমাপ্তি কোথা এ ঘৃণ্য মহাপাতকের ?
হে ঘাতক! এ নাটের গুরুদের আয়ো
কি লীলা দেখিবে বিশ্ব ? বিশ্ব-পালকের
এখনও নির্দ্দেশ শুনি' শোনাতে কি পারো ?

শ্রীশ্রীদুর্গা

(দ্বিতীয় প্রকরণ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

অনেক পুরাণে দুর্গার স্তবে, দুর্গা কে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত আছে। যে শক্তি বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, পরমাণু হইতে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড,—যাহার আদি নাই, যাহার অন্ত নাই, যাহার মধ্য নাই, যাহা চিন্তার অতীত, যেখানে দিক নাই, কাল নাই, তাহা যে শক্তির প্রকাশ, তিনিই দুর্গা। শক্তি ব্যতিরেকে কর্ম্ম হয় না। এই যে বিশ্ব সৃষ্টি, তৃণ জন্মিতেছে, বাতাস বহিতেছে, সূর্য তাপ দিতেছে, রাত্রে চন্দ্র উঠিতেছে, তারা দীপ্তি পাইতেছে, শক্তি ব্যতীত সম্ভবিতে পারে না। তিনি আমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্নেহ, দয়া, বুদ্ধি, মেধা ও প্রজ্ঞারূপে প্রকাশিত হইতেছেন। কত কাল হইতে এই ভাবনা (conception) আমাদের পূর্বপিতামহ আর্যগণের চিত্তে উদিত হইয়াছিল?

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে ১২০-এর সূক্ত দেবী-সূক্ত নামে খ্যাত (সূক্ত, স্তোত্র)। ইহাতে আটটি ঋক্ (মন্ত্র) আছে। রমেশ দত্তের বঙ্গানুবাদ হইতে কিছু কিছু উদ্ধার করিতেছি।

১। আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যাদিগের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি।

৪। যিনি দর্শন করেন, প্রাণ ধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন, অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমারই সহায়তাতে সেই সকল কার্য্য করেন।

৭। আমি পিতা আকাশকে প্রসব করিয়াছি, সেই আকাশ এই জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহ দ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি।

৮। আমিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ হইয়াছে যে দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে।

রুদ্র, বসু, আদিত্য, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা প্রকৃতির এক এক শক্তির নাম। তিনিই তাবৎ শক্তিকে ধারণ করিয়া আছেন। তিনিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হইতেছেন। তিনি সলিলময় আকাশ-সমুদ্রে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ইত্যাদি। তিনিই দুর্গা নামে অভিহিত হইয়াছেন।

এই সূক্তের বক্তা কে? নিশ্চয় তিনি দুর্গা। ঋগ্‌বেদে তাঁহাকে বাক্ বলা হইয়াছে। অবশ্য কোন ঋষি প্রজ্ঞা-রূপা বাক্‌দেবীর দ্বারা আবিষ্ট হইয়া এই মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

দুর্গা ভাবনার মূল পাইলাম। কতকাল পূর্বে এই মূলের উৎপত্তি? ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের অন্যান্য সূক্ত পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, বৈদিক কৃষ্টির অন্তিম কালে এই সূক্ত অনুভূত হইয়াছিল। সে কাল খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৫০০ হইতে ২৫০০ অব্দ। খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৫০০ অব্দ যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদের কাল। ঋগ্‌বেদ হইতে এই তিন বেদ উদ্ভূত হইয়াছে। এই সব কাল-নির্ণয়ে পশ্চিমমুখী পাঠকেরা বিস্মিত হইতে পারেন। যখন তাঁহারা মহিষাসুর-বধ বৃত্তান্ত শুনিবেন, তখন আরও বিস্মিত হইবেন।

এই সূক্তই যে দেবীপূজার মূল, তাহার প্রমাণ দিতেছি। (১) মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্যে আছে, রাজা সুরথ চণ্ডীপূজার সময় দেবীসূক্ত জপ করিতেন। তদ্দ্বারা তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। (২) মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীমাহাত্ম্য দেবীসূক্তের বিস্তার। বেদ-পাঠে ও শ্রবণে যাহাদের অধিকার ছিল না, তাহাদের শ্রবণনিমিত্ত পুরাণকার দেবীসূক্তের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতীতির নিমিত্ত অসুরগণের সহিত দেবীর যুদ্ধ ও অসুর-পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইন্দ্র দেবগণের রাজা। দেবগণকে লইয়া ইন্দ্র মহিষাসুরকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর হইতে তেজঃ নির্গত হইল। সকল তেজঃ মিলিত হইয়া জ্বলনশীল পর্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। পরে সেই তেজোরাশি এক নারীরূপে আবির্ভূত হইল। তিনিই মহিষাসুর বধ করেন। এইজন্য তাঁহার নাম মহিষমর্দিনী। তিনি সকল দেবের সম্মিলিত শক্তি, বিশ্বশক্তি। এই কারণে দুর্গাপূজায় চণ্ডীপাঠ অবশ্যকর্তব্য হইয়াছে। (৩) পঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে ও তামিল দেশে দুর্গাপূজা হয় না, সে সময়ে সরস্বতী পূজা হয়। আমরা বঙ্গদেশে যেমন শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীর পূজা করি, সে সে দেশের বিদ্যার্থীরা আশ্বিন শুক্ল সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে সরস্বতীর পূজা করে। অতএব দেবীসূক্তের বাক্ দুর্গারই নামান্তর।

কার এই শক্তি? কেন-উপনিষদ নামে একখানি উপনিষদ আছে।

তাহার প্রথমে 'কেন' শব্দ আছে। এই হেতু সেই উপনিষদের নাম কেন-উপনিষদ। এই উপনিষদে উক্ত প্রশ্নের বিস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে।

কে মনকে নিজ বিষয়ের প্রতিগমন করায়, কে প্রাণকে নিজ বিষয়ের প্রতিগমন করায়? কার ইচ্ছাতে লোকে এই সকল বাক্য উচ্চারণ করে? কোন্ দেবই বা চক্ষু ও কর্ণকে নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন? তিনি (ব্রহ্ম) চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, মনেরও গম্য নহেন।

একদা দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণ জয়ী হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, এই বিজয় তাঁহাদেরই। তিনি জানিতে পারিলেন, তাহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। কিন্তু এই মহদ্ভূত কে, ইহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না।

তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন, "হে সর্বজ্ঞ, এই মহদ্ভূত কে, তুমি জানিয়া আইস।" অগ্নি তাঁহার নিকটে গমন করিলেন, তিনি জিজ্ঞাসিলেন,

"তুমি কে? তোমাতে কি শক্তি আছে?"

"আমি অগ্নি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমুদয় দগ্ধ করিতে পারি।"

"ইহা দগ্ধ কর," এই বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিলেন।

অগ্নি সমুদয় বল প্রয়োগ করিয়াও দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া আসিলেন। দেবতারা বায়ুকে পাঠাইলেন।

"তুমি কে?"

"আমি বায়ু, মাতরিশ্বা (আমি আকাশে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করি।" অর্থাৎ আমি বহমান বায়ু।)

"তোমার কি শক্তি আছে?"

"পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আমি তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে পারি।"

"এই তৃণটি গ্রহণ কর।"

বায়ু সমুদয় বল প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া আসিলেন। দেবতারা ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্র গিয়া দেখিলেন সেই আকাশে স্ত্রীরূপিণী অতিসৌন্দর্যশালিনী হৈমবতী উমা আবির্ভূতা। ইন্দ্র তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ইনি কে?"

"ইনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বিজয়েই তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছ।"

ইন্দ্রাদি দেবতা যাঁহাকে জানিতে পারিলেন না, তাঁহাকে কিরূপে উমা জানিলেন? উমা কে? তিনি হিমালয়ের কন্যাই হউন, আর যিনিই হউন, তিনি নিশ্চয় ব্রহ্মস্বরূপিণী, নচেৎ ব্রহ্মকে জানিতে পারিতেন না। তিনি ব্রহ্মের শক্তি। সে শক্তি আদ্যাপ্রকৃতি, আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তি ইন্দ্রকে ব্রহ্ম দেখাইয়াছিলেন। অতএব আদ্যাশক্তির উপাসনা ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। তন্ত্রশাস্ত্রেও এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম প্রকৃতির দ্বারাই অভিব্যক্ত হন। প্রকৃতি-ব্যাপার ব্যতীত নিরাকার গুণাতীত ব্রহ্মকে বুঝিবার আর কি উপায় আছে।

আদ্যা প্রকৃতির নামই দুর্গা। শক্তি নিরাকার, কর্ম-দ্বারা শক্তি অভিব্যক্ত হয়। আমাদের জ্ঞানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই কর্ম। অতএব দুর্গা বিশ্বরূপা। জড় ও শক্তি একই পদার্থ, ইহা আধুনিক ভূতবিদ্যাবেত্তা পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কল্পনাদ্বারা অগ্নি ও ইহার দাহিকা-শক্তি পৃথক্ ভাবিতে পারি। কিন্তু বস্তুতঃ পৃথক্ করিতে পারি না।

ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ অগ্নিকে যাবতীয় শক্তির প্রতিনিধি করিয়াছিলেন। অগ্নির এক প্রসিদ্ধ বৈদিক নাম জাতবেদা, যাহা কিছু জন্মিয়াছে, যাহা কিছু হইয়াছে, তিনি সব জানেন। বিশ্ববিৎ, তাঁহার আর এক বৈদিক নাম। তিনি বিশ্ববেত্তা। তিনি কেমন করিয়া জানেন? কারণ তিনি সকল পদার্থেই আছেন। ঋগ্‌বেদে ঋষিগণ বৃষ্টির নিমিত্ত ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন। বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র! তুমি এই যজ্ঞে উপস্থিত হও, আর আমাদের প্রদত্ত হব্য-কব্য গ্রহণ কর। এই সোমরস পান কর।" এই বলিয়া তাঁহারা অগ্নিতে সে সে দ্রব্য অর্পণ করিতেন। কারণ ইন্দ্র এক শক্তি, অগ্নি ইন্দ্রশক্তির প্রতিনিধি। অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে যাহা অর্পিত হয় তাহা ইন্দ্র পাইয়া থাকেন।

ঋগ্‌বেদ হইতে (রমেশ দত্তের বঙ্গানুবাদ) অগ্নির গুণ ও যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় তুলিতেছি।

অগ্নি সমস্ত ভুবন পর্যবেক্ষণ করেন। (১০।১৮৭।৪)। হে অগ্নি! কর্ম তোমা হইতে উৎপন্ন হয়। স্তুতি সমুদয় তোমা হইতে উৎপন্ন হয়। (৪।১১।৩)। হে অগ্নি! তুমি শক্তি-পুত্র, যুবা, যবিষ্ঠ (অতিশয় যুবা) জ্ঞান-সম্পন্ন। (৬।৫।১)। হে জাতবেদা! তুমি মহত্ত্ব দ্বারা দেবগণকে শত্রু হইতে মুক্ত করিয়াছ। (৭।১৩।২)। হে অগ্নি! যেহেতু তুমি প্রভু, অতএব সংগ্রামে তোমাকে আহ্বান করিতেছি। (৮।৪৩।২১)। অগ্নির মাহাত্ম্য মহৎ আকাশ হইতেও অধিক। (১।৫৯।৫)। হে অগ্নি! তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি কর ও বহু প্রকার বুদ্ধিতে অবস্থিতি কর। তুমি বরুণ, তুমি শত্রু-বিনাশক মিত্র, তুমি আকাশের অসুর রুদ্র, (২।১।৩...৭)। তুমি মরুৎগণের বলস্বরূপ। হে অগ্নি! তোমাতে সমস্ত দেব-

গণ অবস্থিতি করেন। (৫।৩।১)। তুমি অমিত তেজোবলে অপরিমিত অয়োনির্মিত নগরীর দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। সেই জাতবেদা নিজ মহত্ত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন। অগ্নি মনুষ্য ও দেবগণের নিয়ামক, সত্য-কারী সনাতন সর্বজ্ঞ। হে শক্তি-পুত্র! তুমি আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর, আমাদের রিপুগণকে জয় কর। (৬।৪।৪)। অগ্নি ভ্রাতা। (৮।৪৩।১৬)। তিনি পিতৃমাতৃ স্থানীয়। (৬।১।৫)। তিনি স্বস্তি দ্বারা আমাদিগকে পালন করেন। (৭।১১।৫)। ইত্যাদি

এইরূপ অগ্নি-স্তুতি অনেক আছে। অগ্নি শক্তি-পুত্র বা বলের পুত্র। মূলে আছে, 'সহসো সূনুং।' 'সহসো বলস্য সূনুং পুত্রম্'। সায়ন বুঝিয়াছেন, যেহেতু মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে হয়, সেই হেতু এই নাম। (৬।৫।১)। এই ব্যাখ্যা ঠিক মনে হয় না। কারণ বালকেও অরণির দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে। "শক্তির পুত্র", ইহার অর্থ শক্তিমান্। যেমন, মিত্র বরুণকে মহান্ বলের পৌত্র ও বেগের পুত্র বলা হইয়াছে। (৮।২৫।৫)। এই সকল সূক্তে অগ্নির যে যে গুণ ও কর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে, সে সে গুণ ও কর্ম্ম সংক্ষেপে দেবীসূক্তেও হইয়াছে, পুরাণোক্ত দুর্গার স্তোত্রে সবিস্তারে হইয়াছে। অতএব দুর্গাতে যে শক্তি, অগ্নিতেও সেই শক্তি অন্তর্ভূত হইয়াছিল। অগ্নি তেজোময় (তেজঃ—radiant energy)। দুর্গা যাবতীয় দেবতার সম্মিলিত তেজঃ। ঋষিগণ যজ্ঞীয় অগ্নিতে সম্মিলিত তেজঃ অনুভব করিয়াছিলেন। ঋগ্ বেদে পার্থিব অগ্নিরও বর্ণনা আছে। কাষ্ঠাগ্নি, বাড়বাগ্নি, পাষাণাগ্নি, বিদ্যুদগ্নি, সূর্য্যাগ্নি, সকল অগ্নিরই দাহিকা শক্তি আছে। সকল অগ্নি মূলতঃ এক। কিন্তু যজ্ঞীয় অগ্নির পৃথক্ ভাবনা হইয়াছিল।

নারায়ণ উপনিষদ্ নামে এক উপনিষদ্ আছে। তাহাতে আছে,

> তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
> বৈরোচনীয়ং কর্ম্ম ফলেষু জুষ্টাম্
> দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
> সুতরসি তরসে নমঃ ॥

যিনি অগ্নিবর্ণা, স্বীয় তাপ দ্বারা জ্বলন্তী, যিনি স্ব-প্রকাশা, যিনি কর্মফলের নিমিত্ত উপাসিতা, সে দুর্গাদেবীর শরণ লইতেছি। সেই সংসার তরণের হেতু তারিণীকে নমস্কার।

বেদের ঋষিগণ যজ্ঞীয় অগ্নিকে বিশ্বশক্তির প্রতিনিধি ভাবিয়াছিলেন এবং সেই হেতু অগ্নিকে ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, রুদ্র, মরুৎ ইত্যাদি দেব বলিয়াছিলেন। কারণ এক এক দেব বিশ্বশক্তির অংশাংশ মাত্র। নারায়ণ উপনিষদ্ সে শক্তিকে দুর্গা বলিয়াছেন। (এই উপনিষদ্ তত পুরাতন বোধ হয় না। পুরাতন নাই হউক, বেদোক্ত বর্ণনা হইতে এই মন্ত্রের ভাব গৃহীত হইয়াছে।)

যদি দুর্গার পূজা করিতে হয়, কোন্ দেবের যজ্ঞাগ্নির পূজা করিব? ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেব কেহই ঈশ্বর নাম পান নাই। কেবল রুদ্র, মহেশ্বর, মহাদেব এই এই নাম পাইয়াছিলেন। অতএব রুদ্র যজ্ঞাগ্নিকে দুর্গা রূপে পূজা করিতে পারি। ঋগ্ বেদে রুদ্র, মহেশ্বর রূপে পূজিত না হইলেও তিনি শিব. (মঙ্গলময়) বিবেচিত হইয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর, ভুবনেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর, রামেশ্বর ইত্যাদি মহাদেবের নামে ঈশ্বর আছে, অত আর কোন দেবের নামে নাই। মহেশ্বরের যজ্ঞাগ্নি, মহেশ্বরের শক্তি বা মহেশ্বরী এই অগ্নি রুদ্রের রুদ্রাণী। ইন্দ্রাগ্নি ইন্দ্রশক্তি, ইন্দ্রাণী। বরুণাগ্নি বরুণ-শক্তি বরুণানী, বিষ্ণু-শক্তি বৈষ্ণবী। মহেশ্বর ও মহেশ্বরী রুদ্র ও রুদ্রাণী ইত্যাদি নাম হইতে দুই পৃথক্ মনে হইতে পারে, কিন্তু পৃথক্ ভাব কাল্পনিক, বাস্তবিক নয়। অতএব রুদ্রের যে গুণ ও কর্ম্ম রুদ্রাণীরও তাই। দেব ও তাঁহার অগ্নিকে পতি পত্নী কিম্বা ভ্রাতা ভগিনী, দুইই কল্পনা করা যাইতে পারে। এক উদ্দেশ্যে দেবের স্তুতি ও অগ্নির সাহায্য আবশ্যক হয়। এই হেতু রুদ্রাগ্নিকে রুদ্রের ভগিনী বলিতে পারা যায়। যজুর্বেদে ইহাই আছে।

কোন্ ঋতুতে রুদ্র-যজ্ঞ হইত, ঋগ্ বেদে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কোন দেবতারই নাই। কয়েকটি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় শরৎ ঋতুর আরম্ভে রুদ্র-যজ্ঞ হইত। ইহার বিশেষ প্রমাণ যজুর্বেদে আছে। সেখানে রুদ্রাণী অম্বিকা নামে উক্ত হইয়াছেন। এক স্থানে শরৎ ঋতু অম্বিকারূপে বর্ণিত হইয়াছে।

যজুর্বেদের কাল নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। জিজ্ঞাসু পাঠক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত "বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়" প্রবন্ধাবলীর "যজুর্বেদের কাল" পড়িতে পারেন। সেকাল খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৫০০ অব্দ। অথর্ব বেদেরও সেই কাল।

শরৎ ঋতু কোন্‌টি। আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ ঋতু চিরকাল ছিল না। যে মাসে অশ্বিনী নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয়, সে মাস আশ্বিন মাস, যে মাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয়, সে মাস কার্ত্তিক। চন্দ্র ও নক্ষত্র যুক্ত করিয়া আশ্বিনাদি মাসের নাম হইয়াছে। কিন্তু সূর্য ঋতু বিধান করেন, চন্দ্র করেন না। কোন নক্ষত্র হইতে যাত্রা করিয়া সে নক্ষত্রে পুনরাগত হইলে সূর্যের এক বৎসর হয়। বৎসরে দুই অয়ন, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে তিন ঋতু, শিশির (শীত), বসন্ত, গ্রীষ্ম। দক্ষিণায়নে তিন ঋতু, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত। দুই মাসে এক ঋতু। অতএব বর্ষা ঋতু গতে অর্থাৎ

দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইতে দুই মাস গতে শরৎ ঋতুর প্রথম মাস। বেদের কালে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতে বৎসর ধরা হইত। আমাদের কোন কোন ধর্ম-কৃত্যে সে বৎসর ধরিতে হয়। ঋগ্‌বেদের আদ্যকালে এই গণনা ছিল। হিম (শীত) ঋতু হইতে আরম্ভ বলিয়া ঋষিগণ বৎসরকে 'হিম' বলিতেন। তাঁহারা দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন আমরা শতহিম জীবিত থাকি। পরে, বোধ হয় রুদ্র-যজ্ঞ কাল হেতু শরৎ-ঋতু হইতে আর এক বৎসর আরম্ভ করিতেন। সে বৎসরের নাম শরৎ ছিল। ঋষিগণ দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন, আমরা যেন শত শরৎ জীবিত থাকি। সংস্কৃত ভাষায় শরৎ শব্দের এক অর্থ বৎসর হইয়া গিয়াছে। যথা, অমরকোষে, সম্বৎসরো বৎসরোঽব্দো হায়নোঽস্ত্রী শরৎসমাঃ। অতএব শারদীয় উৎসব কেবল দুর্গোৎসব নহে, নববর্ষ প্রবেশের উৎসবও বটে। এই কারণে দুর্গোৎসবের মাহাত্ম্য বাড়িয়া গিয়াছে।

কোন নক্ষত্র হইতে সে নক্ষত্রে সূর্যের পুনরাগমন কাল এক বৎসর; অতএব ইহা নাক্ষত্রিক বৎসর। পূর্বকালে ৩৬৬ দিনে এক নাক্ষত্রিক বৎসর ধরা হইত। অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা, কিম্বা পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা এক চান্দ্র মাস। দ্বাদশ চান্দ্র মাসে ৩৬০ তিথি, কিন্তু ৩৫৪ দিন। অতএব দ্বাদশ চন্দ্র দ্বারা বৎসর পূর্ণ করিতে হইলে আরও (৩৬৬-৩৫৪) ১২ দিন আবশ্যক হয়। ১২ দিন ১২ তিথি। মাসে মাসে এক তিথি বৃদ্ধি ধরিয়া বার মাসে বার তিথি। বৈদিক পাঁজিতে এই গণনা ছিল।

কবে শরৎ ঋতুর আরম্ভ, এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। হিম-বৎসরের আট চান্দ্র মাস গতে অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে শরৎ ঋতুর আরম্ভ। এই কারণে দুর্গাপূজায় সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য হইয়াছে।

কোন্ দিন উত্তরায়ণ আরম্ভ? দিক্‌চক্রে সূর্যোদয় কিম্বা সূর্যাস্ত স্থান দেখিয়া বলিতে পারা যায়, কিন্তু যজ্ঞাদি ধর্মকৃত্যের আয়োজন আছে পূর্বে না জানিলে যথাদিবসে কর্ম নির্বাহ হইতে পারে না। যে নক্ষত্রে আসিলে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, এই কারণে সে নক্ষত্র জানা আবশ্যক হইয়াছিল। দৈবক্রমে চিরদিন একই নক্ষত্রে উত্তরায়ণাদি (উত্তরায়ণ আরম্ভ) হয় না। ৯৭০ বৎসর পূর্বে যে নক্ষত্রে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, এখন সে নক্ষত্রে হয় না, পশ্চিম দিকের নক্ষত্রে হইতেছে। অর্থাৎ উত্তরায়ণাদি পিছাইয়া আসিতেছে। নক্ষত্র স্থির; অয়নাদি শনৈঃ শনৈঃ পশ্চিম-গামী হইতেছে। বর্ষ-চক্র বিষ্ণু-চক্র। দুই অয়নাদি ও দুই বিষুব, এই চারি স্থান চারি বিষ্ণুপদ। একটির যে পরিমাণ পশ্চাৎ গমন হয়, অপর তিনটিরও সেই পরিমাণ হয়। নক্ষত্র স্থির আছে, সুতরাং মাস ও বর্ষচক্রের যথা-স্থানে আছে। ঋতু পিছাইতেছে। শতাধিক দুই সহস্র বৎসরে এক মাস পিছায়। আমরা সবাই জানি অধুনা ৭ই আশ্বিন শারদ বিষুব হয়। ষোল শত বৎসর পূর্বে ৩০শে আশ্বিন হইত। বস্তুতঃ সৌরমাস গণনায় এখন ৭ই ভাদ্রে শরৎ ঋতুর আরম্ভ হইতেছে। বিষ্ণু পদের পশ্চাৎ গতি আছে বলিয়াই বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয় সম্ভবপর হইয়াছে।

পরে দেখা যাইবে কালপুরুষ নক্ষত্র রুদ্রের প্রতিমা। কালপুরুষ নাম বাঙ্গলা, সংস্কৃত নাম মৃগ নক্ষত্র। কত শত বৎসর পূর্বে শরৎ ঋতুর আরম্ভে সন্ধ্যার পর এই নক্ষত্রের উদয় হইত? এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা যায়। আমরা অগ্রহায়ণ মাস জানি। ভারতের তাবৎ স্থানে এই মাসের নাম মার্গশীর্ষ বা মার্গ। যে মাসে মৃগ নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয়, সে মাসের নাম মার্গশীর্ষ বা মার্গ। ঋগ্‌বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৪ সূক্তে সোম ও রুদ্র একসঙ্গে আহূত হইয়াছেন। ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, "তোমাদের যজ্ঞ ব্যাপ্ত হউক।" এখানে সোম অর্থে চন্দ্র, সম্ভবতঃ পূর্ণচন্দ্র, অর্থাৎ মৃগ নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইলে রুদ্রযজ্ঞ হইত। যজুর্বেদের কালে (খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দে) পূর্বলিখিত নির্বচন অনুসারে কার্তিক মাস শরৎ ঋতুর প্রথম মাস ছিল। ইহার ২০০০ বৎসর অর্থাৎ খ্রী-পূ ৪৫০০ অব্দ হইতে অগ্রহায়ণ মাস শরৎ বৎসরের প্রথম মাস হইয়াছিল। এই কথাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্", আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ, অর্থাৎ বৎসরের প্রথম মাস। অগ্রহায়ণ নামের অর্থও তাই। হায়ণ বৎসর, বৎসরের অগ্র, প্রথম মাস। পরে দেখা যাইবে, যজুর্বেদের কালে ও তাহারও পূর্বে শরৎ ঋতুর আরম্ভে মধ্য রাত্রে দেবীর সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল।

দুর্গা কে? ইহার ত্রিবিধ উত্তর পাইয়াছি। আধ্যাত্মিক অর্থে দুর্গা বিশ্বরূপা মহাশক্তি। পঞ্চভূতের মধ্যে দুর্গা অগ্নি-রূপা। ইহা আধিভৌতিক অর্থ। দুর্গা রুদ্রদেবের শক্তি। ইহা আধিদৈবিক অর্থ। রুদ্রদেবের শক্তি, রুদ্র যজ্ঞীয়াগ্নি। সে অগ্নি নানা রূপে খ্রী-পূ ৪৫০০ অব্দ হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের সাম্প্রতিক নির্বাচন-পর্ব

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বর্ত্তমান বৎসরের পাঁচই নভেম্বর তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় শহর এবং পল্লী অঞ্চলের ভোটদাতাগণ কর্ত্তৃক এক সাধারণ নির্ব্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সভ্যমণ্ডলী নির্ব্বাচিত হইবেন। শাসন-পরিষদের এই সকল সদস্য আগামী কয়েক বৎসর দেশের রাজনীতিক আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ, বহুল পরিমাণে ইহার আর্থিক উন্নয়ন, এবং বৈদেশিক সম্পর্ককে দৃঢ়ীকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে লিপ্ত থাকিবেন।
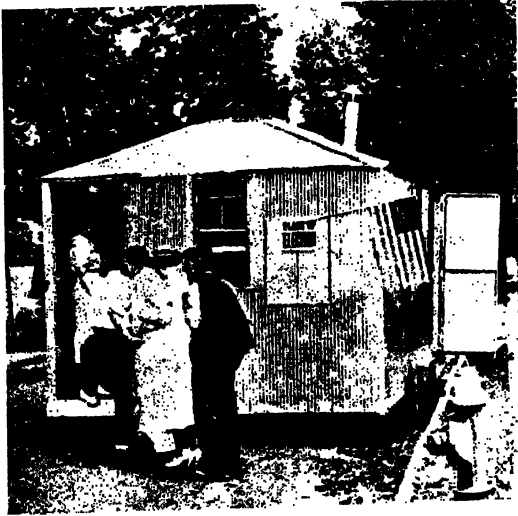
মার্কিন ভোট-দাতাগণ নির্ব্বাচন দিবসে ভোট দিবার জন্য লাইন করিয়া দাঁড়াইয়াছে

প্রত্যেক দুই বৎসর পরে একবার (যুগ্মসংখ্যক বৎসরে) যুক্তরাষ্ট্রের আটচল্লিশটি ষ্টেট হইতে কংগ্রেসী সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসরেই প্রতিনিধি-পরিষদের (House of Representatives) মোট ৪৩৫ জন সদস্য গণ-ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। সিনেটের মেয়াদ অবশ্য প্রতি-বারে ছয় বৎসর, কিন্তু ইহা এরূপ ভাবে গঠিত যে, প্রতি দুই বৎসরে ইহার ৯৬টি আসনের এক তৃতীয়াংশ খালি হইয়া যায় এবং প্রত্যেক দ্বি-বার্ষিক নির্ব্বাচনে উক্ত শূন্য আসন পূর্ণ করিতে হয়।

কংগ্রেসী সদস্য, সিনেটর, প্রতিনিধিবর্গ এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে পদগত মর্য্যাদা এবং স্ব-স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকার কাল ইত্যাদি সংক্রান্ত বৈষম্যের দরুন গবর্ণমেন্টের শাসন-পরিষদ ও ব্যবস্থা-পরিষদ এই দুইটি বিভাগের মধ্যে কখনো কখনো রাজ-নৈতিক বিভেদ সৃষ্টি হইতে পারে। কোনো প্রেসিডেন্টের আমলে যদি অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে নির্ব্বাচন-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয় (যেমন বর্ত্তমান বৎসরে হইতেছে) তাহা হইলে কংগ্রেসী দলের পক্ষে—বিশেষ ভাবে নিম্ন পরিষদে, (Lower House) হোয়াইট হাউসের প্রতিনিধিদের হাত হইতে কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান বৎসরের কংগ্রেসী নির্ব্বাচনের গুরুত্ব যে এত বেশী উপরি-উক্ত বিষয়টি তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। বিগত চৌদ্দ বৎসর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রে যত নির্ব্বাচন-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রত্যেকটিতে পুরোধা রূপে পরলোকগত প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক-লিন ডেলানি রুজভেল্ট উপস্থিত থাকিতেন। কাজেই বর্ত্ত-মান ব্যাপারে তাঁহার অভাব ডেমোক্রাটদল কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে অনুভূত হইবে। এখন গণতন্ত্রী (Democrats) ও রিপাব্লিকান এই দুইটি প্রধান প্রতিযোগী দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশস্ত ক্ষেত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে। শেষোক্ত দল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত, কাজেই এবার তাহারা সে অধিকার লাভ করিবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিবে। রাজনীতি-বিশারদগণ ইহাকে 'মরণ-পণ' প্রতিযোগিতা বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। নভেম্বরে যদি গণতন্ত্রীদল ভোটাধিক্যের বলে পুনর্নির্ব্বাচিত না হয় তাহা হইলে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে যে কংগ্রেসের কর্ণধাররূপে রাষ্ট্র-পরিচালনা করিতে হইবে তাহাতে বিরোধী রাজনৈতিক দলেরই প্রাধান্য থাকিবে। কাজেই বর্ত্তমান কংগ্রেসী নির্ব্বা-চনের গতি-প্রকৃতি ইহাই সূচিত করিতেছে যে, আগামী প্রেসি-

যুক্তরাষ্ট্রের পল্লী অঞ্চলে গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক ভোট-পত্রের (Ballot-paper) সাহায্যে ভোট প্রদান

ডেন্ট নির্ব্বাচনেও কঠোর প্রতিযোগিতা এবং তুমুল ভোট-সংগ্রাম হইবে। সেই ভাবী ভোট-সমরাঙ্গণের সীমারেখাও ইতিমধ্যেই প্রায় নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

নির্ব্বাচক মণ্ডলীর কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক জনৈক তরুণীর ভোট গ্রহণ। পিছনে স্ব স্ব ভোটদানের জন্য প্রতীক্ষারত তরুণ-তরুণীগণ

যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদ-প্রার্থীদের মধ্য হইতে নিজেদের প্রতিনিধিস্বরূপ এমন কয়েকজনকে নির্ব্বাচিত করে যাঁহাদের পক্ষে অধিকসংখ্যক ভোটের জোরে নভেম্বরের নির্ব্বাচনে ষ্টেট, কাউন্টি ও শহরের উচ্চ সরকারী পদ লাভ করা এবং কংগ্রেসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। এইরূপে প্রত্যেক ষ্টেটের গণতন্ত্রীগণ প্রাথমিক নির্ব্বাচনে তাহাদের মনোনীত নামগুলির সপক্ষে ভোট দিয়া ষ্টেটের দায়িত্বপূর্ণ সরকারী উচ্চপদপ্রার্থীদিগকে নির্ব্বাচিত করে। রিপাব্লিকানরাও এই একই কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চলে। তার পর নভেম্বরের সাধারণ নির্ব্বাচনে সমগ্র ষ্টেট ইলেক্টরেট এই বিভিন্ন দলের মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রীয় উচ্চপদসমূহের জন্য কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত করেন। এমনি ভাবে ষ্টেট ইলেক্টরেট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত দলের লোকেরাই প্রত্যেক ষ্টেটে কর্ত্তৃত্ব করেন এবং এই বিশেষ অধিকার লাভ করার দরুন তাঁহারাই জাতির রাজনীতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন।

সাধারণ নির্ব্বাচনে গ্রীষ্মকালীন ভোটাভিযান পর্ব্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেটসমূহে

প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে সমগ্র দেশের জনগণের অখণ্ড মনোযোগ একান্ত ভাবে জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে কেন্দ্রীভূত হয়, কিন্তু কংগ্রেসী সদস্য নির্ব্বাচনে ৪৮টি ষ্টেটের পৃথক পৃথক নির্ব্বাচন-পরিষদের (electorate) স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। সমগ্র দেশের ষ্টেটসমূহ জুড়িয়া কংগ্রেসী নির্ব্বাচনের সংগ্রাম-ক্ষেত্র প্রসারিত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যাবতীয় বিষয়ই ইহার কর্ম্ম-তালিকার অন্তর্গত। বিভিন্ন ষ্টেটের জনগণ তাঁহাদিগকেই কংগ্রেসের সদস্য নির্ব্বাচিত করে, যাঁহারা উক্ত প্রতিষ্ঠানে আসন লাভ করিয়া তাঁহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণসাধনকেই জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লন।

প্রেসিডেণ্ট হইতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সমুদয় জনগণের একক প্রতিনিধিস্বরূপ, কিন্তু কংগ্রেসী সদস্য রাষ্ট্রের সহিত তাঁহার নিজের ষ্টেটের রাজনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করার কার্য্যে যোগসূত্রস্বরূপ। অবশ্য নভেম্বরের ভোটাভুটি দ্বারাই কংগ্রেসী সদস্য নির্ব্বাচন-পর্ব্বের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্ত্তন এবং বিচিত্র দৃশ্যাদির অবতারণা সুরু হয় পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীষ্মকাল হইতেই এবং আকস্মিক দ্রুততার এই রাজনীতিক অভিনয়ের যবনিকা পতন হয় শরৎকালে। আমেরিকার নির্ব্বাচন-সংগ্রামের আর একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হইতেছে মার্চ্চ হইতে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি পর্য্যন্ত বিভিন্ন ষ্টেটে অনুষ্ঠিত "দলগত প্রাথমিক নির্ব্বাচন"। তাহাতে কংগ্রেসী সদস্য পদপ্রার্থীগণ ব্যতীত ষ্টেটের উচ্চ সরকারী পদপ্রার্থীগণের নামও উল্লিখিত হইয়া থাকে।

প্রাথমিক নির্ব্বাচনে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের অনুগামীরা

ভোট-যন্ত্রের সাহায্যে ভোট প্রদানরত জনৈক মহিলা। বর্ত্তমান কালে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ষ্টেটে এই যন্ত্রের সাহায্যেই ভোট দেওয়া হয়

নিউ ইয়র্ক সিটির জাম টাইমস স্কোয়ারে মধ্যরাত্রে ভোটের ফলাফল শুনিবার জন্ত প্রতীক্ষমান জনতা

মালাকান্দের 'মালিক' উপজাতিদের সভায় বক্তৃতা প্রদান রত পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহ্‌রু

যুক্তরাষ্ট্রে 'হরিহর-ছত্রে'র মেলা

টেক্সাস ষ্টেটের সান এঞ্জেলোর মেলা-প্রাঙ্গণে সমবেত জনতা
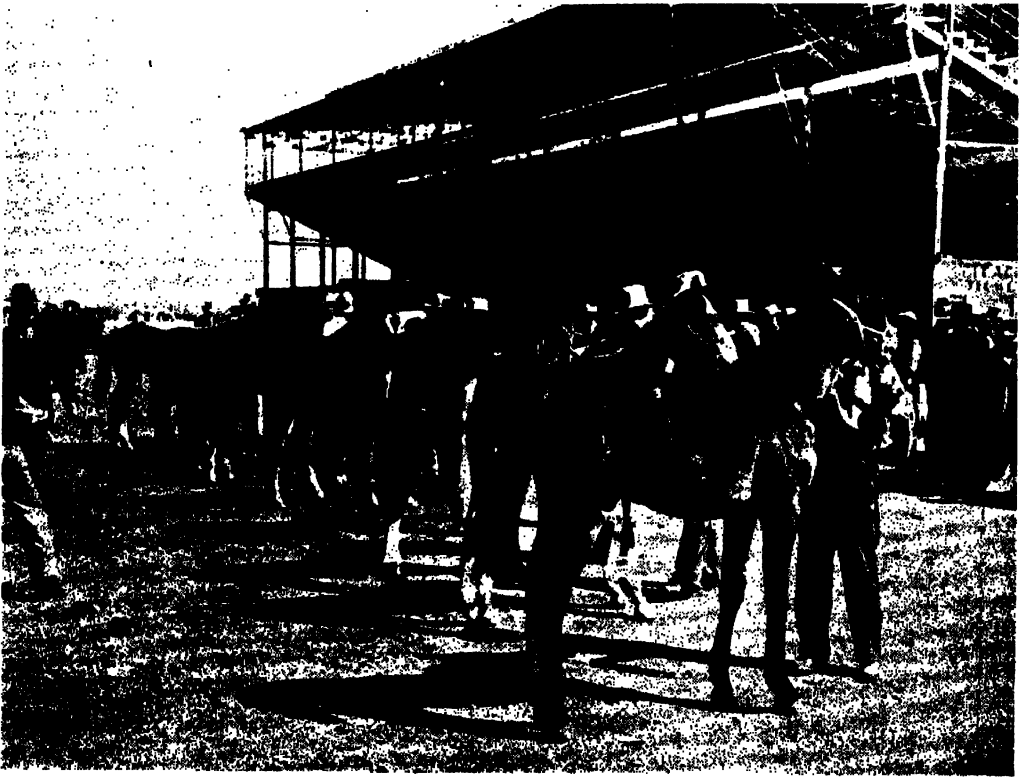
টেক্সাস ষ্টেটের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি বার্ষিক মেলায় শ্রেণীবদ্ধ অশ্ব-প্রদর্শনী

এই সময়েই সদস্য-পদপ্রার্থীদের মধ্যে ভোট সংগ্রহের জন্য বিশেষ কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। তখন তাঁহারা অদম্য উৎসাহে দূরতম পল্লী অঞ্চলে গিয়া প্রত্যেক ভোটদাতাকে নির্বাচন-দিবসে নিকটবর্তী ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সপক্ষে ভোট দিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। যাহারা দোটানায় পড়িয়া ইতস্ততঃ করিতে থাকে তাহাদিগকে স্বমতে আনিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টার আর অন্ত থাকে না। এমনি ভাবে প্রত্যেক ভোটদাতার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া অবশেষে তাঁহারা শহরে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে বিস্তৃত অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে হয়। কারণ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদপ্রার্থী যদি না যথেষ্টসংখ্যক লোকের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদিগকে দলে টানিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে নির্বাচন-সংগ্রামে জয়ের আশা সুদূরপরাহত হইয়া দাঁড়ায়, কেননা, আমেরিকান ইলেক্টরেট এত বিশাল যে, কোন সদস্য-পদপ্রার্থীর পক্ষেই অসংখ্য ভোটদাতাদের একটি ক্ষুদ্র অংশের উপর মাত্র ভরসা করিয়া নিশ্চিন্তমনে ভোট-সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া চলে না। এই উভয় ভোট-সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলি বন্ধ হইবার পরদিন রাত্রিকালে। তখন হইতে ভোটের ফলাফল জনসাধারণের শ্রুতিগোচর করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ভোটসমূহের নির্ঘণ্টীকরণ (Tabulation) অত্যন্ত দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হয়। নির্বাচন-পরিষদের যাবতীয় কর্মচারীই কোন্ কোন্ প্রার্থীর সফলকাম হওয়ার সম্ভাব্যতা আছে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া সেদিন ক্রমাগত জেলাস্থ প্রধানকেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠাইতে থাকেন।

ওদিকে কোনো কেন্দ্রের ভোটসংখ্যা হেড কোয়ার্টার্সে প্রেরিত হইবামাত্র তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং রেডিও যোগেও সর্বত্র প্রচারিত হয়। এমনি ভাবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় জনসাধারণ এবং সদস্য-পদপ্রার্থীদিগকে প্রতিযোগিতার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা হয়। কঠোর প্রতিযোগিতামূলক ভোটযুদ্ধে, যে পর্য্যন্ত না শেষ ভোটটি সম্বন্ধে যথাযথ রিপোর্ট বাহির হয় সে পর্যন্ত প্রার্থীগণ নির্বাচন ব্যাপারে সাফল্যলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারেন না। কেননা এমনও দেখা যায় যে, বিপুলসংখ্যক ভোট লাভ করিয়া জয় লাভ সম্বন্ধে যিনি স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন, শেষ মুহূর্তে বিপক্ষ দলের একটিমাত্র অধিক ভোটের দরুন তাঁহার নির্বাচন-তরণী বানচাল হইয়া গেল।

৬ই নভেম্বর তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে আর একটি ঐতিহাসিক কংগ্রেসী সদস্য নির্বাচন-পর্ব অনুষ্ঠিত হইবে। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের ভাগ্য এই নির্বাচন-সূত্রকে অবলম্বন করিয়া দোদুল্যমান বলিয়া ইহার গুরুত্ব সমধিক। আটচল্লিশটি ষ্টেটের ভোটদাতাগণ নিজেদের সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিবার জন্য যে নির্বাচন-সংগ্রামের সূচনা করিয়াছিল অচিরেই তাহার অবসান হইবে এবং তাঁহাদের নির্বাচিত সদস্যগণ রাষ্ট্রের ব্যবস্থা-প্রণেতৃ রূপে, অন্ততঃ পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কাল পর্যন্ত দেশের ও দশের সেবায় রত থাকিবেন। ভোট প্রদান কালে জনসাধারণ ব্যক্তিগতভাবে যে পন্থাই অবলম্বন করুক এবং যাহার পক্ষেই ভোট দিক না কেন, নূতন নির্বাচনজনিত শাসন-ব্যবস্থা চালু হইবার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসঙ্ঘের মতকেই সকলে নির্বিচারে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে এবং সদস্যগণও সমগ্র জাতির জাগ্রত জনমতকেই প্রাধান্য দিয়া তদনুসারে নিজ নিজ কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকেন, তারপর যখন পুনর্নির্বাচনের সময় আসে তখন আবার পুরনো রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে একটু অদল-বদল করিয়া নূতন করিয়া গড়া হয়।*

* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের প্রায় পুরাপুরি খবরই বাহির হইয়াছে। ইহাতে রিপাব্লিকান দল প্রতিনিধি-পরিষদে ২৪৫টি আসন দখল করিয়াছে। সিনেটে রিপাব্লিকানরা ৫১টি আসন দখল করিয়াছে। কাজেই এবারকার নির্বাচনে রিপাব্লিকানরাই যুক্তরাষ্ট্র-কংগ্রেসে ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। রিপাব্লিকান দলকর্তৃক কংগ্রেস অধিকৃত হওয়ায় ডেমোক্র্যাটিক দলভুক্ত সিনেটর মিঃ উইলিয়াম ফুলরাইট প্রেসিডেন্টের পদ হইতে মিঃ ট্রুম্যানের পদত্যাগ দাবি করিয়াছিলেন, কিন্তু ৭ই নভেম্বরের খবরে প্রকাশ যে তিনি পদত্যাগ করিবেন না।

এই নির্বাচন-সংগ্রামে মিঃ ডিউই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা পাঁচ লক্ষ অধিক ভোট পাইয়া রেকর্ড স্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় নিউ ইয়র্কের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের এই সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া রাজনীতি-বিশারদগণ মনে করেন।

কাব্যে পশুপক্ষীর নাম

শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্ম্মা

'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩৪৯, ভাদ্র) বিবিধ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছিলেন—"প্রাচীন কোন কবির মহাকাব্য নাটক প্রভৃতিতে যত বেশী পশু-পক্ষীর নাম পাওয়া যায়, প্রকৃতির সহিত তাহার বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পরিচয় অনুমিত হইতে পারে। ডক্টর সত্যচরণ লাহা 'কালিদাসের পাখী' নামক গ্রন্থে কালিদাসের গ্রন্থসমূহে যত পাখীর উল্লেখ আছে, সমুদয় একত্র সংগৃহীত করিয়াছেন। অন্য সংস্কৃত কবিদের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে এরূপ কিছু করিয়াছেন কিনা জানি না।

"বাংলা প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের অন্ততঃ বড় বড় লেখকদের গ্রন্থাবলীতে কোন্ কোন্ পাখীর উল্লেখ আছে তাহার তালিকা প্রস্তুত হইলে পরে বুঝা যাইতে পারে প্রকৃতির সহিত কোন্ লেখকের সংস্পর্শ ও পরিচয় কত ঘনিষ্ঠ। কোন পাখী বা পশুর উল্লেখ থাকিলে যদি তাহার স্বভাব ও অভ্যাসের উল্লেখ থাকে, তবে তাহা বৈজ্ঞানিক মতে ঠিক কিনা তাহারও বিচার হইতে পারে।"

তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন এই আলোচনা 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তখন ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। নানা দিক দিয়া সমৃদ্ধ বঙ্গ-সাহিত্যে রামানন্দবাবুর প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ আছে কিনা বলিতে পারিব না। একটি উৎকলীয় কবির কাব্য হইতে এ বিষয়ে কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব। প্রাচীন ও নবীন উৎকলীয় কবিরা কাব্যে ও খণ্ড কবিতায় পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীকে আদরে স্থান দিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর উৎকলীয় লেখক রাধানাথ রায় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাধানাথ উৎকলবাসী বঙ্গ-সন্তান। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ তিন-চারি শত বৎসর পূর্ব্বে মেদিনীপুর হইতে আসিয়া উৎকলের বালেশ্বর জেলার কেদারপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সেই গ্রামে রাধানাথ ১৮৪৮ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষা বিভাগে দীর্ঘকাল কর্ম্ম করিয়া বিশেষ যোগ্যতা অর্জ্জন করেন এবং স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পদ লাভ করিয়া প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তাঁহার লিখিত কাব্য, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী সমগ্র উৎকলভাষী অঞ্চলে আজিও সমাদৃত হইতেছে। রাধানাথ উৎকলবাসী হইলেও সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা কালে বাংলাদেশের বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানেও শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। বঙ্গের সুসন্তান ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের তিনি স্নেহভাজন ছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ রাধানাথ সাদরে গ্রহণ করিতেন। ভূদেব-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় রাধানাথের বাংলা লেখা প্রকাশিত হইত। সেই রচনা দেখিয়া ভূদেববাবু মুগ্ধ হন এবং উৎকলবাসী কবি রাধানাথকে উৎকলীয় ভাষায় লিখিতে উৎসাহ দান করেন। ভূদেবের পরামর্শে রাধানাথ উৎকলীয় সাহিত্য-চর্চ্চায় মনোযোগী হইলেন। রাধানাথের কবিতার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া ভূদেব তাঁহাকে একটি কবিতা দ্বারা আশীর্ব্বাদ করেন। ইহা 'এডুকেশন গেজেটে' মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত কবিতা হইতে সামান্য অংশ উদ্ধার করিতেছি—

১

"রাধানাথ উড়িষ্যার গৌরব কেতন,
উদার বিনীত-ধীর সুবোধ সুজন,
নানাভাষা বিভূষিত,
নানাশাস্ত্র সুপণ্ডিত,
কবিতা-কাননে পিকবর প্রিয়বর,
স্বর্গীয় স্বভাবে পূত তোমার অন্তর।

২

সেই দিন রাধানাথ, আছে তব মনে,
সেই দিন প্রিয়বর, মম সন্নিধানে
বসিয়া অগাধ সুখে
হরষিত স্মিতমুখে,
উপেন্দ্র ভঞ্জের সেই কবিতা সুন্দর,
শুনায়ে মোহিয়াছিলে আমার অন্তর।"

উড়িষ্যার নদনদী, সাগর, হ্রদ, বন, পর্ব্বত, মন্দির, দেবালয়, পশুপক্ষী ও কিংবদন্তী, শিল্প-কলা এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য রাধানাথের রচনার মধ্যে নিহিত আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনে এবং পশুপক্ষীর বিভিন্ন রূপ প্রদর্শনে রাধানাথ যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন অন্যত্র তাহা সুলভ নহে। বিভিন্ন দেশের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অনন্যসাধারণ। কেবল উৎকল ভ্রমণে তিনি সন্তুষ্ট হন নাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, রাজপুতানা, পঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বঙ্গ-বিহার, অযোধ্যা, কাশী ও দার্জ্জিলিঙ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ ও স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তত্তৎ স্থানের নৈসর্গিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। যেখানে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন যত্নের সহিত সেই সৌন্দর্য্যকে গ্রহণ করিয়া নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন। কবি রাধানাথ মরমী, সূক্ষ্মদর্শী ও সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতার মধ্যে পশুপক্ষী সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা আছে তাহা হইতে নিম্নে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম,

(১)

"বিমলা তটিনী-তট-কাননে
বসন্তে কোকিল ভ্রমরগণে

নদী কল কল   শুনিন চঞ্চল
হৃদই-তোষন, চাটু বচনে
নদীকু রহস্ত ভাষু বিজনে।

(২)

বাসর যৌবনে বিটপীতলে
বসন্তি কলাপিকুল কুশলে,
রতনখচিত---পুচ্ছ আন্দোলিত
করন্তু সেকালে বহি শীতলে,
সে ছবি রসিক রসনা বলে।

(৩)

অস্তগামী রবি   বিস্তা খটকিলা
বড়দেউল ত্রিশূলে,
ভার্গবী পুলিহু   হংসরালী(১) উড়ি
গলে খণ্ডগিরি-চূলে।

(৪)

বিন্দু সরোবরে   সিন্দুর লহরী
খেলিলা মন্দ সমীরে,
রথাঙ্গ-মিথুন   দীপ দণ্ডি ছাড়ি
গলে বিপরীত তীরে।

(৫)

সহসা ভীষণ   শার্দ্দূল আসিলা
মৃগমারি সে নির্ঝরে,
শোণিতে আপ্লুত   নখ দন্ত তার,
মুখরু শোণিত ক্ষরে।

(৬)

ব্যাঘ্র দেখি ভীরু   গহ্বর ভিতরে
লুচিলা-ভয়-বিহ্বলে,
ভয় ভরে যাউঁ   উত্তরীয় দেঊঁ
খসি পড়িলা ভূতলে।

(৭)

জল পিই বনে   বাহুড়ন্তে ব্যাঘ্র
ভেটিলা সেহি বসন,
রক্তলিপ্ত মুখে   খণ্ড খণ্ড করি
পকাইলা সেহিক্ষণ।

(৮)

যূথ যূথ হোই ভ্রমন্তি
নানা রঙ্গে হরিণ
তরঙ্গ চাহানি চাহান্তি
চারু গ্রীবা তোলিণ।

(৯)

হেমাঙ্গ হলদীবসন্ত(২)
দেখি যেহ্নে সঞ্চান(৩)
অন্তরীক্ষে ধাএঁ সলসে
ক্ষণপ্রভা সমান।

(১০)

মুহ চঞ্চু যুন সঞ্চান
পক্ষ কয়ে বিস্তার,
মনে করগত পলকে
পরাহেলা শীকার।

(১১)

হলদীবসন্ত একান্ত
প্রাণভয়ে অস্থির,
ক্ষণে ধৃত ক্ষণে মুকত
মনে নিজ শরীর।

(১২)

কাঞ্চন পুচ্ছকু সঞ্চান
চঞ্চুক্ষণে পরশে,
চঞ্চলে এড়াই শীকার
ধরো তির্য্যকে খসে।

(১৩)

কাহিঁ অশ্বারোহী যেনি অশ্ববর
কদমে বুলাই দিওই চক্কর।

(১৪)

অবগাহুছন্তি করী দলে দলে
বিষম পরায়ে দিশি স্রোতজলে।

(১৫)

দাসেরক(৪) আশ্রা করি তরুতল
চোবাউছি গ্রীবা টেকি নিম্বদল।

(১৬)

ভারবাহী যেতে গর্দ্দভাদি করি
ভ্রমুছন্তি দূরে দলে দলে চরি।

(১৭)

কুম্ভাটুয়া(৫) খগ প্রভাত ডগরা
রঙ্গে বজাইলা কানন নাগরা।

(১৮)

বিহিলে কান্তারে কুক্কুট কৌশিক(৬)
চবাপুঞ্জ(৭) মিলি উষা-তৌর্য্যত্রিক।

(১৯)

মন্দানিলে ঝুলুঅছি সিংহাসন,
বর্হ তোলি বর্হী তাণ্ডবে যেমন।

(২০)

তা সঙ্গে মিশিলা ভ্রমরসঙ্গীত,
বনবিহঙ্গর কাকলি ললিত।

(২১)

হংস চক্রবাক জলে অবতরি
বেষ্টিণ দেবীঙ্কি বুলিলে পহঁরি।
মৃগযুথী তীরে তৃণাহার ছাড়ি
উদ্‌গ্রীবে চাহিঁলে হোই ধাড়াধাড়ি।

(২২)

কপোতে রাবিলে তরুষণ্ডে লুচি,
পত্র অন্তরালে রাবিলে গুণ্ডুচি(৮)।
অচলে কোচিলাখাইগুর(৯) রাব
প্রচারিলা বনে মধ্যাহ্ন প্রভাব।
নদীকূলুঁ শুণি স্বজাতির স্বর
নদীকূলবন্ধু(১০) দেলা প্রত্যুত্তর।

(২৩)

রথাঙ্গী ভাসই কাঠখোড়ি নীরে
থরে কাণ্ডে, থরে অনাই মিহিরে
পটিআদহরা পক্ষী দলে দলে,
উড়ি আসুচ্ছন্তি নভে কোলাহলে;
পটুড়ে মধুরে মুরলী বজাই
পঠারু গোঠকু আসুচ্ছন্তি গাই।

(২৪)

তেমুহাণী নামে শুহিস্থান এবে বিদিত লোকে,
তণ্ডীকুঞ্জে জায়া সঙ্গে রঙ্গে যঁহি ক্রীড়ন্তি কোকে(১১)।

(২৫)

পারিধিকি বিজে হেলে নরবর আরোহী হস্তী(১২)
কুমারিকী সঙ্গে অমাত্যরে থেনি বিজে করন্তি,
প্রতিদিন উষা এহিরূপে যাই মৃগগহনে
দেখুথাই বনে মৃগয়া কৌশল নিবিষ্ট মনে;
দেখুথাই বন—পশুপক্ষীঙ্কর চেষ্টা ইঙ্গিত,
সাহস, সাধ্বস, স্নেহ, মায়া আদি যহিঁ সুচিত;
কৌতুকে কাননে কলুথাই মনে রাজেন্দ্র সুতা
মৃগয়ু কুলর দেশ-কাল-জ্ঞান হস্ত-লঘুতা,
নিতি দেখি রঙ্গ এহিরূপে মঞ্চু হস্তী উপর
মৃগয়া দুঃখকু শ্লাঘ্য গণিলা সে গূঢ়-সুখরু।

(২৬)

প্রদেশে সঙ্কীর্ণরাতে বিজে করি সুচিত্র পোতে
করুথাই নক্র(১৩) সংহার বলাঙ্গী হরিত স্রোতে।

(২৭)

অদুরে যাহার বিরাজই শারী শুআ পর্বত
শারিশুআ(১৪) রবে ঝঙ্কারিত যার গুহা সতত।

(২৮)

কইঁসারিলতা—শ্যামলসিকতা—কূলেবিহার
করুথান্তি যহিঁ কৃষ্ণসার সঙ্গে কুরঙ্গী(১৫) যার,

(২৯)

তরঙ্গে ওলটি ক্রূর-রঙ্গে করি মুখব্যাদান
নক্র শিশুমার(১৬) শোষিনে উবান্তি নাবিক প্রাণ।

(৩০)

নীড়ক্রোড়ে বসি সারস-দম্পতি যহিঁনিরোলে
প্রাংশু-তৃণ-বনে দোলুথান্তি সিন্ধু বায়ু হিল্লোলে।

(৩১)

ঝিলি-ঝঙ্কারিত—মহারণ্য ভহিঁথিলা সেকালে,
সদা সুশীতল নানা বনস্পতি—ব্রততী-মালে।

(৩২)

মীনলোভে কলা পাণিকাক(১৭) বুড়ি আলোড়ে জল,
দীর্ঘ গ্রীবা টেকি স্থানে স্থানে বক ধ্যানে নিশ্চল।
নিকাঞ্চনে রহি, নিঃশঙ্কে বিহরি চাহান্তি নাহিঁ
কক(১৮) হংসরালী যহুঁ গোড় কাড়িথিবাকু কাহিঁ

(৩৩)

সহস্র করে সে ভূতলে ক্ষিপিলে অনলগুণ্ডি,
তরুষণ্ডে লুচি সঘনে রটিলা সিন্দুরমুণ্ডী(১৯)।

(৩৪)

উড়িয়াউচ্ছন্তি হংসে বোলা হোই রক্ত অংশুকে
কুলীর অরুণ(২০) পূর্ব পারাবার পুলিন-মুখে।

(৩৫)

রজনীর গর্ভ উজলি উজলি দিগ-গগন
ফণী-ফণা পরিবাতে দোহলিলা চিতা দহন;
স্বনিলে পবন যেহ্নে নিশীথিনী করুণস্বর
ঝিল্লিরব শুনি কলা সে দৃশ্যকু গম্ভীরতর।

(৩৬)

উড়ুচ্ছন্তি সৌর করে প্রজাপতি
স্নাত ইন্দ্রধনু বর্ণে,
উড়ুঁ উড়ুঁ থরে বসি পড়ুচ্ছন্তি
কেতেপুষ্পে কেতে পর্ণে।
ভরতিরা(২১) নিজ প্রিয়া সঙ্গে নাট্য
তরঙ্গে মগ্ন নাচুআ,
ইন্দ্রধনু খণ্ড পাত্র খণ্ডি উড়া
দই ধুলে বালিশুআ(২২)।

পাদটীকা

১। হংসরালী—whistling teal
২। হলদীবসন্ত—Black headed oride
৩। সঞ্চান—Falcon
৪। দাসেরক—উষ্ট্র
৫। কুডাটুরা—কুথা Treepie

৬। কৌশিক—পক্ষীবিশেষ

৭। চষাপুত—পক্ষীবিশেষ, বর্ষাগমে চাঁদনী রাতে 'আমি চাষার ছেলে, চাষার ছেলে' বলিয়া চীৎকার করিয়া আকাশে উড়ে।

৮। শুণ্ডুচী—কাঠবিড়াল

৯। কোচিলাখাই—Horn-bill

১০। নদীকূলবন্ধু—পক্ষীবিশেষ

১১। কোকে—জলচর পক্ষীবিশেষ

১২। দন্তী—হস্তী

১৩। নক্র—কুমীর

১৪। শারি—সারিকা ও তোতাপাখী

১৫। কুরঙ্গী—মৃগী

১৬। শিশুমার—শুশুক, জলজন্তুবিশেষ

১৭। পাণিকাক—Coromorant dorter

১৮। কঙ্ক—হাড়গিলা পক্ষী

১৯। সিন্দূরমুখী—পক্ষীবিশেষ Rose fing

২০। কুলীর অরুণ—কাঁকড়া বিছা

২১। ভরতিআ—ভরতপক্ষী

২২। বালি গুআ—পক্ষীবিশেষ Sand dove

সভ্যতার সমন্বয়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমরা অতি সহজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় সাধনের কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু সমন্বয় সাধনের চেষ্টা যে অসাধ্য সাধনের মত এ কথাটা ভাবিয়া দেখি না। দার্শনিক পণ্ডিত আচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, সত্য বলিতে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবের মিলন কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সমন্বয় সত্যই একটা দুরূহ ব্যাপার, সহানুভূতির দৃষ্টি যদি থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট পাইলাম বলিতে হইবে। এক জাতি অপর জাতিকে বুঝিতে চেষ্টা করে না; ইহার নানা অন্তরায়। ভাষা ধর্ম্ম আচার নীতি প্রভৃতি বাধাস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। সুতরাং এই বিরাট গণ্ডীকে পার হইবার মত মন না থাকিলে কোন জাতির কৃষ্টির মর্ম্মকথা আমরা বুঝিব না। এই যে বাধার কথা বলিয়াছি, জাতীয়তা বা অর্থনৈতিক স্বার্থ আসিয়া সেই বাধাকে দিন দিন দুর্লঙ্ঘ্য করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং দিন যতই যাইতেছে নানা উপায়ে এক জাতি অন্য জাতি হইতে পৃথক হইয়া যাইবার আশঙ্কাই তত বেশী হইতেছে। অবশ্য এ কথা বলিতে পারা যায় যে, স্থান কালের অতীত হইয়া, জড়ত্ব ও সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া পরধর্ম্মকে বুঝিবার মত ঔদার্য্য দুই-এক জন মনীষীর হইতেছে। কিন্তু রাজনীতি-বিদ্‌দের চালে পড়িয়া এমন লোকেদের উপর জাতির অধিকাংশ লোকই বিরূপ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মহা মনীষী রমাঁ রোলাঁর কথা। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়; সুতরাং ফরাসী-জার্ম্মানীর যুদ্ধ তিনি অন্তর হইতে অপছন্দ করিতেন; এই কারণেই তিনি ছিলেন দেশের অপ্রিয়। আবার দেখা যায়, দেশের স্বার্থে রাজনীতিবিদ্ পরস্বাপহরণ করিতেছেন, অপর দেশের বাঁচিবার অধিকার পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে বিলোপ করিতে চাহিতেছেন। শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা বিবেকবুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি নিগৃহীত জাতির প্রতি ব্যবহারের সময় তাঁহারা ভুলিয়া যান। ভারতবাসীর প্রতি ইংলণ্ডের শিক্ষিত রাজনীতিবিদ্‌দের আচরণ দেখিলে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ এই মিলনের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। সুতরাং এ সভ্যতার পরিবর্ত্তন বা ধ্বংস না হইলে যে মিলন হইতে পারে তাহা মনে হয় না।

এ সভ্যতার মর্ম্মস্থলে যে অপরকে উৎসাদিত করিয়া আপনার ভোগের পথকে উন্মুক্ত করিবার একটা উৎকট চেষ্টা আছে তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মতে এই চেষ্টা রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিতে পারা যায় বলিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্ম্মমূল হইতেছে তাহার রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রের ভাল জাতির ভাল; রাষ্ট্রের মন্দ জাতির মন্দ। কিন্তু দেখা যাইতেছে ইউরোপের কোন রাষ্ট্রেই সমষ্টির স্বার্থের সহিত ব্যক্তির স্বার্থের মিল নাই। মিল না থাকায় দলে দলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হানাহানির বিরাম নাই। যত দিন রাষ্ট্র থাকিবে জাতির মঙ্গল-অমঙ্গলের মূলে তত দিন এই শক্তিকে করায়ত্ত করিবার জন্য হানাহানি মারামারি চলিবেই চলিবে। আবার ব্যক্তির স্বার্থকে অবলম্বন করিয়া এক জাতি অন্য জাতির ক্ষতি করিয়া আপনার স্বার্থসাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকে বলেন বাণিজ্যিক সভ্যতার এই পরিণতি বা জাতীয়তামূলক রাষ্ট্রেরও এই একই পরিণতি।

সুতরাং এই পরিণতির হাত হইতে জগৎকে বাঁচাইবার পথ কেহ কেহ খুঁজিয়াছেন আন্তর্জ্জাতিকতায়, আবার কেহ বা খুঁজিয়াছেন পুঁজিবাদের মূলোচ্ছেদে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল এ সভ্যতা যে বিলুপ্ত হইতে বাধ্য তাহা দিব্যচক্ষে দেখিয়া নূতন আদর্শে জগতকে গড়িতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মূল কথা, জাতীয়তার বিনাশসাধন ও পুঁজিবাদের উচ্ছেদ। সঙ্গে সঙ্গে নূতন আদর্শে নূতন শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি লইয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে নূতন সমাজ সৃষ্টি করিয়া একটা

শক্তিমান্ আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্দর সভ্যতা তিনি গড়িতে চাহেন। এখানে শক্তি থাকিবে জ্ঞানী ও মানব-প্রেমিকদের হাতে যাঁহারা জগতের চেহারা বিজ্ঞানের সাহায্যে বদলাইয়া দিবেন। রাশিয়া যে আদর্শ পাশ্চাত্য দেশে আনিয়াছে তাহা অভিনব বটে, কিন্তু তাহাও পরীক্ষামূলক ভাবে চলিতেছে ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সেখানে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তবে রাশিয়া সম্বন্ধে আশার কথা এই যে, তাহাদের চেষ্টা নিরর্থক নয়। তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে দিয়াছে। প্রেম ও সেবার উপর না হইয়া তাহাদের রাষ্ট্র যদি অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে জার্মানীর সজ্ঘাতে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। রাশিয়ার আদর্শ জড়বাদী পাশ্চাত্যের নিকট ভাল হইলেও তাহাই যে সভ্যতার শেষ কথা নয় তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। রাশিয়ার আদর্শ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আশার আলো হয়ত দেখাইতেছে, কিন্তু আদর্শ যদি লইতেই হয় তাহা হইলে জড়বাদীর আদর্শ আদৌ লইব কিনা বিচার করিয়া দেখা উচিত। মনীষী এইচ. জি. ওয়েলস বলিয়াছেন—"ইউরোপের প্রাধান্য মাত্র দুই তিন শত বৎসরের; জগতের ইতিহাসে ইহা ধর্ত্তব্যই নয়। ইউরোপ দুঃস্বপ্নের ঘোরে যে ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন গড়িয়াছে রাশিয়া তাহা বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিল। তাহার কৌশল একটা বিপদ এড়াইবার কৌশল মাত্র। তাহা দিয়া যে জীবনকে গড়িতে পারা যাইবে, জগতে শান্তি আনা যাইবে, মানুষের আত্মার ক্ষুধা মিটাইতে পারা যাইবে তাহা মনে হয় না। তবে একটা বাঁচিবার প্রয়াস হিসাবে ইহাকে শ্রদ্ধা করি এ কথা বলিলে অপলাপ হইবে না।

যে ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান ধনিক সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আসুরিক পরিবেশে সত্য বলিয়া মনে হইলেও তাহা যে মিথ্যা তাহা রাশিয়া কথঞ্চিৎ প্রমাণ করিয়াছে। মানুষের স্বভাবে স্বার্থ বা পশুভাব থাকিলেও তাহার যে দেবভাব আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অবস্থা-বিশেষে এই সদ্ভাবের যথেষ্ট বিকাশ হইতে পারে। বর্ত্তমান সভ্যতায় ইহার সুযোগ কম, কিন্তু ইহাকে বিকশিত করিবার সমস্যাই বর্ত্তমান সভ্যতার সমস্যা বলা যাইতে পারে। প্রেমের মধ্যে, সেবার মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে এক কথায় ধর্ম্মবোধের মধ্যেই জগতের সকল সমস্যার সমাধান রহিয়াছে। অবশ্য ইহার সঙ্গে থাকা প্রয়োজন যথোপযুক্ত জ্ঞান। প্রেম ও জ্ঞানের মধ্য দিয়াই জগতের মুক্তি। মনীষী রাসেল এই কথাই তাঁহার নানা গ্রন্থে বারবার বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

মনে হয় অধ্যাত্মবাদী ভারত প্রেমের দ্বারা সেবার দ্বারা ও ত্যাগের দ্বারা প্রকৃতই যে পরকে আপন করিতে পারা যায় তাহা বুঝিয়াছে ও জগৎকে বুঝাইয়াছে। ভারতে বহু ধর্ম্ম, বহু ভাষা ও আদর্শের সজ্ঘাত হইলেও সে সকলকে স্বীকার করিয়া যথাযোগ্য স্থান দিয়াছে। ভারতের ধর্ম্মেও অধিকারীভেদের যে পরম উদার মত দেখা যায় তাহাও ভারতের, ভারতীয় মনের বিশ্বতোমুখিতার পরিচায়ক। ভারতীয় মনীষীরা ইহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিতে বলিয়াছেন। প্রাচীনপন্থী হইয়াই ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভারতের এই সনাতন ধর্ম্মকে স্বীকার করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু এই বাণী, জগতের সকল ধর্ম্মের যাহা সারভূত তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনে বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ও তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দ তাহা পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ ভারতের এই আধ্যাত্মিক সম্পদের দিকে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইউরোপের মনীষীরা ইহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মানিয়া লইয়াছেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন ভারতের বাণী ইউরোপকে নূতন করিয়া শুনাইতেছেন। সে বাণী যে ইউরোপীয়দের হৃদয়ে স্পন্দন আনিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বিজ্ঞান যে সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া অতৃপ্ত ইউরোপকে নিজেকে নূতন করিয়া চিনিতে হইবে ও প্রকাশ করিতে হইবে এই ধরণের কথা শুনা যাইতেছে। *Counter-attack form the East* নামক একখানি দার্শনিক গ্রন্থে অধ্যাপক জোয়াড পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কোথায় ব্যর্থতা ও প্রাচ্য দর্শন কেমন করিয়া সেই ব্যর্থতার মধ্য দিয়াই জীবনে সার্থকতা আনিতে চায় এবং সত্যই বহু ব্যক্তির জীবনে তাহা আনিতে পারিয়াছে তাহা অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ, গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের বাণী মহামনীষী রোম্যাঁ রোলাঁ ইউরোপের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন ও তাহার মধ্যে অতৃপ্ত ইউরোপ শান্তির পথ খুঁজিয়া পাইবে ইহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা জানি শ্রীঅরবিন্দও ভারতের বাণী জগতের সম্মুখে ধরিয়াছেন ও নব দেব-মানবের এক বিরাট্ আদর্শ স্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন। অ্যানি বেশান্ত ও থিওসফিক্যাল সোসাইটি ভারতের ধর্ম্মের সহিত প্রতীচ্যকে পরিচিত করিতে চাহিয়াছেন। ইহার ফলও ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সত্যকার অনুসন্ধিৎসুগণ ভারতের বাণী শ্রদ্ধার সহিত শুনিয়াছেন ও বিভ্রান্ত জগৎকে তাহা শুনাইতে চাহিতেছেন। আমরা জানি বিখ্যাত বিজ্ঞানী হাক্সলি আজ তর্কের পথ ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান করিতেছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন এই উদার ভিত্তিতেই হইবে। ইহাই প্রকৃত মিলন বা সমন্বয়। অবশ্য সমন্বয়ের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিলোপ হয় না, হয় পূর্ণতর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও ধ্যানী যাঁহারা তাঁহারা ভারতের মনীষী ও আচার্য্যদের কথা শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেছেন। মিলন বা সমন্বয় আজও ঘটে নাই। ইহার পথ প্রস্তুত হইতেছে মাত্র। মনে হয় এক একটি বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধে এই মিলনের পথ প্রশস্ততর হইতেছে। রাজনীতিকেরা যে মিলন বা সমন্বয় চাহেন না তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এ যুদ্ধ যখন শেষ

হইল তখন কত আশাই না করা গিয়াছিল যে বিশ্ব-সৌভ্রাত্র এইবার জগতে প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু হিংসা, সংশয় ও শক্তি-দম্ভ যেমন এক পক্ষকে করিল অন্ধ, তেমনি হিংসা ও স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া অপর পক্ষ ইহাকে দংশন করিয়া চলিয়াছে। ইহার পরিণতি বোধ হয় আর এক যুদ্ধে। ওয়েনডেল উইলকি *One World* নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে কারণে যুদ্ধ হয় সেই মূল কারণকে উৎখাত করিতে না পারিলে এ যুদ্ধে বিজয়লাভ ঘটিলেও জেতারাই প্রকৃতপক্ষে পরাজিত হইয়াছেন বুঝিতে হইবে। অনগ্রসর পুঁজিবাদী মনোবৃত্তি নেতাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। যাহারা মিলন চাহেন তাঁহাদের সংখ্যা এত কম ও কুচক্রী রাজনীতিবিদ্‌দের শক্তি এত বেশী যে মিলনের চেষ্টা ক্রমশ:ই ব্যাহত হইয়া যাইতেছে।

ভারতীয় আদর্শ বিরাট হইলেও, ইংরেজ আগমনের সময়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এদেশবাসীর মধ্যে তাহা প্রচলনের উদ্দেশ্যে রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের মধ্যে জাতীয় জীবন আনিয়াছে, আমাদের অবস্থার কথা ভাবাইতে শিখাইয়াছে, জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষার জন্য একটা অনুরাগ জাগাইয়াছে। ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা আপনাদের চিনিয়াছি; বুঝিয়াছি স্বতন্ত্র জাতীয় জীবন না হইলে আমাদের জীবন ব্যর্থ। আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, আধ্যাত্মিকতার যে একান্ত প্রয়োজন আছে, শুধু আমাদের প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মিটাইবার জন্য নহে পরন্তু জগতের মধ্যে নূতন আদর্শ প্রচারের জন্যও বটে—এ কথা আমরা ইংরেজদের সাহচর্য্যে আসিয়া বুঝিয়াছি। ইংরেজদের সাহচর্য্য আমাদের যে সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি দিয়াছে তাহা সুন্দর হইলেও খুব বড় কথা নয়। ইহার ভাল ও মন্দ উভয় দিকই আছে। ইংরেজের সংস্পর্শে ব্যবসাবাণিজ্য বা industrialism পাইয়াছি। ইহাতে প্রাচীন সমাজ ভাঙিয়া যাইতে বসিয়াছে অথচ নূতন করিয়া গড়িবার শক্তি আমাদের নাই। নূতন ও পুরাতনের প্রবল সঙ্ঘর্ষে আমরা যে আদর্শের সমন্বয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছি তাহাকে জোড়াতালি দেওয়া ভিন্ন অন্য কিছুই বলা চলে না। দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার নাই অথচ সঙ্ঘর্ষ নিরন্তর ভীষণতর হইয়া আমাদের ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আসিতেছে ইহাই ভারতবাসীর জীবনের শোচনীয় দিক। বিপ্লবের মধ্য দিয়া সমস্যার সমাধানের যে চেষ্টা তাহা রাশিয়ার আদর্শ বটে, কিন্তু তাহা যে আমাদেরও আদর্শ তাহা বলিতে পারা যায় না। কমিউনিজম্ যে আমাদেরও রোগে মকরধ্বজের কাজ করিবে তাহা কেমন করিয়া জানিলাম? আমাদের সাহিত্যে কাঙালপনা ও চরম দৈন্য প্রাচীন আদর্শ ধুলায় লুটাইয়া যেমন সদম্ভে আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিতেছে, মনে হয় অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি যাহারা কাঙাল ও দীন তাহারাই রাশিয়ার মাদুলি ভারতের হাতে দিয়া ভারতের সর্ব্বরোগ দূর করিতে চাহে। ইহা আমার মনগড়া কথা হইতে পারে কিন্তু ঐতিহ্যকে যাহারা মানে না, আদর্শে যাহারা বিশ্বাসবান নহে তাহাদের বিশ্বাস করি কেমন করিয়া?

আমরা দেখিয়াছি ভারতে সভ্যতার সমন্বয় সাধনের যে চেষ্টা তাহা যথেষ্ট নয়। কতকটা কাজ হইয়াছে শিক্ষিত ও মনীষীদের দ্বারা। ইউরোপের রাজনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্য আমাদের দেশে মর্ম্মান্তিক দুঃখের কারণ হইয়াছে। সাহিত্যে ও শিল্পে আমরা কতকটা কৃতিত্ব দেখাইয়াছি, কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও জীবনকে সার্থক করিতে যে আমাদের স্বাধীনতা প্রয়োজন ইহার বোধই আমাদের শ্রেষ্ঠ লাভ। স্বাধীনতা যদি লাভ করি আমাদের সমাজ, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি সমস্তই সুন্দর ও স্বাস্থ্যপ্রদ হইবে। এ পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে তাহাতে ইহাই বুঝায় যে, ইউরোপ যে রাজসিক ভাবে ও যে বিজ্ঞানের চর্চ্চায় সামাজিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনিয়াছে মানুষ হইয়া বাঁচিতে হইলে আমাদেরও তাহা নিতান্ত প্রয়োজন। মনে হয়, ইউরোপের সহিত আমাদের মিলন বা সমন্বয়ের তাগিদ আসিবে এই বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নতির দিক দিয়া। আমরা ভারতের চল্লিশ কোটি নর-নারীর জন্য যে শিল্প-ব্যবস্থা চাই তাহাতে যেন পুঁজিপতিদের লুব্ধ দৃষ্টি না থাকে। বিপ্লব না আনিয়াও কেমন করিয়া তাহা সম্ভব করা যায় তাহাই বিচার্য্য। এখনো যন্ত্র-শিল্প খুব প্রসার লাভ করে নাই। সুতরাং যদি এদেশে রাষ্ট্রের হাতে বৃহৎ শিল্পগুলি প্রথম হইতে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে শ্রেণী-সঙ্ঘাতকে এড়ানো যাইতে পারে।

মোটের উপর ইউরোপ ও এশিয়ার সম্বন্ধ সমানে সমানে নয়। এ সম্বন্ধ ভক্ষ্য ও ভক্ষকের সম্বন্ধ। ইংরেজ ভারতে যাহা করিয়াছে তাহাতে ভারত খুশী নয়, ইংরেজও নয়। শ্রদ্ধা ও দরদ না থাকিলে কোনো জাতির মর্ম্মে প্রবেশ করা যায় না। ইংরেজ কবি কিপলিং ভারতে বহুদিন ছিলেন কিন্তু সাহিত্যিক হইয়াও এ জাতের মর্ম্ম-কথা বুঝিতে চান নাই বা পারেন নাই। তাঁহার স্বীকারোক্তি,

> O the East is East, the West is West
> And the twain shall never meet

বা তাঁহার কথা,

> You'll never plumb the oriental mind,
> And if you did it, it isn't worth the toil.
> Think of a sleek French priest in Canada.
> Divide by twenty half breeds. Multiply
> By twice the Sphinx's silence.
> There's your East,
> And you're as wise as ever.

প্রভৃতি হইতে বা তাঁহার উপন্যাস *Kim* ও বহু রচনা

পাঠ করিয়া বুঝি—যে ভালবাসা বা প্রেমের স্পর্শে হৃদয় আপনা হইতেই খুলিয়া যায়, সে স্পর্শ কবি হইলেও কিপ্‌লিঙের ছিল না ও এ দেশীয় শাসক বা ব্যবসাদার ইংরেজের নাই। তাঁহাদের ব্যবহারে হৃদয়ের পরিচয় নাই। তাঁহারা এ দেশে থাকিয়াও পরদেশী। অথচ মিলনের পথ কত সহজেই ইঁহারা সুগম করিতে পারিতেন। ভালবাসিয়া বিদেশীও ভারতবাসীর চিত্ত জয় করিয়াছেন; দীনবন্ধু এন্‌ড্রুজ ইহার উদাহরণ। ইংরেজ বিচার দিয়াছে; আমরা বিচার চাহি না, চাহি তাহার হৃদয়। কিন্তু লোভ ও শক্তিদম্ভে ইংরেজ আপনাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। লর্ড এক্‌টন বলিতেন, "Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely." ইংরেজও শক্তিদম্ভে শক্তির অপব্যবহার করিয়াছে এবং সাধারণ মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধ আমাদের সহিত রাখে নাই। কাজেই সেই দিক দিয়া তিক্ততা যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিয়াছে।

সুতরাং দেখিতেছি সভ্যতার সমন্বয় দুরূহ ব্যাপার। যদি উভয় জাতি এক হইতে চায়, পরস্পরকে শ্রদ্ধার সহিত বুঝিতে চায় ও তাহাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা সমান হয় তবেই এ মিলন বা সমন্বয় ঘটিতে পারে। এক জাতি ছোট হইলে মিলন হয় বিড়ম্বনার কারণ, যেহেতু তাহার মিলন-বিষয়ে আগ্রহ ও অনুরাগ থাকে না। আমরা দেখিয়াছি, ভারতের সহিত পাশ্চাত্য জগতের সমন্বয় বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়—তাহা ভারত ও পাশ্চাত্য জগৎ কাহারও উপকার করিবে না। এ সমন্বয় দেশের গভীর প্রয়োজনের তাগিদে আসা আবশ্যক, তাহা না হইলে মিলন হইবে বিড়ম্বনার কারণ। এ মিলনের অবস্থা এখনও বহুদূরে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহামনীষীরা এখন ইহার স্বপ্ন দেখিতেছেন ও পথ প্রস্তুত করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে চাই, কেননা পরাধীন ও লাঞ্ছিত ভারত এখনও যে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মত মহামানবদের জন্মদান করিতে পারে ইহাতেই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় জগৎকে শুনাইবার মত বাণী নিশ্চয়ই ভারতের আছে:—"আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।" পাশ্চাত্য জগৎও আজ এই আশাই করুক। তাহার সভ্যতা নূতন রূপ লাভ করুক। রোমাঁ রোলাঁর স্বপ্ন সার্থক হউক। ইউরোপ আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করুক আর ভারত লাভ করুক বিজ্ঞানের প্রসার ও কর্মোন্মাদনা।

জ্বলে নোয়াখালি

শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

হয়তো শুনেছ বন্ধু, আমার বাংলা দেশ
সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা উপনিবেশ।
হাসি আর গানে, স্বর্ণাভ ধানে, কলোচ্ছ্বাস
স্নেহে আর প্রেমে, নারীদের চোখে, নীলোৎপল।
আকাশে প্রদীপ, বাতাসেতে মধু, পূর্ণ মন—
দিনের সূর্য, রাতের জ্যোছনা, মধু স্বপন।
তালীবন, আর নারিকেলবনে, নামে আবেশ—
শুনেছ বন্ধু, দেখে যাও এসে, বাংলা দেশ।

জ্বলে নোয়াখালি, জ্বলে কলকাতা, জ্বলছে ঢাকা,
জ্বলে ধানবন, জ্বলে নারীদের অলকাখা।
পুড়ে গেল ঘর, সারা প্রান্তর, অগ্নিরাগে—
লাল হয়ে গেছে; তোমারো চোখে কি সে আঁচ লাগে?
ঢাকছো কি চোখ?—মিথ্যে বন্ধু কানেতে তাই—
শিশুবৃদ্ধের আর্তনাদের রেশ যে পাই।
শেষ চীৎকার, আর্তজনের, লাগছে বেশ।
দেখছে পৃথিবী, দেখছে ভারত বাংলা দেশ।

চমকাও কেন? ঠেকল কি কিছু পায়ের তল?
কিছু নয় ভাই হয় তো রক্ত, হয় তো জল
সদ্যোবিধবা তাদেরি চোখের সম্ভবতঃ;
যেও না এখনি, সামান্য এতো দেখবে কতো।
জ্বলে নোয়াখালি জ্বলে সন্দ্বীপ, ক্ষতি কাহার?
বিংশ শতকী সভ্যতা-তলে রংবাহার।
ধর্মের নামে চলিয়াছে একি বিষম দ্বেষ?
লজ্জা কিসের? অগ্নি উজল বাংলা দেশ।

গলিত শবের, মাংসে তৃপ্ত শকুনিদল—
অনেক উঁচুতে, রাজ আবাসের শৈলাচল।
সেখানে বন্ধু, পৌঁছবে নাতো, দীর্ঘশ্বাসে
পাইনবনের মাঝেতে হাসছে শৈলাবাস।
প্রতি চক্ষের নীলোৎপলেতে কি সংশয়।
আকাশে বাতাসে অশরীরি কান্না। মেইক' ভয়
জ্বলে নোয়াখালি, জ্বলে কলকাতা, জ্বলছে বেশ।
বন্ধু আমার, এসো এসো দেখো—বাংলা দেশ।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২০

এত করিয়া সঞ্চিত মনের স্নিগ্ধতা কিন্তু এক মুহূর্তেই বিনষ্ট হইয়া গেল।

সূর্যাস্ত হইয়া গিয়াছে, দূর পথ পৌঁছিতেও সময় লাগিবে, টুলু উঠিল। পকেটে ডান হাতটা দিয়া ব্যাগটা ধরিল, সবাইয়ের হাতে দুটা করিয়া পয়সা দিলে কেমন হয়?... একটু ভাবিল, তাহার পর হাতটা বাহির করিয়া লইল, "ভিক্ষে ভিক্ষে" খেলার পর এ যেন নেহাত ভিক্ষা দেওয়াই হইবে; দেওয়ার আনন্দটুকুকে এভাবে কলুষিত করিতে মন সরিতেছে না আজ। বলিল, "কাল আসবি, তোদের দিদিমাকে নিয়ে—নিশ্চয় বুঝলি?"

হাওয়াটা চমৎকার লাগিতেছে, নিজেকে তাগিদ দিতে ইচ্ছা করিতেছে না। ধরো যদি গিয়া দেখেই ম্যানেজারের লোক আসিয়া ভিতরে বাহিরে তালা লাগাইয়া দিয়াছে, বনমালী আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। টুলু প্রসন্ন মনেই ব্যাপারটাকে গ্রহণ করিয়া প্রতিকারে লাগিয়া যাইবে, প্রসন্ন মনে আজ ভাল মন্দ সব কিছুকেই তাঁহার দান বলিয়াই মাথা পাতিয়া লইতে ইচ্ছা করিতেছে যিনি অযাচিত ভাবেই অঞ্জলি ভরিয়া এতখানি দিলেন। আঁকা-বাঁকা নির্জন পথের সব মাটিটুকু মাড়াইয়া টুলু ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

যখন স্কুলের কাছাকাছি, তখন অন্ধকার বেশ গা-ঢাকা গোছের হইয়া আসিয়াছে। পথের ধারটিতে একটি বুনো ফুলের গাছ, একটু লক্ষ্য করিতেই বুঝিল সাকরেদের সেই ছেলেটি যে ফুল সেদিন উপহার দিয়াছিল এ সেই ফুল। বোধ হয় ছেলেটির মিষ্ট স্মৃতির সহিত জড়িত বলিয়াই একটা মায়ায় ভরা কৌতূহল হইল। বড় কাঁটা গাছটায়। হাত বাঁচাইয়া এক মুঠা ফুল সংগ্রহ করিতে খানিকটা সময় লাগিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আবার স্কুলের দিকে পা বাড়াইবে, সামনে খানিকটা দূরে স্কুলের উঁচু রাস্তাটার উপর নজর পড়ায় একেবারে নিশ্চল হইয়া পড়িল।

একটি স্ত্রীলোক—নিঃসঙ্গ—টিলার পথ বাহিয়া সামনে চলিয়াছে; অন্ধকারে সামান্য একটু সন্দেহের পরই টুলু বুঝিতে পারিল স্ত্রীলোকটি চম্পা। চম্পার গতি দ্রুত, মাঝে মাঝে চারি দিকে একবার চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইতেছে; হালকা অন্ধকারে যে গোপনতাটুকু দিতেছে সেটা যেন যথেষ্ট নয়।

মুহূর্তেই টুলুর মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। সেদিন পথ আগলাইতে চম্পাকে অমন করিয়া বলিলেও টুলুর কোথায় একটু বিশ্বাস লাগিয়াছিল সে একেবারে না ফিরুক কিন্তু ফিরি-তেছে; আজ আবার এই সন্ধ্যায় তাহাকে সেই বালিয়াড়ির পথে দেখিয়া তাহার মনটা ঘৃণায় আক্রোশে যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। এই একটু আগেই যে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল ভালমন্দ আজ যাই আসুক সমান ভাবেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিবে। সেটা কোথায় তলাইয়া গেল, মনে হইল এ পৃথিবী অনিবার্য ভাবেই অভিশপ্ত, এখানে কিছুই করিবার নাই তাহার, দুঃখ-দারিদ্র্য-ব্যভিচারের ক্লেদ অঙ্গে লেপিয়া চলিবেই এ নিজের পথে, নিবারণের চেষ্টা একেবারেই নিষ্ফল। ...পাছে দুর্বলতার জন্য আবার ফিরাইতে যায় চম্পাকে এই জন্য টুলু যেন জোর করিয়া পা দুইটা পুঁতিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।...যাক্ পাপীয়সী নিজের পথে।

স্কুলের কাছাকাছি গিয়া চম্পা যেন গতিবেগ শ্লথ করিয়া দিল; শুধু তাই নয়, রাস্তার এধার থেকে ওধার চলিয়া গেল, এবং টুলুর দু-এক বার যেন মনে হইল, গলা একটু বাঁকাইয়া দেখিয়া লইল মাষ্টার মশাইয়ের বাসা থেকে কেহ লক্ষ্য করিতেছে কিনা। একটু আশ্চর্য বোধ হইল, কিন্তু একটা কিছু আন্দাজ করিবার পূর্বেই চম্পা হঠাৎ স্কুলের দেয়ালের পাশে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বর্দ্ধিত বিস্ময়ে টুলু সামনে পা বাড়াইল। একবার শিহরিয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে পিশাচী স্কুলটাকেই তাহার পাপের নিকেতন করিয়া তুলিল না তো! কিন্তু যে কারণেই হউক মন যেন এ চিন্তাটাকে প্রশ্রয় দিতে চাহিল না। বেশ হন্ হন্ করিয়া চলিয়া টিলার উঁচু রাস্তাটায় উঠিল, তাহার পর গতিটা খুব সহজ করিয়া দিল,—চম্পা যদি দেখেই তাহাকে তো এটা যেন সন্দেহ না করে যে টুলু তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছে। নেহাতই যেন বেড়াইয়া আসিল এইভাবে ধীরে ধীরে শিকল খুলিয়া বাসায় প্রবেশ করিল; কেহ তালা লাগাইয়া যায় নাই।

একবার মনে হইল বনমালীকে ডাকে, কিন্তু কি ভাবিয়া সত্য সত্য ডাকিল না; সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছু ভাবিল, তাহার পর অন্ধকার আর একটু গাঢ় হইলে ঠিক করিল নিজেই গোয়েন্দাগিরি করিবে।

উঠানের তেপায়ার উপর বসিয়া গোয়েন্দাগিরি প্ল্যান কষিতে কষিতে হঠাৎ হুঁস হইল নিঃসাড়েই বেশ একটু রাত্রি হইয়া গেছে। বনমালী তখনও ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া যায় নাই। আর একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল, নাতনি আসিয়া নিশ্চয় কিছু জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার জন্য বনমালীর এই ভুল, নয়তো প্রতিদিন সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই তো সে ঘর দুয়ার ঝাঁট দিয়া এ কাজটুকু শেষ করিয়া চলিয়া যায়। টুলু বসিয়া বসিয়া আরও খানিকটা ভাবিল। তাহার চিন্তা

নয়, তবু যেন সমস্যাটা টানিতেছে মনকে। আরও প্রায় আধ ঘণ্টাটাক বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া নিজের এই কৌতূহলে টুলুর নিজের মনেই হাসি পাইল; এমন কি ব্যাপার হইয়াছে যে একটা বিরাট সমস্যা খাড়া করিয়া সে এমন উৎকট ভাবে উৎকণ্ঠিত! এখানে বনমালী থাকে—চম্পার ঠাকুরদাদা সে, কোন কারণে খনির ছুটির পর চম্পা দেখা করিতে আসিয়াছে, নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপার ওদের, এর মধ্যে এত মাথা ঘামাইবার আছে কি? কাজ হইয়া গেলেই চলিয়া যাইবে, হয়তো এতক্ষণ গেছেই চলিয়া, না হয় থাকিবেই- তাহার মধ্যেই বা সমস্যার এমন কি? ...ওর আসার মধ্যে একটা লুকোচুরির ভাব ছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল তখন।...কিন্তু আসলে ছিল কি?—দূর হইতে অন্ধকারে দেখা তো। মনটা হালকা হওয়ায় টুলু মনে মনে হাসিয়া নিজের কাছেই স্বীকার পাইল যে মেয়েটাই এমন, তাহার প্রত্যেক গতিবিধি টুলুর রহস্যময়, বোধ হয় যেন একটা কোণে দাঁড়াইয়াছে। টুলু উঠিয়া দাঁড়াইল, সমস্ত ব্যাপারটা মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাহিরে গিয়া বেশ সহজ কণ্ঠেই বনমালীকে ডাক দিল, একটু পরেই দেখা গেল হাত দুইটা কাপড়ে মুছিতে মুছিতে বনমালী কটক হইতে বাহির হইল; টুলুর খাবারের ব্যবস্থা করিতেছিল, ও হাঙ্গামটা চুকিলেই পৌঁছাইয়া যাইবে; তাহার পর কোমরে পিঠে দারুণ ব্যথা লইয়া অসুস্থ হইয়া পড়িবে, চম্পা তাহাদের রান্না শেষ করিয়া তাহাকে আসিয়া খাওয়াইবে, সেঁক দিবে, সেবা করিবে...তাহার পর গাঢ় নিদ্রার প্রলেপে সমস্ত ব্যাপারটি স্বপ্নে রূপায়িত করিয়া বনমালী সকালে উঠিবে জাগিয়া...এর মধ্যে সে শয্যা লইবার পর কখন নাকি চরণ আর পেল্লাদও আসে, কিন্তু এমনই রোগের ধকল, কখনও দেখা হয় নাই তাহাদের সাথে।

টুলু বলিল—বনমালী এখনও যে আলো জ্বালো নি আমার ঘরে; দেশলাইটাও পাচ্ছি না।

বনমালী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হন হন করিয়া তাহার পাশ কাটাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল, বলিতে বলিতে গেল—"তুমি ছিলেক নাই, আলো জ্বেলে কার উবগারটি করতাম গো? তেল খরচ হয় না? তেল কিনতে পয়সা লাগে না?"

টুলুর মুখে একটু হাসি ফুটিল, তাও তো বটে; বনমালী যে হঠাৎ এক এক সময় অতিমাত্র বুদ্ধিমান বিচক্ষণ হইয়া ওঠে? চম্পার কথা জিজ্ঞাসা করিবে কিনা বা কিভাবে করিবে মনে মনে ভাবিতেছিল টুলু, স্থির করিবার পূর্বেই আলোটা জ্বালিয়া তেমনই হন হন করিয়া বাহির হইয়া গেল বনমালী। টুলু রাস্তার ধারে জানালার তাকে আলোটা রাখিয়া একটা ইংরেজী বই লইয়া শুইয়া পড়িল।

পাঁচ মিনিটও গেল না, বনমালী খাবার লইয়া আসিল। রাত্রেও বসে না, বসার দরকারই হয় না, কেননা টুলু খাইতে রাত্রি করে, বনমালী ঠাঁই করিয়া খাবারটা ঢাকা দিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। বুড়া মানুষ ক্লান্ত থাকে বলিয়া টুলুও রাত্রে গল্পের জন্য আটকায় না। আজ কিন্তু নিজেই ক্লান্ত ছিল, ঠাঁই করিয়া খাবারের থালটা রাখিতেই উঠিয়া পড়িল, আসন গ্রহণ করিতে করিতে বলিল—"খেয়েই নিই, অনেক ঘুরে শরীরটা ঠিক নেই; বনমালী ব্যস্ত আছ নাকি একটু আজ? প্রশ্নটা এমনই বিশেষ কিছু না ভাবিয়াই করিল; হয়তো ভিতরে ভিতরে ইচ্ছা ছিল আজ একটু গল্প করিবার, মনটা আছে ভাল। বনমালী ঢাকনাটা বসাইতে যাইতেছিল; হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিল—"না, ব্যস্ত থাকব ক্যানে?"

হঠাৎ ছেলেমানুষী কৌতূহল জাগিল টুলুর মনে চম্পার কথাটা না হয় তোলাই যাক্ না, প্রশ্ন করিল—"তোমার নাতনিকে আসতে দেখলাম, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

বনমালী হকচকিয়ে টুলুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল একটু। রাত্রের ঘটনাগুলি নিদ্রার ওদিকে স্বপ্ন হইয়া পড়িলেও এদিকে থাকে বাস্তবই; কারণটা ভাল করিয়া না বুঝিলেও এর কোন অংশই যে টুলুর কানে তোলা মানা এটা তাহার সর্বদাই মনে থাকে। টুলু কখনও প্রশ্ন না করায় তোলাও দরকার হয় নাই কোন দিন, আজ টুলু স্বয়ং দেখিয়া কথাটা উত্থাপন করিল, এ অবস্থায় এখন কি করা যায়?

অনেক দিন থেকে দেখিতেছে বনমালীকে, টুলু মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিল ব্যাপারটার মধ্যে কিছু রহস্য আছে, আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন হইবে কিনা ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্বেই কিন্তু বনমালী সামনেটাতে হাঁটু দুইটা জড়াইয়া বসিয়া পড়িল, বলিল—"তা দিখবেক নাই ক্যানে গো? ইর মধ্যে লুকুবার কি আছে বটে? দিখেছ তো হইছে কি?"

এই ধরণের দুর্বল মস্তিষ্ক, যা অপরের সঙ্কেতেই চলে বেশীর ভাগ, সমস্যার মুখে বিচারের ক্ষমতা রাখে না। বনমালীর পক্ষে মাত্র দুইটি জিনিষ সম্ভব ছিল, হয় সাধ্যমত চুপ করিয়া থাকা, না হয় আগাগোড়া সব প্রকাশ করিয়া দেওয়া। টুলু যখন স্বয়ং দেখিয়াছে চম্পাকে তখন চুপ করিয়া থাকার পথ বন্ধ। বনমালী আজকের রাত্রের চম্পার আসার সঙ্গে আগেকার কয়েক রাতের স্বপ্নকাহিনী মিলাইয়া সমস্ত ব্যাপারটি খুঁটিয়া খুঁটিয়া বলিয়া গেল। বিবরণ একটু অদ্ভুতই হইল তবে টুলুর আর এটা আন্দাজ করিতে বেগ পাইতে হইল না যে, যে কারণেই হোক আজ কয়েক রাত্রি হইতে চম্পা বাপ আর প্রহ্লাদকে লইয়া ছুলে আস্তানা গাড়িতেছে। তাহারও মাথা গুলাইয়া আসিতে লাগিল। তাহার পর আরও গুলাইয়া গেল যখন রেকর্ড ঘুরাইতে ঘুরাইতে বনমালী তাহার দিনের অভিজ্ঞতার কাহিনী আনিয়া ফেলিল—অর্থাৎ চম্পার ভাবী শ্বশুরের আনাগোনার কথা।

টুলু কিন্তু কৌতূহল দমন করিয়া চুপ করিয়াই আহার সাঙ্গ

করিল, তাহার মনে হইল ভিতরের কথা যাহাই হোক, প্রশ্ন করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করাটা ঠিক উচিত হয় না। আহার শেষ হইলে বনমলী জায়গাটা নিকাইয়া এঁটো বাসনগুলা মাজিয়া রাখিয়া নিজের বাসায় চলিয়া গেল।

কৌতূহল হইতে টুলু কিন্তু এত সহজে পরিত্রাণ পাইল না, একক অবস্থায় সেটা ক্রমেই বাড়িয়া গেল। যতই ভাবিতে লাগিল মনে হইল ব্যাপারটা পারিবারিক কিছু নয়, কোন উদ্দেশ্যে একটা যেন সাজানো ব্যাপার। কিন্তু কে এর শিল্পী, তাহার উদ্দেশ্যই বা কি? যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল টুলুর অস্বস্তিটাও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শুইয়া ছিল, কিন্তু নিদ্রা হইতেছে না, রাত্রিটাই গরম, নিদ্রার অভাবে আরও গরম বোধ হইতে লাগিল। উঠিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখানেও গরম, দুয়ার খুলিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

উন্মুক্ত জায়গার একটা প্রভাব আছে মনের উপর, টুলুর মনে হইল লুকাচুরি না খেলিয়া সোজাসুজি ব্যাপারটার সম্মুখীন হইলে কেমন হয়। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তাহার বা মাষ্টারমশাইয়ের অথবা উভয়েরই একটা বিপদের অঙ্কুরও থাকিতে পারে; সে ধরিতে পারিতেছে না, তবে এটা ঠিক যে চম্পায়-ম্যানেজারে গলাগলি জায়গাটা একটু অদ্ভুত। আর ইতস্ততঃ না করিয়া টুলু স্কুলের দিকে পা বাড়াইল। একটু যাইতেই দেখে কটকের এদিকের থামটিতে পিঠ দিয়া ওদিকে মুখ করিয়া একটি স্ত্রীলোক পাথরের বৈঠকটার উপর বসিয়া আছে, চম্পাই যে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই; টুলু অগ্রসর হইল।

একটু যাইতেই কাঁকরের উপর চটি-জুতার শব্দে চম্পা চকিত হইয়া ঘুরিয়া একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, আরও দুই পদ অগ্রসর হইতে একটু যেন অস্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"ও, আপনি!"

ক্রমশঃ

জীবন-দর্শন

শ্রীসন্ধ্যা ভাদুড়ী

কে বলে জীবন মায়াময় শুধু সত্য নয়,
কে বলে কেবল মরীচিকা হায় প্রান্তরে,
অমর জীবন আমি দেখিলাম অনিত্যেই,
চরম সত্য, মিথ্যা দোয়ার জাল ছিঁড়ে।
একটি নিমেষে অনন্ত কাল হ'ল দেখা,
একটি আননে নিখিল প্রেমের সোনা লেখা,
একটি জীবনে সব জীবনের আলো ঝরে॥

আশা ভঙ্গের সুখ ভঙ্গের চিহ্নময়
ইতিহাসখানি যদিও চক্ষে এনেছে জল,
তারা সব নয়, তারা সব নয়—পিছনে তার
একটি কোমল দৃষ্টিপ্রদীপ শান্তিময়।
একটি কোমল দৃষ্টি-প্রদীপ জেলেছে আলো
মুছি' নিঃশেষে পুঞ্জ পুঞ্জ তিমির কালো,
একখানি মেঘ দিগন্ত কোণে শ্যামসজল॥

সাধনা-লব্ধ আত্মজ্ঞানের পথ কোথায়,
কোথা জীবনের সব প্রশ্নের হয়েছে শেষ,
লক্ষ্য কোথায়—দীর্ঘ দিনেতে খুঁজে খুঁজে
সহসা পলকে দেখিনু জীবনে দেখিনু সব।

আশা আনন্দ কামনা ব্যথার শতেক দল
একসাথে জেগে নয়নে আমার এনেছে জল,
জ্ঞানমার্গের সোপান-বীথিকা নিরুদ্দেশ॥

আঁখি-কোণে তব ও কিসের আলো অমর্ত্যের,
বিদ্যুৎ-শিখা, তবুও ক্ষণিকে দেখিনু হায়
আমার জীবন-মরণের ইতিবৃত্তখানি,
কোথাও তাহার নাহিক মিথ্যা নাহিক ফাঁক।
প্রতিদিনকার আশা নিরাশার দ্বন্দ্বহীন
চিরকারণ্যে ভরেছে রজনী ভরেছে দিন,
সব তৃষ্ণার শেষ নির্বাণ টানে কোথায়॥

আমি তো দেখিনি এত সুন্দর এই জীবন,
যাত্রাপথের বাঁকে বাঁকে আছে এত আশা,
এত আনন্দ ঝ'রে পড়ে মোর পাশে পাশে,
ব্যাকুল হৃদয় সাড়া পায় নব বন্দনাতে।
আর সংশয় নাই, নাই আর কোন গ্লানি,
অমৃতের ভাগী মৃত্যুরে পার হব জানি,
জীবন-তীর্থে নিয়ে যায় মোরে ভালবাসা॥

শার্দূল-কর্ণাবদান

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা" শিক্ষিত বাঙালী সমাজে সুপরিচিত। ইহা বাংলাদেশে এবং বাংলার বাহিরে ভারতের অন্যত্রও বহুবার নৃত্যগীতসহ অভিনীত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে অপূর্ব্ব আনন্দ দান করিয়াছে।

এই প্রসিদ্ধ রচনার বিষয়বস্তু বৌদ্ধ সং স্কৃত গ্রন্থ শার্দূল কর্ণাবদানের ভূমিকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই অবদানখানি অতি প্রাচীন। ন্যূনপক্ষে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর নিকটবর্ত্তী কোনো সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল।* রচয়িতা কে তাহা অজ্ঞাত। ইহার প্রারম্ভ এইরূপ —

ওঁ রত্নত্রয়কে (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘকে) প্রণাম করি। আমি শ্রবণ করিয়াছি, এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরে জেতবনে অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দ একদিন পূর্ব্বাহ্ণে চীবর পরিধানপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করেন। আয়ুষ্মান নগরে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া, ভোজন সমাপনপূর্ব্বক এক কূপের নিকট আগমন করিলেন। সেই সময় প্রকৃতি নামে এক চণ্ডাল কন্যা (মাতঙ্গদারিকা) সেই কূপ হইতে পানীয় সংগ্রহ করিতেছিল। আয়ুষ্মান আনন্দ সেই চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতিকে বলিলেন : ভগিনী আমাকে পানীয় দাও, পান করিব। ইহা শ্রবণ করিয়া প্রকৃতি আনন্দকে বলিলেন : ভদন্ত আনন্দ, আমি চণ্ডাল-কন্যা। আনন্দ বলিলেন : ভগিনী, আমি তোমার জাতি জিজ্ঞাসা করিতেছি না—পানীয় দাও, পান করিব। অতঃপর কুমারী প্রকৃতি আনন্দকে জল দান করিল। আনন্দ জল পান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

আনন্দ তো প্রস্থান করিলেন। কিন্তু প্রকৃতির অন্তরে তিনি তুফান তুলিয়া গেলেন। তাঁহার আকৃতি, তাঁহার মুখ, তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রকৃতির চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া গেল। প্রকৃতি তাঁহাকে ভালবাসিল। "আর্য আনন্দ যদি আমার স্বামী হন" এই চিন্তা তাহাকে ব্যাকুল করিল। "মাতা আমার মহা বিদ্যাধরী, তিনি (মন্ত্রবলে) আনন্দকে আনিতে পারেন" এই তাহার একমাত্র আশা।

অতঃপর সেই চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি কূপ হইতে কলস গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে উপস্থিত হইয়া, তাহা একান্তে পরিত্যাগ করিয়া, জননীকে বলিল : মা, মহাশ্রমণ গৌতমের শিষ্য শ্রমণ আনন্দকে আমি বিবাহ করিতে চাই। তুমি তাহাকে (মন্ত্র বলে) আনয়ন কর। মাতা বলিল : আমি আনন্দকে আনিতে পারি। কিন্তু কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শ্রমণ গৌতমের অতি অনুগত ভক্ত, তিনি যদি এ কথা জানিতে পারেন তবে চণ্ডাল-কুলের অনর্থ ঘটিবে। কেবল ইহা নহে, শুনিয়াছি শ্রমণ গৌতম বীতরাগ। বীতরাগের মন্ত্র অন্য সমস্ত মন্ত্রকে পরাভূত করে।

মাতা ইহা বলিলে, কন্যা উত্তর দিল : শ্রমণ গৌতম যদি বীতরাগ হন এবং সেইজন্য তাঁহার নিকট হইতে যদি শ্রমণ আনন্দকে না পাই, তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব।

ভয়ের অপেক্ষা স্নেহের শক্তি অধিক। মাতা উত্তর দিল : তোমাকে মরিতে দিব না—আনন্দকে আনিব।

ইহার পর মাতঙ্গিনীর অভিচারক্রিয়া আরম্ভ হইল। গৃহাঙ্গনের মধ্যভাগ গোময়লিপ্ত করিয়া, তাহার মধ্যে বেদী প্রস্তুত হইল। সেই বেদীতে আলিম্পন আঁকিয়া কুশসমূহ সজ্জিত করা হইল। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। তাহার পর অষ্ট শততম অর্কপুষ্প গ্রহণ করিয়া, মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক চণ্ডালী একে একে সেই পুষ্পসমূহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অভিচারের ফল ফলিল। আয়ুষ্মান আনন্দের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল। তিনি বিহার হইতে বাহির হইয়া চণ্ডালপল্লীর দিকে চলিতে লাগিলেন। চণ্ডালী তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া প্রকৃতিকে বলিল : ঐ শ্রমণ আনন্দ আসিতেছে। শয্যা রচনা কর। তখন চণ্ডালিকা প্রকৃতি প্রমুদিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে আনন্দের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

এদিকে আনন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, বেদীর নিকট একান্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অক্ষিযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি রোদন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন : আমি বিপদে পতিত হইতেছি, ভগবান আমাকে নিবৃত্ত করিতেছেন না। তখন ভগবান বুদ্ধ তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন। তিনি বুদ্ধমন্ত্রে চণ্ডালমন্ত্র প্রতিহত করিলেন।

অতঃপর আনন্দ চণ্ডালগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বিহারাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। মাতঙ্গকন্যা প্রকৃতি তাহা দেখিল। সে জননীকে বলিল : মা, ঐ দেখ, শ্রমণ আনন্দ চলিয়া যাইতেছে। জননী উত্তর দিল : শ্রমণ গৌতমের মন্ত্র আমাদের মন্ত্রের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। অতএব উপায় নাই।

এদিকে শ্রমণ আনন্দ ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া অবনত শিরে তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক একান্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান বলিলেন : আনন্দ, তুমি এই ষড়ক্ষরী বিদ্যা গ্রহণ কর। ইহা পাঠ কর। এই ষড়ক্ষরী বিদ্যা, দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রহ্মা এবং ছয় জন সম্যক্ সম্বুদ্ধ উচ্চারণ করিয়াছেন।

---

* এই অবদানখানির চারিটি চীনা ও একটি তিব্বতী অনুবাদ আছে। ইহার মধ্যে একটি চীনা অনুবাদ ১৪৮–১৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ও বাকিগুলি ২২২ হইতে ৩১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সম্পাদিত হয়। অনুবাদের সময় দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা প্রথম শতাব্দী বা তাহারও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। Cf. Nanjio catalogue Nos: 643-46.

ইহা তুমি তোমার নিজের হিতসুখের জন্ম এবং সমস্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উপাসক-উপাসিকার (গৃহস্থগণের) হিতসুখের জন্ম অধিগত হও। ইহার শক্তি অপরিসীম। ইহা অসাধ্যসাধন করিতে পারে।

এদিকে 'চণ্ডালিকা' কিন্তু আনন্দকে ভুলিতে পারিতেছে না। তাহার সমস্ত অন্তর আনন্দ-প্রেমে আনন্দময় হইয়া রহিয়াছে। সে প্রভাতে স্নান করিয়া শুচি হইয়া নগরদ্বারের কপাটমূলে আয়ুষ্মান আনন্দের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

'এই পথেই আনন্দ আসিবেন' ইহাই তাহার আশা। তাহার আশা পূর্ণ করিয়া আনন্দ ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগরে প্রবেশ করিলেন। চণ্ডালিকা তাঁহাকে অনুসরণ করিল। তিনি চলিতে থাকিলে সে চলিতে থাকে, তিনি উপবিষ্ট হইলে সে উপবেশন করে, তিনি দণ্ডায়মান হইলে সে উত্থিত হয়। যে গৃহে আনন্দ ভিক্ষার জন্ম প্রবেশ করেন, সেই গৃহের দ্বারদেশে সে মৌনভাবে অবস্থান করে।

আনন্দ ইহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি দুঃখিত ও দুর্মনা হইয়া শীঘ্র শীঘ্র শ্রাবস্তী হইতে বাহিরে আসিয়া জেতবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অবলুণ্ঠিত মস্তকে বুদ্ধের চরণ বন্দনাপূর্ব্বক সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। অবশেষে কাতর স্বরে প্রার্থনা করিলেন: ভগবান, আমাকে পরিত্রাণ করুন। হে সুগত, আমাকে রক্ষা করুন। ভগবান তাঁহাকে বলিলেন: মা ভৈঃ! আনন্দ, ভয় করিও না।

অতঃপর এক দিন ভগবান বুদ্ধ মাতঙ্গদারিকা প্রকৃতিকে বলিলেন: প্রকৃতি, আনন্দ ভিক্ষুকে তোমার কি প্রয়োজন? সরলা চণ্ডাল-বালিকা নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল: ভদন্ত আনন্দকে পতিত্বে বরণ করিতে চাই। ভগবান প্রশ্ন করিলেন: তোমার পিতামাতা কি ইহা অনুমোদন করিয়াছে? প্রকৃতি বলিল: হাঁ ভগবান সুগত, তাঁহারা অনুমোদন করিয়াছেন। ভগবান বলিলেন: আমার সম্মুখে তাহাদের দ্বারা ইহা অনুমোদন করাও।

অতঃপর চণ্ডালিকা তাহার পিতামাতার সহিত বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইল। বুদ্ধ এ বিষয়ে তাহাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা নিঃসঙ্কোচে উহা অনুমোদন করিল। তখন বুদ্ধ বলিলেন: তাহা হইলে প্রকৃতিকে এখানে রাখিয়া তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। তাহারা সেই আদেশ পালন করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক গৃহে গমন করিল। তখন ভগবান প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন: সত্যই কি তুমি আনন্দকে প্রার্থনা কর। প্রকৃতি বলিল, হাঁ ভগবান সুগত, আমি তাঁহাকে প্রার্থনা করি। ভগবান বলিলেন: তাহা হইলে প্রকৃতি, আনন্দের যাহা বেশ, তাহা তোমাকে ধারণ করিতে হইবে। প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল: হাঁ সুগত, আনন্দের যাহা বেশ, তাহা আমি ধারণ করিব। ভগবান, আমাকে প্রব্রজ্যা দান করুন। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ নীচগতিদায়ক সমস্ত পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ নিঃশেষে পরিশোধন পূর্ব্বক চণ্ডালজাতি (বা চণ্ডাল জন্ম) হইতে মুক্ত করিয়া* শুভপ্রকৃতি প্রকৃতিকে বলিলেন: হে, ভিক্ষুণী তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালন কর।

এই বলিয়া তাহাকে মুণ্ডিত করাইয়া কাষায় বসন দান করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ তখন সেই চণ্ডালকন্যাকে তাঁহার অপূর্ব্ব ধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন। ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর, গভীর হইতে গভীরতর ধর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিতে করিতে প্রমুদিতা প্রহর্ষিতা চণ্ডালিকা বলিয়া উঠিলেন: মূঢ় আমি, শিশু আমি। তাই আনন্দকে স্বামী রূপে চাহিয়াছিলাম। আজ আমি অন্যায়কে অন্যায় রূপেই দেখিতেছি। ভগবানও আমার অন্যায়কে অন্যায় রূপেই দর্শন করুন।

ভগবান বলিলেন: প্রকৃতি কল্যাণধর্ম্মের বৃদ্ধিই তোমার কামনা করা উচিত। উহার হানি প্রার্থনা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

এই ভাবে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি ভিক্ষু আনন্দকে ভালবাসিয়া স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে প্রিয়তমের যাহা প্রিয় সেই সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহাকে ভিক্ষুণীসমাজের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

তাহাতে কিন্তু মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। সমাজ ইহাকে এত সহজে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল না। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণগণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন: কি আশ্চর্য্য! চণ্ডাল কন্যা ভিক্ষুণী হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে! গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের গৃহে প্রবেশ করিবে। রাজা প্রসেনজিৎও তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন: সে কি! চণ্ডালকন্যা ভিক্ষুণী হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের গৃহে প্রবেশ করিবে!

এত বড় ভয়ঙ্কর কথা! সমস্ত নগরে হৈ হৈ রব উঠিল। রাজা তাঁহার রথে চড়িয়া ব্রাহ্মণগণ পরিবৃত হইয়া জেতবনে গমন করিলেন। সেখানে যান হইতে অবতরণ করতঃ পদব্রজে ভগবানের নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক একান্তে অবস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণও নতশিরে ভগবানের চরণ-বন্দনা করিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ সুগতের সহিত বিচিত্র বার্ত্তালাপ করিতে লাগিলেন। কেহ বা পিতামাতার নামগোত্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন, কেহ বা নীরবে অবস্থান করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁহাদের আগমনের অভিপ্রায়, তাঁহারা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই অবগত হইলেন। তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: ভিক্ষুগণ, তোমরা কি ভিক্ষুণী প্রকৃতির পূর্ব্ব জীবনের কথা শুনিতে চাও?

ভিক্ষুগণ আগ্রহ প্রকাশ করিলে ভগবান বলিতে লাগিলেন: পুরাকালে, গঙ্গাতীরে, অতিমুক্ত, কদলী, পাটল ও আমলকী

* বৌদ্ধগণের চিত্তেও চণ্ডাল জাতির প্রতি অবজ্ঞার ভাব ছিল। এখানে উহা প্রকাশ পাইয়াছে।

বনপূর্ণ গহন প্রদেশে সহস্র মাতঙ্গের সহিত ত্রিশঙ্কু নামে মাতঙ্গ-রাজবাস করিতেন। সেই মাতঙ্গরাজ ত্রিশঙ্কুর স্মৃতিপটে তাঁহার পূর্বজন্মাধীত বেদাঙ্গ অঙ্কিত ছিল। তিনি অঙ্গোপাঙ্গ রহস্য নিবর্ণ্ট কৈটভ* সহিত চতুর্ বেদে ও পাঠভেদ সহ ইতিহাস পঞ্চমে (পঞ্চম বেদে মহাভারতে ?) তথা অন্য শাস্ত্রে নিষ্ণাত ছিলেন। সেই চণ্ডালরাজের শার্দূলকর্ণ নামে এক রূপবান ও পরম গুণবান্ পুত্র ছিল।

মাতঙ্গরাজ তাঁহার সেই পুত্রকে তাঁহার পূর্বজন্মাধীত অঙ্গোপাঙ্গাদি সহ বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র-ভাষ্য সহ শিক্ষা দিয়াছিলেন।

কুমার শার্দূলকর্ণ সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলে ত্রিশঙ্কু তাহার বিবাহের জন্য অনুরূপ কন্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই সময় পুষ্করসারী নামে একজন বেদজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ উত্তর-পূর্বদেশে রাজা অগ্নিদত্ত-প্রদত্ত উৎকট নামক (চারি শত গ্রাম পরিমাণ) ব্রহ্মোত্তর ভূমি ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি নামে এক পরম রূপ-গুণসম্পন্না শীলবতী কন্যা ছিল। ত্রিশঙ্কু দেখিলেন এই ব্রাহ্মণ-কন্যা প্রকৃতিই সর্বদিক হইতে শার্দূলকর্ণের অনুরূপা ভার্যা হইতে পারে।

এক দিন অতি প্রত্যুষে মাতঙ্গরাজ ত্রিশঙ্কু সর্বশুক্লা বড়বাযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বিরাট শ্বপাকসংঘ ও অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া উৎকটাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অতঃপর তিনি বিবিধ বৃক্ষাচ্ছন্ন, বিচিত্র কুসুমান্বিত, নানা বিহঙ্গম-কূজিত দেবগণের নন্দন-কানন সম এক উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। সেই রমণীয় স্থানে আশ্রয় লইয়া তিনি ব্রাহ্মণ পুষ্করসারীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি অবগত ছিলেন অধ্যাপক বিদ্যার্থীদের শিক্ষা দিবার জন্য সেখানে আগমন করিবেন।

অবশেষে নিশাবসানে প্রত্যূষ সময়ে ব্রাহ্মণ পুষ্করসারী সর্বশুক্লা বড়বাযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক পঞ্চশত বিদ্যার্থী শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া উৎকট হইতে বহির্গত হইলেন।

মাতঙ্গরাজ ত্রিশঙ্কু, উদীয়মান সূর্যের ন্যায়, জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়, ব্রাহ্মণ-পরিবৃত যজ্ঞের ন্যায়, দাক্ষায়ণী-পরিবৃত দক্ষের ন্যায়, দেবগণ-পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায়, ওষধি-সমন্বিত হিমাচলের ন্যায়, রত্নপরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায়, নক্ষত্রসহ চন্দ্রের ন্যায়, যক্ষগণসহ বৈশ্রবণের ন্যায়, দেবর্ষি-পরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায়, সেই ব্রাহ্মণকে দূরে দর্শন করিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্বক কহিলেন : স্বাগত ! ভো পুষ্করসারী স্বাগত। আপনার শুভাগমন হউক।

ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ পুষ্করসারী বলিলেন : হে (ভো) ত্রিশঙ্কু ! তুমি ব্রাহ্মণকে 'ভো' বলিয়া সম্বোধন করিতে পার না। ত্রিশঙ্কু বলিলেন : হে (ভো) পুষ্করসারী, আমি 'ভো' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি। আপাততঃ একটি কার্যের কথা শ্রবণ করুন। দেখুন, কোন কার্যের আরম্ভ চারি প্রকার প্রয়োজনে হয়। যথা, নিজের প্রয়োজনে, পরের প্রয়োজনে, আত্মীয়ের জন্য এবং সর্বজীবের জন্য। এখানে একটি মহত্তর কার্যের বিষয় বলিতেছি—শ্রবণ করুন। আমার পুত্র শার্দূলকর্ণের জন্য আপনার কন্যা প্রকৃতিকে দান করুন। আপনার কুলানুযায়ী কন্যাপণ, যাহা আপনার উচিত মনে হয় তাহাই আমি দিব।

ইহা শ্রবণ করিয়া বেদপারগ অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পুষ্করসারীর মনের অবস্থা যাহা হইল তাহা আপনারা কল্পনা করুন। তিনি মহাকুপিত হইয়া অতি প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিলেন। ললাটে তাঁহার ত্রিশিখা ভ্রূকুটী অঙ্কিত হইল। অক্ষিযুগল ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। নকুলপিঙ্গল দৃষ্টিতে ত্রিশঙ্কুর দিকে চাহিয়া তিনি কর্কশগম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : ধিক্ ! গ্রাম্য চণ্ডাল ধিক্ ! তুই নিতান্ত দুর্বুদ্ধি। হীন চণ্ডালকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কিনা তুই অপমান করিতে চাস। অপ্রার্থনীয়াকে তুই প্রার্থনা করিতেছিস। বায়ুকে তুই পাশের দ্বারা বন্ধন করিতে চাস। তুই সর্বলোকের কুপাংশু, ঘৃণ্য অধম চণ্ডাল ! তুই শ্বপাক (কুকুরভক্ষী), বৃষল (বৃষহত্যাকারী)। দূর হ' ! কেন আমাদের অপমান করিতেছিস।

ইহার উত্তরে মাতঙ্গরাজ ত্রিশঙ্কু বলিলেন : হে পুষ্করসারী, ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। আলোকে এবং অন্ধকারে, ভস্মে এবং স্বর্ণে যেরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতিতে কি তেমন কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় ?

ব্রাহ্মণগণ আকাশ হইতে অথবা বায়ু হইতে আবির্ভূত হন নাই, কিংবা পৃথিবী ভেদ করিয়া উৎপন্ন হন নাই। চণ্ডালাদির ন্যায় ইঁহারাও যোনিজ। জন্মে সকলেই এইরূপ এক। মৃত্যুতেও সকলেই এক। চণ্ডালাদি অন্য বর্ণের ন্যায়, ব্রাহ্মণগণও তখন পরিত্যক্ত হন—জুগুপ্সিত, অশুচি বলিয়া গণ্য হন।

জীবলোকের পীড়াদায়ক যত কিছু নৃশংস পাপকর্ম (চণ্ডালগণ নহে) ব্রাহ্মণগণই আবিষ্কার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের মাংস ভক্ষণের ইচ্ছা হইল, অমনি বিধি প্রস্তুত হইল—'মন্ত্রপূর্বক বলিদান দিলে ছাগমেষাদি স্বর্গে গমন করে।'

ইহাই যদি স্বর্গের বর্ত্ম হয়, তবে ব্রাহ্মণগণ কেন আপনাদিগকে কিংবা আত্মীয়বন্ধুকে, মন্ত্রপূর্বক বলিদান দেন না। কেন ইঁহারা, মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, ভার্যা ও পুত্র-কন্যাগণকে এই ভাবে বলিদানপূর্বক স্বর্গে প্রেরণ করেন না ! জ্ঞাতি বন্ধু অনুগত প্রজাবর্গ সকলেই তো এই ভাবে সদ্গতি প্রাপ্ত হইতে পারে। পশুদের সদ্গতির জন্য কেন আপনারা যজ্ঞ করিতেছেন ? নিজেকে কেন যজ্ঞে বলিদান দিতেছেন না ?

হে ব্রাহ্মণ ! ইহা কখনও স্বর্গের পথ নহে। রুদ্রচিত

* কৈটভ—এক শ্রেণীর রচনা। উহা কি, ঠিক জানা যায় নাই।

ব্রাহ্মণগণ মাংস ভক্ষণের জন্ত এই ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন।

দেখ ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি, সংজ্ঞামাত্র! ইহাদের মধ্যে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই। সমস্ত এক জানিয়া আমার পুত্রের জন্ত তোমার কন্তা প্রকৃতিকে দান কর! তোমার কুলাহুযায়ী কন্তাপণ যাহা তোমার উচিত মনে হয় তাহাই আমি তোমাকে দিব।

ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ পুষ্করসারী পূর্ববৎ ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া কহিলেন: শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতীয়, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র এই তিন জাতীয়, বৈশ্যের বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতীয়, এবং শূদ্রের শূদ্র এই এক জাতীয় ভার্যার ব্যবস্থা আছে।

এইরূপ ব্রাহ্মণের চারি জাতীয়, ক্ষত্রিয়ের তিন জাতীয়, বৈশ্যের দুই জাতীয় এবং শূদ্রের মাত্র এক জাতীয় পুত্র হয়।

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষ ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, নাভি হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। এই চারি বর্ণের চতুর্থ বর্ণেও তোমার স্থান নাই। অধম বৃষল তুমি! তুমি কিনা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাও। তুমি সত্বর ধ্বংস হও!

অতঃপর মাতঙ্গরাজ ত্রিশঙ্কু উত্তর দিলেন: হে ব্রাহ্মণ! তোমাদের চতুর্বর্ণ কিরূপ তাহা শ্রবণ কর।

শিশুগণ রাজপথে ধূলি লইয়া ক্রীড়া করে। সেই ধূলির পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহারা কাহাকেও ক্ষীর, কাহাকেও দধি, কাহাকেও মাংস, কাহাকেও ঘৃত সংজ্ঞায় অভিহিত করে।

দেখ, বালকের বাক্যে ধূলি কদাচ ঐ সমস্ত খাদ্যে পরিণত হয় না। হে ব্রাহ্মণ! তোমাদের চতুর্বর্ণও ঐরূপ!

সকল মানবই একই প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেশ, কর্ণ, শীর্ষ, চক্ষু, মুখ, নাসিকা, গ্রীবা, বাহু, বক্ষ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর, ঊরু, জঙ্ঘা, হস্ত, পদ, নখ, স্বর, বর্ণ ইত্যাদি কোনও বিষয়েই চতুর্বর্ণের প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

দেখ, গো, অশ্ব, গর্দভ, উষ্ট্র, মৃগ, পক্ষী ইত্যাদি প্রাণীর মধ্যে যেমন প্রভেদ দৃষ্ট হয়, চতুর্বর্ণের মধ্যে তেমন কোনও প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

আম্র, জম্বু, খর্জুর, পনস ইত্যাদি বৃক্ষের মূলে, স্কন্ধে, ত্বকে, সারে, পত্রে, পুষ্পে, সর্বত্র যেরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে সেরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

সুখে, দুঃখে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে, আহারে, বিহারে, মূত্রে, পুরীষে, চতুর্বর্ণের কোথাও কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।* সুতরাং বর্ণ এক—চার নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডালাদি সংজ্ঞামাত্র! সেইজন্তই বলিতেছি—হে পুষ্করসারী, আমার পুত্রকে কন্তা দান কর। তোমার কুলাহুযায়ী কন্তাপণ দান করিব।

ব্রাহ্মণ পুষ্করসারী এবার আর পূর্ববৎ ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনি কি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন? যজুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন? সামবেদ, আয়ুর্বেদ, অথর্ববেদ, কল্প কি আপনি অধ্যয়ন করিয়াছেন? অধ্যাত্মবিদ্যা, যুগচক্র, নক্ষত্রবিদ্যা, তিথিক্রম, কর্মচক্র অথবা অঙ্গবিদ্যা, বস্ত্রবিদ্যা, শিবাবিদ্যা, শকুনিবিদ্যা, রাহুচরিত, শুক্র-চরিত, গ্রহচরিত, লোকায়ত, ন্যায় আদি বিদ্যা কি আপনি অধিগত হইয়াছেন?

ইহার উত্তরে মাতঙ্গরাজ কহিলেন: হে পুষ্করসারী, ঐ সমস্তই আমি অধ্যয়ন করিয়াছি। উহার অধিকও আমি অবগত আছি!

দেখুন, পূর্বে কেবল এক বর্ণ ছিল। তখন ব্রাহ্মণাদি সংজ্ঞা ছিল না। পরে বৃত্তির দ্বারা নরগণের এই সংজ্ঞাভেদ হইল। যাঁহারা পরিগ্রহকে রোগের ন্যায়, শল্যের ন্যায় বর্জনীয় মনে করিয়া, তাহা পরিত্যাগপূর্বক, অরণ্যে পর্ণকুটীর রচনা করিয়া পরমার্থের ধ্যান করিতে লাগিলেন—তাঁহারা ব্রাহ্মণ সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন। যাঁহারা শালিক্ষেত্রাদি রক্ষা করিতে লাগিলেন, সেখানে বীজাদি বপন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় (ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়?) সংজ্ঞালাভ করিলেন। যাঁহারা বিবেচনাপূর্বক যথাসময়ে কর্ম করিয়া সেই কর্ম হইতে নানারূপ অর্থসম্পদ লাভ করিতে লাগিলেন তাঁহারা বৈশ্য বলিয়া গণ্য হইলেন। অন্য যাঁহারা ক্ষুদ্র কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন তাঁহারা শূদ্র* সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন।

ইহার পর মাতঙ্গরাজ বেদবৈদিক, আচার্য, তাঁহাদের সম্প্রদায়ভেদ, বেদের শাখাভেদ সম্বন্ধে নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করিলেন এবং পুনরায় পুত্রের জন্য ব্রাহ্মণ পুষ্করসারীর কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন।

পুষ্করসারী ত্রিশঙ্কুর ঐ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শ্রবণ করিয়া মৌনভাবে, অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তখন ত্রিশঙ্কু বলিলেন: হে ব্রাহ্মণ আপনি যদি আশঙ্কা করেন যে, আপনার কন্যার অসদৃশ পাত্রের সহিত সম্বন্ধ হইবে তবে অবগত হউন, আমার পুত্র শার্দূলকর্ণের ক্রান্তি শীলাদি শ্রেষ্ঠ গুণরাশি সমস্তই রহিয়াছে। আপনাকে পুনরায় বলিতেছি—যজ্ঞাদি প্রাণী-হিংসামূলক কর্ম স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ

---

* তুলনীয়: ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্ম, ৪১।৩৫-৪৩; অশ্বঘোষের বজ্রসূচী।

* ক্ষুদ্র (ক্ষুদ্র) হইতে শূদ্র। শূদ্র শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তিই যুক্তিযুক্ত। মদীয় আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বহুপূর্বে তাঁহার এক প্রবন্ধে শূদ্র শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র হইতেই শূদ্র শব্দের উৎপত্তি—ইহা তাঁহার মত।

নহে। শ্রদ্ধা, শীল, তপ, ত্যাগ, শ্রুতি, জ্ঞান, তথা সর্ববেদের অর্থদর্শনই স্বর্গের কারণ। আমার পুত্রের তাহা রহিয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত আপনার কন্যার সম্বন্ধ স্থাপন করুন। ধার্মিক চণ্ডাল ঘৃণার যোগ্য নহে।

ইহাতেও পুষ্করসারী কোনরূপ উত্তর দিলেন না। তিনি পূর্ববৎ মৌনভাবে অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাহা লক্ষ্য করিয়া মাতঙ্গরাজ বলিলেন: দেখুন, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে—এইরূপ কল্পনা করিবেন না। উহা দোষাবহ। কারণ তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্ক হয়।* ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে ভার্যা সম্পর্ক পশুধর্ম—মানবধর্ম নহে।

আমাদের চণ্ডালকুলেও বহু বেদপারগ ঋষি মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনাদেরও বহু ঋষি মহর্ষির মাতা ছিলেন অব্রাহ্মণী। ঋষি কপিঞ্জলাদের মাতা ছিলেন চণ্ডালী।† পরম তেজস্বী দ্বৈপায়ন ঋষির মাতা ছিলেন নিষাদী। ক্ষত্রিয়া রেণুকা সর্বশাস্ত্রবিদ পরম পণ্ডিত ব্রাহ্মণ পরশুরামকে প্রসব করিয়াছিলেন—সুতরাং তিনিও অব্রাহ্মণী-পুত্র।

হে ব্রাহ্মণ! আমি পুনরায় বলিতেছি—এই বর্ণভেদ সংজ্ঞামাত্র। সুতরাং আমার পুত্র শার্দুলকর্ণকে আপনি কন্যা দান করুন।

ইহার পর পুষ্করসারী ত্রিশঙ্কুকে তাঁহার গোত্র প্রবরাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ত্রিশঙ্কু তাহার বিস্তারিত উত্তর দিলেন। তাহার পর তিনি সাবিত্রীর (গায়ত্রীর) উৎপত্তির ইতিহাস, তথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের পৃথক পৃথক সাবিত্রী পুষ্করসারীকে শ্রবণ করাইলেন।

অতঃপর পুষ্করসারী ত্রিশঙ্কুকে একে একে বহুবিধ বিদ্যার বিষয় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং ত্রিশঙ্কু তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

জ্যোতিষের বিস্তৃত আলোচনা চলিল। অষ্টাবিংশতি নক্ষত্রের প্রত্যেকের কয়টি তারা, কত মুহূর্ত যোগ, কিরূপ সংস্থান, কি আহার, কি দেবতা, কি গোত্র। তাহাদের কে পূর্বদ্বারিক, কে পশ্চিমদ্বারিক, কে উত্তরদ্বারিক, কে দক্ষিণদ্বারিক ইত্যাদি।

গ্রহের কথা। রাত্রি দিবসের হ্রাসবৃদ্ধি, পক্ষ, মাস, বৎসর ও ঋতুর আলোচনা। ক্ষণ, লব ও মুহূর্তের পরিমাণ। মুহূর্তের কত প্রকার নাম। স্থান, কাল ও বস্তুর পরিমাণ ও পরিমাপের বিস্তৃত বিবরণ।

কোন্ নক্ষত্রে কিরূপ চরিত্রের মানব জন্মগ্রহণ করে। নক্ষত্রবিশেষে নগর স্থাপনের ফলাফল। কোন্ নক্ষত্র, কোন্ দেশ বা জাতিবিশেষের উপর আধিপত্য করে। কোন্ ঋতুতে বৃষ্টি হইলে, কত (আঢ়ক বা আঢ়া) পরিমাণ বৃষ্টি হয়। তখন কিরূপ কৃষিকর্ম করিতে হয়। গ্রহণের কথা—উহার প্রকারভেদে দেশ বা মনুষ্যবিশেষের উপর তাহার ফলাফল। কোন্ নক্ষত্রে কোন্ কর্ম করণীয় তাহার আলোচনা।

ভূমিকম্পের কথা—কোন্ নক্ষত্রে ভূমিকম্প হইলে, কোন্ শ্রেণীর লোকের, কোন্ দেশের, কোন্ জাতির কিরূপ ক্ষতি হয়। নানারূপ ভূমিকম্পের নাম, যথা—জলকম্পিতা, বায়ুকম্পিতা, অগ্নিকম্পিতা ইত্যাদি। তাহাদের লক্ষণ—যথা, অগ্নিকম্পিতা ভূমিকম্পে ভীষণ উল্কাপাত হয়। অগ্নি রঞ্জিত বন ও কাষ্ঠাদি দগ্ধ করে, ধূমশিখর দৃষ্ট হয়। সমস্ত ভূমিকম্পের মধ্যে এই অগ্নিকম্পিতাই অধম বা জঘন্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ব্যাধি সমুত্থান—কোন্ নক্ষত্রে ব্যাধি হইলে, তাহা কত দিন স্থায়ী হয়, তাহার ফলাফল কিরূপ।

বন্ধন নির্মোক—নক্ষত্র বিশেষে কারাবন্ধনাদির ফলাফল।

তিলক (বা তিলকালক) অধ্যায়—শরীরের নানা স্থানস্থিত নানারূপ তিলের শুভাশুভ ফল।

নক্ষত্র জন্মগুণ—নক্ষত্রবিশেষে জন্মের ফল।

উৎপাতচক্রাধ্যায়—যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষাদি নানারূপ দৈবাদৈব উৎপাতের কথা।

পুরুষপিপ্যাধ্যায় বা পিপ্যাধ্যায়—নানাবর্ণযুক্ত ব্রণকে (বা ব্রণের ন্যায় চিহ্নবিশেষকে) পিপ্য (বা পিপ্প) বলা হইয়াছে। নক্ষত্রবিশেষে জাত স্ত্রীপুরুষের অঙ্গবিশেষে দৃষ্টপিপ্যের শুভাশুভ ফল।

পিটকাধ্যায়—দাহ ও আঘাত (তিল) চিহ্নকে এবং (নানাবর্ণের) বিস্ফোটককে পিটক বলা হইয়াছে। শরীরে স্থানভেদে উৎপন্ন নানারূপ পিটকের শুভাশুভ ফল।*

স্বপ্নাধ্যায়—নানাবিধ স্বপ্নের বিবিধ ফলাফল।

মাস পরীক্ষা—মাসবিশেষে মেঘগর্জন, বর্ষণ ও গ্রহণাদির ফলাফল।

খঞ্জরীটক জ্ঞান—খঞ্জন পক্ষীকে নানা স্থানে নানাভাবে দর্শনের শুভাশুভ ফল।

---

* তুলনীয়: "ব্রহ্মার মুখ হইতে যদি ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়, তবে ব্রাহ্মণীর জন্ম কোথা হইতে হইল? নিশ্চয় ঐ মুখ হইতেই। তবে তো ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের ভগিনী হইলেন।"—অশ্বঘোষের বজ্রসূচী।

† মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, অধ্যায়, ২১ (তাঞ্জোর সং)।

* বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার ৫২ অধ্যায়ে, পিটকের আলোচনা আছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থের কোথাও পিপ্যের কথা নাই। কোন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধানে পিপ্য বা পিপ্প শব্দ পাওয়া যায় না।

বৃহৎসংহিতার ৫২ অধ্যায়ের শেষে যে ব্রণের উল্লেখ আছে, মনে হয় উহা পিপ্যার্থক বা পিপ্যের প্রতিশব্দ। কেননা আলোচ্য গ্রন্থের পিপ্যাধ্যায়ে কখনও পিপ্য বা পিপ্প, কখনও বা তাহার স্থানে ব্রণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং পিপ্য (বা পিপ্প)-কে ব্রণ (বা আঁচিল) বলা যাইতে পারে।

শিবারুত জ্ঞান—শৃগালের নানা হাঁকে, নানা মুখে, নানা রূপ ডাকের ফলাফল।

পাণিলেখা—বা করতল লেখাধ্যায়।

বায়সরুত জ্ঞান—বায়সের নানারূপ ডাকের শুভাশুভ ফল। তাহার পর ধারলক্ষণ, দ্বাদশ রাশিজ্ঞান, কন্তালক্ষণ, বস্ত্রাধ্যায়।

লুঙ্গাধ্যায়—বীজ কিরূপে উৎপন্ন হইল। কিভাবে তাহা বপন করিতে হয়। কোন্ নক্ষত্রযোগে, কোন্ ঋতুতে কিরূপ বীজ বপন করিতে হইবে ইত্যাদি আলোচনা। তাহার পর 'ধূমিকাধ্যায়' বা অগ্নিহোত্র এবং তাহার পর তিথিকর্ম নির্দেশ।

এই সমস্ত বিত্তাবিষয়ক আলোচনা সমাপ্ত করিয়া মাতঙ্গরাজ ত্রিশঙ্কু বলিলেন: আমি জাতিস্মর। বিগত বহুজন্মের কাহিনী আমার চিত্তে অঙ্কিত আছে। এই বলিয়া তিনি অতীত অনেক জন্মের কাহিনী বিবৃত করিলেন।

তখন ব্রাহ্মণ পুষ্করসারী বলিলেন, ভগবান ত্রিশঙ্কু! আপনি শ্রোত্রীয়শ্রেষ্ঠ। আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, আপনি দেবলোকের মহাব্রহ্মার ন্যায়। আপনি আপনার পুত্রের ভার্যার নিমিত্ত আমার কন্তা প্রকৃতিকে গ্রহণ করুন। শীলরূপ ও গুণসম্পন্ন শার্দুলকর্ণ ও ভদ্রা প্রকৃতি পরস্পরকে আনন্দদান করুন ইহাই আমার অভিরুচি।

ইহা শ্রবণ মাত্র সেই পঞ্চশত বিদ্যার্থী উচ্চস্বরে মহাকোলাহলে প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন: হে উপাধ্যায়! না না! ইহা কদাচ করিবেন না। ব্রাহ্মণ বর্তমান থাকিতে চণ্ডালের সহিত সম্বন্ধ আপনার কর্তব্য নহে।

পুষ্করসারী তাহাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন: জাতি সম্বন্ধে ত্রিশঙ্কু যাহা বলিলেন, তাহা অবিতথ সত্য! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি কোথায়? কর্মবশে সর্বজীব সর্বযোনিতেই ভ্রমণ করিতেছে। কোন জীবই (আকাশ বা) বায়ু হইতে জন্মগ্রহণ করে না। সর্ব বর্ণেই অস্থ, বস্ত্র, কুক্ষিরোগী সমানভাবে রহিয়াছে। সকলেই শুক্ল, কৃষ্ণ, তাম্রবর্ণ। অস্থি, চর্ম, কেশ, নখাদি সকলেরই একরূপ। মাংস, মূত্র, পুরীষাদিও ভিন্ন নহে—এক! সুখ দুঃখাদিও এক। সুতরাং বর্ণ এক—চারি নহে।* কর্মেরই এখানে প্রাধান্য! এই মাতঙ্গরাজ পরম জ্ঞানবান, সর্বশাস্ত্রে কৃতবিদ্য। ইনি শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট; ইঁহার অনুরূপ শীল ও গুণসম্পন্ন শার্দুলকর্ণকেই আমার কন্তা প্রকৃতিকে দান করিতেছি।

ইহার পর শার্দুলকর্ণের সহিত প্রকৃতির পরিণয় হইল। এই উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া ভগবান বুদ্ধ বলিলেন: ভিক্ষুগণ! পূর্বজন্মে আমি ছিলাম মাতঙ্গরাজ ত্রিশঙ্কু। শারদ্বতী পুত্র (বা শারিপুত্র) ছিলেন ব্রাহ্মণ পুষ্করসারী। আনন্দ ছিলেন শার্দুলকর্ণ। এবং চণ্ডালকন্তা প্রকৃতি ছিলেন ব্রাহ্মণ পুষ্করসারীর কন্যা।

এই প্রকৃতি তাঁহার পূর্বজন্মের সেই স্নেহ ও প্রেমের আকর্ষণে আনন্দের প্রতি অনুরক্তা। ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী। এই বলিয়া ভগবান এই গাথা উচ্চারণ করিলেন:

> পূর্বকেণ নিবাসেন প্রত্যুৎপন্নেন তেন চ।
> এতেন জায়তে প্রেম চন্দ্রস্ত কুমুদে যথা॥

'প্রাক্তন এবং বর্তমান এই উভয় জন্মকে অবলম্বন করিয়া প্রেম উৎপন্ন হয়। কুমুদিনীর প্রতি চন্দ্রের অনুরাগ উহার উদাহরণ।'

অতঃপর ভগবানকর্তৃক চতুরার্যসত্য† ও তাহা অবগত হইবার উপায় কথিত হইল। সমস্ত ভিক্ষু সম্প্রদায় তাঁহার অভিভাষণ অভিনন্দিত করিলেন।

---

* তুলনীয়: ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্ম, ৪০।২৩-২৯; ৪১।৩৫-৪৩। মহাভারত, শান্তি, ১৮৮।৭-৮। বজ্রসূচ্যুপনিষদ্।

† চতুরার্যসত্য:—১। দুঃখ, ২। দুঃখের কারণ, ৩। দুঃখের নিরোধ, ৪। দুঃখ নিরোধের পথ।

ক্ষণ শাশ্বতী

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

শেষ রাত এল: কদলীপাতার ঝরিছে হিমের আঁখি—
আর ক্ষণকাল প্রণয় মোদের: প্রভাতের নাহি বাকি।
তোমার স্বপ্ন এখনো রঙীন্ কাঁচের মতন হাসে…
বিরহী-জীবন? রহুক্ সে-কথা স্বপনের উচ্ছ্বাসে।
মোর এ মানসী-উপবনে নীল-বাদামী কুঞ্জ কত
ক'রেছি রচনা: তুমি তাহে বসি দিবানিশি অবিরত,
তব নিশ্বাসের আবেগে মধুর কামনার জালে বোনা—
মদির পবন দিয়াছ ঢালিয়া: করে তারা আনাগোনা।
চঞ্চল কেন? ঐ পুব দিকে কিকে আবিরের রঙ…
মৃত্যুর মতো নীরব মোদের এই ক্ষণ অবসর।
ভাঙিবে কি তাকে? শিহরিবে ঊষা: সহিতে
পারিবে তাহা?
মিনতি আমার প্রেম নিয়ে যাও এনেছি যতনে যাহা।
প্রভাত হয়েছে: আলোর ওপারে ধরণী রয়েছে তব।
ঘন রজনীর শীতল পরশে তুমি তাই অভিনব।

অবলম্বন

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

জনসমাজের বাহিরে সুন্দর একখানি বাঙ্‌লো। হয়ত আজ আর নাই, কিন্তু এক দিন ছিল। আর ছিল মানব-মনের ভাবধারার এক অপূর্ব্ব সমাবেশ। আদান-প্রদানের এক অভিনব প্রাণময় নিঃশব্দ প্রকাশ। কিন্তু সাধারণে তার কোন খবর রাখিত না। রাখিবার কথাও নয়। সমাজের বাহিরে অরণ্যানীর কোলে এর অবস্থিতি, ঘনভাবে মিশিয়া আছে প্রকৃতির সহিত। হয়ত এমনি অখ্যাত অজ্ঞাতই সে আমার কাছেও চিরকাল থাকিয়া যাইত যদি না ঘটনাচক্র আমাকে আকর্ষণ করিত।

সেই কথাই বলিব।

বয়স তখন আমার খুবই কম। কুড়ি হইতে বাইশের মধ্যে। প্রাণে অফুরন্ত উৎসাহ, চলার গতি বেগবান প্রাণবন্ত। একটা কিছু হাতের কাছে পাইলেই হইল। চেহারাটাও তখন নাকি ভালই ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা লইয়া আলোচনা করা বৃথা। তা ছাড়া ভালও লাগে না নিজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকতার কঠিন নিষ্পেষণে সে দিনের কথা এখন রূপকথা বলিয়াই মনে হয়। ভুলিয়া থাকিতেই চাই, কিন্তু পারি না, নিজের অজ্ঞাতেই আসিয়া চেতনার মণিকোঠায় মৃদু টোকা দেয়। জানাইয়া দেয় তাদের অস্তিত্ব। তারা আছে থাকিবেও। কিন্তু যাক সে সব কথা।

বন্ধু দেবব্রত এবং ডুডুর একান্ত অনুরোধে বাহির হইয়া পড়িব স্থির করিলাম। প্রথম গন্তব্য স্থান আমাদের কুচবিহার মেকলিগঞ্জে, সেখানে দিন কয়েক কাটাইয়া জ্বামশিং পর্ব্বতে যাইব এরূপ সিদ্ধান্ত আমরা পূর্ব্বাহ্নেই করিয়া লইলাম। দেবব্রতর দেশ মেকলিগঞ্জে। ডুডুর বাবা জ্বামশিং অঞ্চলের একটা বড় চা-বাগানের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

যাত্রা করিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী আমরা। অসংখ্য অসুবিধা থাকিলেও বর্ত্তমান যুগের সহিত সে দিনের তুলনা হয় না। টিকিট-চেকারের উপদ্রব, ভিখারীদের করুণা আকর্ষণের দলবদ্ধ আক্রমণ কিংবা আবিষ্কারকদলের অভিনব আবিষ্কারের বিজ্ঞাপনের জীবন্ত আবির্ভাব সে যুগে তেমন ছিল না। মোটের উপর অভাব-অনটনের তখন একটা মাত্রা ছিল। ক্ষুধার জ্বালায় অথবা বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যার কাহিনী তখনকার দিনে কেহ কল্পনা করিতেও পারিত না। বর্ত্তমানের সত্য সে যুগে ছিল নরক-কল্পনা। তাই ত আজ বিংশ শতাব্দীর উন্নত বৈজ্ঞানিক জগতের প্রতি চোখ ফিরাইয়া বার বার শুধু এই কথাটাই মনে হইতেছে যে, আমরা কি অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতেছি না ভবিষ্যত আরও নীরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে আমাদের বংশধরদের ঠেলিয়া লইয়া চলিতেছে। আজ, অতীতের কাহিনী বলিতে বসিয়া কত কথাই না মনেপড়িতেছে কিন্তু তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া এই আণবিক যুগের বীভৎসতা আর উলঙ্গ করিয়া দেখাইব না। আমি সে যুগের মানুষ হইলেও যুগধর্ম্মের সহিত সমতালে না চলিয়া উপায় কি! কিন্তু—না আর নয়, বিক্ষুব্ধ মন অনেক দূরে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে। এবারে আসল কথা বলিব।

বার দুই গাড়ী বদল করিয়া পরদিন মেকলিগঞ্জে পৌছি-লাম। সেখানে সপ্তাহখানেক বেশ আনন্দে কাটাইয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম। আমাদের এবারের অভিযান জ্বামশিং পর্ব্বতে। বিচিত্র সে অভিজ্ঞতা! প্রায় সাত-আট ঘণ্টার পথ যেন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। জীবনে সেই আমার প্রথম পর্ব্বত দর্শন। পরবর্ত্তী জীবনে সে সুযোগ বহু বার আমার আসিয়াছে কিন্তু সে চোখে কোনদিন আর পর্ব্বতকে দেখি নাই। সে দিনের সে স্মৃতি ফুলশয্যারাত্রির ক্ষণস্থায়ী এক টুকরা অত্যদ্ভুত অনুভূতির মত আজিও মনের কোণে জড়াইয়া আছে।

জ্বামশিং পৌছিলাম শেষ বেলায়। ডুডুর বাবাকে পূর্ব্বেই জানাইয়া রাখা হইয়াছিল। ব্যবস্থার তিনি কোন ত্রুটি রাখেন নাই। পথের ধকল কাটাইয়া উঠিয়া একটু গোছগাছ করিয়া লইতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। সে রাতটা নিছক বৈচিত্র্য হীন ভাবেই কাটিয়া গেল। কিন্তু পরদিন অতি প্রত্যুষেই তিন বন্ধু একপ্রস্থ পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম। পার্ব্বত্য নদী মূর্ত্তিমতীর শুভ্র জলোচ্ছ্বাস দু' চোখ ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। ডুডু জানাইল, হরিণ শিকারের এটি প্রধান কেন্দ্র। গোটা দুই পর্ব্বতের শেষপ্রান্তে গভীর অরণ্য, যেখানে দলবদ্ধভাবে ছাড়া যাইবার উপায় নাই।

পরদিবস বৈকালে এক পশলা বৃষ্টির পরে চমৎকার মিঠে রোদ দেখা দিল। ডুডুকে দেখিলাম বেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তার বাবার সঙ্গে খানিক কি পরামর্শ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাদের প্রস্তুত হইতে বলিল। হরিণ শিকারে বাহির হইব। শিকারে আমার নূতন হাতেখড়ি হইয়াছে মেকলিগঞ্জে, তাই সবচেয়ে উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম আমি। তিন বন্ধু তিনটা দোনলা বন্দুক এবং জনকয়েক পাহাড়ী পথপ্রদর্শক সহ বাহির হইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যা সমাগত। সূর্য্য পর্ব্বতের আড়ালে অদৃশ্য হইবার উপক্রম করিয়াছে। একটি শিকারও পাইলাম না। ডুডুকে ব্যঙ্গ করিলাম। পথপ্রদর্শকদের তাদের অবোধ্য ভাষায় শ্লেষ করিলাম। শেষ পর্য্যন্ত অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া নীরব হইলাম। কিন্তু পায়ের গতি তখনও আমাদের মন্থর ভাবে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। ডুডু ফিরিবার তাগিদ দিল—দেবব্রত সায় দিল। শ্রবণ-ইন্দ্রিয় আমার সজাগ থাকিলেও দৃষ্টি তদপেক্ষা প্রখর ছিল। উহাদের ইঙ্গিতে

নীরব থাকিতে বলিয়া বন্দুকটা তাক করিয়া ধরিলাম। এক জোড়া ডাগর চোখের ত্রস্ত চাহনি—পরমুহূর্তেই ঝপ করিয়া একটা শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গেই ট্রিগারে আঙুলের চাপ। কিছুক্ষণ চুপচাপ, পরমুহূর্তে আর একটা শব্দ। আমি পাগলের মত অনুসরণ করিলাম। শিকার আহত হইয়াছে ইহা বুঝিলাম তার পলায়নের গতিবেগে। নিজেকে হারাইয়া ফেলিলাম। আমার খুনের নেশা লাগিয়াছে। শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে, কখন সম্মুখে। কিন্তু নেশা আমার কাটিয়া গেল রাত্রির ঘনান্ধকারে। আমি পথ হারাইয়াছি। সঙ্গীদের কোন চিহ্ন নাই। বুকে সাহস এবং হাতে দোনলা থাকিলেও এই অন্ধকার অরণ্যানীর মাঝে নিজেকে বড় অসহায় মনে হইল। গা'টা কেমন ছমছম করিয়া উঠিল। নিজের অবস্থাটা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম। চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার। অরণ্যের এ আর এক রূপ, অপূর্ব্ব, ভয়াবহ। হিংস্র জন্তুর সরোষ গর্জ্জনে চমকাইয়া উঠিলাম। অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু আত্মবিস্মৃত হইলাম না। এই বিপৎসঙ্কুল অরণ্যে অগ্রসর হইয়া যাওয়ার বিপদ যে কতখানি তাহা বুঝিয়াও অন্ধের মত পথ চলিতে লাগিলাম। মাথার উপরে একটি নিশাচর পাখী কর্কশস্বরে ডাকিয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানে আসিল, মনুষ্যকণ্ঠের সুতীক্ষ্ণ হাসি। হঠাৎ অস্বাভাবিক ভাবে চমকাইয়া উঠিলাম কিন্তু ভিতরে ভিতরে খানিক ভরসাও পাইলাম। দ্রুতপদে আরও খানিক অগ্রসর হইয়া গেলাম এবং পরম বিস্ময়ে আবিষ্কার করিলাম যে, আমি একটি বাঙলোর সীমানার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি। আর অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছেন এক শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। সমস্ত দেহটা সোনার মত হালকা ঠেকিল। ব্যগ্রভাবে একটু আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম।

বৃদ্ধ আমার আবেদন শুনিয়াছেন কিনা ঠিক বুঝিলাম না। আমি পুনরায় কাতর কণ্ঠে কহিলাম, আমি বিপন্ন এবং পরিশ্রান্ত। একটু আশ্রয় এবং বিশ্রামের সত্যই আমার বড় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। মানসিক উত্তেজনায় এতক্ষণ সে কথা মনে হয় নাই। মানুষ এবং বাঙলোর সন্ধান পাইয়া দেহ তার দাবি জানাইতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করিল না।

বৃদ্ধ এতক্ষণে কথা কহিলেন, সে ত দেখতেই পাচ্ছি নইলে এই আঁধার রাতে কি আর কেউ সখ করে এখানে বেড়াতে আসে? তিনি এক অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়া আমার সারা দেহটা যেন লেহন করিতে লাগিলেন। তাঁর দৃষ্টির অস্বাভাবিকতায় আমি একটু চাঞ্চল্য বোধ করিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া গেল। তিনি ইঙ্গিতে আমায় অনুসরণ করিতে বলিয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন। দুইখানি জীর্ণ বেতের মোড়ায় দুই জনে মুখোমুখি হইয়া বসিলাম। হাতের দোনলাটি এক পাশে কাত করিয়া রাখিলাম। ঘরের চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইলাম। মূর্ত্তিমান বিশৃঙ্খলা একপাশে এক রাশ বোতল গাদা হইয়া পড়িয়া আছে। অপর পাশে রাশি রাশি বইয়ের স্তূপ। অকস্মাৎ সচকিত হইয়া উঠিলাম আশেপাশে কোথাও চাপা কান্নার শব্দে, এবং আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম বৃদ্ধের চোখে-মুখে বেদনার সুস্পষ্ট আভাস দেখা দিয়াছে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন, এবং খানিক নিঃশব্দে কাটিবার পর পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া উপবেশন করিলেন। কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া কহিলেন, এর চেয়ে ভাল আশ্রয় আর আমার নেই যুবক—একটু থামিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু বিশ্রাম করার সুযোগ তুমি পাবে না। এখানকার আবহাওয়া তার অনুকূল নয়। এই বাঙলোখানাকে ঘিরে রাতের পর রাত যে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি তা সাধারণ দশ জনে বিশ্বাস করবে না। রাতের অন্ধকারেই এর জীবনস্পন্দন সত্য রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং অপূর্ণ ভালবাসাকে কেন্দ্র করে এখানে এক অপূর্ব্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। খাঁটি ভালবাসার স্বাদ বনের পশুও ভোলে না। তাই রোজই রাতের অন্ধকারে ওদের এখানে আবির্ভাব। ওরা খুঁজে ফেরে ওদের হারানো বস্তুকে, পায় না। তাই ওরা কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। ব্যর্থমনোরথ হয়ে তীব্র গর্জ্জন করে। ফিরে যায়। আবার আসে। অবোধ জীব আজও বুঝল না যে সে নেই।

বৃদ্ধ ক্রমশঃই দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িতেছিলেন। কিন্তু তাঁকে কোন প্রকার প্রশ্ন করিয়া ব্যস্ত করিতে মন সরিতেছিল না। কেন তাহা আমি নিজেও বুঝিলাম না। তিনিও হয়তো কথাটা বুঝিয়াছিলেন। কহিলেন, সেই কাহিনীই তোমাকে আজ আমি শোনাব, হয়তো এমনি এক মাহেন্দ্রক্ষণ আর জীবনে পাব না। বুঝলে যুবক।

তিনি একটু থামিয়া পুনরায় সুরু করিলেন,—যাকে নিয়ে আমার এই গল্প তার নাম ছিল সুকুমার। ভাল ঘরের শিক্ষিত ছেলে। সাহিত্যসাধনা এবং চিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্য তাকে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও অচেতন করে রেখেছিল। স্বভাব ছিল অত্যন্ত খামখেয়ালী এবং একরোখা। যখন যেটা মাথায় ঢুকত তাই নিয়েই মাতাল হয়ে উঠত। যুক্তি-তর্কের ধার ধারত না। কিন্তু মনটা ছিল তার ফুলের মত নরম। তাই আজ তুমি এখানে আমি এখানে। পৃথিবীর যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু ভাল তাতেই ওর প্রবল আকর্ষণ। অনুরূপে ওর তীব্র বিতৃষ্ণা তাই বুঝি মরণ-ব্যাধি ওর দেহে আশ্রয় নিলে। সুকুমারের হল থাইসিস্।

সুকুমারের বাবা ডাক্তার, দাদা ডাক্তার, তারা ওর আলাদা ব্যবস্থা করলেন। সুকুমার প্রবল বাধা দিলে। বললে, মানুষ হয়ে মানুষের সঙ্গই যদি তাকে ত্যাগ করতে হয় তা হলে এমন কোথাও সে যাবে যেখানে পদে পদে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে তাদের ভাল-মন্দর সংঘর্ষ বাধবে না।

সুকুমারের দাদা অসন্তুষ্ট হলেন। বাবা অনেক বুঝালেন। মা কান্নাকাটি করে বাড়ীর আবহাওয়াটাকেই ভারী করে তুললেন। সকলকেই সে মৃদু হাসি দিয়ে উপেক্ষা করলে, শুধু তার বাবাকে একান্তে ডেকে বললে, তুমি ডাক্তার, তোমাকে আমার বুঝাতে হবে না। সবদিক বেশ করে ভেবেই আমি এ কথা বলছি, এমন কোথাও আমার থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দাও যেখানে পদে পদে আমাকে মানুষের সংসর্গ লোভাতুর করে তুলবে না। তাদের মধ্যে বাস করে নিজেকে পুরোপুরি নির্ব্বাসন দিতে আমি পারব না। হয়তো আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর দুটো সুস্থ মানুষের অনিষ্ট করে বসব।

কথাটা সুকুমারের দাদার কানেও গেল। তিনি বললেন, জীবনটা সাহিত্য নয়। এতটা ভাবপ্রবণতা সাংসারিক জীবনে অচল। কিন্তু তার বাবা সুকুমারের যুক্তিকে এক কথায় অবহেলা করতে পারেন নি। তিনি শান্ত কণ্ঠে বড় ছেলেকে বলেছিলেন, তোমার দিক থেকে এ কথা তুমি বলতে পার সময়, কিন্তু সুকুমারের দিকটাও আমাদের একবার ভাল করে ভেবে দেখা কর্ত্তব্য। সে তরুণ। যে সময়টা মানুষ রঙীন কল্পনায় স্ফূর্ত্ত, জীবনের সত্যিকারের আরম্ভের উন্মাদনায় চঞ্চল, সেই শুভ মুহূর্ত্তটিকে আমরা এত সহজে ভুলতে পারলেও সে যদি তা না পারে আর এই মা-পারায় হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্ত সুকুমার যদি কতকটা ভাবপ্রবণ হয়েও থাকে আমি বাপ হয়ে তাকে এক কথায় বাতিল করে দিই কেমন করে!

সময় তার মিতভাষী পিতাকে জানত। তাই মিথ্যা বাজে কথার সৃষ্টি সে করে নি। বরং সে তার পিতার কাজে শেষ পর্য্যন্ত নানাভাবে সহায়তাই করেছে।

এই ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যেই সুকুমারকে নিয়ে তার মা এবং বাবা এই পর্ব্বতখণ্ডে অরণ্যানীর কোলে আশ্রয় নিলেন। তাঁরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নূতন করে আরম্ভ করলেন তাঁদের জীবনযাত্রা, একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে। কিন্তু সুকুমার তার জীবনযাপন-প্রণালী এক ভিন্নপথ ধরে আরম্ভ করলে। সুকুমারের মনের অপরিস্ফুট ভালবাসা নবরূপে সজীব হয়ে উঠল। সুকুমারের সাহিত্য এবং শিল্পীমনের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটল। দুর্ব্বার হয়ে উঠল এক নবচেতনায়। ওর পরিপূর্ণ রূপান্তর ঘটল। এক কথায় সুকুমার হয়ে উঠল বন্ধ—উচ্ছৃঙ্খল। সে তার মা-বাবার কাছ থেকেও ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। তাঁরা ক্ষুণ্ণ হতেন, তাঁদের স্নেহপ্রবণ মন আহত হ'ত। সুকুমার তা টের পেয়ে মাকে হেসে বলত, শুধুই ত নিচ্ছি মা, করার ত আমার কিছু নেই তাই বড় ভারী ঠেকে। বইবার শক্তি কম কিনা তাই একটু সাবধান হচ্ছি।

মা আর মুখের প্রতি চেয়ে থাকেন। অতশত বোঝেন না তিনি—বুঝতে চেষ্টাও করেন না। কিন্তু বাপের চোখে-মুখে নীরব ভর্ৎসনা প্রকাশ পায়। যদিও তিনি একটি প্রতিবাদের কথাও মুখে আনেন না। সুকুমার হয়তো একটু লজ্জা পায়, বাপকে একান্তে ডেকে বলে মিথ্যে আমি বলি নি বাবা। কিন্তু মাকে ঠকাতে পারলেও তোমাকে আমি পারব না সে আমি জানি। আমার অসংখ্য উৎপাতের মত এটাও ক্ষমা করে যেও। সুকুমার একটু থেমে প্রসঙ্গান্তরে এল, বললে, একটা ভালুকের বাচ্চা নিয়ে এলাম বাবা। ওরা মানুষের মত কথা কইতে পারবে না—সূক্ষ্ম আত্মবোধশক্তি কোন দিন হবে না। আমার যোগ্য সহচর। সুকুমার কেমন এক প্রকার হেসে প্রস্থান করলে।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণের জন্ত থামিলেন। আমার একাগ্রতায় বাধা পড়িল। ঠিক পাশেই চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সচকিত হইয়া উঠিলাম। নিজের অজ্ঞাতেই দোনলাটা দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিলাম। বৃদ্ধ হয়তো আগাগোড়াই আমায় লক্ষ্য করিতেছিলেন। হাত তুলিয়া বাধা দিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, থাম যুবক—ওরা বন্ধ হলেও মানুষের যথার্থ ভালবাসা পেয়েছে। যার অমর্য্যাদা ওরা কোনদিন করে নি—আজও করবে না। ওটা সুকুমারের সেই বাচ্চা ভালুকটা। তার তিল তিল ভালবাসা ওকে এত বড়টি হবার সুযোগ দিয়েছে। সেই হারানো বন্ধুই ওরা খুঁজে বেড়ায়।

ভালুকটি যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। একটা কথাও আমার মুখ হইতে বাহির হইল না। বিস্ময় বোধ করিলাম। ভাবিতেছিলাম মানবমনের বিচিত্র ভাবধারার কথা। কত পথ ধরিয়াই না ইহার আত্মপ্রকাশ। দেওয়ার মধ্যেই এর সার্থকতা।

বৃদ্ধ একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, সুকুমারের জীবজন্তু-প্রীতি দিনে দিনে একটা ব্যাধিতে রূপান্তরিত হ'ল। কোথা থেকে নিয়ে এল এক জোড়া চিতাবাঘ, ডজনখানেক ময়ূর। যোগাড় করলে দুটো বাঁদর, দুটো হরিণ, গোটাকয়েক বন্ধ মেষ। সেই সঙ্গে এল দুজনা পাহাড়ী ভৃত্য। সে কি তার কর্ম্মব্যস্ততা, কোথায় কেমন করে তাদের গৃহ নির্ম্মাণ হবে। কোন্ কামরাটা কোন্ জন্তু-বিশেষের জন্ত করা হ'ল—কতটুকু লম্বা কতটুকু প্রস্থ হলে চিতাবাঘের কামরাটি আরামদায়ক হবে—মোট কথা ওদের সুখ-সুবিধার জন্ত নিজেকে সে ভুলে গেল। নিজেকে এক তিল অবকাশ দিতে সে নারাজ। ঐ শিশু জীবরাজ্যের সে হ'ল একচ্ছত্র অভিভাবক। ওদের স্নানাহার থেকে আরম্ভ করে সবকিছুর তদ্বিরের ভার সে নিজে হাতে তুলে নিল। ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। এক নূতন চেতনায় আত্মভোলা।

বৃদ্ধ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ইঙ্গিতে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে বলিয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্তায় তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম। পাশের ঘরে আসিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। অন্ধকার ঘরের মধ্যে

সর্ব্বপ্রথমে চোখে পড়িল দু' জোড়া চলমান জলন্ত চোখ। মানুষের সাড়া পাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। নিজের অজ্ঞাতেই চমকাইয়া উঠিলাম। বৃদ্ধ কহিলেন, ভয় নেই আলো জ্বালাচ্ছি।

একখানি বহুদিনের অব্যবহৃত শয্যার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘ্রাণ লইতেছে একজোড়া চিতাবাঘ। বাঁদর দুইটা দুর্ব্বোধ্য ভাষায় এক প্রকার শব্দ করিয়া থরময় লাফাইয়া ফিরিতেছে। কয়েকটা বন্যমেষ নির্ব্বোধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। গোটা-কয়েক ময়ূর, দুইটা হরিণ এবং ভালুকটাও এদের দলপুষ্টি করিয়াছে। উহারা জাতিগত পার্থক্য এবং স্বভাবগত হিংসাকে ভুলিয়াছে। উদ্দেশ্য উহাদের এক, তাই হয়তো বিভেদ নাই অথবা ভালবাসার যাদুস্পর্শে উহারা এক গোষ্ঠিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। আমাদের উপস্থিতি ক্ষণিকের জন্য উহাদের গতিরোধ করিল। চিতাবাঘ দুইটা একবার চোখ তুলিয়া চাহিল। বাঁদর দুইটা বারকয়েক আমাদের কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিয়া পুনরায় ফিরিয়া গেল। আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বৃদ্ধ একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, সুকুমারের কবরের পাষাণ তার অস্তিত্বকে চাপা দিয়েছে তাই ওদের আসক্তি তার শোবার ঘরে। বিশেষ করে সুকুমারের শয্যার উপর।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বৃদ্ধ কহিলেন, চল—

পুনরায় দুই জনে মুখোমুখি বসিলাম। বৃদ্ধ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ভিতরে যেন একটা প্রবল ঝড় চলিতেছে। তাঁর মুখ দেখিয়া অনুমান করিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণেই সে ভাব কাটাইয়া উঠিয়া তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন :

তাদের নিষ্প্রাণ বাড়ীখানা সহসা প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর হয়ে উঠল। হাঁক-ডাক চেঁচামেচি লেগেই আছে। সুকুমার বলে, চাকর ছুটো কাজ করে শুধু পয়সার জন্য। নইলে দয়ামায়া বলে কোন পদার্থ ওদের নেই ; অবোলা জীব, ওদের খাওয়াদাওয়ায় উপরও চুরি। তাই নিজেকেই তার সবকিছু দেখতে হয়। পাছে তার অত্যধিক কায়িক পরিশ্রমে তার মা বাবা আপত্তি করেন এ তারই মুখবন্ধ। বাপকে গিয়ে অত্যন্ত সঙ্গোপনে বললে, মানুষ-চিকিৎসা এবার ছেড়ে দাও বাবা, পোষ্য তোমার এখন জীবজন্তুই বেশী। পশুচিকিৎসার খানকয়েক বই আনিয়ে নাও বাবা।—বই তার বাবাকে আনাতেই হয়। না এনে উপায় কি। আজ ওর চিতাবাঘের সর্দ্দি, কাল ভালুকের জ্বর আর এই নিয়ে সুকুমারের রাত্রি জাগরণ। বাপ হয়ে তিনি এটা চোখের উপর দেখেন কি করে।

সুকুমারের মা শেষ পর্য্যন্ত গোলমাল বাধালেন, এ তুমি করছ কি ? তুমি বাধা দিতে পার না ? এই অনিয়ম অত্যাচার ঐ রুগ্ন শরীরে—তিনি কথাটা শেষ না করেই কান্নাকাটি সুরু করেন। সুকুমারের বাবা চুপ করে থাকেন। কি জবাব দেবেন তিনি।

পৃথিবীর সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার হিসাবনিকাশ সে যদি এমনি করে করতে চায় করুক। সুকুমারের বুকের বুভুক্ষিত ভালবাসার বেগ যারা বিচার করতে বসবে না তাদেরই সে বেছে নিয়েছে। কেমন করে এ সম্বলটুকু তিনি তার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন।

সুকুমারের মা কোন কিছুই তলিয়ে দেখবেন না। শুধু একটা নিষ্ঠুর আশঙ্কা তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। শুধু বেঁচে থাকাটাই জীবনে সব নয়—আত্মার দাবি যে তার চেতনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে যার একটাকে বাদ দিলে অপরটা নিরর্থক হয়ে যায় এ কথা তাকে বোঝাবে কে ?

সুকুমারের মা বলেন, এমনি করে সত্যিই আমি আর পারছি না।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণের জন্য থামিলেন। চোখ বুজিয়া কি চিন্তা করিয়া লইয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, সুকুমারের মাকে বেশী দিন সহ্য করতে হ'ল না। একদিন হঠাৎ তিনি চিরতরে চলে গেলেন।

সুকুমারের বাবা এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিহ্বল হয়ে পড়লেন। সুকুমার কিন্তু কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করলে না। অতি সহজভাবেই মৃত্যুটাকে গ্রহণ করেছে এমনি একটি ভাব প্রকাশ করলে। কিন্তু সে তার মাকে দাহ করতে দিলে না। বাপ তার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এত বড় ধর্ম্ম-বিরোধী এবং নীতিবিরুদ্ধ কাজ তিনি করতে দিতে পারেন না। কিন্তু সুকুমার একেবারে ইস্পাতের মত কঠিন, তাকে কিছুতেই ভাঙা গেল না। সে তার বাপের কথায় প্রতিবাদ করে বললে, ধর্ম্ম, ন্যায়, নীতি ওসব সমাজের জীবদের জন্য, আমাদের জন্য নয়। অন্তরের দাবিই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তার ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করবার জন্য কোন অনুশাসন ত আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে নেই বাবা যে তাদের মানতে হবে। আমাদের মন যা চায় সেই আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের ন্যায়ের গণ্ডী।

এর পরে সুকুমারের বাবা আর বাধা দেন নি। মোট কথা বাধা দেবার কোন শক্তিই তাঁর ছিল না।

সুকুমার তার মাকে মাটির তলায় শুইয়ে রাখলে। সেখানে নিজ হাতে গড়ে তুললে এক স্মৃতিসৌধ। তারপর··· তারপর সেই হতভাগা পাষণ্ড কি বললে জান—

বৃদ্ধ মুহূর্ত্তের জন্য থামিলেন। মুখের প্রতিটি শিরা উপশিরা কর্কশ কঠিন হইয়া উঠিল। চোখের চাহনিতে একটা পাগল উদ্‌ভ্রান্ত ভঙ্গী। আগাগোড়াই তিনি যেন একটি ভিন্ন মানুষ। কণ্ঠস্বরে দেখা দিল উত্তেজনা। তিনি পুনরায় কথা কহিয়া উঠিলেন, সেই দুর্মুখ ছেলেটা তার বাপকে বললে, মার পাশে আর একটা সৌধ করে রেখেছি বাবা আমাকেও তুমি ওখানেই শুইয়ে রেখ।

বৃদ্ধ হাঁপাইতে লাগিলেন কিন্তু কিছুক্ষণেই সে ভাবটা কাটাইয়া উঠিয়া তিনি পুনরায় উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,

কথাটা বলতে সুকুমারের কণ্ঠস্বর একটুও কাঁপে নি। তার মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হয় নি। ও কসাই—হৃদয়হীন কসাই। তার এই নিষ্ঠুর আঘাতে সুকুমারের বাবা চিৎকার করে উঠেছিলেন—কুমার—তাঁর সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে তখন কাঁপছিল।

আমি লক্ষ্য করিলাম বৃদ্ধের সমস্ত শরীরটাও তখন দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। এতক্ষণ মনের কোণে যে সন্দেহটা আনাগোনা করিতেছিল তাহার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলাম। এরা আমার কেউ নয়—আগামী কাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে এখান হইতে চলিয়া যাইব। হয়তো জীবনে আর কোন দিনও সাক্ষাৎ ঘটিবে না। কিন্তু তথাপি বড় বেদনা বোধ করিলাম। বৃদ্ধ অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন। তাঁর পদভারে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সহসা তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, সুকুমার মরেছে। তাঁর শেষ ইচ্ছা আমি নিজ হাতে পূরণ করেছি। আমি বাপ হয়ে তাকে নিজ হাতে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি—

আমি লক্ষ্য করিলাম তাঁর দু'চোখ সজল হইয়া উঠিয়াছে, পরমুহূর্ত্তেই শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম একটা বিকট ভয়াবহ অট্টহাস্যে। তাঁর হাসির সঙ্গে সমতা রাখিয়া আমার আশেপাশে গর্জ্জন করিয়া উঠিল এক জোড়া চিতাবাঘ—আর সুকুমারের অত্যন্ত পোষ্যবৃন্দ যারা তার ভালবাসার সুখস্পর্শের সন্ধানে এই কুটীরের আশেপাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। সুকুমার নাই—কিন্তু ভালবাসা দিয়া যাদের সে জয় করিয়া গিয়াছে তারা নাকি রোজই আসিয়া এই বাঙ্‌লোর অঙ্গনে উপস্থিত হয়। খুঁজিয়া ফেরে তাদের হারানো বন্ধুকে। পায় না। চলিয়া যায়। আবার ফিরিয়া আসে।

* * *

পরদিবস অতি প্রত্যূষে ফিরিয়া আসিলাম। ডুমু আমাকে জড়াইয়া ধরিল। দেবব্রত খুশী হইলেও, গোঁয়ার বাঙাল বলিয়া উপহাস করিল। ডুমুর বাবা বলিলেন যে, সাহস থাকা ভাল কিন্তু অতি সাহস গোঁয়ার্ত্তুমির নামান্তর যা প্রায় সব সময়ই বিপদ ডেকে আনে। আমার মা-বাবার নাকি অত্যন্ত পুণ্যের জোর তাই জীবন্ত ফিরিয়া আসিয়াছি।

বুঝিলাম আমার আশা তিনি এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। ইহার পরে আমাকে সম্মুখীন হইতে হইল ডুমুর এবং দেবব্রতর অসংখ্য প্রশ্নের, যার উত্তর দিতে গিয়া আমাকে গত রাত্রের কাহিনী আগাগোড়া বিবৃত করিতে হইল।

ডুমু এবং দেবব্রত অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়িল। ডুমুর বাবা একমুখ হাসিয়া কহিলেন, তাই বল। সেই পাগলা বুড়োর পাল্লায় পড়েছিলে। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ—

কিন্তু উহাদের বিশ্বাস অবিশ্বাস অথবা টীকাটিপ্পনীতে আমার কিছুই আসিয়া যাইবে না। যে ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, স্নেহ এবং ভালবাসার যে সত্য রূপ আমার চোখের সম্মুখে জীবন্ত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল তাহাকে উহারা যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুক না কেন আমার কাছে চিরদিন তাহা শাশ্বত অমর হইয়া থাকিবে।

কোন্ পথে ?

শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী, এম্-এ

আণবিক বোমার বিস্ফোরণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে আর ভবিষ্যতের বিভীষিকাভীত মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে—কোন্ পথে ? এ প্রশ্নের ঠিক মত উত্তর পেতে হলে আমাদের দেখতে হবে মানুষের প্রগতি এত দিন কোন্ পথে হয়েছে, মানুষ কি চেয়েছে আর কি পেয়েছে, আর এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে সে কি চায়।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় মানুষের মনের ইচ্ছা সুখে-শান্তিতে স্বচ্ছন্দে বাস করা। কিন্তু দেখতে পাওয়া যায়, তাকে বার বারই এই জন্যে লড়াই করে আসতে হয়েছে প্রতিবেশীর সঙ্গে। প্রথম যুগে তাকে খাওয়া দাওয়া আর বেঁচে থাকার তাগিদে লড়াই করতে হয়েছে বন্য জন্তুর সঙ্গে, হাজার হাজার বছর ধরে। তার পর বুদ্ধি খাটিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে আর চাষ-বাস করে যখন একটু নিরাপদ হ'ল আর সভ্যতা গড়তে লাগল, তখন থেকে আবার সুরু হ'ল লড়াই পরস্পরের মধ্যে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখি ছবির পর্দ্দায় যেন চলেছে যোদ্ধার সারি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে—হামারুবি, সারাগন, দারিয়ুস, আলেকজাণ্ডার, হানিবল, সিজার, চেঙ্গিস খাঁ, সার্লেমঁ, নেপোলিয়ন, কাইসর, হিটলার এঁদের বিরাট বাহিনীর নানা যুগের নানা অস্ত্রশোভিত অভিযানের এক বিপুল সমারোহ সব কিছুকে যেন ছাপিয়ে উঠেছে। কোন যুগে কোন দেশে যুদ্ধ ছাড়া যেন গতি নাই। এই যুদ্ধের মূলসূত্রের মধ্যে, এরই কারণের মধ্যে নিহিত আছে মানুষের চাওয়া।

এই যুদ্ধের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, শুধু সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে চাওয়াই মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা নয়। সে চায় বড় হয়ে উঠতে। ব্যক্তিগত ভাবে বড় হয়ে উঠবার জন্য যুদ্ধ ছিল প্রধান উপায় আদি যুগে ও মধ্য যুগে। তখন রাজাদের মধ্যে, সামন্তদের মধ্যে এই নিয়ে হয়েছে যুদ্ধ এবং তাঁদের অধীন প্রজাদের হতে হয়েছে বাধ্য হয়ে তাঁদের সহযাত্রী যোদ্ধা। তার

পর বর্তমান যুগে যখন এক একটা দেশ এক এক রাজার অধীন কিম্বা শক্তিশালী এক শাসন-ব্যবস্থায় একটা পরিধি নিয়ে এক জাতি রূপে দানা বেঁধে উঠেছে তখন থেকে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছে আর জাতিতে জাতিতে বড় হয়ে উঠবার প্রতিযোগিতায় যুদ্ধ হয়েছে। যেমন ইংরেজ আর ফরাসীদের বড় হয়ে উঠবার প্রতিযোগিতায় লড়াই হয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং তাতে জয়লাভ করে ইংরেজ জগতের বাজারে জেঁকে বসতে পেরেছে। তার পর এই প্রতিযোগিতায় ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যায় জার্মেনী। অটোভন বিসমার্ক অতুলনীয় প্রতিভা ও কূটনীতি-বলে জার্মানীর বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলোকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে মিলিত করেন, জার্মান সামন্তদের এক রাষ্ট্রের পতাকাতলে এনে গড়ে তোলেন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জার্মান জাতিকে। তার পর থেকে এক উদগ্র জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে বড় হওয়ার জন্য ও উপনিবেশ স্থাপনের জন্য সুরু হয় তীব্র প্রতিযোগিতামূলক লড়াই। ক্রমে দেখতে পাওয়া যায় যে, একক এক দেশ আর এক দেশকে এঁটে উঠতে পারছে না। দুই তিনটি শক্তিশালী দেশ নিয়ে এক একটা মিলিত প্রতিরোধ তৈরি হতে লাগল এই প্রতিযোগিতায়। বিংশ শতাব্দীর দুইটি মহাযুদ্ধই এইরূপ মিলিত জাতিসমষ্টির মধ্যে ঘটে। গত পূর্ব্ব বারে এক দিকে ছিল জার্মেনী, অষ্ট্রিয়া, তুর্কী—আর এক দিকে ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি (প্রথম দিকে) ও আমেরিকা। আর এবারে জার্মানী, ইতালী, জাপান একদিকে—আর একদিকে ছিল ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়া, আমেরিকা ও চীন। ইংরেজদের পক্ষ জিতেছে; ফলে জগতের প্রভুত্ব এখন ইংরেজ, আমেরিকা ও রাশিয়ার হাতে এসে পড়েছে। এবার এই তিন বন্ধু মিলে মিশে সকল মানুষের সমানাধিকার ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে এক অখণ্ড শান্তিময় মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলবার কাজে লাগবে, না প্রভুত্বের নেশায় যার যার পাতে ঝোল টানবার সেই পুরাতন অবস্থার জের টেনে আবার যুদ্ধকে জাগিয়ে তুলবে?

আদর্শের দিক থেকে দেখলে এই তিন বন্ধু এখন আসলে দুই দলে ভাগ হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকা এবং ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গী কতকটা এক রকম—সেই পুরাতন জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্য গড়ার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে আলাদা—সকল মানুষের সমানাধিকার এবং ন্যায়সঙ্গত ধন-বণ্টনের ভিত্তিতে গঠিত সাধারণতন্ত্রের ধারা। এই দুই বিভিন্ন আদর্শবাদীর দল গত মহাযুদ্ধে মিলেছিল প্রবল পরাক্রান্ত জার্মেনীর হাত থেকে রেহাই পাবার তাগিদে। সেই প্রয়োজন ফুরাতেই এখন পরস্পরের আদর্শগত বিরোধ—উভয় মিত্রালিতে কাটল ধরাতে সুরু করেছে। স্পষ্ট যেন দেখা যাচ্ছে দুই দলে আবার একটা ভাল রকম ঠোকাঠুকি হয়ে এক দলই শেষে জয়ী হবে, যার পতাকাতলে বা যাকে আশ্রয় করে জগতে তার পর আসবে অখণ্ড মানবগোষ্ঠীর মিলন।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, গোড়া থেকেই মানুষের মিলনের পরিধি ক্রমে বেড়েই চলেছে। আদিম যুগে দলপতির অধীন ছোট ছোট গোষ্ঠীতে মানব ছিল সঙ্ঘবদ্ধ। তার পর মধ্য যুগে দলপতিদের কেউ কেউ পরাক্রান্ত হয়ে কয়েক গোষ্ঠী বা দলকে নিজের অধীন করে সামন্তরাজ্যে মানুষের দলকে আরো বড় পরিধিতে মেলাতে থাকে। এক একটা দেশে কয়েকজন সামন্তরাজ জায়গায় জায়গায় দুর্গ-প্রাকার তৈরি করে স্ব-স্ব রাজ্যে স্বাধীন ভাবে থাকতেন এবং সেই অঞ্চলের লোকেদের নিজের অধীনে পরিচালিত করতেন। হাজার বছর ধরে জগতের অনেক জায়গায়, বিশেষতঃ ইউরোপে এই ধারা চলে। একে ইতিহাসে মধ্য-যুগ বলে। পরের যুগে (পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী থেকে) এই সব সামন্তরাজদের মিলতে দেখা যায় এক এক জন পরাক্রান্ত রাজার অধীনে, আর তখন থেকে এক একটা রাষ্ট্র গড়ে উঠতে দেখা যায়—যেমন ইংলণ্ড রাজা ক্যানুটের অধীনে, ফ্রান্স হুগ ক্যাপেটের অধীনে, জার্মানী ফ্রেডারিকের অধীনে। এই সব পরাক্রান্ত রাজাদের অধীনে এক একটা দেশ নিয়ে দানা বেঁধে উঠতে থাকে জাতীয়তার যুগ। মানুষের মিলনের ক্ষেত্র সামন্ততন্ত্র থেকে জাতীয়তার বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত হতে থাকে। সময় সময় অবশ্য দেখা গিয়েছে, আলেকজাণ্ডার, সিজার, চেঙ্গিস খাঁ, নেপোলিয়নের মত প্রবল পরাক্রান্ত এক এক জনের দিগ্বিজয়-অভিযানের মধ্যে মানবসমাজকে কয়েক দেশ জুড়ে এক বৃহত্তর রাষ্ট্রে মেলাবার চেষ্টা। আজ আমরা যুদ্ধকে যতই নিন্দা করি না কেন, এই যুদ্ধ এবং বড় হওয়ার প্রয়াসের মধ্যে, এই সব বিখ্যাত বিজয়ীদের বিপুল অভিযানের মধ্যে, প্রাচীন ভারতে রাজসূয় যজ্ঞ করে রাজচক্রবর্ত্তী হওয়ার মধ্যে, দেখা যায় মানবগোষ্ঠীকে বৃহত্তর পরিধিতে মেলাবার প্রয়াস। কিন্তু মিলনের আয়োজন তখন সম্পূর্ণ না হওয়ায় সে সব প্রয়াস সফল হয়ে ওঠে নি। মনের দিক থেকেও মানুষ তৈরি হয়ে ওঠে নি আর চলাচলের বাইরের বাধাও দূর হয় নি আজ যেমন এরোপ্লেন, বেতার পৃথিবীতে ব্যবধানের বাধা দূর করছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে দেখা গিয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রাচীর মানব-গোষ্ঠীর মহামিলনের এক দুস্তর প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের দুই মহাসমর সেই প্রাচীর যেন ভেঙে দিয়েছে। জার্মেনী ও জাপানের শোচনীয় ব্যর্থতায় সেই মোহ কেটে যাচ্ছে। ক্রমবিকাশের ধারায় 'গোষ্ঠী'র, 'সামন্ততন্ত্রে'র, 'রাজা'দের খেলা শেষ হয়েছে, আর শেষ হয়েছে এক জাতির সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে অপর জাতির ওপর প্রভুত্ব করার প্রয়াস। জার্মেনী সামরিক শক্তিতে এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, জগতে কোন এক

জাতি একক তাহার সমকক্ষ হতে পারে নি, কিন্তু তারও আসুরিক শক্তিতে জগতে প্রভুত্ব করার নেশা বিনষ্ট হয়েছে। এখন আরো বৃহত্তর রাষ্ট্র-গঠনের যুগ এসেছে—আমেরিকার প্রভাবাধীন জগৎ আর রুশিয়ার প্রভাবাধীন জগৎ ইতিমধ্যেই যেন গড়া হয়েছে।

এখন দেখা যাক, শুধু বড় হয়ে ওঠার প্রয়াস ছাড়া আর মানুষের মিলনের সূত্র পাওয়া গিয়েছে কিনা। ক্রমবিকাশের ধারায় প্রকৃতি যেমন একদিকে মানবগোষ্ঠীকে ক্রমে বৃহত্তর মিলনের পথে নিয়ে চলেছেন আর একদিকে তার শৃঙ্খল-মোচনও ক্রমশঃ করে চলেছেন। আগের যুগের রাজাদের ও সামন্তদের অত্যাচার ও প্রভুত্ব অচল হয়ে এসেছে। ফরাসী বিপ্লবের বহ্নিরেখায় সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে জনসাধারণের শৃঙ্খলমোচনের যে মন্ত্র ফুটে ওঠে তা পরবর্ত্তী-কালে ক্রমে রূপ নিতে থাকে আর মানুষের শৃঙ্খলমোচন হতে থাকে। অনেক দেশে সাধারণতন্ত্র ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর যে সব দেশে রাজা আছেন তাঁকেও সাক্ষী-গোপাল হয়ে থাকতে হয়েছে, আসল ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে এসেছে। বর্ত্তমান যুগে রাজাদের জায়গায় কলকারখানা ও বড় ব্যবসায়ের মালিকেরা অর্থনীতির ভিত্তিতে অনেক মানুষকে শ্রমিকে পরিণত করেছে। এর পরের ধাপে আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রভাবের প্রাচীর ভেঙে যদি শুধু একক রাশিয়ার প্রভাবই সারা জগতে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ত কথাই নেই। মানুষের চেতনায় ন্যায়বোধের ধারা ক্রমেই জাগ্রত হয়ে উঠছে। এমন এক দিন ছিল, জগতের বড় বড় সভ্য জাতিরা আফ্রিকা ও অন্য দেশ থেকে মানুষ ধরে নিয়ে দাস-ব্যবসা করত, কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষের ন্যায়বোধ জাগ্রত হয়ে তা জগৎ থেকে একবারে দূর করে দিয়েছে। এক জাতির আর এক জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার দিনও ফুরিয়ে এসেছে। মানুষের দীপ্ত ন্যায়বোধের কাছে সকল দেশেই পরাধীনতা অসহ্য হয়ে উঠেছে। মানুষ আর কিছুতেই পরাধীনতার শৃঙ্খল সহ্য করবে না। আণবিক বোমার অধিকারী হয়েও আর কেউ কাউকে পরাধীন রাখতে পারবে না। ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় শৃঙ্খলমুক্ত এক মহামানব-গোষ্ঠীর মিলন যেন জগতে রূপ নেবার জন্য প্রতীক্ষা রয়েছে।

মানুষের প্রগতির ধারায় সামন্ততন্ত্র বহুদিন অচল হয়েছে, রাজতন্ত্রের দশাও তাই। যে জাতীয়তা-বোধ এত দিন তাকে প্রেরণা দিয়ে বড় বড় যুদ্ধের খোরাক যুগিয়েছে তাও আজ অচল হতে চলেছে। আজ তার সম্মুখে ভাসছে মহামানবের মিলনের মহামন্ত্র। পুরাতন খাতে নিজেকেই শুধু বড় করবার, নিজের জাতিকেই শুধু বড় করবার আয়োজন করলে তা ব্যর্থতাই আনবে। সকল মানুষের মিলনের ও কল্যাণের, সকল মানুষ মিলে বড় হবার প্রয়াসের মধ্যেই আছে ভাবীকালের আহ্বান। আর বহু যুগের সাধনায় মানুষের শৃঙ্খল, মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব, জাতির ওপর জাতির প্রভুত্ব আজ মুক্ত হতে চলেছে। মানুষ যদি আবার সেই পুরানো মোহ আঁকড়ে থাকতে চায়, আণবিক বোমার বিস্ফোরণ তার সেই মোহ ঘুচাবে। আজ তাই সর্ব্বপ্রযত্নে সকল জাতির স্বাধীনতায় সম্মিলিত চেষ্টাই প্রকৃষ্ট পথ। সকল স্বাধীন জাতি মিলে গড়ে তুলবে মহামানব-সমাজ এটাই হচ্ছে মহাকালের ইঙ্গিত।

কিন্তু এখনও এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিরাট ধ্বংসলীলার পরও মানুষের প্রকৃত চৈতন্য হয়েছে বলে মনে হয় না। মানুষের প্রগতি যখন সকল ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে ঐক্য ও বন্ধনমুক্তির দিকে চলেছে, যখন তার সুনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিতে জাতীয়তার প্রাকার ভেঙে পড়তে চলেছে তখন পাকি-স্থানের গণ্ডী টেনে মিলনের পথে বিচ্ছেদ ঘটাতে কিম্বা সঙ্কীর্ণতার খোঁচায় কোন জাতির বন্ধন-মুক্তির চেষ্টাকে ব্যাহত করবার প্রয়াস দেখা গেলে এই সন্দেহই মনে জাগে, মানুষের চৈতন্য কি কখনও হবে না? অথচ পশুত্বের সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সত্যের বিমল আলোকে চলবার পথে মানুষের চেষ্টা কম হয় নি। বুদ্ধদেবের মৈত্রী ও নির্ব্বাণমুক্তি, খ্রীষ্টের প্রেম ও স্বর্গরাজ্য, মহম্মদের একেশ্বরবাদের পতাকাতলে মহান্ এক সাম্যমন্ত্র এক দিন মানুষের মনে দীপ্ত প্রেরণা এনেছিল। এঁদের প্রত্যেকের আবির্ভাবের পর চার-পাঁচ শত বৎসর ধরে জগতে বিপুল আলোড়ন হয়েছে, মানুষ পেয়েছে ঊর্দ্ধলোকের প্রেরণা, জ্বলন্ত বিশ্বাসীর দল দিকে দিকে সেই মহাবাণী প্রচার করেছে, অগণিত শহীদ জীবন দিয়েছে মহান্ আদর্শের জন্য। ত্যাগে জ্ঞানে কর্ম্মে মানুষ মহীয়ান্ হয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে কালক্রমে মানুষের মন থেকে মুছে গিয়েছে সেই সব মহান্ আদর্শের ধারা—মানুষ আবার হয়ে পড়েছে পশুর মত। সেই সব মহাপুরুষ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এখন কতকগুলি বাহ্য আচার-নিয়মের গণ্ডীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তাঁদের ধর্ম্ম-মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবের মহামিলনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। এই দিক থেকে ভারত তার যুগযুগান্তের সাধনা ও সংস্কৃতি থেকে বর্ত্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভিতর দিয়ে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের যে মহাবাণী জগতকে দিয়েছে তা অনেকখানি পথ দেখাতে পারবে। তাঁর যোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বর্ত্তমান সভ্যতার দরবারে বেদান্তের মহান্ সার্ব্বজনীন আদর্শের ভিত্তিতে মিলনের বাণী দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে ঋষিদের বাণী ভারতের উপনিষদ নবরূপ নিয়েছে, বর্ত্তমান যুগের মানুষের অন্তরলোকে সাড়া জাগিয়েছে সেই স্বর্গীয় ঝঙ্কার। আর শ্রীঅরবিন্দের ভিতর দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও আদর্শ এক অপূর্ব্ব সার্থকতায় মিলিত হতে চলেছে। এই ভারতের তপঃক্ষেত্রে আজ বিরোধ ও বন্ধনের পুঞ্জীভূত মেঘের আড়ালে সেই মহান্ আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে আসছে যা মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সার্থকতার দিকে।

সার্জেণ্ট শিক্ষা-পরিকল্পনার কয়েকটি দিক

(দ্বিতীয় পর্ব)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

সাধক কবি রামপ্রসাদের রচিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিষয়ক একটি গান আছে :

মন তুমি কৃষিকাজ জান না ;
এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত
সোনা।...

মানুষ ভক্তি প্রেম নিষ্ঠার দ্বারা মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইতে পারে সাধক তাহাই বুঝাইতেছেন। চীনদেশে অনুরূপ একটি সুন্দর প্রবাদ আছে। আধ্যাত্মিক জগতে নয়, বস্তুতান্ত্রিক সামাজিক জীবনক্ষেত্রে সমষ্টিগত সাফল্য ও উন্নতির চেষ্টায় এই হিতবাণীর প্রয়োগ হইয়া থাকে।

"If you are planning for a year, plant grain ;
If you are planning for ten years, plant trees ;
If you are planning for a hundred years,
plant men."

অর্থাৎ,—
এক বৎসরের জন্ত ফললাভের পরিকল্পনা করিলে শস্ত বপন কর ;
দশ বৎসরের জন্ত ফললাভ আশা করিলে বৃক্ষ রোপণ কর ;
শতবর্ষব্যাপী ফললাভ কামনা করিলে মানুষের আবাদ কর।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনার উপসংহারে এই প্রবাদটি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং রিপোর্টের রচয়িতারা বলিয়াছেন, ভারতের সম্মুখে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আসিতেছে তাহাকে সর্বপ্রকারে সার্থক, মহান্ করিয়া তুলিতে হইলে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই দেশে মানুষের আবাদ করিতে হইবে। কথাটি খুবই সত্য এবং মনোহারী। মানুষই দেশের সম্পদ ; মানুষই দেশের সংস্কৃতি, সভ্যতা রচনা করে, মানুষের সাধনা ও অন্তরের দীপ্তিতেই দেশ আলোকিত হয় ; মানুষের ত্যাগ, প্রীতি ও মহানুভবতার নিকট বিশ্ববাসী শ্রদ্ধায় হয় নতশির।

সকল সভ্য দেশেই সুপরিচালিত জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে জাতিগঠনমূলক কার্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান গণ্য করা হয়। কেননা, ইহার মধ্য দিয়াই হয় এমন মানুষের আবাদ যাহারা আত্মশক্তি বিকাশের দ্বারা দেশের সংস্কৃতি ও অগ্রগতিকে আরও আগাইয়া লইয়া চলে। যুদ্ধোত্তর কালে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় মানুষের চাষের সুবন্দোবস্ত হইতেছে, দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির আয়োজনে সবাই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। জাতির কল্যাণ যে জাতীয় শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে এ কথা ইহার মধ্যে বহু ভাবে ব্যক্ত। ৯৮ পৃষ্ঠার রিপোর্টের মধ্যে 'জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা' কথাটির উল্লেখ আছে ৫৫ বার। বলা হইয়াছে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী জীবনের সঙ্গে সংযোগচ্যুত, অস্বাভাবিক এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে অপারগ ; ইহার স্থলে জীবন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহা দেশবাসীকে জ্ঞানে, স্বাস্থ্যে, ঐশ্বর্যে, সংস্কৃতি বর্ধনে সকল দিক দিয়াই সমর্থ করিয়া তোলে। এ সবই আশার কথা, কিন্তু একটা বিষয়ে কেমন খট্‌কা লাগিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান চলিতে থাকিলে সে শিক্ষাকেও কি 'জাতীয় শিক্ষা' আখ্যা দিতে হইবে ?

পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে কতকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থষ্ঠু রূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছে। অধিকাংশ ছাত্রই মাধ্যমিক শিক্ষা অন্তে কর্মজীবনের বিভিন্ন শাখায় আত্মনিয়োগ করিবে। অল্প সংখ্যক মেধাবী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্ত প্রবেশ করিবে। মাধ্যমিক স্কুলে ইংরেজীকে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা এখনকার মতই স্বমহিমায় বিরাজ করিতে থাকিবে। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেশীয় মাতৃভাষার প্রতি কি ইহা দ্বারা অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয় নাই ? বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে লাটিন, ফরাসী, অথবা জার্মান ভাষায় পঠনপাঠন চালাইলে তাহাকে কি 'জাতীয়' শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করা হইত ?

ইংরেজী ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধ ভাষাগুলির অন্যতম একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ ভাষায় রচিত সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ যথেষ্ট মূল্যবান, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইহার উপযোগিতা প্রচুর, কিন্তু তবু ইহা আমাদের কাছে বিদেশী ভাষা। এত দিন ইংরেজী যে প্রাধান্ত লাভ করিয়া আসিতেছে তাহার কারণ ইহা আমাদের শাসকজাতির ভাষা। উচ্চাকাঙ্ক্ষী দেশবাসীর মান-মর্যাদা, উচ্চ সরকারী চাকুরী সবই এই ভাষায় দক্ষতা দেখাইয়া লাভ করিতে হইয়াছে। এই সব কারণে ইংরেজী ভাষা আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় জনসাধারণ হইতে পৃথক এক নূতন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে গিয়া শিক্ষাকে হজম করিয়া নিজস্ব করিয়া লওয়াও অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর ব্যর্থতার জন্ত বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করার বাধাও যে অনেকখানি দায়ী সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। নূতন যুগের সূচনায় নূতন ভাবে রচিত-জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় মধ্যেও যদি এই বাধাকে অচল করিয়া

রাখিবার ব্যবস্থাই করা হয় তবে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এত দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা কোন শিক্ষাই গ্রহণ করি নাই।

ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম যুগে দেশীয় ভাষা কিম্বা ইংরেজী কোন্ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হইবে এই বিতর্ক উঠিয়াছিল। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক মেকলের পরামর্শানুসারে ১৮৩৫ সালে দেশীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা ফলে নাই। ভারতীয়েরা আচার-ব্যবহারে, শিক্ষায়, নীতিজ্ঞানে ইংরেজ না বনিয়া গিয়া ভারতীয়ই রহিয়া গিয়াছে। ইহার এক শতাব্দীর অধিক কাল পরে সার্জেন্ট পরিকল্পনাতেও ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য অটুট রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। অথচ এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতীয় ভাষাসমূহের কত উন্নতি হইয়াছে; বাংলা ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জয়মাল্য অর্জন করিয়া জগতের সমৃদ্ধ ভাষাগুলির সমমর্যাদা লাভ করিয়াছে। বাংলা ভাষা শুধু কাব্যের নয়, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি সকল বিষয়েরই যে যোগ্য বাহন হইতে পারে তাহা সার যদুনাথ সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আচার্য জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষিগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। অধুনা নানা ভাষার নানা বিষয়ক গ্রন্থের সরস সাবলীল অনুবাদ কি বাংলা ভাষার প্রাণশক্তির পরিচয় দিতেছে না? বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্য মাতৃভাষাকে অবহেলা করিয়া বিদেশী ভাষা অবলম্বনে যদি 'জাতীয়' শিক্ষা প্রবর্তিত হয় তাহা শেষ পর্যন্ত দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। মাতৃভাষার দাবি আমরা ছাড়িতে পারি না।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত উর্দু ভাষার মাধ্যমেই সেখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ও অনুরূপ বলিষ্ঠ মনোভাব দেখাইয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরের শিক্ষাই হিন্দী-ভাষার মাধ্যমে দিবার আয়োজন করিতেছেন। এ বিষয়ে কাজও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দেখা যাইতেছে বাংলাদেশই পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে।

* * *

গত সংখ্যা 'প্রবাসী'তে আমরা সার্জেন্ট পরিকল্পনার আর্থিক দিকের কিছু আলোচনা করিয়াছি। পরিকল্পনা-বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে অনেকে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সর্ব-ভারতীয় ব্যাপারে পরিণত না করিয়া স্বায়ত্তশাসনশীল প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্মেণ্টকে নিজ নিজ প্রদেশের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষমতাদানের মত প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষাই ইহার উদ্দেশ্য। সর্ব ভারতীয় পরিকল্পনাকে প্রদেশগুলি নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ অনুযায়ী গ্রহণ করিবেন এবং কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষাখাতে অর্থসাহায্য করিতে হইবে ইহা বলা হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক সচ্ছলতার উপরই যদি প্রধানতঃ যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা নির্ভর করে তবে আমাদের এই প্রদেশের রাজস্ব-তহবিলের অবস্থা কিরূপ, সুতরাং শিক্ষা-প্রসারের চেষ্টার সম্ভাবনাই বা কতদূর এ কৌতূহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। গত আগষ্ট মাসের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজস্বের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া এখানকার অবস্থা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। গত ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৬-৪৭ সাল পর্যন্ত কয়েক বৎসরের যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি হেতু সকল প্রদেশে যখন কোটি কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে, বাংলার রাজস্ব ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ (১৯৩৮) হইতে বাড়িতে বাড়িতে ৪১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উঠিলেও এই কয়েক বছরে ৪৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। পক্ষান্তরে বোম্বাই জমাইয়াছে ৯ কোটি, পঞ্জাব ১০ কোটি, বিহার ৬ কোটি ৬০ লক্ষ। এইরূপ কমবেশী সকলেরই কিছু উদ্বৃত্ত হইয়াছে, শুধু উড়িষ্যার ঘাটতি এক লক্ষ টাকা।

বহু প্রকার করের বোঝা দেশবাসীর উপর চাপাইয়া ১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলার রাজস্বের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৪১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা কিন্তু খরচের বরাদ্দ হইয়াছে তাহার চেয়ে প্রায় সাড়ে নয় কোটি টাকা বেশী। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় বাংলা দেশের শিক্ষা বাবদ বার্ষিক ব্যয়ের হিসাব ৫৭ কোটি টাকা। বর্তমানে যেখানে তিন কোটি টাকার মত শিক্ষা বাবদ খরচ করা হয় সেখানে ৫৭ কোটি টাকা খরচ করিবার সামর্থ্য অর্জন করিতে হইলে বাঙলার রাজস্ব ১৯ গুণ বাড়াইতে হইবে অর্থাৎ মানুষের অর্থ উৎপাদনের ক্ষমতা অন্তত ২৫ গুণ বর্ধিত হওয়া চাই।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি আর্থিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশের শিক্ষার জন্য ব্যয়ের অঙ্কের সঙ্গে তুলনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া বরং দেখিতে হইবে ঐ সব দেশে মোট রাজস্বের কত অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হয়। সে অনুপাত প্রবর্তন করিতে গেলে গবর্মেণ্টের অনেক বিভাগের টাকা ছাঁটাই করিয়া শিক্ষার জন্য বরাদ্দ বাড়াইতে হয়। বিলাতের নূতন শিক্ষা আইনে বলা হইয়াছে যে, শিক্ষা বিভাগে প্রতিভাবান লোক আকৃষ্ট করিতে হইলে বেতন, পদ-মর্যাদা প্রভৃতির দিক দিয়া সিভিল সার্ভিসের সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের চাকুরীর সমতা স্থাপন প্রয়োজন। আমাদের দেশে ইহার প্রয়োজনীয়তা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি; অভাব শুধু প্রকৃত মানুষের আবাদ প্রবর্তন করিতে সক্ষম কামাল আতাতুর্কের মত যোগ্য ব্যক্তির যিনি হীন স্বার্থবুদ্ধির বহু ঊর্ধ্বে থাকিয়া দেশাত্মবোধের প্রেরণাময় দীপ্তিতে জাতিকে কল্যাণের পথে চালিত করিতে পারেন।

যুদ্ধের পর কৃষির উন্নতির পরিকল্পনা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সমুদয়ের মধ্যে কৃষির উন্নতির প্রতি আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দিতে হবে; আমাদের দেশের প্রচলিত কথা হচ্ছে "ভাতকাপড়" অর্থাৎ আগে ভাতের দরকার, তারপর কাপড়ের দরকার; এর মানে এই যে, আগে কৃষি তারপর বস্ত্র-শিল্প।

অনেকের ধারণা এই যে, শিল্পের উন্নতি সাধনের দ্বারাই দেশকে ধনী করা যায়, এবং এর দ্বারা দেশ ধনী হলে অন্যান্য বিষয়ে অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতিতে দেশকে উন্নত করবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তার অভাব ঘটে না। কথাটা খুবই সত্যি, কিন্তু কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষের বেলায় এ মত সম্পূর্ণ ভাবে খাটে কিনা সেটা একবার চিন্তা করে দেখা দরকার। ভারতবর্ষের চার ভাগ লোকের মধ্যে তিন ভাগ লোক কৃষির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে; সুতরাং এই কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষে শিল্পের উন্নতি ও প্রসার হোক তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দেখতে হবে যে, তার দ্বারা কৃষির উন্নতি এবং প্রসারের পথে যেন কোন বাধা না ঘটে। এই সম্পর্কেই প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, কৃষক যে পণ্য উৎপাদন করবে, তার বিক্রয়লব্ধ অর্থে সে যেন সচ্ছল ভাবে জীবন যাপন করতে পারে অর্থাৎ সে যেন তার বর্ত্তমান জীবন-ধারার প্রণালী ও মান উন্নত করতে পারে। কেবল তাই নয়, বর্ত্তমানে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন হয়, জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির উন্নতির জন্য তার চেয়ে অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের জন্যও তাকে সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহিত করতে হবে। মোট কথা তার কৃষিজাত পণ্যের উচিত মূল্য তাকে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে তাকে নিঃসন্দেহ করতে হবে; অর্থাৎ তার মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, সে সব সময়েই তার পণ্যের উচিত মূল্য পাবে। কৃষির উন্নতির যে-কোন পরিকল্পনাতেই এ বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকলে চলবে না।

ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ। কৃষি সম্বন্ধেও ভারতবর্ষ বিচিত্র। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রকার মাটি, জলবায়ু এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী এর কৃষিপদ্ধতি বিভিন্ন এবং কৃষিজাত পণ্যের জমির পরিমাণ এবং ফলনও বিভিন্ন; সুতরাং একই প্রকারের কৃষির উন্নতির পরিকল্পনা সকল অংশে প্রয়োগ করা চলবে না। বিভিন্ন স্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের পরি-কল্পনা প্রস্তুত করতে হবে; কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রস্তুতের পূর্ব্বে স্থানীয় কৃষি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে আমাদের সে জ্ঞানের একান্ত অভাব দেখা যায়; সুতরাং এই জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য বিভিন্ন স্থানের কৃষি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য অনুসন্ধান আগে দরকার। এই তথ্য অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে হবে যে, প্রত্যেক স্থানে কৃষির উন্নতির পথে কি কি বাধা বিদ্যমান আছে, কোন্ শস্যের জমির পরিমাণ কত, কোন্ শস্যের কত ফলন ইত্যাদি সম্বন্ধেও বর্ত্তমানে আমাদের সঠিক কোন জ্ঞান নেই। বর্ত্তমান কৃষির সঠিক তথ্যের উপরেই কৃষির উন্নতির পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভাবে না হলেও অনেকাংশে নির্ভর করবে।

এই সকল তথ্যসংগ্রহের পর বিভিন্ন স্থানের উপযুক্ত বিভিন্ন প্রকার গবেষণার দ্বারা কৃষির উন্নতির পন্থা নির্দ্ধারণ করতে হবে; কেবল গবেষণা করলেই হবে না। ব্যাপক ভাবে পরীক্ষার দ্বারা দেখতে হবে গবেষণার ফল কৃষকদের মাঠে মাঠে কিরূপ কার্য্যকরী হয়; এই পরীক্ষার দ্বারা যদি জানা যায় যে, কোন গবেষণার ফল স্থানীয় সর্ব্বপ্রকার অবস্থার উপযুক্ত তাহলে ব্যাপকভাবে উহার প্রদর্শনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে; অর্থাৎ এর ফলাফল প্রত্যেক অঞ্চলের কৃষকদের চোখের সামনে দেখাতে হবে; সুতরাং এই তিন দফা কাজের জন্য আমাদের চাই কৃষি-বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফল পরীক্ষা করবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী এবং প্রদর্শন-কার্য্যের জন্য উপযুক্ত প্রদর্শকের দল। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে কোনও দফার কাজের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কর্ম্মচারী নেই বললেই চলে। কৃষির উন্নতির পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে যে সর্ব্বাগ্রে প্রত্যেক দফা কাজের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কর্ম্মচারীর দরকার সে বিষয়ে মতের অনৈক্য থাকতে পারে না। কর্ম্মচারীগণের দক্ষতা সম্বন্ধে রাজকীয় কৃষি কমিশন এই মত প্রকাশ করেছিলেন, "কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারিগণের উপদেশ সম্বন্ধে কৃষকদের বিশ্বাসের অভাব কেবল যে কর্ম্মচারিগণের দক্ষতা বিষয়ে 'মারাত্মক' তা নয়, এর দ্বারা কৃষকেরা কৃষি-বিভাগের প্রতিও বিশ্বাসহীন হয়ে পড়ে।" কাজে কাজেই কৃষির উন্নতির পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তরের ভার উপযুক্ত কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত করতে হবে; তা না করলে সবই পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কতকটা সচেতন হয়েছেন এবং উপযুক্ত শিক্ষার জন্য কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী ও যুবক-গণকে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু একেত্রে মনে রাখা দরকার যে, সকল বিষয়ে বিদেশের শিক্ষা আমাদের দেশের পক্ষে উপযুক্ত বা কার্য্যকরী হবে কিনা, এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা বিশেষ সন্তোষজনক নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অন্য দেশের সব প্রণালী হুবহু নকল করলে এদেশের চলবে না। আমাদের অবস্থার ও যোগ্যতার অনুরূপ করে তার অদলবদল করতে হবে। আমাদের দেশে সহজে যা পাওয়া যায় বা সহজে যা উৎপন্ন করা যায়, তা দ্বারাই কৃষির উন্নতি করতে হবে। উদাহরণ-স্বরূপ বলতে পারি যে, ভারতবর্ষেই কৃত্রিম সার প্রস্তুত

করে কৃষকদের আয়ত্তের মধ্যে তা উপস্থিত করতে হবে—অর্থাৎ গ্রামে গ্রামে তা সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, যে সকল যুবককে বৈদেশিক শিক্ষার জন্ম নির্বাচন করা হবে কৃষকদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করবার, তাদের মধ্যে বসবাস করবার, তাদের মনের ভাব বোঝবার ক্ষমতা ঐ সকল যুবকের আছে কিনা। এ না থাকলে কৃষকদের বিশ্বাস অর্জন করা কঠিন হবে। এ বিষয়ে আমাদের ইংরেজ মিশনরীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে। সুদূর পল্লীগ্রামে কৃষকদের মধ্যে তাঁরা যে ভাবে অবস্থান করেন, যে ভাবে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, যে ভাবে তাদের সর্ব্ববিষয়ে উন্নত করবার চেষ্টা করেন, তা দেখলে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। এই রকম মনোভাব নিয়েই কৃষকদের মধ্যে কৃষির উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। উন্নত শ্রেণীর বীজের প্রচলন, জল সেচন এবং সার প্রয়োগের উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারাই ভারতের কৃষির উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। ভারতে প্রত্যেক বৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেক বৎসর এই ৫০ লক্ষ শিশুর জন্ম এবং ভারতের অধিবাসীদের পুষ্টিকর খাদ্যের পরিমাণ বাড়াবার জন্ম ১০ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন; দুই কোটি একর জমিতে জল সেচনের সুব্যবস্থা দ্বারা এই অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করা যায়। বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করে দেখেছেন যে, ভারতের অধিবাসীদের জন্ম ৬ কোটি টন ধান্যজাতীয় খাদ্যশস্যের এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ টন ডালজাতীয় খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হয়; এবং উন্নত শ্রেণীর বীজের প্রচলন, উপযুক্ত পরিমাণ জল সেচন এবং সার প্রয়োগের দ্বারা উভয় জাতীয় খাদ্যশস্য ভারতবর্ষে উৎপাদন করা যায়। ডাল-ভাতের জন্ম ভারতকে অন্য দেশের ওপর মোটেই নির্ভর করতে হয় না।

ভারতবর্ষে স্যাঁৎসেঁতে বা জলা জমির পরিমাণও কম নয়। এই সকল জমিকে শুষ্ক করে খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপযুক্ত করতে হবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে জলস্রোত বা বৃষ্টির দ্বারা জমির যে প্রচুর ক্ষয় হচ্ছে এবং জমির উর্ব্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা নিবারণ করতে হবে। সুতরাং কৃষির উন্নতির পরিকল্পনা যত সহজ মনে করা যায়, তত সহজ নয়। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের নিয়তই যুদ্ধ করতে হবে এবং সেই যুদ্ধে আমরা যে সব সময়েই জয়ী হব তা বলা যায় না; তবে বিজ্ঞানের সাহায্যে অন্যান্য দেশে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং আমরা যদি আমাদের দেশে বিজ্ঞানকে কৃষির উন্নতিকল্পে কাজে লাগাতে পারি, অবশ্য আমাদের অবস্থা অনুযায়ী—তা হলে হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

কৃষির উন্নতির জন্ম "সমবায়" একান্ত দরকার, এ সম্বন্ধে বোধ হয় কোন মতদ্বৈধ নেই। যৌথ প্রথায় কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ দরকার; ইতিপূর্ব্বে কৃষির উন্নতির জন্ম সমবায় প্রণালীর প্রয়োগ উপযুক্ত ভাবে করা হয় নি বললে বিশেষ ভুল হবে না, কিন্তু সমবায় প্রণালীর দ্বারা কৃষির যে প্রভূত উন্নতি করা যায় তার দৃষ্টান্ত এ দেশেও আছে; সুতরাং এ দিকেও আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। কৃষকেরা যাতে যৌথভাবে কৃষিজাত পণ্য ক্রয়বিক্রয় করতে পারে, যৌথ ভাবে কৃষিযন্ত্র, সার, বীজ প্রভৃতি ক্রয় করতে পারে, যৌথভাবে জলসেচনের বা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে—আর mixed farming অর্থাৎ নানারকম ফসল উৎপাদন ও তৎসংশ্লিষ্ট কুটিরশিল্পের প্রতি তাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে হবে।

বর্ত্তমানে পোকামাকড়, রোগ ইত্যাদির দ্বারা খাদ্যশস্যের যে বিরাট ক্ষতি হয় সে সম্বন্ধেও কৃষকদের সচেতন করে তুলতে হবে এবং এই ক্ষতি নিবারণের জন্ম তাদের সহজসাধ্য প্রণালী শেখাতে হবে।

আর একটা কথা এই যে, প্রত্যেক কৃষক-পরিবার যাতে সুসম খাদ্য গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়েও তাদের শিক্ষা দিতে হবে এবং যতদূর সম্ভব প্রত্যেক গৃহস্থ তার পরিবারের প্রয়োজন মত যাতে সুসম খাদ্য উৎপাদন করতে পারে সে সম্বন্ধেও তাকে উপদেশ ও সুযোগ দিতে হবে।

পরিশেষে বলা দরকার যে, কৃষির সম্পূর্ণ উন্নতির জন্ম বর্ত্তমান প্রজাস্বত্বের বা জমির স্বত্বের আমূল সংস্কার ও উন্নতি সাধন করতে হবে। এটা খুবই জটিল প্রশ্ন; কিন্তু আমরা সকলেই আশা করছি যে, এ প্রশ্ন যতই জটিল হোক না কেন এর সমাধান একেবারে অসম্ভব নয়।

দেশের উন্নতির যে-কোন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার কথা স্বতঃই এসে পড়ে। কাজেই দেশের উন্নতির জন্ম জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার একান্ত আবশ্যক। এদিকেও আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

—

হিন্দুর জাতীয় সংহতি ও ঐক্য সাধনের অন্তরায়—প্রচলিত বিবাহ-বিধান

শ্রীরঞ্জনকুমার দত্ত

খড়দায় প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়ের সহিত গঠনমূলক কার্যসূচী সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রচলিত বিবাহ-বিধানের কথাও ওঠে এবং তিনি যে এ বিষয়ে বহু পূর্ব থেকেই বিশেষ ভাবে চিন্তা করে আসছেন তার আভাসও পাই। গত জানুয়ারী মাসে গান্ধীজীর সোদপুরে অবস্থান কালে এক দিন যতীনবাবু কথাপ্রসঙ্গে এই অভিমতই প্রকাশ করেন যে, অন্যান্য ধর্মের লোকেদের মধ্যে সামাজিক সংহতি যেমন সুদৃঢ় হিন্দু সংহতিও তেমনি সুদৃঢ় হওয়া দরকার। অন্যথা ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে, এই বিনষ্টি কেউ রোধ করতে পারবে না। তাঁর এই উক্তি বিষয়টি ভেবে দেখতে আমাকে উৎসাহিত করে।

বস্তুতঃ এই সম্প্রদায়কে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে দেশাচার ও সামাজিক সংস্কারসমূহকে সংশোধিত করে ব্যাপকত্ব দান করতে হবে। তা নইলে এ সমাজের অবনতি ও বিলোপ অবশ্যম্ভাবী।

রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষীরা প্রচলিত সংস্কারকে ভেঙে দিয়ে এক নতুন সমাজের পত্তন করেন বটে, কিন্তু সে-সমাজের স্বতন্ত্র নামকরণ করায় হিন্দু সমাজের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। উক্ত সমাজ নতুন নামে পরিচিত না হয়ে হিন্দু নামেই আখ্যায়িত হলে জনসাধারণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একেই আলিঙ্গন করত ; কেননা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণেতর বর্ণের লোকেরা ব্রাহ্মণ ও বর্ণহিন্দুদের দ্বারা নানানভাবে নির্যাতিত, শোষিত ও উপেক্ষিত হয়ে আসছিল। তাদের কাছে মুক্তির বার্তা নিয়ে যে সমাজই অগ্রসর হবে তাকেই তারা সোৎসাহে আশ্রয় করবে।

শাস্ত্র-আলোড়ন করে অনেক পণ্ডিত ও তর্কশাস্ত্রবিৎ স্ব স্ব অভিমতের সমর্থনে শাস্ত্র-বচন উল্লেখ করে বিরুদ্ধ অভিমত এবং যুক্তিকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের যুক্তি সমর্থনে একই শাস্ত্র থেকে বৈষম্যমূলক শাস্ত্রোক্তির উল্লেখ দেখে এই কথাই মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ্য-প্রভুত্বের যুগে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সুবিধা সংরক্ষণোদ্দেশে অপর বর্ণ বা শ্রেণীর স্বার্থ ও কল্যাণকে উপেক্ষা করে সূত্র রচনাপূর্ব্বক পৌরাণিক শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে সন্নিবেশিত করেছিলেন। ফলে মূল শাস্ত্রোক্ত বিধানের সহিত অসমঞ্জস যুক্তির সমাবেশও লিপিবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় এই 'জগাখিচুড়ী' শাস্ত্রাদি মন্থন করতে না গিয়ে নিজেদের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। তবে একের বিচারে বিচার-বিভ্রম ঘটতে পারে, এইজন্যে যাঁরা বর্তমান যুগোপযোগী করে হিন্দু সমাজকে অনাচার ও কালিমামুক্ত করে তার সত্যরূপের প্রতিষ্ঠা করায় সহায়ক তাঁদেরই ওপর এই ভার দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু যদি এমন হয় যে যাঁরা এই নায়কত্বের দায় গ্রহণ করবেন তাঁরাও রক্ষণশীল সমাজপতিদের ন্যায় দরিদ্র অশিক্ষিত ও উপেক্ষিত জনসাধারণের প্রতি অবিচার অন্যায় করতে থাকেন তবে তাঁদের দেওয়া বিধানও দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষ পরাধীন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-কৃত স্বৈরাচারমূলক সমাজ-বিধান এই পরাধীনতার অন্যতম কারণ নয় কি? ব্রাহ্মণ তথা সমাজপতিরা সমাজের প্রভুত্ব ও নায়কত্ব নিজেদের হাতে রাখতে গিয়ে বর্ণ বিভাগকে কূলগত পর্যায়ে রূপান্তরিত করেন। ব্রাহ্মণেতর বা বিশেষ করে বৈশ্য শূদ্র শ্রেণীর লোকেদের সংস্রব ত্যাগ করায় ও তাদের প্রতি অপরিসীম অত্যাচার ও অবিচার অনুষ্ঠিত হওয়ায় বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিষ্ঠুর বিধানের বলে মানুষের আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ করবার আয়োজন হয়েছে। সমাজের মুচি, মেথর, ধাঙড়, নমঃশূদ্র প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত বর্ণ-হিন্দুদের কতটুকু মেলামেশা ও ভ্রাতৃভাব আছে? তারা যে আজ বিদ্রোহ করবে না এটা আশা করাই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আচার-ব্যবহারে, শিক্ষা ও সভ্যতায় যতই কেননা উন্নত হোক, তারা বর্ণ-হিন্দুদের কাছে আজও বহু ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য ও অবজ্ঞেয় বলে বিবেচিত হয়। সামাজিক ব্যবহারে সম-পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার কোন পথ খোলা রাখা হয় নি তাদের জন্যে।

ধর্মের নামে এমনি ধারা অধর্ম ও স্বৈরাচারের ফলে হিন্দু সংহতি বিনষ্ট হওয়াতেই অতীতে মুসলমান, ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশীর পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ ও বিজয় সম্ভব হয়। ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের অত্যাচারে ও অনাদরে উৎপীড়িত ও উত্ত্যক্ত হয়ে অনার্যগণ তথা শূদ্রশ্রেণীর লোকেরা দলে দলে হিন্দু সমাজ ত্যাগ করে মুসলমান হতে থাকে ; এই ভাবে কয়েক শত বৎসরের মুসলমান রাজত্বে ভারতের পাঁচ কোটির ওপর লোক ইসলাম ধর্মের আশ্রয় লয়। একি কম আপশোষের কথা?

আজ আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার সাধিত না হওয়ায় হরিজন ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা দলে দলে মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। কেন তারা ধর্মান্তরিত হয়? ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন হওয়ায়? তা ত নয়। হিন্দু সমাজের অনাদর, উপেক্ষা ও শোষণকে বরদাস্ত করতে না পেরেই তারা অপর ধর্মাবলম্বনে বাধ্য হয়।

এখনও বাঁচবার পথ আছে। যাঁরা সেকথা ভাবছেন

অনিন্দ্য অলকের আকর্ষণ
রাঙাজবা
কেশতৈল
অনুরূপা কেমিক্যাল :: কলিকাতা
NALANDA

তাঁরা ইতিমধ্যেই ক্ষয় নিবারণের ব্রত গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হিন্দুমিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, আর্যসমাজ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁরা তো ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিচ্ছেন মাত্র, প্রতিদিন হিন্দুসমাজে যে নূতন নূতন ক্ষত দেখা দিচ্ছে তার প্রতিকার কে করবে? তাই যাতে নূতন ক্ষতের সূচনা না ঘটে, সেজন্যে বর্ণহিন্দুদের আর মিথ্যা কুলগত বর্ণমাহাত্ম্যের প্রচার না করে গুণ ও কর্মগত বর্ণ-মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সকল শ্রেণী ও বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ মাত্রের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। নইলে হিন্দুর ধ্বংস অনিবার্য।

আজকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণাচার ও শূদ্রাচারে খুব বেশী পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। অথচ শূদ্রাচারী ব্রাহ্মণ কুলগত ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা নিয়ে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর লোকদের নিপীড়ন করছে মিথ্যা বিধানের বলে ও পরকালে কাল্পনিক দণ্ডভোগের ফতোয়া জারী করে। এই দুর্নীতি ও অস্পৃশ্যতা ব্রাহ্মণাচার থেকে বিদূরিত না হলে হিন্দু সমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

নৃতত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যায় আদিতে বিবাহ বলে কোন প্রথা ছিল না। বিবাহ-প্রথা প্রবর্তিত হয় পরে। মনুসংহিতায় বিবাহের যতগুলি বিধান আছে তার মধ্যে যেগুলি ইতিহাস ও পুরাণের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ তা হ'ল স্বয়ম্বর, গান্ধর্ব, আসুর ও রাক্ষস প্রথা। এ ছাড়া বীর্যশুল্কে বিবাহ বিধানের দৃষ্টান্তও পুরাণ-ইতিহাসে পাওয়া যায়। অবশ্য মনুসংহিতায় এর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এই পঞ্চ বিধানে বিবাহ সংঘটনের দৃষ্টান্তও আছে।

দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতির স্বয়ম্বরের কথা সকলেই জানেন। পৌরাণিক যুগের কথা বাদ দিলেও আমরা দেখতে পাই, হিন্দু-সমাজ-সংহতিতে যখন কেবলমাত্র ভাঙন সুরু হয়েছে তখনও রাজা জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের মূর্তির গলায় মালা পরিয়ে তাঁকে স্বামিত্বে বরণ করেছিলেন।

গান্ধর্ব বিবাহ-প্রসঙ্গে যযাতি-দেবযানী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, অনার্যা নারী শর্মিষ্ঠা, এই ধরণের বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। বীর্যশুল্কে যে বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রমাণস্বরূপ রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতার মিলন অথবা মহাভারতের অর্জুনের দ্রৌপদী লাভ উল্লেখযোগ্য। আর্য শান্তনু ও অনার্যা সত্যবতীর মিলন আসুর প্রথার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই সব বৈবাহিক সম্পর্কে আর্য অনার্য বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইত্যাদির মধ্যে কোন সীমারেখা টানা ছিল না। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ইচ্ছা বা সম্মতিতে এই সব বিবাহ কার্যকরী হ'ত। বিবাহে কন্যার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল, অবশ্য বরের সম্মতিও বিবাহ-সম্পর্কের অপরিহার্য অংশ।

এখন সামাজিক প্রথা এমন যে, বিবাহে কন্যার স্বাধীনতা তো দূরের কথা, সম্মতিরও অপেক্ষা রাখা হয় না। ফলে কন্যা পণ্য-বস্তুর সামিল হয়ে পড়েছে। বিবাহের পর স্বামী কনের মনোমত হোক বা না হোক স্বামীর ইচ্ছার কাছে তার স্বকীয়তা বিসর্জন দিতে হয়। নারীরও যে বিবেক-বুদ্ধি আছে, একথা সমাজপতিরা ভুলে যান। তাঁরা তাঁদের জড়সদৃশ জ্ঞান করেন এবং বোবা বলেই মনে করেন। অথচ স্ত্রী-স্বাধীনতা আর্য সভ্যতারই একটা উজ্জ্বল দিক।

আজ যেমন হিন্দুঘরের মেয়েছেলেরা কলিকাতার রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে অসঙ্কোচে পায়ে হেঁটে বা ট্রামে বাসে স্কুল কলেজে যাতায়াত করছে, সমাজ যখন ব্রাহ্মণ্য-স্বৈরাচারের কঠোর শাসনের কবলিত ছিল তখন কি এমন দৃশ্য কেউ দেখেছে? যা স্বাভাবিক ও সত্য তাকে কখনও দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ করে রাখা যায় না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে বেশী দূর যাওয়া চলে না। তাই আজ মিথ্যা সনাতনী ধর্মের ভড়ং দেখিয়ে যে ব্রাহ্মণ্য স্বৈরাচার হিন্দু সভ্যতার ওপর খবরদারি করছে—তাকে আর এখন মেনে চলা সম্ভব নয়। সমাজের এই খবরদারিকে অগ্রাহ্য করে ভারতের নারীসমাজ আজ পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে। তাই ভারতের জাতীয় আন্দোলন আজ এতটা অগ্রসর। কার আহ্বানে অবগুণ্ঠন ফেলে ভারতের নারী দলে দলে পুলিশের গুলির সুমুখে স্ফীত বক্ষে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন? কার আহ্বান সে নারী জাগরণের উৎস? তিনি আজও আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন। সেই মানুষটি মহাত্মা গান্ধী। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ কিন্তু গান্ধীজীকে সমর্থন করেন না। তাঁরা বলবেন—এ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষারই ফল। বস্তুতঃ তা নয়। যা স্বাভাবিক নিয়মের বিরোধী তাকে দীর্ঘদিন গায়ের জোরে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তাই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের স্বৈরাচারমূলক সমাজ-শাসন-বূ্যহ আপনা হতেই ভেঙে পড়ছে।

যে কালে বিবাহে স্ত্রীস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল অর্থাৎ পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ বিবাহ প্রচলিত ছিল (উক্ত পাঁচ প্রকার বিবাহে কন্যারও সম্মতির আবশ্যকতা ছিল) তখন অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। আর কুলগত বর্ণের তখনও প্রতিষ্ঠা হয়নি। যখন কুলগত বর্ণের মর্য্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও স্বয়ম্বর, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস ও বীর্যশুল্ক প্রথায় কুলগত বর্ণবৈষম্য তেমন গণ্য করা হ'ত না। কেননা ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ব্যক্তিকে যেমন শূদ্রাচারী হতে দেখা যায়, তেমনি শূদ্র-কুলোদ্ভব ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণ্যাচারী ও সদ্‌গুণবিশিষ্ট হতে দেখা যায়। কাজেই কুলগত বর্ণের মর্যাদা থাকার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কাজেই ওটাকে অগ্রাহ্য করতে হবে। প্রকৃত তথ্য এই যে গুণ ও কর্মভেদে বর্ণবৈষম্য মেনে নেওয়া যেতে পারে। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণকুলের সন্তানসন্ততির ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি কুলোদ্ভব সন্তানসন্ততির সহিত বৈবাহিক সম্পর্কের আদান-প্রদান চলতে কোন বাধা হতে পারে বলে মনে করি না। গুণ ও কর্মানু-

সারেই মেলামেশা, শিক্ষা ও আচার-ব্যবহারে সমতা আছে এমন শ্রেণীর মধ্যেই বিবাহ-প্রচলন অনুমোদিত হওয়া সঙ্গত। বর বা কনে যে শ্রেণীরই হোক না কেন তাতে অপকর্ষের আশঙ্কা নেই; বরং এর ফলে জাতি অধিকতর উদার ও শক্তিশালী হবে। শিক্ষা ও আচার-ব্যবহার যে মাত্রায় ব্যাপকত্ব লাভ করছে, পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডও সেই মাত্রায় উদারতার পথে এগিয়ে চলেছে। বস্তুতঃ অসবর্ণ বিবাহ আজ কোন কোন স্থলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাদৃত হয়ে উঠছে, কিন্তু সমাজানুমোদিত এখনও হয় নি। গোঁড়া হিন্দু সমাজের চক্ষু এখনও খোলে নি। তাই তাঁরা এখনও ইতস্ততঃ করছেন, গোঁড়ামির নিষ্পেষণে সমাজের নরনারী যে হাঁপিয়ে উঠেছে সেদিকে কারও হুঁস নেই। এদিকে দিন দিন হিন্দু সমাজ যে ক্ষয়িষ্ণুতার চরমে গিয়ে পৌঁছচ্ছে? কত হিন্দু ইতিমধ্যে বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারে ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে সে হিসাব কে রাখে?

স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে এমন দিন আসা অসম্ভব নয় যখন শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে রক্তসংমিশ্রণের ফলে একটিমাত্র জাতির অস্তিত্বই স্বীকৃত হবে—যে সমাজের বনিয়াদ ও ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতিকে স্বীকার করে চলবে, তাকেই সকল লোকে সাদরে গ্রহণ করবে। হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা যদি মনে করেন যে, তাঁদের বিধান ও দেশাচারই সকল লোকের গ্রহণযোগ্য, তবে বলব তাঁদের ধারণা ভ্রান্তিমূলক। হিন্দু আচারকে সকলের সমর্থনযোগ্য করতে হলে সর্বাগ্রে হিন্দু সমাজাচার ও সমাজবিধি থেকে আবর্জনা সাফ করে ফেলা দরকার। সঙ্কীর্ণতা ও স্বৈরাচার পরিহার করে সর্বগ্রাহ্য সমাজাচার ও উদারতা অবলম্বন করাই সমাজকে শক্তিশালী করার একমাত্র উপায়। সমাজপতিদের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি ত্যাগ করতে হবে, নতুবা নূতন পৃথিবীতে তাদেরই কোণঠাসা হয়ে থাকতে হবে। এ অতি সত্য কথা।

আজ সমাজে প্রতিলোম ও অনুলোম বিবাহের বহুল প্রচলন হলে (অবশ্য এ ক্ষেত্রে কন্যা ও বর উভয়ের সম্মতি সর্বাগ্রে বিচার্য) এক দিকে যেমন পণপ্রথার বন্ধনরজ্জু দরিদ্র পিতামাতা বা অভিভাবকের গলায় চেপে বসবে না, অন্যদিকে তেমনি একই হিন্দু সমাজের মধ্যে আজকে যে বৈষম্যমূলক ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব জাগিয়ে, সমাজকে ধ্বংসের মুখে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করছে না তা ঘুচে যাবে ও হিন্দুসংহতি অভূতপূর্ব শক্তিলাভে সমর্থ হবে।

অসবর্ণ বিবাহ, প্রতিলোম বা অনুলোম বিবাহ পূর্বে প্রচলিত ছিল। এর বিরুদ্ধে যে-সব শাস্ত্রোক্তি তা বিশ্বভ্রাতৃত্বের তথা সার্বজনীনতার প্রতিকূল, কাজেই বলা যেতে পারে এ সকল যুক্তি সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক ও স্বাভাবিক নিয়মের বিরোধী; অতএব আমাদের পরিত্যাজ্য। প্রাচীনকালে পতি-

লোম বা অনুলোম বিবাহের ফলে জাত সন্তান অস্পৃশ্য ছিল না, বরং ক্ষেত্রপ্রাধান্যে মাতৃনামে বা বীজপ্রাধান্যে পরিচিত হ'ত। এই ধরণের দৃষ্টান্ত পুরাণ-ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়।

কন্যার সম্মতি পেলে বরের পছন্দমত কন্যার পাণিগ্রহণ করা বা কন্যার যাকে ইচ্ছা স্বামিত্বে বরণ করতে পারা, অথবা স্বয়ম্বর-প্রথায় বিবাহ সংঘটিত হওয়া—অন্ততঃপক্ষে এই ত্রিবিধ বিবাহপ্রথা সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া দরকার। এইরূপ বিবাহে বর্ণবিচারের বাধা উপেক্ষণীয়। এতে শোষণ, কৌলিন্যের আভিজাত্যবোধ, পণপ্রথা প্রভৃতি হানিকর ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাগুলোর উচ্ছেদসাধন সহজ হবে এবং মানব-সমাজ পারস্পরিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে সমাজের পরম কল্যাণ সৃষ্টি করতে পারবে।

এই পরিবর্তনের মুখে অর্থাৎ অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহ প্রচলনে আমাদের একটি মাত্র অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। সেটি হচ্ছে পৈত্রিক ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তির পথে আইনগত বাধা। এই বাধা অপসারণ করতে খুব বেশী বেগ পাওয়ার কথা নয়। কেননা হিন্দু আইন সংশোধনের আন্দোলন তো ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। সমাজপতিরা ঔদার্যের সহিত অগ্রসর হলেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিদূরিত হয়।

তার পরের প্রশ্ন মুসলমান সমাজ। হিন্দু যদি স্ব-সমাজের মধ্যেই বিবাহ-সম্পর্কে এই বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণ করতে পারে ও হিন্দুসমাজের মধ্যে যে শ্রেণীবৈষম্য চলছে তা তুলে দিতে পারে তবে মুসলমান সমাজের সহিতও তার বিরোধ অনেক পরিমাণে কমে আসে। একই পিতামাতার পাঁচটি সন্তান যদি পাঁচটি ধর্মের আশ্রয়ও নেয় তা হলেও এই বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসী হয়েও তারা একই বাড়ীর পাঁচটি অংশে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে। এইজন্যে মানবগোষ্ঠীর প্রগতিপরায়ণতার চূড়ান্ত পর্যায়ের কথা বিবেচনা করলে সমাচারী সমশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান পরিবারের মধ্যেও ঔদ্বাহিক সম্পর্কের প্রচলন অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

সুধীজন, শাস্ত্রবিদ্ ও সমাজপতিদিগের আমার সানুনয় অনুরোধ যে তাঁরা এ সম্বন্ধে বর্তমান যুগোপযোগী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে সমাজবিধানগুলোর সংস্কার-সাধনে ব্রতী হবেন।

পুস্তক-পরিচয়

জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। প্রকাশক—শ্রীসলিলকুমার মিত্র, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। ক্রাউন অষ্টাংশিত ২২২ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

যাঁরা আজকাল রাজনীতির চর্চা করেন কিন্তু বৃদ্ধ নন, তাঁরা অনেকেই জানেন না কতকালে কাদের যত্নে কোন্ উপায়ে আমাদের দেশাত্মবোধের উন্মেষ হয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ অধিকার হাতে এসেছে। স্বদেশের পূর্ব্বকর্ম্মীদের চেষ্টার এই ইতিহাস না জানলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে: আলোচ্য পুস্তকটি বিগত শতাব্দের প্রথম থেকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস। এই পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয়—ব্রিটিশ শাসক ও বণিক সম্প্রদায় এবং ভারতীয় প্রজার স্বার্থের সংঘাত। দুই জাতির এই বিরোধকে বঙ্কিমচন্দ্র 'জাতিবৈর' বলেছেন, তদনুসারে লেখক তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছেন। লেখক বহু পরিশ্রমে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং যথাক্রমে বিন্যস্ত করে মনোজ্ঞ ভাষায় এই ইতিহাস লিখেছেন। 'জাতিবৈর' সুখপাঠ্য ও অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ, এর বহু প্রচার কামনা করি।

রাজশেখর বসু

গুড আর্থ—পার্ল বাক। অনুবাদ: শ্রীপুষ্পময়ী বসু। রেডিক্যাল বুক ক্লাব। বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

প্রথমেই বলা উচিত যে, যিনি অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহার শক্তি গুড আর্থের মত পুস্তক অনুবাদ করিবার পক্ষেও অনুকূল এবং পর্য্যাপ্ত। গুড আর্থের পরিচয় সুধী পাঠক-সমাজে অনাবশ্যক। গ্রন্থখানি যুগান্তরকারী। ইহার ভাষা, ভাব, আখ্যানভাগ ও প্রকাশভঙ্গী এমন বিশ্বজনীন অথচ ঘরোয়া যে তাহার ছন্দ বজায় রাখিয়া তাহাকে অন্য একটি ভিন্ন গোত্রের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া তাহার স্বকীয় আবহটি রক্ষা করা অল্প সাহিত্যিক প্রতিভার কর্ম্ম নহে। লেখিকার অনুবাদে সেই প্রতিভার আভাস পাইয়া আশান্বিত হইয়াছি। লেখনী নবীন, কিন্তু সাহিত্যের পাকা পাতায় অচিরেই তাঁহার নামজারী হইবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই। প্রকাশকের একটি কর্ত্তব্য বিষয়োপযোগী লেখক নির্ব্বাচন; এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব অভিনন্দনযোগ্য।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রন্থখানিতে লেখিকার নিজের লিখিত কোনও বক্তব্য প্রকাশ করার আবশ্যকতা প্রকাশকগণ বোধ করেন নাই। অথচ পৈরাহাপটির অন্দরমহল জুড়িয়া গদগদ ভঙ্গীতে উচ্চাঙ্গের "আবোল তাবোল"-এর উন্মত্ত কীর্ত্তন। "মহাচীনের মহামৃত্তিকার মহাজাতি"; যেন, মহাকালের মহানাট্য মহাব্রাহ্মণের হাতে পড়িয়াছে মহাসম্পত্তির জন্য। "অনাবৃষ্টিতে দগ্ধ বাংলার সোনাফলা মাটি", "বাংলার চাষী ও বাংলার মেয়ে ওয়াং ও ওলানের মধ্যে লুকিয়ে আছে"—এই সব ভাবাকুলতা বা বিপর্য্যয়ের পরিবর্ত্তে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত ভূমিকা নাম্নী সন্দর্ভটি সন্নিবিষ্ট হইলেই শোভন হইত।

লেখক নির্ব্বাচন ছাড়া, প্রকাশক অন্যান্য কর্ত্তব্য সম্পর্কে বিশেষ দায়িত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দেন নাই। গ্রাম্যতা, প্রাদেশিকতা এবং বানান ও ভাষা-ঘটিত ভ্রমপ্রমাদে গ্রন্থখানি কণ্টকিত; যথা: ১নং (র ও ড় বিভ্রাট) উপুর নয় উপুড়; ভেঙ্গেচুড়ে নয় ভেঙ্গেচুরে; জুতা পড়া নয় পরা—সেইরূপ রয়েছে হামাগুরি, হোমরা চোমড়া, ছেঁড়াখোঁরা ইত্যাদি অনেক আছে। ২ নং (বানান বিভ্রাট) আকরে পরে = আঁকড়ে পড়ে, এক পাঁদী = পাদা; ঘেসে = ঘেঁষে; গুর ভাজে = ভাজে, কুড়ে = কুঁড়ে, সেইরূপ কাথা, হুকো,

পায়ে ফোটে; ট্যাক, ভ্যাড়া, আভুড়ে ইত্যাদি। ৩ নং (ভাবা বিভ্রাট) ঠোঁটকাটা মানে যাহার কিছু বলিতে বাধে না, স্পষ্ট বক্তা; হইবে গলাকাটা। পড়ন্ত রোদ হইবে পড়ন্ত রোদ; দীর্ঘায়িত চুল হইবে দীর্ঘায়ত; দৃষ্টি ঘোরাতে হইবে চোখ ঘোরাতে; বেঅন্নস্থের হইবে নিরন্নতার; ছ্যাঁদা কথা হইবে ছেঁদো কথা; ফাইফরমাস করবে হইবে খাটবে; ঐ সবে নীলমণি তুই হইবে সবে ধন নীলমণি তুই; ইত্যাদি। ৪ নং (বানান বিভ্রাট) চোক্ষু; বীনায়; প্রেম-নিশিক্ত অনবরতঃ; শিথীল; কাঠিণ্য; স্তুপ; শূণ্য; ভাঁড়া; বিদ্রুপ; বেষ্টনী; অভীষ্ঠ ইত্যাদি। ৫ নং ভাষাবিভ্রাট—আজ কি পেল ও; স্থির সঙ্করণে চলেছে ভুরু কুঁচকে, প্রচুর দেহা; বুকখানা পড়ে নিল; ধুঁইয়ের কথা কোনো বিশেষ ভাবে নি, ইত্যাদি বিস্তর।

যাহা হোক, গ্রন্থখানির কাগজ বাঁধাই ও ছাপা বেশ ভাল এবং দামও সে অনুপাতে অতিরিক্ত নয়। বাঙালী পাঠকের নিকট গ্রন্থখানি সমাদৃত হইবে।

শ্রীজীবনময় রায়

কংগ্রেসের পথ—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ। সরস্বতী লাইব্রেরী, সি, ১৮-১৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯৪, মূল্য দেড় টাকা।

আজ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই ভারতের ভাগ্য কোন্ দিকে চলিয়াছে তাহা ভাবিবার ও বুঝিবার সময় আসিয়াছে। সমস্ত জগৎ যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ধ্বংসযজ্ঞে ব্যাপৃত ছিল তখনও ভারতীয় কংগ্রেস অহিংসার আদর্শ পরিত্যাগ করে নাই। শত নির্যাতনেও কংগ্রেস গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত পথই বাছিয়া লইয়াছিল। আজ জাতির জীবনে চরম পরীক্ষার দিন সমুপস্থিত। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও তাহার সহায়ক মুসলীম লীগ উভয়েই হিংসায় বিশ্বাসী এবং এই জন্য আজ কংগ্রেসকে চূড়ান্ত সংগ্রামের মধ্যে অহিংসার আদর্শের পতাকা উড্ডীন রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

বর্ত্তমান পুস্তকে লেখক পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া কংগ্রেসের আদর্শ কর্ম্মপদ্ধতি, বৈপ্লবিক রূপ, অহিংসার শক্তি ও সার্থকতা এবং স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণ বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া সাম্রাজ্যবাদের যে লজ্জাকর সহায়তা করিয়াছে তাহা অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। হিংস ও অহিংস বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্তটি দ্বারা স্বাধীনতা লাভ হইলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোন দল বা শ্রেণীবিশেষের হাতে পড়ে; এজন্য প্রকৃত "গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত হয় না। পৃথিবীর সকল বিপ্লবের ইতিহাসই এই শিক্ষা দেয়। তাই মহাত্মাজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস অহিংসার পথে বিপ্লব ঘটাইয়া প্রকৃতই মজুর-কৃষকের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়।

লেখক অতি সরলভাবে কংগ্রেসের মত ও পথের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে কংগ্রেস সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইবে। বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ একটি সুন্দর 'পরিচয়' লিখিয়া এই পুস্তকের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ভক্তের ভগবান—পঞ্চতীর্থ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বেদান্তশাস্ত্রী। স্কুল সাপ্লাই কোং, সদরঘাট, ঢাকা। মূল্য এক টাকা।

স্ত্রীভূমিকা বর্জ্জিত ছেলেদের নাটক। চন্দ্রহাস নামক হরিভক্ত রাজপুত্রের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কতকটা যাত্রার ধরণে রচিত ভাব উন্নত এবং সুনীতিসঙ্গত।

মণিমালা—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য দুই টাকা।

কবিতার বই। ভাব ও ভাষা মন্দ নহে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মায়াজাল—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীরমেশ ঘোষাল, ৩৫, বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

বর্তমান বাংলার নাগরিক জীবন নানা কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এই কৃত্রিমতার ছাপ পড়িয়াছে। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসাদিতে যে-সমস্ত পাত্রপাত্রীর চিত্র অঙ্কিত হয় তন্মধ্যে সবগুলিকে সত্যচিত্র বলিয়া মানিয়া লইতে মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু রামপদবাবুর কথা-সাহিত্য ঠিক সে জাতীয় নহে; ধার করা জিনিস লইয়া তিনি কারবার করেন না। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং মানুষের প্রকৃত পরিচয় তিনি লাভ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার রচিত কথাসাহিত্যে আমরা বাংলাদেশের হৃৎস্পন্দন শুনিতে পাই।

'মায়াজালে' বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবার দাবি রাখে। গৃহকে কেন্দ্র করিয়াই বাংলার নারীর জীবন ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। বাংলার যে গৃহলক্ষ্মীকে লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "হে কল্যাণী, নিত্য রত আছ গৃহকাজে", যোগমায়া সেই কল্যাণী বধূ-মূর্তিরই প্রতীক। বাংলার বধূ যেদিন স্বামীর সংসারে আসিয়া প্রবেশ করে সেইদিন হইতেই সুরু হয় গৃহকপোতীর মত তাহার নীড় রচনার পালা। ক্রমে গৃহ আর গৃহিণী পরিণত হয় এক অভিন্ন সত্তায়। স্বামীর ভিটার সঙ্গে বাংলার নারীর এই একাত্মবোধ যে কিরূপ সুনিবিড় তাহাই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে 'মায়াজালের' যোগমায়ার আচরণে আর উক্তিতে: সত্যই 'বাড়ীর মর্যাদাকে নিজের মর্যাদা হইতে পৃথক করিয়া ভাবিবার অবসর যোগমায়া কোনোদিন পান নাই।' নিজের জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাত, মৃত্যুশোক ইত্যাদি বিবিধ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া এই শিক্ষাই তিনি লাভ করিলেন যে, স্বামীর ভিটাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র, তাঁহার জীবনের চিরন্তন প্রতিষ্ঠা-ভূমি। সংসারের এই বন্ধন হইতে, এই 'মায়াজাল' হইতে তাঁহার নিষ্কৃতি নাই।

নিভৃত বঙ্গ-পল্লীর তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ শান্তিপূর্ণ পটভূমিকায় অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে লেখক নারীত্বের মহিমাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কোথাও তাঁহাকে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই। পুস্তকটিতে নারীচরিত্রগুলিই অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে এবং সেগুলি যে চরিত্রসৃষ্টি হিসাবে সার্থক ও জীবন্ত হইয়াছে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ 'ডায়লগ' লেখায় লেখকের অসাধারণ দক্ষতা। বাংলার মেয়েদের ঘরোয়া এবং ঘরকন্নার কথাবার্তার বিশিষ্ট ভঙ্গীটুকু কেমন করিয়া তিনি আয়ত্ত করিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

কিশোরীমোহন চৌধুরী

রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উকীল ও রাজনীতিক নেতা কিশোরীমোহন চৌধুরী ৯০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি দুই বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। উক্ত শহরের উকীল সভার সভাপতিরূপে যাবতীয় জনহিতকর আন্দোলনের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাকে তিনি তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত বলিয়া মনে করিতেন। এক সময়ে প্রায় ৮০ জন ছাত্র তাঁহার পরিবারে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত।

মালতী শ্যাম

শিলচরের উকীল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের পত্নী মালতী শ্যাম বিগত ১৩ই কার্ত্তিক পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯৩২ সাল হইতে তিনি জনহিতকর কার্য্যে

মালতী শ্যাম

আত্মনিয়োগ করেন। শিলচরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্পর্শে আসিয়া নারীসমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সভাসমিতির অনুষ্ঠানে রত হন। ১৯৩৮ সালে তিনি "শিলচর নারী-কল্যাণ সমিতি" স্থাপন করেন। ১৯৪০ সালে এই সমিতি নিখিল-ভারত মহিলা সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দরিদ্র ভদ্রঘরের মহিলাগণের হিতসাধনকল্পে তিনি নিজে পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেন এবং তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার ঐকান্তিক কর্ম্মশক্তি দ্বারা শিলচরের নারীসমাজে নবজাগরণের সূচনা হয়।

পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া জেলায় আমরাল গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে ১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কেবলমাত্র স্বীয় অধ্যবসায় বলে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হন। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ৩১ বৎসর বয়সে তিনি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বাঁকুড়া জেলা আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। তিনি বাঁকুড়া দেওয়ানী আদালতে দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত আইন-ব্যবসায়ে রত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতা, সত্যনিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তি বিরল। গত ৭ই ভাদ্র ৭৮ বৎসর বয়সে বাঁকুড়া শহরে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্রীমতী লীলা রায়

পূর্ব্বে উইমেন্স কলেজ কলিকাতা এবং অধুনা স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ছাত্রী বিভাগের ব্যায়াম পরিচালিকা শ্রীমতী লীলা রায় বি-এ, বি-টি বাংলা গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক বৃত্তি পাইয়া মেয়েদের ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যচর্চ্চা সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষালাভার্থ দুই

শ্রীলীলা রায়

বৎসরের জন্য কানাডায় যাইতেছেন। তিনি সম্প্রতি উইমেন্স ইণ্টার-কলেজিয়েট এথলেটিক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীমতী লীলা নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

নবতুর্গা পূজা সমাপনান্তে প্রথম প্রিয়া-সম্ভাষণ

(প্রাচীন কাংড়া চিত্র)

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৫৩

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার ভবিষ্যৎ

বাঙালীর জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। আমরা চরম অবনতির পথে কত দূর পৌঁছিয়াছি এবং কিরূপ দ্রুত বেগে সে পথেই চলিয়াছি তাহার বিচার-ক্ষমতাও আমাদের লোপ পাইতেছে। জাতির প্রগতির পথনির্দেশ করেন তাহার নেতা বা নেতৃবর্গ, নেতৃবর্গ দেশের ও দশের অবস্থা ও ব্যবস্থার বিচার করেন জাতির সদস্যবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া যথাযথভাবে পরামর্শ করিয়া। এই নেতৃবর্গ ও তাঁহাদের পরামর্শদাতাদিগের যোগ্যতার বিচার করে জাতির জনমত এবং এই শেষ বিচারের কষ্টিপাথর হইল দেশের পরিস্থিতি। ইহাই জগতের নিয়ম এবং যেখানেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে সেখানেই জাতির দুর্দশার আরম্ভও হইয়াছে। বাংলার জাতীয়তাবাদের দুর্দশার অন্ত নাই এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? অথচ আমাদের চলিয়াছে সেই এক ঢোল এক কাঁসি, সেই পুরানো অযোগ্য অকর্মণ্য নেতৃবর্গ এবং তাঁহাদের চালক সেই স্বার্থান্বেষী চেলা-চামুণ্ডার দল। দুই যুগব্যাপী চক্রান্ত ও দলাদলির ফলে এই মহাশয় ব্যক্তিগণ দেশকে কোথায় আনিয়াছেন এবং পথ দেখাইবার ছলে কোথায় লইয়া চলিয়াছেন তাহার বিচার যাহাতে না হয় তাহার জন্য নানা প্রকার ধুয়া নানা রকমের উচ্ছ্বাস ও আবেগময় কার্যক্রম ইঁহারা নিত্যই চালাইতেছেন, দেশ তিমির হইতে ঘোরতর তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। নিজের কলঙ্ক নিজের অযোগ্যতা ঢাকিবার জন্য অন্যের উপর কর্দম নিক্ষেপ ও মিথ্যা দোষারোপ এবং নিজের অযোগ্যতার কারণে দেশের ও জাতির অবনতির দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে অন্যের স্কন্ধে ফেলিতে ইঁহারা বিশেষ কুশলী। কিন্তু প্রশ্ন এই যে তাহাতে এই অভাগা দেশের ভবিষ্যতের পথ কোন্ মুখে চলিয়াছে? জাতীয়তাবাদী বাংলার ভবিষ্যতের এক প্রধান অংশ তাঁহাদেরই হাতে, যাঁহাদের এই দুর্ভাগা জাতি নিজে-দের প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়াছে রাষ্ট্র পরিষদে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ও গণ-পরিষদে। জাতীয়তাবাদী বাংলার প্রতিনিধি নির্বাচন হইয়াছে সম্পূর্ণরূপে নেতৃবর্গের নির্দেশ অনুসারে, সুতরাং নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁহাদের। বিশ বৎসর পূর্বে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলার আসন ছিল শীর্ষ-স্থলে। আজ এই সকল প্রতিনিধি নিয়োগের ফলে বাংলার স্থান কোথায় নামিয়াছে তাহা ভাবিতেও লজ্জা করে। সদ্য-মাত্র যে প্রতিনিধিকে কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্য নির্বাচন করা হইল তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি যদি বাংলাদেশে খুঁজিয়া না পাওয়া গিয়া থাকে তবে বলিতে হইবে বাংলাদেশের দুর্গতি চরমে পৌঁছিয়াছে।

বাঙালীর পরিত্রাণ তবেই সম্ভব যদি সে সেই মিথ্যার জাল কাটিয়া বাহির হইতে পারে যাহার দ্বারা তাহার হাত-পা জড়াইয়া গিয়াছে। কর্তাভজা, ভাবোচ্ছ্বাসপ্রবণ, পরশ্রী-কাতর বাঙালীর অস্তিত্বের ডাক আসিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ বা দাসত্ব অনিবার্য। বাংলাদেশে যদি আগেকার মত নিস্বার্থ, নির্ভীক, প্রগতিশীল ও স্বাধীনচেতা বঙ্গসন্তান নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে তবেই এদেশ উদ্ধার পাইবে। দেশে এখন অরাজকতা এবং এ অবস্থার প্রতিকার আমাদেরই করিতে হইবে, অথচ দেশে সক্রিয় রহিয়াছে মাত্র দুইটি শক্তি যে দুইটিই জাতীয়তাবাদের পক্ষে বিষতুল্য। তাহার একটি রাজকীয় যাহার প্রয়োগ অতি প্রবলভাবে চলিয়াছে জাতীয়তাবাদের উচ্ছেদের জন্য এবং অন্যটি, বিভিন্ন নামে ও নানারূপ ছদ্মবেশে গণশক্তির অপপ্রয়োগে জাতীয়তাবাদের ধ্বংসেরই সহায়তা করিয়া চলিতেছে। উদ্দাম বিশৃঙ্খলার জয়-জয়কার চারি দিকেই দেখা যায়, মিথ্যার আবরণে সেই মেকি চলিতেছে এখন জাতীয়তাবাদের নামে। এই মিথ্যার প্লাবনে বাঁধ দিবে কে?

প্রাদেশিক সীমা নির্ধারণ

গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বদিন নয়া-দিল্লীতে এক সম্মেলনে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমা নির্ধারণের বিষয় আলোচিত হয়। ডাঃ পট্টভী সীতা-রামিয়া এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন যে ভাষার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিকে পুনর্গঠন করিবার সমস্যাই গণ-পরিষদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হইবে। প্রদেশের সীমা যথাযথ ভাবে নির্ধারিত না হইলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নিরর্থক হইয়া পড়ে—ইহা সকলেই উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন করিলে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি সুসংবদ্ধ ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিবে।

ডাঃ সীতারামিয়া বলেন, যে সকল প্রদেশ সম্বন্ধে কোন মতবিরোধ নাই সেগুলির তালিকা সম্বলিত একটি প্রস্তাব গণ-পরিষদের পূর্ব অধিবেশনে উত্থাপন করিতে হইবে এবং মাইনরিটি কমিটি, দেশীয় রাজ্য কমিটি প্রভৃতির সহিত একযোগে যথাসম্ভব ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে আর্থিক ও বৈষয়িক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রদেশগুলির সীমা নূতন করিয়া নির্ধারণ করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে। ডাঃ সীতারামিয়া প্রস্তাব করেন যে এই সকল কমিটিকে তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে গণ-পরিষদ যে সকল নীতি নির্ধারণ করিয়া দিবে অস্থায়ী জাতীয় সরকারকে সেইগুলি বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে।

সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীশঙ্কররাও দেও বলেন যে ভারতের জন্য যখন একটি নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণীত হইতেছে সেই সময়ে লোকে যুক্তিসম্মত কোন ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমা নির্ধারণের বিষয় চিন্তা করিবে ইহা স্বাভাবিক। এ যাবৎ ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির সীমা এরূপ কোন ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় নাই। বহু পূর্বে, ১৯২০ সালে, কংগ্রেস ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশগুলির সীমা পুনর্নির্ধারণের নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কংগ্রেস নিজের গঠনবিধিতে এই সীমা মানিয়া লইয়াছে। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারেও কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে যে জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক অঞ্চল বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া নিজেদের বিশিষ্ট জীবন ও সংস্কৃতির অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিবে। এই স্বাধীনতা কংগ্রেস বরাবরই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়:

"যেহেতু ভারতের পূর্বতন শাসকদের অপসারণ ও তাহাদের শাসিত রাজ্য খণ্ডিত করিয়া ভারতবর্ষকে ইতস্তত ভাবে কয়েকটি এলাকায় ভাগ করা হইয়াছে; যেহেতু স্বাতন্ত্র্য-বিশিষ্ট ও সচেতন সুনির্দিষ্ট কয়েকটি রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়; যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশগুলিকে উহার শিক্ষা, আইন, শাসন ও সংস্কৃতি বিষয়ক কর্তব্য যথোচিত ভাবে পালন করিতে হইলে এক ভাষাভাষী ও এক সংস্কৃতিবিশিষ্ট অধিবাসীদিগকে লইয়া প্রদেশগুলি গঠিত হওয়া প্রয়োজন, সেইজন্য গণ-পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধি স্থানীয় সদস্যগণ এবং ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন প্রস্তাব সমর্থনকারী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদিগের এই সম্মেলন গণ-পরিষদের নিকট প্রস্তাব করিতেছে, উহার বর্তমান পূর্ণ অধিবেশনে উপরোক্ত নীতি স্বীকার করিয়া লইয়া নূতন শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার ও ভারত-ব্রিটিশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার অব্যবহিত পরে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ভিত্তিতে প্রদেশগুলি পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক।"

সম্মেলনে ডাঃ জয়াকর, স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, শ্রীশঙ্কররাও দেও, ডাঃ তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কে এম্ মুন্সী, কে শান্তনম, লালা দেশবন্ধু গুপ্ত, কে মাধব মেনন, গোপীনাথ বরদলই, শেঠ গোবিন্দদাস, আর আর দিবাকর, এস নিজলিঙ্গাপ্পা, চৌধুরী চরণ সিং, মুকুটবিহারী লাল, রায় বাহাদুর সুরজমল, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ পি বি দেশমুখ এবং কে বেঙ্কট রাওকে (আহ্বায়ক) লইয়া একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

বাংলার সমস্যা আলাদা। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমা নির্ধারিত হইলেও বাংলার সীমা পুনর্নির্ধারণে বাধা পড়ে না। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা ও সংস্কৃতি মূলতঃ এক হইলেও সাম্প্রদায়িক বিষের ফলে মনোবৃত্তিতে যে বিষম পার্থক্য আসিয়াছে—এই অপ্রিয় সত্য অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের আর্থিক সমস্যা এক, জীবনযাত্রার ধরণেও কতকটা মিল তাহাদের মধ্যে আছে, কতক শ্রেণীর মুসলমান এখনও কিছু কিছু হিন্দু আচার পালন করে সবই সত্য, কিন্তু তথাপি দেখা গিয়াছে লীগপন্থীদের মনের কোণে ভিন্ন ধর্মীর প্রতি যে বিদ্বেষ সঙ্গোপনে রহিয়াছে সুযোগ পাইলেই তাহা উগ্র হইয়া উঠে। পরধর্মীর প্রতি হিন্দুর যে উদার সহনশীলতা আছে পৃথিবীর অপর কোন ধর্মের বেলাতেই তাহা দেখা যায় না। হিন্দুসমাজে মধ্যযুগে যে ছুঁৎমার্গ প্রবেশ করিয়াছিল তাহার বর্তমান দুর্দশার জন্য উহাই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দায়ী। মুসলমানের স্পর্শে হিন্দুর জাত গিয়াছে, হিন্দুনারী অপহৃতা হইলে সমাজে আর তাহার স্থান হয় নাই। এই দুই পাপে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাইয়াছে। নোয়াখালীর আঘাতের পর হিন্দু সমাজ তাহার হৃত-চৈতন্য ফিরিয়া পাইয়াছে। অপহৃতা নারী সমাজে স্থান পাইয়াছে এবং ধর্মান্তরে প্রায়শ্চিত্ত বিধি মনু সত্যই দিয়াছিলেন কি না পণ্ডিতেরা তাহাও সন্দিগ্ধ চিত্তে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মনুর সময়ে খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের জন্ম পর্যন্ত হয় নাই, উহারা ভারতবর্ষে আসেও নাই। সুতরাং ধর্মান্তরকরণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না, তার আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের?

বাঙালী হিন্দুর বর্জনশীলতা বন্ধ হইয়াছে, এবার তাহাকে নিজস্ব বাসভূমির কথা চিন্তা করিতে হইবে। ভাষা ও সংস্কৃতির নামে বাংলা অখণ্ড রাখিলে অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহার কিছু পরিচয় আমরা গত সংখ্যায় দিয়াছি। এই ভিত্তিতে বাংলার সহিত বিহার ও আসামের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলি সংযুক্ত করিলেও বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা বাড়ে না। মুসলমান সমাজে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকাতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় হিন্দু তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না, ১৯০১ সাল হইতে বাংলার সেন্সাস রিপোর্টগুলি ভাল করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। ১৯৩১ ও ১৯৪১-এর সেন্সাসে ভুল থাকিতে পারে কিন্তু ১৯০১, ১৯১১ ও ১৯২১-এর সেন্সাস মিথ্যা কথা বলিবে না।

বাঙালী হিন্দুকে তার প্রাচীন বাসভূমি হইতে উচ্ছেদের নোটিশ মুসলিম লীগ দিয়া দিয়াছে, এই নোটিশ কার্যে পরিণত করিবার বিবিধ আয়োজনও সুরু হইয়া গিয়াছে। গণ-পরিষদে এই সমস্যা উত্থাপনের প্রাক্কালেও যদি আমরা নীরব

থাকি তাহা হইলে বাঙালী হিন্দুর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান বাস্তব যুগে ভাবপ্রবণতা পরিহার না করিলে বাঙালী বাঁচিবে না।

গণ-পরিষদে বিভিন্ন দলের সংখ্যানুপাত

মূল পরিষদে বিভিন্ন দলের সংখ্যানুপাত

		সংখ্যা
কংগ্রেস		২০৬
সাধারণ	২০১	
মুসলিম	৪	
শিখ	১	
মুসলিম লীগ	৭৪	৭৪
ইউনিয়নিষ্ট		৩
সাধারণ	২	
মুসলিম	১	
কম্যুনিষ্ট		১
সাধারণ	১	
তপশীলী ফেডারেশন		১
সাধারণ	১	
অনুন্নত জাতি		২
সাধারণ	২	
জমিদারগণ		৩
সাধারণ	৩	
বাণিজ্য ও শিল্প (স্বতন্ত্র)		২
সাধারণ	২	
শহীদ জীর্গা (বেলুচিস্থান)		১
মুসলিম	১	
পন্থ অকালী		৩
শিখ	৩	
দেশীয় রাজ্যসমূহ (সর্বোচ্চ)	৯৩	৯৩
মোট—		৩৮৯

খণ্ডপরিষদে বিভিন্ন দলের সংখ্যানুপাত

শ্রেণী—এ

মোট আসন—১৯০

কংগ্রেস	
মাদ্রাজ (সাধারণ)	৪৫
বোম্বাই (সাধারণ)	১৯
যুক্তপ্রদেশ (সাধারণ)	৪৪
(মুসলিম)	১
বিহার (সাধারণ)	২৮
মধ্যপ্রদেশ (সাধারণ)	১৬
উড়িষ্যা (সাধারণ)	৮
কুর্গ	১
দিল্লী	১
আজমীঢ়-মারোয়াড়	১
মোট—	১৬৪
মুসলিম লীগ	
মাদ্রাজ	৪
মধ্যপ্রদেশ	১
বোম্বাই	২
যুক্তপ্রদেশ	৭
বিহার	৫
মোট—	১৯
অনুন্নত শ্রেণী	
বিহার (সাধারণ)	১
উড়িষ্যা (সাধারণ)	১
মোট—	২
জমিদারগণ	
মধ্যপ্রদেশ (সাধারণ)	১
বিহার (সাধারণ)	২
মোট—	৩
শিল্প ও বাণিজ্য (স্বতন্ত্র)	
মধ্যপ্রদেশ (সাধারণ)	২
মোট—	২
সর্বশুদ্ধ—	১৯০

শ্রেণী—বি

মোট আসন—৩৬

কংগ্রেস—পঞ্জাব (সাধারণ)	৬
শিখ	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (মুসলিম)	২
সিন্ধু (সাধারণ)	১
মোট—	১০
মুসলিম লীগ—পঞ্জাব	১৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১
সিন্ধু	৩
মোট—	১৯
ইউনিয়নিষ্ট—পঞ্জাব (সাধারণ)	২
মুসলিম	১
মোট—	৩
সহীদ জীর্গা—বেলুচিস্থান (মুসলিম)	১
মোট—	১

পন্থ অকালী—পঞ্জাব	৩
মোট—	৩
সর্বশুদ্ধ—	৩৬

শ্রেণী—সি

মোট আসন—৭০

কংগ্রেস—বাংলা (সাধারণ)	২৫
আসাম (সাধারণ)	৭
মোট—	৩২
মুসলিম লীগ—বাংলা	৩৩
আসাম	৩
মোট—	৩৬
কম্যুনিষ্ট—বাংলা (সাধারণ)	১
মোট—	১
তপশীলী ফেডারেশন—বাংলা (সাধারণ)	১
মোট—	১
সর্বশুদ্ধ—	৭০

বিভিন্ন দল (সম্প্রদায় এবং স্বার্থহিসাবে)

হিন্দু তপশিলী সম্প্রদায় বাদে

কংগ্রেস—	১৫৬
ইউনিয়নিষ্ট	১
কম্যুনিষ্ট	১
জমিদার	৩
শিল্প ও বাণিজ্য	২
মোট—	১৬৩
তপশীলী শ্রেণী—কংগ্রেস	২৯
তপশীলী শ্রেণী	১
ইউনিয়নিষ্ট	১
মোট—	৩১
মুসলমান	
মুসলিম লীগ	৭৪
কংগ্রেস	৪
ইউনিয়নিষ্ট	১
মহীদ জীর্গা	১
মোট—	৮০
এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—কংগ্রেস	৩
মোট—	৩
ভারতীয় খ্রীষ্টান—কংগ্রেস	৬
মোট—	৬
পার্শী সম্প্রদায়—	
কংগ্রেস	৩
অনুন্নত শ্রেণী—	
কংগ্রেস	৪
স্বতন্ত্র	২
মোট—	৬
শিখ—কংগ্রেস	১
পন্থ অকালী	৩
মোট—	৪
সর্বশুদ্ধ—	২৯৬

গণ-পরিষদ

ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল এবং মুসলিম লীগের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করিয়া পূর্বনির্দিষ্ট ৯ই ডিসেম্বর তারিখে গণ-পরিষদের উদ্বোধন হইয়াছে। পার্লামেন্টে বিতর্কে রক্ষণশীল দলের নেতারা লীগ-নায়কদের পক্ষ সমর্থন করিয়া গণ-পরিষদকে একটা হিন্দু সম্মেলন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দাবি তুলিয়াছিলেন যে এই পরিষদ কর্তৃক রচিত রাষ্ট্রবিধি গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হউক। মিঃ চার্চিল, লর্ড উইনটারটন, লর্ড সাইমন এবং লর্ড টেম্পল উড (প্রাক্তন সার সামুয়েল হোর) কমন্স এবং লর্ডস সভায় লীগের হইয়া লড়িয়াছেন, কমন্স সভার বিতর্কের সময় দর্শকদের আসনে মিঃ জিন্নাও উপস্থিত ছিলেন। মিঃ আলেকজাণ্ডার এবং লর্ড পেথিক লরেন্স উভয়েই এই দাবির জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব অনুসারে গণ-পরিষদ কর্তৃক নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রণীত হইলে তাহা বিধিবহির্ভূত হইবে না, তবে মিঃ এটলীর ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা অনুসারে মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকিলে ভারতবর্ষের যে-সব অংশে লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে উহা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। কমন্স সভায় বিতর্কের উদ্বোধনকালে সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপসও এই কথাই বলিয়াছেন। মিঃ আলেকজাণ্ডার বলেন যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে হইয়াছে কি না, নূতন রাষ্ট্রবিধি রচিত হইলেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। এ বিষয়ে সীমাহীন বিতর্ক চালাইয়া যাওয়া অপেক্ষা গণ-পরিষদ নবরচিত রাষ্ট্রবিধিতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য কি বন্দোবস্ত করেন তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করাই তাঁহার মতে সুবিবেচনার কার্য হইবে। মিঃ আলেকজাণ্ডারের উক্তি এইরূপ :—

মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, গণ-পরিষদে শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পর তাহাকে কার্যকরী

করার জন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টের নিকট বিল সুপারিশ করিবেন। তবে ইহার পূর্বে দুইটি সর্ত মানিতে হইবে। একটি হইল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্ত শাসনতন্ত্রের মধ্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা—মন্ত্রী-মিশনের এই সর্ত ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি মানিতে সম্মত হইয়াছেন। সেইজন্ত গণ-পরিষদে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহের কোন কারণ দেখি না।"

এই সময় মিঃ বাটলার প্রশ্ন করেন যে, গণ-পরিষদের ক্ষমতা কত দূর এবং তাঁহারা শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারেন কি না।

মিঃ আলেকজাণ্ডার বলেন, আমরা মোটামুটিভাবে কতকগুলি যে মূল জিনিষের খসড়া করিয়া দিয়াছি, উপযুক্তভাবে নির্বাচিত গণ-পরিষদের সদস্তরা যদি সে-সব বিষয়ে একমত হন তবে একটা ভাল শাসনতন্ত্রই রচিত হইবে। তবে একথা ঠিক যে, পার্লামেণ্টকে সুপারিশ করার পূর্বে রচিত শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিব।

লর্ডস সভার বিতর্কে লর্ড সাইমন নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্ন করেন :

(১) ১৬ই মে মন্ত্রী-মিশনের যে প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উত্থাপন করা হইয়াছিল তাহাতে কি এই কথা বলা হয় নাই যে উভয় সম্প্রদায়কেই কয়েকটি মূল বিষয় মানিয়া লইতে হইবে ?

(২) দিল্লীতে গণ-পরিষদের যে অধিবেশন চলিতেছে লীগ-সদস্যেরা তাহাতে যোগ দেন নাই, এই অবস্থায় উক্ত পরিষদকে মিশন-প্রস্তাবে বর্ণিত গণ-পরিষদ বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে কি ? মুসলমানেরা যদি শেষ পর্যন্ত উহাতে যোগদান না করে তাহা হইলে ঐ গণ-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত রাষ্ট্রবিধিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি ভারতীয়গণ কর্তৃক সকল ভারতবাসীর জন্ত প্রণীত রাষ্ট্রবিধি বলিয়া স্বীকার করিবেন ?

(৩) মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অনুসারেই দিল্লীর বর্তমান গণ-পরিষদকে রাষ্ট্রবিধি রচনা করিতেই হইবে এমন কোন কথা আছে কি ? মন্ত্রী-মিশন ভাবী রাষ্ট্রবিধির যে খসড়া তৈরি করিয়া দিয়াছেন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া নূতন ভাবে রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নের অধিকার গণ-পরিষদের আছে কি ?

লর্ড পেথিক লরেন্স উত্তরে বলেন, "স্বাভাবিক অবস্থায় গণ-পরিষদের কাজ সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন উঠিয়াছে তার জবাব আমি দিব। মন্ত্রী-মিশন ভাবী রাষ্ট্রবিধির যে মূল খসড়া করিয়া দিয়াছেন তদনুসারে নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নের অধিকার দিল্লীর বর্তমান গণ-পরিষদের আছে কি না এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে যে খসড়া দেওয়া হইয়াছে তাহার বাহিরে কিছু করিতে হইলে উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রতিনিধির সম্মতি প্রয়োজন হইবে ; তাহা না পাইলে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের বাহিরে যাওয়া চলিবে না। প্রস্তাবের ১৫ ধারায় উল্লিখিত বিষয়ের ব্যতিক্রম করিতে হইলে উভয় সম্প্রদায়ের উপস্থিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশের ভোট গ্রহণ আবশ্যক হইবে।"

মুসলীম লীগ গণ-পরিষদ নির্বাচনে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু লীগ-সদস্যেরা গণ-পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে বিরত রহিয়াছেন, ইহাতে গণ-পরিষদকে সকল দল ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করা যায় না এই কথা মানিয়া লইয়াও লর্ড পেথিক লরেন্স জানাইয়া দিয়াছেন যে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অনুসারে রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নের অধিকার বর্তমান গণ-পরিষদের অব্যাহতই রহিয়াছে। পার্লামেণ্টের বিতর্ক হইতে ইহাই পরিষ্কার হইয়া গেল যে, গণ-পরিষদের অধিবেশন স্থগিত থাকিবে না, লীগ উহাতে শেষ পর্যন্ত যোগদান না করিলেও যে রাষ্ট্রবিধি প্রণীত হইবে তাহাতে সংখ্যালঘুদের জন্ত কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাই বিবেচিত হইবে এবং ব্রিটেনের সহিত ভারতের সন্ধি ও সংখ্যালঘুদের জন্ত রাষ্ট্রবিধির মধ্যে সংযোজিত রক্ষাকবচ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনঃপূত হইলে নবরচিত রাষ্ট্রবিধি শিরোধার্য করিয়া লইতে আপত্তি হইবে না। তবে মিঃ এটলীর ঘোষণা অনুসারে এইটুকু কথা রহিল যে, এই রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নে লীগ যোগদান না করিলে লীগ-অধিকৃত অঞ্চলে অর্থাৎ পঞ্জাবে, বাংলায় ও সিন্ধুতে উহা প্রযোজ্য হইবে না।

মিঃ এটলীর ঘোষণা ও গ্রুপিং

গণ-পরিষদের উদ্বোধনের প্রাক্কালে মিঃ এটলী বড়লাট এবং কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের লণ্ডনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেখানে কংগ্রেসের সহিত লীগের মিটমাটের একটা চেষ্টা হয় কিন্তু মিঃ জিন্নার চিরাচরিত অসংযত জিদের জন্ত কোন মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। লণ্ডন বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রুপিং। শেষ পর্যন্ত মিঃ এটলী ৬ই ডিসেম্বর তারিখে এক ঘোষণায় বলেন যে, গ্রুপিং সম্বন্ধে তাঁহারা ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আইনজ্ঞের পরামর্শ লইয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যে, সেকশনের অধিবেশনে উপস্থিত সদস্তদের ভোটাধিক্যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, গ্রুপে প্রবেশ করা না করা প্রদেশগুলির ইচ্ছাধীন থাকিবে এবং গ্রুপে প্রবেশ করিলেও নূতন রাষ্ট্রবিধি অনুসারে প্রথম যে নির্বাচন হইবে তদনুসারে গঠিত ব্যবস্থা-পরিষদ গ্রুপ পরিত্যাগের নোটিশ দিতে পারিবে। মন্ত্রী-মিশনের মূল প্রস্তাবানুসারে এই নোটিশ অন্তত দশ বৎসর পরে কার্যকরী হইবে। সেকসনে উপস্থিত সদস্তদের ভোটাধিক্যে গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত হইলে বি ও সি সেকসনের পক্ষে উহা বাধ্যতামূলক হইয়া দাঁড়ায় কারণ এই উভয়টিতেই লীগ সদস্তদের সংখ্যা অধিক। আসাম এবং সীমান্ত প্রদেশ গ্রুপে প্রবেশ সম্বন্ধে তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন

করিয়াছে। মিঃ এটলীর ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে ও সম্বন্ধে ভারতবাসীরা ইচ্ছা করিলে ফেডারেল কোর্টের নিকট আপীল করিতে পারে। মিঃ জিন্না ইহাতে আপত্তি করেন এবং ভারত-সচিবও পরে লর্ডস সভায় বিতর্কের উত্তর দান প্রসঙ্গে জানাইয়া দেন যে ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্ত তাঁহারাও মানিতে প্রস্তুত নহেন, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ব্যাখ্যাই তাঁহারা চূড়ান্ত বলিয়া মনে করেন।

মিঃ এটলীর সংক্ষিপ্ত ঘোষণার শেষ অনুচ্ছেদটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারতবাসীদের একটা বড় অংশে প্রতিনিধিগণ গণ-পরিষদে শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকিলে যে রাষ্ট্রবিধি রচিত হইবে তাহা দেশের অনিচ্ছুক অংশগুলির ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। শাঁখের করাতের ন্যায় এই উক্তি দু-দিকে কাটে। মূল গণ-পরিষদে যেমন লীগ অনুপস্থিত থাকিলে উহাতে গৃহীত রাষ্ট্রবিধি বাংলা, পঞ্জাব ও সিন্ধুর উপর জোর করিয়া চাপানো হইবে না, তেমনি বি অথবা সি সেকশনে লীগ যোগদান করিয়া গণতন্ত্রবিরোধী রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নে উদ্যত হইলে উহা হইতে হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিরা বাহির হইয়া গেলে লীগ-কর্তৃক রচিত রাষ্ট্রবিধি হিন্দু ও শিখদের উপর প্রযোজ্য হইতে পারিবে না। আপাতদৃষ্টিতে মিঃ এটলীর ঘোষণা লীগের অনুকূল বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক উহা তাহা নহে—মিঃ জিন্না এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই ইহার পরেও গণ-পরিষদে যোগদানে সম্মত হন নাই। মিঃ এটলীর ঘোষণায় বর্ণিত অনিচ্ছুক অংশের অনিচ্ছা কি ভাবে প্রকাশিত হইবে তাহা বলা হয় নাই, সেখানে ব্যাখ্যার অবকাশ রহিয়াছে। সেকশনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে এই অনিচ্ছা নির্দিষ্ট হইলে বাংলা, পঞ্জাব ও সিন্ধু বাদ পড়িবে কিন্তু গণ-ভোটে মত প্রকাশের ব্যবস্থা হইলে পঞ্জাবে লীগের পরাজয় ঘটিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। কংগ্রেস, শিখ ও ইউনিয়নিষ্ট দলের মিলিত শক্তি এখনও সেখানে লীগের চেয়ে বেশী।

এই প্রদেশগুলি আপাততঃ নূতন রাষ্ট্রবিধির বাহিরে পড়িয়া গেলেও পাকিস্থান হইবে না। মন্ত্রী-মিশনের ঘোষণার মূল সূত্র দুইটি—(১) ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইতে পারিবে না এবং (২) প্রতিনিধি সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে নির্দিষ্ট হইবে। মিঃ জিন্না দুইটি পৃথক গণ-পরিষদ গঠনের যে দাবি এখনও আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন প্রথমটির দ্বারা তাহা বাতিল হইয়া যায়। ভারতবর্ষে "স্বাধীন ও সার্বভৌম" পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা হইবে না এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং যে প্রদেশগুলি আপাততঃ বাহিরে থাকিবে সেগুলিকে কেন্দ্রীয় শাসন মানিয়া চলিতেই হইবে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লীগ-প্রদেশে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে চলিবে, অন্যান্য প্রদেশ চলিবে ১৯৪৭ সালের নূতন ভারতশাসন আইনে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বর্তমানে যে ক্ষমতা রহিয়াছে নূতন রাষ্ট্রবিধিতে তাহা কমিবার কথা, সুতরাং নূতন আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সম্বন্ধে লীগের আপত্তির কোন কারণ থাকিবে না। ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইবে না এই মূলনীতি ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার পর লীগ-প্রদেশের পক্ষে নূতন কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাও থাকিবে না। অবস্থাটা মোটমাট এই দাঁড়াইতে পারে যে বর্তমানে যেখানে প্রাদেশিক শাসন চলে ১৯৩৫ সালের এবং কেন্দ্রীয় শাসন চলে ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনে, ভবিষ্যতে কিছুদিনের জন্য বড় জোর তিনটি প্রদেশ শাসিত হইবে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও অপর সমস্ত প্রদেশ অনুসরণ করিবে ১৯৪৭ সালের নূতন রাষ্ট্রবিধি। নূতন ভারতশাসন আইন প্রবর্তিত হইলেই ইংরেজের ভারত-ত্যাগ সম্পূর্ণ হইবে, তখন "অনিচ্ছুক" প্রদেশগুলির অনিচ্ছা দূর করিবার ভার পড়িবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। কংগ্রেস এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে পারিবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। মিশনের প্রস্তাবে ম্যাকডোনাল্ডী বাঁটোয়ারার এক অভিশাপ weightage গিয়াছে, পৃথক নির্বাচনের স্থলে নূতন রাষ্ট্রবিধিতে যৌথনির্বাচন প্রবর্তিত হইলে দ্বিতীয় অভিশাপও দূর হইবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান তখনই সহজ হইয়া আসিবে।

"স্বাধীন ও সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র"—ভারতবাসীর লক্ষ্য

গণ-পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছেন :

"এই গণ-পরিষদ ভারতবর্ষকে স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্ররূপে ঘোষণা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছে। ব্রিটিশ ভারত, দেশীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের বহির্ভূত অপরাপর অংশ এবং অন্যান্য যে সমুদয় অঞ্চল স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সঙ্কল্প এই গণ-পরিষদ ঘোষণা করিতেছে।

"ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ (তাহাদের বর্তমান সীমানাসহ অথবা গণ-পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানাসহ অথবা শাসনতন্ত্র-বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে গঠিত সীমানাসহ) আত্মকর্তৃত্বশীল অঞ্চল হইবে। উহারা অসংজ্ঞিত ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উপরে অর্পিত ক্ষমতা ও যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলে স্বভাবতঃই যে সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তব্য তাহাতে গিয়া বর্তে, সে সমুদয় ব্যতীত অপর সমুদয় শাসনক্ষমতার অধিকারী হইবে।

"স্বাধীন সার্বভৌম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ এবং শাসনযন্ত্রের সমুদয় মূলাধার হইতেছে জনসাধারণ। এই যুক্তরাষ্ট্রে এবং অঙ্গরাষ্ট্রসমূহে ভারতের জনগণের অর্থ-

নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্নায়বিচার, সমান মর্যাদা, সমান সুযোগ ও আইনের চক্ষে সমান ব্যবহার পাইবার অধিকার থাকিবে। বাক্যের, ধর্মের, বৃত্তির, উপাসনার, সঙ্ঘ-গঠনের স্বাধীনতাও তাহাদের থাকিবে এবং সংখ্যালঘু অনগ্রসর ও খণ্ডজাতীয় অঞ্চল এবং অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকিবে। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ভূখণ্ড অখণ্ড থাকিবে। সভ্যজাতির আইনকানুন অনুসারে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার থাকিবে। এই সু-প্রাচীন দেশ বিশ্বের দরবারে তাহার ন্যায্য আসন লাভ করিবে এবং বিশ্বশান্তি ও মানব-কল্যাণসাধনে ব্রতী হইবে।"

প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া পণ্ডিতজী একটি উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "আমরা এক নূতন যুগের সমীপবর্তী হইয়াছি। আমরা কি করিতে ইচ্ছা করি এই প্রস্তাবে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ভারতের কোটি কোটি নরনারী তথা বিশ্ববাসীর সহিত অন্তরের যোগস্থাপনই আমাদের অভিপ্রায়। প্রস্তাবটি একটি সঙ্কল্প-বাক্যের স্থায়, এই সঙ্কল্প পালনে আমরা বদ্ধপরিকর। মৃত্যুর ছায়ায় আচ্ছাদিত পথ আমরা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, প্রয়োজন হইলে আমরা আবারও সেই পথে চলিব। সর্বশ্রেণীর দেশবাসীর যথাসম্ভব সহযোগিতা অর্জনের জন্য আমরা অবশ্যই সর্বপ্রকার চেষ্টা করিব কিন্তু আমাদের মূল আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিসর্জন দিয়া সে চেষ্টা করিব না।"

প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে গণ-পরিষদে যোগদানে লীগের আপত্তি আরও দৃঢ় হইতে পারে এই আশঙ্কায় ডাঃ জয়াকর উহা স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু গণ-পরিষদের প্রায় সকল সদস্যই উহা স্থগিত রাখিতে অনিচ্ছুক এই কারণে যে, নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন আরম্ভ করিবার পূর্বে গণ-পরিষদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষণা করা অত্যাবশ্যক। অন্যান্য উদারনৈতিক নেতাদের মধ্যে স্যার গোপালস্বামী আয়েঙ্গার এবং স্যার আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার উহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীও এই প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মত দিয়াছেন।

কলিকাতা পুলিশ

মিঃ জিন্না লণ্ডনে জনসভায় বলিয়াছেন যে কলিকাতায় যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু—তাহারা হিসাবে শতকরা ২৬ জন—সেখানে লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করিতে চাহিবে ইহা চিন্তা করাও ভুল। কিন্তু কলিকাতা পুলিসের উচ্চতম পদগুলি কি ভাবে লীগ দখল করিয়া রাখিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে ঐ যুক্তি কতটা ভিত্তিহীন, কেননা এখানেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র তৈয়ার করা হইয়াছে।

মুসলিম লীগের হাতে বাংলার গবর্মেণ্টের রাজস্ব ও ক্ষমতা কিরূপ সাম্প্রদায়িক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার কিছু নিদর্শন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকারী শাসনযন্ত্রের অপব্যবহারের প্রকৃষ্ট নিদর্শন কলিকাতা পুলিস। কলিকাতা পুলিস শুধু কলিকাতা শহরের শান্তিরক্ষার জন্য গঠিত হইয়াছে, প্রাদেশিক পুলিসের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। শহরে মুসলমান অধিবাসীর অনুপাত শতকরা মাত্র ২৪ জন, কিন্তু পুলিশের উচ্চতম ক্ষমতাপূর্ণ পদের প্রায় সব কয়টিই তাঁহাদের অধিকারে। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লীগের লোক মোতায়েন করা ছাড়া কলিকাতাতেই অপর্যাপ্ত লরী, পেট্রোল প্রভৃতি প্রাপ্তির সুবিধাও রহিয়াছে, যাতায়াতের রাস্তাঘাট এখানেই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, এখানেই লীগের ও গবর্মেণ্টের প্রধান কেন্দ্র, সুতরাং নেতৃত্ব ও তদ্বির উভয়েরই সুবিধা।

কলিকাতা পুলিসের গঠনপ্রণালী এইরূপ : সকলের উপরে আছেন পুলিস কমিশনার, তাঁর অধীনে বর্তমানে ১৬ জন ডেপুটি কমিশনার আছেন :

ডেপুটি কমিশনার	হেড কোয়ার্টার্স	ইংরেজ
"	" (অতিরিক্ত)	"
"	" (স্পেশাল)	"
"	সশস্ত্র পুলিস	"
"	পোর্ট	"
" (দুই জন)	সিকিউরিটি কণ্ট্রোল	"
"	স্পেশাল ব্রাঞ্চ	"
"	রিসিভারশিপ	হিন্দু
"	ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট	"
"	এনফোর্সমেণ্ট	"
"	পাবলিক ভেহিকল	"
"	উত্তর বিভাগ	মুসলমান
"	দক্ষিণ বিভাগ	"
"	স্পেশাল ব্রাঞ্চ (অতিরিক্ত)	"
"	শান্তি	"

ইহার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের পদ দুইটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। শহরের ২৫টি থানা ইঁহাদের অধীনে; থানায় দারোগা মোতায়েন করা ইঁহাদের কাজ। ইহার পরেই গুরুত্বপূর্ণ পদ স্পেশাল ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার, শহরের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহের ভার ইঁহার উপর। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদই লীগের অধিকারে রহিয়াছে। দাঙ্গার পূর্বে উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের পদে একজন অভিজ্ঞ হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। কঠোর হস্তে দাঙ্গাকারীদের শায়েস্তা করিয়া এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ইনি নিজ বিভাগেই শান্তি স্থাপন করেন। বলা আবশ্যক যে এই উত্তর বিভাগেই শহরের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত কলাবাগান,

লালবাগান, ফুলবাগান, রাজাবাজার প্রভৃতি গুণ্ডার আড্ডা অবস্থিত। ইঁহার শাসন লীগের মনঃপুত না হওয়ায় অবিলম্বে ইঁহাকে সরাইয়া এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের পদে জনৈক অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ মুসলমান কর্মচারীকে বেঙ্গল পুলিস হইতে আনা হয়। এই পরিবর্তনকে গুণ্ডারা জয়লাভের নিদর্শন বলিয়া মনে করে এবং নূতন ডেপুটি কমিশনারের কার্যভার গ্রহণের পর হইতেই আবার দাঙ্গা সুরু হইয়া যায়। খানাতল্লাসী, গ্রেপ্তার, আসামী চালান ও প্রাথমিক তদন্তের পর আসামীকে মুক্তিদানের ক্ষমতা দুই বিভাগীয় কমিশনারের আছে এবং এই সব কার্যেই দাঙ্গার পর হইতে বিষম পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি কমিশনারদের অধীনে দুই জন করিয়া এসিস্টাণ্ট কমিশনার আছেন। দাঙ্গার সময় ইঁহাদের তিন জন ছিলেন হিন্দু, একজন মুসলমান। সম্প্রতি একজন হিন্দুকে সরাইয়া সাম্প্রদায়িক হার সমান সমান করিয়া লওয়া হইয়াছে। যে হিন্দু এসিস্টাণ্ট কমিশনারটিকে সরানো হইয়াছে তিনিই দাঙ্গার সময় সবচেয়ে বেশী সাহস ও নিরপেক্ষ কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

অপরাধের তদন্তের জন্য কলিকাতা শহরকে সাতটি উপ-বিভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটিতে এক জন করিয়া ডিভিসনাল ডিটেকটিভ ইন্‌স্পেক্টর মোতায়েন করা হইয়াছে। ইঁহাদের সাত জনের মধ্যে পাঁচ জন মুসলমান, দুই জন হিন্দু। কোন মুসলমান এলাকায় হিন্দু ইন্‌স্পেক্টর নাই, কিন্তু হিন্দু এলাকায় মুসলমান ইন্‌স্পেক্টর আছে। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের বেলায় এই পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট।

তারপর থানা অফিসার। দাঙ্গার সময় ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক অনুপাত ছিল নিম্নোক্তরূপ :

থানার নম্বর	এলাকা	ভারপ্রাপ্ত দারোগা
এ	শ্যামপুকুর	হিন্দু
বি	জোড়াবাগান	মুসলমান
সি	বটতলা	"
ডি	বড়বাজার	"
ই	যোড়াসাঁকো	হিন্দু
এফ	সুকিয়া ষ্ট্রীট	"
জি	হেয়ার ষ্ট্রীট	মুসলমান
এইচ	বৌবাজার	হিন্দু
আই	মুচিপাড়া	মুসলমান
জে	তালতলা	"
কে	পার্ক ষ্ট্রীট	হিন্দু
এল	হেষ্টিংস	মুসলমান
এম	কাশীপুর	হিন্দু
এন	চিৎপুর	"
ও	মাণিকতলা	মুসলমান
পি	বেলেঘাটা	"
কিউ	এণ্টালি	হিন্দু
আর	বেনিয়াপুকুর	মুসলমান
এস	বালিগঞ্জ	হিন্দু
টি	ভবানীপুর	"
ইউ	টালিগঞ্জ	মুসলমান
ভি	আলিপুর	"
ডব্লিউ	ওয়াটগঞ্জ	"
ডব্লিউ ও পি	একবালপুর	"
এক্স	গার্ডেন রীচ	হিন্দু

শ্যামপুকুর, জোড়াবাগান, বটতলা, বড়বাজার, সুকিয়া ষ্ট্রীট, মুচিপাড়া, কাশীপুর, চীৎপুর, ভবানীপুর, টালিগঞ্জ ও আলিপুর এলাকায় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। এই ১১টি থানায় ভারপ্রাপ্ত দারোগাদের মধ্যে পাঁচ জন হিন্দু ছয় জন মুসলমান।

তালতলা, মাণিকতলা, বেলেঘাটা, এণ্টালি, বেনিয়াপুকুর, ওয়াটগঞ্জ এবং একবালপুর এলাকায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী। এই সব থানায় ভারপ্রাপ্ত দারোগাদের মধ্যে এক জন মাত্র হিন্দু।

জোড়াসাঁকো, হেয়ার ষ্ট্রীট, বৌবাজার, পার্ক ষ্ট্রীট, হেষ্টিংস, ভবানীপুর ও গার্ডেন রীচ থানার এলাকায় উভয় সম্প্রদায়ের লোক প্রায় সমান সমান। এই সাতটি থানায় পাঁচটিতে হিন্দু অফিসার।

দাঙ্গার সময় ২৫টি থানার মধ্যে ১৪টিতেই মুসলমান দারোগা মোতায়েন করা হইয়া গিয়াছিল, হিন্দু ছিল মাত্র ১১টি থানায়। দাঙ্গার পর ইহার আরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বর্তমানে ১৭টি থানায় মুসলমান ও মাত্র ৮টিতে হিন্দু অফিসার আছেন। অথচ কলিকাতার মোট অধিবাসীর তিন-চতুর্থাংশ হিন্দু।

থানায় মুসলমান দারোগার সংখ্যা বাড়াইবার জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি অনেক কমানো হইয়াছে। আগে অভিজ্ঞ ইন্‌সপেক্টর ভিন্ন বড় থানার ভার অপরকে দেওয়া হইত না, ছোট থানায় অন্ততঃ স্থায়ী ও অভিজ্ঞ সাব-ইনসপেক্টর নিযুক্ত করা হইত। এই দুই পদে মুসলমানের সংখ্যা কম বলিয়া এ. এস. আইকে অস্থায়ী সাব-ইনসপেক্টরের পদে উন্নীত করিয়া তাহাকেও বড়বাজারের ন্যায় থানায় ভার দেওয়া হইয়াছে। বড়বাজার শুধু কলিকাতার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের বৃহত্তম থানা। অযোগ্যতা এবং সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব আজকাল কলিকাতা পুলিসে উচ্চপদ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সুপারিশ হইয়া উঠিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুলিসে পক্ষপাতিত্ব

মুসলমান নিয়োগমাত্রেই আমাদের আপত্তি ইহা মনে করা অযৌক্তিক। আমরা জানি কোন কোন মুসলমান অফিসার নিরপেক্ষতার সহিত কর্তব্য পালন করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন উপরিওয়ালাদের জন্ত তাহা করিতে পারেন নাই। সাম্প্রদায়িক স্বার্থসাধনের সুবিধার জন্ত অযোগ্য এবং অসাধু কর্মচারীদেরও উচ্চপদে বহাল রাখায় আমাদের আপত্তি।

শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত পুলিসের আচরণ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বে পূর্ণ হইয়া উঠিলে নাগরিক সাধারণের কি অবস্থা হয় কলিকাতার তিন-চতুর্থাংশ লোক তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। ২৫টি থানার ১৭টিতে মুসলমান অফিসার এবং তাঁহাদের উপরিওয়ালা দুই জনই লীগওয়ালা। এই অবস্থায় থানায় এজাহার লিপিবদ্ধ করা, তদন্ত, খানাতল্লাসী, গ্রেপ্তার, জামিনে মুক্তিদান, প্রাথমিক তদন্তের পর মুক্তিদান, পাইকারী জরিমানা প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্ব চলিতে পারে, চলিতেছেও। অভিযোক্তা মুসলমান হইলেই নাম মাত্র অছিলায় পাইকারী হারে গ্রেপ্তার চলে অথচ মুসলমান এলাকায় হিন্দু নিহত হইলেও তার কোন প্রতিকার হয় না। ১৬ই আগষ্ট হইতে এই যে পক্ষপাতিত্ব সুরু হইয়াছে আজও তাহা অব্যাহতই রহিয়াছে। দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে এ সম্বন্ধে বহু অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নাই। বরং দাঙ্গার সময় পুলিসের দায়িত্বপূর্ণ পদে ঐরূপ কর্মচারীর অনুপাত যাহা ছিল এখন তাহা আরও বাড়িয়াছে।

পুলিস কমিশনারের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব সকলের নিকট ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মহরমের দিন শিয়া শোভাযাত্রাগুলি ধীর ও শান্তভাবে রাজপথ অতিক্রম করিয়াছে, কোথাও সামান্যমাত্র গোলযোগও হয় নাই ; পথের দুই পার্শ্বে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়াইয়া লোকে উহা দেখিয়াছে। কিন্তু সারকুলার রোড ধরিয়া অপরাহ্নে সুন্নীদের প্রায় লাখখানেক লোকের যে শোভাযাত্রা বাহির হয় তাহাতে প্রায় সকলের হাতেই লাঠি ও মশাল ছিল এবং ইহারা বহুস্থানে উপদ্রব সৃষ্টি করিয়াছে। নিজেরা ঢিল ছুড়িয়া বাড়ীর লোকের নামে দোষ দিয়াছে এবং কোন কোনস্থানে আক্রমণও করিয়াছে। এই গোলযোগে অল্প সংখ্যক হিন্দু এবং মুসলমান আহত এবং নিহতও হয়। অথচ পুলিস কমিশনারের আদেশে আক্রান্তদের পাড়াতেই ব্যাপক খানাতল্লাসী হইল, বহুসংখ্যক লোক গ্রেপ্তার হইল, অত্যন্ত চড়া হারে পাইকারী জরিমানাও বসিল। পূর্ব কলিকাতার এণ্টালি, বেনিয়াপুকুর প্রভৃতি এলাকায় হত্যা ও মৃতদেহ প্রাপ্তির পরেও খানাতল্লাসী, গ্রেপ্তার, পাইকারী জরিমানা প্রভৃতি কিছুই হইল না। মহরমের দিন সুপরিচিত ও সর্বজনপ্রিয় কংগ্রেসকর্মী মনী সেন নিহত হন, এই হত্যারও কোন কিনারা আজও হইল না এবং যে অঞ্চলে দিবা দ্বিপ্রহরে ইহা ঘটিল সেখানেও কোন কিছুই হইল না।

একদিকে শহরের শান্তিরক্ষা অপর দিকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষা এই দোটানায় পড়িয়া পুলিস কমিশনার নিত্য নূতন পথ অবলম্বন করিতেছেন এবং পরস্পর-বিরোধী আদেশ ঘন ঘন জারি হইতেছে। দাঙ্গার মধ্যে থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাদের আদেশ দেওয়া হইল যে দাঙ্গাকারীদের উপর বলপ্রয়োগ না করিয়া তাঁহারা যেন উহাদিগকে মিষ্ট কথায় নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। হত্যাকাণ্ড শেষ হইয়া যাইবার তিন সপ্তাহ পরে ৬ই সেপ্টেম্বর ইনস্পেক্টর ও সার্জেণ্টরা অস্ত্র ব্যবহারে অনুমতি লাভ করিলেন। ঢিল সম্বন্ধে প্রথমে আদেশ হইল ইষ্টকখণ্ড বাড়ীতে পাওয়া গেলে তার জন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার প্রয়োজন নাই। কয়েক দিন পরেই উহা বাতিল করিয়া হুকুম হইল, যে বাড়ীতে ইটের টুকরা মিলিবে সেখানকার লোকজনকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। পূর্বে যেখানে বড় থানার ভার অভিজ্ঞ ইনস্পেক্টর এবং ছোট থানার ভার অভিজ্ঞ সাব-ইনস্পেক্টর ভিন্ন আর কাহাকেও দেওয়া হইত না, সেখানে এখন এসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইনস্পেক্টর অর্থাৎ হেড কনেষ্টবল পর্যায়ের লোককে বৃহত্তম থানার ভার পর্যন্ত দেওয়া হইতেছে। ইহার কারণ উচ্চপদে মুসলমানের সংখ্যাল্পতা। থানার ভার বেশী করিয়া মুসলমান কর্মচারীদেই হাতে দেওয়ার জন্ত সমগ্র পুলিসবাহিনীর যোগ্যতা এইভাবে নামাইয়া আনা হইয়াছে। অকর্মণ্যতা ও পক্ষপাতিত্ব ইহার প্রত্যক্ষ ফল হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। এই ব্যবস্থায় শহরের শান্তিরক্ষা চলিতে পারে না, অথচ পুলিস কমিশনার পূর্বানুসৃত নিরপেক্ষ ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতেও অনিচ্ছুক অথবা অপারগ। সুতরাং থানাগুলি লীগের হাতে রাখিবার জন্য তাঁহাকে ঘন ঘন মত পরিবর্তন করিয়া নূতন নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইতেছে। বর্তমান থানার অফিসারেরা শান্তিরক্ষায় একেবারেই অক্ষম, পদে পদে ইহা প্রতিপন্ন হইতে দেখিয়া অক্টোবর মাসে পুলিস কমিশনার গোলযোগপূর্ণ কয়েকটি এলাকার থানায় ইনস্পেক্টর পাঠাইয়া উহাদের শক্তিবৃদ্ধি করিলেন। এই শক্তিবৃদ্ধিও পরিকল্পিত ভাবেই করা হইল যাহাতে লীগের শক্তি অব্যাহত থাকে। মুসলমান যে অল্প কয়েকটি ইনস্পেক্টর আছেন তাঁহাদিগকে বাছিয়া বাছিয়া মুসলমান এলাকায় মোতায়েন করা হইল। উত্তর বিভাগের মুসলমান ডেপুটি কমিশনারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠিতে আরম্ভ করায় সেখানে একজন ইংরেজকে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনাররূপে নিযুক্ত করা হয় কিন্তু আন্দোলন মন্দীভূত হওয়া মাত্র তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়া হয়। দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, পুলিস কমিশনার তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হইতেছে। পুলিশের অত্যাচার রীতিমত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে পুলিস কর্তৃক ধৃত লরীর উপর দণ্ডায়মান একটি লোক তিন জন পুলিস কর্মচারীর রিভলবারের গুলীতে নিহত হয় এবং তিন

ব্যক্তি আহত হয় বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এই ঘটনার বিচার-বিভাগীয় তদন্ত হওয়ার কথা, কিন্তু কিছুই হয় নাই। উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনার সদলবলে এক বাড়ীর অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া এক উড়িয়া মালীকে রিভলবারের গুলিতে নিহত করেন বলিয়া শিয়ালদহ আদালতে অভিযোগ আসে কিন্তু সরকারের বিনা অনুমতিতে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা যায় না বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে অব্যাহতি দেন। মানিকতলা থানার এক সার্জেন্টের বিরুদ্ধে ঘরে ঢুকিয়া গুলিচালনা ও মারপিটের অভিযোগে মামলা চলিতেছে। এই সমস্ত ঘটনার পর পুলিসের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া বাংলা-সরকার যেরূপ আদেশ দেন তাহাতে উঁহাদের কোনও দায়িত্বের বাধা রহিল না। অস্বাভাবিক অবস্থাতে যে সময়ে সংযমের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী সেই সময়ে এই শ্রেণীর ঢালা হুকুম পাইলে সাম্প্রদায়িক বিষে পরিপূর্ণ পুলিশ কর্মচারী জনসাধারণের নিকট অভিশাপ-স্বরূপ হইয়া উঠিবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই।

শ্রমসচিব ও শ্রম-সম্বন্ধীয় নীতির খসড়া

গত ৬ই ডিসেম্বর ভারত-সরকারের শ্রমসচিব শ্রীযুক্ত জগজীবনরাম মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে সভাপতিত্ব কালে বলিয়াছেন যে, মানবসমাজের সুখ ও কল্যাণের মূলে শ্রমিকেরা রসদ জোগাইতেছে। তাহারা মানুষের নানা অভাব মিটাইতেছে। সেইজন্য সমাজেরও কর্তব্য যাহাতে এই শ্রমিক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয় তাহা দেখা। এই সম্মেলনে ইণ্ডিয়ান অরগানাইজেশন অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এমপ্লয়ারস, ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব এমপ্লয়ারস, অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস, ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবার-এর প্রতিনিধিগণকে শ্রমসম্বন্ধীয় আইনের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোচনা করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল।

পরিকল্পনাটিতে শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি বিধানের এবং তাহাদের নানা বিষয়ে পারদর্শিতা বৃদ্ধির ও পরিণামে জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। পরিকল্পনাটি ইতিপূর্বে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের শ্রম-মন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত জগজীবনরাম বলেন, এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে খণ্ড খণ্ড ভাবে যেন শ্রমবিষয়ক আইন পাস না হয় ও অমনোযোগের সহিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতির নামে খাপছাড়া ভাবে যাহাতে কিছু করা না হয় তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তিনি বলেন যে ইউরোপের দেশগুলিতে শ্রমিক সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য বৃদ্ধ বয়সে পেনসন ও বেকার অবস্থার জন্য যে ব্যবস্থা আছে, ও সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারণের যে রীতি আছে, আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থা যাহাতে অবিলম্বে প্রবর্তন করা যাইতে পারে সেই প্রচেষ্টার প্রয়োজন। যতটা সম্ভব এই উদ্দেশ্যগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। "আমি এই সঙ্গে জোর করিয়া বলি যে এখন আমাদের উৎপাদন কেবলই বাড়াইয়া তোলা প্রয়োজন।"

দেশীয় শ্রমিকদের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে আমাদের শ্রমিক সম্প্রদায় কাহারও হইতে এতটুকু পিছাইয়া নাই। তবে সমস্যার কথা এই যে ভারতীয় শ্রমিকগণ উপযুক্ত শৃঙ্খলা, সরঞ্জাম ও সুসম্বদ্ধতার অভাবে উন্নতিশীল হইতে পারিতেছে না। আমেরিকানগণ যাহাকে বলে, 'কায়দা' (know how) তাহা আমাদের শ্রমিকগণের জানা নাই। যখন আমরা এই সকল ত্রুটি সংশোধন করিয়া প্রচুর উৎপাদন করিতে পারিব তখন আমাদের জীবনযাত্রার মান আশানুরূপ উন্নত করিবার সুযোগ মিলিবে। "আমরা যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করি, তবেই সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা জিনিষপত্র পাইবে। পৃথিবীর সমস্ত ধনিকই ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন যে শ্রমিকগণই তাঁহাদের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার, যদি তাহাদের ক্রয় করিবার ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে তাঁহারা জিনিষপত্র ইচ্ছানুরূপ বিক্রয় করিতে পারিবেন না। সুতরাং আমাদের বাণী হউক,—জনসাধারণ ক্রয়ের ক্ষমতা বাড়াও।

"আমাদের কর্তব্য নির্দ্দেশের একটি প্রধান কথা হইতেছে শ্রমিকগণের জীবিকার মান বাড়ান। আমি কয়লার খনির শ্রমিকদের বেতন প্রভৃতি পরীক্ষা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছি। এই কমিটি কয়লার খনির শ্রমিক ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকগণের বেতন সম্বন্ধে যে অভিমত জ্ঞাপন করিবেন আমি পরবর্তী কনফারেন্সে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া শ্রমিকগণের বেতন বিবেচনা করিব।

"একমাত্র বেতনবৃদ্ধির ফলেই জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়া উঠিতে পারে। তবে যদি বেতন বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকেরা কাজ কম করে তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিবে। বেতন বৃদ্ধির ফলে যদি তাহারা শিল্পদ্রব্যাদি কিনিতে এবং অন্যান্য সুবিধার জন্য তাহা ব্যয় করিতে না পারে তাহা হইলে বেতন বৃদ্ধি বৃথা হইবে।

"আমি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর যথেষ্ট জোর দিয়াছি, কারণ ইহার অভাবে বিপদের আশঙ্কা আছে। আমার একথা অনেকে ভুল বুঝিয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত দেশে নানা প্রকার শ্রমিক চাঞ্চল্য ও আন্দোলন দেখা যাইতেছে। কিন্তু উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার ফলে আমাদের যতটা প্রয়োজন আছে সেই পরিমিত জিনিষ বাজারে কিনিতে পাইতেছি না। উদাহরণস্বরূপ, কয়লার কথা ধরা যাইতে পারে। যদি কয়লার উৎপাদন কম হয় তাহা হইলে যানবাহন, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি যথাযথ ভাবে চালান সম্ভব হইবে না। ইহা হইতে ইস্পাত, সিমেণ্ট প্রভৃতিরও অনুরূপ

অভাব পড়িবে। ইস্পাত ও সিমেন্ট না হইলে কেবলমাত্র যে বাড়ীঘর তোলা যায় না তাহা নহে, ইহার অভাবে বৃহৎ শিল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং ফলে আরও অধিকসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগও সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না।"

জীবনযাত্রার মানের উন্নতির দিকে নজর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যাহাতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যায় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে না পারিলে মজুরী বৃদ্ধি বৃথা ত হইবেই, উহা ক্ষতিকরও হইয়া উঠিতে পারে। শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক কিন্তু উহা সুপরিকল্পিত ভাবে না হইলে উহার মূল অভিপ্রায়ই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

শ্রমের ও উৎপাদন শক্তির মূল্য বৃদ্ধি প্রয়োজন এ বিষয়ে আমাদের দেশে দুই মত থাকিতে পারে না। কিন্তু আলস্যের অবকাশ বাড়াইয়া কেবলমাত্র ক্রয়-মূল্য বাড়াইয়া দিলে এ দেশের শ্রমিকদিগের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার হইবে। এ কথা যাঁহারা বুঝিয়াও বুঝেন না তাঁহারাই শ্রমিকদিগের প্রধান শত্রু। শ্রীযুক্ত জগজীবনরামের উপদেশ তাঁহাদের কাণে কিরূপ ঠেকিবে তাহাই প্রশ্ন।

সার্জেন্ট রিপোর্ট

ভারত-সরকার সার্জেন্ট রিপোর্টের মূলনীতি এত দিনে স্বীকার করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। রিপোর্টের প্রধান প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রদেশসমূহকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাদে আর সকল প্রদেশই এই পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-প্রণালী গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন স্থানগুলিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। ইহা ছাড়াও প্রাদেশিক সরকারগুলির পরিকল্পিত প্রণালীও ইহার সহিত সংযোগ করা হইয়াছে। সমগ্র পরিকল্পনাটি কার্যকরী হইতে আন্দাজ ১২৫ কোটি টাকা ব্যয় হওয়া সম্ভব। একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত অনুমোদন করিবার পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার আর একবার বিষয়টিকে খুঁটিয়া দেখিতেছেন। প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃক প্রেরিত বহু প্রস্তাব এখনও গ্রহণ করা হইবে কিনা তাহা বিবেচনাধীন রহিয়াছে। যাহা হউক, শীঘ্রই সম্পূর্ণ স্থিরীকৃত পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রাদেশিক সরকারগুলিকে যে যে বিষয়গুলি প্রয়োজনীয় তাহা এখনই আরম্ভ করিয়া দিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। টেকনিক্যাল শিক্ষা সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে যে, উচ্চ ধরণের টেকনিক্যাল শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর ট্রেনিং ব্যবস্থা এবং যাহারা বহুদিন ধরিয়া কাজ করিয়া অভিজ্ঞ হইয়াছে তাহাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে একে একে শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা: প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা প্রণালী অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি স্থির হইয়াছে:

(১) ৬ হইতে ১৪ বৎসরের বালক-বালিকা নির্বিশেষে সকলকে বিনামূল্যে আবশ্যিকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই-ই) দেওয়া হইবে। কিন্তু সকল প্রদেশে এই ব্যবস্থা হইলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশে এই সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন অঞ্চলগুলিতে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) শিক্ষা ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের বালক-বালিকা নির্বিশেষে দেওয়া হইবে। অন্যান্য প্রদেশগুলিতে ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত সকলকেই শিক্ষা দেওয়া হইবে কিনা তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। তবে ৬ হইতে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষার কথা উল্লিখিত আছে। প্রাদেশিক সরকারগুলির শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য মোটামুটি ভাবে ৫৬·৯৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। তাহার মধ্যে কাজ আরম্ভের জন্য ২০·৫২ কোটি ও ধারাবাহিক খরচ হিসাবে ৩৬·৪৩ কোটি টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

(২) টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অনুসরণ করা হইবে:

প্রাদেশিক সরকারের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকার কম-বেশী ৫০০ ছাত্রকে প্রতি বৎসর টেকনিক্যাল শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বাহিরে পাঠাইবেন। একটি অল-ইণ্ডিয়া টেকনিক্যাল এডুকেশন কাউন্সিল স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার কার্য হইবে বর্ত্তমানে কি প্রণালী ও পদ্ধতিতে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত তাহা স্থির করা। প্রাদেশিক সরকারগুলি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যোগ করিয়াছে—

(১) ১৬০টি নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে। তাহার মধ্যে ১০৫টি জুনিয়ার টেকনিক্যাল ও ভোকেশ্যনাল স্কুল, ৩৫টি টেকনিক্যাল হাই স্কুল, ১৬টি পলিটেকনিক ও ৪টি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হইবে।

উপরি-উক্ত পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিবার জন্য ৭ কোটিটাকার অধিক ব্যয় হইবে। প্রতি বৎসরের চলতি ব্যয় হিসাবে মোট ৪·৪৩ কোটি টাকা পড়িবে এবং শেষ পর্যন্ত উহা কমিয়া ২·১৪ কোটি টাকা দাঁড়াইবে। প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রস্তাব অনুসারে অর্দ্ধনিপুণ শিল্পী ও মিস্ত্রীদের, ফোরম্যানদের, টেকনোলজিষ্টদের উচ্চ এঞ্জিনিয়ারীং শিক্ষার সুযোগ এমন ভাবে দেওয়া হইবে যাহাতে তাহারা পরে কলকারখানার দায়িত্ব লইতে পারে। সেইজন্য যে টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হইবে তাহা হইতে প্রতি বৎসর হাজার এঞ্জিনিয়ার তৈয়ার হইতে পারিবে। ইহার গোড়াপত্তনের জন্য ৩ কোটি টাকা

এবং বাৎসরিক চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্ত ০'৪৬ কোটি টাকা লাগিতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজে বাঙ্গালোরের 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়ান্স' ও 'দিল্লীর পলিটেক্‌নিক্' সাহায্য করিবে। এই চারিটি প্রতিষ্ঠান ও প্রাদেশিক সরকারগুলির দ্বারা স্থাপিত কলেজ হইতে প্রতি বৎসর ৪০০০ এঞ্জিনীয়ার বাহির হইবে। টেকনিক্যাল শিক্ষার শিক্ষকদের জন্ত টেক্‌নিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হইবে এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহাতেও প্রাথমিক গোড়াপত্তনের জন্ত প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা ও বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহের জন্ত প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার জন্ত মোটের উপর ২৩ কোটি টাকা ব্যয় (তাহার মধ্যে ১৬ কোটি টাকা গোড়াপত্তন ও ৭ কোটি টাকা বাৎসরিক ব্যয়) পড়িবে।

(৩) সাবালকী শিক্ষার জন্ত যে ব্যয়-ভার প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহাতে ২'১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহার শতকরা ২২ ভাগ প্রাদেশিক শিক্ষা পরিকল্পনা অনুসারে ব্যয়িত হইবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার জন্ত মোটামুটি ভাবে ২'৫৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ১'১৪ কোটি, আলীগড় ৭০ লক্ষ ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারিবে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্ত সাহায্য পাইবে। 'ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়ান্স' বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারে ভারত-সরকারকে উপদেশ দিবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতিকল্পে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে।

পরিকল্পনা প্রণালীর সহিত মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে অধ্যাপকদের ট্রেনিং বিদ্যালয়, শিক্ষকদের ট্রেনিং বিদ্যালয় ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্ত বিদ্যালয় স্থাপনের কথাও যোগ করা হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হইবে। সরকারী শিক্ষা বিভাগ আরও কতকগুলি বিষয় ইহার সহিত যোগ করিয়াছে। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের ট্রেনিং ও শারীরিক স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে। বিশ্বভারতীকে শিক্ষক ট্রেনিঙের জন্ত অর্থসাহায্য দেওয়া হইবে। দিল্লীর জামিয়ামিলিয়া ইস্‌লামিয়াকে সাহায্য দেওয়া হইবে।

সমবায় পরিকল্পনা সমিতির রিপোর্ট

ভারত-সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমবায় পরিকল্পনা সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলিকে গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন করিয়া তুলিবার প্রধান উপায় হইতেছে সমবায় সমিতি। বোম্বাই প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রীযুত আর. জি. সরাভাইয়ের নেতৃত্বে ১২ জন সভ্য লইয়া এই কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ইহার প্রদত্ত যে বিবৃতি সর্ব্বসাধারণ্যে প্রকাশের জন্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, চাষবাস ও ফসল-উৎপাদন, পশুপালন, মাছের চাষ, ফসল বিক্রয়, কুষিঋণ এবং অবসর সময়ের উপজীবিকা-স্বরূপ শিল্পব্যবসায় ও মফঃস্বলের ঋণ-প্রদান ব্যবস্থা, উপযুক্ত স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতি সব বিষয়েই রিপোর্টে আলোচনা করা হইয়াছে।

এই কমিটি সমবায় সমিতির গণ্ডীতে যে সকল কার্য্যই পড়ে তাহার সকল কিছু লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সব ব্যাপারে উন্নতি করিতে পারা যায় তাহার জন্ত উন্নত পরিকল্পনার খসড়াও প্রস্তুত করিয়াছেন। কমিটির মতে পূর্ব্ব ভূমিকাস্বরূপ যদি দেশে দায়িত্ববোধসম্পন্ন গণতান্ত্রিক সরকার ও শিক্ষা-প্রচার ব্যবস্থা না থাকে তবে সমবায় সমিতি কোনক্রমেই সাফল্যলাভ করিতে পারে না।

যদিও সমবায় নীতি অনুসারে কাহাকেও জোর করিয়া সমিতিতে যোগদানে বাধ্য করা বাঞ্ছনীয় নহে তথাপি একথাও সত্য যে কতকগুলি বিষয়ে বাধ্যবাধকতার বিশেষ ভাবেই প্রয়োজন আছে। কমিটির প্রস্তাবিত উপায়ে সমবায় পরিকল্পনাগুলিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে ৫০ কোটি টাকা লাগিবে। সমগ্র দেশের উন্নতির হিসাবে এই টাকার অঙ্কটিকে মোটেই মোটা বলা যায় না। সমবায় প্রথা অর্থনৈতিক সকল কাজের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া সরকার কর্ত্তৃক যে পরিমাণ টাকাই সমবায় সমিতির উন্নতি সাধনে ব্যয় করা হউক না কেন, তাহা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রগতিতে ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। এই কমিটির অনুমোদিত কয়েকটি পন্থা এইরূপ :

সমবায় সমিতি গঠনে সরকারী সাহায্য ও নির্দ্দেশের প্রয়োজনকে অগ্রাহ্য করা চলে না। যাহাতে দেশের জনমত সমবায় নীতির উপযোগী হইয়া উঠে তাহার জন্ত সরকারের একটা দায়িত্ব আছে। সমবায় সমিতি পরিচালনায় এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যাহাতে সমিতির সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত বে-সরকারী সদস্তদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও পরামর্শের প্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকে।

প্রাদেশিক সরকারগুলির একটি কর্ত্তব্য জরীপ করিয়া দেখা যে কি পরিমাণ চাষযোগ্য জমি পতিত অবস্থায় আছে এবং চাষবাস ও ফসল-উৎপাদনে তাহার কতটা সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে। জলসেচনের ব্যাপারটি একমাত্র সরকার কর্ত্তৃকই পালিত হইতে পারে, কারণ সরকারী ব্যবস্থা ও অর্থ সাহায্য ছাড়া সুশৃঙ্খলভাবে ইহা করিয়া তোলা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না।

চাষবাসে ও চাষীর জীবনে সকল প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য যাহাতে বজায় থাকে এইরূপ সকল কার্য্যই সমবায় প্রথাদ্বারা স্থির হওয়া উচিত এবং যাহাতে সজ্জনগণের বাসস্থানের উন্নতি করা যায় তাহার জন্তও একটি সমিতি স্থাপন করা উচিত।

যাহাতে গ্রামগুলির অর্দ্ধেক ও গ্রামবাসিগণের শতকরা ৩০ জন সুশৃঙ্খল সমবায় ব্যবস্থার অধীনে দশ বছরের মধ্যে আসিতে পারে তাহার আয়োজন করা একান্ত কর্তব্য।

চাষের জন্য বৃহৎ ক্ষেত্র গঠন করিলে বহু ব্যাপারে আশাপ্রদ ফল পাইবার সম্ভাবনা আছে। ইহাতে চাষী সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ফল ও সজীর চাষের ব্যাপারে উৎপাদন-ক্ষেত্র বড় করিলে বিশেষ সুফল পাইবার আশা আছে। অরণ্য-রক্ষা ও তাহার বন্দোবস্তের ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে সরকারী দায়িত্বে হওয়াই উচিত। পশুপালন-বিভাগ ও পশুস্বাস্থ্য-রক্ষা বিভাগের কেন্দ্রগুলি এমনভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক গো-স্বামী তাহার সাহায্য পাইবার পুরোপুরি সুযোগ ভোগ করিতে পারে। সমবায় সমিতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত দুগ্ধ-সরবরাহ কেন্দ্রগুলি বিশিষ্ট শহর হইতে ৩০ মাইল পরিধির মধ্যে হওয়া দরকার। শহরে দুধ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করিবার জন্য অন্ততঃ ৩০০টি দুগ্ধ-সরবরাহ সমিতির প্রতিষ্ঠা পাঁচ বছরের মধ্যে করা প্রয়োজন। ইহার জন্য প্রথমে যে ব্যয় হইবে তাহা সম্পূর্ণ ও পরের বাৎসরিক ব্যয়ের অর্দ্ধেক সরকারকে দিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে হাঁস-মুর্গীর চাষ ও পালন ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে খরচ যোগাইতে হইবে।

বিক্রয়যোগ্য শস্যাদি ও চাষবাস সম্বন্ধীয় জিনিষপত্রের বাৎসরিক উদ্বৃত্তের শতকরা ২৫ ভাগ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে বিক্রয় করা যাহাতে সম্ভব হয় তাহার জন্যও চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে।

সারা ভারতবর্ষের বিক্রয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি নিখিল-ভারত সমবায় বিক্রয়-সমিতি স্থাপন করা উচিত। এই সমিতি সকল প্রাদেশিক সমবায় বিক্রয়-সমিতির সংযোগসাধন ও সামঞ্জস্য বিধান করিবেন এবং অনেকটা ব্যাঙ্কের 'ক্লিয়ারিং হাউসে'র মত চাষবাস সম্বন্ধীয় সকল প্রকার আদান-প্রদান রক্ষা ও খোঁজ-খবর দেওয়ার কাজ করিবে।

স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান, অবসর সময়ের উপজীবিকার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও গৃহশিল্পের জন্য প্রদেশে প্রদেশে স্থানীয় উন্নতিবিধায়িনী সমিতি স্থাপন করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক শহরেই সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা উচিত। প্রত্যেক সমবায় বিভাগেই একজন করিয়া স্ত্রীলোক বিশেষ কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিলে ভাল হয়। কারণ ইহাতে মহিলা সমাজের সহিত যোগাযোগ রক্ষা ও তাহাদের সহযোগিতা পাওয়া সহজ হইয়া উঠিবে।

বিশ্বসভায় ভারতের জয়লাভ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অধিবেশনে ফ্রান্স ও মেক্সিকোর প্রস্তাব আলোচনার্থ উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ প্রতিনিধি সার হার্টলি শক্রস জেনারেল স্মাটসকে সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। বিষয়টি স্থিরভাবে বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাইয়া তিনি বলেন, "ইহার ফল কি হইবে তাহা প্রশ্ন নয় —এই বিষয়ে আমাদের কি ক্ষমতা আছে তাহাই বিবেচ্য। ভাবের আতিশয্যে একটা কিছু করিয়া বসা উচিত হইবে না।" দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি স্মাটস গবর্ণেণ্ট যে ব্যবহার করিতেছেন বিশ্বসভার প্রকাণ্ড অধিবেশনে তাহা যুক্তিসঙ্গত প্রতিপন্ন করা সহজ হইবে না বুঝিয়াই ব্রিটিশ প্রতিনিধি সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের এ বিষয়ে ক্ষমতা নাই বলিয়া ধুয়া তুলিয়া সমস্যা এড়াইবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন। কোন দেশের প্রতিনিধিই এই মনোভাব পছন্দ করেন নাই। বিষয়টি আন্তর্জাতিক বিচারাদালতে প্রেরণ করিয়া সমগ্র সমস্যাটিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে আইনের গণ্ডীতে সরাইয়া দেওয়ার যে চেষ্টা জেনারেল স্মাটস করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। মিশরের প্রতিনিধি হাসান পাশা বলেন যে আন্তর্জাতিক বিচারাদালতে প্রেরণ করিবার কোন কারণই ইহাতে থাকিতে পারে না। সোভিয়েট প্রতিনিধিও ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সার হার্টলির উক্তির সমুচিত জবাব দেন। তিনি বলেন—

> দক্ষিণ-আফ্রিকা-সরকার যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে বর্ণবৈষম্য এবং পৃথক্‌করণের কথা স্বীকার করা হইয়াছে। তাহাদের এই ব্যবহার বিশ্বসভার মূল সনদের বিরোধী। এই অভিযোগের যৌক্তিকতা তাঁহাদের এই স্বীকৃতির দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে।
>
> বহু বৎসর ধরিয়া ভারত-সরকার আবেদন জানাইয়াছেন, অভিযোগ করিয়াছেন, প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, আপোষ-মীমাংসার কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় ভারত-সরকার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন এবং পৃথিবীর জনমতের সম্মুখে বিষয়টি বিচারের জন্য আনয়ন করেন। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকা-সরকার এখনও এসম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বিশ্বসভার অধিবেশন চলার সময়ও তাঁহাদের ঐ অন্যায় আইন প্রণয়ন প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার কথাও তাঁহারা বলেন নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার বিশ্বসভার সনদের মূল সত্যকে অস্বীকার করিয়া তাহার অবমাননা করিয়াছেন।
>
> ব্রিটিশ সরকার এযাবৎ বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মচারীর বিবৃতি মারফৎ দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় বিদ্বেষের নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন। এই অবস্থায় বিশ্বসভার সভ্য হিসাবে আমাদের যে গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। নূতন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ গঠনের দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা যদি প্রাচীন সংস্কার ও মত অনুযায়ী পথ চলিতে চেষ্টা করি, তাহা

হইলে আমাদের দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। লক্ষ লক্ষ লোক কেবলমাত্র বর্ণ ও সম্প্রদায়ের দোষে সমাজের নিম্নস্তরে থাকিতে বাধ্য হইতেছে। তাহারা কণ্ঠহারা হইয়া সুবিচারের আশায় আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কেবলমাত্র ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই আমরা পৃথিবীতে এক নূতন ব্যবহার প্রবর্তন করিতে পারি। ভারতের, এশিয়ার অন্যান্য স্থলের ও আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ লোকের মন আজ সর্বপ্রকার বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং দক্ষিণ-আফ্রিকারই বর্ণ-বৈষম্যের নগ্ন রূপ প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য সম্বন্ধে সার হার্টলি শক্রস যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তিনি সুরুচির পরিচয় দেন নাই। তিনি নিজেই জানেন যে, এই সকল অনৈক্য বাড়াইয়া তুলিবার ব্যাপারে ব্রিটেন কি খেলা খেলিয়াছে। তথাপি এই সকল বিভেদের কথা বলিতে তিনি তাঁহার মনের আনন্দ একটুও গোপন করেন নাই। এ বিষয়ে পরিষদ কি মত গঠন করিবেন তাহা আমি তাঁহাদের উপরই ছাড়িয়া দিতেছি। ভারত আজ স্বাধীনতার পথ ধরিয়া একান্ত চেষ্টায় অগ্রসর হইতেছে এবং তাহার আভ্যন্তরীণ সমস্ত অসুবিধা কাটাইয়া উঠিবার জন্যও সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

যে সকল সদস্য-রাষ্ট্র ভারতের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীযুক্তা পণ্ডিত সভাপতি ডাঃ স্পাকের দিকে ফিরিয়া বলেন, "আপনাকে এবং এই পরিষদকে এই বিষয়ে কর্তব্য পালনের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা এ কথা চিরদিন স্মরণ রাখিব যে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে পৃথিবীর সর্বত্রই চিরকাল সমর্থন লাভ সম্ভব।

ভারতীয় প্রস্তাবে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরোধিতাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী এই দুই দেশ এখনও ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্বেতপ্রাধান্য ও অস্ত্রবলসম্বল রাজনীতির মোহ ছাড়িতে পারে নাই—পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইহা অশুভ লক্ষণ।

বিশ্বসভায় দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা

নিউ ইয়র্ক যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে প্রতিনিধিদলের অধিনেত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী এক বেতার বক্তৃতায় বলেন,

"মানুষের যে মূল অধিকার বজায় থাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণ তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণের উপর যে সকল নিষেধাজ্ঞা আছে তাহা দূর করা ও যে সকল মৌলিক স্বাধীনতা ভোগের অধিকার তাঁহাদের আছে, তাহা যাহাতে তাঁহারা লাভ করিতে পারেন, ভারতীয় প্রতিনিধিদল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে তাহারই প্রচেষ্টা করিবেন। আমাদের বিশ্বাস যত দিন একটি জাতি অপর জাতির সহিত বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিবে তত দিন পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত ভারতীয় প্রতিনিধিদলের এই উদ্দেশ্য ও আশা সাফল্যলাভের সুযোগ পাইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাব-কমিটিতে ও সাধারণ সভায় এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে দক্ষিণ-আফ্রিকাকে বিরোধ-মীমাংসাকল্পে রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু মার্শাল জেনারেল স্মাট্‌স্ প্রস্তাবটির প্রচণ্ড বিরোধিতা করিয়াছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার কোন আপত্তিই টিঁকিতে পারে নাই। জেনারেল স্মাট্‌স্ যে সকল যুক্তি ও দাবী তাঁহার ক্রমেলস বক্তৃতায় উল্লেখ করেন শ্রীযুক্তা পণ্ডিত তাহার প্রতিবাদ করেন।

তিনি বলেন, "তিনি (জেনারেল স্মাট্‌স্) বক্তৃতায় দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যাকে ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া দেখাইবার জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা তাঁহাদের ঘরোয়া সমস্যা নহে। আমরা ইহাকে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে জড়িত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমস্যা বলিয়া মনে করি।"

তিনি জেনারেল স্মাট্‌স্ কথিত ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক এসিয়া ও আফ্রিকাবাসীর নেতৃত্বের দাবির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "ইউরোপের বাহিরেও জগতে বহু দেশ আছে। তাহাদের দান শ্বেতাঙ্গদের অপেক্ষা কম নহে। এই ভাবে তাহাদের উপেক্ষা করা সম্ভব নহে। ভবিষ্যতের নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিবার জন্য সমস্ত জাতি সম-অংশীদার হিসাবে সহযোগিতা করিবে—ইহার উপরেই শান্তি নির্ভর করে। এই সহজ সত্য গৃহীত না হইলে মানবজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে।" দক্ষিণ-আফ্রিকার দিকে তাকানোর আগে ভারতবর্ষ নিজের অস্পৃশ্যতা দূর করুক এই উক্তির জবাবে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী বলেন, "ভারতের অনুন্নত শ্রেণীর সমস্যা জাতিগত সমস্যা নহে। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যার মধ্যে তৃতীয় মহাযুদ্ধের বীজ নিহিত আছে। ত্বকের বর্ণ শ্বেত নয় বলিয়াই সে শ্বেতজাতির প্রভুত্ব মানিয়া লইবে না।"

পরিশেষে তিনি বলেন, "ভারতবর্ষ দক্ষিণ-আফ্রিকার নিপীড়িত জনগণের জন্মভূমি—ইহাদের জন্য বিশেষ দরদ অনুভব করা ভারতবাসীর পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

১৩ই নবেম্বর তারিখে কিন্তু মার্শাল স্মাট্‌স্ যে বিবৃতি প্রদান করেন তাহাতে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিগণের বিবৃতিকে আক্রমণ করেন। ভারতীয় প্রতিনিধি সার মহারাজা সিং তাহার প্রত্যুত্তরে বলেন, "তিনি (জেনারেল স্মাট্‌স্)

হয়ত এই কারণেই বেশী চটিয়াছেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে আত্মসাৎ করিবার জন্ত তিনি যে প্রস্তাব আনিয়াছেন, এসিয়ার এক প্রতিনিধি তাহার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু মার্শাল-স্মাটস্ যে একা পড়িয়াছেন, তাহাতে আমি সহানুভূতি জানাইতেছি। একমাত্র ব্রিটেন তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছে। হাজার হাজার আফ্রিকাবাসী তাহাদের দেশকে রিপাব্লিকে পরিণত করিতে চাহে ইহা বুঝিতে পারিয়াই সম্ভবতঃ ব্রিটেন ইউনাইটেড কিংডম ও দক্ষিণ-আফ্রিকার যোগাযোগ রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট সূত্র বলিয়া স্মাটস্‌কে মনে করেন।"

ভারতীয় জাতিভেদ প্রথাকে আক্রমণ করিয়া স্মাটস্ বলিয়াছেন যে যেহেতু ভারতে জাতিভেদ বর্তমান সেইজন্ত ভারতবর্ষের দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির সমালোচনা করিবার অধিকার নাই, ইহার উত্তরে সার মহারাজ সিং বলেন, "কিন্তু মার্শাল স্মাটস্ ভারতের জাতিবৈষম্য ও তপশীলী সমস্যার কথা তুলিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিয়া রাখুন যে, ভারতে প্রত্যেক অধিবাসীর আইন, রাজনীতি, মিউনিসিপ্যাল ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাপারে সমান অধিকার আছে।" দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বলেন, "ভারতের যে প্রতিনিধিদল জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে গিয়াছে তাহার ২০ জনের মধ্যে তিনটি পৃথক ধর্মাবলম্বী ও বহু জাতির লোকই আছে। বর্তমানে ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও অন্যান্য প্রত্যেক মন্ত্রীসভায়ই একাধিক তথাকথিত তপশীলী শ্রেণীর লোক মন্ত্রীরূপে অন্তান্ত মন্ত্রীদের সহিত সমমর্যাদা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর চালাইতেছেন।…কিন্তু মার্শাল স্মাটস্ কি তাঁহার দেশে আফ্রিকান বা অন্তান্ত অ-ইউরোপীয়ানদের সম্পর্কে এইরূপ কোন ব্যবহার কথা বলিতে পারেন? তাহারা কি ব্রিটিশদের সমান রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার পাইয়া থাকে? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্মুখে তিনি যে প্রতিনিধিদল লইয়া আসিয়াছেন তাহার মধ্যে একজনও আফ্রিকান প্রতিনিধি নাই কেন? আসলে আমাদের মত তাঁহার সাহস নাই।"

তিনি আরও বলেন, "দুই জন ইউরোপীয়, দুই জন মার্কিন, দুই জন এসিয়াটিক এবং দুই জন আফ্রিকানকে লইয়া একটি প্রতিনিধি দল (অবশ্য ইহারা ইউনিয়নের বাহিরের লোক হইবেন) দক্ষিণ-আফ্রিকায় গমন করিয়া দেখিয়া আসুন সেখানে কি ঘটিতেছে এবং সেখানকার আফ্রিকানদের সম্বন্ধে রিপোর্ট দিন। তাহা হইলে বুঝা যাইবে দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের সহিত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা যুক্ত হওয়া উচিত কি না।"

২৫শে নবেম্বর তারিখে জেনারেল স্মাটসের প্রদত্ত বক্তৃতার প্রতিবাদপ্রসঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধি বিচারপতি চাগলা এক জবাব দিয়াছেন। বিচারপতি চাগলা বলেন, "যাহারা এসিয়াবাসী নহে, এই ব্যাপারটিকে তাহাদের মধ্যে সংগ্রাম বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে।" রাজনৈতিক ও আইন কমিটির বৈঠকে তিনি বলেন যে, এই প্রশ্নের সমাধানের উপরই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে।

তিনি আরও বলেন, "একথাটি সর্বাগ্রেই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্মেণ্টের জরুরী অনুরোধ ক্রমেই তাহারা সেখানে গিয়াছিল। ঘরছাড়া আশ্রয়প্রার্থী হইয়া তাহারা সেখানে যায় নাই। কিন্তু মার্শাল স্মাটস্‌কে আমি এইজন্ত গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যে তিনি আমাদের দেশীয় লোকদের একেবারেই নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলেন নাই।"

অতঃপর বিচারপতি চাগলা বলেন, "জাতিপুঞ্জ সম্মেলনে প্রত্যেকটি দেশ আন্তর্জাতিক সনদ অনুসারেই যোগদান করিয়াছে। উক্ত সনদের চুক্তি সকলকেই মানিয়া চলিতে হইবে। এ কথা কি কেহ বলিতে চাহিবেন যে, স্বাক্ষরকারী কোন দেশ সনদের সর্ত না মানিলেও তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সম্মিলিত জাতিপ্রতিষ্ঠানের নাই? আন্তর্জাতিক সনদের ভাষ্য যদি ইহাই হয় তবে উহাকে একখানি বাজে কাগজ মনে করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেই আপদ চুকিয়া যাইবে।"

বিচারপতি চাগলা ইহার পর কমিটিকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, "কেহ কি বলিবেন যে দক্ষিণ-আফ্রিকা দাসত্বপ্রথা প্রবর্তন করিলেও জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না? শুধু এইজন্তই ভারতীয় প্রতিনিধিগণ বারংবার বলিতেছে উহা প্রধানতঃ রাজনৈতিক সমস্যা, আইনগত প্রশ্ন নহে। সমস্যাটি নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার কিনা তাহা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিণতির উপরই নির্ভর করিতেছে। স্পষ্ট ও দৃঢ় ভাবে একথা বলা প্রয়োজন যে দক্ষিণ-আফ্রিকার মত ভারতে এমন কোন আইন নাই যাহাতে অনুন্নত সম্প্রদায় ও অন্তান্ত অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে… ভারতে অনুন্নত সম্প্রদায়কে যে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে সে সকল অধিকার যদি দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের দেওয়া হয় তবে ভারতবর্ষ ইউনিয়ন গবর্মেণ্টের সহিত মীমাংসার আলোচনা চালাইবে।"

২৭শে নবেম্বর তারিখে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অধিনেত্রী জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক ও আইনগত কমিটির বৈঠকে আফ্রিকার প্রতিনিধি মিঃ হিটন নিকলসের বিবৃতি ও বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে বলেন যে, মিঃ নিকলসের যুক্তিগুলি যেমন দুর্বল তেমনি আপত্তিকর। তাঁহাকে সমর্থন করিয়া সোভিয়েট প্রতিনিধি মঁ এণ্ড্রু গ্রামিকো দক্ষিণ-আফ্রিকাকে জাতিগত বৈষম্য প্রদর্শনের দ্বারা সম্মিলিত-জাতি সনদের চুক্তি লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত করেন। বক্তৃতার শেষে সোভিয়েট প্রতিনিধি শ্রীযুক্তা পণ্ডিতকে করমর্দন করিয়া জানান যে, তিনি ভারতীয় পক্ষ সমর্থন করিয়া ভোট দিবেন।

অতঃপর রাজনৈতিক ও আইন কমিটির বৈঠকে মেক্সিকো ও ফ্রান্সের পক্ষ হইতে উত্থাপিত একটি প্রস্তাব ২৪-১৯ ভোটে

গৃহীত হয়। তাহাতে স্থির হয় যে উভয় দেশকে অর্থাৎ ভারত ও আফ্রিকাকে বিরোধ-মীমাংসাকল্পে রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পরেও অনেকেরই সংশয় ছিল যে প্রস্তাবটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত হইবে কিনা। কারণ এই সভাতে যদি প্রস্তাবটি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের আধিক্যে গৃহীত না হয় তবে উহা বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু কিন্তু মার্শাল স্মাট্‌সের দুর্ভাগ্যক্রমে প্রস্তাবটি সাধারণ সভায় ৩২-১৫ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকার শিক্ষাপদ্ধতিকে শ্বেত স্বেচ্ছাচারের অস্ত্র রূপে ব্যবহার

দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের শ্বেত স্বেচ্ছাচারের একটি প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হইয়াছে ইহার শিক্ষাপদ্ধতিকে। দক্ষিণ-আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের জন্য যেরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে তাহাকে সুশিক্ষা তো কোনক্রমেই বলা চলে না বরং যাহাতে কৃষ্ণকায় বালক-বালিকাগণ ভবিষ্যতে দক্ষিণ-আফ্রিকার ক্রীতদাস হইয়া উঠিতে পারে সেই ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মালান একদা জোর গলায় প্রচার করিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যের জনসমাজ যদি শিক্ষিত হয় ও জ্ঞান লাভ করে তাহা হইলে ইউরোপীয়দের সহিত জ্ঞানবুদ্ধির সমপর্যায়ে দাঁড়াইয়া তাহারা ইউরোপীয়দের চেয়ে অধিকতর দৃঢ়তার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইবে।

কোন দেশ একটি প্রধান সম্প্রদায়কে ইচ্ছাপূর্বক জোর করিয়া জীবন-সংগ্রামে অপরিহার্য যে শিক্ষা তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া মানুষকে অসহায় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে ইহা বিশ্বাস করাও কঠিন; কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইহাই ঘটিতেছে। কোন লোক যদি দক্ষিণ-আফ্রিকায় সপ্তাহ কয়েক মাত্র কাটাইয়া আসেন তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে সত্যকে কেন কল্পনার চেয়ে বেশী অদ্ভুত বলা হয়।

ইউনিয়নের চারিটি প্রদেশের প্রত্যেকটিতেই ইউরোপীয় ও এশিয়াবাসীদের জন্য আলাদা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক শ্বেতকায় সম্প্রদায়ভুক্ত বালক-বালিকাদের (১৬ বছর পর্যন্ত) বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া, কতকগুলি প্রদেশে বাধ্যতামূলক না হইলেও মাধ্যমিক শিক্ষাও বিনা বেতনে দেওয়া হয়। ছাত্রদের বিনা পয়সায় পুস্তকাদি সরবরাহও করা হয়—ছাত্রাবাসের সুবন্দোবস্তের কোন ত্রুটি নাই। পয়সার অভাব অথবা স্কুল হইতে বাসস্থানের দূরত্ব কিছুই তাহাদের শিক্ষালাভের প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না।

এশিয়াবাসী সম্প্রদায়ের জন্য কিন্তু এ ধরণের কোন ব্যবস্থাই নাই। এমনকি সামান্যতম পরিমাণের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক-শিক্ষাও তাহাদের জন্য বাধ্যতামূলক নহে। যে সামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে এই কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস সম্প্রদায় তাহাদের ক্রীতদাসত্বের কর্তব্য সম্পন্ন করিবার জন্য পটু হইয়া উঠিতে পারে সেইটুকুর বেশী শিক্ষা তাহাদের দেওয়া হয় না।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় কৃষ্ণকায় সম্প্রদায়ের সামান্য যে কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে তাহার ব্যয় ইউনিয়ন গবর্মেণ্ট বহন করে না। ছাত্রদের কাছ হইতে যে বেতন পাওয়া যায় তাহা হইতে অথবা কোন উদার মিশনারী সম্প্রদায় বা কোন কৃষ্ণকায় সম্প্রদায়ের নিজ ব্যয়ে এই সমস্ত স্কুল প্রতিষ্ঠিত। ডার্বানে ভারতীয়গণ নিজেদের উৎসাহে যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করিয়াছে তাহা হইতে মোটামুটি একটা উন্নত ধরণের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে যেন এ কথা মনে না করা হয় যে দক্ষিণ-আফ্রিকার গবর্মেণ্ট কৃষ্ণকায় সম্প্রদায়ের শিক্ষালাভ সুনজরে দেখিয়া থাকে। বরং গবর্মেণ্ট কৃষ্ণকায় সম্প্রদায়ের শিক্ষার উৎসাহ নিবাইয়া দেওয়ার চেষ্টাই সর্বপ্রকারে করিয়া থাকে। আফ্রিকার শিশুদের মধ্যে শতকরা ৬৬ জনের বেশী শিক্ষালাভের সুযোগই পায় না। যাহারা পায় তাহাদের মধ্যে শতকরা ৪ জন পঞ্চমমান (Class five standard) পর্যন্ত পৌঁছায় না। ১৯৪৩ সালে আফ্রিকাতে মাত্র ১১৩ জন প্রবেশিকা ধাপ পর্যন্ত পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিল। শতকরা হিসাব করিলে দেখা যায় তাহা জনসংখ্যার '০৩৫টি মাত্র। শতকরা ৯০ জন কৃষ্ণকায় ও এশিয়াবাসী সম্প্রদায়েরই ছাত্র স্কুলে ভর্তি হয় বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে শতকরা ১০ জনও তৃতীয়মান (Class III) পর্যন্ত পৌঁছায় না।

১৯৪৫ সালে ইউনিয়নের ফোর্ট হেয়ারে অবস্থিত কলেজগুলিতে কৃষ্ণকায় সম্প্রদায়ভুক্ত ৫০৭ জন ছাত্র ভর্তি হইতে গিয়াছিল। তাহার মধ্যে ২৭০ জন আফ্রিকান ও বাকী সকলে অন্যান্য কৃষ্ণকায় সম্প্রদায়ের ছাত্র। কৃষ্ণকায় বলিয়া ইহাদের কাহাকেও কলেজে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। জেনারেল স্মাট্‌সের "উদারনৈতিক" গবর্মেণ্ট এই বলিয়া সাফাই গাহিয়াছেন যে কৃষ্ণকায়দের শিক্ষা-বিভ্রাটের জন্য দায়ী অর্থাভাব। কিন্তু শিক্ষা-সম্বন্ধীয় যে বিভাগীয় রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, ইউরোপীয়দের শিক্ষার ব্যয় কৃষ্ণকায় সম্প্রদায়ের জন্য মাথাপিছু যে ব্যয় হয় তাহার দশ গুণ। ইহাই কি অর্থাভাবের নমুনা?

শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিভাগীয় কমিটি পরিষ্কারই বলিয়াছে যে, সাদা চামড়ার শিশুদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা প্রভু সমাজের উপযুক্ত হইয়া উঠে এবং কাল চামড়ারা শিক্ষার যাহাতে তাহাদের পদতলে থাকে সেই ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা কৃষ্ণকায়দের জন্য ঠিক করা হইয়াছে।

মহিষমর্দিনী

(তৃতীয় প্রকরণ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

দুর্গাদেবী মহিষমর্দিনী-রূপে ভাবিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এক অসুরের আকার মহিষের তুল্য ছিল, অথবা সে অসুর মহিষের আকার ধরিতে পারিত। দেবী তাহাকে শূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন।

দেবী রুদ্রের শক্তি, রুদ্রাণী। দেবের যে রূপ, যে গুণ, যে কর্ম, যে আয়ুধ, যে বাহন, দেবীরও তাহাই। রুদ্র ভয়ঙ্কর দেবতা। রুদ্র নামেই প্রকাশ, তিনি মানুষকে রোদন করাইতেন। (রোদয়তি মনুষ্যান্—ভাহূজি দীক্ষিত)। ঋগ্‌বেদের-আর্যগণ এক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ও আর্ত হইয়া মনে করিতেন, রুদ্র সেই রোগের কর্তা, তাঁহার নিকট রোগের ভেষজ আছে, তিনি প্রসন্ন হইলে মহামারী উপশান্ত হইবে। ঋগ্‌বেদের অন্তিম কালে সেই রুদ্র, শিব. (মঙ্গল-ময়) হইয়াছিলেন। যজুর্বেদে তিনি মহেশ্বর, মহাদেব, সর্ব, ভব ইত্যাদি অনেক নাম পাইয়াছিলেন। কেমন করিয়া রুদ্রদেব শিব হইলেন, কেমন করিয়াই বা মরুৎগণের পিতা হইলেন, ইত্যাদি বিচিত্র পরিবর্তন হইল, তাহার সম্যক্ আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। এখানে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

মৃগ নক্ষত্রে রুদ্রের অধিষ্ঠান। অতএব মৃগ নক্ষত্র নিরীক্ষণ করিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় আমরা এই নক্ষত্রকে কালপুরুষ বলি। শ্রাবণ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ভোর ৪ টার সময় এই নক্ষত্র উঠিতে দেখা যাইবে। তদনন্তর উদয়-কাল মাসে মাসে দুই ঘণ্টা পিছাইতে পিছাইতে আশ্বিন মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ১২টার সময় এবং অগ্রহায়ণ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ৭টার সময় এই নক্ষত্রের উদয় দেখা যাইবে। মাঘ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ৩টায়, চৈত্র মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ১১টায় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ৭টায় অস্ত যাইতে দেখা যাইবে। কালপুরুষের মস্তকে তিনটি ছোট ছোট তারা ত্রিকোণাকারে আছে। জ্যোতিষে নাম মৃগশিরা বা মৃগ-শীর্ষ। দুই বাহুতে দুইটি, দুই পদে দুইটি বড় বড় তারা আছে। দক্ষিণ বাহুর তারা উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ, জ্যোতিষে ইহার নাম আর্দ্রা। কটিতে তিনটি তারকা এক তির্যক্ রেখায় আছে। নাম ইষ্বকা। ইহাদের নিকটে আর দুইটি তারা আছে বটে, কিন্তু ছোট ছোট। কটির দক্ষিণে ও মধ্যস্থলে তিনটি তারা আছে, মধ্যেরটি এক নীহারিকা, ক্ষুদ্র শ্বেত মেঘখণ্ডের মত দেখায়। এই তিন তারাকে কালপুরুষের বস্ত্রাঞ্চল বলা যাইতে পারে। (এই তিন তারায় রুদ্রের জ্যোতির্লিঙ্গ কল্পিত হইয়াছিল)। এই তেরটি তারা আধার করিয়া রুদ্রের রূপ কল্পিত হইয়াছিল। কাল-পুরুষের পূর্ব দিকে বক্রাকারে ছয়টি তারায় হরধনুঃ, জ্যোতিষে নাম পুনর্বসু। এই ছয় তারার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের তারাটি অতিশয় উজ্জ্বল। আকাশে ইহার তুল্য উজ্জ্বল তারা আর একটিও নাই। জ্যোতিষে ইহার নাম ব্যাধ বা মৃগ-ব্যাধ। সেখানে ছায়াপথ অর্থাৎ সুরগঙ্গা তির্যক্ ভাবে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হইয়াছে। কালপুরুষের পশ্চিম দিকে কতকগুলি ছোট ছোট তারা ধনুর আকারে দেখা যাইবে। চিত্র দেখিলে এই সব তারা চিনিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না (চিত্র ১)। দক্ষিণ মুখ হইয়া চিত্র দেখিতে হইবে, অর্থাৎ চিত্রের বাম পার্শ্ব পূর্ব দিক, দক্ষিণ পার্শ্ব পশ্চিম দিক।

চিত্র ১। 1—রুদ্র, 2—ধনুঃ, 3—রোহিণী, 4—স্বর্গঙ্গা।
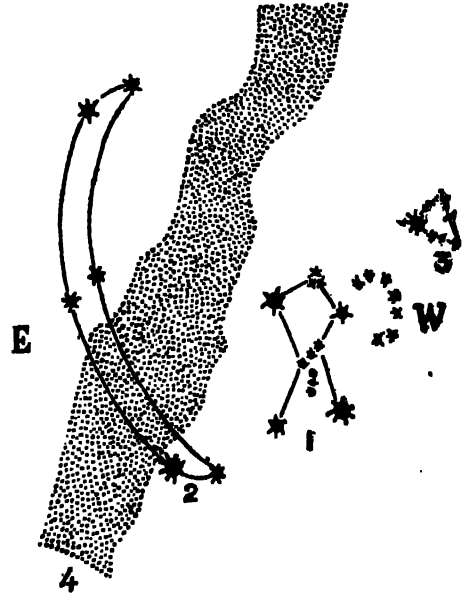
কালপুরুষের ত্রয়োদশ তারা লইয়া মৃগ নক্ষত্র। মস্তকের তিনটি তারা মৃগশীর্ষ বা মৃগশিরা। চারি পদে চারিটি, পুচ্ছে তিনটি, উদরে তিন তারায় একটি বাণ, ব্যাধ নিক্ষেপ করিয়াছে। পুরাণে মৃগ নক্ষত্র অবলম্বন করিয়া দশ-বারটি উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। রুদ্রের একটি দুইটি বিশেষণ কিম্বা উপমা এই সব উপাখ্যান রচনায় আশ্রয় হইয়াছিল।

ঋগ্‌বেদে যে রূপ বর্ণিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া রুদ্র দেবের প্রতিকৃতি লিখিত হইল (চিত্র ২)।
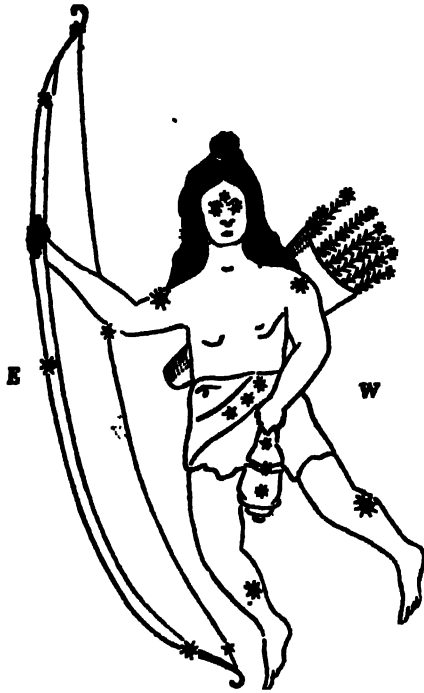
চিত্র ২। পিনাক-পাণি রুদ্র।

ঋগ্‌বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে ৩৩-এর সূক্তের দেবতা রুদ্র। এই সূক্তে রুদ্রের রূপ ও তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা আছে। যথা—(রমেশ দত্তের বঙ্গানুবাদ),—রুদ্র বজ্র-বাহু, কোমলোদর বভ্রুবর্ণ, সুনাসিক, দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র, হিরণ্ময় অলঙ্কার-শোভিত, আরণ্য পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর, ধনুর্বাণধারী, অতিশয় প্রবৃদ্ধ, যুবা, নিষ্কধারণকারী, সমস্ত ভুবনের অধিপতি ('ঈশান') ও ভর্তা। তিনি নানা রূপ-বিশিষ্ট ('বিশ্বরূপ')। তিনি রথস্থিত যুবা, তাঁহার সেনা আছে।

রুদ্রের নিকট বর প্রার্থনা।—তুমি ভিষকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আমাদিগকে ঔষধ প্রদান কর। সর্ব শরীর ব্যাপী ব্যাধিপুঞ্জকে বিদূরিত কর। পাপ বিদূরিত কর। শত্রু বিনাশ কর। আমাদিগকে তোমার জিঘাংসাবৃত্তির বিষয়ীভূত করিও না। তোমার সুখকর ওষধি দ্বারা শত হিম. (বর্ষ) ('শতং হিমাঃ') জীবিত রাখ, তোমার মহতী দুর্মতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। তোমার ধনুর জ্যা শিথিল কর।

প্রথম মণ্ডলের ১১৪-এর সূক্তে রুদ্রের রূপ।—রুদ্র কপর্দী, বীরনাশী, স্বর্গীয় বরাহ, মরুৎগণের পিতা, দীপ্তিমান্।

প্রার্থনা।—আমরা রক্ষার জন্য দীপ্তিমান্ ও যজ্ঞসাধক ও কুটিলগতি ও মেধাবী রুদ্রকে আহ্বান করি। যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ কুশলে থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগশূন্য হইয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যে বৃদ্ধকে বধ করিও না, বালককে বধ করিও না, সন্তান জনয়িতাকে বধ করিও না। গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করিও না, আমাদের পিতাকে বধ করিও না, মাতাকে বধ করিও না, আমাদের প্রিয় শরীরকে বধ করিও না। আমাদিগের পুত্রকে হিংসা করিও না, তাহার পুত্রকে হিংসা করিও না। আমাদিগের অশ্ব মনুষ্যকে হিংসা করিও না। গো ও অশ্ব হিংসা করিও না, বীরদিগকে হিংসা করিও না, আমরা তোমার রক্ষণ প্রার্থনা করি।

ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৪-এর সূক্তের দেবতা সোম ও রুদ্র।—"হে সোম ও রুদ্র! যজ্ঞ সকল প্রতি গৃহে তোমাদিগকে পর্যাপ্ত রূপে ব্যাপ্ত করুক। তোমরা সপ্ত রত্ন ধারণ করিয়া থাক, তোমরা আমাদিগের সুখকর হও, দ্বিপদের এবং চতুষ্পদের সুখকর হও। হে সোম ও রুদ্র! যে রোগ আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, সে সংক্রামক রোগ বিয়োজিত কর। হে সোম ও রুদ্র! তোমাদের দীপ্ত ধনুঃ আছে এবং তীক্ষ্ণ শর আছে। তোমরা আমাদিগের শরীরের জন্য ভেষজ ধারণ কর। আমাদিগের শরীর পাপ হইতে মুক্ত কর।"

উপরি-উক্ত তিন সূক্ত হইতে রুদ্রের রূপ ও গুণের পরিচয় পাইতেছি। তিনি কপর্দী অর্থাৎ তাঁহার মস্তকে জটা আছে। তাঁহার নাসিকা সুন্দর, উদর কোমল (লম্বোদর)। তিনি সপ্ত রত্ন ধারণ করিতেছেন, দুই বাহুতে দুই, দুই পদে দুই, বক্ষে তিন, এই সাত রত্ন। বক্ষের তিনটি রত্ন তিন নিষ্ক (সুবর্ণমুদ্রা) কণ্ঠ হইতে মাল্যাকারে শোভিত হইয়াছে। তিনি ধনুর্বাণধারী। পূর্ব দিকের ছয়টি তারায় ধনুঃ, পশ্চিম দিকের কয়েকটি তারা তাঁহার বাণ। তাঁহার 'হেতি' (অস্ত্র) আছে। তাঁহার বাম হস্তে বজ্র। তিনি দীপ্তিমান্, কারণ তারকাময়। তিনি বভ্রু অর্থাৎ অরুণবর্ণ, আর্দ্রা তারা। জ্যোতিষে রুদ্র আর্দ্রা তারার অধিপতি, মস্তকের উপরে সোম (চন্দ্র)। জ্যোতিষে মৃগ নক্ষত্রের অধিপতি চন্দ্র। ঋগ্‌বেদে মস্তকের তিনটি তারার উল্লেখ বোধ হয় নাই। দুইটিতে নেত্র, একটিতে মুখ বুঝিতে হইবে। এক স্থানে (৭।৫৯।১২) তাঁহাকে ত্র্যম্বক বলা হইয়াছে। ত্র্যম্বক শব্দের বহুবিধ অর্থ আছে; যথা—যাঁহার তিন মাতা আছেন, যিনি ত্রিলোকের অম্ব—পিতা, ইত্যাদি। অনেকে ত্র্যম্বক অর্থে ত্রিনয়ন বুঝিয়াছেন। তিনি বহুরূপ-বিশিষ্ট যেহেতু উদয়কালে কালপুরুষের যে রূপ দেখা যায়, মধ্য আকাশে সে রূপ দেখা যায় না, অস্তকালে আর এক রূপ দেখা যায়। অপিচ, তিনি যুবা, যবিষ্ঠ (অতিশয় যুবা), আবার প্রবৃদ্ধ অপেক্ষাও প্রবৃদ্ধ [বৃদ্ধ

শিব]। তিনি উগ্র, তিনি দিব্য অসুর, দিব্য বরাহ। তিনি আরণ্য বরাহ, মহিষ ও সিংহের তুল্য ভয়ঙ্কর। তেরটি তারা লইয়া বহুবিধ আকার কল্পনা করা যাইতে পারে। রুদ্র কেমন করিয়া মরুৎগণের পিতা হইলেন তাহা পরে বলিতেছি।

রুদ্র উগ্রদেব। তিনি মনুষ্য ও গবাদি গ্রাম্য পশুর হিংসা করেন। তিনি প্রসন্ন হইলে আমাদিগকে ব্যাধি-মুক্ত করিতে পারেন। তিনি ভিষগ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। [ইনিই আয়ুর্বেদের ধন্বন্তরি। ধন্বন্তরি ধনুর্বাণধারী। পুরাণে ইনিই ক্ষীরোদ সাগর-মন্থনে হস্তে অমৃত-ভাণ্ড লইয়া উত্থিত হইয়াছিলেন। চন্দ্র সুধাময়, অমৃত-ভাণ্ড।]

যজুর্বেদ হইতে বুঝিতেছি, শরৎ ঋতুর আরম্ভে আর্যগণ সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইতেন। কি রোগ, জানিতে আমাদের কৌতূহল হয়, কিন্তু তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। কোন্ অতীত যুগের কথা, তাহা পঞ্জাবের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া অনুমান করা অসম্ভব। তথাপি অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। বর্ষার শেষে সে-দেশে গোরুর মড়ক হয়। কখন কখন বঙ্গদেশেও হয়, সংক্রামক মারাত্মক গুটীরোগ। পঞ্জাবে বসন্ত রোগ প্রায় বার মাসই আছে। কিন্তু মনে হয় বেদোক্ত রোগ ব্রণরোগ নয়, মেলেরিয়া হইতে পারে। কৃষ্ণ যজুর্বেদে আছে শরৎই রুদ্রের অম্বিকা ভগিনী। রুদ্র তাঁহারই দ্বারা হিংসা করেন। সায়ণ লিখিয়াছেন, শরৎ কালে পীনস রোগ (শরদী) উৎপাদন হেতু হিংসক। এই কারণে অম্বিকা হিংসিকা। শুক্ল যজুর্বেদের ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন, অম্বিকা শরৎ রূপ গ্রহণ করিয়া কাস জ্বরাদি উৎপাদন করেন। এই দুই ভাষ্যকার ব্রণ সম্ভাবনা করেন নাই।*

কিন্তু ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ ঋতুর দোষ না দিয়া রুদ্রের ক্রোধ ও দুর্মতি কেন সন্দেহ করিয়াছিলেন? কারণ, তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, যে সময়ে রুদ্রের উদয় হয়, সে সময়ে ব্যাধির প্রাদুর্ভাবও ঘটে। রুদ্রের সহিত ব্যাধির নিত্য সম্বন্ধ হেতু তাঁহারা রুদ্রকেই ব্যাধির কারণ অনুমান করিয়াছিলেন। দুই এক মাস পরে রুদ্রের উদয় হইত না, ব্যাধিরও উপশম হইত। ফলজ্যোতিষের ভিত্তিও এই। পৃথিবীর যাহা কিছু সব একই আছে, কিন্তু আকাশে নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রত্যহ একই নক্ষত্র রাত্রির একই সময়ে একই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আকাশের গ্রহ নক্ষত্রই পার্থিব ব্যাপারের কারণ।

দুই বিষুব কালে ৬টার সময় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। সে সময় যে নক্ষত্র ভোর ৫টায় উঠিতে দেখা যায়, পাঁচ মাস পরে সে নক্ষত্র ১০ ঘণ্টা আগে সন্ধ্যা ৭টায় উঠে। যে কালে শরৎ ঋতুর আরম্ভে সূর্যাস্তের পরে রুদ্রের উদয় দেখা যাইত, সে কালে পাঁচ মাস পূর্বে বসন্ত ঋতুতে রুদ্র সূর্যোদয়ের পূর্বে দেখা যাইত। সহস্রাধিক বৎসর পরে রুদ্রকে গ্রীষ্ম কালে সূর্যোদয়ের পূর্বে দেখা যাইত। গ্রীষ্ম ঋতু ঝঞ্ঝাবাতের ঋতু। মরুৎগণ ঝঞ্ঝাবাত, বিশেষতঃ বাতাবর্তের দেবতা। এই কারণে মরুৎগণ রুদ্রপুত্র। তাঁহারা রুদ্রিয়। ঋগ্‌বেদে মরুৎগণের যে রূপ বর্ণিত আছে, তাহা অবিকল রুদ্রের রূপ। তাঁহাদের হস্তে রুদ্রিয় ভেষজ আছে। প্রভেদের মধ্যে মরুৎগণের এক বাহন কল্পিত হইয়াছে। সে বাহন পৃষতী (চিত্র হরিণ) (২।৩৪।৩)। ঝঞ্ঝাবাতের সহিত বৃষ্টি হইতে লাগিল, উগ্রদেব জল বর্ষণদ্বারা শিব, হইলেন (১।১২২।১), ক্রমে যজুর্বেদের কালে বর্ষারম্ভে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং শরদাদো মধ্য রাত্রে রুদ্রকে উদিত হইতে দেখা যাইত।

যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে রুদ্রের মহিমা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শুক্ল যজুর্বেদে (২৯।৮) অগ্নি, অশনি, পশুপতি, ঈশান, মহা-

---

* কোন্ ঋতুতে ব্যাধি হইত, তাহা ঋগ্‌বেদ হইতেও জানিতে পারা যায়। ঋগ্‌বেদে রুদ্রসোমের একত্র স্তব আছে। অথর্ববেদেও আছে। এই সোম ভোররাত্রের কলাচন্দ্র, না সন্ধ্যা-রাত্রের পূর্ণচন্দ্র? যদি কলাচন্দ্র, তবে বসন্ত ঋতু, যদি পূর্ণচন্দ্র, তবে শরৎ ঋতু। অন্য ঋতুতে হইতে পারিত না। বসন্ত ঋতুতে ভোর রাত্রে মৃগ দৃষ্ট হইলে সূর্য পুনর্বসুতে থাকিত। এই নক্ষত্রের কোন দোষ বর্ণিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, শরৎ ঋতুতে সন্ধ্যারাত্রে পূর্ণচন্দ্রের সহিত মৃগ নক্ষত্র দৃষ্ট হইলে মৃগের বিপরীত দিকে চতুর্দশ নক্ষত্রে, মূলানক্ষত্রে সূর্য থাকিত। মূলা বৃশ্চিকের পুচ্ছ। ঋগ্‌বেদে মূলার নাম নিঋ্ঋতি। নিঋ্ঋতি শব্দের অর্থ মৃত্যু। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, ব্যাধির নিদান। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ নিঋ্ঋতিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। কারণ, যে সময়ে মূলা দেখা যাইত না, সে সময়ে রোগের প্রাদুর্ভাব হইত। এক মাস পরে যখন দেখা যাইত, তখন রোগের হ্রাস হইত। পরে যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের কালে (খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দে) কৃত্তিকাযুক্ত পূর্ণিমায় শারদ বিষুব হইত, সূর্য বিশাখায় থাকিত। তখন মূলায় রোগ-নিদানত্ব দোষ কাটিয়া গেল, বৃশ্চিকের পুচ্ছের দুইটি তারা লইয়া 'বিচৃতৌ' নামে নক্ষত্র হইল। এই নামের অর্থ মোচন-কর্তা, রোগ-পাশ-মোচক। অথর্ববেদে (২।৮, ৩।৭) 'ক্ষেত্রিয়' নামে এক রোগের চিকিৎসা ও শান্তির বিধান আছে। সায়ণ 'ক্ষেত্রিয়' শব্দে বুঝিয়াছেন, কুলাগত ক্ষয় কুষ্ঠাপস্মারাদি পিতামাতা হইতে পুত্র কন্যার সঞ্চারী রোগ। ইহাই প্রসিদ্ধ অর্থ। ঋষিগণ এই রোগের চিকিৎসা করিতেন, যখন 'বিচৃতৌ' (দ্বিবচনান্ত) পূর্বদিকে প্রথম উদিত হইত। তখন "শুভকাল শুভগে ভগবতী বিচৃতৌ"। গণিত দ্বারা জানিতেছি খ্রি-পূ ৪০০০ অব্দে বিচৃতৌ অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের আরম্ভে, এবং খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দে পনর দিন পরে প্রথম উঠিতে দেখা যাইত। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ যে ব্যাধির প্রকোপে কাতর হইয়া রুদ্রের নিকট ভেষজ প্রার্থনা করিতেন, তাহা 'ক্ষেত্রিয়' মনে হয় না। দেহান্তর-সঞ্চারী ব্যাধির কালাকাল নাই।

দেব ইত্যাদি রুদ্রের বিভিন্ন মূর্তির নাম। তিনি কৃত্তিবাস, পিনাকপাণি, গিরিশ (পর্বতবাসী) (১৬।২।৪)। মুজবান্ পর্বতের সেদিকে তাঁহার বাস (৩।৭৪)। কৃষ্ণযজুর্বেদে (৪।৫) রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্রের অসংখ্য লীলা-বিগ্রহ বর্ণিত আছে। বিশ্বভুবনে যত কিছু আছে, সব বিশ্বরূপ রুদ্র। তিনি সেনাপতি, দিক্‌পতি, বৃক্ষপতি, পশুপতি, ক্ষেত্রপাল, সভাপতি, মন্ত্রী, বণিক। তিনি গুপ্তচোরপতি, তস্করপতি, বঞ্চক, ব্রাত্যপতি, গণপতি ইত্যাদি। তিনি সর্বত্র সঞ্চরণ করেন। তাঁহাকে শান্ত না করিলে তিনি উপদ্রব করেন। "মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ," পুরুষ মনুষ্য জগৎ, গবাদি পশু, মা হিংসী—বধ করিও না। "তুমি ঘোর রূপ ত্যাগ করিয়া শিবা তনু ধারণ করিয়া আইস।" ঋগ্‌বেদে রুদ্রদেবের রূপ ও গুণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে তাহার বিস্তার ঘটিয়াছে, কিছু কিছু নূতনও আসিয়াছে। মৃগ নক্ষত্রের তারা সন্নিবেশ দেখিলে সহজে তাহা বিকটাকার মনে হইতে পারে। আর, বিকটাকার মনুষ্য দেখিলে যেমন তাহার বিকৃত গুণ অনুমান করি, সেই স্বাভাবিক ক্রমে রুদ্রেরও নিন্দনীয় স্বভাব কল্পিত হইয়াছিল। অথর্ববেদে রুদ্র কিরাত-রূপ, তিনি এক বৃহৎ মুখবিবরবিশিষ্ট কুকুর লইয়া বেড়ান। (চিত্র ৩) শুক্ল যজুর্বেদ লিখিয়া-

চিত্র ৩। 1—শ্বন্, 2—মূষিক, 3—কিরাতরূপী রুদ্র, 4—মুজবান্ পর্বত।

ছেন, এক 'আখু' (ইন্দুর) রুদ্রের প্রিয় পশু। রুদ্র ও তাঁহার ভগিনীকে পুরোডাশ (যবচূর্ণের পিষ্টকবিশেষ) দেওয়া হইত। তাহার প্রিয় পশুকেও ভাগ দেওয়া হইত। এই পাথেয় লইয়া রুদ্রকে মুজবান্ পর্বতের সে পারে স্বীয় আলয়ে যাইতে বলা হইত।*

ঋগ্‌বেদের কাল হইতে যজুর্বেদের কালের বহু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যজুর্বেদের আর্যগণ স্বর্গের ব্যাপার মর্তে আনিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদে এক সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বভুবন সলিল-মগ্ন হইয়াছিল। যজুর্বেদের কালে তাহা পার্থিব জলপ্লাবন হইয়াছিল। বৈবস্বত মনু এক নৌকায় আরোহণ করিয়া জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। (১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে বিষ্ণুর মৎস্যাবতার পশ্য।) তিনি সর্বোচ্চ স্থানে হিমালয়ে নৌকা বাঁধিয়াছিলেন। যজুর্বেদে তাহার নাম নৌবন্ধন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ ঋগ্‌বেদে দিব্য সরস্বতী বা স্বর্-নদী পুরাণে কভু ধবল পর্বত, কভু পুষ্পিত মুঞ্জ বা শরবন রূপে কল্পিত হইয়াছিল। দিব্য সরস্বতী (ছায়াপথ) শ্বেত হিমালয়। তাহারই দক্ষিণ-পশ্চিম পারে কালপুরুষ নক্ষত্র। যিনি রুদ্র, তিনিই রুদ্রাণী, হিমালয়-দুহিতা হইয়াছেন। পুরাণে কার্তিকেয় শরাচ্ছাদিত শ্বেত পর্বতে জন্মিয়াছিলেন। সে শরবন হিমালয়ের মুঞ্জবন, বাস্তবিক স্বর্ নদী।

কালপুরুষের মস্তকের তিনটি তারা ত্রিভুজাকারে অবস্থিত। বোধ হয় এই আকার দেখিয়া শুক্ল যজুর্বেদে (১৬।২৮) রুদ্রের মুখ কুকুরের তুল্য বলা হইয়াছে। ইহা

* আমরা যাহাকে কালপুরুষ বলি, গ্রীকেরা তাহাকে 'ওরায়ণ' (Orion) বলিত। ওরায়ণ কিরাত। তাহারও সঙ্গে এক কুকুর থাকিত, সে কুকুর Sirius তারা। ঋগ্‌বেদেরও এক স্থানে এই তারা কুকুর। মৃগ-নক্ষত্রের দক্ষিণে কয়েকটি তারা আছে, তাহাতে গ্রীকেরা শশক দেখিত। এই নক্ষত্রের ইংরেজী নাম Lepus। যজুর্বেদে তাহা মূষিক। গ্রীক পুরাণে ওরায়ণ নক্ষত্রের উৎপত্তি কিম্বা তাহার কর্ম সম্বন্ধে বিশেষ উপাখ্যান নাই। আর্যগণের ও গ্রীকদিগের কিরাত, তাহার শ্বা ও শশক বা ইন্দুর কাহারা কাহার নিকট পাইয়াছিল? আমার মতে গ্রীকেরা আর্যদিগের নিকট শিখিয়াছিল। এই একটি নয় অনেক। আমার বন্ধু শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলাস দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে হিমালয়ে মুঞ্জতৃণের অরণ্য দেখিয়াছিলেন। মুঞ্জ আমাদের পরিচিত শর গাছের তুল্য। মুঞ্জের ত্বক্ দ্বারা মুঞ্জরজ্জু নামক মসৃণ দীর্ঘকাল স্থায়ী রজ্জু নির্মিত হয়। উপনয়নকালে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে মুঞ্জমেখলা পরিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই দোড়িকে শর-মাঞ্জা বলে। তারপর আমার বন্ধু হিমালয়ের সে পারে তিব্বতে প্রবেশ করিয়া বৃহদাকার ইন্দুর দেখিয়াছিলেন। এত বৃহৎ যে তিনি দূর হইতে শশক মনে করিয়াছিলেন। তারপর ক্রূর দস্যু ও তাহাদের ভীষণাকার হিংস্র কুকুরের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন। সঙ্গে বন্দুক ছিল, তাহাতেই তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই বর্ণনার সহিত যজুর্বেদোক্ত বর্ণনার আশ্চর্যজনক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় যজুর্বেদের ঋষিগণ কৈলাস দর্শন করিয়াছিলেন।

হইতে মহাভারতের দুর্গাস্তবে দুর্গা কোকমুখা হইয়াছেন। কুক্কুরের মুখ হইতে শৃগালের মুখ আসিয়াছে, পরে পুরাণে কালপুরুষ নক্ষত্রই শিবা হইয়াছে। রুদ্রের নাসিকা সুন্দর, বোধ হয় দীর্ঘ। রুদ্র মৃগ (আরণ্য পশুর) তুল্য ভীম। রুদ্রের নাসিকা দীর্ঘ করিয়া বরাহ কল্পনা হইয়াছিল। রুদ্রের গণ আছে। তিনি গণপতি। পুরাণের গণপতি গজানন। তিনি রুদ্রের বিঘ্নবিনাশন মূর্ত্তি। কালপুরুষ নক্ষত্রে গজ-মুণ্ড কল্পনা যেন বিদ্রূপ মনে হয়। হস্তী ত্রিবিধ—মৃগ, মন্দ, ভদ্র। এক প্রকার হস্তীর নাম মৃগ আছে। বোধ হয় মৃগ শব্দে হস্তী বুঝিয়া গজানন আসিয়াছে। আর্দ্রা তারা অরুণবর্ণ। গণেশ মূর্ত্তিতে তাহা হিঙ্গুলবর্ণ হইয়াছে। রুদ্রের প্রিয় আখু, গণেশের মূষিক বাহন। গণেশ ত্রিলোচন। তাঁহার পিতা মাতা নাই। বস্তুতঃ যে দেব বা দেবী প্রতিমার ত্রিলোচন দেখা যায় তাহা রুদ্র-প্রতিমার রূপান্তর।

একদা দক্ষ প্রজাপতি হইয়া এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সে যজ্ঞে যাবতীয় দেব নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রুদ্র হন নাই। দক্ষের সকল কন্যা যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রুদ্রাণী হন নাই। পুরাণে রুদ্রাণী সতী নাম পাইয়াছেন। সতী পিত্রালয়ে গিয়া অপমানিতা হইয়া যজ্ঞাগ্নিতে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। ক্রোধে রুদ্র বীরভদ্র উৎপাদন করিলেন। বীরভদ্র যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন এবং দক্ষের ছাগ-মুখ করিয়া দিলেন। এই বহু প্রচলিত উপাখ্যানে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, রুদ্র যজ্ঞভাগী ছিলেন না। বাস্তবিক আমরা ঋগ্বেদে দেখিয়াছি, রুদ্রযজ্ঞ বহু-প্রচলিত ছিল। যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে উৎপাত-শান্তির নিমিত্ত রুদ্রহোম বিহিত ছিল। প্রজাপতি, যজ্ঞপতি, বর্ষপতি, অর্থাৎ প্রজাপতি কালের নাম। যে কাল সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিতেছেন, সেই কাল। কালপুরুষ নক্ষত্রই কালের প্রতিমা এবং দক্ষ। মৃগ নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুব হইত। ক্রমে পশ্চাদগত হইয়া খ্রি-পূ ৩২৫৬ অব্দে রোহিণীতে উপস্থিত হইল। দক্ষের প্রজাপতিত্ব বিনষ্ট হইল। ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

ঋগ্বেদ বলিতে বস্তুতঃ ঋগ্বেদ সংহিতা বুঝিয়া আসিতেছি। সংহিতায় মন্ত্র আছে। ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থে যজ্ঞে মন্ত্রের প্রয়োগ, ব্যাখ্যা, প্রয়োগের বিচার ও আখ্যায়িকা আছে। এইরূপ অপর তিন বেদসংহিতারও ব্রাহ্মণ আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার এক ব্রাহ্মণের নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। এ ব্রাহ্মণে এক উপাখ্যান আছে (৩।১৩।৯)। যথা—পুরাকালে প্রজাপতি আপন কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি ঋশ্যরূপ ধরিয়া রোহিণীরূপিণী কন্যার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। দেবগণ বলিলেন, যাহা কেহ করে নাই, প্রজাপতি তাহা করিতেছেন। কিন্তু প্রজাপতিকে দণ্ড দিতে পারিবে, আপনাদের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা তাঁহাদের ঘোরতম শরীর একত্র মিলিত করিলেন। এক দেবের উৎপত্তি হইল। তাহার নাম ভূতবান্। দেবগণ ভূতবান্‌কে বলিলেন, প্রজাপতিকে বাণদ্বারা বিদ্ধ কর। ভূতবান্ দেবগণের নিকট পশুগণের আধিপত্য বর চাহিলেন। সেই হেতু তাঁহার নাম পশুমান্। তিনি বাণ দ্বারা প্রজাপতিকে বিদ্ধ করিলেন। প্রজাপতি ঊর্দ্ধে উৎপতিত হইলেন। তাঁহাকে লোকে মৃগ বলিয়া থাকে, আর যিনি মৃগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি মৃগ ব্যাধ। যিনি রোহিতরূপিণী, তিনি রোহিণী। আর যাহা বাণ, তাহা ত্রিকাণ্ড (তিন অংশযুক্ত) বাণ হইয়াছে (চিত্র ৪)। এই উপাখ্যানের মূল ঋগ্বেদে আছে (১০।৬১)।
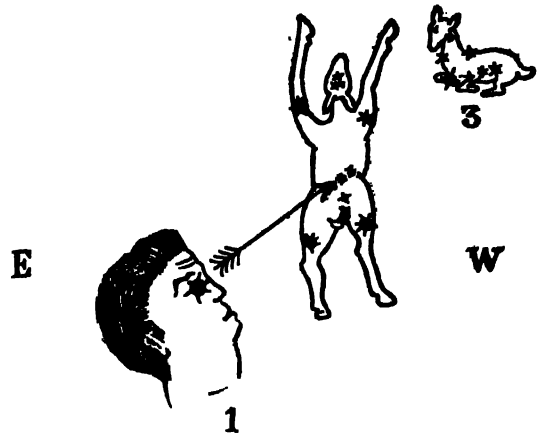
চিত্র ৪। 1—রুদ্র, 2—ঋশ্য, 3—রোহিত মৃগ।

রোহিণী তারা লোহিতবর্ণ। মৃগব্যাধ হইতে রোহিণী পর্যন্ত রেখা করিলে সে রেখায় ত্রিভারক (বাণ) দেখা যায়। [ঋশ্য মৃগ হরিণ নয়। ইহার চলিত নাম নীল গাই। সংস্কৃতে নীলাঙ্গ, গবয়। ইহা গো নয়, ছাগ নয়। আকারে বাছুরের মত।]

এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। (১) প্রজাপতি মৃগনক্ষত্র হইতে রোহিণী নক্ষত্রে গিয়াছিলেন। (২) রুদ্রের রূপ, গুণ ও কর্ম, তাঁহার পশুপতি নাম মৃগ-ব্যাধ তারায় আরোপিত হইয়াছিল। মৃগব্যাধ তারা অতিশয় উজ্জ্বল। ইহা দেখিয়া তাহা দেবগণের সম্মিলিত তেজঃ কল্পিত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এই উপাখ্যানের মূল আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণও পুরাতন। বোধ হয় খ্রি-পূ অষ্টাদশ শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। তৎপূর্বে খ্রি-পূ ৩২৫৬ অব্দে রোহিণী তারায় বাসন্ত বিষুব হইত। তৎকালে নক্ষত্র-চক্রে রোহিণীর প্রাধান্য হইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্বে

(২২৯ অঃ) ইহার উল্লেখ আছে। পূর্বে অভিজিৎ লইয়া অষ্টবিংশতি নক্ষত্র গণনা হইত, এখন অভিজিৎ পরিত্যক্ত হইয়া সপ্তবিংশতি নক্ষত্র হইল। পুরাকালে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠাদি মাসের নাম ছিল না। বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত সে সে নাম লিখিতেছি।

রোহিণীর বিপরীত দিকে জ্যেষ্ঠা। অতএব রোহিণীতে সূর্য আসিলে জ্যেষ্ঠায় পূর্ণিমা হয়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইলে, সে পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষুব ধরা হইত। অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাস বসন্ত ঋতুর প্রথম মাস ছিল। জ্যৈষ্ঠ এই নামেই প্রকাশ, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র প্রধান গণ্য হইত। আষাঢ় মাস হইতে পাঁচ মাস গতে মার্গ মাস শরৎ ঋতুর প্রথম মাস ছিল। ইহা নূতন কথা নয়, পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ঋতু এক মাস পিছাইতে কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসর লাগে। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা হইতে ক্রমে যজুর্বেদের কালে বৈশাখ পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষুব ঘটিতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠ হইতে পাঁচ মাস গতে কার্তিক মাস শরৎ ঋতুর প্রথম মাস হইল।

দুই সহস্রাধিক বর্ষ মার্গ মাসে শরৎ বৎসর আরম্ভ হইত। এখন কার্তিক মাসে শরৎ বৎসরের আরম্ভ আসিয়া পড়িল। যজুর্বেদের ঋষিগণ নক্ষত্র দর্শন করিয়া কৃত্তিকাকে নক্ষত্র-চক্রের আদি করিয়াছিলেন। বৈশাখ পূর্ণিমায় ও কার্তিক পূর্ণিমায় বাসন্ত ও শারদ বিষুব স্বীকার করিলেন।

পরিবর্তনটি সামান্য নয়। দুই সহস্র বৎসর মার্গশীর্ষ বর্ষ-চক্রের প্রথম মাস গণ্য হইয়া আসিতেছিল, এখন কার্তিক মাস প্রথম ধরিতে হইল। উপাখ্যান রচিত হইল। মহাভারতের বনপর্বে (২২১ অঃ) কার্তিকেয় দেবের জন্ম ও কর্ম বৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি অগ্নির পুত্র অগ্নি-কুমার। এই জন্য তিনি কুমার (যুবা)। তাঁহাকে কৃত্তিকা নক্ষত্রের ছয় তারা পালন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্রে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে তিনি কৃত্তিকা নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অগ্নি। মৎস্যপুরাণে প্রকৃত ব্যাপার রহস্যাবৃত হইয়াছে। সেখানে কুমার রুদ্র-স্থানীয় মৃগব্যাধ তারা হইয়াছেন। রুদ্রের প্রকৃত দেহ মৃগ নক্ষত্র। তাহা এই উপাখ্যানে এক অসুর কল্পিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে রুদ্রকে স্বর্গের অসুর বলা হইয়াছে। অসুরের দেহ তারায় গঠিত। এই হেতু নাম তারকাসুর। এই তারকাসুর বধের নিমিত্ত কুমারের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ বধ করিতে পারেন নাই। যে তারকাসুর, সেই মহিষাসুর। তাহার আকার আরণ্য মহিষের তুল্য। এই হেতু মহাভারতে (বনপর্ব ২২৯ অঃ) কুমার কার্তিকেয় মহিষাসুর বধ করিয়াছেন।

কবে তারকাসুর নিহত হইয়াছিল? মহাভারত বলিতেছেন, অগ্রহায়ণ শুক্ল প্রতিপদে কুমারের জন্ম হইয়াছিল। তিনি ছয় দিনের মধ্যেই তেজীয়ান্ হইয়া উঠিলেন। শুক্ল পঞ্চমী-যুক্ত ষষ্ঠীর দিনে তিনি দেবসেনা-পতি পদে বৃত হইলেন। পাঁজিতে সে দিন গুহ ষষ্ঠী নামে খ্যাত। গুহ কার্তিকেয়।

চান্দ্র মাস গণনায় দুই রীতি আছে। কেহ অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা, কেহ পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা মাস গণনা করেন। পাঁজিতে অমান্ত মাসের নাম মুখ্য চান্দ্র এবং পূর্ণিমান্ত মাসের নাম গৌণ চান্দ্র। বৈশাখ অমায় বাসন্ত বিষুব হইলে ছয় মাস গতে অর্থাৎ কার্তিক অমাবস্যা গতে অগ্রহায়ণ শুক্ল পঞ্চমী ষষ্ঠীতে শারদ বিষুব হয়। ছয় মাসে ছয় তিথি পূর্ণ হয় না। পঞ্চমী গতে ষষ্ঠীর কিঞ্চিদধিক একত্রিশ দণ্ড হয়।*

এখন পট পরিবর্তন করিতে হইবে। কার্তিকেয় অগ্নির পুত্র, অর্থাৎ অগ্নি-কুমার। অগ্নিকে স্ত্রীরূপ কল্পনা করিলে তিনি কুমারী। রুদ্র অগ্নিও বটেন, অতএব কুমারী রুদ্রাণী। তিনি মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে ইন্দ্রই অসুর-হন্তা। বৃষ্টি-রোধকারী অসুর বিনষ্ট হইলে ইন্দ্র বর্ষণ করিতে পারিতেন। সে দিন অম্বুবাচি, দক্ষিণায়ন-আরম্ভ। যজুর্বেদের কাল হইতে কেবল ইন্দ্র নহেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ এক পক্ষের, অসুরগণ আর এক পক্ষে সংগ্রাম করিতেন। দুই পক্ষের রাজ্যের সীমা লইয়া সংগ্রাম হইত। দেবগণ অসুরগণের দ্বারা প্রায়ই পরাজিত হইতেন। তখন অসুরবিজয়ী দেব কিম্বা দেবী আবির্ভূত হইয়া অসুর পরাজয় করিতেন। কার্তিকেয় সেইরূপ এক সেনাপতি। তিনি দেবসেনা-পতি। দুর্গা তাঁহার স্থানে আসিয়া অসুর বধ করিয়াছিলেন। অসুর বিনাশের প্রকৃত অর্থ এই যে, ভোর রাত্রে নক্ষত্ররূপী অসুরকে উঠিতে দেখা যাইত এবং উদীয়মান সূর্যের রশ্মি দ্বারা অচিরে অদৃশ্য হইত। সেখানে সূর্যরূপ ইন্দ্র অসুর বিনাশ করিতেন। কার্তিকেয় ইন্দ্র নহেন, তিনি তেমন ভাবে তারকাসুর বধ করিতে পারেন নাই। শরৎ কালে যুদ্ধও হইত না। শরৎ যুদ্ধের পক্ষে অকাল।

গণিত দ্বারা জানিতেছি, যজুর্বেদ কালে ও তাহারও পূর্বে উত্তর ভারত (২৮°-৩০° অক্ষাংশ) হইতে দেখিলে শরদান্তে মধ্য রাত্রে ব্যাধসহ মৃগনক্ষত্রের উদয় হইত। দুই

---

* ইহা হইতে অক্লেশে তারকাসুর বধের কাল নির্ণয় করিতে পারা যায়। এখন ৭ই আশ্বিন শারদ বিষুব হইতেছে। তখন অগ্রহায়ণ মাসের ৬ই হইত। অতএব তদবধি আশ্বিনের ২৩+ কার্তিকের ৩০+অগ্রহায়ণের ৬ দিন=৫৯ দিন। বিষুব ৭৩ বৎসরে এক দিন পিছাইত। অতএব তদবধি ৫৯×৭৩=৪৩০৭ বৎসর গত হইয়াছে; অর্থাৎ খ্রি-পূ ৪৩০৭-১৯৪৫=২৩৬২ অব্দের কথা।

এক বৎসর নয়, অনেক বৎসর এই মৃগয়া ব্যাপার দেখা যাইত, যেন ব্যাধরূপিণী চণ্ডী মহিষরূপী অসুর বধ করিতেছেন। বোধ হয় পৌরাণিক ইহাকে অবলম্বন করিয়া মহিষাসুর-বধ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে দেখা গেল, এক ক্ষুদ্র বীজ হইতে বিশাল মহীরুহের উৎপত্তি হইয়াছে। ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে আর্য-পিতামহগণ এক রোগের শান্তির নিমিত্ত রুদ্রদেবের উদ্দেশে শরৎ ঋতু যজ্ঞ করিতেন। তাঁহারা রুদ্রের এক তারাময় প্রতিমা কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রুতগামী কাল সে কল্পনা ভাঙ্গিয়া দিল। শরৎ ঋতুতে মৃগের উদয় হইল না, রোহিণীর উদয় হইল। এক উপাখ্যান রচিত হইল, কাল-রূপ প্রজাপতির দুষ্কৃত মনে হইল, প্রজাপতি রোহিণীতে পলায়ন করিলেন। এখানেও তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, কৃত্তিকাতে চলিয়া গেলেন। খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দের কথা। রুদ্রের দেহে এক অসুর কল্পিত হইল, রুদ্র স্থানে রুদ্রাণী আসিলেন, রুদ্রের তারাময় প্রাচীন প্রতিমায় অসুর ও রুদ্রাণী, উভয়েই স্থান পাইলেন। অতএব বর্তমান দুর্গা-প্রতিমা কল্পনায় যজুর্বেদের কালের ঘটনা আশ্রয় হইয়াছে। সুর-গঙ্গার সন্নিকটে রুদ্র ও রুদ্রাণীর প্রতিমা। সুর-গঙ্গা শ্বেত হিমবান্ পর্বত। রুদ্রাণী হৈমবতী উমা হইলেন। কিন্তু উমা মহিষাসুর বধ করেন নাই। যিনি করিয়াছেন, তিনি অ-শরীরী যাবতীয় দেবের সম্মিলিত তেজঃপুঞ্জ।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২১

যে অবস্থায় দেখা, টুনুর মুখে একটা রূঢ় প্রশ্ন আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা আর উচ্চারণ করিল না, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"তুমি এখন এখানে! প্রায় দুপুর রাত যে!"

চম্পাও এইটুকুতে প্রথম ঝোঁকটা সামলাইয়া লইয়াছে, অল্প হাসিয়া বলিল—"রাত দুপুর ত আপনার পক্ষেও, জেগে থাকবার কথা নয় ত।"

টুনু বুঝিল কথার কাটান দিয়া চম্পা ব্যাপারটা চাপা দিতে চায়; জানে ওর সে ক্ষমতাটা বেশ আছে, ঘুরাইয়া রহস্যটা বাহির করিতে গেলে ও বেশ খানিকটা এড়াইবার চেষ্টা করিবে। সেদিকে না গিয়া একেবারে সোজাসুজি প্রসঙ্গটা আনিয়া ফেলিল, বলিল—"শোন চম্পা, তুমি কয়েক দিন থেকেই এখানে রাত্তিরে এসে কি একটা করছ, তোমার বাবা থাকে, কে একজন পেয়াদা থাকে। এত দিন জানতাম না, লুকানো ছিল, আজ তোমার ঠাকুরদাদার কাছে শুনলাম।"

চম্পা মুখের পানে চাহিয়া নিতান্ত সহজ কণ্ঠে বলিল—"ঠাকুরদাদার রোজ অসুখ হচ্ছে…"

টুনু বাধা দিয়াই বলিল—"সে ত শুনেছি, বিশ্বাস হ'ল না বলেই ত যাচ্ছিলাম নিজে সন্ধান নিতে।"

ওর লুকাইবার চেষ্টায় বেশ একটু বিরক্ত ভাবেই কথাটা বলিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

চম্পা বলিল—"বিশ্বাস না করলে আন্দাজ করে নেওয়াই ভাল, আবার যে আমি মিথ্যেই বলব না কি করে জানলেন? কিন্তু আপনি একটা ভুল করছেন—আমার সঙ্গে এ সময়ে এ ভাবে দাঁড়িয়ে কথা কওয়াটা…কখনো কখনো এ পথে লোক এসে পড়ে হঠাৎ…তা ভিন্ন বাবা, ঠাকুরদাদা…"

টুনু উত্তর করিল—"আমি যে পথের পথিক, তাতে আমার ওসব গ্রাহ্য করলে চলে না।"

"কিন্তু আমি?…মানে, আমায় যদি দেখেন?"

প্রসঙ্গটা সোজা আনিয়া ফেলা সত্ত্বেও চম্পার আবার অন্য কথা আনিয়া চাপা দেওয়ার চেষ্টায় টুনু উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল, এবার যে রূঢ় মন্তব্যটা মুখে আসিল সেটা, চাপিতে পারিল না, তবে যথাসম্ভব ছোট করিয়া বলিল—"ক্ষতি হবে?"

চম্পার চক্ষু দুইটা হঠাৎ জলিয়া উঠিল, কিন্তু কিছু বলিবার আগেই টুনু বলিল—"শোন, বাজে কথা বেড়ে যাচ্ছে; কি ব্যাপারটা হচ্ছে আমায় স্পষ্ট করে বল।"

তাহার পর একটু হুকুমের সুরে বলিল—"আমি শুনতে চাই।"

চম্পার দৃষ্টি ছিল টুনুর মুখের উপর, ফিরাইয়া সামনে শূন্যে নিবদ্ধ করিল, কোন উত্তর নাই, তবে মন আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে। এই রকম স্তব্ধ রাত্রে, এই বিরাট পরিপূর্ণ শান্তির পিছনে যে শাশ্বত অশান্তি থাকে প্রচ্ছন্ন, মুহূর্তের মধ্যে সেটা উঠিল জাগিয়া। বালিয়াড়ি হইতে সেদিন ফেরার রাত্রিও ছিল এইরূপ, এইরূপ কেন, আরও উন্মাদ; কিন্তু সেদিন একটা কথাও বলে নাই চম্পা, তাই হয়ত সেটা ছিল নিষ্ফল। আজ বলুক, না বলুক—তোমারই জন্য আমার এই বিনিদ্র রজনীর সাধনা, তোমারই জন্য মরণ পণ ক'রে বসে আছি—এত কঠিন, এ রকম বধির তুমি হয়ে থেকো না আর…

টুলু একটু অপেক্ষা করিয়া প্রশ্ন করিল—"আমি বলব তবে ?"

"বলুন না।"

"আমায় তুমি সেদিনে বাড়ি ছাড়তে বলেছিলে, দেখলে রাজী হলাম না, এখন ভয় দেখিয়ে আমায় সরাবার চেষ্টা করছ তুমি। কি করছ তা জানি না, তবে ভয় দেখাবার যোগাড় বোধ হয় পুরোমাত্রায় করে উঠতে পার নি এখনও। কিন্তু এটা তুমি খুব জেনো কোন রকম ভয় দেখিয়েই তুমি আমায় আমার সঙ্কল্প থেকে নিরস্ত করতে পারবে না। কেন তাও বলি...'

চুপ করিল। চম্পা বলিল—"বলুন।"

"এক সময় আমার একটু মনে হয়েছিল তুমি আমার কল্যাণের জন্তেই মানা করছ আমায়—অবশ্য তবুও আমি শুনতাম না—কিন্তু এখন সন্দেহ হচ্ছে ম্যানেজার তোমায় লাগিয়েছে এই কাজে—ভেবেছে যদি কোন হাঙ্গাম না করে, অল্প-বিস্তর ভয় দেখানোর উপরই কাজ হয়ে যায় ত..."

চম্পার মুখটা বেদনায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, হাত দুইটা একত্র করিয়া চাপিয়া বলিল—"আর থাক্।...একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করি,—আপনি এখুনি আমায় স্পষ্ট করে বলতে বলছিলেন, আপনি একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে পারবেন কি ?"

"কি কথা ?"

"এই যে কথাটা বললেন—এই যে আপনার সন্দেহ, এটা কি সত্যি, না, অপবাদ দিয়ে আমায় সরাবার জন্তে এটা বললেন ?"

টুলু একটু থতমত খাইয়াই চুপ করিয়া গেল।

"বলুন না। যদি সত্যি হয় তো আমি কথা দিচ্ছি আপনি আর কখনও আমায় দেখতে পাবেন না এখানে...বা অন্ত কোথাও ?"

গলা যেন একটু সিক্ত হইয়া আসিয়াছে। টুলু আর একটু নিরুত্তর থাকিয়া বলিল—"কিন্তু তুমি ত আমায় সত্যি কথা বল নি যে আমার কাছে শোনবার আশা করছ।"

চম্পার এই দ্বিতীয় সুযোগ, আরও ভাল ভাবে আসিয়াছে, কিন্তু ঐ যে আঘাতটুকু পাইয়া একটু অশ্রু উদ্গত হইয়াছে; ঐ টুকুতেই মনের কালিমা দিয়াছে ধুইয়া। এক বারও, এক মুহূর্তের জন্তও যে মনে হইয়াছিল তাহার রাত জাগার কারণটা বলিয়া টুলুর মন ভিজাইবে—তাহাকে ব্রতচ্যুত করিবার জন্তই—এটুকুর চিন্তাতেই সে নিজের কাছেই যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। অত বড় তপস্যা, অত পবিত্র সম্পদ কি করিয়া সে বাজারের পণ্যে পরিণত করিতে যাইতেছিল ?

মনটা আরও স্বচ্ছ হইয়াছে, টুলুর থতমত খাওয়াতে বুঝিয়াছে ওটা ওর মনের কথা নয়, মিথ্যা অপবাদই। চম্পা নিজেও আর ঘুরপ্যাঁচের দিকে গেল না, টুলুর কথায় একটু নিরুত্তর থাকিয়া বলিল—"আমায় স্পষ্ট বা সত্যি কথা এই যে আমি এখানে এভাবে আসবার সত্যিকার কারণ আপনাকে কখনও বলতে পারব না।...আর সেটা এমন কিছু নয় যার জন্তে আপনার মাথা ঘামাবার হেতু আছে। শুধু দয়া করে এইটুকু বিশ্বাস করুন যে, আমি ম্যানেজারের চর নয়—অন্তত হই নি এখনও, তবে..."

হঠাৎ চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিল। টুলু প্রশ্ন করিল—"থামলে যে ?"

চম্পা মিনতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"এখান থেকে একটু আড়ালে যাই চলুন, অনেক কথা। আপনার সম্ভ্রমের খেয়াল আপনার না থাকে, আমার আছে, আমি সেটা নষ্ট হতে দিয়ে পাপের ভাগী হব কেন ?"

টুলু বলিল—"আমার বাসায় চল।"

চম্পা বিস্মিতভাবে মুখের পানে চাহিল, তাহার পর একটু কি ভাবিয়া লইয়া বলিল—"বেশ তাই চলুন।"

বাসায় আসিয়া টুলু বারান্দায় একটা চেয়ারে বসিল, চম্পা সামনের থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"বলছিলাম চর হই নি, তবে হব বলে কথা দিয়ে এসেছি আজ।"

"কার কাছে ?"

"ম্যানেজারের কাছে।"

"কি রকম ?"

চম্পা আর একবার একটু ভাবিয়া লইল, তাহার পর আজ সকালে ম্যানেজারের সঙ্গে যে যে কথা হইয়াছে—হীরকের জন্ত খোরপোষের ব্যবস্থার কথা থেকে মাষ্টারমশাইয়ের এখানে চম্পার আসিয়া থাকার নির্দেশ পর্যন্ত—সমস্ত টুলুকে বলিয়া গেল।

টুলু নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিয়া গেল; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চম্পার মুখের পানে চাহিয়া আছে। যেন তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ এক জন নূতন মানুষ তাহার দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেই সঙ্গে একটা চিন্তাধারাও চলিয়াছে টুলুর—চম্পা এসব করে কেন ?...শেষ হইলে বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হইয়াই শুনিতেছিল বলিয়া প্রশ্ন করিল—"কিন্তু ক্ষতি কি তাতে ?"

চম্পা চুপ করিয়া রহিল।

টুলু আবার বলিল—"তুমি ত আমাদের কথা পৌঁছে দিচ্ছ না ওর কাছে, বরং অন্তকে না রেখে তোমায় রেখেছে সেই ভাল।"

"আমি সেই জন্তেই ওকে জানিয়ে এসেছি যে ওর কথায় রাজী হলাম, থাকব এখানে এসে; কিন্তু ওর চালটা কি ভয়ঙ্কর তা ত বুঝতে পারছি। জেনে শুনে আপনাদের সর্বনাশ কি করে করব ?"

"সর্বনাশটা কি ?"

প্রশ্নটা করার পরই উত্তরটা, কিন্তু তাহার আপনা হইতেই

জোগাইয়া গেল, বলিল—"ও বুঝেছি ; কিন্তু এর জবাব ত তোমায় আগেই দিয়েছি—আমরা যে পথের পথিক তাতে এ সব গ্রাহ্য করলে চলে না আমাদের, আর মাষ্টারমশাই—তিনি ত দেবতার কাছাকাছি।"

"মানুষের মন কত পলকা জানেন না কি ? মাষ্টারমশাই···আপনারা দেবতাকে দেবতাই থাকবেন, কিন্তু আমাকে এখানে দেখলেই লোকের মন যাবে বদলে।···আমি সেদিন ত শুনলাম মাষ্টারমশাইয়ের চিঠিটা—যাদের মধ্যে আপনাকে কাজ করতে বলেছেন্ তিনি, তাদের অত তলিয়ে দেখবার ক্ষমতা নেই, তারা যেই দেখবে আমি বা আমার মত কেউ মাষ্টারমশাইয়ের বাড়িতে যাওয়া-আসা করছে, অমনি তাদের মন যাবে ভেঙে। আর তাদের মধ্যে কাজ করা চলবে না। এই হচ্ছে ম্যানেজার বাবুর চাল। আপনি আজ দুপুরের একটু পরে বস্তিতে গিয়েছিলেন, তাদের যে কি আহ্লাদ বলে বোঝানো যায় না, সত্যি কোন দেবতা নেমে এলেও এ রকম সাড়া পড়ে যেত না বোধ হয় ; যার সঙ্গেই দেখা হয়, যার কাছেই বসি, শুধু—"

টুনু বাধা দিয়া বলিল—"ও থাক ; তুমি সেদিন চিঠিটা শুনেছিলে—তিনটে বিষয় নিয়ে কাজ করবার কথা লিখেছিলেন—কুলিদের মধ্যে ; শিশু নিয়ে, আর—"

একটু থামিয়া যাইতে চম্পা নিজেই পূরণ করিয়া দিল—"আর আমাদের নিয়ে।"

"তোমাদের সরিয়ে রেখে তোমাদের নিয়ে কি করে কাজ হবে।···চম্পা, সেই চিঠিতেই ত দেখেছিলে মাষ্টারমশাইয়ের কত বড় আশা ?"

চম্পার মনে পড়িল—"একটা মেয়ে সুধ্‌রে গেলে একটা জাতি বেঁচে যেতে পারে।"···ওরও যে কত বড় আশা কি করিয়া জানায় ? কতকটা মনের পূর্ণতায়, কতকটা কুণ্ঠায় চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিল।

টুনুর হঠাৎ একটা কথা মনে উদয় হইল, বলিল—"কিন্তু আমি বড় আশ্চর্য হচ্ছি চম্পা, এখানে থাকবে বলে তুমি নিজে ম্যানেজারকে কথা দিয়ে এলে, এখন আবার থাকবার বিরুদ্ধেই তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করছ।"

চম্পা একটু নিরুত্তর থাকিয়া বলিল—"আমায় মাফ করবেন, আবার পুরানো কথা এনে ফেলছি, আপনি এখান থেকে যান। ম্যানেজারকে কথা দিয়ে আসবার পর অনেকটা সময় গেছে, আমি ভেবে দেখলাম আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই সবচেয়ে বেশী দরকার ; শুধু আপনার কেন, আপনার আর মাষ্টারমশাইয়ের—দু'জনেরই। কাজের জীবন আপনাদের, কাজ আপনারা যেখানে যাবেন সেখানেই করবেন। অনেক ভেবে দেখলাম ম্যানেজারকে কথা দিয়ে এলেও আমার এখানে আসা চলবে না, অথচ আপনারা যদি থাকেনই ত আমার না এসে উপায় নেই।"

যে পাহারা দিবার কথাটা গোপন করিতে চাহিতেছিল সেটা প্রকাশ করিয়া ফেলিবার মুখে আসিয়া চম্পা চুপ করিয়া গেল। টুনু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"কেন ?—না এসে উপায় নেই ?"

চম্পা ততক্ষণে আবার সামলাইয়া লইয়াছে, বলিল—"ঐ যে, ম্যানেজারকে কথা দিয়েছি।"

কিছু যে একটা গোপন করিয়া ফেলিল টুনু সেটা বুঝিতে পারিল, একটু মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চম্পা তাড়াতাড়ি অন্য কথা আনিয়া ফেলিল—সেই পুরানো কথাই, বলিল—"না, আপনারা যান এখান থেকে, সত্যি অনেক বিপদ।"

টুনু একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল—"আবার ভূতের ভয় দেখাচ্ছ—"

চম্পা ব্যাকুল ভাবে বলিল—"ভয় নয় সত্যি।"

"কি রকম ?"

"আপনার পেছনে লোক লেগেছে। আপনাকে আমি এখনও সব কথা বলি নি, ভেবেছিলাম বলবার দরকার হবে না। দুপুরে যে লোকটা দাদুর কাছে আসে সে ম্যানেজারের চর, চর বললে ঠিক বোঝায় না, চরের কাজ খবর নেওয়া, ওর উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য রকম।"

"খুন জখম ?"

"আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

"কি করে জানলে ?"

"ওকে আমি দেখেছি এই পথ দিয়ে গভীর রাত্তিরে যেতে। দু'জন থাকে। তিন দিন দেখেছি।"

"একটা লোক এই পথ দিয়ে যায় বলে ত এটা প্রমাণ হয় না সে খুন করবার মতলবেই ঘুরে বেড়ায়।"

"কিন্তু ঠিক সেই লোকটাই দিনের বেলা নিত্যি দাদুর কাছে এসে কেন অত খোঁজখবর নেবে ?"

"হয় ত—"

বলার উদ্দেশ্য ছিল হয় ত লোকটা সত্যই চম্পার বিবাহের কথার জন্যই আসে, কিন্তু বলা ঠিক হইবে কিনা বুঝিতে না পারিয়া একটু চোখ তুলিয়া চাহিতেই দৃষ্টি স্থির হইয়া গেল।

শোবার ঘরের দোরটা খোলা ; দেখিল বিছানার মাথার কাছে রাস্তার দিকে যে জানালাটা তাহার দুইটা গরাদ ধরিয়া একটা লোক মাথা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঘরের ভিতরটা দেখিতেছে। বেশ সবল চেহারা, চুলগুলা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া।

"কি দেখছেন ?"—বলিয়া চম্পা টুনুর দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া চাহিতেই লোকটা একবার মুখ তুলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নামাইয়া লইল।

"কে ?"—বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া টুনু অগ্রসর হইতেই চম্পা গেঞ্জির পিছেটা টানিয়া ধরিল, বলিল—"যাবেন না, সেই লোকটা।"

—ভয়ে এক মুহূর্তেই তাহার চেহারা অন্ত রকম হইয়া গেছে।

আটকা পড়িয়া টুলু একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিছু না পাইয়া চেয়ারের নড়বড়ে হাতলটা ভাঙিয়া লইয়া গেঞ্জিটাতে একটা টান দিয়া বাহির হইয়া গেল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, চম্পা আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। হাঁপাইতেছে, তাহারই মধ্যে চাপা স্বরে বলিল—"সেই লোকটা; আজ স্কুলে কাউকে না দেখে..."

টুলু প্রশ্ন করিল—"কেন স্কুলে ওরা কেউ নেই? এই বললে..."

চম্পা হকচকিয়া গেল, বলিল—"না...সে কথা নয়... মানে...চলুন আপনি, ওদের তুলিগে।"

টুলু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চম্পার মুখের পানে চাহিয়া ওর এই অসংলগ্ন কথাগুলা শুনিতেছিল; একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল—"না, তুলে কাজ নেই, অযথা একটা গোলমাল হয়ে ওদের মুখ দিয়ে খনি, বস্তি—সারা গঞ্জভিহিতে ছড়িয়ে পড়বে কথাটা। এই পর্যন্তই থাক না, ও আর আসবে না। চল, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

চম্পা কতকটা তিরস্কারের স্বরেই বলিল "পৌঁছে দিয়ে আপনি ফিরে আসবেন এখানে?—তার মানে?"

"বেশ, তবে ভেতরেই এস; তোমার সঙ্গে কথাগুলো এখনও শেষ হয় নি।"

"ঐ একটা ভাঙা চেয়ারের হাতলের ওপর ভরসা করে?"

টুলু একটু হাসিয়া বলিল—"তুমি এসই না, আমি নিজে ত ভাঙা নয়। তা ভিন্ন আছে অস্ত্র ঘরে, তাড়াতাড়িতে খেয়াল হয় নি।"

আবার সেই ভাবে দুইজনে বসিয়া ও দাঁড়াইয়া রহিল। কথা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল না। টুলুর মুখটা বড় কঠিন, একটা বাধা পাইয়া ভিতরের প্রতিজ্ঞা যেন কঠোর হইয়া উঠিয়াছে, যেন কোন কঠোর উত্তর আশঙ্কা করিয়াই চম্পা আর কিছু বলিতে সাহস করিতেছে না।

দুই জনের মধ্য দিয়া স্তব্ধ রাত্রি গড়াইয়া চলিয়াছে। এক সময় যখন শেষ রাত্রের বন্ধ্যায় জ্যোৎস্নাটুকু ম্লান হইয়া আসিয়াছে, চম্পা বলিল—"এবার আমায় যেতে হবে; একটা কথা জিগ্যেস করি, এর পরেও আপনি থাকবেন এখানে?"

"না থাকার কথা কোথা থেকে আসে?"

"আজ রাত্রে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন আপনি।"

টুলুর দৃষ্টিটা স্নিগ্ধ হইয়া আসিল, বলিল—"কি হারাতে বসেছিলাম সেইটেই দেখছ চম্পা, কি পেলাম আজ রাত্রে সেটা ত তোমার চোখে পড়ছে না।...থাকবার লোভও ঢের বেড়ে গেছে আমার। তবে হ্যাঁ, প্রাণটাকে আগলে রাখতে হবে বৈকি। তার উপায়ই ভাবছিলাম এতক্ষণ।"

"কি?"

"সকালে আর একবার ম্যানেজারের কাছে যেও, ব'লো তুমি হীরুককে ত ছেড়ে থাকতে পারবে না, তিনি যেন পেল্লাদ আর পেল্লাদের স্ত্রীকেও এখানে এসে থাকতে হুকুম দেন। ব'লো আমার রাজী করিয়েছ, আমাদের যে চাকরের ঘরটা আছে তাইতে এসে থাকবে।"

"তাতে কি হবে?"

"তাতে অনেক কিছুই হবে, ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, পরে দেখতেও পাবে। আপাততঃ এই হবে যে তোমায় সারারাত স্কুলের দরজায় বসে পাহারা দিতে হবে না, হীরুক আর প্রহ্লাদের ছেলে গলাবাজি করে সে কাজটা বেশ ভাল ভাবেই করে যেতে পারবে।"

টুলুর স্নিগ্ধ ঈষৎ-হসিত দৃষ্টির উপর নিরতিশয় বিস্ময়ের দৃষ্টি ফেলিয়া চম্পা প্রশ্ন করিল—"আমি বসে বসে পাহারা দিই?—বাঃ কে বললে?"

"তোমার সঙ্গে এত কথা হবার পরেও সেটা অন্তের কাছে জানতে হবে চম্পা?...যাও এবার ভোর হয়ে এসেছে।"

২২

টুলু এবং চম্পার নজর পড়িতে যে লোকটি জানালার নিচে অদৃশ্য হইয়া গেল তাহার নাম নিবারণ। এই লোকটিকেই চম্পা গভীর রাত্রে বারচারেক বালিয়াড়ির পথে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল এবং এ-ই প্রতিদিন দুপুরে আসিয়া বনমালীর কাছে তাহার বিবাহের ঘটকালি করিতেছিল। নিবারণের সঙ্গে ম্যানেজার রতিকান্তের পরিচয় এবং সম্বন্ধের ইতিহাস একটু নূতন ধরণের:

কলিকাতায় এক দিন সন্ধ্যায় ট্রাম হইতে নামিয়া বাসায় আসিবার সময় রতিকান্ত টের পাইলেন সোনার চেনে গাঁথা ভাগাটা অন্তর্হিত হইয়াছে। গরমের জন্ত পাঞ্জাবীর হাতাটা কনুই পর্যন্ত লুটানো ছিল, এই সুযোগেই কে হাতসাফাই করিয়াছে। ট্রাম থেকে বাড়িটা অল্প দূরেই, গেট ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবেন, একটি লোক খুব সম্ভ্রমের সহিত নুইয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"হুজুরের সঙ্গে একটু প্রয়োজন আছে।"

রতিকান্ত প্রশ্ন করিলেন, "কি প্রয়োজন?"

লোকটা এক নজরে এক বার চারি দিকটা দেখিয়া লইয়া বলিল—"একটু নিরিবিলি না হলে হবে না।" রাস্তাটা একটু গিয়াই একটা পড়ো জমিতে পড়িয়াছে, নিজেই বলিল—"ঐখানটা মন্দ হবে না।"

রতিকান্তের একটু কি রকম মনে হইল বটে, রাত হইয়াছে, তায় পাড়াটা একটু নির্জন, তবু অগ্রসর হইলেন। সামনাসামনি হইয়া দাঁড়াইলে লোকটা কামিজটা তুলিয়া কতুয়ার পকেট হইতে চেনসুদ্ধ ভাগাটা বাহির করিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"হুজুরেরই মাল, চিনে নেন।"

চেনটা একজায়গায় শুধু কাটা; হাতে লইয়া রতিকান্ত অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তুমি কোথায় পেলে?"

লোকটা একটু দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—"হুজুরের শরীল থেকে।"

"তুমিই সরিয়েছ?—নিজে তুমি?"

"হুজুর আর লজ্জা দেবেন না, এমন আর কি বাহাদুরির কাজ?"

রতিকান্তের আর কথা জোগাইল না খানিকক্ষণ, চুপ করিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—"আবার ফিরিয়ে দিলে যে?"

"হুজুরের কাছে যদি কোন চাকরি পাই···"

"কি চাকরি?"

"অধীন কি দরের লোক একটা নমুনো দিলাম হুজুরকে, ভরসা পাই ত কাল সার্টিফিকিট হাজির করতে পারি, দেখে ব্যবস্থা করবেন।"

"সার্টিফিকেট!···বিস্ময়ের উপর আর এক চোট বিস্মিত হইয়া রতিকান্ত একটু মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"কিন্তু আমি ত গাঁটকাটার সর্দার নয়।"

লোকটা জিভ কাটল, তাহার পর ঝুঁকিয়া ডান হাতটা রতিকান্তের পায়ের কাছাকাছি লইয়া গিয়া আবার নিজের মাথায় ঠেকাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, বলিল—"অমন কথা শুনলেও পাপ হুজুর; হুজুরদের কলকেত্তায়, খাইয়ে কলাও কারখানা, অনেক রকম ভাল-মন্দ লোকের প্রয়োজন, তাই দ্বারস্থ হয়েছে গোলাম একখানি নোমুনো দেখিয়ে। এর চেয়ে বড় কাজেও গোলামের কারিগুরি আছে—সার্টিফিকিট দেখলেই বুঝতে পারবেন হুজুর।"

রতিকান্ত আর একটু চুপ থাকিয়া বলিলেন—"বেশ এনো তোমার সার্টিফিকেট।"

"কাল এই সময়, এইখানে।"

"বেশ, এস।"

গেট পর্যন্ত আসিল লোকটা, তাহার পর বিদায় লইয়া খানিকটা আগাইয়া গেলে, রতিকান্ত আবার গেটের বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, কাছে আসিলে বলিলেন—"বেশ পরিষ্কার ভাবে সরিয়ে আবার দিয়ে তো গেলে, তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিতে তো পারতাম···অন্তত কাল ত তার ব্যবস্থা করতে পারি।"

লোকটা মুখের পানে চাহিয়া এবার একটু নূতন ধরণের হাসি হাসিল, বলিল—"সে লোক নয় আপনি হুজুর,—এটুকু না বুঝলে আমাদের ব্যবসা চলে কি করে?" তাহার পর আবার অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

পর দিন যথাসময়ে রতিকান্তের হাতে সার্টিফিকেটটা পৌঁছিল। প্রায় ছয় ইঞ্চি × ছয় ইঞ্চি একখানি পার্চমেন্টের কাগজ, বাঁ দিকে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ছাপা সার্টিফিকেটের গৎ, ডান দিকে হাতে লেখা। রতিকান্ত বিস্মিত নয়নে পড়িয়া গেলেন:

নাম—নিবারণ পালধি
বয়স—চল্লিশ
ওজন—এক মণ সাতাশ সের
ছাতি···চল্লিশ ইঞ্চি
হাত সাফাইয়ের দাম
হাল তারিখ তক—আড়াই হাজার
খুন হাল তারিখ তক—তিন
বিশেষ—কানের পিছনে চোখ।

সর্দার কালুরাম
পিসিডেন্ট

সার্টিফিকেটের মাঝখানে যথারীতি একটা বাদামি ষ্ট্যাম্প মারা, উপরে লেখা 'সর্দার কালুরামের আখড়া', নিচে লেখা 'হাড়কাটা লেন গলি'; মাঝখানটায় সেই দিনের তারিখ বসানো।

এরকম অদ্ভুত ব্যাপার রতিকান্তের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম, তিন-চার বার কাগজটা পড়িয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে নিবারণ খুব ঘটা করিয়া সেলাম করিয়া একটু দন্ত বিকশিত করিল। রতিকান্ত প্রশ্ন করিলেন—"তা হলে তোমার নাম নিবারণ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।"

"হাড়কাটার গলিতে তোমাদের আখড়া?"

নিবারণ একটু হাসিয়া বলিল—"তা হলে কি সার্টিফিকিটতে লেখা থাকত হুজুর? অত কাঁচা কাজ কেউ করে? দিব্যি গালভরা পছন্দসই নাম তাই সর্দারজী ইষ্টাম্পোরে বসিয়ে দিয়েছেন, যে রকম আপিস-পাড়া হ'ল ড্যালহৌসি স্কোয়ার সেই রকম,—গলির নামটাতে সার্টিফিকিটর মর্যাদা বাড়ল, এই আর কি!"

"আর কালুরাম?"

নিবারণ আবার জিভ কামড়াইয়া বলিল—"তিনি জলজ্যান্ত মহাপুরুষ। অধীনের ওপর নেকনজর হলে কোন-না-কোন সময় সাক্ষাৎ হবে।"

"কি চাকরি চাও?"

"বাঁধা চাকরি নয় হুজুর, বুঝতেই ত পারেন। সার্টিফিকিট দেখা রইল, যেমন যেমন গোলামের দরকার পড়বে বলবেন, গোলাম থেদমতে হাজির হবে; এই আর কি।···কাজ দেখে বকশিশ, তার পর কৃপা হয় কিছু বাঁধা খোরাকীর হুকুম করে দেবেন, হুজুরদের ভরসাতেই তো বেঁচে থাকা?"

সমস্ত ব্যাপারটা কৌতুকে-গাম্ভীর্যে মেশানো, শেষের কথাটিতে বিশেষ করিয়া একটু কৌতুক বোধ হওয়ায় রতিকান্ত একটু মুখ তুলিয়া চাহিয়া হাসিলেন। তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—"কিন্তু তোমার ঠিকানা? পাব কোথায় তোমায়!"

"এবার সুযোগ করে মিস্ত্রিই হাজির দেব হুজুর। কৃপা একটু কায়েমী হয়ে গেলেই ঠিকানা নোট করিয়ে দেবে গোলাম। দু'জন দু'জনকে ভালো রকম না চেনা পর্যন্ত—বুঝতেই পারেন হুজুর..."

হাসিল একটু।

গেট পর্যন্ত সঙ্গে আসিয়া বিদায় লইবার সময় বলিল—"আজ থেকে হুজুরের সব মাল সর্দারজীর হেফাজতে জানবেন, রাস্তায় পড়ে থাকলেও কারুর খুঁটে নেবার বুকের পাটা নেই কলকেতা শহরে।...গোটা-পাঁচেক ট্যাকা হুজুর, নোতুন চাকরির ভেট দিতে হবে সর্দারজীকে। কপাল-জোরে লম্বর এক কেলাসের চাকরি হ'ল কিনা, পাঁচ টাকা।"

পকেটেই ছিল, একটা পাঁচ টাকার নোট রতিকান্ত নিবারণের হাতে দিলেন।

আজও নিবারণ খানিকটা গেলে রতিকান্ত গেটের বাহিরে আসিয়া আবার ডাকিলেন, ফিরিয়া আসিলে বলিলেন—"একটা কথা নিবারণ, সার্টিফিকেটে তোমার বিশেষ গুণের মধ্যে লেখা আছে—কানের পেছনে চোখ, ব্যাপারটা বুঝলাম না ত।"

নিবারণ আবার একটু দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল, তাহাতে তাহার ভাঁটার মত চোখ দুইটা আরও যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল, বলিল—"হুজুর এখানে দাঁড়ান।"

নিজে আট-দশ হাত তফাতে চলিয়া গেল, তাহার পর বলিল—"এই বার যটা খুশি আঙুল তুলুন হুজুর।"

রতিকান্ত বুড়া আঙুল আর কড়ে আঙুল গুটাইয়া লইয়া ডান হাতটা একটু তুলিলেন। নিবারণের মুখ উল্টা দিকেই, ঘাড়টা একেবারেই সিধা, টের পাওয়া যায় না যে কোন দিকে একটুও ঘোরানো, বলিল—"হুজুর তিনটে আঙুল তুলে রয়েছেন।"

তাহার পর ফিরিয়া কাছে আসিয়া সেই ভাবে হাসিয়া বলিল—"ভগবান এইটুকু খ্যামতা কালতু দিয়েছেন হুজুর, জানেন লোকটাকে করে খেতে হবে ত। মানে পিছনকার জিনিস ঘুরে দেখতে হয় না, তবে ঐ হাত-কয়েক তফাৎ চাই।"

এর পূর্বে কাজ লইয়া নিবারণের কয়েকবার গঙ্গডিহিতে আসা হইয়া গেছে। দু-একটা ছোটখাটো কাজ ছাড়া সার্টিফিকেটে আরও দুইটি খুন জমা হইয়াছে। পরিষ্কার হাত, গতিবিধি খুব প্রচ্ছন্ন। কানের পিছনে চোখ আছে বলিয়া বেশ নির্লিপ্ত ভাব বজায় রাখিয়া অনেক খবর রাখিতে পারে। এই ক্ষমতার জন্যই স্কুলের গেট পার হইয়া প্রথম দিনই টের পাইল স্কুলের গেটে চম্পা। চম্পার একটু সন্দেহেরও অবকাশ হইতে দিল না যে সে ধরা পড়িয়া গেছে।...এর পর স্বতন্ত্র সাজিয়া তাক খুঁজিতে লাগিল, অবশ্য বুদ্ধিটা কতকটা ম্যানেজার রতিকান্তের।

ম্যানেজারের সঙ্গে নিবারণ দেখা করে গভীর রাত্রে, তার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

সকালে চম্পার সঙ্গে ম্যানেজারের সে ব্যবস্থা ঠিক হইল। তাহার পর নিবারণের এ যাত্রায় গঙ্গডিহিতে কাজ স্থগিত রহিল। কথাটা কিন্তু নিবারণকে বলা হয় নাই। যেখানে তাহার থাকার ব্যবস্থা সেখানে কয়েকবার লোক পাঠাইয়াছিলেন ডাকিয়া আনিবার জন্য, দেখা পায় নাই। ম্যানেজার একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় রাত যখন প্রায় আড়াইটা, নিবারণ আসিয়া উপস্থিত হইল, সেলাম করিয়া বলিল—"আজও হ'ল না হুজুর, তবে একটা বড় জবর সংবাদ আছে।"

ম্যানেজার প্রশ্ন করিলেন—"কি!"

"আজ যুগল মূর্তি দেখলাম, ছুঁড়িটা ওরই বাসায়।"

ম্যানেজার এই সময় গোলাপী নেশায় থাকেন, একটু যেন চকিত হইয়াই সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন—"তাই নাকি!" গাম্ভীর্যের মধ্যে ভিতরের আনন্দটা একটু ফুটিয়া বাহির হইল।

নিবারণ বলিল—"এতে সুবিধে এই হ'ল হুজুর যে দুটোকে একসঙ্গে পাচার করে দিলে কারুর আর সন্দেহ করবার থাকবে না কিছুই—আপনি সব রটে যাবে দুটোতে ভেগেচে। এখন হুজুরের হুকুমের যা দেরি, তবে আর একজন লোক চাই। একটু খলিফা গোছের।"

ম্যানেজারের আনন্দের কারণ প্ল্যানটা এত দ্রুত সফল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া; চম্পা যে এত ত্বরায় কাজে নামিয়া যাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গেই এতটা সফল হইবে আশা করিতে পারেন নাই। শুধু যে আনন্দিত হইলেন তাহাই না, বেশ খানিকটা স্বস্তিও বোধ হইল, কেননা কতকটা প্রয়োজনে এবং কতকটা আক্রোশের বশে টুলুর পিছনে নিবারণকে লাগাইলেও এটা বুঝিতে পারিতেছিলেন যে অন্য খুনে আর এ খুনে তফাৎ অনেক। টুলু ব্যানার্জি কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর ভাই-পো, তাহার এটাও জানা যে, ম্যানেজার টুলুর উপর চটা—কিছু একটা ঘটিলে তাঁহার উপরই সন্দেহ হইবে। আরও টের পাইয়াছেন টুলুর পিতা রাজসাহীর বেশ বড় উকিল এক জন। খনি নিষ্কণ্টক করিতে বোধ হয় অন্য কোন উপায় ছিল না, কিন্তু ব্যাপারটা বেশ গুরুতরই হইবার সম্ভাবনা ছিল। এখন এ বেশ হইল, চরিত্রের গলদ লইয়া ওসব বড় কাজ চলিবে না টুলুর, আমলই পাইবে না কাহারও কাছে; এদিকে মাষ্টার-মশাই আসিলে তাঁহাকেও জড়াইয়া স্কুলের সুনামের জন্য তাঁহাকে সুদ্ধ সরাইয়া পথ পরিষ্কার করা সহজ হইবে; চিঠি ত রহিলই।...ব্যাপারটি বড় মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে

গোলাপী নেশার সঙ্গে বেশ মিলাইয়া মিলাইয়া উপভোগ করিলেন নিজের চালের এই সফলতাটুকু, তাহার পর নিবারণকে বলিলেন—"এটা আপাতত তোলা রইল নিবারণ, তোমাকে একটু অন্ত কাজে যেতে হবে…"

নিবারণ একটু বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল—"তোলা রইল কি হুজুর!—এমন একটা দাঁও আপনি হ'তে পথ বেয়ে এল!…"

বেশ বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়াই করিল প্রশ্নটা—একেবারে ডবল বকশিশের আশায় ছাই পড়ে…

ম্যানেজার সব কথা ভাঙিলেন না, বলিলেন—মেয়েটা এসেই গোল বাধালো যে, বড় ব্যাদ্, ওকে আমার হাতে রাখতে হবে নিবারণ, আপাততঃ কিছুদিন।

অবশ্য তা বলে তোমার বকশিশের জন্তে ভাবনা নেই; বরং ফিরে যাবার আগে আর একটু কাজ করে যাও, কাংরাস পডের দিকে ষ্ট্রাইকের গোলমাল হব হব করছে, কে করছে; কিভাবে করছে দেখে আসতে হবে, স্কুলের হেড মাষ্টারকে ত তুমি দেখেছ। সেই লোকটাই কিনা একটু জানা বিশেষ দরকার। যত শীগগির পার ফিরে আসবে কিন্তু, আমায় একটু বাইরে বেরুতে হবে।

২৩

পরদিন সকালে চম্পা আসিয়া, প্রহ্লাদ আর প্রহ্লাদের বৌয়ের স্কুলে আসিয়া থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল, আবদার করিয়া বলিল, সে হীরককে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না।

ম্যানেজারের মনটা খুব ভাল ছিল, হুকুমটা সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া গেল। রহস্ত করিয়া বলিলেন—"তুই যাকে যাকে ছেড়ে থাকতে পারবি নি সব এক জায়গায় করে দিচ্ছি চম্পা।"

চম্পা একটু রাগের ভান করিয়া বলিল—"ঐ হীরাকে নিয়েই যার সঙ্গে অমন আড়াআড়িটা হয়ে গেল জোর করে তো তার সঙ্গেই এক রকম এক হাতের নীচে থাকতে হচ্ছে… কি যে আপনাদের উব্‌গার হবে জানি না—তার ওপর ঠাট্টা করে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিন্…"

নিবারণের কাছে, 'আড়াআড়ি' যে কত দূর সে-খবর পাওয়ার পর অভিনয়টা বেশ উপভোগই করিলেন ম্যানেজার, শুধু একটু হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন—"নে, তোর হীরার ব্যবস্থাও করে দিই।"

সামান্ত একটু থামিয়া অন্ত দিনের চেয়ে একটু বেশী প্রশ্রয় দিয়াই বলিলেন—"ঘরের ভেতর থেকে আমার অফিস লেটারের প্যাডটা নিয়ে আয়; চিনতে পারবি তো? আর কাউন্টেন পেনটা।"

চম্পা আনিয়া দিলে একটু হাসিয়া বলিলেন—"না চিনলে চলবে কোথা থেকে? তোকে যে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি করছি।"

চম্পা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ঠাট্টা রেখে কাজ করুন এখন।"

"তাও ভাবি আবার,—তুই হুকুম করবার মানুষ, তাঁবে থাকবি কি করে।"

লিখিতে লিখিতে কথাটা বলিয়া এক জায়গায় একটু দাঁড়াইয়া অল্প একটু ভাবিলেন, তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—"টাকাটা কি লিখি বল্ দিকিন?"

চম্পা আবার রাগ করিয়া বলিল—"কিছু না বললেও তো বদনাম দিচ্ছেন যে হুকুম করছি…"

"তবু বল্‌ই না।"

"আপনাদের তো হাত ঝাড়লে পাহাড়—গোটা দশ টাকা দিন না অন্তত।"

"অফিস ষ্ট্যাম্প আর কপির প্যাডটা নিয়ে আয়, পাকা ব্যবস্থাই করে দিই তোর ছেলের।"

আনিলে হুকুমনামাটা শেষ করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—"দেখ্, সারেবি স্কুলে দু'বছর পড়েছিলি তো, কিছু কিছু বুঝবি। নে, এবার ষ্ট্যাম্পটা বসিয়ে দে।"

আর কিছু না বুঝুক, সংখ্যাটা দেখিয়াই বলিল চম্পা—পনের টাকা! একটু যেন অন্তমনস্ক হইয়া গেল, তখনই সে ভাবটা চাপিয়া অল্প হাসিয়া বলিল—"আপনার দয়া।"

ম্যানেজার চেয়ারে গা ঢালিয়া দিয়া স্থিরভাবে সিগারেটে কয়েকটা টান দিলেন, তাহার পর বলিলেন—"চম্পা, তোকে একটা বড় কাজ দিয়েছি, তার মর্ম্মও তুই বুঝিস, আর ভালো ভাবে আরম্ভও করেছিস। এখন তোকে ভেতরের কথা একটু বলার মতো সাহস পাচ্ছি।"

চম্পা বলিল—"বলুন।"

"খনিতে একটা বিপদ আসছে, বাইরে বাইরে এসে পড়েছে, এখানেও আসবে, আর সেটার বাহন যে মাষ্টারমশাই আর এই ছেলেটা সেটা নিশ্চয় তুইও বুঝতে পেরেছিস।"

চুপ করিলেন, চম্পাও চুপ করিয়া আছে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কথা ক'স্ না যে?"

চম্পা একটু হাসিয়া বলিল—"আমরা অত বুঝি?…তবে, দু'জনকেই একটু কিরকম কিরকম মনে হয় বটে।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তরটা শুনিয়া বলিলেন—"এবার নিজের ঘরের কথা তোকে বলি একটু, আমায় দিন কতকের জন্ত বাইরে যেতে হবে—আপাততঃ দিন দশেকের জন্তে যাচ্ছি, বোধ হয় আরও কিছুদিন হয়ে যাবে। অনেকদিন থেকেই ভাবছি বেরুব, কিন্তু উৎপাত ঘটাতে পারে বলে বেরুই নি; এখন তুই এ কাজটুকু হাতে তুলে নিলে ভাবছি বেরুব।"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"মানে, তুই-ই ম্যানেজার হয়ে রইলি আর কি।"

চম্পাও একটু হাসিয়া বলিল—"গরীবকে বাড়াচ্ছেন তো অনেকখানি, কিন্তু কি চাল দিয়ে ওরা কি কাজ করে সে কি আর আমি বুঝতে পারব ?"

"তোকে কিছু বুঝতে হবে না, কিছু করতে হবে না, তুই শুধু আগলে থাকবি, সেখানে তো তোর চাল পাকাই, মানে, যাকে বলে অব্যর্থ ?"

সিগারেটটা নিভিয়া যাওয়ায় ধরাইতে ধরাইতে কথাটা বলিলেন ম্যানেজার, তাই দেখিতে পাইলেন না চম্পার মুখটা হঠাৎ গম্ভীর আর আরক্তিম হইয়া উঠিল ; মুখটা ঘুরাইয়া লইলও একটু।

এর পরে বাজে কথা বলিয়াই আটকাইয়া রাখিলেন অনেকক্ষণ, লঘু রহস্য, কষ্টিনাষ্টি—এই সব ; অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি আস্কারা দিয়া। চম্পা যোগ দিয়াও গেল, তবে ম্যানেজারের যেন মনে হইল কোথায় কিসের একটা অভাব ঘটিয়াছে, আর এটা স্পষ্ট অনুভব করিলেন রহস্যের মধ্যেও কথায় মোড় ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শালীনতার একটা সীমা বজায় রাখিয়া গেল, তাহার বেশি আগাইতে দিবে না তাঁহাকে ; অবশ্য খুব স্বচ্ছতার সঙ্গে। বেশ একটু নূতন ঠেকিল। চলিয়া গেলে নিজের মনেই বলিলেন—"মেয়েটা সত্যিই মজল নাকি ?"

অনেকক্ষণই একদৃষ্টে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। একটা মিশ্র চিন্তার স্রোত মনে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে কি একটা বেদনারও রেশ আছে···অথচ তিনি তো চানই যে, চম্পা খুব অন্তরঙ্গ হইয়া গিয়া টুলুকে নীচে টানিয়া আনুক।

চিন্তাটাকে অন্য দিকে ফিরাইয়া লইলেন, কাজের দিকে। যদি তাই হয়, অর্থাৎ এর মধ্যে যদি হৃদয়ের ব্যাপার আসিয়া গিয়া থাকে তো চম্পার হাতে এমন গুরুতর ব্যাপারটা ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া বসা চলিবে কি ?···আবার একটা নূতন সিগারেট পুড়িল, তাহার পরে একটা কথা মনে হইল—যাইবার আগে ব্যাপারটা বোধ হয় একটু জানাজানি করিয়া দিলে মন্দ হয় না—এই যে চম্পার মত একটা যুবতী, কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ টুলুর সান্নিধ্যকামী হইয়া পড়িল।···কিন্তু কি করিয়া করা যায় ?

ভাবিতে ভাবিতে উপায়ও ঠাহর হইয়া গেল। বেশ স্বচ্ছ অথচ ভদ্র উপায়—অতি সহজেই গঞ্জডিহির ভদ্রসমাজের নজর টুলুর উপর নিবদ্ধ হইয়া পড়িবে, আপাততঃ টুলুর উপর, এর পর মাষ্টারমশাইয়ের উপরও। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আপাততঃ অনেকটা কাজ হইবে, তাহার পর শেষ পর্যন্ত মাষ্টারমশাইকে সরাইতেও গোলমাল হইবে না।

ম্যানেজার পরের দিন বৈকালে স্কুল কমিটির মিটিং ডাকিলেন। ছোট জায়গায় স্কুলে মুখ দেখাদেখি করিতে করিতে মেম্বার হইয়া পড়ে অনেক, অর্থাৎ বিশিষ্ট কেহই বাদ পড়ে না। মিটিংএ সবাই আসিতে না পারিলেও, জন বারো লোক হইল—ইউনিয়াম বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, বাজারের কয়েক-জন বিশিষ্ট আড়তদার, গঞ্জডিহির বাহিরেই একটি জমিদারি কুঠি আছে, তাহার নায়েব আরও সব। ম্যানেজার ছাড়া খনির তরফ থেকে আছেন পরেশবাবু। সবাই যে ম্যানেজারের সপক্ষে এমন নয়, ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসী লোক, আর সবার মতো সব কথাতেই সায় দিয়া যায় না। আরও দু-এক জন আছে এই রকম, খদ্দর পরে, মাঝে মাঝে বেসুরা গায়। তবে ম্যানেজারের প্রতিপত্তি খুব বেশী, তাঁহার প্রভাবটাই বেশী খাটে।

মিটিংএর কাজ বেশ খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ বনমালীর বাসায় শিশুকণ্ঠের আওয়াজ উঠিল। প্রহ্লাদের বৌ তাহার আগের দিনই আসিয়া গেছে, হীরক বোধ হয় ঘুমাইতেছিল, উঠিয়া ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। মেম্বারদের অনেকেই বিস্মিত ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল, দু-এক জন প্রশ্ন করিল—"কচি ছেলের গলা যে হঠাৎ ?"

ম্যানেজার একটা সুযোগ খুঁজিতেই ছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন—"ও ! সেই যে আমাদের খনির সেই ছেলেটা, সেই মেয়েটা যেটাকে adopt করেছে।"

পরেশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি নাম মেয়েটার পরেশবাবু ?"

পরেশবাবুও নাম জানেন না মোটেই, বলিলেন—"ও, চরণদাসের মেয়েটা ?"

এ সব মিটিংএ কাজের চেয়ে অকাজের কথাই বেশী চলে, তাহারই সন্ধান পাইয়া একজন বলিল—"তা এখানে এসে জুটল যে ?···মেয়েটার তেমন সুনাম নেই গঞ্জডিহিতে তাই জিগ্যেস করছি।"

অপর একজন বলিল—"মেয়েটা শুনেছি স্কুলের চাকরটার মাতনি। তাই বোধ হয়···"

ম্যানেজার একটা প্রস্তাব লিখিতেছিলেন, একটু ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন—"তাই কি ঠিক ?···পরেশবাবু বলুন না, আপনি ত ব্যাপারটা জানেন ?"

তাহার পর নিজেই কলমটা রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"আসলে ছেলেটিকে নেয় প্রথমে অন্য এক জন, মাষ্টারমশাইয়ের বাসাতেই থাকে, আমায় ত তাঁর আত্মীয় বলেই পরিচয় দিয়েছিল। সেই বোধ হয় কোন একটা বন্দোবস্ত করেছে।"

খদ্দরধারী একজন যুবক একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিতেছিল, বলিল—"সে ছোকরা ব্যানার্জি কোম্পানির অনুপমবাবুর ভাইপো। মাষ্টারমশাই-ই আমায় বলেন।"

ম্যানেজার বলিলেন—"ও ! তা হবে ; আমায় বললে মাষ্টারমশাইয়েরই আত্মীয়।"

এক জন প্রশ্ন করিল—"তা এ রকম লুকোচুরি খেলবার মানে ?"

ম্যানেজার আবার কলম তুলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন—"অত মানে খুঁজে ফেরবার ফুরসত নেই আমার।" লেখার মাঝে একবার একটু কলম থামাইয়া বলিলেন—"মানে নিশ্চয় আধ্যাত্মিক নয়।"

ঐটেই আজকের মিটিঙে শেষ প্রস্তাব ছিল, লিখিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"এই হ'ল, আপনারা শুনুন সবাই।"

কাজ শেষ হওয়ার পরও কাগজপত্র গোছানোর মধ্যে গল্পের জেরটা চলিল একটু। খুব ভাল—বিশেষ করিয়া চরিত্রের দিক দিয়া খুব ভাল, এমন লোক আবার অনেকের চক্ষুশূল। একজন বলিল—"তা কতদিনকার ব্যাপার এটা? আমরা ত জানতাম যে মাষ্টারমশাই···"

খদ্দরধারী যুবাটি বেশ একটু জানাইয়া বাধা দিল, বলিল—"তিনি দেবতা।"

ম্যানেজার এমন সুযোগটা হাতছাড়া করিলেন না। কাজ হইয়া গেছে, চেয়ার ঠেলিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন—"আমি ত সেইজন্যেই ও নিয়ে মাথা ঘামাই নি। তাঁকে দেব-চরিত্র বলেই জানি, তিনি এসেই একটা ব্যবস্থা করবেন···মানে সরিয়ে-টরিয়ে দেবেন এদের।"

সামান্য একটু বিরতি দিয়া বলিলেন—"কিন্তু তা যদি না করেন···"

নায়েববাবু প্রভৃতির মুখের উপর একবার দৃষ্টিটা বুলাইয়া আনিয়া বলিলেন—"চলুন, সে পরের কথা পরে হবে।—আমি আবার কয়েক দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। একবার কম্পাউণ্ডটা ঘুরে আসি চলুন, সেকেণ্ড মাষ্টার মশাই বলছিলেন—মাষ্টারমশাইয়ের বাসার বাইরের দেয়াল খানিকটা ভেঙে গেছে—"

উদ্দেশ্য ছিল টুলুর চেহারাও এক বার সবাইকে দেখাইয়া দেওয়া, একটু বোধ হয় আশা ছিল চম্পাকেও ঐখানেই পাওয়া যাইতে পারে। চম্পা ছিল না, আসে নাই যদি হইতে। টুলু ঘরে ছিল, বাহিরে আসিয়া অনির্দিষ্ট ভাবেই হাত তুলিয়া সবাইকে নমস্কার করিল, দৃষ্টিটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ম্যানেজারের উপরই গিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন—"আপনি তা হলে এখানেই আছেন! মাষ্টারমশাই ত আজও এলেন না, ব্যাপারখানা কি? আপনাকে নতুন করে কিছু লেখেন নি আর?"

—অতি সূক্ষ্ম একটু ব্যঙ্গের হাসি; টুলু স্পষ্ট করিয়াই হাসিয়া উত্তর দিল—"আজ্ঞে না, পুরনো কথা নূতন করে আর কবার লিখতে হয় মানুষকে?"

এর তিক্তাস্বাদটি অবশ্য মুখে আসিয়া রহিল; তবে সান্ত্বনা রহিল যে, বেশী গুলতন না করিয়া ইসারায়-ইঙ্গিতে সমস্ত ব্যাপারটি সবার সামনে বেশ ধরিয়া দেওয়া হইল। এর পর পথ নিশ্চয় সহজ হইবে।

নিবারণ আসিল তিন দিন পরে। খবর দিল গোলমাল ওদিকে প্রচুর। কিন্তু যে লোকটি আগুন লাগাইয়াছে সে দিন পাঁচেক আগে ওখান থেকে কোথায় চলিয়া গেছে। চেহারার যা বর্ণনা শুনিল, মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে অনেকটা মেলে বটে।

তাহা হইলে মাষ্টারমশাই এই বার ফিরিলেন। দেখা হওয়া নিতান্ত দরকার, ম্যানেজার আরও দু-এক দিন রহিয়া যাওয়া স্থির করিলেন।

পরদিনই কিন্তু বনমালী আবার একটা দরখাস্ত আনিয়া হাজির করিল, আরও দিন-সাতেকের ছুটি চাহিতেছেন মাষ্টার-মশাই, অর্থাৎ গ্রীষ্মাবকাশ পর্যন্ত। গ্রীষ্মাবকাশটাও বাহিরেই কাটাইতে চান, অনুমতি চাহিয়াছেন।

কতকটা নিশ্চিন্ত এবং কতকটা নিরাশ ও বিমূঢ় হইয়া ম্যানেজার তাহার পরদিনই যাত্রা করিবার আয়োজন করিলেন।

ক্রমশঃ

নূতন কালের যাত্রী

শ্রীকরুণাময় বসু

দেখেছি অনেক চাঁদ, এই চাঁদ সম্পূর্ণ নূতন
আকাশ-গাঙের জলে ভেসে আসা স্বর্ণাভ বরণ
মদির স্বপ্নের প্রায়; বনান্তের অশান্ত বাতাস
মুকুলিত আম্রকুঞ্জে রেখে যায় কথার আভাস
অস্ফুট গানের মতো; পুষ্প গন্ধে আমন্থর পথ
দু-জনে রয়েছি বসে, ধ্যানস্তব্ধ রাত্রির জগৎ।
পাখীরা গিয়াছে নীড়ে, ঝিকিমিকি ম্লান নদীজল,
ছায়াপথে যেতে যেতে কারে খোঁজে নক্ষত্র সকল।
পথ কি হ'ল না শেষ; আমাদেরো যেতে হবে দূরে
সুদূর পথের বাঁকে, বনঘন নীল শৈলচূড়ে,
বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রান্তে। এ জীবনে রয়েছে প্রাচীর,—
প্রসারিত রুদ্ধজাল, ডানাগুলি হয়েছে অস্থির,
খুঁজিতে নূতন দেশ, অভ্যুদয় যেথা স্বর্ণযুগ,
সূর্যের আলোয় স্নাত বিকশিত লক্ষ হাসিমুখ,
দুর্জয় সাহসী প্রাণ, মৃত্যুকীর্ণ রক্তের অক্ষরে
নূতন জীবন আঁকে,—যাত্রী মোরা নূতন বন্দরে।

আজকের ভালোবাসা আজ নয়, মানুষের হাতে
নূতন কালের রাখী বেঁধে দিনু নূতন প্রভাতে।

স্বরাজ-সাধনা বনাম সিবিল সার্বিস

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বিগত ২১শে ও ২২শে অক্টোবর অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দ্দার বল্লভভাই পটেলের আহ্বানে বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রিগণ নিউ দিল্লীতে সমবেত হইয়া আলাপ-আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতীয় সিবিল সার্বিসভুক্ত কর্ম্মচারীমণ্ডলী নিয়োগের দায়িত্ব ভারত-সচিবের পরিবর্ত্তে ভারতের জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক গ্রহণ আশু কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান বর্ষের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সকল সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীকেই সরকারকে জানাইতে হইবে তাহারা নূতন সংস্থার নূতন সর্ত্তে কর্ম্ম করিবে কি না। যাহারা জাতীয় সরকারের অধীনে কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক তাহাদিগকে পূর্ব্বচুক্তি মত ক্ষতিপূরণ দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে। ভারতবাসী মাত্রেই এই সংবাদে উৎফুল্ল হইয়াছেন। ভারতীয় সিবিল সার্বিস ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব তথা শাসনের একটা মস্ত বড় স্তম্ভ— ইহাকে চিরতরে অব্যাহত রাখিবার একটা প্রধান উপায়। লয়েড জর্জ ইহাকে 'ষ্টীল ফ্রেম' বা ইস্পাতের কাঠামো আখ্যা দিয়াছিলেন। এই সার্বিসে প্রবেশলাভ করিয়া দেশ-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করাকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ স্বরাজ-সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস প্রথম অধিবেশন হইতেই এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া এ বিষয়ে জনমত গঠন করিতে অগ্রসর হন। আজ কংগ্রেস তথা ভারতীয় মহাজাতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে চলিয়াছে। এই সময় এই শাসক-গোষ্ঠির পূর্ব্বেকার ইতিহাস এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর ইহার ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় দেওয়ানী প্রাপ্তি হইতে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজাধিকৃত অঞ্চলের শাসনকার্য্য দেশী-বিদেশী ভাগ্যান্বেষীদের উপরই ন্যস্ত ছিল। তাহারা জনসাধারণের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ ই বড় করিয়া দেখিত। এ কারণ শাসনে অনাচার ও অব্যবস্থা চরমে উঠে। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের তখন যত ক্রোধ ভারতবাসীদের উপর গিয়া পড়ে। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারি করেন যে, ভারতীয় রক্ত যাহাদের ধমনীতে প্রবাহিত এরকম লোকদের সামরিক, অসামরিক বা নৌবিভাগীয় কোন কর্ম্মেই নিয়োজিত করা হইবে না। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই আদেশ কার্য্যকরী হয়। এই সনের সনন্দে এ সম্বন্ধে আরও দুইটি ধারা যুক্ত হয়। ইহার একটিতে স্থির হয় যে, ইংরেজাধিকারের মধ্যে যে-সব পদ শূন্য হইবে তাহা যথাসময়ে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকে জানাইতে হইবে এবং তাঁহারা লোক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবেন। অন্যটিতে বলা হয় যে, কাউন্সিলের সদস্য ছাড়া অন্য সকল কর্ম্মচারীই চাকুরির বয়স এবং যোগ্যতা অনুসারে উপরিতন পদে উন্নীত হইবে। এ বৎসর হইতেই এই নিয়মে কার্য্য আরম্ভ হইল। ভারতীয় সিবিল সার্বিসের ভিত্তি এইরূপে স্থাপিত হয়। শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারের ওজুহাতে এই সময় হইতে সরকারী কার্য্যে ভারতীয়দের একেবারেই বাদ দেওয়া হইল। রাজা রামমোহন রায়ের মত যোগ্য লোকও সরকারের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই, ইংরেজ কলেক্টারের অধীনে সাময়িক ভাবে কিছুকাল দেওয়ানের কার্য্য মাত্র করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরে কোন ভারতীয়ই পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হয় নাই। তবে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের আদেশ মতে ভারতীয়েরা দেওয়ানী বিভাগের ছোটখাট পদ লাভের অধিকার পায়। ইহার পর মুন্সেফ ও সদর আমিনের পদে তাহারা নিয়োজিত হইতে লাগিল। সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষ এই সদর আমিনের পদে নযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর প্রতি এতাদৃশ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনন্দ পুনঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটিতে ১৮৩১-৩২ সালে ভারত-শাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা চলে। এই সময় রাজা রামমোহন রায় বিলাতে উপস্থিত ছিলেন এবং কমিটি দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কোম্পানীর ভারত-শাসন সম্বন্ধে নিজ মত লিখিয়া পাঠান। সিলেক্ট কমিটি সব দিক বিবেচনা করিয়া এই মত প্রকাশ করেন যে, অযোগ্যতা বা অবিশ্বস্ততার ওজুহাতে সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয় নিয়োগ বন্ধ করিয়া দেওয়া মোটেই উচিত হয় নাই। কমিটি ভারতীয় নিয়োগের সম্পর্কে যে চারিটি কারণ উল্লেখ করেন তাহার দুইটি এখনও প্রযোজ্য—যথা, সুবিচার ও ব্যয়সংক্ষেপ। ঐ সময়েও সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীদের বেতন ছিল অসম্ভবরকম বেশী। চারি বৎসর একটি পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে যে-কোন সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী পাইত বৎসরে পনর হাজার টাকা, আর দশ বৎসর পরে প্রত্যেকের বেতন হইত বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকা। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে স্থিরীকৃত হইল যে, উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ যে-কোন পদেই ভারতীয় নিয়োগ করা চলিবে। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের চক্রান্তে সনন্দের এই ধারা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইল। সে যুগে বিলাতে গিয়া সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে সিবিল সার্বিসের যোগ্যতা অর্জ্জন করা সম্ভব ছিল না। রাজা রামমোহন রায়ের পুত্রস্থানীয় রাজারাম বিলাতে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ অন্তে অনুরূপ যোগ্যতা অর্জ্জন করিলে কোর্ট অব

ডিরেক্টর্স তাঁহাকে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগে সম্মতি দেন নাই।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আবার কোম্পানীর সনন্দ লাভের সময় হয়। পূর্ব্ব প্রথামত হাউস অব কমন্স সিলেক্ট কমিটির উপর ইহার কার্য্যাকার্য্যের তদন্তের ভার অর্পণ করেন। বিংশতি বৎসর অতীত হইলেও ১৮৩৩ সালের সনন্দ অনুসারে সিভিল সার্ভিস তথা উচ্চতর দায়িত্বপূর্ণ পদে কেন একজনও ভারতীয় নিয়োগ করা হয় নাই এ সম্বন্ধে কমিটিতে স্বভাবতঃই আলোচনা উপস্থিত হয়। এ যাবৎ সিভিল সার্ভিসে কোম্পানীর ডিরেক্টর-দের আত্মীয়-স্বজনেরাই নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিল, আত্মীয়-পোষণ হেতু অন্যদের ইহাতে বড় একটা স্থান হইত না। ইংরেজ জনসাধারণ ইহার বিরোধী হইয়া উঠিল এবং দাবি করিল যে, এরূপ ব্যবস্থা করা হউক যাহাতে সকল যোগ্য লোকেরই ইহাতে স্থান হইতে পারে। কমিটি এই দাবি পূরণের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করিলেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদ্বারা কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইলে ভারতবাসীদের নিকটও স্বতঃই ইহার দ্বার উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু এ সময়ে এক শ্রেণীর লোক এই বলিয়া ইহার প্রতিবাদ করে যে, ভারতবাসীরা দেওয়ানী কার্য্যে অধিকতর যোগ্য, শাসনবিভাগে তাহাদের নিয়োগ যুক্তিযুক্ত হইবে না, কেননা এ বিভাগে তাহাদের দক্ষতা প্রমাণিত হয় নাই। বঙ্গের প্রথম লেঃ গবর্ণর এবং বাস্তু সিভিলিয়ান সার ফ্রেডারিক হেলিডে কমিটির সম্মুখে এই মত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবাসীরা ঈর্ষ্যাপরায়ণ, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে সর্ব্বপ্রথম একজন বাঙালী নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে বিরূপ ভাব দেখা দিয়াছে। এই প্রথম বাঙালী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হিন্দু কলেজের একজন বিখ্যাত ছাত্র রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর। হেলিডের এই উক্তির উপযুক্ত জবাব প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও জননেতা রামগোপাল ঘোষ সনন্দ আইন সম্পর্কে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় যুক্তি-প্রমাণ সহকারে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ এবং তাঁহাদের নিয়োজিত সিভিল সার্ভিসভুক্ত কর্ম্মচারীগণ ভারত-বাসীদের এ মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে দিতে যে একান্ত অনিচ্ছুক, হেলিডে প্রমুখ ব্যক্তিদের অযথা উক্তি তাহার প্রমাণ। যাহা হউক, পার্লামেণ্টে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা-দ্বারা সিভিল সার্ভিসে কর্ম্মী নিয়োগ ধার্য্য হইল এবং ভারত-বাসীও ইহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিল। এ সময়ে পার্লা-মেণ্টে এই মর্ম্মে একটি সংশোধনী প্রস্তাবও উত্থাপিত হয় যে, ভারতবাসীদের পক্ষে এই পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে যাইবার প্রয়োজন হইবে না, কিন্তু ইহা ভোটে টিকে নাই।

কিন্তু ইহার সপক্ষে ভারতবর্ষে শীঘ্রই আলোচনা সুরু হইল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (বা 'ভারতবর্ষীয় সভা') বিলাতে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতির নিকট এক-খানি স্মারকলিপি প্রেরণ করিলেন। ইহাতে এই মর্ম্মে লেখা হইল যে, ১৮৩৩ এবং ১৮৫৩ সালের সনন্দ আইনে ভারত-বাসীদের সরকারী উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত আদৌ কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হয় নাই। ইহার পক্ষে প্রধান দুইটি বাধা হইল—(১) বিলাতে গিয়া ভারতবাসীদের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বাধ্য হওয়া এবং (২) পরীক্ষার বিষয়সমূহে নম্বরের তারতম্য। স্মারকলিপিতে এই পরামর্শ দেওয়া হইল যে, ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্সি শহরসমূহে বিলাতের মত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক, আর পরীক্ষার বিষয়গুলির নম্বরের তারতম্য হ্রাস করিয়া সমতা স্থাপন করা হউক। স্থানীয় ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকাগুলিতে এই স্মারকলিপির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হইল। তাহারা আরও বলিতে লাগিল যে, সিভিল সার্ভিসে ভারতবাসী প্রবেশ করিলে ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি হইবে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ভারতবাসীর মুখপাত্র রূপে এ কথার যোগ্য উত্তর দেন। 'পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন,

"The close Civil Service, the instrument of a temporary policy, and an institution un-rooted in the deeper parts of the social frame, must make way for an agency less pretentious and better suited to the altered requirements of the time." (Feb. 12, 1857.)

অর্থাৎ, সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধিকল্পে কেবলমাত্র ইংরেজ-দের লইয়া যে সিভিল সার্ভিস গঠিত হইয়াছিল এবং ভারতীয় সমাজের অন্তস্তলে যাহার মূল কখনও প্রোথিত হয় নাই, সময়োপযোগী করিয়া এরূপ শাসন-কাঠামোর পরিবর্ত্তন সাধন আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই কর্ম্মচারীমণ্ডলী দেশ-বাসীর সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথে তখনই কিরূপ বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া হরিশ্চন্দ্র লিখিতেছেন,

'From the first it has offerd a passive but determined resistance to the progress of constitutionalism—the true form in which British political action manifests itself wherever it is allowed fairly to operate. From the first it has proclaimed itself the governing agency of an Asiatic power, of an Oriental despotism. From the first it has denied the capacity of the people of India to participate in the political progress of the rest of the British dominions. From the first it has opposed the introduction of 'English ideas' into the internal policy of the country. It has discountenanced English education, the spread of English language, and the adoption of external forms of European civilization. It has discouraged special progress except in the direction of material prosperity. Lastly, it has monopolised political power, and exercised a sort of social tyranny intolerable alike to natives and Europeans. For these grave offences it deserves the penalty of extinction it has incurred. These offences are

the defects of the system, and the system must therefore be broken up." (March 13, 1857)

পেট্রিয়ট-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র যে সকল গুরুতর অপরাধে সিবিল সার্বিসভুক্ত কর্ম্মচারীমণ্ডলীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ইহার উচ্ছেদসাধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শত বৎসর পরে তাহা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রথম হইতেই ইহারা এদেশে স্বৈর-শাসন চালাইতে আরম্ভ করে এবং সর্ব্বপ্রকার নিয়মানুগ শাসন প্রবর্ত্তনে বিঘ্ন ঘটাইতে থাকে। পাছে পাশ্চাত্য ভাবধারা ভারতবাসীদের মনে গাঁথিয়া গিয়া তাহাদিগকে প্রগতির পথে উদ্বুদ্ধ করে এই আশঙ্কায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনে ইহারা বরাবর বাধা দিয়াছে। অন্যান্য ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলসমূহে যেরূপ স্বাধিকারমূলক শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এখানে তদনুরূপ কিছু যাহাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় তজ্জন্য ইহাদের চেষ্টার অন্ত নাই। সর্ব্বোপরি সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইহারা পরিচালিত করায় দেশী বিদেশী সকলের পক্ষেই তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারণে 'সিবিল সার্বিস' ব্যবস্থা শীঘ্র তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক।

কিন্তু তুলিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, এই মণ্ডলীতে ভারতবাসীদের নিয়োগ দ্বারা ইহার যথোপযুক্ত সংস্কার সাধনেও কর্ত্তৃপক্ষ বাধা দিয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায় এ সম্পর্কে আলোচনা কিছুকাল বন্ধ থাকে। এই বিদ্রোহের শেষের দিকে রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার কোম্পানীর নিকট হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তখন তিনি ভারত-শাসন সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণা করেন তাহাতেও এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ থাকে যে, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে ভারতবাসীদিগকে দেশ-শাসন ব্যাপারে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হইবে। বিদ্রোহের অবসানে বিলাতের নূতন কর্ত্তৃপক্ষ 'সিবিল সার্বিস' সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা সুরু করেন। তাঁহাদের নিযুক্ত ইণ্ডিয়া আপিস কমিটি এই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতবাসীদের 'সিবিল সার্বিস' পরীক্ষা ভারতবর্ষে বসিয়াই গ্রহণ করা সমীচীন। কর্ত্তৃপক্ষ এই সমস্ত সুপারিশই অগ্রাহ্য করিলেন। এত দিন সংস্কৃত ও আরবী—প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য নম্বর ছিল ৩৭৫, পরন্তু গ্রীক ও লাটিনের প্রত্যেকটির নম্বর ছিল ৭৫০ করিয়া। কমিটি সংস্কৃত ও আরবীর নম্বর বাড়াইয়া ৫০০ করিবার সুপারিশ করিলেন। কমিটির এই সুপারিশটি কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন।

ইহার পর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়া সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনিই ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম সিবিলিয়ান। তাঁহার সঙ্গী ও বন্ধু মনোমোহন ঘোষ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন। সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্যে ভারতবাসীরা যেমন উৎফুল্ল হইল, ইংরেজেরা ততোধিক বিমর্ষ হইয়া পড়িল। কেননা, তাহাদের এতকালের একচেটিয়া অধিকারে ভারতবাসীরা ভাগ বসাইতে অগ্রসর হইয়াছে! বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ অতিক্রান্ত পূর্ব্ব-ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া সংস্কৃত ও আরবীর নম্বর পুনরায় ৩৭৫-এ নামাইয়া দিলেন। মনোমোহন ঘোষ ইহার পরে পরীক্ষায় আর উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, অবশেষে ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৬৯ সালের মধ্যে ষোল জন ভারতবাসী সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিলেও সত্যেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। উক্ত নিয়ম পরিবর্ত্তনই ইহার প্রধান কারণ।

যাহা হউক, ১৮৬৮ সাল হইতে কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবাসীদের প্রতি কতকটা দয়াপরবশ হইলেন। ভারত-শাসনে ইংরেজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতবাসীদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ কিরূপে অংশতও পালন করা যায় ইহাই হইল তাঁহাদের ভাবনা। অনেক আলোচনা ও বিতর্কের পর ১৮৭০ সালে তাঁহারা পার্লামেণ্ট দ্বারা এই মর্ম্মে একটি আইন করাইয়া লন যে, ভারতে বসিয়াই যোগ্য ভারতবাসীদিগকে উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারত-সরকার নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং ভারত-সচিবের অনুমোদন সাপেক্ষ তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে নিয়মাবলী রচনা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যাঁহাদের উপর নিয়মাবলী রচনার ভার দেওয়া হইল তাঁহারাও যে ভারতবাসীদের কোনরূপ শাসনক্ষমতা দানের বিরোধী। বিলাত হইতে বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া ভারত-সরকার অবশেষে কিছু করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইবার নয় বৎসর পরে ১৮৭৯ সালে ভারত-সরকার ভারত-সচিব দ্বারা অনুমোদন করাইয়া 'ষ্ট্যাটুটারী সিবিল সার্বিস' নামে একটি বিশিষ্ট কর্ম্মীমণ্ডলী গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্থির হইল যে, ভারতবাসীদের মধ্যেই ইহা সম্পূর্ণ নিবদ্ধ থাকিবে। দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য প্রায় সমান সমান হইলেও সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীদের মত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি পদে তাহাদের নিয়োগ করা চলিবে না, দেওয়ানি বিভাগেই তাহাদের বেশীর ভাগের স্থান হইবে। তাহাদের বেতন হইবে উহাদের দুই-তৃতীয়াংশ। শাসন-বিভাগের কোন উচ্চতর পদে তাহাদের নিয়োগ করিতে হইলে ভারত-সরকারের বিশেষ অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। ভারতবাসীরা এত দিন যাহা চাহিয়াছিল এ ব্যবস্থা তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শাসন-বিভাগের উচ্চতর পদ হইতে ভারতবাসীদের বঞ্চিত করিবার ইহা এক অপকৌশল বলিয়াও তাহারা বুঝিতে পারিল।

সিবিলিয়ান-তন্ত্র পরিচালিত ভারত-সরকারের নিকট হইতে উক্তরূপ ব্যবস্থা ব্যতীত আর কিই-বা আশা করা যাইতে পারিত! কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের মূলে আরও যথেষ্ট কারণ ছিল। বিলাত-প্রবাস এবং পাঠ্যতালিকায় পক্ষপাতিত্বজনিত অসুবিধা সত্ত্বেও ১৮৭০-৭১ সাল হইতে ভারতবাসীরা সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে থাকে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর দ্বিতীয় দলে বোম্বাইয়ের শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর এবং বঙ্গের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল গুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্ত সিবিলিয়ান হইয়া ১৮৭১ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পরও কেহ কেহ সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহাতে এদেশে ব্রিটিশ সিবিলিয়ান-তন্ত্র ও বিলাতে রক্ষণশীল ইংরেজগণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। সামান্য কারণে সিবিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথের কর্মচ্যুতিতে তাহাদের মনোভাব সুস্পষ্টই বুঝা গেল। 'ষ্ট্যাটুটরী সিবিল সার্বিস' গঠন সম্পর্কে আলোচনাকালে ইংরেজ সিবিলিয়ানদের প্ররোচনায় ভারত-সরকার এরূপও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, বিলাতে গিয়া সিবিল সার্বিস পরীক্ষা আর ভারতবাসীদের দিবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়াও আবশ্যক হইল না। কেননা, বিলাতের কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই ১৮৭৬ সালে এই মর্মে এক হুকুম জারি করিলেন যে, সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থিদের ঊর্দ্ধতন বয়স একুশ বৎসরের স্থলে উনিশ বৎসর করা হইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এত অল্প বয়সে ভারতবাসীরা আর বিলাতে গিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবে না, ভারতের শাসকগোষ্ঠী বরাবর ইংরেজই থাকিয়া যাইবে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হিসাব করিয়া দেখান যে, উক্ত হুকুম জারি হইবার পর সাত-আট বৎসরের মধ্যে একজন মাত্র ভারতবাসী সিবিলিয়ান হইতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য কতখানি সফল হইয়াছিল, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটনের উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এই মর্মে লেখেন,—

"আমরা সকলেই জানি যে, ভারতবাসীদের সিবিল সার্বিসে নিয়োগের দাবি কখনও পূরণ হইতে পারে না বা হইবে না। কাজেই তাহাদের এই দাবি প্রকাশ্যে অস্বীকার করা ও তাহাদের বঞ্চনা করা—এই দুইটির একটি পথ আমাদিগকে বাছিয়া লইতে হইয়াছে। আমরা দ্বিতীয়টি অবলম্বন করিয়াছি। বিলাতে ভারতীয়দের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা এবং প্রতিযোগীদের বয়স হ্রাস করা—আইনকে ব্যর্থ করিয়া দিবার সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নহে। যেহেতু এ পত্রখানি গোপনীয় সেহেতু একথা বলিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত-সরকার কেহই এই অভিযোগের উত্তর দিতে পারিবেন না: আমরা মুখে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি কাজে তাহা ষোল আনা ভঙ্গ করিতেছি।"

বারংবার আঘাতে ভারতীয় সমাজের রাজনৈতিক বুদ্ধি ইতিমধ্যেই কতকটা জাগ্রত হইয়াছিল। ১৮৭৬ সালের সরকারী ব্যবস্থা, অর্থাৎ সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের বয়স হ্রাস করিয়া উনিশ বৎসরে নামানো, ভারতবাসীরা বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিতে পারিল না। এ সম্বন্ধে ভারতের জনসাধারণ স্বরাজ-সাধনার পথে এক নূতন আন্দোলন আরম্ভ করে।

প্রতিবাদে প্রবর্তিত হইতে দেয় নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এ যাবৎ শুধু কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়া ভারত-শাসন ব্যাপারে নিজেদের মতামত জ্ঞাপন করিতেন। কিন্তু নব-প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভা জনসাধারণের মুখপাত্র স্বরূপ শুধুমাত্র স্মারকলিপি প্রেরণে সন্তুষ্ট না থাকিয়া ইহার প্রতিবাদে গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত করিলেন। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ ব্যাপক আন্দোলন ভারতবর্ষে এই প্রথম আরম্ভ হইল। উক্ত সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদে ১৮৭৭ সালের ২৪শে মার্চ কলিকাতা টাউনহলে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণের সভাপতিত্বে ভারত-সভা এক বিরাট্ জনসভার অনুষ্ঠান করেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীরা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ধর্মনেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও সভায় উপস্থিত থাকিয়া ইহার উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানাইয়াছিলেন। শুধু কলিকাতায়ই আন্দোলন সীমাবদ্ধ রহিল না, বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সমগ্র ভারতে সভা সমিতি করিয়া ইহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইল। ভারত-সভার পক্ষে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বারবার সমগ্র ভারত পরিক্রমা করিয়া ইহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিতে প্রয়াসী হইলেন। বিলাতেও প্রতিনিধি পাঠাইয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হইল। ভারত-সভা বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষকে এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৯ সালে বিলাতে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন জনসভায় মর্মস্পর্শী ভাষায় ভারতবাসীর অভিমত ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার কার্য্যে বিখ্যাত উদারনৈতিক নেতা পার্লামেণ্ট সদস্য ভারত-বন্ধু জন ব্রাইট বিশেষ সহায় হন এবং একটি সভায় সভাপতিত্ব করিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। কিন্তু এত আন্দোলন সত্ত্বেও কি বিলাতে কি এ দেশে সর্ব্বত্রই কর্তৃপক্ষ অটল রহিলেন।

ভারত-সভা নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া পুনরায় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারত-সরকার মারফত ভারত-সচিবের নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিলেন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপন এবং ব্যবহার-সচিব স্যার কোর্টনে ইলবার্ট ইহার যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়া নিজ নিজ মন্তব্য উক্ত স্মারকলিপির সঙ্গে জুড়িয়া দিলেন। কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ তখনও সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের বয়স উনিশ বৎসরের ঊর্দ্ধে বাড়াইতে এবং ভারতবর্ষে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইলেন না। এই সময়কার ইলবার্ট আন্দোলনের মূলেও যে ঐ একই মনোভাব কার্য্য করিয়াছিল তাহাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সমীচীন। প্রথমতঃ ভারতবাসী ইংরেজদের মত শাসন-বিভাগে আসীন হইবার অধিকার লাভ করিবে এবং দ্বিতীয়তঃ তাহারা ইংরেজ সিবিলিয়ানদের সমান ক্ষমতার ক্ষমতাবান হইবে ইহা ইংরেজ শাসকমণ্ডলীর অসহ্য হইয়া

উঠিয়াছিল। ভারত-শাসনের যন্ত্র সিবিলিয়ান-গোষ্ঠীতে স্থান না হইলে শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। এ কারণ কংগ্রেস প্রথম অধিবেশনেই এই জনমত প্রথিত করিয়া একটি ব্যাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

প্রথম কংগ্রেসের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটিতে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা হইল। সিবিল সার্বিস পরীক্ষা একই কালে বিলাতে ও ভারতবর্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, গুণানুসারে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদের একই তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। ইহার পর ভারতীয়েরা বিলাতে গিয়া আরও আবশ্যক পরীক্ষাদি দিয়া আসিবে। পরীক্ষার্থীদের ঊর্দ্ধতম বয়স ধার্য্য করিতে হইবে তেইশ বৎসর। প্রস্তাবে আরও বলা হইল যে, ছোট-খাট কাজ ছাড়া সকল বড় সরকারী চাকরিতেই প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা দ্বারা কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে আর অধিক দিন চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পর বৎসরই (১৮৮৬ সাল) একটি পাবলিক সার্বিস কমিশন বসাইয়া তাহার উপর এ সব বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার ভার অর্পণ করিলেন। কমিশন দুই বৎসর কাল সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। কমিশন ষ্ট্যাটুটারি সিবিল সার্বিস তুলিয়া দিবার সপক্ষে মত দিলেন। তাঁহারা সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের বয়স তেইশ বৎসরই ধার্য্য করিলেন বটে, কিন্তু এদেশে পরীক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা এই মতের অনুকূলে কারণ দর্শাইলেন যে, প্রথমতঃ হিন্দুরাই এ ব্যবস্থা চাহিতেছে এবং দ্বিতীয়তঃ এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষায় উন্নত হিন্দুরা উপকৃত হইবে, শিক্ষায় অনুন্নত মুসলমানদের ইহাতে কোন সুবিধা হইবে না। ভারতের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ কালে শাসন-কার্য্যে ভারতীয় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই যুক্তি কতখানি দূষনীয় তাহা পরে ভারতবাসী সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছে। কমিশনের মুসলমান সদস্য সার সৈয়দ আহমদ খাঁ এই যুক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া অধিকাংশের মতেই মত দিলেন। হিন্দু সদস্যগণ এই যুক্তি স্বীকার করিতে না পারিয়া এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত জ্ঞাপন করিলেন। সব দিক আলোচনা করিয়া এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিষ এই কমিশনই প্রথম ছড়াইয়া দিয়া যান।

কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইলে কংগ্রেস পরবর্ত্তী সাধারণ অধিবেশনে ইহার উপর নিজ অভিমত জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। নেতৃবৃন্দ সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের ঊর্দ্ধতম বয়স তেইশ বৎসরে উন্নীত করায় আনন্দ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু একইকালে বিলাতের মত এদেশে পরীক্ষা গ্রহণে কমিশনের আপত্তিতে ক্ষুব্ধ হইলেন। ইহার পর ১৮৯৩ সালের ২রা জুন পার্লামেণ্টে সরকার পক্ষে সহকারী ভারত-সচিবের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, ভারতবর্ষেও সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। দাদাভাই নৌরজী তখন পার্লামেণ্টের সদস্য। তিনি ইহার অনুকূলে এরূপ অকাট্য যুক্তির অবতারণা করেন যে, সদস্যগণ তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। কংগ্রেস পরবর্ত্তী অধিবেশনে এজন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইলেন যাহাতে এই প্রস্তাব শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করা হয়। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ যে ইহার একান্ত বিরোধী। ভারত-সচিব প্রকাশ্যে পার্লামেণ্টে গৃহীত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া ভারত-সরকারের নিকট মতামত চাহিয়া ইহার নকল পাঠাইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধে এমন সব মন্তব্যের অবতারণা করিলেন যাহা ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। সিবিলিয়ানতন্ত্র-পরিচালিত ভারত-সরকারের পক্ষে ভারত-সচিবের উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহারা যথারীতি প্রাদেশিক সরকারসমূহের মতামত গ্রহণ করিলেন এবং ইহার বিরুদ্ধে স্বীয় মত লিপিবদ্ধ করিয়া ভারত-সচিবের দরবারে পাঠাইলেন। পার্লামেণ্টে গৃহীত প্রস্তাবও কিরূপে কর্ত্তাব্যক্তিদের চক্রান্তে অকেজো করিয়া তোলা যায় এই ব্যাপারটি তাহার একটি চমৎকার উদাহরণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। তাঁহার আমলে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পদে পদে ব্যাহত হইতে থাকে। তিনি মনে করিতেন, ইংরেজরাই চিরকাল ভারত শাসন করিবে। সুতরাং সিবিলিয়ান-তন্ত্রে শ্বেতকায়দের প্রাধান্য বজায় রাখিতে তিনি কায়মনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আসল উদ্দেশ্য চাপা দিয়া ভারতবাসীদের ধোঁকা দিবার জন্য তিনি এমন কথাও বলিয়া-ছিলেন যে, যত সব সরকারী কর্ম্মচারী আছে তাহার ত অধিকাংশই ভারতবাসী, কাজেই তাহাদের তুলনায় মুষ্টিমেয় সিবিল সার্বিস কর্ম্মচারীদের মধ্যে ভাগ বসাইবার কোন হেতুই নাই। কিন্তু এ কথা অতি সাধারণ লোকেও বুঝিতে পারে যে, শাসন-ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে যত দেরি হইবে, আমাদের উন্নতিও তত বিলম্বিত হইবে। এই কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেস মারফত ভারতবাসী চাহিয়াছিল। এই কর্ত্তৃত্ব সিবি-লিয়ান-তন্ত্র দ্বারাই পরিচালিত হয়। লর্ড কার্জনের উক্তি দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হইল যে, কর্ত্তৃপক্ষ এই কর্ত্তৃত্ব অংশতঃও ভারতবাসীদের হাতে ছাড়িয়া দিতে রাজী নন। ভারতবাসীর দাবি যতই প্রবল হইয়া উঠিল ইংরেজ সিবিলিয়ান-তন্ত্র ততই ভারতীয়দের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া ইহা ব্যাহত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের সময় সিভিলিয়ান-তন্ত্রের অপকীর্ত্তি আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই সময় হিন্দুকে দুয়ো রাণী এবং মুসলমানকে সুয়ো রাণী পর্য্যায়ে ফেলিয়া, প্রথমটিকে দাবাইয়া রাখিয়া দ্বিতীয়টিকে বাড়াইয়া তুলিতে তাহারা অহরহ চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের এই

অপচেষ্টায় এক দিক ১৯০৯ সালে প্রবর্ত্তিত মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কারে পৃথক নির্ব্বাচনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

সিভিলিয়ান পদে ভারতীয় নিয়োগের নানারূপ বাধা পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল। দেশের জননেতারা ইংরেজ শাসক-বর্গের কারসাজি ধরিয়া ফেলিলেন। কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে এত দিন ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইয়া আসিয়াছে, মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের পর কেন্দ্রীয় আইন সভায়ও এ বিষয়ে ভীষণ তর্ক উঠিল। এবারেও জনমত এত প্রবল হয় যে, সরকার অবশেষে ১৯১২ সালে লর্ড ইসলিংটনের সভাপতিত্বে একটি রয়্যাল কমিশন গঠন করিয়া তাহার উপর এ বিষয়ে অনুসন্ধান এবং ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার দিতে বাধ্য হইলেন। এই কমিশনে সদস্য ছিলেন সার আবদার রহিম, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, হার্বার্ট ফিশার, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এবং লর্ড রোণাল্ডসে। কমিশনের কার্য্য কিছুদূর অগ্রসর হইলে গোপালকৃষ্ণ গোখলে মারা যান। যুদ্ধের গতিকে কার্য্য শেষ হইবার এক বৎসর পরে ১৯১৭ সালে কমিশন রিপোর্ট দাখিল করিলেন। রিপোর্টে সাক্ষ্যদান কালে ভারতীয় মুষ্টিমেয় সিভিলিয়ানদের উপর ইংরেজ সিভিলিয়ান-তন্ত্রের আক্রোশ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ভারতীয়েরা বিচারকার্য্যে ভাল, কিন্তু শাসন ব্যাপারে তাহাদের যোগ্যতা নাই—প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বেকার সার ফ্রেডারিক হেলিডের কথা এবারেও ইংরেজ রাজপুরুষদের মুখে শুনা গেল। অথচ যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ভারতীয় সিভিলিয়ান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা ইংরেজ সিভিলিয়ানদের অপেক্ষা কোন অংশেই কম যোগ্যতা প্রদর্শন করেন নাই বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্যতাই দেখাইয়াছেন। তবে সরকারী চক্রান্তে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর পদ তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই, কাজেই তাঁহারা যোগ্য কি অযোগ্য তাহার একান্তই প্রমাণাভাব। ভারতীয় সিভিলিয়ানদের মুখপাত্র রূপে জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত কমিশনের সমক্ষে উক্ত মর্ম্মে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। এদেশে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের সপক্ষে ভারতবাসী মাত্রেই মত দিয়াছিলেন। পরে আইন-সভায় ইহা লইয়া যখন প্রশ্ন উঠে তখনও সরকার পক্ষে আগেকার যুক্তি উত্থাপিত করিয়া বলা হয় যে, কোন কোন সম্প্রদায় অধিকতর শিক্ষিত বলিয়া এই মণ্ডলীতে তাহাদেরই স্থান হইবে। ইহার উত্তরে তখন মহম্মদ আলী জিন্নাও কিন্তু বলিয়াছিলেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে ভয়ের কোন কারণ নাই, কেননা তাহারা এখন আর শিক্ষায় অনুন্নত নয়। যাহা হউক, ইসলিংটন কমিশন রিপোর্টে যে সকল সিদ্ধান্ত করেন তদনুযায়ী কার্য্য করা হইলে ভারতবাসীদের অসন্তোষ আরও বাড়িয়া যাইত। অথচ তখন যুদ্ধের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ভারতবাসীদের সন্তুষ্ট রাখা ব্রিটেনের একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে ভারত-সচিব এডুইন মণ্টেগু এবং বড়লাট লর্ড চেমস-ফোর্ড কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন না। পরন্তু মণ্টেগু সাহেব ১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসে একটি সরকারী ঘোষণা দ্বারা ভারতবাসীদের জানাইয়া দিলেন যে, ভারত-শাসনে ভারতবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের শীঘ্র ব্যবস্থা করা হইবে।

এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯১৯ সালে পার্লামেন্টে নূতন ভারত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইল, আর এই অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইল ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে। ইংরেজ সিভিলিয়ান-পুঙ্গবেরা এ ব্যবস্থায় মোটেই খুশী হইতে পারে নাই। তাহারা কেহ কেহ এদেশ হইতে তখন বিদায় লইল বটে, কিন্তু অধিকাংশই চাকুরির মায়া ছাড়িতে না পারিয়া নব-প্রবর্ত্তিত শাসন-ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব্বপদ আঁকড়াইয়া রহিল। অবশ্য তাহারা যখন নূতন ব্যবস্থায় ভারতবাসীদের প্রদত্ত ক্ষমতার স্বল্পতা বুঝিতে পারিল তখন তাহাদের ক্ষোভের আর কোন কারণ রহিল না। তাহারা খাস ভারত-সচিবের অধীন, লাট-বেলাটের সঙ্গেও সরকারী কাজে মোলাকাতে কোন বাধা নাই, কাজেই প্রাদেশিক মন্ত্রীদের তাহারা একরূপ আমলেও আনিল না। ওদিকে কংগ্রেস ভারতবাসীর প্রতি নির্ম্মম ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া নূতন শাসন-সংস্কার বর্জ্জনপূর্ব্বক অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রগতিশীল প্রচেষ্টা-সমূহের প্রতি ব্রিটিশ সিভিলিয়ান-তন্ত্রের বিরোধিতা সুবিদিত। তাহারা এবারে কঠোর হস্তে আন্দোলন দমন করিতে লাগিয়া গেল। সরকারের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের দুর্ব্বার শক্তি অনুভূত হইতে লাগিল।

নূতন শাসন-ব্যবস্থায় ভারতবাসীদের অধিকার যতই সামান্য হউক, প্রচলিত সিভিলিয়ান-তন্ত্র ইহার সঙ্গে মোটেই খাপ খাওয়াইতে পারিল না। এক দিকে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠা, অন্য দিকে ইংরেজ সিভিলিয়ান-তন্ত্র অটুট রাখা—দুই-ই সরকারের দৃষ্টিতে বেমানান ঠেকিল। এহেতু যাহাতে সিভিল সার্ভিসে অধিক সংখ্যায় ভারতবাসী অতঃপর নিয়োজিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ১৯২২ সালের ৩০শে মে ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী ও'ডনেল প্রাদেশিক সরকারসমূহকে একখানি পত্র লেখেন। প্রাদেশিক সরকার-গুলির উচ্চতন পদসমূহও সিভিল সার্ভিসমণ্ডলী কর্তৃক অধিকৃত। পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া তাহাদের মনে এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, হয়ত-বা এই গোষ্ঠীতে ইংরেজ সিভিলিয়ান নিয়োগ অচিরাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে। মনোগত ভাব যাহাই হউক, সিভিল সার্ভিসমণ্ডলী তাহাদের অভাব-অভিযোগ জানাইয়া বড়লাট মারফৎ বিলাতে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের নিকট একখানা পাণ্টা স্মারকলিপি প্রেরণ করিল। এই স্মারকলিপি পাইয়া ইংরেজ সিভিলিয়ান-তন্ত্রকে আশ্বাস দিবার জন্য পার্লামেন্টে ১৯২২, ২রা আগষ্ট লয়েড জর্জ এক বক্তৃতা

করিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় সিবিল সার্বিসকে 'ষ্টীল ফ্রেম' বা ইস্পাতের কাঠামো বলিয়া উল্লেখ করেন এবং বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, ভারত-শাসনে ইংরেজ সিবিলিয়ানদের কখন্ যে প্রয়োজন হইবে না তাহা ভাবা আদৌ কল্পনাসাধ্য নহে। বস্তুতঃ ও'ডনেল-সার্কুলারে সিবিল সার্বিসে ভারতবাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রস্তাবই করা হইয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনের পরেও দেখা যায়, ১৯২২ সালে মোট সিবিলিয়ান কর্মচারীর শতকরা মাত্র তের জন ছিল ভারতীয়! লয়েড জর্জ বক্তৃতা দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, এই বৎসরের শেষ দিকে লর্ড লীর নেতৃত্বে একটি রয়্যাল কমিশন পাঠাইয়া সিবিলিয়ানগোষ্ঠীর অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবারও ব্যবস্থা করিলেন। লী কমিশন তিন-চার মাসের মধ্যে অতি দ্রুত অনুসন্ধান কার্য্য সারিয়া ১৯২৩, মার্চ মাসে কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট পেশ করিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাব অনুযায়ী ততোধিক তৎপরতার সহিত সিবিলিয়ান কর্মচারীদের বেতনের হার ও ভাতা বৃদ্ধি এবং সরকারী খরচে কর্মকালে অন্ততঃ চারি বার সপরিবারে প্রথম শ্রেণীতে বিলাতে যাতায়াতের ব্যবস্থা হইয়া গেল! কমিশন সুপারিশ করিলেন যে, ভারতীয় সিবিল সার্বিসে মোট সংখ্যার অর্দ্ধেক ইংরেজ এবং অর্দ্ধেক ভারতীয় হইবে। কিন্তু প্রতি বৎসর যে হারে নূতন নিয়োগের ব্যবস্থা হইল তাহাতে পনর বৎসর পরে, ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী নাগাদ এই সমতা লাভ ঘটিবে এরূপ মত প্রকাশ করিলেন। লী কমিশন যে একটি সাজান ব্যাপার তাহা বুঝিতে আর বাকি রহিল না। ইংরেজ সিবিলিয়ান-তন্ত্র এইরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারত-শাসনে মন দিলেন। অসহযোগ আন্দোলনকালে হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন-সৌধ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, ১৯২৩-৪ সাল হইতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ হেতু তাহা দ্রুত ভাঙিয়া পড়িতে সুরু হইল। সিবিলিয়ান-তন্ত্রের অপ্রকাশ্য হস্ত ইহার মধ্যে কতখানি ছিল তাহা পরিমাপ করা কঠিন নহে। স্বরাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতে ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয় তাহা ব্যাহত করিবার জন্ত ইহাদের চেষ্টা কাহারও অবিদিত নাই। এই সময় হইতে ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে এক সম্প্রদায়কে বিশেষ ভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে পক্ষে টানিতেও ইহারা সচেষ্ট হইল। ইহার পরিণতি কি হইয়াছে আজ আমরা তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সমবেত দাবি অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া সরকার-মনোনীত ইংরেজ ও ভারতীয় প্রতিনিধি লইয়া বিলাতে শাসন-পরিকল্পনা নির্ণয়ের জন্ত কয়েকবার গোলটেবিল বৈঠক বসে। দ্বিতীয় বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি-স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী যোগদান করিয়াছিলেন, প্রথম ও তৃতীয় বৈঠককালে তিনি ছিলেন জেলে। গোলটেবিল বৈঠক শেষ হইবার পর জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটিতে শাসন-ব্যবস্থার রূপ দেওয়া হয়। স্বভাবতঃই ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার ইস্পাত-কাঠামো সিবিল সার্বিস সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। তখন সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্ত এই হয় যে, নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের পাঁচ বৎসর পরে সিবিল সার্বিস সম্বন্ধে নূতন করিয়া ব্যবস্থা করা হইবে।

নূতন ভারত-শাসন আইন ১৯৩৫ সালে বিধিবদ্ধ হয় এবং প্রাদেশিক অংশ ১৯৩৭, এপ্রিল মাস হইতে কার্য্যকরী হয়। কংগ্রেসের অবিরত আন্দোলনের ফলে শাসন-ব্যাপারে ভারতবাসীর এতাদৃশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রারম্ভিক আলাপ-আলোচনার পর অধিকাংশ প্রদেশেই তাঁহারা মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন। ইহাও সিবিলিয়ান-তন্ত্রের মনঃপুত হয় নাই। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালে ইউরোপে আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া যায়। কংগ্রেস ব্রিটিশ নীতির সঙ্গে একমত হইতে না পারায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন, সিবিলিয়ান-তন্ত্রও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পর জাতির পক্ষে কংগ্রেস কয়েক বার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয় ১৯৪২ সালের আগষ্ট-আন্দোলন। ভারতবর্ষে ইংরেজ কর্তৃত্বের বিলোপ চাই—ইহাই ছিল কংগ্রেসের দাবি। এবার সিবিলিয়ান-গোষ্ঠী বজ্রমুষ্টিতে আন্দোলন দমন করিতে অগ্রসর হইল। এই সময়ে তাহাদের অনাচার-অত্যাচারের খবর সম্প্রতি কতকটা জানিতে পারা সম্ভব হইয়াছে।

পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৪২ সালে সিবিল সার্বিস সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার কথা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের গতিকে তাহা হইতে পারে নাই। সিবিল সার্বিসে নূতন নিয়োগও এই সময় হইতে বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে ভারত-শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যুদ্ধের মধ্যেই নূতন করিয়া আলাপ-আলোচনা হইতে থাকে। কংগ্রেস ব্রিটিশের মতে মত না দেওয়ায়, বরং ব্রিটিশের কাজে সাক্ষাৎ ভাবে বাধা দিতে অগ্রসর হওয়ায় সরকার ইহাকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া নেতৃবৃন্দকে কারাগারে আটক রাখেন। সিবিলিয়ান-তন্ত্র ইত্যবসরে নিজ অভিরুচি মত সকল কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে ভারত-বাসী ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতে থাকে। গত পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্ত দায়ী কে, দুর্ভিক্ষ কমিশন বসানো সত্ত্বেও তাহা প্রকৃত ভাবে জানা যায় নাই। ইহার মূলে সিবিলিয়ান-তন্ত্রের কঠোর হস্তের ক্রিয়া যখন সত্যকার ইতিহাস লেখা হইবে তখন প্রকাশ হইয়া পড়িবে নিশ্চয়। যাহা হউক, যুদ্ধের শেষে নেতৃবৃন্দকে কারামুক্তি দেওয়া হয় এবং কয়েকটি বৈঠকে অনেক আলাপ-আলোচনা-বিতর্কের পর ভারতের শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন যে অত্যাবশ্যক তাহা সরকারী ভাবে স্বীকৃত হয়। বিলাতে শ্রমিক দল নির্ব্বাচনে অভ-

নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রথমে পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি-দল প্রেরণ পূর্ব্বক সকল বিষয় অবগত হইয়া মন্ত্রিসভা এই বৎসরের গোড়ার দিকে ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে ক্যাবিনেট-মিশন প্রেরণ করেন। তাঁহারা বহুদিন যাবৎ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনার পর নেতৃবৃন্দকে লইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার স্থাপন এবং শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্ত শাসন-তন্ত্র রচনা কমিটি গঠনের উপায় নির্ণয় করেন। তাঁহাদের প্রস্তাব মত যে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারা জাতীয় আদর্শ অনুযায়ী নূতন শাসকমণ্ডলী গঠনে অগ্রণী হইয়াছেন।

সম্প্রতি প্রকাশ, সিভিল সার্বিস সম্পর্কিত যাবতীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের ভার ভারত-সচিব ভারত- সরকারের হস্তে শীঘ্রই অর্পণ করিবেন। ভারতীয় জনমত তথা কংগ্রেসের প্রচেষ্টা এত দিনে জয়যুক্ত হইতে চলিল।*

* প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ হইতে বিশেষ সাহায্য লইয়াছি,—

(1) *Selections from the Writings of Hurrish Chunder Mukherjee.*

(2) *Speeches of Ram Gopal Ghose.*

(3) *Speeches of Lalmohun Ghose.*

(4) *Indian Civil Service*—Naresh Chandra Roy

(৫) মুক্তির সন্ধানে ভারত—বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক।

নবজন্ম

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

জীবন-মৃত্যুর মাঝে তারাসম কাঁপিয়া কাঁপিয়া
কাটায়েছি কত নিশি আঁধার ব্যাপিয়া
সুখজ্যোতিহীন,
অসাড় রয়েছি ভুলে যোগনিদ্রালীন;
সহসা এ কি এ হ'ল, নবীন আলোক
পরিপূর্ণ করে বিশ্বলোক,
ঘুম ভাঙে, মোহ টুটে, মরণ নমিয়া সরে দূরে,
সহস্র জীবনহীন আঁধার জগৎ ঘুরে ঘুরে
চেতনা যে এই লভিলাম;
লহ এ প্রণাম।

অচল পাষাণ-শৈলে কঠিন তুষার
গলিল কল্লোল রোলে, ছুটে পারাবার,
বাঁধন লুটায়ে পড়ে, ভয়ে কাঁপে শত দুঃখ ভুল,
প্লাবি' প্রাণকূল
তরঙ্গ তুলিয়া নামে তীরে তীরে ধ্বংসলেশ আঁকি',
অশান্তি দুঃখের দাহ নাহি নাহি বাকি;
পুরে মনস্কাম,
লহ এ প্রণাম।

স্বর্গমন্দাকিনী হ'তে ধারা ঝরি' ঝরি'
তুলিয়া লয়েছে শুচি করি'
মুক্তিস্নানে মম উৎসমুখ,
তরঙ্গিত চঞ্চল এ বুক
নিঃসীম নির্ম্মল নীল ছায়া দিল নিখিল গগনে,
জয়যাত্রা-গানে,

সন্ধ্যার গৈরিক রাগ ঊষার উজলী স্মৃতিদীপ
ক্লান্ত ভালে দিল স্নেহ-টীপ,
মলিনতা মুছে লয়ে পূর্ণতায় প্রাণ হতে প্রাণে
ছন্দে গানে
আসিয়াছি নব মহিমায়
রূপ হতে অরূপ সীমায়;
আঁধারের রাজ্যপারে আলো গাহে তব মন্ত্রনাম,
লহ এ প্রণাম।

অতীত সঞ্চয়-গেহে পূর্ব্বজন্ম-পদচিহ্নগুলি
লেপিয়া মুছিয়া দিল হতাশাস ঝটিকার ধূলি';
অবসন্ন স্মৃতিনদী হয়েছে মুখর,
মহাস্রোতে শূন্যতায় ভরিল অন্তর,
সে সব অন্বেষি' ধীরে কত তাপ সহি'
এই তীরে এসেছি বিরহী;
কত দূর জন্মান্তর নাহি জানা কত সিন্ধু পার
অপরিচয়ের পথে লঙ্ঘিয়া প্রাকার
এই হেথা আসিলাম,—এ কি মুগ্ধ শোভা,
ক্লান্ত মনোলোভা!
অনন্ত জীবনস্রোত বয়ে গলি' গলি',
দিনু তাহে আপনা অঞ্জলি,—
নবপ্রাণ নবপ্রেমে এই সঁপিলাম,
লহ এ প্রণাম—
এ প্রাণের পূর্ণ পরিণাম।

প্লুটোনিয়ম

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক বিস্ময়কর আবিষ্কারের নাম করিতে বলিলে পরমাণু-বোমার কথাই উল্লেখ করা স্বাভাবিক, কিন্তু সৃষ্টি-সাফল্যের কথা ভাবিলে একথা অনস্বীকার্য মনে হইবে যে, বিজ্ঞানের পরম প্রাপ্তি পরমাণু-বোমা নয়, প্লুটোনিয়ম। পরমাণু-বোমার আবিষ্কারে মানুষ প্রকৃতির অনুসরণে অমিত তেজ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাতে যত প্রচণ্ড বিস্ময়ই থাকুক না কেন, বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী প্রতিভা এখানে প্রকৃতিকে পরাভূত করিতে পারে নাই, অনুকরণ করিয়াছে মাত্র, কারণ প্রাকৃতিক তেজের প্রচণ্ড উৎস সূর্য এখনও অম্লান গৌরবে বিরাজমান। অপরাপর সকল আবিষ্কারের ভিতরেও এই ব্যাপারই দেখা

লর্ড রাদারফোর্ড
আলফা-কণিকার সাহায্যে সর্বপ্রথম পরমাণু চূর্ণ করেন

যাইবে যে, মানুষের চিরন্তন প্রচেষ্টা হইয়াছে প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। কিন্তু অগণিত সাফল্যের ভিতর দিয়াও মানুষ বড়জোর প্রকৃতির সমকক্ষতায় পৌঁছিয়াছিল, তাহার চেয়ে বেশী নয়। কিন্তু প্লুটোনিয়ম নামক নূতন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হওয়াতে মানুষ প্রকৃতির পরিকল্পনাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে একথা বলা চলে।

পৃথিবীতে পদার্থ অগণিত হইলেও বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাগে পদার্থগুলি প্রধানত দুই জাতের—মৌলিক এবং মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ। মিশ্র কিংবা যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে তাহা হইতে একাধিক এমন উপাদান পাওয়া যাইবে অতঃপর যাহারা অবিভাজ্য। জল এমনই একটা পদার্থ। বিশ্লেষণ দ্বারা উহা হইতে পাওয়া যাইবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, ইহাদের কিন্তু সহজে ভাঙা যায় না। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌলিক পদার্থ। এই রকম মৌলিক পদার্থের সংখ্যা সীমাবদ্ধ, মাত্র বিরানব্বইটি। এতাবৎকাল এ কথা অখণ্ডনীয় সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে যে, বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ ভিন্ন আর কোন কিছুর স্বাধীন সত্তা নাই। এই পদার্থগুলি সকল বস্তুর মৌলিক উপাদান। যদিও বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে দুই একটির সন্ধান আজও অজ্ঞাত, কিন্তু একথা অবিসম্বাদিত সত্য বলিয়াই জানা ছিল যে, যে-কোন কারণেই হউক ত্রিনবতিতম পদার্থের প্রাকৃতিক অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রকৃতির পরিকল্পনার গণ্ডীর বাহিরে গিয়া বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছে দুইটি নবতম পদার্থ, নেপচুনিয়ম ও প্লুটোনিয়ম।

মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির স্ব স্ব গুণ, ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ঊনবিংশ শতকের শেষে রেডিয়ম জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কারের পর একথা জানা গিয়াছিল যে, মৌলিক পদার্থগুলিও বিভাজ্য বটে। এতদ্বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়াছে। এখন একথা স্বীকৃত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণু মোটামুটি তিন প্রকার কণিকায় নির্মিত। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন। প্রোটন ও ইলেকট্রনে যে বিশেষ গুণ আছে উহার অভিব্যক্তি দুই কণিকায় বিপরীতধর্মী। এই গুণকে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিয়া বলা হয়; প্রোটন পজিটিভ তড়িৎ-গ্রস্ত ও ইলেকট্রন নেগেটিভ তড়িৎ-গ্রস্ত। নিউট্রনে অনুরূপ কোন গুণ নাই বলিয়া ইহাতে কোন রকম তড়িতের প্রকাশ নাই। নিউট্রনে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন অঙ্গাঙ্গিভাবে ও প্রায় অবিচ্ছেদ্য হইয়া জড়িত রহিয়াছে এবং কার্যত নিউট্রন মৌলিক কণিকা রূপে কাজ করিলেও মূলত উহাও মৌলিক নহে। এখানে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, আমরা যে সকল তড়িৎক্রিয়া দেখি তাহাদের সবই পরমাণু-বিযুক্ত ইলেকট্রন বা প্রোটনের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি। মৌলিক কণিকাগুলির সম্বন্ধে আরও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, প্রোটন ও ইলেকট্রনের তড়িৎ-সংস্থান সমান হইলেও গুরুত্বের দিক দিয়া প্রোটন অনেক ভারী এবং উহার তুলনায় ইলেকট্রন প্রায় গুরুশূন্য। বিভিন্ন মৌলিক পরমাণুর বিভিন্নতার কারণ পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা-তারতম্য। প্রত্যেক পরমাণুতেই ইলেকট্রন-প্রোটনের সংখ্যাসাম্য রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সমাবেশ ও মোট সংখ্যার বিভেদই মৌলিক পদার্থের একটি হইতে অপরটিকে পৃথক জাতের করিয়া রাখিয়াছে। হাইড্রোজেন পরমাণু সবচেয়ে হাল্কা, উহাতে রহিয়াছে মাত্র
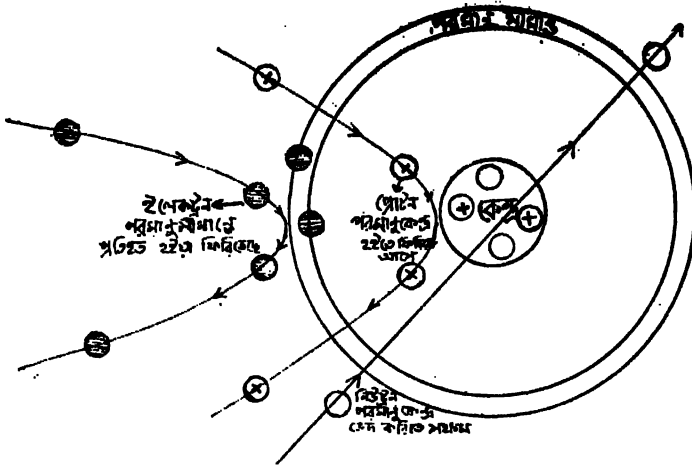
মৌলিক কণিকা (ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন) পরমাণুর দিকে নিক্ষিপ্ত হইলে উহারা কতদূর অগ্রসর হইতে সক্ষম

নানা কৌশলে একেবারে বিযুক্ত করিয়া আনাও সম্ভব, কিন্তু বহিঃস্থ ইলেকট্রনের সংখ্যা হ্রাসে পরমাণুর স্বরূপ বদলায় না অর্থাৎ এক পদার্থ অন্ত পদার্থে রূপান্তরিত হয় না, কেবল মাত্র ইলেকট্রনের অভাবে অর্থাৎ প্রোটনের সংখ্যাধিক্যে পরমাণুটি তড়িৎ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। আবার কোন প্রক্রিয়াদ্বারা পদার্থের এক পরমাণু হইতে অপর পরমাণুতে ধারাবাহিক ভাবে ইলেকট্রন চালনা করিতে পারিলে সেই পদার্থের ভিতর তড়িৎপ্রবাহ চলে।

পরমাণুর বহিরঙ্গস্থিত ইলেকট্রনদের স্থানচ্যুত করিলে পদার্থের মৌলিক চরিত্র বদলায় না, কারণ বহিঃস্থ ইলেকট্রনের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় কেন্দ্রের শাসনে। যতক্ষণ কেন্দ্রের গঠন অপরিবর্তিত থাকে ততক্ষণ পরমাণুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে। তাই এক পদার্থের পরমাণুকে অপর পদার্থে পরিবর্তন করিতে হইলে কেন্দ্রের গঠন বদলাইতে হইবে। কিন্তু এই কার্য খুব সহজ নয়। ইলেকট্রন-প্রাচীর যেন পরমাণুরাজ্যের সীমান্ত। ইলেকট্রন-সেনানীরা স্ব-স্ব রাজ্যের ধ্বজা লইয়া সেখানে সক্রিয় রহিয়াছে; কিন্তু উহাদের কোন স্বাধীন সত্তা নাই, কেন্দ্রীয় শক্তিই উহাদের নিয়ামক। রাজ্যের ওলটপালট করার বা নীতি বদলাইবার জন্ত কেন্দ্রে আলোড়ন সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু সীমান্তের সৈন্তব্যূহ ভেদ করিয়া কেন্দ্রে পৌঁছানোও সহজ নহে। পরমাণুর কেন্দ্রে পরিবর্তন সংঘটন করিতে হইলে সেখানকার প্রোটন-সংখ্যা কমানো-বাড়ানো দরকার। কিন্তু সীমান্তের ইলেকট্রনের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া পরমাণুকেন্দ্রে মৌলিক কণিকা পাঠাইবার উপায় বহু দিন আমাদের জানা ছিল না।

একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন; সবচেয়ে ভারী পরমাণু য়ুরেনিয়মের এবং এইটি মৌলিক পদার্থের তালিকায় সর্বশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত—য়ুরেনিয়মের পরমাণুতে আছে বিরানব্বইটি প্রোটন। এক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে একটি করিয়া বেশী প্রোটন দিয়া গঠিত হইয়াছে মোট বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ। কিন্তু তিরানব্বইটি বা ততোধিক প্রোটনে তৈয়ারী পরমাণুর স্বাভাবিক অস্তিত্ব নাই।

পরমাণুর গঠনের কথা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, পরমাণুর ভিতর ছুইটি পৃথক অংশ রহিয়াছে—নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র, সেখানে প্রোটন ও নিউট্রন জোট বাঁধিয়া থাকে, আর কেন্দ্রের বাহিরে অনেকটা দূরে রহিয়াছে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রনের প্রাচীর। পরমাণু-কেন্দ্রে অনেক সময় প্রোটন ও নিউট্রন একত্রিত অবস্থায় থাকিয়া মৌলিক কণিকার ন্তায় আচরণ করে। একটি প্রোটন ও নিউট্রন একত্রিত হইয়া যে কণিকা গঠন করে উহার নাম ডয়েট্রন। আবার দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন সমাবেশেও এক প্রকার কণিকা পাওয়া যায়—তাহার নাম আলফা-কণিকা। রেডিয়ম জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে এই কণিকা স্বতই নির্গত হয়।

পরমাণুর সকল গুণ ও ধর্মের অভিব্যক্তির জন্ত দায়ী পূর্বোক্ত ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রনসমূহ। উহাদের কার্যকারিতায় ফলেই পদার্থের বিভিন্ন গুণাবলী আত্মপ্রকাশ করে এবং ইহাদের সংখ্যা ও বিন্তাসের উপর উহাদের কার্য নির্ভর করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই সংখ্যা ও বিন্তাস নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রের প্রোটনগোষ্ঠী। রাসায়নিক বা অন্ত প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা পরমাণুকে যে পরিবর্তনের ভিতরেই লইয়া আসি না কেন তাহার সবই বহিঃস্থ ইলেকট্রনের উপর ক্রিয়াজনিত। সাধারণ প্রক্রিয়াদ্বারা আমরা কেন্দ্রকে স্পর্শ করিতেও পারি না। সমগ্র পরমাণু হইতে বহিঃস্থ ইলেকট্রনের দুই একটিকে

কয়েক বৎসর আগে কার্মি চেষ্টা করিয়াছিলেন সীমান্তের প্রহরীকে ফাঁকি দিয়া কেন্দ্রে নিউট্রন ঢুকাইতে। তাঁহারই চেষ্টার পরবর্তীকালে জয় হইয়াছে প্রটোনিয়মের।

পরমাণুকেন্দ্রের গঠনরীতি বদলাইতে হইলে দুই প্রকারে এই কার্য করা সম্ভব। কোন প্রকার আঘাতে কেন্দ্রকে ভাঙিয়া ফেলিয়া উহার প্রোটন-সংখ্যা কমানো যাইতে পারে কিংবা অন্ত কোন উপায়ে বাহির হইতে প্রোটন সরবরাহ করিয়া কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা চলিতে পারে। কেন্দ্রকে ভাঙিতে হইলে পরমাণুর গায়ে মৌলিক কণিকার (ইলেকট্রন, প্রোটন বা নিউট্রন) ঢিল নিক্ষেপ করা চলে। ইলেকট্রনকে পরমাণুর দিকে ছুঁড়িয়া দিলে, সে যত জোরেই হোক না কেন, এই বহিরাগত ইলেকট্রন পরমাণুর সীমান্তবাসী ইলেকট্রনদের বিকর্ষণ প্রভাবে পরমাণুর কেন্দ্রে পৌঁছান তো দূরের কথা সীমান্ত হইতেই ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিবে। ইলেকট্রনের পরিবর্তে বাহিরের দিক হইতে প্রোটন ছুঁড়িয়া
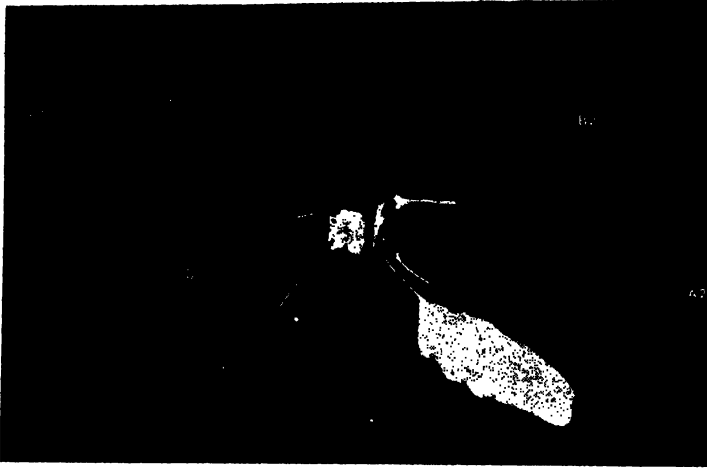
বেগযুক্ত প্রোটনের আঘাতে লিথিয়ম পরমাণু চূর্ণীকৃত হইয়া বিভিন্ন দিকে আলফা-কণিকা রূপে ছিটকাইয়া যাইতেছে

দিলে উহারা সীমান্তস্থিত ইলেকট্রন কর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইবে না (কারণ বিপরীতধর্মী কণিকারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে), বরং কেন্দ্রের সমগোত্রীয় বলিয়া সীমান্তের প্রহরীরা সসম্ভ্রমে ঘাঁটি ছাড়িয়াই দিবে, কিন্তু উহারা প্রতিহত হইবে একেবারে কেন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া—কেন্দ্রের প্রোটন বাহিরের প্রোটনকে বিকর্ষণ করিবে। এতদ্ব্যতীত নিউট্রন নির্গুণ তথা অদলীয় বলিয়া উহা সহজেই কেন্দ্রে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম।

রাদারফোর্ড এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৯১৯)। রেডিয়ম জাতীয় পদার্থ হইতে স্বতই বেগযুক্ত শক্তিশালী ইলেকট্রন ও আলফা-কণিকা ঢিলের মতই নির্গত হয়। এই প্রকারে প্রাপ্ত তীব্র বেগযুক্ত আলফা-কণিকাকে পরমাণুর উপর সংঘর্ষ ঘটাইতে দিয়া রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম নাইট্রোজেন ও এ্যালুমিনিয়ম পরমাণুকে ভাঙিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আলফা-কণিকাও খুব ভারী পরমাণু-কেন্দ্রে সংঘর্ষ ঘটাইতে অসমর্থ। আলফা-কণিকা সীমান্তের ইলেকট্রন-প্রাচীর ভেদ করিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু কেন্দ্রের সম্মুখীন হইলেই কেন্দ্রস্থিত প্রোটনগুলি উহাদের অগ্রসর হইতে দেয় না, তখন পারস্পরিক বিকর্ষণ সক্রিয় হইয়া উঠে। কেন্দ্রের প্রোটন-গোষ্ঠী সংখ্যায় যত বেশী হয়, বহিরাগত প্রোটনের পক্ষে কেন্দ্রে পৌঁছানো তত অসম্ভব হয়। প্রোটনদ্বারা কেন্দ্রে সংঘর্ষ ঘটাইতে হইলে উহাদের প্রাথমিক গতিবেগ খুব বেশী করিতে হইবে। রেডিয়ম-সি হইতে প্রাপ্ত আলফা কণিকার এমনই গতি আছে। অনুরূপ বেগযুক্ত প্রোটন পাইবার জন্য রাদারফোর্ডের সহকর্মী কক্রফ্ট এক যন্ত্র নির্মাণ করেন (১৯৩২) এবং তাহারই সাহায্যে হাইড্রোজেন পরমাণু-কেন্দ্রকে বেগযুক্ত করিয়া তিনি লিথিয়ম পরমাণুকে ভাঙিতে সমর্থ হন।

মৌলিক কণিকাকে বেগযুক্ত করিবার জন্য অতঃপর আরও কয়েকটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে—তন্মধ্যে লরেন্স-নির্মিত সাইক্লোট্রোন সর্বাপেক্ষা আধুনিক। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন, ডয়েট্রন বা আলফা-কণিকাকে ইচ্ছামত গতিশীল করা যাইতে পারে।

ইতিমধ্যে চ্যাড্উইক নিউট্রন আবিষ্কার করেন (১৯৩২)। ইহার কোন তড়িৎসংস্থান নাই বলিয়া নিউট্রন পরমাণু-কেন্দ্রে অভিযান করিবার বেশী উপযুক্ত। পোলোনিয়ম নামক তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেরিলিয়মের সঙ্গে রাখিয়া দিলে নিউট্রন নির্গত হয়। এই সকল আবিষ্কারের পরে জুলিয়ো তদীয় পত্নী আইরীন কুরীর সহযোগিতায় বিভিন্ন পরমাণু ভাঙিতে সমর্থ হন (১৯৩৩) এবং তাঁহাদের চেষ্টাতেই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায়। এক পদার্থের পরমাণু মৌলিক কণিকার আঘাতে ভাঙিয়া যাইবার

সাইক্লোট্রন নির্মাতা আর্নেষ্ট ও লরেন্স

সময়ে বেগযুক্ত প্রোটন, ইলেকট্রন বা নিউট্রন ত্যাগ করে এবং এইরূপে ইহারা রেডিয়মের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। এই কারণে ইহাদিগকে কখনও 'কৃত্রিম রেডিয়ম' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যুক্ত পরমাণুমাত্রেই য়ুরেনিয়ম-ধর্মী। সাধারণত বেশীর ভাগ য়ুরেনিয়ম পরমাণুতেই ৯২টি প্রোটনের সঙ্গে ১৪৬টি নিউট্রন থাকে। ইহারা ভারী য়ুরেনিয়ম বা য়ুরেনিয়ম-২৩৮। আবার এমন য়ুরেনিয়ম পরমাণু আছে যাহার কেন্দ্রে ১৪৩টি নিউট্রন থাকে—ইহারা হালকা য়ুরেনিয়ম বা য়ুরেনিয়ম-২৩৫। এই দুই-জাতীয় য়ুরেনিয়ম পরমাণু সর্বদিক দিয়াই অভিন্ন, কেবল উহাদের ভর সামান্ত কম-বেশী। নীয়েলস বোর আবিষ্কার করেন যে, হালকা য়ুরেনিয়মের আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, নিউট্রনের আঘাতে উহা খুব সহজে ভাঙে (১৯৩৯)। তেজ উৎপাদন কার্যের জন্ত যাহারা য়ুরেনিয়ম-বিভাজন বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন তাঁহারা এই আবিষ্কারে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। দেখা গেল যথেষ্ট পরিমাণ য়ুরেনিয়ম-২৩৫ সংগ্রহ করিতে পারিলে খুব সহজেই প্রভূত তেজ উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু য়ুরেনিয়ম-২৩৫ সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। খনিজ প্রস্তর হইতে যে য়ুরেনিয়ম উদ্ধার করা হয় তাহাতে ভারী য়ুরেনিয়মের সঙ্গে হালকা য়ুরেনিয়ম থাকে মোটামুটি ১৪০ ভাগে ১ ভাগ মাত্র। ইহাকে পৃথক করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল।

সাইক্লোট্রন হইতে বেগপ্রাপ্ত ডয়েট্রন কণিকা বাহিরে আসিতেছে

পরমাণুর রূপান্তর সম্ভব হইতেছে অর্থাৎ পরমাণু-কেন্দ্রে বহিরাগত প্রোটন বা নিউট্রন সংযোগ করা চলে দেখিয়া ফার্মি এক নূতন পরিকল্পনা লইয়া গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন (১৯৩৪)। বিরানব্বইটি প্রোটন ও এক শত ছেচল্লিশটি নিউট্রনে গঠিত সর্বাপেক্ষা ভারী য়ুরেনিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন যোগ করিয়া দিয়া উহাকে আরও ভারী করা চলে কিনা ইহাই ছিল ফার্মির গবেষণার বিষয়। তিনি য়ুরেনিয়ম পরমাণুকে নিউট্রনের আঘাতের সম্মুখীন করিয়া দেখিলেন যে, য়ুরেনিয়ম পরমাণু পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রকাশ করিলেন যে, তিনি য়ুরেনিয়ম হইতেও ভারী পরমাণু ও নবতম পদার্থ তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইয়াছেন যাহার কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা বিরানব্বইয়ের বেশী।

কয়েক বৎসর এই বিষয়ে পরীক্ষা চলিবার পর অটোহান, স্ট্রাসমান ও মীটনার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, ফার্মির দাবি সত্য নহে—নিউট্রনের আঘাতে য়ুরেনিয়ম পরমাণু নূতন পরমাণুতে পরিবর্তিত হয় নাই (১৯৩৯)। তবে তাঁহারা ইহাও বলিলেন, ফার্মির পরীক্ষায় যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা আরও বিস্ময়কর—য়ুরেনিয়ম পরমাণু ভাঙিয়া দুই টুকরা হইয়া দুইটি অপেক্ষাকৃত হালকা পদার্থের পরমাণুতে পরিণত হইয়াছে। এই হালকা পরমাণুগুলিকেই ফার্মি নবতম পদার্থ বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষায় ইহাও দেখা গেল যে, য়ুরেনিয়ম পরমাণু ভাঙিবার ফলে প্রভূত তেজ উদ্ভূত হয়। পরবর্তী কালে এই তেজই পরমাণু-বোমার প্রলয়ঙ্করী শক্তি জোগাইতে ব্যবহার করা হইয়াছে।

য়ুরেনিয়মকে ভাঙিয়া দুই টুকরা করিয়া যে তেজ পাওয়া গেল উহাকে সহজলভ্য করিবার জন্ত চেষ্টা চলিতেছিল। য়ুরেনিয়ম পরমাণুর দুই-তিনটি রকমারি আছে। ৯২টি প্রোটন-

নিউট্রন আবিষ্কর্তা স্যার জেম্‌স চ্যাডউইক

নীয়েলস বোর

পরমাণু-বোমা নির্মাণ করিবার জন্ত য়ুরেনিয়ম-২৩৫ সংগ্রহ করা অপরিহার্য হইয়া উঠিল। অনেক ব্যয়বহুল, কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যবস্থায় য়ুরেনিয়ম-২৩৫ সংগৃহীত হইতেছিল। এদিকে ফার্মি স্বীয় পরিকল্পনাতেই গবেষণা করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি দেখাইলেন যে, নিউট্রনের গতি মন্দীভূত করিয়া তদ্দারা য়ুরেনিয়ম-২৩৮কে আঘাত করিলে য়ুরেনিয়ম পরমাণু না ভাঙিয়া এমন নবতম পদার্থে রূপান্বিত হয় যাহা ৯৪টি প্রোটনে গঠিত। এই পদার্থের নাম দেওয়া হইল প্লুটোনিয়ম। ইহাকেও য়ুরেনিয়ম-২৩৫ এর মত সহজেই ভাঙিয়া ফেলা যায়। উপরন্তু, এই পদার্থ য়ুরেনিয়ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহা য়ুরেনিয়ম হইতে পৃথক করিয়া লওয়া সহজ। পরমাণু-বোমার নির্মাণকল্পে যাঁহারা য়ুরেনিয়ম-২৩৫ সংগ্রহকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁহারা এখন প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন।

য়ুরেনিয়ম-২৩৮ এর পরমাণু-কেন্দ্রে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি নিউট্রন থাকে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহাকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিলে এই নিউট্রন-কেন্দ্রে গিয়া বাধা পায়, ফলে তখন পরমাণু-কেন্দ্রে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৭টি নিউট্রনের সমাবেশ ঘটে। একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক নিউট্রনে রহিয়াছে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন। অবস্থাবিশেষে নিউট্রন ইলেকট্রন ত্যাগ করিয়া প্রোটনে রূপান্তরিত হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে বহিরাগত নিউট্রনটি কেন্দ্রে গিয়া আটকা পড়িলেও উহারই আঘাতে কেন্দ্রস্থিত দুইটি নিউট্রন একে একে ইলেকট্রন ত্যাগ করে। একটি নিউট্রন প্রোটনে পরিবর্তিত হইলে কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা হয় ৯৩। এই পরমাণু নূতন সৃষ্টি। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে নেপচুনিয়ম। ইহা অস্থায়ী পদার্থ। কেন্দ্রের অপর একটি নিউট্রনও ইলেকট্রন ত্যাগ করিয়া প্রোটনে পরিণত হয় এবং সেই অবস্থায় পরমাণু-কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা হয় ৯৪ ও নিউট্রনের সংখ্যা ১৪৫। ইহাই প্লুটোনিয়মের পরমাণু-কেন্দ্র। ইহাও একটি নূতন পদার্থ। এই পদার্থের স্বাভাবিক অস্তিত্ব নাই। প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করিবার পর ইহার নিজস্ব গুণ ও ধর্মাদি গবেষণাদ্বারা স্থির করা হইতেছে।

পরমাণু-বোমা নির্মাণের উদ্দেশ্যেই ব্যাপকভাবে প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করা হইয়াছে। প্রকাশ, প্রাথমিক প্রচেষ্টার পরে যে পরমাণু-বোমা নির্মিত হইয়াছে তাহা সবই প্লুটোনিয়মে তৈয়ারী। য়ুরেনিয়ম অপেক্ষা প্লুটোনিয়ম বেশী ভঙ্গপ্রবণ ও উহার বিভাজনে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ তেজ বিমোচিত হয়। প্রত্যেকটি পরমাণু-বোমার জন্ত নাকি এক শত পাউণ্ড প্লুটোনিয়ম প্রয়োজন হয়।
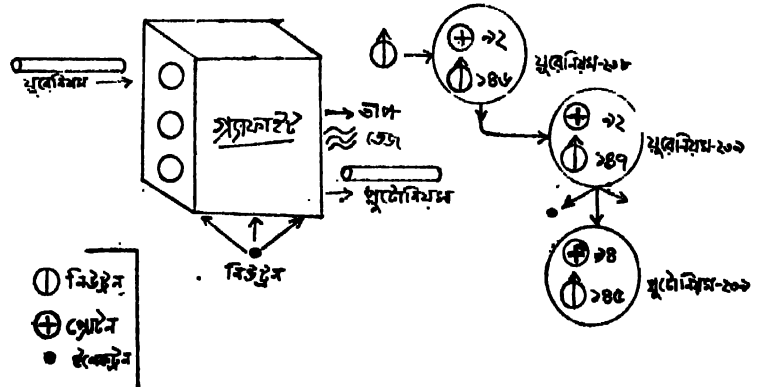
য়ুরেনিয়ম হইতে কিভাবে প্লুটোনিয়ম তৈয়ারি করা হয়

পরমাণু-বোমার জন্ত যে ব্যবস্থা দ্বারা প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করা হইয়াছিল এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফার্মি দেখাইয়াছিলেন যে মন্থরগতি নিউট্রনের আঘাতেই ভারী য়ুরেনিয়মকে প্লুটোনিয়মে পরিণত করা সম্ভব। সাধারণত পোলোনিয়ম বা অনুরূপ পদার্থ হইতে যে নিউট্রন পাওয়া যায় তাহার গতিবেগ কোন ক্রমেই মন্থর নহে। অতএব প্লুটোনিয়ম তৈয়ারীর জন্ত এইগুলির গতি মন্দীভূত করা প্রয়োজন। এক খণ্ড কারবন বা গ্র্যাফাইটের ফলকের ভিতর

দিয়া চালনা করিয়া দিলে নিউট্রন উহা ভেদ করিয়া আসিতে সক্ষম হয়, কিন্তু চলার পথে কারবন-পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ইহার বেগ কমিয়া আসে। প্লুটোনিয়ম তৈয়ারীর জন্য খাঁটি য়ুরেনিয়ম লইয়া উহাকে গ্র্যাফাইটের ভিতরে ভরিয়া দেওয়া হয়। বাহিরের দিক হইতে নিউট্রনকে উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলে নিউট্রনের গতি মন্দীভূত হয় এবং ইহারা য়ুরেনিয়ম-২৩৮কে প্লুটোনিয়মে পরিণত করে। য়ুরেনিয়ম-২৩৫ এর পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ হইলে নিউট্রন এই পরমাণুকে ভাঙিয়া ফেলিবে এবং এই ভাঙনের ফলে য়ুরেনিয়ম-২৩৫ হইতে আবার নূতন নিউট্রন মুক্ত হইবে এবং ইহারা আবার য়ুরেনিয়ম-২৩৮ এর উপর ক্রিয়া করিতে সক্ষম। এইরূপে য়ুরেনিয়মকে প্লুটোনিয়মে রূপান্তরিত করণের হার ক্রমে বাড়িয়া চলে।

এই রকম ব্যবহার সর্বশেষে য়ুরেনিয়ম হইতে যে দুইটি ইলেকট্রন বাহির হইয়া আসে তাহারা তেজ বহন করিয়া আনে এবং ইহারই ফলে বিপুল তাপের উদ্ভব হয়। এই কারণে প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করিবার সময় যন্ত্রকে ঠাণ্ডা করিবার প্রয়োজন আছে। আমেরিকার হানফোর্ডে পরমাণু-বোমা তৈয়ারীর জন্য যে সুবৃহৎ কারখানা আছে সেখানে এতদুদ্দেশ্যে কলম্বিয়া নদীর সমগ্র জলস্রোতকে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এইখানে প্রত্যহ দুই-তিন পাউণ্ড পরিমাণ প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করা সম্ভব।

প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করিয়া মানুষ নূতন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিশ্বের সৃষ্টিরহস্যে ইহা সত্যই অভিনব ও অভাবনীয়। নূতন পদার্থ সৃষ্টির পর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নবতম জীব সৃষ্টি করিতে নিয়োজিত হইলেও বিস্ময়ের কিছু নাই।

আঁখি*

শ্রীরবি গুপ্ত

যে আঁখির নীলিম আভা
হৃদয়ের পরশ লহে,
যে আঁখির কালো তারা
স্বপনের সুবাস বহে,
উষসী তাদের পরে
ঢেলেছে সোনার করে ;
কত যে এমন আঁখি
ঘুমিয়ে মাটির বুকে,
আজিও অরুণ ওঠে,
পড়ে না তাদের মুখে।
দিবসের প্রান্ত-মণি—
নিশীথের মধুরতা,
জ্বলেছে নয়ন-তলে
ভরিয়া নীরবতা ;
আকাশের তারার আভা
অবিরাম ছন্দে কাঁপা।
নয়নের মুক্ত-পথে
নামিল অন্তলিখা,
রচিল ছায়ার ভঙ্গি'
আঁধারের যবনিকা।
ধরণীর শ্যামল-ছবি
তারা কি হারায় তবে ?
দীপিকা আলো-বিহীন
কেমনে সত্য হবে ?
নয়নের উজল ধারায়
তমসা আপন হারায়

শুধু যে দৃষ্টি তাদের
নিয়েছে ভিন্ন লেখা,
ধরণীর আঁখির তারায়
যাদেরে যায় না দেখা।
আকাশের তারার মালা
কে জানে কোন্ গহনে
চলে যায় অস্তাচলে
তবু ত রয় গগনে।
তাদেরও চোখের তারা
আঁধারে হয় নি হারা
কোন এক ভুবন 'পরে
সবুজের উৎসধারা,
কেমনে বলি তারে,
হয়েছে ধ্বংস তারা।
যে আঁখির নীলিম আভা
হৃদয়ের পরশ লহে,
যে আঁখির কালো-তারা
স্বপনের সুবাস বহে ;
অনাদি আলোর কোলে
তারা যে নয়ন খোলে,
মরণের অন্তরালে
যে আঁখি বন্ধ আজি
তাদেরি তারার বীণায়
আলো যে উঠল বাজি।

* Sully Prudhomme-এর মূল ফরাসী কবিতা হইতে

মানকুমারী বসু

১৮৬৩—১৯৪৩

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানকুমারী জীবিতকালে "আমার অতীত জীবন" নাম দিয়া আত্মচরিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ('উত্তরা,' ২য় বর্ষ, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার জীবনী রচনায় ইহাই আমাদের প্রধান উপজীব্য।

বংশ-পরিচয়; বাল্য-জীবন

তিনি বাল্য-জীবনের কথা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। স্মৃতিকথায় সাল-তারিখের এক-আধটু গণ্ডগোল থাকা স্বাভাবিক। মানকুমারীর ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জামাতা—খুলনার উকীল শ্রীচারুচন্দ্র নাগ দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার জন্ম-তারিখ প্রকৃতপক্ষে ১৩ মাঘ ১২৬৯ (২৫ জানুয়ারি ১৮৬৩),—১৩ মাঘ ১২৭১ নহে।—

"যাঁহারা মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর জীবন-কাহিনী পড়িয়াছেন, তাঁহারা উক্ত কবিবরের জ্যেষ্ঠতাত ৺রাধামোহন দত্ত চৌধুরীর কথা অবশ্য মনে রাখিয়াছেন; কারণ, তিনিই সাগরদাঁড়ির দত্ত-বংশের সৌভাগ্য-প্রতিষ্ঠাকারী। তিনিই আমার পিতামহদেব। তাঁহার প্রথমা পত্নী বালিকা বয়সে গতায়ু হইলে, দ্বিতীয় বার যে পত্নী গ্রহণ করেন, সেই পত্নীর গর্ভে একমাত্র পুত্র আমার পিতৃদেব ৺আনন্দমোহন দত্ত-চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের যশোহর জেলার শ্রীধরপুর গ্রামের জমিদার ৺বনমালী বসু আমার মাতামহ দেব। আমার জননী শ্রীযুক্তেশ্বরী শান্তমণি দেবী তাঁহার আটটি সন্তানের মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠা। অতি বাল্যকালে (তখনকার প্রথামত) আমার মাতাপিতা বিবাহিত হন। বিবাহকালে পিতৃদেবের বয়স এগার, মাতৃদেবীর বয়স পাঁচ বৎসর। আমার মাতার চারিটি মাত্র সন্তান হয়।...চতুর্থ আমি—মানকুমারী সর্ব্বকনিষ্ঠা।... ১২৭১ সালে ১৩ই মাঘ রাত্রিকালে, মাতুলালয় শ্রীধরপুরে এ অভাগিনীর জন্ম হয়।...শিশুকালে আমাকে "অভিমানিনী" বুঝিয়াই নাকি আমার নামকরণ হইয়াছিল।...আমি অতি বাল্যকাল হইতে আমার মাতা-পিতাকে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি অথবা পুরাণের শিবশক্তির মতই দেখিতে পাইয়াছিলাম। বাবা পুস্তক-পাঠ, পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনা, শিবপূজা, পুরমহিলাদিগের নিকটে পুরাণ পাঠ, বালিকাদিগকে সদুপদেশ দান এবং শিশুদিগের সহিত ক্রীড়া এই সব করিতেন। আর মা কার্য্যকারকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, পুত্রের উন্নতিচেষ্টা, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন, গৃহকর্ম্মে অসাধারণ নৈপুণ্য, এই সব করিতেন।...

আমি বাবার কাছে, আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার পত্নীর কাছে এবং আমার এক দিদির কাছে প্রথম ভাগ পড়িতে লাগিলাম। ঙ-কার বানান শেষ হইলেই দ্বিতীয় ভাগ ধরিলাম। দ্বিতীয় ভাগের যুক্তাক্ষর শীঘ্র মুখস্থ হইবে বলিয়া বাবা আমার সহিত সর্ব্বদা বানান করিয়া কথা কহিতেন। যুক্তাক্ষর পড়া শেষ হইলে আমাদের বাহির বাটীতে বালিকা-বিদ্যালয় হইতে লাগিল। আমি দ্বিতীয় ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কথামালা লইয়া পড়িতে স্কুলে চলিলাম।...বিদ্যালয়ে যাইবার সময়ে বাবার আদেশমত ভগবানের চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাঁহারই কৃপায় পাঠ আমি খুব শীঘ্র শিখিতে লাগিলাম; কিন্তু হাতের লেখার বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতাম না।...এই সময়ে আমি ঘরে বসিয়া বাবার পুস্তক সকল অর্থাৎ কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীখণ্ড, হর-পার্ব্বতী-মঙ্গল প্রভৃতি পড়িতাম আর পুরবাসিনীদিগের অনুকরণে, বাবা মা দাদা প্রভৃতি আত্মীয়দিগের উদ্দেশে কৃত্রিম পত্র লিখিতাম।...আমার দাদা স্ত্রী-শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন।...আমার সধবা ভ্রাতৃজায়া 'বামাবোধিনী'র গ্রাহিকা ছিলেন। উক্ত পত্রিকায় বামা রচনা দেখিয়া তাঁহারাও গদ্য-পদ্য রচনা করিতেন। এই সব দেখিয়া আমারও "রচনা" করিতে মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত।...

আমি চাঁদের জ্যোৎস্নায় বসিয়া উপকথা রচনা করিয়া খাতায় লিখিতাম।...পদ্য বা গদ্য অর্থাৎ উপকথা যাহা লিখিতাম, কাহাকেও দেখাইতাম না,...তাহার ভিতর রচনায় দুইটি ছত্র মাত্র আমার স্মরণ আছে, তাহা এই:—

"রাখ রাখ সবে ভাই বচন আমার,
ঈশ্বরের পদে কর কর নমস্কার।"

গদ্য রচনারও একটু নমুনা দিলাম; "এক রাজ-কন্যার বারাণ্ডায় এক ঝাঁক পাখী আসিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে রাজ-কন্যা একটি পাখী ধরিয়াছিলেন; তাহার গায়ের রং লাল, সবুজ, হলুদে, আর কালো; এমন সুন্দর পাখী কেহ কখনও দেখে নাই; তাহাকে দেখিতে ঠিক যেন একটি বাদুড়।" এই রচনা দেখিয়া আমার ভ্রাতৃজায়ারা হাসিয়া গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, আমি ভয়ানক অপ্রতিভ হইয়াছিলাম; সৌন্দর্য্যের শেষ উপমের "বাদুড়" হওয়া যে এত হাসিবার কথা তাহা আমি মোটেই বুঝি নাই, কারণ "বাদুড়" আমি তখন মোটেই দেখি নাই।"

বিবাহ ও বৈধব্য

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যানন্দকাটী গ্রাম-নিবাসী বিবুধশঙ্কর

বসুর সহিত ১০ বৎসর বয়সে মানকুমারীর বিবাহ হয়। বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে অধিক দিন স্বামি-সুখ লেখেন নাই; দশ বৎসর যাইতে-না-যাইতেই তিনি একটি কন্যা লইয়া বিধবা হন। তাঁহার আত্মকথায় প্রকাশ :—

"আমার পিত্রালয় সাগরদাঁড়ি গ্রামের পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বিদ্যানন্দকাটী গ্রাম। সেখানকার বসু মহাশয়েরা ধন, মান, বিদ্যাবত্তা এবং লোকহিতকর কাজের জন্ত সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। আমার এক পিতৃব্যের দুইটি কন্তা ঐ বসু মহাশয়দিগের গৃহে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। আমার সেই দিদিদিগের কয়টি দেবর কার্য্যোপলক্ষে একদিন আমার সেই পিতৃব্যের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই একজনকে দেখিয়া আমার মাতৃদেবী, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং সচ্চরিত্রতার কথা শুনিয়া, নিজ জামাতা করিতে একান্ত ইচ্ছুক হন। ক্রমে সেই পাত্রের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ করেন।...বাবা তাঁহার স্নেহের কন্তাকে মহাসমারোহপূর্ব্বক, ১২৭৯ সালে ৭ই মাঘ তারিখে, সেই মনোনীত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ...বিবাহের সময়ে চারি পাঁচ দিন শ্বশুরালয় গিয়া শ্বশুর, শাশুড়ী, ননন্দা, জা প্রভৃতি নূতন আত্মীয়দিগের যথেষ্ট আদর পাইয়া মাতৃ-ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।...

তেরো বৎসর বয়সে পড়িয়াই অর্থাৎ বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইবামাত্র আমাকে দ্বিতীয় বার শ্বশুরালয়ে যাইতে হইয়াছিল। ...আমার শ্বশুরালয়ে গিয়া দেখি, তাঁহারা বৃহৎ পরিবার।... সেখানে অনেক লোক ছিলেন, তাঁহাদের প্রকৃতিও নানা রকম। আমাকে "অদ্ভুত জীব" দেখিয়া অর্থাৎ আত্মগোপন করিতে অক্ষম, ছলনা-চাতুরীতে অনভ্যস্ত এবং গৃহ-কর্ম্মে অপটু, এমনতর অদ্ভুত জীব দেখিয়া অনেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং নিষ্ঠুর সমালোচনা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। কেবল আমি বলিয়া নহি, বঙ্গগৃহের অনেক বালিকা বধূকেই এইরূপে "মানুষ" হইতে হয়।

যাহা হউক ক্রমে ক্রমে আমাকে বিনীতা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দেখিয়া গুরুজনেরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। আর আমার তখনকার সরলতা ও কবিতা রচনার ক্ষমতা দেখিয়া ননন্দা প্রভৃতি সমবয়স্কাগণ আমাকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিলেন। এখানে আমি একগুঁয়েমি ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সকলকে প্রসন্ন করিতে এবং গৃহকর্ম্ম শিখিতে একান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার জ্যেঠা জা শিল্পকার্য্যে সুনিপুণা, তাঁহার নিকটে সেলাই শিখিলাম।

তখন পতি-দেব কলিকাতায় পড়িতেন। ছুটিতে বাটী আসিয়া আমার ননন্দাদিগের নিকটে আমার কবিতা রচনার কথা শুনিলেন। তিনি আমাকে প্রত্যহ এক-একটি কবিতা রচনা করিতে বলিলেন।· তিনি যে আমার পরম সুহৃদ্ শ্বশুর-বাটীতে আসিয়া তাহাই আমার বিশ্বাস হইল। ক্রমশঃ তাঁহাকে তুষ্ট ও সন্তুষ্ট করাই আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে আমি সমস্ত গৃহকর্ম্মের মধ্যে দিনের বেলায় এক একটি পদ্য লিখিয়া রাত্রিতে তাঁহাকে "উপহার" দিতাম। এই কাজ খুব গোপনে করিতে হইত। কারণ, তখনকার দিনে এরূপ কাজ বড়ই

মানকুমারী বসু

"লজ্জা"র, বড়ই "অসমসাহসে"র এবং "বিরক্তি"র বিষয় হইত। যাহা হউক স্বামী ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইতেন এবং পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত উহা পাঠ করিতেন। বন্ধুগণ সেই কবিতার সুখ্যাতি করিতেন; কিন্তু আমি পাছে সুখ্যাতি শুনিয়া অহঙ্কৃতা হইয়া উঠি, এজন্ত স্বামী অত্যন্ত সতর্ক হইতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি আমার নিকটে —যিনি আমাদের বঙ্গ-মহিলা-কুলের শীর্ষস্থানীয়া সেই 'দীপ-নির্ব্বাণ' 'ছিন্নমুকুল' রচয়িত্রী, সুকবি প্রসন্নময়ী দেবী প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণের আদর্শ রচনাশক্তি আমার সম্মুখে ধারণ করিতেন। আমাকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে তাঁহার মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত, কিন্তু তিনি সময় ও সুযোগ পাইতেন না। তাঁহার নিজের পাঠ্যাবস্থা, সেজন্ত অধিকাংশ সময়ে কলিকাতারই থাকিতেন; যে সময়ে বাটী আসিতেন, তখন গুরুজনদিগের শাসনে, লজ্জার অনুরোধে দিনের বেলায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইত না। রাত্রি ১২টা কি ১টার সময়ে যখন শয়ন-গৃহে যাইতাম, তখন আমি পড়িতে ইচ্ছা করিলেও, তিনি আমার অসুস্থতার আশঙ্কায় নিষেধ করিতেন; সেই জন্ত তাঁহার কাছে আমার লেখাপড়া হইত না।

আমার বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন আমি "পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা" শীর্ষক অমিত্রাক্ষর ছন্দে, বীররস-পূর্ণ একটি কবিতা লিখিয়া স্বামীকে দিয়াছিলাম; তাহার প্রথম কয়েক ছত্র এই—

"দুরন্ত যবন যবে ভারত ভিতরে
পশিল আসিয়া, পুরন্দর মহাবলী

কেমনে সাজিলা রণে, প্রিয়তমা তার
ইন্দুবালা কেমনে বা করিলা বিদায় ?
কৃপা করি কহ মোরে হে কল্পনা দেবী।
কেমনে বিদায় বীর হ'ল প্রিয়া কাছে।"

পদ্যটি সুদীর্ঘ হইয়াছিল। স্বামী এবং তাঁহার কলিকাতার বন্ধুগণ ইহা পড়িয়া বিশেষ প্রীত হন। কিছু দিন পরে একজন বন্ধু এই কবিতাটি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে মুদ্রিত করেন। ইহাই আমার প্রথম প্রকাশ্য লেখা।

কবিতাটি মুদ্রিত করিয়া উক্ত কাগজের সম্পাদক টীকায় লিখিয়াছিলেন, "আমরা অবগত হইলাম, লেখিকা কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী; ইনি ইঁহার পিতৃব্য-সৃষ্ট বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরে যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার গলায় আমরা প্রশংসার শত-নরী হার পরাইলাম। চর্চ্চা থাকিলে ইঁহার মধুময়ী লেখনী কালে অমৃত প্রসব করিবে।"

ইহা দেখিয়া পতিদেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "লোকে প্রশংসা করিতেছে বলিয়া তুমি যেন গর্ব্বিতা হইও না। দেখ দেখি, তোমার কাকা কত বড় ক্ষমতাপন্ন কবি ছিলেন; তুমি তাঁহার উপযুক্তা ভ্রাতুষ্পুত্রী হইলে তবে আমার মুখোজ্জ্বল হইবে। স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া সকলে এতটা প্রশংসা করে।"

যাহা হউক, আমি বিশেষ উৎসাহ পাইয়া দুই বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং উপন্যাস লিখিয়াছিলাম। তাহা স্বামীর কাছে দিয়াছিলাম; তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধুর একান্ত প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

স্বামী আমাকে কলিকাতা হইতে ইংরাজী শিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার আদেশে আমি আনন্দের সহিত আমার একখানা খাতাকে সঙ্গিনী করিয়া বাটীর বালকদিগের নিকটে ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

আমার বয়স যখন সতর বৎসর তখনই আমার একমাত্র সন্তান—আমার কন্যাটি ভূমিষ্ঠা হয় [৩০ ডিসেম্বর ১৮৮০]। তখন আমি পিত্রালয়ে ছিলাম। আমার কন্যার বয়স যখন কুড়ি দিন তখন আমার পরমারাধ্যতম স্নেহময় বাবা আমাদিগকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার উদ্দেশে আমি একটি শোক-গাথা লিখিয়াছিলাম। তার পর অনেক দিন আর লেখাপড়া করিতে পারি নাই।

পর বৎসর [ইং ১৮৮২] স্বামী মেডিকেল কলেজ হইতে এল্. এম্. এস্. (L.M.S.) উপাধিপ্রাপ্ত হন।···কিন্তু আমার অদৃষ্টে এত সুখ ও সৌভাগ্য বেশী দিন সহিল না। আমার শ্বশুরঠাকুরের অনুরোধে এবং কয়েকটি সম্ভ্রান্ত বন্ধু-বান্ধবের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে স্বামী সাতক্ষীরা মহকুমায় ডাক্তারি করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সেখানে "সুদক্ষ চিকিৎসক" বলিয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইলেন। দু'জনেই মনে করিয়াছিলাম, এইবারে আমাদের সকল কষ্টের অবসান হইল। তিনি আমাকে বারংবার বলিয়াছিলেন, "এইবার আশ্বিন মাস হইতে তোমাকে, খুকীকে এবং আমার ছোট ভাই দু'টিকে আমার কাছে লইয়া যাইব।" আমার এক ননন্দা পীড়িতা হওয়াতে তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন। দুই তিন দিন মাত্র বাড়ীতে থাকিয়া ২৭শে বৈশাখ সাতক্ষীরায় চলিয়া গেলেন। আমরা উভয়েই আশ্বিন মাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

শ্রাবণ মাসে তাঁহার দারুণ পীড়ার সংবাদ আসিল। আমার শ্বশুর, আমার অন্যতম ডাক্তার দেবর, আমার দাদা প্রভৃতি একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সাতক্ষীরায় চলিয়া গেলেন। কেহ আমাকে লইয়া যাইবার কথা বলিলেন না। আমি হিন্দু কুলবধূ, লজ্জায় ভয়ে কিছুই বলিলাম না। কেবল তাঁহার আরোগ্য-সংবাদ পাইবার জন্য পথ চাহিয়া রহিলাম; কেবল তাঁহার মঙ্গল-কামনায় ভগবানকে ডাকিলাম···তার পরে আর কি বলিব ? সংবাদ পাইলাম, যিনি আমার রমণী-জীবনের অবলম্বন, আমার সেই পরোপকারী, দয়ালু দেবপ্রতিম পতি-রত্ন, তিনি ২৯শে শ্রাবণ সোমবারের রাত্রিতে আমাকে জগতের দুয়ারে হতভাগিনী করিয়া ভগবানের কাছে চলিয়া গিয়াছেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিদ্যানন্দকাটির বাটীতে থাকিয়া আমি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। তখন আমার বয়স উনিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই—সাড়ে আঠারো।"

সাহিত্য ও সমাজ সেবা

বিধবা হইবার পর সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে মানকুমারীর মন বসিত না; তিনি শেষে কবিত্বশক্তির অনুশীলনে ও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"অতি বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এইরূপ হইয়াছিল যে, কোনরূপ সুখ-দুঃখাদি কর্ত্তৃক আমার মন একটু উত্তেজিত হইলে আমার একটি কবিতা হইত। এই কবিতা প্রায়ই পদ্য, সময়ান্তরে গদ্য কবিতাও লিখিতাম। আমি যখন সেই তরুণ বয়সে নিদারুণ পতিশোক প্রাপ্ত হইলাম, তখন যেন আমার হৃদয় পিষিয়া কবিত্বশক্তি সকল বাহির হইতে লাগিল। এই শোকোন্মাদ অবস্থায় আমার গদ্যকাব্য 'প্রিয় প্রসঙ্গ' রচিত হইয়াছিল। উহা কেবল নিজের মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই লিখিতাম। বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য কোন চিন্তা করি নাই।

আমার একজন কৃতবিদ্য আত্মীয় তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে ঐ হস্তলিপি দেখিতে পান, এবং উহা ছাপাইলে বিধবা রমণীগণের একটা সান্ত্বনার জিনিস হইবে এইরূপ পরামর্শ দেন। আমার স্বর্গীয় পতিদেবের একটি স্মৃতি রক্ষা হইবে, ইহা মনে করিয়া উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে আমি একান্ত উৎসুক

হই। আমার স্বামীর পরলোক গমনান্তে আমার আত্মীয়গণ, তাঁহার কিছু অর্থ আমাকে আনিয়া দিয়াছিলেন, আমি সেই অর্থ দিয়া আত্মীয়ের নিকটে উঁহার মুদ্রাঙ্কনের ভার প্রদান করি। পুস্তকে আমার নাম এবং পরিচয় দিতে নিষেধ করি। এই কাজ খুব গোপনে করিয়াছিলাম। এখন আমার মনে হয়, তখন আমার যে রকম লজ্জা সঙ্কোচাদি ছিল, তাহাতে যদি আমার মন সেরূপ অপ্রকৃতির না হইত, তবে আমি 'প্রিয় প্রসঙ্গ' ছাপাইতে পারিতাম না। যাহা হউক, 'প্রিয় প্রসঙ্গ' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে আমার আত্মগোপনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকে বুঝিতে পারিলেন আমিই উঁহার রচয়িত্রী। তখন অনেক হিংসা, দ্বেষ, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আমাকে সহিতে হইয়াছিল। আমার এত আদরের 'প্রিয় প্রসঙ্গ'ও সাধারণের কাছে আদৃত হয় নাই। বিজ্ঞাপনাদি অভাবে অনেকে উঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনেক দিন জানিতে পারিলেন না।...

যখন ক্রমশঃ দিন যাইতে লাগিল, তখন কেবল গুরুজনের সেবা, শিশুপালন অথবা সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া আমার হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না। বাকী জীবনটি কি করিয়া কাটাইব, তাহাই আমার চিন্তার বিষয় হইল। ভগবান এ অধম সন্তানকে যে বিদ্যানুরাগ ও একটু কবিত্বশক্তি দিয়াছিলেন, তাহাই অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ক্রমে বুঝিলাম, জগতে থাকিতে হইলে বিশ্ব-বিধাতার কাজে আত্মোৎসর্গ করা উচিত। বলা বাহুল্য, তখন ভগবানের স্নেহে অবিশ্বাস বা তাঁহার উপরে অভিমান দূর হইয়াছিল। আমার অদৃষ্টকে আমি পাইলাম। ইহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। আমি মনে করিলাম, সধবা মহিলাদিগের যেমন সংসারের কাজ করা কর্ত্তব্য, বিধবা মহিলাদিগের সেইরূপ সমাজের কাজ করা কর্ত্তব্য। ইহা যখন আমার "সত্য" বলিয়া ধারণা হইল, তখন সেই অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতা দ্বারা সমাজের সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এই সময় আমি পুরাতন বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কবিতা, এবং সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক গ্রন্থ পড়িতাম। নবজীবন, প্রচার, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিকপত্র এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'হৃদয়োচ্ছ্বাস' পড়িতে আমার স্বদেশ ও স্বজাতীয়া ভগিনীদিগের জন্য অনেক চিন্তা উপস্থিত হইত; সেই সকল চিন্তা আমি অনেক সময়ে লিপিবদ্ধ করিতাম। যখন পিত্রালয়ে থাকিতাম, তখন আমি দাদার নিকট অনেক মিনতি করিয়া তাঁহার কাছে একটু ইংরাজী পড়া শিখিয়া লইতাম। একখানি উপক্রমণিকা ব্যাকরণ হইতে শব্দরূপ, ধাতুরূপ প্রভৃতি মুখস্থ করিতাম।...এ সময়ে আমি আমার বিশেষ আত্মীয় ব্যতীত কোন পুরুষের সম্মুখীনা হইতাম না; কোন আমোদ বা উৎসাহে যোগ দিতাম না; এবং স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গেও বিশেষ মিশামিশি বা রহস্যালাপ করিতাম না। আমার স্বর্গীয় স্বামীর দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমার উপরে নিপতিত আছে ইহাই আমার ধারণা ছিল।

আমাদের বাড়ীতে 'সখা' নামক মাসিকপত্র আসিত। সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন দেশের বালক-বালিকাদিগকে জ্ঞানানুশীলন এবং নীতিশিক্ষা দান করিয়া গঠিত-চরিত্র করিবেন এই উদ্দেশ্যে 'সখা' প্রবর্ত্তন করেন। আমি তাঁহার এই সাধু কাজের সহায়তা করিতে একান্ত ব্যগ্র হইলাম। 'সখা'র উপযুক্ত কবিতা লিখিয়া প্রমদাবাবুর নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি যত্নপূর্ব্বক প্রকাশ করিলেন। সেই হইতে কিছু দিন পর্য্যন্ত 'সখায়' লিখিতে লাগিলাম।* কিছু দিন পরে প্রমদাবাবু ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সেই অ-দৃষ্ট বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে আমি মনে মনে বড় শোকাকুলা হইলাম। এরূপ দুঃখে কেহ সহানুভূতি করিবে না বলিয়া কাহাকেও বলিলাম না। তখন "শোক-সঙ্গীত" শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়া 'সখা'র উদ্দেশে প্রেরণ করিলাম। প্রমদাবাবুর ভ্রাতা এবং 'সখা'র রক্ষক বাবু অন্নদাচরণ সেন তাহা সাদরে গ্রহণ করিলেন। অনেকগুলি প্রাপ্ত কবিতা হইতে কেবল আমার সেই কবিতাটি 'সখা'য় [আগষ্ট ১৮৮৫] প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে একখানি অতি সুন্দর ছবির পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন।

আমার জাতীয় ভগিনীগণের জন্য কিছু কাজ করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল হইল। সেই জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া আমি বামাবোধিনীর লেখিকা-শ্রেণীভুক্তা হইলাম।† কিছু দিন বামাবোধিনীতে কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার অধিকাংশ আমার স্বর্গীয় পতিদেবের উদ্দেশে রচিত।

বামাবোধিনীর ২৫শ বর্ষ পূর্ণ হইলে ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয় উহার জন্য "জুবিলী" করেন। সেই সময়ে অনেকগুলি পুরস্কার-প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন দেন। আমি তিন-চারিটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এবং প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিশ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলাম। বামাবোধিনীর বিজ্ঞাপনানুসারে 'বনবাসিনী' নামক এক ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিয়া উক্ত সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি উহা অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বামাবোধিনীর জুবিলীতে বিতরণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিধবা রমণীর কর্ত্তব্য বিষয়ে আমি অনেক

* প্রমদাচরণ সেন-সম্পাদিত ৩য় বর্ষের 'সখা'য় (১৮৮৫, জানুয়ারি ও মে সংখ্যা) "জনৈক বঙ্গ মহিলা" নামে মানকুমারীর "সোহাগ" ও "নববর্ষ" শীর্ষক দুইটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

† 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মানকুমারীর প্রথম রচনা—"আমার দেবতা" নামে একটি কবিতা। ১২৯৩ সালের ভাদ্র (সেপ্টেম্বর ১৮৮৬)-সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সময়ে চিন্তা করিতাম। সেই চিন্তার ফলে আমার মনে হইল, জ্ঞানধর্ম্মে আত্মগঠন করিয়া ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, হৃদয়ের মধ্যে স্বর্গীয় স্বামীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, স্বজাতীয় ভগিনীগণের উন্নতিসাধন, শিশুদিগকে উপযুক্তরূপে গঠন এবং অনাথ আতুরদিগকে সেবা, ইহাই বিধবা রমণীদিগের কর্ত্তব্য। আমার এই কথা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য উপন্যাসাকারে 'বনবাসিনী' লিখিয়াছিলাম। ইহা বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয় স্বতঃই বুঝিয়াছিলেন। 'বনবাসিনী'র প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে যখন কলিকাতায় "দাসাশ্রম" প্রতিষ্ঠা হয়, তখন উক্ত মহাশয় আমাকে এক পত্র লিখেন, "মা! তোমার 'বনবাসিনী' কল্পনা সফল হইয়াছে"—ইত্যাদি। ঐ ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণের নিকটে খুব আদৃত হইয়াছিল।

এই "জুবিলী" সময় হইতে বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয় আমাকে নিজ কন্যারূপে স্নেহ করেন। আমার শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণসাধন, তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। আমার লেখা তিনি সাগ্রহে, সমাদরে সম্পাদকীয় স্তম্ভে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। লিখিত বিষয়ে কোন ত্রুটি হইলে তাহাও স্নেহের সহিত বুঝাইয়া দিতেন। আমাকে যেরূপ সদুপদেশ দিয়া পত্র লিখিতেন, আমার জীবনে তাহা যেরূপ প্রার্থনীয় সেইরূপ দুষ্প্রাপ্য। তিনি ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য এবং দেবতুল্য চরিত্রবান্ জানিয়া তাঁহার কাছে পত্রাদি লিখিতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা সঙ্কোচ হইত না। আমি মনে মনে তাঁহাকে আমার পিতৃদেবের মত ভক্তি করিতাম। এই সময় হইতে বামাবোধিনীতে আমি পদ্য অপেক্ষা গদ্য প্রবন্ধ অধিকাংশ লিখিতে লাগিলাম। আমাদের অন্তঃপুর-শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী, পল্লীগ্রামের স্ত্রী-চিকিৎসক এবং ধাত্রীর আবশ্যকতা বিষয়ে আমি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য একাধিক বার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বাল্য-বিবাহ নিবারণ এবং বরপক্ষের অর্থলুব্ধতা নিবারণ জন্যও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। অতঃপর আমি নব্যভারত পত্রে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই সঙ্গে অন্যান্য মাসিকপত্রে দুই-চারিটি কবিতাও প্রকাশ করিয়াছিলাম।

৺ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের পুরস্কার প্রবন্ধ "বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম" রচনার প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায়, আমি ১২৯৬ সালে পুরস্কার পাইয়াছিলাম। ঐ কথা শুনিয়া আমার কয়জন আত্মীয় "যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী" সভার বিজ্ঞাপনানুসারে "বিবাহিতা রমণীর কর্ত্তব্য" বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। সেই প্রবন্ধের জন্য প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় আমি প্রথম হইয়াছিলাম এবং মিসেস্ বি. দে. প্রদত্ত রৌপ্য মেডেল পাইয়াছিলাম। সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষেরা সেই প্রবন্ধটি উক্ত সম্মিলনীর কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ করেন। বামা-হিতৈষী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় তাহা দেখিয়া নিজ সহৃদয়তায় একান্ত আনন্দিত হন, এবং আমাকে বিশেষ উৎসাহজনক পত্র লিখিয়া কতকগুলি পুস্তক পাঠাইয়া দেন। ঐ প্রবন্ধ দেখিয়া মহাত্মা ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (ধাত্রী-শিক্ষা-প্রণেতা) তাঁহার 'বাঙ্গালী মেয়ের নীতিশিক্ষা' পুস্তকে আমার নাম মুদ্রিত করিয়া, বিশেষ গৌরবসূচক এক পত্র মুদ্রিত করিয়া, উহা আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। ইহার পরে আরও দুই বারে আমি যশোহর-খুলনা-সম্মিলনীতে "সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য" এবং "মহৎ জীবনী" নামক প্রবন্ধ রচনায় প্রথম বিবেচিত হই এবং শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার পাই।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ও আমাকে যার-পর-নাই স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতে থাকেন। তাঁহার এবং বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়ে আমি অধিকতর মনোযোগপূর্ব্বক ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিখিতে চেষ্টা করি। তখন আমার শিক্ষক বিশেষ কেহই ছিল না। আমি ভগবানের উপরে নির্ভরপূর্ব্বক একান্ত চেষ্টা করিতেছিলাম। একদিন ইংরাজী পড়িতাম আর একদিন সংস্কৃত পড়িতাম। ইংরাজী এবং দেবনাগর অক্ষর লিখিতেও শিখিতাম। যেদিন আমার ইংরাজী হস্তাক্ষর বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম, আর যেদিন টীকা দেখিয়া কুমারসম্ভব পড়িতে পারিয়াছিলাম, সেই দিন ঐ মহাশয়দ্বয় যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আমার চিরস্মরণীয়। মানবের মাতৃ-পিতৃ-স্নেহঋণ যেমন অপরিশোধনীয়, ঐ দুই আরাধ্যতমের স্নেহের ঋণও আমার সেইরূপ অপরিশোধ্য।...

এই সকল সময়ে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গীতা পাঠ করিতাম। আমার গীতাপাঠ শেষ হইলে তখন বাড়ীর সকলে উঠিতেন। তখন আমি ব্যাকরণ কৌমুদীর খানিকটা মুখস্থ করিতে করিতে, অথবা ইংরাজী বানান শিখিতে শিখিতে গৃহকর্ম্ম করিতাম। আহারের সময় বেশী খাইলে পাছে শরীরে আলস্য হয় সেই ভয়ে সামান্য রূপ আহার করিতাম। দিনের বেলায় ৩।৪ ঘণ্টা এবং রাত্রিতে ৫।৬ ঘণ্টা লেখাপড়ার সময় পাইতাম। আহার নিদ্রা বিষয়ে বিশেষ সংযত হইয়াছিলাম। কিন্তু বেশী দিন ইহা সহিল না—সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় আমার "শারীরিক বৃত্তি সকল যথোচিত অনুশীলিত" হইয়াছিল না, তাই কিছু দিন মধ্যে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল।

বলিয়াছি, বামাবোধিনী, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিকপত্রে আমি কবিতা লিখিতাম। পূজনীয় কবিরত্ন মহাশয় স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল সংগ্রহপূর্ব্বক কাব্যকুসুমাঞ্জলি নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং উহার বিজ্ঞাপন লিখিয়া দেন। ইহার পরে স্নেহময় কবিরত্ন মহাশয়ের আগ্রহ ও অনুগ্রহে আমার 'কনকাঞ্জলি' 'প্রিয়-প্রসঙ্গ' (২য় সংস্করণ), 'বীরকুমার-বধ কাব্য' জনসমাজে প্রকাশিত হইয়াছে।

বামাবোধিনীর ত্রিশ বৎসর বয়সেও এক জুবিলী হইয়াছিল,

আমি তাহাতে বিজ্ঞাপনানুসারে "বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণী-দিগের অবস্থা"-শীর্ষক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাহার পরীক্ষক ছিলেন; সেবারেও আমি কয়েক জন পুরুষ ও রমণীর সহিত প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হই।

যাঁহারা দেশ-হিতৈষী, নারী-হিতৈষী এবং সমাজ-শিক্ষক, তাঁহাদিগকে আমি মনে মনে গভীর ভক্তি করিতাম। বরিশালের শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের 'ভক্তিযোগ' পড়িয়া অবধি প্রত্যহ প্রত্যূষে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতাম। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমি জীবনে কখনও না দেখিলেও তাঁহাকে একান্ত আত্মীয়ের ন্যায় ভক্তি করিতাম।... এই বঙ্গদেশে যাঁহারা সমাজ-শিক্ষকরূপে পরিগণিত,—যাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, নীতিবেত্তা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং সুকবি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে মনুষ্যত্ব-লাভে সহায়তা করিয়াছেন (ব্যক্তিগত ভাবে না হইলেও শক্তিগত ভাবে)। আমি এই সকল লোকের নিকট ঋণী। এইরূপে নব্যভারতের অন্যতম সুকবি বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিত্বশক্তি এবং ৺গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যিক শক্তির নিকট আমি প্রচুর পরিমাণে ঋণী। সকলের অপেক্ষা সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের ঋণই আমার গুরুতর। কেবল সাহিত্য-শিক্ষা বিষয়ে নহে। আমার চির অপ্রত্যক্ষ ধর্ম্মতত্ত্ব-প্রণেতা আচার্য্যদেবকে আমি গুরুদেবের আসনে বসাইয়া, তাঁহারই উপদেশানুসারে আত্ম-গঠন-চেষ্টা করিয়াছি।"

গ্রন্থাবলী

মানকুমারী যে-সকল পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশ-কাল, বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **প্রিয় প্রসঙ্গ**। বা হারানো প্রণয় (গদ্য-পদ্য)। ইং ১৮৮৪ (২৪ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৩০।

পুস্তকে লেখিকার নাম ছিল না; ইহা "কোন বঙ্গমহিলা প্রণীত" ও "এস্‌ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত।" প্রকাশকের নিবেদনটি এইরূপ:—"নবীনা বঙ্গবালার তরুণ শোকোচ্ছ্বাস বঙ্গবাসীর সমক্ষে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ...গ্রন্থকর্ত্রী পল্লীগ্রামে শিক্ষিতা, উচ্চ শিক্ষা বিবর্জ্জিতা, বিধবার কি মর্ম্মান্তিক যাতনা তাহাই চিত্রিত করা নবীনা লেখিকার উদ্দেশ্য, পরিমার্জ্জিত ভাষার সহায়তায় হীন বঙ্গসাহিত্যের উৎকর্ষ বিধান তাঁহার ইচ্ছা নহে ইহা যেন সকলে স্মরণ রাখেন।"

'প্রিয় প্রসঙ্গে' এই কয়টি রচনা আছে:—দুর্গোৎসব, তুমি কোথায়?, চিত্রপট, মুকুরে মুখ, পিঞ্জরে বিহঙ্গী, মরুভূমে মরীচিকা, অরণ্যে রোদন (কবিতা), একাদশী।

পনর বৎসর পরে তারাকুমার কবিরত্ন এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে "সাতক্ষীরায়" নামে একটি কবিতা অতিরিক্ত স্থান পাইয়াছে।

২। **বনবাসিনী** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১২৯৫ (৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮)। পৃ. ২৩।

'প্রিয়প্রসঙ্গ'-রচয়িত্রী প্রণীত এই উপন্যাসখানি বামাবোধিনীর জুবিলী উপহার হিসাবে বিতরিত হইয়াছিল। ইহা প্রথমে ১২৯৫ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়।

৩। **বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম** (সন্দর্ভ)। (১৫ জুলাই ১৮৯০)। পৃ. ১২।

ইহা "ব্রজমোহন দত্ত-পুরস্কার"প্রাপ্ত রচনা; প্রথমে ১২৯৬ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় মুদ্রিত হইয়াছিল।

৪। স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে **শোকোচ্ছ্বাস**। ? [ইং ১৮৯১] পৃ. ৮।

পুস্তিকাখানি বামাবোধিনী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ও বিতরিত হয়। ইহাতে মানকুমারীর তিনটি রচনা—"শোকোচ্ছ্বাস" (গদ্য), এবং "শোকাতুরা মা" ও "বিসর্জ্জন" নামে দুইটি কবিতা আছে। এগুলি ১২৯৮ সালের শ্রাবণ ও ভাদ্র-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রথমে প্রকাশিত হয়।

৫। **দুইটি প্রবন্ধ**। ১২৯৮ সাল (২২ ডিসেম্বর ১৮৯১)। পৃ ৩২।

যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী সভা কর্ত্তৃক পুরস্কৃত 'প্রিয়প্রসঙ্গ'-রচয়িত্রীর দুইটি রচনা—"বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য" ('বামাবোধিনী পত্রিকা' আশ্বিন ১২৯৭ দ্রষ্টব্য) ও "সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য"—এই পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে।

৬। **কাব্যকুসুমাঞ্জলি**। ইং ১৮৯৩ (২ অক্টোবর)। পৃ. ২৭১।

এই পুস্তকে ৬৮টি কবিতা এবং বিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষে "শোকোচ্ছ্বাস" নামে একটি গদ্য প্রবন্ধ আছে। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (চৈত্র ১৩০৩) প্রবন্ধটির পরিবর্ত্তে "ভালবাসি" ও "সাতক্ষীরায়" নামে দুইটি কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়। পরবর্ত্তী কালে, ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উপলক্ষে লিখিত "অভিষেচন" নামে আরও একটি কবিতা 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি'তে যেমন স্থান পাইয়াছে, তেমনি আবার "সাধের মরণ" নামে কবিতাটি বর্জ্জিত হইয়াছে।

৭। **কনকাঞ্জলি** (কাব্য)। ১৩০৩ সাল (২৯ অক্টোবর ১৮৯৬) পৃ. ২৬০।

"হেয়ার-প্রাইজ্‌ এসে ফণ্ড" হইতে পুরস্কারপ্রাপ্ত।

৮। **বীরকুমার-বধ কাব্য**। ১৩১০ সাল (১০ মে ১৯০৪)। পৃ. ২৩৫।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত এই কাব্যের বিষয়—অভিমন্যু-বধ।

৯। **শুভ সাধনা** (গদ্য-পদ্য)। ইং ১৯১১। পৃ. ১৮৪।

"এই পুস্তকের অনেকগুলি প্রবন্ধ, বহুদিন পূর্ব্বে প্রথমে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া তাহা এই গ্রন্থে প্রকাশ করিলাম।..."সাধক"-শীর্ষক কবিতাটি মৎকৃত 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' হইতে গৃহীত।"

সূচী :—রাজা ও প্রজা, সহানুভূতি, পঞ্চ যজ্ঞ, উন্নতি, দধীচ (পদ্য), চরিত্র, আর্য্যদিগের দাম্পত্য-জীবন, পুত্র-ভিক্ষা (পদ্য), আর্য্য-মহিলা শৈব্যা, স্বার্থে পরার্থ, গুণগ্রাহিতা শক্তি, অভাব, দুইখানি ছবি, নিন্দুক, আত্মসংযম, ক্ষমা, ভক্তি, সাধক (পদ্য) :

'শুভ সাধনা' অনেক দিন বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল।

১০। **বিভূতি** (কাব্য)। চৈত্র ১৩৩০ (১২ এপ্রিল ১৯২৪)। পৃ. ৩১১+১ শুদ্ধিপত্র।

১১। **সোনার সাথী** (কাব্য)। ? (২ মে ১৯২৭)। পৃ. ৫০।

১২। **পুরাতন ছবি** (আখ্যায়িকা)। ? (২৫ জুলাই ১৯৩৬)। পৃ. ১৩১।

সূচী :—গৃহলক্ষ্মী, মাতৃহৃদয়, বিমাতা, শৈশব সঙ্গিনী, বন্ধু ও পত্নী, মহামুহূর্ত্ত, ভিখারিণীর গীত।

* * *

ছোট গল্প রচনায় মানকুমারী সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১ম বর্ষের (১৩০৩ সাল) কুন্তলীন-পুরস্কার—'গল্প ও কবিতা' পুস্তকে প্রকাশিত তাঁহার "রাজলক্ষ্মী" গল্পটি "বিশেষ পুরস্কার ১৫৲ টাকা", এবং ৩য় বর্ষের (১৩০৫ সাল) কুন্তলীন-পুরস্কার—'গল্প ও ছড়া' পুস্তকে প্রকাশিত "অদৃষ্ট চক্র" গল্পটি "সপ্তম পুরস্কার—৫৲" লাভ করিয়াছিল। ২য় ও ৪র্থ বর্ষের কুন্তলীন-পুরস্কার-পুস্তক দেখি নাই ; তাহাতেও মানকুমারীর রচনা থাকিতে পারে।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্মান

মানকুমারীর সাহিত্য-প্রতিভার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারত-সরকার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে তাঁহাকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মাসিক ৩০৲ (পরে ৩৪৲) বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে (ফাল্গুন ১৩৪৩) চন্দননগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়। মানকুমারী এই সম্মিলনে 'কাব্য-সাহিত্য' শাখার সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম 'ভুবনমোহিনী সুবর্ণ-পদক' ও ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক' দান করিয়া সম্মানিত করেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ জুলাই শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক খুলনায় মানকুমারীর জয়ন্তী-উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল।

মৃত্যু

মানকুমারী ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ ডিসেম্বর (৯ পৌষ ১৩৫০) মধ্যরাত্রে ৮১ বৎসর বয়সে খুলনায় পরলোকগমন করেন। তিনি জামাতার গৃহে দৌহিত্র-দৌহিত্রীদিগের সহিত বাস করিতেন। একমাত্র কন্যা প্রিয়বালাকে হারাইয়া (মৃত্যু : ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫) তিনি শেষজীবনে এক প্রকার জীবন্মৃতা হইয়া ছিলেন। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে তিনি "আর কেন ?" নামে যে মর্ম্মস্পর্শী কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

আর কেন ডাকো !

যে যুগে মা বীণাপাণি করেছিলা পূজারিণী
সে যুগের বীণাতান কেন মনে রাখো !
ভালবেসেছিলে বুঝি, তাই এ সাঁঝেতে খুঁজি
পুনঃ আসিয়াছ কাছে,—নীরবেই থাকো !
সে যে গো অনেক দিন নাহি তার কোন চিন,
সে পুরানো স্মৃতি কেন আজি বুকে মাখো !
সে বসন্ত, সে বরষা, সে আনন্দ, সে ক্রন্দন,
আঁধারে মিলায়ে গেছে, আর পাবে নাকো !
এখন কিসের দাবী ? হারায়ে গিয়াছে চাবি,
ভেঙে গেছে বীণা বাঁশী আর হবে নাকো !
আজি বৈতরণী নীরে তরণী লাগিছে তীরে
ডাকিছে পারের মাঝি,—মনে মনে থাকো !
বিদায়, বিদায়, ভাই ; আর কেন ডাকো !

মানকুমারী বসু ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা দেশে যে-কয় জন মহিলা-কবি সর্ব্বজনবিদিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, মধুসূদন-ভ্রাতুষ্পুত্রী কবি মানকুমারী বসু তাঁহাদের অন্যতম। তিনি দীর্ঘ ষাট বৎসর কাল বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের জন্মের মাত্র দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দুই বৎসর পর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ আমাদের কালেও বিবিধ পুস্তক ও সাময়িক-পত্রের মারফৎ তিনি সাধারণ বাঙালী পাঠক-সমাজের সহিত যোগসূত্র রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি প্রধানতঃ বিয়োগ-বেদনায় মধুর। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে স্বামিসুখবঞ্চিত হইয়া তিনি যে দুঃখের মধ্যে সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার অনুভূতি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি সহজ সরল ভাষায় সুললিত ছন্দে নিজের মনের কথা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন, সাধারণ পাঠকের হৃদয় অধিকার করিতে এই কারণেই তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' হইতে "একা" কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

একা

১

একা আমি, চিরদিন একা
সে কেন দু'দিন দিল দেখা ?
আঁধারে ছিলাম ভাল
কেন বা জ্বালিল আলো ?
নীরদ মাঝারে যথা বিজলীর রেখা ।
ভুলে ভুলে ভালবাসি
ভুলে ভুলে সে দুরাশা
সে ঘুচিল না শুধু কপালের লেখা !

২

একা আমি এ অবনীতলে
কেহ নাই "আপনার" ব'লে,
একাই গাহিব গীতি
একাই ঢালিব প্রীতি
একাই ডুবিয়া যাব নয়নের জলে !
সে কেন পরাণে আসে
সে কেন মরমে ভাসে
কেন ছোটে তারি ঢেউ মনের তলে !

৩

বসন্ত বরষা শীত যারা,
আমার কেহই নয় তা'রা,
ভাসিলে নয়ন-নীরে
দেয় না মাথার কিরে
হাসিলে আসে না কাছে হেসে সুধাধারা !
একা আমি একা রই
সুখ দুখ একা সই
সে কেন আমার তরে হ'ত দিশাহারা ?

৪

একা আমি জগতের পর
এক পাশে বেধে আছি ঘর,
আমার উঠানে ফুলে
হাসে না কুসুমকুলে
ঢালে না কো কলকণ্ঠ মধুমাখা স্বর ;
সে, হেন একার ঘরে
কেন অধিকার করে
প্রাণে কেন তারি ছটা ভাসে নিরন্তর ?

৫

একা আমি আসিয়াছি ভবে,
আমার "দোসর" কেন হবে ?
শ্মশান সৈকত-বুকে
একাই ঘুমাব সুখে
জগৎ সংসার মোর শত দূরে র'বে,
আমারে মমতা-স্নেহ
দেয় নি—দিবে না কেহ,
সে কেন আমারি শুধু হয়েছিল তবে ?

৬

একা আমি চিরদিন একা,
শুধু সে দু'দিন দিল দেখা !
এখন সাধনা তাই
কোটি পরমায়ু পাই
তাহারি তপস্যা করি কপালের লেখা !
তারি লাগি বসুন্ধরা
হাসি-ভরা কান্না-ভরা
জীবনের সুখ শুধু তারি লাগি লেখা !
সে আলোকে আলো পথ
ত্রিদিবের পুষ্পরথ !
ও পারে অনন্তপুরী যায় যেন দেখা !
যে ক'দিন থাকে প্রাণ !
এই কোরো ভগবান্ !
গাহি যেন তারি গান বসি' একা একা !

শব ও কঙ্কাল

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

সম্বলপুরের নিঃসম্বল ভিখারীর দল— পথই ওদের ঘর।

লৌহনগরীর দক্ষিণ প্রান্তসীমা দিয়ে যে পায়ে চলার সরু রাস্তাটা খড়কাই নদীতটাভিমুখে চলে গিয়েছে তার এক পাশে সার বাঁধা কতকগুলো গাছের নীচে এসে ওরা আশ্রয় নিয়েছে। নগরোপ্রান্তের এ দিকটা নির্জ্জন। এখানে-সেখানে পুষ্পখচিত ছোট ছোট বন-ঝোপ আর ঘনসন্নিবিষ্ট তরুশ্রেণী স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে মহাবনকে ধ্বংস করে সিংভূমের পার্ব্বত্য অঞ্চলে বিরাট্ শিল্প-নগরী গড়ে উঠেছে, এই তরুশ্রেণীর শ্যামলতা থেকে সেই অনন্তপ্রসারিত অরণ্যানীর বিলুপ্ত মহিমার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

লোকালয়ের বাইরে, নদীতীরস্থ এই নিভৃত স্থানে গড়ে উঠেছে এক দল ভিখারীর সংসার—বিচিত্র সংসার। গাছ-তলার খানিকটা জায়গা তারা সাফ করে পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। মাটিতে দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা ছেঁড়া কাঁথা বিছানো, গাছের ডালে দড়ির সাহায্যে টাঙানো হাঁড়ি-কুড়ি। উন্মুক্ত আকাশের নীচে পথের প্রান্তে চলেছে গৃহহীন-দের গৃহস্থালি, জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকবার প্রাণান্তকর প্রয়াস। পাশাপাশি চলেছে জন্মমৃত্যুর বিচিত্র লীলা। এ দিকে মাটির বুকে জন্ম নিচ্ছে হতভাগা শিশু চিরন্তন অভিশাপ ললাটে নিয়ে, আর তার পাশেই কোনো বুভুক্ষিত দুর্ভাগার অভিশপ্ত জীবনের হচ্ছে অকাল অবসান। জীবন এদের নিকট ভাগ্যের নিষ্ঠুর নির্ম্মম খেলা, মৃত্যুর সঙ্গে এদের মিতালি। দুর্ভাগ্য এদের সবাইকে একত্র টেনে এনে পথে দাঁড় করিয়েছে বটে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবোধকে লুপ্ত করতে পারে নি। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি-জ্ঞান হয়ে উঠেছে টনটনে। এরই মধ্যে গণ্ডী-রেখা টেনে দিয়ে এক একটি পরিবার নিজ নিজ এলাকা ঠিক করে নিয়েছে। কেউ বিনা অনুমতিতে অপরের এলাকায় অনধিকার-প্রবেশ করলে একেবারে কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। ভূমিহীনদের জমির অধিকার নিয়ে কলহ-বিবাদের আর অন্ত নেই।

এই বিচিত্র জগতে স্বামী-স্ত্রী আর বছর চারেকের ছোট্ট একটি শিশু—এই তিন জনের এক পরিবার। পথবাসী হলেও মনে হয়, প্রায় পশুর স্তরে উপনীত এই ভিখারীর দল থেকে এরা যেন একটু স্বতন্ত্র। ওদের থেকে ঈষৎ ব্যবধানে একটা গাছতলায় হাঁড়িকুড়ি নিয়ে নিজেদের সংসার কেঁদেছে। হয়তো সদ্য ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ওরা অনন্যোপায় হয়ে যাযাবর ভিখারী-দলের সঙ্গে গাছতলায় এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। তা হলেও কিন্তু, ওরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে, ওদের দলে সম্পূর্ণভাবে মিশে নির্লজ্জ বর্ব্বরতার শেষ সীমায় নেমে যেতে পারে নি। তাই মানুষের মনে স্নেহ-প্রেম আনন্দ-বেদনার যে বিচিত্র অনুভূতি খেলে যায়, মাঝে মাঝে যেন তার ছাপ ওদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে।

পুরুষটি সারাদিন ভিক্ষা করে আহার্য্য যোগায়, মেয়েটি ঘর-সংসারের (?) কাজকর্ম্ম করে—ছেলেকে আগলায়। একমাত্র সন্তানকে কেন্দ্র করে এই ভাগ্যহত তরুতলাশ্রয়ী দম্পতি ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করে, তাদের বঞ্চিত জীবনের সকল নিষ্ফল কামনা এই শিশুটিকে আশ্রয় করে সফলতার পথ খুঁজে মরে। দূরে লৌহনগরীর কারখানার অভ্রভেদী চিমনিগুলোর পানে তাকিয়ে পুরুষটি আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখে। মনে হয়, কুবেরের ভাণ্ডার যেন যন্ত্রপুরীর প্রাকার-বেষ্টনীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত। কিন্তু তার বয়স নেই, স্বাস্থ্য নেই, সামর্থ্য নেই। তাই লৌহনগরীর রত্নপুরীর সিংহদ্বার তার নিকট অর্গলবদ্ধই থেকে যাবে। কিন্তু তার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করে তুলবে তার ছেলে। তাকে সে নিজের দেহের রক্ত তিল তিল করে জল করে মানুষ করে তুলবে। ছেলে বড় হলে কোনো বড়লোকের খোশামোদ করে যদি সে তাকে কারখানায় ঢুকিয়ে দিতে পারে তা হলে আর ভাবনা কি?

বৌকে সম্বোধন করে সে বলে—"শুনলি বাঁশমতী, ডাঙর হলে কলিয়াক কারখানায় ঢুকাই দেমি। তেখেন কলিয়া কেতে টকা রুজি করিব।"

বৌটি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে আপন শীর্ণ বক্ষে কলিয়াকে চেপে ধরে মনের আনন্দে গান ধরে

> "খণ্ড খণ্ড দহিবড়া মণ্ড মণ্ড দিলা
> আর রাজবাড়ী খানা মেরা রাজবাড়ী খানা"

ভবিষ্যতে ছেলের দৌলতে রাজবাড়ীর আহার্য্য খণ্ড খণ্ড দহিবড়ার আশায় উপবাসক্লিষ্ট কলিয়ার মায়ের শুষ্ক রসনা লালায়িত হয়ে উঠে। কলিয়াকে বুকে করে মৃদু দোলা দিতে দিতে গুন্ গুন্ সুরে বার বার সেই একই গানের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে।

ওদিকে ধীরে ধীরে যন্ত্রদানবের ক্ষুধা হয়ে উঠল ক্রমবর্দ্ধমান, সুরু হ'ল খড়কাই নদীর উপর পোল নির্ম্মাণ আর ওপারের শাল-বন ধ্বংসের আয়োজন। প্রকৃতির শ্যাম-সমারোহকে বিলুপ্ত করে দিয়ে পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল নূতন কারখানা নির্ম্মাণের তোড়জোড়।

যে সঙ্কীর্ণ রাস্তাটির পাশে ভিখারীর দল এসে সংসার পেতেছিল মোটর লরী চলাচলের জন্যে সেটিকে প্রশস্ততর করতে হবে, কাজেই দু'ধারের বনঝোপ আর বৃক্ষশ্রেণীর ওপর

পড়তে লাগল যাত্রিদের কোপ। রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষ পার্ব্বত্য প্রান্তরের বুকে যে শ্যাম তরুশ্রেণী স্নিগ্ধচ্ছায়াতলে দুঃখতাপক্লিষ্ট ভিখারীদের আশ্রয় দিয়েছিল, দেখতে দেখতে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে এল। সেখানে পিচঢালা রাজপথ নির্মাণে ব্যাপৃত হ'ল মজুরদল। নিভৃত আরণ্যভূমিতে যন্ত্ররাজের বিজয়-অভিযান পরিচালনার পথ প্রশস্ত হ'ল বটে, কিন্তু ওদিকে ভিখারীদের জগৎ হয়ে এল অপরিসর। সুরু হ'ল তাদের নীড়ভাঙার পালা। পোঁটলাপুঁটলি, ছেঁড়া কাঁথা-কাঁথা আর হাঁড়িকুঁড়ি গুটিয়ে নিয়ে তারা রওনা হ'ল নূতন আশ্রয়-স্থলের সন্ধানে। ঘরে যাদের ঠাঁই হ'ল না, সারাজীবন পথেই তাদের বাঁধতে হবে ঘর। আবার নূতন জায়গায় তরুতল আশ্রয় করে গড়ে উঠবে এদের সংসার। এই তাদের জীবন। কোথাও স্থির হয়ে বেশী দিন বাস করবার জো নেই, অবিরাম তাদের এগিয়ে চলতে হয়, ধ্বংসের পথে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। কারও পানে ফিরে তাকাবার অবসর তাদের নেই। দীর্ঘদিনের সঙ্গীকে পথের পাশে একান্ত অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে ওদের বুকে এতটুকুও ব্যথা বাজে না, মনে জাগে না লেশমাত্র অনুকম্পা— বিধাতার মতই ওরা বিকারহীন।

চলে গেল সবাই, যেতে পারলে না শুধু স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কলিয়ার বাবা। কয়দিন ধরে কলিয়ার মা মারাত্মক ব্যামোতে ভুগছে। গাছতলায় পড়ে সে ধুঁকছে, অস্থিচর্ম্মসার দেহের মধ্যে তার ক্ষীণ প্রাণটুকু ধুকপুক করছে। এ অবস্থায় তাকে নিয়ে এক পা এগোনোও তো সম্ভব নয়। কাজেই ছেলে-বৌকে নিয়ে সঙ্গীসাথী-পরিত্যক্ত কলিয়ার বাবাকে পথের প্রান্তেই পড়ে থাকতে হ'ল। সবাই চলে গেলে নিতান্ত অবোধ শিশুটিকে কোলে নিয়ে তরুতলে মৃত্যুপথযাত্রিণী স্ত্রীর পাশে বসে কলিয়ার বাবা আজ প্রথম উপলব্ধি করলে, এত বড় বিশ্ব-সংসারে সে কত অসহায়, কিরূপ নিঃসঙ্গ! যারা তাকে ফেলে চলে গেল তাদের কারুরই মনে তার প্রতি স্নেহপ্রীতি বা সমবেদনার লেশমাত্র ছিল না সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র তাদের সাহচর্য্যের মূল্যই যে ছিল যথেষ্ট! তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে মানুষ যে মানুষের কত প্রিয় তাই সে আজ সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করলে, একান্ত অসহায়ভাবে একবার ঊর্দ্ধপানে তাকালে,—সেখান থেকে কোনো সান্ত্বনার বাণী তার কাছে পৌঁছুলো কিনা কে জানে?

খড়কাই নদীতীরের নবনির্ম্মিত তকতকে ঝকঝকে পিচঢালা প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে সুরু হ'ল দিনরাত অনবরত মজুরবোঝাই মোটর লরীর আনাগোনা। দিন-কতকের মধ্যেই নদীর ওপারের শালবন নির্ম্মূল হয়ে যন্ত্রপুরীর ভিত্তি পত্তন হ'ল।

মোটর লরীতে করে প্রতিদিন মজুর আর কর্ম্মীদের জন্যে অপর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাওয়া হয়, ওপারের নির্ম্মীয়মান কারখানায়। এই প্রাচুর্য্যের দিকে কলিয়ার বাবা প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, সংসারে এত আছে অথচ তাদের অদৃষ্টে তার এক কণাও জোটে না। ওপারের বনজঙ্গল কেটে মানুষ তাদের বসবাসের জগতের পরিধিকে বাড়িয়ে নিচ্ছে। শুধু তাদেরই তিনটি প্রাণীর সঙ্কীর্ণ পৃথিবী হয়ে এল সঙ্কীর্ণতর।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি। নিবিড় অন্ধকারের কৃষ্ণাঞ্চল-তলে চরাচর গভীর সুপ্তিতে মগ্ন—মাঝে মাঝে লৌহনগরীর কারখানার ভুল্লে প্লাণ্টের সুতীব্র আলোয় দূরদূরান্তের মাঠ-বন-গিরি-নদী সব কিছু আলোকিত হয়ে ওঠে। সেই অগ্নি-শিখায় চকিতের মত কারখানার সারিবাঁধা অভ্রভেদী চিমনি-গুলো দৃশ্যমান হয়—মনে হয়, অতিকায় যন্ত্রদানবসমূহ যেন আকাশস্পর্শী লকলকে অগ্নিজিহ্বা মেলে চরাচরকে গ্রাস করতে উদ্যত। পরক্ষণেই দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায় গভীরতর অন্ধকারে। মাঝে মাঝে উত্তুরে হাওয়া যেন কার দীর্ঘশ্বাসের মত জনহীন পার্ব্বত্য প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে হু হু করে বয়ে যায়।

এই শীতজর্জ্জর অন্ধ তামসীরাত্রে জনমানবহীন খড়কাই নদীতীরে পথ-প্রান্তে ভূমিশয্যায় নিদ্রামগ্ন তিনটি প্রাণী—কলিয়া, তার বাবা আর মা। সবাই গভীর নিদ্রায় অচেতন।

নিত্যকার মত কলিয়া শুয়েছে তার মায়ের বুকে। কিন্তু মা তার আজ জ্বরের ঘোরে বেহুঁস, অচৈতন্য। তার শীর্ণ-বক্ষচ্যুত হয়ে কখন যে কলিয়া গড়াতে গড়াতে রাজপথের ওপর গিয়ে রাজশয্যা গ্রহণ করেছে তা সে টেরও পায় নি।

শেষরাত্রে মোটর লরীর ঘর্ঘরধ্বনিতে রাত্রির আকাশ মুখরিত হয়ে উঠে। মজুরদলকে নিয়ে প্রকাণ্ড লরী চলেছে নদীর ওপারের নূতন কারখানার দিকে। দুর্ব্বার তার গতি। রাজপথের উপরে নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রাতুর কলিয়াকে নিষ্পিষ্ট করে যন্ত্ররাজের বাহন এগিয়ে চলে যন্ত্রপুরীর দিকে। যন্ত্র-রাজের বিপুল শক্তির এ নিছক অপচয়। এই ক্ষীণপ্রাণ শিশুর ইহলীলা সাঙ্গ করবার জন্যে, এত বড় আয়োজনের, এত প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগের কোনোই দরকার ছিল না। বিধাতার সৃষ্টিতে এত বড় একটা নির্ম্মম শোকাবহ ব্যাপার ঘটে গেল, কিন্তু চরাচরে তার সাক্ষী কেউ রইল না। কলিয়ার অন্তিম মুহূর্ত্তের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখচ্ছবি রাত্রির অন্ধকার-পটেই চিরতরে বিলীন হয়ে গেল। মোটরের প্রচণ্ড আওয়াজ ছাপিয়ে তার শেষ মুহূর্ত্তের আর্ত্ত ক্রন্দন অনন্ত আকাশে নির্ব্বিকার বিধাতার দরবারে গিয়ে পৌঁছুলো না।

পৃথিবীতে চরম নিষ্ঠুর ব্যাপার অনুষ্ঠিত হ'ল রাত্রির অন্ধকারে, সংগোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

পরদিন খড়কাই নদীতীরে প্রভাত এল—অসহায় নিরপরাধ শিশুর রক্তে রঞ্জিত প্রভাত। দূরে পূর্ব্বদিকে কারখানার

পেছনের ধূম্রমলিন আকাশে অরুণরাগের মতই পিচঢালা কালো রাজপথের উপর লেগে রয়েছে টাট্‌কা রক্তের দাগ, আর তারই পাশে থেঁতলানো একদলা মাংসের উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে কঙ্কালসার নগ্নপ্রায় এক নারীমূর্ত্তি। মুখ তার ভাবলেশহীন, তাতে দুঃখ বেদনা শোকাবেগ কিছুরই যেন অভিব্যক্তি নেই। তার কোটরগত চোখ দুটোর নিষ্পলক দৃষ্টি রক্তরঞ্জিত রাজপথের উপর নিবদ্ধ—নিস্পন্দ দেহ থেকে প্রাণচেতনা যেন বিলুপ্তপ্রায়।

বিকৃত শবকে আগলে বসে আছে জীবন্ত কঙ্কাল—সৃষ্টির চরমতম বীভৎস-করুণ দৃশ্য।

দূরে শোনা যায় মোটর লরীর ঘর্ঘর ধ্বনি। শব ও কঙ্কালের উপর দিয়েই চলবে কি যন্ত্রদানবের জয়-রথ?

কারাবন্ধন

শ্রীসুহৃৎ চন্দ্র মিত্র

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজ্যশাসনের বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত আছে। কিন্তু শাসনপদ্ধা যে ধরণেরই হউক, সব শাসনতন্ত্রের আইন-কানুনের মধ্যেই অপরাধীকে কারাগারে নিক্ষেপের একটা ব্যবস্থা আছে। কোন্ অপরাধে কারাদণ্ড হওয়া উচিত আর সে কারাদণ্ড কি রকম হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ সশ্রম না বিনাশ্রম, ছ'মাস, এক বছর না যাবজ্জীবনের জন্যে, প্রত্যেক দেশের অপরাধ-আইন পুস্তকের বিবিধ ধারায় সে সব কথা লিপিবদ্ধ আছে। প্রথাটি অনেক দিন থেকেই চলে আসছে। জনসাধারণের সকলেই এটা এমন ভাবে মেনে নিয়েছে যে, এ সম্বন্ধে কারুর মনে কোন রকম প্রশ্নই বড় একটা জাগে না, যদিও বা কখনও এ সম্বন্ধে কোন রকম আলোচনা হয় ত সে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে ছোট ছোট গণ্ডীর ভেতর। অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে কারাবাসের সময়ের সামঞ্জস্য আছে কিনা, কোন কোন অপরাধে কারাদণ্ড অসমীচীন, কিম্বা আরও কোন্ কোন্ অপরাধে কারাদণ্ড হওয়া বিধেয়, এই জাতীয় আলোচনা মাঝে মাঝে হতে দেখা গেছে। কিন্তু কারাদণ্ড আদৌ হওয়া উচিত কিনা, কিম্বা যে উদ্দেশ্যে এই শাস্তি দেওয়া হয়, সে উদ্দেশ্য কারাবাসের ফলে কতখানি সাধিত হয়, কারাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা কি রকম হওয়া প্রয়োজন এই সমস্ত জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আলোচনা এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই হয় নি। একথা জোর করেই বলা যায় যে, মনোবিদ্যার নব আবিষ্কৃত তথ্যগুলির বহুল প্রচারের ফলেই শাসনকর্ত্তাদের, সমাজনেতাদের, বিচারকদের এবং আইন-ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এদিকে সম্প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং এই সব সম্বন্ধে অনুসন্ধান, আলোচনা এবং প্রয়োজনমত প্রতিকারের চেষ্টার সূচনা দেখা যাচ্ছে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতিনীতি, আইন-কানুন ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রচলিত ধারার পরিবর্ত্তন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নইলে সমাজে অমঙ্গল প্রবেশ করে, রাজ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়, গৃহ অশান্তিতে ভরে ওঠে।

আমাদের দেশে কারাদণ্ডের প্রথা বহুকালের প্রথা। অনেকের ধারণা আছে প্রাচীন ভারতবর্ষে কারাগার ছিল না। সে ধারণা ঠিক নয়। মহাভারতে দেখা যায়, জরাসন্ধ অনেক রাজা-মহারাজাকে বন্দী করে কারাগারে রেখে দিয়েছিলেন। কংস রাজা দেবকীকে বিফল করবার অভিপ্রায়ে দেবকীকে কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তবে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে শুধু আটক রাখাটাই বোধ হয় তখন কারাগারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পাশ্চাত্য দেশে পুরাকালে কারাগারের যে ব্যবস্থা ছিল না তা নয়, তবে কারাদণ্ডের প্রচলন খুব কমই ছিল বলা যায়। ইংলণ্ডে প্রথম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালেই অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই কারাদণ্ডের বিশেষ প্রচলন আরম্ভ হয়। জরিমানা আদায়ের একটা বিশেষ উপায় হিসাবেই কিন্তু প্রথম প্রথম এই দণ্ড দেওয়া হ'ত। সেই সময়ের অন্যান্য দেশের আইন এবং শাস্তির ব্যবস্থা অনুসন্ধান করলে এই ধারণাই হয় যে, যদিও খুব প্রাচীন কালে অসভ্য জাতিদের ভিতরেও কারাদণ্ডের ধারণা একটা ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে অপরাধের শাস্তি হিসাবে এর বহুল প্রচলন মধ্যযুগ থেকেই আরম্ভ হয়। সেকালের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কর্ত্তারাও কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করতেন। মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকার তাঁদের ছিল না বলেই তাঁরা এই দণ্ডের যথেচ্ছ ব্যবহার করতেন। কাউকে একেবারে নির্জ্জন ঘরে একলা আবদ্ধ করে রাখা হ'ত, যাকে বলে 'সলিটারী কন্‌ফাইনমেণ্ট'—আবার কাউকে কাউকে অন্য কয়েদীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হ'ত। ক্রমশঃ কয়েদীদের কাজে লাগানোর কথা মনে হয় এবং যে সব অপরাধী কার্য্যক্ষম তাঁদের আটক না রেখে জোর করে কোন কাজে লাগানো হ'ত। স্ত্রীলোক, রোগী, বৃদ্ধ বা যারা অন্য কোন কারণে কাজ করতে অক্ষম তাদেরই শুধু আবদ্ধ রাখা হ'ত। এই সময় থেকেই একটা নূতন ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। লণ্ডনের একজন বিশপ, রিড্‌লে তাঁর নাম, তিনি একটা আন্দোলন আরম্ভ করেন যে, শহরের অশিক্ষিত বলিষ্ঠ ছেলেরা—যারা কোন কিছু করে না বরং মার-ধোর, গুণ্ডামি, ছোটখাট চুরি—ছিঁচকে চুরি আর কি, যৌন ব্যভিচার প্রভৃতি অপকর্ম্ম করেই বেড়ায় তাদের দিনকতক আটক রেখে শোধরাবার ব্যবস্থা করা

উচিত। এই আন্দোলনের ফলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পার্লামেন্টে এই মর্মে এক আইন পাস হয় যে, প্রত্যেক 'কাউন্টি'তে একটা করে 'সংশোধনাগার' (House of Correction) স্থাপন করা হবে এবং খুঁজে পেতে ঐ ধরণের বদমাইস, ভবঘুরে, কুঁড়ে—এবং দুশ্চরিত্রাদের ধরে এনে সেইখানে আবদ্ধ করে রাখা হবে। সংশোধনাগার অনেক কাউন্টিতেই স্থাপিত হ'ল এবং কাজও বেশ চলতে লাগল। ক্রমশঃ অন্য ধরণের অপরাধীদেরও সংশোধনাগারে আটকে রাখা হতে লাগল। সাধারণ জেল আর সংশোধনাগারের ভিতর তফাৎ আর বেশী রইল না। দু'জায়গাতেই চাবুক এবং লোহার শৃংখলের ব্যবস্থা ছিল। এই সংশোধনাগারের ভিত্তিতে যে চিন্তা এবং উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশের মনীষী এবং হৃদয়বান লোকেরা তার গভীরতা এবং কার্য্যকারিতা সহজেই উপলব্ধি করলেন। কাজেই সমস্ত ইউরোপেই তখন সংশোধনাগার নির্মিত হতে লাগল। জার্ম্মেনীতে এই সংশোধনাগারগুলি বিশেষ কার্য্যকরী হয়ে উঠল। তবে ইউরোপের সবচেয়ে বিখ্যাত সংশোধনাগার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ামের অন্তর্গত ঘেণ্ট শহরে স্থাপিত হয়।

সংশোধনাগারের পর এল জেল-সংশোধনের চেষ্টা। এই সম্বন্ধে প্রথমেই নাম করতে হয় জন্ হাওয়ার্ডের। নিজে ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রায় সমস্ত জেলই পরিদর্শন করে তিনি ১৭৭৭ সালে *State Prisons in England* বলে যে বইখানি লিখেছিলেন তাতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তখনকার জেল সম্বন্ধে তিনি এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, অল্পবয়স্ক পথভ্রষ্টদের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ একেবারে বিনষ্ট করে দেওয়াই ম্যাজিষ্ট্রেটদের যদি অভিপ্রায় হয় তা হলে এই সব জেলে আটক রাখার চেয়ে কার্য্যকরী উপায় তাঁরা উদ্ভাবন করতে পারবেন না। কারণ এমন কোন পাপাচার নেই যা এই সব জেলে হয় না।—তাঁর এই কঠোর মন্তব্যের পর জেল-সংশোধনের একটা সাড়া পড়ে গেল এবং চারদিকে কতকগুলি কারা-সংস্কার সমিতি (Prison Reform Societies) স্থাপিত হতে লাগল। স্বীকার করতেই হবে, এই সব সমিতির চেষ্টায় জেলের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্ত্তন, অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এমন কি কিছুদিন পরে একজন ত দুঃখ করেই লিখলেন—হায় রে! জেল আর সে জেল নেই, লোকে এখন জেলের ভয় আর করে না বরং অনেকে বাইরের কষ্টকর স্বাধীন জীবনের চেয়ে জেলের আরামের পরাধীন জীবনই বেশী পছন্দ করে। একথা তিনি বলেছিলেন এক শ' বছরেরও আগে ১৮২১ সালে। আজ ১৯৪৬ সাল। জেল বা কারাদণ্ড সম্বন্ধে আজকে আর কি কিছু বলবার নেই—সব কথাই কি বলা হয়ে গেছে—সব উন্নতিই কি করা শেষ হয়ে গেছে। তা মনে করা একেবারেই সমীচীন নয়। সমাজ গতিশীল। এক শ' বছরে সমাজের আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক আদর্শেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। তখনকার দিনে কারাদণ্ডের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা ধারণা ছিল, এখনও আছে কিনা সেটা ভাববার কথা। আর এখন যা উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য কতখানি সফল হচ্ছে, তারও বিচার করা দরকার। ঠিক আগেকার মত জেলের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, তা সে ব্যবস্থা যত ভালই হউক এখনকার আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারছে কি না তা পরীক্ষা করা দরকার। যদি না পারে তা হলে আবার সংস্কারের কথা ভাবতে হবে। এখন এই সব বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করা যাক।

কারাদণ্ডের উদ্দেশ্য কি? প্রধান উদ্দেশ্য আইনজ্ঞ যে করেছে, অপরাধ যে করেছে তাকে আটক রাখা। আটক রেখে কি লাভ হয়? আটক রাখার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে মোটামুটি তিনটি। প্রথম, তাকে আটকে রাখলে সে সমাজের অনিষ্টকর কাজ করতে অক্ষম হবে। তাতে সমাজের উপকার হবে। দ্বিতীয়, তার শাস্তি দেখে অন্য লোকে ঐ রকম অনিষ্টকর কাজ থেকে ভয় পেয়ে বিরত হবে এবং তৃতীয়—এই শাস্তি ভোগ করার ফলে অপরাধীর মনের পরিবর্ত্তন, এবং ছাড়া পাবার পর অপরাধ করবার প্রবৃত্তি তার আর থাকবে না।

প্রথম যুক্তিটি সহজেই মেনে নেওয়া যায়। বাস্তবিকই যে সমাজের বাইরে একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল সে আর সমাজের অনিষ্টকর কাজ কি করে করতে পারবে। কিন্তু এখানেও একটু ভাববার কথা আছে। এ রকম ঘটনা বেশী হয় ত ঘটে না কিন্তু তবুও কয়েদী জেলের গার্ডকে কিম্বা অন্য কয়েদীকে মার-ধোর করলে, এমন কি খুন পর্য্যন্ত করলে—এ ধরণের ব্যাপারও মাঝে মাঝে হয়। তা ছাড়া পরস্পরের বিকৃত যৌনাচার অনেক সময়েই লক্ষিত হয়েছে। জেলের গার্ড যদি একটু সহায় হয় তা হলে আরও অনেক রকমের অপরাধ জেলের ভিতর বসে বসেও করা যায়। জেল থেকে পালানো যায়ই। একবার আমেরিকায় অনেক মেকি মুদ্রা বাজারে চলতে থাকে। পুলিসের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, ঐ মেকি মুদ্রা সেখানকার এক জেলের ভেতর কয়েকজন কয়েদী মিলে তৈরি করে এবং জেলের গার্ডের সাহায্যে বাইরে চালায়। সমাজ জেলের গার্ডের উপর অনেকখানি দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। গার্ড যদি সে দায়িত্ব বহন করবার উপযোগী না হয়, তা হলে অপরাধীকে আটক রাখা সত্ত্বেও সমাজ তার অপকর্ম্মের হাত থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি না পেতেও পারে।

দ্বিতীয় যুক্তিটির সার্থকতা প্রথমটির চেয়ে ঢের কম একথা বলতেই হবে। একজন একটা কাজ করে জেলে গেল দেখে আর একজন সেই কাজ থেকে বিরত হবে তা ধরে নেওয়া যায় না। চুরির অপরাধে জেলে ত অনেকেই যাচ্ছে—তাতে চুরি বন্ধ হচ্ছে কি? কোন ফলই যে হয় না একথা অবশ্য

বলছি না। কিন্তু যারা বিরত হয় তারা ঠিক আটক থাকবার জন্যেই বিরত হয় কিনা তা বলা যায় না। বিচার হবে, পাঁচ জনের সামনে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে—কারাবাসের হুকুম হয়েছে বলে সবাই জানবে—এই সব মিলিয়ে মনের মধ্যে একটা ভাব হয়, শুধু আটক থাকবার সম্ভাবনাটাই বিরতির কারণ নাও হতে পারে।

তৃতীয় যুক্তিটি সবচেয়ে দুর্ব্বল। আটক থাকার ফলে অপরাধীর মনের পরিবর্ত্তন হবে এবং বাইরে এসে সে আর অপরাধ করবে না—এটা একটা কল্পনামাত্র। বাস্তব ভিত্তি এর নেই। একটি রিফর্মেটরী থেকে ৫১০ জন পর পর ছাড়া পায়। পাঁচ বছর বাদে দেখা গেল তাদের ৩১৬ জন আবার নানা রকম অপরাধে ধরা পড়েছে। শিকাগোতে ১৯২৫ থেকে ১৯৩০ সাল অবধি যে ৩০০ বালককে একটি বিশেষ স্কুলে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল, ১৯৩০ সালে দেখা গেল তাদের মধ্যে ১৮৭ জন জেল খাটছে, দুই জনের খুনের অপরাধে ফাঁসি হয়ে গেছে, সাতচল্লিশ জন নিরুদ্দেশ ইত্যাদি; কেবলমাত্র আঠার জন সংপথে থেকে সহজ জীবন যাপন করছে। অপরাধ করার এবং অপরাধ থেকে বিরত হবার প্রবৃত্তি অনেকটা মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু শুধু আটক থাকায় অপরাধ করার প্রবৃত্তি কতটুকু কমে বা আদৌ কমে কিনা, তা নির্ণয় অনুসন্ধানসাপেক্ষ।

অনেক কয়েদী কারাগার সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত লিপিবদ্ধ করে গেছে। একজন বলছে—উন্নতির সত্যিকারের আন্তরিক চেষ্টাকে কারাগার পদে পদে বাধা দেয় এবং উন্নতির সব পথই একেবারে বন্ধ করে দেয়। আর একজন বলছে, এগার বছর বয়সে আমাকে দুষ্টু ছেলেদের একটা স্কুলে পাঠানো হয়। সেখান থেকে একজন বেশ ভাল পকেটমার হয়ে আমি ফিরি। সতের বছর বয়সে আমায় রিফর্মেটরীতে পাঠানো হ'ল, সেখান থেকে একজন পাকা সিঁদেল চোর হয়ে বেরুলাম। তার পর জেলে গেলাম, সেখান থেকে চূড়ান্ত রকমের অপরাধী হয়ে বেরিয়ে এসেছি। সাধারণতঃ অপরাধীরা যে সব অপরাধ করে থাকে সে সবই আমি করেছি এবং অপরাধী হয়েই মরব এই আশাই করি।

এই ধরণের অনেক বিবৃতি সংগৃহীত আছে। মনে হতে পারে এগুলি একতরফা। আটক থাকার ফলে ভাল হয়েছে এ রকম মতও হয় ত আছে। একেবারে নেই তা নয়। প্রথমতঃ তার সংখ্যা খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ পরিবর্ত্তন হয় কিনা মতের চেয়ে কাজের ভিতর দিয়েই তা বেশী প্রকাশ পায়। একবার যারা জেলে গেছে তারা কি রকম হয়েছে তা অনুসন্ধান করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খারাপ ফলই দেখা গেছে। জেল-কর্তৃপক্ষের অনেকের মতই কয়েদীদের প্রতিকূল মতেরই অনুরূপ। একজন বলেছেন, "Imprisonment as it exists to-day, is worst crime than any of these committed by its victims." আর একজন লিখেছেন, "if absolutely innocent individuals were put under prison conditions they would tend to develop anti-social conceptions of conduct."

এই আলোচিত মতামত থেকে এইটেই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, কারাগারে মনের এবং চরিত্রের পরিবর্ত্তন বিশেষ হয় না, সংশোধন কোন রকম ত হয়ই না বরং খারাপ হয়। কিন্তু আমরা সকলেই চাই যে, জেল থেকে অপরাধী ভাল হয়েই ফিরবে। ভাল হবে বলেই ত তাকে জেলে পাঠানো, ফিরে এসে যদি সে আবার অনিষ্টকর কাজই করতে থাকে তা হলে সমাজ-সংরক্ষণ কি করে হবে? এ পর্য্যন্ত মানসিক পরিবর্ত্তনের কোন সুবিধা কারাগার যদি না করে দিয়ে থাকতে পারে তা হলে কারাগার-ব্যবস্থায় কোথায় ত্রুটি-গলদ আছে তা অনুসন্ধান করা আবশ্যক এবং তার সংস্কার প্রয়োজন, এবং সংশোধন দরকার।

এই সমস্যাই এখন কারা-সংস্কারকদের গবেষণার বিষয়। দেখা যাক, তাঁরা কি ভাবে এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়েছেন।

প্রথমেই অনুধাবন করবার কথা হচ্ছে এই যে, কারাগার-ব্যবস্থাটা এমনই একটা ব্যবস্থা যে তার সঙ্গে উন্নতির পথের কতকগুলি প্রতিবন্ধক স্বতঃই জড়িয়ে থাকে। কতকগুলি বাহ্যিক—যেমন ছোট অস্বাস্থ্যকর ঘর, দুর্গন্ধ, পোকামাকড় অলসতা প্রভৃতি। এগুলির পরিবর্ত্তন সহজেই করা যায়। কিন্তু কতকগুলির ভিত্তি আরও গভীর, সহজে বদলানো যায় না।

অনেক সময় উপযুক্ত লোকের অভাবে জেলের কাজ সুচারুরূপে চালাবার ব্যবস্থা হয় না। আমরা আশা করছি যে জেল থেকে অপরাধী সংশোধিত হয়ে ফিরবে, কিন্তু সেই সংশোধনের ভার কার ওপর দিচ্ছি সেটা বিবেচনা করা উচিত নয় কি? কারা-কর্তৃপক্ষের অপরাধীদের মনের কার্য্যাবলী, তাদের মানসিক গতির ধারা প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে তাদের মনের পরিবর্ত্তন কি তাঁরা করাতে সমর্থ হবেন? এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে উপযুক্ত লোক যাতে নিযুক্ত হয় সকলের তা দেখা উচিত। তারপর শুধু জ্ঞানসম্পন্ন কর্ম্মচারী হলেই হবে না। অর্থ, জিনিষপত্র প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর কাজের যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগ দিতে হবে। জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট না হলে উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

জেলে কয়েদীদের নিয়ম মেনে চলতে হয়। এই নিয়মানুবর্ত্তিতা একটা মস্ত ব্যাপার হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে এবং এই নিয়ে গার্ড এবং কয়েদীদের মধ্যে গোলমালের সৃষ্টি প্রায়ই হয়। কোন কয়েদী হয় ত গার্ডকে দেখে উঠে দাঁড়াল না বা সেলাম করলে না, গার্ড মনে করলেন তাঁর মানের হানি হ'ল, তিনি সাজা দিতে উদ্যত হলেন, দাতের মধ্যে

দরকষাকষি বেড়েই চলল। এই বাইরের জিনিষ ছাড়াও মনোবিজ্ঞার দিক থেকে কয়েদীদের নিয়মানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে আলোচনা করবার বিষয় আছে।

কয়েদীদের নিয়মানুবর্ত্তিতা মানে তাদের দৈনিক জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা। কখন উঠবে, কখন বসবে, কখন খাবে, কি খাবে, কি করবে, কি করবে না সমস্তই ওপরওয়ালার হুকুম এবং নির্দ্দেশ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। দেখা গেছে, এর ফল সাধারণতঃ দু-রকমের হয়। কেউ কেউ কোন রকম প্রতিবাদ করে না। খুব সহজেই তারা তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। সব নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে মেনে চলাই তাদের অভ্যাস হয়ে পড়ে। গার্ড দের কাজের তাতে খুব সুবিধা হয়, কিন্তু এই ধরণের অনেক কয়েদীই তাদের সমস্ত মানসিক শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলে, কোন রকম কর্ম্মপ্রেরণা বা উত্তম তাদের আর থাকে না। তারা কেবল দিবাস্বপ্ন দেখে, কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে। এই বাস্তব জগৎ থেকে পালিয়ে কল্পনার রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া এবং এই বাস্তবতার থেকে দূরে সরে থাকার অভ্যাস মনের উন্নতির পক্ষে একটি বিশেষ অন্তরায়।

আর একদল কয়েদী কিছুতেই এই নিয়ম-কানুনের মধ্যে নিজেদের বেঁধে রাখতে পারে না, তারা সারাক্ষণই নিয়ম ভঙ্গ করছে এবং ফলে অনবরত শাস্তি ভোগ করছে। এতে তাদের মনে অপরিসীম একটা বিদ্বেষ ভাব সর্ব্বক্ষণই জেগে থাকে এবং সকলের ওপর একটা বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয়।

সুতরাং নিয়ম মানুক আর নাই মানুক মনের দিকে দুয়েরই পরিণাম একই। সে পরিণাম হচ্ছে মানসিক বিকার-গ্রস্ত হওয়া বা এক রকম পাগল হয়ে যাওয়া। যৌথিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, কারাবাস কালের ওপর এই বিকার অনেকখানি নির্ভর করে। জেলে আসবার সময় যাদের মন স্বাভাবিকই ছিল এক মাস কারাবাসের পর তাদের মধ্যে যত জনের মানসিক বিকার হয়েছিল এক বছরের পর তার চল্লিশ গুণ লোক পাগল হয়েছিল।

এখন এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই ওঠে, তা হলে কি নিয়মানু-বর্ত্তিতার এই কঠোরতা মন্দীভূত করা বা নিয়মানুবর্ত্তিতা একেবারে তুলে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। হ্যাঁ কি না বলে এর জবাব দেওয়া চলে না। হঠাৎ কোন একটা সিদ্ধান্তের বশীভূত হয়ে কিছু করে ফেলাও সমীচীন নয়। প্রথমে ভেবে দেখা উচিত নিয়মানুবর্ত্তিতার খারাপ ফল কি কারণে হয়, তার পর ধীরে ধীরে তার প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত।

নিয়মানুবর্ত্তিতার খারাপ ফলের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, কয়েদীকে স্বাধীন চিন্তা করবার কোন রকম অবকাশ দেওয়া হয় না। জোর করে তাকে নিয়ম মানানো হয়। এর পেছনে এই তথ্য রয়েছে যে, নিয়ম মানা একবার তার অভ্যাস হয়ে গেলে জেলের বাইরে এসেও সে সামাজিক সব নিয়ম মেনে চলবে; কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ভুল, এর কোন ভিত্তিই নেই। নিয়মানুবর্ত্তিতার অভ্যাস করতে হলে যে স্বাধীন চিন্তা বর্জ্জন করতেই হবে তার কোন প্রমাণই নেই। যাঁরা স্বাধীন চিন্তা করেন তাঁরা যে নিয়মানুবর্ত্তী হতে পারেন না তা ত বলা যায় না। সুতরাং স্বাধীন চিন্তা করবার সুযোগ দিলে কয়েদীরা নিয়মানুবর্ত্তী হবে না এটা ধরে নেওয়া আজকাল আর চলে না। জেল-কর্ম্মচারীদের কয়েদীদের প্রতি মনোভাব এবং ব্যবহারের ওপর কয়েদীদের মানসিক পরিবর্ত্তন ও উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে। তাঁরা যদি শুধু কর্তৃত্ব করব এই ভাবটা মন থেকে তাড়িয়ে দেন এবং তাঁরা যদি একটু দূরদৃষ্টি ও সহানুভূতিসম্পন্ন হন তা হলে কয়েদীদের সংশোধনের কাজ অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে। একটা শক্ত প্রশ্ন কিন্তু এখানে থেকে যায়। কারাকর্তৃপক্ষের প্রধান কাজই হচ্ছে কয়েদীদের আটকে রাখা এবং অনেক কয়েদীর প্রধান চেষ্টাই হচ্ছে জেল থেকে পালানো। সুতরাং এই দুই দলের মধ্যে মূলগত একটা বিদ্বেষের ভাব থাকেই; কিন্তু এটা ভবিষ্যতে লাঘব করা যেতে পারবে বলে বিশ্বাস।

সংশোধনের একটা মস্ত বড় অন্তরায় হচ্ছে কয়েদীদের পরস্পরের ভিতর যে একগোষ্ঠী-বোধ (group feeling বা Espirit de corps) সৃষ্টি হয় তাই। কয়েদীদের ভাব চিন্তা প্রভৃতি অন্য কয়েদীদের মতামতের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। যে খুব বড় রকমের অসামাজিক কাজের ফলে জেলে এসেছে অন্য কয়েদীরা তাকে সম্মানের চোখে দেখে। বাইরে যেমন ভাল কাজ করলে লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করা যায়, জেলের ভিতর তেমনই যে যত বেশী খারাপ কাজ করে সে ততই অন্য কয়েদীদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে সমর্থ হয় এবং যে ভাল কাজ করে সে ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। অপরাধের উপর ভিত্তি করেই কয়েদীদের পরস্পরের ভিতর মানসিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এর ফলে যে মনোভাব গড়ে ওঠে সেটা অতিক্রম করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

এই সবের প্রতিকারকল্পে এখন একটা উপায়ের পরীক্ষা চলছে বলা যায়। সেটা হচ্ছে কয়েদীদের স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা করা। অসবোর্ণ এই ব্যবস্থা চালাবার একজন প্রধান উদ্যোক্তা। আমেরিকার বিখ্যাত সিং-সিং জেলে তিনি এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। কয়েদীরা নিজেরাই পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করবে, কে কখন কি রকম ভাবে কোন্ কাজ করবে। তারা শুধু এক একটা নম্বর, যন্ত্রবিশেষ, তাদের কোন দায়িত্ব নেই এ ভাবটা চলে গিয়ে যখনই কয়েদীরা মনে করতে আরম্ভ করবে যে তারা প্রত্যেকেই, অন্য সকলের— তাদের সঙ্গীদের—ভাল-মন্দের জন্য খানিকটা দায়ী তখনই তাদের মনের পরিবর্ত্তন হতে আরম্ভ হবে। এই ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রে কাজে পরিণত করা যে খুব সহজ তা নয় কিন্তু অনেক

দেশে ইতিমধ্যেই এই প্রথা চলছে এবং তাতে ভাল ফলই পাওয়া গেছে। আমাদের দেশেও এই পরীক্ষা চালানো যায় না কি?

পরিশেষে একটা কথা বলি। জেলগুলি শুধু আটক রাখবার জায়গা না হয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের কেন্দ্র হওয়া উচিত। তা হলে অনুসন্ধানের সুযোগ যথেষ্ট বেড়ে যাবে। সমাজের পক্ষে সে ব্যবস্থা কল্যাণকরই হবে।

শিল্প-প্রসঙ্গে আচার্য্য নন্দলাল

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার রীতি-নীতি এবং বিষয়বস্তুর ধারা আজ বহুমুখী হয়ে পড়েছে। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনায় ভারতের চিত্রকলা আবার রূপে রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে—তাঁর প্রবর্ত্তিত শিল্পধারা আজ বহু শাখা-প্রশাখা অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যেরা তাঁদের নিজ নিজ ভাব ও কল্পনা অনুযায়ী রঙে ও রেখায় রসসৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁদের অনেকেরই শিল্প-সৃষ্টিতে স্বকীয়তার পরিচয় পরিস্ফুট। বাস্তবিক আমাদের শিল্পসৃষ্টিতে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব বিশেষ ভাবেই নজরে পড়ে।

যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন আসে। নূতন ভাবস্রোতে যে পলিমাটি পড়ে, তাতে শিল্পীমন উর্ব্বর হয়—শিল্পের জগতে নব নব রূপ রস আঙ্গিক ও আদর্শে সৃষ্টির গোড়াপত্তন হয়। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ধরাবাঁধা বস্তুর মধ্যে বা style-এর মধ্যে এক এক সময় এক একটা ভাষা ধরা পড়ে যায়। কথিত ভাষা, চিত্রিত বা ইঙ্গিত করার

তীর্থযাত্রী —লেখক কর্তৃক অঙ্কিত

ভাষা সবারই এক গতিক। যেমনি style বেঁধে গেল অমনি সেটা জমে জমে কালে কালে একই ভাবে বর্ত্তমান রয়ে গেল—নদী যেন বাঁধা পড়ল নিজের টৈনে আনা বালির বাঁধে। নূতন কবি, নূতন আর্টিষ্ট এঁরা এসে নিজের মনের গতি ভাষার স্রোতে যখন মিশিয়ে দেন তখন style উল্টে পাল্টে ভাষা আবার চলতি রাস্তায় চলতে থাকে।"

আজকের দিনে সকল দেশেই শিল্পজগতে যুগোপযোগী পরিবর্ত্তনের সাড়া জেগেছে। আমাদের দেশের সাহিত্য, সঙ্গীত এবং চিত্রকলাও বৈদেশিক প্রভাবের ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। কিন্তু অন্যান্য দেশে গতানুগতিকতার হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার জন্য শিল্পীদের যে চেষ্টা দেখা যায়, তাদের ছবিতে যেমন আঙ্গিক ও নূতন বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষণের সম্পূর্ণ নতুন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় আমাদের দেশে তা বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না।

শিল্পকলার সাধনায় ব্রতী যারা তাদের মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, আমরা কোন্ পথে চলেছি। আমরা কি লক্ষ্যভ্রষ্ট

হয়ে ভুল পথে চলেছি? পরিবর্তন তো রবিবর্ম্মা, বিশ্বনাথ ধুরন্ধর প্রমুখ শিল্পীদের ছবিতেও এসেছিল; এঁদের তুলিতে জোর ছিল—কিন্তু ছবিতে তো রসের ধারা প্রবাহিত হয় নি। আজকের দিনের শিক্ষিত (trained) চোখে এঁদের ছবির মেকিত্ব সহজেই ধরা পড়ে এবং সেগুলো যে সৃষ্টি হিসেবে সার্থক হয় নি তা বুঝতে পারা যায়। ইউরোপীয় শিল্পের স্বাঙ্গীকরণ (assimilation) এদের দ্বারা হয়ে ওঠে নি বলে, নূতন রসসৃষ্টি এঁরা করতে পারেন নি, করেছিলেন ব্যর্থ অনুকরণ। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে আচার্য্য নন্দলালের কথা। উপদেশ প্রদানচ্ছলে একবার তিনি আমায় বলেছিলেন, "দেশবিদেশের নানারকম ছবি বেশ ভাল করে দেখ। এঁকে যাও ছবি—ছবিতে দরদ দাও। আঙ্গিক (technic) আপনি তোমার স্বকীয়তায় সৃষ্টি হবে। আর ছবি করবে তোমার শিল্পদৃষ্টিতে—ফটোর মত নয়।" তাঁর আঁকা একখানি দৃশ্যচিত্র (landscape) "শান্তিনিকেতন" দেখিয়ে বললেন, "এই দেখ, এতে তো বিষয়-বস্তু সবই বোঝা যায়—গাছপালা, মানুষ, পশুপক্ষী—কিন্তু এ তো ফটো নয়; এ হ'ল ও জায়গাটার ছবির রূপ। এতে আমি যেমন দেখেছি, যা আমার মনে লেগেছে—এ হ'ল তারই রূপ।'

ঘাট —লেখক

আমার কয়েকখানা ছবি তাঁকে দেখালাম। আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললাম, "আমি ছবি আঁকা ভাল করে শিখতে চাই, আমার কোথায় ভুল থেকে যাচ্ছে, আর কি করে সেগুলো শোধরানো যাবে সে সম্বন্ধে আপনার নির্দ্দেশ পাব এই আকাঙ্ক্ষা।" তিনি হেসে বললেন, "তোমার নিজের ছবি সম্বন্ধে বলছি কাজেই কিছু আবার মনে করো না যেন। তোমার ড্রয়িং তো ভালই। কিন্তু এই যে এঁকেছ, এতে তো কম্পোজিশনের ছন্দ নেই। কবিতায় যেমন মিল আছে, ছন্দ আছে, ছবিরও তাই; সোজায় সোজায় মিল হ'ল একরূপ, আবার বাঁকায় সোজায় মিলে হ'ল অন্যরূপ—এ রকম নানা মিল আছে। এ ছন্দ-বোধটা থাকা চাই। একটা ছবি দেখলে সহজে বুঝতে পারবে।"—বলে তাঁর আঁকা "ঝড়" ছবিটি দেখিয়ে বললেন, "এই দেখ, সোজা সোজা তালগাছ সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি পড়ছে, ছুটে চলেছে মানুষ সবই সোজা সোজা। এ হ'ল সোজায় সোজায় মিল। কিন্তু চোখে তো লাগছে না—কারণ এর ছন্দ সব ঠিক আছে।"

শুনে অবনীন্দ্রনাথের 'রূপ' প্রবন্ধের কয়েকটি কথা আমার মনে পড়ল। তাতে আছে—"বাঁকা" দিলে একরূপ, সোজা দিলে অন্য, বাঁকায় বাঁকায় মিলে একরূপ, সোজায় বাঁকায়

রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকের জন্ত শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদপট

মিলে অন্ত—এমনি নানা ভেদ রূপের। মেঘের উপরে ইন্দ্রধনু—সে একটিমাত্র রঙীন আলোর বাঁক, তার সঙ্গে আর একটা উপযুক্ত রকম সোজা তীর তো জোড়া হ'ল না, তবু আলো-অন্ধকার, রৌদ্র ও মেঘের ভেদাভেদ দিয়ে সুন্দর ফুটল রূপটি…। সমুদ্রতীরে রূপের ভেদাভেদ শব্দ করে ফুটল আর স্থিতি ও গতি ধ'রে ফুটল ঠিক সঙ্গীতের মতই আকাশ—নিস্তব্ধ নিথর নীল এবং সমুদ্র—সচল সশব্দ নীল।…রূপের ঘেরে বন্দী আমরা গোড়া থেকেই, এই বাঁধন থেকে মুক্তি হচ্ছে রূপমুক্তির সাধনা রূপকারের।"

আবার নন্দলালের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। খানিক চুপ করে থেকে তিনি পুনরায় বলে চললেন, "আর একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখবে—তুমি ছবিতে যে জিনিষটা ফোটাতে চাও সেটাকে করবে স্পষ্ট করে—বাকীগুলো সব দরকারমত ফুটিয়ে তুলবে। তোমার চোখ একটা জিনিষকে বিশেষ করে দেখছে, আরও কিছু সে দেখছে, কিন্তু তা ততটা স্পষ্ট করে নয়। ছবি আঁকার বেলায়ও তাই—তুমি যা' দেখাতে চাও, সেটির দিকে বিশেষ করে নজর দাও—বাকীগুলোকে দরকারমত সব যার যার জায়গায় বসিয়ে দাও। দেখবে, তাতে ছবি ফুটবে ভাল। তুমি যে এঁকেছ, তাতে সবগুলো জিনিষের দিকেই যেন তোমার সমান নজর। সবগুলোকেই তুমি ভাল করে ফোটাতে চেয়েছ, দূরের গাছের প্রতিটি পাতা পর্য্যন্ত—এতে ছবির সবটাই একসঙ্গে নজরে পড়ছে। ফলে প্রধান বিষয় চাপা পড়েছে।"

তাঁর বাড়ীর পিছনের দিকের বারান্দায় বসেছিলুম। তিন দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। সেটি তাঁর বিশ্রাম করবার স্থান, সেখানে ছবি আঁকার সব সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে। সামনে বহুদূর-বিস্তীর্ণ মাঠ, উঁচু-নীচু ঢেউ-খেলানো লাল কঙ্করময় জমি। মাঝে মাঝে তালগাছের সারি দেখা যাচ্ছে—এখানে ওখানে দু'একটা বাবলা গাছও রয়েছে। সে দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি আবার সুরু করলেন, "মনে কর, ঐ যে তালগাছটা দেখা যাচ্ছে—ঐটে তুমি আঁকছ—ওর সামনে পেছনে গাছপালা মাঠ সব রয়েছে। এখন তোমার দৃষ্টিতে তাল-গাছটা হ'ল রাজা-বাদশা—আর ওর সভাসদেরা সভা জমিয়ে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট জায়গায় সব বসেছে। ছবির মধ্যেও এমনি রাজা-বাদশা, সভাসদ রয়েছে। তোমার শিল্প-দৃষ্টিতে যেটা প্রধান—সেই 'রাজা-বাদশাকে' ছবিতে যথোচিত মর্য্যাদায় বসাও, তারপরে তার সভার মধ্যে যথাস্থানে সভাসদদের বসাও—ছবি তাতে জমবে ভাল। এই ত হ'ল ছবির আসল কথা।"

উপমাটা বেশ জুৎসই মনে হ'ল। খানিক পরে আবার আমার ছবির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, বললেন—"তোমার ছবিগুলোতে একটা 'ফটো ফটো' ভাব রয়েছে। গাছপালা, মানুষ, পশুপক্ষী—শারীরস্থানের (anatomy) হিসেবমত এরা ঠিকই আছে। কিন্তু এঁদের প্রাণ তো চাই। সব যেন কলের পুতুলের মত বসানো হয়েছে। ছবি তো ফটো নয়, ছবি দেখলেই মনে হবে ছবি দেখছি—কোন কিছুর ফটো নয়। ফটোতে তো ছবির রস নেই, প্রাণ নেই; ফটো হ'ল বাইরের ছাপ, আর অন্তরের ছাপ হ'ল ছবি।"

আর্ট স্কুলে বরাবর নেচার থেকে স্কেচ করে ছবি আঁকার নির্দেশই পেয়ে এসেছি। তাই বোধ হয় বরাবর চোখ দেখে আসছে "শুকং কাষ্ঠং", কিন্তু "এ যে তরবর রসের বিহনে রহে" এরূপ দেখার মত দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হয়ে ওঠে নি। এই রসহীন পরিবেশের মধ্যে কলের পুতুলের মত কাজ করার ছাপ পড়েছে সব ছবিতে। গতানুগতিকভাবে ছবি, মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করতে করতে হাত উঠেছে পাকা হয়ে, কিন্তু মন রয়ে গেছে উপবাসী।

নন্দলালকে জানালাম যে স্কেচ করে তাই থেকে সব ছবি এঁকেছি—ছবি যে প্রাণহীন হয় সেইটে এর একটা কারণ হতে পারে। তিনি বললেন, "নেচার থেকে স্কেচ করবে সেটা ভাল। স্কেচ তো আমরাও করি; তালগাছ, খেজুরগাছ জন্তু-জানোয়ার সব আমাদের স্কেচ করা আছে। কিন্তু ছবি তো আঁকি মন থেকে। ছবি আঁকার বেলায় সেগুলো সাহায্য করে মাত্র।"

"কিছুদিন mythological subject (পৌরাণিক বিষয়) নিয়ে ছবি আঁক, ছবিতে রং দাও, প্রাণ ঢেলে দাও। তা হলে এ অভাবটা দূর হবে। তোমার ছবি বেশীর ভাগই ইংরেজীতে যাকে বলে genre painting, কলাভবনে যেয়ো—বিদেশী genre painting কিছু তোমায় দেখিয়ে, বুঝিয়ে দেব।"

পরদিন কলাভবনে অনেকগুলো জাপানী ও বিলাতী ছবি দেখলাম। নন্দলাল বললেন, "এ রকম আঁকতে পার। এগুলোর সঙ্গে প্রকৃতির মিল রয়েছে, কিন্তু ছবির রস এগুলোর মধ্যে অক্ষুণ্ণ আছে—জীবন্ত মানুষও হয়েছে—ছবিও হয়েছে। ছবিও আঁক, আর সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ভাল ভাল বই পড়ে মনকেও পুষ্ট কর।"

আমি একজন সামান্য শিক্ষার্থী। আমায় সঙ্গে করে শান্তিনিকেতনের ফ্রেস্কো এবং মডেলিং কতগুলো দেখালেন এবং সেগুলোর রস ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন।

কত বড় শিল্পী তিনি, তাই শিল্পীমাত্রেই তাঁর একান্ত আপনার জন, তাদের প্রতি তাঁর কত দরদ!

ভালই তো

শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন রায়

পরীক্ষার পর ছাত্রজীবনে মুক্তির যে জোয়ার আসিয়া পড়ে তাহাতে প্রাণ খুলিয়া সাড়া না দিয়া পারে ক'জন! সেই একঘেয়ে পড়াশুনার মাঝে যখন নূতনত্বের আহ্বান আসিয়া দ্বারে আঘাত করে, তখন পিঞ্জরাবদ্ধ মন বুঝি রুদ্ধ দুয়ারের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া ছুটিয়া চলে অসীম মুক্তির সন্ধানে! পড়াশুনার সেই বাঁধাধরা সময় নাই, কলেজে যাইবার না আছে তাড়াহুড়ো, না আছে একটা বিরক্তিকর কর্তব্যবোধ! এই মুক্তির মাঝে হিসাবী দোকানীর মত গুনিয়া গুনিয়া সতর্কভাবে দিন কাটাইতে আর যেন ইচ্ছা করে না।

বাহিরে যাইতে হইবে, কিন্তু কোথায় যাইব? শহরের এই কোলাহলের বাইরে একটু নির্জনতা কি পাওয়া যাইবে না কোথাও? অনেক টাইম-টেবিলের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া, অনেক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বড়দার কথাটাই বেশ মনোমত হইল, দেশেই যাইব! চূর্ণী নদীর তীরে ছোট নির্জন গ্রামটির আকর্ষণ যেন কিসের এক অদৃশ্য টানে আমাকে টানিয়া লইল, কিন্তু মুশকিল বাধিল যে! থাকিব কোথায় গিয়া! আমাদের দেশের বাড়ীতে তো তালা পড়িয়া আছে সেই কবে হইতে! বড়দা বলিলেন—'কুছ পরোয়া নেই। অমুর বাড়ীতে গিয়ে উঠবি।' অমুদা দাদার বাল্যবন্ধু—গ্রামসম্পর্কে আমাদের জ্ঞাতিও বটে।

মোটঘাট বাঁধিয়া রওনা হইয়া গেলাম বহুদিন-না-যাওয়া, শান্ত পল্লীজননীর ক্রোড়ে আশ্রয়ের লোভে।

...উঃ! কতদিন পরে না আজ আবার নৌকায় উঠিলাম। ছোট নদীটির তীর ঘেঁষিয়া নৌকা চলিয়াছে। বাইরে শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠিয়াছে আকাশে, ফুটফুটে জ্যোৎস্না, তার নীচে রূপালী ছোট্ট নদী কুলকুল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে যেন দয়িতের কাছে প্রেমগুঞ্জনের আশায়। আর নৌকার মধ্যে আমি চুপটি করিয়া বসিয়া আছি। এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের মাঝে ছইয়ের মধ্যে বসিয়া থাকা আর চলে না।

মাঝি বারণ করিল—বাবু বাইরে হিম পড়ছে, ঠাণ্ডা লাগতে পারে।—তা বটে! ওর ধারণা কলিকাতার বাবু একটু হিমেই জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে হয় তো।

...সৌন্দর্য্যের কি বিরাট্ রূপ! সোনা ছুঁয়ের পোঁচ লাগিয়াছে গাছের পাতায়, আকাশের গায়ে, নদীর জলে। নদীর পাড়ে বাঁশবনের ঝোপ, হোগলা বনের জঙ্গল...গাছের পাতায় চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি, নদীর জলে তরল রূপার ছোট ছোট ঢেউগুলি...মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক, নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ, আকাশে মাথার উপর দিয়া কত রকম পাখীর উড়িয়া যাওয়ার সেই মনোরম দৃশ্যটি, মাঝে মাঝে দুই-একটা কুটীর...দূর হইতে ভাসিয়া-আসা বাউলের গান আজ আমার মনকে

কোথায় যেন উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। এমনটি তো দেখি নাই কোন দিন। কলিকাতার বিজলী বাতির সমারোহে প্রকৃতি-রাণীর এমন রূপটি তো দেখি নাই আর। ইচ্ছা হয় হাত যোড় করিয়া বলিয়া উঠি—'হে সুন্দর! তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তোমাকে আমি প্রণাম করি।'

...ঘাটে আসিয়া পৌঁছিতে বেশ খানিকটা রাত হইয়া গেল, আগেই চিঠি পাইয়া অমূল্য নিজেই আসিয়াছেন ঘাটে।

প্রণাম করিতেই দুই হাত দিয়া জড়াইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন—ওমা, কত বড়টি হয়েছিস্ তুই! সেই ছোটটি ছিলি, কি রকম আব-আব কথা বলতিস।...একটু থামিয়া, তা কম দিন তো আর হ'ল না। কেউ কি আর গাঁ-মুখো হবে তোমরা!

বাড়ী আসিয়া বৌদিকে প্রণাম করিলাম, কত কথা, কত অনুযোগ-অভিযোগ। কেন গ্রামে আসি না আমরা, শহর ছাড়িয়া আসিতে ভাল লাগে না বুঝি, মাঝে মাঝে গরীব দাদা-বৌদিকে স্মরণ করিলে এমন আর কি জমিদারী নিলাম হইয়া যাইত! তাঁহাদের কথা মুখ বুজিয়া সহ্য করিলাম! কি করিয়া তাঁহাদের বুঝাইব, অবহেলা নয়, পিঞ্জর হইতে মুক্তি না পাইলে আসিব কি করিয়া! আর তা ছাড়া যে ঘোড়া ঠুলি-আঁটিয়া পথ চলে, সে কি করিয়া সন্ধান রাখিবে তাহার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিপথের বাহিরেও আছে আর একটি বিরাট্ জগৎ!

...সকালে একটু দেরি করিয়া ঘুম হইতে উঠা আমার বহুদিনের অভ্যাস। হঠাৎ পায়ে কিসের সুড়সুড়ি লাগিতেই সজোরে পা ঝাড়া দিয়া একেবারে উঠিয়া বসিলাম, সাপখোপ নয় তো। না, যাহা ভয় করিয়াছিলাম তাহা নয়। দেখিলাম একটা বিড়াল ছিটকাইয়া পড়িল গিয়া একেবারে ঘরের ঐ কোণটায়, মহানন্দে আসিয়া শুইয়াছিল আমার বিছানায়।

তাহার মিউ মিউ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে 'কি হয়েছে রে পুষি!' বলিতে বলিতে একটি পাঁচ-ছয় বছরের সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। পুষি ততক্ষণে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে, গা ঝাড়া দিয়া আমার দিকে তাকাইয়া ডাকিয়া উঠিল,—মিউ। কি হইয়াছে তাহার জবাবটা সে ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিল, মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া তাহার সুডৌল দুটি হাত দিয়া পুষিকে কোলে তুলিয়া লইল, তারপর আমার দিকে রুদ্রনেত্রে তাকাইয়া বলিল, 'পুষিকে তুমি মেরেছ?'

আমি আমতা আমতা করিতে লাগিলাম, 'আমি তো দেখতে পাই নি, পা-টা বেই একটু সরিয়েছি—'

কথা শেষ হইবার আগেই সে ফাটিয়া পড়িল—পা একটু সরিয়েছ আর অমনি পুষি ওরকম ছিটকে এক কোণ দূরে পড়ল গিয়ে? বলি, পুষি কি আমার কানা বেলুন নাকি এঁ্যা?

উত্তর দিব কি, এই এক ফোঁটা মেয়েটির জেঁপোমি দেখিয়া হাসির চোটে আমার সর্ব্বশরীর দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু হাসিলে পাছে আরও কিছু অনর্থ বাধিয়া বসে তাই নেহাত গো-বেচারীর মত মুখ করিয়া আবার বলিলাম, 'আমি কি বুঝেছি যে ও ছিটকে পড়বে—আর আমি তো ভেবেছিলাম সাপ-টাপ বুঝি।'

আমার কথা শুনিয়া মেয়েটি এবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—বেরালকে সাপ ভাববে না! ভীমরতি আর বলে কাকে!

কার সঙ্গে কথা বলছিস রে মঞ্জু—বলিয়া বৌদি আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন—'সকাল না হতেই এসে ঢুকেছ এখানে,' ...আমার দিকে তাকাইয়া: 'আমার মেয়ে মঞ্জু। এই প্রণাম কর্, তোর কাকা যে।' মঞ্জু তো অবাক! কৈ কাকা তো তাহার ছিল না কোন দিন। রাতারাতি মাটি ফুঁড়িয়া কাকা গজায় নাকি আজকাল। কাল তো রাতে শুইবার আগে পর্য্যন্ত এমন সৃষ্টিছাড়া কাকা দেখে নাই সে। যে কাকা বেড়ালকে সাপ ভাবিয়া লাথি মারিয়া বসে, যে কাকা রোদ উঠিয়া গেলেও কুম্ভকর্ণের মত ঘুমাইতে থাকে।...আবার মঞ্জুর রাঙা টুকটুকে ঠোঁটের উপর মিষ্টি হাসি নামিয়া আসে।

'কি রে প্রণাম করলি নে?' বৌদির কণ্ঠ আবার ঝঙ্কার তোলে। মঞ্জু একটু ইতস্ততঃ করিল, তারপর পুষিকে মাটিতে বসাইয়া রাখিয়া আমার কাছে আগাইয়া আসিল প্রণাম করিতে। আমি দুই হাত দিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইলাম—'থাক, আর প্রণাম করতে হবে না, বাঃ বেশ লক্ষ্মী মেয়েটি তো তোমার বৌদি। যেমন চেহারাটি তেমনি মিষ্টি নামটি—মঞ্জু।'

মঞ্জু ফিক্ করিয়া হাসিয়া মার দিকে কটাক্ষ হানিয়া সলজ্জ কণ্ঠে বলিল 'মিষ্টি না ছাই। মিষ্টি হলে কি আর মা আমায় মুখপুড়ী বলে ডাকত কখনও। তুমিই বল না কাকা—হঠাৎ কথার তোড়ে এত বড় প্রতিপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলায় মঞ্জু লজ্জায় আমারই বুকে মুখ গুঁজিয়া বসিল। তাহার কোঁকড়ানো চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম 'আমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল তো মঞ্জুরাণী। পুষিকে আর কোনদিন মারব না, কেমন? মঞ্জুও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।'

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, 'ভাব তো হ'ল এবার মেয়ের পাকামোর ঠেলায় পাগল না হয়ে যাও।' তিনি হাসিমুখে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

* * *

এমনি করিয়া ক'টা দিন যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল কে জানে। শীতের অলস মধ্যাহ্নে মঞ্জুর বকুনি শুনিতে শুনিতে কখনও ঘুমাইয়া পড়ি, আবার রোদ পড়িয়া আসিলে কখন যে তাহার তাড়া খাইয়া উঠিয়া পড়ি—তা যেন নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। তারপর দুই জনে গিয়া বসি চুর্ণী নদীর তীরে। ছোট নদীটি, কতরকম ছোট বড় নৌকা ভাসিয়া

যাইতেছে নদীর বুকের উপর দিয়া, মধু কল্পনার রং চড়াইয়া কত কথাই না বলিয়া যাইতেছে।

'ঐ যে দেখছ বড় নৌকোটা পাল টেনে যাচ্ছে ওতে আছে এক রাজার ছেলে বিয়ে করে বৌ নিয়ে যাচ্ছে,'—তারপর কোলে উপবিষ্ট পুষির গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলে, 'আমার পুষিরাণীও যাবে একদিন ঐ রকম একটা পেল্লায় নৌকোয় চড়ে শ্বশুর বাড়ী, নারে পুষি—'

—'মিউ'

গাঢ় কণ্ঠে মধু বলিয়া চলে—'দেখেছ কাকামণি, পুষি আমার সব কথা বোঝে'—তাহার এই জলন্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে টুঁ-শব্দটি করিতেও সাহস হইল না, শুধু মৃদু হাসিয়া সায় দিলাম। মেয়েটার কল্পনার রং যেন ক্রমেই চড়িয়া যাইতেছে।

—'কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জান, কাকামণি!' জিজ্ঞাসু-নেত্রে মধুর মুখের দিকে তাকাইলাম। মধু একটি দূর্বাঘাস দাঁতে কাটিতে কাটিতে নেহাত গিন্নীবান্নীর মত চিন্তিত মুখে বলিল, 'বিনে পণে ত কেউ আর মেয়ে নেবে না। দু-পাঁচ শ নইলে বাবুদের আর মনই ওঠে না যে!' একটা ঢোক গিলিয়া··· 'সেই যে চাঁপা আছে না, ওর হতুমকে তো তুমি দেখেছ। সেই যে গো কালো ড্যাবড্যাবে চোখ! সে-ও চায় আড়াই শ, কত বললাম দু'শ কর্ না সই। ওর সেই এক কথা, বলে, ভদ্রলোকের মেয়ের এক কথা—আচ্ছা বাবু, আমিও দেখি দু'শ টাকায় আমার পুষির পাত্তর জোটে কি না! পুষি আমার কি ক্যাল্‌না মেয়ে! না রে পুষি!'

—'মিউ।'

আর সামলাইতে পারিলাম না, হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, 'দু'শ টাকাই বা পাবি কোথায় রে!'

মধু কথাটা শুনিল, কতক্ষণ হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর কি রকম মধুর হাসিয়া ঘাড় দোলাইতে দোলাইতে বলিল, 'নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না বাপু! একটুও বুদ্ধি নেই তোমার, কাকামণি! সত্যি সত্যি টাকার কথা কে বলেছে তোমাকে—সে যে খোলামকুচির টাকা গো!'

আশ্বস্ত হইলাম। নিজের ভুল শোধরাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, 'খোলামকুচির টাকাই যদি, তবে আড়াই শ'তে আর আপত্তি করছ কেন?'

মধু তর্জনী দিয়া স্বীয় চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল, 'ওমা, তুমি বলছ কি গো! খোলামকুচি বলে কি পঞ্চাশটা টাকা তোমার গায়েই লাগল না!'

এই রে, সর্বনাশ! একটা ভুল শুধরাইতে গিয়া ক্রমেই ভুলের মাত্রা বাড়াইয়া চলিয়াছি। ভ্রূ কুঁচকাইয়া গম্ভীর মুখে ভারিক্কী চালে বলিলাম, 'সত্যিই তো পঞ্চাশ টাকা বেশীই বা দিতে যাবে কেন? মেয়ে তোমার কুৎসিত নয়! দু'শর বেশী এক পয়সাও দিও না কাউকে!'

মধু মৃদু হাসিয়া সস্নেহে বলিল, 'সবই বুঝি কাকামণি, কিন্তু ক'টা টাকার জন্যে কি অমন ভাল পাত্তর হাতছাড়া করতে আছে? মানুষের জন্যেই ত টাকা, কি বল, এ্যাঁ?'

কথাটা তাহার নিজের কানেই বুঝি কেমন বেখাপ্পা শুনাইল, তাই আবার বলিল, 'পুষি আমার মানুষের মতোই! ওদেরও তো সুখদুঃখ আছে, কি বল?'

কি আর বলিব, বলিলেও বিপদ, না বলিলেও, তাই বুদ্ধিমানের মত শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে। নিকটে-দূরে শাঁখের আওয়াজ, মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টা এমন সময়টিকে যেন বড় মধুর করিয়া তোলে।

—চল্ রে মধু, সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাড়ী যাই চল্। হাত ধরাধরি করিয়া দু-জনে বাড়ীর পথে পা বাড়াইলাম।

* * *

সেদিন দুপুরে ঘুমাইয়া আছি, হঠাৎ মধুর ঠেলা খাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম—'কি রে, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে নাকি!'

মধু কি রকম অপ্রস্তুত হইয়া গেল, 'ও তুমি বুঝি ঘুমোচ্ছিলে?'

ঘুমন্ত লোককে ঘুম হইতে জাগাইয়া তাহাকে ঘুমের কথা জিজ্ঞাসা করাটা কি রকম একটু অভিনব বোধ হইল। ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, অনুমান তাহার মিথ্যা হয় নাই। আমি ঘুমাইতেছিলামই বটে!

মধু আমার মাথার কাছে বসিয়া বলিল, 'মাথা টিপে দেবো কাকামণি!'

বলিলাম, 'কেন রে, কাকামণির ওপর বড় দরদ যে! কোন অন্যায় করে এসেছ বুঝি!'

আমার কথা কানে না তুলিয়া মধু বলিয়া চলিল, 'আজকালকার কাপ প্লেটগুলো দেখেছ কাকামণি! ধরেছ কি ভেঙেছে, জাপানী মাল কিনা!'

—'দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমার মজা! দোষ করে আগে থেকেই সাফাই গাওয়া হচ্ছে!' বৌদি যে কখন আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়াছেন, তাহা আমরা দু'জনে কেহই এতক্ষণ দেখি নাই।

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। মধু আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল, তাহাকে কোলের কাছে নিবিড় করিয়া লইয়া বৌদিকে বলিলাম,—'থাক বৌদি, এবারকার মত মাপ কর ওকে। ছেলেমানুষ ভেঙে ফেলেছে একটা জিনিষ—'

—'সে জন্যেই তো আস্কারা পেয়ে যায় ও, এদিকে পাকা-মোতে তো একেবারে ঠানদি—' বৌদি চলিয়া গেলেন।

মায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মধু উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিলাম, 'হ্যাঁ রে, দিন দিন বড় হচ্ছিস—একটুও পড়াশুনো করবি নে!'

মঞ্জু ঘর ছাড়িয়া যাইতে যাইতে ঝঙ্কার দিয়া বলে, 'হ্যাঁ, পড়াশুনো করবার সময় আমার গড়াগড়ি দিচ্ছে কিনা! আর মেয়েমানুষ পড়াশুনো করে কি হাকিমী করবে, এঁ্যা?'··· একটু থামিয়া,—

'যাই দেখি, মেয়েটা আবার কোথায় পাড়া টহল দিতে বেরিয়েছে—' মঞ্জু পুষির উদ্দেশে দ্রুতগতিতে দৌড়িয়া ফেলিয়া দুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

···এইরূপে দিনগুলি বেশ ভাল ভাবেই কাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইবার সময় হইয়া আসিয়াছে। আর তো এখানে বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

তারপর এক দিন বিছানা-বাক্স লইয়া ফিরিয়া চলিলাম। যাইবার সময় বৌদি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, 'আবার এসো ভাই! মেয়েটা বড্ড কষ্ট পাবে, উঠে যে কি কাণ্ডটাই বাধিয়ে তুলবে, তাই ভাবছি।'

রাত্রে মঞ্জু ঘুমাইয়া পড়িলে পর বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি। দিনেও যাওয়া চলিত, কিন্তু মঞ্জুর সামনে দিয়া নৌকায় উঠিবার মত বুকের পাটা আমার কোথায়? দুঃখ এই, যাইবার সময় মেয়েটার সঙ্গে দেখাও হইল না।

* * *

দীর্ঘ দশ বৎসর পরে এই কাহিনীর যবনিকা আজ আবার তুলিয়া ধরিলাম। ইহার মধ্যে সংসারের কত পরিবর্ত্তনই না হইয়া গেল: বাবা মারা গেলেন, আমিও বি-এ পাস করিয়া উচ্চশিক্ষার অভিলাষ ছাড়িয়া চাকরির জোয়ালে জুড়িয়া গেলাম। তারপর সেই দশটা পাঁচটা করিয়া রঙীন পৃথিবীটাকে কবে যে অন্তঃসারশূন্য আখের ছিবড়ার মত করিয়া ফেলিয়াছি, তাহা আমি নিজেই বুঝি জানি না। যাক্ সে কথা।

দশ বৎসর পরে সদলবলে আজ আমরা আবার দেশে ফিরিতেছি পূজার উৎসবে। কিন্তু দশ বৎসর পূর্ব্বে যে পথে যাইতে যাইতে কত রঙীন স্বপ্ন, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা আমার নবীন মনকে দোলাইয়া মাতাইয়া তুলিয়াছিল, আজ যেন তাহার শতাংশের একাংশও নিজের মনে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। কিন্তু নৌকায় উঠিয়াই প্রথমে মনে হইয়াছে একটি ছোট মেয়ের কথা।

মঞ্জু! নিশ্চয়ই রাগ করিয়াছে···খুব রাগ করিয়াছে সে। এতদিন একটা চিঠি পর্য্যন্ত লিখি নাই তাহার কাছে। প্রথম সে কথা বলিবে না···কিছুতেই বলিবে না। আমিও প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। শিমুলতলার মেলা হইতে একটা কুম্ভকর্ণের মূর্ত্তি কিনিয়া আনিয়াছি মঞ্জুর জন্য। দাড়ি-গোঁফওয়ালা বিরাটাকার এক পুরুষ শুইয়া আছে, তাহার বুকের উপর চড়িয়া দুই তিনটা ক্ষুদে রাক্ষস ঢাক ঢোল বাজাইবার বিভিন্ন ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান, বাক্সে ভরিবার আগেই মূর্ত্তিটার নাকটা বাক্সের কোণায় লাগিয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে ক্ষতি বিশেষ কিছুই হয় নাই। মঞ্জুর হাসির বেগ হয়ত আরও বর্দ্ধিত হইবে ইহাতে। কল্পনায় যেন সে দৃশ্যটা ভাসিয়া উঠিল। মঞ্জু যেন মাথা গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে···এমন সময় সেই মূর্ত্তিটি তাহার সামনে ধরিয়া বলিলাম, 'এই দেখ তোমার বর।' ইহার পর আর সে হাসি চাপিতে পারিবে না, কিছুতেই পারিবে না! ব্যস্, দুই জনে আবার ভাব হইয়া যাইবে।···ভারি তো মঞ্জু! তাহার রাগ ভাঙাইতে আর কতক্ষণই বা লাগিবে?

সেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করিয়া ঘুমাইতে অনেক রাত হইয়া গেল। পরদিন হাতমুখ ধুইয়া চা খাইয়া অমুদার বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হইয়া গেলাম।

ডাক শুনিয়া দাদা-বৌদি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুই জনকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম। বৌদি আসিয়া বলিলেন, 'ভাল আছ ত ভাই?' ঘাড় নাড়িয়া উত্তরটা সারিয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিলাম, বৌদি হয়ত মনের কথা বুঝিলেন, বলিলেন—'ও মঞ্জু দেখে যা, তোর কাকা এসেছে যে!'

একটি শাড়ীপরা মেয়ে ধীর নম্রভাবে বাহির হইয়া আসিল এবং একটা প্রণাম করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোন অভিমানের আভাস, কোন রাগের চাপা ইঙ্গিতই ত তাহার মুখে নাই, বরং একজন অপরিচিতের সামনে দাঁড়াইয়া সে যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে।

একটু পরে ধীরে ধীরে সে ভিতরে চলিয়া গেল। কোন কথাই তাহাকে বলা হইল না, কলিকাতায় কেনা মূর্ত্তিটাও তো তাহাকে দেখানো হইল না, যে মূর্ত্তি দেখাইয়া তাহার রাগ ভাঙাইয়া আবার ভাব করিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প মনে মনে আঁটিয়া আসিয়াছিলাম।

সেই শূন্য স্থানটির দিকে চাহিয়া শুধু মনে হইল, সত্যিই, মঞ্জু বড় হইয়াছে, এখন কি আর তাহার বাজে কথা বলিবার সময় আছে, যেমনটি ছিল দশ বছর আগে। তাহার যে এখন অনেক কাজ···অ-নে-ক। মঞ্জু বড় হইয়াছে। সুখের কথা, ভাল কথা, ভালই ত! সে কি চির দিনই ছোট খুকীটি থাকিবে নাকি!

ঋগ্বেদে দেবতাদিগের মধ্যে ও ঋষিকুলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ঋগ্বেদে কয়েকজন দেবতা, কয়েকটি ঋষিকুল ও ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন ঋষির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। অপর পক্ষের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ, আত্মশ্লাঘা ও কোন কোন ক্ষেত্রে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ঋগ্বেদের ভারতীয় ও বৈদেশিক ব্যাখ্যাতাগণ ঋগ্বেদীয় দেবতাদিগের মধ্যে ও ঋষিকুলগুলির মধ্যে এই দ্বন্দ্বের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। ঋগ্বেদকে আর্যজাতির অথবা আর্যজাতির ভারতীয় শাখার প্রাচীনতম প্রামাণ্য দলিল বলিয়া গ্রহণ করিয়া যাঁহারা আর্যজাতির ইতিহাস রচনা করিয়াছেন এই দ্বন্দ্বের ইতিহাসকে তাৎপর্যহীন বলিয়া উপেক্ষা করায় তাঁহাদের সিদ্ধান্তে ত্রুটি ঘটিয়াছে কিনা তাহা বিচারের বিষয়।

এই প্রবন্ধে ঋগ্বেদীয় দেবতাদিগের মধ্যে ও সূক্তকার ঋষিদিগের মধ্যে এই অন্তর্বিরোধের কাহিনীর কিছু আলোচনা করা হইবে। এই প্রসঙ্গে হিন্দু-ধর্মে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের বিরোধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই তিন মত তিন জন দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হইতে উদ্ভূত। লক্ষ্য করিতে হইবে যে কলহ বিবাদ এই তিনটি মতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, তিন জন দেবতার মধ্যে কলহ ও সংগ্রামের বিবরণ তিন সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ মানুষের বিবাদ দেবতায় আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং যেখানে দেবতায় দেবতায় বিরোধের কথা বলা হয় সেখানে উহাকে কল্পনা মাত্র বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করিয়া এইরূপ অনুমান করা চলে যে বিভিন্ন মতের মধ্যে সংঘাতের কথা বলা হইতেছে। এই সংঘাতের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে মূল্যবান একথা বলা বাহুল্য। সূক্তকার ঋষিগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী ঋগ্বেদের আমলে সামাজিক অবস্থার উপর খানিকটা আলোকপাত করে। ঋগ্বেদকে যাঁহারা যাযাবর, পশুপালক, অর্দ্ধসভ্য আর্যজাতির কবিগণের বিচিত্র, অস্পষ্ট-বোধ্য, কাব্যোচ্ছ্বাস অথবা ভারতবর্ষের আর্যজাতীয় বৈদেশিক বিজেতাগণের কাল্পনিক বা অর্দ্ধ-কাল্পনিক বিবরণ বলিয়া দূরে সরাইয়া না রাখিয়া ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের একটি অত্যন্ত প্রাচীন, মূল্যবান মানবীয় দলিল হিসাবে বুঝিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট ঋগ্বেদ সম্পর্কে এই প্রকারের ইতিহাসের যতটুকু পুনর্গঠন করা সম্ভব তাহাই বিশেষ মূল্যবান মনে করা যাইতে পারে। বলা প্রয়োজন যে প্রবন্ধে ঋগ্বেদকে সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার একটি দলিল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রথমে দেবতাদিগের মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে দেবতায় দেবতায় বিবাদ ও সংগ্রামের বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল বিবরণ অনেক ক্ষেত্রে এত সংক্ষিপ্ত, সময়ে সময়ে এরূপ অসঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে হয় যে এইরূপ বিবাদের বিবরণের অন্তরালে কি কথা বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা ধরিতে পারা যায় না। তাহা ছাড়া এই প্রকার বিবাদের আনুপূর্বিক ইতিহাস সংগ্রহ করাও অসম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই-একটি কথায় প্রাচীন কিম্বদন্তীর উল্লেখ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উষার বিবাহের কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। দশম মণ্ডলে ৮৫ সূক্তে উষার বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া ঋগ্বেদের আমলের বিবাহ-পদ্ধতির একটা বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তে উষার পাণিগ্রহণের জন্য দেবতাদিগের মধ্যে একটি রথ চালনার প্রতিযোগিতার কথা বলা হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করিয়া অশ্বিদ্বয় উষাকে লাভ করেন। অকৃতকার্য্য প্রতিদ্বন্দ্বিগণ অশ্বিদ্বয়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিক কাহিনীর প্রাচীনত্ব ও খানিকটা রূপক ছাড়া আর কোন বিশেষ অর্থ আছে কিনা জানা যায় না। অশ্বিদ্বয় বা নাসত্য খ্রীঃ পূঃ ১৫ শতাব্দীর মিটানী লেখনে ও জেন্দাবেস্তায় উল্লিখিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে অশ্বিদ্বয়ের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। এই সকল কীর্ত্তির বেশীর ভাগ অসুস্থ বা বিপদগ্রস্ত ঋষি ও রাজাদিগকে রোগ ও বিপদ হইতে মুক্ত করিবার কাহিনী। এরূপভাবে এই সকল কীর্ত্তির প্রায় একই প্রকার তালিকা পুনঃ পুনঃ উপস্থিত করা হইয়াছে যে মনে হয় বহুপূর্ব্ব হইতে এই সকল কাহিনী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অভিষবকালে দেবতাদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি-কাহিনী স্মরণ করিবার বিধি ছিল। দেবগণের প্রতি ক্রোধ বশতঃ অগ্নির জলমধ্যে লুকায়িত হওয়া ও দেবদূত মাতরিশ্বা কর্ত্তৃক অগ্নিকে আনয়ন আর একটি রূপক মিশ্রিত পৌরাণিক কাহিনী।

রুদ্রপুত্র মরুৎগণের সহিত ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ কয়েকটি ঋকে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের সহিত মরুৎগণের একত্র উপাসনায় আপত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি সূক্তে মরুৎগণকে তরুণ বয়স্ক বলা হইতেছে। ইন্দ্রের মুখ দিয়া বলা হইতেছে—উহারা কি মনে করিয়া কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিল? অগস্ত্য মরুৎগণের পক্ষ লইয়া ইন্দ্রকে বলিতেছেন,—হে ইন্দ্র, তুমি কি আমাকে হনন করিতে ইচ্ছা কর? মরুৎগণ তোমার ভ্রাতা, উহাদিগের সহিত সুখে যজ্ঞভাগ সেবা কর। ইন্দ্র অগস্ত্যকে বলিতেছেন, তুমি সখা হইয়া কেন আমাদিগকে অপলাপ করিতেছ? তুমি আমাদিগকে যজ্ঞভাগ দিতে ইচ্ছুক নহ। অগস্ত্য অন্যত্র বলিতেছেন যে দূরে মরুৎগণের জন্য তিনি হব্য সংস্কৃত করিয়াছেন। ইহার অর্থ ইন্দ্র ও মরুৎগণের জন্য

পৃথক ব্যবস্থা হইয়াছিল। এদিকে দেখা যায় বশিষ্ঠ মরুৎগণকে বৃদ্ধদেবগণ বলিতেছেন। কণ্বকুল মরুৎগণের সহিত একসঙ্গে ইন্দ্রের স্তুতি করিতেছেন দেখা যায়। কণ্বকুলের এক জন ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তোমরা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে; কোন্ সময়ে ইহা ঘটিয়াছিল? ঋগ্বেদের কয়েকটি কবিত্বপূর্ণ সূক্ত মরুৎগণের স্তোত্রের মধ্যে দেখা যায়। ইন্দ্রের সহিত মরুৎগণের বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করা হয় নাই। সম্ভবতঃ অগস্ত্যের চেষ্টায় মরুৎগণ প্রধান দেবগণের সঙ্গে সমান মর্য্যাদা লাভ করেন, তাহার পূর্ব্বে কুলীন দেবগণের সঙ্গে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব্বের কাসাইট লেখনে মরুত্তাস নাম পাওয়া যায়। অনুমান করা হইয়াছে কাসাইট জাতির উপাস্য এই মরুত্তাস ও বৈদিক মরুৎ অভিন্ন।

সূর্য্যের সহিত ইন্দ্রের বিরোধের একটা কাহিনী ঋগ্বেদ রচনার কালে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদে এতশের সহিত সূর্য্যের যুদ্ধে ইন্দ্র কর্ত্তৃক এতশের পক্ষ লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার কথা আছে। ঋগ্বেদে বধ্ৰ পুত্র সূর্য্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সায়নের ব্যাখ্যা এই যে পুত্র কামনা করিয়া বধ্ৰ রাজা সূর্য্যের উপাসনা করিলে সূর্য্য তাঁহার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। দেবতা তুষ্ট হইয়া ভক্তের পুত্র বা কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এই বিশ্বাস ঋগ্বেদের আমলে প্রচলিত ছিল। ইন্দ্র স্বয়ং বৃষণশ্ব রাজার কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কন্যার নাম ছিল মেনা। সে যাহা হউক, বধ্ৰ পুত্রের সহিত সোমাভিষবকারী এতশ ঋষির বিবাদের হেতু জানা নাই। তাঁহার সহিত এতশের যুদ্ধকে সূর্য্যের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রের এই যুদ্ধে যোগদানের কারণ শরণাগত রক্ষা এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট মনে হইতে পারে। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের একটি ঋকে দেখা যাইতেছে যে অগ্নিও এতশের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। সুতরাং এইরূপ সন্দেহ উঠিতে পারে যে সূর্য্য-উপাসক বধ্ৰ রাজা সম্ভবতঃ ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। ইন্দ্রের সহিত ত্বষ্টার বিরোধ ও ত্বষ্টার পুত্রকে হত্যা করিবার কাহিনীর উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে।

এক দেবতার প্রতি অনুরক্ত ঋষি বা রাজা অন্য দেবতার প্রতি উদাসীন এরূপ ব্যাপার ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু ইহাই নহে, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি জনপ্রিয়, প্রসিদ্ধ দেবতাদিগের উপাসনার বিরোধী, ইন্দ্রের অস্তিত্বে সংশয়ী ব্যক্তি ঋষিকুলগুলির মধ্যে ছিল এরূপ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে।

দেবতাদিগের নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসঙ্গে ইন্দ্র ও উষার মধ্যে বিরোধ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই বিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায় বামদেবকুলের রচিত চতুর্থ মণ্ডলে।

বামদেব পরিবারের উষার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশের উগ্রতা হঠাৎ চোখে পড়িলে অহৈতুক ও হতবুদ্ধিকর মনে হয়। উষা বিদ্রোহিণী, হিংসাকারিণী, ইন্দ্রহীনা (দ্রুহং জিঘাংসন্ ধ্বরসমনিন্দ্রা), তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য ইন্দ্র অস্ত্র তীক্ষ্ণ করেন। ইন্দ্র দ্যুলোকের কন্যা, হননাভিলাষিণী স্ত্রীকে বধ করিয়াছিলেন। তিনি উষাকে সংপিষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহার রথ চূর্ণ করিয়াছিলেন। ভীতা উষা রথ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। চূর্ণীকৃত রথ বিপাশতীরে পড়িয়া রহিল, উষা দূরে অপসৃতা হইলেন। (এতদস্যা অনঃশয়ে সুসংপিষ্টং বিপাশ্যা। সসার সীং পরাবতঃ)। বিপাশ আর্জীকীয়া নামে ঋগ্বেদে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে ইহা বিয়স নামে পরিচিত। কুলু উপত্যকার রোহটাং গিরিপথ হইতে বাহির হইয়া অমৃতসর ও কপূর্রতলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা শতদ্রুতে মিশিয়াছে। বিয়সের প্রাচীন পথ ছিল লাহোর ও মন্টোগোমারী জেলার মধ্য দিয়া। এই পথে মুজাবাদের নিকটে বিয়স চেনাবের সহিত মিলিত হইত। বিপাশের তীরে উষার ভগ্ন রথ পড়িয়া রহিল, তিনি দূরে অপসৃতা হইলেন, ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে বিপাশ বামদেব ঋষির নিকট প্রত্যন্ত প্রদেশস্থ নদী। ইন্দ্র কর্ত্তৃক উষার রথ ভগ্ন করিবার কাহিনী আরও কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। উষাকে অভদ্র ব্যাধের মত নিষ্ঠুর, জরাদায়িনী ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইন্দ্রের সহিত উষার বিরোধের কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই। এই সব বিবরণ মিলাইয়া উষাদেবীর উপাসনার একটি প্রবল বিরোধী দল ছিল অনুমান করা যায় এবং বামদেব গোত্রীয় ঋষিগণ সম্ভবতঃ এই বিরোধিতায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের স্ত্রী-দেবতাদিগের মধ্যে উষা প্রধান। উষার বর্ণনায় ঋগ্বেদীয় কবির কবিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল বর্ণনায় উষার চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। উষা প্রগলভা, সুন্দরী তরুণী, বিশ্বপালয়িত্রী, মহীয়সী মাতা ও সুরূপচরিত্রী দেবী। লজ্জাহীনা যুবতীর ন্যায় উষা সূর্য্যের সম্মুখে আগমন করেন। উষা নর্ত্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করেন। উষা শুভ্রবর্ণা, নিত্যযৌবনসম্পন্না, শুভ্রবসনা। উষা অভিসারিকা যুবতীর ন্যায় হাস্য করিয়া বক্ষদেশ অনাবৃত করেন। উষার কন্যাত্বের উল্লেখ কয়েক বার করা হইয়াছে। উষা সুবেশা, সন্তস্নাতা তন্বী; মাতা যাঁহার অঙ্গমার্জনা করিয়া স্নান করাইয়া দিয়াছেন সেই কন্যার ন্যায় উষার উজ্জ্বল সৌন্দর্য। উষা অস্ত্রধারী যোদ্ধার ন্যায়। তিনি গোপ্রচরণভূমি অনাবৃত করেন, দেবকারিগণকে পৃথক করেন, দৈবব্রত অবিঘ্ন করেন। উষা মহতী দেবী, সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরী, অন্নসম্পাদিকা, দেবগণের মাতা, মনুষ্যের মৈত্রী। পূর্ব্বকালীন পিতা অঙ্গিরাগণ মন্ত্রদ্বারা উষাকে প্রাদুর্ভূতা করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠগণ সকলের প্রথমে উষাদেবীকে স্তব ও

স্তোম দ্বারা প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। গোতম বংশীয়গণ উষার স্তব করেন।

উষা ইন্দো-য়ুরোপীয়ান আমলের আর্যজাতির প্রাচীন উপাস্যদেবতা, গ্রীকদিগের ঈওস (Eos) ও লাটিনদিগের অরোরা (Aurora) উষস নামের রূপান্তর এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে—"Her names in the Rigveda are Arjuni, Brisaya, Dahana, Ushas, Sarama, Saranya and all these names reappear among the Greeks as Argynoris, Brises, Daphne, Eos, Helen and Frinys." উষার অহনা নাম রূপান্তরিত হইয়া গ্রীকদিগের Athena হইয়াছে এইরূপ বলা হইয়াছে। অত্যন্ত সরলভাবে এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে গ্রীক ও হিন্দু ভিন্ন জাতি হইয়া যাইবার পূর্বে তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ উষাকে এই সকল নাম দিয়াছিলেন। ভাষাবিজ্ঞানীগণের আবিষ্কৃত আর্যজাতি ও এই জাতির ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা এখানে অবান্তর। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রাচীন বৈদিক আর্যদিগের সহিত যাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে সেই প্রাচীন ইরাণীয় আর্যদিগের মধ্যে উষার অনুরূপ কোন দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। উষার কল্পনায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে দেখা যায় তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে কয়েকটি ভিন্ন প্রকৃতির দেবীর কল্পনার সমাবেশে ঋগ্বেদীয় উষার উৎপত্তি হইয়াছে। যে সকল দেবীর বৈশিষ্ট্য উষাতে আরোপিত হইয়াছে তাঁহাদের উপাসনা সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের আমলে অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। উষার যে সকল নাম ঋগ্বেদে দেখা যায় সেই নামগুলি সম্ভবতঃ ঐ সকল প্রাচীন, ঋগ্বেদীয় আমলে লুপ্ত দেবীর নিকটে প্রাপ্ত। ইহা ছাড়া উষার কল্পনায় অনেকটা রূপকও রহিয়াছে। সকল বহু-ঈশ্বরবাদী প্রাচীন ধর্মে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। সে যাহা হউক, ইন্দ্রের সহিত উষার প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ হইতে সঙ্গতভাবে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে ইন্দ্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পরে উষাদেবীর উপাসনা প্রবর্তিত হয় এবং গোঁড়া ইন্দ্র-উপাসকগণ এই উপাসনার প্রচলনে বাধা দিয়াছিলেন। এই অনুমানের পক্ষে একটি প্রমাণ ঋগ্বেদ হইতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম দিকে যজ্ঞের সহিত উষার বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায় না; শেষের দিকে উষাকে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে দেখা যায়। সম্ভবতঃ অঙ্গিরাগণ অথবা বসিষ্ঠকুল এই নূতন উপাসনার প্রচলন করেন। কিন্তু নূতন দেবতার উপসনার প্রবর্ত্তন করিলেও ইঁহারা ইন্দ্র-বিরোধী ছিলেন না।

এখানে উষার উপাসনার প্রচলন সম্বন্ধে যে অনুমান করা হইয়াছে তাহার স্বপক্ষে ঋগ্বেদের আর একটি প্রমাণের উল্লেখ করা হইতেছে।

অদিতি ঋগ্বেদীয় প্রাচীন দেবতাগণের মধ্যে একজন। কখন অনন্ত আকাশ, কখন সর্বংসহা পৃথিবী, কখন বিশ্বরূপা গাভীরূপে তিনি কল্পিত হইয়াছেন। তিনি মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি সকল প্রধান দেবতাদিগের মাতা; এজন্য তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দেবমাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। দেব-গণের সম্মানীয়া মাতারূপে তাঁহার মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এজন্য তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি অঘ্ন্যা ও অনর্বা অর্থাৎ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিহত। অদিতির চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি ঋগ্বেদে কয়েকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে, তিনি অহিংস ব্রতের অধিষ্ঠাত্রী এবং শত্রুহীনা। বৈদিক ঋষিগণ বা আর্যগণ যজ্ঞে পশুবধ করিতেন প্রচলিত বিশ্বাস এইরূপ। কিন্তু ঋগ্বেদে দেখা যায় যে অহিংসাবাদী এক দল ঋষি গোড়া হইতে বর্ত্তমান ছিলেন এবং অহিংস বা পশুবধ না করিয়া যজ্ঞ করিবার রীতিও প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের আমলের পরেও যে এই অহিংসাবাদের ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারতের নারায়ণীয় অংশে বসু উপরিচরের কাহিনীতে ও পঞ্চরাত্র মতবাদের ব্যাখ্যায়। নানা উৎস হইতে প্রবাহিত বারিরাশিতে সমৃদ্ধ হইয়া এই প্রাচীন ধারা মহানদীতে পরিণত হইয়াছিল গৌতমবুদ্ধের ধর্মে।

সে যাহা হউক, দেখা যায় যে এই প্রাচীন, অঘ্ন্যা ও অনর্বা দেবমাতা অদিতির একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হইল। অঙ্গিরা গোত্রীয় কুৎস ঋষি বলিতেছেন, মাতা দেবানামদিতে-রনীকং; হে উষা! তুমি দেবগণের মাতা, অদিতির প্রতি-স্পর্দ্ধিনী। তুমি সকলের বরণীয়া (বিশ্ববারা)। অদিতি ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, আর্যমান, আদিত্যগণের ও রুদ্রগণের মাতা, সুতরাং যথার্থ দেবমাতা, কিন্তু কোন দেবতাকে উষার পুত্র বলা হয় নাই। উষাকে সূর্যের মাতা বলা হইয়াছে, কিন্তু সূর্যের কন্যারূপে এবং কোন কোন স্থানে সূর্যের স্ত্রী বা প্রণয়িনী রূপেও তিনি উল্লিখিত হইয়াছেন। দেখা যাইতেছে কোন দেবতার মাতা না হইয়াও উষা দেবগণের মাতা ও অদিতির প্রতিস্পর্দ্ধিনী বলিয়া সম্বোধিত হইতেছেন। সুতরাং এ অনুমান সহজেই করা যায় যে দেবগণের মাতৃপদের উচ্চ মর্য্যাদা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয়।

ইন্দ্রের সহিত বিরোধ ও সংগ্রাম এবং অহিংসব্রতের ঈশ্বরী ও শত্রুহীনা দেবমাতা অদিতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই দুইটি বিষয়ের উল্লেখ হইতে মনে করা যাইতে পারে যে ঋগ্বেদীয় দেবতা গোষ্ঠির মধ্যে উষার অভ্যুদয় একটি স্মরণীয় ঘটনা এবং ইন্দ্রের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে বিদ্রোহের উপলক্ষ একজন স্ত্রীদেবতা। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেকে মত-প্রকাশ করিয়াছেন যে আর্যজাতি পুরুষ দেবতাদিগের ভক্ত

ছিলেন, হিন্দু ধর্মে স্ত্রী দেবতার উপাসনার আমদানী হইয়াছে অনার্য ধর্ম হইতে। অনার্য জাতির ধর্মে স্ত্রী-দেবতার প্রাধান্য ঘটে তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থায় স্ত্রীজাতির প্রাধান্য হইতে (matriarchal society)। এই জাতীয় মতের ভিত্তি অনুমান মাত্র, কোনপ্রকার প্রমাণ নহে এবং কোন প্রকার প্রমাণ উপস্থিত করিবার দায়িত্ব স্বীকার করা হয় না। ঋগ্বেদে অদিতি, ঊষা, সরস্বতী, বাক্ ও পৃথিবীর স্তুতি-গুলিতে যে ভাব ও চিন্তার উৎকর্ষ ও কবিত্বশক্তির প্রকাশ দেখা যায় কোন পুরুষ দেবতার স্তুতিতে ঐরূপ উৎকর্ষ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন।

উপরে ঊষার উপাসনার প্রবর্ত্তন সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ছাড়াও ঋগ্বেদের কয়েকজন প্রধান দেবতার উপাসনার বিরোধিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রমাণ দুই প্রকারের। কোন কোন ঋষি ও দেবতার মধ্যে শত্রুতা ও সংঘর্ষের উল্লেখ দেখা যায়। আবার কোন কোন দেবতার অস্তিত্বে সন্দেহ করা হইয়াছে ও সাময়িক ভাবে কোন কোন দেবতার উপাসনা অপ্রচলিত হইয়াছিল এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে ঋগ্বেদের দুই জন প্রধান দেবতা, ইন্দ্র ও অগ্নির সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণের উল্লেখ করা হইতেছে।

ঋষি ও দেবতাদিগের মধ্যে শত্রুতার দৃষ্টান্তসমূহ হইতে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ ইন্দ্রের সঙ্গেই শত্রুতার সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। অঙ্গিরা গোত্রীয় কুৎস ঋষির সঙ্গে ইন্দ্রের সখ্য প্রসিদ্ধ। পণিগণের সহিত যুদ্ধে, অব্রাত দস্যুগণের সঙ্গে বিরোধে কুৎস ও ইন্দ্রের সহযোগিতার কথা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে। হঠাৎ একটি ঋকে দেখা যায় যে কুৎস ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়াছিলেন বলা হইতেছে। ইহার কোন কারণ ব্যাখ্যা করা হয় নাই। প্রাচীন ও সম্মানীয় পিতৃগণের শ্রেণী-ভুক্ত অথর্বন ঋষি ইন্দ্রের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। ইহার কারণ উল্লেখ করা হয় নাই। কণ্ব ঋষির পিতার নাম নৃষদ। একস্থানে বলা হইয়াছে ইন্দ্র নৃষদের পুত্রকে বিদীর্ণ করেন। ইন্দ্রের এই কার্যের কোন কারণ ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ভৃগুকুল প্রাচীন পিতৃগণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় মণ্ডলের সূক্তকার গৃৎসমদ ভৃগুকুলে জন্মিয়াছিলেন, পরে অঙ্গিরাকুলে গৃহীত হন। অগ্নি উপাসনার প্রবর্ত্তনে ভৃগুকুল অথর্বন ও অঙ্গিরা কুলের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। ৭ম মণ্ডলে দেখা যায় যে ভৃগুগণকে ইন্দ্র জলে নিমজ্জিত করিয়া নিহত করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে ভৃগুগণ অনু ও দ্রুহ্যু গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিয়া সুদাসের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ভৃগুকুলের নেম ঋষি বলিতেছেন, ইন্দ্র বলিয়া কেহ নাই, কে তাঁহাকে দেখিয়াছে? কাহাকে আমরা স্তুতি করিব?

নেম ঋষির এই উক্তি হইতে দেখা যায় যে ইন্দ্রের মত মর্য্যাদাশালী দেবতার অস্তিত্বে সংশয়ী লোক ঋষিকুলগুলির মধ্যে ছিল। ভরদ্বাজ ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—যদি তোমার সেরূপ বল হইয়া থাকে, সেরূপ ক্ষমতা থাকে তবে মধ্যে মধ্যে কার্যের দ্বারা তাহার পরিচয় দেওয়া উচিত। অত্রিকুলের রচিত ৫ম মণ্ডলে ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধারহিত ও তাঁহার সহিত সংস্রবহীন লোকের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। একটি ঋকে বলা হইতেছে, যে ইন্দ্র বৃত্র বধাদি কার্য করিয়াছিলেন তিনি কোন্ স্থানে ও কোন্ লোকের মধ্যে থাকেন? প্রসিদ্ধ দশ রাজার যুদ্ধের বর্ণনায় দেখা যায় যে ত্রিৎসু, ভরত, সৃঞ্জয় এবং সম্ভবতঃ পুরু গোষ্ঠী বাদে প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদীয় যজমান গোষ্ঠীগুলিকে ইন্দ্রহীন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ভরদ্বাজ গোত্রীয় গর্গ ঋষির একটি উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইন্দ্রের প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন যে এই ইন্দ্র পূর্বতন প্রশস্ত কর্মের অনুষ্ঠানকারিগণের সহিত মিত্রতা ত্যাগ করিয়া এবং তাহাদের প্রতি দ্বেষ করিয়া নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুতা করেন। ভরদ্বাজগণ ঋষিকুলগুলির মধ্যে একটু বেশী উন্নাসিক প্রকৃতির। অগ্নির পূর্বতন ভ্রাতা দেবতাদিগের জন্য যজ্ঞভাগ বহন করিতে গিয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন। এইজন্য ভয়প্রযুক্ত অগ্নি দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এখানে শত্রুপক্ষের বিরোধিতার ফলে কোন্ সময়ে অগ্নির উপাসনা সাময়িক ভাবে বন্ধ হইয়া-ছিল এই ইঙ্গিত করা হইতেছে। প্রগাথের পুত্র ভর্গ ঋষি একটি ঋকে বলিতেছেন, আমরা ইন্দ্রকে জানি না, আমরা অগ্নিরহিত, এক্ষণে সোম অভিযুক্ত হইলে তাহার জন্য একত্রিত হইয়া ইন্দ্রকে সখা করিয়া লইব। এখানে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে কোন কোন ঋষিকুলের মধ্যেও ইন্দ্র ও অগ্নির উপাসনা সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

ঋষিগণের মধ্যে প্রাচীন, মধ্যকালীন, ইদানীন্তন ও অর্বাচীন এইরূপ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতাগণের মধ্যেও বৃদ্ধদেবতা, নবীন দেবতা ও অর্ভক দেবতা এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ দেখা যায়। কোন কোন দেবতার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তাঁহারা মনুষ্যপদ হইতে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বহু স্থানে অঙ্গিরা ও অগ্নিকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। অঙ্গিরা গোত্রীয় সুধন্বা ঋষির পুত্রগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঋভু নামে পরিচিত হইয়াছেন। একটি ঋকে বলা হই-য়াছে যে, মরুৎগণ পূর্বে মনুষ্য ছিলেন, প্রশংসনীয় কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বায়ু ও ইন্দ্রকে কোন কোন স্থানে "নরা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

দেবতাদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং দেবতা ও ঋষিদিগের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এবার ঋষিদিগের মধ্যে ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধের প্রসঙ্গে আসা যাইতে পারে।

ঋষিদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধের যে সকল উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার শ্রেণীবিভাগ করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যায় যে কোন ক্ষেত্রে এই বিরোধ কুলগত কোন ক্ষেত্রে এই

বিরোধ যজ্ঞের নেতা বা প্রধান ঋত্বিকের পদ লইয়া; কোন ক্ষেত্রে এই বিরোধের কারণ স্বীয় গোত্র বা কুলের প্রাধান্য প্রচারের অভিলাষ এবং কোন ক্ষেত্রে এই বিরোধের কারণ দেবতাবিশেষের প্রতি পক্ষপাত।

ঋষিদিগের মধ্যে বিরোধের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে বৈদিক ধর্মে যজ্ঞানুষ্ঠান ও স্তুতিকে কিরূপ প্রাধান্য দেওয়া হইত তাহা বুঝিতে হইবে। স্তুতির দ্বারা ঋষি দেবতাদিগের বন্ধুত্ব লাভ করেন, ইন্দ্রাদি দেবতার বলবৃদ্ধি করেন, তাঁহাদিগের ক্রোধ নিরোধ করেন, আপনার অভীষ্ট লাভ করেন। স্তুতি পাইবার জন্য দেবতারা কোলাহল করিয়া যজ্ঞস্থানে আগমন করেন। দেবতারা যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত, ঋষিগণ যজ্ঞের জীব। যজ্ঞের দ্বারা ঋষি, পৃথিবী ও আকাশ পবিত্র করিয়াছেন, সূর্যকে তাঁহার স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন, পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন। যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে অভীষ্ট প্রদানে বাধ্য করা হয়। শত্রুদিগের উপর জয়লাভ করিবার, তাহাদিগের ধন সংগ্রহ করিবার উপায় যজ্ঞ ও স্তুতি; গো, অশ্ব, উষ্ট্র ও কুক্কুরবাহিত বিপুল দক্ষিণা লাভ করিবার উপায় যজ্ঞ। যজ্ঞপূত ব্যক্তি পূজনীয় হইলেও দেবগণ তাহাকে বধ করেন। যে হব্য দেয় না ইন্দ্র তাহাকে মণ্ডলাকার সর্পের ন্যায় পদদ্বারা দলন করেন।

ঋগ্বেদে যুদ্ধ-কাহিনীর ছড়াছড়ি। এই সকল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল প্রধানতঃ জল ও উর্বরা ভূমির অধিকার লইয়া, অপরের রাজ্যজয় ও বিপুল ধনরাশি লুণ্ঠন করিবার লোভ হইতে। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য দেবতাদিগের সাহায্য প্রয়োজন হইত। দেবতাদিগের সাহায্য পাইবার একমাত্র উপায় ছিল যজ্ঞ ও স্তুতি। স্তুতি ও যজ্ঞে পারদর্শী ও যজ্ঞের নেতা ছিলেন ঋষিকুল। এই জন্য যজ্ঞার্থী রাজগোষ্ঠীর নিকট অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা ঋষিগণের সমাদরের অন্ত ছিল না। দক্ষিণার পরিমাণও ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে অসামান্য। একজন ঋষি গর্ব করিয়া বলিতেছেন যে তাঁহার দক্ষিণার পরিমাণ ছিল চারি সংখ্যায়, অর্থাৎ হাজারের উপর। গো, অশ্ব, রথ, উষ্ট্র, সুবর্ণ, বস্ত্র, দাস ও সালঙ্কারা রাজকন্যা দক্ষিণা দেওয়া হইত। দানশীল যজমানের প্রশংসা সূক্তকারগণ পঞ্চমুখে করিয়াছেন। পূষার নিকট একটি প্রার্থনা বেশ চিত্তাকর্ষক। "হে পূষা তুমি অদানশীল ব্যক্তিকে দানার্থ উত্তেজিত কর, তুমি কৃপণের হৃদয় কোমল কর।" কোন কোন যজমানগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট পুরোহিতকুল ছিল। ত্রিৎসু রাজা সুদাসের পুরোহিত ছিলেন বসিষ্ঠগণ, সৃঞ্জয়দিগের ভরদ্বাজগণ, পুরুদিগের কণ্বকুল। কিন্তু কোন দানশীল রাজা যজ্ঞ করিবেন জানিতে পারিলে কখন কখন ঋষিগণ অনাহূত ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। কবষ ঋষি কুরুশ্রবণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, —আপনি যজ্ঞ করিবেন, আপনার জন্য আমি তিনটি স্তোত্র রচনা করিয়াছি। আমি আপনার পিতার প্রশস্তিকার, আপনি আমার নিকট আসুন।

যজ্ঞের প্রাধান্য ও বিপুল দক্ষিণা লাভের আশায় ঋষিগণের মধ্যে যজ্ঞে নেতৃত্ব করিবার আগ্রহ হইতে সহজে অনুমান করা যায় যে এই ব্যাপার লইয়া ঋষিকুল বা ঋষিগণের মধ্যে কি প্রকার ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মনোমালিন্যের উদ্ভব হওয়া সম্ভব ছিল। ঋগ্বেদে এই ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মনোমালিন্যের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঋষিদিগের মধ্যে কুলগত শত্রুতার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র বংশীয়গণ। কেহ কেহ অনুমান করেন সম্মিলিত ত্রিৎসু-ভরত গোষ্ঠির পৌরোহিত্য করিবার দাবি এই শত্রুতার কারণ। যজ্ঞে নেতৃত্ব করিবার দাবি লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদাহরণ হিসাবে ভরদ্বাজগোত্রীয় ঋজিশ্বা ও অতিযাজের মধ্যে কলহের উল্লেখ করা যায়। ঋজিশ্বা প্রথমে বলিতেছেন, অতিযাজের যজ্ঞ স্বর্গীয় বা পার্থিব দেবগণের যোগ্য নহে, উহা আমি যে যজ্ঞ করি তাহার তুল্য নহে। তার পর অতিযাজ ও তাঁহার ঋত্বিকগণ লাঞ্ছিত হউক এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। তার পর মরুৎগণকে আহ্বান করিয়া যে আপনাকে ঋজিশ্বা যে কুলে উদ্ভূত হইয়াছেন সেই কুল হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাহাকে শাস্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। ইহাই শেষ নহে। তারপর সোমকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—তুমি আমাদের রক্ষক; যখন শত্রু আমাদিগের কুৎসা রচনা করে কি হেতু তুমি উদাসীন থাক? ব্রহ্মদ্বিষকে বিনাশ করিবার জন্য অস্ত্র নিক্ষেপ কর। ব্রহ্মদ্বিষ কথার অর্থ স্তুতি-বিদ্বেষী। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষিকে এই গালি দেওয়া হইতেছে। দেখা যায় যে একটি ঋকে বলা হইতেছে দুই জন বিবাদকারীর মধ্যে যাহার ঋত্বিকগণ যজ্ঞে ইন্দ্রের স্তব করেন সেই ব্যক্তিরই ধনলাভ হয়। বসিষ্ঠ বলিতেছেন যে তাঁহার পৌরোহিত্যের ফলে সুদাস শত্রুগণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন।

ঋজিশ্বার উক্তিতে কুলের অহঙ্কার করা হইয়াছে। একজন ঋষি বলিতেছেন, যে আমাদিগকে দ্বেষ করে সে নিকৃষ্ট হইয়া পতিত হউক। অপর একজন ঋষি অগ্নিকে বলিতেছেন, যে কেহ আমাদের হিংসা করে তাহাদের যজ্ঞে যাইও না, তোমার অভ বন্ধুর যজ্ঞে যাইও না। একজন প্রার্থনা করিতেছেন, যাহারা আমাদের নিন্দা করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে দূর করিয়া দাও। আত্মীয় ও অনাত্মীয় শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য কোন কোন ঋষি দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। এই আত্মীয় শত্রুগণ যে সম্পর্কিত কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষি তাহাতে সন্দেহ নাই। ধার্মিক ও অধার্মিক কৃত উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে। ধার্মিক উপদ্রবকারী ঋষিকুলভুক্ত এরূপ মনে করা যাইতে পারে। একজন ঋষি বলিতেছেন, আমি যে শ্রেণীভুক্ত সেই শ্রেণীর লোক অপেক্ষা যে ব্যক্তি আপনাকে মহৎ মনে করে তাহাকে খর্ব কর। দেবতাবিশেষের প্রতি পক্ষপাত কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতি-

দ্বন্দ্বিতা বা ঈর্ষার কারণ হইয়াছে। "অন্য দেবে অনাসক্ত" বলিয়া কোন ঋষি গর্ব প্রকাশ করিতেছেন। কণ্ব গোত্রীয় একজন ঋষি বলিতেছেন,—আমরা ভিন্ন অন্য কেহ কি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি অবগত আছে ?

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে ঋষিদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা ও শত্রুতা কিরূপ ব্যাপক ছিল তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। দেবতাদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব, দেবতার অস্তিত্বে সন্দেহ এবং দেবতা ও ঋষিদিগের মধ্যে বিবাদ সম্বন্ধে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে পরোক্ষে তাহা ঋষিদিগের মধ্যে ঐক্য মতের অভাব প্রমাণ করে। এই সকল প্রমাণকে ঋষিকুলগুলির মর্য্যাদার হানিকর বা ঋষিদিগের পক্ষে গ্লানিকর বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ঋগ্বেদীয় সমাজের যে চিত্র এই সকল প্রমাণ হইতে পাওয়া যায় সেই চিত্রের সম্বন্ধে ধীর ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। এই চিত্রের সম্মুখ ভাগে রহিয়াছেন পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী ঋষিকুল, মধ্য ভাগে তাঁহাদের যজমান গোষ্ঠী বা রাজন্যবর্গ। দেবতাদিগের স্তুতি, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও রাজাদিগের প্রশস্তি রচনা করিয়া অন্ন ও যশ অর্জ্জন করা ঋষিদিগের লক্ষ্য ; পুরোহিতের সহায়তায় যাগযজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে তুষ্ট করিয়া শত্রুর ধন অপহরণ ও রাজ্য জয় করা রাজন্যবর্গের লক্ষ্য। এই চিত্রের পশ্চাদ্ভাগে রহিয়াছে শত্রুগোষ্ঠী। দাস, দস্যু, আর্য, যজমান গোষ্ঠী, ঋষি—সকলকে লইয়া এই শত্রুগোষ্ঠী গঠিত। ঋষিদিগের মধ্যে বিবাদ, শত্রুদিগের সহিত বিবাদ, দেবতাদিগের মধ্যে বিবাদ, নানাপ্রকার বিবাদের কোলাহলে সমগ্র ঋগ্বেদ মুখরিত।

ঋগ্বেদ ও বৈদিক আর্যজাতি সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে সেই সকল মতবাদের সহিত এই চিত্রের সঙ্গতি দেখা যায় কিনা বিচার করিতে হইবে। ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্র ভারতবর্ষের বাহিরে, মেসোপটেমিয়ায় বা ইরাণে রচিত হইয়াছিল, আর্য জাতি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ শতকে ঋগ্বেদের রচনা আরম্ভ হইয়া খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ শতকে শেষ হয়, আর্য জাতি আক্রমণকারীরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি মতবাদে অনেকে দৃঢ়বিশ্বাসী। ঋগ্বেদের আরম্ভ হইতে দেখা যাইতেছে যে ঋষিদিগের পৌরোহিত্য ও রাজন্যবর্গের রাজত্ব পুরুষানুক্রমিক। রাজন্য গোষ্ঠীগুলি আপনাদিগের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত। স্বর্গ ও দেবগণের প্রসাদ পাইবার উপায় ঋষিগণের করায়ত্ত বলিয়া যজমানগোষ্ঠীগুলি সতত তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট। ঋগ্বেদের রচনাকালকে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০, কাহারও মতে খ্রীঃপূঃ ২০০০ বা ২৫০০ শতক হইতে খ্রীঃপূঃ ৮০০ শতক পর্যন্ত টানা হইলেও দেখা যায় যে ঋগ্বেদের আরম্ভ হইতে উপরের বর্ণিত অবস্থা বর্ত্তমান। যে পুরুষানুক্রমিক পৌরহিত্যের প্রচলন ঋগ্বেদের প্রথমাবধি দেখা যায় তাহা গড়িয়া উঠিতে যে বহু যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই ঋগ্বেদ রচনার অনুমিত সময়কে আর্যগণের ভারতে প্রবেশের অনুমিত সময়ের অনেক পরে লইয়া যাইতে হয়। সেক্ষেত্রে ঋগ্বেদের কোন অংশ ভারতবর্ষের বাহিরে রচিত হইবার কথা উঠে না। অথবা এই অনুমান করিতে হয় যে সংঘবদ্ধ পুরোহিত গোষ্ঠীগুলি বাহির হইতে আসিয়া এদেশে বসবাস ও দেশীয় রাজন্য গোষ্ঠীগুলিকে আপনাদিগের ধর্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। একটি বিদেশীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতাবিহীন হইয়া আপনাদিগকে সমাজের শীর্ষস্থানে কায়েমী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই প্রসঙ্গে পারস্যের হাকামনীয় ও সাসানীয় আমলের Magi বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের কথা রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় উঠাইয়াছেন। তাঁহার মতে মিডিয়ার এই পুরোহিত সম্প্রদায় পারস্যের রাজবংশকে আপনাদিগের ধর্মে দীক্ষিত করিয়া পারস্যে আপনাদিগের পুরুষানুক্রমিক পৌরোহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ঋগ্বেদীয় পুরোহিতগোষ্ঠীও এইরূপ কার্য করিয়াছিলেন। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে Magi পুরোহিতগণ কোন নূতন ধর্ম প্রচার করেন নাই, মিডিয়ার অধিবাসী হইয়া তাঁহারা সুদূর পূর্বাঞ্চলের বাল্খে উদ্ভূত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সাইরাসের সময়ে মিডিয়া ও পারস্য এক রাজবংশের অধীনে আসিলে তাঁহারা পৌরোহিত্যের দাবি করেন ও এই দাবি হাকামণি সম্রাটগণ স্বীকার করেন। মিডিয়ায় পৌঁছিবার পূর্বে এই ধর্ম যে পারস্যকে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ইতিহাসের সঙ্গে ঋগ্বেদীয় ঋষিকুলের অবস্থার কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না।

আর একটি অনুমান এই হইতে পারে যে ঋগ্বেদীয় পৌরোহিত্য প্রতিষ্ঠান এ দেশীয় প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়িয়া উঠে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি ছিল ; শুধু উহা ঋগ্বেদীয় ঋষিকুলের হাতে চলিয়া যায়। এইরূপ মতের একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের শেষ দিকের রচনায়। তাঁহার মত এই যে সিন্ধু সভ্যতার আমল হইতে এই পৌরোহিত্য প্রতিষ্ঠান চলিয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবসর নাই।

ঋগ্বেদের আরম্ভ হইতে পুরুষানুক্রমিক পুরোহিতগোষ্ঠী ও রাজন্যগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় বলা হইয়াছে। দেবতাদিগের মধ্যে বিবাদ, দেবতা ও ঋষিদিগের মধ্যে বিবাদ এবং ঋষিদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষা প্রভৃতির বিবরণ হইতে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে যাহাকে বৈদিক ধর্ম বলা হয় তাহার অনেকখানি ঋগ্বেদ অপেক্ষা বহু প্রাচীন। ঋগ্বেদে দেবতা অপেক্ষা যজ্ঞের প্রাধান্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং বৈদিক ধর্মের যজ্ঞাংশকে যদি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে যজ্ঞাংশের প্রবর্ত্তনের

সহিত পৌরোহিত্যের প্রবর্তন সমসাময়িক বলিয়া মনে করা যায়। এই অনুমান গ্রাহ্য হইলে তাঁহার যে ঋগ্বেদীয় দেবদেবী-গণের উপাসনা ঋগ্বেদ রচিত হইবার পূর্বেও, যাহাদের লইয়া ঋগ্বেদীয় সমাজ গঠিত, তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ এখানে এই ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, যে সমাজের চিত্র ঋগ্বেদে পাওয়া যায় সেই সমাজ ঋগ্বেদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

ঋগ্বেদ সম্বন্ধে যে সকল ধারণা প্রচলিত আছে এই মত সেই সকল ধারণার বিরোধী, এই মত গ্রহণ করাইতে হইলে বিস্তারিত প্রমাণ করা আবশ্যক এ কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু মাত্র এই মত গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজন আর্যজাতি সংক্রান্ত সমগ্র সমস্যা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিতে সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রবন্ধে নানা দিক হইতে সমস্যার উপর আলোক প্রক্ষেপ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

সে যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে এই তথ্যটুকু পাওয়া যাইতেছে যে ঋগ্বেদকে আর্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণের সহিত যুক্ত করিবার কোন সূত্র পাওয়া যায় না। আর্যজাতি কোন সময়ে বাহির হইতে সিন্ধু-উপত্যকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তর্কের খাতিরে ইহা স্বীকার করিলেও, বলিতে হয় যে ঋগ্বেদ তাহার বহুকাল পরে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু আর্যজাতি যে বাহির হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিবার কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক* বা অবৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখা যায় না।

---

* আগষ্ট, ১৯৪৬এর *Science and Culture*এ লেখকের "Were the Vedic Aryans Proto-Nordics?" প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের আংশিক আলোচনা করা হইয়াছে।

ভারতের উপর ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতির চাপ

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের একটি প্রধান সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই যুদ্ধে যোগদান করা ভারতবর্ষের উচিত কি-না এবং সত্য সত্যই আধুনিক যুদ্ধ চালাইবার মত ভারতবর্ষের সঙ্গতি ছিল কি-না, ভারতবাসীকে সে সম্বন্ধে চিন্তা করিবার বা মত প্রকাশ করিবার সুযোগ না দিয়াই ভারত-সরকার এদেশকে যুদ্ধের জালে জড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। শাসনকর্তৃপক্ষের এই স্বৈরাচারের ফল হইয়াছে এই যে, সাধারণ ভোগ্যপণ্যাদির জন্য পরমুখাপেক্ষী ভারতবর্ষকে যুদ্ধের কয়েক বৎসর (যুদ্ধ শেষ হইলেও এখনও অবস্থা প্রায় একই রূপ চলিতেছে) সর্ব্ববিধ পণ্যের অভাবে দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে এবং যুদ্ধের বিরাট ব্যয়ভার বহন করিতে এই দরিদ্র দেশ নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিজীবী দেশ। এদেশে শিল্পপ্রসার আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া বিবিধ ভোগ্যপণ্য বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া ভারতবাসীর চাহিদা মিটাইয়া থাকে। যুদ্ধের সময় সমুদ্রপথ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠায় এই পণ্য আমদানী ব্যবস্থায় দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আমদানী যখন প্রায় বন্ধ এবং অন্তর্দেশীয় সাধারণ পণ্যাভাব যখন প্রবল, তখন যুধ্যমান ভারতে সৈন্য বিভাগের ব্যাপক সম্প্রসারণ সুরু হয়। ব্রিটিশ, মার্কিণ প্রভৃতি বিদেশী সেনারাও প্রাচ্য মহাযুদ্ধের ঘাঁটি হিসাবে ভারতবর্ষে ভিড় করিয়া আসিতে থাকে। এ অবস্থায় সরকারী কর্তৃপক্ষের দিক হইতে সামরিক বিভাগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রশ্ন বড় করিয়া দেখাই স্বাভাবিক এবং এই সব সেনাবাহিনী ও সেনাবাহিনী সংশ্লিষ্ট লোকেদের চাহিদা মিটাইতে ভারতের নগণ্য পরিমাণ পণ্যের অধিকাংশই ফুরাইয়া যায়। কাজেই অসামরিক দেশবাসী এই সময় প্রোচনীয় পণ্যাভাবে দারুণ কষ্ট পাইতে থাকে। যুদ্ধের কল্যাণে কাজ-কারবার করিয়া ইহাদেরই মধ্যে যাহারা দু'পয়সা ঘরে তুলিয়াছে, বাজারের সামান্য পরিমাণ পণ্য আয়ত্ত করিতে তাহাদের দিক হইতে অপচেষ্টার অভাব হয় নাই। সচ্ছল ব্যক্তিদের এই ভোগাকাঙ্ক্ষা শেষ পর্য্যন্ত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত দেশবাসীকে অর্দ্ধাশন-অনশনে এবং দারুণ অভাব-অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাইতে বাধ্য করিয়াছে। সমরপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে ভারত-সরকার এই সময় টাকাকে টাকা বলিয়াই গ্রাহ্য করেন নাই। এই টাকা দেশের এক শ্রেণীর লোককে রাতারাতি লক্ষপতি করিয়া তুলিয়াছে এবং কারবারী বড়-লোকদের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স এই সময় হু হু করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। অন্যদিকে চাহিদা ও যোগানের উপর পণ্যমূল্য নির্ভর করে বলিয়া এই সস্তা টাকার মাহাত্ম্যে ভারতের বাজারে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যপণ্য দেখিতে দেখিতে অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধকালীন এই ফাঁপাই টাকা ও নিদারুণ পণ্যা-ভাবের যুগকে বলা হয় মুদ্রাস্ফীতির যুগ। যুদ্ধ শেষ হইলেও এ পর্য্যন্ত টাকার বাজারের নরম ভাব এবং ভোগ্যপণ্যের অভাব প্রায় একই রূপ আছে, কাজেই এখনও ভারতবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশনের যুগ চলিতেছে বলা চলে।

আধুনিক যুদ্ধে যে দেশই অংশ গ্রহণ করে, তাহাকেই মুদ্রাস্ফীতির অসুবিধা সহ্য করিতে হয়। যুধ্যমান দেশে প্রচলিত মুদ্রার প্রাচুর্য্য ঘটে দুইটি কারণে। প্রথমতঃ, যুদ্ধের

প্রয়োজনে গবর্ণমেন্ট অসংখ্য লোককে নিয়োগ করিতে বাধ্য হন এবং এই সকল লোককে বেতন হিসাবে বহু অর্থ দিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেন্ট বাধ্য হইয়া সামরিক পণ্যাদি এবং সমরবিভাগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যে কোন মূল্যে কিনিয়া থাকেন। পণ্যের অভাব ঘটায় এই সময় পণ্যসমূহের মূল্যরেখা এমনিই অনেকখানি উপরে উঠিয়া যায়। যুদ্ধের অবিশ্রান্ত খরচ চালাইতে শেষ পর্য্যন্ত নোট ছাপানোর ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের রক্ষণশীলতা রক্ষিত হয় না। ভারতেও মহাসমরের ফলে এই অবস্থা হইয়াছে। যুদ্ধের ছয় বৎসরের মধ্যে ভারত-সরকারের প্রয়োজনে দেশে নোট বাড়িয়াছে হাজার কোটি টাকার বেশী, অথচ আগে যেমন নোটের জামিন হিসাবে সরকারী কোষাগারে স্বর্ণসম্পদ রক্ষা করা হইত, এই বাড়তি হাজার কোটি টাকার নোটের বেলা সে নিয়ম মানা হয় নাই। যুদ্ধের ঠিক আগে, অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক বিলীকৃত নোটের পরিমাণ ছিল ২১৭ কোটি টাকা এবং এই নোটের পরিবর্ত্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে জমা ছিল ৪৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার স্বর্ণ। এই স্বর্ণ আবার তখনকার বাজার অপেক্ষা অনেক কম দরে কেনা ছিল এবং ইহার ক্রয়মূল্যই এই হিসাবে ধরা হইয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক বিলীকৃত এই নোটের পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে ১৯৪৬ সালের ১৫ই নভেম্বর ১২৫৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে, অথচ বিস্ময়ের কথা যে, এই পর্ব্বতপ্রমাণ নোটের পরিবর্ত্তে সঞ্চিত স্বর্ণসম্পদ এক কাণাকড়িও বাড়ে নাই। এখনকার নোটের জামিন ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডন শাখায় সঞ্চিত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি। এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটি কবে পাওয়া যাইবে এবং পুরোপুরি সবটা পাওয়া যাইবে কি না, সে সম্বন্ধে এখনও সঠিক কিছুই বলা যায় না। যুদ্ধের খাতায় স্বত্বসর্ব্বস্ব ভারতবর্ষ নিজেকে বঞ্চিত করিয়া ব্রিটেনকে ধারে পণ্যাদি যোগাইয়া সাহায্য করিয়াছে, এই আত্মবঞ্চনার ফলে ভারতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংগুলি জমিয়া উঠিয়াছে এই বিচিত্র সাহায্যদানের বিনিময়ে। যাহা হউক, নোটের উপর ষ্টার্লিং সিকিউরিটি এখন অকেজো কাগজী ঋণপত্র ছাড়া আর কিছু নয় এবং ভারতের সহস্রাধিক কোটি টাকার প্রচলিত নোটের জামিন হিসাবে এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটিকে রক্ষা করা ভারতের মুদ্রানীতির পক্ষে শুধু অসম্মানই নয়, ইহা মুদ্রানীতির নিরাপত্তার দিক হইতেও বিপজ্জনক।

এক বৎসরের বেশী হইল যুদ্ধ থামিয়াছে, পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যদেশ ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিকে শান্তিকালীন পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত করিবার জন্য নানা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়েছেন; অত্যন্ত দুঃখের কথা এদিক হইতে ভারত-সরকারের আশানুরূপ কোন কর্ম্মকুশলতা এখনও দেখা যাইতেছে না। ষ্টার্লিং পাওনা জমিতে দেওয়া ভারতের শোচনীয় মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে এই অভাব পাওনা জমিতেই পারিত না, আর কার্য্যগতিকে জমিলেও যুদ্ধ থামিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই পাওনা অবিলম্বে আদায় করিবার জন্য ভারত-সরকার ব্রিটিশ সরকারের সহিত বুঝাপড়া করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, আগের মতই এখনও সর্ব্বহারা ভারতবর্ষ ব্রিটেনকে পণ্যাদি যোগাইয়া চলিয়াছে এবং ফলে ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ এখনও বাড়িতেছে। ভারতের আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় এবং সাধারণভাবে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচনা করিলেও সেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে যে মূলধনের প্রয়োজন, তজ্জন্যও ভারত হইতে এইরূপ ধারে পণ্যপ্রেরণ অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। ভারতের যুদ্ধকালীন পণ্যাভাব এখনও এতটুকু কমে নাই, বরং খাদ্যদ্রব্যাদির সূচকসংখ্যা হইতে দেখা যায় যে, দেশের গরীব ও মধ্যবিত্তের দল এখন যুদ্ধের সময়কার তুলনায় আরও বেশী কষ্টে দিন কাটাইতেছে। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্যাদির পাইকারী দর ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে ১০০ ধরিলে ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে খাদ্যমূল্যের এই সূচকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৪, অথচ যুদ্ধ শেষ হইবার বৎসরাধিক কাল পরে ১৯৪৬ সালের ১৬ই নভেম্বর খাদ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যহারের সূচকসংখ্যা ২৬২ হইয়াছে। এদিকে সামরিক প্রয়োজন শেষ হওয়ায় এখন প্রত্যহই বহু লোক বেকার হইতেছে। দেশের আর্থিক বাজারে যখন এই ভাবে মন্দাভাব প্রসার লাভ করিতেছে, তখন মুদ্রাস্ফীতি অবিলম্বে প্রতিরোধ করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আগের তুলনায় নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাদির দাম যখন অন্ততঃ তিন গুণ, তখন এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা দ্বারা দেশবাসীকে তুষ্ট করা কেমন করিয়া সম্ভব? ইহার উপর আবার যাহাদের হাতে পণ্যনিয়ন্ত্রণের ভার তাহাদের সততার উপর নিঃসন্দেহে নির্ভর করা যায় না। কাজে কাজেই এক দিকে যখন শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ ব্যবস্থার অভাবে দেশে বেকার সমস্যা ও মন্দা বাজারের দ্রুত আবির্ভাব প্রত্যক্ষ হইতেছে, অন্য দিকে তখন খাদ্যাদি বিবিধ ভোগ্যপণ্যের অনটন তথা মূল্যবৃদ্ধি সমান তালে চলিতেছে। উপরে খাদ্যমূল্যের যে সূচকসংখ্যা দেখা হইল তাহা ভারত-সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার বিজ্ঞপ্তি হইতে উদ্ধৃত। এই সরকারী বিজ্ঞপ্তি সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে রচিত এবং কেবল মাত্র নিয়ন্ত্রিত মূল্যতালিকা হইতে জিনিষপত্রের দাম ইহাতে সন্নিবেশিত হয়। বলা বাহুল্য, শহর অঞ্চলে এবং বিশেষ করিয়া বাংলা প্রভৃতি যুদ্ধের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত প্রদেশে অসামরিক অধিবাসীর পক্ষে এই মূল্যহিসাবে খাদ্যাদি লাভ করা সম্ভব নহে। এখন যুদ্ধোত্তর বেকারসমস্যা ও আর্থিক মন্দাবাজারের চাপে দেশ বিপন্ন হইতে চলিয়াছে,

এখন এই মূল্যরেখার স্ফীতি নিঃসন্দেহে অসংখ্য দেশবাসীর জীবনধারণ পর্য্যন্ত অনিশ্চিত করিয়া তুলিবে।

ভারতে যুদ্ধোত্তর স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরাইয়া আনিতে হইলে বর্ত্তমান ফাঁপাই টাকার বাজারের উপর গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতেই হইবে। ভারতের অসংখ্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত অধিবাসীর আয় যখন কমিতেছে এবং ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি না পাওয়ার জন্য পণ্যমূল্যরেখা যখন নামিতেছে না, তখন ধনীদের বা অবস্থাপন্ন দেশবাসীর হাতে টাকা বাড়িতে দিলে দেশে চোরাবাজারের প্রসার, ক্রমবর্দ্ধমান পণ্যাভাব এবং পণ্যমূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য্য। দুঃখের বিষয়, ধনীদের হাতের নগদ টাকা কমাইবার জন্য ভারত-সরকার এ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। ভারতে তাঁহারা যদি এখন যথেষ্ট শিল্প-প্রসারের সুযোগ দিতেন, তাহা হইলে এই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে ধনীদের বহু টাকা আটক পড়িতে পারিত। অবশ্য ভারতের বর্ত্তমান অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার এ বিষয়ে আশ্বাস দিয়াছেন, কিন্তু মোটের উপর কণ্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যু মারফৎ ভারত-সরকারের এ সম্বন্ধে কর্ম্মনীতি অত্যন্ত হতাশাজনক। ভারতে সোনার দর যদি অপেক্ষাকৃত কম হইত, তাহা হইলেও ধনীরা সোনা কিনিয়া কিছু টাকা হস্তান্তর করিতেন। ব্রিটেনের নিকট ভারতের যে আঠারো শত কোটি টাকার ষ্টার্লিং পাওনা লণ্ডনে অকেজো ভাবে আটকাইয়া আছে, তাহা অবিলম্বে ফিরিয়া পাইবার ব্যবস্থা হইলে এবং তদ্দ্বারা ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে যথেষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানী করা হইলে ভারতে নূতন শিল্পযুগের প্রবর্ত্তন করা যায় এবং এই শিল্পবিপ্লব সম্ভব হইলে এক দিকে যেমন অসংখ্য দেশবাসীর কর্ম্মসংস্থান তথা জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থা হয়, অন্য দিকে তেমনই বিবিধ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া পণ্যের মূল্যরেখা অবশ্যই নামিয়া আসে। মোটের উপর ভারত-সরকারের এখন সুস্পষ্ট একটি মুদ্রাসঙ্কোচন নীতির একান্ত দরকার। ভারতে যত দ্রুত যন্ত্রশিল্পের প্রসার হইবে, ততই বাজারে পণ্যের জোগান এবং অর্থের অত্যধিক প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইয়া দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের অবস্থা একটু ভাল হইবে। এইভাবেই বর্ত্তমান ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতিজনিত দুর্ভোগ হইতে দেশ রক্ষা পাইতে পারে। অবশ্য এইরূপ যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটাইবার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নবস্ত্রাদি অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। জনসাধারণের আয়ত্তাধীন মূল্যরেখায় সকলের মধ্যে সমান হারে এই সব জিনিস বণ্টিত হইবার ব্যবস্থা হইলে শিল্পপ্রসারে সমস্ত দেশবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা লাভ সহজ হইবে, অন্যথায় দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী যদি দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখী হয়, তবে এই শোচনীয় পরিস্থিতি দেশের সমগ্র ব্যবসাচক্র ও অর্থনীতির উপর তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারে না। ভারতবর্ষের পণ্য বা পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি যাহারা পরিচালনা করেন, তাঁহাদের কর্ম্মনিষ্ঠা বা যোগ্যতার উপর দেশবাসীর কোন শ্রদ্ধা নাই। পণ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্ত্তমানে সুপরিচালিত হওয়া নিঃসন্দেহে অত্যাবশ্যক এবং এই ব্যবস্থা সার্থক করিতে হইলে যোগ্য, নির্লোভ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদের হাতে নিয়ন্ত্রণ বিভাগ পরিচালনায় দায়িত্ব ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বর্ত্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কর্ত্তৃপক্ষের উপর ভারতের মুদ্রানীতি ও মুদ্রাবিনিময়-ব্যবস্থা পরিচালনার ভার ন্যস্ত। যুদ্ধোত্তর কালে এখনও তাঁহারা যেভাবে মুদ্রানীতি পরিচালনা করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কেহই অভিনন্দিত করিবে না। ভারত-সরকার অত্যন্ত অন্যায়ভাবে যুদ্ধোত্তরকালে এখনও নিয়ত ভারত হইতে ব্রিটেনকে ধারে মাল পাঠাইতেছেন এবং তৎপরিবর্ত্তে অকেজো কাগজী-প্রতিশ্রুতিপত্র ষ্টার্লিং সিকিউরিটির অঙ্ক বাড়িয়া যাইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গের কর্ত্তব্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকারের ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার নীতির পরিবর্ত্তন না ঘটিলে ভারতের উপর হইতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ শীঘ্র কমিবে বলিয়া মনে হয় না।

আগেই বলা হইয়াছে, ভারতের ন্যায় অসম ধনবণ্টন-ব্যবস্থা সমন্বিত দেশে মুদ্রাসঙ্কোচন করিতে হইলে ধনীদের হাতের নগদ টাকা টানিয়া লইবার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টকে করিতেই হইবে। ভারতের আমলাতান্ত্রিক বিদেশী সরকার দরিদ্রদের মুখ চাহিয়া কোনকালে কাজ করেন নাই, এক্ষেত্রেও ধনীদের হাতের টাকা কমাইয়া বর্ত্তমান চড়াবাজারে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের কিঞ্চিৎ সুবিধা করিয়া দিতে তাঁহাদের অনিচ্ছাই প্রত্যক্ষ হইতেছে। অতিরিক্ত মুনাফা-কর উঠিয়া গিয়াছে, আয়করের হার কমিয়াছে, মোটের উপর ধনীদের অবস্থা সচ্ছলতর করিবারই ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারত-সরকার টাকার বাজার সম্পর্কেও অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সরকারী ঋণপত্রসমূহের সুদের হার উপর দিকে থাকিলে বিত্তশালী ব্যক্তিরা সহজেই বেশী লাভের আশায় অজস্র টাকা সরকারী ঋণপত্রাদিতে লগ্নী করিতেন; ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য ভারত-সরকারের এই টাকার এখন প্রয়োজনও আছে যথেষ্ট। শিল্পবাণিজ্য সম্প্রসারিত না হওয়ায়, বলিতে গেলে ধনীরা এখন টাকা খাটাইবার জায়গাই খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ভারত-সরকার কিন্তু এই সময় হঠাৎ ঋণপত্রসমূহের সুদের হার কমাইয়া দিতে সুরু করিয়াছেন। এই ভাবে মেয়াদহীন সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ তাঁহারা পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা সুদের ঋণপত্র বাজারে ছাড়িতেছেন। এখন টাকার বাজার যেরূপ নরম তাহাতে এই সস্তা টাকার বাজারের সুবিধা গ্রহণের ফলে সরকারের সুদের দরুন বৎসরে কয়েক কোটি টাকা অবশ্যই বাঁচিয়া যাইবে, কিন্তু বৎসরে চার-পাঁচ কোটি টাকা বাঁচাই-

যার মোহে তাঁহারা দেশের সমগ্র অর্থনীতির অনিবার্য্য বিশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। সরকারী ঋণপত্রের অল্প সুদের জন্য ধনিক সম্প্রদায়ের এই ঋণপত্র সম্বন্ধে ঔৎসুক্য থাকার কথা নয়, অথচ তাঁহারা হাতের বিরাট পরিমাণ টাকা একেবারে অকেজো ভাবে বসাইয়া রাখিতে পারেন না। কাজেই একাংশ ব্যাঙ্কে রাখিয়া এবং সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতিতে লগ্নী করিয়া বাকী টাকা তাঁহারা বাড়ী, জমি, ভোগ্যপণ্য, সোনারূপা বা শেয়ার বাজারে খাটাইতেছেন। তাঁহাদের এই ঝুঁকিদারী কারবারের ফলে প্রত্যেক জিনিষেরই অবিশ্বাস্যভাবে চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সবই অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য যদি চাহিদার চাপে শেয়ার বা মোটর গাড়ীর দর বাড়ে তাহাতে সাধারণ লোকের তেমন কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু চাহিদা বাড়িবার জন্য বাড়ী, জমি, সোনারূপা এবং বিবিধ প্রকার ভোগ্যপণ্যের মূল্য অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাওয়ায় গরীব-গৃহস্থ দেশবাসী বর্ত্তমানে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অল্প কয়েকজন ধনীর স্বার্থে দেশের অসংখ্য লোককে এইভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে দেওয়া যে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কৃতিত্বের কথা নয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতে যুদ্ধের প্রয়োজন শেষ হওয়ায় অন্ততঃ ৪০ লক্ষ লোক বেকার হইতেছে। ইহারা ছাড়া আরও অনেকের আয়ও যুদ্ধবিরতির জন্য সঙ্কুচিত হইয়াছে। পণ্যের বাজার সস্তা হয় নাই বলিয়া সপরিবার এই সব কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তি জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে ভার-স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। ভারত-সরকার যদি মুদ্রাস্ফীতি বা ইন্‌ফ্লেশন এখনও বন্ধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে এদেশের কয়েক কোটি লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহ ক্রমেই অনিশ্চিত হইয়া উঠিবে। এদিকে গবর্ণমেণ্ট শুধু ধনীদের হাত হইতে টাকা টানিয়া লইবার জন্য বেপরোয়াভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করভার বাড়াইতে চলিলেও দেশের আর্থিক বাজারে মন্দাভাব দেখা দিবে এবং লোকের ক্রয়ক্ষমতা লোপ পাওয়ার জন্য পণ্যাদি উৎপাদন করিতেই লোকে ভয় পাইবে। এই ব্যবস্থার ফলে শিল্প-বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য এবং তাহাতে বেকার সমস্যার সমাধান না হইয়া সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিবে। কাজে কাজেই এখন দেশবাসীকে সাধারণভাবে বাঁচিবার সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে ভারত-সরকারের মধ্যপথ অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অনেক কমিয়াছে, এখন আর ধীরে ধীরে কমাইয়া গবর্ণমেণ্টের উচিত উদ্বৃত্ত অর্থে দেশে শিল্পবাণিজ্য প্রসারের জন্য উৎসাহ দেওয়া। এদেশে কল-কারখানা বাড়িলে বহু বেকারের কর্ম্ম-সংস্থান হইবে, কৃষিনীতি সংস্কৃত হইবার ফলে চাষীদের আর্থিক অবস্থা ভাল হইবে, পণ্য উৎপাদন ও লোকের ক্রয়-ক্ষমতা একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতিজনিত অসুবিধা তখন আর থাকিবে না। ব্রিটেনকে ধারে পণ্য-যোগাইয়া বুভুক্ষু ভারতকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার আর কোন অর্থ নাই, ভারতের সর্ব্বনাশের বিনিময়ে যে ষ্টার্লিং পাওনা জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাও আর ফেলিয়া রাখা অযৌক্তিক। এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটি সঞ্চয় বন্ধ করিয়া ভারত-সরকার যদি যথাসম্ভব পাওনা ষ্টার্লিংগুলি আদায়ের জন্য ব্রিটেনের সহিত বোঝাপড়া করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই ষ্টার্লিং বিনিময়ে তাঁহারা বিদেশ হইতে বহু কোটি টাকার যন্ত্রপাতি, খাদ্যদ্রব্য ও বিবিধ অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য আমদানী করিয়া অল্পকালের মধ্যেই দেশবাসীর হাত হইতে কয়েক শত কোটি টাকা টানিয়া লইতে পারেন। এই ব্যবস্থা সম্ভব হইলে ভারতে যে বাড়তি টাকা থাকিবে, তাহা কাজে-কারবারে লগ্নী থাকিয়া ও দেশবাসীর উপকারে আসিয়া মুনাফা উৎপাদন করিবে। এইভাবে অর্থের প্রচলনগতি যদি বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ, দেশে বাড়তি টাকার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পণ্য-উৎপাদনবৃদ্ধি চলে এবং সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থানের দৌলতে সাধারণ দেশবাসীর ক্রয়ক্ষমতা বাড়িতে থাকে, সেই অবস্থাকে অবশ্যই মুদ্রাস্ফীতির যুগ বলা চলিবে না। ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশে বাজারে কয়েক শত কোটি টাকার নোট চালু হওয়া সমস্যাই নয়, যদি সেই মুদ্রাবৃদ্ধির সহিত সমান হারে দেশে পণ্য উৎপাদন বাড়ে এবং নিরন্ন অসংখ্য দেশবাসীর প্রসারিত শিল্প-বাণিজ্যে কর্ম্মসংস্থান হয়। ভারতে গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আশা করা যায়, জনগণের প্রতিনিধিমূলক সরকার অতঃপর পূর্ব্বতন আমলাতান্ত্রিক বিদেশী সরকার কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করিবেন এবং দেশ-বাসীর মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতি বা ইন্‌ফ্লেশন সমস্যার সমাধান করিবেন।

বিহারের লোক-সঙ্গীত

শ্রীমায়া গুপ্ত

ঝুমুর গান

উচ্চ বর্ণের মধ্যে ঝুমুরের বিশেষ প্রচলন নেই ; ঝুমুর চলে তথা-কথিত নিম্নজাতির মধ্যে। মুচি, ডোম, মেথর ; আদিবাসীর মধ্যে সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা—এদের সকলের মধ্যেই বিভিন্ন ঝুমুরগানের প্রচলন আছে। কাহার জাতির মধ্যে মেয়েরা মাঝে মাঝে ঝুমুর গায়। পাল-পার্বণে ঝুমুর হয়ে থাকে, তবে ঝুমুরের আদর সবচেয়ে বেশী হোলির সময় এবং তারপর করমা, জিতিয়াতে। বিবাহ এবং সন্তান-জন্মোৎসবেও সমাজের দশ জন একত্রিত হয়ে খাওয়া-দাওয়া যখন হয়, তখন ঝুমুর চলে প্রায় সমস্ত রাত্রি। নিম্ন জাতির মধ্যে মেয়েপুরুষ একত্রিত হয়ে ঝুমুর গায়—সঙ্গে বাজে মাদল কখনও-বা এক-আধটা বাঁশীও থাকে। আদিবাসীদের মধ্যে মাদল ও বাঁশীর প্রচলন বেশী এবং বাদ্যযন্ত্র হিসাবে এ দুটির নিষ্ঠতা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র থেকে কম নয়। বিহারে উচ্চবর্ণের গৃহে মাদলের শব্দ কখনও শুনি নি, নিকৃষ্ট বাঁশীর সুরও শুনেছি ; কিন্তু এদের বেলায় সে কথা বলা চলে না।

একত্রিত হয়ে চক্রাকারে দাঁড়িয়ে স্বল্প অঙ্গভঙ্গী সহকারে মেয়েপুরুষে ঝুমুর গায়। প্রধান গায়ক বা গায়িকা গান আরম্ভ করে, তারপর সকলে ধুয়ো ধরে—একটি পদ বারকয়েক গাওয়ার পর অন্য পদ ধরা হয়। ঝুমুরগুলি সাধারণতঃই খুব ছোট ছোট হয়।

বিহার ও বাংলার সীমারেখায় স্থানগুলিতে ঝুমুরের প্রচলন আছে খুব বেশী। বাংলা ঝুমুর-গানও শুনেছি মানভূম পুরুলিয়ার গাওয়া হয়। সত্য বলতে কি ঝুমুরের বাংলা, তথা ঠেট্ হিন্দির সঙ্গে পার্থক্য খুব বেশী নেই। আমার মনে হয় হিন্দী ভাষায় অজ্ঞ লোকও কিছু কিছু বুঝতে পারবেন এ ভাষা। এই সূত্রে মনে পড়ল দু-ছত্রের একটি ঝুমুর-গান—গেয়েছিল একটি তরুণী, জাতিতে মেথর ; মেয়েটি বাঙালী নয়, সম্পূর্ণই বিহারিণী। গানটি শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম, কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম ঐ মানভূম পুরুলিয়ার কোন বন্ধু বা বান্ধবীর কাছে হয়ত গানটি তার শেখা। উচ্চারণে 'স'-এর বাংলা উচ্চারণ না করে প্রকৃত উচ্চারণ করলে যেমন শোনায় ঠিক সেই উচ্চারণে গানটি গাওয়া হয়েছিল। উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"এক পয়সার পুঁটি মাছ দুয়ারে বসে বাছি গো
ভাঁসুর দিগে পিঠ করে ননদ সঙ্গে হাসি গো।"

শুধু শব্দ নয়, বিভক্তি যোগও বাংলা ভাষার অনুযায়ী। অবশ্য ভাসুর মহাশয়ের সামনাসামনি হাসা—বাংলা, তথা বিহার সর্বত্রই নিষিদ্ধ। বিধানও এক—পেছন ফিরে যদি বসা যায় তবে হাসা চলতে পারে।

চক্রাকারে দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে গান চলে। তালে তালে দু-তিন পদ এগিয়ে বা পিছিয়ে যাওয়া হয়। কখনও বা সামনে ঝুঁকে নাচের ভঙ্গীতে হস্ত-সঞ্চালনও হয় যেমন—কোমরে দুটি হাত অথবা একটি হাত নিজের চিবুকে, অপরটি কোমরে, অথবা একটি হাত কোমরে অন্য হাতটি বিভিন্ন ভঙ্গীতে মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে, এই ভাবের অঙ্গভঙ্গী চলে ঝুমুরের সঙ্গে। মেয়েরা সাধারণতঃ এক দিকে এবং পুরুষেরা অপর দিকে দাঁড়ায়। কখনও মেয়েরা পরস্পরের কোমর ধরে নাচে। সবচেয়ে সুন্দর দেখতে তাদের পদক্ষেপ, একেবারে মাপা-জোখা এবং নিখুঁত তালে ওঠে পড়ে পাগুলি। এই মনোহর ভঙ্গীসমূহ ব্যতিক্রম নয়—আদিবাসী এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই নিখুঁত নাচই স্বাভাবিক। তরুণ-তরুণী থেকে আরম্ভ করে মধ্যবয়সী, এমন কি বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও নাচগানে যোগ দেয় এবং তা খুবই স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যদি বয়স্কদের মধ্যে তাল গাইয়ে বা বাজিয়ে থাকে তবে তো তার খাতির ঈর্ষার বস্তু। স্পষ্ট দেখা যায়, সকলে তাকে খোশামোদ করছে রীতিমত এবং তার কাছে ধমক খেয়ে হাসিমুখে ভুল শুধরে নিচ্ছে।

ঝুমুর-গানের শেষ পঙ্‌ক্তিটিকে 'ভণিতা' বলে। একই ভণিতা বহু বিভিন্ন পদের শেষে গাওয়া হয়,—

যে দিন রাজা রসিক মরলৈ।
রাজা হো—আখাড়া তো শুনা হো গেলৈ।
মাটিকে মন্দরবা হো মথরী বিয়া গেলৈ
বাঁশ রীমে ঘুণ লাগ গেলৈ।

(ভণিতা)—নারিয়ানা সিংগা বোনে—এ বুধা গোবিন্দা জানে
রাজাহো বাঁশ রীমে ঘুণ লাগ গেলৈ।

গানটি করুণ রসের। যেদিন রাজা রসিকের মৃত্যু হ'ল—'আখাড়া' (রাজপ্রাসাদ নয়) শূন্য হয়ে গেল। তাঁর মৃত্তিকানির্মিত বাদ্যযন্ত্র মাদলে পোকামাকড়ের বাস হ'ল আর তাঁর বাঁশের বাঁশরীতে ঘুণ ধরে গেল। ভণিতা হচ্ছে : নারায়ণ জানেন (সিংগা বোনে—সম্ভবতঃ সাঁওতালী ভাষা) এবং গোবিন্দও (?) জানেন যে বাঁশীতে ঘুণ ধরে গেল ইত্যাদি।

"হরদি হরদি পুরা পাটন্ গো—
বাসি যৈতৈ কৌসান্বি রাংগাবা।
খোরী মাঝে কুঁয়ার ঘোড়াবা দৌড়ায়লে
গিরু গেলো তোহার ফুলহার।"
"আবহি আছে কুঁইয়া পানিহার,
বিছি দেহো হমর ফুলবা কে হার।"
"মাইয়া তোরা বিছতৌ, বহনিয়া তোর বিছতৌ
বিছি দেতৌ তোর বারি বিহারিয়া।"

জল-কর্দমপিচ্ছিল পথে কুমার ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। তাঁর

ফুলহার পড়ে গেল কণ্ঠ হতে। হৃদে লাল রঙে রাঙানো মন্ত্রাদি খারাপ হয়ে যাবে তাই তিনি যাঁরা কূপে জল তুলতে এসেছে সেই মেয়েদের ডেকে বলছেন—"ওগো পানিহারীরা, আমার হারটা তুলে দাও।"—মেয়েরা রেগে উঠে উত্তর দিচ্ছেন, "তোমার মা বোন তোমার হার খুঁজে দিক—তোমার প্রথম বিবাহের যে বধূ সে খুঁজে দিক—আমাদের কি দায়?"

গানটির 'ফুলহার' অবশ্যই রূপক হিসাবে ব্যবহার হয়েছে, না হলে অকারণে মেয়েরা এত চটেই বা যাবেন কেন, এবং ফুলহারের জন্যে কুমারই বা এত ব্যাকুল হয়ে মেয়েদের অনুরোধ-উপরোধ করতে যাবেন কেন?

বলা বাহুল্য, ঝুমুর-গান সবই প্রায় তরল সুর ও ভাবে রচিত। তা ছাড়া নরনারীর প্রেমই অধিকাংশ গানের বিষয়-বস্তু। লোক-সঙ্গীতের এই গানগুলিই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

হাঁথে গুলতিয়া মুহে বঁসরীয়া,
চিড়িয়া মারায় গেলে পিয়া।
সভে চিড়াইয়া মারিহো হে পিয়া
কৈল চিড়িয়া না মার।
ডাঁসিহে পিঞ্জা পুর বিছাইবো হে পিয়া
শুনা নহি করিহো অধা তর।

হাতে গুলতি মুখে বাঁশী নিয়ে প্রিয় যাচ্ছেন পাখী-শিকারে। বধূ বলছেন—"সব পাখী মের, কিন্তু কোয়েল মের না। কচি কচি পাতা দিয়ে যখন শয্যা রচনা করব তখন আমের ডালে যদি কোয়েলের গান না শোনা যায় তবে বড়ই খেদের বিষয় হবে।"

চন্দনগাছ রুহি সেবলোঁ,
সজনী হে সে হো ভেলো সিয়াকে গাছ।
ফুলবা ফুটলৈ কচনাল।
দুহু দল ভ্রমরে পচাশ
রস লৈলে উড়ল আকাশ।

"কত যত্নে চন্দনগাছ করলাম, হে সখী, দেখলাম সে গাছ সিয়ার। ফুল ফুটলো কচনাল। ফুলের লোভে ভ্রমরেরা এল এবং মধু নিয়ে উড়ে গেল—"

"এহি পারে গঙ্গা, ওহি পার যমুনা
বিচ গাছে ফুটলৈ গেঁদা ফুল গো।
ওনেসে আওয়ে মালিনী বেটিয়া
তোড় দিহো ওহি গেঁদা ফুল গো।"
"কৈসে তোড়বৈ ওহি গেঁদা ফুলবা
সরপাহি ভাঁসত হমে গো।"
"পূরব পশ্চিম সে বৈদ মাগাবৈ
হাঁথ রসে বিষ্ ঝাড়বৈ গো।"

"গঙ্গা-যমুনার মাঝ গাছে গাঁদা ফুল ফুটেছে—মালিনীকে বলা হচ্ছে ঐ ফুল এনে দাও। মালিনী উত্তর দিচ্ছে, ওখানে সাপ আছে, আমায় কাটবে। উত্তর হ'ল, পূর্ব্ব-পশ্চিম হতে বৈদ্য আনাব সাপের বিষ ঝাড়াবার জন্যে।"

"ভেলো তিন সাঝিয়া মুরগা বেলো বাঙ্
ধনী হে জিয়ারাম।
কোরিল বেটি অঙ্গন বাঢ়াবে গো।
অঙ্গন বাঢ়াতে আঁচর খসক গেলৈ
কুমার কানখে আরে গো।
কি তোহি রাজা কানখী চালাববে
হমরে আঁচর বিখ মাতল।
তোহারি আঁচর বিখ্ মাতল হে—
ধনী জিয়ারাম
মন্তরি মন্তরি বিখা মারবৈ গো।"

ভোর হয়েছে—মুরগীর ডাক শোনা গেল। ধনী (বধূ) অঙ্গন ঝাঁট দিতে আরম্ভ করেছে। নীচু হয়ে হয়ে কাজ করতে করতে তার অঞ্চল সরে গেল। কুমার কটাক্ষপাত করছে। তা দেখে ধনী বলছেন—"আমার অঞ্চলে বিষ আছে—কটাক্ষপাত করে আর কি করবে?" উত্তর হ'ল, "ধনি! তোমার অঞ্চলে বিষ মাখানো আছে বটে, কিন্তু আমি মন্ত্র দিয়ে বিষ নষ্ট করব।"

"আমা পাতা লম্বী লম্বী বেলপাতা চাকর
কৈসন বরে দেলে বাবা মোছ দাড়ী পাক।"

কন্যার সখেদ-উক্তি শুনে বর তাকে খোশামোদ করছে—

"যে তো টাকা লাগে গুনগারী
গো ভালো নারী।
এবে না ছোড়িব জিদোয়ারী।
দুয়ারে বান্ধিব হাতী আনিব শতলারী।"

"ওগো ভাল মেয়ে, যত টাকাই লাগুক আর তোমায় ছাড়ছি না। দুয়ারে হাতী বাঁধবো, তোমার জন্যে শতনরী হার আনব যাতে তুমি তুষ্ট হও।"

দুয়ারে হাতী বাঁধা হলে এবং শতনরী হার পেলে বুড় বরের খেদ নিশ্চয় আর থাকবে না।

"ঘুমতে কিরাত রহে বিচে ডাহরী
চুন চুন বাঁন্ধত রহে টেঢ় পাগড়ী।
পানিয়াকে যাত্ রহি শিরে গাগরী
বিচ্ টিনা ভেলো ভেট্
কৈসন মসখরী।
য়োয়ে কে কাঁচে উমর,
হমরো কাবরী।
য়োয়ে হমরে লাল
কৈসন মস্খরী।"

"মাথরাস্তায় ঘোরা-ফেরা করছে—সৌখিন করে মাথায় পাগড়ী বাঁধছে। আমি যাচ্ছি মাথায় কলসী নিয়ে জল আনতে

এমন সময় দেখা হ'ল পথে। এ কেমন আচরণ! তোমার হ'ল অল্প বয়স, আমার বয়স বেশী, তোমার সঙ্গে আমার আবার হাসি-ঠাট্টার সম্বন্ধ কি?"

কাঁহা শোভে বাজুবন্ধ কাঁহা কঙ্গনবা
　　কাঁহা শোহে নীল সাড়ী
　　হো গৌরী কে বদনবা।
বাঁহে শোহে বাজু হাঁথে কঙ্গনবা
　　অঙ্গে শোহে নীল সাড়ী।
　　গোরীকে হো বদন
ক্ষণে ক্ষণে মন পরে হো সজন।

বাজুবন্ধের এত শোভা কোথায়—কঙ্কণেরই বা এত শোভা কোথায়, আর নীল শাড়ী—সে আমার প্রিয়ার। তার উপর গৌর মুখখানি। বাহুতে বাজু, হাতে কঙ্কণ, অঙ্গে নীল শাড়ী আর গৌর মুখখানি, ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে সেই মুখ।

সেহ বদন ন দেখি দুনিয়া আন্ধারি
গৌরী কে বদন যৈসে ফুল চম্পাকলি।
কানে কুণ্ডল শোহে নাকে বেশরী
তোহারি সুরত হম্ বিসরে ন পারি।
ধরতী পর ঠার ভেদু ধরতী কাঁপলি
　　　যৈসে দুনিয়া আঁধারি।

"সেই গৌর মুখখানি না দেখে দুনিয়া অন্ধকার, গৌরীর মুখখানি যেন চাঁপার কলি। কানে কুণ্ডল, নাকে বেশর। হায়, তোমার মুখখানি আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হয়, জগৎ অন্ধকার আর পায়ের তলায় ভূমি কাঁপছে।"

অন্য দিকে বিরহিণী গাইছেন—

"পরল বিপতি দূতী
ক্ষণ ক্ষণ মন পরে শাঁবল মূরতী।
　　বড় দুখ পরল প্রাণ
　　হরি গেল মধু বন।
নিতি পাবন পিয়ি বৈঁধু জহর পিবি
কেদলী সরিখে মোর যৈসে কাঁপে প্রাণ।"

"বড়ই বিপত্তি হ'ল—ক্ষণে ক্ষণে সেই শ্যামল মূরতি মনে পড়ে। হরি মধুবনে গেছেন—প্রাণে বড়ই দুঃখ। আমি বিষ খাব, এ বিরহ সহ্য হয় না—আমার প্রাণ অহরহ কদলী-বৃক্ষের মত কাঁপছে।"

তারপর—　　"সবদিন হে হরি,
　　　　তুমহুঁ আপন করি,
　　আজ মোরে তো গুনলি বিরান।
　　মোরে বিনা তো ন বসে পরান।
　　　　দয়া করো সাঁঝ বিহান।"

চিরদিন আপন বলে মেনেছ আজ পর করে দিলে। তোমায় ছেড়ে তো প্রাণ বাঁচে না, সুতরাং সকাল সন্ধ্যায় কৃপা কর।

ভাদ্র মাসের 'করমা' পর্ব্বে ঝুমুর গাওয়া হয়—সেগুলি একটু গভীর ভাবের গান। তার থেকে দুটি গান এখানে দেওয়া হচ্ছে।

"ধাঁহতব জয়ো রাধা দিন রাতি
　　অহে সুন্দর সাথী।
ধন মাধে ধান,
সম্পতি মাধে গাই,
　　বেটা বহিতো সভ ধন ছাই।"

বন্ধ্যা রমণী গাইছেন—"দিবারাত্র আমার অন্তর জ্বলে পুড়ে গেল। ধনের সেরা হ'ল ধান আর সম্পত্তির সেরা হ'ল গাভী। কিন্তু পুত্রসন্তান যদি না থাকে তবে সব ধন-সম্পত্তিই বৃথা।"

"যেদিন কৃষ্ণ তোহার জনম ভেলো
　　ভরলে ভাদোয়া কে রাত
আগিয়া খোজাতে কাঠিয়া ন মিলেই
　　বড়ি দুখে কাটবৈ হো রাত।
জিরাওয়া জোয়াইন কে বরসি ভরবো হে—
　　মহরি মহরি উঠে বাস—
দুখে ন কাটাইবে হে রাত।"

"শিশু কৃষ্ণ জন্মালেন ভরা ভাদ্রের রাতে, আগুন নেই, বড় কষ্টেই রাত্রি কাটাতে হবে।—অন্যে বলছেন, জিরা জোয়ান দিয়ে আগুন তৈরি করবো, সুগন্ধে ঘর ভরে যাবে—রাত্রি তোমায় দুঃখে কাটাতে হবে না।"

নব আবির্ভাব

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বহু, বহু দিন পরে—। যার লাগি এত অন্বেষণ,
সুদুর্গম পথে যাত্রা, যার তরে দুঃসাধ্য সাধনা,
সুদুষ্কর এই ব্রত, যার লাগি এত আরাধনা,
যার তরে এ তপস্যা, যুগে যুগে এত আয়োজন,
সে কি এল কাছে? এল, এল না কি সেই শুভক্ষণ?
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আগমনী তার গেছে শোনা?
হবে কি সার্থক আজ সব দুঃখ, সকল লাঞ্ছনা?
বাঞ্ছিতের পাব দেখা? চরিতার্থ হবে কি জীবন?

হে ব্রতী কোরো না ভয়, পূর্ণ ব্রত হবে এত দিনে,
শোন অভয়ের বাণী, দূর হোক্ সংশয়ের ব্যথা,
দীর্ঘ বিস্মরণ পরে চিরপ্রিয়ে লহ আজ চিনে
—চির পরিচিতে। দেখ, নববেশে এল সে দেবতা।
জাগিল মূর্চ্ছিত প্রাণ, বাজে বার্ত্তা হৃদয়ের বীণে—
এল সে, এল সে আজ, যুগান্তরে এল স্বাধীনতা।

যুদ্ধোত্তর যুক্তরাষ্ট্রে বিমান-ঘাঁটি সম্প্রসারণ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস কর্তৃক সম্প্রতি আমেরিকার সর্বত্র বিমান-ঘাঁটি নির্মাণের জন্য ৫০০০ লক্ষ ডলার ব্যয় মঞ্জুর করিয়া এক আইন পাস হইয়াছে। তদনুসারে আগামী সাত বৎসর ধরিয়া বিমান-ঘাঁটি নির্মাণ-প্রচেষ্টা চলিতে থাকিবে, স্থির হইয়াছে তিন হাজারেরও অধিক বিমান-ঘাঁটি নির্মিত হইবে। উক্ত বিধি অনুসারে একদিকে যেমন নূতন ঘাঁটি নির্মাণ করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি পুরনো ঘাঁটিগুলিরও উন্নতি বিধান করিতে হইবে। এই উভয়বিধ কার্য্যের জন্য ষ্টেট এবং মিউনিসিপ্যালিটি-সমূহকে ১,০০০০ লক্ষ ডলার খরচ করিতে হইবে। ষ্টেটসমূহ বিভিন্ন অঞ্চলের আয়তন এবং লোক-সংখ্যার অনুপাতে এই অর্থের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বিতরণ করিবেন। এই সঙ্গে আলাস্কা, হাওয়াই এবং পোর্টো রিকোর বিমান-পথের জন্যও আরো ২০০ লক্ষ ডলার ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অন্ততঃ ষাট লক্ষ লোক বৈমানিক ব্যাপারে আগ্রহান্বিত। সমগ্র জনসংখ্যার অন্ততঃ শতকরা সাতাশ ভাগ বিমানযোগে উড়িতে ইচ্ছুক। সরকারী বিমান বিভাগের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ২৫০,০০০ আর ব্যক্তিগত-ভাবে ৩২,৯০০ জন লোকের বিমান আছে।

বিগত বিশ বৎসর যাবৎ বৈমানিক বাণিজ্যের কার্য্য-কারিতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশে মাত্র ৫০০টি ছোট ছোট বিমান-ঘাঁটি ছিল, আর ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি দেশের সর্বত্র চার হাজার বিরাট বিমানবন্দর স্থাপিত হইল। এই পনের বৎসরের মধ্যেই ২,৫০০,০০০ মাইল ব্যাপী বিমান-পথ ২৫,৫০০,০০০ মাইল পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইল, আর যাত্রীসংখ্যা ২০ হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৫,১৩৮,০০০তে দাঁড়াইল।

বিমান বিভাগের ভাবী বিপুল সম্ভাবনা ও উন্নতির কথা পূর্ব্বাহ্নেই আঁচ করিতে পারিয়া অধিকাংশ ষ্টেটই নিজস্ব 'বৈমানিক-সংসদ' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের ইণ্ডিয়ানা এবং কান্সাস প্রভৃতি কয়েকটি ষ্টেট এখনো এ বিষয়ে পিছনে পড়িয়া আছে। পক্ষান্তরে, সমরবিভাগ ভূতপূর্ব্ব বিমানবাহিনীর কতকগুলি ঘাঁটিকে উদ্বৃত্ত বলিয়া ঘোষণা করায় ক্যালিফোর্ণিয়া এবং ফ্লোরিডা ষ্টেটের গবর্ণমেণ্ট তাহা হস্তগত করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলস্থ লুশিয়ানার বিমান-ঘাঁটি সম্পর্কিত প্রোগ্রামই সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিমূলক। উক্ত প্রোগ্রামে একটি দশ-বার্ষিক পরিকল্পনা করিয়া ৭০টি নূতন ঘাঁটি নির্মাণের সঙ্কল্প করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কুড়িটির নির্মাণ-কার্য্যের সূচনা ইতি-মধ্যেই হইয়া গিয়াছে। আগামী মাত্র-বর্ষের মধ্যেই এই সমস্ত প্রচেষ্টায় কুড়ি লক্ষ ডলার ব্যয়িত হইবে। মিশিগান, টেক্সাস ষ্টেট, ওহিও এবং উটাতেও এ বিষয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে একমাত্র টেক্সাস ষ্টেটেই ৫৩২টি বিমান-বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উক্ত ষ্টেটে বর্ত্তমানে ৩১৯টি বিমান-ঘাঁটি আছে, তন্মধ্যে ১৯৬টির সংস্কার করা আবশ্যক। ক্যালি-ফোর্ণিয়ার বিমানের সংখ্যা হইবে ৪২৫; এই বৈমানিক প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রে পেনসিল্‌ভানিয়া দখল করিবে তৃতীয় স্থান—তাহার বিমানের সংখ্যা হইবে ২৭১; আর এই প্রতিযোগী ষ্টেটসমূহের মধ্যে ফ্লোরিডার স্থান সর্ব্বনিম্নে, তাহার বিমানের সংখ্যা ২৪৯। অন্যান্য যে সমস্ত ষ্টেট এই প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহাদের বিমানের সংখ্যা ২০০ কিম্বা তাহারও কম।

বিমান-ঘাঁটিগুলিতে ঘাসের চাপড়া এবং গুল্মবৃক্ষাদি লাগানোর প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী মার্কিন এঞ্জিনিয়ারগণ সম্প্রতি সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রস্তাবিত 'মার্কিন তৃণ গবেষণাগার' অচিরেই এ বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহে এবং পরীক্ষণে প্রবৃত্ত হইবেন। বিমান-ঘাঁটির প্রাঙ্গণ শান দিয়া বাঁধানো অপেক্ষা তৃণাচ্ছাদিত করিতে অনেক কম খরচ পড়ে। যে স্থলে কংক্রিটের বিমান-প্রাঙ্গণে একর-প্রতি ৯,০০০ হইতে ২০,০০০ ডলার পর্য্যন্ত খরচ পড়ে সেই স্থলে তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে একর-প্রতি খরচ পড়ে ৫০ হইতে ৭৫০ ডলার মাত্র।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর মোটর-গাড়ী ইত্যাদি যন্ত্র গতিশীল শকট-শিল্পের যে অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর, আগামী সাত হইতে দশ বৎসরের মধ্যে আমে-রিকার বৈমানিক উন্নতি হইবে তদপেক্ষা বহুগুণে বেশী। আশা করা যায় যে, ব্যক্তিগতভাবে বিমান ক্রয় করিবার স্পৃহা লোকেদের উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে, কয়েক বৎসরের মধ্যে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ছোট ছোট বহু বৈমানিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং দেশের সর্ব্বত্র বিমানযোগে ডাক চলাচলের ব্যাপক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে। অদূর ভবিষ্যতে বিমানের এই বাহুল্য দেখিয়া আমেরিকাকে "উড্ডীয়মান দেশ" আখ্যা দিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।
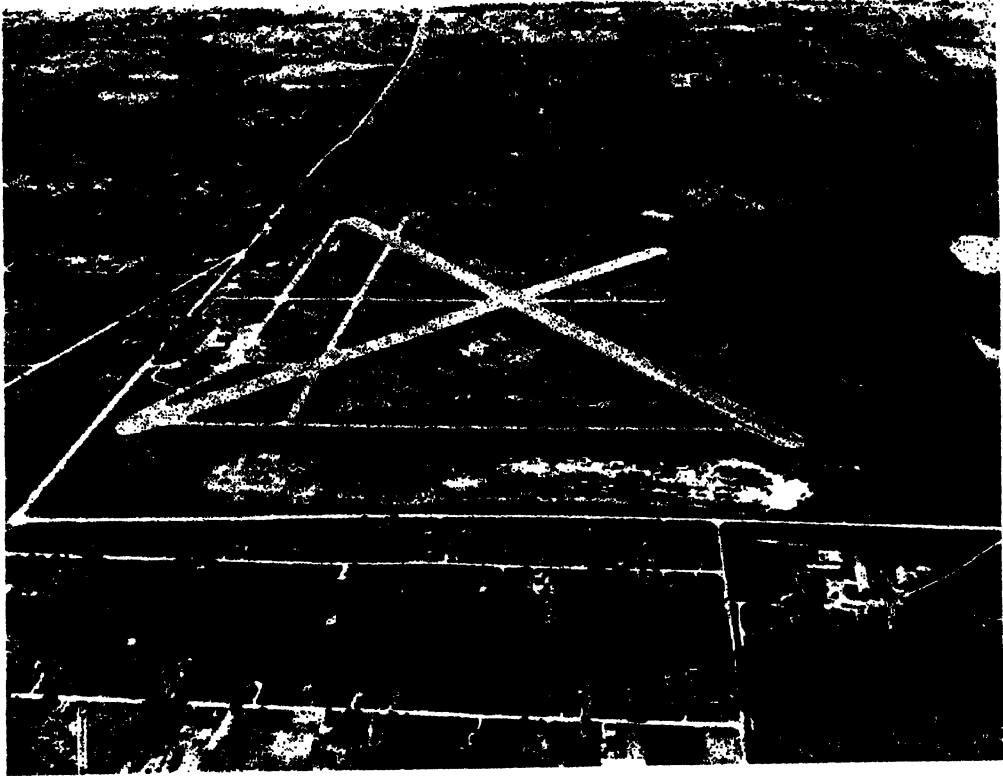
মিশিগান ষ্টেটের মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে কন্‌ক্রিটের প্রাঙ্গণযুক্ত একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর বিমান ঘাঁটি

পেনসিলভানিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলে একটি প্রথম শ্রেণীর বিমান-ঘাঁটি

ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম গণ-পরিষদের প্রাথমিক অধিবেশন—মাইকের সম্মুখে রাষ্ট্রপতি কৃপালনী

বর্ত্তমান রেশনের ক্যালোরি ও পুষ্টিকারিতা

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম. এস্‌সি.

খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একখানি বিলিতী পত্রিকা খুলতেই দেখি প্রথম ও প্রধান প্রবন্ধের নাম "শূকর জাতির ভিটামিনের চাহিদা।" এই বিরাট্‌ প্রবন্ধের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে শূকরের খাদ্য সম্বন্ধে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের মৌলিক গবেষণার তালিকা। শুনে আশ্চর্য্য হতে হয় যে, এই তালিকাতে রয়েছে ৭০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধের উল্লেখ, যেগুলি থেকে লেখক তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন। যাঁরা ইতর-প্রাণীর খাদ্যের কল্যাণসাধনে এতদূর যত্নবান তাঁরা তাঁদের দেশের মনুষ্য-সম্প্রদায়ের শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান-কল্পে কত দূর আগ্রহান্বিত তাহা সহজেই অনুমেয়। আর আমাদের হতভাগ্যদেশের লোকেরা আজ ভিটামিন দূরের কথা দুবেলা দুমুঠো ভাতেরও কাঙাল হয়ে পড়েছে। এই চরম দুর্দশার জন্য কে বা কারা দায়ী তার গবেষণার জন্য খুব মাথা ঘামানোর দরকার নাই, তবে তার প্রতিকারের পন্থা যে জটিল তা আজ অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন।

আমাদের বর্ত্তমান রেশনের খাদ্য শরীর রক্ষার পক্ষে যে সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী তা বুঝবার জন্য খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অনাবশ্যক। কুলিমজুর, নৌকার মাঝিমাল্লা, ঠেলাগাড়ী- ও রিক্‌শ-চালক, ছুতোর, কামার, চাষী এবং অন্যান্য দিনমজুর, যাদের গতরে খেটে রোজগার করতে হয় তাদের প্রত্যেক বেলায়ই যে আধ সের তিন পোয়া চালের ভাত বা আটার রুটি দরকার তা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে এ কথাও সত্য যে, যাঁরা ঘরে বসে কাজ করেন সেই দোকানী, কেরাণী বা শিক্ষক প্রভৃতির প্রতি বেলা তিন ছটাক বা একপোয়া চালের ভাতই যথেষ্ট। ফলতঃ পরিশ্রমের অনুপাতে যে আহার্য্য বেশী লাগে তা সকলেরই জানা আছে। সুতরাং বর্ত্তমান রেশন-ব্যবস্থায় যখন দেখি কঠোর কায়িক পরিশ্রম করে যাঁদের জীবিকা অর্জ্জন করতে হয় তাঁরাও আটা চাউলে একুনে দৈনিক আধসেরেরও কম পাচ্ছেন তখন এর পরিণাম যে কতদূর মারাত্মক হতে পারে ভেবে আতঙ্কিত হই। এতে তাঁদের শরীর ক্রমশঃ ভেঙে পড়ে। ভাঙা শরীরে ব্যাধির আক্রমণ বেশী হয়, ফলে লোকের কর্ম্মশক্তি হ্রাস পায়। কর্ম্মশক্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিকও সেই অনুপাতে কমতে থাকে; পরিণামে লোকেরা দারিদ্র্যের নিম্নতম স্তরে ক্রমশঃ নেমে আসে এবং জাতির ধ্বংস ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হতে থাকে।

সম্প্রতি ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে মেজর জেনারল সার জন মেগ (Megaw) লিখেছেন—ভারতের এই অন্নাভাবের মূল কারণ হচ্ছে ভারতীয়দের অত্যধিক সন্তান-প্রজনন। পঞ্চাশের প্রলয়ঙ্কর মন্বন্তরের মধ্যেও নাকি বাংলাদেশে জন্মের হার কমে নাই। তিনি আরও বলেছেন যে, লোকসমাজের সচ্ছল অবস্থা হলে জন্মের হার স্বভাবতঃ কমে আসে; কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সুশাসন এবং তজ্জনিত সচ্ছলতা সত্ত্বেও সেখানে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা শতকরা ৫০ হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষে সচ্ছল বা অসচ্ছল কোনও অবস্থায়ই জন্মের হার কমছে না বলে তিনি দুঃখের সহিত মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে ভারতে শস্য উৎপাদন বাড়িয়ে কোনও স্থায়ী লাভ হবে না যতদিন না এদেশের লোকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে অবহিত হন। যদি তাঁর কথা সত্য বলেই ধরে নেওয়া যায় তবু একথা স্বীকার্য্য যে আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর আধিক্যের দরুন লোকসংখ্যার প্রকৃত বৃদ্ধির হার পাশ্চাত্যের অনেক দেশের চেয়েই ঢের কম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, খাদ্যাভাব সমস্যার প্রকৃত সমাধান কি?

আমাদের ত মনে হয়, প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারপূর্ব্বক জনগণের দায়িত্বজ্ঞান ও কর্ম্মস্পৃহা উদ্দীপিত করলে, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ করে চাষীদের কর্ম্মশক্তি বাড়িয়ে তুললে, কৃত্রিম সার প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করে সুলভে ব্যবহারের ব্যবস্থা হলে এবং অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি জনিত শস্যহানি রোধ করলে দেশে জনসংখ্যা স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠলেও খাদ্যাভাবের আদৌ আশঙ্কা থাকবে না।

আপাততঃ আমাদের বর্ত্তমান রেশনের খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করা যাক। খাদ্যের পুষ্টিকারিতা বা খাদ্য মান সম্বন্ধে বুঝতে হলে খাদ্যের উপাদান এবং বিভিন্ন খাদ্য কি ভাবে আমাদের শরীরে ক্রিয়া করে সে সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ফলে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও গুণাগুণ এবং আমাদের শরীর গঠন ও পোষণে তাদের ক্রিয়াও স্থিরীকৃত হয়েছে। খাদ্যোপাদানগুলি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—কার্ব্বোহাইড্রেট অর্থাৎ শর্করা ও শ্বেতসার, স্নেহপদার্থ, প্রোটিন বা আমিষ পদার্থ, ভিটামিন, লবণ-পদার্থ ও জল। এর মধ্যে শরীরের তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে প্রথমোক্ত তিনটি উপাদান—যদিও প্রোটিনের অন্যতম ক্রিয়া হচ্ছে লবণ-পদার্থের মতই গঠনমূলক। আমরা সচরাচর যে সব খাদ্য গ্রহণ করি তার অধিকাংশের মধ্যেই খাদ্যের একাধিক উপাদান বিদ্যমান থাকে। ডালের মধ্যে আমরা অবশ্য সচরাচর কেবল মাত্র মসুর ডালকেই আমিষ বলে ধরে থাকি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে নির্ণীত হয়েছে যে, সকল জাতীয় ডালেই শতকরা

প্রায় ২৫ অংশ থাকে আমিষ পদার্থ। এমন কি চাল, আটা; গোলআলুর মধ্যেও যথাক্রমে শতকরা সাড়ে দশ, সাড়ে তের ও দুই ভাগ আমিষ পদার্থ থাকে। চাল, আটা ও ডালের অবশিষ্ট প্রায় সবটুকুই হচ্ছে কার্ব্বোহাইড্রেট। গোলআলুর ত আশী ভাগই জল, অবশিষ্ট দুই ভাগ আমিষ পদার্থ বাদে প্রায় সবটাই শ্বেতসার (কার্ব্বোহাইড্রেট)। নির্জ্জলা চিনি বা গ্লুকোজ বিশুদ্ধ কার্ব্বোহাইড্রেট এবং বিশুদ্ধ ঘি বা চর্ব্বিতে ষোল আনা স্নেহপদার্থ বিদ্যমান। অবশ্য ভাল ঘিতে স্নেহপদার্থ ছাড়া ভিটামিন এ এবং ডি থাকে, তবে তার পরিমাণ এত কম যে সমুদ্রে জলবিন্দুর সঙ্গে তুলনীয়। স্বভাবজাত কোনও খাদ্যেই মানুষের শরীর রক্ষার উপযোগী সমুদয় খাদ্যোপাদান থাকে না। এ বিষয়ে দুধই একমাত্র ব্যতিক্রম। দুধে কার্ব্বোহাইড্রেট (ল্যাকটোজ বা দুগ্ধশর্করা), প্রোটিন (ছানা ও ল্যাক্ট্ অ্যালবুমিন), স্নেহপদার্থ (মাখন), লবণ-পদার্থ, কয়েকটি ভিটামিন ও জল— সবই বিদ্যমান। তবে পরিণতবয়স্কের পক্ষে ঐ খাদ্যোপাদানগুলি যে অনুপাতে আবশ্যক দুধে সেই পরিমাণে না থাকায় এবং অনেক প্রকার ভিটামিন ও লবণ-পদার্থের অভাব নিবন্ধন শুধু দুগ্ধ পান করে বয়স্ক মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে না। খাদ্যের উপাদান সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম, এখন তাপ ও শক্তি সঞ্চয়কারী উপাদানগুলির কার্য্যকারিতা ও শরীর রক্ষায় তাদের উপযোগিতার বিষয় জানতে চেষ্টা করব।

তাপ ও শক্তির একটিকে যে অপরটিতে রূপান্তরিত করা যায় সে কথা অনেকেরই জানা আছে। হাতে হাতে ঘর্ষণ করলে শক্তি তাপরূপে প্রকাশ পায়—তাপের প্রভাবে শক্তি উৎপাদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কয়লার তাপে জলকে বাষ্প করে তদ্দ্বারা রেলগাড়ী চালানো। তাপের পরিমাণ যে 'মানে' মাপা হয় তাকে বলে ক্যালোরি। এক তোলা বিশুদ্ধ নির্জ্জলা চিনি বা ময়দা পোড়ালে মোটামুটি হিসাবে ৪৫ ক্যালোরি তাপ পাওয়া যায়। ১ তোলা বিশুদ্ধ নির্জ্জলা মাছ বা মাংস পোড়ালেও ঐ পরিমাণ তাপ জন্মে। পক্ষান্তরে ১ তোলা বিশুদ্ধ ঘি বা চর্ব্বি দগ্ধ করলে তা থেকে প্রায় ১০০ ক্যালোরি-তাপ পাওয়া যায়। চিনি পুড়ে গেল বলতে রাসায়নিক ভাবে এ কথাই বুঝতে হবে যে, চিনির অণুতে যে কার্ব্বন থাকে তা বাতাসের অক্সিজেন গ্যাসের সঙ্গে রাসায়নিক সংমিশ্রণে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডে এবং চিনির হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি অনুরূপ মিশ্রণের ফলে জলে পরিণত হয় এবং এই রাসায়নিক সংমিশ্রণ যখন ঘটে তখন অনেকটা তাপ নির্গত হয়ে থাকে। ঘি চিনি প্রভৃতি খাদ্যবস্তু আমরা যখন গ্রহণ করি তখন সেগুলি পরিপাক-যন্ত্রের বিভিন্ন রসের ক্রিয়াতে নূতন ক্ষুদ্রাবয়ব পদার্থে পরিণত হয় এবং এইগুলি রক্তস্রোতে প্রবেশ করলে রক্তের লোহিত কণিকা বাহিত অক্সিজেনের সংস্পর্শে তাদের কার্ব্বন ও হাইড্রোজেন রাসায়নিক সম্মিলনে যথাক্রমে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপ নির্গত হয়। এ যেন বিনা আগুনে দহনক্রিয়া। বলা বাহুল্য, উভয় ক্ষেত্রেই (বাহিরে পোড়ালে বা শরীরের মধ্যে রূপান্তরিত হলে) সম-পরিমাণ পদার্থ থেকে ঠিক সমান পরিমাণ তাপই পাওয়া যায়।

এইমাত্র উল্লেখ করা হ'ল যে, খাদ্যোপাদানগুলি পরিপাকান্তে ক্ষুদ্রাবয়ব পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। কার্ব্বোহাইড্রেট থেকে যে রূপান্তরিত নূতন পদার্থ জন্মে তার নাম গ্লুকোজ। আমিষ পদার্থ থেকে পাওয়া যায় বিভিন্ন অ্যামিনো এসিড এবং স্নেহপদার্থের শেষ পরিণতি হচ্ছে গ্লিসারিন ও কয়েক প্রকার জৈব অ্যাসিডে। গ্লুকোজ, গ্লিসারিন এবং জৈব অ্যাসিড পূর্ব্বোক্তভাবে দগ্ধ হয়ে শরীরের তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে কিন্তু প্রোটিনজাত অ্যামিনো-অ্যাসিডগুলি প্রধানতঃ নূতন মাংসপেশী গঠন ও ক্ষয়প্রাপ্ত পুরনো পেশীগুলোর ক্ষতিপূরণ করে এবং তদতিরিক্ত অংশ গ্লুকোজের মতই দগ্ধ হয়ে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। এই কারণে মাছ-মাংস বেশী পরিমাণে খেয়ে হজম করতে পারলে তাতে অনেকটা ভাতরুটি খাওয়ার ফল পাওয়া যেতে পারে। পক্ষান্তরে শরীরের চাহিদামত অ্যামিনো-অ্যাসিড যদি খাদ্য থেকে না-পাওয়া যায় তবে শরীরের মাংসপেশী ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে অপরিহার্য্য প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। এই শোচনীয় অবস্থা শরীরে ভাঙন ধরারই নামান্তর। মাছ দুধ ক্রমশঃ যে ভাবে আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে তাতে স্বাস্থ্যের শোচনীয় পরিণতি যে অনিবার্য্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন শরীরের মধ্যেও যখন দহন-ক্রিয়াই চলছে তখন ভাতের বদলে কয়লা বা পেট্রোলে ঐ কাজ চলতে পারে কি না। একথার উত্তর এই, শরীরের যন্ত্রাদির গঠন এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, কয়েকটি বিশেষ পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু ধমনীর রক্তস্রোতে প্রবেশ করতে বা দগ্ধ হতে পারে না। কয়লা যত গুঁড়ো করেই খাওয়া যাক তা হজম হবে না, কাজেই রক্তস্রোতে পৌঁছুতে পারবে না—পেট্রোলের বেলাতেও ঐরূপ। তারপর কত যে জাত এবং অজ্ঞাত পদার্থের সহযোগিতায় এই দহন-কার্য্য চলে, তার প্রকৃত রহস্য এখনও পুরোপুরি উদ্‌ঘাটিত হয় নি। পক্ষান্তরে সম পরিমাণ খাদ্য কয়েকজন সমবয়সী ব্যক্তিকে খাওয়ালেই যে তাতে সমান পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হবে একথাও বলা যায় না। যার পরিপাকশক্তি যত অধিক তার রক্তস্রোতে ঐ খাদ্যের জীর্ণ অংশ তত বেশী পরিমাণে যাবে, কাজেই সে ঐ খাদ্য থেকে বেশী শক্তি আহরণ করতে পারবে এবং অধিকতর শক্তিমান্ ও কর্ম্মক্ষম হবে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেছেন, বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী এবং পুরুষের নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কত ক্যালোরি-শক্তি খরচ হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের পরিশ্রমের দরুনই বা ক্যালোরি-শক্তির ব্যয় কি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রশ্ন হতে পারে নিষ্ক্রিয়

অবস্থায় আবার শক্তি খরচ হবে কেন ? এর উত্তরে বলা যায়, মানুষ যখন চুপচাপ বসে থাকে তখনও তাহার ফুসফুস প্রভি-নিয়ত বাতাস গ্রহণ ও বর্জ্জন করছে, হৃৎপিণ্ড রক্ত পাম্প করে সারা শরীরে সঞ্চালিত করছে, পরিপাকশক্তি সক্রিয় রয়েছে, মস্তিষ্ক চিন্তা করছে—এইরূপ বিভিন্ন শারীরযন্ত্রের ক্রিয়া-পরি-চালনায় ও শরীরের তাপরক্ষায় শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে। পূর্ব্বেই বলেছি খাদ্যোপাদানগুলি শরীরে দগ্ধ হয়ে এই তাপ জন্মে এবং কোন্ প্রকার খাদ্যে কত ক্যালোরি তাপ দিতে পারে তাও নির্ণীত হয়েছে, সুতরাং যখন বুঝতে পারি রাম বা শ্যামের দৈনিক দু'হাজার ক্যালোরি দরকার তখন তাদের কতটা চাল, ডাল, তেল ইত্যাদির প্রয়োজন তা অঙ্ক কষে বার করা যায়। নিম্নে বয়সভেদে ক্যালোরির চাহিদার হিসাব দেওয়া হচ্ছে :—

১৩ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক পুরুষের যদি ১০০ ক্যালোরি ধরা যায়
তবে " " " স্ত্রীলোকের লাগে ৮৩ ক্যালোরী
" " নিম্নতম বালিকবালিকার " ৭০ "
৬ " " শিশুদের " ৫০ "

অবশ্য শারীরিক পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে পরিণত-বয়স্কের উপরোক্ত ১০০ ক্যালোরির স্থলে ১২৫ বা ১৫০, খুব কঠিন পরিশ্রমকারীর পক্ষে ২০০ বা ততোধিক ক্যালোরি পর্য্যন্ত দরকার হয়ে থাকে। একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, বেশী শারীরিক পরিশ্রমে আমিষ পদার্থের পরিমাণ না বাড়িয়ে কেবলমাত্র স্নেহপদার্থ ও কার্ব্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বাড়িয়ে ক্যালোরির পরিমাণ পুষিয়ে নিলেই চলে। তারপর যাঁর শরীরের ওজন যত বেশী তাঁর তত বেশী ক্যালোরি এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালের চেয়ে বেশী ক্যালোরি আবশ্যক হয়। আমাদের মধ্যে অল্প শারীরিক পরিশ্রম যাঁরা করেন যেমন, কেরাণী, দোকানী, শিক্ষক প্রভৃতির দৈনিক দু-হাজার সওয়া দু-হাজার ক্যালোরি দরকার। ল্যাবরেটরী প্রভৃতিতে যাঁরা হাতে-কলমে কাজ করেন এবং যে-সকল কুলি মাঝারি রকমের পরিশ্রম করে তাদের প্রায় তিন হাজার ক্যালোরি এবং যারা কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের প্রায় চার হাজার ক্যালোরী আবশ্যক।

এখন বর্ত্তমান রেশন-ব্যবস্থামত সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক এক-একজন ভদ্রলোকের জন্য যে পরিমাণ আটা, চিনি ও সরিষার তৈল বরাদ্দ আছে তাতে দৈনিক কত ক্যালোরি হয় হিসাব করে দেখা যাক্।

চাউল দৈনিক ১৫ তোলা অর্থাৎ ৫৮৬ ক্যালোরি
আটা " ১০ " " ৩৭১ ক্যালোরি
চিনি " ২·১৪ " " ৮৭ "
সঃ তৈল " ১·৪২ " " ১৮৫ "

একুনে ১২১৯ ক্যালোরি

(অবশ্য রেশনের সরিষার তৈল যদি গায়ে না মেখে রান্নায় সবটাই ব্যবহার করা হয়।)

বলা বাহুল্য, চাউল আটা বাবদ যে পরিমাণ ক্যালোরি ধরা হ'ল কার্য্যক্ষেত্রে ঠিক ততটা পাওয়া যাবে না, কারণ রেশনের আটা চাউলে ধুলো-বালি কাঁকর-ভুষি প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। সেগুলো বাদ দিলে ওজন অনেকটা কম হবে। দৈনিক এক ছটাক ডাল, এক ছটাক মাছ এবং গোল আলু, রাঙা আলু, কচু, কাঁচাকলা, পেঁপে, মূলো ইত্যাদি সংযোগে যদি অন্ততঃ আরও এক পোয়া খাওয়া যায় তা হলে অতিরিক্ত ৪২৫ ক্যালোরি পাওয়া যাবে। তাহলে একুনে গিয়ে দাঁড়ায় ১৬৪৪ ক্যালোরি, সুতরাং দু-হাজার ক্যালোরিতে পৌঁছুতে আরও প্রায় সাড়ে তিন শত ক্যালোরি আবশ্যক। যদি প্রত্যহ সকালে-বিকালে অন্ততঃ আধ পোয়া চিঁড়া বা মুড়ি অথবা খোসা ছাড়ানো এক ছটাক চিনাবাদাম দিয়ে জলযোগ করা যায় তবে টায়-টোয় দু-হাজার ক্যালোরিতে উঠতে পারে। অবশ্য উপরোক্ত খাদ্য-তালিকায় সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টিকারক অনেক ভিটামিন এবং লবণ-পদার্থের অভাব বিদ্যমান। সেই ঘাটতি কথঞ্চিৎ পূরণ করতে হলে রোজই কিছু টাটকা শাক-সব্জী ও একটি পাতিনেবু খেতে হবে এবং অবস্থায় কুলোলে মাঝে মাঝে দুধ, ডিম এবং অন্ততঃ চুনো মাছের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

যাঁরা কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করেন, যাঁদের দৈনিক তিন হাজার থেকে চার হাজার ক্যালোরি দরকার তাঁরা বর্ত্তমান রেশনে কত ক্যালোরি পাচ্ছেন দেখা যাক।

দৈনিক বরাদ্দ চাউল আটা চিনি তেল সব কিছুতে মিলিয়ে এঁদের ১৬৩০ ক্যালোরি হয়, অবশ্য চাউল প্রভৃতির ভেজালের দরুন কিছু বাদ যাবে। এঁরা যদি দৈনিক ডাল দু-ছটাক, আধ পোয়া রাঙা আলু, কচু, মূলো ইত্যাদি তরিতরকারি রন্ধন করে খান এবং প্রত্যহ আধ ছটাক মাছ খান তবে আরও ৫১০ ক্যালোরি পেয়ে একুনে দৈনিক ২১৪০ ক্যালোরির যোগান দিতে পারেন। সুতরাং যাঁরা কঠিন শারীরিক শ্রম করেন বর্ত্তমান রেশন ব্যবস্থানুযায়ী যা খাদ্য তাঁরা গ্রহণ করেন তাকে আধ-পেটা খাওয়া বলে গণ্য করা যেতে পারে। কাজেই রেশনের খাদ্যের অতিরিক্ত উপরোক্ত ডাল তরি-তরকারি ছাড়া এর উপরে এঁরা দৈনিক এক পোয়া ছাতু বা চিঁড়া খেলে প্রায় তিন হাজার ক্যালোরি পেতে পারেন। সামর্থ্যে কুলোলে এরা যদি এর ওপর খোসা ছাড়ানো এক ছটাক চিনাবাদাম দৈনিক খেতে পারেন তবে প্রায় ৩৩০০ ক্যালোরির সংস্থান হতে পারে। এঁদের খাদ্য সম্বন্ধে যে ব্যবস্থার কথা বলা হ'ল এতে ক্যালোরি-সমস্যার অনেকটা সমাধান হলেও কতকগুলি অত্যাবশ্যক ভিটামিন ও লবণ-পদার্থ থেকে এঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এজন্য এঁদের রোজই শাক, কাঁচা মূলো, কাঁচা পেঁয়াজ বা পেয়ারা প্রভৃতি সময়োপযোগী

কলমূল খাওয়া উচিত। মাঝে মাঝে পুঁটি, চৈংরা প্রভৃতি ছোট মাছ পরিপাক শক্তি অনুযায়ী বেশী করে খাওয়া এঁদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত নিতান্তই অপরিহার্য্য।

এই রেশনের একটি প্রধান ত্রুটি সরিষার তেলের অল্পতা। বাংলা দেশের অধিকাংশ লোক, বিশেষতঃ শীতকালে, গায়ে সরিষার তেল মাখেন; অনেকে মাথায়ও এই তেলই দিয়া থাকেন। অথচ রেশনের তেলে একটি ডাল ও একটি তরকারি রান্না করলে গায়ে মাখার তেলই থাকে না, সুতরাং কি দিয়ে আর পুঁইশাক বা চুনোমাছ রান্না করবেন? অথচ শেষোক্ত জিনিষগুলি না খেলে ক্যালোরির বিশেষ ঘাটতি না হলেও ভিটামিন ও লবণ-পদার্থের অভাবেই শরীর ভেঙে পড়বে। এই কারণে যাঁরা কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করেন তাঁদের জন্ম মার্গারিন জাতীয় কোনও সস্তা স্নেহপদার্থ রেশনের অন্তর্ভুক্ত করবার ব্যবস্থা করা নিতান্তই আবশ্যক। যদিও দেখা গেছে শরীরের তাপে যে সকল স্নেহপদার্থ তরল অবস্থায় থাকে সেগুলিই সহজপাচ্য। শীতকালে রেশনে চিনির বরাদ্দ বাড়ানো বা সস্তায় ভাল গুড়ের ব্যবস্থা করাও বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বেই বলেছি শীতের জন্ত বেশী ক্যালোরি খরচ হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই বাংলাদেশে পূর্ব্বে শীতকালে পায়েস, পিঠে প্রভৃতির প্রচুর প্রচলন ছিল যার স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে পৌষপার্ব্বণ কথাটি। নারকেল, দুধ, ক্ষীর, গুড় বা চিনি পিষ্টকের প্রধান উপাদান এবং এগুলি ক্যালোরি এবং সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টিকারিতার দিক্ থেকে খুব উপাদেয় উপকরণ তা সকলেই জানেন।

আমি কঠোর পরিশ্রমকারীদের খাদ্যে ছাতু, চিনাবাদাম, ছোলাভাজা, চিড়া প্রভৃতি দিয়ে ক্যালোরি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছি, তবে যেখানে ছাতুর সেরই বার আনা, এক টাকা সেখানে এ উপদেশ কতটা কার্য্যকরী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পুঁটি, চৈংরা, বেলে, খলসে প্রভৃতি মাছ এবং মূলো, নটে, পালং, কলমি প্রভৃতি শাক আহার করে লবণ-পদার্থ ও ভিটামিন সংগ্রহের কথা বলেছি কিন্তু যেখানে পুঁটির সেরই দেড় টাকা, দু টাকা সেখানে গরিবের পক্ষে পুষ্টিকর আহার্য্য যোগাড় করা যে কত কঠিন তা বলাই বাহুল্য।

যে সময়ে আমরা জিনিষের দুষ্প্রাপ্যতা এবং দুর্মূল্যতার জন্ত চিনাবাদাম, ছোলা-ভাজা, ছাতু ও পুঁটিমাছ প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর খাদ্যসামগ্রীর সাহায্যে শরীর রক্ষার উপায় চিন্তা করছি ঠিক সেই সময়ে বিলাতে আদর্শ খাদ্যের বরাদ্দ কি ধরা হয়েছে নিম্নের তালিকায় তা দেওয়া হ'ল। এ কথা হয়ত অনেকেই জানেন যে, ওদেশের রেশনের মান উন্নত করে ইতিমধ্যেই ঐ আদর্শ কার্য্যে পরিণত করার সূচনা হয়েছে।

দৈনিক একজন প্রাপ্তবয়স্কের বরাদ্দ	ক্যালোরি
ছয় ছটাক দুধ	১৯০
১টি ডিম বা ২ ছটাক কড্ মাছ	৮৫
আধ পোয়া চর্ব্বিহীন মাংস	১৭০
এক ছটাক পনির	২৪০
আধ পোয়া মাখন বা মার্গারিন	৯২০
৯ ছটাক আটার রুটি	১২৩০
১ ছটাক চিনি	২৩০
দেড় পোয়া গোল আলু	২৮৮
১টি কমলালেবু বা ২টি আপেল ও ১টি কলা	৩৫
স্যালাড্	১০
আধ পোয়া রান্না-করা শাকসব্জী	২২
	৩৪২০

বলা বাহুল্য, এই খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও লবণ-পদার্থগুলিও পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই পাওয়া যায়।

অনেকে হয়ত বলবেন এ খাদ্য কি বাঙালীরা হজম করতে পারবে। আমি বলি নিশ্চয়ই পারবে, বরং এর চেয়ে পরিমাণে অধিক এবং অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য সেদিন পর্য্যন্তও বাংলার মধ্যবিত্ত ও জোতদার-জমিদার শ্রেণীর লোক অনায়াসে হজম করতেন এবং শক্তিও রাখতেন তাঁরা অসাধারণ। আমিষ-নিরামিষ আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থলে বলেছেন—"সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এককথায় দশ ক্রোশ হেঁটে দিত, দুই কুড়ি কই মাছ কাঁটাসুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, এক-শ বছর বাঁচত। এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙালী খাওয়া—উপাদেয়, পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া। পূর্ব্ব-বাংলার ওদের নকল কর যত পার।"

আধুনিক খাদ্যবিজ্ঞান একথা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ করেছে যে জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য ও শৌর্য্যবীর্য্য প্রধানতঃ আমিষ খাদ্যের উপরই নির্ভর করে। প্রচলিত আমিষ খাদ্য যদি ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হতে থাকে তবে জাতিকে বাঁচার মত বাঁচতে হলে, কঠোর জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে হলে, আবশ্যক বোধে রুচি এবং সংস্কারের আমূল পরিবর্ত্তন করে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্মত, বিভিন্ন প্রাণীর মাংসাহারের প্রচলন করতে হবে।

দ্বারিকানাথ ঠাকুর

(১৭৯৬—১৮৪৬)

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সিংহ

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি— এই বহু-প্রচলিত প্রবচনের সমর্থনে প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার উল্লেখ না করিলেও চলে। মাত্র শত বৎসর পূর্ব্বে বিদেশে যে একজন দিকপাল বাঙালীর কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান ঘটে তাঁহার সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা বা ঔদাসীন্য এই প্রবচনকে সমর্থন করে।

দ্বারিকানাথের কর্ম্মবহুল জীবন সম্পর্কে আমাদের বর্ত্তমান ঔদাসীন্যের যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ, চাকুরীগত প্রাণ মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে উচ্চশিক্ষিত ইংরেজীনবীশ ব্রাহ্মণ-বংশীয় বণিকের আবির্ভাব একটু দুর্ব্বোধ্য ও স্বভাবতঃই দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার। দ্বারিকানাথ ভারতে আধুনিক ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথপ্রদর্শকদের এবং আধুনিক শিল্পের প্রবর্ত্তকদের অন্যতম। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ, সতীদাহ নিবারণ বা প্রেস আইন সম্পর্কে তাঁহার কার্য্যকলাপ সুবিদিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই কার্য্যাবলী বাদ দিয়া কেবল তাঁহার বণিকজীবন সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইতেছে।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারে দ্বারিকা-নাথের জন্ম হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রামলোচন নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি দ্বারিকানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। রামলোচন বালক দ্বারিকানাথের শিক্ষার জন্য তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ ইংরেজ শিক্ষক ও মৌলবী নিযুক্ত করেন এবং বাল্যাবধি দ্বারিকানাথ ইংরেজ বণিকদের সহিত সহজে মেলামেশা করিতে অভ্যস্ত হন। দ্বারিকানাথ কৈশোরেই পৈতৃক ভূসম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণের কার্য্যে মনোনিবেশ করেন এবং অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। ভূমিস্বত্ব আইন সম্পর্কে তাঁহার এমন ব্যুৎপত্তি জন্মে যে বাংলা ও বাংলার বাহিরে বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশ অঞ্চলের বহু জমিদার তাঁহাকে আইনঘটিত বিষয়ে পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি বহু ভূম্যধিকারীর বিবিধ বৈষয়িক কার্য্যের জন্য "এজেন্ট" নিযুক্ত হন এবং স্বীয় ভূসম্পত্তির উৎপন্ন পণ্যের ব্যবসায়ও এই সঙ্গে চালু করেন। ঠাকুর-পরিবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত লবণের কারবার কলিকাতা আগমনের পরই সুরু করিয়াছিলেন। দক্ষ দ্বারিকা-নাথ এক্ষেত্রেও শীঘ্রই সুনাম অর্জ্জন করেন।

দ্বারিকানাথের বয়স যখন ত্রিশ সেই সময় কোম্পানীর রাজস্ব ও লবণ বিভাগে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় এবং তাঁহারা দ্বারিকানাথকে ইহা গ্রহণ করাইতে সমর্থ হন। মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ তখনই ইংরেজী শিক্ষার আবর্ত্তে পড়িয়া কোম্পানীর চাকুরীর মহিমা স্বীকার করিতে সুরু করিয়াছেন। তখন প্রাচীন বণিকশ্রেণী লোপ পাইতেছিল, জগৎ শেঠের সন্তান-সন্ততি তখন অর্দ্ধাহারে, অনাহারে কোম্পানীর চাকুরী ভিক্ষা করিতেছিল, অপর পক্ষে তখন লর্ড কর্ণওয়ালিস-প্রবর্ত্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় নূতন অভিজাতশ্রেণীর উদ্ভব হইতেছিল। দ্বারিকানাথের পিতামহ ইংরেজ কোম্পানীর আমলাতন্ত্রে বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরূপ পরি-স্থিতিতে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারিকানাথের চাকুরী গ্রহণ একটা অভাবনীয় ঘটনা নহে। অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল আরও আট বৎসর পরে যখন তিনি কোম্পানীর চাকুরীতে ইস্তফা দিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় ও সততায় দ্বারিকানাথ কয়েক বৎসরের মধ্যেই শুল্ক, লবণ ও রাজস্ব বোর্ডের দেওয়ানের পদে উন্নীত হইলেন। শত বৎসর পরে এই পদের গুরুত্ব ও মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে হইলে কোম্পানীর তদানীন্তন শাসনতন্ত্রের অবস্থা জানা প্রয়োজন। দ্বারিকানাথ এই গুরুত্বপূর্ণ পদের সকল কার্য্য দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াও নিজ সম্পত্তি রক্ষণে এবং ব্যবসায়াদি পরিচালনে অবহেলা করেন নাই, এমন কি নব প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কেরও তিনি প্রথম হইতেই একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে সমান কৃতিত্ব অর্জ্জন অসম্ভব বোধ হওয়ায় আটত্রিশ বৎসর বয়সে দ্বারিকানাথ আমলাতন্ত্রের সহজ ও সুনির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবিকার অনিশ্চিত ও বন্ধুর পথ গ্রহণ করিলেন। যদি বাঙালীর ইতিহাসবোধ থাকিত তাহা হইলে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের এই ঘটনা ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বেণ্টিঙ্ক-মেকলে-প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতি অপেক্ষা আমাদের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

কোম্পানীর চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এদেশে ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত ম্যানেজিং এজেন্সির আদর্শে একটি ব্যবসায়ের পরিকল্পনা করেন এবং দুই জন ইংরেজ বণিকের সহিত সমান অংশীদার হিসাবে "কার ঠাকুর কোম্পানী" নামে প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তদানীন্তন বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এবং বহু ইংরেজ দ্বারিকানাথকে এজন্য সম্বর্দ্ধনা করেন। কার ঠাকুর কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় দ্বারিকানাথ যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা তৎকালীন ঔপনিবেশিক ধনিকতন্ত্রের মুখপত্র (Fishers' Colonial Magazine) বিস্ময়ের সহিত স্বীকার করে। ১৮৩০-৩৪ সালে কলিকাতায় ইংরেজ পরিচালিত কয়েকটি প্রাচীন 'এজেন্সি হাউসে'র পতন ঘটে এবং তাহার ফলে কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের জগতে বেশ মন্দা পড়ে। এমনই সময় একজন বাঙালী কোম্পানীর চাকুরী ত্যাগ করিয়া একটি বিরাট 'এজেন্সি হাউসে'র পরিকল্পনা করিলেন এবং ইউরোপের সহিত যোগরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া একটি অংশীদারী কারবার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাতে কিন্তু তদানীন্তন ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায় পর্য্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। ১৮২৯ সালে য়ুনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়, দ্বারিকানাথ তখন কোম্পানীর কর্ম্মচারী হইলেও উহাতে অংশীদার

হিসাবে যোগ দেন; হরিমোহন ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন বাঙালী জমিদার ও কয়েকজন ইংরেজ বণিক এই আধুনিক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যখন কলিকাতার ব্যবসায়ী-মহলে ইংরেজ এজেন্সি হাউসগুলির পতনের ফলে আতঙ্কের সঞ্চার হইল এবং য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ককেও তাহা স্পর্শ করিল তখন দ্বারিকানাথ ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কের পুরোভাগে আসিলেন; তখনও তিনি কোম্পানীর চাকুরীতে বহাল ছিলেন। চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার পর তিনি ঐ ব্যাঙ্কের কর্ণধার হইলেন। কার ঠাকুর কোম্পানী ও য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক এই দুই প্রতিষ্ঠান মারফত তিনি অচিরে তদানীন্তন সমগ্র বাংলা ও যুক্তপ্রদেশে তাঁহার কার্য্যাবলী সম্প্রসারিত করিলেন। বোম্বাইয়ের দুই-একটি পার্শী বণিক ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁহার সমকক্ষ কোনও দেশীয় বণিক রহিল না।

কার ঠাকুর কোম্পানীকে পুরাপুরি চালু করিবার পূর্ব্ব হইতেই দ্বারিকানাথ তাঁহার নিজ ব্যবসায়লব্ধ অর্থ বাংলা ও যুক্তপ্রদেশে জমিদারী ক্রয়ে নিয়োগ করিতেছিলেন। কিন্তু প্রজা-বিলি ও খাজানা সংগ্রহই তাঁহার ব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বন হয় নাই। উত্তর-ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশাল ভূসম্পত্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছিল পাইকারী ভাবে রেশম, নীল ও শর্করা উৎপাদন। আধুনিক প্রথায় পণ্য উৎপাদন করিতে হইলে এক জনের মূলধন বা মহাজনী কারবারে চলে না এবং আমদানী ও রপ্তানীর জগতে জমিদারী কানুন অচল এ সত্য তাঁহার জানা ছিল। এজন্য য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানীর কর্ণধার হইয়াই তিনি আধুনিক প্রথায় পাইকারী উৎপাদন ও আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারে উদ্যোগী হইলেন। শর্করা-শিল্পে তিনি দেশীয় ইক্ষু ব্যতীত চীন ও মরিশসের ইক্ষু উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন এবং বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শর্করা-কুঠীতে বিবিধ বৈদেশিক প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন। কুলী চালান সম্পর্কে 'অনুসন্ধান-কমিশনে' তাঁহার সাক্ষ্যে প্রসঙ্গক্রমে দ্বারিকানাথ বলেন যে, ভারতবর্ষে তিনিই পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে ইক্ষুচাষ ও শর্করা উৎপাদন প্রবর্ত্তন করেন। বারুইপুর, গাজীপুর ও পাবনাস্থিত কুঠীতে পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে শর্করা উৎপাদন-প্রচেষ্টায় তিনি বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করেন। বাষ্পীয় শক্তিতে শর্করা প্রস্তুত এদেশে তিনিই প্রবর্ত্তন করেন। দ্বারিকানাথের ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের খতিয়ানে জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার সাহস ও প্রচেষ্টার মূল্য নিরূপিত হইবে না। যখন কোনও ইংরেজ কোম্পানী রাণীগঞ্জে তাহাদের কয়লার খনি চালাইতে অসমর্থ হয় তখন প্রকাশ্য নীলামে দ্বারিকানাথ তাহা ক্রয় করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে সমুদ্রপথে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে নদীপথে ষ্টীম সার্ভিস প্রবর্ত্তনে যাঁহারা উদ্যোগী হন দ্বারিকানাথ তাঁহাদের পুরোভাগে ছিলেন। আরও একটি ক্ষেত্রে দ্বারিকানাথ তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। পাট চাষ প্রসারের জন্য তিনি বিশেষ আন্দোলন করেন এবং ইংরেজ বণিকদের সহযোগিতায় আধুনিক ভাবে পাইকারী হারে পাট-উৎপাদন শিক্ষার জন্য একটি শিল্প-বিদ্যালয় গঠনে প্রয়াসী হন। উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে ও হঠাৎ তাঁহার ইংলণ্ড গমনে এই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। কিন্তু ইংলণ্ড ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই পণ্যদ্রব্যের জন্য যে একটি বিরাট চাহিদা সৃষ্টি হইতে পারে দ্বারিকানাথের এই ধারণা তাঁহার মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়। যখন ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধিল তখন রুশ-দেশজাত শনের অভাবে ইংলণ্ডের শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষে এক প্রবল সমস্যার সৃষ্টি হইল। তখন হইতে বাংলার পাট ডানডির পণ্যশালায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিল। অবশ্য বাংলার কৃষকের অন্ন-সংস্থানে তাহা সাহায্য করে নাই একথা সত্য; তাহার কারণ নির্ণয় এ প্রবন্ধে অবান্তর।

দ্বারিকানাথ সৌখিন ছিলেন এবং পরদুঃখমোচনে ও সমাজের হিতকর কার্য্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন বলিয়াই হউক বা তদানীন্তন অভিজাত-সমাজের অগ্রণী ছিলেন বলিয়াই হউক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়গুলি তাঁহার মৃত্যুর পর বেশী দিন চলে নাই। কিন্তু যেদিন বাঙালীর আধুনিক ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত ভাবে রচিত হইবে তখন তাঁহাকে যোগ্য মর্য্যাদা দান করিতেই হইবে।

পুরীর পুরাবৃত্ত

শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী

ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূল বিভাগের অধিকাংশ জনপদ বা অনুষ্ঠানের আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেগুলি বারম্বার প্লাবিত ও পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গুজরাট অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তিক দ্বারকাপুরী বা দ্বারাবতীর ও দক্ষিণ বাংলার নানা প্রতিষ্ঠানের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের দক্ষিণ বাংলার ভূ-সংগঠন, জনবসতি, প্লাবন ও পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব না কেবল উড়িষ্যার দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী পুরী বা জগন্নাথক্ষেত্র সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার যে, বিশেষ ভাবে "পুর" শব্দ (যাহার গ্রীক প্রতিশব্দ polles)

প্রাচীনকালে নদীতীরবর্ত্তী অধিষ্ঠানগুলি বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইত, এবং তদনুযায়ী বন্দরার্থে পত্তন শব্দ ও পার্ব্বত্য অধিষ্ঠান বুঝাইতে গিরি শব্দ প্রয়োগ করা হইত। তাহার কারণ, বর্ত্তমান কালের স্টেশন বা রেলওয়ে স্টেশন কেন্দ্রিক সভ্যতার অনুরূপ নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতার প্রচলন ছিল। কালক্রমে উক্ত পুর শব্দ "ঈ"-কার দ্বারা বিশেষিত হইতে থাকে, যেমন, হস্তিনাপুর/হস্তিনাপুরী; মাহিষ্যতীপুর/মাহিষ্যতীপুরী; মথুরাপুরী; দ্বারকাপুরী ইত্যাদি; আবার পাটলীপুত্র <পাটলীপুত্ত <পাটালী১ পত্তন; নাগপত্তন; বিশাখাপত্তন ইত্যাদি ও দেবগিরি; ব্রহ্মগিরি; গিরিব্রজ ইত্যাদি।২

আমাদের আলোচ্য বিষয়—পুরী বা শ্রীক্ষেত্রের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বাদ দিলেও, যত দূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে ঐতিহাসিক যুগেই কয়েকবার প্লাবিত ও পুনরুত্থিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা হয়। তিনটি বিভিন্ন পর্ব্বে ইহার তিনটি বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছিল। প্রথমে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীনা পর্য্যটক ফা-হিয়ান (মোক্ষদেব) তাঁহার ভারত পরিভ্রমণ কালে উক্ত স্থানটি পরিদর্শন করিয়া যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, উহা একটি বৌদ্ধতীর্থ ছিল এবং উহার নাম ছিল "নলি-গইনা।"৩ এখন উক্ত নলি-গইনা সংস্কৃত "নীলাঙ্গন", "লূনাঙ্গন" ও প্রাকৃত "লোনাগন", "নীলাগনে"র কথাই মনে করাইয়া দেয়। অর্থ বুঝাইত, সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থান; যেমন তীরভুক্তি, সমতট ইত্যাদি শব্দ। উক্ত স্থান বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদিগের একটি বাসস্থান ও বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র ছিল এবং এখানে স্বল্পসংখ্যক স্তূপ ও বিহার ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহারও পূর্ব্বযুগের বিবরণ যাহা মহাভারত হইতে টলেমি ও প্লিনির ভৌগোলিক বিবরণে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় তাহার সহিত চীনা পর্য্যটকদের প্রদত্ত বিবরণের দূরত্ব, দিঙ্ নির্ণয় বিষয়ে যথেষ্ট অনৈক্য থাকায় গ্রহণযোগ্য নহে। তবে একথা বলিলে বা মানিয়া লইলে ভুল হয় না যে, দ্রাবিড়ীয় "পলৌর" বা "পালৌর", মহাভারত ও হরিবংশের "দন্তকুর" বা "দন্তক্রুর" ও বৌদ্ধশাস্ত্র দীঘ-নিকায়, দাঠাবংশ প্রভৃতির "দন্তপুর" ও তাহার নিকটবর্ত্তী "সিদ্ধান্তম্" বা "সিদ্ধার্থক গ্রাম," "ভুহুর" বা "ভিক্ষুপুর", "ধৌলি" বা "ধবলী", "বিমলা পত্তন" ও "বিশাখা পত্তন" প্রভৃতি পুরী-ভুবনেশ্বর অঞ্চলের বৌদ্ধ প্রসিদ্ধিরই সাক্ষ্য দেয়।৪

পরবর্ত্তী যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনা পর্য্যটক হু-এন-সাঙ্ (মহাযানদেব) ভারতবর্ষে আসেন। ফা-হিয়েন ও হু-এন-সাঙের কাল-ব্যবধান প্রায় দুই শত বৎসর। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই দেখা যায় যে উক্ত স্থানের নাম নলি-গইনা পরিবর্ত্তিত হইয়া "চরিত্রপুরে" দাঁড়াইয়াছে।৫ অথচ এই পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে ইহা যে বৌদ্ধ মহাযান তীর্থে পরিণত হইয়াছে সেবিষয়ে নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ তিনি দিয়াছেন। মহাযান-মতের দেব-দেবী—বিমলা, লোকনাথ, মঞ্জুশ্রী, জঙ্গলা, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং রথযাত্রা উৎসবেরও প্রচলন হইয়াছে।৬

ইহার পর ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গ বংশোদ্ভূত তৃতীয় অনঙ্গ ভীমদেব কর্ত্তৃক তাঁহার পিতৃ-পিতামহগণের প্রারব্ধ মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত করার জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এই জনশ্রুতি হইতে উক্ত তীর্থ বৌদ্ধ হইতে হিন্দুতীর্থে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় এবং তাহা খ্রীষ্টীয় একাদশ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ঘটিয়া থাকিবে বলিয়া অনুমিত হয়। এখানে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, বৌদ্ধ-মহাযান মত বা সংস্কৃত বৌদ্ধমত হিন্দু-বৈষ্ণব মতের সগোত্রীয়। উভয়েই নানা বিষয়ে পরস্পরের নিকট ঋণী। উপরন্তু মহাযান মতোদ্ভূত মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ক্রমে ক্রমে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের সহিত বিলীন হইয়া গিয়াছিল। বৈষ্ণবদিগের সঙ্কীর্ত্তন সহজযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদিগের জিনিষ ও সত্যনারায়ণ পূজা প্রাক্তন অবলোকিতেশ্বরের পূজার অপভ্রষ্ট সংস্করণ। বৌদ্ধ জঙ্গলা দেবীই হিন্দু জঙ্গলা রাক্ষসী, যাহার নামে "অস্তি গোদাবরী তীরে জঙ্গলা নাম্নী রাক্ষসী। তস্যা নাম স্মরণমাত্রেণ গর্ভিণী বিশল্যা ভবেৎ।"৭ শ্লোক কীর্ত্তিত আছে। হিন্দু শাক্ত মতের তন্ত্রগুলির মধ্যে গৌতমী তন্ত্র যে বিশেষভাবে বৌদ্ধদিগের সম্পত্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তদুপরি নাথ ধর্ম্ম, যোগী (=যুগী)-দিগের দার্শনিক মত ও সাধন-ভজন প্রণালী জৈন ও বৌদ্ধমতের মিশ্রিত ও হ্রস্ব সংস্করণ।৮ এবম্বিধ নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা ধরিয়া লওয়া যায়, উক্ত তীর্থ বৌদ্ধমহাযান মত হইতে বজ্রযান-কাল চক্রযান-সহজযান হইয়া শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু-বৈষ্ণবমতের তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। তদনুযায়ী ইহার চরিত্রপুর নাম বিচ্ছিন্ন হইয়া পুরীতে এবং মঞ্জুশ্রীক্ষেত্র নাম শ্রীক্ষেত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।৯

আবার খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কলিঙ্গাধিপতি কাকতীয় বংশের শেষ রাজা প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক উক্ত তীর্থের বালুগ্রাস হইতে উদ্ধার উহার পুনর্জন্মের কথাই মনে করাইয়া দেয়। কিয়ৎকাল ব্যবধানে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক উক্ত তীর্থের বিবিধ সংস্কারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার পরেই কালাপাহাড় কর্ত্তৃক পুরীর মন্দিরের দেববিগ্রহগুলির অবমাননার কাল নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। তৎপরে শ্রীচৈতন্তকর্ত্তৃক নব্য বৈষ্ণবমত প্রচলনের যুগ। জীবনের শেষভাগে তাঁহার এখানে আসিয়া বসবাস ও আনুষঙ্গিক সঙ্কীর্ত্তন, দীক্ষাদান প্রভৃতি ব্যাপার যে কতদূর ইহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছিল তাহার বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক।

এখন লুপ্ত বৌদ্ধেতিহাসের চিহ্ন-প্রমাণগুলির উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বর্ত্তমান মূল মন্দিরের সম্মুখস্থিত অরুণ-স্তম্ভ বা গরুড়-স্তম্ভ যে অশোক-স্তম্ভ ব্যতীত আর কিছুই নহে তাহা বলা বাহুল্য। মূল মন্দিরের শিখরস্থিত চক্র, যাহা

বিষ্ণুচক্র নামে কথিত হয় ও দ্বারভাগে অবস্থিত সিংহমূর্ত্তি "বৌদ্ধ ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তন সুত্তে"র চক্রবা চক্র ও "সিংহনাদে"র প্রতীক সিংহ বা সিংহই। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত হনুমানের মূর্ত্তি মূলতঃ কালভৈরব বা মহাকালের মূর্ত্তিই ছিল। মন্দিরগাত্রে আজিও যে সকল নগ্ন মূর্ত্তি খোদিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বৌদ্ধশিল্পেরই অবশিষ্ট চিহ্ন। লোকনাথ ও বিমলা নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ মহাযান মতের দেব-দেবী। বিষ্ণুপঞ্জর যাহা কৃষ্ণের বক্ষপঞ্জর বলিয়া বিদিত তাহা যে কতদূর মিথ্যা সে কথা শ্রীমদ্ভাগবতেই পাওয়া যায়। সুতরাং উহা ভগবান তথাগতের কোনও দেহাবশিষ্ট হওয়াই সম্ভবপর। ত্রি-বিগ্রহ অর্থাৎ জগন্নাথ-সুভদ্রা ও বলরাম প্রকৃতপক্ষে (ক) বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের বা (খ) সূত্র বিনয় ও অভিধর্ম্মপিটকের বা (গ) মঞ্জুশ্রী-প্রজ্ঞাপারমিতা ও অবলোকিতেশ্বরের, অথবা (ঘ) গৌতম বুদ্ধ মৈত্রেয় বুদ্ধ ও শক্তির (=কান্নন্ বা কান্-ইনের) প্রতীক ছিল। রথযাত্রা উৎসব যে হু-এন্ সাঙ্ পরিদৃষ্ট বুদ্ধ-ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতীক লইয়া রথযাত্রা তাহা বলাই বাহুল্য। খুব সম্ভবতঃ ইহা কুষাণ রাজবংশ কর্ত্তৃক খোটান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত হইয়া হর্ষবর্দ্ধন-শিলাদিত্যের রাজত্বকালে এতদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে জগন্নাথের সমার্থক ভুবনেশ্বরের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিলেই প্রবন্ধ পূর্ণাঙ্গ হইবে বলিয়া মনে করি। সুতরাং ভুবনেশ্বর তীর্থের বহুসংখ্যক শিবমন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত বৃহৎ লিঙ্গমূর্ত্তিগুলি যাহাদিগকে অশোক-স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ বলিয়াই মনে হয়, সেগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ইহার অনতিদূরবর্ত্তী খণ্ডগিরি ও উদয়-গিরি গুহাগাত্রের১০ ব্রাহ্মীলিপি ও ধৌলী পর্ব্বতগাত্রের অশোকানুশাসন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাদটীকা

১। আমি Jarl Charpentier পরিকল্পিত "পাটলীপুত্রে" বিশ্বাস করি না। কারণ উহা অশুদ্ধ ও অন্যত্র আর দৃষ্ট হয় না।

২। পুর-পুরী, নগর, পত্তন, গ্রাম-গিরি, কূট-কোট্টা, আগার প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিয়া প্রাচীনকালে শহর ও বন্দরগুলির নামকরণ হইত।

৩। রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের "প্রাচীন ভারত" ও *Travels of Fa-Hian*—translated and edited by Landresse, Klaproth and Remusat দ্রষ্টব্য।

৪। দ্রষ্টব্য—"*Pre-Dravidians & Pre-Aryans in India*" by Jean Przyluski, Sylvain Levi and Jules Bloch—translated into English by Dr. P. C. Bagchi, pp. 167-172.

৫। দ্রষ্টব্য—রামপ্রাণ গুপ্তের "প্রাচীন ভারত" ও "*Hiuen-tsang*" (*Yuan-Chwang*) by Wattors & S. Beal

৬। স্নানযাত্রা-উৎসবও ইহার সমকালীন কিনা সে বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৭। যে আকারে শ্লোকটি পাওয়া যায় তাহা অশুদ্ধ এবং তাহা এই—"অস্তি গোদাবরী তীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী। যস্যা নাম স্মরণমাত্রেণ গর্ভিণী বিশল্যা ভবেৎ।"

৮। দ্রষ্টব্য—*Discovery of Living Buddhism in Bengal* by H. P. Sastri; *Modern Buddhism in Orissa and its Followers*—by N. N. Vasu ও অন্যান্য মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিভিন্ন প্রবন্ধ।

৯। হিন্দুদিগের মতে শ্রী অর্থে লক্ষ্মী; সুতরাং সুভদ্রা নহে। ভগ্নী ও স্ত্রী একই বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সেজন্য সুভদ্রার নামানুযায়ী ইহার শ্রীক্ষেত্র নামকরণ হইয়াছিল, এরূপও বলা যায় না।

১০। দ্রষ্টব্য—*Old Brahmi Inscriptions in the Caves of Khandagiri and Udayagiri*: *Introduction* by Dr. B. M. Barua.

সেইটুকু বল ভাই

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

বন্ধু, আজিকে বল,
ভরা গঙ্গার কূলে কূলে জল করে নাকি টলমল?
ও আঁখি কিনারে প্রেমের মিনতি হ'য়ে যাক্ নির্বাক
ছলছল চোখে ফিরে ফিরে মোরে, দিও না, দিও না ডাক।
আজ শুধু তুমি বল,
ঘনায়িত ঘন বন্যার বেগে হও নাকি চঞ্চল?
কত না প্রাণের সবুজ শিখায় হঠাৎ ঝঞ্ঝা লেগে
উন্মুখ প্রাণ কেঁপে কেঁপে ওঠে জেগে,
তারই কম্পিত শিখায় শিখায় নূতনের আহ্বান,
জীবনের অভিযান—
কত না সাগর পাড়ি দিল এরা, কত না দরিয়া পার,
কান্তার, গিরি, দুস্তর পারাবার,
কে করে তাহার হিসাব নিকাশ, কেবা করে গণনাই,
অচেনা পথিক রয়ে গেল চির রহস্য অজানাই।
যদি জেনে থাক এ প্রাণের কোন গোপন মর্ম্মকথা
সেইটুকু বল ভাই।

গুরু-দক্ষিণা

শ্রীঅবনীনাথ রায়

মানুষের যত বয়স বাড়ে সে তত অতীতের মধ্যে ডুবে যেতে চায়। অতীত তার চোখে যে মোহ-অঞ্জন লাগিয়ে দেয় বর্তমান তার তুলনায় ফিকে এবং হাল্কা বলে বোধ হয়। তরুণ এবং প্রৌঢ়ের মধ্যে এখানেই প্রভেদের সীমারেখা।

অতীতে যে মহত্ব দেখেছি এবং মানবতার সংস্পর্শে এসেছি তার তুলনায় বর্তমানকে কঠোর এবং নীরস বলে মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকে জানবার সৌভাগ্য সেই মহত্বের স্মৃতির প্রধান বাহক।

আমাদের দেশকে কে কে বড় করেছেন, আমাদের জাতিকে সুপ্তি থেকে উদ্বোধিত করে তুলেছেন তাঁদের আজ স্মরণ করি। চার জন মহাপুরুষের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়—বঙ্কিমচন্দ্র, পরমহংস রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ। রাজা রামমোহন জাতির আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি জাতি গড়ে যেতে পারেন নি। বঙ্কিম তাঁর অতুলনীয় কথা-সাহিত্যে জাতির সামনে তুলে ধরলেন উজ্জ্বল আদর্শ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দিলেন সংকল্প, রবীন্দ্রনাথ দিলেন ভাব ও ভাষা, রুচি এবং শালীনতা। জাতির ক্রমবিকাশের পর্য্যায়ে এইরূপই প্রয়োজন ছিল। এই চার জন মহাপুরুষ ছাড়া আরো অনেকে জাতির আত্মচেতনার যজ্ঞে সমিধ জুগিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কল্যাণের সীমা-রেখাকেই স্পর্শ করেছিলেন, জাতির আত্মাকে মূলগত ভাবে আন্দোলিত করতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম', 'দেবীচৌধুরাণী', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি উপন্যাসে দেশপ্রেমের যে বীজ বপন করলেন জাতির মনে কালক্রমে তা পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগল। স্বামী বিবেকানন্দ 'বর্তমান ভারত' প্রভৃতি পুস্তকে এবং তাঁর জীবনের উদাহরণ দিয়ে এই বীজের মূলে জলনিষেক করতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন আবির্ভূত হলেন তখন জাতির মন খানিকটা প্রবুদ্ধ হয়েছে, তখন তাঁকে শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়ে যৌবনে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই সময়টা জাতীয় জীবনে একটা সঙ্কট-মুহূর্ত—কেননা, এই সময়ে পথ ভুল হলে উন্নতির বদলে রসাতলের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ সেই দায়িত্ব নিলেন। দেশের জনমনের অন্তর্গূঢ় বেদনা এবং আনন্দকে তিনি ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করে ছড়িয়ে

দিলেন। আমরা অনুভব করতে পারলাম যে, আমাদেরও গৌরবময় অতীত ছিল, আমাদের ভবিষ্যৎও আছে। এই যে নবলব্ধ শক্তি এ বিপথে যেতে পারত—রবীন্দ্রনাথের প্রেমের বাণী এবং মাধুর্য্যের স্পর্শ আমাদের সত্য-পথ দেখিয়ে দিলে। আমাদের জাতির বিবর্ত্তনের ইতিহাস, অন্ধকার থেকে আলোকে যাওয়ার সত্য ইতিহাস যেদিন লিখিত হবে সেদিন রবীন্দ্রনাথের এই দানটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান বলে ঘোষিত হবে এই আমার বিশ্বাস।

আমি রবীন্দ্রনাথকে নিকটের থেকে জেনেছি, তাই আমার এ সংশয় কিছুতেই মেটে না যে তিনি কবি হিসাবে বড় ছিলেন, কিংবা তিনি মানুষ হিসাবে বড় ছিলেন। কবিত্বের পরিমাপ বড় বড় রসজ্ঞেরাই করতে পারবেন কিন্তু আমি তাঁকে মানুষ হিসাবেই জেনেছি। তাঁর জন্য যে শ্রদ্ধা, যে আকর্ষণ অনুভব করেছি, তার তুলনা নেই। তাই সেদিন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ লিখিত "My Master in his Slippers" শীর্ষক লেখা 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় যখন পড়ি তখন মনের মধ্যে মধু বর্ষণ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের যে কি দুর্দমনীয় আকর্ষণ তা যিনি তাঁর নিকট-সংস্পর্শে না এসেছেন তিনি কিছুতেই অনুমান করতে পারবেন না। তিনি একাধারে ছিলেন মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা। তাঁর স্নেহের, তাঁর সহানুভূতির অনাবিল স্রোতে কত নরনারী যে অবগাহন করে তৃপ্ত হয়েছেন তার হিসাব আজ করা শক্ত। বিধাতা দেহের যে সৌন্দর্য্য দিয়ে তাঁকে গড়েছিলেন তা জগতের সকলের চোখেই ধরা পড়েছে, কিন্তু মনের যে সৌন্দর্য্য দিয়ে তাঁকে উদ্বোধিত করে তুলেছিলেন তার খবর যাঁরা তাঁর স্নেহের অংশীদার না হয়েছেন তাঁরা অনুমান করতে পারবেন না। তাঁর কথাবার্ত্তা—তাঁর ধরণধারণ, তাঁর চাহনি, তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর—সমস্ত মিলে এমন একটি জ্যোতির্ম্ময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করত যার সাক্ষাৎ আর দ্বিতীয় বার পাই নি। কৌতুকপ্রিয়তার কি অফুরন্ত ভাণ্ডার তাঁর বাণীর মধ্যে বিজড়িত হয়ে রসস্রোত বইয়ে দিত তা আজ যখন ভাবি তখন কেমন আশ্চর্য্য লাগে। মনে হয় তাঁকে অদ্বিতীয় করে রাখবেন বলেই বুঝি বিধাতা আর তাঁর সমান করে কাউকে সৃষ্টি করলেন না। যত

খাদ্য ও টনিক

আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সময়ে একটা উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অসুখেই হউক বা সুস্থ অবস্থাতেই হউক, যখনি কোনো কারণে আমাদের জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ একটা টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার প্রধান একটী কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন আহার্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনে দৈনিক আহার্য্যের এই অক্ষমতা টনিকের দ্বারা পূরণ হয়।

কিন্তু টনিক যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন তাহার একটী দোষ এই যে উহাদ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। সাময়িক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহা বিশেষ কার্য্যকরী হইলেও উহার প্রভাব অল্পকালেই নিঃশেষিত হয়। একমাত্র সুনির্ব্বাচিত কোনো খাদ্যদ্বারাই দৈহিক পরিপুষ্টির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর।

স্যানা-ভিটা এই সকল কারণেই একটী আদর্শ পানীয়-রূপে পরিগণিত। ইহা একাধারে একটী শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটী উৎকৃষ্ট খাদ্যকে আশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে। তাই ইহার নিয়মিত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে।

স্যানা-ভিটা সুনির্ব্বাচিত ও মূল্যবান উপাদানসমূহের সুষম সমন্বয়ে প্রস্তুত। ইহাতে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, ভিটামিন "বি" কমপ্লেক্স, মল্টযুক্ত সয়াসীম ও অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাযথরূপে বিদ্যমান। ইহা সুস্থ কি অসুস্থ যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী। বিশেষ করিয়া রোগান্তে, প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে, বার্দ্ধক্যে এবং বর্দ্ধিষ্ণু শিশু ও মস্তিষ্কজীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়া স্যানা-ভিটা রোগান্তে ও বর্দ্ধিষ্ণু শিশুদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য ও টনিক। রোগবিধ্বস্ত শরীরের দ্রুত সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করিতে ও শিশুদের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য-গুণটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাই প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত স্যানা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি সহজেই আমরা এই ভিটামিন যথাযথরূপে পাইতে পারি। অধিকন্তু খাঁটি দুগ্ধ ও কোকো থাকাতে স্যানা-ভিটা মস্তিষ্ক, পেশী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য করে।

স্যানা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিষ্কজীবীদের পক্ষে অপরিহার্য্য। বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কের পুষ্টি ও শক্তি-বর্দ্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মল্টযুক্ত সয়াসীম স্যানা-ভিটার আর একটি অপূর্ব্ব সম্পদ। বস্তুতঃপক্ষে সয়াসীম খাদ্যতত্ত্বের এক বিস্ময়কর অবদান। উদ্ভিজ্জ জাতীয় হইলেও ইহা আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ। স্যানা-ভিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ ও উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে অতুলনীয় বলা চলে। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে প্রোটিন ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও স্নায়ুমণ্ডলীর সুষ্ঠু পোষণ ও সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই অনুপাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন ২.৫ গ্রাম প্রোটিন। প্রোটিনের এই অপরিহার্য্য দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি কাপ স্যানা-ভিটাতে অন্যান্য নানা মূল্যবান্ উপাদান ছাড়াও দুইটী ডিমের সমান প্রোটিন থাকে। প্রত্যহ দুই কাপ স্যানা-ভিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। উপরন্তু মল্ট ও সয়াসীম থাকাতে স্যানা-ভিটা কেবল যে সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অন্যান্য খাদ্য পরিপাক করিতেও এই অপূর্ব্ব খাদ্য-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে।

প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে জননীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঐ সময়ে নিয়মিত স্যানা-ভিটা ব্যবহার করিতে দিলে যাবতীয় অশুভ উপসর্গ হইতে সহজেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। স্যানা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো ও অন্যান্য মূল্যবান উপাদান থাকাতে ইহা দ্রুত মাতৃদেহের সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করে। চর্ব্বি, প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ-গঠনোপযোগী ও শক্তিবর্দ্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত সহজপাচ্য অবস্থায় স্যানা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়।

স্যানা-ভিটা কি সুস্থ কি অসুস্থ সকলের পক্ষেই সমান উপকারী। যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। স্যানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও সুমিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্তিদায়ক। ইহা গরম বা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে।

বিজ্ঞাপন

ভারাক্রান্ত মন নিয়েই তাঁর কাছে যাওয়া যাক না কেন, প্রসন্ন হাস্যে এবং সান্ত্বনার প্রলেপে তিনি সে বিষণ্ণতা দূর করে দিতেন। আমাদের যখন অল্প বয়স, তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা বুঝবার যখন আমাদের সময় হয় নি তখন তাঁর ধৈর্য্যের উপর, তাঁর মূল্যবান সময়ের উপর কত জুলুম যে করেছি তা আজ মনে পড়লে লজ্জার পরিসীমা থাকে না। কিন্তু তিনি তাঁর অপরিসীম ঔদার্য্যে আমাদের সেই ছেলেমানুষির প্রশ্রয় দিতেন, আমাদের লেখা কবিতা সংশোধন করে দিতেন। কোনদিন সময়াভাবের অজুহাত তোলেন নি। আজ তাই যখন চারিদিকে—'আমার সময় নেই', এই কথাই অবিরাম শুনি তখন মনে হয় যে, যে-লোকটি পৌনে এক শতাব্দী ধরে নিরলস চিত্তে দেশমাতৃকার এবং বাণীর পূজা করে গেলেন—বিশ্বের দরবারে পূজা-উপচার সাজিয়ে বঙ্গ-ভারতীকে বিশ্ববরেণ্য করে তুললেন, অফুরন্ত সময় কি কেবল ছিল তাঁরই ?

আজ মনে হয় যেন এর উত্তর খুঁজে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ মানুষের মর্য্যাদা দিতে জানতেন, মূল্য দিতে জানতেন। বয়সে ছোট, বিদ্যায় খাটো, সাংসারিক প্রতিষ্ঠায় অনুল্লেখ-যোগ্য কাউকেই তিনি তুচ্ছ করতে পারেন নি। তাই কারুর প্রার্থনার উত্তরেই তিনি 'না' বলতে পারতেন না, বেদনা দিতে তাঁর সঙ্কোচ হ'ত। এর জন্যে নিজে বেদনা পেয়েছেন কিন্তু তবু প্রার্থীকে আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

আজ যখন অনুযোগ শুনি যে, শান্তিনিকেতনের কোন ছাত্র সরকারী বড় চাকরি করে না, পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও কারুর দেশদেশান্তরে প্রচারিত হয় নি, দেশনেতার উচ্চাসন কারও ভাগ্যে লব্ধ হয় নি, তখন ভাবি যে এ অনুযোগ অবান্তর। রবীন্দ্রনাথ সকলকে সাধারণ সহজ মানুষ করতে চেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা যদি সর্ব্ব দেশের মানুষকে প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে, নিজেদের জীবনকে বিশ্বপ্রকৃতির নিকট উন্মুক্ত করে ধরতে পারে, যদি তারা আচরণে ভদ্র হয়, অকারণে অপরকে আঘাত করবার দুষ্প্রবৃত্তি থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে, তাদের জীবনে এবং ব্যবহারে যদি সুরুচির, শালীনতার এবং মাধুর্য্যের পরিচয় থাকে, তবে রবীন্দ্রনাথের বাণী তারা জীবনে গ্রহণ করতে পেরেছে বলে মনে হবে।

কি ভাষায় প্রণতি জানালে তাঁর স্মৃতির যোগ্য সমাদর হবে খুঁজে পাই নে। তিনি ছিলেন আমাদের গুরু—

শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাঁকে 'গুরুদেব' বলে ডাকবার রীতি ছিল, কিন্তু বহু লোকের মনোমন্দিরে তিনি গুরুরূপে পূজা পেয়ে আসছেন। তার কারণ তিনি আমাদের অনেকের জীবনকে প্রাত্যহিকতার গ্লানি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা, বাঙালীরা যে অর্থকে জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবতা বলে মনে করি নে, দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি ভাবাবেগ যে আমাদের মনে আলোড়ন জাগাতে পারে, যে-কোন প্রকারে নিজের স্বার্থসংসিদ্ধি যে আমাদের মনঃপূত হয় না—শিল্প, সঙ্গীত যে আমাদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করতে পারে—এই সব কারণেই ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা এক বিশিষ্ট জাতি। এই বৈশিষ্ট্য যদি আমাদের না থাকত তবে আমরা গতানুগতিক জীবনের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারতাম না—প্রতিদিনকার জীবন আমাদের নিকট একটি অখণ্ড আনন্দের মূর্ত্তিতে দেখা দিত না। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে যান্ত্রিক জীবনযাত্রার এই পৌনঃপুনিক আবর্ত্তন থেকে বাঁচিয়েছেন। এইখানে তিনি আমাদের গুরু। দেশের লোক আজকের দিনে এই ঋণ যদি স্মরণ করেন তবে তাঁদের উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে।

—

পুস্তক-পরিচয়

বিচিত্র মণিপুর—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড। ৮নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সচিত্র। মূল্য দুই টাকা।

এই ভ্রমণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। আমাদের ঘরের পাশেই মণিপুর, তাহার সম্বন্ধে কত কম খবর আমরা রাখি। মণিপুর হিন্দুরাজ্য, হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সব চেয়ে পূবের ঘাঁটি। এখানকার হিন্দুধর্ম্ম আমাদের বাঙ্গালা দেশের চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা অনুপ্রাণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বাঙ্গালার সঙ্গে একটা বিশেষ যোগসূত্রস্বরূপ বিদ্যমান। এ ছাড়া, বাঙ্গালার সংস্কৃতির অন্য প্রভাবও মণিপুরে পঁহুছিয়াছে। মণিপুরের প্রধান জাতি, রাজার জাতির ভাষা মেইতেই বাঙ্গালা লিপিতে লিখিত হয়, যদিও ভাষাটি আর্য্যগোষ্ঠীর নহে, ভোট বা তিব্বতী এবং বর্ম্মীর সগোত্রীয়। বাঙ্গালার পাশে হইলেও মণিপুরে যাওয়া সহজ নহে এবং ভারতীয় জগতের এক কোণে পড়িয়া আছে বলিয়া ইহার দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশও কাহারও নাই। এই ভ্রমণ-কথার লেখক মণিপুরে গিয়া নিজের চোখে যাহা দেখিয়াছেন তাহা আমাদের শুনাইয়াছেন। বইখানি পড়িয়া মনে হয়, লেখকের দেখিবার চোখ আছে, সরস করিয়া বলিবার শক্তিও তাঁহার আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে মেইতেইদের বৌদ্ধধর্ম্ম মিশ্র যে নিজস্ব ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি ছিল, তাহারই আধারের উপর ইহাদের আধুনিক হিন্দু সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। মণিপুর রাজ্য এতাবৎ কাল যাহাকে বলে unspoiled তাহা ছিল—অর্থাৎ অত্যধিক সভ্যতা-ব্যাধি-গ্রস্ত ছিল না। দেশটি সুন্দর, দেশের লোকেদের জীবন-যাত্রা সাবেক কালের, সরল এবং সহজ সৌন্দর্য্যে ভরপুর ছিল। নলিনীবাবুর বর্ণনা পড়িয়া আমার প্রতিপদে বলিদ্বীপের কথা মনে হইতেছিল। রাজধানী ইম্ফলের কথা খুঁটিনাটির সঙ্গে লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, মণিপুরের বিবাহ এবং মণিপুরের বিশিষ্ট নৃত্যের মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন, মণিপুরের ইতিহাসের কথা, রাজকুমার টিকেন্দ্রজিতের কথা শুনাইয়াছেন, আর আমার কাছে যা সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে মণিপুরের বিখ্যাত প্রণয়-গাথা রাজকুমারী থইবি ও বীর খাম্বার উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকের কাছে এই সুন্দর প্রেম-কাহিনীটি তিনিই প্রথম উপস্থাপিত করিয়াছেন। মোটের উপর মণিপুরের অনেক জ্ঞাতব্য কথা তিনি এই বইয়ে দিয়াছেন। বইখানির সার্থকতা এইখানে যে, তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া মণিপুর দেশ ঘুরিয়া আসিবার ইচ্ছা হয়।

মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় ইহা যে বিশেষ লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে (১) মইরাঙের কাহিনী, (২) সুখিন্ত কাপা, (৩) মণিপুরের ইতিবৃত্ত (৪) মণিপুর অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ভারতীয় জাতীয়বাহিনী—এই চারিটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। ফলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ এবং অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কথাগুচ্ছ—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স্ লিমিটেড, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

পুস্তকখানি খ্যাতনামা ছোটগল্প-লেখকদের রচনার সংগ্রহ। বাংলায় এইরূপ একটি কথা-সঙ্কলনের প্রয়োজন ছিল। এক যুগ পূর্ব্বে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া নিঃশেষিত হইয়া যায়। তার পর বহু সুসাহিত্যিক ভাল ছোট গল্প লিখিয়াছেন। কাজেই নূতন সংস্করণে সঙ্কলন নূতনতর এবং সম্পূর্ণতর হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ সমাজপতি, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, পরশুরাম, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির গল্প সঙ্কলিত হইয়াছে। অনুরূপা দেবী, শান্তা দেবী, সীতা দেবী, নরেশচন্দ্র, সৌরীন্দ্রমোহন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনাও ইহাতে আছে। তারাশঙ্কর প্রমুখ আধুনিক কথা-সাহিত্যিকগণের রচনাসম্ভারেও ইহা সমৃদ্ধ। গোড়ায় ভূমিকাস্বরূপ প্রমথ চৌধুরী লিখিত ছোট গল্প সম্বন্ধে একটি সুন্দর নিবন্ধ আছে। শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় লিখিত লেখক-পরিচিতিতে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। সম্পাদক ঠিকই লিখিয়াছেন, সকলের মাপকাঠি এক নয়। শ্রেষ্ঠ গল্পের নির্ব্বাচনে বিভিন্ন মতামত থাকিতে পারে। কিন্তু "কথাগুচ্ছ" সুসম্পাদিত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও, এরূপ সঙ্কলন বাংলা গল্প-সাহিত্যের দিঙ্-নির্ণয়ে সাহায্য করিবে বলিয়াই বলিতেছি, বিগত যুগের নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক এবং স্বর্ণকুমারী দেবী, নিরুপমা দেবী প্রভৃতি লেখিকার রচনা ইহাকে পূর্ণতর করিতে পারিত। "পরিচিতি"তে লেখকবর্গ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদান করা হইয়াছে। ১৯০৪ সালে নয়, ১৯০৩ সালে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যান এবং তাঁহার রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিবার তারিখ ১৯১৩ নয়, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। প্রভাতকুমারের জন্ম-তারিখ—নয় বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে; ১২৭০ সালে নয়, ১২৭৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতারিখ ষোল বৎসর আগাইয়া আসিয়াছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "সাধনা" সম্পাদন আরম্ভ করেন, কাজেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম সম্ভবপর নয়; ১৮৬৯ খ্রীঃ তাঁহার জন্মবৎসর। বহু সুলেখকের রচনা-সমৃদ্ধ "কথাগুচ্ছে"র গল্পগুলি পাঠকের আনন্দের কারণ হইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

"কালোর আলো"—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। দি ন্যাশনাল লিটারেচার কোং ১০৫ কটন ষ্ট্রীট। কলিকাতা।

নিষ্ঠুর আঘাত এবং নিবিড় দুঃখের মধ্য দিয়া মানুষের এক এক সময় দিব্যদৃষ্টি ফোটে, সুখের দিনে যে-কল্যাণকে অবহেলা করিল হঠাৎ তাহার সত্য মূল্য বুঝিতে পারে। ধনীর মেয়ে সিন্ধুর জীবনে লেখক এই সত্যটিকে রূপায়িত করিয়াছেন। স্বামী প্রফুল্ল পাড়াগাঁয়ে বড় ভাই আর ভ্রাতৃজায়ার স্নেহে মানুষ হইল—ভাল ছেলে, শহরে ধনীকন্যা সিন্ধুর

সহিত হইল তাহার বিবাহ। এর পর নবানুরাগের ঘোরের সঙ্গে সিন্ধুর কাঞ্চন-কৌলীন্যের দর্প মিলিয়া প্রফুল্লকে ধীরে ধীরে নিজের গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল। দাদা আর বৌদিদির নৈরাশ্য আর বেদনার কথা স্মরণ করিয়া প্রফুল্ল বধূকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ঘটনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিল।

এর পর প্রায় আকস্মিকভাবেই প্রফুল্ল মারা গেল, এবং তাহার পর কয়েকটি ঘটনায় সিন্ধু প্রকৃত স্নেহ আর দরদ কোথায় এবং স্ত্রীলোকের প্রকৃত অধিকার কোন্‌খানে সেটা বুঝিতে পারিয়া সন্তানদের লইয়া পিতার গৃহ ছাড়িয়া শ্বশুরের ভিটায় ভাশুরের সংসারে চলিয়া গেল।

প্রফুল্লর দাদা এবং ভ্রাতৃজায়ার বেদনাতুর স্নেহের চিত্রগুলি বড়ই করুণ। প্রফুল্লও মোটানার মধ্যে চরিত্রগত একটি সামঞ্জস্য বেশ রক্ষা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু গল্পের প্রথমাংশের দিকে, সিন্ধুবালার চরিত্রে কাঠিন্য বা উগ্রতাটা জায়গায় জায়গায় একটু অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে এবং শেষের দিকে তাহার পিতার সহিত ব্যবহারে অযথাই একটি নাটকীয় আড়ম্বর আসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা বইখানির তৃতীয় সংস্করণের সমালোচনা করিলাম। সর্ব্বসাকুল্যে বইখানি সুখপাঠ্য এবং বাঙালী-চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতার সহিত বেশ খাপ খাওয়াইয়া লেখা।

তেপান্তর—শ্রীচরণদাস ঘোষ। আর এইচ শ্রীমানী এণ্ড সন্স। ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা।

লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন মাসিক বসুমতীতে "শ্রী" নামে তাঁহার একটি গল্প প্রকাশিত হয়। তাহারঃপর হঠাৎ একদিন পড়িয়া দেখেন গল্পটিতে—"আরও অনেক কিছু বলবার কথা যেন বাকী রয়ে গেছে।" সেইজন্য গল্পটিকে একটি উপন্যাসে পরিণত করিয়াছেন।

গল্পটি পড়ি নাই, তবে লেখকের এ দুর্ম্মতি না হইলেই ভাল হইত। চরিত্র, ঘটনা, সবই এমন সামঞ্জস্যহীন যে, মনে হয় যেন একদল পাগলের কাণ্ড। কি উদ্দেশ্য লইয়া লেখক গল্পটি টানিয়া বাড়াইয়াছেন কিছু বোঝা গেল না।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নেতাজীর পথ ও গান্ধীজীর মত—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ষ্টাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী, ২১৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৮৪, মূল্য তিন টাকা।

লেখক তেরটি অধ্যায়ে এই পুস্তকে নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলন, ইসলামের আদর্শ ও পাকিস্থান, ভারতের গণ-আন্দোলন ও কংগ্রেস, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজীর ব্যক্তিগত সম্প্রীতি সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থকার নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। নেতাজী একদা মহাত্মার এবং কংগ্রেসের আনুগত্য স্বীকার করিলেও আজ তাঁহার মত ও পথ প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট সুস্পষ্ট। গান্ধীজীর নিকট অহিংসার আদর্শ স্বাধীনতা হইতেও অধিকতর কাম্য, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের আদর্শ হিংসাত্মক উপায়েও স্বদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জ্জন। বিগত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিতেছেন, ইহা সত্ত্বেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসকে আইন-সভায় প্রবেশ করাইয়া ও নেতাজী ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আজাদ হিন্দ সরকার ও সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া জনগণকে নূতন পথে চালাইতে ও নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। লেখক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, গান্ধীজীর প্রাণপণ চেষ্টায়ও ভারতে হিন্দু-মুসলমানকে এক করিতে পারে নাই, কিন্তু নেতাজী স্বীয় পন্থা অনুসরণ করিয়া এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন—তাঁহার মরণজয়ী আজাদ হিন্দ ফৌজই ইহার সাক্ষ্য। নেতাজী জীবিত কি মৃত তাহা লইয়া আজ বাদবিতণ্ডা চলিতেছে। আজ জাতির এই মহা দুর্দ্দিনে সুভাষচন্দ্রের আদর্শ দেশবাসীকে নূতন আলোক দেখাইতে পারে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মা-কালীর খাঁড়া—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানি—১০৫ নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

সেকালের প্রভাবশালী জমিদারের সঙ্গে মা-কালীর খাঁড়া নামধেয় দস্যুদলের সংঘর্ষ-কাহিনী লইয়া এই শিশু উপন্যাসখানি রচিত। ঝরঝরে ভাষায় প্রতিটি অধ্যায়ে রহস্যের জাল বুনিয়া লেখক শিশুচিত্তকে কুতূহলী করিয়া তুলিয়াছেন। এই ডাকাতের দলপতি অনেকটা রঘু ডাকাতের মত; দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই তাঁর ধর্ম্ম। কাহিনীর উত্তেজনা ছাড়া এই উপন্যাসে শিশুচিত্ত গঠনের উপযোগী শিক্ষাও আছে। পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়ায় বুঝা যায়, ইহা ছোটদের মনোরঞ্জন করিয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বর্গীয় পণ্ডিত রমানাথ চক্রবর্ত্তী-সঙ্কলিত এবং কলিকাতা ১২০।২ আপার সারকুলার রোড হইতে ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৪+২০০ মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

আলোচ্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থখানি ভারতীয় ঋষিগণের ভক্তিভাবপূর্ণ দেবদেবী মাহাত্ম্যের গ্রন্থসমূহের মধ্যে অতীব সমাদরের বস্তু। এই গ্রন্থ স্বকীয় গৌরবে হিন্দু সমাজের চিরপূজ্য। শ্রীমৎ ভাগবত, ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি জনসমাজে ভারতীয় ঋষিগণের ভক্তি ভাবধারা প্রকাশে অতি উপাদেয় নিদর্শন। অধুনা শক্তিতত্ত্ব আলোচনায় শিক্ষিত নরনারী মাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক। বহুদিন হইতেই নানা বিষয়ে বাঙালীদের দুর্ব্বলতা দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যাহাতে বাঙালীর দেহে, মনে ও হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয়ের উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে সে বিষয়ে সকলেরই অবহিত হওয়া অত্যাবশ্যক। যদি কেহ শ্রীশ্রীচণ্ডীর শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের দ্বারা এবং সর্ব্বহারা সুরথ-সমাধির শ্রেয়োলাভের ন্যায় বাঙালী জাতির কল্যাণের পথ মুক্ত করিতেন তবে এদেশবাসী দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান্ হইত। কেবল বাহুবলই বল নহে, মানসিক বল যথেষ্ট না থাকিলে বাহুবল পাশব বলের ন্যায় অনর্থকর ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর শক্তি-সাধনা এবং শিক্ষা একদা এদেশবাসীর পক্ষে অতীব ফলপ্রদ হইয়াছিল, নানা কারণে সেই শিক্ষা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। জাতির এই সঙ্কট-সময়ে আমি এই গ্রন্থখানির অভিনব সংস্করণ দেখিয়া ও আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বস্তুতঃই আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছি। সম্পাদক মহাশয় সকল বিষয়েই দৃষ্টি রাখিয়া এই সংস্করণটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে সুদীর্ঘ 'আলোচনা'য় এদেশে চণ্ডীপাঠের বিভিন্ন রীতি, মাতৃভাবে ভগবদারাধনা এবং চণ্ডীবিষয়ক বহুল জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন সূক্ত ও ষড়ঙ্গসহ মূল চণ্ডীর সরল বঙ্গানুবাদ এবং গ্রন্থশেষে বর্ণানুক্রমিক শ্লোকসূচী থাকায় গ্রন্থের গৌরব বাড়িয়াছে।

যাহাতে গৃহে গৃহে এই গ্রন্থখানি সমাদরে সংরক্ষিত ও পঠিত হয় তজ্জন্য যত্ন আমাদের সমাজ-মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বিদ্যাভূষণ শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা

পথের বাঁশী—কাজী আকরম হোসেন। ইতিকথা বুক ডিপো, কলিকাতা। পাঁচ সিকা।

কবি নানা দেশের সৌন্দর্য ও গৌরবের গান গেয়েছেন। প্রথম কবিতা 'জাহান আরার সমাধি'। তারপর আছে আগ্রা, বৃন্দাবন, বৈশাখের পদ্মা, চেরাপুঞ্জী, রুশিয়া, আরব প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ক কবিতামালা। বিষয় নির্বাচনে মানসিক ঔদার্য এবং রচনায় মার্জিত শ্রী প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা বাঙালী—কাজী আকরম হোসেন। ইতিকথা বুক ডিপো। দুই টাকা।

সরল প্রীতিকর কয়েকটি কবিতা। ভাব ও বিষয়বস্তু সাধারণ—ছাড়ী-বাড়ি, মসজিদ, কলের বাগান, ওকু ভাই প্রভৃতি। প্রকাশভঙ্গীতেও চমক লাগাবার কোন চেষ্টা নেই। সহজ সুরটি বেশ লাগে। আর ভালো লাগে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি বিপর্যয়ের দিনে, 'আমরা বাঙালী'—কবির এই স্বাভাবিক সুস্থ মনোভাব।

প্রথমা—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। ৩২-এ, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ভূমিকায় রচয়িতা "কবিতা কি"—এই প্রশ্নের আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে "কবি সব সময়েই সচেতন শিল্পী। আবেগের প্রেরণায় সে কখনও লেখে না।" আলোচ্য কবিতাগুলিতে "সচেতন" প্রয়াসের পরিচয় আছে, "আবেগের প্রেরণা" নেই।

ভক্তের ভগবান—পঞ্চতীর্থ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী। স্কুল সাপ্লাই কোং, সদর ঘাট, ঢাকা। মূল্য এক টাকা।

স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত ছেলেদের নাটক। চন্দ্রহাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমার দেশকে আমি ভালবাসি—শ্রীকান্ত কর। দি ন্যাশনাল লিটারেচার কোং, ১০৫ কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এই বইখানি ছাত্রগণের জন্য পারিতোষিক-গ্রন্থ রূপে নির্ব্বাচিত করিলে অভিভাবকগণ ভাবীকালের দেশসেবক গঠনে সহায়তা করিবেন। ইহার অনেকগুলি কবিতা ইতিপূর্ব্বে 'রংমশালে' প্রকাশিত হইয়াছিল। আশাবাদী কবির বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তি দেশের নূতন রূপ ধ্যান করিয়া তরুণগণকে কর্ম্মিষ্ঠ, বলীয়ান্ ও গণচেতনায় নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। ছন্দের মাত্রা ও যতিপ্রকরণের দিকে অধিক লক্ষ্য না রাখিয়া ভাবের আবেগ-প্রবণ গতিশীলতার সহিত তাল রাখিয়া কবি কবিতাগুলির শব্দ-চয়ন ও ছন্দবিন্যাস করিয়াছেন। এই সূক্ষ্ম ত্রুটি ছাড়িয়া দিলে কবিতাগুলি সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। রয়াল সাইজ, বোর্ড বাঁধাই ও উৎকৃষ্ট কাগজ ইত্যাদি দ্বারা বইটিকে ছাত্রদের পক্ষে লোভনীয় করা হইয়াছে।

অন্ধকারের আফ্রিকা—ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস। পর্য্যটক প্রকাশনা ভবন, ১৬।১এ আয়পুলি লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৪০, মূল্য আড়াই টাকা।

রামনাথ বিশ্বাস প্রমুখ কয়েক জন বাঙালী বাহিরের দুনিয়া সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জ্জনোদ্দেশ্যে একরূপ বিনা সম্বলে ভূপর্য্যটন দ্বারা বাঙালীর সুনাম বৃদ্ধি করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া ও নির্য্যাতিত মানবের প্রতি অভেদ-উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিশ্বাস মহাশয় গভীর দরদের সহিত দুনিয়ার হালচাল লক্ষ্য করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা 'ভয়ংকর আফ্রিকা' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থ পূর্ব্ব আফ্রিকা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মান ইষ্ট-আফ্রিকা ব্রিটিশ ইষ্ট-আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত একটি দেশে পরিণত হয়। গ্রন্থকার প্রথমে কেনিয়া প্রদেশস্থ মোম্বাসা হইতে আরম্ভ করিয়া টাঙ্গার পথে লবঙ্গের দেশ জাঞ্জিবার, তথা হইতে টাঙ্গানিয়াকার রাজধানী দার-এ-সালাম হইয়া অরণ্য-পথে ঘুরিয়া ডাসালেও পর্য্যন্ত তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী শেষ করিয়াছেন। প্রথমে আরব, পরে বুয়র ইংরেজ-প্রমুখ পাশ্চাত্য জাতির হস্তে পশুবৎ নিগৃহীত নিগ্রোদের দুর্দ্দশার কাহিনী লিখিতে বসিয়া আফ্রিকাবাসী কোন কোন ভারতীয়ের সম্বন্ধে এক অতি সত্য কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—'এক ঘৃণিত আর ঘৃণিতকে ঘৃণা করে।' ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে বর্ত্তমানের আফ্রিকা প্রাচীন কালের আর্য্য এবং অনার্য্যদের প্রতি বর্ণসঙ্কর ভীতিজনিত সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পুনরাবৃত্তির পটভূমিকায় দণ্ডায়মান। নবীন শ্বেতাঙ্গ আর্য্যগণকে প্রাচীন আর্য্যগণ অপেক্ষা অধিক উদারভাবাপন্ন কল্পনা করা দুরাশা।

হাসি আর নক্সা—শ্রীপঞ্চানন্দ ভট্টাচার্য্য (বহ্ম্রানন্দ শর্ম্মা)। আরতি এজেন্সি, ১মং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চৌদ্দ আনা।

হাসির কবিতার বই। কয়েকটি কবিতা চিত্রিত করা হইয়াছে। ছোট কবিতাগুলি উপভোগ্য ও সরস হইয়াছে। দীর্ঘ কবিতা-গুলিকে কবিতায় হাসির গল্প বলা চলে। এরূপ দীর্ঘ কবিতা হাস্য-রসের কবিতায় অচল।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

বাংলার সাধনা—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল সরস লোক-রঞ্জক ভঙ্গীতে ভারতীয় চিন্তা-ধারায়, বিশেষ করিয়া ধর্ম্মে ও দর্শনে

—বাঙালীর দানের ও তাহার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের মতে বাংলার যোগী, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও বাউলদের মধ্যে যে কায়াসাধনা—উপাস্য-উপাসকের যে ঘনিষ্ঠ মানবীয় সম্বন্ধ ও প্রেমভক্তির প্রচলন রহিয়াছে তাহার মধ্যেই বাঙালীর বৈশিষ্ট্য নিহিত। এই দিক দিয়া বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসের বিশেষ কোনও আলোচনা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। তাই এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গ্রন্থকার বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এ বিষয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ ও বিস্তৃততর আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

হে বীর পূর্ণ কর—শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান, ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

"হে বীর পূর্ণ কর" যুগোপযোগী জাতীয়তামূলক নাটক। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়া বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহ নাটকীয় দ্রুততায় আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধ বাংলাদেশের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া আমাদের সমাজ-জীবনকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই অশুভ পরিস্থিতির মধ্যেই নব নব ভাববিপ্লব এবং আদর্শ-সভ্যাতের ভিতর দিয়া জাতি স্থির লক্ষ্যে, অনমনীয় দৃঢ়তায় মুক্তি-পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সমালোচ্য নাটকের 'শঙ্কর' আর 'অশোক' সেই মুক্তি-পাগল তরুণ বাংলারই প্রতীক। মৃত্যুপথযাত্রী সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের মর্ম্মস্থল মথিত করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে পরাধীনতার বিষে জর্জ্জরিত, নিপীড়িত বাংলার মর্ম্মবাণী—"এ রক্ত আমার বুক থেকে উঠছে না, এ রক্ত উঠছে দেশের বুক থেকে; জাতির হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে। আমি যে বাণী পৌছে দিতে পারলাম না, যে কাজ শেষ করতে পারলাম না—তোমরা তাই করো, তোমরা সে অসমাপ্ত বাণীকে পৌছে দিও—গ্রাম থেকে গ্রামে, সারা বাংলায়, সারা দেশে..."

শঙ্কর তাহার আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার আসন কি শূন্য পড়িয়া থাকিবে? কোন্ সে মহাবীরের জন্য সমগ্র দেশ প্রতীক্ষমাণ যিনি সে আসন পূর্ণ করিয়া বাংলা, তথা সমগ্র ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে অদূর ভবিষ্যতে জয়যুক্ত করিয়া তুলিবেন।

মন্মথকুমারের কৃতিত্ব এইখানে যে উদ্দেশ্যমূলক হইলেও নাটকখানি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কণ্ঠে নানা আদর্শের জয়গানই উদ্গীত হইয়াছে কিন্তু কোন মতবাদের প্রতিই নাট্যকারের অত্যাসক্তি প্রকাশ পায় নাই—নিরপেক্ষ দর্শকের মতই তিনি নিরাসক্ত। আর অপূর্ব্ব তাঁহার সংলাপ—তাহা ভাবাবেগে উদ্দীপ্ত, আবেগমুখর অথচ সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য এবং উচ্ছ্বাসবর্জ্জিত। এই সংলাপ-রচনার কৌশলই 'হে বীর পূর্ণ করো'কে অতি-নাটকীয়তা এবং প্রচারধর্ম্মিতার অপঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই নাটকের আর একটি আকর্ষণ মৃণালকান্তি দাশ রচিত গীতাবলী। নাটকখানিতে সংলাপ ও সঙ্গীতের মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছে। অল্প কালের মধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ভ্রম-সংশোধন

গত কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে 'নিশায় স্বপন' নামক পুস্তকের সমালোচনা শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় কৃত নহে, সমালোচনা করিয়াছিলেন শ্রীতারাপদ রাহা।

দেশ-বিদেশের কথা

মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞানের অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ মনোবিদ্ ও মনঃসমীক্ষক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ৯ই নবেম্বর তারিখে ৩০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অধ্যাপক মন্মথনাথ ভারতবর্ষে এবং ভারতীয়-

মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গণের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় অগ্রণীদের অন্যতম ছিলেন; বস্তুতঃ তিনিই এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম M.Sc—ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের দ্বারা বৃত্তিনির্বাচন (Vocational Selection) ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের যে কত উন্নতি হইতে পারে সে বিষয়ে তিনিই প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা আংশিকভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হয়। ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সমিতি ও তৎসংলগ্ন মানসিক চিকিৎসালয়ের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; সূচনা হইতেই তিনি এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার সুধীমহলে সুপরিচিত হইয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডের 'নেশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সাইকোলজি'র তিনি 'অনারারী করেস্পণ্ডেণ্ট' ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে মনোবিজ্ঞানের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

সামাজিক জীবনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান্ সত্যাশ্রয়ী আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে দীক্ষিত হইলেও সংস্কৃত দর্শন, যোগ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

বি. এল. ঘোষ

সুবিখ্যাত টস এণ্ড সন্স নামক চা কোম্পানির স্বত্বাধিকারী মিঃ বি. এল. ঘোষ বিগত ২৮শে নবেম্বর তারিখে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অল্প বয়সেই তিনি ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। টস এণ্ড সন্স কোম্পানীর

সাফল্যের মূলে রহিয়াছে তাঁহারই ব্যবসায়বুদ্ধি এবং কর্ম্মশক্তি। তিনি সঙ্গীত এবং খেলাধূলায়ও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেও তাঁহার দানের পরিমাণ কম ছিল না।

অধ্যক্ষ ভুবনমোহন সেন

বিগত ২১শে অক্টোবর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ অধ্যক্ষ ভুবনমোহন সেন মহাশয় খুলনায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে

অধ্যক্ষ ভুবনমোহন সেন

এম. এ. ডিগ্রি লাভ করিয়া তিনি কলিকাতা সিটি কলেজে যোগদান করেন। সেখানে আট মাস অধ্যাপনা করিবার পর তিনি আসাম শিক্ষা-বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং গৌহাটি কটন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ছাত্রজীবনে এবং উত্তরকালে অধ্যাপকরূপে তিনি ডক্টর এইচ. সি. মুখার্জ্জি, পরলোকগত জে. এন. দাশগুপ্ত এবং হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। আসামেই তাঁহার কর্ম্মজীবনের সুদীর্ঘ একত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হয়।

অধ্যক্ষ সেন একজন সুরসিক, স্বিপ্রভাষী বক্তাও ছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। ইতিহাস এবং রাজনীতি এই উভয় বিষয়েই তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। বিভিন্ন ইংরেজী বাংলা এবং অসমীয়া পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধসমূহ চিন্তাশীল মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। আসামের ইতিহাস-ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী। অধ্যাপক আর. সি. গফিনের সহযোগিতায় লিখিত তাঁহার *Stories from Assamese History* নামক পুস্তকখানি আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার 'Rock-bottom of Communalism and Rewriting of History' নামক প্রবন্ধটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। তা ছাড়া তিনি অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গৌহাটিতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। খেলাধূলায়ও অধ্যক্ষ সেনের বিশেষ উৎসাহ ছিল।

বাংলার ব্যাঙ্ক

সম্প্রতি বাঙালীর ব্যাঙ্কের উপর 'রান' অর্থাৎ একসঙ্গে টাকা তোলার হুজুগ হইয়াছিল, কিন্তু মোটে তিনটি ছোট ব্যাঙ্ককে লেনদেন বন্ধ করিতে হইয়াছে। লালা হরকিষণ লাল শিল্প কমিশনের সমক্ষে বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের পিপলস্ ব্যাঙ্ক যখন 'ফেল' হয় তখন লাহোরে কোন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীর বাড়ীতে ভোজে আনন্দপ্রকাশ করা হয়। পরে জানা যায় এই কর্ম্মচারী পঞ্জাবের লাট ছিলেন। এবারও শুনা যাইতেছে ইংরেজ-পরিচালিত কোনও কোনও ব্যাঙ্ক ভিতরে ভিতরে প্রচারকার্য্যের দ্বারা এই 'রান' করাইয়া দিতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মিঃ ভার্গব বলিয়াছেন, কয়েকটি ব্যাঙ্ককে অনিয়মের জন্য 'দোষী'র তালিকায় বহু পূর্ব্বে ফেলা হইয়াছে। এই তালিকা ব্যাঙ্কের ব্যবহারের জন্য, অথচ হঠাৎ ইহা এই সময়ে সাধারণের মধ্যে কেন প্রচারিত হইতেছে তাহা তিনি জানেন না। কোনও ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ অবস্থা খারাপ হইলে এক সঙ্গে টাকা তোলায় উহা একেবারে নষ্ট হইবে, বরং কিছু সময় পাইলে ক্ষতিপূরণ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। যে ব্যাঙ্কের টাকা নিরাপদ ভাবে লগ্নি করা হইয়াছে এক সঙ্গে টাকা দিতে হইলে তাহাকেও বিপন্ন হইতে হয়। সুতরাং এই ভাবে টাকা তোলা কোনও দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য নহে। জাতীয়তাবাদী প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্র ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু টাকা তুলিতে নিষেধ করায় হিড়িক মন্দীভূত হয়। ইংরেজ বণিকসমাজের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' ২৮শে নবেম্বর তারিখে এমন সব কথা লিখিয়াছেন যাহাতে বাঙালীর ব্যাঙ্কের উপকার না হইয়া অপকার হইতে পারে। ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত দোষীর তালিকার কথা উল্লেখ করেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই মিঃ ভার্গবের অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙালী হিন্দুর ব্যাঙ্কে আশী কোটি টাকা গচ্ছিত রহিয়াছে। ইহার জোরে ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশে বাঙালী কয় বৎসরে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। ইংরেজের অনেক পাটকল, লোহের কারখানা মাড়োয়ারীরা কিনিয়া লইয়াছে। বাঙালী যাহাতে এই সময় পিছাইয়া না পড়ে সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। মহাজনী আইন ও চাবীখাতক আইন করিয়া লীগ সচিব-সঙ্ঘ বাঙালী হিন্দুর এক শত কোটি টাকা আটকাইয়া রাখিয়াছে। এখন আশী কোটি টাকা নষ্ট করিবার জন্য বিদেশীদের অপচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীগিরেশর চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রা
শ্রীঅনিল পাল

একক পল্লী পরিভ্রমণ কালে গান্ধীজীর একটি সাঁকো অতিক্রমণ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৫৩ | ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ৬ই জানুয়ারী নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে—

"নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির ২২শে ডিসেম্বরের প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছে। উহাতে যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে কমিটি তাহার সহিত একমত।

কংগ্রেস সর্বদাই ফেডারেল কোর্টের রায় মানিবে বলিয়া জানাইয়াছে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের স্পষ্টোক্তির পর ফেডারেল কোর্টে যাওয়া নিরর্থক। উভয়-সম্মত সিদ্ধান্ত হইলে এবং সকলে ফেডারেল কোর্টের রায় মানিতে প্রস্তুত হইলেই শুধু উহাতে যাওয়া চলে।

কমিটির বিশ্বাস যত দূর সম্ভব মতৈক্যের ভিত্তিতেই স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রবিধি রচিত হওয়া উচিত। এই কার্যে বাহিরের হস্তক্ষেপ অথবা কোন প্রদেশ কর্তৃক অপর প্রদেশের উপর জোর খাটানো চলিবে না। ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মের প্রস্তাবে আসাম, সীমান্ত প্রদেশ এবং শিখদের যে অসুবিধায় ফেলা হইয়াছে কমিটি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন, ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণায় এই অসুবিধা আরও বাড়ানো হইয়াছে। এই সব অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের ঘাড়ে কোন কিছু বলপূর্বক চাপাইয়া দিতে গেলে কমিটি কখনও তাহা সমর্থন করিতে পারে না; ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নিজেও বল-প্রয়োগের নীতি অন্যায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

কমিটির ইচ্ছা গণ-পরিষদ দেশের সর্বদলের শুভেচ্ছা লইয়া স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রবিধি রচনা করিতে থাকুক। বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা দ্বারা যে মতবিরোধ চলিতেছে তাহার অবসান ঘটাইবার জন্য কমিটি ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সেকসনের কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা মানিয়া লইবার পরামর্শ দিতেছেন।

তবে একথা স্পষ্ট ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে এরূপ করিতে গিয়া কোন প্রদেশের উপর জোর খাটান বা পঞ্জাবের শিখদের স্বার্থবিরোধী কাজ যেন না ঘটে। জোর খাটাইতে গেলে কোন প্রদেশ বা উহার অংশ বিশেষের স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার অধিকার থাকিবে। ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর উপর কার্যপদ্ধতি নির্ভর করিবে, সুতরাং কমিটি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাসময়ে যথোপযুক্ত পরামর্শ দেওয়ার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে নির্দেশ দান করিতেছে।"

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উক্ত প্রস্তাবে আসাম, সীমান্ত প্রদেশ এবং শিখদের বিশেষ অসুবিধায় ফেলা হইয়াছে ইহা তাঁহারাই বলিয়াছেন কিন্তু বাংলায় জাতীয়তাবাদের কি অবস্থা হইবে একথা কেহ ভাবেন নাই, বলেনও নাই। আমাদের প্রতিনিধিরূপে যে মহাশয়গণ উক্ত কমিটিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই বলা বাহুল্য। সুতরাং যদি কংগ্রেসের এই "চাল ফেরত" করায় ফলে পাকিস্থানপন্থীদিগের পথ খুলিয়া যায়— যাহা মোটেই অসম্ভব নহে— তবে বাঙালী হিন্দুর মৃত্যুদণ্ড একতরফা ডিক্রী হিসাবেই হইবে।

আসামের কর্তব্য কি সে বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টই নির্দেশ দিয়াছেন :—

"আমি বরদলৈকে বলিয়াছি যে কংগ্রেস কমিটি কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ যদি না দেয় তবে আসাম যেন সেকসনের বৈঠকে যোগদান না করে। প্রতিবাদ জানাইয়া আসাম যেন গণ-পরিষদ হইতে বাহির হইয়া আসে। কংগ্রেসের মঙ্গলের জন্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইহা সত্যাগ্রহ-স্বরূপ হইবে। আসাম যদি নীরব থাকে তবে তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত মুছিয়া যাইবে। আসাম যাহা চায় না তাহাকে দিয়া জোর করিয়া উহা করাইয়া লওয়ার অধিকার কাহারও নাই। আসাম বর্তমানে অনেকাংশে স্বাধীন। তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও আত্মকর্তৃত্ব-সম্পন্ন হইতে হইবে। সে সাহস ও দৃঢ়তা আপনাদের আছে কি না আমি জানি না। আপনারাই তাহা বলিতে পারেন। আপনারা এ কথা জোর গলায় বলিতে পারিলে চমৎকার হইবে। গণ-পরিষদ সেকসনে বিভক্ত হইলেই আসাম যেন বলিতে পারে—'ভদ্রমহোদয়গণ, আসাম বিদায় গ্রহণ করিল'। একমাত্র এই পথেই ভারতের স্বাধীনতা আসিবে। প্রত্যেকটি প্রদেশ যেন স্বাধীন ভাবে কর্তব্য নির্ধারণ ও কাজ করিতে পারে।"

গান্ধীজী আসামকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে স্বাধীনতার পথনির্দেশ অতি স্পষ্ট রহিয়াছে। বাংলার কংগ্রেস নেতৃবর্গ কি বাঙালীর স্বাধীনতা দানপত্র লিখিয়া লীগ দলের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন? তাঁহাদের কর্তব্য তো স্পষ্ট। এখন প্রত্যেক কংগ্রেসপন্থীকে প্রস্তুত হইতে হইবে তাহাদের আদর্শের জন্য মরণ পণ যুঝিতে। পাঞ্জাবে শিখেরা চাহিতেছে তাহাদের পিতৃভূমি স্বরূপে কয়টি জেলাকে পৃথক করিয়া এক ভিন্ন প্রদেশ গড়িতে। বাংলায় এখন প্রয়োজন ঐরূপ আন্দোলনের, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ফাঁকা যুক্তিতর্কের দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন জীবন-মরণ সমস্যা। শিখেরা তাহাদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রস্তুত হইতেছে তাহা নিম্নলিখিত সংবাদেই দেখা যাইতেছে:

"গত ১১ই জানুয়ারী অমৃতসরে শিখদের প্রতিনিধি পন্থিক বোর্ড ওয়ার্কিং কমিটি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির ৬ই জানুয়ারীতে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

"প্রতিনিধি পন্থিক বোর্ড ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ১৯৪৬, ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি সম্পর্কে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে সম্যক্ বিবেচনা করিয়াছেন। কমিটি অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের ফলে শিখদের অবস্থা ভয়ানক খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।

কমিটি পন্থকে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন এবং এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য ১৯৪৭ সনের ২৬শে জানুয়ারী সকাল ১১টার সময় জেনারেল কমিটির একটি বিশেষ সভা আহ্বান করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শাসনতন্ত্র গঠনে শিখদের অভিমত গ্রহণ করে তাহাদের দাবি সমর্থনের যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল তাহা পূরণ করিতে কমিটি কংগ্রেসকে আহ্বান করিতেছেন।"

লীগ আত্মনিয়ন্ত্রণের দোহাই দিয়া ভারতের স্বাধীনতার পথ কণ্টকময় করিয়া তুলিয়াছে। এই অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদী এবং এক দল চক্রান্তকারীও তাহাদের সহযোগিতা করিতেছে। অথচ ভারতে আত্মনিয়ন্ত্রণের যুদ্ধ আরম্ভ করিল বাঙালী, সেই যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক বলি দিল বাঙালী, কিন্তু হিসাব-নিকাশে সম্পূর্ণ ফাঁকিতে পড়িল সেই বাঙালী। সোভিয়েটের এক অংশে ৫০ হাজার লোকের জনসমষ্টিরও স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পাকিস্থানে আড়াই কোটি জাতীয়তাবাদী বাঙালীর দাসত্ব ভিন্ন অন্য ব্যবস্থা নাই। সোভিয়েটে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও ভুল ধারণা যাঁহাদের আছে তাঁহারা বর্তমান বৎসরের রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে অনেক নূতন তথ্য পাইবেন।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্মেলনে সভাপতি অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক সমতার সহিত যাঁহারা সোভিয়েটের রাষ্ট্রবিধি ও উহার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতার তুলনা করেন, তাঁহারা সোভিয়েট রাষ্ট্রবিধির মূল তত্ত্বই বুঝিতে পারেন নাই। সোভিয়েট শাসনপ্রণালীতে কমিউনিষ্ট পার্টির অধিকার কতখানি তাহাও তাঁহাদের জানা নাই। রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টি একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল, পার্টির সমস্ত ক্ষমতা নেতাদের হাতে সীমাবদ্ধ, নেতাদের আদেশে নির্দেশে বা অনুরোধেই সকলকে চলিতে হয় এবং এই নেতারাই রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন। গবর্ন্মেণ্ট পরিচালনে এইটিই সবচেয়ে বড় কথা। সিডনি এবং বিয়েট্রিস ওয়েবও তাঁহাদের বিখ্যাত গ্রন্থ "সোভিয়েট কমিউনিজমে" বলিয়াছেন, কমিউনিষ্ট পার্টি শাসন-যন্ত্র কতখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহার পরিমাপ করা দুরূহ, তবে ইহা ঠিক যে রাশিয়ার কুড়ি বা ত্রিশ লক্ষ লোকের এই দলটি সর্বহারাদের বিবেক রক্ষকরূপে রাষ্ট্র পরিচালনায় সকল দায়িত্ব করায়ত্ত করিয়াছে। ষ্টালিন নিজেও বলিয়াছেন, "সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বা গঠনমূলক সমস্যাই পার্টির নির্দেশ না লইয়া মীমাংসা করা হয় না। এই হিসাবে সর্ব-হারাদের ডিক্টেটরশিপকে আমরা পার্টির ডিক্টেটরশিপ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। পার্টিই সর্বহারাদের নিয়ন্তা।" অটোক্র্যাটকে ভক্তি করা রুশ জনসাধারণের স্বভাবসিদ্ধ, যাঁহাকে তাহারা পূজা করে, সাধারণ লোকের এই মনোভাবের পূর্ণ সদ্ব্যবহার গবর্ন্মেণ্টের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ব্যক্তিরা পূর্ণ মাত্রায় করিয়া থাকেন। লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁহাকে প্রায় ঈশ্বরের দূতের পর্যায়ে তুলিয়া ধরা হয়, তাঁহার রচনাবলীকে পবিত্র রচনা বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং বলা হয় যে উহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে কিন্তু প্রতিবাদ চলিবে না। রাশিয়ার ১৬ কোটি লোক যাহাকে অন্ধভাবে ভক্তি করিতে পারে লেনিনের মৃত্যুর পর এমন একজনকে খাড়া করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। দলের নেতারাই ঠিক করিলেন যে, ষ্টালিনকেই দলের, রাষ্ট্রের এবং সর্বহারাদের অদ্বিতীয় নেতারূপে দাঁড় করানো হইবে। তাঁর ছবি ও আবক্ষ ছোট ছোট মূর্তি লাখে লাখে বিতরণ করা হইল, মার্কস ও লেনিনের ছবির পার্শ্বে উহার স্থান করিয়া দেওয়া হইল। সোভিয়েট শাসনপদ্ধতির সহিত অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে বলিয়াই এই কথার উল্লেখ করা হইতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের স্থান কি তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে মূল রাশিয়ার আয়তন ও লোকসংখ্যার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে মূল রাশিয়ার আয়তন শতকরা ৯০ ভাগ এবং লোকসংখ্যা অর্ধেকের বেশী।

এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে নামেই সোভিয়েট ইউনিয়ন "স্বতঃপ্রণোদিত ইউনিয়ন" এবং অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারও কাগজেপত্রেই সীমাবদ্ধ। অতঃপর অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝাইয়া দেন যে, এই কথা বলিতে গিয়া তিনি সোভিয়েটের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের সংস্কৃতি রক্ষার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে ছোট করিয়া দেখাইতে চাহেন না। এই অধিকার তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবেই দেওয়া হইয়াছে এবং আন্তরিকতার সহিত পালন করা হইতেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিতে যদি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া সংস্কৃতি রক্ষা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ ক্ষমতা বুঝায় তবে এ দেশেও অনায়াসে এই ধরণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার দেওয়া যাইতে পারে।

পদব্রজে গান্ধীজীর গ্রাম পরিক্রমা

নগ্নপদে একটি যষ্টি মাত্র সম্বল করিয়া গান্ধীজী একাকী নোয়াখালীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রোষহীন, ক্ষোভহীন, ভয়লেশহীন অন্তরে সকল মানসিক বিকার মুক্ত গান্ধীজী বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহার সাধনার চরম পরীক্ষা করিতে চলিয়াছেন। গান্ধীজীর ডাণ্ডী যাত্রার সহিত এই যাত্রার পার্থক্য অনেক। তাঁর এই অভিযান দেশবাসীর প্রতি সরকারের কোন অবিচারের প্রতিবাদে নয়, ইহার মূলে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। যে বলিষ্ঠ অহিংসা গান্ধীজীকে অমিত শক্তির অধিকারী করিয়াছে তাহার স্পর্শে সাধারণ লোকের মনের ভয় ও পারস্পরিক অবিশ্বাস দূরীভূত করিয়া স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা তাঁহার লক্ষ্য। এক দলের হিংসা ও অপর দলের কাপুরুষতা দূর করাই সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এই বিশ্বাসে গান্ধীজী নিজেকে এবং নিজের অনুসৃত অহিংসার চরম পরীক্ষা করিতে চলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নোয়াখালীর গ্রাম পরিক্রমার তাৎপর্য অপরিসীম। এ কথাই গান্ধীজী কয়েক দিন আগে এক নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পল্লীর পথে পায়চারি করিতে করিতে তাঁহার এক অন্তরঙ্গ সঙ্গীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। গান্ধীজী তাঁহাকে বলেন,

"এবার আমার পরীক্ষা বড় কঠোর; আমার দায়িত্ব অসীম। পূর্বে আমি যত বার সত্যাগ্রহ করিয়াছি, প্রতিবারই আমার সমক্ষে একটা সুস্পষ্ট অন্যায়ের প্রতিমূর্তি ছিল। সরকারের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ ছিল, আমি সেই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যই অহিংস সংগ্রাম করিয়াছি। সেই সংগ্রামে আমি পুরোভাগে গিয়া দাঁড়াইলেও আমার পাশে চতুর্দিক হইতে আমার নিগৃহীত দেশবাসীরা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"আমি ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলেও ইহাদের সান্নিধ্য আমাকে অনেক সান্ত্বনা ও শক্তি যোগাইয়াছে কিন্তু আজ আমি যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছি তাহার রূপ সম্পূর্ণ অন্য। আমি সরকার-অনুষ্ঠিত কোন অবিচারের প্রতিকার করিতে যাইতেছি না। কাহারও বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নাই। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব আমি সারাজীবন যে অহিংসার সাধনা করিয়া আসিয়াছি সেই অহিংসা দ্বারা আমি মানুষের মনের অমানুষিকতা দূর করিতে পারি কিনা। মানুষে মানুষে যে হানাহানি, মানুষে মানুষে যে হিংসা-দ্বেষ, মানুষ হইতে মানুষের যে ভয়, বিরাগ সেই বিকার মানুষের মন হইতে দূর করিতে আমার অহিংসা কতটা কার্যকরী আমি জীবন-সায়াহ্নে তাহাই যাচাই করিয়া যাইব। এ কাজ দলে মিলিয়া করার নয়, কাজেই আমাকে একাই এই পরীক্ষা করিতে হইবে। তাই আজ আমি একা চলিয়াছি, আজ আমার পশ্চাতে আমার পাশে শতসহস্র অনুচরের প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র ঈশ্বরের দেওয়া শক্তির উপরই আমাকে নির্ভর করিতে হইবে। তাই আমাকে জনগণের মাঝে অগ্রসর হইতে হইবে হিংসা-দ্বেষ বিমুক্ত অন্তর লইয়া। আমার অন্তরে কোন কলুষ থাকিলে আমার সাধনা ব্যর্থ হইবে। তাই আমি দীন-ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি যেন আমার মন হইতে সকল কালিমা দূর করেন, আমার আত্মায় যেন তিনি শক্তি দান করেন।

"ইহাই আমার তীর্থযাত্রা। সকল সংস্কার-মুক্ত হইয়া সর্বস্ব দান করিতে করিতে দীনভাবে নগ্নপদে তীর্থস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়াই ভারতের তীর্থযাত্রার আদর্শ। তাই আজ আমি নগ্নপদে চলিয়াছি আমার তীর্থ-পরিক্রমায়।"

এক দিকে কাপুরুষতা অপর দিকে হিংসার মহাপঙ্ক হইতে মানুষকে উপরে টানিয়া তুলিবার জন্যই গান্ধীজীর এই অভিযান। তাঁহার ধারণা সফলতা বা বিফলতা কোন কার্যেরই চূড়ান্ত কষ্টিপাথর নহে, সিদ্ধিলাভের জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে ইহাই হইল কার্যের একমাত্র খাঁটি কষ্টিপাথর।

নোয়াখালীর হাঙ্গামার মুল কারণ পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা

নোয়াখালীতে মাসিমপুরে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যখন 'রামধুন' গীত হইতেছিল তখন একদল মুসলমান সভাক্ষেত্র হইতে উঠিয়া চলিয়া যায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া গান্ধীজী জানিতে পারেন যে রামনামে তাঁহাদের আপত্তি আছে। ঐ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া তিনি বলেন—

"আমি জানিতে পারিলাম যে, প্রার্থনায় রামনাম লওয়া হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। মুসলমানরা রাম-নাম পছন্দ করেন না। ইহার জন্যও আমি আনন্দিত। কারণ ইহার দ্বারা আমার অবস্থাটা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। মুসল-মানরা ভাবেন, ভগবানকে একমাত্র 'খোদা' নামেই অভিহিত করা যাইতে পারে। গত অক্টোবর মাসে নোয়াখালীতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে পরধর্মের প্রতি এই অসহিষ্ণুতা। হিন্দুরা সংখ্যালঘু হইলেও তাঁহাদের জানা প্রয়োজন যে, যিনি রাম, তিনিই খোদা। ইউরোপীয়রা বলেন, 'গড', হিন্দুরা বলেন, 'রাম' এবং অন্যান্যরা অন্যান্য নামে ভগবানকে অভিহিত করেন। আমি শুনিয়াছি পাকিস্থানে সকলেই স্ব-স্ব ধর্ম অনুসরণ করিতে পারিবে। নিজের ধর্ম পালনে কাহাকেও বাধা দেওয়া হইবে না। কিন্তু এখানে আমি আজ যাহা দেখিলাম, তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এখানে হিন্দুদিগকে হিন্দুত্ব ভুলিয়া ভগবানকে খোদা বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। সকল ধর্মই সমান। বিভিন্ন ধর্ম বৃক্ষের বিভিন্ন পত্র। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতিতে কোন বিরোধের কারণ থাকিতে পারে না।"

এই অসহিষ্ণুতার এখানেই শেষ হয় নাই, লীগ পত্রিকায় ইহা লইয়া তীব্র সমালোচনা করিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে

যে গান্ধীজী মুসলমানদের অবতারবাদ শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রামধুনের মধ্যে অবতারবাদ বা পৌত্তলিকতার পরিবর্তে গান্ধীজী উহার মূলগত একেশ্বরবাদই ফুটাইয়া তুলিতেছেন, সুতরাং ইহাতে মুসলমানদেরও কোন আপত্তি থাকিবার সঙ্গত কারণ নাই।

জগৎপুরের প্রার্থনা-সভাতেও এই পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার কথা আলোচিত হয়। গান্ধীজী বলেন,—

"আমি কিছুদিন ধরিয়া শুনিতেছি যে, মুসলমানরা যদি হিন্দুদের বলে 'তোমাদের ধনপ্রাণ বাঁচাইতে হইলে ইসলাম গ্রহণ কর' আর সেই কথা শুনিয়া হিন্দুরা যদি মুসলমান হয় তবে তাহাকে বলপ্রয়োগ বা চাপ দিয়া ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা বলা চলে না। আমি এই উক্তির সত্যাসত্য সম্পর্কে কিছু বলিতে চাই না, এমন কি সেকথা মুহূর্তের জন্যও ভাবি না। তবে আমি এ কথা বলিব যে, এসকল ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শনই ইসলাম গ্রহণের কারণ। কিন্তু প্রকৃত ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশী আত্মিক শক্তির প্রয়োজন হয়। এই ধরণের কথা শুনিলে স্বতই সেইসব তথাকথিত খ্রীষ্টান প্রচারকদের কথা মনে পড়িয়া যায় যাঁহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল হইতে অনাথ শিশুদের কিনিয়া আনিয়া খ্রীষ্টান হিসাবে লালনপালন করিতেন। এটাকে কোনমতেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ বলা চলে না। সুতরাং বৈধ ও প্রকৃত ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রত্যেককে বিশ্বাসের স্বাধীনতা দিতে হইবে। জোর করিয়া ইসলামে প্রকৃত দীক্ষা দেওয়া যায় না। তাহার উপর সত্যকারের দীক্ষা লাভের জন্য দীক্ষার্থীর পক্ষে নিজ ধর্ম ও নূতন ধর্ম উভয়েরই সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমার সামনে যে সকল শিশু ও নরনারীকে দেখিতেছি তাঁহাদের এইভাবে ধর্মান্তর গ্রহণের সম্ভাবনা দেখি না। ধর্মান্তরকরণের রীতিতে আমার বিশ্বাস নাই। আমি নিজে হিন্দু কিন্তু এই কারণে বন্ধুদের হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে বলি না।"

তারপর তিনি বলেন, "আমার কর্মব্যস্ত জীবনে মুসলমান সাধকদের লেখা ইসলামের ইতিহাস যতটা সম্ভব পাঠ করিয়াছি কিন্তু কোথাও বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের সমর্থনে একটি কথাও পাই নাই। এই দোষ তাঁহারা কেহই করেন নাই।" ইসলামের সাধকেরা শান্তভাবে সত্যানুসরণের শিক্ষা দিয়াছেন ইহা সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমান অভিযানের প্রাক্কালে বিন কাশিমও ইহা পালন করেন নাই, নোয়াখালীর অসহিষ্ণুতা ও বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণও নূতন নহে। হিন্দুর কাপুরুষতা এই কার্য সহজ করিয়া দিয়াছে, কাপুরুষতা দূর না হইলে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করা কঠিন হইবে।

নোয়াখালীতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতি

১২ই জানুয়ারী তারিখের হরিজন পত্রিকায় এক প্রবন্ধে শ্রীপ্যারেলাল লিখিয়াছেন—কলিকাতার এক বন্ধু কয়েকজন সহকর্মীর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। সহকর্মীদের মধ্যে এক জন গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মন্তব্য করেন যে রাজনৈতিক দাবা খেলায় বাংলাদেশকে পণ-হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। গান্ধীজী উত্তর দেন—"না", তার পর বলেন,—"বাংলা বাংলা বলিয়াই আজ পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আছে। বাংলাদেশেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীরগণ বাংলাতেই জন্মিয়াছেন—যদিও আমার চোখে তাঁহাদের কর্মপন্থা ভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এ কথা আপনাদিগকে আজ বুঝিতেই হইবে যে বাংলা যদি আজ তাহার খেলা ঠিকমত খেলিতে পারে, তাহা হইলে বাংলাই ভারতের সকল সমস্যার মীমাংসা করিবে। এই জন্যই আমি আজ বাঙালী হইয়াছি। যে বাংলায় এমন মানুষ জন্মিয়াছে সেখানে কাপুরুষতা থাকিবে কেন?"

আগন্তুক বলেন, "ঠিক কথা। যখন দেখি ধর্মস্থানগুলি ভগ্ন ও কলুষিত হইয়াছে তখন মনে হয় সেই স্থানের প্রত্যেকটি পুরুষ নারী ও শিশু মিলিয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিল না কেন?"

গান্ধীজী বলিলেন, "তাহারা যদি সেরূপ করিত তাহা হইলে আপনাদের আর কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন হইত না। নোয়াখালীর নেতাগণ আজ নোয়াখালীতে নাই। তাঁহারা বিপদের সম্মুখে যাইতে চান না, নিজেদের ঘর বাড়ী ছাড়িয়া তাঁহারা চলিয়া আসিয়াছেন। নেতৃস্থানীয় যাঁহারা নিজেদের ঘর এবং গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা যদি ফিরেন তো ভালই, নতুবা সাধারণ লোকদেরই অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। আজ সাধারণ লোকেরই যুগ আসিয়া পড়িয়াছে।"

কলিকাতার যে-সব বাঙালী শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলার লোক বহু আছেন। নোয়াখালী ও চাঁদপুরের হাঙ্গামার পর ইঁহাদের কেহ কেহ সাড়ম্বরে বিমানযোগে সেখানে গিয়াছেন বটে, কিন্তু বোধ হয় কেহই গ্রামে ঢোকেন নাই। স্থানীয় বর্ধিষ্ণু লোকেরা সাধারণতঃ গ্রামে বাস করেন না, তবে গ্রামের সহিত এত দিন তাঁহারা খানিকটা যোগাযোগ রক্ষা করিতেন, পূজা-পার্বণে দেশে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। গত হাঙ্গামার পর সেটুকুও ঘুচিয়াছে, গ্রামের বাস তুলিয়া দিয়া ইঁহারা সম্পূর্ণরূপে কলিকাতাবাসী হইয়াছেন। দরিদ্র গ্রামবাসীরা যাঁহাদিগকে ভরসা ও আশ্রয়স্থল বলিয়া মনে করিয়াছে তাঁহাদিগকে এই ভাবে স্বার্থপর কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিতে দেখিলে তাহাদের মনোবল ভাঙিয়া যায়। নোয়াখালীতে ইহাই ঘটিতেছে, ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, গান্ধীজীও গভীর বেদনার সঙ্গেই এই কথার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই কষাঘাতেও ইঁহাদের কাপুরুষতা দূর হইবে কি না বলা কঠিন। বাংলার তরুণ সম্প্রদায় এই অপবাদ

দূর করিবার ভার গ্রহণ না করিলে ইতিহাসের এক পরম সন্ধিক্ষণে বাংলার ইতিহাস কালিমালিপ্ত হইয়া থাকিবে।

অধিবাসী বিনিময়

ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের নিজ নিজ সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় সরাইয়া লওয়া সম্পর্কে মিঃ জিন্না যে প্রস্তাব করিয়াছেন বিজ্ঞজনমাত্রেই তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন উহা অসম্ভব ও সর্বথা অবাঞ্ছনীয়। পঞ্জাবের গবর্ণর স্যার এভান জেঙ্কিন্সও এক সভায় এ সম্বন্ধে বিরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন যে হিটলারও একদা এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সকলকাম হইতে পারেন নাই। লোক-বিনিময়ের নামে বিহার হইতে তদ্বির করিয়া লোক আমদানী করিয়া তাহাদিগকে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে বসতি স্থাপনের সুযোগ করিয়া দিয়া কি ভাবে পশ্চিম-বাংলাকেও মুসলমানগরিষ্ঠ এলাকায় পরিণত করিবার আয়োজন সুরু হইয়াছে তাহা এতদিনে অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। এ বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনাও করিয়াছি।

মহাত্মা গান্ধীর অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি বলেন, "লোক-বিনিময়ের কথা আমি ভাবিতেই পারি না ; আমি মনে করি উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব প্রস্তাব।" যিনি যে প্রদেশেই থাকুন না কেন, হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন, অথবা আর কোন ধর্মে বিশ্বাসী হউন, তিনি ভারতবাসী। পাকিস্থান যদি পুরাপুরি ভাবে প্রতিষ্ঠিতও হয় তথাপি এ সত্য পাল্টাইবে না। আমার মতে এই রকমের কোন ব্যবস্থা রাজনৈতিক বুদ্ধি ও জ্ঞানের চূড়ান্ত দৈন্যের পরিচায়ক। বর্তমান অব্যবস্থিত অবস্থাতেও এই রকম ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন কারণ আমি দেখি না। সব দিক দিয়া সম্পূর্ণ রূপে হতাশ হইলেই শুধু অধিবাসী-বিনিময়ের প্রস্তাব উঠিতে পারে। সুতরাং সর্বশেষ পন্থা হিসাবে কচিৎ কখনও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা অবলম্বনীয় হইতে পারে। কিন্তু ইহার স্বাভাবিক পরিণতি যে কি তাহা কল্পনায় আনাও ভয়ঙ্কর।"

গান্ধীজীর ন্যায় আমরাও পূর্ববঙ্গ হইতে সকল হিন্দুর বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার ঘোর বিরোধী, এবং ইহারই জন্য আমরা বঙ্গ-বিভাগের পক্ষপাতী। পূর্ববঙ্গের হিন্দুর ধনপ্রাণ ও নারীর সম্মান রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বাধা পড়িয়াছে। সেখানে সৈন্য গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অল্প দিনের জন্য। নূতন রাষ্ট্র-বিধিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা আরও কমিবে, প্রদেশের ক্ষমতা বাড়িবে। সুতরাং নূতন আমলে পূর্ব বাংলার হিন্দুর সাহায্য প্রাপ্তির পথ আরও বিঘ্নসঙ্কুল হইবে। সৈন্য বিভাগের উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব বাংলার হিন্দু অনন্তকাল বসিয়া থাকিতে পারে না। মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত উগ্র ভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করিতেছিলেন বিহারের ঘটনার পর তাঁহারা কতকটা সংযত হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই সংযম কত দিন স্থায়ী হইবে তাহা বলা কঠিন। তা ছাড়া বিহারের পুনরুক্তি সর্বথা অবাঞ্ছনীয় এবং দেশের সমগ্র স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। আমরা এখনও মনে করি না যে নোয়াখালীর প্রতিশোধ গ্রহণই বিহারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ; কলিকাতার দাঙ্গায় বহু বিহারী নিহত আহত ও সর্বস্বান্ত হইয়াছে এবং প্রধানতঃ বিহারী মুসলমান গুণ্ডা শ্রেণীর লোকের দ্বারাই এই কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে। কলিকাতার আক্রান্ত বিহারীদের অনেকে দেশে ফিরিয়া ইহা প্রচার করিয়াছে এবং সেখানে ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে, "তোমার আত্মীয় আমার আত্মীয়কে মারিয়াছে" এই ধরণের। ইহার ফলেই বিহারের ব্যাপার এত মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিহারে বাঙালীদের সহিত যে ব্যবহার চলিতেছে তাহা স্মরণ করিলে শুধু বাঙালীদের প্রতি প্রীতি বশতঃ বিহারের ঘটনার অবতারণা হইয়াছিল ইহা মনে করা কঠিন হয়। পূর্ব বাংলার হিন্দুর উপর অত্যাচার হইলেই ভারতবর্ষের সর্বত্র বিহারের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে ইহা আমরা মনে করি না এবং উহা ঘটুক ইহাও আমরা প্রার্থনা করি না। পূর্ব বাংলার হিন্দুকে বাঁচাইবার জন্য এমন উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে যাহার দ্বারা অপরের রক্তপাত বা অনিষ্ট না হয় অথচ হিন্দুরাও বাঁচে।

বাংলার শাসনতন্ত্র যত দিন মুসলিম লীগের হাতে থাকিবে এবং যত দিন উহা শুধু এক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইয়া অপর সম্প্রদায়ের পীড়নের কারণ হইয়া রহিবে, তত দিন পূর্ব বাংলার হিন্দু যেমন স্বস্তি পাইবে না, তেমনি সমগ্র বাংলার হিন্দুও ধীরে ধীরে ডুবিতে থাকিবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব এবং ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ব্যক্তিকে নিজেদের মধ্যে পাইয়াও নোয়াখালীর অধিবাসীরা আজও নিরাপদ বোধ করিতে পারিতেছে না। গান্ধীজীও তাহাদের মনে আশ্বাস সঞ্চার করিতে পারেন নাই। প্রধানতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের মনে স্বস্তির সঞ্চার করিবার জন্যই এই অশীতিপর বৃদ্ধকে একাকী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার প্রতীক পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিপদে সাহায্য এবং বিচারালয়ে সুবিচার প্রাপ্তির বাস্তব ভরসা না পাওয়া পর্যন্ত গান্ধীজীর একাকী ভ্রমণেও স্থানীয় অধিবাসীদের পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর হইবে কিনা সন্দেহ। বর্তমান অবস্থায় ইহা নাই এবং অদূর বা দূর ভবিষ্যতেও উহা লাভ করিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। সরকারের প্রতিটি আদেশপ্রয়োগের ভিতর দিয়া এখনও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব ফুটিয়া উঠিতেছে এবং যত দিন উহা চলিতে থাকিবে তত দিন সমাজদ্রোহী লোকদের সামাজিক শৃঙ্খলা নাশের চেষ্টা অব্যাহতই থাকিবে। আপাত স্বার্থে দূর পাকিস্থানকামী সম্প্রদায় যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া আসিতে-

ছেন, যে ভাবে সুপরিকল্পিত উপায়ে হিন্দু-দলন পর্ব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তাহাতে হিন্দু বাংলার স্বতন্ত্র গবর্মেণ্ট অনতিবিলম্বে গঠিত না হইলে পূর্ব বাংলার হিন্দুও বাঁচিবে না, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাঙালী হিন্দুও ধ্বংস হইবে। বাঙালী হিন্দুর নিজস্ব গবর্মেণ্ট মুসলমানকে চলিয়া যাইতে বলিবে না, অত্যাচারও করিবে না। বাঙালী হিন্দু নিজের এলাকায় বাঙালী মুসলমানের সর্ব্ববিধ উন্নতির সুযোগ করিয়া দিয়া পূর্ব বাংলার হিন্দুর প্রতি তাহাদের কর্তব্যবোধ জাগ্রত করিয়া দিবার সুযোগ যেমন পাইবে, তেমনি সেখানে কাহারও উপর অত্যাচার হইলে বাঙালী হিন্দুর নিজস্ব গবর্মেণ্ট প্রতিকারের চেষ্টায় তৎক্ষণাৎ অগ্রণী হইতে পারিবে। পূর্ব বাংলার হিন্দুকে তখন বিপদের দিনে সহায়-সম্বলহীন বাঙালী হিন্দুর জনমত অথবা নেতাদের বিমান-বিহারমাত্র সম্বল করিয়া সশঙ্কিত চিত্তে বাস করিতে হইবে না। গৌড় ও বঙ্গ বহুকাল স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। আবারও একবার কিছুদিনের জন্য বর্তমান বাংলাকে ভাঙিয়া গৌড় ও বঙ্গে পরিণত করিলে যদি বাঙালীর বাঁচিবার পথ হয় তবে আমরা তাহাতে কোন ক্ষতি দেখি না। গৌড় ও আসামের দৃষ্টান্তে বঙ্গ যদি অনুপ্রাণিত হয় তখন পুনর্মিলনের পথেও বাধা থাকিবে না।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের নবম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলিয়া ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ ও নূতন রাষ্ট্র গঠনের দাবি অযৌক্তিক, অসঙ্গত এবং অবাস্তব। বিহারের ঘটনার জন্য পূর্বোক্ত নীতির অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচারকে দায়ী করিয়া তিনি বলেন, কয়েকটি ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করিয়া লইলে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী অখণ্ড ভারতীয় স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্ভব হইবে এবং তাহাই হইবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রকৃত সমাধান।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির বিকৃত ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জগতের অনেক সমস্যাকে জটিলতর করিয়াছে, সংখ্যাগুরু ও উন্নত সম্প্রদায়ের অগ্রগতি ব্যাহত করিয়াছে। ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক জটিলতার জন্য বিশেষভাবে এই নীতির অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগই দায়ী। এই নীতিরই দোহাই দিয়া ভারত বিভাগের দাবি তোলা হইতেছে।

১৯১৮ সালে রাষ্ট্রপতি উইলসন যখন প্রথম এই নীতির কথা ঘোষণা করেন, তখনই অনেকে বলিয়াছিলেন যে, ইহার অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগের ফলে জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলার ক্ষতি হইতে পারে। প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে উইলসন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির কথা উত্থাপন করিলে তাঁহারই পররাষ্ট্রসচিব রবার্ট লানসিং উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজজীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ডিনামাইটের ন্যায় সংগুপ্ত থাকিবে; এক দিন উহা ফাটিবেই এবং সেদিন আর কেহ ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের পথ খুঁজিয়া পাইবে না। লানসিং বলেন, "এই নীতি মানুষের মনে যে আশা জাগাইবে তাহা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, বরং ইহা সহস্র সহস্র মানুষের জীবনহানির কারণই হইয়া উঠিবে।" লানসিং চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমেরিকা ও কানাডা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পৃথক হওয়ার অধিকার স্বীকার করে নাই বলিয়াই আজ তাহারা বর্তমান শক্তির অধিকারী। যদি মানিত, তবে আমেরিকাকে আজ আমরা দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত দেখিতে পাইতাম এবং কানাডারও ফরাসী অংশ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া কানাডার চিরদুর্বলতার কারণ হইয়া রহিত। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চোরাবালিতে একবার পদক্ষেপ করিলেই সংখ্যালঘুর পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি স্বীকার না করিয়া উপায়ান্তর থাকে না। এই সমস্যা এড়াইবার জন্যই জেনেভার জাতি-সঙ্ঘের মাইনরিটি নীতি এই ছিল যে, সংখ্যালঘু যতক্ষণ দেশ ও জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতীয় উন্নতির অন্তরায় হইয়া না উঠিবে, ততক্ষণই শুধু তাহাদের অতিরিক্ত সুবিধা দাবি করিবার অধিকার থাকিবে। জাতি-সঙ্ঘ অবশ্য এই ব্যাখ্যা সঠিক ভাবে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে বড় বড় দেশগুলি ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতিকে নিজ নিজ অধীনস্থ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে কণ্টক রোপণের জন্য ব্যবহার করিয়াছে। প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে ইহা লইয়া যখন আলোচনা হয় সেই সময় উইলসন নিজেও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিকে অপরিহার্য মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর কেন্দ্রীয় পূর্ব-ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠনের সময় এই নীতি বহুলাংশে যেমন অনুসরণ করা হইয়াছে, উহার অপপ্রয়োগও ঠিক তেমনি ভাবে হইয়াছে। বলকান রাষ্ট্রসমূহের সীমা নূতন করিয়া নির্ধারণ করিবার সময় সুকৌশলে এমন ভাবে এক একটি দেশে মাইনরিটি ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে যাহার ফলে সমগ্র দেশটির রাজনীতি কলুষিত হইয়া চিরবিবাদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির প্রয়োগের কথা পর্যালোচনা করিয়া অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন—ঠিক কোন্ ক্ষেত্রে এবং কি অবস্থায় কোন্ জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবি করিতে পারে তাহার সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা-নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আয়তনে অন্ততঃ পক্ষে কতটা হইলে কোন্ ভূখণ্ড আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হইবে তাহা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া অতিশয় দুরূহ। অধ্যাপক হ্যারল্ড টেম্পারলি বলিয়াছেন—এই নীতির

এক দিকে যেমন ঐক্য সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, অপর দিকে তেমনি ইহা বিভেদ সৃষ্টিও করিতে পারে। আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি বেশী প্রশ্রয় পাইলে শেষ অবধি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি পর্যন্ত হয়তো পাঁচ শতাব্দীর বন্ধন কাটাইয়া রাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া যাইতে চাহিবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর বেশী জোর দেওয়ার বিপদ এইখানেই। দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং বৈষয়িক স্বার্থকে আত্মনিয়ন্ত্রণের উপরে স্থান দিতে হইবে।

৮ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন—"আত্মনিয়ন্ত্রণ সকল ক্ষেত্রে কার্যকরী হইতে পারে না এ কথা অনেকে ভুলিয়া যান। এই নীতি কেবল মাত্র ভূখণ্ডের প্রতি প্রযোজ্য—কোন জাতির প্রতি নয়। ইহাকে জাতি সম্পর্কে প্রয়োগ করিতে গেলে বিভেদ ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকিবে। কোন দেশের অধিবাসীর কতকাংশের প্রতি ধর্মের ভিত্তিতে ইহা প্রয়োগ করিতে গেলে তাহা মূঢ়তার পরিচায়ক হইয়া দেশের পরম ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিবে। কারণ, তখন ঐ সকল অঞ্চলের মাইনরিটিরাও একই নীতি অনুসারে যুক্তিসঙ্গত ভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি করিবে এবং ফলে একই অঞ্চলে মেজরিটি ও মাইনরিটির পৃথক পৃথক গবর্মেণ্ট গঠনের ন্যায় একটা অবাস্তব ও অসম্ভব অবস্থা দেখা দিবে। আত্মনিয়ন্ত্রণ বলিতে যদি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন বুঝায় তবে সেই অধিকার কেবল ভৌগোলিক, বৈষয়িক এবং সামরিক ভাবে অখণ্ড ভূভাগের থাকিতে পারে। দেশের বা অধিবাসীদের একাংশ এই অধিকার দাবি করিতে পারে না, করিলে নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের শতকরা ২৪ জন যদি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া এই অধিকার দাবি করেন তবে বাংলার শতকরা ৪৪ জন, আসামের শতকরা ৬৬ জন এবং উত্তর প্রদেশের মিলিত জনসংখ্যার ৪৭ জন অধিবাসী হিন্দু বলিয়া একই যুক্তিবলে অনুরূপ অধিকার দাবি করিবে এবং দেশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে এই অধিকার দেওয়া হয় নাই ইহা শুভ লক্ষণ। তাঁহারা পাকিস্থান দাবি বর্জন করিয়াছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-গঠনের অযৌক্তিক দাবী মিশনের প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় নাই।"

যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার গড়িয়া উঠিলে তাহা তত ক্ষতিকর হয় না, যত ক্ষতির কারণ হয় পৃথক নির্বাচনের পথে। এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্ত ভারতবর্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন প্রবর্তিত হইয়াছে, ফলে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচিত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ শাসকবর্গ সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের বা তাহাদিগকে পর্যাপ্ত শিক্ষা দিয়া উন্নত করিয়া তুলিবার জন্ত কোন চেষ্টা করেন নাই, অথচ বেশী বেশী করিয়া রাজনৈতিক অধিকার দিয়া এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহ নিজেরা উপকৃত হয় নাই কিন্তু প্রগতিশীল সম্প্রদায়সমূহের অগ্রগতিতে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহের অল্পসংখ্যক লোক প্রভূত লাভবান হইয়াছে, কিন্তু অপরাবহ ক্ষতি হইয়াছে দেশের ও সেই সব সম্প্রদায়েরই আপামর জনসাধারণের। ইহাদের রোগ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা কিছুই ঘুচে নাই, শুধু উহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত কতক লোকের জুটিয়াছে বড় নানাবিধ চাকুরী হইয়াছে। ইহাদের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন ইংরেজ শাসকদের ইচ্ছাও নয় কারণ এক দল অনগ্রসর লোক ও স্বার্থান্বেষী ভরীবাহকের দলের সাহায্যে প্রগতিশীল দেশের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় বাধা দেওয়া যত সহজ এমন আর কিছুতে নহে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও রেষারেষি জাগাইয়া তুলিয়া আভ্যন্তরীণ কলহের সৃষ্টি করিলে দেশেরই এক দল লোক ইংরেজের হইয়া সাম্রাজ্য রক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইবে। অস্ত্রবল ও দমননীতির প্রয়োগের চেয়ে এই ব্যবস্থা সহজ ও সমান সুফলপ্রদ। এই অভিসন্ধি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যই হইয়াছে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতি। যৌথ নির্বাচন প্রবর্তিত না হইলে ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় নাই।

মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত

রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাবের মূল ভিত্তির প্রশংসা করিয়া তিনি উহার কয়েকটি ত্রুটি ধরিয়া দিয়াছেন। গণ-পরিষদের সভ্যদের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা আশা করি।

প্রাদেশিক ও প্রদেশমণ্ডলের শাসনতন্ত্র রচনার পর যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনার যে ব্যবস্থা মিশনের প্রস্তাবে করা হইয়াছে তাহার সমালোচনা করিয়া অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :—

> এখন সমস্যা দাঁড়াইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের পূর্বে কি করিয়া প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা যায়? যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্মপদ্ধতি সম্যক্ নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত প্রদেশ ও প্রদেশমণ্ডলের ক্ষমতা নির্ধারিত হইতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে তাহারা নিজ নিজ শাসনতন্ত্র প্রণয়নও করিতে পারে না। রাষ্ট্রতন্ত্র প্রণয়ন করিতে হইলে শুধু শাসনযন্ত্রের রূপ নির্দেশ করিলেই হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে সরকারের ক্ষমতা ও কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শেষ না হইলে প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র গঠন সম্ভবপর নয়।

ইহার উত্তরে অনেকে বলিতে পারেন যে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে মুদ্রা-ব্যবস্থা, মূলশিল্প এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রভৃতির সহিত মন্ত্রী-মিশন-নির্দিষ্ট বিষয়গুলির প্রকৃত সম্পর্ক কিরূপ ?

রাষ্ট্রনীতির একটি মূল সূত্র হইল যে, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে কোন ক্ষমতা কাহারও উপর অর্পিত হইলে তাহার যথাযোগ্য প্রয়োগের জন্ত প্রয়োজনীয় অপর সকল ক্ষমতা নির্দিষ্ট না করিয়া দিলেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার মতে আসল সমস্তার মূলই হইল এখানে।

পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যানবাহন বিভাগের আওতায় কোন্ কোন্ বিষয় পড়ে তাহা কি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ? ঐ সংজ্ঞাগুলির প্রকৃত অর্থ কি ? বৈদেশিক বাণিজ্য, বাণিজ্যচুক্তি, আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক, আয়কর, স্বতঃই আনুষঙ্গিকভাবে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং ইহাই সর্বজনস্বীকৃত নীতি।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি চিরকাল স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। বিখ্যাত রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ, বিচারক কুলিজ বলিয়াছেন, শাসনতন্ত্রে এই অনির্দিষ্ট আনুষঙ্গিক ক্ষমতার গুরুত্ব খুবই বেশী। কাহাকেও কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব অর্পণ করিলে তাহা পালনের জন্ত প্রয়োজনীয় অপরাপর সকল ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে এ কথা স্বতঃসিদ্ধের ন্তায় স্বীকৃত হয়। এজন্ত সাক্ষ্য-নজিরের কোন প্রয়োজন নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যাহা সত্য তাহা ভারতের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। মন্ত্রী-মিশন হয়ত ইচ্ছা করিয়াই বর্তমান পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা বা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত করেন নাই। কিন্তু গণ-পরিষদের সদস্তগণের পক্ষে অবহিত হওয়া প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনে সফল হইতে হইলে তাঁহাদের সর্বাগ্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষমতা যতটা সম্ভব একমত হইয়া নির্ধারিত করিতে হইবে। নতুবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলির অবশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কথা অর্থহীন হইয়া পড়িবে। তাহাতে নানা অনর্থের উৎপত্তি হইবে এবং রাষ্ট্রতন্ত্র প্রণয়নের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের একটি ত্রুটি প্রমাণ হইবে। গণ-পরিষদ এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবেন ইহাই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিলে তাহা নিবারণের দায়িত্ব কাহার এবং কি উপায়েই বা তাহা করা হইবে, মিশন-প্রস্তাবে তাহার উল্লেখ নাই। অথচ ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া বলিতেছেন,

"যদি কোন ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকার গোলযোগ নিবারণ করিতে না পারেন বা না চাহেন এবং ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় তাহা হইলে কি হইবে ? এরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিহীন করিয়া রাখা কোন ক্রমেই সমীচীন নয়। তাহাকে শান্তিস্থাপনের জন্ত হস্তক্ষেপের শাসনতান্ত্রিক অধিকার অবশ্যই দিতে হইবে। এজন্ত সুইজারল্যাণ্ডের বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের ব্যবস্থার অনুরূপ অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়া আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে একটি ধারা যোগ করিতে হইবে। শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হইলে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্ত সুইজারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারেন। দেশের জনসাধারণ রাজনীতি বুঝে না, তাহারা শান্তিতে দিনযাপন করিতে চায়। তাহার ব্যবস্থা করাই রাষ্ট্রনায়কদের কর্তব্য। বিহার ও নোয়াখালির ঘটনাবলীর পর আমার প্রস্তাবিত ব্যবস্থার (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপের অধিকার দান সম্পর্কে) কাহারও আপত্তি হইবে না বলিয়াই মনে করি।

এরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। সুইজারল্যাণ্ডের ন্তায় ব্যবস্থা-পরিষদের সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত যৌথ শাসন-পরিষদের ব্যবস্থা করাও গণ-পরিষদের কর্তব্য। তবে যদি বলা যায় যে, মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে দেশরক্ষা বলিতে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলাও বুঝায় তবে সেকথা স্পষ্টভাবে শাসনতন্ত্রে নিবদ্ধ হওয়া উচিত। তাহাতে ভবিষ্যতে বহু গোলযোগ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।"

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় উপসংহারে বলেন, "অপর সকল দেশের ন্তায় আমরাও ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করিয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারিব।" আমরাও বিশ্বাস করি কংগ্রেস দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করিয়া ভারতবর্ষের নিজস্ব রাষ্ট্রবিধি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন। গণ-পরিষদের কাজ পণ্ড করিবার জন্ত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও প্রতিক্রিয়াপন্থী লীগের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হইবে।

পাকিস্থান সম্বন্ধে রাশিয়ার অভিমত

মস্কো বেতারে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্তার আলোচনা প্রসঙ্গে রুশ ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে ভারতে হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ ব্রিটিশের চক্রান্ত, ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে সমস্তা আরও জটিল হইবে। তিনি বলেন, ইংরেজরা যে ভাবে ভারতে নূতন গবর্মেণ্ট গঠনের খেলা খেলিতেছে তাহাতে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ এবং রক্তপাত অনিবার্য। বিলাতের অনেক সংবাদপত্রও ভারতীয় সমস্তার সমাধান হিসাবে ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত করিবার জন্ত প্রচারকার্য চালাইতেছে। এই ভাবে দেশ ভাগ করিলে ভারতীয়

জনতার সমাধান তো হইবেই না, বরং সমস্যা আরও জটিল হইয়াই উঠিবে। তিনি আরও বলেন, "যখনই ইংরেজরা কোনরূপ শাসনসংস্কার প্রবর্তন করিতে গিয়াছে তখনই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ও হানাহানি হইয়াছে। কারণ হিসাবে ইংরেজরা বলে যে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি পৃথক। কিন্তু কথা হইতেছে যে গত ৮০০ বৎসর ধরিয়া হিন্দু ও মুসলমানেরা ভারতবর্ষে মিশ্র ভাবে বসবাস করিয়া আসিতেছে, এমন ধারা হানাহানি তো হইত না। ইংরেজও সে কথা স্বীকার করেন। গত শতাব্দীতেও এই অবস্থা ছিল না। এই শতাব্দী হইতেই ইহা এক সর্বভারতীয় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

"সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার হিসাবে মুসলমানেরা শতকরা ২৩ জন। পাকিস্থানে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে, কিন্তু হিন্দু এবং শিখ মিলিয়া হইবে জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ। এবং সংখ্যালঘু হইলেও হিন্দু ও শিখরা সব বিষয়ে মুসলমানদের অপেক্ষা উন্নত এবং সঙ্ঘবদ্ধ। কাজেই ইহাদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ লাগিয়াই থাকিবে। ভারত বিভাগের কুচক্রান্ত যাহাদের মাথায় ঘুরিতেছে, তাহারাও এমনি স্থায়ী হানাহানিই চায়, তাহাতেই তাহাদের স্বার্থসিদ্ধি। কারণ স্থায়ীভাবে দেশে সঙ্ঘর্ষ এবং বিশৃঙ্খলা জিয়াইয়া রাখিতে পারিলে সর্বদাই ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ ইংরেজের থাকিবে এবং এই ভাবেই তাহারা ভারতের উপর তাহাদের আধিপত্য বজায় রাখিবে।"

ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এবং আজও উহাকেই নানাভাবে বজায় রাখিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পথে কণ্টক রোপণ করা হইতেছে এই সত্য সোভিয়েট রাশিয়া সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উস্কানি দিয়া সংখ্যাগুরুর উন্নতি বন্ধ করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট উইলসনের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির অপপ্রয়োগ কি ভাবে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে ভারতবর্ষ তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে যতদূর সম্ভব ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নূতন ভাবে প্রদেশ গঠন করিয়া দিলে পাকিস্থানের পথ যেমন বন্ধ হইবে হিন্দু মুসলমান বিরোধও তেমনি কমিয়া আসিবার উপায় হইবে। পঞ্জাবে ও বাংলায় শতকরা ৫৫ জন যতক্ষণ সর্বতোভাবে শতকরা ৪৫-এর সকল দাবি উপেক্ষা করিয়া তাহাদের ধর্ম, শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন করিতে থাকিবে ততক্ষণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

পণ্ডিত জবাহরলালের বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অভিভাষণ

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৩৪তম অধিবেশনে ভারতের অন্তবর্তীকালীন সরকারের সহ-সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু সভাপতির প্রসঙ্গে বলেন যে, বিজ্ঞানের একটি সামাজিক উদ্দেশ্য আছে। ভারতের ৪০ কোটি বুভুক্ষু জনগণের নানা বিষয়ের সমস্যার সমাধানই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের কর্তব্য।

পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, তিনি সংক্ষেপে ভারতবর্ষের নব রূপ পরিগ্রহণের সম্বন্ধে কিছু বলিবেন। তিনি মনে করেন যে, ভারতবর্ষের সহিত বিশ্ববিজ্ঞানের সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলা যেমন দরকারী তেমনই উচিত। ভারতবর্ষেরও একান্ত ভাবে কর্তব্য বিশ্ববিজ্ঞানের সহিত পা মিলাইয়া চলা।

যদি বর্তমানের নব উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের পথকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে থাকে তাহা হইলে তাহা পথ হারাইয়া যাইবে।

বিশ্বের বিজ্ঞান-দরবারে ভারতবর্ষ আপনার ঠাঁই করিয়া লইয়াছে। তথাপি আমাদের বিজ্ঞ বিজ্ঞান-সমালোচকদের মতকে সমর্থন করিয়া আমিও বলি যে ভারতবর্ষের যতখানি করা উচিত তাহা ভারত করিতে পারে নাই।

ভারতের বিশাল জনগণের কাছে যখন সকল প্রকার সুযোগের দ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে তখন আমরা যাহা করিতে পারি তাহা করিয়া উঠিবার উপায় লাভ করিব। যে প্রতিভা গুপ্তভাবে থাকিয়া লোপ পাইয়া যাইতেছে তাহার শতকরা ৫ ভাগও আমরা যদি কাজে লাগাইতে পারি তাহা হইলেও ভারতে বৈজ্ঞানিকের ছড়াছড়ি পড়িয়া যাইবে। আজ আমরা শতকরা একটি প্রতিভাবান লোককেও কাজে লাগাইতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হউক যাহাতে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দূরীভূত হইয়া আমরা সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারি।

অতঃপর পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বলেন যে তিনি একথা একান্তভাবেই বিশ্বাস করেন, ভারতের তথা পৃথিবীর সমস্যাগুলি উপযুক্ত সমাধান বিজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব। তিনি বলেন যে অনেক বৈজ্ঞানিকই তাঁহাদের গবেষণাগার হইতে বাহিরে আসিয়া জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নীতির অনুগ ভাবে কার্যারম্ভ করিতে ভুলিয়া যান। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে বৈজ্ঞানিক রীতিতে কার্যারম্ভ করিলেই আমরা সাফল্য অর্জন করিতে পারিব।

পণ্ডিত জবাহরলাল অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলেন, যখন আমরা কোন বিশেষ ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিব তখন যেন তাহার সামগ্রিক পটভূমিকাসহ আলোচনা করি। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের সহিত বিজ্ঞানও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাহাকে বাদ দিয়া কাজ চলিতে পারে না।

গত দুই বছর আগে হিরোশিমাতে একটি বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের

আজ মনে হইতেছে, আমাদের গতি কোন্ দিকে। সভ্যতার ভবিষ্যৎ কি? আণবিক বোমার প্রয়োজন ছিল কি না তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা যে একটি বিষয়ে মানুষকে জন্মগত ভাবাইয়া তুলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ধ্বংসের জন্য যে কোন উপায়কেই গ্রহণ করা হইবে কিনা তাহাই চিন্তার বিষয়। হিরোশিমার বিপর্যয় অকথ্য, অবর্ণনীয়। হয় তো একথা সত্য যে যাহা উদ্দেশ্য ছিল তাহা সার্থকতা লাভ করিয়াছে কিন্তু এইখানে কথাটি বিজ্ঞানীগণকে অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করিতে হইবেই।

বিজ্ঞানের দুইটি দিক আছে, একটি সৃষ্টির অপরটি ধ্বংসের। হিরোশিমাকে দুই সংগ্রামের একটি রূপক হিসাবে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু বিশ্বসভার আণবিক শক্তি-সংসদের মন্তব্য যাহাই হউক এবং তাহা যদি আমরা গ্রহণও করি তথাপি মানুষের মনে সেই প্রশ্নই মাথা তুলিতে থাকে যে আমাদের গতি কোন্ দিকে?

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইলে কোন্ পথে চলিবে তাহা আমি জানি না। আমি একটি পথের কথা জানি, ভারতবর্ষ সে পথ লইলে আমি খুশি হইব—ভারতকে সেই পথ গ্রহণ করানই আমার ব্রত। একটি প্রাচীন বনস্পতি ছিন্নমূল হইলে উহার মূলস্থ মৃত্তিকার বড় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ভারতে আজ বহু পুরাতন মহীরুহ উন্মূলিত—কোটি কোটি লোক স্বাধীনতা লাভ করিলে বহু আবদ্ধ শক্তি মুক্তি পাইবে। তাহারা কোন্ পথ ধরিবে তাহা বলা কঠিন। ভারতের জড়-জনতা আজ গতিশক্তি লাভ করিতেছে। এই গতি-মুক্তির পটভূমিকায় যে সংগ্রাম দেখা যাইতেছে তাহা তুচ্ছ—যদিও তাহা আমাদের কাছে সাময়িক ভাবে বড় মনে হইতে পারে। আজকের ভারতে সত্যই বিরাটের সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। বিশাল জনতা আজ গতিশীল। হঠাৎ মুক্তবন্ধন জড়-জনতা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। তবু সবচেয়ে বড় কথা এই যে তাহা গতিবেগের অধিকারী হইয়াছে, যে ভুলই তাহারা করুক, তাহারা আবার যথাস্থান খুঁজিয়া লইতে পারিবে, কারণ তাহারা গতিময় ও শক্তিশালী। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের প্রধান কর্তব্য ইহার কেন্দ্রগত সামঞ্জস্য বিধান করা।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় আমাদের প্রধান কর্তব্য হইবে মানুষের শক্তি উপলব্ধি করিয়া তাহাকে যথোপযুক্ত সুযোগ করিয়া দেওয়া। ভারত-সরকারের একটি প্রধান ত্রুটিই এই যে তাহার কোন সুসমঞ্জস কেন্দ্রগত যোগাযোগ নাই। প্রত্যেক বিভাগই মনে করে যে, অপর বিভাগের ব্যাপারে তাহার মাথা ঘামাইবার কিছু নাই। এই সমস্যা সমাধানের জন্য 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি' চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে এই কমিটি বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই।

ইহার পর পণ্ডিতজী বলেন যে বর্তমানের স্বাধীনতামুখী ভারতবাসীর পক্ষে বস্তুতর ভাবে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন (scientific-minded) হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানের একটি সামাজিক উদ্দেশ্য থাকা একান্তই প্রয়োজন। একটি ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে সত্যের মূল্য খুব বেশী নয়। যখন দেশ খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখী তখন সত্য, ভগবান যা আরো অনেক জিনিষ উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। আগে আমাদের তাহাদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহার পর তাহাদের কাছে ভগবৎ-দর্শন ব্যাখ্যা চলিবে।

বিজ্ঞানের অপব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ কথা আমি অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়াই বলি যে আমরা যুদ্ধে যোগদান করিব না। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা অবশ্য আমরা জানি না। ভবিষ্যতের কথা বলিবার অথবা ভবিষ্যতে ভারত কি করিবে তাহার বাধ্যবাধক ছক বাঁধিয়া দিবার অধিকার আমার নাই। তবে গত মহাযুদ্ধের পর যখন আবার তৃতীয় মহাযুদ্ধের কথা উঠিতেছে তখন হয়ত আবার বিজ্ঞানবিদ্‌গণকে যুদ্ধের কাজে অপব্যবহার করা হইতে পারে। আমি মনে করি যে বিজ্ঞানী নরনারীগণ যেন একথাও ভাবিয়া দেখেন কি নীচ অভিপ্রায়ে তাঁহাদের ব্যবহার করা হইতেছে ও তাহারা যেন আর সেই কু-অভিপ্রায় সমর্থন না করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, যে বিরাট শক্তিসম্ভারগুলিকে বিশ্ব কল্যাণে সদ্ব্যবহার করিলে মানুষের জীবন স্বপ্ন-সুষমায় ভরিয়া উঠিত, তাহা না করিয়া মানুষ কেবল মারামারি কাটাকাটির কথাই ভাবিতে থাকিবে।

পরিশেষে তিনি সমবেত বিজ্ঞানীগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনারা ভারতে ৪০ কোটি লোকের কল্যাণ-বিধায়ক হউন। বিশ্বের জাতিপুঞ্জের প্রগতি ও শান্তির ব্যাপারে আপনাদের সহানুভূতি থাকুক।

বিজ্ঞান-কংগ্রেস

বিজ্ঞান-কংগ্রেসে এবারকার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, রাশিয়া, আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ হইতে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকেরা আসিয়া উহাতে যোগদান করিয়াছেন। গবেষণার ক্ষমতায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বের কোন দেশের বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ন্যূন নহেন, ইহা বহু ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানকে জনকল্যাণে নিয়োজিত করিবার যে দায়িত্ব বৈজ্ঞানিকের আছে, তাঁহারা তাহা করিতে পারেন নাই। যুদ্ধের সময় আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা বিলাত ও আমেরিকার বিজ্ঞানচর্চা পরিদর্শন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের কাজে নিয়োজিত করিতে পারেন নাই। যথেষ্ট সুযোগ হাতে থাকা সত্ত্বেও ইহা হয় নাই।

ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে আমাদের দেশে একটি ব্যাপক ভূমি-পরীক্ষা (Soil Survey) হওয়া দরকার। এই

প্রয়োজন দীর্ঘকাল যাবৎ অনুভূত হইতেছে। ইম্পিরিয়াল কৃষি-গবেষণাগারের ভারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকেরা আজ পর্যন্ত ইহা করেন নাই। কৃষকের সহিত তাঁহাদের কোন যোগাযোগ নাই। তাঁহাদের গবেষণা প্রভৃতি প্রকাশিত হয় ইংরেজী পত্রে, ইংরেজী ভাষায়, কৃষকের নিকট উহা অনধিগম্য। আমেরিকার যে-কোন চাষী কৃষি গবেষণাগারে উপস্থিত হইয়া অসুবিধার কথা বলিতে পারে এবং উহার প্রতিকারও লাভ করে, কিন্তু ভারতবর্ষে অশিক্ষিত সাধারণ কৃষকের তো কথাই নাই, কৃষিকার্যে রত শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও কৃষি-গবেষণাগারের সহায়তা লাভ করা দুরূহ। ঢাকায় উৎপন্ন তুলায় ঢাকাই মসলিন তৈরি হইত ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, অথচ এই তুলার গাছ একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে। কোন বাঙালী বৈজ্ঞানিক এই গাছ খুঁজিয়া বাহির করিবার অথবা ঢাকাই মসলিনের জন্য ব্যবহৃত দীর্ঘ-আঁশ তুলা আবার ঢাকায় উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। ইংরেজ বলিয়া দিয়াছে ভারতবর্ষে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা জন্মে না, অতএব উহাই ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইয়া বৈজ্ঞানিকেরা দীর্ঘকাল নিদ্রিত ছিলেন। তুলা-গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার পর এ বিষয়ে কিছু কিছু কাজ হইতেছে বটে, কিন্তু বাংলার তুলা গাছগুলি উদ্ধারের জন্য বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের কোন চেষ্টা দেখা যায় না। গবাদি পশু সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ইম্পিরিয়াল পশু-গবেষণাগার মণ্টগোমারী গাভী লইয়া ব্যস্ত। সারা দেশের গবাদি পশু বর্ষাকালে পা ও মুখের ঘায়ে ভুগিয়া মরিতেছে তাহার কোন প্রতিকার আজও হইল না। চরকার উন্নতির জন্য খাদি কর্মীরা যে চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকেন, কোন বৈজ্ঞানিককে তাহার শতাংশের একাংশও করিতে দেখি না। কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজ বড় বড় কারখানাওয়ালাদের জন্য যে উৎসাহের সহিত গবেষণা করিয়া দেন, কুটির শিল্পের জন্য তাহার কণামাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। ষ্ট্যাটিষ্টিকাল ইনষ্টিটিউট সরকারী অর্থসাহায্য সংগ্রহ করিয়া সরকারের কাজ করিয়া দেন, কিন্তু দেশের যেটুকু উপকার তাঁহারা করিতে পারেন তাহা কণামাত্রও করেন না। নৃতত্ত্বের দিক দিয়া বাংলার নমশূদ্র, কৈবর্ত, বাগ্দী প্রভৃতি জাতি সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণার শুধু যে বিরাট ক্ষেত্র রহিয়াছে তাহা নহে, উহা একান্ত আবশ্যকও বটে। রাঁচীতে শরৎ চন্দ্র রায় অথবা মধ্যপ্রদেশে ভেরিয়ার এলউইন একাকী স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন, ষ্ট্যাটিষ্টিকাল ল্যাবরেটরী বাংলার বিভিন্ন অনুন্নত জাতি সম্বন্ধে তাহা করিতে পারিতেন। এরূপ গবেষণা ভিন্ন ইহাদের অবস্থার প্রকৃত উন্নতি কি ভাবে হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করা অতিশয় কঠিন হইবে, বিজ্ঞান সম্মত হইবে না বলিয়া এরূপ উন্নতির স্থায়িত্বও হইবে না। বাঙালী বৈজ্ঞানিকেরা উচ্চ শ্রেণীর গবেষণায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার কতকাংশ জন-কল্যাণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ না দেখাইলে আপামর সাধারণ বিজ্ঞানের কল্যাণময় ফলভোগে বঞ্চিত হইয়াই থাকিবে।

আসামের পার্বত্য জাতি

'আসাম ট্রিবিউন' পত্রিকায় গৌহাটিস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ভারত-সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের গোপন নির্দেশ অনুসারে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা আসামের পার্বত্য জাতিদের লইয়া একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের জন্য আবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। এই সংবাদ পার্বত্য জাতির নেতাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, এক জন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী আসামের পার্বত্য জাতির নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, আসামের পার্বত্য জাতিদের লইয়া যদি একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা হয় তবে তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট চেষ্টা করিবেন এবং তাহাদিগকে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির হাত হইতে রক্ষা করিবেন। এই পরিকল্পনায় পার্বত্য জাতির নেতাদের নিকট হইতে সমর্থন পাওয়ার জন্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের এই চক্রান্তের কথা পণ্ডিত নেহরুও সম্ভবতঃ জানেন। পণ্ডিত নেহরু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্য জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ভ্রমণের সময় ব্রিটিশ রাজনৈতিক দপ্তরের গোপন কার্যকলাপের পরিচয় লাভ করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের এই দুই সীমান্তের পার্বত্য জাতিদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ঐ দুটি স্থানকে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে পিণ্ডরূপে ব্যবহার করিতে চাহিতেছেন, ইহা ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। মিঃ জিন্না ইহাই চাহিয়াছিলেন, তাঁহার পাকিস্থান পরিকল্পনার মূলে ইহাই ছিল অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশন কর্তৃক পাকিস্থান প্রস্তাব অবাস্তব ও অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যক্ত হওয়ার পর উহার এই অংশটি ব্রিটিশ রাজনৈতিক বিভাগ কুড়াইয়া লইয়া নিজেদের কাজে ব্যবহার করিতে চাহিতেছেন। কখনও বোমা কখনও বা চাউল আকাশ হইতে বর্ষণ করিয়া পার্বত্য জাতিকে দলে রাখা ইংরেজের পক্ষে আর সম্ভব হইবে না, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সংবাদে তাহারই যথেষ্ট ইঙ্গিত মিলিতেছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভূমি-বিষয়ক নূতন বিল

পশ্চিম-বাংলার হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিকে মুসলমানপ্রধান জেলায় পরিণত করিয়া বাংলার সর্বত্র সাম্প্রদায়িক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইবে বলিয়া আমরা যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি তাহা সত্য হইতে চলিয়াছে। প্রকাশ, বাংলা-সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনেই একটি আইন পাস করাইয়া পশ্চিম বঙ্গের ১৪ লক্ষ একর

অনাবাদী জমি দখল করিয়া উহাতে প্রজা বসাইবার ব্যবস্থা করিবেন। বলা বাহুল্য, আসাম হইতে বিতাড়িত এবং বিহার হইতে আহূত লোকদের পশ্চিম বঙ্গে বসাইবার জন্যই এই আয়োজন।

কত অল্প লোক বসাইলে বর্ধমান বিভাগের ছয়টির মধ্যে চারিটি জেলাকে মুসলমানপ্রধান করিয়া ফেলা যায়। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহা বুঝা যাইবে :—

	হিন্দু	মুসলমান
বর্ধমান—	১৩,৯৩,৮২০	৩,৩৬,৬৬৫
	(৭৩'৭২'/.)	(১৭'৮১'/.)
বীরভূম—	৬,৮৬,৪৩৬	২,৮৭,৩১০
	(৬৫'৪৮'/.)	(২৭'৪১'/.)
বাঁকুড়া—	১০,৭৮,৫৫৯	৫৫,৫৬৪
	(৮৩'৬৩'/.)	(৪'৩১'/.)
মেদিনীপুর—	২৬,৮১,৯৬৩	২,৪৬,৫৫৯
	(৮৪'০৬'/.)	(৭'৭৩'/.)
হুগলী—	১০,৯৯,৫৪৪	২,০৭,০৭৭
	(৭৯'৮১'/.)	(১৫'০৩'/.)
হাওড়া—	১১,৮৪,৮৬৩	২,৯৬,৩২৫
	(৭৯'৫০'/.)	(১৯'৮৮'/.)

লীগ মন্ত্রীদের প্রজা-দরদের এই আকস্মিক অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা আদৌ কঠিন নয়। ১৪ লক্ষ একর কর্ষণযোগ্য অনাবাদী জমি অধিকার করা হইতেছে। এক একর অর্থাৎ তিন বিঘা জমি গড়ে পাঁচ জন লোকের একটি পরিবারকে বিলি করিলে ৭০ লক্ষ লোক আমদানীর ব্যবস্থা হইবে। পূর্ববঙ্গে মুসলমান ভূমিহীন দিনমজুরদের পক্ষে ইহা কম লোভনীয় প্রস্তাব নয়, যাহারা আসামের দুর্গম স্থানে গিয়া আসাম-সরকারের ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করিয়া জোর করিয়া জমি দখলের ইচ্ছা রাখে, এই প্রস্তাব যে তাহারা উপেক্ষা করিবে আমরা ইহা ভাবিতে প্রস্তুত নহি। বর্ধমান জেলায় ১২ লক্ষ, বীরভূমে ৫ লক্ষ, হুগলীতে ১০ লক্ষ এবং হাওড়ায় ১০ লক্ষ মোট ৩৭ লক্ষ লোক বসাইতে পারিলেই এই চারিটি জেলা "অধিকার" করা যায়। এই লোক সংগ্রহ করিতে খুব বেশী দিন লাগিবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা।

বাংলায় বাঙালী হিন্দুকে অবাঞ্ছিত "বিদেশী" আখ্যা দিয়া এখনই তাহাকে অন্যত্র ঘর খুঁজিবার নোটিশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। উপরোক্ত আয়োজন সফল করিতে পারিলে তাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে নোয়াখালিতে তাহার পূর্ণ পরিচয় মিলিয়াছে, এখনও মিলিতেছে।

দামোদর-পরিকল্পনা

দামোদর-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বাংলা ও বিহার সরকারের যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা শেষ হইয়াছে, তিন জনে একমত হইয়া কাজ আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার ফলে সাঁওতাল পরগণা এবং পশ্চিম বঙ্গের অনেক উন্নতি হইবে।

দামোদর-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে বিস্তীর্ণ এলাকায় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে এবং উহার ফলে কৃষি ও শিল্প উভয়েরই উন্নতি হইবে। ক্ষেতের জন্য কৃষকেরা যেমন জল পাইবে, ছোট-বড় শিল্পের উদ্যোক্তাগণও তেমনই সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি হাতে পাইয়া নানাবিধ শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিবে। কলিকাতা পর্যন্ত সকলেই সম্ভবতঃ এক আনা দরে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয় করিবার সুযোগ পাইবে।

দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং তদনুসারে গবর্মেণ্ট পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনার কাজ যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তদুদ্দেশ্যে আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি অথরিটির ন্যায় একটি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই কর্পোরেশনের উপর পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব অর্পিত হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি আইনে পরিণত করিয়া লওয়ার কথা হইয়াছে। পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার পূর্ণ দায়িত্ব উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের হাতে থাকা উচিত এ সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না। ইহার জন্য মোট ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে, তন্মধ্যে বাংলা-সরকার দিবেন ২৮ কোটি, কেন্দ্রীয় সরকার ১৬ কোটি এবং বিহার ১১ কোটি।

মূল পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর এখন উহার খুঁটিনাটি দিকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা আবশ্যক। দামোদরের জল হইতে যে বিরাট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে তাহাকে যথোপযুক্ত ভাবে কাজে লাগাইতে হইলে এই অঞ্চলে কোথায় কিরূপ কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান দরকার। ৫৫ কোটি টাকা লগ্নী করিয়া যে বিরাট কার্যে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে তাহার জন্য বার্ষিক চলতি ব্যয় বড় কম হইবে না। টাকার সুদ, ক্ষয়পূরণ, মেরামত এবং কর্মচারী প্রভৃতির বেতন বাবদ বার্ষিক ছয়-সাত কোটি টাকা ইহার জন্য ব্যয় হইবে। এই টাকা ত তুলিতেই হইবে, লগ্নী টাকাও ধীরে ধীরে তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং এমন ভাবে জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে হইবে যাহাতে বার্ষিক অন্ততঃ দশ কোটি টাকা আয়ের সংস্থান হইতে পারে। এই Load Survey অবিলম্বে আরম্ভ হওয়া আবশ্যক, এবং স্থানীয় অঞ্চলসমূহ সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে সেইরূপ বাঙালী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইলেই উহা সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, এমন কি একটি মাত্র কারখানাও স্থাপনের পূর্বে বৈদ্যুতিক গ্রেড পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হওয়া দরকার। গ্রেড পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের

লাইনগুলি আগে হইতে ঠিক করিয়া না দিলে খাপছাড়া ভাবে কারখানা বসান আরম্ভ হইবে এবং পরে উহা ক্ষতি ও বিভ্রাটের কারণ হইয়া উঠিবে। এই বিষয়টি সম্পর্কে এখনও যথোপযুক্ত মনোযোগ দেওয়া হয় নাই বলিয়াই আমরা আশঙ্কা করিতেছি।

এই বিরাট ইঞ্জিনীয়ারিং কার্যের উপযুক্ত ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারের অভাবে আপাতত: বিদেশ হইতে বিশেষত: টেনেসি ভ্যালির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ আনাইবার প্রয়োজনীয়তা ভিন গবর্ণমেণ্টই স্বীকার করিয়াছেন, অপরেও করিবেন। কিন্তু বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার সময়েই উপযুক্ত ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদেরও উহাতে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিযুক্ত করা উচিত। ভারতবর্ষে বর্তমানে উচ্চশিক্ষিত সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারের অভাব নাই। তাঁহাদের মধ্য হইতে যোগ্য লোক বাছিয়া লইয়া ট্রেনিঙের ব্যবস্থা গোড়া হইতেই হওয়া দরকার, কারণ যথাসম্ভব শীঘ্র পরিকল্পনার কার্যে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হওয়া উচিত। কর্ণেল ইভান্সকে ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল এ দেশে থাকিবেন না, চাকুরির কণ্ট্রাক্ট শেষ হইলেই সম্ভবত: চলিয়া যাইবেন। আমরা মনে করি প্রথম হইতেই কর্ণেল ইভান্সের সহকারী হিসাবে একজন বাঙালী ইঞ্জিনীয়ারকে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত করা উচিত। দুই কারণে ইহা করা দরকার। প্রথমত:, তাঁহার পরবর্তী ডিরেক্টর তাঁহারই সহিত হাতে-কলমে কাজ করিয়া সমগ্র পরিকল্পনা নখদর্পণে আনিয়া ফেলিতে পারিবেন, দ্বিতীয়ত:, এক জন বাঙালী এই পদে সমাসীন থাকিলে দেশের বৈষয়িক ও সামাজিক সমস্যার সহিত পরিকল্পনার কোথাও অমিল ঘটিলে তাহারও সমাধান করিতে পারিবেন। আমাদের দেশে বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন বিদেশী, কার্যে পরিণত করিবার ভারও পড়িয়াছে বিদেশীর উপর। দেশের ভৌগোলিক, বৈষয়িক ও সামাজিক অবস্থার সহিত ইঁহাদের অনভিজ্ঞতার দরুন অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত সুফলপ্রসূ না হইয়া অশেষ দুর্গতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের লাইন এবং উত্তর-বঙ্গের রেল-লাইন ইহার দুইটি জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। এই বিরাট কাজগুলি যাঁহারা করিয়াছেন বাহবা লইয়া তাঁহারা দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন, দুর্ভোগ ভুগিতেছে এ দেশের লোক। দামোদর-পরিকল্পনা অতি বিরাট ব্যাপার হইবে এবং বহু লক্ষ লোকের মঙ্গলামঙ্গল উহার উপর নির্ভর করিবে। আমেরিকার আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের প্রাণপণ চেষ্টাতেও টেনেসি ভ্যালি স্কীম সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই; আমাদের দেশে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কার্যের ফল ত্রুটিহীন হইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। সুতরাং প্রথম হইতেই এক জন উপযুক্ত বাঙালীকে এই কার্যের সঙ্গে রাখা উচিত।

বাংলাদেশের শিক্ষা-বিভাগ

বাংলাদেশের অন্যান্য বিভাগগুলির ন্যায় শিক্ষা-বিভাগেও সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত বেশী পরিমাণে প্রশ্রয় পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে এ সম্বন্ধে প্রায়ই গুরুতর অভিযোগ উঠিতেছে। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কার্যকলাপে, বিশেষত: নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক কারণে হস্তক্ষেপ করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। শিক্ষা-বিভাগের কয়েকজন অমুসলমান ডিরেক্টর এবং সেক্রেটারী কথায় কথায় বিভাগীয় দৈনন্দিন কাজে সাম্প্রদায়িক কারণে মন্ত্রীমহাশয়ের হস্তক্ষেপ সহ্য করিতে না পারিয়া শিক্ষা-বিভাগ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগে যে-সব বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাঁহাদেরও কেহ কেহ এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে হিন্দু এবং খ্রীষ্টান, ইংরেজ এবং ভারতীয় উভয়েই আছেন।

সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা উপলক্ষে বিভাগীয় উপযুক্ত কর্মচারীদের সহিত মন্ত্রী মহাশয়ের বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার পরিকল্পনা অনুসারে স্থির হয় যে সর্বপ্রথমে উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করিবার জন্য একটি পুরুষদের ও একটি মেয়েদের ট্রেণিং কলেজ গঠিত হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক ভিন্ন শিক্ষা-বিস্তারে অগ্রসর হওয়া নিরর্থক। সার্জেন্ট-পরিকল্পনাতেও শিক্ষকদের শিক্ষাদানের অত্যাবশ্যকতা ও গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এইজন্য সর্বাগ্রে প্রস্তাবিত কলেজের জন্য ২৮ জন ভাবী অধ্যাপক বাছাই করা হয় এবং তাঁহাদের মধ্যে ১২ জনকে ইংলণ্ডে এবং ১৬ জনকে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা-কেন্দ্রে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়। বিলাতে প্রেরিত ১২ জনের মধ্যে ৪ জন এবং অবশিষ্ট ১৬ জনের মধ্যে ৩ জন মুসলমান। সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক এই সব প্রার্থী নির্বাচিত হন এবং সিলেকশন বোর্ডে উপযুক্ত মুসলমান সদস্য ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অযোগ্য প্রার্থীকে সাম্প্রদায়িক কারণে নিযুক্ত করিতে গেলে শিক্ষাবিস্তারের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে ইহা বুঝিয়া এই নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক দাবির বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। প্রার্থীরা নিজ নিজ কেন্দ্র হইতে মাসিক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন এবং তাহাতেই কে কতখানি অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্ল্যানিং এডভাইসর মিঃ ম্যাকেরিথ এবং প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ে বিশেষজ্ঞ মিসেস ম্লাগডেন এই সমস্ত রিপোর্ট রাখিতেন এবং প্রার্থীদের যথোপযুক্ত নির্দেশ দান করিতেন। ভারতবর্ষে যাঁহারা জ্ঞানলাভ করিতেছিলেন তাঁহাদের শান্তিনিকেতনে গিয়া কুটীরশিল্প শিক্ষাদান প্রণালী পর্যবেক্ষণ করার কথা ছিল; মুসলমান প্রার্থীরা সাম্প্রদায়িক কারণে সেখানে যান নাই এবং সে দিক দিয়া ইঁহাদের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

প্রার্থীদের কাজ শেষ হইয়াছে এবং ইঁহাদিগকে লইয়া প্রস্তাবিত কলেজ দুইটি গঠনের সময় আসিয়াছে। প্রত্যেক কলেজে এক জন করিয়া প্রিন্সিপাল ও এক জন ভাইস-প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইবেন। কয়েকজন অধ্যাপক বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসের সিনিয়ার গ্রেডে নিযুক্ত হইবেন। সাম্প্রদায়িক কারণে দাবি উঠিয়াছে যে বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমান প্রার্থী চতুষ্টয়কে কলেজ দুইটির প্রিন্সিপাল ও ভাইস-প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা হউক এবং অবশিষ্ট তিন জন মুসলমানকে প্রথম হইতেই সিনিয়ার গ্রেড দেওয়া হউক। মিঃ জ্যাকেরিয়া এবং মিসেস ব্রাগডেন প্রত্যেকটি প্রার্থীর যোগ্যতা পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহাদের মতে প্রস্তাবিত নিয়োগ ঘোরতর অন্যায় হইবে। যোগ্য লোক থাকিতে অযোগ্য লোককে উচ্চতম পদগুলিতে বসাইয়া সাম্প্রদায়িকতার অন্যায় দাবি প্রথম হইতেই মানিয়া লইলে শিক্ষাবিস্তার-পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে বাধ্য, ইহা বুঝিয়া তাঁহারা উভয়েই উক্তরূপ নিয়োগের আপত্তি করেন। এই আপত্তি শিক্ষামন্ত্রীর মনঃপূত হয় নাই, তিনি সাম্প্রদায়িক অন্যায় জিদেরই সমর্থন করিতেছেন। মিঃ জ্যাকেরিয়া কিছুদিন আগেই পদত্যাগ করিয়াছিলেন, মিসেস ব্রাগডেনও শিক্ষামন্ত্রীর কার্যের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রার্থীদের কার্যের রেকর্ড দেখিয়া নিয়োগ করা হউক, ইহাই ছিল বিশেষজ্ঞদের অভিমত। কিন্তু তাহা করিতে গেলে মুসলমান প্রার্থীদের উচ্চতম পদগুলিতে অধিষ্ঠিত করা চলে না, সুতরাং মন্ত্রীমহাশয় এই অতিশয় সঙ্গত প্রস্তাব মানিতে পারিলেন না। তিনি জানাইলেন যে তিনি স্বয়ং প্রার্থীদের ডাকিয়া পরীক্ষা করিয়া নিয়োগের আদেশ দিবেন। ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রীর জ্ঞান আছে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ, প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করিবার পক্ষে তিনি উপযুক্ত লোক নহেন। অথচ এই সাক্ষাৎকারের সময় মিঃ জ্যাকেরিয়া বা মিসেস ব্রাগডেনের ন্যায় এই বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও উপস্থিত থাকিতে বলা হয় নাই। এ ক্ষেত্রে নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব ঘটিতে পারে এই সন্দেহ স্বভাবতই লোকে করিবে।

মন্ত্রীমহাশয় এই নিয়োগ স্বয়ং না করিয়া পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপর প্রার্থী নির্বাচনের ভার ছাড়িয়া দিলেই সর্বাপেক্ষা সঙ্গত ও শোভন কাজ হইত বলিয়া আমরা মনে করি। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার-পরিকল্পনায় যে টাকা ব্যয় হইবে তাহার অধিকাংশ কেন্দ্রীয় সরকার দিবেন, সুতরাং সে দিক দিয়া এই নিয়োগে হস্তক্ষেপের অধিকার তাঁহাদের অবশ্যই থাকিতে পারে। এই অধিকার প্রয়োগ করাও তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য। শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দানে জাতিগঠন বাধা প্রাপ্ত হইবে, দেশের পক্ষে উহা সবচেয়ে মারাত্মক অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকিবে।

বাঙালী ব্যাঙ্কের বিপদ

কলিকাতার ছোট ব্যাঙ্কগুলির উপর দিয়া কিছুদিন যাবৎ ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। কয়েকটি ব্যাঙ্কও ইতিমধ্যেই ফেল হইয়াছে। ব্যাঙ্কের উপর 'রান' আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু বিপদ সম্পূর্ণরূপে কাটিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না।

ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সুশৃঙ্খলভাবে গড়িয়া উঠে নাই। ১৯৩৪ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু আজও উহা দেশের ছোট বড় সমস্ত ব্যাঙ্ককে আপন তত্ত্বাবধানে আনিতে পারে নাই। অল্প কয়েকটি ব্যাঙ্ককে তপশীলভুক্ত করিয়াই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সন্তুষ্ট রহিয়াছে, দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় গড়িয়া তোলার চেষ্টা এদেশে এখনও পর্যন্ত হয় নাই, অথচ পৃথিবীর আর পাঁচটা সভ্য দেশে গত মহাযুদ্ধের পর হইতেই এরূপ আয়োজন হইয়াছে।

কলিকাতার ব্যাঙ্কগুলিতে টাকা তোলার হিড়িক সুরু হওয়ার পর হইতে ব্যাঙ্কগুলিকে তপশীলী ও অ-তপশীলী এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া প্রচার করার চেষ্টা হইয়াছিল যে পূর্বোক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্কই নিরাপদ, বিপদ শুধু শেষোক্তগুলির। আমরা ইহা অতিশয় অন্যায় বলিয়া মনে করি। ছোট ব্যাঙ্ক ধীরে ধীরে স্বকীয় দক্ষতাগুণে বড় হয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলে স্থান লাভ করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলে নাম আছে কি না ইহাই ব্যাঙ্কের প্রকৃত পরিচয় নয়, ব্যাঙ্কের শ্রেষ্ঠত্ব ও দৃঢ়তা নির্ভর করে তাহার পরিচালকদিগের সততা, কর্মদক্ষতা, সতর্কতা ও নিষ্ঠার উপর। বহু অ-তপশীলী ছোট ব্যাঙ্কের এই সব গুণ আছে এবং ইহারাই ধীরে ধীরে অতি সামান্যভাবে কারবার আরম্ভ করিয়া ব্যাঙ্কিং জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করে। কলিকাতার কয়েকটি সুদৃঢ় ও সুপরিচিত ব্যাঙ্ক এইরূপে মফঃস্বল শহরে সামান্যভাবে জীবন আরম্ভ করিয়া নিজেদের চেষ্টায় আজ সকলের আস্থাভাজন হইয়া বাঙালীর বাণিজ্য-ক্ষেত্রে স্তম্ভস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে উহার তত্ত্বাবধানে আনিয়া সুগঠিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে কিন্তু উহা কার্যে পরিণত এখনও হয় নাই। বর্তমানে কলিকাতায় টাকা তোলার যে হিড়িক চলিতেছে তাহা হইতে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিও বাদ পড়ে নাই, এইরূপ একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্ককেও দুষ্ট লোকের বদনাম রটানোর ফলে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া অপরের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। কিছুদিন আগে কলিকাতাতেই একটি ব্যাঙ্কে বড়রকমের চুরি হওয়ার ফলে উহাতে 'রান' হয়। আমানতকারীদের বুঝাইয়া শান্ত করিবার জন্য বিশিষ্ট জননায়কেরা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের দরজায় আসিয়া দাঁড়ান, তথাপি ব্যাঙ্কটি ফেল পড়ে। পরে ব্যাঙ্কটি নিজের পাওনা আদায় করিয়া লইবার পর আমানতকারী এবং পাওনাদারদের পাই-

পয়সা মিটাইয়া দিয়াছে। এইভাবে অহেতুকী চাঞ্চল্যের জন্য একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুদৃঢ় ব্যাঙ্কও নষ্ট হইয়া যায়। ব্যাঙ্কে হঠাৎ 'রান' হইলে অতি বড় ব্যাঙ্ককেও বিপদে পড়িতে হয়, আমানতকারীদের দরজায় দাঁড় করাইয়া মুহূর্তের মধ্যে সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া লগ্নী টাকা আদায় করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়। অথচ একটু সময় পাইলেই ব্যাঙ্ক সামলাইয়া লইয়া সকলের টাকা শোধ করিয়া দিতে পারে। ব্যাঙ্কে 'রান' চরম স্বার্থপরতার পরিচায়ক, ইহাতে আমানতকারী, ব্যাঙ্ক এবং সেই ব্যাঙ্কের সহিত জড়িত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সকলেরই সমান ক্ষতি। একটা ব্যাঙ্কে 'রান' হইলেই সম-অবস্থাপন্ন আর পাঁচটা ব্যাঙ্কেরও আমানতকারীরা চঞ্চল হইয়া উঠে, ফলে সমগ্র ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় জীবনে বিপর্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইলে ব্যাঙ্কের 'রান' বন্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইত। এই ক্ষমতা যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ভিন্ন আর কাহারও নাই ইহা ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ব্যাপারেই ভাল ভাবে দেখা গিয়াছে। ছোট ব্যাঙ্কের মধ্যে অসাধু ব্যাঙ্ক থাকে, সময় থাকিতে এই সব ব্যাঙ্ক বন্ধ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহা করেন না। তাঁহারা ছোট ব্যাঙ্কের ভার জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। অথচ [illegible] প্রকৃত পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের, জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের নহে। ভাগ্যান্বেষী, অসাধু ও অপরিণামদর্শী লোকের পক্ষে ব্যাঙ্ক খোলা নিষিদ্ধ করা এবং খুলিলেও বেশী ক্ষতি করিবার পূর্বেই উহাদিগকে অপসারিত করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই থাকা উচিত। বর্তমানে যুদ্ধোত্তর চড়া বাজার চলিতেছে, মন্দা দেখা দিতে আর বেশী দেরি নাই। মন্দার বাজার আরম্ভ হইলেই বহু শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ককে বিপদে পড়িতে হইবে। সুতরাং এখন হইতেই সতর্ক হওয়া আবশ্যক। একটি ব্যাঙ্কও যাহাতে ফেল না পড়ে সে বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দৃষ্টি রাখা দরকার, যথোপযুক্ত ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে না থাকিলে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় ডিরেক্টর বোর্ড ভারত-সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়া আইন প্রণয়নের অনুরোধ করিতে পারেন। ভারত-সরকার উহা প্রত্যাখ্যান করিবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বাঙালী ব্যাঙ্কের উপর দিয়া যে ঝড় সম্প্রতি বহিয়া গিয়াছে, যাহা আসিতেছে তার তুলনায় উহা নগণ্য বলিয়াই আমাদের ধারণা।

লবণ-কর তুলিয়া দেওয়ায় বিলম্ব

নয়া দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, অর্থনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে করাচীতে সমবেত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌গণ লবণ-কর রদের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলীম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিবার পর হইতে লবণ-কর রদের ব্যাপার লইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্বর্তী সরকারের কংগ্রেস ও লীগ দলের মধ্যে যে লড়াই চলিতেছে, তাহার কথা তাঁহারা হয়তো তেমন কিছু জানেনই না। ডাঃ জন মাথাই অর্থসচিব থাকাকালে যথাসম্ভব শীঘ্র লবণ-কর রদের সিদ্ধান্ত করা হয়।

মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিবার পর মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ অর্থসচিব হন। তিনি পূর্বতন অর্থসচিবের ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিতে নানা ছুতা তুলিয়া গড়িমসি করিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ঐ সম্পর্কে একটা কিছু করিবার জন্য বলা হইলে লীগদল পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পাল্টাইবার কথা বলেন। কিন্তু কংগ্রেস উহাতে রাজি না হওয়ায় তাঁহারা বলেন যে, লবণ-কর সম্পর্কে কি করা হইবে না হইবে, তাহা আগামী বর্ষের বাজেট তৈয়ারীর সময়ই স্থির করা হইবে।

কংগ্রেস পক্ষ হইতে বলা হয় যে, বিশেষ বিচার বিবেচনার পরই লবণকর রদের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। উহা কার্যকরী করিতেই হইবে। কিন্তু অর্থদপ্তরের ভার এক জন লীগ সদস্যের উপর থাকায় তিনি (অর্থসচিব) নানা ভাবে টালবাহনা করিতেছেন। তিনি মনে করেন যে, লবণ-কর রদ করা হইলে কংগ্রেসের মর্যাদা বাড়িয়া যাইবে।

অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের যোগদানের প্রধান উদ্দেশ্য কংগ্রেসের জনকল্যাণমূলক সকল চেষ্টায় বাধা দান ইহা ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিতেছে। অর্থ-বিভাগ লীগের হাতে থাকায় বাধা দেওয়ার সুযোগও যথেষ্টই আছে। লীগবর্জিত অন্তর্বর্তী গবর্মেণ্ট অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন, লীগ উহাতে প্রবেশ করিবার পর তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে। সমগ্র দেশের স্বাধীনতা বা কল্যাণ ইঁহাদের কাম্য ত নহেই, স্বীয় সম্প্রদায়ের দরিদ্র জনসাধারণের উপকার করিতে গেলে যদি তাহা সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের অংশ হইয়া পড়ে তবে লীগ-নেতারা তাহাতেও ইচ্ছুক নহেন। লবণ-কর রহিত হইলে উপকৃত হইবে দরিদ্রেরা। তাহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা যথেষ্ট, কিন্তু তবু লীগ তাহা করিবেন না। কারণ কংগ্রেস লবণ-কর তুলিয়া দেওয়ার জন্য ষোল বৎসর যাবৎ আন্দোলন করিয়াছে অর্থসচিব নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁর আমলে লবণ-কর উঠিয়া গেলেও উহাতে নাম হইবে কংগ্রেসের এই ভয়।

চরকার সূতা

ভারত-সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার শ্রীযুক্ত ধর্মবীর বোম্বাইয়ের সম্মিলনীতে বস্ত্রের অবস্থার সম্বন্ধে বিবৃতি প্রসঙ্গে সকল প্রদেশকেই হাতে-কাটা সূতা উৎপাদনের দিকে বেশী করিয়া নজর দিতে বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধর্মবীর বলেন যে, প্রথমে যখন দেশে উৎপন্ন সূতা ভাগ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তখন মাসে ১০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ সূতা বিক্রি করা হইত। পরে সেই অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইলে এই

বরাদ্দ বাড়িয়া মাসে ৮৩,৩০৪ গাঁইটে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সরবরাহের এই পরিমাণ বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। এখন অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছে যে বরাদ্দের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা অনেক কমাইয়া আনিতে হইয়াছে। ইহার কারণ-স্বরূপ শ্রমিক ধর্মঘট, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও পরিশেষে শ্রম-সময়ের হ্রাস প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত ধর্মবীর এই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বিদেশী আমদানীর উপর নির্ভর করিতেছেন। তবে তিনি বলেন যে, আমেরিকা ও বিলাত হইতে যে পরিমাণ নকল সিল্কের ও তুলার সূতা আসিতে পারে তাহা সামান্যই। এইজন্য শ্রীযুক্ত ধর্মবীর হাতে সূতা কাটার উপর বেশী করিয়া জোর দিতেছেন। তিনি বলেন, "প্রদেশগুলি যাহাতে ব্যাপক ভাবে এই দিকে নজর দিতে পারে তাহাই করা উচিত। প্রাক্-যন্ত্রযুগে ভারতের তাঁতীরা হাতে এমন সূতা কাটিত যাহা যন্ত্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন সেইরূপ পারদর্শিতা না হউক, মোটা কাপড় তৈয়ারী করাও কেন সম্ভব হইবে না? ইহাতে চাষী সম্প্রদায়ের লোকেরা অবসর সময়ের জন্য কাজ পাইবে এবং ইহার দ্বারা তাহাদের জীবিকারও যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প ইংরেজ আগমনের পূর্বে ঠিক এইভাবেই গঠিত ছিল। কুটিরে কুটিরে চরকা ও তাঁত চলিত এবং তাহার দ্বারাই দেশের কাপড়ের চাহিদা মিটিয়া এত উদ্বৃত্ত থাকিত যে ব্রিটেনে এবং অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইত। ইহা চাষীদের একটি অতিরিক্ত আয়ের পন্থা ছিল; অজন্মায় ধান না হইলে আয়ের অন্ততঃ একটি পথ তাহাদের সম্মুখে খোলা থাকিত। বিলাতী সস্তা কাপড় আমদানীতে ভারতীয় নিজস্ব বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহারাই ল্যাঙ্কাশায়ারের স্থান গ্রহণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ কাপড় সম্বন্ধে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। যুদ্ধের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, উৎপন্ন বস্ত্রের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাপড় সামরিক প্রয়োজনে কাড়িয়া লওয়ায় নাগরিকদের বস্ত্র প্রাপ্তি দুর্ঘট হয়। বৎসরাধিককাল যুদ্ধ থামিয়াছে, তথাপি বস্ত্রাভাব ঘুচে নাই। বরং আবার নূতন করিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের উপর ভারতবাসীকে বস্ত্রের জন্য নির্ভরশীল করিবার আয়োজন সুরু হইয়াছে, টেক্সটাইল কমিশনার আমদানী বিলাতী সূতার জন্য সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। ভারতীয় মিলের কাপড়ের এই যদি পরিণাম হয়, একটু অসুবিধা ঘটিলেই যদি বস্ত্র-সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায় তবে এই বস্ত্রশিল্প বজায় রাখিবার কি প্রয়োজন আছে দেশবাসীকে তাহা চিন্তা করিতে হইবে। বিপদের দিনের ত্রাণকর্তা হিসাবে যদি মিল ছাড়িয়া চরকা ও তাঁতের শরণাপন্নই হইতে হয় তবে চরকা ও তাঁতকেই উপযুক্ত মর্যাদা দিয়া ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইবে না কেন? জাপান যে ভাবে কুটিরে কুটিরে বিদ্যুৎচালিত তাঁত বসাইয়া বড় বড় কারখানার উপর ভরসা না রাখিয়া ঘরে ঘরে বস্ত্র উৎপাদন করিয়াছে, ভারতবর্ষেও তাহা হইতে পারে। সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা ভারতবর্ষের বহু স্থানে হইয়াছে, অন্যত্র স্থানেও হইতেছে সুতরাং এ কাজ আর আমাদের পক্ষেও কঠিন নহে। আমেরিকা বস্ত্র-উৎপাদনের উন্নত পন্থা আবিষ্কার করিয়া একটি লোকের দ্বারা বহু কাপড় তৈরি করাইতে পারিতেছে কিন্তু বিশ্বের ক্ষুধা মিটাইতে সে-ও অক্ষম। তা ছাড়া মানুষকে বাদ দিয়া যন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে মানুষ যন্ত্রেরই দাস হইয়া উঠিয়া সভ্যতায় বিপর্যয় আনিবে। উৎপাদনের ব্যবস্থা সকল দেশে সকল ক্ষেত্রেই এমন হওয়া উচিত যাহাতে সবচেয়ে বেশী লোক কাজ পায়, যন্ত্র যাহাতে মানুষকে কর্মক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত না করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। দশ জন লোক বিতাড়িত করিয়া তাহাদের করণীয় কাজ একটি যন্ত্রের দ্বারা করাইয়া লওয়া লাভজনক হইতে পারে কিন্তু সে লাভ অল্প লোকের, দশের নয়। দশের ও দেশের ক্ষতি সাধন করিয়াই এই লাভের অঙ্ক সঞ্চিত হয়। শ্রীযুক্ত ধর্মবীর গ্রামের লোকের দৃষ্টিতে বস্ত্র-সমস্যার প্রতি তাকাইলে উহার প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধানের পথ পাইবেন।

সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী

বাংলার খ্যাতনামা মুসলিম নেতা ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী ২৪শে পৌষ বুধবার পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার তেঁতুলিয়া গ্রামের অধিবাসী। তিনি রিপন কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯১৮ সালে বাঘ শিকার করিতে গিয়া আহত হওয়ায় তাঁহার একখানি পা কাটিয়া ফেলিতে হয়। হাসেমী সাহেব ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২১ সালে যশোহরে এবং ১৯২৬ সালে দিনাজপুরে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা করায় তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনেও যোগ দিয়াছিলেন এবং চারি বার কারাবরণ করেন। তিনি বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন, আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবাস কালে সার ষ্টানলি জ্যাকসন তাঁহার পরিষদের সদস্য-পদ খারিজ করিয়া দেন। ১৯৩৭ সালে তিনি পুনরায় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪১ সালে তিনি উহার ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। দীর্ঘকাল তিনি কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে কৃষক-প্রজাদলে যোগদান করেন। পদ-মর্যাদা ও নেতৃত্বের লোভে এবং কলিকাতার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর লীগের ভয়ে বহু কৃষক-প্রজা কর্মী ও নেতা দল ত্যাগ করিয়া লীগে যোগ দিয়াছেন; মুষ্টিমেয় যে কয়জন মুসলিম নেতা লোভে বা ভয়ে স্বীয় মত ও পথ ত্যাগ করেন নাই, সৈয়দ জালালুদ্দীন তাঁহাদেরই এক জন ছিলেন।

দুর্গার প্রতিমা

(চতুর্থ প্রকরণ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

মোহন-জো-ডেরো স্থানে আবিষ্কৃত পুরাকৃতির মধ্যে কতকগুলি মৃন্ময় ছোট ছোট নারী-পুত্তলিকা পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিগুলি ভূষণে অলঙ্কৃত, কিন্তু নগ্ন। প্রাজ্ঞেরা বলিতেছেন, মাতৃদেবীর মূর্তি, ভাবুকেরা বলিতেছেন দুর্গা কিম্বা দুর্গার পূর্বরূপ। ইঁহাদের উক্তিতে আমার বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয় সে সব ছেলেখেলার পুতুল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমি বঙ্গদেশের গ্রামের ও কটকের জাতে (মেলায়) তেমন পুতুল অনেক দেখিয়াছিলাম। সেগুলি অলঙ্কৃত ও বস্ত্রাবৃত। মোহন-জো-ডেরোর আবিষ্কৃত নারীমূর্তি যে ছেলেদের পুতুল নয়, তাহার প্রমাণ কি? ভারত-পুরাকৃতির অধ্যক্ষ শ্রীযুত দীক্ষিত মহাশয়কে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিতে পারেন নাই, কারণ পূজার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় নাই। তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন, আমি যে পুতুল দেখিয়াছি সে পুতুল কোথায় পাওয়া যায়।

পুরাকৃতির সঙ্গে অনেক লিঙ্গচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় প্রাচীন সিন্ধুবাসী লিঙ্গোপাসক ছিল। ঋগ্‌বেদে লিঙ্গোপাসকের নিন্দা আছে। ঋগ্‌বেদে রুদ্র ভয়ঙ্কর দেবতা। ভয়ে কেহ তাঁহার নাম করিত না। রুদ্রাণীর উল্লেখ নাই। থাকিলে তিনিও ভয়ঙ্করী হইতেন, মাতৃমূর্তি হইতেন না।

যাঁহারা মনে করিয়াছেন, সে সব পুত্তলিকা দুর্গা কিম্বা তদনুরূপ আর্যদেবীমূর্তি, তাঁহারাও এই অনুমানের প্রমাণ দেন নাই। ঋগ্‌বেদে কয়েকটি দেবীর নাম আছে এবং কয়েকটির স্তুতিও আছে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই দুর্গা-স্থানীয় হইতে পারেন না। ঋগ্‌বেদের উষা বহুস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু উষা এক প্রাকৃতিক আলোক। দুর্গার গুণ ও কর্ম উষাতে নাই।

কেহ বলিয়াছেন, অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে মিশর ও মেসোপোটেমিয়ায় মাতৃদেবী-পূজা প্রচলিত ছিল। কিন্তু যদি মিশর ও মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আমাদের দুর্গাপূজা আসিয়া না থাকে, তাহা হইলে কোন্ দেশে মাতৃদেবীর পূজা ছিল, কোন্ দেশে ছিল না, তাহা জানিয়া দুর্গাপূজার ইতিহাস পাওয়া যাইবে না। নারী-মূর্তি-পূজা সহজাত সংস্কার নয় যে সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিবে।

বস্তুতঃ আমরা মাতৃদেবীর পূজা করি না, মহিষমর্দিনীর পূজা করি, চণ্ডীর করি। তাঁহাকে অম্বিকা বলিতেছি বটে, কিন্তু তিনি অম্বামূর্তিতে পূজিত হন না। পূর্ব প্রকরণে দেখিয়াছি, মহিষমর্দিনী রুদ্রের বজ্রাগ্নি। রূপকে তিনি অম্বিকা। যিনি রুদ্র, তিনিই অম্বিকা। ঋগ্‌বেদে মৃগনক্ষত্র রুদ্রপ্রতিমা-কল্পনার আশ্রয় হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদের অন্তিমকালে খ্রি-পূ ৩৫০০ অব্দে ব্যাধরূপে পশুপতি বাণদ্বারা মৃগ বধ করিতেছেন। ঋগ্‌বেদে এই মৃগ ভীম, যেমন আরণ্য বরাহ, আরণ্য মহিষ। সেই পৃথক-ভূত রুদ্র বা রুদ্রাণী মহিষমর্দিনী হইয়াছেন। যাহা পূর্বকালে রুদ্রের শরীর ছিল, তাহা মহিষের শরীর হইয়াছিল। ব্যাধ, মৃগ-ব্যাধ তারা, দেবগণের সম্মিলিত তেজঃ। পশুপতি স্থানে চণ্ডী আসিয়া শূলদ্বারা মহিষাকার অসুরের দেহ বিদ্ধ করিতেছেন (চিত্র ৫)। ইহা নিত্য ব্যাপার।
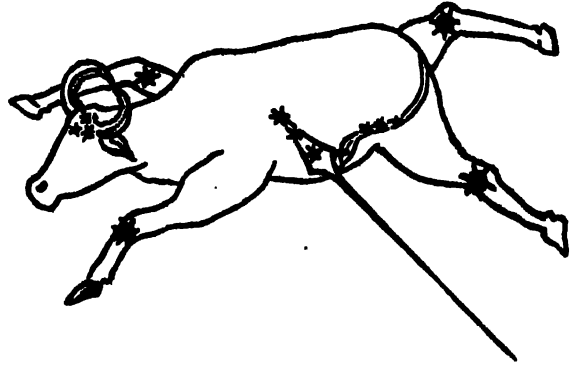
৫। মহিষাসুর

কালান্তরে এই মূলের কিছু কিছু রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী, তথাপি মূলের লক্ষণ থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, মহেশের ধ্যান স্মরণ করি। তিনি চতুর্হস্ত। তিনি "পরশুমৃগ-বরাভীতি-হস্ত।" তাঁহার হস্তে পরশু, মৃগ, বর ও অভয় আছে। এইরূপ চতুর্হস্ত মহেশপ্রতিমা আছে। তিনি কোথা হইতে পরশু ও মৃগ পাইলেন? কল্পির মরুদ্গণের হস্তে বাসি (ছুতারের বাইস) আছে। সেই বাসি মহেশের পরশু। মৃগ, যে মৃগ আকাশে পলায়ন করিতেছে। তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। এই ব্যাঘ্র চিত্র-ব্যাঘ্র। মরুদ্গণের মাতা পৃষতী (চিত্রমৃগ), (কারণ মৃগ-নক্ষত্র তারাময়)। ইহা হইতে মহেশ ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়াছেন। মহেশের রূপ বৈদিক কল্পনা। বিশেষতঃ তিনি বিশ্বাদ্য, বিশ্ববীজ, নিখিল-ভয়হর, প্রসন্ন। দুর্গাও বিশ্বের

আদি, বিশ্বের বীজ, ও নিখিল-ভয়-হারিণী, ভক্তের প্রতি প্রসন্না। এই কারণে আমরা দুর্গাপূজা করিয়া থাকি।

বস্তুতঃ আমরা ভাবের পূজা করি, মূর্তির পূজা করি না। দুর্গার মূর্তি থাকিতে পারে না। তিনি বিশ্বাত্মা, শক্তিরূপিণী, চিন্ময়ী। অথবা বিশ্বই তাঁহার অবয়ব। তিনি প্রত্যেক অবয়বে বর্ত্তমান। সে অবয়ব তাঁহার প্রতীক। আমরা দুর্গার মূর্তি বলি না, বলি দুর্গার প্রতিমা, গুণ ও কর্মের প্রতিমা। প্রতিমা শব্দ শুক্ল যজুর্বেদে (৩২।৩) আছে। "ন তস্য প্রতিমা অস্তি।" অত্র মহীধর,—তস্য পুরুষস্য প্রতিমা প্রতিমানমুপমানম্ কিঞ্চিদ্বস্তু নাস্তি।" পুরুষের প্রতিমা নাই, প্রকৃতির আছে। প্রতিমা জড়ময়ী না হইয়া বাঙ্‌ময়ী হইতে পারে। আর যিনি ধ্যানে অগম্যা তাঁহার পূজাও নাই। কিন্তু কেবা তাঁহার গুণ ও কর্মের ইয়ত্তা করিতে পারে? প্রতিমা ভাবস্ফুরণের আশ্রয় মাত্র। মহিষমর্দিনী প্রতিমা দেখিলে ভক্তের মনে হয়, তিনি বিপন্ন দেবগণকে নির্ভয় করিয়াছিলেন। প্রসন্ন হইলে তিনি ভক্তকেও স্বস্তি ও অভয় দ্বারা রক্ষা করিবেন।

৬। মহিষমর্দিনী—মধ্যভারতে নাগোড রাজ্যে আবিষ্কৃত। পঞ্চম খ্রীষ্ট শতাব্দে নির্মিত। (অমৃতবাজার পত্রিকা পূজা সংখ্যা)

মহিষমর্দিনী-প্রতিমায় উগ্রচণ্ডী শূলদ্বারা এক মহিষ বিদ্ধ করিতেছেন। ইহাই মূলরূপ। এইরূপ প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র ৬,৭)। মহিষ যে অসুর, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত মস্তকটি মহিষের, নিম্নাঙ্গ নরাকার হইবার কথা। বস্তুতঃ এইরূপ প্রতিমাও আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র ৮)। ইহা নূতন নয়। বরাহ অবতারের প্রতিমায় মস্তকটি বরাহের, নিম্নাঙ্গ মনুষ্যের। দশভুজা দুর্গার ধ্যানে অসুরের ঊর্দ্ধাঙ্গ দ্বিভুজ, খড়্গ-খেটকধারী, নিম্নাঙ্গ চতুষ্পদ

৭। মহিষমর্দিনী।—দক্ষিণ আর্কট জিল্লাতে আবিষ্কৃত। (অমৃতবাজার পত্রিকা, পূজা সংখ্যা)

মহিষ। বঙ্গদেশে এইরূপ প্রতিমা নির্মিত হইত। শত বৎসর পূর্বেও ছিল (চিত্র ৯)। এখন পূর্ববঙ্গে আছে, পশ্চিমবঙ্গে কদাচিৎ আছে। প্রথমে সিংহ বাহন ছিল না। পরে রুদ্রের কুকুর সিংহ হইয়াছে।

কালিকা পুরাণে (৬০।১৫৫) চন্দ্রশেখর চণ্ডিকাকে বলিয়াছেন, "হে জগন্ময়ী দেবি! মহিষশরীর আমারই। পূর্বে তুমি আমাকে বধ করিয়াছ, পরেও করিবে।" পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমান দশভুজা-প্রতিমার ছিন্ন মহিষমুণ্ড পৃথক প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু সে মুণ্ড যে শূলবিদ্ধ অসুরের, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কোথাও শিল্পীরা এই মহিষমুণ্ড ত্রিনয়ন না করিয়া দ্বিনয়ন করিয়া থাকেন। ইহা অশাস্ত্রীয়।

বর্ত্তমানে দুর্গাপ্রতিমার সহিত লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশের প্রতিমাও সন্নিবিষ্ট হইতেছে। কিন্তু লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গারই শক্তি। সুতরাং তাঁহাদের প্রতিমা প্রদর্শনের হেতু নাই। কার্তিক গণেশ প্রতিমাও অকারণ আসিয়াছে। এই চারি প্রতিমা-সন্নিবেশ দ্বারা দুর্গার মহিমা খর্ব হইয়াছে। দুর্গা কুমারী। তাঁহার পুত্রকন্যা নাই। এই কারণে দুর্গাপূজায় কুমারী-পূজা বিহিত হইয়াছে। পুরাণে লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গার কন্যা নহেন। দুর্গা কার্তিক গণেশের

৮। মহিষমর্দিনী।—দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে আবিষ্কৃত। ভারত-পুরাকৃতি ভবনে রক্ষিত। একাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দে নির্মিত।
(অমৃতবাজার পত্রিকা, পূজাসংখ্যা)

মাতা হইতে পারেন না। বস্তুতঃ গণেশ বিঘ্নবিনাশন রুদ্রেরই বিকৃত মূর্তি। কার্তিকের মাতা কৃত্তিকা, পিতা অগ্নি। চারি শত বৎসর পূর্বে রঘুনন্দন লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশের পূজার উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় শত বৎসর পূর্বে এই চারি প্রতিমা দশভূজা প্রতিমার সহিত নির্মিত হইত না (চিত্র ৯)। অদ্যাপি মধ্যপ্রদেশে, যেমন জব্বলপুরে, সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী দশভুজার প্রতিমার পার্শ্বে অন্য প্রতিমা নির্মিত হয় না।

এই পর্যন্ত দুর্গাপ্রতিমা বুঝিতে কষ্ট নাই। কিন্তু মহাভারতোক্ত দুর্গাস্তবে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে দুর্গা যশোদা-গর্ভ-সম্ভূতা। তিনি ভদ্রকালী অর্থাৎ কালী-রূপা। কেমন করিয়া তিনি দুর্গা হইলেন, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। কে যশোদা, কিছুই জানি না।

কথাটি সামান্য নয়। একটু বিস্তার করিতেছি। বিষ্ণুপুরাণ হইতে ভদ্রকালীর উৎপত্তি লিখিতেছি। পুরাণ-পাঠক জানেন, মুখ্যচান্দ্র (অমান্ত) শ্রাবণমাসে কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রে ভগবান্ হরি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর সেই রাত্রে নবমীতে জগতের ধাত্রী "যোগনিদ্রা মহামায়া" যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন, "বিষ্ণুরূপ সূর্য আবির্ভূত হইলেন।" বসুদেব স্বীয় বালককে যশোদার শয্যায় রাখিয়া যশোদার "নীলোৎপলদলশ্যামা" কন্যাকে দেবকীর শয্যায় রাখিয়া দিলেন। কংস সে কন্যাকে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে কন্যা আকাশে রহিলেন এবং আয়ুধের সহিত অষ্টমহাভুজবিশিষ্ট মহৎ রূপ ধারণ পূর্বক আকাশ-মার্গে অন্তর্হিত হইলেন।

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন, যশোদার এই কন্যা নীলবর্ণা, অষ্টভুজা মহাকালী। ইন্দ্র মহাকালীকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভদ্রকালী শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণও এই কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু মহাভারত মতে তিনি কংসাসুরঘাতিনী। মথুরার রাজা কংস অসুর ছিলেন অথবা কংসাসুর নামে কোন অসুর উদ্দিষ্ট হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না। শুম্ভ-নিশুম্ভ নামের দৈত্য-কল্পনার মূলে নিশ্চয় কোন নক্ষত্র ছিল।

এখন কিছু কিছু সন্ধান পাইতেছি। গোপাল কৃষ্ণ ইন্দ্র, ইহা ১৩৪০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" প্রতিপন্ন করিয়াছি। মুখ্য শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে অম্বুবাচি হইত। এই কারণে ঘোর দুর্যোগ, সেদিন গোপালের জন্ম হইয়াছিল। অষ্টমী গতে নবমীতে ভদ্রকালী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ ভদ্রকালী ইন্দ্রযজ্ঞ-রূপা। ধূম অগ্নির পতাকা, ঋগ্‌বেদে আছে। যেখানে ধূম আছে, সেখানে অগ্নিও আছে। এই ন্যায়ে ভদ্রকালীর বর্ণ নীল। গাঢ় নীল নয়, আ-নীল, যেমন নীলোৎপলের ফুল, কিম্বা অতসীর ফুল। বস্তুতঃ তিনি যজ্ঞিয় অগ্নি। ইন্দ্র-রূপ কৃষ্ণ কংস-রূপ অসুর-বধ করিয়াছিলেন। পুরাণ ভদ্রকালীর আবির্ভাবের হেতু বলেন নাই। দেখা যাইতেছে, বৈদিক কালের ইন্দ্রকর্তৃক অসুরবধ ও ইন্দ্র-যজ্ঞ স্মরণ করিয়াছেন।

দেখি, কতকাল পূর্বের ঘটনা। যজুর্বেদের কাল হইতে কার্তিকপূর্ণিমায় শারদ বিষুব ধরা হইত। ইহা হইতে গণিয়া গেলে শ্রাবণপূর্ণিমায় নয় চান্দ্র মাস হয়। নয় চান্দ্র-মাস গতে শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী-নবমীতে অম্বুবাচি ঘটে। সেদিন ভোর রাত্রে ভদ্রকালী আকাশে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। এই বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয়, মৃগ নক্ষত্রই ভদ্রকালী কল্পনার আধার হইয়াছিল। ব্যাধ তারা লইয়া গণিত দ্বারা জানিতেছি, যজুর্বেদের কালে এই নক্ষত্র দক্ষিণায়ণ-আরম্ভ কালে ভোর ৪টার সময় উদিত হইত। প্রথমে মৃগ, পরে ব্যাধ। রবিকরে প্রথমে মৃগ, পরে ব্যাধ অদৃশ্য হইত, যেন ব্যাধ মৃগ বধ করিয়াছে। দুই এক বৎসর নয়, অনেক বৎসর এইরূপ দেখা যাইত। বর্ষা ঋতুর সূচনা করিত বলিয়া আকাশে উদয় নিরীক্ষিত হইত। অম্বুবাচির দিন যজ্ঞ হইবার কথা। অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদিত হইত। সেই অগ্নি ভদ্রকালী, অধর-অরণি (পাতন) যশোদা। সে

নক্ষত্র শরৎ ঋতু-আরম্ভে মধ্যরাত্রে উঠিত। বোধ হয় এইরূপে অম্বুবাচির ভদ্রকালী পরে দুর্গা হইয়াছেন। আরও মনে হয় দুর্গাপূজা-প্রচলনের পূর্বে ভদ্রকালীর পূজা হইত। পরে দুর্গা-পূজা আসিয়াছে, কিন্তু শরৎ ঋতুতে।

মথুরায় পুরাকৃতি-ভবন আছে। সেখানে মথুরা অঞ্চলে আবিষ্কৃত মহিষমর্দিনী প্রতিমা রক্ষিত হইয়াছে। অবেক্ষক মহাশয় জানাইয়াছেন, সেসব প্রতিমা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, খ্রিষ্ট শতাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে বোধ হয় অন্বেষণ করিলে খ্রিষ্টাব্দের দুই এক শত বৎসর পূর্বের ভদ্রকালীর প্রতিমা পাওয়া যাইবে। বিন্ধ্যাচলে এক দেবী প্রতিমা আছেন। কোন্ দেবী প্রতিমা, কত কালের প্রতিমা, তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য। তিনি পুরাণোক্ত বিন্ধ্যবাসিনী হইতে পারেন।

১। মহিষমর্দিনী। শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গে চিত্রিত। ("প্রবাসী", ১৩৫৩, শ্রাবণ)

এক্ষণে বর্তমান প্রচলিত দশভুজা দুর্গার প্রতিমা অবলোকন করিতেছি। মৎস্যপুরাণে নানা দেবদেবীর প্রতিমার লক্ষণ বর্ণিত আছে, দশভুজা দুর্গারও আছে। সেখানে দুর্গা অতসীপুষ্পবর্ণাভা। দুর্গাপ্রতিমার কি বর্ণ হইবে? অতসীপুষ্প আ-নীল। অতসীর বাঙ্গলা নাম তিসী? নদীয়া জেলায় ইহার প্রচুর চাষ হয়। ইহার বীজের নাম মসৃণা, বাঙ্গলায় মসিনা। মসিনার তেল রং মিশাইতে লাগে। এ কারণে বঙ্গের নানা স্থানে তিসীর চাষ আছে। শ্রীকৃষ্ণ অতসীকুসুম-শ্যাম। ইহা প্রসিদ্ধ। বৃহৎ সংহিতায় উজ্জয়িনীর বরাহমিহির (ষষ্ঠ খ্রিষ্টশতাব্দে) বিষ্ণু ও বৈষ্ণবীর এই বর্ণ লিখিয়াছেন। কৃষ্ণের যে বর্ণ, মৎস্য পুরাণের মতে দুর্গারও সেই বর্ণ। যশোদা-গর্ভসম্ভূতা ভদ্রকালীরও সেইবর্ণ। কালিকা পুরাণে ভদ্রকালী অতসী-পুষ্পবর্ণা। ভদ্রকালী অবশ্য কালী (কৃষ্ণা)। দক্ষিণ ভারতের চিত্রকারেরা দুর্গা চিত্রের সেই বর্ণই করেন।*

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইন্দ্রাদির স্তবে দেবীর বর্ণ লিখিত হইয়াছে। "উদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি"—গোপাল চক্রবর্তীর টীকা অনুসারে অর্থ, উঠিবার সময় পূর্ণচন্দ্রের যে বর্ণ দেখা-যায়, সে বর্ণ। ("ক্রোধেনারক্তীভূতত্বাৎ")। সে বর্ণ আরক্তপীত। দেবীর দেহের কান্তি "কনকোত্তম-কান্তি"

* আমার কাছে অন্যান্য দেবদেবীর সহিত "শ্রীদুর্গা"র এই বর্ণের চিত্র আছে। নাম "ভূগোল চিত্রং।" মহিসূর মহারাজার পরিপোষিত "কৃষ্ণ মূর্ত্যাচার্যেন বিরচ্য প্রকাশিতম্।"
Sole proprietor :—
P. Rajagopaul Naidu.
Bidens garden Vepery, Madras.

সদৃশ। উৎকৃষ্ট সুবর্ণের যেমন কান্তি, দীপ্তি। তদনুসারে কালিকা-পুরাণে দুর্গা "তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা"। বঙ্গদেশের দুর্গা প্রতিমা এই বর্ণের হয়। স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য "দুর্গার্চন-পদ্ধতি" লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি মৎস্য পুরাণোক্ত কাত্যায়নী দশভুজার প্রতিমালক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্গা "অতসীপুষ্প-বর্ণাভা"। কিন্তু তিনি অতসী শব্দে শণ বুঝিয়াছেন। অতসীপুষ্প আ-নীল বর্ণ। কোন কোন ফুলে রক্তের আভা মিশ্রিত হইয়া থাকে। শণ শুদ্ধ পীত বর্ণ। দোড়ির নিমিত্ত শণের বিস্তর চাষ হয়।*

ধ্যানে আছে, জটাজূট-সমাযুক্তা। প্রতিমায় জটা দেখিতে পাই না। অর্ধেন্দু শিরোভূষণও দেখি নাই। ধ্যানের সহিত পশ্চিম বঙ্গের মহিষাসুরের দেহের ঐক্য নাই, পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। মৎস্যপুরাণ প্রতিমার লক্ষণ দিয়াছেন, ধ্যানমন্ত্র দেন নাই। এই কারণে "ত্রিশূলং দক্ষিণে দদ্যাৎ, পরশুং সন্নিবেশয়েৎ, মহিষং বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ, সিংহং প্রদর্শয়েৎ" ইত্যাদি কর্মসূচক ক্রিয়া আছে। এতদ্ব্যতীত দশভুজার রূপ পাইতেছি। তাঁহার গুণের কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় ইহাকে কারিকা (বিবরণ) বলিয়াছেন, মন্ত্র বলেন নাই।

* বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব কবি লোচনদাস লিখিয়াছেন, কৃষ্ণের বর্ণ অতসীকুসুম তুল্য। শ্যামদাস লিখিয়াছেন, "অতসীকুসুম জিনি তনু",—সতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত অপ্রকাশিত "পদরত্নাবলী"। পূর্ববঙ্গে এক বিস্ময়কর ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। ভাগীরথীর পূর্বপার্শ্ব হইতে ত্রিপুরা মৈমনসিং পর্যন্ত শণ-পুষ্পীর নাম অতসী হইয়া গিয়াছে! অমরকোশে, "অতসী স্যাৎ উমা ক্ষুমা।" অতসীর নাম উমা ও ক্ষুমা। ক্ষুমার অংশু হইতে উৎপন্ন বস্ত্রের নাম ক্ষৌম। তিন-চারি শত বৎসর ক্ষৌম অজ্ঞাত হইয়াছে। হিমালয়-দুহিতার নাম উমা ছিল। তিনি কৃষ্ণা ছিলেন, "নীলোৎপলদলচ্ছবি।" মৎস্য পুরাণে ও কালিকা পুরাণে বিস্তারিত আছে। বোধ হয় সেই বর্ণহেতু অতসীর এক নাম উমা হইয়াছিল। কিন্তু উদ্ভিদ্ উমার কোন প্রয়োগ পাই নাই। অমরকোশে, শণ পুষ্পীর এক নাম ঘণ্টারবা। ইহা বন্যবৃক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে নাম বনশণা, ঝন্‌ঝনা বা ঝুন্‌ঝুনি। ইহার ফুল শন ফুলের তুল্য, উজ্জ্বল পীতবর্ণ। ফল শুঁটী, পাকিয়া শুখাইলে বাতাসে নড়িয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে। এক কবি খেদ করিতেছেন, "সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি। আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাৎ ঝন্‌ঝনায়তে।" সুবর্ণ-সদৃশ পুষ্প দেখিয়া মনে হইল ইহার ফল রত্ন হইবে, এই আশায় বৃক্ষটির সেবা করিতে থাকিলাম। কিন্তু ফল সুপক্ব হইলে ঝন্‌ঝন্ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই হইল না।

শুনিয়াছি, কোথাও কোথাও শিল্পী দুর্গা প্রতিমাকে চম্পকবর্ণা করেন; ইহা অশাস্ত্রীয়। যিনি অগ্নিবর্ণা, অগ্নি-স্বরূপা, তিনি চম্পকবর্ণা কিছুতেই হইতে পারেন না।

ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, এই ধ্যান অনুসারে সকল মহিষ-মর্দিনী-প্রতিমা নির্মিত হইত না, কিন্তু অন্য লক্ষণের বর্ণনা পাওয়া যায় না।

অরণি

পরে অরণি আবশ্যক হইবে। কিন্তু বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে অরণি অজ্ঞাত। এই হেতু অরণি-নির্মাণ সবিস্তার লিখিতেছি। বহুকালপূর্বে আমি কটকে গণিয়ারি ও অশ্বত্থের অরণিতে অগ্নি উৎপাদন করিতে দেখিয়াছিলাম। অশ্বত্থের দুই জাতি আছে। এক জাতির পাতার আকার পানের মত। অগ্রভাগ দীর্ঘ, ইহাই প্রকৃত অশ্বত্থ। অন্য জাতির পাতা হ্রস্ব, অগ্র দীর্ঘ নয়। ইহার সংস্কৃত নাম অশ্বত্থী, গজাশ্বত্থ; বাঙ্গলা নাম গয়া-আশুত্। দুই অশ্বত্থই গজভক্ষ, কিন্তু ইহার কাঠ অপেক্ষাকৃত নরম। এই হেতু গজের আরও প্রিয়। নরম কাঠের অরণি ভাল হয় না। গণিয়ারি বৃক্ষের সংস্কৃত নাম গণিকারিকা। (অ-গ্নি-কারিকা), অপর নাম অগ্নিমন্থ, অরণি, জয়া, জয়ন্তী। অগ্নিমন্থ চিরহরিৎ ছোট তরু। কাঠ সুগন্ধ, পাতাও সুগন্ধ। ডাল সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। পাতা অভিমুখী, মৎস্যাকার। আয়ুর্বেদে দশমূল পাচনে ইহার মূল লাগে। ইহা সর্বত্র জন্মে না। বঙ্গদেশের কবিরাজেরা ইহার এক সগোত্র অন্য এক গাছকে গণিয়ারি বলেন। ইহার কাঁটা আছে। গণিকারিকার কাঁটা নাই। অগ্নিমন্থ হইতে ওড়িয়া নাম অগবথু। বৈজ্ঞানিক নাম Premna integrifolia.

ওড়িষ্যার বহু স্থান জাঙ্গল, বাঁকুড়ারও অনেক স্থান জাঙ্গল। জাঙ্গল দেশে অরণি বহু প্রচলিত আছে। অরণিকে বাঁকুড়ায় 'আগুন খাড়ি' অর্থাৎ আগুন কাঠি বলে। রাখাল বালকেরা বনের ধারে গরু চরাইতে যায়। আগুন খাড়ি দিয়া আগুন করিয়া 'চুটি' (শাল পাতায় জড়ান তামুক পাতা) খায়। সাঁওতালেরা আগুন করিতে দক্ষ। অড়হর, বিশেষতঃ টুমুর (অড়হরের বড় জাত), কুড়চি (সংস্কৃত নাম কুটজ), শাওড়া, আশুত্, কদাচিৎ বেল ও বাবলা প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ যে কোন নাতিঘন, নাতিকঠিন, নাতি-কোমল কাঠে অরণি হইতে পারে।

ইহার নির্মাণক্রম এই। দুইখানি কাঠে অরণি হয়। একখানি মোটা, অপর খানি আঙ্গুলের তুল্য সরু সোজা, তিন পোয়া লম্বা। মোটা কাঠে একটি অগভীর গর্ত করিয়া, গর্ত হইতে কাঠের পাশ পর্যন্ত একটি ত্রিকোণ নালী কাটিতে হয়। (চিত্র ১০)। এই কাঠের নাম পাতন। পাতনের তলায় শুখ্‌না পাতা রাখা হয়। দুই পায়ের আঙ্গুল দিয়া পাতন টিপিয়া ধরিয়া নালী কোলের দিকে রাখিয়া, কাঠখানির মোটা মুখ গর্তে চাপিয়া দুই হাতে
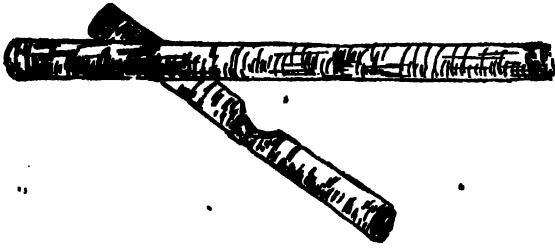
১০। অরণি

মথিতে হয়। উপর হইতে নীচে হাত চলিতে থাকে। ঘর্ষণে কাঠের 'ভুরা' (ধূলা) হয়, ভুরায় আগুন ধরে, নালী দিয়া পাতায় পড়ে, পাতা জ্বলিয়া উঠে। দুই মিনিটে আগুন পাওয়া যায়। সরু কাঠটির নাম দাঁড়া। সংস্কৃতে পাতনের নাম অধর-অরণি (নিম্নস্থ অরণি), দাঁড়ার নাম উত্তর-অরণি (উর্দ্ধ-অরণি), অপর নাম প্রমন্থ। এইটি নর, নীচেরটি নারী। এই দুই নাম সাঁওতালের মুখে ও ওড়িষ্যায় শুনিয়াছি। নর-নারীর সংযোগে গর্ভ হয়, গর্ভই অগ্নি। নর-নারী এক গাছের কাঠের না হইয়া দুই গাছের হইতে পারে। ঋগ্‌বেদে নর-নারীর নাম পিতামাতা, অগ্নি শিশু, কুমার। দুই হাতের দশ অঙ্গুলিকে দশ ভগিনী বলা হইত।

দুই জন লাগিলে পরিশ্রম কম হয়। এক জন প্রমন্থের মাথায় একটা কঠিন কাঠের গর্ত চাপিয়া ধরে। অন্য এক জন দোড়ী দিয়া প্রমন্থ এদিক-ওদিক 'দধিমন্থনের মতন টানিতে থাকে। প্রমন্থ মোটা করিতে হয়, মোটা কাঠে আগুন বেশী হয়। বোধ হয় বৈদিককালে অরণি-নির্মাণ এই পর্যন্ত উঠিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত "শত পথ ব্রাহ্মণে"র বঙ্গানুবাদের পরিশিষ্টে চিত্র ও বর্ণনা দিয়াছেন।

আমি পূর্বে বেল কাঠের অরণি শুনি পাই। বেলকাঠ ঘন ও কঠিন। ইহার অরণি দ্বারা আগুন করা সোজা মনে হয় নাই। এক ভাদ্রমাসে সূত্রধরের ভ্রমরযন্ত্রের লোহার ফলার স্থানে বেলকাঠের সরু ফলা আঁটিয়া বেল-কাঠের পাতনে মথিয়া আগুন পাইয়াছি। দুইটি কাঠই রসা ছিল। বন্য বিল্ব ও গ্রাম্য বিল্ব, দুই জাত। বন্য বিল্ব পাহাড়ে ও উচ্চ বনভূমিতে জন্মে। পাতা কাঁটা ও ফল দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। অরণির পক্ষে ইহার বিশেষ গুণ আছে কিনা দেখা হয় নাই।

ধর্ম ঠাকুরের গাজনে 'গামার কাটা' এক বৃহৎ পর্ব। কেহ ইহার প্রয়োজন জানে না। আমার বোধ হয় অরণি নির্মাণের নিমিত্ত এই কাঠ খুজিতে হয়। গামার সংস্কৃত নাম গম্ভারি। কিন্তু গামার কাঠ হালকা, নরম। ভ্রমর দ্বারা রসা কাঠে পরীক্ষা করিয়া দেখি, ঘর্ষণে ও চাপে দুই স্থান মসৃণ হইয়া গেল, ভুরা বাহির হইল না। তখন অল্প বালি দিতে আগুন বাহির হইল। ধর্মের গাজন গ্রীষ্মকালে হয়। তখন কাঠ শুখ্‌না থাকে, ভুরাও বাহির হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে অগ্নিগর্ভা শমী প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ শমী কাষ্ঠে অগ্নি আছে। ঋগ্‌বেদে শমীর অরণির উল্লেখ আছে। শমী বাবলা গাছের তুল্য। (চিত্র ১১)। ইহার কাঁটা ছোট সোজা শক্ত। এত গাছ থাকিতে ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ এই কণ্টকী বৃক্ষের অরণি কেন করিতেন, প্রথমে বুঝিতে
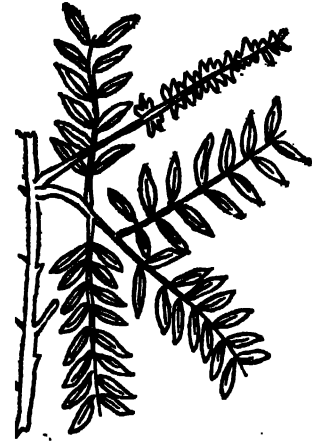
১১। শমী (হ্রস্বীকৃত)

পারি নাই। পরে জানিয়াছি পঞ্জাবে বিশেষতঃ লাহোর অঞ্চলে শমী বৃক্ষ অপর্যাপ্ত। অশ্বত্থ দুর্লভ, পূর্বকালে অশ্বত্থ ছিল না। সেখানে অশ্বত্থ রোপন ও পালন করিতে হয়, যত্রতত্র আপনি জন্মে না। উর্বশী-পুরুরবা-সংবাদ হইতে জানিতেছি, গন্ধর্বেরা পুরুরবাকে অশ্বত্থের অরণি করিতে শিখাইয়াছিল। পুরুরবার দেশ আগ্রা প্রদেশ, পঞ্জাব হইতে পারে না। অথর্ববেদের দেশও সেই দেশ, পঞ্জাব নয়। সে বেদে অশ্বত্থ বট পর্কটীর নাম আছে। এই সকল বৃক্ষ পঞ্জাবের নয়, উত্তর ভারতের। বিরাটনগরে প্রবেশের পূর্বে পাণ্ডবেরা তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া এক শমীবৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। শমীর বাঙ্গালা নাম শাঁই, বৈজ্ঞানিক নাম Prosopis spicigera.

ভারতের পশ্চিমার্ধে শমীবৃক্ষ জন্মে। পূর্বার্ধে কদাচিৎ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীপুরাণে শমীর অরণি লিখিত হইয়াছে। অতএব সে পুরাণ ভারতের পশ্চিমার্ধে কোথাও রচিত হইয়াছিল। বিল্ববৃক্ষ ভারতের সর্বত্র জন্মে। দেবী ভারতের পূর্বাংশে বোধ হয় পার্বত্য প্রদেশে বিল্ব-বাসিনী হইয়াছিলেন। পূজার মন্ত্রেও বিল্বকে পার্বত্য

আবাস হইতে আসিতে বলা হয়। পশ্চিম ভারতে শমী দেবীর পবিত্র বৃক্ষ। রাজারা নীরাজন করিবার সময় আবাস হইতে দুই তিন মাইল দূরে রোপিত শমীবৃক্ষের পত্র লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিজয়াদশমীর পর বন্ধু-বর্গের মধ্যে শুভ কামনায় শমী পত্রের আদানপ্রদান রীতি আছে। এক বিজয়াদশমীর পরে আমার এক মরাঠী বন্ধুকে পত্রে তাঁহার বিজয় কামনা করিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি পত্রের উপরিভাগে কুঙ্কুমলিপ্ত একটি ছোট পাতা পাঠাইয়াছিলেন। সে পাতা শ্বেত কাঞ্চনের। তিনি শমী পাতা পান নাই। সেই পাতা শমীর প্রতিনিধি হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে শমী দুর্লভ। বাঁকুড়ায় শমীবৃক্ষ আছে কিনা অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের উৎসাহী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নিমিত্ত শমীবৃক্ষ অন্বেষণ করিয়াছিলেন। এই নগর হইতে ৬।৭ মাইল দূরে ঈশান কোণে নড়রা নামে গ্রাম আছে। তাহার নিকটবর্তী শিবরামপুর গ্রামে দুইটি শমীবৃক্ষ আছে। দৈবজ্ঞেরা পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন যজ্ঞকালে শমীর অরণি আবশ্যক হয়। বাঁকুড়া জেলায় আরও অনেক স্থানে শমীবৃক্ষ আছে। ইন্দপুর থানার অন্তর্গত শালডিহা গ্রামে গণকেরা দুইটি বৃক্ষ পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, হোমে শমীকাষ্ঠ আবশ্যক হয়। দেখা যাইতেছে, গ্রহাচার্যেরাই প্রাচীন স্মৃতি পালন করিয়া আসিতেছেন। ইঞ্জিনিয়ার আমাকে শমীর ডাল আনিয়া দিয়াছিলেন। এক সাঁওতালকে সেই কাঠের অরণিতে অগ্নি উৎপাদন করিতে দিয়াছিলাম। আগুন বাহির করিতে তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অশ্বত্থের অরণিতে অল্পায়াসে আগুন বাহির হয়। তথাপি ঋগ্বেদের কাল হইতে শমীর অরণি প্রসিদ্ধ হইয়া আছে, শমী-গর্ভ শব্দের অর্থও অগ্নি হইয়া গিয়াছে। শমী-গর্ভ অশ্বত্থ, যে অশ্বত্থে অগ্নি আছে।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে বিলাতী দিয়াশলাই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। কেহ কেহ চকমকি পাথর সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু ইস্পাতও দুর্মূল্য। তখন মনে হইয়াছিল, অরণি দ্বারা অগ্নি-উৎপাদন করিতে হইবে। উদ্যোগী বণিক ভ্রমর-অরণি নির্মাণ করিয়া দিয়াশলাইর অভাব পূরণ করিবেন, আমাদের পূর্বকালের অবস্থা হইবে। সভ্যতায় লোকে পরবশ হয়, অরণি দ্বারা আত্মবশ হইতে পারিবে। অশ্বত্থ-বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা কেন পুণ্য কর্ম, এখন বুঝিতে পারা যাইবে। গ্রামে কত ঘর বাস করে, কত অরণি চাই। এই হেতু অশ্বত্থবৃক্ষ কাটিতে ও পোড়াইতে নাই, শুখ্‌না ডাল কাটিতে দোষ নাই।*

* দুর্গোৎসবের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকরণে ১১খানি চিত্র মুদ্রিত হইল। নবম চিত্র প্রবাসী প্রেস দিয়াছেন। অবশিষ্ট ১০ খানি চিত্র বাঁকুড়া কেন্দুবীপ—চলিত নাম কেন্দুভি—; নিবাসী বালক শ্রীধরণীকুমার ভট্টাচার্য লিখিয়াছে। কয়েকখানি দুর্গাপ্রতিমার চিত্র "অমৃতবাজার পত্রিকা"র পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত চিত্র দৃষ্টে প্রতিলিখিত হইয়াছে। পত্রিকায় সালের উল্লেখ ছিল না, আমি লিখিয়া রাখি নাই। বোধ হয় ১৯৩৬—১৯৪০ সালের মধ্যে এক সংখ্যায় ছিল। লেখকের নামও ছিল না। বোধ হয় তিনি পুরাকৃতিরক্ষা বিভাগে কর্ম করিতেন।

যুক্তরাষ্ট্রে জমির সার সংরক্ষণের সাম্প্রতিক পদ্ধতি

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে বিশেষভাবে বোম্বাই এবং পঞ্জাব প্রদেশে, জমির উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সার-সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক জমির সারের অপচয় নিবারণের জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। এই দিক দিয়া যুক্ত-রাষ্ট্রে কি ধরণের কাজ হইতেছে তাহা জানিবার জন্য ভারতের কৃষির উন্নতিকামী ব্যক্তিদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য, গবাদি পশুর উপযুক্ত পরিচর্য্যা এবং সার-সংরক্ষণ এই তিনটির সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আইওবা ষ্টেটের পশ্চিম অঞ্চলে বহু কৃষিক্ষেত্রের উর্বরতা এবং উৎপাদিকা শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আইওবা ষ্টেটে আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্যের অগ্রণী হইতে-ছেন মিঃ জেনসেন। এই প্রণালীতে কর্ষিত ক্ষেত্রগুলি উপরে উঁচু মাটির বাঁধ দেওয়া এবং সেগুলির চতুষ্পার্শ্বে ঘাসের উপর দিয়া জলধারা প্রবাহিত। এই বাঁধের দরুন ক্ষেত্র হইতে জল বাহির হইয়া যাইতে পারে না, এবং সারও সংরক্ষিত হয়। কেহ এই ধরণের কৃষিপদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করিলে ঈষৎ হাসিয়া মিঃ জেনসেন জবাব দেন—"এর চাইতে উন্নত ধরণের কৃষির কথা আমি তো কল্পনাও করিতে পারি না।"

অডুবনের নওয়া দুই মাইল দূরে জেনসেনের সুবৃহৎপ্রসারী কৃষিক্ষেত্র অবস্থিত। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে গিয়া তিনি চাষ-

আবাদের রচনা করেন এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জমির সার-সংরক্ষণ সম্বন্ধে দীর্ঘকালের এক পরিকল্পনা লইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পরিকল্পনা যে কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই যে, ঐ কৃষিক্ষেত্র হইতে আগে যে স্থলে ৭৫ বুশেল শস্য এবং ৪৫ বুশেল ওট পাওয়া যাইত সেই স্থলে আজ ১০০ বুশেল শস্য এবং প্রায় সমপরিমাণ ওট উৎপন্ন হইতেছে।

জেনসেন যে নিজে কৃষিকার্য্যের কোন অভিনব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নহে, তবে তিনি এরূপ সফলকাম হইলেন কিসে? একথার উত্তর এই যে, পূর্ব্বাবিষ্কৃত পদ্ধতিগুলিকেই কার্য্যক্ষেত্রে কৌশল প্রয়োগ করিয়া তিনি জমির উৎপাদিকা-শক্তি চূড়ান্তভাবে বাড়াইতে এবং সার-সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার কৃষিকর্ম্মের পদ্ধতি হইল নিম্নলিখিতরূপ: প্রথমতঃ পাহাড়ের চূড়ায় অথবা চূড়ার নিকটে গড়ানে জায়গাগুলিতে উঁচু মাটির ঢিবি তৈরি করা হয়। ইহাতে পর্ব্বতগাত্র অনেকটা সমতলাকার হওয়ায় জমির সার পাহাড়েই সংরক্ষিত হয়, পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া নীচে চুঁয়াইয়া যাইতে পারে না, উপরন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জল ক্ষেত্রে জমা হওয়ায় ফসলের পরিপুষ্টি ও পরিমাণ বৃদ্ধির সহায়তা হয়। পর্ব্বতগাত্রস্থ এই ধরণের নয়টি ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দুই মাইল।

যে জলধারা উপচাইয়া পড়ে তাহাকে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে প্রবাহিত করাইবার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো জায়গায় জলনালী কাটিয়া দেওয়া হয়। এই জলধারা নিম্নতম সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া নিকটবর্ত্তী নদীতে গিয়া পতিত হয়। জমির সার যাহাতে বহির্গত না হইতে পারে সেই জন্য এই সমস্ত জলনালীতে প্রচুর পরিমাণে ঘন-সন্নিবিষ্ট ভাবে ঘাসের চাষ করা হয়। জলনালীগুলি ষোল হইতে পঁচিশ ফুট পর্য্যন্ত চওড়া। জেনসেন শস্যক্ষেত্র এবং ওটক্ষেতের উভয় প্রান্ত-সীমায় ষোল ফিট চওড়া এক এক ফালি জমিতে ঘাস লাগাইয়া থাকেন। ফলে ক্ষেত্রপার্শ্বস্থ যে সমস্ত জায়গা বে-কায়দা পড়িয়া থাকিত গবাদি পশু আজ সেখানে চরিয়া খায়। এই সমস্ত পশুদের চারণ-ক্ষেত্রের পরিমাণ পনর হইতে আঠার একর। এই তৃণক্ষেত্র হইতেও তাঁহার লাভ হয় প্রচুর। জমির সার আটকাইয়া রাখিবার জন্য আলফালফা নামক শস্যের সঙ্গে ব্রোম নামক এক জাতীয় ঘাসও লাগানো হয়।

ঘাস শস্য এবং ওট প্রভৃতি কাটা হইলে পর জেনসেন তাঁর গরু-বাছুর এবং শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুকে ক্ষেত সাফ করিবার কাজে লাগাইয়া দেন। যন্ত্রের সাহায্যে যে সমস্ত গাছের শিকড় উৎপাটিত করা যায় না এই উপায়ে তাহা নির্ম্মূল হইয়া যায়।

বিগত চার বৎসর যাবৎ জেনসেন আইওবা ষ্টেটের 'জমির 'সার-সংরক্ষণ' সমিতির সভ্যপদে নিযুক্ত আছেন। তিনি বলেন যে, ভবিষ্যতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থার ফলে আইওবা ষ্টেটের উৎকৃষ্ট জমিতে ফলন আরও অনেক বেশী হইবে। আইওবাতে প্রযুক্ত এই সমস্ত আধুনিক পদ্ধতির কৃষিকর্ম্ম যে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তার একটি প্রমাণ এই যে, সরকারী হিসাবমতে উক্ত ষ্টেটের এ বছরকার উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৭০০,০০০,০০০ বুশেল—প্রত্যেক একরে ৬১ বুশেল করিয়া শস্য জন্মিয়াছে। ইহা যুক্তরাষ্ট্রে শস্য-উৎপাদন-ক্ষেত্রে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে।

যোগাযোগ

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

জানি তার অন্ত নাই যে আনন্দ উচ্ছলিত রসে;
শত বর্ণ গন্ধ গানে দুঃখ-সুখে বরষে বরষে
প্রত্যহের পরিপূর্ণ মুখরিত পলকের দল,
আমার ভাবনারাশি নিত্য রাতে করেছে চঞ্চল।
একান্ত একেলা বসি বাতায়নে কান পেতে রাখি
কে বা আসে কে বা যায়—ডাকে কোন্ নিশাচর পাখী;
ফুলে ফলে অগণন গগনের তত্ত্ব তারাদলে,
বিচিত্র তরুর বুকে নিত্য নব প্রসাধন চলে
পুরাতন ধরণীর; ফুল ফোটে, ঝ'রে যায় পুন,
বর্ষা আসে পুষ্পগুচ্ছে মঞ্জরিয়া, নদির ফাল্গুনও
ফিরে চলে যায় কোথা! ধরণীর নিত্য আবর্ত্তন—
জীবনেরে পূর্ণ করে জন্ম আর মধুর মরণ।

ওই মাধবীর লতা, অঙ্গনের প্রান্তে গাঁদা ফুল
ধরণীর ধূলিরাশি-মৃত্তিকারে করিয়া আকুল
দুলিছে আলস্যভরে—রজনীগন্ধার গুচ্ছ সবে
মেলিয়াছে ঊর্দ্ধ্বে তার প্রাণশিখা বিপুল গৌরবে;
কত রূপে কত রসে কোন্ অতি-মানসের লীলা
প্রকাশ করিছে বিশ্ব—সাগরের মুক্তামণিনীলা
আর তুচ্ছ তৃণদল। পরিপূর্ণ আমার চেতন
অনুভব করে তার নিত্য চলা, নিত্য আগমন।
বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে অন্তহীন কল্পনায় তাঁর
আমারো রয়েছে স্থান যোগাযোগ আনন্দ বিহার;
আমারো বীণার তারে হৃদয়ের বাণী বাজে ক্ষণে
জীবনের অন্তরালে—কোলাহল ভরা জাগরণে।

প্যারিসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-সঙ্ঘের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ।
উপবিষ্ট (বাম হইতে) : ডাঃ ভাবা, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ। দণ্ডায়মান : কে.জি. সৈয়িদাইন, রাজকুমারী অমৃত কাউর, সার জন সার্জেন্ট

ইলিনয়সের 'মেডিল স্কুল অব জার্নালিজমে'র ছাত্রদিগকে হাতে-কলমে সাংবাদিকতা শিক্ষাদান

যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক পদ্ধতির কৃষিক্ষেত্র 'জেনসেন ফার্মে'র একটি দৃশ্য

আইওয়া ষ্টেটের অডুবনের নিকটবর্তী কৃষিক্ষেত্রে সার-সংরক্ষণ এজেন্ট জে. এইচ. লেন্টিমায়ার (বামে)
ও 'জেনসেন ফার্মে'র মালিক মিঃ জেনসেন

ক্ষত

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

স্টেশন হইতে বাড়ি পাকা তিন মাইল পথ। রাস্তা পাকা হইলেও—একযুগ অ-মেরামতিতে—চলিবার কালে মানুষকে পিছনেই ঠেলিতে থাকে; অন্ধকার রাত্রিতে হোঁচট খাওয়া তো অত্যন্ত সুলভ ব্যাপার। আগে আগে শনিবারের দিন কলিকাতা হইতে একখানি স্পেশাল ট্রেন ছাড়িত বেলা সাড়ে তিনটায়, যুদ্ধের তৃতীয় বার্ষিকে সেটা বন্ধ হইয়াছে। এখন সাড়ে পাঁচটার ট্রেণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। রাত আটটার কম সে ট্রেন স্টেশনে আসে না। পথের দুর্দশার কথা ভাবিয়া ঘোড়ার গাড়ির শেয়ারের পয়সা দিতেই হয়। প্রত্যেক শনিবারে বিজয় শেয়ারের গাড়িতে বাড়ি আসে—সেই জন্ম গাড়োয়ানরা তাকে খাতির করে বেশী। যারা গাড়ি চড়ে না, অন্ধকারে ওই দুর্গম পথ হাঁটিয়াই পার হয়—তাদের পাশ দিয়া যাইবার সময় গাড়োয়ানরা নিজেদের গাড়িগুলিকে বেশী জোরে হাঁকাইয়া প্রচুর ধুলা উড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠে। যারা আপিসে চাকরি করে অথচ গাড়ি ভাড়া দিবার প্রবৃত্তি নাই—তাদের উপেক্ষা বা জব্দ করার ঐ একটি মাত্র উপায়ই ওরা জানে। বিজয়কে ওরা খাতির করে। বাড়ির দুয়ারে গাড়ি থামিলে মণিব্যাগ বাহির করিয়া ভাড়া মিটাইয়া দিলে বিজয়কে ওরা সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া যায়। এই সম্মানটুকু পাইয়া বিজয় মনে মনে খুশি হয়।

এক শনিবার বিজয়ের খুশির পরিমাণ কূল ছাপাইয়া গেল। সেদিন শশী গাড়োয়ান ভাড়া তো লইলই না—উপরন্তু একখানা দশ টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল—এটা রেখে দিন বাবু, কাল দুপুরে আসবো আপনার কাছে—পরামর্শ আছে।

বিজয়ের আনন্দ হইবারই কথা। শুধু বিশ্বাস নহে, পরামর্শ লইবে বলিয়াছে। যারা ঘোড়ার গাড়ি চালায় তাদের ভাল রকমেই জানে ও। পাঁচু শা'র তাড়িখানাটা টিকিয়া আছে ওই গাড়োয়ান কয়জনের দৌলতেই। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে অবসর পাইলেই ওরা দোকানে গিয়া তাড়ি গিলিবেই। কাঁচা পয়সা রোজগার,—হিসাব নিকাশের বালাই নাই। গাড়ির মালিক কিছু গাড়োয়ানের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে পারেন না সারাদিন। রোজ বরাদ্দ কোনদিন কোনদিন ওরা মালিকের হাতে কিছু দেয়, কোনদিন দেয় না, তাড়ির দোকানে ঢালে। মিথ্যা বলিতে ওদের একটুও বাধে না। নিজের সংসারে ওদের অভাব লাগিয়াই আছে। চাল জুটিল তো পরণের কাপড় জোটে না; বাড়ি ঘর-দুয়ার অধিকাংশেরই নাই। গাড়ি ঘোড়া বা খাটুনি কোনটাই নিজের সংস্থানকে বাড়ায় না, মালিককেও যে সন্তুষ্ট করে এমন নয়। শস্তা নেশায়—তাড়িতে গাঁজাতে আর জুয়াখেলায় সর্বস্ব উড়াইয়া দিয়া ছন্নছাড়া জীবনযাপন করাতেই ওদের আনন্দ।

রাত্রিতে শুইয়া বিজয় ভাবিল, এমনই উন্মার্গগামী একটি জীবনকে যদি সৎ উপদেশ দিয়া ও সুপরিচালিত করিয়া ভদ্র গৃহস্থে পরিবর্তিত করা যায়—তার চেয়ে বেশী আনন্দ আর কিই বা লাভ হইবে। সে প্রতিজ্ঞা করিল, শশীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবে।

২

দুপুরবেলায় শশী আসিয়া তাহার পায়ের ধুলা লইয়া মেঝের উপর বসিল। অত্যন্ত বিনীতভাবে হাত জোড় করিয়া কহিল, বাবু আমার একটা গতি করে দিন, না হলে পরের গাড়ি ভাড়া নিয়ে কতকাল আর কাটাব। মেয়েটা বড় হয়ে উঠল—ওর বিয়ে দিতে হবে।

বিজয় বলিল, তোমরা তো উপায় মন্দ কর না শুনি—মালিকের পাওনা মিটিয়ে কিছু জমে না কেন?

শশী বলিল, কি করে জমবে হুজুর, ভাড়া আমার জুটুক না জুটুক মালিককে দৈনিক দিতে হয় দু'টাকা। একটা সহিস ঘোড়া ডলাই মলাই করে, মাঠ থেকে ঘোড়ার ঘাস নিয়ে আসে, তাকে দিতে হয় দৈনিক দশ আনা খাওয়া-পরা ইস্তক। তার পর দুটো ঘোড়ার ছোলা লাগে আট দশ সের। ষোল টাকা ছোলার মণ। তারপর আজ টায়ার ছিঁড়ছে—কাল চাকা ভাঙছে, এসব তো আছেই। আগে ভাল রবার পাওয়া যেত—এক পাট রবারে ছ'মাস চলতো। তা' ছাড়া রাস্তা ছিল ভাল। আজ কাল খোয়া ওঠা রাস্তায় বাজে টায়ার পনের দিন যেতে না যেতে—ব্যস। দাম আগেকার চারগুণ। তারপর মিনসিপালির আইনে ফাইন তো লেগেই আছে।

বিজয় বলিল, ফাইন দাও কেন—যা নিয়ম সেই রকম লোক নিলে ত হাঙ্গামা থাকে না।

শশী হাসিয়া বলিল, তা'হলে আমাদের পোষাবে কেন বাবু। এই বলে পুলিসের হাত তেলা করে ফাইন দিয়ে গাড়ি প্রিতি তিন টাকা থাকে। দিনে চারটে ক্ষেপে—গড়পড়তা দশটা টাকা—

তবে তোমাদের টাকা জমে না কেন?

আজ্ঞে—খেতে যে পরিবার, ছেলেপিলে নিয়ে দশটি প্রাণী। ধরুন চালের দাম—কাপড়ের দাম···

বিজয় বাধা দিয়া বলিল, আর তাড়িও ত যথেষ্ট গেল।

শশী মাথা নামাইয়া সলজ্জ কণ্ঠে কহিল, আজ্ঞে যা মেহন্নত হয়—তাতে একটু-আধটু নেশা না করলে খাটতে পারব কেন বাবু।

একটু-আধটু? শুনেছি যতবার স্টেশন থেকে ফেপ মার…

শশী নত মস্তকেই প্রতিবাদ করিল, না বাবু, এই উপার্জ্জন এর মধ্যে যত খুশি খেলেই হ'ল। তাড়ির দাম তাই বলে এক গেলাস…, এ প্রসঙ্গ অশোভন বলিয়াই সে সহসা চুপ করিল। খানিক মেঝেতে আঙুল দিয়া আঁক কাটিতে কাটিতে বলিল, নেশা খারাপ জিনিষ—খুবই খারাপ। তাই ত ভাবলাম—আপনাদের শ্রিচরণে উপার্জ্জনের টাকা ক'টা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তি হব। আমার গোছগাছ করে দিন বাবু।

এই কথায় বিজয় বিগলিত হইল। নিজেকে এক জন সংস্কারক মনে করিয়া কহিল, পারি তোমায় মানুষ ক'রে দিতে—যদি আমার কথা শোন।

আলবৎ শুনব বাবু। না শুনি তো আপনি আমার কান ধরে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারবেন গালে। আমায় পাঁচ জনের সামনে…

আচ্ছা। প্রত্যেক সপ্তাহে যখন বাড়ি আসব—আমাকে অন্তত দশটা করে টাকা দেবে—অবশ্য তোমার সংসার খরচ বাদে। ওই টাকা আমি পোষ্ট আপিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখব। যখন গাড়ি মেরামতির দরকার হবে নেবে তাই থেকে।

সে ত উত্তম কথা বাবু। কিন্তু নিজের গাড়ি না হলে কাজে ফূর্ত্তি হবে কেন বাবু। আপনি আমায় একখানা গাড়ি ক'রে দিন।

দেব। এই ভাবে টাকা জমলে তিন মাসে তোর গাড়ি-ঘোড়া সব হবে।

শশী মেঝের সটান শুইয়া পড়িয়া ভক্তি গদগদচিত্তে বিজয়ের পা ছুঁইয়া বলিল,গরীবের ওপর একটু নেকনজর রাখবেন বাবু।

শশী গমনোদ্যত হইতেই বিজয় বলিল, আর শোন—মদ খাওয়া তোমার ছাড়তে হবে। না হ'লে তোমার টাকা ফেরত নিয়ে যাও।

শশী এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তার পর আবার সটান শুইয়া পড়িল মেঝের। বিজয়ের মানা সত্ত্বেও তাহার পা খাবলাইয়া বলিল, এই পিতিজ্ঞে করলাম আজ থেকে নেশা আমার হারাম। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দু'টি কান মলিয়া গট্‌গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শশী চলিয়া গেলে বিজয়ের মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, শশেটা আজও মাতাল হয়ে এসেছিল বুঝি?

না মা—ওর মতি ফিরেছে। ও জীবনে আর মদ খাবে না প্রতিজ্ঞা করলে—আর দশটা টাকা আমার কাছে জমা রাখলে।

বিজয়ের মা বলিলেন, ওদের আবার প্রতিজ্ঞা—তুইও যেমন। আজেক দিন বউটাকে খেতে দেয় না, মারে। কালও বউটা আমাদের বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে গেল।

আচ্ছা দেখ মা—ওকে আমি শুধরে তুলবই।

মা হাসিয়া বলিলেন, তা বেশ, এখন খাবি আয়।

৩

পরের শনিবারে শশী বিজয়ের হাতে দশ টাকা দিল। তারপরের সপ্তাহে সাত টাকা।

বিজয় বলিল, এবার সাত টাকা যে? আবার বুঝি…

কান মলিয়া শশী বলিল, আপনার পা ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে করছি বাবু—মদ হারাম। এবার উপার্জ্জন কম হয় নি, তবে হঠাৎ মকবলে বিয়ের বায়না নিয়ে—মেঠো পথে গাড়ির ইস্‌পিরিং গেল ভেঙে। আপনাকে শনিবার ছাড়া তো পা[ই] না—তাই মেরামত করিয়ে নিয়েছি পরশু।

বিজয় খুশি হইয়া কহিল, বেশ।

শশী হাত জোড় করিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, আর বুঝি সব্বস্ব যায় বাবু। বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে উপোস করে মরতে হয়।

কেন—কেন?

মহাজন কত্তা তাগাদা দিয়াছে—পরশু থেকে গাড়ি কেড়ে নেবে।

কেন—রোজকের রোজ ভাড়া দিস না বুঝি?

দিচ্ছি তো বাবু। কিন্তু আগেকার পাওনা ওর পেরায় পঞ্চাশ টাকা—তারই জন্যে গাড়ি কেড়ে নেবার ভয় দেখায়।

তা আগের এত পাওনা হ'ল কি করে?

শশী মাথা নামাইয়া বলিল, আগে তো আমার চরিত্তির ভাল ছিল না—নেশাটা ভাংটা অযচ্ছল করেছি—তারই দরুন, বলিয়া সে বিজয়ের পায়ের উপর পড়িয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিজয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া কহিল, আঃ—কাঁদিস কেন? কি করতে হবে—তাই বল।

শশী বলিল, আমায় একখানা গাড়ি কিনে দিয়ে বাঁচান।

বিজয় বলিল, তা গাড়ি কেনবার এত টাকা কোথায়? মোটে তো সাতাশটি টাকা—

আপনি কিছু দিন বাবু—না হ'লে আমার—

আমি! বিজয় চমকাইয়া উঠিল।

হাঁ বাবু। দু' মাসে আপনার দেনা যদি শোধ না করতে পারি তো—আমার জুতোপেটা করবেন বাবু। আমার কান কেটে কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দেবেন বাবু।

অবশ্য এই কঠিন শপথে আশ্বস্ত হইয়া নহে—পরোপকার প্রবৃত্তির প্রাবল্যে বিজয়ের মনও অল্পে অল্পে দ্রব হইতেছিল।

শশী আড়চোখে বিজয়ের অনুকূল মুখভাব পাঠ করিয়া কহিল, বিশ্বাস আমায় করবেন না বাবু। গাড়ি ঘোড়া সবই আপনার নামে রাখুন। যেমন হপ্তায় হপ্তায় আপনাকে টাকা দিচ্ছি—তেমনি দিয়ে যাব। আপনাদের দায়ে দরকারে গাড়ি ভাড়াটাও লাগবে না—আর আমার পরিবারও রক্ষে হবে।

তাহার অশ্রুজল অনুনয় ও প্রতিশ্রুতি আরও কিছুক্ষণ চলার পর বিজয় বলিল, আচ্ছা—আসছে সপ্তাহে যা হয় বলব। শশী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

৪

তিন দফায় টাকা পাইয়া শশীর উপর বিজয়ের বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। শশী এবার ঠেকিয়া শিখিয়াছে। যৌবনের উদ্দাম আনন্দে নেশা করিয়া পয়সা নষ্ট করা ওদের জন্মগত স্বভাব। দুর্বলচিত্ত শশীও তার প্রভাব কাটাইতে পারে নাই। আজ সে উদ্দামতা ওর নাই। ক্রমবর্দ্ধমান সংসারের চাপে এবং রক্ত গাঢ় হইবার সঙ্গে সঙ্গে এমনটা না হওয়াই বরং আশ্চর্য্যের। শশীর মনে সংসারের অভিযোগ ও আঘাত লাগিয়া এই পরিবর্ত্তন হয়ত কিছুদিন হইতেই সুরু হইয়াছিল। তবু অভ্যাসবশতঃ নেশাটা সে ছাড়িতে পারে নাই। বিজয়ের সংস্পর্শে আসিয়া ওর চিত্ত দৃঢ় হইয়াছে এবং বিজয়ের পা ছুঁইয়া শপথ করার পর হইতেই ও সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়াছে। নেশার ঝোঁক থাকিলে তিন দফায় এই ক'টি টাকা কখনই শশী বিজয়ের কাছে গচ্ছিত রাখিতে পারিত না। বিজয় সঙ্কল্প করিল, শশীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে।

এই চিন্তার তলায় আর একটি সূক্ষ্ম চিন্তার প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছিল—সেটিও বিজয়কে খুশির স্বর্গে তুলিয়া দিল। নিজের নামে গাড়ি থাকিবে, যখন ইচ্ছা নিজেদের প্রয়োজনে এখানে ওখানে যাওয়া চলিবে, আর প্রতি শনিবার স্টেশন হইতে বাড়ি আসার জন্য কাহারও খোসামোদ করিতে হইবে না, যত ইচ্ছা মাল লইতে পারিবে—যে ক'জন বন্ধুকে খুশি গাড়িতে তুলিতে পারিবে। নিজস্ব একখানি গাড়ি থাকা কম গৌরবের নহে।

সে স্থির করিল গাড়ি কিনিবার জন্য বাকী টাকাটা শশীকে দিবে। দিতে যখন হইবেই তখন মিছামিছি বিলম্ব করিয়া লাভ কি?

দুই-এক জন বন্ধুকে সঙ্কল্পের কথা জানাইতেই তাহারা আনন্দে পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, বেশ ত, আমাদেরও এক-এক দিন গাড়ি চড়া হবে। গাড়ির লাইসেন্স তোর নামে থাকবে—আর ও যখন শুধরেছে তখন টাকাটাও চটপট শোধ হয়ে যাবে। খুব ভাল কাজ করলি বিজু, একটা পরিবারকে এ ভাবে বাঁচানো—সত্যি খুব ভাল কাজ।

বিজয়ের স্ত্রী বলিল, গাড়িখানা কার নামে থাকবে?

মনে করছি তোমার নামেই রাখব।

স্ত্রী মনে মনে অত্যন্ত খুশি হইয়া কহিল, শশীকে বলে দিয়ো কি হপ্তায় এই বুধ বিষ্যুদ বারে আমাদের যেন টকি দেখিয়ে আনে। আর মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করব।

বেশ ত, গাড়ি হ'লে সবই হবে।

মাও আনন্দিত হইয়া বলিলেন, অনেকদিন বাবলায় পাট দেখা হয়নি—আর একদিন বাগাঁচড়ায় মা বাক্‌দেবীর মানত শোধ করতে যাব।

বেশ ত।

হাঁরে—ফুলে নবলা অবধি গাড়ি যদি যায় ত এবার কৃত্তিবাসের মেলায় নিয়ে যাস আমাদের।

সবই হবে—গাড়ি আমাদেরই থাকবে। যে ক'দিন দেনা শোধ না হয়—যেখানে ইচ্ছে যাবে।

একা বিজয়ের নয়—সকলেরই কল্পনায় অল্প-বিস্তর রং ধরিল।

৫

পরের শনিবার স্টেশনের পথের ধুলার উপর শশী বিজয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল—আরও কয়েকজন গাড়োয়ান আসিয়া বিজয়ের পায়ের ধুলা লইল।

কেহ বলিল, বড়বাবু আপনার নাম আমরা যত দিন বেঁচে থাকব করব। শশেটাকে আপনি ছেলের মত মানুষ করে দিলেন।

কেহ বলিল, আমাদেরও একটা গতি করে দিতে হবে আপনাকে। রোজ রোজ পুলিসের হাঙ্গামা, বড়লোকের জুলুম—কম ভাড়া দেওয়া এ সবের ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে। আপনাকে পিসিডেন হতে হবে।

রহমৎ বলিয়া একজন গাড়োয়ান শশীর কাঁধে ধাক্কা দিয়া কহিল, লে শালা—ভাল করে বাবুর পায়ের ধুলো লে। তোর জন্যে বাবু যা করল!

আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইয়া বিজয় বাড়ি পৌঁছিল।

পরদিন সকালে শশী আসিয়া বলিল, গাড়ি এনেছি বাবু—আপনাকে একটু কষ্ট করে গোপালপুর যেতে হবে—না হ'লে গাড়িখানা বিক্রী হয়ে যাবে।

কত দর ঠিক করলি?

বেচ শ'র কমে ছাড়তে চায় না বাবু—আপনি যদি বলে করে কিছু কমাতে পারেন।

মাস কাবারের পুরা মাহিনার টাকাটা হাতে লইয়া বিজয় গাড়িতে গিয়া উঠিল।

ঘণ্টা-দুই পরে সে ফিরিলে স্ত্রী বলিল, হাঁ গা—গাড়ি কেনা হ'ল?

বিজয় হাসিমুখে বলিল, হাঁ—দুর্গা বলে বেরিয়েছি যখন—না কিনে কি ফিরি!

বেশ হয়েছে—মা সিদ্ধেশ্বরীর পুজো পাঠিয়ে দিই গে।

বিজয় বলিল, শশী বলছিল—আজ বিকেলে তোমাদের সিনেমা দেখিয়ে আনবে। যাবে?

যাব না আবার—কি যে বল! আনন্দে পাক খাইয়া বউ বাহির হইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, পাড়ার দু-এক জনকে নিয়ে যাব কিন্তু।

বন্ধু সনৎ বলিল, তুমি এখন একজন বিগম্যান বিজয়—খাইয়ে দাও আমাদের।

বিজয় হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, যাঃ—কি যে বলিস!

পথ দিয়া চলিবার কালে দোকানী বলে, বাবু—এই বার মানিয়েছে আপনাকে। গাড়ি না হলে চাকরি করে লাভ কি!

অন্ত গাড়োয়ানরা সেলাম করে—কেহ কেহ কোচবাক্স হইতে নামিয়া পায়ের ধুলাও লয়।

পাড়াতেও সকলে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছে, তবে আনন্দের তলায় ঈর্ষার ভাবটা স্পষ্ট দেখা যায়।

তা হবে বৈকি গাড়ি—চাকরির পয়সা, উপরিও ত আছে।

যখন হয় এমনিই হয়—গাড়িটার একটা আয় দাঁড়াল।

দেখেছ আজকাল বাজার করে আনে তাও গাড়ি চড়ে। পয়সা ত লাগে না।

মেয়েরাও বলে, বউয়ের ত গরবে পা পড়ে না মাটিতে। গাড়ি মেরে গঙ্গাস্নান! কালে কালে কতই দেখব!

প্রকাশ্যে সকলেই বিজয়ের খাতির করিয়া চলে। সামান্ত কাজের এই অসামান্ত ফল লাভে বিজয়ও যথেষ্ট স্ফীত হইয়াছে। সেও বুঝিয়াছে—যার মহিমাই মানুষ মুখে প্রচার করুক অন্তরে অন্তরে সে ঐশ্বর্য্যের ভক্ত। শ্রদ্ধা সম্মান ভালবাসা—এ সবেরই নিরিখ টাকা।

৬

এমনই স্ফীত জোয়ারের জলে পরিবারবর্গসহ বিজয় ভাসিতে লাগিল। ধনগর্ব্ব ঠিক নহে—অথচ গাড়িতে চাপিলেই মনে হয় এ গাড়িখানি আমার। এখানি যেখানে যতক্ষণ খুশি ব্যবহার করিতে পারি। ভাড়া লইয়া কেহ বচসা করিবে না—টাকার হিসাব কষিয়া মনও সঙ্কুচিত হইবে না। আর পথ দিয়া চলিবার কালে দু'পাশের লোকের বিস্ময় ভক্তি কুড়াইয়া পাওয়া, সে-ও কি কম ভাগ্যের কথা! বিজয় যে একজন ছন্নছাড়া হতভাগ্যকে পরিবারবর্গসহ সর্ব্বনাশের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে—এই সাধুবাদই কি ওই নীরব ভক্তি বিস্ময় মাখানো দৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়া উঠে না সর্ব্বক্ষণ? এর চেয়ে বড় পুরস্কার মানুষের জীবনে কিই-বা আছে!

মাস দুই পরে একদিন সনৎ বলিল, ওহে খুব ত নাম বার করেছ চার দিকে—গাড়ির হিসেব-পত্তর কিছু রাখছ?

বিজয় বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, গাড়ির আবার হিসেব-পত্তর কি?

সনৎ হাসিয়া বলিল, অবশ্য পরোপকার-প্রবৃত্তি ভাল। তবে আমার যেন মনে হচ্ছে মাস মাস টাকা দিয়ে শশী তোমার ধার শোধ করবে। ভুল শুনেছিলাম কি?

বিজয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, ঠিক বলেছ ভাই, গাড়িখানা কিনে মেরামত করতেও কিছু খরচ হয়েছে ওর—তাই টাকা চাই নি।

সনৎ বলিল, ভাল কর নি। রাশ আলগা দিলে দুষ্টু ঘোড়া ঠিক পথে চলে না—একটু হুঁস রেখ।

সোমবারে কলিকাতা যাইবার মুখে বিজয় শশীকে বলিল, হাঁ রে দু'মাস হ'ল আমায় ত কিছু দিলি নে। দেনা শোধ করবি কি করে?

শশী বলিল, ভাবছেন কেন বাবু—চোত্ মাসে ভাড়া মন্দা চলে, আসুক বোশেখ মাস—এক মাসেই ডবল টাকা তুলে দেব। উঠুন—ভাল হয়ে বসুন বাবু। সজোরে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশাইয়া সে গাড়ি হাঁকাইয়া দিল।

বৈশাখের দু'সপ্তাহ পরে বিজয় একটু চড়া গলায় বলিল, এসব ত ভাল নয় শশী, টাকা উপায় কর অথচ ধারশোধের নাম নেই!

শশী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, কোথায় উপায় বাবু, দিন দিন জিনিষের দর যা চড়ছে—

বিজয় বলিল, আজকাল মদও নাকি খাচ্ছ?

শশী তাহার পায়ের গোড়ায় সটান শুইয়া পড়িয়া কহিল, যে হারামজাদা আমার নামে লাগিয়েছে—

বিজয় তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, যে যাই বলুক—আসছে সপ্তাহে তোমার কাছ থেকে দশটি টাকা চাই, না হলে গাড়ি আটকে রাখব জানবে।

সে সপ্তাহে শশীর গাড়ি স্টেশনে পাওয়া গেল না।

মতি গাড়োয়ান বলিল, বাবু, আমার গাড়িতে আসুন—শশী কেষ্টনগরে গেছে ভাড়া নিয়ে।

রবিবারেও শশী ফিরিল না। সোমবারে হাঁটিয়াই বিজয় স্টেশনে গেল।

পরের শনিবারেও শশীকে স্টেশনে পাওয়া গেল না। মতি গাড়োয়ান বলিল, আসুন বাবু।

শশীর কি হ'ল?

মতি মুচকি হাসিয়া বলিল, আর বাবু বেটা তিন দিন থেকে নেশা করে পড়ে আছে—গাড়িও বার করছে না—আর ঘোড়াকেও খেতে দিচ্ছে না।

বাড়ি পৌঁছিয়াই বিজয় শশীর খোঁজে আস্তাবলে গিয়া দেখিল তাহার বাহ্যজ্ঞান নাই—বউকে খিস্তি করিয়া গাল দিতেছে।

বিজয় কঠিন কণ্ঠে ডাকিল, শশী—

শশী টলিতে টলিতে তাহার পায়ের গোড়ায় আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কিছু বলা বৃথা বুঝিয়া বিজয় বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

পরের শনিবার শশীকে স্টেশনে পাওয়া গেল। বিজয়ের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়া সে কহিল, বাবু মাপ করুন।

বিজয় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেও মুখে কিছু বলিল না।

জলযোগের পর মা বলিলেন, হাঁরে বিজু, গাড়িখানা তোর না শশীর?

কেন মা ?

পরশু বলে পাঠালাম বাগাঁচড়ায় নিয়ে যেতে—তা বললে কিনা আজ হবে না। কাল গঙ্গাস্নানে নিয়ে যাবার কথায় বললে, ভাড়া আছে। নিজেদের দরকারে যদি নাই পাওয়া যায় গাড়ি—তো এক কাঁড়ি টাকা ঢাললি কি জন্যে শুনি ? টাকা কি তোর বাক্সে ধরছিল না ?

বিজয় বলিল, দাঁড়াও—কাল দেখাচ্ছি মজা।

সনৎকে ডাকিয়া সে বলিল, কি করা যায় বল দেখি ভাই ? গাড়িখানা আটক করব ?

সনৎ বলিল, তোমার ত আস্তাবল নেই—গাড়ি রাখবে কোথায় ? আর ঘোড়া দু'টোরই বা কি ব্যবস্থা হবে ?

বিজয় বলিল, লাইসেন্স নেয়া আছে বউয়ের নামে—তাতেও ত গোলমাল হতে পারে।

পারে বৈকি—ও ব্যাটা শয়তান। শুনলাম বাইরে দু'-তিন জায়গায় এই রকম করে তোর কাঁধে চেপেছে।

তা'হলে উপায় ?

মিষ্টি কথায় ওকে বশ করে টাকা আদায় করতে হবে।

শশীকে ডাকিয়া বিজয় যথাসম্ভব মিষ্ট কথা বলিল। যদিও ওর ইচ্ছা হইতেছিল শশীর ভক্তিগদ্‌গদ্‌ শঠতা-মাখানো মুখে গায়ের ঝাল মিটাইয়া গোটাকতক চড় কসাইয়া দেয়। চড় মারিলে টাকা আদায় হইবে না সত্য কিন্তু, টাকা ফিরিয়া পাওয়ার চেয়ে তাহাই বেশী তৃপ্তিকর মনে হইতেছে।

শশী বিনয়ে বিজয়কে অভিভূত করিয়া দিল। যাইবার সময় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পায়ের ধুলা লইতেও ভুলিল না।

৭

মিষ্ট ব্যবহারের দেনা-পাওনায় আরও ক'টি মাস গেল। কোন বার শশী দু'টাকা জমা দেয়—কোন বার তার উপবাসী বউ কাঁদিয়া কাটিয়া চার টাকা ধার লইয়া যায়। বলে, আমরা তোমাদের আশ্রিত মা ! ওটা কি মানুষ ?—তা'হলে তোমাদের টাকা খেয়ে এত দুঃখু দেয় আমাদের ? খালি নেশা মা—খালি নেশা। আমরা ম'লাম কি রইলাম চেয়েও দেখে না।

এ সব ঘটে সপ্তাহের মধ্যবর্ত্তী দিনে। শনিবারে বাড়ি আসিয়া সব শুনিয়া বিজয় বলে, কেন দিলে ওকে টাকা ?

মা বলেন, শশেটা হতভাগা—কিন্তু বউ-ছেলেমেয়েগুলো কি দোষ করলে বাবা ? যা হোক—আমাদের গাড়ি নিয়েই ত চলছে ওদের সংসার।

হিসাবে পাওনাটা ভারি হইতে থাকে দিন দিন।...অবশেষে বিজয় সঙ্কল্প করিল, একটা হেস্তনেস্ত আজ করিবেই।

সনৎ শুনিয়া বলিল, তাই কর—তোর নিন্দে আর শুনতে পারি নে।

নিন্দে ? বিজয় বিস্মিত কণ্ঠে বলে, নিন্দে করবার মত কি কাজ করলাম আমি !

সনৎ বলিল,—সেদিন বাজারে বসে মদ খেয়ে তোর নামে যাচ্ছে তাই বলছিল। তোর দেনা নাকি কোন্ কালে শোধ হয়ে গেছে। গাড়ি কিনে ইস্তক টকি দেখানো—গঙ্গাস্নান করা—এখানে ওখানে যাওয়া—তোকে স্টেশন থেকে ফি সপ্তাহে বাড়ি আনা—এসব হিসেব করলে ওরকম গাড়ি নাকি তিনখানা কেনা যায়।

বলিস কি ! শয়তান এই সব বলছে ?

হাঁ। আরও বলছে—বাবু এমন অর্থপিশাচ যে, শনিবারে এসে সব টাকা কেড়ে-কুড়ে নেয়, ওর বউ ছেলেরা খেতে পায় না। লোকেও বলছে—তা হবেই ত। বড়লোকেরা আর কোন্‌কালে চায় গরীবদের মুখের পানে।

বিজয় স্তম্ভিত হইয়া সব শুনিল। টাকার জন্য ওর দুঃখ হইল, কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করিল।

আত্মসুখের স্ফীত বেলুন কুৎসার ছিদ্রপথে কখন চুপসাইয়া গেছে।

সোমবার বিজয় আপিস গেল না। নিজের বৈঠকখানায় শশীকে ডাকাইল—সনৎ ও আর এক জন বৃদ্ধ প্রতিবেশীকেও ডাকিল।

সকলের সামনে বিজয় বলিল, শশী, আমার কাছে কত তোমার পাওনা বল ? আজ কড়ায়-গণ্ডায় সব শোধ হয়ে যাক।

শশী যথারীতি কাঁদিয়া বিজয়ের পা জড়াইয়া বলিল, আপনি মালিক—

চুপ। বিজয় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কত হয়েছে আমার কাছে পাওনা বল ? বল ?

আশ্চর্য্য—এত নেশা করা সত্ত্বেও দীর্ঘ দশটি মাসের নির্ভুল হিসাব শশী আঙুল গণিয়া বলিয়া দিল।

সনৎ বলিল, যা দেখছি—তাতে দেনা-পাওনা সমান সমান দাঁড়ায় যে।

বিজয় বলিল, আন কাগজ-কলম—গাড়ি আমি ওর নামে লেখাপড়া করে দেব। ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না আর।

লেখাপড়া শেষ হইলে শশী গদ্‌গদ্‌ চিত্তে আর একবার বিজয়ের পায়ের ধুলা লইতে গেল। বিজয় পা সরাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, গেট আউট—গেট আউট।

এক মাস পরে এক শনিবারে মতি গাড়োয়ান বিজয়কে বাড়ির দুয়ারে নামাইয়া দিয়া হাত জোড় করিয়া কহিল, বাবু একটা নিবেদন আছে।

তাহার হাতে গাড়িভাড়া দিয়া বিজয় বলিল, কি ?

মতি বলিল, শশীর হিরে করে দিলেন—সে কথা সবাই বলাবলি করে। আপনি ওর বাপের কাজ করেছেন। আমিও দেখুন, পরের গাড়ি নিয়ে ব্যাগার খাটছি—

বিজয় কটমট চক্ষে মতির মুখের পানে কয়েক মিনিট তাকাইয়া রহিল। পরে স্নেহ-মাখানো স্বরে বলিল, টাকা চাই, না? আচ্ছা বলতে পার মতি, মানুষ ক'বার ঠকে?

বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সে হন্‌হন্ করিয়া বাড়ির মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ-বৎসর-বয়স্ক বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী কলেজের সিনিয়র ডিবিসনের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময়ে তাঁহার বাল্য-রচনার সূত্রপাত হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখন কলেজের ছাত্রবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য তাহাদের রচনা স্বীয় পত্রে স্থান দিতেন। তাঁহার প্রশস্তি-সমেত হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র, হিন্দু কলেজের দীনবন্ধু মিত্র, কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতির প্রথম রচনাগুলি 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর "বিবিধ" খণ্ডে ১৮৫২-৫৩ সনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ বাল্য রচনাই মুদ্রিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার আরও দুইটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; সে দুইটি নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

['সংবাদ সাধুরঞ্জন,' ৩ অক্টোবর ১৮৫৩]

শরদ্বর্ণনাচ্ছলে দম্পতির কথোপকথন।

কামিনী।

ললিত।

আ মরি, আ মরি মরি, আজিকার বিভাবরী,
নাথ কি দেখেছি শোভা, আ মরি আ মরি হে,
নিরমল নীলাম্বরে, ধীরে চলে শশধরে,
বিমল কোমল করে, সায় আলো করে হে।
অসীম বিমল নীলে, বিধু কর গেছে মিলে,
মাঝে তারা পূর্ণশশী, শত শোভা ধরি হে।
গেছে জলদের কাঁদ, শরতের পূর্ণ চাঁদ,
অমল মোহন শোভা, ধরা বয় পরি হে।
যৌবনে নবীনা নদী, ধীরে ধীরে নিরবধি,
প্রেম গান মৃদু গেয়ে, চলিছে সুন্দরী হে।
নিরমল বুকে তার, শশী তারা ছায়াকার,
সমীরণ নেচে যায়, যেন প্রেমেশ্বরী হে।
তৃণপূর্ণ তটে তার, ফুল নাচে অনিবার,
শশী কিবা শোভা পায়, হৃদয় উপরি হে।
স্মর বুঝি সেই স্থানে, গিয়েছিল ধনুর্ব্বাণে,
মারিল আমার প্রাণে, যাতনায় মরি হে।

পতি।

আমিও দেখেছি সখি, তেমতি প্রকার।
সকলি তেমতি মত, শরীরে তোমার।
ঢল ঢল দেহ-নদী, নবীন হিল্লোলে।
মাঝে তার মুখখানি, শশধর দোলে।
নিশ্বাস সমীর ধীর, সদা বয় জলে।
কাঁপায় নদীর নীর, হৃদয় মণ্ডলে।
জোর বায়ু নয় প্রাণ, পালেতে কি কায।
বুকের বসন পাল, নাবাতে কি লাজ।
অমনি চলিবে তরি, কাণ্ডারির গুণে।
কায নাই পালে সখি, কায নাই গুণে।
চল সখি বায় যাই, গভীর সলিলে।
ডুবে মরি সেও ভাল, স্বর্গ তাহে মিলে।
সে বরং ভাল সখি, জল খেয়ে মরি।
চড়ায় ঠেকিলে তরি, উপায় কি করি।
এ যে বড় দায় দেখি, বালির চড়ায়।
জল্ দে জল্ দে সখি, তৃষায় পোড়ায়।
হা জল যো জল করি, চারি পাশে চাই।
কেবলি যে বালি আর, ঘোলাজল পাই।
দেও লো রমণি মণি, এক বিন্দু জল।
তৃষায় বাঁচুক প্রাণ, হই লো শীতল।
নির্দয় অন্তর তুমি, স্বভাবত নারী।
তৃষা কি জান লো আগে, তবে দেবে বারি।
আ মরি রেগো না ধনি, আমার উপরে।
বালিকা বলেছি শুধু, রাগাবার তরে।
আসিতেছে এই সবে, যৌবন জুয়ার।
পূরুক পূরুক ধনি, দিব লো সাঁতার।
হবে কি এমন দিন, কপাল আমার।
এ নদী কাঁপিয়া হবে, অকূল পাথার।
বড় কালে বড় হবে, তুলিয়ে তরঙ্গ।
করিবে নিশ্বাস-বায়ু, হৃদি মাঝে রঙ্গ।
তরঙ্গে দুলিবে নদী, ঢেউ তুলে তুলে।
আমার কলার ভেলা, যাবে দুলে দুলে।
রেগো না রেগো না ধনি, মরি, রেগো না লো।
বড় নদী বলি নাই, বলিয়াছি ভালো।

কে জানে যদ্যপি এই, শরতের কালে।
এক টানা কাঁটা পাছে, ধটে লো কপালে॥
ভরা গাঙে পাল দিয়ে, ভেলা যেতে চোড়ে।
দয়ে পোড়ে যাবে বলি, কপালে দর্শপোড়ে॥
যাক যাক রাগাবো না, আর লো তোমায়।
কি বলিতে কি বলেছি, ক্ষমা কর তায়॥
যেমন দেখেছ দেখেছ তুমি, দৃশ্য চমৎকার।
তেমতি দেখেছি বলি, স্বরূপ তাহার॥
ঢল ঢল দেহ-নদী, যৌবন হিল্লোলে।
তার মাঝে আঁখি মুখ, তারা শশী দোলে॥
নিশ্বাস সমীর ধীর, সদা বয় জলে।
কাঁপায় নদীর নীর, হৃদয় মণ্ডলে॥
কূলগুলি আশে পাশে, অলঙ্কার তার।
কি কব রূপের কথা, নদীর আমার॥
মদন ছিল না, কিন্তু, তবু কাম কিসে।
অন্তর কেলিল বিষে, তার শর বিষে॥
পয়োধরে পঞ্চশর, জেনেছিল হর।
বুঝি এসেছিল তথা, করিতে সমর॥
রণে কাম পরাজয়, যেখানেতে তব।
ধনুর্ব্বাণ ফেলে গেছে, ভ্রূ কটাক্ষে তব॥

কামিনী।

যাও যাও কায নাই, কথা কয়ে আর।
ভরা গাঙ খুঁজে নিয়ে, দেও গে সাঁতার॥

পতি।

মরি এ নয় সোজা, রমণীর মন বোঝা,
কি কথায় করিয়াছ রোষ।
ছিছি ছিছি ছিছি প্রাণ, ছাড় ছাড় ছাড় মান,
ক্ষম মোর যদি থাকে দোষ॥
মুখ ম্লান দেখে শশী, গগন মণ্ডলে বসি,
হাসিতেছে প্রফুল্ল বদনে।
ছিছি ছিছি করি মান, তাহারি বাড়িল মান,
অপমান কেবলি আপনে॥
পায় ধরি রসবতি, কথা কও প্রাণ।
কেন লো যুবতি সতি, কেন কেন মান॥
দেখ দেখি প্রাণেশ্বরি, কুমুদিনী জলে।
হেসে হেসে, ভেসে ভেসে, প্রেমসুখে গলে॥

কামিনী।

না হে না হে না হে প্রাণ, সেও যে কোরেছে মান,
ছায়া ছলে অধোমুখ করি।
তাই শশী ছায়া ছলে, পায় ধরে গিয়ে জলে,
তবু মানে রহিল সুন্দরী॥
কাঁদে চাঁদ যাতনায়, জলে বুক ভেসে যায়,
ঐ কলঙ্ক অশ্রুধারা দাগ।
ছাড়ে শ্বাস দুখ ভরে, কাঁপে শশী কলেবরে,
জলে ঐ দেখে ছাড় রাগ॥

পতি।

তা নয় তা নয় প্রাণ, তার তরে নয়।
তার তরে নাহি জলে, শশধর রয়॥
তোমার বদন শোভা, দেখি শশধর।
লজ্জায় ডুবিয়া মরে, জলের ভিতর॥
যাইতে জলের মাঝ নিবারি তোমায়।
পাছে তব মুখছায়া জল মাঝে যায়॥
জলে ডুবে তবু চাঁদ, হোয়ে অপমান।
সে ভয়ে ঐ দেখ শশী, জলে কম্পমান॥
মনেতে ভাবিয়া দেখে, ডুবিয়াছে জলে।
তথাপি নিস্তার নাই, লজ্জার অনলে॥
তাই বুঝি ছার প্রাণ, রাখিবে না আর।
হৃদয়ে করিয়ে ছিল, অস্ত্রের প্রহার॥
রুধির পড়েছে তারি, ধারে ধারে বুকে।
তার চিহ্ন কলঙ্ক, বলিছে সবে মুখে॥
যদি বল চাঁদ যদি, ডুবে গেছে জলে।
কি ওই প্রকাশে শোভা গগন মণ্ডলে॥
সে তোমার মুখছায়া, পড়েছে আকাশে।
তোমারি মুখের মত, সুশোভা প্রকাশে॥
চিকণ চাঁচর কালো, যদি পড়ে গালে।
ছায়াতেও সেই দাগ, হয় সেই কালে॥
কালো কেশ ছায়া পড়ি, কালো দাগ হয়।
না জেনে কলঙ্ক চিহ্ন, মূর্খলোকে কয়॥
কতমত করি রাখ, বদনে বসন।
কভু পূর্ণ কভু কিছু, ঢাকহ বদন॥
তাই হয় কমী বেশী, আকাশের ছায়া।
লোকে বলে তিথি গুণে, বাড়ে চাঁদ কায়া॥
কিন্তু আর মিছে কথা, কায নাই কোয়ে।
শরদ যামিনী যায়, মিছে মিছি বোয়ে॥
কেন আর প্রাণেশ্বরী, বাহিরেতে রহ।
এখনি আসিবে রবি, কমলিনী সহ॥
দেখিব তখন কের, স্বভাবের ছবি।
প্রখর ক্রমেতে হবে, শরদের রবি॥
সোহাগিনী কমলিনী, মোহিনী সাজিবে।
হেসে হেসে মনসুখে, মরমে মজিবে॥

কামিনী।

বরষা কালেতে রবি, ছিল হে মলিন ছবি,
শরদে প্রখর কেন হবে।
তখন নলিনীচয়ে, ছিল হে মলিনী হয়ে,
এখন প্রফুল্ল কেন হবে॥

পতি।

দ্বিপ্রহরে দিনমণি, প্রেয়সীর পানে।
চেয়ে দেখে প্রেমভরে, গদ গদ প্রাণে॥
দেখে কোথা থেকে আসে, কমলিনী কাছে।
আর এক দিনমণি, জলে পড়ে আছে॥
না জেনে আপন ছায়া, মনে রাগিয়াছে।
বলে বুঝি পদ্মী ছুঁড়ী, এর সঙ্গে আছে॥
রাগেতে প্রচণ্ড তেজ, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
হইয়াছে দিনমণি, কমল উপর॥
মনে ভাবে মাপ চাবে, দাঁতে করি কুটো।
পদ্মী বলে হোলো ভালো, মিলে গেল দুটো॥
এই ভেবে মহানন্দে, হাসি-ভরা মুখ।
এমনে জানে না ছুঁড়ী, উপপতি দুখ॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হুগলী কালেজীয় ছাত্র।

'সংবাদ সাধুরঞ্জন', ২৪ অক্টোবর ১৮৫৩]

রূপক

বসন্ত বর্ণনাচ্ছলে দম্পতির কথোপকথন

পতি।

বসন্ত বাসরে মরি, যায় রবি বরা হরি,
ধরণী কি শোভা ধরি, দেখ না লো দেখ না।
মহী লো মোহিল মনে, মোহিনি লো সঙ্গোপনে।
বিনে তাহা দরশনে, থেকো না লো থেকো না॥

স্ত্রী।

বসন্তে বিষম স্মর, কালের কুসুম শর,
লক্ষ করে বক্ষোপর, যাব না হে যাব না।
সহজে অবলা নারী, জ্বালা সহিবারে নারি।
সে বাণে নির্ব্বাণ বারি, চাব না হে চাব না॥

পতি।

স্মর শরে প্রাণেশ্বরী, কেন সরে মন।
কি ভয় থা[illegible]তে আমি, তব নিকেতন॥
মারে যদি মারে শর, তব বক্ষোপরি।
হৃদে হৃদি দিয়ে আমি, লব বাণ ধরি॥
কহলো নিরখি সখি, কেমন কৌশল।
মহীর সুশোভা শত, সবল সকল॥
সুধাকরে সুধা করে, হাসে ফিরে বায়।
এখনো বদন-চন্দ্র, দেখেনি তোমায়॥
দেখাও দেখাও সখি, দেখাও বদন।
পূর্ণেন্দু পড়িয়ে লাজে, পলাবে এখন॥
না লো না লো থাক্ শশী, বিহরি গগনে।
মহিলে মহিলা তুমি, মজিবে আপনে॥
গগন মণ্ডল মাঝে, নিশাকর বিনে।
গ্রাসিতে গগন গ্রহ, গ্রহণের দিনে॥
প্রবল পামর রাহু, আইলে বাহিরে।
যখন যামিনীনাথ, দেখা না পাইরে॥
তব মুখ-শশী ভ্রমে, পাছে আসি গ্রাসে।
গগনে থাকুক চন্দ্র, বলি সেই ত্রাসে॥
কিন্তু লো তা হোলে রাহু, বাঁচিবে না আর।
বেণী-ফণি বিষ খেয়ে, বাঁচে সাধ্য কার॥
দেখ প্রিয়ে প্রভাকর, প্রখর প্রচণ্ড।
অহঙ্কার চূর্ণ তার, কর এই দণ্ড॥
বাহিরে এসো লো প্রাণ, এসো লো বাহিরে।
চাঁচর নীরদ ভরে, তাড়াও মিহিরে॥
নলিনী হইতে চায়, উপমা তোমার।
নাথেরে না দেখে লবে, গরবিনী আর।
না লো না লো এসো না লো, থাকিতে তপন।
তা হোলে পাব না তব, মুখ দরশন॥
বদন চন্দ্রমা হোলে, দিনেশ নিকটে।
রবি চন্দ্র মিলনেতে, পাছে কুহু ঘটে।
তথাপি লো প্রাণেশ্বরি, তাড়াও মিহিরে।
বাহিরো বাহিরো প্রাণ, বাহিরো বাহিরে॥
কমল কলিকা কুল, বসন্ত বাতাসে।
সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব কর, বদন প্রকাশে॥
না লো শশিমুখি মানা, তা করিতে করি।
সলিলে সরোজ থাক্, থাক প্রাণেশ্বরি॥
মধুপানে মধুকর, আসিবে যখন।
যদি নিজ কমলিনী, না করি দর্শন॥
ভ্রমে ভ্রমি তব মুখে, ভ্রমে সে ভ্রমরে।
জানি পদ্ম মুখে পাছে, মধুপান করে॥
তবু এসো এসো সখি, এসো লো তথাপি।
তোমা বিনা রহিবারে, না পারি কদাপি॥

স্ত্রী।

কিন্তু যে মলয় বয়, সুশীতল অতিশয়,
অগ্নিমাত্র নাই সঙ্গে তার।
বিরহে সখা না পায়, সখার সন্ধান চায়,
সমীরের বিরহ বিকার॥
বিরহি সে সমীরণ, করিব না পরশন,
বিরহির গায়ের বাতাস।
ওই শুন তার ভয়ে, কে যে, 'কুহু কুহু' রবে,
কুণ্ড বায়ু কয় তব পাশ॥

পতি।

কুহু কুহু শুন যাহা, সুমধুর স্বর।
তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি, অতি মোহকর॥

মানবমণ্ডলী মূঢ়, না জেনে সকলে।
কোকিল কলনা কুহু, সে ধ্বনিকে বলে॥

স্ত্রী।

রহস্য ছাড়িয়া দাও, আমার হে মাথা খাও,
কেন কর উন্মত্ত প্রলাপ।
যদি প্রতিধ্বনি হবে, ওই দেখ কুহু রবে,
কুজিতেছে কোকিল কলাপ॥

পতি।

আকাশে বিকাশে প্রিয়ে, দেখি দিবাকর।
ধরায় হতেছে খর', তব কলেবর॥
বদনে বিকাশে বিধু, তোমার প্রেয়সি।
সরোজিনী সখা সহ, সপ্রকাশ শশী॥
রবি শশী একত্রেতে, বুঝি কুহু হয়।
তাই গো কোকিলকুল, কুহু কুহু কয়॥

স্ত্রী।

বল দেখি তরুদল, কি কারণ ঝলমল,
করিতেছে নবীন পল্লবে।
বোধ হয় সেই ছলে, নবীন পল্লবদলে,
নব বেশ পরিয়াছে সবে॥

পতি।

বসন্ত যৌবন দিন, পেয়ে সবে রসাধীন,
হোলো তরু নব লতা আর।
পুষ্পেতে পূরিল সব, হইয়াছে পুষ্পোৎসব,
ফুল ফুটিয়াছে সবাকার॥
সে কারণে রীতিমত, তরুগণে প্রথমত,
শিশিরেতে করিয়াছে স্নান।
পরে বৃক্ষ লতাদলে, করেছে নবীন দলে,
নব বেশ ভূষা পরিধান॥

স্ত্রী।

গুঞ্জরে ভ্রমর কেন, নিকুঞ্জ নিকরে।
'গুণ গুণ' করি অলি নিকরে কি করে॥

পতি।

যতেক নাগর ফুলে, প্রফুল্ল কুসুম তুলে,
নাহি দেয় মধু মধুকরে।
অলি তায় ক্রোধভরে, অস্ত্র অন্বেষণ করে,
জ্বালা দিতে নাগর নিকরে॥
করিতে মানস পূর্ণ, দর্শন করিল তূর্ণ,
তব ভ্রূ মদন ধনু মত।
কিন্তু তাহে গুণ নাই, গুণ চেয়ে ভ্রমে তাই,
গুণ গুণ স্বরে অবিরত॥

কামিনী।

নিরমল নীলাকাশ, শশধর সপ্রকাশ,
নক্ষত্রের বিভাবরী, কিবা শোভা ধরিয়াছে।
যেন দরপণ করি, শশাঙ্ক গগনোপরি,
পাশে লক্ষ তারাগণ, কত শোভা করিয়াছে॥

পতি।

গগন তোমার রূপ, কোরে দরপণ।
সহস্র তারায় চেয়ে, সহস্র নয়ন॥
শশাঙ্কের দীপ জেলে, দেখে ভাল করি।
বায়ু শব্দে প্রশংসায়, বলে মরি মরি॥

কামিনী।

দেখ দেখ প্রাণ সখা, কুসুম নিকরে।
নেচে নেচে হেলে দুলে, কত শোভা করে॥
কেহ রাঙা, কেহ নীল, শ্বেত কেহ কেহ।
বিমল কোমল কিবা তাহাদের দেহ॥

পতি।

শুনিয়ে তোমারি ভূষণ রব।
মনে করেছিল কুসুম সব॥
দল বেঁধে বুঝি আলি নিকরে।
এসেছে বুঝিবা মধুর তরে॥
মনে করিয়াছে দিবে না মধু।
দুলে ঘাড় নাড়ে 'না না না বঁধু'॥
কারো কারো ছিল বরণে ভ্রম।
বলে কেহ নাই আমার সম॥
কিন্তু তোমা দেখি সে লাজ পায়।
অধোমুখে দেখে কি বর্ণ পায়॥
তাই হেঁট মাথা কুসুমচয়।
কেহ অভিমানে বৃক্ষে না রয়॥
বরণ নাশিতে ভূমেতে পড়ি।
কাদা মাখি দেয় ঐ গড়াগড়ি॥

কামিনী।

মলিন ছিল হে কমল শীতে
বসন্তে কেমন সুপ্রকাশিতে॥
কেমন সুন্দর আ মরি মরি।
মনে হয় যেন হৃদয়ে ধরি॥
ফুটেছে সকল কমলদল।
রক্তিম শ্বেতাঙ্গ সুনিরমল॥
তাহার উপর নীহার কণা।
আশে পাশে শোভে দেখ দেখ না।

পতি।

সরোজিনী সদা দেখেছে মরে।
তোমার সমান হবার তরে॥
দেখেছে তোমার বদনোপরে।
পাশে স্বর্ণ ভূষা কিরণ করে॥
তেমনি কিরণ দিবার আশে।
নীহারের কণা মেখেছে পাশে॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হুগলি কালেজের ছাত্র।

বুদ্ধের ব্রহ্মবিহার ও বোধিসত্ত্বের আদর্শ

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

গৌতম বুদ্ধ তাঁহার পূর্বজীবনে বোধিসত্ত্ব ছিলেন। জাতকে দেখিতে পাই, এই বোধিসত্ত্বাবস্থায় তিনি সর্বদা সর্বপ্রাণীর হিতসুখ সাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। সর্বজীব-জগতের সুখ ও কল্যাণের জন্য নিজের সর্বস্ব, এমন কি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে তিনি সতত উদ্যত ছিলেন। বোধি-সত্ত্বের আদর্শ কি, তাহা জাতকে কথিত বুদ্ধের পূর্বজীবনের ঐ কথিকাসমূহ হইতে কতক বুঝা যাইবে।

'বোধি' অর্থাৎ বোধ বা জ্ঞান। সত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণী। "জ্ঞানের জন্য যে প্রাণী (প্রচেষ্টা করিতেছেন)" তিনি বোধি-সত্ত্ব। ইহা হইল বোধিসত্ত্ব শব্দের আক্ষরিক অর্থ। বোধিসত্ত্বের আদর্শ যেখানে বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, মহাযান বৌদ্ধগণের পরম প্রিয় ও প্রামাণিক সেই 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থে ইহার ভাবার্থ দেওয়া হইয়াছে এইরূপ :—"সর্বজীবের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বোধিপ্রাপ্তি নিমিত্ত যে সংকল্প এবং সেই সংকল্পসাধনের জন্য যে-প্রয়াস, তাহার নাম বোধিচিত্ত।"[১] এই বোধিচিত্ত যিনি বরণ করিয়াছেন (বা এই বোধিচিত্ত যাঁহার মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে), তিনি বোধিসত্ত্ব।"

সংস্কৃত, চীন ও তিব্বতীয় ভাষায় রচিত ও অনূদিত মহাযান বৌদ্ধ-শাস্ত্রের সর্বত্র এই বোধিসত্ত্বের আদর্শ, এবং কোথাও কোথাও আত্মত্যাগী বোধিসত্ত্বের অপূর্ব মহিমামণ্ডিত জীবনকাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বোধিসত্ত্ব একাধারে জ্ঞান লাভ করিবেন ও কর্ম করিবেন, জ্ঞানলাভের জন্য কর্ম করিবেন এবং কর্ম করিবার জন্যও জ্ঞানলাভ করিবেন, একটিকে ছাড়িয়া অন্যটি হইবার নহে। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, বোধিসত্ত্ব একদিকে যেমন ধ্যান করিতেছেন অন্যদিকে তেমনি জীবসেবাদি কর্মও করিতেছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে ধ্যানের নয় প্রকার স্তর বা সমাধির উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ নয়টি অবস্থার[২] বিষয় উল্লিখিত আছে। বুদ্ধদেব নিজে এই নয়টি স্তরের সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন।[৩] এই নয়টি স্তরের প্রথম স্তর প্রাপ্ত হইবার জন্য যাহা যাহা ধ্যানের অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়, তাহাদের একটি হইল—"অপরিমেয় চিত্ত।" মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই গুণ চতুষ্টয়কে "অপরিমেয় চিত্ত" বা "ব্রহ্মবিহার"[৪] বলিয়া বৌদ্ধ-শাস্ত্রে অভিহিত করা হইয়াছে।

বৈদিক ও বৌদ্ধগণ উভয়েই এই চারিটি "মনোভাবকে" যোগসাধনায় অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকার করিয়াছেন।[৫] তবে বৌদ্ধগণ ইহাদিগকে অধিকতর ব্যাপক এবং কখনও বা বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। "মাতা যে ভাবে নিজের একমাত্র পুত্রকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করেন, সমস্ত জীবগণের জন্য চিত্তকে সেই 'অপরিমেয় ভাবে' ভাবান্বিত কর।" সুত্তনিপাত, ১।৮।৭। মৈত্রীসাধনা, পৃ. ১৬।

এইরূপ (পরিমাণহীন) মনোভাবকেই "অপরিমেয় চিত্ত" বলা হইয়াছে।

ইহার মধ্যে পুত্র প্রেমানুরূপ প্রেমকে মৈত্রী বলা হয় :—গুণবান একমাত্র পুত্রের উপর যেমন কোন গৃহস্বামীর মজ্জাগত প্রেম, সমস্ত জীবের উপর সেইরূপ মজ্জাগত প্রেমই হইল মৈত্রী।

এই মৈত্রী যখন বিরাটরূপ ধারণ করিয়া মহা মৈত্রীরূপে কাহারো চিত্তে উৎপন্ন হয় তখন তিনি নিজের দেহ, নিজের জীবন নিজের সমস্ত কল্যাণের মূল (কুশলমূল)[৬] পর্যন্ত সমস্ত জীবজগৎকে দান করেন ; অথচ তাহার কোন প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করেন না। শিক্ষাসমুচ্চয়, ১৪৬,২৮১। মৈত্রীসাধনা, পৃ. ১৬-১৭।

১। বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ ৬, ১৫।

২। ইহার মধ্যে প্রথম চারিটিতে রূপের (Matter) উপলব্ধি হয়। অবশিষ্টগুলিতে রূপের উপলব্ধি হয় না। নবমটি হইতেছে সমাধির সর্বশেষ অবস্থা, যখন সর্বপ্রকার চেতনা ও অনুভূতি সম্পূর্ণ ভাবে নিরুদ্ধ হয়। এই অবস্থায় মৃতের সহিত সমাধিস্থ ব্যক্তির প্রভেদ মাত্র এইটুকু যে, তাঁহার দেহ উষ্ণ থাকে, প্রাণ বহির্গত হয় না এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নষ্ট হয় না।

৩। দীঘনিকায়ের মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধ পরিনির্বাণের পূর্বে ধ্যানের এই স্তরে প্রবেশ করেন। আনন্দের তখন ধারণা হয়, তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া ভদন্ত অনুরুদ্ধকে প্রশ্ন করেন : ভন্তে অনুরুদ্ধ, ভগবান্ কি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন ? অনুরুদ্ধ বলিলেন : আনন্দ, ভগবান নির্বাণ প্রাপ্ত হয় নাই, তিনি "সংজ্ঞাবেদিতনিরোধ" সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪। ব্রহ্মবিহার—"ব্রহ্মবিহার" শব্দের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে :—ব্রহ্মার চিত্ত বিশুদ্ধ নির্দোষ। তিনি নির্দোষ চিত্তে বিহার করেন। এই মৈত্রী করুণাদির দ্বারা যোগিগণও ব্রহ্মসম হইয়া নির্দোষ চিত্তে বিহার করেন। সুতরাং ইহা "ব্রহ্মবিহার।" বিসুদ্ধিমগ্গ, ৯ম, পরি, মহাযানীদের বোধিচর্যাবতারের ৯ম পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে, চিত্তের 'ব্রহ্মতা' বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ আছে।

৫। যাহারা সুখভোগ করিতেছে তাহাদের সুখে সুখ (বন্ধুর ন্যায় আচরণ বা মৈত্রী), যাহারা দুঃখভোগ করিতেছে তাহাদের দুঃখে দুঃখ (করুণা), যাঁহারা পুণ্যাত্মা, তাঁহাদের পুণ্যকর্মে আনন্দ (মুদিতা) এবং যাহারা পুণ্যাত্মা নহে, অথবা যাহারা পাপী, তাহাদের প্রতি ঔদাসীন্য (উপেক্ষা), এই ভাব অভ্যাস করিতে করিতে মন প্রসন্ন, প্রশান্ত হইয়া যাইবে (এবং তখনই) তাহা একাগ্র করা সম্ভব হইবে) পাতঞ্জলদর্শন, ১।৩৩।

৬। ক্রোধ, লোভ ও মোহের অভাবকে বৌদ্ধশাস্ত্রে "কুশল মূল" বলা হইয়াছে। এই তিন বৃত্তির অভাব বা নিবৃত্তিই সমস্ত কুশলের (বা কল্যাণের) মূল বা উৎস।

আর্তপুত্রের প্রতি পিতার যে প্রেম, (আর্ত) জগতের প্রতি সেইরূপ প্রেমই হইল করুণা।—বোধিচর্যাবতার, ৯।১৬। এই করুণা যখন পরিবর্ধিত হইয়া কাহারো অন্তরে মহা-করুণা রূপে উদিত হয়, তখন (আর্ত পুত্রের পিতা যেমন নিজের কথা না ভাবিয়া সর্বপ্রথম পুত্রের আরোগ্য কামনা করেন, সেইরূপ) তিনি সর্বপ্রথম জগতের অন্য সমস্ত প্রাণীর বোধি আকাঙ্ক্ষা করেন—নিজের নহে। শিক্ষা, পৃ. ১৪৬। মৈত্রী, পৃ. ১৭।

অন্যের সুখে যে সুখপ্রাপ্তি, অন্যের আনন্দে যে আনন্দলাভ তাহাই হইল মুদিতা।

উপেক্ষা—(১) ঔদাসীন্য (২) সুখানুভূতি বা দুঃখানুভূতির অভাব। (৩) অনাসক্তি। প্রেম ও করুণায় প্রাণ ভরপুর রহিবে কিন্তু আসক্তি রহিবে না, ইহাই বোধিসত্ত্বের সাধনা।

এই অপরিমেয় চিত্তের ভাবনার দ্বারা ধ্যানের প্রথম স্তর, বা সমাধির প্রথম অবস্থা প্রাপ্তি হয়।৭"

বোধিসত্ত্বের শিক্ষা ও কর্ম আরম্ভ হয় এই চারি "অপরিমেয় চিত্তের" অভ্যাস ও প্রয়োগের দ্বারা। এই শিক্ষা তাঁহার জীবনে এরূপ চরিতার্থতা লাভ করে যে, তাঁহার দেহ যখন ছিন্ন হইতে থাকে, তখনও বেদনা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তখনও তিনি সর্বজীবের জন্য মৈত্রী বিস্তার করেন।—শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃ, ১৮১। যাহারা তাঁহার দেহ ছিন্ন করিতে থাকে, তাহাদের মুক্তির জন্যই তিনি সমস্ত সহ্য করেন। ঐ পৃ, ১৮১। মৈত্রীসাধনা, পৃ. ১৯। প্রেমের গভীরতা এবং উচ্চস্তরের সমাধি৮প্রাপ্তির দ্বারা ইহা সম্ভব হয়।

বোধিসত্ত্ব বলেন:—প্রাণিগণ বড় অসহায়। ক্রোধ, লোভ ও মোহ তাহাদের অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এমন কোন কুশল-কর্ম করিবার শক্তি তাহাদের নাই, যাহার দ্বারা তাহারা নিজেদের উদ্ধার করিবে। তাহারা যখন নিজেদেরই উদ্ধার করিতে পারে না, তখন অন্যকে উদ্ধার করিবে কিরূপে?

"সুতরাং আমিই সকলের দুঃখের ভার গ্রহণ করিতেছি। জগতের সমস্ত প্রাণীকে আমায় মুক্ত করিতে হইবে। সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করিতে হইবে।—শিক্ষা, পৃ. ২৮০-৮২; মৈত্রী, পৃ. ২০-২২। "আতুর যাহারা আমি তাহাদের ঔষধ হইব। বৈদ্য হইব। রোগ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি তাহাদের শয্যাপার্শ্বচারী পরিচারক হইব। "দরিদ্রগণের অক্ষয় নিধি-স্বরূপ হইয়া নানা উপকরণরূপে আমি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকিব।" "আমি অনাথের নাথ, পথিকগণের পথ-প্রদর্শক এবং নদনদী উত্তরণকামীর নৌকা ও সেতু হইব।" "আমি দীপাকাঙ্ক্ষীর দীপ, শয্যাভিলাষীর শয্যা এবং দাসাকাঙ্ক্ষীর দাস হইব।" "এই ভাবে অনন্ত আকাশপ্রমাণ অপরিমেয় জীবগণের আমি (পঞ্চভূতের ন্যায়) নানারূপ ভোগের উপাদান হইব। যতদিন পর্যন্ত সমস্ত জীব নির্বাণ-লাভ না করে ততদিন পর্যন্ত আমি তাহাদের উপজীবিকার উপায় হইব।"—বোধিচর্যাবতার, ৩।৭—২১; মৈত্রীসাধনা, পৃ. ২২—২৪।

বোধিসত্ত্ব বীর-সাধক। তাঁহার ধর্ম বীর-ধর্ম। বলহীনের দ্বারা উহা প্রাপ্ত হইবার নহে। শাস্ত্রে আছে, 'বায়ু বিনা যেমন গতি সম্ভব নহে, সেইরূপ বীর্য বিনা পুণ্যও সম্ভব নহে। বীর্য বিনা ক্ষমাগুণ অর্জন হয় না। সুতরাং বীর্যবান্ হইয়া ক্ষমা অভ্যাস করিবে। বীর্যেই বুদ্ধত্ব অবস্থান করিতেছে। বোধিচর্যাবতার, ৭।১। "যাহারা আমাকে মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত করিবে, যাহারা আমার শারীরিক ও মানসিক অপকার করিবে, যাহারা আমাকে উপহাস করিবে, তাহারা এবং অবশিষ্ট অন্য সকলেও যেন বুদ্ধত্ব লাভ করে। "সর্ব-জীবের যথেচ্ছ সুখলাভের জন্য আমার এই দেহ। আঘাত করুক, নিন্দা করুক, ধূলির দ্বারা আচ্ছন্ন করুক, তাহাদের সুখকর যে-কোনো কার্য তাহারা করুক, তাহাদিগকেই এই দেহ সমর্পণ করিয়াছি।—ঐ, ৩।১২-১৬। মৈত্রী, ২৪-২৫।

বীর বিনা এমন কথা কে বলিতে পারে? ইহা শুধু কথার কথা নহে, ইহা জীবনে সার্থক করিয়া গিয়াছেন, এমন বোধিসত্ত্বের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শত্রু যখন শূন্যবাদী বোধিসত্ত্ব আর্যদেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে মারাত্মক অস্ত্রাঘাত করিল—তিনি তখন তাহাকে শান্তভাবে উপদেশ দিলেন; "বৎস, ঐ দেখ আমার কাষায় বস্ত্র। ঐ আমার ভিক্ষাপাত্র। উহা লইয়া ভিক্ষুর বেশে সজ্জিত হইয়া এখনই ঐ পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন কর।"

গুরু মরণাপন্ন। শিষ্যগণ চতুর্দিকে রোদন করিতেছে। কেহ কেহ মর্মভেদী করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিতেছে—"কে হত্যা করিল? এমন নৃশংস অত্যাচার করিল কে?" "মুমূর্ষু গুরু প্রশান্ত বদনে উত্তর দিলেন:—

"নাহি প্রাণ, নাহি প্রাণী, নাহি হত্যা নাহি অত্যাচার।
জন্ম নাহি, মৃত্যু নাহি, নাহি সুখ, দুঃখ হাহাকার।

৭। মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা অপেক্ষাও উপেক্ষা উৎপন্ন করা অধিকতর কঠিন। তবে উপেক্ষা ব্যতীতও কেবলমাত্র মৈত্রী, করুণা ও মুদিতার দ্বারাই ধ্যানের প্রথম স্তর, এমন কি দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর পর্যন্ত প্রাপ্তি হয়। উপেক্ষার দ্বারা (যেহেতু উহা চিত্তের উন্নততর অবস্থায় উৎপন্ন হয়) চতুর্থ স্তর পর্যন্ত লাভ হয়।

৮। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে আছে—"চিত্তস্থিতি" নামক একপ্রকার সমাধি প্রাপ্ত হইলে মানুষ সর্ব ব্যাপারেই আনন্দলাভ করে। তখন আনন্দ ভিন্ন অন্য কোনো অনুভূতি চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। তখন হস্ত, পদ, কর্ণ, নাসিকা ছিন্ন বা চক্ষু উৎপাটিত হইতে থাকিলেও ব্যথা প্রাপ্তি হয় না। ইক্ষুর ন্যায় নিষ্পেষিত বা তপ্ততৈলে নিক্ষিপ্ত হইলেও তখন বেদনা হয় না।—শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃ. ১৮১।

কে তোমার প্রিয়জন ? কার তরে কর অশ্রুপাত ?
কে মারিল ? কে মরিল ? কে করিল কারে অস্ত্রাঘাত ?
ছিন্ন হোক মোহবন্ধ সব। মিথ্যা দৃষ্টি হোক তিরোহিত।
মহা ব্যোম-সমান-শূন্যতা-শান্ত-শিবপ্রপঞ্চ-অতীত।"

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭।

অনেকের ধারণা, ভারতীয়গণের যাহা কিছু সাধনা সমস্তই নিজের মোক্ষলাভের জন্ত। মৈত্রী, করুণার অভ্যাস বা জীব-সেবাদি সমস্ত শুভকর্মেরই এই একমাত্র লক্ষ্য। উহার দ্বারা নিজের মোক্ষলাভ হয় বলিয়াই উহা করা হয়। উহা নিজেরই স্বার্থসিদ্ধির জন্ত, পরের জন্ত নহে।

সর্বদেশে, সর্বজাতির মধ্যে, সর্বসময়েই এইরূপ একদল সাধক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা কেবল নিজের মুক্তির জন্তই সাধনা করিয়াছেন বা করিতেছেন। কিন্তু "ভারতীয় সাধকগণ সকলে নিজের মোক্ষের জন্তই সাধনা করিয়াছেন"—এইরূপ ধারণা নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত।

"আতুর অভাজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একা মুক্তি চাহি না।—ভাগবত, ৭।৯।৪৪। মৈত্রীসাধনা, পৃ. ২১। "আমি স্বর্গ চাহিনা, মুক্তি চাহি না—সমস্ত জগতের দুঃখ দৈন্ত ক্লেশকেই আমি বরণ করিতে চাই। যত দিন পর্যন্ত শেষ জীবটি মুক্তিলাভ না করে, তত দিন পর্যন্ত বার-বার এই বিশ্বে জন্মগ্রহণ করিতে চাই।"—ভাগবত, ৯।২১।১২। মৈত্রী, পৃ. ৬৪। "একটি প্রাণীর জন্ত সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত আমি এই জগতে অবস্থান করিব।"—শিক্ষা সমুচ্চয়, পৃ. ১৪। মৈত্রীসাধনা, পৃ. ৬২। জীবগণ যখন দুঃখবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে থাকে, তখন প্রাণে যে আনন্দসাগরের সৃষ্টি হয়—তাহাই পর্যাপ্ত। রসহীন শুষ্ক মোক্ষে কি প্রয়োজন ?" ঐ, পৃ. ৩৬৭ ; বোধিচর্যাবতার, ৮।১০৮। মৈত্রীসাধনা, পৃ. ৬২।

ইহা ভারতীয় বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধকগণই বলিয়া গিয়াছেন। বোধিসত্ত্বগণের এই সাধনা যে কতদূর পরার্থপর তাহা দিয়ে আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে:—"ইঁহারা যে ধর্মজীবন যাপন করেন, নিজ চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করেন, তাহা স্বর্গের জন্ত বা ইন্দ্রত্বলাভের জন্য নহে। কোন ভোগ, কোন ঐশ্বর্য, দেহের বিশেষ বর্ণ, রূপ বা সৌন্দর্যলাভের জন্য, যশের জন্ত কিংবা পশুজন্ম বা নরকাদির ভয়ে তাহা ইঁহারা করেন না। সর্বজীবের হিতের জন্য, সুখের জন্য, কল্যাণের জন্তই ইঁহারা ধর্মজীবন যাপন করেন। নিজের চরিত্র রক্ষা করেন।"—শিক্ষা, পৃ. ১৪৭, মৈত্রী পৃ. ১৮। ইঁহারা প্রত্যেকে বলেন, "আমি যে এই অনুত্তর সম্যক্ সম্বোধির জন্ত যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি, উহা কোনরূপ ইন্দ্রিয়সুখের আশায় নহে, কামোপভোগের জন্ত নহে। আমার সর্বজ্ঞতা উৎপাদন সর্বজীবজগতের উদ্ধারের জন্ত।"—শিক্ষা, পৃ. ২৮১। "জগতের সকল জীবের জন্ত আমি আমার কুশলমূল উৎপন্ন করিতেছি, উহাকে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত করাইতেছি। উহা সকলের উদ্ধারের জন্ত নিয়োগ করিব। শিক্ষা, ২৮২। আমি আমার কুশলমূলকে এমন ভাবে পূর্ণতায় পরিণত করিব, যাহাতে সমস্ত প্রাণী পরম সুখলাভ করে। অসমুদ্ভূত আনন্দ অধিগত হয়। সর্বজ্ঞতায় আনন্দ প্রাপ্ত হয়। শিক্ষা, ২৮১। জগতের সর্বজীবের দুর্গতিতে অবস্থান করা অপেক্ষা বরং আমি একাকীই দুঃখ ভোগ করি। আমি স্বেচ্ছায় নিজেকে বন্ধক রাখিয়া তাহার পরিবর্তে সমস্ত জগতকে নরক হইতে, পশুজন্ম হইতে, যমলোক হইতে উদ্ধার করিব। সর্বজীবের হিতের জন্ত সমস্ত দুঃখ-বেদনা আমি আমার এই নিজের দেহেই ভোগ করিব। শিক্ষা, পৃ. ২৮১। মহাযান সূত্রালংকার, ১৩।১৪। আমি আমার এই দেহ সর্বজীবের জন্ত উৎসর্গ করিয়াছি। আমার সর্ব বাহ্যসম্পদ, যাহার যাহা কাজে লাগিবে তাহা তাহাকেই দান করিব। হস্ত, পদ, চক্ষু, রক্ত, মাংস, মজ্জা, মস্তক এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যে যাহা চাহিবে, আমি তাহাকেই তাহা দান করিব। ধন-ধান্য, শস্যাদি, স্বর্ণ রৌপ্যাদি, মণি-মুক্তাদি, অশ্ব, রথ, শকট, গ্রাম, নগর, রাজ্য, দাস-দাসী, পুত্র-কন্যাদি বাহ্য বস্তুর আর কথা কি—আমার যাহা কিছু যতক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ যাহার যাহা প্রয়োজন তাহাকেই তাহা দান করিব। অনুতাপ না করিয়া ক্ষোভ-বর্জিত হৃদয়ে কোনোরূপ প্রতিদানাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক, নিরাসক্ত ভাবে সর্বজীবের প্রতি করুণা ও অনুকম্পা বশত আমি এই সমস্ত দান করিব। শিক্ষা, পৃ. ২১। যে কুশলমূল বা ধর্মজ্ঞাননৈপুণ্য সর্বজীবের প্রয়োজনে আসিবে না তাহা যেন আমার মধ্যে উৎপন্ন না হয়। ঐ, পৃ. ৩০। পুণ্যত্যাগেও যদি পুণ্য অর্জন হয় তবে তাহাও আমি নিজের জন্য কামনা করি না, তাহাও পরেরই জন্য। ঐ, পৃ. ১৪৭।

সর্বজগতের সর্বজীবের প্রত্যেকটি দুঃখ-বিপদ দূর করিবার জন্য আমি এই জগতে অনন্ত কাল অবস্থান করিতে উদ্যত রহিয়াছি।" ঐ, পৃ. ২৮১।

শত্রু মিত্র সকলকেই সমান ভাবিব কেমন করিয়া ? আমার সর্বনাশ করিয়াছে যে, কেন আমি তাহাকে ক্ষমা করিব ? আমার পরম শত্রুকেও ভালবাসিব কেন ? কেন তাহার কুশল কামনা করিব ? আমাদের মনে স্বভাবতই এই সব প্রশ্ন জাগে, বোধিসত্ত্বগণ এই ভাবে তাহার উত্তর দেন :—

"যখন কেহ কোনো দণ্ড বা অন্য কোনো অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আমাকে আঘাত করে, তখন আমি ঐ দণ্ডাদির উপর ক্রুদ্ধ হই না। ঐ দণ্ডাদি যাহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাহারই উপর ক্রুদ্ধ হই। অতএব দ্বেষের দ্বারা প্রেরিত জীব যখন আমাকে আঘাত করে, তখন জীবের উপর দ্বেষ না করিয়া, দ্বেষের উপরই আমার দ্বেষ করা উচিত। যাহার দ্বারা আমাকে আঘাত করা হয়, সেই অস্ত্র এবং যেখানে আমি আঘাত পাই সেই দেহ, এই উভয়েই দুঃখের কারণ। অস্ত্রধারী শত্রু, এবং দেহধারী আমি, এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর ক্রুদ্ধ

হইব? যাহাদিগকে আমি অপকারী মনে করি, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া (অর্থাৎ তাহাদিগকে ক্রমাগত ক্ষমা করিতে করিতে) আমার চরিত্রের উৎকর্ষ হয়। আমি আমার পরম প্রয়োজনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাগুণ লাভ করি। এদিকে আমাকে অবলম্বন করিয়া, তাহাদের হিংসাদ্বেষাদি উৎপন্ন হয়, তাহাদের অবনতি ও দুর্গতির অন্ত থাকে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আমি যাহাদিগকে অপকারী মনে করি, বস্তুত তাহারা আমার উপকারী এবং আমিই তাহাদের অপকারী। ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া, হে খলচিত্ত, কেন তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ?"—বোধিচর্যাবতার, ৬।৪১-৪৯; মৈত্রীসাধনা, পৃ ৩৭-৩৮।

ত্যাগের মধ্যে যশ ও সম্মান ত্যাগই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা দুরূহ। এমন অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ যশ ও সম্মানের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বোধিসত্ত্ব কিন্তু, এই যশ ও সম্মানকে বন্ধন মনে করেন, তাঁহার যশ ও সম্মান যাহারা নষ্ট করে, তাহাদিগকে তিনি মুক্তিদাতা বন্ধু মনে করেন। তিনি বলেন:—

"আমি মুক্তিকামী। লাভ ও সম্মানাদির বন্ধন আমার যোগ্য নহে। যাহারা আমাকে ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত করে, তাহাদের উপর আমার বিদ্বেষ হয় কিরূপে? আমার স্তুতি, যশ ও সম্মানাদির ব্যাঘাতের জন্য যাহারা উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা আমাকে অপায়-পতন হইতে পরিত্রাণ করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুঃখে প্রবেশকামী আমার সম্মুখে তাঁহারা রুদ্ধ কপাটরূপে বিরাজিত হইলেন। উহা যেন মহা কারুণিক বুদ্ধের প্রভাব বশতই সম্ভব হইল। এইরূপ উপকারী যাঁহারা, তাঁহাদের উপর আমার বিদ্বেষ হয় কিরূপে? ইহার দ্বারা আমার পুণ্যের বিঘ্ন হইল, এইরূপ মনে করিয়াও কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। কেননা, ক্ষমার সমান পুণ্য নাই এবং এই ব্যক্তির জন্যই সেই পুণ্যের সুযোগ উপস্থিত হইল। অসহিষ্ণু আমি যদি তখন নিজের দোষে তাহাকে ক্ষমা না করি, তবে আমা দ্বারাই আমার পুণ্যের বিঘ্ন হইল। পুণ্যের কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমি পুণ্য অর্জন করিলাম না।"

যদি কেহ বলেন, আমার ক্ষমারূপ পুণ্য অর্জন হউক, এরূপ কোনো সদ্ অভিপ্রায় শত্রুর নাই। অধিকন্তু অপকার করিবার দুষ্ট অভিপ্রায়ই তাহার সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। বোধিসত্ত্ব তাহার উত্তরে বলিতেছেন:—

"অপকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে বলিয়াই তো শত্রু ক্ষমাসিদ্ধির কারণ। অপকারের অভিপ্রায় না লইয়া, যদি বৈদ্যের মত তিনি আমার হিতচেষ্টা করিতেন, তবে কি তাঁহার উপর আমার দ্বেষের সম্ভাবনাই থাকিত, না ক্ষমার প্রসঙ্গ উঠিত? তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়াই আমার ক্ষমা উৎপন্ন হয়, অতএব তিনিই ক্ষমার কারণ। তিনি আমার সদ্ধর্মের ন্যায় পূজনীয়।[১] ঐ, ৬।১০০-১১১। মৈত্রীসাধনা, ৪১-৪৫। এই মহাত্মাগণের চরিত্রসমূহ অলৌকিক অদ্ভুত। ইঁহারা কাহাকেও দুঃখ দেন না। সকলের সকল দুঃখ দূর করেন। দুঃখের মধ্যেই ইঁহারা বাস করেন। কিন্তু দুঃখকে ভয় করেন না। দুঃখের মধ্যে বাস করিলেও (বাসনামুক্ত বলিয়া) ইঁহারা দুঃখ হইতে মুক্ত। করুণাতেও ইঁহাদের দুঃখ নাই, অথচ দুঃখকেই ইঁহারা বরণ করিয়া লইয়াছেন।—মহাযান সূত্রালংকার, ১১।৬৮। মৈত্রী, পৃ, ৬১। ইঁহাদের সুখেও আনন্দ, দুঃখেও আনন্দ! জীবগণের জন্য বার-বার নরক-বাসেও ইঁহাদের কষ্ট হয় না। ঐ, ৪।২২; ১৩।১৪। মৈত্রী, পৃ, ৬১। যাহার জন্য মানুষ ধন আকাঙ্ক্ষা করে, ইঁহারা তাহাই সকলকে দান করেন। দেহরক্ষার জন্যই লোকে ধন আকাঙ্ক্ষা করে, অথচ সেই দেহই ইঁহারা শত শত বার (পরের জন্য) বিসর্জন দেন। দেহ দান করিয়াও ইঁহাদের দুঃখ হয় না, ধনদানের কথা কি! ইহা সত্যই অলৌকিক! কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অলৌকিক হইতেছে সেই আনন্দ, যাহা ইঁহারা সেই (বলিদানের) দুঃখের দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন।—মহাযানসূত্র—১৬।৫৮।৫৯; মৈত্রী, পৃ, ৬১-৬৩।

বোধিসত্ত্বের আত্মোৎসর্গের এই সাধনা এখনও বৌদ্ধদের মধ্যে লুপ্ত হয় নাই। তিব্বতীয় সাধকগণ আজিও অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় এই সাধনা অভ্যাস করিতেছেন। সাধক গভীর রাত্রে, নির্জন অরণ্যে অথবা শ্মশানে, সাধনোদ্দেশ্যে গমন করেন। সেখানে গিয়া তিনি ভাবনা করিতে থাকেন যে, তাঁহার দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু ও রাক্ষস-পিশাচাদি রক্ত-মাংসলোলুপ প্রাণীর তৃপ্তির জন্য তিনি স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে দান করিতেছেন। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে সেই নির্জন অরণ্য অথবা শ্মশানভূমি সচকিত করিয়া তিনি উচ্চস্বরে আবৃত্তি করিতে থাকেন:—

"হে অনশনক্লিষ্ট, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত প্রাণিগণ! কোথায় তোমরা? সত্বর এখানে আগমন কর। আমার দেহের এই মাংসের দ্বারা তোমাদের ক্ষুধা শান্ত হোক, আমার শোণিতের দ্বারা তোমাদের পিপাসা দূর হোক। হস্ত ও চরণযুগল ছিন্ন করিয়া আমি তোমাদের দান করিতেছি। চক্ষু ও হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া, গ্রীবা, যকৃৎ ও অন্ত্রসমূহ কর্তন করিয়া, তোমাদিগকে সমর্পণ করিতেছি। মাংস, অস্থি, মজ্জাসমূহ তোমাদের সম্মুখে স্তূপীকৃত করিতেছি। অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া শোণিত দান করিতেছি। তোমাদের অনশনকষ্ট দূর হোক! তোমাদের পিপাসার জ্বালা শান্ত হোক! তোমরা পরিতৃপ্ত হও, সুখী হও! কাহারো যেন কোনো দুঃখ না থাকে।"

বিজন অরণ্যে, নির্জন শ্মশানে, নিস্তব্ধ নিশীথে, সেই অপূর্ব আবেষ্টনীতে, এইরূপ ভাবনা ও আবৃত্তি করিতে

১। অর্থাৎ সদ্ধর্মের সেবা করিয়া যাহা লাভ হয়, শত্রু হইতেও তাহাই লাভ হয়, সেই জন্যই শত্রুও সদ্ধর্মের ন্যায় পূজনীয়।

করিতে, সাধক এমন অবস্থায় উপনীত হন, যখন তিনি স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করেন—ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ, পিশাচাদি অশরীরিগণ, সেখানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার মাংস ও শোণিতে তাহাদের বুভুক্ষা ও পিপাসা নিবৃত্ত করিতেছে। মাংস ভক্ষণ করিতেছে। অস্থি চর্বণ করিতেছে। শোণিত শোষণ করিতেছে। অন্ত্রসমূহ চোষণ করিতেছে। তখন যদি তিনি বেদনা অনুভব না করেন, ব্যথা না পান, অনুতপ্ত না হন, যদি তিনি তাহাদের তৃপ্তিতে তৃপ্ত হন, তাহাদের সুখে সুখী হন, তাহাদের হর্ষে হর্ষ লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ সাধনায় সিদ্ধ হইলেন।"[১০]

ভারতেও এই বোধিসত্ত্বের সাধনা তিরোহিত হয় নাই। আজিও ভারতে বোধিসত্ত্ব রহিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের শ্মশানভূমি তাঁহার সাধনক্ষেত্র। সেই সাধনক্ষেত্রে এইরূপ অপূর্ব আত্মোৎসর্গের সাধনায় তিনি মগ্ন রহিয়াছেন। কৌপীনধারী, সর্বস্বত্যাগী, সর্বস্বাচ্ছন্দ্যহীন, দেহমাত্রসম্বল এই বোধিসত্ত্ব তাঁহার দেহের শেষ অস্থিখণ্ড পর্যন্ত জীবসেবায় উৎসর্গ করিতে সতত উদ্যত রহিয়াছেন। সমস্ত জগৎ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে।

১০। বলা বাহুল্য, এই সাধনা অত্যন্ত কঠিন। ইহা অভ্যাস করিতে করিতে, কেহ বা উন্মাদ হইয়া যান, কেহ বা মৃত্যুমুখে পতিত হন, কেহ বা স্বাস্থ্য হারাইয়া বিষাদগ্রস্ত রোগক্লিষ্ট জীবন যাপন করেন!

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২৪

প্রাণ হারাইতে বসার কথা বলায় টুলু উত্তর করিয়াছিল—কি হারাতে বসেছিলাম সেইটেই দেখেছ চম্পা, কি পেলাম আজ রাত্রে সেটা তো তোমার চোখে পড়ছে না।

সেই থেকে সব কাজের মধ্যে চম্পার মন এই কথা কয়টির চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। শুধু কথাই নয়, টুলুর কণ্ঠেও ছিল অপরূপ স্নিগ্ধতা। কিন্তু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর এমন কিছু পাওয়ার ব্যাপার তো চোখে পড়ে না চম্পার সমস্ত ত্রিভুবন খুঁজিয়া। তবে?...

এক হয় উদ্যোগের সফলতা, ব্রতসিদ্ধি, সব কথা শুনিয়া টুলু কি নিঃসন্দেহ হইল যে, তাহার চেষ্টা ফলিয়াছে,—চম্পা শেষ বারের মত ফিরিয়াছে? সেদিন ম্যানেজারের ওখান থেকে ফিরিবার পথে চম্পা যখন টুলুকে আটকায়, টুলু দারুণ বিতৃষ্ণায় বলিয়াছিল—কেউ কি ফেরে নিজের সর্বনাশ থেকে?

তুমি ফিরেছ?

শেলের মত বিঁধিয়াছিল চম্পার মনে সেকথা, কেননা ও সেই থেকেই ফিরিয়াছে, কিন্তু বলিবার তো উপায় ছিল না। টুলু যদি এত বিলম্বেও সে সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়া থাকে।

এই সম্ভাবনার আনন্দটুকু চম্পার সব কাজে রহিল মিশিয়া। প্রথমটা সে তাহার নূতন গৃহস্থালি গুছানোয় লাগিয়া গেল। মিতিনকে বস্তি হইতে লইয়া আসিতে বেগ পাইতে হইল না। প্রথমত গোছালো মানুষ চায়ই একটু ভালভাবে থাকিতে, সেদিক দিয়া নূতন জায়গা পছন্দই মিতিনের, তাহার উপর হীরুকে লইয়া সে যেন জোড়াগাঁথা হইয়া গেছে চম্পার সঙ্গে, এক ধরণের আত্মীয়তা হইয়াছেই, সেই সঙ্গে আছে টাকার স্বার্থ। চম্পা আবার পাঁচ টাকাটাকে দশ টাকা করিয়া দিল—টাকা লইয়া তাহার বরাবর একটা উদারতা আছে—হীরুকের খোরপোষের বাকি পাঁচটা টাকা নিজের হাতে রাখিল, পোশাক-পরিচ্ছদের জন্ত। প্রহ্লাদের একটু অনিচ্ছা ছিল, খনিটা হইয়া যাইতেছে বেশ একটু দূর। কিন্তু খতাইয়া দেখিল স্ত্রী কাছে থাকিলেই আর সবের দূরত্ব অগ্রাহ্য করা যায়।

বস্তিতে একটু চাঞ্চল্য উঠিল, তবে কৌতূহল সে রকম সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল না। ভিতরকার ব্যাপারটা কাহারও জানা নাই। ছেলে লইয়া চম্পার সঙ্গে টুলুর যা সম্বন্ধ সেটা বৈরিতারই; তাহা ভিন্ন মাষ্টার মশাই যে এখানে নাই, টুলু একলা, সেকথাও প্রায় কেহই জানে না। মাষ্টারমশাইকে আর টুলুকে যতটুকু দেখিয়াছে তাহাতে, এরা মানুষের খারাপ দিকটাই সচরাচর দেখিতে পায় বলিয়া তাঁহাদের দেবতার কাছাকাছিই মনে হয়। মোট কথা, কোন কুটিল সন্দেহের পথে যাইবার অবসরই পাইল না বস্তির মনটা। চম্পা বলিল—ঠাকুরদাদা বুড়া হইয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া থাকাটা অধর্ম হয়, এই তো এক চোট ভুগিল খুব। লোকে বেশ বুঝিল; চম্পার সুমতি হইয়াছে দেখিয়া রুচি অনুযায়ী প্রশংসা করিল বা ঠোঁট উল্টাইল।

চম্পা জানে এ ওজুহাত টিকিবে না বেশী দিন, ভাবিল তবুও এই করিয়া ম্যানেজারের উদ্দেশ্যটা যত দিন ব্যর্থ করা যায়। এখন আর বলিবারই বা কি ছিল তাহার?

প্রহ্লাদের স্ত্রীকে আনাইয়া লইবার কথায় প্রথম একটু খোঁকা লাগিয়া গিয়াছিল চম্পার, মনে হইয়াছিল, টুলু বদনামের আর একটা ঘর বাড়াইল; কিন্তু একটু পরেই বুঝিতে পারিল উদ্দেশ্যটা,—চম্পার সঙ্গে আরও একটা পরিবার থাকায়ই বরং বদনামের আশঙ্কাটা কমিল। টুলু এর দ্বারা ম্যানেজারের চালের খানিকটা কাটান্ দিয়াছে।

দুইটির জায়গায় আবার তিনটি পরিবার হইল, অত্যুক্তি হইলেও ছোট একটি পাড়া বলা যায়।

যেদিন মিটিং হইল স্কুলের, যেদিন প্রহ্লাদের পরিবার আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পর দিনের কথা। রবিবার, স্কুল বসে নাই; খনিতে সবাই একটা দিন করিয়া ছুটি পায়, চম্পা পায় বুধবার, নূতন গৃহস্থালি পাতিবার জন্য একটি সঙ্গিনীর সঙ্গে বদল করিয়া লইয়াছে ছুটিটা, বুধবার তাহার হইয়া খাটিয়া আসিবে। দুইটি সংসারের জিনিষপত্র কাল খানিক খানিক আসিয়াছিল, বাকিগুলি আজ সকালে বনমালী, চরণ আর প্রহ্লাদ আনিয়া হাজির করিয়াছে। বনমালীর বাসার উঠানে ডাঁই করা আছে, চম্পা আর তাহার মিতিন তুলিয়া তুলিয়া গোছগাছ করিতেছে। অল্প জায়গা—সে অনুপাতে জিনিষ বেশী, কেননা দুইটি পরিবারই বস্তির হিসাবে একটু সম্পন্ন; তোলা-পাড়া গোছগাছ করার সঙ্গে একটু মাথাও ঘামাইতে হইতেছে।

এরা আসিয়াছে পর্যন্ত টুলু আসে নাই এদিকে। আসিবার তো কোন দরকার নাই, নির্লিপ্ত ভাব বজায় রাখাই মনে হইল শোভন। দুইটা শিশুর পালা করিয়া, কখনও বা সমতানে কান্নায় একটু হইল আগ্রহ; জানালা দিয়া দেখিল একে, দুয়ে, তিনে স্কুলে নূতন লোক সব আসিতেছে, ম্যানেজারও তাহার মোটরে আসিয়া জন দুয়েককে লইয়া নামিল; টুলু বুঝিল মিটিং হইবে, আর যাওয়া হইল না। মিটিং ভাঙিবার পর ম্যানেজার এদিকে আসিল, মাষ্টার মশাইয়ের উপদেশ লইয়া একটু ব্যঙ্গোক্তি করিল, তাহার সমুচিত উত্তর দিলেও সন্ধ্যার পর হইতে যতক্ষণ জাগিয়া রহিল টুলুর মনটা রহিল বিষাইয়া। বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না।

ঠিক করিল আজ সকালে যাইবে। সকালটি বড় চমৎকার আজ—এক একটা সকাল যেমন আসে মনের সমস্ত সঙ্কোচ সঙ্কীর্ণতা মুছিয়া দিয়া। মনে হইল ওদের এক রকম ডাকিয়াই আনিয়াছে, গ্রহণ করার সহজ হাসি লইয়া দাঁড়াইতে হইবে বৈকি ওদের উঠানে।···আনন্দের জোয়ারই ওকে ঠেলিয়া লইয়া গেল।

আনন্দ কিন্তু হঠকারী, চারি দিক ভাবিয়া দেখে না। বেশ লঘু পদেই গেট পার হইয়া যখন বনমালীর বাসার একেবারে কাছাকাছি আসিয়াছে, টুলুর হুঁস হইল এ ভাবে গিয়া উঠানের মধ্যে দাঁড়ানো চলিবে না তো। সে চম্পার সঙ্গে পরিচয়ের জোরে যাইতেছিল, কিন্তু চম্পার সঙ্গে তাহার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথাটা তো আর কেহই জানে না, কেননা তাহার সবটাই হইয়াছে এদের দৃষ্টির অন্তরালে। বনমালীর কথা বাদ দেওয়া চলে, কতকটা না হয় চরণদাসেরও, কিন্তু প্রহ্লাদ রহিয়াছে, আর বিশেষ করিয়া তাহার স্ত্রী—টুলুর এ রকম ওপর-পড়া হইয়া হঠাৎ উঠানে আসিয়া দাঁড়ানোটা ওরা কি ভাবে লইবে। এর ওপর চম্পা যদি আবার তাহাদের নূতন ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরিয়া বেশ সহজ আলাপেই কোন কথা বলিয়া বসে—বলিবেই, এটাও ঠিক—তো সে কি একটা বিসদৃশ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে ওদের সবার চোখে।

টুলু নিদারুণ কুণ্ঠায় থামিয়া উঠিল যেন, আগাইতেও পারে না, অথচ চলিয়া আসিতেও পা ওঠে না,—ওদের কেহ হঠাৎ বাহির হইয়া দেখিলে কি মনে করিবে? কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় বনমালী বাহির হইয়া আসিল এবং তাহাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"ছোটবাবু যে! কি দরকার বটে?"

একবার একটু আমতা আমতা করিয়া উত্তরটা জোগাইয়া গেল টুলুর, বলিল—"ইয়ে, তোমার বাসায় হঠাৎ ছেলের কান্না শুনে ভাবলাম···"

বনমালীর মনটা কাল থেকেই ভরাট হইয়া আছে, একেবারে উল্লসিত হইয়া উঠিল, বলিল—"আজ্ঞে লাতমি এলোক যে, আমার সেবাটি করবেক—তার ছাওয়াল কান্দে—হাঁ। আমার লাতমির ছাওয়াল, আসুন আপুনিকে দিখাই, যা ভাবচেন সিটি নয় আজ্ঞে, আসুন ভিতরে পায়ের ধুলো দিন, আপুনিকে বুলি সব কথা—সে রকম দোষের কথা নয় আজ্ঞে—আর পেল্লাদের বৌ এলোক, পেল্লাদ এলোক···"

"কে বটে গো? কার সঙ্গে কথা বুলছ?"

বলিতে বলিতে চরণও আসিয়া উপস্থিত হইল, টুলুকে দেখিয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া বলিল—"আপুনি? আমি কই বুড়া কার সঙ্গে কথাটি বুলে।"

প্রহ্লাদও বাহির হইয়া আসিল। বনমালী বলিল, "তা আসুন আজ্ঞে ভিতরে পায়ের ধুলো দেন, আজ আপুনির আশীর্বাদে আমার ঘর ভরে গেলোক।"

জীবনে যে নিরীহ প্রবঞ্চনার দরকার মাঝে মাঝে সেটা টুলুর ততক্ষণে উপলব্ধি হইয়াছে, একটু কি ভাবিয়া বলিল—মেয়েরা রয়েছে বনমালী—থাক না এখন—আবার না হয়···"

বনমালী গম্ভীর হইয়া গেল, বলিল—"হঁ, রইছে। রাজরাণী গো। আপুনির কাছে লজ্জা!"

গর গর করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেল, এবং তখনই সেহাৎ টানিয়া না আনুক, কতকটা জোর করিয়া চম্পা আর তাহার মিতিনকে ডাকিয়া আনিয়া দরজার কাছে দাঁড় করাইল। চম্পা টুলুর গলা শুনিয়াই ভিতরে কান খাড়া করিয়াছিল, আসিয়া এমন একটা ঔদাসীন্য লইয়া দাঁড়াইল যেন লোকটাকে পথের বাঁকে কোথাও দেখিয়া থাকিবে, এর বেশী নয়। টুলু একবার চাহিল, কত শীঘ্র যে চম্পা অবস্থাটা বুঝিয়া নিজেকে ঠিক মানাইয়া লইয়াছে, দেখিয়া আশ্চর্য হইল।

বনমালী ওদিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, ডান হাতটা চম্পার পিঠে দিয়া বলিল—"ই চম্পাটি আছেঁ, আমার লাতমি, আপুনি শুনেছেন ইর কথা, কিন্তু দিখেন নাই, বড়ো ভালো মেয়েটি বটে···"

চুপ করিয়া না দেখার কথাই মানিয়া লইত টুলু, কিন্তু দেখার সাক্ষী সামনে রহিয়াছে, প্রহ্লাদের বউ, টুলু সত্যো

মিথ্যায় মিলাইয়া বলিল—"না, দেখেছি একবার বনমালী, বলিতে।"

তাহার পর হাসিয়া বলিল—"কিন্তু তাতে খুব ভাল মেয়ে বলে তো মনে হয় নি, না হয় এই মেয়েটিকে জিগ্যেস করো না ?"

নাতনির তাহার বিশেষ সুনাম নাই ; টুলুর ইঙ্গিতটা নিশ্চয় সেই দিক দিয়াই মনে করিয়া বনমালী উচ্ছ্বাসের মুখে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া দেখিয়াই কিন্তু চার জনের মুখেই হাসি দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল—"কি কথাটি আছে তোরা খুলবিক নাই বুঢ়াকে ?"

চরণদাস সে দিন ছিল না, তবে ব্যাপারটা জানে, বলিল—"গঞ্জভির সবাই জানে, তু জানিস না তো কি হবেক ?—উ ছাওয়ালটি তো বাবুই নিইছেঁলো, পেল্লাদের বউকে পুষবার তরে দিলেক, ট্যাকা দিলেক, তা তুর নাতনি কেড়ে লিলেক নাই ?"

প্রহ্লাদের বউ মুখটা চম্পার ঘাড়ের পিছনে লুকাইয়া বলিল, "আমাকে মারলেক নাই ? গালি দিলেক নাই ?—আমার জামা ছিঁড়ে দিলেক নাই ?…হুঁ, বড়ো ভাল মেয়ে বুঢ়ার নাতনি ?"

সে নিজেও হাসিয়া উঠিল এবং অত সবার হাসিও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—অবশ্য বনমালী ছাড়া। তাহার মুখটা গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে, চম্পার পানে চাহিয়া তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলিল—"ইকি শুনি গো ! পরের ছাওয়াল আপন বলে চালাস ?—উকে মারলিক ! হ !…"

হীরক কান্না জুড়িয়াছে, চম্পা তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া তাহাকে লইয়া আসিল, বনমালীর পানে একটু বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"তা উনিকে দিয়া দে ক্যানে, কে এমন ছাওয়ালকে রাখবেক গো ?"

পরিচয় গোপন করিয়া নূতন পরিচয় হইল। এ নিরীহ প্রবঞ্চনাটুকুর দরকার ছিল ; নগ্ন সত্য সব সময় চলে না জীবনে, সময় বুঝিয়া তাহার অঙ্গে একটু আক্র টানিয়া দিতেই হয়।

এর পর কিন্তু টুলু আর কোন ব্যবধানই রাখিল না। "এস তোমার নতুন গেরস্থালি দেখি বনমালী"—বলিয়া নিজেই আগাইয়া গেল। সবাই যেন কৃতার্থ হইয়াই আগে-পিছে হইয়া তাহার সঙ্গে ভিতরে আসিল।

উঠানে পা দিয়াই টুলু দাঁড়াইয়া পড়িল। একরাশ জিনিসপত্র উঠানে গাদা করা—শিলনোড়া বাসনপত্রের সঙ্গে, চৌকি, খাটুলি, বাক্স ; দু'একখানা অপেক্ষাকৃত সৌখিন আসবাব পর্যন্ত—আলনা, ব্র্যাকেট, নিশ্চয় চম্পার।" ঘরের ভিতরেও মেঝেতে কিছু কিছু ছড়ানো ? চারি দিকটা একবার চাহিয়া লইয়া টুলু বিস্মিত ভাবে বলিল—"এ কি ব্যাপার ?"

চম্পা হাসিয়া বলিল—"আপনি গরিবদের জিনিসের ওপর নজর দিচ্ছেন ? একে ত হয়ই না।"

টুলু বলিল—"কিন্তু তোমার ঠাকুরদাদার বাসার কথাও একটু ভাবা উচিত তোমাদের। ঐ তো দুখানি ঘর।…তা নয়, আমি বলছিলাম মাষ্টার মশাইয়ের ত একটা চাকরের বাসা আছে, কিছু না হয় সেখানে গিয়ে ওঠ না।"

চরণ বোধ হয় সমর্থন করিতে যাইতেছিল, তাহার আগেই চম্পা হাসিয়া বলিল—"ঠাকুরদার ঘর ভরল দেখে আপনার হিংসে হচ্ছে…"

টুলু উত্তর করিল—"হিংসে ? এ রকম করে ঘর যেন আমার কখনই না ভরে, ঘরের মালিককেই যাতে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়।…কি বল গো বনমালী ?"

একটু হাসি যা উঠিল, বনমালী একটু রসিকতা করিয়া সেটাকে বাড়াইয়া দিল—"আজ্ঞে, নাতনিকে ঘর ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়াব—সিটি ত ভাগ্যির কথা বটে।"

হাসির মধ্যেই টুলু বলিল—"আমার নাতনী নেই, সেই জন্যে বোধ হয় তোমার ভাগ্যির কথা বুঝব না, তবুও এ ভাগ্যির হিংসে করি না বনমালী। যাক, একেবারে রাস্তায় না দাঁড়িয়ে না হয় আমার কাছেই চলে এস, আমার তবু সঙ্গী হবে এক জন।"

চম্পা একবার মুখের পানে দেখিয়া লইয়া বলিল—"আর এদিকে ঠাকুরদাদার জন্যেই আমরা এলাম—বুড়ো হয়েছে, নিত্যি অসুখ—মিস্তিরদের পর্যন্ত টেনে নিয়ে এলাম। আপনার সঙ্গীর ব্যবস্থা আমরা আগেই করেছি,—বাবা আর পেল্লাদ-ভাই আপনার ওখানেই থাকবে, অবশ্য আমাদের মতন খনির কুলি-মজুরদের থাকা মানে রাতটুকু কাটানো।"

চরণ বলিয়া উঠিল—"আমি ক্যানে গো ? আমায় ছাড়ান্ দে। পেল্লাদ যাবে বটে, উনি একজন সঙ্গী চাইছেন, তু হুকম চাপাচ্ছিস—কষ্ট হবেক নাই ?"

ওর শঙ্কিত বিপর্যস্ত ভাব দেখিয়া চম্পা একটু শব্দ করিয়াই হাসিয়া উঠিল, বলিল—"তুর রোগের কথা জানেন উনি।…তা রপ্তে রপ্তে ছাড়তে হবেক নাই উ অভ্যেসটি ?"

চরণ একটু অপ্রতিভ হইয়া গেছে দেখিয়া টুলু বলিল—"না, তোমার মেয়ের মতন অভ্যেস নিয়ে আমি খোঁটা দেবার লোক নয় চরণ, তুমি আমার দলেই এস।…অভ্যেস অভ্যেসই, যখন চাইবে এক দিনেই ছেড়ে দেবে তুমি।"

বনমালী হাতমুখ নাড়িয়া বলিল—"তুর বাবার উ অভ্যেসটি ছিলোক নাই ? ভাব্ ক্যানে।"

সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গীতে সবাই হাসিয়া উঠিল।

প্রহ্লাদ আর তাহার স্ত্রী, দুজনেই একটু লাজুক প্রকৃতির, নিঃশব্দে সবার কথাবার্তা শুনিয়া যাইতেছিল আর মাঝে মাঝে কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে হাসিতে যোগ দিতেছিল, টুলু তাহাদেরও কথাবার্তার মধ্যে টানিল, প্রহ্লাদকে টানিল তাহার কাজের

পরিচয় লইয়া, ওর স্ত্রীকে, সেদিন বস্তিতে গিয়া ছেলে দেখার জন্ত তাহাদের বাসায় যাওয়ার কথা লইয়া। জিজ্ঞাসা করিল টাকা যে দিয়া আসিয়াছিল তাহাতে তাহার ছেলের জামা কেনা হইয়াছে ত?

ছেলেটি ঘরে ঘুমাইতেছে—একটু ঘুমায় বেশী, চম্পা ছেলেটিকে দেখাইবার জন্তই মিভিনকে একটু ঠেলিয়া বলিল—"তু জামাটি পরায়ে নিয়ে আয় গো, উনির দেঁখা হবেক নি?"

হীরুকের কোমরের গোটের জন্তও দুইটা টাকা দিয়াছিল টুলু; অবশ্য দু'টাকায় গোট হয় না, তবুও কিন্তু নজরটা একবার তাহার খালি কোমরে গিয়া পড়িল।

প্রহ্লাদের বউ সেটা লক্ষ্য করিল, বাসার দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল, চম্পার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"তু হীরার গোটের ট্যাকার হিসাব দে উনিকে।"

চম্পা একটু দুষ্টামির হাসি ঠোঁটে আনিয়া বলিল—"আমি তুর মতন বোকা নাকি গো? ছেলের উপার্জনের ট্যাকা পেটে খেয়েছি। খাবো নাই? তুর মতন বোকা নাকি?"

হাসিভরা দৃষ্টিটা একবার টুলুর মুখের উপর দিয়াও বুলাইয়া লইয়া গেল।

স্কুলের গেট হইতে বাহির হইয়াই দেখে সদর দরজার সামনে রাস্তার প্রান্তটিতে এক বুড়ী একটা ছেঁড়া কাঁথা জড়াইয়া জবুথবু হইয়া বসিয়া আছে, তাহার পাশে একটি ছোট মেয়ে, একটি ছোট ছেলে রাস্তার অন্তধারে খোঁদ হয় নুড়ি সঞ্চয় করিতেছে। টুলুকে দেখিয়া মেয়েটি বুড়ীকে কি বলিতেই সে মুখটা তুলিয়া একটু যেন প্রস্তুত হইয়া বসিল। টুলুর মনে পড়িল বটতলার সেই মেয়েটি, তাহার দিদিমাকে লইয়া আসিয়াছে; পা চালাইয়া দিল।

একটু কাছে আসিতেই বুড়ী পায়ের শব্দ লক্ষ্য করিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষু দুইটা টুলুর মুখের পানে তুলিয়া ধরিল এবং ডান হাতটা বাড়াইয়া ও মুখের ভাবটা যতদূর সম্ভব করুণ করিয়া আরম্ভ করিল—"দেন গো রাজাবাবু, কিছু দেন গরিব বুড়ীকে—একটি নাতনি, একটি নাতি—খেতে পাই না…দুদিন থেঁকে…"

টুলু লক্ষ্য করিল মেয়েটি ঘেঁষিয়া আসিয়া পা ঠেলিতেছে—উদ্দেশ্য নিশ্চয়, ভাষা এবং ভঙ্গী আরও করুণ করিয়া তুলিতে ইঙ্গিত করা। ছেলেটিও আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে। টুলু আসিয়া পড়িল, মেয়েটিকে প্রশ্ন করিল—"তোকে না পরশু আসতে বলেছিলাম?"

মেয়েটি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ভয় দিদিমা মুখে খোসামোদের হাসি ফুটাইয়া আরও করুণ কণ্ঠে বলিল—"উয়ার দোষ নাই গো রাজাবাবু, উ বুলেছে, আমার মুখারটি হ'ল, আসতে পারলাম নাই, উয়ার দোষটি নাই।"

টুলু একটু যেন কি রকম হইয়া গেছে; ভিখারীও দেখিয়াছে ঢের এর আগে, মন কঠিন নয়, যথাসাধ্য দেয়ও, কিন্তু দারিদ্র্যের এমন মর্মন্তুদ ছবি এর আগে যেন দেখে নাই। হইতে পারে দৃষ্টি আজকাল এদিকে সজাগ বলিয়াই এরূপ মনে হইল; গলা যথাসম্ভব নরম করিয়া বলিল—"না গো বাছা, আমি সেজন্তে বলছি না, দোষ কেন হবে?…তা অন্যপারে এলে কেন এতটা পথ বেয়ে? এই রোদ্দুরে…"

ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"না গো, জারকালে রোদ্দুর উয় মিঠা লাগে বটে…উয়…"

মেয়েটি হাতে একটা চাপ দিয়া ইসারায় থামাইয়া দিল, ওর ভয় যেন বুড়ী আর ছোট ভাইয়ে মিলিয়া কিছু বেফাঁস বলিয়া এমন একটা সুযোগ নষ্ট করিয়া না ফেলে। টুলু ছেলেটির দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তাহার পর বুড়ীকে বলিল—"অন্যপারে না এলেই পারতে, যাক এসেছ ভালই হয়েছে, ভেতরে এস…"

বুড়ীর হাত ধরিয়া তুলিয়া দরজার মধ্যে পা দিল। ছেলেটি আর মেয়েটি হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঘুরিয়া বলিল—"আর তোমরাও, বাঃ!"

মাষ্টার মশাইয়ের বাসার দেয়ালের বাহিরেই চাকরের বাসা, পাশাপাশি দুইটি ঘর, খিড়কির দরজার পাশেই পড়ে, উঠানের দেয়ালটাই ঘর দুইটার পিছনের দেয়াল। সেইখানে লইয়া গিয়া বলিল—"তোমরা এইখানটায় থাকবে, পাশেই আমি রইলাম।"

তিন জনেই কি রকম হইয়া গেছে। বুড়ী স্থির, দীপ্তিহীন চক্ষুযুক্ত মুখটা আন্দাজে টুলুর মুখের দিকে তুলিয়া একটু ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল—"থাকব।"

একটা ছোট সিঁড়ি, তাহার পরেই এক ফালি বারান্দা, টুলু তাহাকে তুলিয়া লইয়া বলিল—"হ্যাঁ…তোমাদের জিনিসপত্র কিছু আছে?"

মেয়েটি হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল—"আছে গো! আছে; আনি গিয়া?"

বুড়ী এই হঠাৎ সৌভাগ্যটাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, লোভ-আশঙ্কা মেশানো কণ্ঠে খলিত ভাবে বলিল—"রাখবেন?…কিন্তু আমি তো কানা আছি…কাজ তো করতাম…আর দিখতে পারি না…"

মেয়েটি জিনিসপত্র আনিতে যাইবার জন্ত পা বাড়াইয়াছিল, শঙ্কিত ভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আবার বুঝি সব কাঁচিয়া যায়।—টুলু তাহার পানে চাহিয়াই বুড়ীকে বলিল—"কেন তোমার নাতনী রয়েছে তো, কাজ করবে আমার…কি রে পারবি নি?"

মেয়েটির পা সামনের দিকেই বাড়ানো আছে যেন চাবি

দিকেই সামলাইবার চেষ্টা ; বলিল, "হুঁ পারব, পারব বটে…"

ভাই সিঁড়ির উপর উঠিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুপারিশ করিল—"উ রাখে, দিদিমা যিদিন চাল আনে, উ রাখে ; সিলাই করতে পারে…"

ভদ্রালয়ে আসিবার খাতিরেই হোক অথবা আনন্দেই হোক, মেয়েটি তাহার জীর্ণ কাপড়টাকে একটু মেরামত করিয়া লইয়াছে, এক জায়গায় অপেক্ষাকৃত একটা করসা তালিও দেখা যায়। বোধ হয় তাই তাহারই উপর টুলুর দৃষ্টি টানিয়া আনিল ভাবিয়া একটু গুটাইয়া সুটাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ওর চলিয়া যাওয়ার একটু পরে টুলু ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি আছে তোদের সেখানে ?"

উত্তর হইল—"আমার কাঁথা আছেঁ, উর কাঁথা আছেঁ, বুড়ির নোহার সানকি আছেঁ, নোহার গিলাসটি আছেঁ।"

"কোথায় আছে ?"

"চরণদাসের বাঁসার পিছনটিতে লুকানো।"

আন্দাজ আধ ঘণ্টা পরে প্রায় ইস্কুলের কাছাকাছি একটা কান্নার শব্দ উঠিল—"আমাদের সব নিইঁছে, সব চুরি কর‍্যা নিইঁছে।"

"দিদি আইছোঁ।" বলিয়া ছেলেটা ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া গেল। বুড়ী মাথাটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া একটু শুনিল, তাহার পর গভীর নিরাশায় কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—"যা, সব গেলোক !"

কান্নার আওয়াজটা নিকটবর্তী হইতে লাগিল এবং একটু পরেই মেয়েটি আকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত হইল—"আমাদের কাঁথা নিইঁছে, আমাদের থালা নিইঁছে। গিলাস নিইঁছে !"

চম্পা প্রথমে গ্রাহ্য করে নাই, এ ধরণের কান্না বস্তির নিত্যকার ব্যাপার একটা ; তাহার পর আওয়াজটা মাষ্টার মশাইয়ের বাসায় ঢুকিল দেখিয়া একটু কান পাতিয়া শুনিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিল। আসিয়া দেখে বুড়ী কাঁথামুড়ি দিয়া দুলিয়া দুলিয়া কাঁপিতেছে, ছেলেটা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মেয়েটা ব্যাকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া যাইতেছে আর টুলু তাহার একটা হাত ধরিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে। পিছন ফিরিয়া ছিল বলিয়া চম্পাকে দেখিতে পায় নাই, চম্পা স্থির হইয়া খানিকক্ষণ দেখিল, তাহার পর একটু আগাইয়া সামনে আসিতে টুলু ফিরিয়া চাহিল। তাহার চক্ষে ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতেছে।

চম্পা শান্তকণ্ঠে একটু অনুযোগের সহিতই বলিল—"এত অল্পতেই যদি চোখের জল ফেলেন…"

টুলু চোখ দুইটা মুছিয়া লইয়া অপ্রতিভ ভাবে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"তা নয় চম্পা, আমি মনে করেছিলাম দুঃখ-দারিদ্র্যের এরাই চরম, এদের জিনিস চুরি করবার মতনও মানুষ তা'হলে আছে পৃথিবীতে ? দুটো ভাঙা লোহার বাসন আর দুখানি কাঁথা—তার নমুনা ঐ সামনেই দেখ না।"

২৫

বুড়ীর কাঁপুনিটা বাড়িয়াছে ; অসুখটা বাড়িয়াছে নিশ্চয়. তাহার পর এই নূতন অবস্থায় হরিষে-বিষাদ। চম্পার পায়ে একটু কুণ্ঠা যেন চেষ্টা সত্ত্বেও ফুটিয়া উঠিল, তাহার পর সে সোজাই উঠিয়া গিয়া বুড়ীর মাথায় হাত দিয়া প্রশ্ন করিল—"কাঁপিস কেন এত রাঙা ঠানদি ?" সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা কপালে চাপিয়া টুলুর দিকে চাহিয়া বলিল—"জ্বর হয়েছে দেখছি যে !"

টুলু বলিল—"হ্যাঁ, এতটা হেঁটে এসে বোধ হয় বাড়লও। বুড়ী তোমার জানা দেখছি যে…"

বুড়ী কাঁথাটা একটু টানিয়া জড়াইয়া ঘাড় গোঁজা অবস্থাতেই কাঁপা কণ্ঠে বলিল—"চম্পির গলা না ?…এত্তোটুকু দেখেছি…এত্তোটুকু…"

কতটুকু সেটা দেখাইবার জন্য ডান হাতটা বাহির করিয়া একটু তুলিয়া ধরিল। একটু পরে সেটা কাঁপিতে কাঁপিতে আপনিই নামিয়া গেল।

বোধ হয় অদরকার বোধেই চম্পা আর টুলুর কথার উত্তর দিল না। "দাঁড়াও আসি—"বলিয়া টুলুর দিক থেকে একটু মুখটা ঘুরাইয়াই বাসার দিকে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কেন যে এমন করিল গলার স্বরে সেটুকু বুঝিতে আর টুলুর বাকি রহিল না।

মেয়েটি চুপ করিয়াছে, বোধ হয় নূতন অবস্থায় অভিভূত হইয়াই। বুড়ী বিড় বিড় করিয়া কয়েকবার কি বকিল—বোঝা গেল না, জ্বরের তাড়সে দু'একটা স্পষ্ট অক্ষরের সঙ্গে হিস হিস করিয়া শব্দ হইয়া মিলাইয়া গেল মাত্র। টুলু আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—"কিছু বলছ আমায় ?" বুড়ী একটু জোরেই বলিল এবার। ছেলেটি কাছেই ছিল, টুলু বুঝিতে না পারায় তাহার পানে চাহিতে বলিল—"বুলছে আগে সবাই রাঙা ঠানদিই বুলত।"

টুলু একটু ভাবিল—তাহার পর প্রশ্ন করিল—"এখন কি বলে ?"

"রাণ্ডি বুড়ী।"

মেয়েটি একটু তর্কের সুরে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "না, কানা বুড়ি…কানা ভিখ-উলিও বুলে !"

যেন অনেক দিনের নালিশ একজন বিচারক পাইয়া জানাইয়া দিতেছে। ছেলেটি বলিল—"হুঁ, তাও বুলে।"

বুড়ী আবার একটা কি বলিল—টুলু আবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই মেয়েটি বলিল—"বুললে—মিঠা লাগল তাই বুললাম।"

বুড়ী একটা কম্পিত অঙ্গুলি তুলিয়া বলিল—"একটি বছরে"··· পুরানো একটি ডাকে মনটা বড় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে, ছাড়িতে পারিতেছে না প্রসঙ্গটা।

টুলু এবার ওর কথাটা বুঝিল, মনে মনে ওর বক্তব্যটা পূর্ণ করিয়া লইল—একটি বছরে রাঙা ঠানদি থেকে কানা ভিখ-উলি।···একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

চম্পা আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা মাদুরের মধ্যে গুটানো একটা কম্বল আর বালিস আনিয়াছে, এর অতিরিক্ত নিজেকেও আনিয়াছে বদলাইয়া, নূতন দৃশ্যটাতে যে একটু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, সে-ভাবটা আর নাই, এবার বেশ সপ্রতিভ। আসিয়াই একটু বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—"এখানেই দাঁড়িয়ে এখনও আপনি! যান এবার, নিজের কাজ আছে তো।"

টুলু একটু হাসিয়া বলিল—"কাজ তো দেখছ···আমার সামনেই···এনে তো ফেললাম, এখন···"

"ঐ এনে ফেলা পর্য্যন্তই আপনাদের কাজ, এখন আমার এলাকা, আপনি যান।···হাঁ তখন কি যেন জিজ্ঞেস করলেন—বুড়ীকে জানি কি না, জানি বৈকি, বস্তিরই তো মানুষ, খনি ছেড়েছে অনেক দিন, বছরখানেক আগে পর্য্যন্ত এর ওর ফরমাস খেটে বেশ চালিয়ে এসেছিল।···বছর খানেকই হ'ল, না গা রাঙাঠানদি?"

বুড়ী বলিল—"উ শাওনে গেলোক চক্ষু।"

চম্পা বলিল—"আর এটা এই জুটি।···অদেষ্ট।"

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল, একটু অন্যমনস্কও হইয়া গেল, তাহার পর টুলুর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"নিন, এবার যান আপনি···বেটাছেলের জায়গায়।"

টুলু যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া আবার ঘুরিয়া বলিল—"কিন্তু ···বেশ জ্বর রয়েছে।"

বুড়ী কি ভাবিয়া মাথা দু' তিনবার নাড়িল। মেয়েটি বলিল—"উর জ্বর থাকেক নাই···ভিখ মাঙতে হয় কিনা।"

চম্পা বলিল—"ঐ শুনুন থাকে না জ্বর; জ্বর থাকলে পেট চলবে কি করে? আবার না তো।···যান আপনি।"

খিড়কি দিয়া টুলু ভিতরের উঠানে পা দিয়াছে, চম্পা নামিয়া আসিয়া ডাকিল—"শুনুন।"

নিজেও আগাইয়া গেল, বলিল—"জ্বরের কথায় মনে পড়ল, —মাষ্টার মশাই তো ওষুধ দিতেন,—হোমিওপ্যাথি। নিশ্চয় আছে বাক্স ঘরে।"

টুলু বলিল—"আমি একেবারেই জানি না যে···"

"ওতে একেবারেই জানবার কিছু নেই, বই দেখে দেখে লক্ষণ মিলিয়ে দেয়, আমি অনেককে দেখেছি। বইও নিশ্চয় আছে তা'হলে; দেখুন না একবার।···লক্ষণ জ্বর কাঁপুনি।··· গায়ে ব্যথাও আছে রাঙা ঠানদি?···বলছে আছে। দেখুন দিয়ে এবার। আর যা ওষুধ, ভুল হলে ভয়ের কিছু নেই।"

আছে খানতিনেক হোমিওপ্যাথির বই। টুলু একবার এটা একবার ওটা লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। কৌতুক জাগাইতেছে। হোমিওপ্যাথির বিচারগুলো পড়িল, তিনটা বইয়েরই, তাহার পর ঔষধ, রোগ-লক্ষণ। এক এক সময় বেশ লাগিতেছে, এক এক সময় বড় অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছে—মনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছে বুড়ী, ছেলেমেয়ে দুটি, চম্পা; বড় অদ্ভুত মনে হইতেছে চম্পাকে—তাহার আবার একটি রূপ নয়, কত দিনের কত রূপেই যে আসিয়া দাঁড়াইতেছে সামনে।···মন আবার অন্য দিকে ছুটিতেছে—আনিল তো তিনটি প্রাণীকে ডাকিয়া, রাখিতে পারিবে ধরিয়া এদের দায়িত্ব?···আর একটা কথা—চম্পা বড় বেশী কাছে আসিয়া পড়িল না? বুঝিতে পারিতেছে না টুলু, অনুভূতিটা সফলতার আনন্দ, কি অনিশ্চয়তার অস্বস্তি।···বইয়ে আবার মন দিতেছে, কিন্তু বড় গোলমেলে ব্যাপার—ঔষধে ঔষধে জড়া-জড়ি হইয়া যাইতেছে—শুধু কাঁপুনি, জ্বর আর গায়ের ব্যথাতে কুলাইবে না, রোগীকে আরও একরাশ প্রশ্ন করা দরকার।··· কিন্তু চম্পা এমনভাবে দখল করিয়াছে জায়গাটা যে যাইতে যেন সাহস হইতেছে না, একজন দিগ্‌গজ ডাক্তারের মত গিয়া বুড়ি বুড়ি প্রশ্ন করিতেও সঙ্কোচ হইতেছে—চম্পা ঠাট্টাও করিতে পারে—কর্ম্মের মধ্যে এই নূতন রূপে সে যেন একটু রহস্য-প্রবণও হইয়া উঠিয়াছে, টুলু গিয়া সুযোগই সৃষ্টি করিবে তো।

বই পড়িতে পড়িতে একবার কয়েকটি পায়ের শব্দে রাস্তার দিকে ফিরিয়া চাহিল, দেখে চম্পা ছেলেমেয়ে দু'টিকে লইয়া স্কুলের দিকে যাইতেছে। একটু আগাইয়া গিয়া জানালা দিয়া দেখিল, গতিতে নূতন উৎসাহ ছেলেমেয়ে দু'টিরও—পিছন হইতে দেখা হইলেও বেশ বুঝা যায় তাহারা এর মধ্যেই অনেকটা বদলাইয়া গেছে, যেন কাহার যাদুস্পর্শেই। উহারা স্কুলের ভিতর চলিয়া গেলে টুলু আবার ফিরিয়া বইয়ে মন দিল। তাহার পর তাহার মনে পড়িয়া গেল—এই সুযোগে বুড়ীকে লক্ষণ সব জিজ্ঞাসা করিয়া আসা যাক্ না।

গিয়া দেখিল জায়গাটিতেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ইতিমধ্যে। দু'টি ধর-বারান্দা বেশ পরিষ্কার ঝাঁট দেওয়া, নিচে খানিকটা দূর পর্য্যন্ত আগাছাগুলা কাটিয়া জমিটা পরিষ্কার করা। একটি মাদুরের ওপর কম্বল পাতা বিছানায় বুড়ী শুইয়া আছে, এক দিকে খুরি ঢাকা একটি কলসীতে জল।

আরামে বুড়ী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, এক ডাকে উত্তর পাওয়া গেল না। টুলু চলিয়া যাইতেছিল, আবার ফিরিল, বোধ হয় ভাবিল, এমন সুযোগ না পাওয়া যাইতেও পারে। একটু জোরে ডাক দিতে বুড়ী জাগিয়া উঠিল। অনেকগুলি প্রশ্ন, তার বেশীর ভাগই জটিল,—ডান দিকে ফিরিয়া শুইতে ভাল লাগে, কি বাঁ দিকে ফিরিয়া,—এ সব প্রশ্নের উত্তর সুস্থ মানুষেরই পক্ষে দেওয়া শক্ত ত একটা অথর্ব বুড়ী, গায়ে বোধ

হয় একশো তিন ডিগ্রি জ্বর। তবুও খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেল।

একটা রাস্তা হওয়ায় ঔষধ-নির্বাচনে এবারে বেশ মন বসিল। ধরিয়া ছাড়িয়া ধরিয়া ছাড়িয়া শেষ পর্যন্ত একটা দাঁড় করাইল, অবশ্য অনেকটা সময় গেল। ঔষধটা লইয়া দিতে যাইবে, দেখে চম্পা খিড়কি দিয়া আসিতেছে, প্রশ্ন করিল—"পারলে না একটা কিছু ঠিক করতে?"

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কি ভাবিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"মা পেয়ে থাকেন একোনাইট দেবেন—সব রোগেতেই লাগে দেখেছি।"

টুনু বলিল—"না, ঠিক করেছি একটা, চলো।"

"আমাকেই দিন, খাইয়ে দিচ্ছি।"

টুনু একটু ভাবিয়া বলিল—"আমিই দিয়ে আসি চলো। বুড়ী ভাববে ডেকে নিয়ে এলো, তারপর দেখা নেই; ভাববে না? মানে, অসুখ-শরীরে মনটা যত ভাল থাকে ততই ভাল, নয় কি?"

এইটুকু খাতিরের অভাবে মন খারাপ হবে না ওর, অত উঁচুদরের কেউ নয়।

—চম্পার মুখটা হঠাৎ বেশ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে, একটু কঠিনও, টুনু বিস্মিতভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"তোমার যেন রাগের ভাব চম্পা—হঠাৎ কি হ'ল?"

চম্পা সেইভাবে বলিল—"রাগের কথাই হয়েছে একটু—আপনি যত রাজ্যের জঞ্জাল ওরকম করে এনে জড়ো করবেন না, আর করলেও ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। ঐ একটা রোগা বুড়ী, কি রোগ তার ঠিক নেই...তখন ঐ মেয়েটাকে একেবারে প্রায় বুকে জড়িয়ে আপনি তুলছিলেন, কত রোগের বীজ যে ওর শরীরে আছে...সেবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

টুনু একটু চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিল—"চম্পা, আমি প্রথমে যাঁদের সেবা করতাম তাঁরা নিত্য স্নান করেন, নিত্য কাচা কাপড় পরেন, নিত্য ফুলচন্দনের মধ্যে থাকেন, মাষ্টার মশাই আমায় তাদের থেকে সরে এসে এদের সেবা করতে বলেছেন, আজ আবার তুমি এদের ছেড়ে সেই চন্দনের-সাবানের দিকে যেতে বলছ। এর বুঝা-পড়া তিনি এলে তাঁর সঙ্গেই করো'খন। আপাতত পথ ছাড়ো; এ কি, পথ আগলানো তোমার একটা রোগে দাঁড়াল নাকি?"

চম্পা একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল সে দুয়ারের সামনেই দাঁড়াইয়া আছে বটে, একটু সরিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে অতিক্রম করিয়া কয়েক পা ওধারে গিয়া টুনু ফিরিয়া বলিল—"বাঃ, তুমিও এস, দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

চম্পা আসিয়া কতকটা নির্লিপ্ত ভাবেই বাইরের একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

রোগীর ঘরে আরও একটু শ্রী ফুটিয়াছে, এবারে অন্যভাবে। মেয়েটি মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে, ছেলেটি পায়ের কাছে বসিয়া আছে, বোধ হয় পা টিপিবার কাজ পাইয়াছে কিন্তু মন বসাইতে পারিতেছে না। সেবার এই ছবিটুকু কিন্তু আরও মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে অন্য ব্যাপারে—দু'জনেই তেল মাখিয়া স্নান করিয়া পরিষ্কার হইয়াছে আর দু'জনেরই পরিধানে একখানি করিয়া আস্ত কাপড়, কতকটা পরিষ্কার। আস্ত অবশ্য সে হিসাবে নয়, নিজের কোন পুরানো শাড়ী থেকে ওদের যোগ্য করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে চম্পা। তবে সেটা আর বোঝা যায় না; তাহার বাইরের প্রমাণ এই যে, ছেলেটির কাপড়ের পাড়টা চওড়া। রোগীর গায়েও সে কাঁথাটি নাই, তাহার স্থানে একটি সুজনী; পুরাতন, জায়গায় জায়গায় সুতা আলগা হইয়া গেছে কিন্তু পরিষ্কার; এটা একেবারে ধোপদস্ত।

টুনুর মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতেছে, তিনটিকে আশ্রয় দিয়া সে বেশ একটু দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিল মনে মনে—বিশেষ করিয়া বুড়ীর অসুখের জন্য। চম্পা যে শুধু সমস্যাটা মিটাইয়া দিয়াছে তাই নয়, ঐ অসুখকে কেন্দ্র করিয়াই একটি সৌন্দর্যের পরিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছে। বেশ বুঝিল টুনু এ ধরণের একটা কল্পনাই ওর মাথায় আসিত না।

বুড়ীকে তুলিয়া ঔষধটা খাওয়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে চম্পা যেন একটা কথা কহিবার জন্যই বলিল—"তুমি যে উল্টো করে বললে,—সোজা করে বারণ করলে আমি এ ঘরে ঢুকতাম না।"

চম্পা একটু ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল—"বুঝলাম না।"

"তোমার বলা উচিত ছিল আমার ছোঁয়াচে বরং এদের অসুখ হবার সম্ভাবনা আছে, আমার ঘরও এদের ঘরের মতন পরিষ্কার নয়। আজ নিজেও এদের কাছে দাঁড়াতে পারি না—তুমি যা দাঁড় করিয়েছ আর কি।...থাক্ এ কথা, একবার আমার ঘরে এস।"

ঘরে আসিয়া বাক্স খুলিয়া পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া বলিল—"এই পাঁচটা টাকা রাখ আপাতত, এদের খরচ।"

চম্পা হাতটা না বাড়াইয়া বলিল—"আমরা কি খাচ্ছি না এক মুঠো।—তার সঙ্গে ঐ এক কৌটা এক কৌটা দুটো পেট, বুড়ীর আপাতত দু' বেলা দু' পয়সার সাবু।"

টুনু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"চম্পা, তা'হলে কথাটা বলি—আজ সকাল থেকে, মানে এদের তিন জনের ভার নেওয়া অবধি, একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই যে, যদি এ ধরণের কাজ আমি করতে চাই তো তোমার কাছে পাওয়া আমার একান্ত দরকার, নইলে আমার বিড়ম্বনা তো বটেই, যাদের তুলব টেনে তাদের আরও বিড়ম্বনা।"

চম্পার মনে হইল অন্তরের মধ্যে কি একটা অপূর্ব মধুর স্বাদে চোখ দুইটি যেন বুজিয়া আসিতেছে, মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"আমি আবার কি করলাম বুঝি না তো।"

টুনু নিজের কথায় জোর টানিয়া বলিল—"সত্যি, কাজ আমার একলার করতে গেলে সে কাজ অচল হয়ে পড়বে,

তুমিই যদি হাত দাও তবেই ভরসা। তা তুমি ত তোমার টুনু ভাল ভাবেই করছ, আমায় একবার ডেকে বলতে হ'ল না। কিছু তো ক্ষতিও হ'ল—কাপড়ে বিছানায়, তাতেও আপাতত আমি কিছু বলব না, কিন্তু টাকার অংশটাও তোমার ওপর চাপাতে পারব না চম্পা, আমায় বোলোও না, কেননা তাতে আমার পৌরুষে যা পড়বে বুঝতেই পারো এ কথাটায়।... নাও, ধরো।"

চম্পা হাত বাড়াইয়া টাকাটা লইল, তারপর বলিল—"একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

"করো"।

"অন্যায় হবে, তবুও জিজ্ঞেস করছি—আপনি টাকা পাবেন কোথায়? উপার্জনের দিকে তো ঝোঁক নেই।"

"তুমি এই একটু আগে বুড়ীর মতন যত সব জঞ্জাল টেনে আনবার কথা বলছিলে। যত জঞ্জাল সব টেনে তোলবার আমার ক্ষমতা নেই, তবে এই রকম এক আধ জনকে—আরও দু'এক জনকে নিয়ে চেষ্টা করতে পারি বোধ হয়।"

চম্পা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া বলিল—"আমি ঘর-পালানো ছেলে, তবে বাপ-মায়ের খেদানো নয়, তাঁদের মায়া, মমতা আমায় ঘিরে থাকেই সব জায়গায়; বিশেষ করে মায়ের। টাকার আমার অভাব হয় না ততটা, ভগবান বাবাকে ওদিক দিয়ে সামর্থ্য দিয়েছেন, বিশ্বাস করেন বলে আমি একটু প্রশ্রয় পাই, বিশেষ করে মায়ের কাছ থেকে।"

চম্পা চুপ করিয়া আছে।

টুনু বলিল—"জানি এর বিরুদ্ধে বড় একটা যুক্তি আছে, বাপ-মায়ের টাকা এভাবে খরচ করা মানায় না—উপযুক্ত ছেলের।"

একটু হাসিয়া বলিল—"কিন্তু যে ছেলে অনুপযুক্ত অপদার্থ তার যে সবই মানায়, আর সবই মাপ। কি, তর্কটাতে তবুও ভুল আছে?...এর বেশী ভাবি, না চম্পা।...তুমি এবার যাও। বনমালীকে একটু পাঠিয়ে দেবে।

ক্রমশঃ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীগৌরীহর মিত্র

আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু শ্রীশিবকিঙ্কর সামন্ত মহাশয়ের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয় আলোচনা হয় এবং তিনি তাঁহার নিকট মহর্ষির ধ্যানস্থ ও রাজসিক মূর্ত্তির অপ্রকাশিত ফটো, দার্জ্জিলিং হইতে জামাতা জানকীনাথ ঘোষালকে লিখিত মহর্ষিদেবের চিঠির নকল ও দার্জ্জিলিং এবং চুঁচুড়ার বাটিতে ব্যবহৃত তাঁহার রূপার বাসনকোসন এবং শীতবস্ত্রাদির তালিকা, জমা-খরচের নকল ও মহর্ষির কতকগুলি রচনাংশের কপি ইত্যাদি থাকার কথা উল্লেখ করেন। আমি পরদিন শিববাবুর বাড়ী গিয়া ঐ সব জিনিষ স্বচক্ষে দেখিলাম এবং তাঁহাকে ঐগুলি কিছু দিনের জন্য ধার দিতে অনুরোধ জানাইলাম। তিনি সানন্দে এই সমস্ত জিনিষ আমাকে ধার দিয়াছেন।

শিববাবুর পিতা রামনাথ সামন্ত মহাশয় সম্প্রতি ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মহর্ষির নিকট দশ বৎসরকাল কাজ করেন। মহর্ষি তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন। সামন্ত মহাশয় যখন তাঁহার কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, মহর্ষিদেব তখন স্বহস্তে নিজের এই ফটোগুলি এবং তিনি যে অতি সাধারণ কেদারাটিতে বসিয়া ধ্যান করিতেন সেটিও তাঁহাকে উপহার দেন। এক্ষণে শিববাবুর অনুগ্রহ ও সৌজন্যে উপরিউক্ত ফটো এবং পত্রাদি প্রকাশিত করিতে পারিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছি।

মহর্ষির পত্র ও রচনাংশসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে:

২৩ বৈশাখ, দার্জ্জিলিং

প্রাণাধিক জানকীনাথ,

আমি এই জরাজীর্ণ শরীর লইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এই পৃথিবীতে আর অতি অল্প দিনই আছি। আমার এখানকার দিনের প্রায় অবসান হইয়াছে এবং এখান হইতেই আমার নবতর কল্যাণতর দিনের অভ্যুদয় দেখিতেছি। এখন আমার সম্যকরূপে যতির ধর্ম্ম পালন করা নিতান্ত প্রয়োজন; অতএব পরিজনের সঙ্গ হইতে বিবর্জ্জিত হইয়া এখানে নির্জ্জনে তাঁর সহিত যোগযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। পরিজনের সঙ্গ চিত্তকে সমাহিত করিবার অন্তরায়। সহজেই সংসারের ধূলি আসিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত ও কলুষিত করে। অতএব এই ভগবদ্গীতার শ্লোকের অনুসরণ করিয়া আমাকে অবস্থান করিতে হইবে—

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।"

অতএব তোমরা এখন এখানে আসিতে ক্ষান্ত থাকিয়া আমার এই যোগের আনুকূল্য করিলে পরম সন্তোষলাভ

করিব। তোমাদের ঐহিক ও পারত্রিকের মঙ্গল হউক এই আমার শুভ আশীর্ব্বাদ। ইতি ২৬ বৈশাখ ৫৮

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দারজিলিং

মহর্ষির বিক্ষিপ্ত রচনা ও উক্তি :

ধর্ম্ম বৃথা জ্ঞান বৃথা জ্ঞান বিনা বল,
প্রীতি বিনা ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃথাহি কেবল। (মহর্ষি)

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্ত মোহেন মূঢ়ং
অয়ং লোকোনাস্তি পরইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতেমে॥"

মহর্ষির ধ্যানস্থ মূর্ত্তি

"প্রমাদী ও ধনমদে মূঢ় নির্ব্বোধের নিকটে পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশ পায় না। এই লোকই আছে, পরলোক নাই—যাহারা এ প্রকার মনে করে তাহারা পুনঃপুনঃ আমার বশে অর্থাৎ মৃত্যুর বশে আইসে।"

বৈঠিয়ে না যাঁহা তাঁহা কুসঙ্গ সঙ্গীয়া যাহা কায়ের কা সঙ্গ দুর ভাগে পার ভাঙ্গে। কাজরকা কুঠরী যে কেসো সীয়ান ধসে কাজের কা এক দাগ লাগে পায় লাগে। কুজন কা বাসন যে বৈঠি নেই নসনয়ে কামীনকা কী সঙ্গ কাম জাগে পায় জাগে। কামন কাহ ষড় বৈঠ্ বৈরাগী নাহী হোখা হায়, মায়াকী এক কান্দ লাগে পায় লাগে।

সাধু সঙ্গ বৈঠ্ বৈঠ্ লোকলাজ খোই,
অবত বাত কৈল গৈ জানত্ সব কোই,
মোয় গিরিধারী গোপাল দুসরে ন কোই।

পরমাত্মার অনন্ত মূর্ত্তি
জীবাত্মার অনন্ত গতি

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮

এক দিন আত্মা নীচে মাতার ডানার নীচে ছিল। এখন ক্রমে তাহার পাখা উঠিতেছে এবং সেই দিন ঘুনিয়া আসিতেছে যখন বাসা ছাড়িয়া মাতার সঙ্গে সে মুক্ত আকাশে বিচরণ করিবে। (মহর্ষি)

নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরোয়ৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং ॥১॥

'তদানীং' সেই সময়ে সেই সৃষ্টির পূর্ব্বে 'ন অসৎ আসীৎ' অসৎ ছিল না। 'নো সৎ আসীৎ' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যে সৎ তাহাও ছিল না। 'ন আসীৎ রজঃ।' এক কণা রেণুও ছিল না। 'ন ব্যোম' ঐ মহা আকাশও ছিল না। নাপি 'পরয়ৎ' উপরে যে দ্যুলোক তাহাও ছিল না। 'কিং আবরীব' যেমন আকাশকে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র এখন আবরণ করিয়া রহিয়াছে, যখন আকাশও ছিল না তখন আকাশের এই সকল আবরণই বা কোথায়? 'কুহ কস্য শর্ম্মন্' কোথায় বা কাহার এই সকল ভোগ্য বস্তু। 'অম্ভঃ কিং আসীৎ গহনং গভীরং' এই যে গহন গভীর সমুদ্র তাহাও কি তখন ছিল।১।

সেই সময়ে সেই সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যে সৎ তাহাও ছিল না। এক কণা রেণুও ছিল না, এই মহান্ আকাশও ছিল না। উপরে যে দ্যুলোক তাহাও ছিল না। যেমন আকাশকে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ নক্ষত্র এখন আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, যখন আকাশও ছিল না, তখন আকাশের এই সকল আবরণই বা কোথায়? কোথায় বা কাহার এই সকল ভোগ্যবস্তু? এই যে গহনগভীর সমুদ্র তাহাও কি তখন ছিল?১।

মৃত্যুরাসীদ মৃতং ন র্তহি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিংচ নাস ॥২॥

'মৃত্যু আসীৎ অমৃতং ন র্তহি' মৃত্যু অমৃত তখন কিছুই ছিল না। 'ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ' রাত্রির সহিত দিনও ছিল না। 'ন প্রকেতঃ' প্রজ্ঞানও ছিল না। 'আনীৎ অবাতং স্বধয়া তদেকং' তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাত প্রাণিত সেই এক ব্রহ্মই জাগ্রৎ ছিলেন। 'তস্মাৎ হ অন্যৎ ন কিঞ্চি ন আস' তাহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। 'ন পরঃ' এই বর্ত্তমান জগৎও ছিল না।২।

মৃত্যু অমৃত তখন কিছুই ছিল না। রাত্রির সহিত দিনও ছিল না, প্রজ্ঞানও ছিল না। তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাত প্রাণিত সেই এক ব্রহ্মই জাগ্রৎ ছিলেন। তাহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, এই বর্ত্তমান জগৎও ছিল না।২।

তম আসীত্তমসাগূঢ় মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদং।
তুচ্ছে নাভু পিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং ॥৩॥

'তম আসীৎ তমসা গূঢ়ং অগ্রে'—অগ্রে সৃষ্টির পূর্ব্বে

অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। 'অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বং আঃ ইদং' এই সমুদায় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিঃহীন মহাশূন্য সমুদ্র ছিল। 'তুচ্ছেন আভু অপিহিতং যৎ আসীৎ' 'একং' তুচ্ছ অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত যে এক বিশ্ব কার্য্যের বীজ ছিল 'তৎ' 'তপসঃ মহিনা অজায়ত' তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্ম্যে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল।৩।

অগ্রে সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই সমুদয় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিঃহীন মহাশূন্য সমুদ্র ছিল। তুচ্ছ অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত যে এক বিশ্বকার্য্যের বীজ ছিল তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্ম্যে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল।৩।

আমি জানিতেছি আমি পরিমিত জ্ঞান। আর আমি জানিতেছি যে আমি অনন্ত জ্ঞান হইতে হইয়াছি। আমি তাহাতে রহিয়াছি। তিনি আমার অন্তর্য্যামী, আমার জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতির জন্য আমি এই দেহযন্ত্র এবং কর্ম্মক্ষেত্র, এই পৃথিবীলোক পাইয়াছি। দেহ অবসান হইলে আমি আমার অন্তর্য্যামীকে লইয়া পৃথিবীলোক হইতে চলিয়া যাইব এবং আমার জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি অনুসারে আমার গতি হইবে।

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং পাপ নাশ হেতুরেব নতু বিচার বাগ্ বলং। দর্শনস্ত দর্শনেন নেমেনতু নির্ম্মলং। বিবিধ শাস্ত্রজল্পনেন ভবতি তাত কিং কলং। পুণ্যপুঞ্জেন প্রেমধনং কোপিলভে তত্ত্ব তুচ্ছং সকলং যাতি মোহান্ধ তমঃ প্রেম রবেরভ্যুদয়েতাতিতত্ত্বং বিমলং। প্রেমধর্ম্মো যদি তাতিক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্তগতং।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রাজসিক মূর্ত্তি)

(নীচের রচনাংশটি অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ)

যে তাহাকে তাহার লক্ষ্য এই থাকে তাহার আদর্শ লইয়া মদন? আমার দেবতা যিনি সেই দেবতার সাদৃশ্য যে তার আমি কতক উপলব্ধি করিতে পারি আমি যে তোমার দরজায় আসিয়াছি।

তাহা হইতে পরিত্রাণ পাই তোমার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারি তিনিও অপহত পাপ্মা? আছেন তাহা একবার এই কল যে যখন আমার আত্মাকে পাপমনা মনে করিয়া তাহার কাছে কাছে যাইতে পারিব।
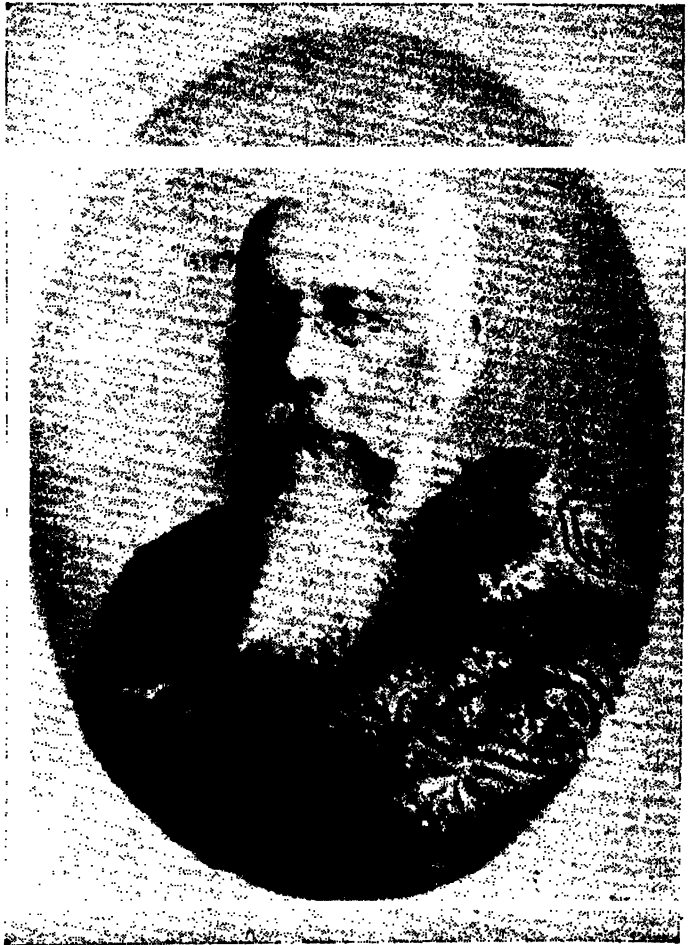
তাঁহার সাদৃশ্য করা ও পাপমনাত্তান করা তিনি যেমন অমূর্ত্ত আমিও সেইরূপ অমূর্ত্ত কিন্তু আমার আত্মা পাপমনাদ্বারা মলিন হইয়া রহিয়াছে

আমার আত্মাকে অপহত পাপ্মা করা যতদূর পারি চেষ্টা করা……আনন্দরূপ……

তাহার যখন জরা নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই সত্য-কাম, সত্য সঙ্কল্প এই যখন জানিবে তখন তোমার যেমন—

(আর লেখা নাই)

বঙ্গে ধর্ম্মান্তরকরণ ও তাহার প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা

(শতবর্ষ পূর্ব্বে ও পরে)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

সম্প্রতি নোয়াখালিতে অসহায় হিন্দু নরনারীকে যে ভাবে জোরপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ, নিষিদ্ধ খাদ্য-ভক্ষণ এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করানো হইয়াছে তাহাতে দেশের মধ্যে স্বতঃই আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এবং সমাজের নেতৃবর্গ এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, উক্তরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণে এবং বিবাহাদি রূপ নিগ্রহে ধর্ম্মান্তরিত ঐ 'বিবাহিত' নরনারী 'পতিত' বা স্বধর্ম্মচ্যুত হইবে না, তাহাদিগকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজের নেতাদের একটি বিষয় বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। একথা অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, হিন্দু সমাজ-মধ্যে এমন বহু ক্ষত রহিয়াছে যাহার সুযোগ লইয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ যুগে যুগে হিন্দুদিগকে এইরূপ আক্রমণ করিতে উদ্যোগী ও সাহসী হইয়াছে। রাজশক্তি যখন যে সমাজের অনুকূল থাকে, তাহার প্রভাব অন্যদের উপরও নানা রূপে আত্ম-প্রকাশ করে। পূর্ব্বে বিভিন্ন দেশে ব্যাপক ধর্ম্মান্তরকরণ রাজশক্তির সহায়েই হইয়াছে। আধুনিক কালে ও-রূপটি হুবহু না ঘটিলেও অনুন্নত মন এখনও একথা ভাবিয়া উৎফুল্ল হয় যে, রাজশক্তি যখন সপক্ষে তখন বুঝি নির্ব্বিরোধেই এই কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহারা প্রতিপক্ষ অর্থাৎ 'শাসিত', তাহারা ঐক্যবদ্ধ না হইলে প্রবলতর পক্ষকে সার্থক ভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নয়। হিন্দু-সমাজে এখনও এমন সব বিধিনিষেধ আছে যাহার জন্য তাহার সঙ্ঘশক্তি সুস্পষ্ট ও ফলপ্রদ হইতে পারিতেছে না। এই সব বিধিনিষেধের বেড়াজাল একেবারে না ভাঙিতে পারিলে বা আমূল সংস্কার না করিয়া লইলে প্রবলতর পক্ষের লোলুপ দৃষ্টি পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমানেও হিন্দু সমাজের উপর পড়িতে থাকিবে। সাময়িক ভাবে কোনরূপ নির্দ্দেশ বা পাঁতি দেওয়া অত্যাবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজের স্থায়ী কল্যাণ সাধন করিতে হইলে সর্ব্বসাধারণের মনে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মানো প্রয়োজন যে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণে যে ব্যক্তি 'পতিত' তাহাকে স্ব-সমাজে ফিরাইয়া লইতে কোনই বাধা নাই। এই মনোভাব সাধারণের মধ্যে দৃঢ়মূল হইলে পরধর্ম্মীরা হিন্দুদের উপর আর এমন লোলুপ দৃষ্টি হানিবে না। শতবর্ষ পূর্ব্বে এই উদ্দেশ্যে একটি সমবেত প্রচেষ্টার সূচনা হয়। ইহা তখন খ্রীষ্টধর্ম্মের স্রোত রোধ করিতে বহুলাংশে সমর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বগামী-দের উক্ত প্রচেষ্টা আধিকার দিনে কর্ত্তব্য নির্ণয়ে সহায়তা করিবে।

২

এদেশে ইংরেজী শিক্ষার সত্যিকার প্রয়োজনীয়তা সরকারী ভাবে স্বীকৃত হয় ১৮৩৫ সনে। ইহার পূর্ব্বেই খ্রীষ্টান পাদ্রীরা ইংরেজী শিক্ষার আইন করিয়া ভারতবাসীদের, বিশেষতঃ হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে অগ্রণী হয়। ঐ বৎসর ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের ভার যখন সরকার গ্রহণ করিলেন তখন তাহারা স্বভাবতঃই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আরবি ও সংস্কৃত শিক্ষার অবহেলা হইবে ভাবিয়া প্রাচীনপন্থীরা শঙ্কিত হইলেন। তখন কলিকাতার বহু গণ্যমান্য মুসলমান নেতা ও মৌলবী সরকারের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে তাঁহারা এই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, হিন্দু এবং মুসলমানদের খ্রীষ্টান করাই এরূপ শিক্ষা প্রচলনের মূল উদ্দেশ্য।* হিন্দুরা বরাবর ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অগ্রণী হইলেও, মুসলমানেরা এ কারণ ইহা হইতে বিরত থাকে। এই শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের মূলে ছিলেন সরকারের ব্যবস্থা-সচিব টমাস বেবিংটন মেকলে। তিনি রাজনীতিতে উদার মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু ভারতবাসীদের এবং তাহাদের স্বকীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার মত মোটেই উদার ছিল না। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মত তিনিও চাহিতেন, ইংরেজী শিক্ষার মারফত পাশ্চাত্য ভাবধারা আয়ত্ত করিয়া ভারতবাসীরা যেন খ্রীষ্টান ভাবাপন্ন হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধানদের ঐ ধারণা যে একেবারে অমূলক ছিল না, বিলাতে পিতাকে লিখিত মেকলের একখানি পত্র হইতে তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি। তিনি লেখেন—

"The effect of this [English] education on the Hindoos is prodigious. No Hindoo who has received English education, ever remain sincerely attached to his religion. Some continue to profess it as a matter of policy ; but many profess themselves as deist, and some embrace Christianity. It is my firm belief that if our plan of education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty years hence. And this will be effected without efforts to proselytize ; . . .'

---

* হোরেস হেমান উইলসন ১৮৫৩, ১৮ই জুলাই পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদান কালে এই আবেদন-খানির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন—

"After objecting to it upon general principles, they said that the evident object of the government was the *conversion* of the natives ; that they encouraged English exclusively and discouraged Mohammedan and Hindu studies, because they wanted the people to become Christians."

মেকলে বলেন, "হিন্দুদের উপর ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব অসাধারণ। ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত এমন কোন লোক নাই যে তাহার নিজের ধর্ম্মে সত্য সত্যই আস্থাশীল। কেহ কেহ ঐহিক সুবিধার জন্ত নিজেকে হিন্দু বলে বটে, কিন্তু অনেকে ইতিমধ্যেই একেশ্বরবাদী হইয়াছে এবং কেহ কেহ খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিক্ষার পরিকল্পনাটি যদি ঠিক ঠিক অনুসৃত হয় তাহা হইলে আগামী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একজনও পৌত্তলিক থাকিবে না, আর খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের কোন চেষ্টা না করিয়াই এমনটি ঘটিয়া যাইবে।"

মেকলের সহকর্ম্মী এবং তৎপ্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতির অনুরাগী ও সমর্থক সার চার্লস ট্রেভিলিয়ানও ১৮৫৩ সনে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদান কালে বলেন—

"Educated in the same way, interested in the same pursuits with ourselves, they become more English than Hindoos just as the Roman provincials became more Roman than Gauls or Italians."

কিন্তু মেকলে প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পরিকল্পনাটি ঠিক ঠিক কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে খ্রীষ্টান মিশনরী বা পাদ্রীদের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাহাদের পরামর্শমত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সরকারী বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকাদি রচনায় আর স্বাধীনতা রহিল না। শিক্ষা-কমিটি পাদ্রী ইয়েট্সের পরামর্শানুসারে স্থির করিলেন যে, বাংলা প্রভৃতি দেশ-ভাষায় যে-যে পুস্তক মুদ্রিত হইবে তৎসমুদয়ই প্রথমে ইংরেজীতে রচনা করাইয়া কমিটির অনুমোদন লাভের পর ঐ ঐ ভাষায় অনুবাদ করিতে দেওয়া হইবে।* এরূপ করার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—প্রাচ্য ভাব ও দর্শনবাদ পাঠ্য পুস্তকে যাহাতে না প্রবেশ লাভ করে তাহাই তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় ছিল।

শিক্ষা-বিভাগ হইতে ক্রমে সরকারী অন্ত বিভাগেও পাদ্রী-দের প্রাধান্ত অনুভূত হইতে লাগিল। রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮৫১ সনের ৭ই অক্টোবর ডক্টর উইলসনকে একখানি পত্রে লেখেন—

"Missionary influence is now on the ascendant. Every department from the fountainhead of Government to the lowest course of office is infected with it."

৩

১৮৩৫ সনের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং তাহা কার্য্যকর করিবার পদ্ধতি খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদের বিশেষ অনুকূল হইল। এত দিন কলিকাতার মত বড় বড় শহরেই পাদ্রীদের প্রচারকার্য্য চলিতেছিল, চতুর্থ দশকে তাহারা গ্রামেও ছড়াইয়া পড়িল এবং নিরীহ দরিদ্র গ্রামবাসীদিগকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া খ্রীষ্টান করিতে লাগিয়া গেল। আর এ কার্য্যে বিশেষ অগ্রণী হইলেন আলেকজাণ্ডার ডাফ। ডাফ যখন ১৮৩০ সালে প্রথম কলিকাতায় আসেন তখন রাজা রামমোহন রায় স্কুল প্রতিষ্ঠায় তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। রামমোহন বিলাত গমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় স্কুলটির পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে হিন্দুদের নিকট হইতে সাহায্য পাইলেও ডাফ অল্পদিনের মধ্যেই নিজ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং ডিয়াল্ট্রি প্রমুখ অন্তান্ত পাদ্রীদের সঙ্গে একযোগে নব্যশিক্ষিত যুবকদের নিকট খ্রীষ্টমাহাত্ম্য প্রচারে তৎপর হন। হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রধানতঃ ইঁহারই উপদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাফ প্রায় পাঁচ বৎসরকাল (১৮৩৫-৯) ইউরোপ ও আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিয়া বক্তৃতা দিয়া বেড়ান। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া *India and India Missio .s* নামক পুস্তক রচনা করিয়া কি পৌত্তলিক, কি বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম্মের সকল শাখার উপরই তীব্র কটাক্ষ করেন। দেখিতে দেখিতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণও হইয়া যায়। ডাফ ভারতবর্ষে ফিরিয়া পূর্ণোদ্যমে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে লাগিয়া যান। বিভিন্ন স্থানে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার মারফত ছেলেদের কোমল মনে খ্রীষ্ট-কথা অনুপ্রবিষ্ট করাইবারও ব্যবস্থা করা হইল।

পাদ্রীদের এরূপ কার্য্যের কুফল সম্বন্ধে হিন্দু সমাজ প্রথম দিকে ততটা সচেতন হয় নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই এদিকে সর্ব্বপ্রথম অগ্রণী হইয়া বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন। দেবেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ভাবধারা বর্জ্জন না করিয়া বরং তাহা গ্রহণেরই পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত ছিল যে, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে নিজস্ব ধর্ম্ম ও

* ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" (ফাল্গুন ১৭৬৭ শক) যে সকল হিন্দু খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, খ্রীষ্টানদের প্রদত্ত তাহার সংখ্যার একটি তালিকা দিয়াছেন। পত্রিকার মন্তব্যসহ এই তালিকাটি দিলাম—

আগড়পাড়া গ্রামে ৮৫ জন। কাটোয়াতে ১৩৭ জন। কার্পাসডাঙ্গাতে ৯৬০। কৃষ্ণনগরে ৩১০। কৃষ্ণপুরে ১০০। খাড়িতে ১০০। গাদরাই হাদে ১৭৫। চাটগাঁতে ১০৬। চাপড়াতে ৪২২। জলেশ্বরে ৪১। জানমগরে ১৯০। টালিগঞ্জে ৫৪৪। ঠাকুরপুরে ২১৭। ঢাকায় ১৮। তমলুকে ১১১। দিনাজপুরে ৬৮। নদিয়াচকে ২৭৩। বরিশালে ৭০। বর্দ্ধমানে ১৮৬। বহরমপুরে ১০০। বালেশ্বরে ১৫। বারিপুরে ১৩১২। মলয়াপুরে ২৫। যশোহরে ৩২২। রঙ্গপুরে ৮৫৮। রামমাখাল চকে ১৬০। লক্ষ্মিপুরে ২৫০। শিউড়িতে ৮২। শ্রীরামপুরে ৯। সাধমহলে ৩৪। সোলোতে ৮৭০। হাবড়াতে ১৯৫ জন।

"আমারদিগের দেশস্থ লোক দৃষ্টি করুন যে তাঁহারদিগের অনুৎসাহ এবং অমনস্ক্য প্রযুক্ত খ্রীষ্টানেরা কি প্রকার প্রবল হইতেছে। অতএব স্বধর্ম্ম রক্ষা এবং কাল্পনিক খ্রীষ্টান ধর্ম্ম নিবারণ জন্ত যেরূপ যত্নের আরম্ভ হইয়াছে তাহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি দ্বারা মানস সফল করিতে সকলে প্রাণপণ চেষ্টা করুন।"

সংস্কৃতির ভিত্তিতে। বিজাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে বহু সহস্র শতাব্দীপুষ্ট বৈশিষ্ট্য একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে। দেবেন্দ্রনাথ এই আশঙ্কা করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের অভিসন্ধি ফাঁস করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। পাদ্রীরাও শীঘ্রই বুঝিল যে, তাহাদের এক জন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ভব হইয়াছে।*

৪

দেবেন্দ্রনাথের প্রতিরোধ এতদিন আলোচনার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি উহাদের প্রকাশ্যে বাধা দানে অগ্রসর হইলেন। ১৮৪৫ সনের এপ্রিল মাসে মিজ কুঠির রাজেন্দ্রলাল সরকার নামক জনৈক কর্মচারীর কিঞ্চিদূর্দ্ধ চতুর্দ্দশ বৎসরবয়স্ক ভ্রাতা এবং ডাফের স্কুলের ছাত্র উমেশচন্দ্র সরকার ডাফ সাহেবেরই পরামর্শে একাদশ বর্ষীয়া নাবালিকা স্ত্রীকে লইয়া তাঁহার বাটীতে যায় এবং সেখানে কয়েকদিন মাত্র অবস্থান করিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করে। 'হেবিয়াস কর্পাস' সূত্রে উহাদিগকে ফিরাইয়া লইতে চাহিয়া আবেদন করা হইলে সুপ্রিম কোর্ট তাহা নামঞ্জুর করেন। অথচ ইহার প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার এডওয়ার্ড রায়ান ব্রজনাথ ঘোষ নামক একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালককে পাদ্রীদের কবল হইতে হেবিয়াস কর্পাস অনুসারে উদ্ধার করিয়া পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিচার বিভাগের যখন এইরূপ বিপর্য্যয় দেখা দিল তখনই হিন্দু সমাজের টনক নড়িল। দেবেন্দ্রনাথ নিজ পত্রিকায় এই সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়া লিখিলেন যে, পাদ্রীদের মত হিন্দুদের পক্ষেও অবৈতনিক বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিয়া নিঃসম্বল ছাত্রদের সেখানে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বাড়ী বাড়ী গিয়া হিন্দু-প্রধানদের এই বিষয়ে কিরূপ উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, 'আত্মজীবনী'তে তিনি তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। (পৃ. ১০২-৩, বিশ্বভারতী সংস্করণ)। তিনি তাঁহার কার্য্যে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ রক্ষণশীল এবং রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ প্রগতিবাদী উভয় দলেরই আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিলেন। বহুদিনের বিবদমান হিন্দু-সভা এবং ব্রহ্ম সভা এক হইয়া গেল। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে ১৮৪৬ সনের ১লা মার্চ্চ 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' নামে একটি অবৈতনিক ইংরেজী-বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ইতিমধ্যে এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হইবে জানিয়া দানবীর মতিলাল শীল ১৮৪৫ সনের ২রা জুন নিজ ভবনে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং এতদুদ্দেশ্যে নিজ তহবিল হইতে এক লক্ষ টাকা আলাদা করিয়া রাখিলেন।

এখানে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই সময়ে হিন্দুগণ পাদ্রীদের অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলির পরিবর্ত্তে মাত্র নিজেদের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়সমূহেই ছেলেদের পাঠাইয়া খ্রীষ্টানীর স্রোত রোধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কারণ তখন পাদ্রী-স্কুলে অক্ষরজ্ঞান হইবার পরই ছাত্রদিগকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে খ্রীষ্টতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকাদি পড়িতেও বাধ্য করানো হইত। আর এ হেতু তাহাদের মন অল্প বয়সেই খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া যাইত। হিন্দুগণ এবিষয়ে ক্রমে অধিকতর হুঁশিয়ার হইলেন। ১৮৪৭ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় গোরাচাঁদ বসাকের ভবনে এক সভায় সমবেত হইয়া তাঁহারা এই সঙ্কল্প গ্রহণ করেন যে, অতঃপর তাঁহারা মিশনরীদের স্কুলে ছেলেদের আর পাঠাইবেন না। এই সভার একটি বিবরণের কিয়দংশ এখানে দিলাম। বিবরণটি মিশনরীদের প্রদত্ত—

"Hindoo Anti-Christian Meeting . . . The meeting crowded to excess by a curious and motely group of natives of every caste and creed . . . The proceedings began with Rajah Radhakanta Deb's taking the chair. It was resolved that a society be formed, named the Hindu Society, and at the first instance each of the heads of castes, sects, and parties at Calcutta, orthodox as well as heterodox, should, as members of the said Society, sign a certain covenant, binding him to take strenuous measures to prevent any person belonging to his caste, sect, party from educating his son or ward at any of the Missionary Institutions at Calcutta, on pain of excommunication from the said caste, sect or party. Many of such heads present signed the covenant. It was presumed that the example will soon be followed by the inhabitants of the Mofussil. One of the orthodox party present at the meeting said after its dissolutions, addressing himself to the boys present, "Babas, be a follower of one God, (*i.e.*, a Vedantist), eat whatever you like, do whatever you like, but be not a Christian."*

সভায় হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর, মতের ও দলের যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব, হরকুমার ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এখানে হিন্দু সোসাইটি নামে একটি সভা স্থাপিত হইল। সমবেত ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মিশনরী বিদ্যালয়সমূহে কোনমতেই আর ছেলেদের পাঠানো হইবে না। যাহারা এই

---

* *The Christian Observer* (July 1840) লেখেন—
"Hinduism and Vedantism Missionary . . . The last and most novel movement on the part of the Hindu is that of the Vedists. They have, we understand, determined to send out Missionaries to preach the doctrines of the Vedas amongst the people. They also ... to establish a *patshala* for the vernaculars in which the Vedas shall alone be taught. . . ."

* *Hand-Book of Bengal Missions.* By the Rev. James Long. 1848. P. 501.

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ঐ সব প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের পাঠাইবে তাহারা যে শ্রেণী, মত বা দলের লোক হউক না কেন, তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করা হইবে। মফস্বলেও এই আন্দোলন সুরু করিবার কথা হইল। এই সময় মিশনরীদের দৌরাত্ম্যে হিন্দুসমাজ কতখানি উত্ত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, উপরিউক্ত বিবরণের শেষে উদ্ধৃত জনৈক রক্ষণশীল হিন্দুর উক্তি হইতে তাহা বুঝা যাইবে। তিনি সভাস্থে উপস্থিত যুবকদের সম্বোধন করিয়া বলেন যে, তাহারা এক ঈশ্বরের ভজনা করুক, যাহা ইচ্ছা ভক্ষণ করুক, যদৃচ্ছা আচরণ করুক তাহাতে কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু তাহারা যেন খ্রীষ্টান না হয়। হিন্দুসমাজের এই আন্দোলন এবং অবৈতনিক বিদ্যালয়াদি স্থাপন হেতু খ্রীষ্টান হইবার স্রোত রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত ব্যাহত হইল, একেবারে মিশনরীদের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"(আত্মজীবনী পৃ, ১০৬)। নব্যশিক্ষিত প্রগতিবাদী যুবকগণ পূর্ব্বে যেমন খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িত, এই সময় হইতে তাহা ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল। অল্পকাল মধ্যে মিশনরীদের হিন্দুধর্ম্ম নিন্দার অনুকরণে তাহারাও প্রকাশ্য স্থানে খ্রীষ্টধর্ম্মের দোষগুলি দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল। ভূদেব লিখিয়াছেন—

"কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় পাদ্রীরা যেমন খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, অমনি তাহাদিগের পার্শ্বে নব্য ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের মত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন স্থানে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্বপক্ষেও দুই একটি বক্তৃতা হইতে লাগিল। নব্যেরা এই সময়ে আর একটি উপায় করিয়াছিলেন। এতদিন খ্রীষ্টধর্ম্মই এদেশের ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিয়া ইহার দোষ প্রদর্শন করিতেছিল…এই অবধি নব্যেরা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা যে সকল সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত খ্রীষ্টধর্ম্ম মানিতেন না, তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুক্তি সকল সংগ্রহ করিয়া ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই অবধি ছেলেরা ইংরাজী পড়িলেই খ্রীষ্টান হইবে—এ আশঙ্কা ন্যূন হইয়াছে।" (বাংলার ইতিহাস, ৩য় ভাগ, পৃ. ৮৭) ইহার পর, শাসকবর্গের উপর, বিশেষতঃ সরকারী শিক্ষানীতির উপরও মিশনরীদের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল।

৫

হিন্দুগণ, বিশেষতঃ হিন্দু যুবকগণ যাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ না হয় এ তো হইল তাহারই প্রচেষ্টা। কিন্তু যাহারা ইতিমধ্যে খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে তাহাদের উদ্ধার করিয়া সমাজে পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থাও তো করা আবশ্যক। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ বিষয়েও শীঘ্রই অবহিত হইলেন। ১৮৫১ সনের প্রথম দিকে কলিকাতা ভবানীপুরে আবার মিশনরীরা কয়েকজন হিন্দুকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলে। এই সময় ঐ অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় লোকেদের আগ্রহাতিশয্যে পুনরায় হিন্দু সমাজের পক্ষে এক বিরাট সভার আয়োজন হইল। ১৮৫১ সনের ২৫শে মে তারিখে চিৎপুরস্থ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ভবনে রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে এই সভার অধিবেশন হয়। এবারেও হিন্দু-সমাজ ভুক্ত রক্ষণশীল প্রগতিবাদী সকলেই যোগ দিয়াছিলেন। এদিনকার সভার প্রধান বিচার্য্য বিষয় ছিল—"যাহারা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে পরধর্ম্ম গ্রহণ ও ইহার আচারাদি পালন করিয়াছে, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়াছে তাহারাও যদি পূর্ব্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে চায় তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সাধ্যমাত্র অর্থের বিনিময়ে তাহারা তাহা করিতে পারিবে কিনা?" সে যুগের বহু বিখ্যাত পণ্ডিতও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই এরূপ ব্যবস্থার সপক্ষে মত প্রদান করিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের পণ্ডিতদেরও মত গ্রহণ আবশ্যক বিবেচিত হইল। সভাপতি মহাশয় শাস্ত্রীয় নানা বচন উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, হিন্দু শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিভিন্ন বিধির উল্লেখ আছে এবং যুগে যুগে তাহার পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান কালে কড়ি মাত্রের বিনিময়েই 'পতিত' বা ধর্ম্মান্তরিত ব্যক্তিকে স্ব-সমাজে ও স্ব-ধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। সভার অভিমত এবং সভাপতির উক্তির উল্লেখ করিয়া শ্রীরামপুরের মিশনরীদের পরিচালিত 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' ৫ই জুন তারিখে ইহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি খুব বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ("Constitute one of the most important events that has occurred in India in the present century.")।

হিন্দুদের এই সভা হইতেই যে 'পতিতোদ্ধার সভা'র উৎপত্তি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।* সভার প্রস্তাব এবং সভাপতির উক্তি দৃষ্টে একটি প্রস্তাবনা রচনা করিয়া বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতদের নিকটে প্রেরিত হইল। প্রস্তাবনা বা ভূমিকায় যে সব প্রধান সমস্যার কথা উত্থাপিত হইল তাহার একটি হইল এই: পাদ্রীগণ মুসলমানদের খ্রীষ্টান করাইতে বা মুসলমানগণ খ্রীষ্টানদের ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে বড় একটা আগ্রহ দেখায় না, অথচ উভয়েই হিন্দুদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইতে লালায়িত হয়, ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে,—প্রথমোক্ত ধর্ম্মাবলম্বিগণের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার পর পূর্ব্বধর্ম্মে ফিরিয়া যাইতে কোনও বাধা নাই, পরন্তু হিন্দু সমাজে ইহার বিপরীত রীতি বলবৎ। সমাজের লোকের যেরূপ মনোভাব তাহাতে একবার হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্মান্তরিত হইলে পূর্ব্বধর্ম্মে ফিরিয়া

* "স্বর্গীয় সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের যত্নে কলিকাতায় পতিতোদ্ধারিণী নাম্নী একটি সভা স্থাপিত হয়"—"পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থা পত্রিকা"র তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আসা সাধ্যাতীত। তবে হিন্দুশাস্ত্রে মনু যাজ্ঞবল্ক্য যে-সব প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা কিসের জন্য? পরন্তু বর্ত্তমানে যদি সমাজকে রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে ধর্ম্মান্তরিত ব্যক্তিগণকে হিন্দুধর্ম্মে ফিরাইয়া আনা একান্ত আবশ্যক। হিন্দু সমাজে পূর্ব্বে এরূপ করা হইত। বর্ত্তমান যুগেও রামদুলাল সরকার এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়া কয়েকজন 'পতিত'কে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বিত্তশালীদের মধ্যে কেহ কেহ স্বেচ্ছাচারী হইলেও পরে ধনৈশ্বর্য্য বলে হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকেরা যদি কখনও স্বেচ্ছায় বা প্রলোভনে পড়িয়া কিংবা অন্য যে-কোন কারণে পরধর্ম্ম গ্রহণ করে ও 'পতিত' হয় তাহা হইলে তাহাদের আর উদ্ধারের আশা থাকে না। কাজেই সমাজে ব্যবহার-সাম্য স্থাপন জন্যও তাহাদিগকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করা বিধেয়।

পতিতোদ্ধার সভার আবেদনে কাজ হইল। শ্রেষ্ঠতম সাত জন পণ্ডিত মিলিয়া একখানি ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিলেন। তাহা উক্ত প্রস্তাবনা সহিত 'পতিতোদ্ধার সভা'র পক্ষে "পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থা পত্রিকা" নামে ১৭৭৫ শকে (১৮৫৩-৪) মুদ্রিত হয়। অম্বিকা, আগড়পাড়া, আটপুর, আড়িয়াদহ, টালা, উত্তরপাড়া, কলিকাতার আরপুলি, কলুটোলা, সিমলা, শোভাবাজার প্রভৃতি, কামারহাটি, কুমারহট্ট, কুলীনগ্রাম, কোন্নগর, গুপ্তপল্লী, গোবরডাঙ্গা, চিৎপুর, চিতপিপোতা, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, পানিহাটি, বংশবাটী, ময়মনসিংহ, সুগন্ধ্যা, শান্তিপুর, হরিনাভি প্রভৃতি সংস্কৃত-চর্চ্চার কেন্দ্রসমূহের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এই শত জনের মধ্যে ছিলেন। এই ব্যবস্থাপত্রখানির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হইল এই যে, পরধর্ম্ম গ্রহণ এবং অভক্ষ্য ভক্ষণজনিত অপরাধ হেতু পতিত হইলেও পূর্ব্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে কোন হিন্দুরই শাস্ত্রগত কোন বাধা থাকিবে না। সামান্য মত প্রায়শ্চিত্ত করণান্তর তাহাদের 'অব্যবহার্য্যতা' দোষ খণ্ডিত হইয়া যাইবে।

৬

গত শতাব্দীর মধ্য ভাগে হিন্দু সমাজের উপর মিশনরীগণ যে আক্রমণ চালাইয়াছিল, সাধারণের, বিশেষতঃ যাঁহারা ভিতরের খবর রাখিতেন তাঁহাদের বিশ্বাস, রাজশক্তি তাহার খুবই সহায় হইয়াছিল। আমরা দেখিলাম, কিরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রগতিপন্থী এবং রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ রক্ষণশীল নেতৃবর্গ একযোগে কার্য্য করিয়া বিভিন্ন উপায়ে ইহাতে বাধা দান করতঃ কতকাংশে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহার পর এক শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। জগতে বহু বিষয়ে বিপুল পরিবর্ত্তনও সাধিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ধারাও যুগে যুগে বদলাইয়াছে। বর্ত্তমানে শাসনে যে পন্থা অনুসৃত হইতেছে তাহাতে বঙ্গদেশের শাসনদণ্ড প্রত্যক্ষ ভাবে একটি সম্প্রদায়-বিশেষের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। ইদানীং কতকটা রাজনৈতিক প্রচারের ফলে এবং কতকটা ব্রিটিশের অদৃশ্য হস্তের সহায়ে বঙ্গীয় সমাজের এক শ্রেণীর উপর নানাভাবে আক্রমণ চলিতে সুরু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্যাপক ধর্ম্মান্তরকরণ একটি। সমাজনেতৃবৃন্দের এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে আরম্ভেই বলিয়াছি। পূর্ব্বযুগের মত বর্ত্তমানেও হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু এই সঙ্ঘ সময়োপযোগী করিয়া গঠন করিতে হইবে। সমাজের তথাকথিত উচ্চ এবং তথাকথিত নীচ সকলের মধ্যেই আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে যাহাতে সমান চেতনার উদ্রেক হয় তাহার উদ্যোগ করা প্রয়োজন। আর বর্ত্তমান সময়ে ইহার প্রথম সোপান হইবে—বংশগত, জন্মগত, বা শ্রেণীগত ভেদবৈষম্য বিদূরণ এবং গীতার 'গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ' নীতি মানিয়া গুণী এবং কর্ম্মীর যথোচিত সমাদর। তাহা হইলে গত শতাব্দীতে যেমন খ্রীষ্টান হইবার স্রোত রোধ করা সম্ভব হইয়াছিল আজিও অন্যবিধ রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম্মগত পথ অগ্রাহ্য করিয়া প্রগতির পথে অবাধে অগ্রসর হওয়া চলিবে।

প্রিয়া তুমি এই ধরণীর

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

অনেক স্বপন দিয়ে তারাক্রান্ত দিনান্তের শেষে
কত বৃত্ত্য পাড়ি-দেওয়া প্রিয়া মোর দেখা দিল এসে।
কত ঘুঘু ডেকে গেল—উড়ে গেল কত বুনো হাঁস,
আকাশের নীল খুশী বুকে ক'রে রেখেছিলো বাস।
'নবগঙ্গা'-তীরে শুনি এলোমেলো বাতাসের সুর,
কত সন্ধ্যা কতবার ক'রে গেছে তাহারে বিধুর।
নরম ফুলের মত ঝরে গেছে কত শেফালিকা,
জ্বলে জ্বলে নিবে গেছে কতবার কত দীপশিখা।

তারারা জেগেছে কত শতাব্দীর কত প্রেম নিয়ে,
তারি মধু-ভালোবাসা আজি কিছু মোরে গেল দিয়ে।
নিশুতি রাতের মাঝে ঝিঁঝি ডাকে—কেঁপে ওঠে বন,
ঘুম ভুলে ক্ষণে ক্ষণে তাই আমি হই উন্মন।
জোনাকির আলো-মাখা যূঁই ফুলে সুরভি অধীর:
তুমি এলে প্রিয়া মোর—প্রিয়া তুমি এই ধরণীর।

মৃৎশিল্পের ক্রমোন্নতি

শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এসসি

মৃৎশিল্প সম্বন্ধে ইংরেজী এবং অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় অনেক বই আছে, কবে কোথায় এবং কখন মৃৎশিল্পের প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষয়েও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এসম্বন্ধে পুস্তকাদি নেই বললেই চলে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় খনিজ পদার্থ বা তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে মাত্র দু-চারখানা বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঠিক এই বিষয়ে কোন বই না থাকার দরুন, বিশেষ করে বাংলা ভাষায় মৃৎশিল্প সংক্রান্ত পরিভাষার অভাবে ভারতীয় মৃৎশিল্পের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসে এখনও আলোকপাত হয় নি। এই সব নানা কারণে মৃৎশিল্প বিষয়ে লিখতে গিয়ে সম্যক্ ভাব-প্রকাশের জন্যে সময় সময় ইংরেজী শব্দের ব্যবহার করতে হয়েছে।

অন্যান্য কলা বা বিজ্ঞানের ন্যায় মৃৎ-শিল্পেরও নানা শাখা-প্রশাখা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে এই শিল্পের যাবতীয় বিভাগ সম্বন্ধেই মোটামুটি ভাবে কিছু কিছু বলবার চেষ্টা করেছি।

মৃৎশিল্প বোধ হয়, পৃথিবীর সব জায়গায় একই সময়ে আরম্ভ হয়। কখন কোথায় এবং কেমন করে এর প্রথম সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে ইতিহাসে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তবে এই শিল্প মানুষের আদিম মনোবৃত্তির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত বলে কেমন করে স্তরে স্তরে এর ক্রমোন্নতি হ'ল সেই কথাই বলব।

মানুষ সব সময়ে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয় বা নিতে চেষ্টা করে। প্রস্তরযুগে মানুষ পাহাড়ের গুহায় বাস করত। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বাসস্থানের পরিবর্তন হ'ল এবং মানুষ গিরিগুহা পরিত্যাগ করে নদীর ধারে গাছের পাতা বা ঘাসে ছাওয়া কুটীর বেঁধে বাস করতে লাগল। প্রস্তর-যুগে যেমন তারা পাথরকে নিজেদের কাজে লাগাত তেমনই এখন তারা যে মাটির বুকে বাস করত তাকেই কাজে লাগাল।

তারা দেখলে, ভিজে মাটিকে নিয়ে চেষ্টা করলে যে রকম খুশি আকার দেওয়া যায় এবং সহজে সেই আকারের পরিবর্তন হয় না, এটা হ'ল মাটির স্বাভাবিক ধর্ম। ইংরেজীতে একে "Plasticity" বলা হয়, বাংলায় একে "নমনীয়তা" বলা যেতে পারে। আদিম যুগের মানুষ নিজেদের খেয়ালখুশিতে ঐ সব ভিজে মাটিকে নানা আকার দান করত। তারা যখন দেখলে, রৌদ্রের তাপে ঐ সব জিনিস শক্ত হয়ে যায় বটে তবে আবার জলে ভিজলে নরমও হয়, এমন কি আকারেরও পরিবর্তন হয়, তখন তারা ভাবলে ঐ সব জিনিসকে আরও গরম করলে কি পরিণতি হয় তা পরখ করে দেখা উচিত। কাজেই তারা কাজে লেগে গেল। ঐ সব মাটির জিনিষকে আগুনে পোড়ালে, ফল হ'ল আশ্চর্য্য। আগুনে পুড়িয়ে যে জিনিস তারা পেল তা আর আগের মত ঠুনকো নয়, অল্প বা

চীনদেশীয় মৃৎশিল্প
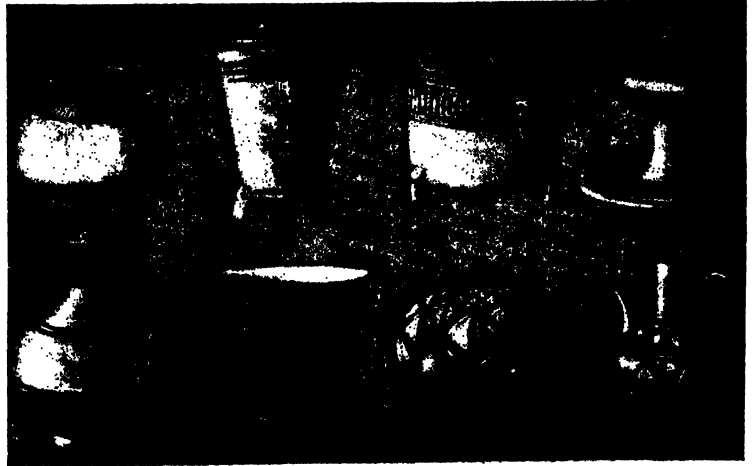
মৃদু আঘাতে ভাঙে না বা জলে পড়লে নরমও হয় না। এমনি করেই "মৃৎশিল্পে"র গোড়াপত্তন হল।

তখন তারা মাটি দিয়ে হাঁড়ি, কলসী, খেলনা ইত্যাদি নানা রকম জিনিস তৈরি করতে লাগল। এই সব তারা তাদের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করার ছাঁচ রূপে এবং খাদ্যবস্তুর আধার হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল। এই সব জিনিসকেই বলা হয় মৃৎপাত্র। এই সব মাটির জিনিস দিয়ে হয়ত তাদের কাজ চলে যাচ্ছিল, কিন্তু শুধু এতেই তারা সন্তুষ্ট হতে পারলে না—দেখলে, সব জিনিস মনের মত হয় নি, হয়ত আকারে তারা সমান নয়, কোনটা পাতলা, কোনটা মোটা আবার কোনটা হয়ত টুটা-ফাটা। এগুলোর উন্নতির জন্য তারা অক্লান্ত চেষ্টা করতে লাগল। এদের ভিতর যারা বেশী মাথাওয়ালা তারা দেখলে, শুধু হাতের দ্বারা যে জিনিস তৈরি হয় তা সব সময় মজবুত হয় না এবং তাদের যে সামান্য যন্ত্রপাতি আছে (যা হয়ত পাথরের) তাও মৃৎপাত্রাদি গঠনের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। তখন যন্ত্রগুলির উৎকর্ষ সাধন এবং নূতন যন্ত্র-নির্মাণের চেষ্টা চলতে লাগল এবং এরই ফলে পটারস্ হুইলের সৃষ্টি হ'ল, যাকে আমরা বলি "কুমোরের চাক"।

ইংলণ্ডের মৃৎশিল্প (কেল্‌টিক যুগ)

মাটির জিনিস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভারতীয় মৃৎশিল্পের প্রাচীনত্বের কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে হয়। ভারতে মাটি দিয়ে শুধু যে খেলনা তৈরি হয়েছিল বা ব্যবহারিক জীবনে মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্যাদিকে কাজে লাগানোই মাত্র হয়েছিল তা নয়, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবন ও সাধনার সঙ্গেও মাটি ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত। মাটি দিয়ে দেব-দেবীর মূর্তি নির্ম্মাণ করে আমরা পূজা করে আসছি স্মরণাতীত কাল থেকে। এই প্রতিমা পূজা কতকালের সে বিষয়টি বিতর্কমূলক, কিন্তু এটা যে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীক তাতে সংশয় নেই। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস যদি আলোচনা করি তা'হলে দেখি, ধাপে ধাপে সে এগিয়ে যাচ্ছে। গিরিগুহা পরিত্যাগ করে মানুষ যখন গৃহবাসী হল তখন ধীরে ধীরে তার নজর পড়ল বাসগৃহের উন্নতিবিধানের দিকে—জল ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মানুষ তখন মাটি থেকে তৈরি করলে ইট, টালি প্রভৃতি। ক্রমে ক্রমে হ'ল তার সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশ। তাই মাটির জিনিসগুলি কিসে সুদৃঢ় এবং নয়নসুন্দর হয় সেই বিষয়ে লোকেরা চিন্তা করতে লাগল। কেউ কেউ ভিজা মাটির জিনিসগুলি পোড়াবার আগে তাদের গায়ে জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতির ছবি এঁকে কারুকার্যমণ্ডিত করলে।

এই সময় এক শ্রেণীর মানুষ নানা প্রকার জিনিস মিশিয়ে নানারকম রঙের সৃষ্টি করলে এবং সেই সব রং মাটির জিনিসের গায়ে লাগিয়ে হরেক রকম সুন্দর ও বাহারি দ্রব্য তৈরি করতে লাগল। এরই ফলে সৃষ্টি হ'ল সেই সব জিনিসের—যাদের এখন 'টালি' এবং 'টেরাকোটা' বলা হয়। এই জাতীয় জিনিসের যে এককালে খুব কদর ও প্রচার ছিল, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের যাদুঘরসমূহ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু এইখানেই এর শেষ হ'ল না। মানুষ তার সহজাত সৌন্দর্যবোধের প্রভাব এড়াতে পারলে না। তখন তাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন আরম্ভ হয়েছে। শুধু লাল রঙের মাটির জিনিস বা সেগুলোর উপর রং-করা জিনিস নিয়ে তারা সন্তুষ্ট হ'ল না। নানা রকম জিনিস নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হ'ল। কোন্ জিনিস পোড়ালে কি রূপান্তর হয় তা তারা পরীক্ষা করে দেখলে এবং নানা রকম জিনিষ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে মিলিয়ে পোড়ালে কি হয় তাও তারা জানতে পারলে। তখন তারা সাদা রঙের জিনিস তৈরি করার জন্য সচেষ্ট হল, এই পরীক্ষাতেও তারা সফলকাম হ'ল।

সাদামাটির সঙ্গে চুণ-জাতীয় পদার্থ মিলিয়ে ও পুড়িয়ে তারা সাদা রঙের হরেক রকম জিনিস তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল। তখনকার দিনে তারা এই সব জিনিসের কি নাম দিয়েছিল তা আমরা জানি না, এখন এই সব জিনিসকে আমরা চীনামাটির পাত্র বলে অভিহিত করি।

কুমোরের চাকের সাহায্যে কেমন করে স্তরে স্তরে মৃৎ-পাত্রের উন্নতি হ'ল তা আমরা দেখলাম, এখন যে জিনিসগুলো পাওয়া গেল সেগুলো আগের থেকে বেশী সাদা, সুন্দর ও শক্ত। কিন্তু একটা খুঁত তাতে দেখা গেল। এই সব জিনিষের "সছিদ্রতা" (porosity) তখনও যায় নি। যখন ঐ সব পাত্রের ভিতর জল ইত্যাদি তরল পদার্থ রাখা গেল তখন সহজেই তা বোঝা গেল, দেখা গেল যে, তরল পদার্থটি আস্তে আস্তে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে। তখন পরীক্ষামূলক গবেষণা আরম্ভ হ'ল কিসে ঐ সছিদ্রতা বন্ধ করা বা কমানো যায়। দুই উপায়ে চেষ্টা চলতে লাগল। যে সব জিনিষ দিয়ে এই সব পাত্র তৈরি হত তার সঙ্গে ফেলস্পার (felspar) জাতীয় জিনিস মেশানো হ'ল যা আগুনের উত্তাপে দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি বন্ধ করে দেয়। আবার কেউ কেউ উত্তাপের পরিমাণ বাড়িয়ে সছিদ্রতা কমাবার চেষ্টা করতে লাগল। এরই পরিণতি হ'ল "stoneware" বা পাথুরে জিনিস, যা তারা সাদামাটির সঙ্গে কম উত্তাপে দ্রবীভূত হয় এমন পদার্থ মিলিয়ে ও কিছু বেশী উত্তাপে পুড়িয়ে পেতে সক্ষম হ'ল।

এই জিনিসগুলি হ'ল পূর্ব্বেকার মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্যাদি অপেক্ষা শক্ত ও মজবুত। কিন্তু তখনও সেগুলি মসৃণ হয় নি। কি করে তা করা যায় সেই বিষয়ে নানা রকম পরীক্ষা ও গবেষণা করে এমন একটি পদার্থের আবিষ্কার হ'ল যা পাত্রের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে অল্প উত্তাপে পোড়ালে স্বচ্ছ ও

মসৃণ আবরণের সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতিকেই ইংরেজীতে বলা হয় "গ্লেজিং"। আমরা জানি 'গ্লেজ' খুব কম উত্তাপে গলে যায় এবং এর ভিতর লিড অক্সাইড, বোরাক্স, ফেল্‌স্পার, সোডা, প্রভৃতি জিনিস থাকে। এই স্বচ্ছ মসৃণ আবরণ মৃৎপাত্রাদির পক্ষে বিশেষ ভাবেই উপযোগী হয়েছিল। তা ছাড়া নানা রং মিশিয়ে এমন সব বিভিন্ন রকমের গ্লেজের সৃষ্টি হয়েছিল যা আবরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে মৃৎপাত্রাদির টুটা-কাটা ইত্যাদি সারিয়ে নিতেও বিশেষ ভাবে সহায়ক হত।

প্রাচীন গ্রীসদেশীয় মৃৎশিল্প। (৭ম হইতে ৫ম খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দ)

চীনামাটির জিনিসের উপর এ ধরণের স্বচ্ছ আবরণের দ্বারা পোর্সেলিনের পাত্রাদির সৃষ্টি হল। এই সব জিনিস দেখতে সুন্দর এবং কাঁচের মত পাতলা কিন্তু একেবারে স্বচ্ছ নয়।

এমনই ভাবে ক্রমাগত পরীক্ষা ও গবেষণা করে শিল্পীরা মৃৎশিল্পের উন্নতি সাধন করতে লাগল। তাদের অধ্যবসায়ের শেষ নেই। কি উপায়ে এই সব পোর্সেলিনের পাত্রাদি আরও সুন্দর করা যায় তার চেষ্টা চলতে লাগল। এরই ফলে এনামেলের আবিষ্কার হ'ল, যাকে বাংলায় "কলাই করা" বলা হয়। হরেক রকম রং দিয়ে শিল্পী পোর্সেলিনের পাত্রাদির উপর নানা কারুকার্য্যের সৃষ্টি করলে। ফলে মৃৎ-শিল্পকে আশ্রয় করে তার সৌন্দর্য্যবোধও ধীরে ধীরে চরিতার্থতা লাভ করতে লাগল।

ইরাণীয় মৃৎশিল্প

যখন গ্লেজ বা এনামেলের সৃষ্টি হ'ল তখন দেখা গেল যে, এর জন্যে কাঁচের মত স্বচ্ছ আবরণের দরকার। এই সূত্র ধরেই গবেষণা করে সিলিকা, লাইম, সোডা প্রভৃতি নানা রকম জিনিস নানা অংশে বিভক্ত করে একত্রে মিলিয়ে নানা জাতীয় কাঁচের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাকে বিবিধ কাজের উপযোগী করা হয়েছে। এখন আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কাঁচের ব্যবহার অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, কাঁচকে এখন কাপড়ের মত ব্যবহারের চেষ্টাও পুরামাত্রায় চলছে।

কাঁচের সৃষ্টি ও প্রসার পরে হয়েছে। প্রাচীন যুগে কাঁচের আদর ছিল কম, বিশেষ করে ব্যবহারিক জীবনে। আমরা দেখলাম, কাঁচের মতন স্বচ্ছ জিনিসের দরকার হয়েছে গ্লেজিং সৃষ্টির পরে এরই আনুষঙ্গিক হিসেবে। কাঁচ কোথায় ও কবে প্রথম তৈরি হয়েছিল সে বিষয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ অনেক কথা লিখেছেন। তার মধ্যে স্যর ডব্‌লু. এম্. ফ্লিন্‌ডারস্‌ যা লিখেছেন তা আংশিক ভাবে দিয়ে উল্লেখ করছি। ফ্লিণ্ডার্সের মতে কাঁচ প্রথম তৈরি হয় এশিয়াতে, বিশেষ করে সিরিয়া-ইউফ্রেটিস অঞ্চলে। মিশর দেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগে তৈরি কাঁচের জিনিস পাওয়া যায় তবে এগুলি এশিয়া থেকে আমদানী করা বলে মনে হয়। ভারতবর্ষে মোহেন-জো-দাড়ো আবিষ্কারের ফলে যে সমস্ত মৃত্তিকানির্মিত দ্রব্য পাওয়া গেছে তার থেকে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এদেশে মৃৎশিল্পের, বিশেষ করে 'পটারি' ও 'গ্লেজে'র উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।
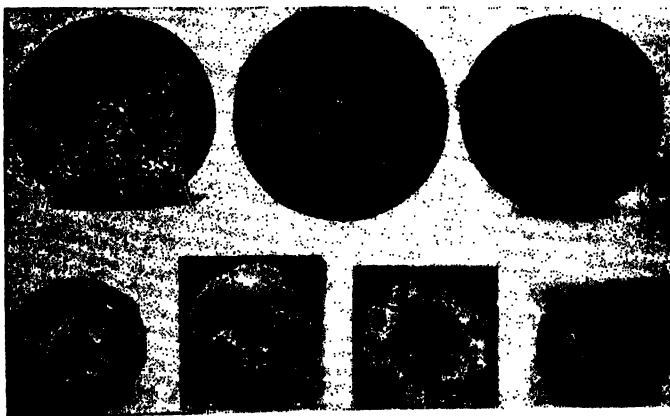
ভারতবর্ষে কাঁচের আমদানী প্রথম সিংহল দেশে হয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কাঁচকে মৃৎশিল্পের ক্রমোন্নতির শেষ পর্য্যায়ে ধরা ভুল হবে বলে মনে হয় না।

মেক্সিকোর মৃৎশিল্প। (১৫০০-১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে)

মৃৎশিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম বাধাবিঘ্ন দেখা দিতে লাগল। মৃৎশিল্পের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিল্পেরও প্রচার আরম্ভ হয়েছিল। তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ধাতব-শিল্প। এই সময়ে শিল্পীরা বুঝল যে, মজবুত দ্রব্যাদি তৈরি করতে গেলে বেশী উত্তাপের দরকার। তাই আদিম যুগে শিল্পদ্রব্যাদি নির্ম্মাণের জন্যে কাঠ জেলে যে অগ্নি উৎপাদন করা হত তা যথেষ্ট বলে তাদের মনে হল না। এল কয়লার যুগ, ক্রমে ক্রমে গ্যাস এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুরু হ'ল বহুল পরিমাণে।

খোলা জায়গায় যে অনেক উত্তাপ নষ্ট হয় এটা বহু প্রাচীন কালেই লোকেরা বুঝতে পেরেছিল। তখন গর্ত্ত খুঁড়ে বা মাটির প্রাচীর নির্ম্মাণ করে তার ভিতরে বিভিন্ন পদার্থ দগ্ধ-করণের ব্যবস্থা হ'ল। বেশী উত্তাপও পাওয়া গেল এবং জিনিষও আগের চেয়ে উৎকৃষ্ট হল। কিন্তু এই সমস্ত অগ্নিদগ্ধ দ্রব্যাদিতে নানা রকম দাগ বা ময়লা লেগে থাকতে দেখা গেল। শুধু তাই নয় চারপাশের মাটির দেয়ালেও নানা রকম পরিবর্ত্তন দেখা যেতে লাগল। কোথাও পুড়ে খুব লাল হয়ে যাচ্ছে। আবার কোথাও বা আগুনের তাপে গলে যাচ্ছে। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বোঝা গেল যে, যে আধারে বা যে জায়গায় ভিতরে জিনিসগুলি পোড়ানো হচ্ছে তার সর্ব্বত্র সমান তাপের সৃষ্টি হয় না এবং পাত্রগুলোও কাজের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। তখন কি ভাবে এই সব আধারের উন্নতি সাধন করা যায় সে বিষয়ে চেষ্টা সুরু হ'ল। আগুনের উত্তাপে যাতে আধারের কোন ক্ষতি না হয়, অথচ জিনিসগুলি ভাল ভাবে তৈরি হয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ ভাবে পরীক্ষাদি আরম্ভ হ'ল। তখন শুধু মাটির দেওয়ালের বদলে নানা রকম খনিজ পদার্থ মিশিয়ে সেগুলোকে দগ্ধ করে এমন এক রকম জিনিসের সৃষ্টি হল যাকে এখন আমরা Refractories ('উচ্চতাপ-সহিষ্ণু') দ্রব্য বলে থাকি।

রিফ্র্যাক্টরিজ বলতে বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন জিনিস বোঝায়। এদের প্রধান গুণ হ'ল, এরা খুব বেশী উত্তাপ সহনক্ষম এবং অন্য জিনিসের সংস্পর্শে সাধারণতঃ এদের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। এদের অন্য অনেক গুণ ও ধর্ম্মও আছে।

প্রথমে আধার (container)কে একটি পাত্রের রূপ দেওয়া হল। এগুলি দেখতে সাধারণতঃ বাক্স বা বড় জালার ন্যায়। এদের নাম দেওয়া হল "Pots" বা "Mutlle"। কিন্তু চাহিদা যত বাড়তে লাগল পাত্র বা আধারের আয়তনও তত বাড়তে লাগল। এর ক্রমোন্নতিতে এমন একটি স্তর উপস্থিত হ'ল যখন শুধু একটি বড় পাত্রে কাজ চালানো সম্ভব হয়ে উঠল না। প্রথমতঃ বড় বড় পাত্র তৈরি করা সহজ নয়, দ্বিতীয়তঃ দগ্ধ করবার সময় ঐ সব পাত্র বিনষ্ট হয়ে যেতে লাগল।

এই অন্তরায় এড়াবার জন্য শিল্পীরা তৈরি করতে লাগল এক ধরণের ইষ্টক যাকে বলে রিফ্র্যাক্টরী ব্রিকস। পরে এই সব ইঁট বা বিভিন্ন আকারের জিনিসগুলি একত্রে জুড়ে তৈরি হ'ল ওভেনস বা ফার্ণেস যাকে বাংলায় বলে উনুন বা চুল্লী। এর ভিতরে জিনিসগুলি সুন্দর ভাবে পোড়ানো সম্ভব হ'ল।

ধাতুশিল্পীদের দরকার হ'ল বড় বড় ফার্ণেসের যার ভিতরে তারা নানাবিধ খনিজ পদার্থ মিশিয়ে ও দ্রবীভূত করে লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু উৎপন্ন করতে পারে। এই সব কাজ ১৫০০।১৬০০ ডিগ্রীর কম উত্তাপে হয় না। এইজন্য মৃৎশিল্পী-দের অনেক গবেষণা করে বিশেষ বিশেষ উপাদানে এমন সব আধার সৃষ্টি করতে হয়েছে যার ভিতর লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু সকল দ্রবীভূত হয়ে জলের মত তরল আকার ধারণ করে অথচ ফার্ণেসের কিছু ক্ষতি হয় না। শুধু তাই নয়, লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু তৈরি করার সময় যে slag বা মল বেরোয় তার ক্ষয়ের শক্তি খুব বেশী। সে বিষয়েও মৃৎশিল্পীদের দৃষ্টি রেখে কাজ করতে হয়েছে।

ব্যবহারিক জগতে লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুসমূহের কদর বেশী, কেননা তারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, মৃৎ-শিল্পীদের সাহায্য ব্যতীত এ সব জিনিসের সৃষ্টি হত না।

অধ্যাত্ম-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

রবীন্দ্রনাথের জীবনকে আজ নানাদিক থেকেই দেখবার ও জানবার চেষ্টা চলছে। সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র সবদিকেই আলো পড়ছে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার দিকটা এখনো লোকের কাছে কুয়াশাচ্ছন্ন। তাঁর ধর্মমত বা দার্শনিকতার আলোচনা যদি বা মেলে, ব্যবহার-জগতে সাধনা-পরিচয় দুর্লভ। এদেশ ধ্যান-ধারণা, জপতপের দেশ—এখানে সাধারণের কাছে একজন মহাপুরুষ প্রতিষ্ঠা পান অনেকটা এই সব প্রক্রিয়ার ঐশ্বর্যে। কোন গুরুর নাম শুনলেই লোকের কৌতূহল জাগে আগে তাঁর তপস্যার দিকটাতেই। লোকে দেখে তাঁর বিভূতি, তাঁর শিষ্যসংখ্যা। রবীন্দ্রনাথও আখ্যা পেয়েছেন—'গুরুদেব'। কিন্তু বাস্তবিক তিনি জপতপ আদৌ কিছু করতেন কিনা, কিংবা কি সব করতেন, তার কথা বড় একটা জানার মধ্যে নেই। অথচ ভারতের একজন গুরু, সেই তপস্যা-ধারার কিছু চিহ্ন না নিয়ে কি ক'রে তিন গুরুদেব হয়েছেন, সেই হচ্ছে কৌতূহলের বিষয়।

অবশ্য সাধনার কথা গুহ্য কথা। নিতান্ত অন্তরঙ্গ এবং উপযুক্ত ধারাবাহী ছাড়া এ সব বিষয়ে কথা কইবার অধিকারী যে-সে হতে পারে না। কিন্তু এদিকে এখনো তেমন কোনো আলোক-পাতের সহায়তা সাধারণ পায় নি। না পেয়েছে বরাবর তাঁর কাছ থেকে, না অন্য কারো থেকে। তাই এ-প্রশ্ন কেবলি জাগে 'গুরুদেবে'র গুরুত্ব কোথায়?

তাঁর মৃত্যুর মাসাধিক আগে, মধ্যাহ্নে স্নান সেরে গুরুদেব এসে উদয়নের একতলায় বসেছেন, আহারের প্রতীক্ষায়। সে সময়কার পার্শ্বপরিচর তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মশায়ও বসেছেন এক পাশে। তাঁর সঙ্গে কবির যখন-তখন অনেক কথাই হত, তা গভীর হাল্‌কা সব ভাবেরই। কথায় কথায় সেদিন কবি তরল আলোচনা হিসাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি আস্তিক না নাস্তিক।" উত্তরে সুধাকান্ত বাবু বললেন, "আমি মশায়, আস্তিক এবং নাস্তিক মিশ্রিত জীব।" কবি বললেন—"সেটা কি রকম?" সুধাকান্ত বাবু বললেন—"আমার চিন্তায়, প্রচলিত ভূত ও ভগবান্ আমার কাছে উভয়ই সমান। ছোটবেলা থেকেই আমাকে শেখানো হয়েছে, ভূতকে ভয় এবং ভগবানকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আমিও ভগবান কি, না জেনেই সকলের সঙ্গে মিশে সাকার-নিরাকার ভগবানকে গৌণভাবে নমস্কার জানাতাম এবং ভয় না পেয়েও শ্মশানে-মশানে ভূতের ছবি কল্পনা করতাম। অথচ এই উভয় বস্তুর সঙ্গেই কোনকালে আমার সাক্ষাৎ ঘটে নি।" ঈশ্বর-প্রসঙ্গে সুধাকান্তবাবু একটু অবিশ্বাস ও পরিহাসের ছলেই এই উক্তি করে ফেলেছিলেন। অমনি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাব-ধৈর্য পরিহার করে আহত চিত্তের উগ্র প্রকাশ দ্বারা ঈশ্বরের সত্যতা সম্বন্ধে বলতে সুরু করলেন। সুধাকান্ত-বাবু কবির এই গভীর ও গম্ভীর উক্তিতে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক একটানা স্রোতে কবি এই বলেছিলেন—"ঈশ্বর আছেন, তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে মহাজন যাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, শ্রদ্ধায় তাঁদের কথা উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত; তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়, তাঁদের অভিজ্ঞতার মূল্যও অনেক বেশী। তাচ্ছিল্য করে তা ওড়াবার জিনিষ নয়। ললিত ভাবে নাস্তিকতার গর্ব করা অজ্ঞতারই পরিচায়ক, তা অন্যায়ও বটে।" কবি ঈশ্বর-সাধক ছিলেন তাঁর গভীর সত্তা থেকে। এই ঈশ্বরের বোধ অবশ্য কালে কালে নানাভাবেই ক্রমপরিণতি লাভ করেছে তাঁর জীবনে। শেষাবস্থায় এই ঈশ্বর তাঁর "মানুষের ধর্ম" নামক গ্রন্থে এবং কাব্যসমূহে ভক্তিরসের ব্যক্তিস্বরূপের চেয়ে জ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক আনন্দরূপেই যেন বেশি প্রতিভাত। মন্ত্র ছিল তাঁর ওঁ। পরে সে কথা আছে। আর একটি মন্ত্রও তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল, সেটি "শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্।" "যাত্রী" গ্রন্থে লিখেছেন, "যে সত্য বিশ্বপ্রকৃতি, লোকসমাজ ও মানবাত্মা পূর্ণ ক'রে আছেন তাঁর স্বরূপকে ধ্যান করবার সহায়তাকল্পে শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্ মন্ত্রটি যেমন সম্পূর্ণ উপযোগী এমন আমি তো আর কিছুই জানিনে।" একটি মন্ত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন শেষ দিকে, সেটি হচ্ছে—"সোহং"। আর এক স্থানে বলেছেন, "আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি" উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বার বার ধ্বনিত হয়েছে।" এই সঙ্গেই আরও বলেছিলেন, "বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোনও বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখছি, তা নিয়ে তর্ক কেন? স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা, তার মৃত্যু নেই।" এই উক্তি থেকেই বুঝা যায়, বিশ্বের সকল বস্তুকে স্বীকার করে তার বস্তুরূপের আশ্রয়ে যে রসসত্তা, তাকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভিতরে বাহিরে বস্তুতে ও অনুভূতিতে (বা রসে) বিশ্বের সমগ্র ভাবের সেই উপলব্ধি দ্বারাই তিনি অমৃতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন।

দেখা যায়, একটি মূল প্রেরণা তাঁর আদর্শরূপে চিরদিনই তাঁকে ভিতর থেকে চালিয়েছে। সেই প্রেরণাটি তাঁর উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ সত্য, ধর্ম-কর্মের মূল সে জিনিষ তাঁর—বিশ্বযোগ। এই যোগ-প্রেরণা তাঁর ভিতরে প্রথম অঙ্কুর মেলে শৈশবের উপনয়নের পর গায়ত্রী মন্ত্র থেকে। তিনি বলেছেন—"এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হ'ত বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক অন্তরীক্ষ, আমি তারি সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্তে যিনি আছেন, তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব: বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলেছে।

এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এই রকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।"

ধর্মপ্রেরণার মূল রেখাপাত কবির এইখানে, একেই সাধন করেছেন সারা জীবন। প্রক্রিয়ার কথা পরে আসবে, এখানে মূল নির্ধারণের সঙ্গে আর একটি তথ্যের দিকে ইঙ্গিত করা যাচ্ছে যে, জীবন-আলো দর্শনের সাহায্যে এসে কবির ধর্মগুরুর কাজ করেছেন, একভাবে বলা যায় তাঁর পিতাই। কারণ তিনিই কবিকে বুঝিয়ে দেন এই গায়ত্রীমন্ত্রের তাৎপর্য। পিতারই সযত্ন তত্ত্বাবধানের শিক্ষা কবিকে নিয়ে যায় শৈশব থেকেই সংস্কৃত-চর্চ্চার পথে—ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং বিশেষ করে উপনিষদের জ্যোতির্লোকে। কবির নিয়মিত উপাসনার অভ্যাসও ঐরূপে তাঁর পিতার নিকট থেকেই পাওয়া। শেষদিকে এ কাজটি কবি করতেন লোকের অগোচরে, অতি প্রত্যূষে। লোকে জেগে দেখত তিনি হাত মুখ ধুয়ে দিনকর্মে প্রস্তুত। মধ্য জীবনে যখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় গড়ে তুলছেন, সে সময়ে এই উপাসনার কাজটি বাইরে একটু স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে অন্তরঙ্গ আশ্রমিকদের কাছে। তাঁদের বর্ণনায় পাওয়া যায়, পূর্বপার্শ্বে মন্দিরসংলগ্ন যে ছোট্ট বারান্দাটি আছে; কিছুদিন প্রভাতী আলো-আঁধারে গুরুদেবকে দেখা যেত সেখানে, প্রশান্ত ধ্যাননিমীলিত নেত্রে সমাসীন। ঐ পর্বেই তাঁর শান্তিনিকেতনের ভাষণধারার সূত্রপাত। তা ছাড়া, সচরাচর তাঁর বাসগৃহ দেহলী ভবনের দ্বিতলস্থিত সঙ্কীর্ণ খোলা ছাদটুকুতেই তাঁকে উক্ত অবস্থায় প্রতি ঊষায় আসীন দেখা গেছে। ভোরে উঠে এই উপাসনার অভ্যাসের কথা তাঁর দেশবিদেশের জীবন-প্রাসঙ্গিক অনেক রচনাতেই পাওয়া যায়। সমাধিস্থ হলে যে ভাবতন্ময়তা আসে তার পরিচয় কোনও জপধ্যানের প্রক্রিয়া থেকে কবিজীবনে সুলভ নয় বটে, কিন্তু প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ দৃশ্যে মন তাঁর এক এক ক্ষেত্রে তেমনি অবস্থাই যে প্রাপ্ত হয়েছে, গদ্যে পদ্যে তার উদাহরণ আছে বহু। সে অবস্থাকে তিনি আধ্যাত্মিক আনন্দোপলব্ধির পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন। জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত শৈশবের সেই নারিকেল গাছের পল্লবালয়ের ফাঁক দিয়ে দেখা সূর্যোদয় থেকে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'প্রভাত-উৎসব' কবিতা এবং শেষজীবনে সিঙ্কল পাহাড়ের সূর্যাস্ত থেকে 'পত্রপুট' কাব্যের প্রথম কবিতার প্রেরণা-দৃশ্যগুলি—এইরূপ দুর্লভ অপার্থিব আনন্দ-সম্ভোগেরই অন্যতম সাক্ষ্য বহন করে। পদ্মাপারে জমিদারীতে বৃষ্টির দোতলায় দাঁড়িয়ে নববর্ষা-দিনের একটি উপলব্ধির কথার সঙ্গে, স্নানের ঘরে যাবার পথে জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখার থেকে আর একবার ঐরূপ ভাবাবেশের অবস্থা ঘটে বলে উল্লিখিত আছে। প্রভাত-সঙ্গীত পর্বের সূর্যোদয়ের থেকে যে অভিজ্ঞতা হয় সেইটিই কবির প্রথম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বলে তিনি নিজেই বলেছেন, "সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে।" ধ্যান-প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান দেখা যায় নি সত্য, কিন্তু তার ফল তাঁর জীবনে ফলতে দেখা গেছে। চৈতন্যকে বাগে এনে অনেক বার কবি শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার হাত এড়িয়েছেন। জাহাজে চলবার সময় জানলার একটি পাটের চাপ পড়ে আঙুল একবার থেঁৎলে যায়, সেই দুঃসহ জ্বালার সময় মনকে পিষ্ট স্থান থেকে সরিয়ে রেখে কেমন করে বেদনা ভুলেছিলেন, চিঠিতে তা লিখে গেছেন। অনেক শোক-দুঃখের মুহূর্তে অনুভূতিকে বশ করেছিলেন এই করে। 'চিঠিপত্র' জাতীয় বইয়ে তার অনেক সন্ধান মিলবে।

দেখা যেত সহজে এমনিতেই তিনি সোফায় বসে চোখ বুজে আছেন স্থিরভাবে, কোনও বিশেষ বাঁধা সময় করে নয়—যখন-তখনই এবং কোনও বিশেষ আসন বা মুদ্রার আভাসও নেই। ধ্যান-ধারণার চেয়ে এই গভীর মননের প্রক্রিয়াই তাঁতে বেশী প্রকট ছিল।

মানবজীবনের পূর্ব ও পরলোক রয়েছে যবনিকার ওপারে। ইহলোকের মধ্যে যা আছে, সেই পঞ্চভূতের কারবারই তবু যা সাধারণের প্রত্যক্ষ। এই কারবারের তত্ত্ববিচার ও প্রণালী নিরূপণ নিয়েই বিজ্ঞান। দেখা যায়, কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানানুরাগী। তার এই অনুরাগের মূল অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, সর্বমানুষের যোগপ্রেরণাই তাঁতে নিহিত। কবিজনোচিত অনুভবের রাজ্যটি তাঁর অপ্রত্যক্ষের, চিন্তাও তাঁর অনেকখানি অপ্রত্যক্ষকে নিয়ে। কিন্তু বিষয়কে যথাসম্ভব সকলের বুঝবার স্তরে এনে বলতে গিয়ে যোগ রেখেছেন বিজ্ঞানের। তাঁর আধ্যাত্মিক ভাষণগুলির অনেক স্থলেই দেখা যাবে সাম্প্রতিক ঘটনা এবং বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার বহুল সমাবেশ। তাঁর গানে আছে—

> "সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।"
> "বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
> সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

মন ছিল তাঁর লক্ষ কোটি প্রাণী অভিমুখী। সকলের সঙ্গে মেলা যায়, এমন একটি সহজ সাধারণ স্বাভাবিক যোগতত্ত্ব নিয়েই তিনি ছিলেন স্বধর্ম পালনে সক্রিয়। জ্ঞানকেন্দ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিই মানুষের সেই যোগভূমি হওয়ার কথা, যেখানে শিক্ষা উপলক্ষে জাতিবর্ণশ্রেণী নির্বিশেষে সব মানুষ এসে মিলতে পারে একত্রে। পিতা মহর্ষিদেব গড়েছিলেন শান্তি-নিকেতন। কবি কার্যত করলেন তাকেই জ্ঞাননিকেতন, কিন্তু সেটাই তাঁর কাছে তাঁর নিজের সাধনাপীঠ হয়ে উঠেছিল। তাঁর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'আশ্রম' শব্দের যোগ, বিশেষ করে তাঁর ভারত-পথের ধর্ম-প্রবণতাই সূচিত করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ও অগ্রজ মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন পরম ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। তা ছাড়া, ঠাকুর-পরিবার একটি শাখা-ধর্মের ধারাবাহী। প্রাচীন সংস্কৃতির পঠন ও অনুধ্যানের সঙ্গে কবির স্বীয় শিক্ষা-জীবনের পরিমণ্ডলগত এই ব্যক্তিত্ব ও পরিবারের ধর্ম-প্রভাবও পরিণত জীবনে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার বেলায় স্কুল-কলেজের স্থলে এই 'আশ্রম' গড়াতে ভিতরে ভিতরে কিছু কাজ করে থাকবে। লোকসমাজে তাঁর 'ঋষি' আখ্যায় হেতু এই আশ্রমও যে কিছু না হয়ে আছে এমন নয়। সুতরাং ধর্মকেন্দ্রিক এই 'আশ্রম'-তত্ত্বটির তাৎপর্য বিশেষভাবে এখানে বুঝে নেওয়া দরকার।

স্কুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষাধারায় প্রত্যক্ষ জগতের বস্তু-জ্ঞানকেই মুখ্য ধরা হয়। খেয়ে-পরে চলার ব্যবহারিক কাজ চালানোর কাজেই সেই শিক্ষার প্রয়োগ, এবং তা সংসারে কার্যকরীও বেশী, এজন্য আদরও তার বেশী। অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বাহুত জেনে রাখা হয় মাত্র। এই করে অপ্রত্যক্ষ জীবনাংশ সেখানে গৌণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ মিলিয়ে বৃহৎ করে সমভাবেই জীবনকে সত্য বলে দেখেছেন। প্রত্যক্ষের বাস্তব জগতেই পরিসমাপ্ত ভাবে জীবনকে খণ্ডরূপে দেখা নয়। অপ্রত্যক্ষের অসীম অনন্ত সম্ভাবনাময় জেনে তাকে সমগ্র ভাবে এক বৃহৎ সত্তায় উপলব্ধি করা,—এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা। গোড়া থেকে তাই ঈশ্বর নামে এক বৃহৎ সত্তা বা বৃহৎ জীবনকেই করা হয়েছে মূলভিত্তি। ঈশ্বর সম্পর্কীয় যে আচরণ, ব্যবহারিক ভাষায় তাই হ'ল ধর্ম। উপাসনা ইত্যাদি ঐ প্রকারের ধর্মকৃত্যাদি দ্বারা সেই বৃহৎ জীবন-ধারারই অনুভব এই খণ্ড জীবনে বহন করা হয়। সেই অনুভবে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনকে নির্দিষ্ট প্রণালীমতে চিন্তায়, কথায়, কাজে প্রতিদিন গড়ে তোলাই ছিল পুরাকালীন আশ্রমের শিক্ষা। বড় জীবনের সাধক রবীন্দ্রনাথ খণ্ড জীবনগুলিকে গড়ে তোলার সাধনায় সেই আশ্রমের প্রণালীতে আশ্রমেরই পত্তন করলেন। তাই ধর্মের সংযোগে জীবনের যাবতীয় শিক্ষালাভ গোড়া থেকেই হ'ল এখানকার উদ্দেশ্য। সে ধর্ম সাধু চিন্তা ও সদাচরণের মধ্যেই প্রধানত অনুষ্ঠিত হলেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে ঈশ্বরের নিরাকার সত্তার উদার সাধনাশ্রয়ী। আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যা দু' বেলা এবং প্রতি বুধবার সকালে মন্দিরে সমবেত উপাসনায় ভগবৎ স্মরণ বা অধ্যাত্ম-মননই এর আনুষ্ঠানিক অঙ্গ। বহিরঙ্গের হাত-মুখ ধোয়ার সমান্তরালে অন্তরশুদ্ধির জন্যও এই উপাসনা বা মননজীবনের মূল প্রেরণাশক্তির উৎস হিসাবেই এখানে দিনচর্যারূপ অবশ্য-কর্তব্যশৃঙ্খলার অন্তর্গত। বুধবার মন্দিরে উপাসনার পর উপদেশচ্ছলে আচার্য অনেক সময় স্ব-উক্ত ব্যাখ্যান দিয়ে ধর্মপ্রসঙ্গের অবতারণা করতেন।

উপাসনার অবশ্য-কর্তব্যতা সম্বন্ধে এই উপলক্ষে কবির অনমনীয় দৃঢ়তা তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক চিন্তার মহার্ঘ মূল্যদানই নির্দেশ করে। এ বিষয়ে যে তিনি কঠোর শৃঙ্খলা-পরায়ণ ছিলেন আর একটি কার্য তার পরিচায়ক। এই আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেই আবার এমন কোন ধর্মানুষ্ঠান কোনও আশ্রমবাসীকেই তিনি করতে দিতেন না, যা আশ্রমের সর্বধর্ম-সমন্বয়ী জীবন-শৃঙ্খলার পরিপন্থী। এই নিয়ে কোন কোনও স্থলে তাঁর কার্যে রূঢ়তারও হয়ত কটাক্ষ আসবে। কিন্তু বিচার-শীল দৃষ্টির কাছে সেই কটাক্ষপাতের বিষয়টিই স্বভাবকে তাঁর আরও উজ্জ্বল করে তুলবে। কারণ তদ্দ্বারাই প্রতিভাত হবে যে, তিনি ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠানের ধর্মের চেয়ে জাতিধর্মের গণ্ডীমুক্ত মানব-সমাজের বৃহত্তর যোগের সামগ্রিক জীবনকেই বড় বলে জানতেন, তা-ই নিয়েছিল তাঁর প্রথম পূজার আসন।

পিতৃচরিত্রের আত্মস্থতার প্রভাব তাঁকে অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে সাহায্য করেছিল। উপনিষদের শিক্ষাও তাঁকে ভাব-ব্যাকুলতার স্থলে বীর্যবত্তাতেই মন স্থির রাখবার প্রেরণা জুগিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে—শান্তিনিকেতনে প্রতি বুধবার মন্দিরে গান ও উপাসনা হয়। দেশের অনেক অনুরূপ আরাধনায়, যেমন কীর্তনে ব্যাখ্যানে আধ্যাত্মিক ভাবোচ্ছ্বাসের প্রবৃত্তি কতকটা শিথিল হতে পারে, এখানে তা হয় না। যা হয়, তাকে রাশভারি অবস্থাই বরং বলা চলে। শান্তিনিকেতন বাসকালে সমর্থাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রতি বুধবার মন্দিরে নিয়মিত ভাবে আচার্যের কাজ করেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, কখন কখন গানও করেছেন, তাতে উপলব্ধির আনন্দ জমেছে, উন্মাদনা জাগে নি। লোকের অন্তর্নিহিত বিবেক-বুদ্ধিকেই তিনি সশ্রদ্ধ সম্মান দিয়ে তার বিচারের কাছেই নিজের মননটি যেন প্রাত্যহিক আলাপের ভাষায় স্থাপন করতেন, কোন যোগপ্রক্রিয়ার ঐশ্বর্য অবতারণায় আত্মমহিমা বৃদ্ধির সুযোগ নিতে চান নি। তাতে যেন তাঁর এক রকমের সঙ্কোচই ছিল। লোকে যেমন করে তাঁকে ভাবত, লোকের সেই 'গুরু'-ভাবনাই ছিল তাঁর মনের পক্ষে গুরু-পরিপাকের বিষয়। বারবার বলেছেন—"আমি গুরু নই"। কিন্তু তবু তিনি গুরুদেবই রয়ে গেলেন। কোনরূপ ধর্মের ভেদ দ্বারা অন্যের বিবেকবুদ্ধির উপর সম্মোহ বিস্তারের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাকে আশঙ্কার চোখে দেখতেন সর্বদাই ; এ জন্য কাউকে দীক্ষাদানে তাঁর মন ছিল না। নিজে গুরু হতে চান নি, কিন্তু তা বলে এই গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ছিল না তাঁর কোনকালেই। কালে কালে বিশ্বের যেখানেই যাঁরা গুরু বলে চিহ্নিত হয়ে আছেন, তাঁদের সকলের সাধনা তিনি বুঝে উঠতে পারুন আর নাই পারুন, বিনয়নম্র নমস্কারে সকলকে তিনি ভক্তি জানিয়েছেন এবং সকলকে তেমনই ভক্তি জানাতে বলেছেন।

কবি কাজ করেছেন আমরণ, সে কাজ সকল মানুষের মুক্তির জন্য সকলকে নিয়ে সকল মানুষের যোগের কাজ। য়ুরোপের বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের ধর্মের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ

দুই ধারাকে এক করে মিলিয়ে তিনি ভিতরে বাইরে পূর্ণাঙ্গ জীবনের সাধনা করেছেন তাঁর "বিশ্বভারতী"তে। একদিকে আশ্রমের আবাসিক জীবনে আচরিত ধর্ম—এবং বিজ্ঞান মানে মোটের উপর ক্লাসের বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বিদ্যাশিক্ষা—দুই দিক দিয়েই বিশ্বভারতীর গুরুত্ব আছে; এবং তার আশ্রমিক জীবনেও যে এই দুই বিষয়েরই সমান গুরুত্ব আছে, এ কথাও মনে রাখা দরকার। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা উভয়কেই কবি এখানে শামহস্তে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন। পাছে এই আশ্রম শুধুই পড়া দেওয়ার-নেওয়ার একটা ক্লাস-রুমের রুটিনবাঁধা স্কুল-কলেজ মাত্রে পর্যবসিত হয়, এই ভয়ে সর্বদাই ছিলেন তিনি শঙ্কিত। অনেকবার এই শঙ্কা থেকে আশ্রমের কোন কোন কর্মবিভাগ বর্জনেও তিনি উদ্যত হয়েছেন। আবার তেমনই ভাবনা ছিল, পাছে এই ধর্মের দেশে ধর্মোন্মাদনার প্রাবল্যে কোন্ দিন এটা একটা মঠ-মন্দির মোহান্তেরই জায়গা না হয়ে ওঠে।—মঠমন্দির বা ভগবানের নাম করে কোন একটা উপলক্ষে ঝুলি পাতলেই আর্থিক বনিয়াদের দিক দিয়ে বিশ্বভারতীর জন্য তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারতেন, এই সম্ভাব্য সুযোগের কথা অনেকবারই তিনি কৃত্রিম আপশোসের সহিত পরিহাস করে বলতেন। তাতে তিনি টাকা পেতেন কিন্তু মানুষ পেতেন না। কিন্তু তাঁর সকল মানুষকেই যে পাওয়া চাই। বিশ্বমৈত্রীই যে তাঁর বড় সাধনা। অসংখ্য বৈচিত্র্যের মিলিত বিশ্বই যে তাঁর কাছে অখণ্ড সত্তার ভগবান। জ্ঞানে তাঁর সামগ্রিক উপলব্ধি, কর্মে তাঁর নিবিড় সংযোগ। কোন আচারে বা প্রচারে কারু সঙ্গে মিত্রতা বাধা পেলে সে যে তাঁর সাধনারই বাধা।

সারাজীবনের সকল কাজই ভগবৎ কর্ম, কবি তাঁর জীবনে এই ভাবেই সব কাজকে মর্যাদা দিয়ে দেখেছেন এবং তাই নিয়েই নিশ্চিন্তে নিরত সংসারের সকলের মধ্যে থেকে কর্মরত ছিলেন। জপতপের বিশেষ প্রক্রিয়া সেই মর্যাদাকে হীন করে বিশেষ পুণ্যগৌরবের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর জীবনে বা তাঁর আশ্রমে বিশেষ স্থান পায়নি। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, এ জীবনে কিছু হ'ল না, শুধু খাওয়া-পরা নিয়ে সাংসারিকতায় জীবন ব্যর্থ গেল, পরম ধন পাওয়া গেল না—এ সব সুলভ নৈরাশ্যের দীনবাণী তাঁর শেষ দিনগুলিকে ক্লান্ত বা নিষ্প্রভ করে নি। এপারেও তাঁর পাওয়া, ওপারেও। কোথাও হায়-আপশোস নেই। "সময় হয়েছে, খেলাঘরের এক কোঠা থেকে অন্য কোঠায় চলে চলে যাচ্ছি,"—এই যেন তাঁর শেষের ভাবখানা। হয়তো প্রচলিত মতে তাঁকে সাধক বলতে বাধা ঠেকবে, তাঁর আনুষ্ঠানিক জপতপের অভাব দেখে—কিন্তু, মানুষ হিসাবে তাঁরই ভাষায় সেই "দু হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছোঁবার" মত বিশ্বরসী মানুষও সচরাচর বোধ হয় এমন কমই মিলবে।

সবার বড় সংস্কার শিক্ষা। মানুষের জীবন গড়ে শিক্ষায়, জ্ঞান থেকে। দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকেই তাঁর মুখ্য সাধনার বিষয় বলে বেছে নিয়েছেন গোড়া থেকেই। আর সেই শিক্ষার আচারে ও প্রচারে জীবনের প্রধান অংশই ব্যয়িত করছেন একনিষ্ঠায়। এক রকম বলতে গেলে, এই বিশ্বের জ্ঞানই নিয়েছিল তাঁর কাছে ঈশ্বরের স্থান, শিক্ষা ছিল সেই ঈশ্বরের সাধনা আর তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ছিল তাঁর কাছে সেই ঈশ্বরের নিত্যনৈমিত্তিক পূজামন্দির। শিক্ষা শুধু বসে বসে পঠনপাঠন নয়, তার বিষয় ও প্রণালীবৈচিত্র্যে তা যেমন সুপ্রসর, তেমনি দৈনন্দিন আহার-নিদ্রায় উৎসবে ব্যসনে, ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্কীর্ণ ও প্রসারিত গণ্ডীতে মিশিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বসময়ে সুষ্ঠু চেষ্টায় সে শিক্ষা পরম উপভোগ্য রূপে সত্তার পূর্ণভাবিকাশী। সেই শিক্ষার সাধনা তাঁকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ আনন্দের মধ্যে নিয়ে গেছে, সে আনন্দও মুনি-ঋষির মুক্তির আনন্দের চেয়ে তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্রে কিছু কম নয়। প্রত্যক্ষত, বিশেষ করে শিক্ষাই যাঁর সাধনপ্রক্রিয়ার অন্যতম বিষয় ছিল, স্বভাবত শিক্ষিতদের মধ্যেই তিনি গুরুদেব হয়ে রয়েছেন। তিনি রসে মগ্ন ছিলেন, ঘর-সংসার, আত্মীয়স্বজন, নাচগান এবং মেয়েদের তাঁর জীবনে ও অনুষ্ঠানে সহজ স্থান দিয়ে। কবির একটি কথা এ সম্পর্কে স্মরণীয়, এক স্থলে তিনি বলেছেন,—"আনন্দকে সুন্দরকে নানা মূর্তিতে নানা উপলক্ষ্যে প্রকাশ করা চাই···আমাদের অনেক তপস্বী মনে করেন সাধনায় জ্ঞান ও কর্মই যথেষ্ট। কিন্তু বিধাতার রচনায় তিনি দেখিয়েছেন শুধু স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া নয়, রসেই সৃষ্টির চরম সম্পূর্ণতা। মরুর মধ্যে যা-কিছু শক্তি সমস্তই বিরোধের শক্তি, বিনাশের শক্তি। রস যখন সেখানে আসে তখনি প্রাণ আসে। তখন সব শক্তি সেই রসের টানে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়, সৌন্দর্যে কল্যাণে সে উৎসবের রূপ ধারণ করে।" জ্ঞান-কর্মের সঙ্গে কবির সাধনা সমভাবেই শেষ পর্যন্ত উৎসবময়ী রসাশ্রয়ী হয়ে ছিল ও আছে।

আর কোথাও নয়, মানুষেই চরমতত্ত্ব, এই মানুষের পৃথিবীতেই জ্ঞানে কর্মে অনুভবে মানুষের সঙ্গে মিলেই মুক্তি পাওয়া যাবে, এই বলে লোকান্তরের দেবদেবী স্বর্গ-নরক ছেড়ে পৃথিবী ও মানুষের মর্যাদা এবং মানুষের উদার সর্বজনীন মিলনের আবশ্যকতাকে একান্ত করে ধরে পৃথিবীর মানুষেই দৃষ্টিনিবদ্ধতা, এই লক্ষণেই রবীন্দ্রসাধনা বিশ্ব-গুরুদের সাধনা-ভরে বিশিষ্ট হয়ে থাকবে। আর কোনও ধারার সঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক, নিজস্ব পথে তালছন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাধনা তাঁর লেখায়, তাঁর গানে, নৃত্যে, তাঁর উৎসবে, তাঁর সেবায়, তাঁর শিক্ষায়, ভ্রমণে, তাঁর আশ্রমে, গৃহধর্মে সব মিলিয়ে হয়ে উঠেছে একটি সর্বাঙ্গীণ জীবনযোগের ধারা।

এই দেশে ত ধারাবৈশিষ্ট্যের অন্ত নেই। শবসাধক অঘোর-

পন্থী কাপালিক, আউল বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, আবার ব্রহ্ম-জ্ঞানী, সনাতনী কত কি! বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধারাপ্রবর্তকদের প্রত্যেকেই যে পূর্ব শিক্ষাদীক্ষা বা গুরুগৌরব পেয়েছেন তারই হুবহু ধারা টেনে তাঁরা গুরু হন নি। নিজেরা প্রত্যেকেই এমন কিছু দিয়েছেন যে সাধন-প্রক্রিয়া বা বাণী-বৈশিষ্ট্যে তাঁরা পূর্বাচার্যদের মহিমা ছাড়িয়েও উত্তুঙ্গ হিমালয়ের বিভিন্ন শিখরের মত উত্তরকালে উত্তীর্ণ হয়েছেন বিশিষ্ট সত্তায়, প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন গুরুর পরেও নূতন গুরু বলে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের সেই ধারার গুরুত্ব বরণে নিতান্ত সঙ্কোচে বারবারই বলেছেন—"আমি গুরু নই, আমি কবি। আমি বিচিত্রের দূত।" কিন্তু তাঁর কর্মে ও বাণীতে মিলিয়ে যে ব্যবহারিক জীবন তিনি রচনা করে রেখে গেছেন, এই দেশে তা যে একদিন গুরুর বিশিষ্টতায় তাঁকে দাঁড় করাতে পারে, সেই সম্ভাবনা তিনিও যে একেবারে না দেখেছিলেন এমন নয়। এই বিষয়ে তাঁর 'গুরু'ত্ব স্বীকারের নিষেধ-বাণীর পৌনঃপুনিক বহুল ব্যবহার এবং তীব্রতাই সেই কথা আরো মনে করিয়ে দেয়। কাব্যের এলাকা ছেড়ে দিয়ে জীবনের এলাকায়ও রবীন্দ্রনাথের 'গুরু'ত্ব অস্বীকার করবার নয়। সে গুরুত্ব তাঁর সমন্বয়-ধর্মে। জীবনের সর্বক্ষেত্রের সমন্বয় করে জীবন পরিচালনা এবং মানুষেরও সর্বশ্রেণীর সংযোগ-স্থাপনে কায়মনোবাক্যের যোগ,— এই আদর্শ রেখে গেছেন তিনি বিরোধের জগতে। চারদিকেই তখন তাঁর মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের চরম। তাঁর কাছেও বাস্তবের অধিকারভেদজনিত হাজার স্বাভাবিক বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব রয়েছে স্পষ্ট, কিন্তু তা'হলেও জীবনের গোড়া থেকেই জেনে এসেছেন তিনি একত্বকেই।

স্বীয় ধর্মমত সম্বন্ধে প্রথম কবি মত প্রকাশ করেছেন "আমার ধর্ম" নামক প্রবন্ধটিতে। তার উপসংহারে গুছিয়ে নিয়ে যা বলেছেন, তাতে বিচিত্রের মধ্যে এক মহান্ সত্তাকে পূজার কথাই পাওয়া যায়। কবির ধর্মধারণার ক্রমবিকাশের আদিসূত্র হিসাবে রচনাটি মূল্যবান। তিনি তাতে বলেছিলেন, —"আমার রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্মতত্ত্ব থাকে ত তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে-প্রেমের এক দিকে দ্বৈত, আর এক দিকে অদ্বৈত ; এক দিকে বিচ্ছেদ, আর এক দিকে মিলন ; এক দিকে বন্ধন, আর এক দিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে ; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্য ভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্য ভাবে গ্রহণ করে ; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে।" আজ ধর্মে জাতিতে রাষ্ট্রে মারামারি-কাটাকাটির পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদের কথাই কেবল প্রশ্রয়প্রাপ্ত, সেটাই একমাত্র সত্য হয়ে উঠে কার্যকরী আর প্রলয়ঙ্করী হয়ে দাঁড়াল। মানবের একের মধ্যে বিচিত্রের সমন্বয়ধর্মে প্রতিষ্ঠিত বাস্তবনিষ্ঠ রবীন্দ্র-সাধনাদর্শ তাই আরও বিশেষ করে এ সময় অনুধ্যান ও আচরণের বিষয়। তাতে যোগের নূতন ইতিহাস রচিত হওয়ার বীজ আছে।

বাঙালীর ব্যাঙ্কের অগ্রগতি

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

১৯২৭ সনে যখন বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যায় তখন বাঙালীর মনে এক দারুণ নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ ইহাই ছিল বাঙালীর বিশেষ গৌরবের বস্তু এবং স্বদেশী যুগের প্রথম (১৯০৮ সনে) প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক। ইহার প্রতিষ্ঠার সময় দেশের গণ্যমান্য অনেকেই ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যাহা হউক বাঙালীর ব্যবসায়-প্রতিভা এবং অধ্যবসায় বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পতনকে পরাজয় বলিয়া স্বীকার করে নাই, পরবর্তী ঘটনা তাহাই প্রমাণিত করিয়াছে।

১৯৩০ সন হইতে দ্রব্যমূল্যের, বিশেষ করিয়া কৃষিজাত পণ্যের, যে মন্দা দেখা দেয় তাহাতে বাংলার ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তৎকালীন প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটি এবং ভারতীয় ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট হইতে এই দুর্দশার কথা বিশেষভাবে জানা যায়। এখানে বলা প্রয়োজন তৎকালীন বাংলার ব্যাঙ্কিং বলিতে লোন আপিস বুঝাইত। এই লোন আপিসের কার্য্য ছিল বিশেষ করিয়া জমিজমার সম্পর্কে ধার দেওয়া। কৃষিদ্রব্যের দাম কমিয়া যাওয়ায় জমির দাম পড়িয়া যায়। খাজানা আদায় শক্ত হইয়া পড়ে, ফলে এই সকল ব্যাঙ্কের লগ্নি-করা টাকা এরূপভাবে আটকা পড়ে যে, তাহা ফিরাইয়া পাইবার আশা ছাড়িয়া দিতে হয়। লোন আপিসগুলি অধিকাংশই ছিল মফস্বলে অবস্থিত, সুতরাং উহাদের দুরবস্থার দরুন বাংলার জেলাসমূহে যে আর্থিক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইল তাহা অবর্ণনীয়। এই দুর্দিনের আঘাত হইতে বাংলার সমবায় ব্যাঙ্ক, মহাজন কেহই অব্যাহতি পায় নাই। মনে রাখিতে হইবে, বাংলায় এই দুর্দিন বিশেষভাবে বাঙালীকে আঘাত করিলেও ইহা ছিল বিশ্বব্যাপী মন্দার এক অংশ মাত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) অব্যবহিত পরে প্রথম যে মুদ্রাস্ফীতি ও তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে মুদ্রাসঙ্কোচ দেখা গিয়াছিল এই বিশ্ব-মন্দা উহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। অবশ্য তদানীন্তন রাজনীতিক জগতের কর্ণধারগণ যে আর্থিক পরিকল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং

মুদ্রা ও শিল্প প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের যে নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই বিরাট-মন্দা ও বিশ্বব্যাপী বিপর্য্যয় যে উহার ফল নহে এরূপ বলা চলে না।

এখন বিষয়টি আলোচনা করা যাক। এই মন্দার আঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাংলার মফস্বলের কতকগুলি ব্যাঙ্ক কলিকাতায় আপিস স্থাপন করে। মফস্বলের কৃষিকেন্দ্র হইতে কলিকাতার ব্যবসা-কেন্দ্র তখনও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ছিল এবং এখানে আমানতের টাকাও, বেশী মূল্যে অর্থাৎ বেশী সুদে, সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল। তখন কলিকাতার মত বিশিষ্ট বাণিজ্য-কেন্দ্রে বাঙালী ব্যাঙ্কের কোন স্থানই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ নিরাশার আবহাওয়ায় বাঙালীর ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের নূতন করিয়া জয়যাত্রা সুরু হয়। আজিকার সাফল্যের দিনে অতীতের সে কথা স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন আছে। কারণ উত্থানপতনের মধ্য দিয়া ঘাত-প্রতিঘাত সহিয়াই সকল ব্যবসায়ের মত ব্যাঙ্ক ব্যবসাও ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

বর্ত্তমানে বাঙালী পরিচালিত ছোট-বড় সর্ব্বশ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা জানিতে হইলে ইহাদের সংখ্যা, আদায়ী মূলধন, রিজার্ভ এবং কর্ম্মকেন্দ্রগুলির (শাখা-প্রশাখা) হিসাব লওয়া প্রয়োজন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্থাপিত হওয়ার কয়েক বৎসর পর হইতে উক্ত ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক সম্পর্কীয় তথ্যাদি বৎসর বৎসর প্রকাশিত করিতেছেন। যুদ্ধের দরুন ১৯৪৩ সনের পরবর্ত্তী হিসাব এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ঐ সন পর্য্যন্ত যে তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা লইয়াই বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থার পরিমাপ করা যাক। বলা বাহুল্য, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ধরা হয় নাই।

(ক) ১৯৪৩ সনের হিসাবে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতে ৫০,০০০ হইতে ১,০০,০০০ টাকা মূলধনের মোট ১৪৩টি ব্যাঙ্ক ছিল, ইহাদের মধ্যে ২৬টি বাঙালীর ব্যাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ ব্যাঙ্ক বাঙালীর দ্বারা গঠিত। এই ২৬টি ব্যাঙ্কের সম্মিলিত আদায়ী মূলধন প্রায় ৬,১০,০০০ টাকা, রিজার্ভ ১,৭০,০০০ টাকা এবং আমানত ১,১৭,০০,০০০ টাকা। ইহাদের মোট আপিসের সংখ্যা ১১৫টি। মাত্র চারিটি ব্যাঙ্কের দশ বা ততোধিক শাখা আছে।

(খ) ঐ সময়ে সমগ্র ভারতে ১,০০,০০০ হইতে ৫,০০,০০০ টাকা মূলধনের মোট ১৫২টি ব্যাঙ্ক ছিল, ইহাদের মধ্যে ২৭টি বাঙালীর ব্যাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ ব্যাঙ্ক বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত। এই ২৭টি ব্যাঙ্কের সম্মিলিত আদায়ী মূলধন ৫২,৮৮,০০০ টাকা, রিজার্ভ প্রায় ৯,০০,০০০ টাকা এবং আমানত ৩,৮০,০০,০০০ টাকার ঊর্দ্ধে। এই সকল ব্যাঙ্কের মোট কার্য্যালয়-সংখ্যা ২২৩টি। ইহাদের মধ্যে দশটি ব্যাঙ্কের দশ বা ততোধিক শাখা আছে। ১৯৪৩ সনের হিসাবে সাদার্ণ ব্যাঙ্ক এই শ্রেণীতে পড়িয়াছে; ১৯৪৬ সনে ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত হইয়াছে।

(গ) এখন যে সকল ব্যাঙ্কের কথা বলা হইবে তন্মধ্যে সবগুলিই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী তপশীলভুক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে অর্থাৎ এগুলি প্রত্যেকেরই আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ পাঁচ লক্ষ বা তদূর্দ্ধ কিন্তু এগুলি ১৯৪৩ সন পর্য্যন্ত তপশীলভুক্ত হয় নাই।

আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ লইয়া যে সকল ব্যাঙ্কের টাকা ৫,০০,০০০ বা তদূর্দ্ধ হইয়াছে, সমস্ত ভারতে তাহাদের সংখ্যা ৩৫টি—তন্মধ্যে বাঙালীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৪টি, অর্থাৎ অর্দ্ধেকের কিছু কম। এই সকল ব্যাঙ্কের সম্মিলিত আদায়ী মূলধন ৮৮,৫০,০০০ টাকা এবং রিজার্ভ ৯,৫০,০০০ টাকা এবং মোট আমানতের পরিমাণ ৪,২৬,০০,০০০ টাকা। এগুলির মোট ২০২টি আপিস আছে। ছয়টি ব্যাঙ্কের ১০টি বা তদূর্দ্ধ সংখ্যক শাখা আছে। ইহাদের মধ্যে ২৫ হইতে ৫০টি শাখাযুক্ত ব্যাঙ্কও রহিয়াছে। এই শ্রেণীর অন্তর্গত 'ব্যাঙ্ক অব কমার্স', 'হুগলী ব্যাঙ্ক' এবং 'ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক' পরে তপশীলভুক্ত হইয়াছে।

(ঘ) এখন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের কথা বলা হইবে। ১৯৪৩ সনে এরূপ ব্যাঙ্কের সর্ব্বভারতীয় সংখ্যা ছিল ৫৮টি, তন্মধ্যে বাঙালীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১২টি, অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশের কিছু কম। বাঙালীর ব্যাঙ্কগুলির আদায়ীকৃত মূলধন ২,১০,০০,০০০ টাকা, রিজার্ভ ৪৮,৫২,০০০ টাকা এবং আমানত ২৪,৬৫,০০,০০০ টাকা ছিল। ইহাদের মোট কার্য্যালয়-সংখ্যা ছিল ২৫৫টি। ১৯৪৩ সনের হিসাবে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন ও মিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক পৃথক ছিল। বর্ত্তমানে (১৯৪৬) ইহারা একটি ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। এই বারোটি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের আটটির ২০টি বা তদূর্দ্ধ সংখ্যক আপিস ছিল।

এইবার (ক) (খ) (গ) এবং (ঘ) এই চারি শ্রেণীর বাঙালী ব্যাঙ্কসমূহের সম্মিলিত অঙ্কগুলি দেখা যাক :—(১নং তালিকা)

(১নং তালিকা)	ভারতের ব্যাঙ্ক সংখ্যা	বাঙালীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা	আদায়ী মূলধন	রিজার্ভ	আমানত	বাঙালীর ব্যাঙ্ক আপিসের সংখ্যা
			(০০০ বাদ দেওয়া হইয়াছে)			
(ক)	১৪৩	২৬	৬,১০	১,৭০	১,১৭,০০	১১৫
(খ)	১৫২	২৭	৫২,৮৮	৯,০০	৩,৮০,০০	২২৩
(গ)	৩৫	১৪	৮৮,৫০	৯,৫০	৪,২৬,০০	২০২
(ঘ)	৫৮	১২	২,১০,০০	৪৮,৫২	২৪,৬৫,০০	২৫৫
	৩৮৮	৭৯	৩,৫৭,৪৮	৬৮,৭২	৩৩,৮৮,০০	৭৯৫

১৯৪৩ সনের শেষে ভারতে মোট ৬৮৮টি ব্যাঙ্ক ছিল, তন্মধ্যে ৭৯টি ছিল বাংলাদেশে বাঙালীর ব্যাঙ্ক। ঐ সকল বাঙালীর ব্যাঙ্কের সম্মিলিত আদায়ী মূলধন ৩,৫৭,৪৮,০০০ টাকা, রিজার্ভ ৬৮,৭২,০০০ টাকা এবং আমানত ৩৩,৮৮,০০,০০০ টাকা ছিল। বাংলায় বাঙালীর সমস্ত ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা ছিল ৭৯টি। অবশ্য অনেকগুলির শাখা বাংলা দেশের বাহিরেও ছিল।

এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, বাংলার বাহিরে আসামে বহু এবং বিহারে কয়েকটি বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক আছে—তাহা এই হিসাবে ধরা হয় নাই। আসাম প্রদেশের একটি বিশিষ্ট অংশ অর্থাৎ শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি জেলাকে বাংলাদেশের অংশ বলিলেই হয়। শ্রীহট্ট, গৌহাটী এবং শিলঙে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত বহু ব্যাঙ্ক রহিয়াছে।

১৯৪৩ সনের হিসাবে বাঙালীর ১২টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কটি কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের সহিত একত্রীভূত হওয়ায় বর্ত্তমান সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১টি। আবার (খ) শ্রেণী হইতে একটি (সাদার্ণ ব্যাঙ্ক) এবং (গ) শ্রেণী হইতে আরও তিনটি ব্যাঙ্ক (ব্যাঙ্ক অব কমার্স, হুগলী ব্যাঙ্ক এবং ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক) তপশীলভুক্ত হওয়ায় বর্ত্তমানে তপশীলভুক্ত বাঙালীর ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা ১৫টি হইয়াছে। বাঙালীর তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ১৯১০ সনে, দিনাজপুর ব্যাঙ্ক ও কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ১৯১৪ সনে, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৯১৮ সনে, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৯২২ সনে, পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক ১৯২৩ সনে, নাথ ব্যাঙ্ক ১৯২৬ সনে, নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৯২৯ সনে, ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ১৯৩৪ সনে, ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ১৯৩৫ সনে এবং ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক ১৯৪০ সনে স্থাপিত হয়। ১৯৪৩ সনের পরে যে চারিটি ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত হয়, সে সব কয়টিই গত দশ বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

সমস্ত ভারতের তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মোটসংখ্যা (ইউরোপীয় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ব্যতীত) বর্ত্তমানে ৭৯টি, ইহাদের মধ্যে বাঙালীর ব্যাঙ্ক ১৫টি মাত্র।

১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সনে এবং ১৯৪৬ সনের এই কয় মাসে সকল শ্রেণীর ব্যাঙ্কের, বিশেষতঃ তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থার বহু পরিবর্তন হইয়াছে। আদায়ী মূলধন, রিজার্ভ এবং বিশেষ ভাবে আমানত খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার একটি কারণ অবশ্য আর্থিক সচ্ছলতা। তাহা ছাড়াও ব্যাঙ্ক আইনের আওতা হইতে আত্মরক্ষার জন্ত এবং যুদ্ধোত্তরকালের পুনর্গঠনে প্রকৃতই সহায়ক হওয়ার জন্ত প্রত্যেক ব্যাঙ্কের পক্ষেই নিজ নিজ বনিয়াদ শক্ত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের অনুকরণে বাংলাদেশে আমরা বাঙালী ব্যাঙ্কের বড় পাঁচটাকে একসঙ্গে 'বিগ ফাইভ' বলিয়া থাকি। ইহাদের আর্থিক বনিয়াদের হিসাব নিয়ে ২নং তালিকায় প্রদত্ত হইল।*

তালিকায় সংখ্যাগুলি মোটামুটি ভাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, পাঁচটি প্রধান বাঙালী ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ২,৮৭ লক্ষ, রিজার্ভ ৯৬ লক্ষ এবং আমানত প্রায় ৫৪ কোটি টাকা, অর্থাৎ ইহাদের মোট অর্থবল প্রায় ৫৮ কোটি টাকা।

এখন একবার ভারতের অন্যান্য প্রদেশের দুই-একটি ব্যাঙ্কের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কথা ধরা যাউক। এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ মিলিয়া পাঁচ কোটির বেশী দাঁড়ায়। ইহার আমানতও ১০০ কোটি ছাড়াইয়াছে। সুতরাং এই একটি ব্যাঙ্কই আমাদের পাঁচটি বড় বাঙালীর ব্যাঙ্ককে অতিক্রম করিয়াছে। ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বোম্বাই অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক। লাহোরের পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, এবং মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নামও উল্লেখযোগ্য। অল্পকাল মধ্যে মাড়োয়ারীগণ ভারতের নানা স্থানে বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভারত ব্যাঙ্ক (দিল্লী), হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক (কানপুর), ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক, হিন্দ ব্যাঙ্কের (কলিকাতা) নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বিড়লাদের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ও গোয়েঙ্কাদের হিন্দ ব্যাঙ্কে বাঙালীর সহযোগিতাও রহিয়াছে। মাড়োয়ারীরা দেশীয় রাজ্যে জয়পুর ব্যাঙ্ক এবং বিকানীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কই বড় ব্যাঙ্ক। এই সকল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তপশীলভুক্ত হয় এবং অল্পকাল কার্য্য করিবার পরই বিপুল আমানত সংগ্রহ করে এবং লাভ হইতে বহু লক্ষ টাকা তুলিয়া লইয়া রিজার্ভ গঠন করে। অবশ্য মাড়োয়ারীগণের ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষতা এবং শিল্প জগতে প্রতিষ্ঠাই ইহার একমাত্র কারণ। মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ পরিকল্পনা করিয়া যুদ্ধোত্তর কালে

* (২নং তালিকা)

	আদায়ী মূলধন	রিজার্ভ	আমানত
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন	৭৮,০০,০০০৲	৩০,০০,০০০৲	১৫,০০,০০,০০০৲
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৭০,৪০,০০০৲	১৫,৬৫,০০০৲	১০,৫৩,০০,০০০৲
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	৬০,০০,০০০৲	২৫,০০,০০০৲	১২,৫০,০০,০০০৲
নাথ ব্যাঙ্ক	৪৮,৭৬,০০০৲	১৫,০০,০০০৲	৯,৯১,০০,০০০৲
ক্যাল্‌কাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	৩০,০০,০০০৲	১১,০০,০০০৲	৬,০০,০০,০০০৲
মোট	২,৮৭,১৬,০০০৲	৯৬,৬৫,০০০৲	৫৩,৯৪,০০,০০০৲

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক ইত্যাদি স্থাপিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন এবং বহুলাংশে সফলও হইয়াছেন। অনেক শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই ইউরোপীয়দের নিকট হইতে মাড়োয়ারীরা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন ও পরিচালনা করিতেছেন। আশা করা যায়, অল্প দিন মধ্যেই ব্যবসাক্ষেত্রে জাতীয়-করণ আরও বিপুলভাবে দেখা যাইবে। তবে ইহাও লক্ষ্য করা দরকার, এখনও ব্যাঙ্কের কার্য্য, বিশেষ ভাবে বিদেশী বিনিময় বা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য, ভারতীয়েরা উল্লেখযোগ্য ভাবে দখল করিতে পারে নাই। এই ক্ষেত্রে শীঘ্রই দেশীয় ব্যাঙ্ক-সমূহের প্রতিযোগিতা বাড়িবে ইহা নিঃসন্দেহ।

যাহা বলা হইল তাহাতে বাঙালীর নিরুৎসাহ হইবার কোনই কারণ নাই, তবে অন্যান্য ভারতীয়েরা কিভাবে ব্যবসা-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে সর্ব্বদা সজাগ থাকা প্রয়োজন। নিজেদের অতীত ও বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতা হইতে যেরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ মাড়োয়ারী, গুজরাটী ও পার্শীদের এবং ইউরোপীয়গণের নিকট হইতেও শিক্ষালাভ করিতে হইবে। নিজেদের কোথায় দুর্ব্বলতা তাহা জানিতে হইবে ও তাহার প্রতিকার করিতে হইবে।

একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙালীর ব্যাঙ্ক মধ্য-বিত্তের প্রতিষ্ঠান। এজন্য বাঙালীর ব্যাঙ্ক গড়িতে অনেক সময় লাগিয়াছে। আমাদের ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেশী হইলেও আমাদের মূলধন অপেক্ষাকৃত কম। অবাঙালীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত হয়, কারণ তাহারা বেশী মূলধনে কার্য্য আরম্ভ করে, আর আমাদের ব্যাঙ্ককে তপশীলভুক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অসচ্ছলতা ও মন্থরগতি সত্ত্বেও আমাদের ব্যাঙ্কের অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে। তবে আমাদের কর্ম্মপন্থা ও নিয়ম-কানুনের পরিবর্ত্তন দরকার বলিয়া মনে হয়। এই বিষয়েও যে আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে তাহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত উপায়সমূহ অবলম্বনে বাঙালীর ব্যাঙ্ক আরও শক্তিশালী হইতে পারিবে।

১। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন বৃদ্ধি করা। যুদ্ধের সময় এই বিষয়ে নানা বাধা ছিল এখন তাহা দূর হওয়ায় অনেক ব্যাঙ্কের সুবিধা হইবে।

২। শাখার সংখ্যা অবাঞ্ছনীয়ভাবে না বাড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে কর্ম্ম কেন্দ্রীভূত করা ও পরস্পরের মধ্যে অলাভ-জনক প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মের ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লওয়া।

৩। ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রীভূত করিয়া অপেক্ষা-কৃত বড় বড় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা।

৪। ব্যাঙ্কের উন্নতি, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা বহুলাংশে উপযুক্ত এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরক্ত কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করে, সুতরাং যাহাতে ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারিগণ উপযুক্ত বেতন ও সুখসুবিধা পান ব্যাঙ্ক-পরিচালকদের তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। সর্ব্বোপরি যাহাতে ব্যাঙ্কের টাকা নিরাপদে খাটে তাহার ব্যবস্থা করা। ব্যাঙ্কের মূলধন ও রিজার্ভ যতই থাকুক না কেন উহার কার্য্যকরী মূলধনের বিপুল অংশ গ্রাহকগণের আমানত হইতে আসে। সুতরাং যাহাতে সাধারণের অর্থাৎ আমানতকারীদের অর্থের অপচয় না হয় ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণের সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই স্থানেই ব্যাঙ্কের সহিত অন্যান্য ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের (বীমা ব্যতীত) তফাৎ। অংশী-দারের লাভ অপেক্ষা আমানতকারীগণের টাকার নিরাপত্তার দিকে ব্যাঙ্ক-পরিচালকের বেশী নজর রাখিতে হয়।

৬। দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে যথোচিত সাহায্য করা ব্যাঙ্কের অন্যতম কার্য্য। এইরূপ কার্য্যে উভয়েরই মঙ্গল। কারণ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইলে ব্যাঙ্কের টাকা বেশী খাটিবে; অংশীদারের বেশী লাভ হইবে। আবার ঠিক সময় উপযুক্তরূপে সাহায্য পাইলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। কাজেই উভয়ের সহযোগিতায় পরস্পরের মঙ্গল। ব্যাঙ্কিং সুদ-খোরের ব্যবসা নহে, ইহা জন-হিতকর ব্যবসায়ের অন্যতম। আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই ব্যবসায়ে যোগদান করিয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। আজ বোম্বাই ও পঞ্জাবের ব্যবসায়ের অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সকল প্রদেশের নিজস্ব বড় বড় ব্যাঙ্ক থাকার দরুন উহা সম্ভব হইয়াছে।

৭। বাঙালীর ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাঙ্ক-ব্যবসা তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সূচনা করিতেছে। এখন প্রত্যেক বাঙালীর কর্ত্তব্য হইতেছে, নিজেদের ব্যাঙ্কের সহিত কারবার করা। এক কালে বাঙালীর বিশ্বাসযোগ্য ভাল ব্যাঙ্ক ছিল না। আজ আর সেকথা বলা চলে না, বাঙালীর ব্যাঙ্কে বাঙালী টাকা রাখিলে তবেই বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহা হইতে সাহায্য পাইবে এবং বাঙালীর অগ্রগতিরও সহায়তা করা হইবে। মনে রাখিতে হইবে, অবাঙালীর ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অর্থই অবাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করা এবং বাঙালীকে সেই সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা। একথা বিশেষ ভাবে ইউরোপীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সত্য। আমরা এত দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি।

৮। আর একটি বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে সকল বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক মিলিয়া নিজেদের, বিশেষ করিয়া বাঙালী জাতির হিতকর একটি সাধারণ কর্ম্মসূচী প্রণয়ন ও গ্রহণ করা। বর্ত্তমানের অহিতকর প্রতিযোগিতা ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের পক্ষে মঙ্গল-জনক নহে, একথা বাঙালীকে মনে রাখিতে হইবে। ঈর্ষা দ্বারা

কাহারও কোন লাভ হয় না, কেবলমাত্র ঈর্ষাকারীর নিজের ক্ষতি হয়; বাঙালীর তাহাই হইয়াছে। এত কালের ক্ষতি হইতে আজ আমাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে। ছোট বড় সকল ব্যাঙ্কের কর্ণধারগণ একত্র হইয়া বাঙালীর ব্যাঙ্কের কিসে আরও প্রতিষ্ঠা বাড়ে, ভিত্তি শক্ত হয়, বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্য কিসে আরও বেশী সাহায্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিলে দেখিতে পাইবেন—ব্যবসায়ক্ষেত্রেও বাঙালীর আবার নেতৃত্ব গ্রহণ সম্ভব হইবে।

সর্ব্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতায় ক্ষেত্রে বাঙালীর অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে, প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় ও ব্যাপক করিতে হইলে জাতি হিসাবে বাঙালীকে আজ নূতন করিয়া গঠনকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে। এ কার্য্যে বাঙালী ব্যাঙ্ক-পরিচালক ও কর্ণধারগণের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব কাহারও অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে।

যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষায় সঙ্গীত

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সর্বশাস্ত্রের রহস্য জানাবার জন্যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদের শাখাগুলির উপযোগী ক'রে এই শিক্ষাশাস্ত্র রচনা করেন।[১] শিক্ষার উদ্দেশ্যই হ'ল ছন্দ, স্বর, বর্ণ প্রভৃতির নিয়ম-কানুনকে স্পষ্ট ক'রে দেখান। বেদপাঠের প্রধান অবলম্বনই ছন্দ ও স্বর; তাই মহর্ষি প্রথমেই "উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ তথৈব তৎ" বলে উদাত্তাদি স্বর তিনটির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আসল পরিচয় দেবার আগে স্বর তিনটির বর্ণ (রঙ), দেবতা, জাতি, ঋষি, ছন্দ ও প্রকৃতি জানার আকুতিই দেখি তাঁর বেশী। যেমন তিনি বলেছেন:

"শুক্লমুচ্চং বিজানীয়ান্নীচং লোহিতমেব চ।
শ্যামং তু স্বরিতং বিদ্যাদগ্নিরুচ্চস্য দৈবতম্।
নীচং[২] সোমং বিজানীয়াৎ স্বরিতে সবিতা ভবেৎ।
উদাত্তং ব্রাহ্মণং বিদ্যান্নীচং ক্ষত্রিয়মেব চ।
বৈশ্যং তু স্বরিতং[৩] বিদ্যাদ্ভারদ্বাজমুদাত্তকম্।
নীচং গৌতমমিত্যাহুর্গার্গ্যং তু স্বরিতং বিদুঃ।
বিদ্যাদুদাত্তং গায়ত্রং নীচং ত্রৈষ্টুভমেব চ।
জাগতং স্বরিতং বিদ্যাদেবমেব নিয়োগতঃ।[৪]

অর্থাৎ দেখা যায় যে,

স্বর	রং	দেবতা	জাতি	ঋষি	ছন্দ
উদাত্ত	শুক্ল	অগ্নি	ব্রাহ্মণ	ভরদ্বাজ	গায়ত্রী
অনুদাত্ত	লোহিত	সোম	ক্ষত্রিয়	গৌতম	ত্রিষ্টুভ
স্বরিত	শ্যাম	সবিতা (সূর্য)	বৈশ্য	গার্গ্য	জগতি

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই বিভাগ ও রীতি নারদীশিক্ষা ও অন্যান্য কয়েকটি শিক্ষারই অনুরূপ। পরবর্তী গ্রন্থকারদের ভেতর এক দত্তিল ও নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ছাড়া প্রায় সকলেই ঐ ধারা গ্রহণ করেছেন। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতেও অবশ্য এই সব খুঁটিনাটি বিভাগের কোন উল্লেখ নাই তবে স্বরনির্ণয়-প্রকরণে গ্রামসম্বন্ধে মতঙ্গ কিন্তু যখন আলোচনা করেছেন তখন ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধারগ্রামকে "অসাধারণত্বং দেবকুলসমুৎপন্নত্বেন" বলেছেন। শুধু তাই নয়, তাদের দেবতাদের কথাও বলেছেন; যেমন,

"দেবকুলসমুৎপন্নাঃ ষড়্জগান্ধারমধ্যমাঃ।
এতেষাং দেবতা জ্ঞেয়া ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।"[৫]

মতঙ্গকে দেখা যায়—বৈদিক বা ঔপনিষদিক প্রভাবকে কাটিয়ে উঠে অনেকটা পৌরাণিক আবহাওয়ার ভেতর দিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন আর সেজন্যেই তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নাম উল্লেখ করাকেই প্রয়োজন বোধ করেছেন। তবে আর একদিকে স্বর বা রাগরূপের বেলায় দেবতা, বর্ণ (রং) বা ব্রাহ্মণাদি জাতির[৬] কথা তিনি আবার কিছু বলেন নি। কিন্তু বৃহদ্দেশীর পর সঙ্গীতমকরন্দে নারদ[৭] স্বরের জাতি, বর্ণ, ছন্দ, স্থান, রস, রাশি সবকিছুরই স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। যেমন,

"দেববংশাস্ত সগমাঃ পঞ্চম পিতৃবংশজঃ।
রিধৌ ঋষিকুলে জাতৌ নিষাদোঽসুরবংশজঃ।
ব্রহ্মজাতি সমৌ জ্ঞেয়ৌ রিধৌ ক্ষত্রিয়জাতিকৌ।
নিগৌ বৈশ্যাবিতি প্রোক্তৌ পঞ্চমঃ শূদ্রজাতিকঃ।

১। "সর্বশাস্ত্র রহস্যং তদ্ যাজ্ঞবল্ক্যেন ভাষিতম্।"—শিক্ষা-সংগ্রহ, পৃ. ৩৫

২। পাঠভেদ—"নীচে সোমমিতি।"

৩। পাঠভেদ—"উদাত্তং তু ভরদ্বজম্।"

৪। শিক্ষাসংগ্রহ পৃ. ১। এ ছাড়া ৬-৭ শ্লোকে আবার নিজের কথাই উল্লেখ ক'রে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন:

"বর্ণো জাতিশ্চ মাত্রা চ গোত্রং ছন্দশ্চ দৈবতম্।
এতৎ সর্বং সামাখ্যাতং যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা।"

গ্রন্থকারদের নিজেদের নামের সম্বন্ধে উল্লেখ করার এ রকম রীতি প্রাচীনকালে ছিল।

৫। বৃহদ্দেশী, পৃ. ২১

৬। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ ভরত, বা দত্তিলের মতন যাজ্ঞবল্ক্য আবার "জাতিরাগ" বা জাতিগানের কথাও বলেছেন কিন্তু রাগ বা স্বরের ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাদি জাতির কোনও উল্লেখ করেন নি।

৭। এই নারদ কিন্তু শিক্ষাকার নারদ নন, ইনি মকরন্দ-কার নারদ।

পদ্মাভঃ পিঞ্জরঃ স্বর্ণবর্ণঃ কুন্দপ্রভঃ সিতঃ।
পীতঃ কর্বুর ইত্যেতে তেষাং বর্ণা নিরূপিতা॥

* * *

জম্বুশাককুশক্রৌঞ্চশাল্মলীশ্বেতনামসু।
দ্বীপেষু পুষ্করে চৈব জাতাঃ ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ॥

* * *

বহ্নেঽত্রিঃ কপিলশ্চৈব বশিষ্ঠো ভার্গবস্তথা॥

* * *

গণেশ্বরাদয়ো দেবাঃ ষড়্জাদীনাং তু দেবতাঃ॥
ক্রমাদনুষ্টুবগায়ত্রী ত্রিষ্টুপ চ বৃহতী তথা।

* * *

কুন্তলা হ্যষশ্চৈব সিংহ-কতা-বহুস্তথা।

* * *

ষড়্জস্যাদ্ভুতবীরৌ চ ঋষভস্য চ রৌদ্রকঃ॥"[৮]

এর পর শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরে (৩।৫০-৫৯): "পঞ্চমঃ পিতৃবংশোত্থো নিষাদ্যষিকুলোদ্ভবৌ" প্রভৃতি বলে স্বরের বংশ, বর্ণ, জন্মস্থান, ঋষি, দেবতা ও রসের কথা উল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেবের পর জৈনাচার্য পার্শ্বদেব তাঁর সঙ্গীত-সময়সারে "নাদাগ্নঃনন্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ"[৯] এই মাত্রই যা নাদের বিচারে উল্লেখ করেছেন; স্বরের দেবতা, বর্ণ বা জাতি নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে চেষ্টা করেন নি। অনেক পণ্ডিতের মতে পার্শ্বদেব শার্ঙ্গদেবের পরবর্তী গ্রন্থকার, কেননা পার্শ্বদেব শার্ঙ্গদেবের পূর্ববর্তী আচার্য হলে অবশ্য প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে রত্নাকরের বা গ্রন্থকার শার্ঙ্গদেবের কথা কোথাও-না-কোথাও উল্লেখ করতেন। কিন্তু পার্শ্বদেব তা করেন নি। কাজেই অনেকের অভিমত, পার্শ্বদেব শার্ঙ্গদেবেরও পরবর্তী গ্রন্থকার। অবশ্য আমরাও এই মতের এখনও পক্ষপাতী; কিন্তু বিচিত্র ও বিস্তৃত আলোচনাপূর্ণ রত্নাকরের বিষয়-বস্তু এবং বিকাশভঙ্গী দেখলে মনে হয় অনেক জিনিসই যেন পার্শ্বদেবের সময়ের পরে বিস্তৃতিলাভ করছিল, কেননা পার্শ্বদেব তাঁর সঙ্গীতসময়সারে সঙ্গীতের অনেক জিনিসেরই আবার আলোচনা করেন নি; তা ছাড়া আলোচনার ভঙ্গীও তাঁর বেশ সুসংযত ও ধারাবাহিক নয়। কিন্তু শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকরে সঙ্গীতের বিষয়-বস্তুর পারিপাট্য ও নিয়মিত ক্রমিক আলোচনার ভাব বেশ সুপরিস্ফুট। কাজেই সন্দেহ করা একেবারেই অসঙ্গত নয় যে, রত্নাকর সময়সারেরও পরেকার গ্রন্থ। অবশ্য এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের জন্যে আরও তুলনামূলক নিবিড় আলোচনার প্রয়োজন। ডাঃ রাঘবন্ ও শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণমাচারিয়ার দু'জনেই কিন্তু শার্ঙ্গদেবকে বৃদ্ধ ও প্রাচীন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। আমরাও অবশ্য আরও নির্দিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ঐ মতই এখন নানা কারণে স্বীকার করব।

৮। সঙ্গীতমকরন্দ ১।২৮-৫১

৯ সঙ্গীতসময়সার ১২

এখন আলোচনার বিষয় যে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি স্বরের বর্ণ ও দেবতা ইত্যাদি ক'রে বিভাগ করেছেন তা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত ও প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবর্তী। যাজ্ঞবল্ক্য দেবতা ও বর্ণের (রঙের) যে সমপাংক্তিক ভাগ দেখিয়েছেন তা ঠিক ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত বিভাগের অনুযায়ীই, তবে তফাৎ হ'ল—ছান্দোগ্যে অগ্নির লাল, জলের সাদা আর পৃথিবীর রূপ কাল বলা হয়েছে, আর যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষায় অগ্নির রং সাদা; সোম, চন্দ্র বা জলের রং লাল ও স্বর্ণের রং কাল বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ "ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্" (৬।৪।১)[১০] অর্থাৎ লাল, সাদা আর কাল এই তিনটি রং মাত্রই সত্য অর্থাৎ আদি বলেছে। এদিক দিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকারও ঠিক একই কথা বলেছেন, তবে দেবতা ও রঙের সামঞ্জস্যের বেলায় তিনি ঠিক সমান ধারা বজায় রাখতে পারেন নি। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বিকাশ ও পদার্থগত সামঞ্জস্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সামাজিক প্রভাবের ফলে জাতির অনুসারে বর্ণবিভাগের মোহ সম্ভবতঃ এড়াতে পারেন নি, আর এ জন্যেই দেবতার গুণ ও প্রকৃতিগত বর্ণের সামঞ্জস্য দেখাতেও তিনি কার্পণ্য বোধ করেছেন বলেই আমাদের মনে হয়।

বর্ণ ও দেবতার কথা ছেড়ে দিলে স্বরকে দেবতা, ঋষি ও বর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করার আবেগ শুধু শিক্ষাকার যাজ্ঞবল্ক্যেরই ছিল না, শিক্ষাকার নারদ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাতিশাখ্যকারেরা পর্যন্তও এই প্রবৃত্তি রেখেছিলেন। তবে স্বরের জায়গায় কেউ বা দেখিয়েছেন মূর্ছনাকে, কেউ বা বর্ণ আবার কেউ বা ছন্দকে। যেমন নারদীশিক্ষাকার নারদ ষড়্জাদি তিন গ্রামের মূর্ছনার কথা ব'লে শেষে আবার বলেছেন:

"পিতৃণাং মূর্ছনা সপ্ত তথা যক্ষা ন সংশয়ঃ।
ঋষীণাং মূর্ছনাঃ সপ্ত যাস্থিমা লৌকিকাঃ স্মৃতাঃ॥[১১]

সাতটি লৌকিক স্বরের বেলায়ও আবার বলেছেন:

ষড়্জঃ প্রীণাতি বৈ দেবানৃষীন্ প্রীণাতি চর্ষভঃ।
পিতৃন্ প্রীণাতি গান্ধারো গন্ধর্বান্ মধ্যমঃ স্বরঃ॥
দেবান্ পিতৃন্ ঋষীংশ্চৈব স্বরঃ প্রীণাতি পঞ্চমঃ।
যক্ষান্ নিষাদঃ প্রীণাতি ভূতগ্রামং চ ধৈবতঃ॥[১২]

এখানে ঋষি নারদের উল্লেখ দেখা যায়। তিনি তিনটি প্রধান বংশের মূর্ছনা-প্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন, আর স্বরের বেলায় চারটি বংশের কথাও বলেছেন। তবে এটা ঠিক যে, মাঝামাঝি সময়ে বৈদিক সমাজে দেব, ঋষি ও পিতৃ এই তিনটি কুল বা বংশের বিভাগই মাত্র প্রধান ছিল আর গন্ধর্ব ছিল

১০। অবশ্য ছান্দোগ্যে (১।৬।১) পৃথিবী অগ্নি, অন্তরীক্ষ বায়ু, দ্যুলোক আদিত্য—এ রকমের ইঙ্গিতও করা হয়েছে।

১১। শিক্ষাসংগ্রহ, পৃ. ৪০০

১২। ঐ পৃ. ৪০১

পিতৃবংশেরই অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী সঙ্গীতের আচার্যেরা নারদের এই বিভাগকেই বেশীর ভাগ মেনে নিয়েছেন।

ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যে গায়ত্রী, উষ্ণিক ইত্যাদি সাতটি ছন্দের ('সপ্ত ছন্দাংসি') এবং দেবতা ও অসুর এই দুটি মাত্র বিভাগের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন (ক) "দৈবন্যাপি চ সপ্তৈব"১৩; (খ) "সপ্ত চৈবাসুরাণ্যাপি"১৪। তবে ১৬।৮ সূত্রে আবার 'ঋষিছন্দাংসি' কথায় ঋষিবংশেরও উল্লেখ আছে দেখা যায়। কাজেই ঋগ্বৈদিক থেকে প্রাতিশাখ্যের যুগ পর্যন্ত ঋক্, সাম ও যজু এই তিন বেদের মতন ঋষি, দেবতা ও অসুর, অথবা ঋষি, দেবতা ও পিতৃবংশেরই মাত্র বিভাগ ছিল। ঋক্প্রাতিশাখ্যের ১৭।৮–১২ সূত্র পর্যন্ত বারুণী, প্রাজাপত্য, বায়ুদেবতা, পৌরুষী, ব্রাহ্মী বলে দেবতাদের নাম করা হয়েছে। ১৭।১৪ সূত্রে আবার

"শ্বেতং চ সারঙ্গমতঃ পিশঙ্গং কৃষ্ণমেব চ।
নীলং চ লোহিতং চৈব সুবর্ণমিব সপ্তমম্ ॥
অরুণং শ্যামগৌরে চ বভ্রু বৈ নকুলং তথা ॥"

এখানে বিচিত্র বর্ণেরই নাম করা হয়েছে দেখা যায়। তারপর শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যেও বর্ণ নিয়ে আলোচনার সময় বলা হয়েছে (ক) 'বর্ণদেবতাঃ', (খ) 'আগ্নেয়াঃ কণ্ঠ্যাঃ' প্রভৃতি।১৫ সুতরাং দেখা যায়, দেবতা, ঋষি, অসুর ও পিতৃ প্রভৃতি বংশের সঙ্গে এবং শ্বেত ইত্যাদি রঙের সঙ্গে বর্ণ, ছন্দ, স্বর বা মূর্ছনার একতা অথবা সামঞ্জস্য দেখাবার ধারা বৈদিক-যুগ থেকেই সবার ভেতর ছিল; আর পরবর্তী আচার্যেরা পূর্ববর্তীদের রীতিকেই মাত্র অনুসরণ করেছেন বলা যায়। কিন্তু কেন? অথবা কি জন্যে?—এর কোন কারণ দেখাবার বা ঐতিহাসিক বিকাশের কোন ইঙ্গিত দেবার আবশ্যকতাও তাঁরা মোটেই অনুভব করেন নি। এতে উপকার হয়েছে এই যে, শাখা-প্রশাখার বিস্তার ক'রে আলোচনার বস্তুকে মোটেই তাঁরা ভারাক্রান্ত করেন নি, আর তার জন্যে সঙ্গীতের স্বর, অলঙ্কার ও রাগ-রাগিণীই যে মূল বস্তু তারই মাত্র ভাল ক'রে পরিচয় দিতে পেরেছেন, কিন্তু অপকারও হয়েছে এই যে, বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সঙ্গীতের বিকাশ কেমন ক'রে হ'ল তার সুনির্দিষ্ট একটা প্রমাণপঞ্জীকে তাঁরা একেবারে মুছে দিয়েছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এর পরই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন:

গান্ধর্ববেদে যে প্রোক্তাঃ সপ্ত ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ।
ত এ ব বেদে বিজ্ঞায়ন্ত্রয় উচ্চাদয়ঃ স্বরাঃ ॥"১৬

গান্ধর্ববেদে অর্থাৎ লৌকিক গীতিশাস্ত্রে যাকে ষড়্জাদি সাত স্বর বলা হয়েছে তাই বেদে উদাত্তাদি তিন স্বর। এখানে যাজ্ঞবল্ক্য ষড়্জাদি স্বরকে গান্ধর্ববেদের অন্তর্গত বলায় লৌকিক বা দেশী সঙ্গীতের স্বরকেই ইঙ্গিত করেছেন বলতে হবে, কিন্তু শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যের ১।১২৭ সূত্রের ('সপ্ত') ভাষ্যে মহর্ষি কাত্যায়ন আবার "সামসু সপ্তস্বরানাহুঃ ষড়্জ ঋষভ-গান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদান্" বলেছেন। আমাদের অভিমতে কাত্যায়নের সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, কেননা "সপ্ত স্বরা যে যমাস্তে" সূত্র ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যের।১৭ এই সূত্রের ভাষ্যে উবট স্পষ্টই বলেছেন: "যে তে সপ্তস্বরাঃ ষড়্জর্ষভগান্ধারমধ্যম-পঞ্চমধৈবতানিষাদাঃ স্বরাঃ—ইতি গান্ধর্ববেদে সমাম্নাতাঃ।" তা হ'লে যাজ্ঞবল্ক্য- ও ঋক্প্রাতিশাখ্যকারের কথার এখানে দেখা যায় মিল আছে। তবে যাজ্ঞবল্ক্যের এই "ত্রয়ো বেদে বিজ্ঞেয়াস্ত্রয় উচ্চাদয়ঃ স্বরাঃ" কথাগুলির সঙ্গে কিন্তু ঋক্প্রাতিশাখ্য ও তার ভাষ্য বা ব্যাখ্যা ছাড়া তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য বা আর কারও সঙ্গে ঠিক মেলে না। কারণ ঋক্প্রাতিশাখ্যের ভাষ্যকার উবট বলেছেন: "তথা সামসু ক্রুষ্ট-প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মন্দ্রাতিস্বার্যাঃ।" তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যেরও (২৩।১২ সূত্রে) তাই বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যের ত্রিরত্নভাষ্যে সোমাচার্য এবং বৈদিকাভরণব্যাখ্যায় গার্গ্য গোপালযজ্বও পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন: "তদেবং সামবেদবর্তিনঃ ক্রুষ্টাদয়ঃ সপ্ত স্বরাঃ সমস্ত নিরূপিতাঃ। তেষু মন্দ্রাদয়ো * * যথাক্রমশাৎ স্বাধ্যায়বৃত্তিনঃ অনুদাত্তস্বরিত প্রচয়োদাত্তা ভবন্তীত্যর্থঃ।"১৮ এখানে ভাষ্যের এই "যথাক্রমশাৎ * * অনুদাত্ত" প্রভৃতি শব্দগুলি অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্যের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করছে। কাজেই বুঝতে হবে যে, বৈদিক সামগানের গোড়াকার দিকে-মাত্র উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন স্বরের প্রচলনই ছিল। তার পর স্বরিত ও প্রচয়,১৯ স্বরের অভ্যুদয় হয়।

কিন্তু এতেও ঠিক আসল সমস্যার সমাধান হয় না, কেননা ঋক্প্রাতিশাখ্য প্রভৃতিতে ও বিশেষ ক'রে নারদীশিক্ষায় যে ইঙ্গিত লুকানো রয়েছে তা থেকে প্রথমাদি স্বরকেই ঠিক ঠিক বৈদিক বা সামগানের স্বর বলা যেতে পারে। কেননা নারদীতে "আর্চিকং গাথিকং চৈব"২০ অথবা (ক) "ঋগ্বেদে সামবেদে চ বক্তব্যঃ প্রথমঃ স্বরঃ", (খ) ঋগ্বেদস্তু দ্বিতীয়েন তৃতীয়েন চ বর্ততে;২১ পুষ্পসূত্রের ৯ম প্রপাঠকের ১-৮ শ্লোকগুলি আর তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যের ২৩ অধ্যায়ের ১৭ সূত্রের "মন্দ্রাদয়ো দ্বিতীয়াত্তাশ্চত্বারস্তৈত্তিরীয়কাঃ" শব্দগুলি

১৩। ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য ১৬।৩

১৪। ঐ ১৬।৪

১৫। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ৮।৩১।৩৮

১৬। শিক্ষাসংগ্রহ, পৃ. ১

১৭। ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য ১৩।৪৪

১৮। *Vide* তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য in *Bibliotheca, Sanskrita*, No. 33, (Mysore), edited by K. Rangacharya, pp. 16-17

১৯। অনেকের মতে 'প্রচয়' স্বর স্বরিতেরই অন্তর্ভুক্ত।

২০। শিক্ষাসংগ্রহ, পৃ. ৩৯৫

২১। ঐ পৃ. ৩৯৭

থেকে সে কথাই অনুমান করা যায়। তার পর "মন্দ্রাদিষুত্রিষু স্থানেষু সপ্ত সপ্ত যমাঃ"২২ সূত্রটিতে মন্দ্র, মধ্য ও তার অথবা উচ্চ, নীচ ও মধ্য স্থান যে বৈদিক যুগে ও সামগানের সময়েও প্রচলিত ছিল, আর এই তিন স্থানেই যে প্রথম দ্বিতীয়াদি সাতটি স্বরে উচ্চ-নীচ শব্দের তারতম্য প্রচলিত ছিল সে কথাও বেশ বোঝা যায়। কাজেই একথাই ঠিক যে, মন্দ্র, মধ্য ও তার স্থান থেকেই পরে লৌকিক স্বরের কারণ বা যোনি-স্বরূপ (source or womb) অনুদাত্ত, স্বরিত ও উদাত্ত স্বর তিনটির সৃষ্টি হয়েছিল। আর তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যের ত্রিরত্ন-ভাষ্যকার সোমাচার্যও "যো দ্বিতীয়ঃ স উদাত্তঃ, যো মন্দ্রঃ সোঽনুদাত্তঃ যৌ তৃতীয়চতুর্থৌ তৌ স্বরিতপ্রচয়ভিত্ত্যর্থঃ" কথা-গুলিতে সে সমর্থনেরই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। বৈদিকাভরণ-ব্যাখ্যায় গোপালযজ্বও "তৃতীয়াখ্যঃ প্রচয়শ্চতুর্থাখ্যঃ স্বরিতঃ" কথাগুলিতে ত্রিরত্ন-ভাষ্যের সমর্থন করেছেন। কাজেই এ কথা ঠিক যে, মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থান থেকেই পরে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের উৎপত্তি হয়েছিল, আর উদাত্তাদি তিনটি স্বর থেকে পরে লৌকিক ষড়্‌জাদি সাত স্বরের সৃষ্টি হয়েছিল।২৩ একজে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও ঠিক বলেছেন:

> "উচ্চৌ নিষাদগান্ধারৌ নীচাবৃষভধৈবতৌ।
> শেষাস্তু স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্‌জমধ্যমপঞ্চমাঃ॥"২৪

উচ্চ বা উদাত্ত থেকে নিষাদ ও গান্ধার, নীচ বা অনুদাত্ত থেকে ঋষভ ও ধৈবত এবং স্বরিত থেকে ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বরের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজে মানুষের চাহিদার জন্যেই তিন স্বর থেকে ধীরে ধীরে লৌকিক সঙ্গীতের উপযোগী ষড়্‌জাদি সাত স্বরের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। তবে উপায় বা অবলম্বন ছিল কিন্তু উদাত্তাদি অথবা উচ্চ, নীচ ও মধ্য স্বর তিনটিই।

এর পর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বিস্তৃতভাবে মাত্রা কাকে বলে ও তার উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন:

> "নিমেষো মাত্রাকালঃ স্যাদ্বিদ্যুৎকালেতি চাপরে।
> অক্ষরাতুল্যযোগস্থামিতিঃ স্যাৎ সোমশর্মনঃ॥
> সূর্যরশ্মিপ্রতীকাশাৎ কণিকা যত্র দৃশ্যতে।
> অণবস্তু সা মাত্রা মাত্রা তু চতুরাণবা॥
> মানসে চাণবং বিন্দ্যাৎ কণ্ঠে বিদ্যাদ্দ্বিরাণবম্।
> ত্রিরাণবং তু জিহ্বাগ্রে নিঃসৃতং মাত্রিকং বিদুঃ॥২৫

নিমেষ কালকে কেউ 'মাত্রা' বলেন, আবার বিদ্যুৎ-প্রকাশ যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততটুকু সময়কেও কেউ কেউ 'মাত্রা' বলেন। নিমেষকাল অর্থে চক্ষুর পাতা পরিবর্তন হ'তে যতটুকু সময় লাগে। অক্ষর বা বর্ণগুলির অণুকাল যে সময় সেই কালকে 'একমাত্রা' বলে। তারপর সূর্যের রশ্মিতে যে সব অণুর কণা দেখা যায় তাকেই ঠিক মাত্রা বলে; কিন্তু ঐ রকমের অণু চারটি অণু বা পরমাণু আবার একত্র হলে তবেই মাত্রার মানস-প্রত্যক্ষ বা অনুভব হয়। মানুষের মনে এক মাত্রা থাকে, কণ্ঠে দুই মাত্রা এবং জিহ্বাগ্র-নিঃসৃত শব্দে তিন মাত্রা থাকে।২৬

> "অবগ্রহে তু যঃ কালস্ত্বর্ধমাত্রা বিধীয়তে।
> পদয়োরন্তরে কাল একমাত্রা বিধীয়তে॥

হ্রস্বমাত্র কালই অর্ধমাত্রা, আর দুটি পদের ব্যবধানে যে কাল থাকে তাকে বলে একমাত্রা।

> "একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
> ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্ধমাত্রিকম্॥

এখানে যাজ্ঞবল্ক্য হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত স্বরের পরিচয় দিয়েছেন। এই হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত স্বরের উদাহরণ দেবার সময় যাজ্ঞবল্ক্য আবার ঋক্‌প্রাতিশাখ্যকারের মতনই বলেছেন:

> "চাষস্তু বদতে মাত্রাং দ্বিমাত্রাং বায়সোঽব্রবীৎ।
> ময়ূরস্তু ত্রিমাত্রাং বৈ মাত্রাণামিতি সংস্থিতিঃ॥২৭

স্বর্ণচাতক বা নীলকণ্ঠের শব্দ একমাত্রাবিশিষ্ট, কাকের শব্দ দু'মাত্রা, আর ময়ূরের শব্দ তিন মাত্রাবিশিষ্ট।

এর পর যাজ্ঞবল্ক্য ভাল ও মন্দ স্বর বা শব্দের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। কম্পিত, ভীত, অনুনাদিক শব্দকে মন্দ, আর প্রকৃতি যার বিনীত ও কল্যাণী ও স্বর সুশোভন এমন লোকের শব্দ বা স্বরকে তিনি ভাল বলেছেন। স্বরকে সুশোভন ও মিষ্ট করতে গেলে আমাদের কি প্রণালী অনুসরণ করা উচিত তারও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন প্রাতঃকালে উঠে আম্র, পলাশ, বিল্ব, অপামার্গ, শিরীষ, খদির, কদম্ব, করবী, করঞ্জক শাখা দিয়ে দাঁত মাজা উচিত, তাতে গলার স্বর সূক্ষ্ম ও মাধুর্য পূর্ণ হয়। "ত্রিফলাং লবণাক্তেন"—লবণযুক্ত ত্রিফলার জলপান করলে ক্ষীণমেদ হওয়ার জন্যে স্বর যে বেশ সুস্পষ্ট হয় তাও

২২। তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য ২৩।১০

২৩। বৈদিক ও লৌকিক সাত স্বরের উৎপত্তির ইতিকথা সম্বন্ধে বিশদভাবে বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

২৪। শিক্ষাসংগ্রহ, পৃ. ২

২৫। ঐ শ্লোক ৮-১০

২৬। 'মানুষের মনে একমাত্রা থাকে' ইত্যাদির অর্থ হ'ল অণুর প্রত্যক্ষ হয় না, এসরেণুরই কেবল প্রত্যক্ষ হয়। এসরেণু থেকেই বৈশেষিকদর্শনকারের মতে সৃষ্টির আরম্ভ, অথচ "অণবস্তু সা মাত্রা" যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তি অনুসারে অণুই ঠিক ঠিক মাত্রা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "মাত্রা তু চতুরাণবা"—চারটি অণুর মিশ্রণ হলে তবে মাত্রার প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু তারপরেই যাজ্ঞবল্ক্য সেজন্যে বলেছেন: "ত্রিরাণবং তু জিহ্বাগ্রে নিঃসৃতং"। কাজেই বুঝতে হবে যে, জিহ্বাগ্র-নিঃসৃত ত্রিমাত্রাযুক্ত শব্দ যখন স্বররূপে ব্যক্ত হয় তখন চতুরাণবযুক্ত হয়েই তা প্রকাশ পায় ও প্রত্যক্ষ হয়।

২৭। ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যে (১৩।৪০) এর সামান্য একটু পাঠভেদ আছে, যেমন,

> "চাষস্তু বদতে মাত্রাং দ্বিমাত্রাং বায়সোঽব্রবীৎ।
> শিখী ত্রিমাত্রো বিজ্ঞেয় এষ মাত্রাপরিগ্রহঃ॥"

বলেছেন। পরে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরকে কি প্রণালীতে উচ্চারণ করতে হবে তার পরিচয়ও ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর শিক্ষাতে দিয়েছেন।

মোট কথা, যাজ্ঞবল্ক্য অথবা অপরাপর শিক্ষাগুলির ভেতর সঙ্গীতের পরিচয় যা আমরা পেয়ে থাকি তা বর্ত্তমানের তুলনায় নগণ্যই বলতে হবে। আসলে শিক্ষার যুগে সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে বৈদিক সমাজের রীতি ও ধারাকে অনুসরণ করে; কাজেই একথা ঠিক যে, শিক্ষাগুলির ভেতর যদি আমরা বর্ত্তমান কালে প্রচলিত রাগ-রাগিণী, শ্রুতি, অলঙ্কার, তান, বিস্তার ও বাদী সম্বাদী প্রভৃতির বিচারপূর্ণ মূর্ত্তিকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করি তা হলে অবশ্যই নিরাশ হব। তাই আসল কথা হ'ল সব জিনিসই যেমন বিকাশ ও ক্রমাভিব্যক্তির ধারাকে অনুসরণ করেই পরিপুষ্টি লাভ করেছে, সঙ্গীতের বেলাও তাই। কাজেই শিক্ষাগুলির ভেতর সঙ্গীতের অনুসন্ধান করব আমরা বৈকাশিক স্তর ও অভিব্যক্তির ইতিহাসকে খুঁজে পাবারই প্রবৃত্তি নিয়ে, বর্ত্তমান ধারার সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে নেবার মনোবৃত্তি নিয়ে নয়। শিক্ষাগুলিতে সাঙ্গীতিক পরিচয় ও বিকাশ আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাস রচনায় অমূল্য উপাদান। তা ছাড়া বেদ, ব্রাহ্মণ, সূত্র, প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষার যুগে সঙ্গীতের রূপ কি রকমের ছিল তার পরিচয়ও আমরা শিক্ষাগুলির আলোচনা থেকে পেয়ে থাকি।

ভুলুয়ার রাজবংশ ও বারাহীদেবী

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাংলার ক্ষুদ্রতম জেলা নোয়াখালীর উপর আজ বিশ্বমানবের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। গান্ধীজী প্রমুখ মহাত্মাগণের পাদস্পর্শে ইহা অভিনব তীর্থে পরিণত হইয়াছে। নোয়াখালীর দেশাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগবতী বারাহীদেবীর বিচিত্র লীলা এবং পুনর্জাগরণ এতদ্দ্বারা সূচিত হওয়া অসম্ভব নহে। পলাশী-যুদ্ধের দ্বিশতবার্ষিকী আসন্নপ্রায়—২০০ বৎসর ইংরেজ অধিকারের একটি ফল আমরা বঙ্গদেশে উপলব্ধি করিতেছি যে, কলিকাতা মহানগরী মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া বাংলার জীবনীশক্তি ত্রিপুরা নোয়াখালী প্রভৃতি প্রত্যন্ত ভাগে লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছিল। বঙ্গজননীর এই কেন্দ্রীভূত বিকট হৃৎস্পন্দন মুমূর্ষু অবস্থা সূচনা করে কিনা ভাবিবার বিষয় বটে। নোয়াখালীর ঐতিহ্য এবং অতীত গৌরবের কথা শুনিতে বাংলার জনসাধারণ কোন কালেই আগ্রহান্বিত হয় নাই। ১৯০৭ সনে বেগমগঞ্জ মধ্য-ইংরেজী স্কুলের হেড্ মাষ্টার প্যারীমোহন সেন 'নোয়াখালীর ইতিহাস' নামক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার কোনও গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের একটি খণ্ডও রক্ষিত আছে কিনা সন্দেহ। নোয়াখালীর ইতিহাস সম্বন্ধে এ যাবৎ যে সকল ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে প্রায় সবগুলিই ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে সেন-মহাশয়ের গ্রন্থই স্থানীয় গবেষণামূলক এবং অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য। আজ হয়ত সহৃদয় বাঙালী পাঠকের চিত্তে নোয়াখালীর বিষয়ে কৌতূহল জাগিয়াছে। আমাদের সংগৃহীত উপকরণরাজির কিয়দংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া তাহা কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিতে প্রয়াস করিব।

নোয়াখালী জেলার বর্ত্তমান নাম ও কেন্দ্রস্থল অতীত গৌরবের সহিত সম্পর্করহিত ও আধুনিক। ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে "নোয়াখালী" নামক গ্রাম বা নগরের অস্তিত্ব ছিল না—ইহার অভিনবত্ব নাম-মধ্যেই প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লাভজনক নিমক মহাল সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের অনতিদূরবর্ত্তী এই নোয়াখালীতে এক জন বিশিষ্ট ইংরেজ সল্ট এজেন্ট রূপে অবস্থান করেন। ইহা ১৭৮৭ সনের কিছু পূর্ব্বের ঘটনা, পরের নহে। ত্রিপুরার কালেক্টার জন বুলার (John Buller) সাহেব (২৪।১১।১৭৮৫-১২।১।১৭৯২) J. Gross নামক ব্যক্তির ১।৩।১৭৮৭ তারিখে "Noahcollee" হইতে লিখিত যে পত্র পাইয়াছিলেন তাহা কুমিল্লা কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে। ইহাই নোয়াখালীর প্রাচীনতম উল্লেখ। ১৮২২ সনে পৃথক জেলা গঠনের সূত্রপাতকালে ইহার নাম ছিল "জিলা ভুলুয়া"— ১৮৬৮ সন হইতে বর্ত্তমান নাম চলিতেছে।

সমুদ্রমধ্যস্থ হাতীয়া-সন্দীপ বাদ দিয়া নোয়াখালীর বর্ত্তমান ভূ-ভাগ প্রায় সমগ্রই প্রাচীন ভুলুয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালের পূর্ব্বেই জুগীদিয়া ও দাঁদড়া ভুলুয়া হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। টোডরমল্লের বন্দোবস্তে ইহাদের রাজস্বের পরিমাণ ছিল— ভুলুয়া (১৩৩১৪৮০ দাম) জুগীদিয়া (৫১২০৮০ দাম) ও দাঁদড়া (৪২১৩৮০ দাম)। পরবর্ত্তী কালে ভুলুয়ার অংশদ্বারা আরও নূতন নূতন পরগণার সৃষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন ভুলুয়া রাজ্য ও সমাজের স্মৃতি এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র জাগিয়া আছে। এই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম—বারাহীদেবী। ভুলুয়ার শেষ স্বাধীন নরপতি লক্ষ্মণমাণিক্যের সভাকবি "রঘুনাথ কবিতার্কিক" রচিত 'কৌতুক-রত্নাকর' নামক উৎকৃষ্ট সংস্কৃত প্রহসনের প্রস্তাবনায় ভুলুয়া রাজ্যের রাজধানীর এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:

যত্র হি—তারাবিপ্রস্থবীথীবিচরণপটুভির্ভূষিতা ভূমিদেবৈ—

নিত্যং ভূদেবদেবার্চনরতমনুজা তারতীরঙ্গশালা।

বঙ্গালঙ্কারভূতাতিথিবিমলমহাসাদরাশেষলোকা

বারাহী যত্র দেবী বরমবনকরী ভুলুয়া রাজধানী ॥৫

অপিচ—দানৌর্ঘৈর্ব্বহুভির্মখৈঃ সুকৃতিনামাশংসনীয়া স্থিতেঃ

স্বর্লোকাদপি সা সমুজ্জলগুণা বিভ্রাজতে ভুলুয়া।

যস্যাং শূরকুলাম্বুধেঃ সমুদিতাঃ কল্পক্রমা ভূমাঃ

ক্ষৌণীন্দ্রাঃ বিচরন্তি সন্তি বিবুধাচার্য্যা দ্বিজেন্দ্রাঃ শতম্ ॥৬

অর্থাৎ—লক্ষণমাণিক্যের রাজধানী ভুলুয়া তারাবিশারদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদ্বারা ভূষিত ছিল, অধিবাসীরা দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ এবং সকলেই অতিথিসৎকারে উৎসুক ছিল। সরস্বতীর রঙ্গশালা এবং বঙ্গদেশের অলঙ্কারস্বরূপা এই নগরীর রক্ষাকর্ত্রী বরং বারাহীদেবী। স্বর্গ হইতেও সমুজ্জল গুণরাশি এখানে বিরাজমান—দানধর্ম্ম ও যাগযজ্ঞ দ্বারা ইহা পুণ্যবানের প্রশংসনীয় আবাসস্থল। শূরবংশীয় রাজারা জঙ্গম কল্পতরু রূপে এখানে বিচরণ করিতেছেন এবং শত শত বৃহস্পতিতুল্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এখানে বিদ্যমান।

অপর এক জন প্রাচীন অজ্ঞাতনামা কবি জন্মভূমির স্তব করিয়াছেন—তখনও শূররাজবংশের পতন হয় নাই। ত্রিপুরার এক পল্লীতে একটি পুঁথির পত্রে এই মনোহর শ্লোক আমরা পাইয়াছিলাম :—

বারাহী যত্র দেবী ত্রিভুবনভবনত্রাণ-সংহারকর্ত্রী

যত্রাস্তে বদ্ধমূলা ক্ষিতিপকুলমণেঃ শূরবংশস্য লক্ষ্মীঃ।

যত্র তারাবিশারদেবগুরুনিভাঃ পণ্ডিতাঃ সন্তি সন্তঃ

সা ভূমা বঙ্গভূমের্জগতি বিজয়তে ভুলুয়া জন্মভূমিঃ ॥

অর্থাৎ, ত্রিভুবনের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্রী বারাহী দেবী যেখানে বিরাজমান, নৃপকুলশ্রেষ্ঠ শূরবংশের রাজলক্ষ্মী যেখানে বদ্ধাবস্থায় আছেন, দেবগুরুতুল্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা যেখানে বাস করেন, বঙ্গদেশের অলঙ্কারস্বরূপা সেই জন্মভূমি ভুলুয়া আজ জগতে বিজয়লাভ করিতেছে। নোয়াখালীর কতিপয় প্রাচীন দানপত্রে ৺বিষ্ণুপ্রীতের পরিবর্ত্তে "বারাহীদেবী প্রীতে" লিখিত পাওয়া যায়। (কুমিল্লা কালেক্টরীর ১৯২৪ ও ৫১৭৮ সংখ্যক সনদের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য—প্রথমটির তারিখ ১৬।১২।১১৬৪)। ১২৫২ সনে ভুলুয়া জমিদারী নিলাম হইলে ভুলুয়ার শেষ স্বামীর জমিদার খিলপাড়া নিবাসী সাধক কবি জগচ্চন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী নিম্নোক্ত গানটি রচনা করেন :—

"করলে কি মা, ওগো তারা মা ভুলোর উপর ডাকাতি।
বারাহী নামেতে ভুলো, মহিমা জাগ্রত ছিল,
সে ভুলো নিলাম হ'ল, মা হ'লে বিশ্বাস-ঘাতী।
ভুলো অধিপতি যাঁরা, করিলি কৌপীন সারা,
বাসেবাড়ী করলি হারা, নিবালি বংশের বাতি।
দাস জগচ্চন্দ্র বলে, এই ছিল মা মোর কপালে,
পাথারে পড়িয়া ভাকি, দাঁড়াতে মা নাহি ক্ষিতি।"

প্রবন্ধ-লেখকের বাল্যগুরু খিলপাড়া নিবাসী সংস্কৃত গ্রন্থকার সুকবি ৺আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় (জন্ম ৪।৮।১২৬৬, মৃত্যু ৫।১১।১৩৪১) নোয়াখালী ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর সভাপতিরূপে মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন :—

সমুদ্রাম্বুখিতা লব্ধা যঃশ্রেয়সকরী শুভা।

দেশাধিষ্ঠাতৃদেবী যা বারাহীং তামুপাস্মহে ॥

বারাহীনগর, বারাহীপুর প্রভৃতি গ্রাম এবং বারাহীপ্রসাদ, বারাহীচরণ, বারাহীদাস প্রভৃতি নাম নোয়াখালীর বাহিরে কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। নোয়াখালীবাসীর চিত্তে এইরূপ ওতঃপ্রোত ভাবে অধিষ্ঠিত দেবী-প্রতিমার কথা বাঙালীর নিকট প্রায় অজ্ঞাত। "বাংলায় ভ্রমণে" প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ তীর্থাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু নোয়াখালীর ক্ষুদ্র বিবরণ মধ্যে বারাহী দেবীর নাম নাই। পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় দেবীবিগ্রহের যে আখ্যায়িকা সূচনা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

মিথিলানিবাসী শূরবংশীয় ক্ষত্রিয় "রাজা বিশ্বম্ভর" (অথবা বিশ্বাম্বর) চন্দ্রশেখর তীর্থদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে নাবিকদিগের দিগ্ভ্রমবশতঃ একটি চরে উপনীত হন। নিদ্রাবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, এক দেবী তাঁহাকে বলিতেছেন,—"আমি বারাহী দেবী তোমার অর্ণবযানের দক্ষিণপার্শ্বে আছি, তুমি আমাকে উত্তোলন করিয়া পূজা কর। তুমি যে এখন বিস্তীর্ণ সমুদ্র দেখিতেছ, ক্রমে ইহা ভূমিখণ্ড রূপে পরিণত হইবে। ইহাতে তুমি ও তোমার বংশধরগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত একাধিপত্যে রাজত্ব করিবে এবং অষ্টম পুরুষের রাজত্বকালে এই রাজ্যের সীমা সঙ্কুচিত হইবে ; ১৫শ পুরুষ পর্য্যন্ত ইহার খণ্ডাংশে রাজত্ব করিলে, তোমার বংশধরগণ রাজ্যহীন হইবে।" (নোয়াখালীর ইতিহাস পৃ. ১৫) প্রবাদ অনুসারে ৬১০ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ বারাহীদেবীকে উত্তোলন করিয়া কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন আকাশে দিগ্ভ্রমবশতঃ "পূর্ব্বমুখী" করিয়া স্থাপনকরতঃ ছাগাদি বলিদানে দেবীর অর্চনা সম্পন্ন হয়। সূর্য্যোদয় হইলে সকলে বলিয়া উঠেন "ভুল হুয়া"—ইহাতেই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম হইল "ভুলুয়া"॥ বিশ্বম্ভরের সঙ্গে ১৪৯টি নৌকা ২০০ সৈন্য এবং পরিজনবর্গ ছিলেন। বর্ত্তমান সোনাইমুড়ী রেল ষ্টেশনের পশ্চিমে "বগাদিয়া" নামক গ্রামে দেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উল্লিখিত অদ্ভুত প্রবাদ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা দুরূহ। আমরা মূলতত্ত্বগুলি নিষ্কাশন করিতে চেষ্টা করিব। বর্ত্তমানে যে কতিপয় শূরবংশের শাখা বিদ্যমান আছে তাঁহারা বাৎস্যগোত্র—এক সময়ে ইঁহারা ক্ষত্রিয়াচারী ছিলেন তাহারও প্রমাণ বিদ্যমান আছে। লক্ষণমাণিক্যের পিতৃব্যপুত্র অনন্তমাণিক্যের বংশধারা অধুনা ত্রিপুরা জেলার কাদ্‌বা পরগণার জীবনপুর গ্রামে বিদ্যমান আছে। অনন্তমাণিক্যের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র চন্দ্রনারায়ণের গলায় সোনার ত্রিবৃতী উপবীত দেখিয়া ব্রাহ্মণভ্রমে অনেক ব্রাহ্মণ

নমস্কার করিয়াছিল। চন্দ্রনারায়ণ সেই ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীত দান করেন এবং তদবধি আর কেহ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না। এই ঘটনাটি একটি প্রাচীন প্রবাদবাক্যে প্রচারিত হইয়াছিল—"ব্রাহ্মণে প্রণাম কৈল, ত্রিদণ্ডী দান হৈল।" বিশ্বম্ভরের গুরু ও পুরোহিতবংশ মিথিলা হইতে আগত বলিয়া চিরকাল প্রসিদ্ধি আছে, যদিও ইঁহারা রাঢ়ীয় সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। শূরবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে চির-প্রচলিত মৈথিল প্রবাদটিকে সম্প্রতি উড়াইয়া দেওয়ার অদ্ভুত চেষ্টা হইতেছে। শূরবংশের নামমালা যখন প্রথম সংগৃহীত হয়, বিশ্বম্ভরের পরিচয়স্থলে "আদিশূরের নবম পুত্র" এইরূপ লেখা পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এই আদিশূরের সহিত বঙ্গাধিপতি বিখ্যাত রাজা আদিশূরের কোনই সম্পর্ক নাই। কিন্তু কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি অযথা কৃত্রিমতার আশ্রয় লইয়া বিশ্বম্ভরকে রাঢ়াগত প্রতিপন্ন করিতে আদিশূর হইতে বিশ্বম্ভর পর্য্যন্ত ১৫শ পুরুষের নাম ও তারিখ আবিষ্কার করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন !!! (রাজমালা, তৃতীয় লহর, মধ্যমণি, ১১৯-২১ পৃ.) আদিশূরের প্রামাণিকতা বিচারে এইরূপ উৎকৃষ্ট মুদ্রিত নিদর্শন কেহ আলোচনা করেন নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। বস্তুতঃ ভুলুয়ার সামাজিক ইতিহাস যাঁহারা ঘুণাক্ষরেও অবগত নহেন তাঁহারাই এইরূপ কৃত্রিম বস্তুর আবিষ্কর্ত্তা।১

রাজা বিশ্বম্ভর কর্তৃক ভুলুয়া রাজ্য ও বারাহী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার তারিখটি প্রমাণসিদ্ধ নহে। বিশ্বম্ভরের অধস্তন অষ্টম পুরুষ লক্ষ্মণমাণিক্য সম্রাট্ শাহজাহানের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। সুতরাং বিশ্বম্ভরের অভ্যুদয়কাল কিছুতেই ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্বে যাইবে না। প্রচলিত তারিখটির মধ্যে একটি বিলুপ্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গাব্দ প্রচলিত হয়। তৎপূর্ব্বে বাংলার বহুস্থলে অপর একটি দেশীয় অব্দ প্রচলিত ছিল—পরবর্ত্তীকালে ইহা "পরগণাতি সন" নামে প্রচারলাভ করে। প্রাচীনকাল হইতে ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ভুলুয়া অঞ্চলেও ঐ সন প্রচলিত ছিল। আমরা ভুলুয়ার শত শত প্রাচীন দলিল ও পুথিতে উক্ত সনের উল্লেখ দেখিয়াছি। ইহা "কার্ত্তিকাদি" এবং ১২০১-৩ সন হইতে আরব্ধ। কারণ, বহু দলিলের সঙ্গে বাংলা সনও লিখিত আছে। যথা, কুমিল্লার সনদ রেজিষ্টারের ১৪ সং সনদের তারিখ "১১৬২ বাঙ্গালা সন ৫৫৪ পরগণাতি মাহ ১৫ কার্ত্তিক।" এইরূপ ১১৮৬=৫৭৭ ২৫ জ্যৈষ্ঠ (২৪৫ সং সনদ), ১১৪২=৫৩৪ ১৫ আষাঢ় (১০৮২ সং), ১১৪১=৫৩৮ ১৫ বৈশাখ (৩০৭৪ সং) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। কালক্রমে এই পরগণাতি সনই ভুলুয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভ্রান্ত মতের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত একটি বাংলা পুথির লিপিকাল ১৬১১ শকাব্দা ও "পরগণে ভুলুয়া সন ৪৮৭" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। (I.H.Q., XIV. pp. 740-1। দ্রষ্টব্য) ভুলুয়া ভিন্ন ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগণায় ও ঢাকা, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে এই সনের প্রচার প্রমাণিত হইয়াছে।

বিশ্বম্ভর কর্তৃক নবরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রবাদ লক্ষ্মণমাণিক্য রচিত 'বিখ্যাতবিজয়' নাটকের প্রস্তাবনায় ইঙ্গিতে সমর্থিত হইয়াছে :

যস্যোত্রপ্রথমেন কেনচিদহো আকল্পমত্যাদৃতৈ-
র্বদ্ধা স্বীয়গুণৈঃ কুলক্ষিতিভুজাং পদ্মালয়া মন্দিরে। (১০ শ্লোক)

অর্থাৎ, লক্ষ্মণমাণিক্যের আদিপুরুষ প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী গুণরাশিদ্বারা কুলরাজগণের রাজ্যলক্ষ্মীকে স্বীয় মন্দিরে অচলভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৺আনন্দ তর্কবাগীশ মহাশয় উক্ত নাটকের (প্রথম দুই অঙ্কের) টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'কেনচিৎ' পদের ব্যাখ্যা "বিশ্বম্ভররায়নামধেয়েন রাজ্ঞা" লিখিত আছে। ১৪শ শতাব্দীতে মিথিলা হইতে আসিয়া বিশ্বম্ভর ভুলুয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণযোগ্য। এই দেশান্তর-গমনের কারণ আকস্মিক তীর্থদর্শন না হইয়া সুপ্রসিদ্ধ মহম্মদ্ তোঘলক কর্ত্তৃক মিথিলাবিজয়ই অধিক সম্ভাবিত। তাহা হইলে ১৪শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভে ১৩২৫-৩৫ সনে ভুলুয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠা অনুমান করা যায়। সম্ভবতঃ সোনারগাঁর নবাব ফকরুদ্দীন (১৩৩৯-৪৯ সন) কর্ত্তৃক চাটিগ্রাম বিজয়ের পূর্ব্বেই বিশ্বম্ভর আসিয়াছিলেন। শিহাবুদ্দীন তালীশের বর্ণনানুসারে (*J.A.S.B.*, 1907, p. 421) ফকরুদ্দীন চাটিগ্রাম অভিযানকালে চাঁদপুর হইতে চাটিগাঁ পর্য্যন্ত উচ্চ রাজপথ ('আল') নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নোয়াখালীতে এই প্রাচীন রাজবর্ত্মের স্মৃতি "ফকদির্মের হদ্" নামে এখনও বাঁচিয়া আছে।

১৪শ শতাব্দীতে নোয়াখালীর উত্তরাংশ সমুদ্রের চর ছিল না। সুতরাং বারাহী মূর্ত্তির স্বপ্নাদেশকাহিনী এবং পূর্ব্বমুখী হইয়া অবস্থানবার্ত্তা অমূলক বলিয়া মনে হয়। বারাহী দেবী মূর্ত্তিতত্ত্ববিদ্যার নিকষে বৌদ্ধ "মারীচী" মূর্ত্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বৌদ্ধ দেবতার হিন্দু দেবতারূপে এই বিচিত্র পরিণতি-মধ্যে এবং প্রাঙ্মুখত্ব ও বিপরীত ছাগবলিদানের মধ্যে মূলতঃ একটি বৌদ্ধ পরিবারের প্রাচীন বৌদ্ধতন্ত্রসম্মত আচার প্রচ্ছন্নভাবে আছে কিনা গবেষণাযোগ্য। বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত ধ্যানে বারাহীর অর্চ্চনা হয় :—

বারাহীং চাষ্টভুজাং দেবীং ত্রিনেত্রাং বরদায়িকাং।
পাশাঙ্কুশধরুর্ব্বাণং মধ্যেশ্রীবদনাম্বুজাম্ ॥

১। বিগত ১০০ বৎসর মধ্যে যত কৃত্রিম বংশলতা ও কুলপঞ্জী রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে তাহার শতাংশও প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি মধ্যে পাওয়া যায় না। যাঁহারা বর্ত্তমানে কুলপঞ্জী হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা কেহই ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মুদ্রিত গ্রন্থমাত্র অবলম্বন করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইতেছেন।

দক্ষকর্ণে মুখং দুর্গা বামকর্ণে বরাহকং।
বরাহবাহিনীমাদ্যাং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে॥

(আনন্দনাথ রায় : বারভূঞা, পৃ. ১৫৫)

দুর্গার বীজমন্ত্র এবং আবরণ দেবতা মহারুদ্র ভৈরব, দুর্গা, বরাহগণ, উমা, মহেশ্বর এবং সবাহন দেবতাবৃন্দ। আমরা বারাহী দেবীর দর্শনলাভে সমর্থ হই নাই। যাঁহারা দর্শনলাভ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন মূর্ত্তিটির রাজশাহী মিউজিয়মে রক্ষিত অপূর্ব্ব মনোহর মূর্ত্তির সহিত "অবিকল সাদৃশ্য" আছে (শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, মধ্যমণি, পৃ. ১৩৭)। বাঙ্গলা দেশে যতগুলি মারীচী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে রাজশাহীর ঐ মূর্ত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর—উহা বিক্রমপুর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রে উক্ত মূর্ত্তির উৎকৃষ্ট ছবি মুদ্রিত হইয়াছে (Catalogue of Archaeological Relics, V. R. S., p. 6. ও ছবি দ্রষ্টব্য)। 'সাধনমালা' গ্রন্থোক্ত ধ্যানের সহিত উক্ত মূর্ত্তির আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে :—

সূর্য্যং পীত বর্ণাকারং ধ্যাত্বা তদ্বিনির্গতরশ্মিনিবহৈরাকাশে সমাকৃষ্য ভগবতীমগ্রতঃ স্থাপয়েৎ। গৌরীং ত্রিমুখীং ত্রিনেত্রামষ্টভুজাং রক্তদক্ষিণমুখীং বরাহমুখ শররুচিবামদক্ষিণকরাম্ অশোক পল্লবচাপসূত্রতর্জ্জনীধরবামচতুষ্করাং বৈরোচনমুকুটিনীং নানাভরণবতীং চৈত্যগর্ভস্থিতাং রক্তাম্বরকঞ্চুক্যুত্তরীয়াং সপ্ত শূকর রথারূঢ়াং প্রত্যালীঢ়পদাং এর্কারজবায়ুমণ্ডলে হংকারজচন্দ্রসূর্য্যাগ্রাহিমহোগ্ররাহুসমধিষ্ঠিতরথমধ্যাং দেবচতুষ্টয়পরিবৃতাং... বর্ত্তালীং...বদালীং...বরালীং...বরাহমুখীং...ধ্যাত্বা। (সাধনমালা Vol, 1, p. 303)। অনভিজ্ঞ পুরোহিত এবম্বিধ মূর্ত্তি দেখিয়া যে ধ্যান ও আবরণ দেবতা কল্পনা করিয়াছেন তাহা অদ্ভুত। ভুলুয়ার মারীচী ওরফে বারাহীমূর্ত্তি উজ্জ্বল কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত, ইহার ঊর্দ্ধভাগে কিছু খণ্ডিত এবং ভিন্ন জাতীয় একটি পৃথক্ প্রস্তরখণ্ড পাদপীঠরূপে ব্যবহৃত। ভুলুয়ার এই "জাগ্রত" দেবীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত আছে।

শূররাজগণের রাজধানী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বারাহী দেবীরও স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বিশ্বম্ভরের রাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিবার উপায় নাই। ভুলুয়া পরগণা ছাড়া ভুলুয়া নামে একটি নগরীও বিদ্যমান ছিল, কবিতার্কিকের শ্লোকে সেস্থলে রাজধানী থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে নোয়াখালী শহরের পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে প্রাচীন ভুলুয়া নগরী একটি সাতিশয় গ্রামে পরিণত হইয়াছে—জমীদারের একটি কাছারিই ইহার একমাত্র গৌরবচিহ্ন। এই গ্রামের নামমধ্যেই ইহার প্রাচীনতার প্রচ্ছন্ন চিহ্ন বর্ত্তমান এবং অনুমান হয় বিশ্বম্ভরের রাজধানীও এখানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশ্বম্ভরের চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 'গণপতি' রাজা হইয়াছিলেন। তৎপুত্র 'শূরানন্দ খাঁ'। এই খাঁ উপাধি দ্বারা গৌড়ের পাঠান রাজগণের নিকট ইঁহার আনুগত্য সূচিত হয়। রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দীনই তাঁহার পোষক হওয়া সম্ভব—চাটগাঁ হইতে জালালুদ্দীনের বহু মুদ্রা প্রচারিত হইয়াছিল। শূরানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'শ্রীরাম খাঁ'। তাঁহার নামানুসারে অধুনাখ্যাত 'শ্রীরামপুর' গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। তৎপুত্র 'কবিচন্দ্র খাঁ'—ইঁহার রাজত্বকালে বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণ ভুলুয়ায় সমাগত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'রাজবল্লভ রায়'। ইনি হীনবল ছিলেন এবং ইঁহার সময়ই ত্রিপুরাধিপতি দেবমাণিক্য (১৫২৬-৩২)২ সর্ব্বপ্রথম ভুলুয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। দিগ্বিজয়ী ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫২৬) যে সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ভুলুয়ার নাম নাই। দেবমাণিক্য সম্বন্ধে প্রাচীন হস্তলিখিত রাজমালায় আছে :

শ্রীদেবমাণিক্য রাজা বড় যুভাজন।
ভুলুয়া জিনিয়া করে সমুদ্রে গমন। (২৩খ পত্র)

রাজবল্লভের দুই পুত্র 'উদয়মাণিক্য' ও 'গন্ধর্ব্বমাণিক্য'। ইঁহাদের নাম প্রচলিত মুদ্রিত বংশলতায় বাদ পড়িয়াছে। আমাদের সংগৃহীত দুইটিমাত্র বংশলতায় ইঁহাদের নাম আছে —একটিতে 'গন্ধর্ব্ব' স্থানে 'পঙ্গত' (Pangat), অপরটিতে 'গন্ধব্য' লিখিত আছে। উদয়মাণিক্যের অতি প্রামাণিক বিবরণ ত্রিপুরার রাজমালায় লিপিবদ্ধ আছে। ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল 'দুর্লভনারায়ণ' এবং তিনি বিখ্যাত ত্রিপুরাধিপতি বিজয়মাণিক্যের (১৫৩২-৬৫) অধীনস্থ জমিদার ছিলেন। বিজয়মাণিক্যের সেনাপতি গোপীপ্রসাদনারায়ণ বলপূর্ব্বক ত্রিপুরসিংহাসন অধিকার করিয়া উদয়মাণিক্য নামে (১৫৬৭-৭৩) রাজত্ব করেন। তৎকালে উক্ত দুর্লভনারায়ণ হঠতাসহকারে ত্রিপুরার অধীনতা পরিহার করিয়া স্বয়ং 'উদয়মাণিক্য' নাম গ্রহণপূর্ব্বক বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ত্রিপুরাধিপতি অমরমাণিক্য (১৫৭৭-৮৬) তাঁহাকে "মাণিক্য" উপাধি বর্জ্জন করিতে আদেশ করেন এবং অস্বীকৃত হইলে ১৫০০ শকে ভুলুয়া আক্রমণ করেন। উদয়মাণিক্য পরাজিত হইয়া বাকলায় পলায়ন করিলে বিশ্বাসঘাতক কন্দর্প রায় তাঁহাকে বধ করেন।

২। নূতন মুদ্রাদির আবিষ্কার-ফলে ত্রিপুর-রাজগণের রাজত্বকাল এখন নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হইয়াছে এবং মুদ্রিত রাজমালার কালনির্ণয় প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইয়াছে। দেবমাণিক্যের ১৪৪৮ শকের মুদ্রা ঢাকা মিউজিয়মে আছে। বিজয়মাণিক্যের ১৪৫৪ শকের দুইটি মুদ্রা মালদহে রক্ষিত আছে—ইহাতে রাণীর নাম নাই। অনন্তমাণিক্যের ১৪৮৭ শকের মুদ্রা এবং উদয়মাণিক্যের ১৪৮৯ শকের মুদ্রা মালদহে আবিষ্কৃত হইয়া বর্ত্তমানে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট আছে। উদয়-পুত্র জয়মাণিক্যের ১৪৯৫ শকের মুদ্রা ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মহোদয়ের নিকট আছে। মালদহের মুদ্রা দুইটি ছাড়া সব মুদ্রাই আমরা স্বয়ং পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি।

ত্রিপুরা হইতে যে 'রাজমালা' বৃহৎ ৩ খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনাদিসহ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মূলাংশ উক্তির দুর্গামণি সংশোধিত প্রাচীন রাজমালার আধুনিক সংস্করণ। আমরা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি উক্তিরপ্রবরের ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাববশতঃ তাঁহার তথাকথিত সংশোধন প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ হইয়াছে। রাজমালার তৃতীয় লহরে (পৃ. ১১-১৩) ভুলুয়া-বিজয়ের বিবরণ এবং 'মধ্যমণি'তে (পৃ. ১৩৮-৪৮) তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রমাদপূর্ণ এবং সর্ব্বথা সংশোধনীয়। আমরা হস্তলিখিত প্রাচীন রাজমালার 'ভুলয়া অধ্যায়' হইতে প্রয়োজনীয় অংশ অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি,—

"দুল্লভনারায়ণ শূর জাতি ভুলয়া জমীদার।
নৃপমাঝে ছিরে সে যে রাজব্যবহার॥
পুরুষে পুরুষে তারা ত্রিপুরেত মিলে।
রাজবংশ নহে উদয় দেবেত না মিলে॥
উদয়মাণিক্য হৈল রাজবংশ বারি।
এহি হেতু না যাইল অহঙ্কার করি॥
আপনে ধরিল নাম উদয়মাণিক্য।
অনন্তমাণিক্য তুমি আমি সমকক্ষ॥
হেন শুনি উদয়মাণিক্য ক্রোধে জ্বলে।
করিতে না পারে কিছু বুঝে গৌড় বলে॥
কতবর্ষে অমরমাণিক্য রাজা হৈল।
মাণিক্য না ধরিতে তাহাকে লিখিল॥
না মানিল আজ্ঞা সে যে মত্তুবা হয়ে।
তুমি রাজা না হইতে মোর নাম হয়ে॥
তুমি হ না হও রাজা ধয়ে বড় নয়ে।
বড়ুয়া হইছ রাজা কেনে অতিশয়ে॥
বিজয়মাণিক্য রাজার জমিদার আমি।
বড়রা আছিলা তান আপনেহ তুমি॥
* * *
উদয়মাণিক্য তবে বাঙ্গেলাত গেল।
কন্দর্প রায় জমিদারে তাহারে মারিল॥"

ভুলুয়া রাজবংশে এই উদয়মাণিক্যই (দুর্ল্লভমাণিক্য এ স্থলে ভ্রান্ত পাঠ) সর্ব্বপ্রথম গৌরবাত্মক 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করিয়া বংশমর্য্যাদা বাড়াইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন সন্দেহ নাই, নতুবা পরাক্রান্ত ত্রিপুরাধিপতিদ্বয়ের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিতে সাহসী হইতেন না। রাজমালার উক্তি অনুসারে ত্রিপুরাধিপতি বিশ্বাসঘাতক উদয়মাণিক্যের সহিত সংঘর্ষকালে ভুলুয়ার উদয়মাণিক্য গৌড়াধিপতির সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। এই গৌড়াধিপতি নিঃসন্দেহ সুলেমান কররাণি।

উদয়মাণিক্যের শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা গন্ধর্ব্বমাণিক্য ১৫০০ শকে (১৫৭৮-৯ সনে) ভুলুয়ার রাজা হন। বলা বাহুল্য, তিনি অমরমাণিক্যের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 'অমরসাগর' খননকালে ভুলুয়া হইতে যে ১০০০ কাটী প্রেরিত হইয়াছিল তাহা গন্ধর্ব্বমাণিক্যের রাজত্বকালীন ঘটনা। যদিও রাজমালার সাগর খনন বৃত্তান্ত ভুলুয়া-জয়ের পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি অমরমাণিক্যের 'শ্রীহট্ট-বিজয়' মুদ্রার তারিখ ১৫০৩ শকাব্দ হইতে প্রমাণ হয় সাগর খনন ভুলুয়া বিজয়ের পরের ঘটনা, পূর্ব্বের নহে। পরবর্ত্তী ত্রিপুরাধিপতি যশোমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৬০০-২৩) গন্ধর্ব্বমাণিক্য বিদ্রোহী হইয়াছিলেন (রাজমালা, ৩য় লহর, পৃ. ৫৮)। রাজমালার গ্রন্থকার তাঁহার মাণিক্য উপাধি অঙ্গীকার না করিয়া গন্ধর্ব্বনারায়ণ নাম লিখিয়াছেন। রাজমালা-সম্পাদক মহাশয় গন্ধর্ব্বমাণিক্যের অস্তিত্ব অবগত না হইয়া নামটি ভুল অনুমান করিয়াছেন (ঐ পৃ. ৩৪৭)। ভুলুয়ার গন্ধর্ব্বপুর, গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতি গ্রামের নাম তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। তিনি কিরূপ প্রতাপশালী ছিলেন পূর্ব্বোল্লিখিত 'কৌতুকরত্নাকর' প্রহসনে তাহার কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আছে।

"জনকস্ত যস্ত—আসীন্মনোজাধিকরম্যমূর্ত্তিঃ
শ্বেতাতপত্রীকৃতচারুকীর্ত্তিঃ।
শূরাম্বয়াম্ভোনিধিপূর্ণচন্দ্রো
গন্ধর্ব্বমাণিক্যমহীমহেন্দ্রঃ॥৭

অপি চ, আভূমণ্ডলমা সুরেন্দ্রসদনাদা সপ্তপাতালকাৎ
আসপ্তার্ণবমা ধরাধরকুলাদা পদ্মসন্মালয়াৎ।
আবৈকুণ্ঠমজ্স্র যস্ত সমরপ্রস্থানলীলাবিধৌ
ভেরীতাড়িত-বৃংহিতোৎকৃতি-ধনুষ্টঙ্কার-
বাজিস্বনৈঃ॥৮

অপি চ, গজেন্দ্রজীমূতমদাম্বুবৃষ্টিভির্মহীপতের্যস্ত
পুরস্ত সন্নিধৌ।
সিতাভ্রপূরেপি বিপক্ষভূভুজাং প্রতাপবহ্নিঃ
প্রশমং সমাগতঃ॥৯

অপি চ, ভ্রমতি যুধি করীন্দ্রে যস্য সংরূঢ়পক্ষঃ,
ক্ষিতিধর ইতি মোহাদগ্রহীদ্বজ্রমাত্ত।
তদনু দশনবীক্ষাপাত্তভাদৃগ্ভ্রমোহয়ং,
সুরসদসি সলজ্জো বজ্রপাণির্বভূব॥১০"

(সারার্থ, লক্ষ্মণমাণিক্যের পিতা রাজা গন্ধর্ব্বমাণিক্য কামদেব হইতেও সুন্দর ও কীর্ত্তিমান্ ছিলেন। যুদ্ধযাত্রাকালে ভেরী, হস্তী, ধনু ও অশ্বের বিপুল ধ্বনি ত্রিভুবনাদি ব্যাপ্ত করিত। তাঁহার গজসৈন্যের মদবারিবর্ষণে শত্রুরাজাদের প্রতাপানল নির্ব্বাপিত হইত। তাঁহার যুদ্ধহস্তীকে দেখিয়া স্বয়ং ইন্দ্র পক্ষধারী পর্ব্বতভ্রমে বজ্র ধারণ করেন এবং দাঁত দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হন।)

এই বর্ণনা হইতে জানা যায় তাঁহার গজসৈন্য ছিল এবং তিনি স্বয়ং যুদ্ধকালে পর্ব্বতপ্রমাণ একটি বিপুলকায় হস্তীতে আরোহণ করিতেন। কবি এখানে তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত গুণেরই বর্ণনা করিয়াছেন—লক্ষ্মণমাণিক্যের ন্যায় তাঁহার বিদ্যা

কিম্বা বিদ্যোৎপ্রিয়তার উল্লেখ মাত্র করেন নাই। ঈশা খাঁর তাঁহার জীবন প্রধানতঃ যুদ্ধবিগ্রহেই কাটিয়াছিল। বিগত ১৫০ বৎসর যাবৎ তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণমাণিক্যকেই সকলে বার-ভূঞার অন্যতম বলিয়া ধরিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণ হইতেছে যে, গন্ধর্ব্বমাণিক্যই বারভূঞার অন্যতম এবং তিনিই চাঁদ-কেদার রায়, কন্দর্প রায়, ঈশা খাঁ প্রভৃতির সমকালীন এবং বীর্য্যাদিতে সমকক্ষ। ১২০২ সনে তৎপ্রদত্ত একটি তাম্রশাসন কুমিল্লায় আনীত হইয়াছিল। তত্রত্য কালেক্টরীতে ইহার একটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে—কিন্তু পাঠোদ্ধারকার্য্য এক জন কেরাণীদ্বারা সম্পন্ন হওয়ায় প্রতি-লিপিটি অত্যন্ত অশুদ্ধ। আমরা যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া "তাম্রপত্রের সনদের নকলটি" উদ্ধৃত করিলাম (১৯১২ সংখ্যক সনদ):—

শ্রীকৃষ্ণচরণস্মরণম্

শ্রীশ্রীযুতগন্ধর্ব্বমাণিক্যদেবস্য শ্রীলশ্রীমন্তরায়স্য

স্বস্তি। শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজচঞ্চরীকেন ধীমতা।

লীলাপ্রহিতকোদণ্ডকাণ্ডৈঃ খণ্ডিতবৈরিণা॥

গোবিন্দচরণদ্বন্দ্বপরায়ণপরাত্মনা।

কলাভিরবতীর্ণেন মহাপারিষদস্য চ॥

শ্রীশ্রীগন্ধর্ব্বমাণিক্য-মহীপতিমহাত্মনা।

দত্তা বিভির্দ্বিজাতিভ্যঃ পিতুঃ স্বর্গাভিবৃদ্ধয়ে॥

শ্রীরামচন্দ্রধীরায় শ্রীরামানন্দশর্ম্মণে।

হৃদয়ানন্দবিপ্রায় বিদুষে ব্রহ্মচারিণে॥

কাচীহাটা-নজিরপুরয়োর্মিশ্রনীলাম্বরস্য,

যাবদ্ভূমির্ভবতি রঘুরাকীয়বাটীসমেতা।

তস্মিন্ বাটী লবণমহলে বিপ্রদুর্গাবরস্য,

মিশ্রাযোগকতু পরিগতৈঃ পঞ্চ ঠৈখার্দ্ধয়েসাং॥

অত্র গৃহপূর্ণগ্রামপঞ্চকাদ্ আয়পোষাঃ সমুপেক্ষিতা ইতি।

যথেষ্টং পুত্র-পৌত্রাদিক্রমেণোপভুজ্যতাং॥

যদা যদা যস্য ভবেদ্ধরিত্রী, তদা তদা তৎফলমেব তস্য।

অতো দ্বি-জানাং (চ) ময়া প্রদত্তা,

বিভির্নরেন্দ্রৈঃ পরিপালনীয়া॥

অথ চ, স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা ব্রহ্মবিত্তিং হরেত্তু যঃ।

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥

ইতি ৎ ৪০৩ তারিখ...

তাম্রশাসনের তারিখ '৪০৩' পূর্ব্বলিখিত পরগণাতি সন বটে। কারণ, দানভাজন ব্যক্তিগণের ৪ জন বৃদ্ধপ্রপৌত্র 'রামরত্ন' প্রভৃতি উপভুক্ত জমির যে বিবরণ তৎকালে প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ পারস্ত ভাষায় লিখিত দপ্তরে কুমিল্লা কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে। দানপত্রের তারিখ তন্মধ্যে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে "সন ৪০৩ পরগণাতি।" দান-গ্রহীতাদের পুরা নাম রামচন্দ্র পঞ্চানন, রামানন্দ চক্রবর্ত্তী ও হৃদয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য। ভূমির পরিমাণ মোট ৩৸৶ (তিন দ্রোণ চৌদ্দ কাণি) এবং গ্রামসংখ্যা ছয়—কাজিহাটা, জয়নারায়ণপুর, কৃষ্ণরামপুর, রামচন্দ্রপুর, রঘুদেবপুর ও মহবৎপুর। এই মূল্যবান্ তাম্রলিপিদ্বারা প্রমাণ হয় ১৬০৫ সনেও গন্ধর্ব্বমাণিক্য জীবিত ছিলেন। সুতরাং তিনি দুর্দ্দান্ত মঘনরপতি সিকান্দর সাহা (১৫৭১-৯৩) ও সলীম সাহার (১৫৯৩-১৬১২) সমকালীন এবং তাহাদের সহিত সংঘর্ষে তিনি ভুলুয়াকে অনেকাংশে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। নতুবা মঘ-ফিরিঙ্গির অত্যাচারলীলার সম্মুখে অবস্থিত এই রাজ্য প্রথমেই সুন্দরবনের দশা প্রাপ্ত হইত।

১৬০৫-১০ মধ্যে গন্ধর্ব্বমাণিক্যের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুবিখ্যাত লক্ষণমাণিক্য ভুলুয়ার রাজা হন। বঙ্গের নিভৃত প্রান্তে বসিয়া তিনি যে একটি সারস্বত কেন্দ্র গঠন করিয়াছিলেন তাহার বিচিত্র ইতিহাস চতুর্দ্দিকে মঘ-ফিরিঙ্গির তাণ্ডবলীলার প্রত্যাদেশরূপে বাঙালীর একটি গৌরবময় কীর্ত্তি এবং পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচনা যোগ্য। লক্ষণমাণিক্য তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ পিতৃব্যপুত্র অমিতবলশালী অনন্তমাণিক্যের সহিত বিগ্রহ করেন এবং অনন্তমাণিক্য মঘ-রাজা সলীম সাহার সাহায্যে লক্ষ্মণ-মাণিক্যকে রাজ্যচ্যুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 'বহারিস্তান' গ্রন্থানুসারে অনন্তমাণিক্য ১৬১১ সনে ইস্‌লাম খাঁর মোগল-বাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া মঘ-রাজ্যে পলায়ন করেন। অতঃপর অনন্ত কিম্বা তাঁহার কোন বংশধর ভুলুয়ার রাজ্যাংশ কোনকালে প্রাপ্ত হন নাই। লক্ষণমাণিক্য বারভূঞার অন্যান্য বংশধরদের ন্যায় মোগল শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিয়া দীর্ঘ-কাল জীবিত ছিলেন। তৎপ্রদত্ত কতিপয় দানপত্রের প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি—একটির তারিখ '১০ মাঘ ৪৩৫ সন' অর্থাৎ ১৬৩৭ খৃঃ, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালীন। এই দানপত্রে 'পরগণে ভুলুয়া তপে চৌদ্দহাজারী'র অন্তর্গত স্বকীয় 'জায়গীরে'র উল্লেখ আছে। ভুলুয়ার চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ অনুসারে বিশ্বাসঘাতক বাকলার জমীদার রামচন্দ্রের হস্তে লক্ষণ-মাণিক্যের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা প্রায় ১৬৪০ সনে সংঘটিত হয়। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কি পরে ভুলুয়া পরগণা তিন অংশে বিভক্ত হইয়া শূরবংশীয় 'কবি-কীর্ত্তিনারায়ণ' (দত্তপাড়া) 'শ্রীরাম' (মাইজদী) এবং সিংহবংশীয় 'কবিরত্ন-নারায়ণ' (খিলপাড়া) চৌধুরীত্রয়ের সহিত নূতন বন্দোবস্ত হয়। মূল রাজবংশ 'তরপ গোপালনগর' নামক জায়গীর মাত্র অধিকার করেন। লক্ষণমাণিক্যের ৪ পুত্র—ধন্যমাণিক্য (নিঃসন্তান, একটি দানপত্রে ধর্ম্মমাণিক্য লিখিত আছে), চন্দ্র-মাণিক্য (নিঃসন্তান), বিজয়মাণিক্য ও অমরমাণিক্য। অমর-মাণিক্যের বহু দানপত্র দ্বারা ১৬৯৬-১৭০৫ মধ্যে তাঁহার অভ্যুদয়কাল নির্ণীত হয়। তৎপূর্ব্বে বিজয়মাণিক্য ও ধন্য-মাণিক্য 'রাজা' ছিলেন। অমরমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্য ও বিজয়মাণিক্যের পুত্র রুদ্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর ৫১৭ সনের পূর্ব্ব হইতে অন্ততঃ ৫৩৪ সন পর্য্যন্ত রুদ্রমাণিক্যের পত্নী 'রাণী

পদীমুখী' স্বকীয় গুণরাশিদ্বারা ভুলুয়া সমাজে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনিই ৺কাশীধামে গমনকালে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বারাহী মূর্ত্তিকে রাজধানী ভুলুয়ার সন্নিহিত 'কল্যাণপুর' রাজগৃহ হইতে সরাইয়া বর্ত্তমান 'আমিশাপাড়া' গ্রামে স্বকীয় পুরোহিত রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তীর গৃহে নূতন দীর্ঘিকা ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং কিঞ্চিদধিক ২০০ বৎসর যাবৎ বারাহীদেবী বর্ত্তমান মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন। ভুলুয়ার তদানীন্তন সকল জমীদার মিলিয়া উক্ত রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে ৺বারাহীদেবীর পূজার্থে ৭ দ্রোণ ভূমি 'চরমটুয়া' গ্রামে দান করিয়াছিলেন—দানপত্রের তারিখ ১৭ বৈশাখ ১১৭০ (২৬০২ সংখ্যক সনদ দ্রষ্টব্য)। তৎপূর্ব্বে খিলপাড়ার চৌধুরীগণ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১১৬৯ সনে 'চরমনসা' নামক স্থানে উক্ত চক্রবর্ত্তীকে ৩ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ভূসম্পত্তি এখন সমুদ্রগর্ভে। রাধাকান্তের বংশের দৌহিত্রবংশ এখন বারাহীদেবীর মন্দিরাদির স্বত্বাধিকারী।

শিক্ষক

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

১

সতীশ দত্তের মনটা আজ মোটেই ভাল ছিল না। সকাল বেলা তিনি রসিক সাহার কাছে অপমানিত হইয়াছেন, গত দুই মাস ধরিয়া বিল আসিলে টাকা দিবেন বলিয়া বলিয়া প্রায় বিশ-পঁচিশ টাকা বাকী লইয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বিলের টাকাও আসে নাই—তাহার ধারও পরিশোধ করা হয় নাই। তা ছাড়া আজ পুনরায় রসিকের নিকট কিছু চাল আর তেলের জন্য গিয়া অনেক কটু কথা শুনিয়া আসিয়াছিলেন। নীরবে রসিক সাহার কথাগুলা হজম করিতে হইয়াছে এবং আরও দুই-এক জন বন্ধু-বান্ধবের নিকট ঘুরিয়া অবশেষে কয়েকটি টাকা হাওলাত করিয়া চাল ও তেলের যোগাড় করিয়া কোনক্রমে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া সতীশ দত্ত ইস্কুলে আসিয়াছেন। ইস্কুলে আসিয়াও সেই এক চিন্তা কেমন করিয়া দিন চলিবে, কবে ইস্কুল বোর্ড টাকা পাঠাইবে কে জানে। আজ ছয় মাস তাঁহারা মাহিনা পান না। আজ তিন বছর ধরিয়া ফ্রি-প্রাইমারী এডুকেশন আরম্ভ হইয়াছে—খোদ সরকার বাহাদুর এখন বেতন দিবার কর্ত্তা। কাজেই বিল করিয়া পাঠাইয়া ও দরখাস্তের পর দরখাস্ত করিয়া তিন মাস ছয় মাস পরে কোন এক শুভ লগ্নে হয়-তো বেতন পান। কোন কোন সময় বা তদ্বির করিতে সদরে দৌড়াইতে হয়।

আজ ক্লাসে বসিয়া সতীশ মাষ্টার এই সবই ভাবিতে-ছিলেন—পড়ানোতে মোটেই মন দিতে পারিতেছিলেন না। এমনি এক সময় অমল তাহার শ্লেটখানি লইয়া সতীশ দত্তের সম্মুখে আসিয়া বলিল—'অঙ্কটা মিলছে না মাষ্টার মশাই।' এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অঙ্কটি একবার বুঝাইয়া দিয়াছেন—হঠাৎ সতীশ দত্তের মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া গেল, ঠাস্ করিয়া অমলের গালে একটি চড় কসাইয়া দিয়া বলিলেন—'ভাগ্ দূর হ।' অমল সেই হইতে ঘণ্টাখানেক বসিয়া বসিয়া শ্লেট আড়াল দিয়া একটানা কাঁদিয়া চলিয়াছিল, চড়টি খুব জোর লাগিয়াছিল নজর। অমল ছুটি হইলে বাহির হইয়া যাইবার সময় সতীশ মাষ্টার দেখিতে পাইলেন, তাহার গালে পাঁচটা আঙুলের দাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছাত্র হিসাবে তো অমল খারাপ নয়—নিশ্চয়ই অঙ্কটি বুঝিতে তাহার কোথাও গোলযোগ হইয়াছিল, সেইটুকু একটু লক্ষ্য করিয়া ঠিক করিয়া দিলেই ত হইত। আর কতই বা ছেলেটির বয়স—এই তো সবে এগার-বার বৎসর হইবে। ইস্কুল হইতে ফিরিবার পথেও সতীশ দত্ত এই সবই ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলেন, বাড়ী আসিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া পীরপুরের গঞ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া যাইতে ছিলেন। পীরপুরের গঞ্জের হৃদয় দাসের আড়তে হিসাবপত্র রাখেন সতীশ দত্ত, মাসিক বেতন আট টাকা। সকালবেলা দুটি ছেলেকে পড়াইয়া পান পাঁচ টাকা, আর ইস্কুলের মাহিনা তাঁহার একুশ টাকা। এই ছয় মাস শুধু মাত্র তের টাকার উপরে নির্ভর করিয়া সংসার চালাইতে হইতেছে। এ দিকে সংসারের পোষ্য পাঁচটি—নিজে, স্ত্রী, দুইটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। বাড়ীর বাহির হইবার সময় স্ত্রী ডাকিয়া বলিল—'আজ মায়ার জন্যে একটা প্যাণ্ট এনো, ভুলে যেয়ো না যেন।' সতীশ দত্ত আমতা আমতা করিয়া কহিলেন—'আজ তো হবে না, এই ইস্কুলের বিলটা পেলেই—'

স্ত্রী মাঝপথে তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল—'রেখে দাও তোমার বিল—আজ তিন মাস ধরে তো কেবল বিলই দেখাচ্ছ। সাত বছরের মেয়ে নেংটা হয়ে থাকলে কেমন দেখায় বল তো—ঝাঁটা মারি অমন চাকুরীর মুখে।' সতীশ দত্ত কথাটি না কহিয়া চুপ করিয়া পথে নামিয়া পড়িলেন। রাগে দুঃখে চোখ দিয়া তাঁহার জল বাহির হইবার উপক্রম হইল।

২

মেয়েটি বড়, বয়স সাত-আট, ছেলে দুটির একটি বছর পাঁচেকের, অন্যটির বয়স বছরদেড়েক হইল আর কি। মেয়েটির সত্যই পরিবারের কিছুই নাই—সেই বছরখানেক আগে একবার একটি প্যাণ্ট কিনিয়া দিয়াছিলেন, সেটি যেমন

ছোট হইয়া গিয়াছে তেমনি ছিঁড়িয়াও গিয়াছে। এক-মাথা চুল, সব সময় জট পাকাইয়াই আছে, মুখে সব সময় একটা রোগা রোগা করুণ ভাব, বুকের হাড়গুলি সব গুনিতে পারা যায়। বড় ছেলেটির জ্বর প্রায় লাগিয়াই থাকে, শিউলি পাতার রস আর চিরতা ভিজানো জল মাঝে মাঝে খাওয়ানো হয়—এক গ্রেণ কুইনাইনের দাম দুই আনা, সুতরাং পেটের প্লীহা, যকৃৎ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ছোটটিকে এই দেড় বৎসর বয়সেই ভাত ধরানো হইয়াছে, কাজেই পেটের অসুখ তাহার আর মোটেই ভাল হইতেছে না।

মেয়েটি আজ মাস দুই ধরিয়া ভয়ে ভয়ে আবদার ধরিয়াছে তাহার একখানা রঙিন ডুরে শাড়ী চাই। সামনের মাসে মাহিনা পাইলেই দিবে প্রতিশ্রুতি দিতেই মেয়েটি খুশী হইয়া যায়। ছেলেটি কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে প্রতিদিন অন্ততঃ দুই-এক বার করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়, 'আমার লাল জুতো কবে কিনে দেবে বাবা—দাশুর মত।' গত পূজার সময় পাশের বাড়ীর দাশুর এক জোড়া লাল জুতা আসিয়াছে, সেই হইতে ছেলেটির এই আব্দার চলিতেছে। সতীশ প্রতিদিনই সেই একই জবাব দেন—'দেব বাবা দেব, পুজোর সময় তোমারও লাল জুতো কিনে দেব।' শুনিয়া ছেলেটি কখনও খুশী হইয়া, কখনও বা মুখভার করিয়া অবশেষে কোঁপাইয়া কোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলে। সতীশ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন এবার বিলের টাকা পাইলে নিশ্চয়ই একখানা ডুরে শাড়ী আর এক জোড়া ছোট জুতা কিনিবেনই।

১৯২০ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া ২১ সনের অসহযোগ আন্দোলনে জেল খাটিয়াছিলেন সতীশ দত্ত। জেল হইতে বাহির হইয়া কিছুদিন একটি পল্লীগ্রামে শিক্ষা লইয়া মাতিয়াছিলেন। সেই যে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ—সে অনুরাগ আর তাঁহার কোন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইল না। সেদিন সঙ্কল্প ছিল সতীশচন্দ্রের—জীবনে বিবাহ করিবেন না, চিরটা কাল দেশ-সেবা করিয়া, শিক্ষাপ্রচার লইয়াই এ জীবন কাটাইয়া দিবেন। তারপর কতদিন গিয়াছে, নানা অবস্থার পরিবর্তন হইয়া অবশেষে এই স্কুলে আসিয়া পড়িয়াছেন। প্রথম যৌবনের সে সঙ্কল্পও টিকে নাই—একটু অধিক বয়সে একটি অনাথা বিধবাকে কন্যাদায় হইতেও উদ্ধার করিয়াছেন। আজ দশ-এগার বৎসর ধরিয়া এই উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়টিতে চাকুরী করিতেছিলেন তিনি। সম্প্রতি তিন বৎসর হইল এই জিলায় সরকারী "খয়রাতী শিক্ষা"র প্রচলন হইয়াছে। সতীশচন্দ্র এই স্কুলেরই এখন হেড মাষ্টার।

প্রথম যৌবনের সেই আদর্শ শেষটায় এমনি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা সতীশচন্দ্র কখনও কল্পনাও করিতে পারেন নাই। মনে তাঁহার শান্তি নাই—গৃহে স্বস্তি নাই। স্ত্রী আজকাল যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়া যায়, কথায় কথায় বলে—'ঝাঁটা মারি অমন চাকুরীর মুখে, জনখাটাও ওর চেয়ে অনেক ভাল—একটা জনের মজুরি রোজ দেড় টাকা।'

মনের নানা অশান্তিতে ক্লাসে বসিয়াও আজকাল আর ভাল করিয়া পড়াইতে পারেন না। অর্থকষ্ট সব সময়ই মনকে পীড়িত করিতে থাকে। তা ছাড়া এই কয় বৎসরে প্রত্যেক ক্লাসে ছাত্র হইয়াছে দ্বিগুণ, এক জন শিক্ষককে একসঙ্গে পাইকারী হিসাবে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ছাত্রকে শিক্ষা খয়রাত করিতে হয়। ভাল লাগে না সতীশচন্দ্রের।

৩

সতীশচন্দ্রের স্ত্রী বনলতার এক খুড়তুতো ভাই রমেশ বছর দশেক ধরিয়া কলিকাতায় নানা ব্যবসায় করিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতেছিল। সম্প্রতি কিছুকাল হইল মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট লইয়া একেবারে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। তাহার নানা দিকে নানা কারবার, একা একা সামলাইয়া উঠা দায়। তাই কলিকাতায় যাইয়া তাহার পুরাতন কারবার দেখাশুনা করিবার জন্য মাস দুই হইতে সতীশচন্দ্রকে লিখিতেছিল। সতীশচন্দ্র এতদিন কানেই তোলেন নাই। অধ্যাপনা ছাড়িয়া শেষকালে বণিক্-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে? না, তাহা কখনও পারিবেন না। কিন্তু বনলতা এই সংবাদ শুনিবার পর হইতে একেবারে পাইয়া বসিয়াছে, মাষ্টারী করা যে একটা কিছু নয়, এখনই যে সতীশচন্দ্রকে রমেশের নিকট চলিয়া যাওয়া উচিত, যখন-তখন একথা বলিতে কসুর করে না। এই ছয় মাসে সতীশচন্দ্রের অশান্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছে, সব সময়েই খিটিমিটি বাধিয়াই আছে। দুই-এক কথা সতীশচন্দ্রও না বলিয়া পারেন না—ফলে বনলতা চেঁচাইয়া কাঁদিয়া একাকার করিয়া ফেলে। পৃথিবীতে টাকাটাই যে সব কিছু নয়, শিক্ষকতা যে কত বড় কাজ স্ত্রীকে সতীশচন্দ্র বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা হইয়াছে—বনলতা তাঁহার একথা কোন দিন কানেই তুলে নাই, বরং প্রকারান্তরে অকর্মা অপদার্থ এমনই অনেক কথা শুনাইয়া দিয়াছে।

এমনি সময় হঠাৎ এক দিন রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে রমেশ বখাটের মত যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত, সে রমেশ আর এ রমেশে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সে চেহারা নাই—এ কয়টা বছরের ভিতরে শরীরের আয়তন দ্বিগুণ হইয়াছে, পেটে বেশ একটু মেদ জমিয়াছে। পায়ের জুতা হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত একটা বৈশিষ্ট্য এক নজরেই বুঝিতে পারা যায়। সে আজকাল বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে কথা বলে। টাকা যার বুদ্ধিও তার—গরীবেরা কিছু নয়—এইটাই যেন প্রমাণ করিতে চায়। দিদি, ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীদের জন্য অনেক টাকার জামাকাপড় লইয়া আসিয়াছে সে। স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া রমেশ সতীশচন্দ্রকে বলিল—'আমি কিন্তু আপনাদের নিতে এসেছি জামাইবাবু, কাল চারটের গাড়ীতে যেতে হবে প্রস্তুত হোন।'

সতীশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—'সে কি রকম।'

—'কেন, আজ ক'মাস ধরে লিখছি যে।'

—সে হয় না রমেশ।

রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল—কেন?

কি সুখে এখানে পড়ে আছেন শুনি? একটু চেষ্টা করলে মাসে দুই-এক শ' টাকা রোজগার সে আবার একটা কথা না কি? ও সব চলবে না—ঘরে তালা দিয়ে চলুন।

কিন্তু সতীশচন্দ্র জবাব দিলেন—ইস্কুল ছেড়ে আমি যেতে পারব না রমেশ।

—তার মানে—আপনার ছেলেমেয়েদের এম্‌নি করে উপবাসী রেখে মেরে ফেলবার কি অধিকার আছে আপনার, শুনি?

—মেরে ফেলা?

—না তো কি? এম্‌নি করে অনাহারে অর্দ্ধাহারে থেকে ছেলেরা কখনও মানুষ হবে মনে করেছেন? চিরটা কাল পাড়াগাঁয়ে পড়ে পড়ে যদি মাষ্টারীই করবেন—তবে বিয়ে করা উচিত হয় নি—ছেলেমেয়েদের বাপ হওয়াও উচিত হয় নি।

ওদিকে বনলতা ঝগড়া করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া জানাইয়া দিল—রমেশের সহিত না যাওয়া হইলে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে।

রমেশের অকাট্য যুক্তি ও স্ত্রীর কান্নাকাটির নিকট অবশেষে সতীশচন্দ্র হার মানিতে বাধ্য হইলেন। বনলতা প্রবল উৎসাহে জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করিতে লাগিল। বেলা গোটাদশেকের ভিতরেই যাত্রা করিতে হইবে—তা না হইলে, তিন মাইল দূরের ষ্টেশনে গিয়া বারটার গাড়ী ধরা যাইবে না। আগের দিনেই খান-দুই গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া রাখা হইল। পরের দিন সকাল সকাল স্নানাহার করিয়া সকলে প্রস্তুত হইলেন। রমেশ প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সতীশচন্দ্রের হাতে ট্রেন ভাড়ার টাকা দিয়া বলিল—'আপনি হেঁটে যান জামাইবাবু—আগে গিয়ে টিকিট করে রাখুন।' প্রত্যহ যেমনই স্নানাহার করিয়া বেলা দশটার সময় ইস্কুলে যান—আজও তেমনি করিয়াই বাড়ীর বাহির হইলেন সতীশচন্দ্র। কিন্তু আজ তো আর ইস্কুলে নয়—ইস্কুল যে চিরদিনের মত ছাড়িয়া যাইতেছেন তিনি। কথাটি যেন সতীশচন্দ্র নিজেই বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বিদ্যালয়ের সম্মুখ দিয়াই পথ। কিছুদূর হইতেই ছেলেদের কোলাহল কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল—সতীশচন্দ্রের কত কালের পরিচিত কোলাহল! জীবনের বাইশটি বৎসর এই কোলাহলের ভিতরেই তিনি কাটাইয়াছেন। যতই স্কুলের নিকটে আসিতে লাগিলেন—ততই তাঁহার মন হইতে ষ্টেশনে গিয়া টিকেট কাটিবার কথা—কলিকাতায় যাইবার কথা একেবারে উবিয়া যাইতে লাগিল। যন্ত্রচালিতের মত স্কুল ঘরে আসিয়া ঢুকিয়া—চতুর্থ শ্রেণীতে গিয়া বসিলেন, অমলকে ডাকিয়া বলিলেন—'এদিকে আয় তো অমল—বাংলা বই নিয়ে আয়।'

তার পর বই খুলিয়া পড়াইতে লাগিলেন :—

"ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিকর।
ধরিয়াছে কি আশ্চর্য্য শোভা মনোহর।"

সরোবরে অর্থাৎ দীঘিতে, কমলনিকর মানে পদ্মফুলসমূহ…।

কোথা দিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে সে খেয়াল সতীশচন্দ্রের নাই। ষ্টেশনে গিয়া টিকেট করিতে হইবে—কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হইবে—সেকথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। দুইখানা গরুর গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই করিয়া বনলতা ও ছেলেমেয়ের সহিত রমেশ ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিল—হঠাৎ গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া চীৎকার করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল—'আরে থামা, থামা।' পরে দিদিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—'দেখেছ জামাইবাবুর কাণ্ড—ষ্টেশনে যাওয়ার নাম করে ইস্কুলে এসে বসে আছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে রমেশ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। গাড়ীর ভিতর হইতে বনলতা চেঁচাইয়া উঠিল—'এই পথের উপরে আমি কি শেষকালে মাথা খুঁড়ে মরব রমেশ!'

রমেশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল—'ব্যাপার কি বলুন তো? মাথা খারাপ হ'ল নাকি আপনার?' পরে সতীশচন্দ্রের হাত টানিয়া ধরিয়া বলিয়া বলিল—'উঠে আসুন।' যন্ত্রচালিতের মত সতীশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন—রমেশ তাঁহাকে হিড় হিড় করিয়া বাহিরে টানিয়া লইয়া আসিল।

গণিত-বিদ্যায় প্রাচীন ভারত

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গণিত-বিদ্যা আবিষ্কৃত হয়। দৈনন্দিন জীবনে গণিতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। পাটি-গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি গণিত-শাস্ত্রের অন্তর্গত। লীলাবতীর মতে 'ব্যক্তং পাটিগণিতম্ অব্যক্তং বীজগণিতম্।' প্রথমতঃ, শব্দদ্বারা সংখ্যা-বোধ হইত। এখনও সে প্রথা তিরোহিত হয় নাই। শতকিয়া পাঠের সময় এক চন্দ্র, দুই পক্ষ, তিন নেত্র, চারি বেদ, পঞ্চবাণ, ছয় ঋতু, সাত সমুদ্র, আট বসু, নব গ্রহ, দশ দিক, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য পঠন-রীতি বিদ্যমান। প্রাচীন কালে এতদবলম্বনে রাশি লিখিত হইত। "নন্দাব্ধীন্দু গুণাস্তথা শক নৃপস্যান্তে কালের্বৎসরাঃ।" বিশ্লেষণে বাক্যটির ব্যুৎপত্তি হয় ৩১৭৯ (তিন হাজার এক শত উন-আশী)। নন্দ—৯,

নবনন্দ শব্দ হইতে ৯ রাশির উৎপত্তি। অগ্নি—৭ (সপ্তাগ্নি), ইন্দু—১ (এক চন্দ্র), গুণ—৩ (সত্ত্ব-রজস্তমঃ)। 'অঙ্কস্য বামাগতি।' প্রথম শিক্ষার্থীদের গণিত-শিক্ষাকালে সর্ব্বদক্ষিণ দিক হইতে বামাগতিতে একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি গণনা শিক্ষাদান হয়। এই সূত্রাবলম্বনে উপরের রাশিটি প্রাপ্ত। তৎকালে গণিতবিৎ হইতে হইলে সাহিত্যে অধিকারী হইতে হইত। বর্ত্তমানকালেও ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্যগণ পত্রাদিতে গণিতের ব্যবহার এইভাবে করিয়া থাকেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও বিবাহ-বাসরে কন্যাপক্ষীয়গণ বিবিধ রহস্যপূর্ণ গণিত-প্রশ্ন দ্বারা বরপক্ষীয়গণের বুদ্ধির পরিচয় লইতেন। যেমন,—

তিন ছয়, তিন নয়।
তিন আঠার কত হয়।

এরূপ চর্চ্চা এখন অবলুপ্ত।

সঙ্কলন (+), ব্যবকলন (−), গুণন (×) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যার সহিত ব্যাখ্যাত হয়। একাদশ (১০+১), ঊনবিংশ (২০−১), ত্রিংশৎ (১০×৩)

কথিত আছে, প্রজাপতি প্রজাকল্যাণার্থ গণিত-বিদ্যার আবিষ্কার করেন। তাঁহার নিকট হইতে ঋষিগণ এবং ঋষিগণের নিকট হইতে মেধাবী ছাত্রগণ গণিত শিক্ষা করেন। লোকসমাজে এই প্রকারে গণিত প্রচারিত হয়।

পূজাদি দৈবানুষ্ঠানে ঋত্বিকগণ যে সুদৃঢ় মণ্ডলাদি প্রস্তুত করেন তাহাতে গভীর জ্যামিতি-জ্ঞানের আবশ্যক। গৃহ-নির্ম্মাণে, জলাশয়-খননে, ভাস্কর্য্যে এবং চারুকলা-বিদ্যাদিতে গণিত-শাস্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য্য। যুদ্ধবিদ্যাতেও গণিত বিশেষ ভাবে আদরণীয়। জ্যামিতির জ্ঞানে ধনুর্ব্বাণ নির্ম্মিত হইত এবং গতিবিজ্ঞানের (Dynamics) অভিজ্ঞতায় নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের গতি নির্দ্ধারিত হইত। এতদ্ব্যতীত শত্রু-সংহার ঘটিত না।

ভারতের আর্য্যভট, ভাস্করাচার্য্য, লীলাবতী, শ্রীধরাচার্য্য, শুভঙ্কর দাস প্রভৃতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অবিসম্বাদিত রূপে শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাদের খ্যাতি শুধু ভারতে নিবদ্ধ নহে—সমস্ত বিশ্বে বিস্তৃত।

প্রাচীনকালে প্রাচ্য দেশে গণিত শাস্ত্রাবলম্বনে কিরূপ রহস্যময় জটিল অঙ্কের সমাধান হইত তাহা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি প্রমাণিত করিবে।

প্রথম, চারি জন রত্ন-বিক্রেতার মধ্যে এক জনের আটটি মাণিক্য, এক জনের দশটি ইন্দ্রনীলমণি, এক জনের এক শতটি মুক্তা এবং অন্য জনের পাঁচটি বজ্রমণি ছিল। মৈত্রী বশতঃ প্রত্যেকে নিজ নিজ রত্নের এক একটি পরস্পর বিনিময় করিলে সকলেরই তুল্যধন হইল। ইহাদিগের রত্নের পৃথক পৃথক মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে।

সমাধানের নিয়ম—জনসংখ্যা দ্বারা পরিবর্ত্তিত রত্ন-সংখ্যা গুণ করিয়া গুণফল প্রত্যেক ব্যক্তির সমুদয় রত্ন হইতে পৃথক পৃথক বিয়োগের পর ইষ্টরাশিকে বিয়োগফল দ্বারা ভাগ করিলে প্রত্যেক রত্নের মূল্য নির্ণীত হইবে।

এক্ষেত্রে জনসংখ্যা ৪, মাণিক্য ৮, ইন্দ্রনীলমণি ১০, মুক্তা ১০০, বজ্রমণি ৫, পরিবর্ত্তন ১। এক্ষণে নিয়মানুসারে জনসংখ্যা ৪ দিয়া পরিবর্ত্তিত রত্নসংখ্যা ১ কে গুণ করিয়া গুণ ফল ৪ হইল। এই চার ক্রমান্বয়ে রত্নসংখ্যা হইতে বিয়োগ করিলে, মাণিক্য ৪, ইন্দ্রনীল ৬, মুক্তা ৯৬, বজ্রমণি ১ অবশিষ্ট থাকিতেছে। এই বিয়োগফলগুলি দ্বারা একটি অভীষ্ট রাশিকে ভাগ করিতে হইতেছে। কিন্তু এরূপ অভীষ্ট রাশি কল্পনা করা উচিত যাহার ভাগশেষ না থাকে। এই হেতু এখানে ৯৬কে অভীষ্ট রাশি কল্পনা করিয়া প্রাগুক্ত বিয়োগফল দ্বারা ক্রমান্বয়ে এই ৯৬কে ভাগ করিয়া ২৪, ১৬, ১ এবং ৯৬ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতএব প্রতি মাণিক্যের মূল্য ২৪, ইন্দ্রনীলের মূল্য ১৬, মুক্তার মূল্য ১ এবং বজ্রের মূল্য ৯৬ নির্দ্ধারিত হইল। এতদনুপাতে প্রত্যেক ব্যক্তির ধনের সমষ্টি ২৩৩ হইবে।

দ্বিতীয়, নয় হাত উচ্চ একটি স্তম্ভের উপরিভাগে একটি ময়ূর উপবিষ্ট ছিল। ঐ ময়ূর সেই স্তম্ভের সাতাশ হাত দূরে এক সর্পকে দেখিতে পাইয়া উহাকে ধরিতে উড্ডীন হয়। এ দিকে সর্পও ময়ূর-ভয়ে ভীত হইয়া স্তম্ভের নিম্নস্থ গর্ত্তের অভিমুখে ধাবিত হইল। উভয়ের গতি সমান ছিল। এমতাবস্থায় স্তম্ভ হইতে কত হাত দূরে ময়ূর সর্পকে ধরিতে সক্ষম হয়।

সমাধানের সূত্র—ভুজ ও কর্ণের যোগফল দ্বারা কোটির বর্গকে ভাগ করিয়া সেই ভাগফল ভুজ ও কর্ণের যোগফল হইতে বিয়োগ কর। এই বিয়োগফলের অর্দ্ধেক ভুজের পরিমাণ হইবে। পরন্তু ভুজ ও কর্ণের যোগসংখ্যা হইতে এই ভুজ-পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই কর্ণ।

বলা বাহুল্য, এই সূত্রের উদাহরণ স্বরূপই ময়ূর ও সর্পের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। স্তম্ভ হইতে কত হাত দূরে সর্প ধৃত হইল, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে মনে করুন—
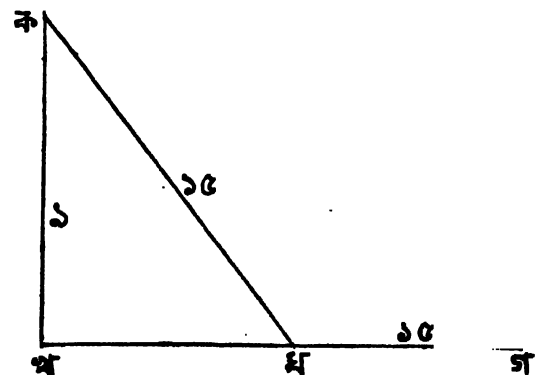
ক খ সেই স্তম্ভ, আর খ গ রেখায় গ বিন্দুতে সর্প অবস্থিতি করিতেছিল। ক খ স্তম্ভের পরিমাণ ৯ হাত এবং খ স্তম্ভমূল হইতে গ বিন্দুর দূরত্ব ২৭ হাত। এক্ষণে দেখিতে হইবে, খ

বিন্দু হইতে কত দূরে ময়ূরটি সর্পকে ধরিতে পারিবে। মনে করুন, ঘ বিন্দুতে ময়ূর আসিয়া সর্পকে ধরিয়া ফেলিল। তাহা হইলে ক বিন্দু হইতে ঘ বিন্দু পর্য্যন্ত রেখা টানিলে ক ঘ রেখা ঘ গ রেখার সমান হয়। কেননা, ক বিন্দু হইতে ময়ূর যত দূর আসিবে, গ বিন্দু হইতে সর্পকে ঠিক তত দূরেই আসিতে হইবে; যেহেতু উভয়ের গতি সমান। তবেই দেখা যাইতেছে কঘ+ঘখ=খগ=২৭। এক্ষণে সূত্রানুসারে [খগ−(কখ² + ঘগ) + ২] = খঘ। অর্থাৎ [২৭−(৯² + ২৭)] + ২ = [২৭−৩] + ২ = ২৪ + ২ = ১২ অর্থাৎ স্তম্ভ হইতে বার হাত দূরে ময়ূর কর্ত্তৃক সর্প ধৃত হইবে।

তৃতীয়,—একটি সরোবরে জল হইতে অর্দ্ধ হস্ত ঊর্দ্ধে মৃণালোপরি একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত ছিল। সহসা ঝটিকাঘাতে পদ্মটি দুই হস্ত দূরে জলমগ্ন হইল। সরোবরে কত জলের উপর মৃণাল জাগিয়া ছিল অর্থাৎ জলের গভীরতা কত ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই অঙ্ক সমাধানে নিম্নরূপ প্রক্রিয়া আবশ্যক।

কোটি ও কর্ণের বিয়োগফল দ্বারা ভুজের বর্গকে ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত কোটি ও কর্ণের বিয়োগফল দ্বারা ভুজের বর্গকে ভাগ করিয়া, ভাগফলের সহিত কোটি ও কর্ণের বিয়োগফল যোগ কর। এই যোগফলের অর্দ্ধেক লইলে কর্ণের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। আর সেই কর্ণের পরিমাণ হইতে কোটি কর্ণের বিয়োগফল বাদ দিলে কোটির পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে। এস্থলে খ জলের উপরি-ভাগ, খ ক পদ্ম সংযুক্ত
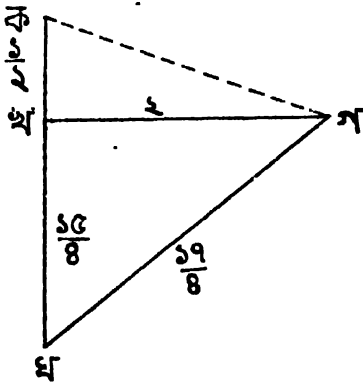
মৃণাল, খ অর্থাৎ জলের উপরি-ভাগে অবস্থিত। খ ক মৃণালের পরিমাণ অর্দ্ধ হস্ত। ক খ পদ্মসংযুক্ত মৃণাল ঝটিকাঘাতে খ হইতে দুই হস্ত দূরে গ বিন্দুতে জলমগ্ন হইল। খগ ভুজ। ইহার পরিমাণ ২ হস্ত। এক্ষণে খ ঘ কোটির পরিমাণ বা জলের গভীরতা স্থির করিতে হইবে। এখানে দেখা যাইতেছে, ক ঘ =গ ঘ। নিয়মানুসারে কোটির ও কর্ণের বিয়োগ-ফল অর্থাৎ $\frac{১}{২}$ দ্বারা খ গ ভুজের বর্গকে অর্থাৎ ৪কে ভাগ দিলে ৮ রাশি পাওয়া গেল। সেই ৮ ভাগফলের সহিত কোটি ও কর্ণের বিয়োগফল অর্থাৎ $\frac{১}{২}$ যোগ দিলে $\frac{১৭}{২}$ পাওয়া গেল। তাহার অর্দ্ধেক $\frac{১৭}{৪}$ ই কর্ণের পরিমাণ। কর্ণ $\frac{১৭}{৪}$ হইতে কর্ণ ও কোটির বিয়োগফল $\frac{১}{২}$ বিয়োগ করিলে $\frac{১৫}{৪}$ অবশিষ্ট থাকে। তাহাই কোটির পরিমাণ বা জলের গভীরতা।

ভারতে গণিত-শাস্ত্রের চর্চ্চা বর্ত্তমানে এক প্রকার তিরোহিত। যে যৎসামান্য গণিত অধ্যাপিত হয় তাহা শুধু জীবিকা অর্জ্জনের জন্য। অনুমান ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ভারতীয় গণিত-বিজ্ঞানের স্রোত মন্দীভূত হয়। পাশ্চাত্য দেশ আজ গণিত-বিজ্ঞানের সহায়তায় সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত করিয়াছে। পরোক্ষভাবে এই বিদ্যার জন্য সে ভারতের নিকট ঋণী। আরবীয় মনীষিগণ ভারতবর্ষে আগত হইয়া গণিত শিক্ষা করেন। আরব হইতে পরে স্পেন দেশে এবং সে স্থান হইতে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে এই মূল্যবান্ বিদ্যা প্রচারিত হয়।

তিন-চারি শত বৎসর পূর্ব্বে আধুনিক বাঁকুড়া জেলায় শুভঙ্কর দাস কবিতাচ্ছন্দে যে সমস্ত গণিত-সমাধান-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন অনুশীলনের অভাবে তাহাও লুপ্তপ্রায়। তাঁহার কবিতায় তৎকালীন প্রচলিত সামাজিক প্রথা এবং বঙ্গ ভাষার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্যে।
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্যে।
কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ।
বিশ গণ্ডায় হয় কাঠার প্রমাণ।
গণ্ডা বাকী থাকে যদি কাঠা নিলে পর।
যোল দিয়ে পূরে তারে সারা গণ্ডা ধর।

পূর্ব্বে কায়স্থগণ পদবীর শেষে অথবা পদবীর পরিবর্ত্তে "দাস" শব্দের ব্যবহার করিতেন। পবিত্র গ্রন্থাদিতে গ্রন্থকর্ত্তা উপাখ্যানের শেষে স্বীয় নাম সুকৌশলে সংযোজিত করিয়া ধন্য হইতেন। মহাভারতের অনেক স্থলে কায়স্থ কাশীরাম লেখনী-মুখে গাহিয়াছেন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

কায়স্থ বংশীয় শুভঙ্করও তাঁহার কোন কোন আর্য্যার শেষ চরণে নিজ নামোল্লেখে পাদপূরণ করিয়াছেন।

* * *

কড়া প্রতি দুই কাক গণ্ডার অর্দ্ধ তিল।
শুভঙ্কর দাস কহে এই মত মিল।

বাঁচার দাবী

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিশ্বে বড় সবার চেয়ে তৃষ্ণা এই,
দুঃখ থেকে মুক্তি এবং স্বাধীন হয়ে বাঁচার দাবী
তার চেয়ে আর এই জগতে শ্রেষ্ঠ কোনই তৃষ্ণা নেই।
বন্দীশালার বদ্ধ কারায়
মানবজীবন ছন্দ হারায় ;
কোন্ নিরাশার অন্তবিহীন অন্ধকারে
বাঁচতে যে তাই বারংবারে—
চিত্ত তাহার ক্ষিপ্ত সমান মুক্তি মাগে
সকল বাধা হতে ঠেলি,
জীবন যে তাই সদাই চাহে মরণ দিয়া
মৃত্যুজয়ের নিস্তারণ,
শাশ্বত এই প্রাণের দাবী রুদ্ধ করে'
রাখবে সে কোন্ বর্ব্বরেরা ?
বিশ্ব জুড়ে বাঁচার দাবির যুদ্ধ লাগি
গর্জ্জেছে আজ মৃত্যুপণ।
পাশব বলের দম্ভপুরে হিরণ্য আজ
দিক না হুকুম হুঙ্কারিয়া,
অত্যাচারের লৌহচাকা যাক্ গুঁড়িয়ে
সত্যাগ্রহীর বক্ষতল ;
যন্ত্রবলের দর্পরাবণ বিশ্বগ্রাসে
দাঁড়াক না আজ ডঙ্কা দিয়া
হুকুম তাহার বহক্ না ব্যোম-সিন্ধুজল।
তবুও মানা মানবে না আজ মুক্তিমাতন
দৃপ্তচেতন প্রহ্লাদের,
সত্যবেদী বর্ব্বরতার জল্লাদের।
উদ্ধত সেই দীপ্ত খাঁড়ায় তুচ্ছ করি'
চিত্তে স্মরি রুদ্র-হরি,
করবে বালক সিংহনাদ,
লক্ষ প্রলয় ঝঞ্ঝাবাত
উঠবে হঠাৎ চমকে হাজার বজ্রপাত,
এক নিমেষে খুলবে সকল অন্ধকারের বদ্ধ দ্বার,
নৃসিংহেরি হুহুঙ্কার,
সত্যবেদী বর্ব্বরতার স্তম্ভ ফেটে
একটি ক্ষণেই অকস্মাৎ,
সত্য-ন্যায়ের রক্ষা লাগি হবে দিয়ে আশীর্ব্বাদ,
মর্ত্ত্যেরি এই অত্যাচারের রক্ত-কাদায়,
মুক্ত করি সকল বাধায়
প্রকট হবে রুদ্র-হরির বজ্রহাত,
বিশ্বে সকল বিপৎপাত
একটি ক্ষণেই শান্ত হবে
মাভৈঃ রবে,
এই পৃথিবীর রক্তে রাঙা প্রহ্লাদেরা
করবে হেসে মৃত্যু জয়,
সিন্ধুতীরে রক্ষবাজার থাকবে পড়ে ধ্বংসময়
দর্পদিনের সৌধ এ পাপ শতাব্দীর,
মর্ত্ত্যে শুধুই থাকবে বেঁচে ভক্তবীর।
ভয় কি ওরে তোদের তবে শঙ্কা নাই,
তোদের যারা রক্ত শোষে, বর্ব্বরতার যন্ত্রণায়
আঘাত হানে পাশব বলের,
রচবে তারাই নিজের লাগি মৃত্যুপথ,
ভক্তবীরের পরীক্ষায় এই মুক্তিরণ ;
চিরন্তনের বিজয়পথে আত্মদানের
ধর্ষরিত যুদ্ধরথ,
শাশ্বত এই বাঁচার দাবির মৃত্যুপণ।
হঠাৎ এ কি দেখছি মোদের শীর্ষোপরে
বজ্রবিষাণ রুদ্রস্বরে—
মেঘে বাজলো বাণী অকস্মাৎ,
সেথা অগ্নিলেখার মন্ত্রে জ্বলে আশীর্ব্বাদ—
"ওরে, আমার লাগি বইবি বুকে রক্ত যারা,
আমার প্রিয় শ্রেষ্ঠ তারাই সর্ব্বহারা,
আয় তবে চল করবি কারা দুঃখজয়ের দুঃখবরণ,
সঙ্গে তোদের সঙ্গী আমি দুঃখ এবং মৃত্যুহরণ।
দুঃসহ কোন্ দর্পনাশের
রুদ্র-হাতের,
বজ্রবাদল ঝঞ্ঝাবাতের সর্ব্বনাশন,
ধ্বংসলীলার প্রলয় নাচন
হুহুঙ্কারে,
মুক্তিরতীন সিংহদ্বারে,
অত্যাচারের রক্তসাগর সন্তরিয়া,
তাথৈ থিয়া তাথৈ থিয়া।
প্রলয় আমার মৃত্যুনাচের
সঙ্গে নেচে চল্‌বি চল,
বাজবে শিঙা লাখ মাদল,
দুঃখজয়ের শ্রেষ্ঠপথ এই চিরন্তন,
বাঁচার দাবির ভক্তদের এই শ্রেষ্ঠ রণ।

যুদ্ধোত্তর মহাচীন

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর বৎসরাধিক কাটিয়া গেল। এই প্রলয়ঙ্কর মারণ-যজ্ঞ মানবের শুভবুদ্ধির উদ্বোধন করিয়া জগতে স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবে কি না নিঃসংশয়ে বলা যায় না। এদিকে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে ঘটনা-প্রবাহের গতি কিন্তু প্রত্যেক চিন্তাশীল নর-নারীকেই শঙ্কাকুল করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন এবং অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর নবজন্ম হইয়াছে। আগতপ্রায় যুগে পৃথিবী কি রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহার প্রতি বিশ্বের মনীষিবৃন্দ অনবহিত নহেন। যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগে যে সমস্যাগুলি বিদ্যমান ছিল, যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধান্তে তাহা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন সমস্যাও দেখা দিয়াছে। আমাদের দৃষ্টি প্রধানতঃ ভারতীয় সমস্যাগুলির প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু বৃহত্তর জগৎ, বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের সমস্যাগুলির প্রতিও আজ আমাদের উদাসীন থাকা চলিবে না।

চীন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রতিবেশী। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির দিক হইতে এই দুইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

যে মারণ-যজ্ঞের প্রাণঘাতী বিষাক্ত ধূমে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস আজও কলুষিত হইয়া রহিয়াছে, মহাচীন তাহার অন্যতম প্রধান হোতা। এই সেদিন পর্য্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি পঞ্চকের অন্যতম জাপানের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকারে অপ্রস্তুত চীনের সংগ্রাম ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। বিজয়লক্ষ্মী মহাচীনের কণ্ঠলগ্না হইয়াছেন। কিন্তু 'ততঃ কিম্' ? ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল চীন যেমন এশিয়া তথা বিশ্বের শান্তিরক্ষার সহায়ক হইবে, পক্ষান্তরে অন্তর্ব্বিরোধে বিচ্ছিন্ন দুর্ব্বল চীন তেমনই বিশ্ব-শান্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার নিজের জাতীয় অস্তিত্বও নিরাপদ থাকিবে না। অন্তর্ব্বিরোধ তাহার নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতের বিপদ ডাকিয়া আনিবে।

কেহ কেহ মনে করেন যে চীনে কোন দিনই শান্তি এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। স্বীয় মতের পোষকতায় বর্ত্তমানে যে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্টাং যুদ্ধ চলিতেছে তাঁহারা তাহার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, জীবন-মরণ যুদ্ধের মধ্যেও এই দুই রাজনৈতিক দলের বিরোধ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রচ্ছন্ন স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান প্রায় অসম্ভব এবং চীনরাষ্ট্রের প্রতিটি প্রদেশই বিশালায়তন এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যও বড় বেশী।

উপরি-উক্ত মতসমূহের কোনটিই অসত্য নহে। কিন্তু ১৯১১ সালের রাষ্ট্র-বিপ্লব এবং তাহার ফলে মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত চীনের বিস্ময়কর অগ্রগতির কথা বিস্মৃত হইলে আধুনিক ইতিহাসের একটি প্রধান তথ্যকেই অস্বীকার করা হইবে। ১৯১১ সালে মাঞ্চু-সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভাঙিয়া পড়িল। যে বিপ্লবীগণ এই পতন ঘটাইলেন, বিপ্লবোত্তর যুগে কোন্ পথে, কি প্রণালীতে রাষ্ট্র-তরণী পরিচালনা করিতে হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা বা সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না। আর পরিকল্পনা থাকিলেও তাহাকে রূপায়িত করিবার কোন উপায় ছিল না। এই কথা মনে রাখিলেই বিপ্লবোত্তর চীনে ইউয়ান-সি-কাইয়ের স্বৈরাচারী একনায়কত্ব, 'টুকুন' (Tuchun) বা 'ওয়ার-লর্ড-'গণের আবির্ভাব এবং দেশের সর্ব্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মূল কারণটি ধরা যাইবে।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১) হইতে জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া গ্রাস (১৯৩১) পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে মহাচীনে নবজীবনের সুস্পষ্ট স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। জাপ-আক্রমণের ফলে বহুধা বিভক্ত এবং অন্তর্ব্বিরোধে মৃতকল্প মহাচীনের দুর্দ্দমনীয় জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছে। এই পরিণতি সর্ব্বত্র প্রগতিপন্থীদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সংস্কারকগণ, যেমন কাঙ্ ইউ-ওয়াই, লিয়াঙ্-চি চাও, ডাঃ হু-সি, জেমস ইয়েন প্রভৃতির রচনাবলী এবং সহস্র সহস্র আমেরিকা ও ইউরোপ প্রত্যাগত ছাত্রের প্রচেষ্টা এই পরিণতি ঘটাইতে সহায়তা করিয়াছে। ইঁহাদের চেষ্টা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলেই চীনে সর্ব্বপ্রথম প্রকৃত জনমত গঠিত হইয়াছে। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে নানকিঙ জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতি এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপে এই জনমত পরিপূর্ণভাবে না হইলেও অংশতঃ প্রতিফলিত হইয়াছে। জাপ-যুদ্ধের ফলে এই জনমত স্পষ্ট এবং দৃঢ়তর হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক চীনকে বুঝিতে হইলে ডাঃ সান-ইয়াট-সেনের "জনগণের তিনটি মূলনীতি" (Three Principles of the people) অথবা "সান-মিন-চুই" এবং চীনা মনের উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই 'সান-মিন-চুই' আধুনিক চীনের প্রতিটি সংস্কারমূলক কার্য্যের মাপকাঠি—অন্ততঃ চীনাদের দৃষ্টিতে। কোন প্রস্তাবিত সংস্কার 'সান-মিন-চুই'র বিরোধী না হইলে তবেই সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এমন কি যে কম্যুনিষ্ট দলের সহিত ক্যুওমিন্টাং দলের অহি-নকুল সম্পর্ক, সেই কম্যুনিষ্ট দলও প্রথম হইতেই ডাঃ সান-ইয়াট-সেনের নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইয়া আসিতেছে।

ডাঃ সানের আদর্শ এবং উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদের আর অন্ত নাই। কিন্তু তথাপি একথা মনে করা অযৌক্তিক নহে যে অদূরভবিষ্যতে যখন মহাচীনের সমস্ত রাজনৈতিক দল মতামত প্রকাশের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভ করিবে, তখন দেশের রাজনৈতিক এবং অন্তবিধ সমস্যাগুলির সর্বজনগ্রাহ্য একটা সমাধান মিলিতেও বা পারে। ১৯৪৩ সালে গঠিত 'কমিটি অব প্রোমোটিং দি রিয়ালাইজেসন অব কনস্টিটিউশনাল গবর্ণমেণ্টে'র জাতীয় মহাপরিষদ (National Assembly) গঠনে সহায়তা করিবার এবং পরিষদের চীনের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-বিধি গ্রহণ করিবার কথা। যে কমিটি পরিষদ নির্ব্বাচন করিবে তাহাতে কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিণ্টাং দলভুক্ত সদস্য ব্যতীত এক জন মুসলমান, এক জন তিব্বতীয়, এক জন স্ত্রীলোক এবং চার জন অপরাপর দলভুক্ত সদস্যও রহিয়াছেন। এই শেষোক্তগুলির কোনটিই সরাসরি অবৈধ বলিয়া ঘোষিত না হইলেও আজ পর্য্যন্ত সরকারীভাবে তাহাদের বৈধতা স্বীকৃত হয় নাই।*

ডাঃ সানের 'থ্রি প্রিন্সিপলসে'র উদ্দেশ্য ছিল চীনের জাতীয় সার্ব্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র স্থাপন এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার সৌকর্য্য সাধন।

১৯৪২ সালে ইংলণ্ড এবং আমেরিকা চীনে তাহাদের রাষ্ট্র-সীমার বহির্ভূত অঞ্চলের (Extra-territoriality) কর্তৃত্বাধিকার, অর্থাৎ কোন ইংরেজ বা আমেরিকান চীনদেশে কোন অপরাধ করিলে ইংরেজ বা আমেরিকান আদালতে অপরাধীর নিজের দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে তাহার বিচার করিবার অধিকার পরিত্যাগ করে। কিছুদিন পরে ফ্রান্সও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। ফলে বিশ্বের দরবারে চীনের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইল। অর্দ্ধ-উপনিবেশ চীন নামে স্বাধীন হইল সত্য, কিন্তু বহু কঠিন এবং জটিল সমস্যার সমাধান এখনও বাকী রহিয়াছে।

তারপর গণতন্ত্রের কথা। চীনের রাজনীতিক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ জয়যুক্ত হইয়াছে বলিলে ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইবে সত্য; কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে জাপ-যুদ্ধ কালে চীন শনৈঃ শনৈঃ গণতান্ত্রিক আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই প্রগতি ১৯১২ হইতে ১৯৩৭ সাল এই পাদ শতাব্দীর অগ্রগতি অপেক্ষা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট এবং দ্রুততর। যুদ্ধকালে গঠিত জনগণের রাজনৈতিক পরিষদ সরকারের কার্য্যের সমালোচনার অধিকারী। ইহার সহিত পরামর্শ করিতে সরকার আইনতঃ বাধ্য। প্রাদেশিক পরিষদ এবং নগরাঞ্চলের ও গ্রাম্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলিও আজ আর নিজেদের দায়িত্ব অথবা সমালোচনা করিবার ও মতামত প্রকাশ করিবার অধিকারের প্রতি অনবহিত নহে।

১৯৩৬ সালে নানকিং-সরকার রচিত যে রাষ্ট্র-বিধির খসড়া সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে একটি জাতীয় মহা-পরিষদের হস্তে রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। পরিষদের ১২০০ প্রতিনিধির মধ্যে ৬৬৫ জন বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। ৩৮০ জন থাকিবেন ভূম্যধিকারী এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। অবশিষ্ট ১৫৫ জন তিব্বতীয়, মোঙ্গোলীয়, মাঞ্চু এবং প্রবাসী চীনাগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। ৬ বৎসর পর পর এই মহাপরিষদের নূতন নির্ব্বাচন হইবে এবং ৩ বৎসর পরে একবার ইহার অধিবেশন হইবে। দুই অধিবেশনের অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে 'লেজিসলেটিভ ইউয়ান' বা ব্যবস্থা-পরিষদ মহা-পরিষদের স্থান গ্রহণ করিবে। পরিষদের আইন প্রণয়ন করিবার এবং বাজেট মঞ্জুর করিবার অধিকার থাকিবে। সদ্য-গৃহীত রাষ্ট্র-বিধিতে রাষ্ট্রপতিকে বড় বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র রাষ্ট্রপতিই যুদ্ধ-ঘোষণা, যুদ্ধ-বিরতি এবং এতৎ সংক্রান্ত যাবতীয় আদেশ দিবার ও বিধি-ব্যবস্থা করিবার অধিকারী। জাতীয় বাহিনীর তিনিই সর্ব্বাধিনায়ক। পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনিই হইবেন মহাচীনের একমাত্র মুখপাত্র। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে রাষ্ট্রপতি আবশ্যক আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন-পরিষদের পুনর্ব্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবার অথবা জাতীয় মহা-পরিষদের নিকট পেশ করিবার অধিকার তাঁহার থাকিবে। রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। কর্ম্মচারী নিয়োগে কিন্তু রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নহে। 'এক্জামিনেশন ইউয়ান' বা 'পরীক্ষা পরিষদ' প্রথমতঃ স্থির করিবে কাহারা রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার যোগ্য এবং রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন এই অনুমোদিত প্রার্থিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহা অপেক্ষাও বড় কথা এই যে, রাষ্ট্রপতি যাবতীয় ব্যাপারে জাতীয় মহা-পরিষদের কর্তৃত্বাধীন থাকিবেন। আপত্তি উঠিবে যে মহা পরিষদ তিন বৎসর পর পর আহূত হইবে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে উক্ত পরিষদকে উপেক্ষা করা মোটেই কঠিন হইবে না। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রবিধিতে যে পল্লী-পরিষদসমূহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, প্রায়ই তাহাদের অধিবেশন হইবে এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলির মধ্যস্থতায় তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারকে জনমতের সহিত পরিচিত করিবার সুযোগ পাইবে। এই ভাবে জনমতের সহিত সরকারের সংযোগ রক্ষিত হইবে। সুতরাং জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, সম্প্রতি গৃহীত চীন-রাষ্ট্রবিধি খুঁটিনাটি ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় গণতান্ত্রিক না হইলেও আদর্শের দিক হইতে ইহার ভিত্তি গণতান্ত্রিক।

কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাং বিরোধ এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক

---

* চীনের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-বিধি সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু কম্যুনিষ্ট দল এই অভিনব রাষ্ট্রবিধি গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন।—লেখক

আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে চীনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। জাতির অদৃষ্টাকাশে যেদিন দুর্য্যোগের কৃষ্ণ মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল, জাতির স্বাধীনতা এমন কি তাহার সত্তা পর্য্যন্ত যেদিন বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, সেই চরম দুর্দ্দিনে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রত্যেকেই মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সংগ্রাম করিয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদের অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের কাহিনী অমর হইয়া থাকিবে। চীনের অন্যতম প্রধান কম্যুনিষ্ট নেতা জেনারেল চু-টের কথায়—

"Communist troops had engaged 69 per cent of Japanese troops in China and 95 per cent of puppet troops fighting for Japan."

অর্থাৎ কম্যুনিষ্টরাই চীন অভিযানকারী জাপবাহিনীর শতকরা উনসত্তর ভাগ এবং জাপ তাঁবেদার চীন-সৈন্তের শতকরা পঁচানব্বই ভাগের সহিত লড়াই করিয়াছে। বিখ্যাত সাংবাদিক ষ্টুয়ার্ট গেল্ডারের মতে কম্যুনিষ্টরা চীনের তিন লক্ষ বিশ হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থান শত্রুকবল মুক্ত করিয়া জাপ-অধিকৃত অঞ্চলসমূহের মোট বিশ কোটি অধিবাসীর মধ্যে নয় কোটি অধিবাসীর মুক্তিসাধন করিয়াছে। অথচ এই যুদ্ধকালেও মধ্যে মধ্যে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাং বিরোধ এবং সজ্বর্ষের কথা শোনা গিয়াছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে এই বিরোধের জন্ত প্রধানতঃ চিয়াং কাই-শেক পরিচালিত ক্যুওমিণ্টাংকেই দোষী মনে হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে 'এক কাঠি বাজে না।'

১৯৪৩ সালের নবেম্বর মাসে উত্তর-চীন হইতে লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইয়াছিলেন যে, চুংকিং জাতীয় সরকার কম্যুনিষ্ট অধিকৃত স্থানগুলির পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন।

পর বৎসর ডিসেম্বর মাসে 'দি ওয়ার য়্যাণ্ড দি ওয়ার্কিং ক্লাস' পত্রিকায় মিঃ এ, আভারিন চুংকিং সরকারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত পাঁচ দফা অভিযোগ করেন—

১। প্রতিক্রিয়াপন্থী, যুদ্ধপিপাসু এবং জয় সম্বন্ধে হতাশ নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক চুংকিং সরকারের নীতি প্রভাবিত হয়। মিঃ আভারিন এই নেতৃবৃন্দকে যুগোস্লাভিয়ার মিহাইলোভিচের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

২। আট লক্ষ জাপ তাঁবেদার চীন সৈন্তের শতকরা নব্বই জন পূর্ব্বে সরকারী সৈন্তদলভুক্ত ছিল। এই সমস্ত সৈন্তের অধিনায়কগণ দেশদ্রোহী মীরজাফরের ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন।

৩। চীনের আভ্যন্তরীণ সম্পদসমূহের উন্নতি সাধন বা তাহার যথাযোগ্য ব্যবহারে জনসাধারণ কোন সরকারী সাহায্য পায় না। পক্ষান্তরে সরকার নিরঙ্কুশ কাটকাবাজির প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

৪। চিয়াং কাই-শেকের অন্তরঙ্গ এবং পরম আস্থাভাজন হো-ইং-চিন প্রমুখ সৈন্তাধ্যক্ষগণ ক্যুওমিণ্টাং বাহিনীর সর্ব্বাপেক্ষা সুসজ্জিত এবং দুর্দ্ধর্ষ অংশকে জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত না করিয়া তাহার সাহায্যে স্বদেশপ্রেমিক কম্যুনিষ্ট বাহিনীকে উত্তর চীনে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন।

৫। সম্মিলিত কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাং সরকার গঠনে বাধা দিয়া ক্যুওমিণ্টাং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ জাতীয় ঐক্য স্থাপনের পথ বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া জাতীয় সমর-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিতেছেন।

যুদ্ধাবসানের পর হইতেই কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাং বিরোধ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া অবশেষে সর্ব্বনাশা গৃহ-যুদ্ধের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কেহ ক্যুওমিণ্টাং এবং কেহ বা আবার কম্যুনিষ্ট দলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ একটি প্রধান শক্তির চুংকিঙে অবস্থিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে অভিযোগ শোনা গিয়াছিল যে, তিনি কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাং সমস্যা সমাধানের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছেন।

অনেকে আশঙ্কা করেন যে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাং বিরোধের অবসান না হইলে অদূরভবিষ্যতেই হয়ত মিঃ জিন্না এবং তাঁহার সাধের পাকিস্থানের চৈনিক সংস্করণের কথা শোনা যাইবে।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, যে সমস্ত কারণে ভারতীয় পাকিস্থানের উদ্ভট কল্পনা সম্ভবপর হইয়াছে, সে সমস্ত কারণ—প্রগতিশীল চিন্তাধারার বাহক একটি রাজনৈতিক দলের সহিত প্রতিক্রিয়াপন্থী অপর একটি দলের মতানৈক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্ত তৃতীয় পক্ষ কর্ত্তৃক শেষোক্ত দলকে প্রশ্রয়দান—চীন এবং ভারতবর্ষে সমভাবে বিদ্যমান।

কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাং বিরোধের অবসান ঘটাইবার দুইটি মাত্র পথ আছে। হয় কম্যুনিষ্টগণকে তাঁহাদের যাবতীয় সৈন্য-সামন্ত, সমরোপকরণ ক্যুওমিণ্টাং দলের হাতে তুলিয়া দিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব লাভের প্রয়াস পরিত্যাগ করিতে হইবে আর না হয় ত ক্যুওমিণ্টাংদলকে রাজনৈতিক একাধিপত্য পরিত্যাগ এবং জনসাধারণের ভোটের অধিকার স্বীকার করিয়া প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাং বিরোধের মূল কারণ কি ? সমাজের মেরুদণ্ড কৃষক সম্প্রদায়কে সর্ব্বপ্রযত্নে রাজনীতিক ছোঁয়াচ হইতে বাঁচাইয়া ক্ষমতা বজায় রাখা ক্যুওমিণ্টাং দলের উদ্দেশ্য। এইজন্তই এই দল আজ পর্য্যন্ত একটিও সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করে নাই। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্টগণ কৃষক সম্প্রদায়কে একটি সক্রিয় রাজনীতিক শক্তিতে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর। জনগণের সাহায্যে স্বদলের শক্তির সংরক্ষণ, সংবর্দ্ধন এবং পরিণামে রাষ্ট্র-কর্ত্তৃত্ব লাভ তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

জাপযুদ্ধকালে কম্যুনিষ্টগণ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য জনসাধারণের হাতে অস্ত্র দিবার দাবি জানাইয়াছিলেন। কুওমিণ্টাং সরকার এই দাবীতে কর্ণপাত করেন নাই। জাপ-যুদ্ধের প্রথমাবধি পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত চীনের অস্ত্রশস্ত্র এবং সর্ববিধ সমরোপকরণের একান্তই অপ্রাচুর্য্য ছিল। চীনের মিত্রবর্গ তাহাকে যে পরিমাণ সাহায্য করিতে পারিতেন তাহার একাংশও করেন নাই। কম্যুনিষ্টগণ বলেন যে, প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত অপ্রচুর যে অস্ত্রশস্ত্র এবং সমর-সম্ভার চীনের ছিল তাহারও ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে কম্যুনিষ্টবাহিনী বঞ্চিত হইয়াছিল।

যত দিন যুদ্ধ চলিতেছিল, কম্যুনিষ্টগণ বার বার কুওমিণ্টাং বাহিনীকর্তৃক কম্যুনিষ্টশাসিত অঞ্চলসমূহের অবরোধ প্রত্যাহার করিবার 'লেণ্ড-লিজ' চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত সমরোপকরণ কম্যুনিষ্ট এবং কুওমিণ্টাংবাহিনীকে সমান ভাবে দেওয়ার এবং একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সর্ব্বময় কর্তৃত্বের অবসান ঘটাইয়া সর্ব্বদলীয় সরকার গঠন করিবার দাবী জানাইয়াছিলেন।

উল্লিখিত দাবিগুলির কোনটিই পূর্ণ করা হয় নাই। স্বীয় নীতির সমর্থনে কুওমিণ্টাং সরকার বলিয়াছেন যে কম্যুনিষ্টগণ অবৈধ ভাবে তাঁহাদের সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং বরাবর শত্রুর সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদান করিয়াছেন।

কুওমিণ্টাং দলের কম্যুনিষ্ট-ভীতি কম্যুনিষ্ট-কুওমিণ্টাং ঐক্যের একটি প্রধান অন্তরায়। প্রথমোক্ত দল মনে করেন যে, কম্যুনিষ্টগণ সুযোগ পাইলেই স্বীয় অধিকৃত অঞ্চলে এমন একটি শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠিত করিবেন যে, তাহাকে তাঁবে রাখা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হইবে না। তাঁহাদের ধারণা যে একবার কম্যুনিষ্ট দলের বৈধতা স্বীকার করিলে কোনক্রমেই আর তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখা যাইবে না।

আগত-প্রায় যুগে অন্যান্য দেশের মত চীনেও প্রগতিপন্থী-দিগের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। কম্যুনিষ্ট ব্যতীত প্রগতিপন্থী আরও রাজনৈতিক দল চীনে রহিয়াছে। একটিমাত্র রাজ-নৈতিক দলের একনায়কত্বের অবসান আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এত দিন পর্য্যন্ত চীনের রাজনীতিক্ষেত্রে কুওমিণ্টাং দলের একাধিপত্য চলিয়াছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহা অসম্ভব। অন্যান্য দলের মতামত উপেক্ষা করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং তাহার প্রত্যেকটিকেই যথাযোগ্য গুরুত্ব এবং মর্য্যাদা দান গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির গোড়ার কথা। জাপ-যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ চীনের সর্ব্বত্র গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রসার লাভ করিয়াছে। তুলনীয়—

"It is the inescapable outcome of the war, and of the widely enlivening effect it has had on the minds of all Chinese even in the lowest strata."—*The Story of China's Revolution* by O. M. Green, p. 115.

জীবনযাত্রা সহজ এবং জীবিকানির্ব্বাহ স্বল্পায়াসসাধ্য না হইলে কোন সংস্কার-প্রচেষ্টাই ফলবতী হইতে পারে না। চীন সরকার এই তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সাধারণ জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় চীনের মত একটা সুবিধা আছে। স্বাবলম্বন চীনের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। গৃহনির্ম্মাণের প্রয়োজন অনুভব করিলে চীন-কৃষক অযথা কালক্ষেপ না করিয়া প্রয়ো-জনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বাসগৃহ-সমস্যা উপস্থিত হইলে কোথায় এবং কি ধরণের গৃহ নির্ম্মিত হইবে আর কাহারাই বা গৃহনির্ম্মাণের অধিকারী হইবে প্রথমতঃ তাহা লইয়া বিভাগীয় কর্তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনব্যাপী তুমুল বাদবিতণ্ডার পর কর্ত্তব্য এবং কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত হয়।

আঘাত যত গুরুতরই হউক না কেন, তাল সামলাইয়া উঠিবার ক্ষমতা চীনের অসাধারণ, অমানুষিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হাঙ্কোর কথা ধরা যাউক। 'টাইপিং' বিদ্রোহকালে এই নগর তিন বার অগ্নিদগ্ধ এবং তিন বার পুনর্নির্ম্মিত হয়। ১৯১১ সালে রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় হাঙ্কো পুনরায় অগ্নিদগ্ধ হয়। কিন্তু দুই বৎসর পরে ১৯১৩ সালে হাঙ্কোতে এই বিপর্য্যয়ের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। কাজেই জাপ-যুদ্ধের ফলে চীনের অপরিসীম ক্ষতি হইলেও যুদ্ধে যোগদান-কারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই চীনই সর্ব্বপ্রথম পা ঝাড়া দিয়া উঠিবে আশা করা হয়ত অযৌক্তিক হইবে না।

মহাচীনের বিরাট জনসমষ্টির শতকরা ৮০ জন কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। জীবনধারণের জন্য ইহারা একান্তভাবেই মাতা বসুন্ধরার করুণার মুখাপেক্ষী। কিন্তু কৃষির উপর অনন্যনির্ভর হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা বর্ত্তমান যুগে সম্ভব নহে। এইজন্যই চীন-সরকার শিল্পোন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ইতিমধ্যেই একটি দশবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। রাস্তা, রেলপথ এবং জলপথে চলাচল ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, দেশের কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি যাবতীয় খনিজ সম্পদের অপচয় নিবারণ ও যথোচিত সদ্ব্যবহার এবং কলকারখানার সংখ্যা বাড়াইয়া জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। জীবন-মরণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাকালেও—অবশ্য প্রধানতঃ এই যুদ্ধ এবং তজ্জাত সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রয়োজনেই—শিল্প-প্রগতি সম্পূর্ণ ব্যাহত হয় নাই। তিব্বত এবং সেচুয়ের মধ্যবর্ত্তী যে সিকঙ প্রদেশের নামও পূর্ব্বে প্রায় অপরিজ্ঞাত ছিল সেই সিকঙই আজ চীনের অন্যতম প্রধান শ্রম-শিল্প কেন্দ্র। উত্তর-চীনেও বহুল পরিমাণে শিল্পের প্রসার হইয়াছে। পশ্চিম চীনে সর্ব্বপ্রকার অনাচার এবং ভূম্যধিকারী-প্রথার কুফল বিশেষভাবে বিদ্যমান। কিন্তু এই অঞ্চলেও যুদ্ধ-পূর্ব্ব অবস্থা আর ফিরিয়া আসিবে না। ব্রহ্মদেশের সহিত

আবার চীনের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। চীন এবং ব্রহ্মদেশের মধ্যে রেলপথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে পশ্চিম এবং দক্ষিণ-চীনের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের কাটতি হইবার পথে কোন অসুবিধাই আর থাকিবে না। ইহার ফলে এক দিকে যেমন দেশের সমৃদ্ধি বাড়িবে অপর দিকে তেমনই আবার রাজনৈতিক ভারসাম্য স্থাপিত হইবার পথও সুগম হইবে।

চীনের সর্ব্বত্র শ্রম-সমবায় সমিতি (Industrial Co-operatives) স্থাপিত হওয়ার ফলে চীন কৃষককে এখন বৎসরের কোন সময়েই আর বেকার বসিয়া থাকিতে হয় না। সমবায় আন্দোলন বিদ্যুদ্বেগে প্রসারলাভ করিতেছে। কিন্তু এখনও বহু শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং যত শীঘ্র তাহা হয় ততই মঙ্গল। সমবায় আন্দোলন চীনে যতই বিস্তারলাভ করুক না কেন, দেশের সমগ্র চাহিদা মিটাইবার মত শক্তি তাহার কোন দিনই হইতে পারে না। এই জন্যই শিল্পোন্নতি চীনের পক্ষে একান্তভাবেই আবশ্যক। কিন্তু শিল্পের উন্নতি এবং প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের কুফলগুলি যাহাতে আত্মপ্রকাশ না করে তাহার প্রতি অবহিত হইতে হইবে। অন্যথা বর্ত্তমানে যে সমস্যাগুলি আছে তাহাদের সমাধান হইলেও নূতন নূতন সমস্যা সৃষ্টির ফলে জটিলতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে এবং শিল্পোন্নতির প্রধান উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

দেশে নূতন নূতন পণ্যোৎপাদন প্রয়োজন। পূর্ব্বেকার মত চা, রেশম এবং অন্যান্য দুই-তিনটি শিল্পের উপর অনন্তনির্ভর হইয়া থাকিলে চলিবে না। মাটির উপর এবং নীচেকার প্রাকৃতিক সম্পদ-সম্ভারের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। পণ্যোৎপাদনের শক্তি এবং পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মীদিগের পারিশ্রমিকের হার বাড়াইয়া তাহাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটাইতে হইবে।

রপ্তানিকারী দেশগুলি চীনের শিল্পোন্নতির সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়া উঠিতে পারে। কারণ শ্রমশিল্পে উন্নত চীন কেবল যে নিজের চাহিদা মিটাইতেই সমর্থ হইবে তাহা নহে, বিদেশের বাজারেও সে প্রথমোক্ত দেশগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু ইহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে অদূর ভবিষ্যতে নিজের প্রয়োজনীয় সস্তা ও খেলো কাপড়চোপড় এবং সাধারণ ঔষধপত্রাদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইলেও চীনকে এখনও দীর্ঘ কালের জন্য উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি, কলকব্জা এবং সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির জন্য প্রধানতঃ বাহির হইতে যোগানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। চীনের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত জিনিষের চাহিদাও তাহার বাড়িয়া যাইবে। কাজেই চীনের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিতে রপ্তানিকারী দেশগুলির আপাততঃ আর্থিক অবনতির কোন আশঙ্কাই নাই। পক্ষান্তরে চীনের সমৃদ্ধি এখনও বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিবে।

ডাঃ সানের আদর্শকে রূপায়িত করিবার পথে বহু অন্তরায় আছে সত্য; কিন্তু ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৫ সাল এই আট বৎসরব্যাপী দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া চীনের নবজন্ম হইয়াছে। নির্ম্মম শত্রুর নিষ্করুণ আঘাত জাতীয় চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী মহাচীনকে স্ব-শক্তিতে আস্থাবান করিয়া তুলিয়াছে। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ডের আক্রমণের ফলে এই ভাবেই স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। নেপোলিয়নের সর্ব্বগ্রাসী রাজ্যলিপ্সার ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবোধের সূচনা এবং বিকাশ ত সেদিনের কথা। আর সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অংশতঃ বাহিরের আঘাতের ফলেই ত অখণ্ড ভারতীয় জাতি-গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল।

জাপ-যুদ্ধের ফলে চীনের গণ-মানসের বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ব্যক্তির উপর পরিবারের প্রভাব হ্রাস একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন। যুদ্ধের ফলে চীনের দৃষ্টিভঙ্গী উদার এবং দৃষ্টি-কোণ প্রসারিত হইয়াছে। চীন নাগরিক আজ নূতনভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। সে আজ চিন্তা করে সমগ্র জাতির কথা। জাতি-মানসের এই রূপান্তরই চীনের সাধনার উত্তরসাধক হইবে।

দেওয়ার আলো

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

"দেওয়ার আলো" জ্বালো জ্বালো, নেওয়ার কথা ভুলে যাও,
অন্ধকারে যে মন আছে আলোয় তারে মুক্তি দাও।
সত্য যারা ব্যক্ত তারা, গোপন তাদের কিছুই নাই,
নির্ভীকতার সাধন তাদের, আসন তাদের সকল ঠাঁই।
খোলা আকাশ তাদের প্রকাশ আপন বুকে ধারণ করে,
অবাক তাদের অবাধ গতি বিমল ভাতি তিমির হরে।
আলোর পথে পথিক তারা পথে পথে তাদের বাসা,
আশার বাণী বহন করে স্বচ্ছ তাদের বুকের ভাষা,
মানুষ তারা সকল তারা মানবজাতির তারাই গুরু,
দৃষ্টি তাদের আগুন-ঝরা প্রেমের রসে কল্পতরু।
দিয়ে গেল, ফেলে গেল, রেখে গেল পথে আলো;
দুনিয়াখানার দুয়ার খুলে পথে "দেওয়ার আলো" জ্বালো।
দুনিয়া শুধু দেওয়ার খেলা, এই খেলা তো নয়কো সোজা,
খেলতে গেলে দেওয়ার ছলে বইতে হবে পথের বোঝা।

শিক্ষায় চিত্র-বিদ্যা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

"For, don't you mark, we're made so that we love
First when we see them painted, things we have passed
Perhaps a hundred times, nor cared to see;
And so they are better painted—better to us,
Which is the same thing. Art was given for that—
God uses us to help each other so,
Lending our minds out."

—BROWNING

চিত্র-বিদ্যাটা আমাদের বর্ণ-বিন্যাস অর্থাৎ লিখতে শিখবার চের আগেই প্রচলিত ছিল। আদিম যুগে মানুষ লিখতে শেখে নি, কিন্তু তার মনের ভাব প্রকাশ করবার প্রয়োজন হয়েছিল। মাটি এবং পরে পাথরের উপর নানা রকম ছবি এঁকে তখন মনের ভাব প্রকাশ করা হ'ত। এই সব ছবিই ক্রমে সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়ে অক্ষরে এসে দাঁড়িয়েছে।

অসভ্য মানুষ যারা তাদের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই, তারা লিখতে পারে না—কিন্তু আঁকতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও লিখন-বিদ্যা প্রচলিত হওয়ার চের আগে প্রাণীদিগের একটা মোটামুটি ছবি (rude expression) এঁকে গিয়েছেন।

প্রতীক চিত্র

বকযন্ত্র

অনন্তের প্রতীক
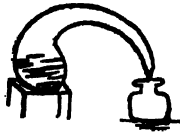
স্বস্তিকা

মানসিক শক্তির বিকাশ হওয়ার প্রথম অবস্থায় কাগজ পেন্সিল বা খড়িমাটি পেলে শিশু যে সব বস্তুর মধ্যে এবং যে সব জীব-জন্তুর সঙ্গে বাস করে চিত্রে তা প্রকাশ করবার চেষ্টা পায়। কারও পরিচালনা ব্যতীত আপনা হতেই শিশু-মনের এইরূপ বিকাশ লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রথমে শিশু যা আঁকবে, তা সাধারণের বোধগম্য না হলেও সে কিন্তু তখনই তার একটা কিছু নাম দেবে।

তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে যা আঁকবে, তার একটা আকার দেখা দেবে। এই সময়ে সে মানুষ, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণী এবং ঘর-বাড়ী ইত্যাদি যে সব জিনিষের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং যে সব জিনিষের সম্বন্ধে তার নির্দ্দিষ্ট ধারণা আছে, তারই ছবি আঁকবে। তারপর মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আঁকবে—ঘরের দরজা-জানালা এবং আরও নানা টুকিটাকি জিনিষ। মানুষের ছবিতে তখন দেখা দেবে হাত-পা, কারও মুখে থাকবে গোঁফ, কারও মাথায় পাগড়ী, কারও বা টুপী।

চিন্তাধারা উন্নতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সে আঁকবে গাছ-পালা, জীবজন্তু, আকাশ, মেঘ, নদীর মধ্যে নৌকা—এই সব। গুলির সামঞ্জস্যটা হয়ত তার ঠিক হবে না, বর্ণ-বিন্যাসও হয়ত ঠিক হবে না।

রাক্ষুসে বুড়ী

গুণটানা

শিল্পী :—চিত্রলেখা—বয়স ৪ বৎসর রেখা চক্রবর্ত্তী—বয়স ১০ বৎসর

শিশুকে প্রথম যে চিত্র আঁকতে দিতে হবে, সে চিত্র হবে তার চিন্তাকে বাইরে প্রকাশ করবার একটা সুযোগ। যে বস্তু এই সে আঁকবে, সেটা হবে সেই জিনিষ যা তার চিত্তে সব চেয়ে পরিষ্কারভাবে রেখাপাত করেছে।

এইভাবে ছবি আঁকায় শিশু-মনের সৃজনী-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং একটা কিছু সৃষ্টি করার মধ্যে যে অনুরাগ, সেটা তার শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এই কাজে শিল্পীর মনে একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সমতা বোধ, এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবার নিপুণতা জাগিয়ে তোলে। তার ফলে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়—যা আর কোনও উপায়ে হওয়ার সম্ভাবনা কম। এই শিল্পকুশলতা এবং সৌন্দর্য্যোপলব্ধি পরিণামে মনে একটা নির্ম্মল আনন্দ এনে দেয়। মনঃশক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও বিকাশ হয় এবং এই শিল্প-কুশলতাকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিচালনা করলে চতুস্পার্শ্বস্থ সুন্দর জিনিষের উপর একটা আকর্ষণ এবং অনুরাগ জন্মে। উত্তর জীবনে রাস্তাঘাট এবং গৃহাদি নির্ম্মাণে, গৃহসজ্জায় এবং সমগ্র চরিত্রে এর সুফল দেখা দেয়।

এই সব কারণে চিত্র-বিদ্যা বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করবার উপযোগিতা যে অপরিসীম সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই।

কিন্তু কিছুকাল আগেও বিদ্যালয়ে যে ভাবে চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'ত, সেটাকে অশিক্ষাই বলা যেতে পারে; কারণ তাতে মনের বিকাশ না হয়ে ক্ষতিই হত বেশী। শিশুর কাছে যা অর্থহীন, এমন একটা চিত্রের আদর্শ তার সম্মুখে রেখে তাকে সেটা নকল করবার আদেশ দেওয়া হ'ত। এইজন্য ছাত্রের পক্ষে তখন চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ক্লাসটা ছিল নিতান্ত নীরস। প্রকৃত চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা এতে হয় না; কারণ

যতক্ষণ না মনে একটা অনুসন্ধিৎসা ও আনন্দের স্ফুরণ দেখা দেয় এবং যতক্ষণ না যে চিত্রটা আঁকতে হবে তাতে সম্পূর্ণ মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষা বলতে আমরা মনের যে অনুশীলনের কথা বুঝি, তা ছাত্র কিছুমাত্র লাভ করতে পারে না।

মাছ বিড়াল

চিত্রলেখা—বয়স আট বৎসর

এইজন্ত যে চিত্র আঁকতে হবে, সে বিষয়ে ছাত্রের মনে যাতে উৎসাহ আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেছেন—

"The boy encouraged to imitate some natural object will ever after see in that object something unseen and unknown to him before, and he will find the time he formerly did not know what to do with henceforth full of pleasurable sensations."

—G. F. Watts

ছবি আঁকতে হলে কি কি জিনিষ প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করা যাক।

চক, কাঠকয়লা, পেন্সিল, রবার, কলম, তুলি, জল, রং এবং কাগজ এইগুলি হচ্ছে চিত্র-বিদ্যার প্রধান উপকরণ।

মনোভাব প্রকাশের উপায় যেমন ভাষা, চিত্রও তেমনি মনের ভাব প্রকাশ করে; কিন্তু প্রকাশ করবার একটা কিছু ভাব বা বিষয়-বস্তু যদি না থাকে তা হলে চিত্রাঙ্কন সৃষ্টির দিক দিয়ে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সেইজন্ত প্রথম শিক্ষার্থীর কাজ হচ্ছে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিষ্কার জ্ঞান ও ধারণা পোষণ করা। অর্থাৎ কোনও একটা জিনিষ আঁকবার চেষ্টা করার আগে সেই জিনিষটার স্বরূপ বুদ্ধি দিয়ে যথাযথ ভাবে বিচার করে দেখতে হবে। দৃষ্টির পিছনে যার যত গভীর চিন্তা থাকবে লেখাটা তার হবে ততখানি যথাযথ। "The eye sees only that which it brings the power to see."

কোনও একটা ছবি আঁকা যে খারাপ হয় তার কারণ, তার পিছনে চিন্তাটা থাকে ভাসা-ভাসা বা অস্পষ্ট। তাড়াতাড়ি কোন জিনিষ এঁকে ফেলার চেয়ে অঙ্কনে প্রবৃত্ত হবার আগে শিশুর পক্ষে ঐ জিনিষের আকৃতি সম্বন্ধে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করাটা ঢের বেশী দরকারী।

চিত্র সাধারণতঃ দু-রকমে করা হয়ে থাকে। কোনও বস্তু দেখে তদনুসারে আঁকা (object drawing) এবং কোনও একটা আদর্শ দেখার পর সেটা শিল্পীর স্মৃতি থেকে আঁকা (memory drawing)।

কিন্তু পৃথিবীতে ত বস্তুর অভাব নেই। সম্মুখে না থাকলেও আমরা স্মৃতি থেকে তাদের আঁকতে পারি। প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীর বস্তুগুলির মধ্যে কোনটি সরল, কোনটি বক্র, কোনটি বা গোলাকার ইত্যাদি—এখন এদের মধ্যে আগে কোন্ শ্রেণীর চিত্র আরম্ভ হবে? এর উত্তর দেওয়া শক্ত। শিল্পকুশলীরা বলেন, সেটা শিল্পীর মনের গড়নের উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণতঃ শিল্পী আগে সরল রেখা দিয়ে আরম্ভ করে তারপর গোলাকার ও ডিম্বাকার এবং তার পর অন্যান্য আকারের ছবি এঁকে থাকে। মনে রাখতে হবে, শিল্পী দৈনন্দিন জীবনে যে সব জিনিষ বেশী দেখে তাদের সঙ্গেই তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ এবং তাদের এঁকেই তার সব চাইতে বেশী আনন্দ। 'সৃষ্টির আনন্দম্' আনন্দের ভিতর দিয়ে গানের মত ছবিকেও ফুটিয়ে তুলতে হবে।

স্মৃতি-চিত্রে সাধারণতঃ কোনও একটা জিনিষ চার-পাঁচ মিনিটের জন্ত দেখতে দিয়ে ওটা সরিয়ে ফেলা হয়। এই অল্প সময়ের দৃষ্টিতে ঐ বস্তু শিল্পীর মনে যে রেখাপাত করে সেইটাই তাকে চিত্রে প্রকাশ করতে হয়।

বিড়াল শূকর
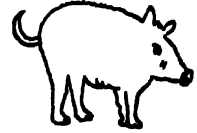
পার্থসারথি—বয়স ছয় বৎসর

পেন্সিলের কাজ শেখবার পর তুলির কাজ; তারপর আলো-ছায়ার সন্নিবেশ। এ ছাড়াও আছে কারু-কাজ (Design), অক্ষর-সন্নিবেশ (Lettering), তলের সমতা, বা অসমতা (Textures) এবং বর্ণ-বিন্যাস (Colouring)। বর্ণ-বিন্যাস সম্বন্ধে সবিশেষ বলা এখানে সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, হলদের উপর কালো রং সবচেয়ে বেশী ফুটে ওঠে এবং সবুজের উপর লাল রং দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবচেয়ে কম।

শিল্পীর মন যখন বস্তুর আকার, বর্ণ ছাড়িয়ে যায় তখন সে হাত দেয় প্রতীকে (symbolic) এবং বৃত্তাঙ্কন বা স্কেচিঙে। প্রতীক-চিত্রের পিছনে থাকে একটা গভীর অর্থ। কেউ কেউ মনে করেন আমাদের দেশের প্রতিমাগুলির মধ্যে এই গভীর অর্থ আছে। কালীমূর্ত্তিকে স্থান (space), কাল (time), ও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের (causality), অতীত মহাশক্তি (eternal power) বলা হয়। দুর্গা প্রতিমাকে কেউ কেউ বলেন, প্রাতঃ, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নের প্রতীক এই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। স্বস্তিকা চিহ্ন (সূর্য্যের গতি, পূর্ব্বে উদয় ও পশ্চিমে অস্তযাত্রা) সৌভাগ্যের প্রতীক। একটা সাপ তার লেজটাকে মুখের মধ্যে দিয়ে বৃত্ত রচনা করেছে, এই ছবিটি হবে অনন্তের (eternity) প্রতীক। বহুর্বাণ কাম বা ভালবাসার চিহ্ন, মিশিতে মুক্তার

ভারবিচার, প্রদীপে জীবন এবং বদ্ধ-ঘরে বুকার বিজ্ঞান। বিভিন্ন দেশে এই রকম বিভিন্ন প্রতীক চলে আসছে।

অঙ্কিত চিত্রের মত বিভিন্ন রংও বিভিন্ন মানসিক অবস্থার প্রতীক। সাদা রং পবিত্রতার, লাল হিংসার, হলুদ ধর্ম ও সভ্যতার, সবুজ প্রাচুর্য্যের, আশা ও যৌবনের এবং কালো রং মৃত্যু, শূন্যতা, দুঃখ বা হতাশার প্রতীক।

কবি যেমন কোনও বিষয়-বস্তুতে তার ব্যক্তিগত অনুভূতি সংযোগ করবার অধিকার রাখেন, শিল্পীও তেমনি বস্তুর দাস নন—বস্তুকে ছাড়িয়েও তার মনের উপলব্ধি কাজ করতে পারে। এখানে শিল্পী স্বাধীন। দৃশ্যাঙ্কন বা স্কেচিঙের কথাই আমি বলছি এখানে। টার্ণারের একখানি সূর্য্যাস্তের ছবি দেখে একটি ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, এটা কি সূর্য্যাস্ত? কিন্তু এমনতর সূর্য্যাস্ত ত দেখি নি কখনও।

টার্ণার উত্তর দিয়েছিলেন, দেখেন নি সত্যি, কিন্তু দেখতে কি চান না?

প্রাকৃতিক দৃশ্য-চিত্রাঙ্কনের মধ্যে একটা স্বাধীন, আত্মহারা ভাব আছে, অসীম আনন্দ আছে। হ্যাজলিট এ সম্বন্ধে বলেছেন—

"One is never tired of painting, because you have to set down not what you know already, but what you have just discovered; with every stroke of the brush a new field of enquiry is laid open; new difficulties arise, and new triumphs are prepared over them."

ডাকা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

মোর যেন মনে পড়ে,
যুগে যুগে আমি তোমারে ডেকেছি
স্ফুট-অস্ফুট স্বরে।
গিরির শিখরে, সাগরের তলে,
ডেকেছি তোমারে নিতি নানা ছলে,
হয়ে কত জীব, কীট ও কীটাণু—
গড়া তব নিজ করে।

২

কভু উল্লাসে কখনো ব্যথায়
ভয় ও যাতনা মাঝ,
ডেকেছি তোমারে, তোমারে ডেকেছি,
হে দয়াল রাজরাজ।
কখনো আরাবে, কভু কাকলীতে
কভু ঝঙ্কারে কভু ব্যাকুলিতে,
কভু সঙ্গীতে, কখনো মন্ত্রে
জনম জনম ধরে।

৩

জড়িত ও মধু নামের সঙ্গে
আমার লক্ষ জপ,
আমার যজ্ঞ, আমার সাধনা,
আমার কৃচ্ছ্র তপ।
মোর আঁখিজলে-ভেজা ওই নাম,
আমার শান্তি, মোর প্রাণারাম,
রসনা বাসনা হৃদি-রসায়ন
ওই নামে মধু ক্ষরে।

৪

ওই নাম মোরে উজান বহিয়া
তোমার চরণে লয়।
নাম-সুরধুনী আমি যে তোমার
দেয় এই পরিচয়।
তব রূপ রস স্পর্শ ও নাম
মোর ধ্যান জ্ঞান তীর্থ ও নাম,
ওই নাম মোর সকল দৈন্য
সকল শঙ্কা হরে।

৫

ও নাম স্মরণে, ও নাম করণে,
আমি হয়ে যাই পর,
আমার বাঁশীতে সুর দেয় আসি
স্বয়ং বংশীধর।
আমি গলে যাই, আমি ডুবে যাই
আমি মিশে যাই, আমি উবে যাই
ক্ষীণ জলকণা মিলাইয়া যাই
অমৃতের সরোবরে।

শিক্ষা ও শরীরচর্চ্চা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

যে-কোন ধর্ম্মসাধন ও কর্ম্মসাধনের জন্যই সুস্থ সবল শরীরের প্রয়োজন, বাস্তব জগতের অতি সত্য এই বাণী আমাদের শাস্ত্রে আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত সমষ্টিগত বা জাতিগত ভাবে ব্যাপক চেষ্টার দ্বারা সবল দেহে উন্নত মন গড়িয়া তোলার উদ্যোগ আমরা করি নাই। ফলে বাঙালীকে জাতি হিসাবে দুর্ব্বল, ভীরু, সৈন্যবিভাগের অযোগ্য ইত্যাদি অপবাদ হজম করিতে হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এদেশের নরম মাটি আর আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য বাঙালীরা কঠোর দৈহিক পরিশ্রমে অপটু। কিন্তু প্রকৃতই কি তাহাই? ইতিহাসে কি বাঙালীর শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় নাই? অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা এ অপবাদ খণ্ডন করা যায়, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সমষ্টিগত ভাবে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা স্বল্পায়ু ও দৈহিক শক্তিতে হীনতর হইয়া পড়িতেছি। যন্ত্রসভ্যতার উন্নতির যুগে আমরা যেন ক্রমেই অল্প আয়ু ও ক্ষীণ স্বাস্থ্যের দিকে আগাইয়া চলিয়াছি। দুই পুরুষ পূর্ব্বেও আমাদের এ অবস্থা ছিল না; দেশে বলিষ্ঠ লোকের এতটা অভাব তখন হয় নাই। ব্যক্তিগত হইলেও একটি ঘটনার উল্লেখ করি। আমার দীর্ঘ ঋজুদেহ পিতামহকে তাঁহার আশী বৎসরের বেশী বয়ঃক্রম-কালেও যেরূপ শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে দেখিয়াছি তাহা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিত। তাঁহার যৌবনকালের একটি ঘটনা এখন অনেকের নিকটই উপকথার মত মনে হইবে, কিন্তু ইহা অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট এবং তাঁহার প্রমুখাৎই শোনা। এক দিন গ্রামের মাইলচারেক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে একা ফিরিবার সময় পথে কালবৈশাখীর সন্ধ্যার ঝড় ও প্রবল শিলাবৃষ্টি সুরু হয়। লোকালয়হীন মাঠের মধ্যে মাথা বাঁচাইবার কোন আশ্রয় নাই। অগত্যা নিকটের এক বিল হইতে আট হাত লম্বা একখানা ডুবানো নৌকা টানিয়া তোলেন এবং উল্টা করিয়া মাথায় ধরিয়া তিনি দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাড়িতে পৌঁছেন। পরদিন সেখানা গরুর গাড়ীতে করিয়া পূর্ব্ব স্থানে রাখিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এরূপ শক্তিমান্ লোক তখনকার সমাজে বিরল ছিল না।

আনন্দোজ্জ্বল স্বাস্থ্য, সাহসবিস্তৃত-বক্ষ, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে উজ্জ্বল সুঠাম দেহ আজকাল খুব বেশী নজরে পড়ে না। অবশ্য ইহার মূলে আছে রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিবিধ পুঞ্জীভূত সমস্যা। বাঙালী জাতি যেন নীরবে মৃত্যুর পথ বহিয়া চলিয়াছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী হইয়াছে আমাদের নিত্য সঙ্গী। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, শহরে উপযুক্ত আলো-বাতাসহীন অঞ্চলে ঘনবসতি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। তদুপরি জীবিকার্জ্জনের সমস্যা কঠিনতর হওয়ায় অন্নবস্ত্রের সংস্থানের নিমিত্ত ছুটাছুটি করিতেই আমাদের জীবন নিরানন্দপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সুখের দিনের কথা উঠিতেই আমরা অতীতের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি; বর্ত্তমান আমাদের আনন্দহীন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

শিক্ষার জন্য দেশে বিদ্যায়তন আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশ—দেহের এবং মনের, মস্তিষ্কের এবং মাংসপেশীর, হৃদয়ের এবং বাহুবলের উৎকর্ষ সাধন করা, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জ্জন ও বুদ্ধিবৃত্তি অনুশীলনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় শিক্ষার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ, সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক স্কুলেই ড্রিল শিখাইবার জন্য শিক্ষক আছেন, অনেক স্থানে খেলাধুলার সরঞ্জামও আছে কিন্তু সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে আন্তরিকতা ও প্রাণস্পন্দনের অভাব। স্কুলে খেলাধুলা করানোর নিয়ম আছে বলিয়াই যেন দায়সারা-ভাবে এ কাজটি সম্পন্ন করা হয়। আমাদের কাছে শারীর-বিদ্যা এখনও সাধারণ বিদ্যার অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া উঠে নাই।

স্কুল-কলেজে শরীরচর্চ্চা শিখাইবার ভার যে সব শিক্ষকের উপর থাকে তাঁহাদের অনেককে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর শিক্ষক আছেন যাঁরা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই বাঁধা-ধরা রুটিন-মাফিক শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহার মধ্যে না আছে বৈচিত্র্য, না আছে বিভিন্ন রুচির প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁহাদিগকে বলা চলে 'আনন্দ হত্যাকারী' (kill joys)। তাঁহাদের শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে শারীর-বিদ্যার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকারের শিক্ষকদিগকে আখ্যা দেওয়া যায় 'পেশীবর্দ্ধনকারী'। অল্পসংখ্যক ছাত্রকে বাছিয়া লইয়া তাহাদের শরীর গঠন, মাংসপেশীর পরিপুষ্টি সাধন ও কোন কোন অঙ্গের শক্তিমত্তার পরিচয় দেওয়ানোই তাঁহারা শিক্ষাদান-কুশলতার নিদর্শন মনে করেন। অবশিষ্ট অধিকাংশ ছাত্রই উপেক্ষিত থাকিয়া যায়। আর এক শ্রেণীর শিক্ষক খেলাধুলার অন্যান্য স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রের ট্রেনিং দিতেই ব্যস্ত থাকেন যেন তাহাদের দ্বারা স্কুলের সুনাম অর্জ্জিত হইলেই সকল ছাত্রের শরীরচর্চ্চার সফলতা প্রমাণিত হইবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যোন্নতির দিকেই যে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, ক্রীড়া-কৌতুকও যে মানসিক শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক এবং খেলাধুলার মধ্য দিয়া যে ছাত্রদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সহযোগিতা জাগাইয়া তোলা যায় ইহা যিনি জানেন ও কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন তিনিই শারীর-বিদ্যার প্রকৃত শিক্ষক। এই শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে ডাঃ এল্. পি. জ্যাকস্ লিখিয়াছেন:

Living becomes an art when work and play, labour and leisure, mind and body, education and recreation are governed by a single vision of excellence and a conscious passion for achieving it. A master of the art of living draws no sharp distinction between his work and play, his labour and his leisure, his mind and his body, his education and his recreation.—*Education through Recreation.*

অর্থাৎ, এমন মানুষের জীবনই ছন্দোময় ও সুষমামণ্ডিত যিনি কাজ ও ক্রীড়ার মধ্যে কোন গণ্ডীরেখা টানিয়া দেন না, যাঁর কাছে শ্রম ও বিশ্রাম, মন ও শরীর, শিক্ষা ও আমোদ সমান আকর্ষণের বস্তু। প্রাণশক্তির জারক রসে তিনি সকল অবস্থা হইতেই আনন্দ আহরণ করিতে সমর্থ।

* * *

ভারতবর্ষ এক নব জীবনের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস সার্থকতার দিকে আগাইয়া যাইতেছে, কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে দেশবাসীকে এখনও বহু অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষণের জন্য যেমন নৈতিক বল, মানসিক দৃঢ়তা, দূরদৃষ্টি ও লক্ষ্যনিবদ্ধ স্থির প্রতিজ্ঞা চাই, তেমনি চাই সাহস, দৈহিক শক্তি, কষ্টসহনশীলতা এবং যে কোন দুঃখকে, এমন কি মৃত্যুকেও হাসিমুখে আলিঙ্গন করিবার মত দৃপ্ত নির্ভীকতা। আশার কথা এই যে, দেশ এ বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিতেছে। গত অক্টোবর মাসে মধ্যপ্রদেশে অমরাবতীতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে প্রথম নিখিল-ভারত শারীর-বিদ্যা সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি. জি. খের বলেন :

. . . physical education and intellectual education are complementary to each other and must be integrated in such a way as to form an organic whole. No man can reach perfection without the full development of body, mind and soul.

শারীর-বিদ্যা ও বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত বিদ্যা উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক এবং শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে উভয়কে একই উদ্দেশ্যে একীভূত করিতে হইবে। দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক উন্নতি ব্যতীত কোন মানুষই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় খেলাধুলা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ খের ঘোষণা করেন যে, বোম্বাই-সরকার সে প্রদেশে শিক্ষাখাতে যত টাকা খরচ করিবেন তাহার অর্দ্ধেক শারীর-বিদ্যার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলেন :

It is first of all necessary to create a mass-consciousness among our young men and women, an intense desire to live healthily, to be able to act vigorously and to be able to sustain a considerable amount of physical strain. For this purpose our whole propaganda machinery, both official and non-official, should act conjointly.
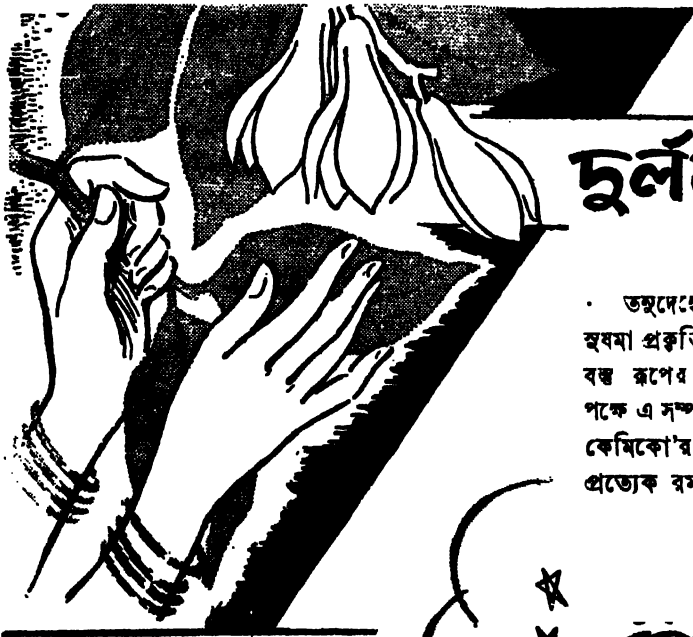
অর্থাৎ "আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে আমাদের তরুণ-

তরুণীদের মনে সুস্থ জীবন যাপনের, তেজের সঙ্গে কাজ করিবার এবং কঠোর দৈহিক শ্রম সহ্য করিবার ক্ষমতা অর্জ্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার। এই উদ্দেশ্যে সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে একযোগে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে।" 'শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' মুছিয়া ফেলিয়া যুবসমাজকে তিনি মানুষের মত বাঁচিতে অনুপ্রাণিত করেন এবং বলেন যে, অটুট স্বাস্থ্যে বাঁচিয়া থাকার আনন্দে তাহাদিগকেই জীবনের জয়গান গাহিতে হইবে। তিনি আহ্বান জানাইয়াছেন :

It is up to you, the youth of the country, . . . to demonstrate the bloom of health and the joy of life and to sing to your countrymen a song of gladness and hope.

নূতন জীবন গঠনের দিনে যুব-সম্প্রদায় এই উৎসাহের বাণীতে নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন।

* * *

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চ্চা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পরিকল্পনা সমিতি বলিয়াছেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার যেমন একটা মান নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইরূপ ঐ বয়সের ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক উৎকর্ষেরও একটা মান (norm) নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে এবং ঐ মানের নিম্নতম যোগ্যতা —যেমন শরীরের উচ্চতা, ওজন, ভারোত্তোলন-ক্ষমতা, দৈহিক কষ্টসহিষ্ণুতা, দ্রুতধাবন-ক্ষমতা, সন্তরণ প্রভৃতি শারীরিক পটুতা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষণা করা হইবে না। শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়া দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সম্পাদনের নিমিত্ত ইহা গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে নিখিল-ভারত শারীর-বিদ্যা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে স্থির হইয়াছে। প্রথম অধিবেশনে সমষ্টিগত ভাবে মহারাষ্ট্রবাসীগণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাহাদের সুন্দর দেহগঠন, নিখুঁত স্বাস্থ্য, অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য ও সাবলীল গতিভঙ্গী উপভোগ্য হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রের বালিকারাও এই অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে যোগদান করিয়াছিল। স্বাস্থ্যে, শক্তিমত্তায় তাহারাও প্রায় পুরুষদের সমকক্ষতা দেখাইয়াছে। একজন দর্শক বলিয়াছেন যে, আগামী দিনে মারাঠা রমণীরাই হইবে ভারত-রমণীর আদর্শ। ভারতের সকল প্রদেশের বালিকারাই যদি স্বাস্থ্যে, শৌর্য্যে ও বিনয়নম্র আচরণে মহারাষ্ট্রের বালিকাদের মত হইতে পারে তবে আমাদের এক নূতন বীর্য্যবান সমাজ গড়িয়া তোলার স্বপ্ন সফল হইবে নিশ্চিত।

আধুনিককালে বাংলার ছাত্রসমাজ অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছে। তাই আশা হইতেছে যে, শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যোন্নতির যে আন্দোলন দেখা দিতেছে ইহাতে হয়ত তাহারা অন্য কোন প্রদেশের পিছনে পড়িয়া থাকিবে না।

উপনিষদের ফারসী অনুবাদ

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

শাজাহান বাদশাহের পুত্র শাহজাদা দারাশিকোহ বিদ্যা-ব্যসনী, জ্ঞানী ও পণ্ডিত বলে তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের আলোচনার জন্যে শাহজাদাকে বহু আয়াস স্বীকার করে অনেক পণ্ডিতের সান্নিধ্য ও সাহায্য লাভ করতে হয়েছিল। তারই ফলে তিনি পণ্ডিতরাজ জগন্নাথজীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হন এবং তাঁর সহায়তায় সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের মধ্যে উপনিষদের স্থান সর্ব্বোচ্চে। শাহজাদা দারাশিকোহ অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয় করে পাঁচ খণ্ড উপনিষদ ফারসী ভাষায় অনুবাদিত করেন।

এই ফারসীতে অনূদিত উপনিষদাবলীর নাম রাখা হয় 'শির্ র আকবর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গূঢ় রহস্য। এই গ্রন্থ কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশিত করা হয়েছিল।

তখন ফারসী ভাষার মুদ্রাযন্ত্র ভারতবর্ষে ছিল না; বহু হস্তলিপিকুশল ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রতি খণ্ড নকল করে শাহ-জাদার নিকটে প্রচুর পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন।

এই হস্তলিখিত পুথিগুলির পাণ্ডুলিপি আজও ভারতবর্ষে—কাশী কারমাইকেল লাইব্রেরী, লাহোর, পঞ্জাব পাবলিক লাইব্রেরী এবং লণ্ডনে—ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

কথিত আছে যে, দারাশিকোহ একবার কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে বহু কাশ্মীরী বিদ্বান্ ব্যক্তির সহিত তাঁর আলাপ হয় এবং সেই সূত্রে তিনি উপনিষদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করেন। পরে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে তিনি কাশী থেকে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে রাজধানীতে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের সাহায্যে এই বিরাট অনুবাদ-কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত হয়।

যতদূর জানা যায়, অথর্ব্ববেদ বিষয়ক পঁয়ত্রিশ খণ্ড, সাম-বিষয়ক এক খণ্ড, ঋগ্ বেদ বিষয়ক তিন খণ্ড ও যজুর্ব্বেদ বিষয়ক এগার খণ্ড উপনিষদ ফারসী ভাষাতে অনুবাদ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও বহু হিন্দু শাস্ত্রের ফারসী অনুবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তা এতই দুর্ব্বোধ্য ও অস্পষ্ট যে তার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই অনূদিত উপনিষদ-সংগ্রহের

নাম কারসী ভাষায় দু' রকম—'শির্‌র আকবর' ও 'শির্‌র্‌ল অসরার'। কারসী অনুবাদ থেকেও উপনিষদ ভাষান্তরিত হয়। অন্‌কুটিল ডুপেরন (Anquetil Duperton) করাসী ও লাটিন ভাষায়ও উপনিষদের তর্জ্জমা করেন।

মনীষী ম্যাক্সমূলর এই অনুবাদ সম্বন্ধে বলেছেন—এই উপনিষদ বিচিত্র ও উচ্চভাবপূর্ণ। এর গূঢ়তত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই গভীর তত্ত্ব-সংবলিত গ্রন্থের তাৎপর্য্য শুধু শোপেনহাওয়ারের মত মহাপ্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

শোপেনহাওয়ার শুধু এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি এর মর্ম্মার্থ এতই সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন যে, জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশের গুণী-জ্ঞানীদের দৃষ্টি এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

কারসী অনুবাদ থেকেই ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

মুণ্ডক উপনিষদে রূপকচ্ছলে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব-স্রষ্টা ভগবান সর্ব্বজীবে ও সর্ব্ব দ্রব্যাদিতে অধিষ্ঠিত আছেন। এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়ে জ্ঞানী লোক ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে বৃথা তর্ক ও কালক্ষেপ করেন না। তাঁরা অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব গভীর ভাবে উপলব্ধি করে মহানন্দে কাল যাপন করেন এবং ক্রমে তাঁদের সাধনা জয়যুক্ত হয়ে তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষোত্তমে পরিণত করে।

উল্লিখিত অংশের কারসী রূপান্তর নিম্নলিখিতরূপ :

"দো পরিন্দ্ খুব অন্দ্ ও হর দো হমেশা হমনশীন হম্ অন্দ্ বরক দীগঢ় রায় অন্দ ও দঢ় এক দরস্ত মীওয়া শন্দ। একে অয়া দো মেও আঁ দঢ়ন্তয়া শীরী দানিস্ত ভী খুরদ দোয় মেঁ। হেচনভী খুরদ্ ও মীবীনদ। মুরদ অভী দো পরিন্দ্ কি একেমী খুরদ ও দীগরে নমী খুরদ ও মীবীনদ আঁকি ভী-খুরদ জীব আত্মা অস্ত ও আঁকি নমী খুরদ ও মীবীনদ পরম আত্মা অস্ত ও মুরদ অব দরস্তবদন ও মুরাদ অজ মেও কি শিরি দানিস্ত জী-খুরদ নতীজাঃ আমাল অস্ত, ও আঁ পরিন্দ কি মেঁ ও আ দরগু মী-খুরদ অবর নাদানী অজ হকীকত খুদ ওয়াকিফ অজ হমী জহত হমেশাঃ দর খিক্র ও আজাঢ় অস্ত বক্তে কি বঢ় হকীকত আঁ পরিন্দ কি চীজে নমী খুরদ ও তমাশা মীবুন্দ মুত্তালা শবদ ও হম্ অজ খুর্দন বাজ মীম।"

এর অর্থ হ'ল এই : একই বৃক্ষে দুটি পাখী গভীর মিত্রতা ও সৌজন্যের সঙ্গে পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে বাস করে। একটি পাখী ঐ বৃক্ষের ফল খুব মিষ্টি মনে করে আহার করে; অপর পাখীটি সাগ্রহে তাই দেখে।

যে পাখীটি ফল খায় তাকে জীবাত্মা ও যে পাখীটি ফল

খায় না তাকে পরমাত্মা বলে কল্পিত হয়েছে। বৃক্ষকে জীবন রূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং তার সুস্বাদু ফলকেই বলা হয়েছে কর্ম্মফল।

যে পাখীটা ফল খায় সে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে এবং নিজের জীবনের আসল উদ্দেশ্যের সহিত তার পরিচয় সংঘটিত হয় নি। শুধু তাই নয় তার এই ফলাহারের বাসনা তাকে ক্রমেই দুঃখ ও দুশ্চিন্তার অভিভূত করে ফেলে। সে তখন তার সহচর অপর পাখীটির প্রতি করুণ নয়নে চেয়ে থাকে এবং তার মত নিঃশঙ্ক ও দুঃখাতীত হতে উৎসুক হয়, ফল খাওয়ার রুচি ক্রমেই তার কমে আসে।

এই অনূদিত অংশ থেকে বোঝা যায় যে ফারসী ভাষায় উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্ব কি সুন্দর ভাবেই না রূপান্তরিত হয়েছে। উক্ত ভাষায় অনুবাদ হুবহু মূলের অনুরূপ হয়েছে।

এমনিভাবে উপনিষদের অনুবাদের ভিতর দিয়ে ইসলাম ভারতীয় সংস্কৃতির এক অপূর্ব্ব সম্মিলন তখন হয়েছিল এবং সেই আদর্শকে সমগ্র দেশবাসী পরম সমাদরে ও গভীর শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছিল।

পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একমত যে, উপনিষদ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত বিশ্ববাসীর সংযোগ স্থাপিত করেছে এবং এই মহৎ কার্য্যের কৃতিত্বের অনেকটা শাহজাদা দারাশিকোহের প্রাপ্য। কারণ তিনিই ফারসী ভাষায় পঞ্চাশ খণ্ড উপনিষদের প্রথম অনুবাদক।

দার্শনিক শোপেনহাওয়ার জার্মান ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ করেন দুপরেনের অনুবাদকে ভিত্তি করে; তাঁর দার্শনিক চিন্তাও বহুলাংশে উপনিষদের প্রভাবে প্রভাবিত।

শোপেনহাওয়ার উপনিষদকে তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সান্ত্বনার উৎস ও মৃত্যুকালীন চরম শান্তিলাভের অবলম্বন বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে উপনিষদের মধ্যে অক্ষয় ও অপার জ্ঞানের ভাণ্ডার নিহিত রয়েছে—যার আলোচনা এক দিন সমগ্র মানব জাতিকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের উপায় নির্দ্ধারণে সহায়তা করবে।*

*এই প্রবন্ধ লিখতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদজী, পণ্ডিত কালীপ্রসাদ পাণ্ডুরং ও মৌলভী মহেশপ্রসাদ আলিম ফাজিলের রচনাবলী থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

খাদ্য ও টনিক

আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সময়ে একটী উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অসুখেই হউক বা সুস্থ অবস্থাতেই হউক, যখনি কোনো কারণে আমাদের জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ একটী টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার প্রধান একটী কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন আহার্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনে দৈনিক আহার্য্যের এই অক্ষমতা টনিকের দ্বারা পূরণ হয়।

কিন্তু টনিক যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন তাহার একটী দোষ এই যে উহাদ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। সাময়িক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহা বিশেষ কার্য্যকরী হইলেও উহার প্রভাব অল্পকালেই নিঃশেষিত হয়। একমাত্র সুনির্ব্বাচিত কোনো খাদ্যদ্বারাই দৈহিক পরিপুষ্টির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর।

স্তানা-ভিটা এই সকল কারণেই একটী আদর্শ পানীয়-রূপে পরিগণিত। ইহা একাধারে একটী শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটী উৎকৃষ্ট খাদ্যকে আশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে। তাই ইহার নিয়মিত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে।

স্তানা-ভিটা সুনির্ব্বাচিত ও মূল্যবান উপাদানসমূহের সুষম সমন্বয়ে প্রস্তুত। ইহাতে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, ভিটামিন "বি" কমপ্লেক্স, মল্টযুক্ত সয়াসীম ও অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাযথরূপে বিদ্যমান। ইহা সুস্থ কি অসুস্থ যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী। বিশেষ করিয়া রোগান্তে, প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে, বার্দ্ধক্যে এবং বর্দ্ধিষ্ণু শিশু ও মস্তিষ্কজীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়া স্তানা-ভিটা রোগান্তে ও বর্দ্ধিষ্ণু শিশুদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য ও টনিক। রোগবিধ্বস্ত শরীরের দ্রুত সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করিতে ও শিশুদের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য-গুণটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাই প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত স্তানা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি সহজেই আমরা এই ভিটামিন যথাযথরূপে পাইতে পারি। অধিকন্তু খাঁটি দুগ্ধ ও কোকো থাকাতে স্তানা-ভিটা মস্তিষ্ক, পেশী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য করে।

স্তানা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিষ্কজীবীদের পক্ষে অপরিহার্য্য। বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কের পুষ্টি ও শক্তি-বর্দ্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মল্টযুক্ত সয়াসীম স্তানা-ভিটার আর একটি অপূর্ব্ব সম্পদ। বস্তুতঃপক্ষে সয়াসীম খাদ্যতত্ত্বের এক বিস্ময়কর অবদান। উদ্ভিজ্জ জাতীয় হইলেও ইহা আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ। স্তানা-ভিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ ও উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে অতুলনীয় বলা চলে। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে প্রোটিন ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও স্নায়ুমণ্ডলীর সুষ্ঠু পোষণ ও সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই অনুপাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন ২'৫ গ্রাম প্রোটিন। প্রোটিনের এই অপরিহার্য্য দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি কাপ স্তানা-ভিটাতে অন্যান্য নানা মূল্যবান্ উপাদান ছাড়াও দুইটী ডিমের সমান প্রোটিন থাকে। প্রত্যহ দুই কাপ স্তানা-ভিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। উপরন্তু মল্ট ও সয়াসীম থাকাতে স্তানা-ভিটা কেবল যে সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অন্যান্য খাদ্য পরিপাক করিতেও এই অপূর্ব্ব খাদ্য-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে।

প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে জননীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঐ সময়ে নিয়মিত স্তানা-ভিটা ব্যবহার করিতে দিলে যাবতীয় অশুভ উপসর্গ হইতে সহজেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। স্তানা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো ও অন্যান্য মূল্যবান উপাদান থাকাতে ইহা দ্রুত মাতৃদেহের সংস্কার:ও পুষ্টিবিধান করে। চর্ব্বি, প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ-গঠনোপযোগী ও শক্তিবর্দ্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত সহজপাচ্য অবস্থায় স্তানা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়।

স্তানা-ভিটা কি সুস্থ কি অসুস্থ সকলের পক্ষেই সমান উপকারী। যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। স্তানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও সুমিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্তিদায়ক। ইহা গরম বা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে।

বিজ্ঞাপন

পুস্তক-পরিচয়

কথাশিল্প—শ্রীরাধারাণী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

এখানি গল্প-সংগ্রহ। আধুনিক কালের বিভিন্ন লেখকের লেখা চৌদ্দটি ছোট গল্প আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, সুবোধ বসু, 'বনফুল', বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, সরোজ রায় চৌধুরী, গজেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়—ইঁহারা এই চতুর্দ্দশটি গল্পের লেখক। রচনার সঙ্গে সম্পাদকদ্বয় লেখকদের জীবনেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থপ্রকাশের ইতিহাস এইরূপ :— ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন, এই সংগ্রহপুস্তক তাহারই ফল। গল্পগুলি সুনির্ব্বাচিত। গ্রন্থ সুপাঠ্য, সুমুদ্রিত, সুসম্পাদিত।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দর্শন ও বিপ্লব—শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়। জিজ্ঞাসা—১৩৩-এ, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৫, মূল্য পাঁচ সিকা।

এখানি গ্রন্থকারের ইংরেজী দার্শনিক প্রবন্ধের অনুবাদ-পুস্তক। অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসমরেন রায়। বস্তুবাদ ও বাস্তব আদর্শবাদ, বিপ্লবের ইতিহাস এবং জাতীয়তাবাদের আদর্শ এই তিনটি প্রবন্ধ এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় সাম্যবাদী লেখকগণের মধ্যে মানবেন্দ্র রায় একজন শক্তিশালী লেখক। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এই ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ লেখক খুব কমই আছেন। কিন্তু তাঁহার সকল লেখাই ইংরেজী ভাষায়। এজন্য মানবেন্দ্র রায় ওরফে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের লেখা নিছক বাংলা জানা পাঠকের অপরিচিত। বর্ত্তমান অনুবাদগ্রন্থ কতকাংশে এই অভাব দূর করিবার প্রয়াস। লেখকের চিন্তাধারা বাস্তবপন্থী এজন্য ভারতীয় অধ্যাত্ম-চিন্তার সহিত ইহার ঘোর বিরোধ। মানবেন্দ্রনাথ আদর্শের দিক দিয়া পাশ্চাত্যের সহিত ভারতের কোন মূলগত পার্থক্য একেবারেই অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে একমাত্র বিপ্লবের ভিতর দিয়াই ভারতবাসীর ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইবে, কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান কংগ্রেসী নীতি এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র ও জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আস্থা নাই এবং ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তিনি নিছক জড়বাদী বা বস্তুবাদীর চোখেই দেখিয়াছেন। ভারতের জাতীয়

জীবনে রামকৃষ্ণনাথের প্রভাব বিশেষ প্রবল না হইলেও তাঁহার চিন্তার সহিত পরিচয়ের আবশ্যকতা যাঁহারা স্বীকার করেন এরূপ শিক্ষিত পাঠক-মহলে এই পুস্তকের প্রচার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অনুবাদের ভাষা সরল হইয়াছে।

নারীর অধিকার—শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল। শিল্প-সম্পদ প্রকাশনী, ৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১০৪, মূল্য পনর আনা।

লেখক সাতটি অধ্যায়ে নারীর মর্যাদা, সমাজ-ব্যবস্থায় নারী, পিতৃকুলাত্মক পরিবার ও নারী, নারী-আন্দোলন, নারীর অধিকার, খসড়া হিন্দু-আইন এবং নারী-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, গ্রন্থকারের আলোচ্য বিষয় ভারতের হিন্দু নারী। ভারতের হিন্দু সমাজে নারী অতি প্রাচীন কাল হইতেই এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে নারীদের অবদানও কিছু কম নহে। শাস্ত্রাদিতেও নারীকে খুব উচ্চ-স্থানই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ভারতীয় নারীর অবস্থা অতি শোচনীয়। জাতির প্রকৃত উন্নতি এই নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও তাহার সত্যকার অধিকার প্রতিষ্ঠার উপরেই নির্ভর করে। লেখক খসড়া হিন্দু আইনের সমালোচনায় দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান জগতের অন্যান্য দেশের নারীর অবস্থার তুলনায় প্রস্তাবিত হিন্দুনারীর অধিকারগুলি খুবই বিপ্লবাত্মক নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নানা প্রতিষ্ঠান এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছে। আমাদের মনে হয় ভারতের জাতিগঠন কেবলমাত্র আংশিক ভাবে হিন্দু আইন সংশোধন দ্বারা সম্ভব হইবে না। যুক্তি এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে এরূপ আইন প্রণয়ন দরকার যাহা সম্প্রদায় ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রয়োগ করা চলিবে। ধর্ম্মকে সর্ব্বসাধারণের অধিকারের এলাকা হইতে সরাইয়া ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর্ভুক্ত রাখা উচিত। নারীকে তাহার নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পুরুষ-জাতির তাহাদিগকে পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা—শ্রীমনোমোহন ঘোষ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ ও বিশাল নাট্যসাহিত্য প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ নাট্যকলার নিদর্শন হিসাবে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু নৃত্য-গীত-বাদ্য-বিদ্যাদির মত প্রাচীন ভারতীয় নাট্যবিদ্যারও যথার্থ স্বরূপ আজ আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ, দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের দেশে এই বিদ্যার সম্যক্ অনুশীলন অপ্রচলিত—সম্প্রদায়-বিচ্ছেদের ফলে তাই আমরা বহু বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। আধুনিক পণ্ডিতসমাজ এই সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে সেই প্রয়াসের কিছু নমুনা পাওয়া যাইবে। প্রাচীন ভারতীয় নাটকের স্বরূপ ও তাহার প্রয়োগ-বিষয়ক রীতিনীতি সংক্ষিপ্ত ও যথাসম্ভব সরলভাবে এই গ্রন্থে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। তবে এ জাতীয় ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক অস্পষ্টতা ও পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের মতানৈক্য অপরিহার্য। যথোচিত প্রমাণ-নির্দেশের অভাবে গ্রন্থকারের কতকগুলি উক্তি জিজ্ঞাসু পাঠকের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে। বিবাহ ও গৃহপ্রবেশে নাট্যানুষ্ঠানের অপরিহার্যতা, দৃশ্যনাট্যের মধ্যে গীতবাদ্যের বাহুল্য উদাহরণ ব্যতীত ভাল বুঝা যায় না।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাংলার বীর সন্তান বিজয়সিংহ মাত্র সাত শত অনুচর লইয়া অদ্ভুত সাহস ও বিক্রমের সহিত সুদূর লঙ্কার দুর্গভালে বাংলার জয় পতাকা প্রোথিত করিয়া স্বীয় নামানুসারে বিজিত দ্বীপের নাম রাখিয়াছিলেন "সিংহল"।

বাঙালীর সেই শৌর্য্য বীর্য্য আজ কাহিনীতে পর্য্যবসিত—স্বাস্থ্যহীনতার জন্য জাতীয় জীবন প্রতিপদে ব্যাহত।

ল্যাড্‌কোভাইন

স্বাস্থ্যহীনতার গ্লানি দূর করে। এই সুবিখ্যাত টনিকটির প্রতি বিন্দু শক্তি, পুষ্টি ও উদ্যমের শ্রেষ্ঠ পরিবেশক।

ল্যাড্‌কোভাইন

আদর্শ টনিক ওয়াইন

লিষ্টার এণ্টিসেপ্টিকস্ · কলিকাতা

A. A. S.

অসময়—শ্রীসুরুচি সেনগুপ্ত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮ সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

কুমারী করতোয়ার গৃহশিক্ষক সজল তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া তরুণ বয়সে যে কল্পনার স্বর্গ রচনা করিয়াছিল বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ধনীর দুলালী করতোয়ার বিবাহ হইল উচ্চশিক্ষিত অভিজাত বংশীয় উদয়ের সঙ্গে। কিন্তু অদৃষ্টচক্রের আবর্তনে করতোয়াকে পুনর্বিবাহিতা হইতে হইল সেই সজলের সঙ্গেই। এই পূতচরিত্র নারীর জীবনে পর পর দুইটি পুরুষের আবির্ভাবে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই লেখিকা এই কাহিনীটির ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কাহিনী বর্ণনে অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টির প্রয়াস নাই, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের বাহুল্যও নাই। প্রবহমাণ নদীর মত গল্পের ধারাটি সাবলীল গতিতে স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। নিসর্গ-চিত্রণেও লেখিকার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। জায়গায় জায়গায়, হালকা তুলির টানে আঁকা রেখাচিত্রের মত, তিনি সামান্য দু'চারটি কথায় নৈসর্গিক দৃশ্যের বড় সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন।

শয়তানের জাল—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পুস্তকের নাম হইতে মনে হয় যে, ইহা একটি ডিটেকৃটিভ কাহিনী। আসলে কিন্তু, ইহা তেরোশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষকবলিত বাংলার পটভূমিকায় রচিত একটি কিশোর-উপন্যাস। বিগত মহাযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে ধনী, মুনাফাখোর, চোরাকারবারী প্রভৃতি 'শয়তানের দলে'র লুণ্ঠন ও শোষণ-প্রবৃত্তির ফলে বাংলাদেশের, বিশেষতঃ মহানগরীর বুকের উপর ধ্বংসের যে তাণ্ডব লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায়, সরস ভঙ্গীতে লেখক তাহারই একটি নিপুণ আলেখ্য আঁকিয়াছেন। উপন্যাসের নায়ক মাধব—একটি চতুর্দশ বৎসর-বয়স্ক কিশোর। মন্বন্তরের দুর্দিনে মহানগরীর পথে পথে তাহার চরম দুর্গতির কাহিনী কিশোর পাঠকপাঠিকাদের চিত্তকে বেদনায় ভারাক্রান্ত এবং চক্ষুকে অশ্রুসজল করিয়া তুলিবে। বইটির একটি বিশেষ সার্থকতা এই যে, ইহা পাঠে পরিপূর্ণ প্রাচুর্যের মধ্যে বাংলাদেশে এই চরম দুঃসময় কেন আসিয়াছিল কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের মনে সেই প্রশ্ন জাগিবে এবং লেখকের মন্তব্যগুলি তাহাদিগকে সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে সাহায্য করিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ইহলোক ও পরলোক—শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত। ৬২ এল, তিলজাশেখর, বেনারস সিটি হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য আড়াই টাকা।

মানবাত্মার ইহলোক হইতে পরলোক যাত্রার বৈজ্ঞানিক গবেষণাপূর্ণ এই পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম। লেখক স্বয়ং উচ্চশিক্ষিত এবং এই বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিবার জন্য ইউরোপ-আমেরিকাও ঘুরিয়া আসিয়াছেন। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে কিরূপ গবেষণা করিতেছেন এবং লেখক স্বয়ং এই তত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে লিখিয়াছেন। তিনি পরলোকগত আত্মাদের নিকট হইতে প্রেতচক্রে যে সব গুহ্যকথা জানিয়াছেন—অত্যন্ত আশ্চর্যের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে, তাহার সমস্তই ঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রের সহিত মিলিয়া যায়। বর্তমান নাস্তিকতার যুগে মানুষের ধর্মানুভূতি জাগাইবার জন্য এইরূপ পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাঁহারা জগৎকে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহা পাঠে আনন্দিত হইবেন।

অন্নদাতা—কৃষণ চন্দর। অবন্তী সান্যাল কর্তৃক অনূদিত। ইণ্টার ন্যাশনাল পাব্‌লিশিং হাউস, ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

উর্দু সাহিত্যের শক্তিশালী লেখক কৃষণ চন্দরের এই ক্ষুদ্র

উপন্যাসখানি বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত। পুস্তকখানির অসাধারণত্ব প্রতি পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান। একজন ভিন্ন প্রদেশবাসী, ভিন্ন ভাষার লেখক বাংলার সেই দুর্দ্দিনের দুঃখকে কতখানি সহানুভূতির সহিত দেখিয়া কিরূপ অগ্নিময় ভাষায় তাহার চিত্র আঁকিয়াছেন, দেখিয়া বিস্মিত আনন্দে বুক ভরিয়া উঠে। সাহিত্যের এই মহার্ঘ্য অবদানটিকে যিনি বাংলায় রূপান্তরিত করিয়াছেন তাঁহার কৃতিত্ব এমনি যে একবারও মনে হয় নাই, অনুবাদ পড়িতেছি।

মায়ের আশীর্ব্বাদ—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী। (দ্বিতীয় সংস্করণ) ২৮।৪এ, বিডন রো হইতে পি, দাশ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

লেখিকা বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিতা। বাঙালী-ঘরের কন্যাবধূ ও জননীর চরিত্র অঙ্কনে তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ। পুস্তকখানি যে জনসমাদর লাভ করিয়াছে উহার দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ। ছাপা ও বাঁধাই আধুনিক রুচিসম্মত।

আবির্ভাব—শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার বি.-এ। ৮।৭।১এ, হাতীবাগন রোড—ইণ্টালী, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

যীশুখৃষ্টের বিষয় অবলম্বনে লিখিত ভক্তিরসাশ্রিত নাটিকা। প্রথমতঃ ইহা বেতারে অভিনয়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল। রচনাগুণে নাটিকাখানি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেকটি চরিত্র সু-অঙ্কিত এবং সংলাপগুলিও সরল এবং সুন্দর।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

সর্ব্বমঙ্গলা-বিদ্যাপীঠ—শ্রীতারাপদ রাহা। মডার্ণ পাবলিশার্স, ৬, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

অনুপম প্রথম জীবনে লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিয়া উচ্চ আদর্শের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ সরস্বতীর সাধনায় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিণতির স্বপ্ন দেখিয়া, এম-এ পাস করিয়া মাত্র পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় এক স্কুলে চাকুরী গ্রহণ করিল, যাহার নাম সর্ব্বমঙ্গলা-বিদ্যাপীঠ। ইহাকে একটি বে-সরকারী আদর্শ উচ্চ ইংরাজী স্কুল বলা যাইতে পারে। এই শিক্ষকজীবনকে কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হইল তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া অনুপম বৌদির প্রতি শেষ চিঠিতে লিখিয়াছে—"অনেক আশা করে এখানে মাষ্টারী করতে এসেছিলাম। মনে করেছিলাম, এখানে কত ঋষি, মহর্ষি, আরুণি, উপমন্যুর দেখা মিলবে। সে ভুল আমার কেমন করে ভেঙেছে, সে কথা তুমি জানো।" শিক্ষকদের উপর দেশের আশা-ভরসাস্থল তরুণ ছাত্রগণের জীবন ও চরিত্রগঠনের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা ও অনুকম্পার ভাব কোন স্বাধীন প্রগতিশীল জাতির মধ্যে দেখা যায় না। বিভূতিবাবুর 'অনুবর্ত্তনে'র ন্যায় তারাপদবাবুর 'সর্ব্বমঙ্গলা-

বিদ্যাপীঠ'ও এদিকে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কনক-বৌদি ও অনুপমের মধুর স্নেহপূর্ণ সম্বন্ধ, প্রভাত ও নীলার বিয়োগান্ত পরিণতি এরূপ সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে উপন্যাসের সার্থকতা এখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইখানির গোড়ার দিকে আদর্শ-চরিত্র শিক্ষকগণের কথাবার্ত্তায় একটু মাত্রাধিক উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রথম প্রণাম—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। রবীন্দ্র পাবলিশিং হাউস, ৪০ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

'প্রথম প্রণাম' অপূর্ব্ববাবুর প্রথম উপন্যাস,—পড়িয়া আমাদের ভালই লাগিল। কোনও বিশেষ দোষগুণ এই অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন উপন্যাসটিতে ফুটিয়া উঠে নাই। সাধারণ পাঠককে ইহা আনন্দদান করিবে, কারণ ইহা মনস্তত্ত্বের জটিল গ্রন্থিজালে অথবা কোন সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার তর্কালোচনায় অথবা ভারাক্রান্ত নহে। গল্পটি সুখপাঠ্য, ভাবোচ্ছ্বাস বা বর্ণনার আতিশয্যদোষ হইতে মুক্ত। চরিত্রাঙ্কনেও বিশেষ ত্রুটি ধরা পড়ে না। জমিদার পিতার ধনমদগর্ব্বিতা ও বালিগঞ্জের এক অতি-আধুনিক কলেজে সহশিক্ষার ফলে উন্মার্গগামিনী নায়িকা অশোকার বিপরীতে তাহার বিবাহিত স্বামী ডাক্তার প্রণবের উদার-কোমল অথচ অনমনীয় দৃঢ় চরিত্র সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে অশোকার পূর্ব্বপ্রণয়ী সমীরকে শেষের দিকে একেবারে লম্পট পর্য্যায়ভুক্ত করা অসঙ্গত মনে হইল। প্রণবের বন্ধুপত্নী স্বামীবিয়োগ-বিধুরা সরমার চরিত্র-পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে।

গ্রিমের রূপকথা—শ্রীতারাপদ রাহা। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ইংরেজী অনুবাদ-সাহিত্যে গ্রিমভ্রাতৃদ্বয় সংগৃহীত জার্ম্মানীর উপকথাগুলি সর্ব্বজনবিদিত। ইতিপূর্ব্বে এই রূপকথার ভাণ্ডার হইতে অধিকাংশ গল্প অনেকে বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন, তারাপদ বাবু মাত্র বারটি গল্প ইহা হইতে নির্ব্বাচিত করিয়া সরস মনোহর ভঙ্গীতে ছেলেদের জন্য লিখিয়াছেন। প্রচুর চিত্র বইটিকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া ছেলেদের নিকট গল্পগুলিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়াছে। গল্পের সংখ্যা আরও বাড়ানো সমীচীন ছিল।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দেশ-বিদেশের কথা

উত্তরপাড়ায় নিখিল-বঙ্গ আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা

বিগত ১লা জানুয়ারি, ১৬ই পৌষ, বুধবার অপরাহ্নে উত্তরপাড়ার "হরিনারায়ণ স্মৃতি-পাঠাগারে"র ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে এক নিখিল-বঙ্গ আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত পাঠাগারের উদ্যোগে এইরূপ প্রতিযোগিতার ইহা দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। ইহার বিভিন্ন বিভাগে শিশু, বালক-বালিকা, মহিলা এবং বয়স্ক প্রতিযোগিবৃন্দ যোগদান করেন। "হরি-ভবনে"র বিরাট প্রাঙ্গণ দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সভার বহু সাহিত্যসেবীরও সমাবেশ হইয়াছিল। অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন কথাশিল্পী শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কবি শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। প্রতিযোগিতার বিচারকের কার্য্য করেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি উত্তরপাড়ার পৌর-প্রধান শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে সমাগত সাহিত্যিক এবং শ্রোতৃবৃন্দকে সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রতিযোগিতার তালিকায় ১১৫ জনের নাম থাকায় ইতিপূর্ব্বে ২৮শে ডিসেম্বর একটি প্রাথমিক প্রতি-যোগিতার অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে বিচারক ছিলেন শ্রীশ্যাম মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাধাশ্যাম ঘোষ এবং শ্রীসুধীর সেনগুপ্ত। আবৃত্তি, বিশেষতঃ শিশুদিগের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছিল। প্রতিযোগিতার পর বিচারকদ্বয় আবৃত্তি ও পাঠাগার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রধান অতিথি কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিবার কালে বাস্তববাদ ও রোমান্টিসিজমের ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি তাঁহার অভি-ভাষণে বলেন, "গ্রন্থাগার সম্পর্কে উত্তরপাড়ার যথেষ্ট ঐতিহ্য আছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের এক সংস্কৃতিগত দুর্য্যোগের সম্মুখীন হইতে হইবে। পাঠাগারকেই দীর্ঘকালের সংস্কৃতির বাণী বহন করিতে হইবে।" সভ্যবৃন্দের সহযোগে সংগঠক শ্রীবিজয় রায় এবং সম্পাদক শ্রীপাঁচু মুখোপাধ্যায় উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

কলিকাতায় মূকবধির ছাত্রদের শিল্প-প্রদর্শনী

বিগত ৪ঠা পৌষ, ২৯৩ নং আপার সার্কুলার রোডে মূকবধির শিক্ষক-সম্মেলনের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতা এবং মফস্বলের কয়েকটি মূকবধির বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ১৯৪০ সন হইতে এ ধরণের প্রদর্শনীর সূত্রপাত হয়। ১৯৪৪ সনে ৭১ নং তারক প্রামাণিক রোডে মূকবধিরদের যে শিল্প-প্রদর্শনী হয় বাংলার তদানীন্তন গবর্ণরের পত্নী মিসেস কেসি তাহার উদ্বোধন করেন। বর্ত্তমান বৎসরের প্রদর্শনীর উদ্বোধন-কার্য্য লাটপত্নী লেডী বারোজ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে মূকবধির বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে যে সভা হয় তাহাতে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত এ. সি. সেন এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কয়েকজন মূক ছাত্রকে কথা বলাইয়া তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করেন। পঞ্চানন প্রামাণিক নামে একটি ছাত্র দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ পাঠ করে। মূকবধির শিক্ষক সম্মেলনের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রমোহন মজুমদারও সভায় বক্তৃতা করেন।

ডাঃ কে. কে. রায়

কেশবকৃষ্ণ রায়

যশস্বী চিকিৎসক কেশবকৃষ্ণ রায় ডাঃ কে. কে. রায় নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন জুয়েলার। স্কুল ত্যাগ করিয়া কেশবকৃষ্ণ প্রথম জীবনে পিতৃব্যবসায় অবলম্বন করেন। উচ্চশিক্ষার আহ্বান তাঁহাকে কিন্তু স্থির থাকিতে দিল না। পরিণত-যৌবনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া তিনি একসঙ্গে কলেজে অধ্যয়ন করিতে এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, একান্ত সাহস এবং সঙ্কল্পে দৃঢ়তা ছিল তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর জ্ঞান আহরণ করিতে কেশবকৃষ্ণ আমেরিকা যাত্রা করেন। ১৯১৫ সালে ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিভার্সিটি হইতে এম.ডি. ডিগ্রী লাভের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই এক জন শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক রূপে গণ্য হন। পাশ্চাত্য শিক্ষার আভিজাত্য তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করে নাই। বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক রূপেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। প্রাদেশিক এবং সর্ব্বভারতীয় হোমিওপ্যাথিক কন্‌ফারেন্সে তিনি বহু বার সভাপতির পদে বৃত হন। বিহার এবং যুক্ত প্রদেশের চিকিৎসক-সম্মেলনেও তিনি সভাপতিত্ব করেন। হিন্দু মহাসভা কর্ত্তৃক তিনি কলিকাতার উত্তর বিভাগের সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হন। ছয় পুত্র, তিন কন্যা, অসংখ্য বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩, প্রায় ষাট বৎসর বয়সে সহৃদয়, নিরভিমান, পরোপকারী, প্রতিভাবান চিকিৎসক ডাক্তার কেশবকৃষ্ণ রায় তাঁহার চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ ভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

—

ভ্রম সংশোধন

("বঙ্গে ধর্ম্মান্তরকরণ ও তাহার প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা")

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭২	২	৩	আইন	অছিলা
ঐ	ঐ	৩৫	সপক্ষে	সম্বন্ধে
৩৭৩	১	১১	প্রৈভিনিয়াস	প্রৈভিনিয়ান
ঐ	ঐ	২৭	ধর্ম্মনবাদ	ধর্ম্মাদি
ঐ	২			
ঐ	ঐ	২০	ডিয়াবেট্	ডিরেলট্
৩৭৪	১	২২	বিভাগের	বিভাগেও
৩৭৬	১	১৪	সাত	শত
ঐ	২	২৭	পথ	চাপ

ইহা ছাড়া, ৩৭৩ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের পাদটীকা দ্বিতীয় স্তম্ভের ১৩শ পঙ্‌ক্তিতে "খ্রীষ্টান করিতে লাগিয়া গেল।"-এর পরে বসিবে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রণতি

শ্রীবৈদ্যনাথ দাস

পারকোটের পথে গান্ধীজী

সিরন্দির প্রার্থনা-সভা। গান্ধীজী আমতুস সালামের অনশনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৫৩

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কংগ্রেস, লীগ ও গণ-পরিষদ

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশনের ৬ই ডিসেম্বরের বিজ্ঞপ্তি মানিয়া লওয়ার পর করাচিতে লীগ-কমিটির অধিবেশন বিগত ২৯শে জানুয়ারী হয়। তাহাতে নূতন কিছুই হয় নাই, পুরান চালই আবার চালিবার ব্যবস্থা হয় এবং সেই সঙ্গে নানাপ্রকার অনুযোগ-অভিযোগ এবং আস্ফালনও হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি পূর্বেকার মতই আছে, প্রভেদ এইমাত্র যে লীগদল গণ-পরিষদ অচল করা ছাড়াও আরও কয়েকটি অভিযান চালানোর চেষ্টা করিতেছে। বলা বাহুল্য, এইরূপ পরিস্থিতি ভিন্ন অন্য কিছু ঘটিবার কথা আশা করাই অন্যায় ছিল। লীগের পুঁজিতে যাহা কিছু আছে তাহার আন্দাজ এদেশ অনেক দিন যাবৎ পাইয়াছে এবং সেই কারণেই অতি বড় আশাবাদী বা অতি ক্ষীণবুদ্ধি লোক ভিন্ন অন্য কেহই অবস্থার উন্নতির আশা করে নাই। এখন দেখিবার বিষয় কংগ্রেস লর্ড ওয়াভেল ও তাঁহার লীগের কার্যক্রমের সম্মুখে কিভাবে দাঁড়ায়। দাঁড়াইতে কংগ্রেসকে হইবেই কেননা এখন পদত্যাগ বা পরিষদ ত্যাগ প্রায় আত্মঘাতী হওয়ার সমান। প্রশ্ন কেবল মাত্র কংগ্রেসের কর্তব্য কি।

কংগ্রেসের সম্মুখে এখন নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দিতেছে। প্রথমতঃ ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশনের খসড়া অনুযায়ী কার্যক্রম সচল করিতে হইলে লীগ ও অন্যান্য ছোটবড় কংগ্রেস-বিরোধী দলের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া হওয়া দরকার। এইরূপ "সমঝোতা" জাতীয় বুঝাপড়া সর্বদাই নির্ভর করে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে আন্তরিক বিশ্বস্ততা এবং সদিচ্ছার উপর। সেখানে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যেকার ব্যবধান সঙ্কুচিত হওয়া প্রয়োজন, দুই দলের মধ্যে বিরোধের মূল কারণগুলি দূর হওয়া প্রয়োজন কিম্বা অন্ততঃ পক্ষে সে সকলের প্রতিকারের এমন একটা পথ নির্দেশ প্রয়োজন যাহাতে ঐ সকল বিরোধের দরুণ আবার অরাজকতা ও হত্যাকাণ্ডের আগুন প্রজ্বলিত না হইতে পারে। প্রকাণ্ড বিপ্লবের সূত্রপাত হইলেই যাহাতে সালিশী বা বিচারের দ্বারা ন্যায়-নিষ্পত্তি হইতে পারে, যাহাতে শান্তির মধ্যে ধর্মসঙ্গত ভাবে আপোষ হইতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থায় উভয় পক্ষের নেতৃবর্গ চুক্তিবদ্ধ হইলে এই বৈরিভাব দূর হওয়া সম্ভব, অন্যথায় নহে।

লীগের সঙ্গে ঐরূপ চুক্তির সম্ভাবনা ক্রমেই সুদূরপরাহত হইতেছে। তাহার মূল কারণ দুইটি এবং সেই দুই কারণ লীগের অস্তিত্বের সহিত জড়িত। লীগের মূল উদ্দেশ্য হিন্দুকে দাসত্বে আবদ্ধ করিয়া ভারতে মধ্যযুগের মুসলমান সাম্রাজ্যবাদের পুনর্গঠন। মুখে নানা প্রকার অন্য মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়া অন্যের চক্ষে ধূলা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা যতই হউক, কার্যতঃ বাংলাদেশে ও সিন্ধুপ্রদেশে লীগ শাসনের বাস্তব চিত্রে ভুক্তভোগী হিন্দুর মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি ও বিচার শক্তি এখনও আচ্ছন্ন হয় নাই তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছে লীগের প্রকৃত স্বরূপ কি। লীগের আধিপত্যের মধ্যে হিন্দুর ধন প্রাণ মন, স্বাধীনতা বা ধর্ম কোন কিছুই থাকিতে পারে না। তিন শত বৎসর পূর্বে যে অমানুষিক বর্বরোচিত ব্যবহার মুসলমান সাম্রাজ্যবাদ হিন্দুর উপর চালাইয়াছিল, যে অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া হিন্দু—মারাঠা, রাজপুত, শিখ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জাতি ও শ্রেণী—বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া নিজের হাতে ক্রমে ক্রমে মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙিয়া গুঁড়া করে, আজ লীগের লুব্ধ নেতৃবর্গ সেই লুপ্ত প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখিতেছে। ইংরেজ এদেশ অধিকার করে হিন্দুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, হিন্দুর ঘরে বিবাদ লাগাইয়া; তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা প্রবল ভাবে করে মারাঠা ও শিখ। অথচ আজ চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে ইংরেজ সেই দুর্ভোগার করিয়া আবার সেই মধ্যযুগের বর্বরতার পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। অতএব, এক কথায় লীগের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে হিন্দুর স্বাধীনতার সম্পূর্ণ লোপের উপর এবং ভারতে মধ্যযুগের মুসলমান সাম্রাজ্যের পত্তনের উপর। সোজা কথায় ইহার অর্থ লীগ-অধিকৃত ভারতে কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ। লীগের ক্ষুধা লুণ্ঠনকারীর ক্ষুধা, সুতরাং ভারতের কতটা তাহার গ্রাসে গেলে পরে সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

দ্বিতীয় কারণ লীগের কংগ্রেসের উপর সন্দেহ। এই সন্দেহের ভিত্তি প্রতিশোধের ভয়ের উপর। লীগের আরম্ভ হয়

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের উচ্ছেদের চেষ্টায় অঙ্গস্বরূপে, এবং ইহার গোড়াপত্তন ও পোষণ হয় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর হাতে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর অনুচর রূপে লীগ জাতীয়তাবাদ দলনে, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুর দলনে ও শোষণে যে কাজ আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাতে প্রতি-শোধের ভয় হওয়া স্বাভাবিক। এবং বাংলাদেশে লীগ যাহা চল্লিশ বৎসর যাবৎ করিয়াছে, সারা ভারতবর্ষে তাহা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে বিগত পনর বৎসর এবং বিশেষতঃ গত ছয়-সাত বৎসর। এই অপরূপ কীর্তি যাহাদের ইঙ্গিতে, উৎসাহে ও পারিতোষিক দানে এতদিন চলিতেছিল, আজ তাহারা বিদায় লইতে চলিয়াছে, সুতরাং প্রতিফলের ভয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে, কেননা আত্মবৎ মন্যতে জগৎ। কাজেই লীগ ছলে বলে চেষ্টা করিতেছে যাহাতে ইংরেজ বিদায় না লয়; ইংরেজ প্রভু বিদায় লইলে লীগের পাকিস্থান কি করিয়া থাকিতে পারে? কাজেই লীগের অস্তিত্বের সহিত ভারতে ইংরেজ আধিপত্য দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। একের অভাবে অন্যের উপস্থিতি অসম্ভব এবং ভারত হইতে ইংরেজ বিদায় না লইলে কংগ্রেসের অস্তিত্বও স্থায়ী হইতে পারে না। এইরূপ পরস্পর বিরোধী অবস্থার মধ্যে সমঝোতের অবকাশ কোথায়?

এই বিবাদভঞ্জন ও সমস্যাপূরণ সেই দিনই হইবে যে দিন ভারতে মুসলমান সাধারণের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ বুঝেন তাঁহাদের প্রতিপত্তি বাড়িবে। বিদেশের মুসলমান স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝে সেকথা মিঃ জিন্না অতি স্পষ্টভাষায় শুনিয়া আসিয়াছেন মিশরে। সে কথা আজও তিনি খুলিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দকে বলেন নাই। মিশরে ও পশ্চিম-এশিয়ার আরব নেতৃবর্গ বুঝিয়া লইয়াছেন যে ইংরেজের আধিপত্যের ছদ্মনাম যাহাই হউক তাহার মধ্যে স্বাধীনতার নামগন্ধ থাকিতে পারে না, থাকিতে পারে পরস্বাপহরণের সুযোগ, ঘুষ ও দুর্নীতির প্রবল স্রোত। উদাহরণস্বরূপে বাংলাদেশের ও সিন্ধু প্রদেশের লীগ রাজত্বের উল্লেখই যথেষ্ট। কিন্তু সে কথা ভারতের মুসলমান জনসাধারণকে বুঝাইবে কে? এবং মুসল-মান জনসাধারণ সে কথা না বুঝিলে সমঝোতের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র একথা কংগ্রেস বুঝিবে কবে?

মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত স্বাধীনতাকামী, যাঁহাদের স্বাধীনতার চিত্রে অন্যের অপকার, পরস্বাপহরণ বা অন্যের উপর দাসত্বারোপ নাই, তাঁহাদের কথা আজ মুসলমান জন-সাধারণের কাছে পৌঁছায় না। তুরস্কের নূতন স্বাধীনতার দিনে কামাল আতাতুর্ক ঐরূপ নীতির যে প্রচার করিয়াছিলেন তাহারই জোরে আজও তুর্ক স্বাধীন হইয়া প্রগতির পথে চলিয়াছে। সে কথা মুসলমান জনসাধারণ জানে না বা জানিতে চাহে না। তাহাকে শুনান হইতেছে মুহম্মদ বিন কাশিমের কাহিনী এবং তাহাও অশেষ অদলবদল করিয়া আরব্য উপন্যাসের মুখরোচক কাহিনীর মত করিয়া। ইহার প্রতিকার কি? সম্পূর্ণ প্রতিকার কংগ্রেসের হাতে নাই সে কথা ঠিক। কিন্তু যে ভাবে এখন সমস্ত ব্যাপারটা চলিতেছে তাহাতে কংগ্রেসের দায়িত্ব ও কর্তব্য দুইই রহিয়াছে। লীগ সম্পর্কে কংগ্রেস অতীতে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে তাহার ইংরেজী নাম "Policy of drift," বাংলায় তাহাকে শুধু "পা টিলা" দেওয়া বলা চলে না, তাহার সঙ্গে "হাল ছেড়ে দেওয়া" বলা উচিত। বাংলায় ইহার বিষময় ফল ফলিয়াছে, সিন্ধু প্রদেশে কি ঘটিতেছে তাহাও দ্রষ্টব্য, পঞ্জাব এখনও সম্পূর্ণ ডুবে নাই তাহার কারণ শিখ সম্প্রদায়ের দৃঢ় সচেতন ভাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খান আবদুল গফফর খান তাঁহার ব্যক্তিত্বের জোরে পাঠান জাতির সম্মুখে প্রকৃত স্বাধীনতার আদর্শ ধরিয়া রাখায় এখনও কংগ্রেসে প্রাণ রহিয়াছে। তবে কংগ্রেস সচেষ্ট না থাকিলে তাহাও যাইবে, কেননা বিপক্ষ বিদেশীর সহায়তায় কংগ্রেসের বাঁধে ভাঙন ধরাইবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে, এবং এ সবই ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে কংগ্রেসের দৌর্বল্য ও অবহেলার ফলে। এবং যাহার দিকে চাহিয়া কংগ্রেস এই অবহেলা করিয়াছে সেই দলই ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর কণ্ঠে জগতে ঘোষণা করিতেছে যে কংগ্রেস তাহাদের উপর অবিচার করিয়াছে, করিতেছে ও ভবিষ্যতে করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। একেই বলে "যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর"।

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা কংগ্রেসের আদর্শ। আদর্শ কখনও পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া উচিত নহে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। চল্লিশ বৎসরের দমন, দলন, স্বৈরাচার, লুণ্ঠন ও বিচার-বৈষম্যের ফলে বাঙালী হিন্দু যে আজ হৃতসর্বস্ব, আসন ও পদচ্যুত এবং ভবিষ্যতে জীবনোপায়হীন হইয়া পথে দাঁড়াইতে বসিয়াছে সে ব্যবস্থা ইংরেজ কোন্ দলের সাহায্যে করিয়াছে? কংগ্রেস সেখানে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক বলিয়া, ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রবল দোষারোপ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে কেন? যে লোক বা যে দল প্রত্যক্ষ ভাবে সাম্রাজ্যবাদের কুটিল চক্রান্তের সাহায্য লইয়া নিজের লালসা এবং হিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এরূপ নীচ ও ঘৃণ্য কাজ করিয়াছে ও করিতেছে তাহাদের স্পষ্টভাষায় অভিযুক্ত করিতে বা নিন্দাবাদ করিতে কংগ্রেসের গলায় কাঁটা লাগে কেন? বিগত যুদ্ধের আরম্ভ হইতে বিগত বৎসরের শেষ পর্যন্ত—বিশেষতঃ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট আন্দোলনের পর হইতে—লীগদলের লোকে ব্রিটিশ অধিকারীবর্গের অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও পক্ষপাতিত্বের সাহায্যে সারা ভারতবর্ষে যে অনাচার, বলছলে অত্যাচার এবং সমস্ত দেশব্যাপী নীতি বিকারের স্রোত বহাইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট নিন্দাবাদ এবং সোজাভাবে দোষী নির্দেশ করা হয় নাই কেন? এতদিন শুনিয়া আসিতেছি ঐরূপ অনুযোগ-অভিযোগের ফলে "একতা" নষ্ট হইতে পারে, সুতরাং হিন্দুকে সকল কিছু সহ্য করিয়া যাইতে হইবে। ঐক্যের খাতিরে কংগ্রেসের নেতৃ-

বর্গ ঐরূপ বাক্য রোধ করিয়াছেন আজ প্রায় বিশ বৎসর, ফলে কিন্তু অনৈক্যই দাঁড়াইতেছে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া। অন্ততঃ পক্ষে আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে তাহাই দেখায়, নেতৃবর্গ দিব্য দৃষ্টিতে কি দেখেন আমরা জানি না। জাতীয়তাবাদী মুসলমান কংগ্রেসের এই আদর্শচ্যুতির ফলে ভাসিয়া গিয়াছে অধিকাংশ মুসলমান-প্রধান প্রদেশে, এখন সে সব অঞ্চলে পূর্ণ পাকিস্থান স্থাপনের ব্যবস্থা চলিতেছে যাহাতে সে সকল প্রদেশে কংগ্রেস যাদুঘরের প্রদর্শনীয় বস্তুবিশেষ হইয়া দাঁড়ায়।

কংগ্রেসকে তাহার কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। যদি কংগ্রেসের আদর্শকে সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হয় তবে মিথ্যার সহিত আদানপ্রদান বন্ধ করিতে হইবে। নিজের দল, নিজের পক্ষকে কেবল ত্যাগের ও বলিদানের উপদেশ দিয়া অনাচার ও অত্যাচারের পরোক্ষ সমর্থন করিলে যাহা হয় তাহা তো দেখাই গিয়াছে। এখন কংগ্রেসকে হয় তাহার স্বপক্ষ রক্ষার জন্য সংগ্রামকামী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে নয় আসন ছাড়িয়া বনে যাইতে হইবে। হাল ছাড়িয়া, স্রোতে ভাসিয়া চলিবার সময় আর নাই, কেননা ভরাডুবি আসন্নপ্রায়। পঞ্জাবে কংগ্রেস শক্তিহীন, বাংলায় নেতৃবর্গের কর্মতৎপরতার অভাবে কংগ্রেস ক্লীবত্ব প্রাপ্ত, সিন্ধুদেশেও প্রায় তথৈবচ, আসাম ও সীমান্ত প্রদেশ লীগের গ্রাসের মধ্যে যায় কি না যায়, এইরূপ তো অবস্থা, ব্যবস্থা আর হইবে কবে?

বাংলাদেশ ও পঞ্জাবের সমস্যা এক না হইলেও সমস্যা-পূরণের পথ একই। দুই প্রদেশেই বিভাগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যদি অন্য উপায় কিছু থাকে তবে তাহার নির্দেশ অনেক পূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল অথচ সেরূপ কোন কথাই নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি বলেন নাই। এখন এই দুই প্রদেশে কংগ্রেস-বাদী ও জাতীয়তাবাদীদিগের অস্তিত্ব রক্ষার ইচ্ছা যদি কংগ্রেসের থাকে তবে ঐরূপ বিভাগের ব্যবস্থা করিতেই হইবে, নহিলে কংগ্রেস ইহাদিগকে লীগের অনলে নিক্ষেপ করুন।

বাঙালী জাতির ক্লৈব্যের লক্ষণ

অন্যায় অত্যাচার নীরবে মুখ বুজিয়া সহ্য করা, উহার প্রতিবিধানে অগ্রসর না হওয়া এমন কি প্রতিবাদ পর্যন্ত না করা বাঙালীর স্বভাব হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় ম্যাক-ডোনাল্ডী-বাঁটোয়ারা-পুষ্ট ভারতশাসন আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতেই তাহার এই দুর্দশা আরম্ভ হইয়াছে। চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক হার প্রবর্তনের পর বাঙালী হিন্দু শাসনযন্ত্রের দায়িত্ব ও ক্ষমতাপূর্ণ পদগুলি হইতে একে একে অপসারিত হইয়াছে। কেরাণীগিরিতে বাঙালী হিন্দু এখনও আছে বটে, কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, থানার ভার-প্রাপ্ত দারোগা, বিভিন্ন বিভাগীয় ডিরেক্টর, শিক্ষাবিভাগে স্কুল ইন্সপেক্টর প্রভৃতি উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে তাহাদের প্রবেশাধিকার এক প্রকার নিষিদ্ধ হইয়াই আসিয়াছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে জাতীয়তাবাদী বাঙালী হিন্দু বুকের রক্ত দিয়াছে, সর্বস্ব দান করিয়াছে, তাহারই সাধনার ও ত্যাগ-স্বীকারের ফলে স্বাধীনতা যখন দ্বারপ্রান্তে উপনীত তখন তাহাকেই স্থান গ্রহণ করিতে হইতেছে সকলের পিছনে। প্রগতি-বিরোধী, স্বাধীনতা-বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ নিছক মাথাগুন্‌তিতে সংখ্যাধিক্যের জোরে আসিয়া জাতীয়তাবাদী হিন্দুর বুকের রক্তে অর্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইতেছে এবং এক শ্রেণীর তাঁবেদার হিন্দুর সহায়তায় উহা জাতীয়তাবাদী বাঙালীর ধ্বংসসাধনে প্রয়োগ করিতেছে। এক মুঠি অন্ন, একখণ্ড বস্ত্র, এক কৌটা তৈল, এক টুকরা কয়লা প্রভৃতি জীবনযাত্রার অপরিহার্য জিনিষগুলির জন্য বাঙালী আজ গবর্মেণ্ট অর্থাৎ মুসলিম লীগের উপর একান্ত অসহায়ভাবে নির্ভরশীল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলবৃষ্টিতে রৌদ্রে দোকানের সম্মুখে লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া সে নীরবে মনুষ্যত্বের চরম ও পরম লাঞ্ছনা সহ্য করে। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা রেশনের দোকানদারও এই মেষপালকে বুঝিয়া লইয়াছে বলিয়া তাহা-দিগকে অযথা দাঁড় করাইয়া রাখিয়া এক পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে। অপেক্ষমান প্রতীক্ষমান লোকেরা সবই দেখে সবই বুঝে, কিন্তু প্রতিবাদের সাহস পায় না, কারণ এই সব লোকেরই মর্জির উপর আজ তাহার জীবনমরণ নির্ভরশীল।

এই অসহায় অবস্থা মানুষকে ক্লীবে পরিণত করিতে বাধ্য। মানুষ যখন অন্যায় সহ্য করিতে আরম্ভ করে, অন্যায়-কারীর নিকট হইতে একটা কোন সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাহারই তোষামোদে প্রবৃত্ত হয়, তখনই সে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা ঘটায়। মানুষ নিজেকে যখন একান্ত অসহায় বলিয়া বোধ করে, জাতির উপর যখন সে শ্রদ্ধা হারাইয়া বসে, নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপর যখন তার কোন বিশ্বাস থাকে না, তখনই সে কল্পনা করে সবল প্রকৃতির অপর কেহ আসিয়া আমাকে রক্ষা করুক। বাংলায় এই মনোভাবই কিছুদিন যাবৎ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিহারী এবং শিখ প্রভৃতি আমাদের বাঁচাইবে ইহাই অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস। নোয়াখালীর ঘটনার পর দৈনিক 'হিন্দুস্থান' পত্রিকা লিখিয়া-ছিলেন যে অতঃপর বাঙালী হিন্দুরা নোয়াখালী জেলায় বিহারী বসাইবেন এবং শিখ-গুরুদ্বার স্থাপন করিবেন এবং তারপর দেখিয়া লইবেন কে বাঙালীর গায়ে হাত দেয়। ইহাই আজ-কালকার বাঙালী হিন্দুর বোধ হয় অধিকাংশেরই মনোভাব। ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার কলিকাতার ভবানীপুরের একটি ঘটনায় ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে। জাতীয় ক্লৈব্যের নিদর্শন হিসাবে ঘটনাটির উপর আমরা অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। উহা এইরূপ :—ঐ দিন অপরাহ্ণ প্রায় ছয় ঘটিকার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে রসা রোডের উপর বাসের কণ্ডাক্টর শ্রেণীর এক পাঞ্জাবী একটি বাঙালী তরুণীর আঁচল ধরিয়া টানে। তরুণীটি প্রতিবাদ করিলে সে তাহাকে আরও অপমান করিতে

উদ্যত হয়। ভবানীপুরের এই অঞ্চল জনবহুল, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লোক জমিয়া যায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রায় তিন শত লোক দাঁড়াইয়া পড়ে কিন্তু "বাঙালীর পরিত্রাতা"-পুরুষের কবল হইতে তরুণীটিকে রক্ষা করিবার জন্ত কেহ অগ্রসর হয় না। একটি দীর্ঘদেহ বাঙালী ভদ্রলোক সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে পাঞ্জাবী গুণ্ডাটার হাতে তিনি ভয়ানকভাবে প্রহৃত হন। তখনও তিন শতাধিক লোকের জনতা সেখানে দণ্ডায়মান। ইহাদের মধ্যে এক জন সাহস সঞ্চয় করিয়া পুলিসে খবর দেয়। ঘটনাস্থলও থানার অতি নিকটে। পুলিস আসিয়া মেয়েটিকে উদ্ধার করে এবং লোকটাকে গ্রেপ্তার করে।

বঙ্গ-বিভাগের আন্দোলন

বাঙালীর এই ক্লৈব্যের জন্ত প্রধানতঃ তাহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা দায়ী ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সর্ব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করা, প্রতি পদক্ষেপে অপমান ও লাঞ্ছনা মুখ বুঁজিয়া সহ্য করা, নিজেকে ক্ষুদ্র এবং অসহায় মনে করা মানুষকে অধঃপাতের কোন অতলে টানিয়া নামাইতে পারে উপরোক্ত ঘটনাটি তাহারই নিদর্শন। ইহার আশু প্রতিকারের উপায় বাঙালী তরুণ-তরুণীদের মুষ্টিযুদ্ধ, যুযুৎসু প্রভৃতি শারীর বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তোলা যাহাতে তাহারা আত্মরক্ষায় উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে। দেহে শক্তি এবং আততায়ীকে ঘায়েল করিবার কৌশল জানা থাকিলে হয়ত সকলেই এরূপ নিষ্ক্রিয় দর্শক হইয়া দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতে পারিবে না, সক্রিয় প্রতিরোধের জন্ত অগ্রসর হইয়া আসিবে। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেল-ইন্‌স্পেক্টরের উদ্যোগে প্রত্যেক ছাত্রী-নিবাসের ছাত্রীদের ব্যায়াম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে, ছোরা খেলাও শেখানো হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যায়াম-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবারও প্রস্তাব করা হইয়াছে। ছাত্রী-নিবাসে এই বন্দোবস্ত সময়োচিত এবং উপযোগী হইয়াছে ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু ছাত্রাবাসগুলিতেও অবিলম্বে মুষ্টিযুদ্ধ ও যুযুৎসু শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কবিতা লেখা ও সিনেমা দেখায় বাঙালী তরুণেরা সকলকে হার মানাইয়াছে, এবার তাহাদের দৈহিক ও মানসিক বলের পরিচয় দানের দিন আসিয়াছে।

এই অবস্থায় স্থায়ী প্রতিকারের উপায় বাঙালী হিন্দুর নিজস্ব স্বতন্ত্র গবর্মেণ্ট গঠন। মুসলীম লীগের উপর বাঙালী হিন্দুর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা দূর করিতে না পারিলে বাঙালীর ক্লীবত্ব ঘুচিবে না এবং এই নির্ভর-শীলতা দূর করিবার একমাত্র উপায় তাহার নিজস্ব গবর্মেণ্ট গঠন। ইহারই জন্ত আমরা বঙ্গ-বিভাগের একান্ত পক্ষপাতী। বাংলার নেতৃবৃন্দ প্রতিকারের আশু এবং স্থায়ী উভয় পন্থা সম্বন্ধেই সমান উদাসীন। এখনও তাঁহারা ভাবপ্রবাহে গা ভাসাইয়া বাঙালী জাতির ধ্বংস নির্বিকার চিত্তে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বাংলা কংগ্রেস দল-বিশেষের দ্বারা কবলিত, তাঁহারা দলগত প্রাধান্ত রক্ষায় জন্তই এত ব্যস্ত যে জাতীয় সমস্তার প্রতি মনোনিবেশ করিবার সময় তাঁহাদের নাই। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামপন্থী দল সম্পূর্ণ ক্ষীয়মান শক্তি বাড়াইবার এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস দখল করিবার জন্তই এত ব্যগ্র যে তাঁহাদেরও এ দিকে মন দেওয়ার সময়াভাব। কম্যু-নিষ্ট দলেই বোধ হয় সবচেয়ে কর্মতৎপর লোক আছে, কিন্তু তাঁহারাও কংগ্রেসের ধ্বংস সাধনের "শুভ" কার্যে লিপ্ত আছেন বলিয়া জাতীয় সমস্তার প্রতি মন দেওয়ার সময় পাইতেছেন না। হিন্দু মহাসভা ঢেউ গণিতেছেন, কোন্ দিকে চলিলে সুবিধা হইবে তাহা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। এই অবস্থাতেও মুষ্টিমেয় হইলেও কয়েকজন লোক বঙ্গ-বিভাগের আন্দোলনে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। পাটনায় বেঙ্গল পার্টিশন লীগ নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ উহার সম্পাদক। এই সমিতি বাংলার জেলায় জেলায় বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহ আরম্ভ করেন। আসানসোল, ফরিদপুর এবং ময়মনসিংহের বার এসোসিয়েশন বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে পত্র দিয়া-ছেন। আরও বহু নেতৃস্থানীয় লোকেও তাহাকে সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চৌধুরী পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ ইউনিয়ন নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া কাজ আরম্ভ করেন। বেঙ্গল পার্টিশন লীগ পরে মেজর-জেনারেল এ, সি, চ্যাটার্জির সভাপতিত্বে পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সমিতি নাম গ্রহণ করে এবং পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ ইউনিয়ন উহার সহিত মিলিত হয়। বর্তমানে মেজর-জেনারেলের নেতৃত্বে ইঁহারা বিভিন্ন জেলায় কমিটি প্রভৃতি গঠনে অগ্রণী হইয়াছেন। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় এই আন্দোলনের সপক্ষে প্রচুর সাড়া মিলিতেছে। মেজর-জেনারেল চ্যাটার্জি স্বয়ং বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করিয়া জনমত গঠন করিতেছেন।

হিন্দু বাংলার আয়তন

হিন্দু বাংলার আয়তন কি হইতে পারে তাহা লইয়া নানা-বিধ আলোচনা চলিতেছে। একটি মতানুসারে হিন্দু বাংলা দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, দিনাজপুর, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার পশ্চিমাংশ, খুলনা, চব্বিশ পরগণা, কলি-কাতা ও বর্দ্ধমান বিভাগ লইয়া গঠিত হইতে পারে। আর এক মতানুসারে বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি ডিভিসন এবং দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা লইয়া উহা গঠন করা যাইতে পারে। বাংলার হিন্দুসংখ্যা শতকরা ৪৫, সুতরাং মোট ভূমি পরি-মাণের এই অংশ হিন্দুরা দাবি করিতে পারে। শেষোক্ত পদ্ধতিতে বঙ্গ-বিভাগ হইলে এই পরিমাণ ভূমি হিন্দুরা পায়। কিন্তু ইহাতে অসুবিধা এই যে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, বিহারের ভিতর দিয়া সেখানে যাইতে হইবে। তবে সাঁওতাল পরগণা, মানভূম প্রভৃতি বাংলায় ফিরিয়া

আসিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারিবে। এই ভাবে বাংলা ভাগ করিলে পশ্চিম বঙ্গে মুসলমান সংখ্যা হইবে ৭৪ লক্ষ এবং পূর্ব বঙ্গে হিন্দু হইবে ১০১ লক্ষ। এই মতানুসারে আয়তন, জনসংখ্যা প্রভৃতি বিভাগ হইবে নিম্নোক্তরূপ :—

আয়তন

বর্দ্ধমান বিভাগ	১৪,১৩৫ বর্গমাইল
প্রেসিডেন্সি "	১৬,৪০২ "
পশ্চিম বঙ্গ	৩০,৫৩৭ "
জলপাইগুড়ি	৩০৫০ "
দার্জিলিং	১১৯২ "
নূতন পশ্চিম ও উত্তর বাংলা	৩৪,৭৭৯ "
নূতন পূর্ব বাংলা	৪২,৬৬৩ "

বাংলার মোট আয়তন ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল, উহার শতকরা ৪৫ ভাগ হয় ৩৪,৮৪৯ বর্গমাইল।

এই সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রদেশগুলির আয়তন তুলনা করা যাইতে পারে—

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৪,২৬৩ বর্গমাইল
উড়িষ্যা	৩২,১৯৮ "
সিন্ধু	৪৮,১৩৬ "
আসাম	৬৪,৯৫১ "

জনসংখ্যা

বিভাগ	মুসলমান	অ-মুসলমান
বর্দ্ধমান	১৪,২৯,৫০০	৮৮,৫৭,৮৬৯
প্রেসিডেন্সি	৫৭,১১,৩৫৪	৭১,০৫,৫৩৩
পশ্চিম বঙ্গ	৭১,৪০,৮৫৪	১৫৯,৬৩,৪০২
জলপাইগুড়ি	২,৫১,৪৬০	৮,৩৮,০৫৩
দার্জিলিং	৯,১২৫	৩,৬৭,২৪৪
নূতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ	৭৪,০১,৪৩৯	১৭১,৬৮,৬৯৯
মোট—		২৪৫,৭০,১৩৮
জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং ব্যতীত		
রাজসাহী বিভাগ	৭২,৬৭,৫৩২	৩৩,০৭,০৫১
ঢাকা "	১,১৯,৪৪,১৭২	৪৭,৩৯,৫৪২
চট্টগ্রাম "	৬৩,৯২,২৯১	২০,৮৫,৫৯৯
নূতন পূর্ব বঙ্গ	২,৫৬,০৩,৯৯৫	১,০১,৩২,১৯২
মোট—		৩,৫৭,৩৬,১৮৭

নূতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে মুসলমান সংখ্যানুপাত ৩০·১
নূতন পূর্ববঙ্গে হিন্দু সংখ্যানুপাত ২৮·৩

তপশীলী জনসংখ্যা

বর্দ্ধমান বিভাগ	১৮,৩৫,০৩৮
প্রেসিডেন্সি	১৮,৯৪,৮৯৭
নূতন পশ্চিম বঙ্গ	৩৭,২৯,৯৩৫
জলপাইগুড়ি	২৮,৯২২
দার্জিলিং	৩,২৫,৫০৪
নূতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ	৪০,৮৪,৩৬১
নূতন পূর্ববঙ্গ	৩২,৯৪,৬০৯

নূতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে হাজার-করা ৫৫৩ জন তপশীলী বাস করিবে, পূর্ববঙ্গে থাকিবে ৪৪৭ জন।

খাদ্যসম্ভার

এইরূপে নবগঠিত প্রদেশদ্বয় খাদ্যসম্বন্ধে নিজের উপর কি ভাবে নির্ভরশীল হইতে পারিবে তাহা ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট হইতে দেখানো যায়। ধান উৎপাদন সম্বন্ধে তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্য এই প্রকার :

বর্দ্ধমান বিভাগ	৮৯,৭৩২,০০০ মণ
প্রেসিডেন্সি "	৮৯,৭৯৩,০০০ "
জলপাইগুড়ি	১৬,০৮৫,০০০ "
দার্জিলিং	৯৬৫,০০০ "
নূতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ	১,৯৬,৫৭৫,০০০ "
নূতন পূর্ববঙ্গ	২,৮৫,৪৫৭,০০০ "

গড়পড়তা বার্ষিক জন প্রতি ভাত খাওয়ার পরিমাণ—

পশ্চিম বঙ্গ	৮·০২ মণ
পূর্ববঙ্গ	৮·০০ "

খনিজ দ্রব্য

সমস্ত কয়লার খনি পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত।

শিল্প

চটকল, ইস্পাত ও লোহার কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, রাসায়নিক কারখানা প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত। রেলের কারখানার মধ্যে পূর্ববঙ্গে পাহাড়তলীতে একটি আছে, অপরগুলি সব পশ্চিম বঙ্গে। ৩০টি কাপড়ের কলের মধ্যে ২৭টি পশ্চিমবঙ্গে।

রাজস্ব

১। ভূমিরাজস্ব—

জমিদারী প্রথা হয়ত শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জমিদারের খাজনা হিসাব না করিয়া প্রজা কর্ত্তৃক জমিদারকে দেয় খাজনার হিসাব ধরা হইল। জমিদারী উঠিয়া গেলে গবর্ণমেণ্ট এই টাকা প্রজার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ	২,৬১,৪৭,০০০ টাকা
বর্দ্ধমান "	২,৫৮,৭৯,০০০ "
জলপাইগুড়ি	১১,৭৯,০০০ "
দার্জিলিং	৪,১৬,০০০ "
নূতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ	৫,৩৬,২১,০০০ "
নূতন পূর্ববঙ্গ	৫,৯৫,৮৩,০০০ "

বর্তমানে জমিদারদের নিকট হইতে খাজনা আদায় হয়ঃ
নূতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত এলাকা হইতে
১,৬১,৩৩,৫১৫ টাকা
নূতন পূর্ব বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত এলাকা হইতে ১,৫৫,৯৫,০৬১

২। পাটশুল্ক—পাটশুল্কের মোট পরিমাণের শতকরা ৯৫ ভাগ আদায় হয় পশ্চিম বঙ্গে।

৩। আয়কর—আয়করের মোট পরিমাণের শতকরা ৮৫ ভাগ আদায় হয় পশ্চিম বঙ্গে।

৪। কৃষি আয়কর, বিক্রয় কর প্রভৃতি কোন্ এলাকায় কত আদায় হয় তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে ইহা অনুমান করা যায় যে এই প্রকার করগুলির শতকরা ৮০ ভাগ আদায় হয় পশ্চিম বঙ্গে ও শতকরা ২০ ভাগ পূর্ববঙ্গ হইতে আসে।

৫। আমদানী, রপ্তানী শুল্কের শতকরা ৯৩ ভাগ আদায় হয় কলিকাতায় এবং শতকরা মাত্র ৭ ভাগ চট্টগ্রামে।

৬। লবণ-করের পরিমাণ ভাগ করিলেও দেখা যায় পশ্চিম বঙ্গে উহার শতকরা ৯৩ ভাগ আদায় হয় এবং মাত্র ৭ ভাগ আসে পূর্ববঙ্গ হইতে।

পৃথক নির্বাচন ও শান্তিরক্ষা

পৃথক নির্বাচন-প্রথা যে শান্তিরক্ষার কত বড় প্রতিবন্ধক কলিকাতার দাঙ্গার সময় হইতে তাহা বিশেষভাবে ধরা পড়িতেছে। বাংলার বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচিত মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। মুসলমানদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া আইন ভঙ্গ ও দাঙ্গা প্রভৃতিতে লিপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে মন্ত্রীমণ্ডলের পক্ষে শান্তি রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন সব সময় সম্ভব হয় না ইহা ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। মন্ত্রীরা যাহাদের ভোটে নির্বাচিত, যাহারা তাঁহাদের হইয়া ভোট সংগ্রহ করিয়াছে, ক্ষেত্র বিশেষে বিরোধী দলের উপর বল প্রয়োগ করিয়াছে, তাহাদের তাঁহারা অসন্তুষ্ট করিতে পারেন না। কারণ পরবর্তী নির্বাচনে ইহাদেরই শরণাপন্ন তাঁহাদের হইতে হইবে। এই অসুবিধা বাংলাদেশেই অন্ততঃ উগ্রভাবে দেখা দিয়াছে। যৌথ নির্বাচন প্রবর্তিত থাকিলে এরূপ ঘটিত না, জনসাধারণের ধনপ্রাণ ও নারীর সম্মান রক্ষার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা করিতেন না এইজন্য যে এই কার্য সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া গণ-স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত হইত এবং এই কারণে অধিকাংশ ভোটারের সম্মতি লাভ করিতে পারিত। পৃথক নির্বাচন না থাকিলে ধনপ্রাণ ও নারীর সম্মান রক্ষার ভার নাগরিক জীবনের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে সাম্প্রদায়িক রেষারেষির কথাও উঠিত না।

কলিকাতার দাঙ্গার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উহা লইয়া যে আলোচনা হয় তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, পার্ক ষ্ট্রীট থানায় আনীত সাত জন অভিযুক্ত আসামীকে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী আসিয়া মুক্ত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এক শ্রেণীর লোককে এই ভাবে আরও অনেক থানায় অন্যায় ভাবে মুক্তি বা জামীন দেওয়া হইয়াছে, বহু ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারই করা হয় নাই এরূপ বহুসংখ্যক অভিযোগ প্রকাশ্যে হইয়াছে। ইহাদিগের দুষ্কার্যের কথা জানিয়াও গবর্ণমেন্টের পরিচালক মন্ত্রীরা গুণ্ডা-শ্রেণীর লোককে পর্যন্ত শাস্তি দানে কুণ্ঠিত হন এই কারণে যে ভোটের এবং ভোট গ্রহণ কালে সাহায্যের জন্য তাঁহারা ইহাদেরই উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

এই বিসদৃশ অবস্থা আরও ভয়াবহ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ৯ই ফেব্রুয়ারীর বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিলের সভায়। এই সভায় অনেক সদস্য প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীকে চাপিয়া ধরেন এই বলিয়া যে, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলায় মুসলমানদের উপর পুলিসের অত্যাচার চলিতেছে এবং প্রধান মন্ত্রী তাহা কেন নিবারণ করিতে পারেন নাই। ইঁহারা দাবি করেন যে, জেলার সমস্ত হিন্দু পুলিস কর্মচারীকে বদলী করা হউক। হট্টগোলের মধ্যে অনেক বার ব্যর্থ চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত মিঃ সুরাবর্দী যে জবাব দেন তাহাতে নির্বাচকমণ্ডলীর বিরাগভাজন হইবার ভয় সুস্পষ্ট। তিনি বলেন যে, নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা তিন হাজার নহে, ৮৫০ এবং জানান যে নোয়াখালীর পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বদলী করা হইয়াছে ও অনেক সাব-ইনস্পেক্টরকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে। নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় যাহা ঘটিয়াছে তাহার তুলনায় ৮৫০ জন গুণ্ডা গ্রেপ্তার অতি সামান্য ব্যাপার। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন মিঃ আব্দুল্লা, তাঁহার পক্ষপাতিত্বের খ্যাতি সুবিদিত। ইনিই যদি ৮৫০ জনকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন তবে নিরপেক্ষ লোকের হাতে কত লোক গ্রেপ্তার হইত তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। তথাপি দলের লোকের চাপে বাধ্য হইয়া প্রধান মন্ত্রীকে ইঁহার বদলীর আদেশ দিয়া নোয়াখালীতে আর এক জন মুসলমান পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পাঠাইতে হইয়াছে। বাংলায় যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী থাকিলে প্রধান মন্ত্রীর নিকট এরূপ কৈফিয়ত কেহ দাবি করিতেও পারিত না। তিনিও ন্যায় বিচার করিতে সাহস পাইতেন এই ভরসায় যে তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই বুদ্ধিমান্ লোকেরা ইহার জন্য তাঁহাকেই সমর্থন করিবেন। গুণ্ডা তখন গুণ্ডা বলিয়াই পরিচিত হইত, তাহার সাম্প্রদায়িক ছাপ খুঁজিয়া বাহির করিয়া পক্ষপাতিত্বের দাবি উঠিতেই পারিত না। কলিকাতার দাঙ্গা হইতে সুরু করিয়া লীগ কাউন্সিলের সভা পর্যন্ত গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের এবং অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচারের যে স্পৃহা প্রকাশ পাইয়াছে পৃথক নির্বাচন বজায় থাকিতে তাহা দূর হইবার

নহে। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যেরা ব্যবস্থা-পরিষদে সংখ্যাধিক্য লাভ করিলে তাঁহাদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে শাসনক্ষমতা আসিলে উহা এক সম্প্রদায়ের স্বার্থে এবং প্রয়োজন হইলেই অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবার অবসর ঘটে। বাংলাদেশে তাহাই ঘটিতেছে এবং ইহার ফলে বাঙালী হিন্দু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা-ক্ষেত্র হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া এমন একটা অসহায় অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যাহা তাহাকে জাতীয় ক্লৈব্যের স্তরে আনিয়া ফেলিতেছে।

বর্গাদার নিয়ন্ত্রণ বিল

বর্গা জমির নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলা-সরকার একটি বিল আনিয়াছেন। তাঁহাদের অন্যান্য বিলের ন্যায় এই বিলটিরও মূলে কোন দূরদৃষ্টি নাই, আছে শুধু একটি আশু সমস্যা যেন-তেন-প্রকারেণ এড়াইবার মনোভাব। এই বিলটি সম্বন্ধে বহরমপুর হইতে মোহাম্মদ আব্দুল সত্তার 'যুগান্তরে' পত্র লিখিয়া যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য বলিয়া আমরা মনে করি। সত্তার সাহেব প্রথমেই বলিতেছেন, "বিলের ধারাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উহা কেবল বর্গাদারদের সুখ-সুবিধা ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই রচিত হইয়াছে কিন্তু জমির মালিকগণের স্বার্থ ও সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখা হয় নাই। বাজারের মুড়ি-মুড়কী, রসগোল্লা, ছানাবড়া প্রভৃতি সমস্তই খাদ্য, কিন্তু উহা কি একই দরে বিক্রয় হইবে? তাহা যদি না হয় তবে সকল স্থানে এবং সমস্ত জমিরই উৎপন্ন ফসলের বিভাগ একই রূপ হয় কোন্ যুক্তিতে? জমির মূল্য, খাজনা এবং বর্গাদারের পারিশ্রমিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উৎপন্ন ফসলের বিভাগ বণ্টন হওয়া কি ন্যায়সঙ্গত নহে?"

বাংলার সব স্থানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ সমান নয়। কোথাও বা লোকের তুলনায় জমি বেশী, কাজেই সেখানে বড় বড় জোতদার বিদ্যমান। জমির মূল্য কম, খাজনাও খুব কম। আবার কোন কোন স্থানে জমি কম, মূল্য বেশী, খাজনাও বেশী। কোথাও অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপন্ন হয় আবার কোন স্থানে কঠোর পরিশ্রমে সামান্য ফসল পাওয়া যায়। কোন স্থানে জমির মালিকেরা অবস্থাপন্ন, কোথাও বা মালিকেরা দরিদ্র ও অসহায় বলিয়াই জমি বর্গা দিতে বাধ্য হয়। সত্তার সাহেব পশ্চিম বঙ্গের উত্তরাঞ্চলের দৃষ্টান্ত দিয়া লিখিতেছেন, "এই অঞ্চলে লোকসংখ্যার অনুপাতে জমির পরিমাণ খুব কম। বিধবা, অসহায়, অক্ষম এবং যাহাদের যৎসামান্য জমি আছে সাধারণতঃ তাহারাই জমি বর্গা দিয়া থাকে। আর যাহারা বর্গাদার তাহাদের নিজের কিছু জমি থাকে, কেবলমাত্র বর্গা জমি লইয়া সাধারণতঃ কেহ চাষ-আবাদ করে না। এক জনের হয়ত পনর বিঘা জমি আছে, উহা চাষ-আবাদের জন্ত একখানি হাল ও দুই জন লোক অবশ্যই দরকার। সে আরও পাঁচ-সাত বিঘা জমি বর্গা লইয়া ঐ হালে এবং ঐ দুই জন লোকেই চাষ-আবাদ করিয়া লাভবান হয়। এই অঞ্চলে বর্গাদারগণ জমির শ্রেণী অনুসারে ১/২, ১/৩ বা ১/৬ অংশ পাইয়া থাকে। একই গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর এরূপ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমি আছে যে উৎকৃষ্ট জমি ১/৩ অংশে বর্গা লইবার জন্ত অনেকেই, এমন কি অনেক অবস্থাপন্ন কৃষকও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে কিন্তু নিকৃষ্ট জমি ১/২ অংশ বা তাহার অধিক অংশেও কেহ বর্গা লইতে চাহে না। বর্তমানে কোন কোন স্থানে ভাল জমির মূল্য প্রতি বিঘা হাজার টাকারও কিছু বেশী এবং খাজনা ৪৲ টাকা আবার সেই গ্রামেই খারাপ জমির মূল্য ৬০।৭০ টাকা ও খাজনা দশ-বারো আনা মাত্র। অতি অল্প পরিশ্রমে ভাল জমিতে প্রচুর ফসল পাওয়া যায় এবং জল সেচন ও ফসলরক্ষার বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়াই উহার মূল্য ও খাজনা অত্যধিক। আর খারাপ জমিতে কঠোর পরিশ্রম করিয়াও ভাল শস্য হয় না বলিয়াই উহার মূল্য ও খাজনা কম। পরিশ্রমের তুলনায় ভাল জমি বর্গা লইয়া অর্ধাংশ ফসল পাইয়াও তাহার পরিশ্রমের মূল্য উঠে না বলিয়াই উহা লইতে আপত্তি করে।" বাংলা-সরকার বিলটিতে জমির তারতম্য অনুসারে মালিকের ও বর্গাদারের ভাগের কোন পার্থক্য করেন নাই, উভয় প্রকার জমির উৎপন্ন ফসলের অংশ একই প্রকার ধরিয়া দিয়াছেন।

বর্গাদারের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে কেহই আপত্তি করিবে না, কিন্তু মূল্য-স্বরূপ জমির মালিক যে মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছে এবং উচ্চহারে খাজনা দিয়াছে সে দিকটাও কি বিবেচ্য নহে? এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে অক্ষম, অসহায় ও দরিদ্র মালিককে বর্গাদারেরা আর গ্রাহ্য করিবে না। মালিক মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পাইয়া দুর্বল হইবে, বর্গাদার সমস্ত জমিতে দুই-তৃতীয়াংশ পাইয়া প্রবল হইবে। বড় জোতদারের পক্ষে আইন এড়ানো কঠিন হইবে না, তাহারা বর্গা দেওয়া বন্ধ করিয়া খাসে জমি চাষ করিতে পারিবে। দুই-তৃতীয়াংশ ফসলের জন্ত বীজ, সার, হাল প্রভৃতি দিতে হইলে তাহারা বর্গা দিতে চাহিবে না বরং জন খাটাইয়া নিজে চাষ করিয়া সমস্ত ফসলই নিজে রাখিতে পারিবে। ইহাতে দরিদ্র বর্গা-দারেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অপর পক্ষে বিধবা অথবা দরিদ্র জোতদারেরা দারিদ্র্য নিবন্ধন হাল, গরু, বীজ প্রভৃতি সরবরাহ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদিগকে এক-তৃতীয়াংশ ফসল লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে এবং উহারই মধ্য হইতে বর্তমান চড়া হারে খাজনা দিতে হইবে। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইবে। বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলনে যাঁহারা কর্মী হিসাবে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এই কারণে স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতেই ইংরেজ

গবর্ণেণ্ট বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি ধ্বংস করিবার জন্ত সর্বপ্রকার আয়োজন করিতেছেন। বর্গাদার বিলের মূল উদ্দেশ্যও এই।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কাজ

মানুষের দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিশূন্য হৃদয়হীন লোক কৃষি বিভাগের ন্যায় জাতীয় কল্যাণকর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলে তাহার কি দশা ঘটে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের বর্তমান কার্য-কলাপে তাহা বিশদভাবে দেখা যাইতেছে। মেদিনীপুরের যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটটি ঘূর্ণীবাত্যার সময় দুর্গতদের প্রতি অমানুষিক হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন, গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কৃষির উন্নতির নামে ইঁহার হাত দিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় অথবা অপচয় হইয়াছে। কৃষির উন্নতি কতটা হইতেছে তাহা যে কোন গ্রামে সন্ধান লইলেই জানা যাইবে। 'ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে উহার সামান্য একটি দৃষ্টান্ত মিলিবে। পত্রখানি এই :—

> আজকাল দেশে কৃষির উন্নতির জন্ত সরকারী ব্যবস্থার কথা খুব চলিতেছে। বাংলাদেশে অন্ততঃ ময়মনসিংহ জেলায় এই ব্যবস্থা কি রকম চলিতেছে তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে কতকটা আন্দাজ করা যাইবে।
>
> এক ভদ্রলোক এক বার তাঁহাদের অঞ্চলে চীনা-বাদামের চাষ প্রচলন করিবার জন্ত স্থানীয় সরকারী কৃষি কার্মে যান ভাল বীজের জন্ত। কার্মের কর্মকর্তারা দিলেন তাঁহাদের সর্বোৎকৃষ্ট বীজ। কিন্তু বাজারে ঐ ফসল চলিল না, কারণ সরকারী সর্বোৎকৃষ্ট চীনাবাদাম বাজারের নিকৃষ্টতম বাদামের চাইতেও অধম।
>
> গত দুই বৎসর সরকারী কার্ম হইতে যাঁহারাই কপি ইত্যাদি তরকারির বীজ আনিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন ফুলকপির বীজ হইতে বাঁধাকপির চারা বাহির হইয়াছে, যে চারাতে কার্তিক মাসে ফুলকপি হওয়ার কথা, তাহাতে ফুলকপি হইয়াছে মাঘ মাসে ইত্যাদি শুনা যায়, তরকারির গাছে মরশুমী ফুলও হইয়াছে।
>
> এই জেলার কলমাকান্দা মোহনগঞ্জ অঞ্চলে ভাল সরিষা হয়। কৃষি বিভাগের জনৈক কর্মচারী যান সেই অঞ্চলে প্রচারকার্যে। তিনি সকল কৃষককে জানাইয়া দিলেন যে, সরকারের খোঁজে এক বিশেষ শ্রেণীর সরিষা আছে। উহা বুনিলে ফসলও ভাল হইবে, সরিষার দরও ভাল পাওয়া যাইবে। সকলে তাঁহাকে ধরিল সেই বীজ আনাইয়া দিতে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। অনেক দিন পরে বুনিবার সময় পার হইয়া গেলে খবর আসিল নারায়ণগঞ্জ শহরে কোন দোকানে ঐ সরিষা পাওয়া যায়। কৃষকেরা যেন উহা আনাইয়া লয়। সোয়া শ' মাইল দূর নারায়ণগঞ্জ শহর হইতে সরিষা আনা ঐ সকল কৃষকের পক্ষে সম্ভবও ছিল না, আনিলেও কোন কাজ হইত না। বুনিবার সময় চলিয়া গিয়াছিল। আনা হইলেও ঐ বীজে সরিষা ফলিত কি গাঁদা ফুল ফুটিত সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মশতবার্ষিকী

গত ৩১শে জানুয়ারী পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্মের এক শত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথের নিকট প্রগতিশীল মুক্তিকাম ভারতবর্ষ বহুভাবে ঋণী। তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী পালনের আয়োজন ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছিলেন এবং দেশবাসীও তাহাতে সাগ্রহে যোগ দিয়াছেন। এতদুপলক্ষে সাধনাশ্রম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সম্মিলন সমাজে বিশেষ উপাসনা হয়। সিটি স্কুলে এবং ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে স্মৃতিসভা হয়।

ভারতীয় সমাজ-জীবনে পণ্ডিত শিবনাথের দান অনন্ত-সাধারণ। রাজা রামমোহনের চিন্তা ও ভাবধারা শিবনাথের জীবনে দীপ্ত মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ধর্মবীর, চিন্তা-বীর, কর্মবীর এবং সাহিত্যবীর এই মহাপ্রাণ দেশনায়কের পরিচয় স্বল্পপরিসরে দেওয়া সম্ভব নহে। এদেশে সজ্ঘবদ্ধ ছাত্র-আন্দোলনের প্রকৃত পথপ্রদর্শক তিনি। বিভিন্ন ছাত্র-সভায় ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তাশীল ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া তিনি ছাত্রসমাজকে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁহার দান অতুলনীয়। আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির সহিত একত্রে ভারত-সভা প্রতিষ্ঠা তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। ১৮৭৬ সালে ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে তাঁহারা দেশপ্রেমে দীক্ষা গ্রহণের জন্ত নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটি গ্রহণ করিতেন এবং জীবন দিয়া উহা পালন করিতেন : "(১) ধারত-শাসনই আমরা একমাত্র বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসন বলিয়া মনে করি। তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান গবর্ণেণ্টের আইন-কানুন মানিয়া চলিব, কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্য ও নিরাশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গবর্ণেণ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না। (২) আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা করিব না, যে যাহা অর্জন করিবে তাহাতে সকলের সমান অধিকার এবং সেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্মে জীবন উৎসর্গ করিব।"

শিবনাথ ও তাঁহার সহকর্মী আনন্দমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতির রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল "অন্যায়ের উপর ন্যায়, অসাম্যের

উপর সাম্য, রাজার উপর প্রজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া পৃথিবীব্যাপী একটি মহাসাধারণতন্ত্রের আয়োজন" করা। এই কল্পনা শিবনাথ-সম্পাদিত "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় ১৮০৩ শকাব্দের (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ) ১৬ই ফাল্গুন প্রথম প্রকাশ পায়। ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন বলে ভারত-সরকার যখন কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ নয় জনকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করেন তখন তাহার প্রতিবাদে কলিকাতায় যে জনসভার অনুষ্ঠান হয় তাহার সভাপতিত্ব করিবার জন্য তৎকালীন কোন দেশনেতাকে পাওয়া যায় নাই। শিবনাথ অগ্রসর হইয়া আসিয়া ঐ সভায় নেতৃত্ব করেন।

নারীজাতির প্রতি শিবনাথের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অতি প্রগাঢ় ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং তাহার জন্য অশেষ লাঞ্ছনা ও কষ্ট সহ্য করেন। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় তাঁহারই কীর্তি। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাঁহার দান অতুলনীয়। তাঁহার প্রণীত পুষ্পমালা, নির্বাসিতের বিলাপ ও পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ; মেজবউ, নয়নতারা, বিধবার ছেলে, যুগান্তর প্রভৃতি উপাদেয় উপন্যাস। তাঁহার রচিত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সংস্কৃতির একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস। তাঁহার রচিত "ধর্মজীবন", "আত্মচরিত" ও প্রবন্ধাবলী বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিবনাথ শতবার্ষিকী কমিটির অনুষ্ঠান শেষ হইয়াছে, কিন্তু কাজ শেষ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। শিবনাথের অমূল্য গ্রন্থাবলীর কয়েকটি ভিন্ন অপরগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। কমিটি এইগুলির পুনঃপ্রকাশে ব্রতী হইলে শিবনাথের স্মৃতিরক্ষায় প্রকৃত সাহায্য করা হইবে।

ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী

ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ঢাকা মিউজিয়মের কিউরেটর ছিলেন। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। বাংলার বিভিন্ন যুগের ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্বের উৎসাহী গবেষক ও তথ্যানুসন্ধিৎসু লেখক হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের লেখক হিসাবে তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। ঢাকা শহরে মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই তিনি উহার কিউরেটর রূপে কাজ করিয়া গিয়াছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও পর্যটনের ফলে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বহু মূর্তি, মুদ্রা, তাম্র-শাসন প্রভৃতি তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ঢাকা মিউজিয়ামে উহা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। মিউজিয়ামটির উন্নতিসাধনেই তিনি তাঁহার সমস্ত সময় ও শক্তি অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে *Iconography of Buddhist and Brahmanical Scriptures in the Dacca Museum*, *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, এবং *Last Bhowal Copper Plate of Lakshman Deb of Bengal.* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার বারভূঁঞা সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধাবলী প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে তাঁহার গবেষণা মোগলশাসনের বিরুদ্ধে বাংলার বিদ্রোহের ইতিহাসের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করিয়াছে। ডাঃ ভট্টশালীর মৃত্যু অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয় উন্নতির পক্ষে একটি অতি গুরুতর বিষয়। প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতির উৎকর্ষের উপর ভবিষ্যৎ বংশীয়দের উন্নতি বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। এই শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ হইলে সমগ্র জাতির মেরুদণ্ড শক্তিহীন হয় এবং দুর্বল হইয়া গড়িয়া উঠে। এইজন্য পাশ্চাত্য দেশে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী ত্রুটিহীন এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য চেষ্টা ও যত্নের অন্ত নাই। কিণ্ডারগার্টেন, মন্টেসরি, নার্সারি স্কুল প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আজও সে সব দেশে গবেষণা চলিতেছে এবং নূতন নূতন আবিষ্কার হইতেছে। ভারতবর্ষের মনীষিবৃন্দও এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর প্রাথমিক শিক্ষাদানপদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতেই ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় এবং বনিয়াদী স্কুল স্থাপন আরম্ভ হয়। বনিয়াদী স্কুলের কার্য-পদ্ধতি দেখিয়া এখন বিশ্বাস করা সহজ হইতেছে যে এই প্রথাই বোধ হয় আমাদের দেশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। ইহার দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষালাভের সঙ্গে মেধাবৃদ্ধি, শৃঙ্খলাবোধ, স্বাবলম্বন এবং চরিত্রগঠনেরও সুযোগ এবং ক্ষেত্র আছে। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে বনিয়াদি শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বনের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

বাংলাদেশে কি ঘটিতেছে তাহা এবার দেখা দরকার। এখানেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থানে স্থানে বনিয়াদি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সরকারের সাহায্য উহারা লাভ করে নাই। বাংলা-সরকার এখন ১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনটি কার্যে পরিণত করিয়া এমন ব্যবস্থা করিতেছেন যাহার ফলে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলগুলি এক প্রকার সমগ্রভাবে মুসলিম লীগের প্রভাবাধীনে আসিয়া পড়িতেছে। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে অবস্থা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে সেখানে বহু স্কুলে এখন মুসলমান শিক্ষকদের নিকট হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা করিতে হইতেছে। ধর্মশিক্ষা প্রাথমিক স্কুলে ১৯৪০ সাল হইতে অবশ্যপাঠ্য বিষয় করা হইয়াছে। উহাতে পরীক্ষা লওয়া হয় এবং বহু স্কুলে হিন্দু শিক্ষক রাখা হয় নাই বলিয়া সেখানে মুসলমান শিক্ষকদের নিকট হিন্দু ছেলেমেয়েরা হিন্দু ধর্ম শেখে। কি শেখে তাহা বুঝা কিছু কঠিন নয়। সমগ্র সমস্যাটা বুঝিতে হইলে একটু আনুপূর্বিক বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের উদ্দেশ্য ছিল বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দান। প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া স্কুল বোর্ড স্থাপন করিয়া উহাদের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে। দার্জিলিং এবং মেদিনীপুর ভিন্ন অপর সকল জেলাতেই স্কুল বোর্ড গঠিত হইয়াছে। আপাততঃ প্রাথমিক শিক্ষা-কর বসাইয়া উহার দ্বারাই স্কুলগুলির ব্যয় নির্বাহের চেষ্টা হইতেছে। বিনা বেতনে শিক্ষাদানেরই চেষ্টা এখন চলিতেছে, শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার আয়োজন এখনও হয় নাই। এই আইন শুধু গ্রাম্য এলাকায় প্রযোজ্য এবং সেখানেই উহা প্রয়োগ করা হইতেছে। মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদ রাখা হইয়াছে, কারণ সেখানে উহার কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করিতে গেলে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। মেদিনীপুর হিন্দু প্রধান জেলা, উহাও বাদ আছে।

স্কুল বোর্ডের এক দল সদস্য নির্বাচিত হন ইউনিয়ন বোর্ডগুলির দ্বারা এবং আর এক দল গবর্মেণ্ট মনোনয়ন করেন। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের ইউনিয়ন বোর্ডগুলির অধিকাংশই লীগের ঘাঁটি, সেখান হইতে সদস্য নির্বাচনে রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক কারণই প্রবল হয়, নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন শিক্ষিত লোক সাধারণতঃ ঢুকিতে পান না। সরকারী মনোনয়নের দ্বারাও এরূপ লোকই বোর্ডে আসিয়া থাকেন। বোর্ডে প্রথম আট বৎসরের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন সভাপতি, তার পর হইতে সভাপতি নির্বাচিত হন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্ব কালে প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অনুমোদন সাপেক্ষে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট কার্য পরিচালনা করেন। প্রথমে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং পরে প্রেসিডেণ্ট এই দুইটি পদ জেলা বোর্ডের সভাপতিরাই সাধারণতঃ অধিকার করিয়া থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইঁহারাই স্থানীয় মুসলিম লীগেরও সভাপতি। সুতরাং স্কুল বোর্ডগুলিকে স্থানীয় জেলা বোর্ড অথবা মুসলিম লীগের প্রতিচ্ছবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আগে একটা নিয়ম ছিল যে প্রাথমিক স্কুলগুলির পরিচালনার পরামর্শ দানের জন্য একটি করিয়া স্থানীয় এডভাইসরি বোর্ড থাকিবে। ঐগুলি শিক্ষিত লোকদের লইয়া গঠিত হইত। এবার উহাও ভাঙিয়া দিয়া সমগ্র কর্তৃত্ব ভার অর্পিত হইয়াছে স্কুল বোর্ডের হাতে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুল বোর্ডগুলির সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব কায়েম করিবার জন্য বাংলা-সরকার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীয় এডভাইসরি বোর্ড গঠনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা

প্রাথমিক স্কুল স্থাপনের সরকারী নিয়ম এই যে প্রতি দুই বর্গ মাইলে একটি স্কুলের বেশী থাকিবে না। স্কুল বসাইবার সময় মুসলমান পাড়ার মধ্যে অথবা যথাসম্ভব উহা ঘেঁসিয়া যাহাতে উহা স্থাপিত হয় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। ইহা লইয়া দুই বিভিন্ন দলে বিরোধও বাধে এবং শেষ পর্যন্ত উহা লইয়া উৎকোচের আদান-প্রদানও হয়। স্কুলসমূহের সাব-ইনস্পেক্টরই সাধারণতঃ স্কুলের স্থান নির্দেশ করেন এবং উহার দ্বারা তাঁহাদের উপরি-আয়ও কিছু কিছু হয় বলিয়া শুনা যায়। আজ পর্যন্ত কত জন সাব-ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে এরূপ দুর্নীতির অভিযোগ আসিয়াছে তাহা শিক্ষামন্ত্রী জানাইলে ভাল হয়। পূর্ববঙ্গে এই ব্যবস্থার ফলে সমস্ত হিন্দু স্কুল উঠিয়া গিয়াছে। এই ব্যবস্থার আর একটি মারাত্মক বিধান এই যে, সরকারী সাহায্য ছাড়া ব্যক্তিগত চেষ্টাতেও কোন প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হইতে পারে না।

শিক্ষক নিয়োগেও এই প্রকার পক্ষপাতিত্ব প্রকট। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক হার অনুসারে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। পশ্চিম বঙ্গে আধা-আধি বখরা। শিক্ষক নির্বাচনে স্থানীয় লীগ প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে, কারণ ইহারাই প্রকৃত পক্ষে লীগের ভলান্টিয়ারের কাজ করে। পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে বহু স্কুলে একটিও হিন্দু শিক্ষক নাই। ত্রিপুরা স্কুল বোর্ডে এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাস করান হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি যে, যে এলাকায় মাইনরিটির অনুপাত শতকরা ২৫ জনের কম সেখানে মাইনরিটি সম্প্রদায় হইতে কোন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে না। ইহার ফলে পূর্ববঙ্গের বহু স্কুলে হিন্দু শিক্ষক নিযুক্ত হইতে পারেন না।

শিক্ষকদের ট্রেণিঙের জন্য গুরু ট্রেণিং স্কুল আছে। উহাতে এতদিন হিন্দু-মুসলমানের সমান প্রবেশাধিকার ছিল। বর্তমানে তাহাও গিয়াছে। গুরু ট্রেণিং স্কুলের পাণ্টা হিসাবে শুধু মুসলমান শিক্ষকদের ট্রেণিঙের জন্য মোয়াল্লেম ট্রেণিং স্কুল বহু স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার অনুপাতে গুরু ট্রেণিং স্কুলে মুসলমানদের ভর্তির ব্যবস্থাও হইয়াছে। মোয়াল্লেম ট্রেণিং স্কুল শুধু পূর্ব ও উত্তর বঙ্গেই স্থাপিত হয় নাই, হুগলী এবং ২৪ পরগণা জেলাসমূহেও উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৪০ সালে শিক্ষাবিভাগের স্পেশাল অফিসার বলিয়াছিলেন যে গুরু ট্রেণিং স্কুলগুলি যাহাতে শিক্ষাদান ও শিক্ষিত লোকের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কাজ করিতে পারে তাহার জন্য উহাদিগকে স্থানীয় হাই স্কুলগুলির কাছে বসানো হউক। কিন্তু কার্যতঃ ঐগুলিকে এখন মাদ্রাসার কাছে কাছে বসানো হইতেছে।

পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের ব্যবস্থাও চমৎকার। বঙ্গীয়

পাঠ্য পুস্তক কমিটি মনোনীত পাঠ্য পুস্তকসমূহের একটি তালিকা করিয়া দেন। ঐ তালিকা হইতে আবার নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী উপ-তালিকা প্রণয়নের ক্ষমতা স্কুল বোর্ডসমূহের আছে। তাঁহারা এই উপ-তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় এমন ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেন যেন নিজেদের তাঁবেদার শ্রেণীর হিন্দু ভিন্ন আর কোন হিন্দুর পুস্তক পাঠ্য করা না হয়। ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার প্রাথমিক স্কুলসমূহে যে সব পুস্তক পাঠ্য হইয়াছে তাহার তালিকা সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে যে একটিও হিন্দু লেখকের পুস্তক পাঠ্য করা হয় নাই। ইহার অপরিহার্য পরিণাম এই যে, বাঙালী ছেলেদের উর্দু মিশ্রিত অপূর্ব খিচুড়ি ভাষা শিশুকাল হইতেই গলাধঃকরণ করিতে হইতেছে। ১৯৪০ সালে প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্য-তালিকা পরিবর্তন করা হইয়াছে। এত দিন এই সব স্কুলে ধর্মশিক্ষা অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল না, উহাতে পরীক্ষাও লওয়া হইত না। এই বৎসর হইতে ধর্মশিক্ষা অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে নির্দিষ্ট হয় এবং উহাতে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পরীক্ষাও লওয়া হয়। মন্ত্রী মৌলবী তমিজুদ্দীনের আমলে এই কার্য করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেনিঙের অধ্যক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন কিন্তু তাঁহার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াই এই ব্যবস্থা করা হয়। মাইনরিটির অনুপাত শতকরা ২৫-এর কম হইলে সেই সম্প্রদায়ের শিক্ষক স্কুলে থাকিতে পারিবে না এই নিয়ম অনুসারে পূর্ববঙ্গের বহু স্কুলে হিন্দু শিক্ষক নাই এবং সেই সব স্কুলে মোল্লাশ্রেণীর গোঁড়া মুসলমান শিক্ষকদের নিকট হিন্দু ধর্ম শিক্ষার নামে হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা কি বস্তু শিক্ষা করিতেছে তাহা বলিয়া না দিলেও চলে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এত বড় একটা বিষয় সম্পর্কে কংগ্রেস বা হিন্দু-মহাসভার নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদপত্রসমূহ পর্যন্ত সমান উদাসীন।

স্কুল পরিদর্শনেও লীগের প্রভাব যাহাতে অব্যাহত থাকে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক জেলার একজন করিয়া জেলা ইনসপেক্টর এবং তাঁহার অধীনে কয়েকজন করিয়া সাব-ইনসপেক্টর থাকেন। ২৮ জন জেলা স্কুল ইনসপেক্টরের মধ্যে ১৭ জন মুসলমান, ১১ জন হিন্দু। একজন মাত্র ছিলেন শিক্ষিত তপশীলী হিন্দু, ভদ্রলোক উচ্চশিক্ষার জন্য ছুটি লওয়ায় তপশীলী দরদী লীগ গবর্মেণ্ট তাঁহার স্থলে একজন মুসলমানকে নিযুক্ত করিয়াছে। মুসলমানপ্রধান সমস্ত জেলায় স্কুল ইনসপেক্টর মুসলমান, হিন্দুপ্রধান জেলা খুলনা, চব্বিশপরগণা, হাওড়া প্রভৃতিতে এবং কলিকাতাতে স্কুল ইনসপেক্টর মুসলমান। এই পদের কোনটি খালি হইলে পাবলিক সার্ভিস কর্তৃক মনোনীত একটি তালিকা হইতে লোক বাছাই করিবার কথা, কিন্তু তাহা করিতে গেলে কয়েকজন হিন্দু ঢুকিয়া পড়িতে পারে বলিয়া লীগ গবর্মেণ্ট স্কুলপরিদর্শন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হাই স্কুলের মুসলমান হেডমাষ্টারদের আনিয়া এই সব পদ পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাব-ইনসপেক্টরদের সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাত আরও বেশী। নোয়াখালী জেলায় ১২ জন সাব-ইনসপেক্টরের মধ্যে ১১ জনই মুসলমান, একজন মাত্র হিন্দু।

বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে ইহা তাহার একটি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ চিত্র মাত্র। বাংলাদেশ জুড়িয়া ১৯৪০ সাল হইতে এই ব্যাপার চলিতেছে, তথাপি নেতৃবৃন্দ ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আন্দোলন করাও আবশ্যক বোধ করেন না ইহাই পরম আশ্চর্য।

পরিকল্পনা-পরামর্শ বোর্ডের রিপোর্ট

গত অক্টোবর মাসে ভারত-সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিকল্পনা উপদেষ্টা বোর্ডের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সব দিকের কথাই বিবেচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, একটি স্থায়ী পরিকল্পনা কমিশনের প্রয়োজন উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতির একটি আভাস দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, আর্থিক নীতির বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, এই পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের স্থান দেখানো হইয়াছে। সর্বশেষে শিল্প-পরিচালনায় সরকারের নীতি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

স্থায়ী পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য-সংখ্যা ঊর্ধ্বপক্ষে পাঁচ ও ন্যূনপক্ষে তিনের মধ্যে স্থির করা হইয়াছে। এই কমিশনকে সাহায্য করিবার জন্য ন্যূনপক্ষে পঁচিশ হইতে ঊর্ধ্ব তম ত্রিশ জন সদস্যের এক পরামর্শদাতা কমিটিও থাকিবে। এই পরামর্শদাতা কমিটিতে বিভিন্ন প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য ও কেন্দ্রের প্রতিনিধি থাকিবে ও বৃত্তির দিক হইতে থাকিবেন কৃষি, শিল্প, শ্রম, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের প্রতিনিধিগণ। বোর্ডের আরও ধারণা যে, কেন্দ্রের এই ধরণের সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা কমিটি প্রত্যেক প্রদেশে ও এমন কি প্রতি জেলাতেও গঠন করা উচিত। তাহা হইলে জেলা কমিটিগুলি কৃষি ও কুটীরশিল্পের উপর নির্ভরশীল গ্রামগুলিকে জাতীয় পরিকল্পনার দৃঢ় বনিয়াদে পরিণত করিতে পারিবে।

জাতীয় পরিকল্পনা-কমিটির কার্য-প্রণালী সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক পরিকল্পনাগুলির সমন্বয় বিধান হইবে ইহার প্রথম কাজ, দ্বিতীয় কাজ হইবে প্রয়োজনীয় খনিজ ও অন্যান্য প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় রাজস্ব বরাদ্দ করা। তৃতীয়তঃ, এই কমিটি শিল্পের মালিকানা সম্পর্কে সরকারী নীতিকে পরিচালনা করিবে। এ ছাড়া পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুসারে মুদ্রা ও আমানত সমেত জাতীয় আর্থিক লেনদেনকে এই কমিটি নিয়ন্ত্রণ করিবে।

বাস্তব প্রয়োগের ভিত্তিতে ভাবিতে গিয়া রিপোর্টে পরি-

কল্পনায় দুই অংশ কৃষি ও শিল্পের পরিকল্পনাকে পৃথকভাবে ও সবিস্তারে দেখান হইয়াছে। খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে কৃষিকে দুই দিক হইতেই দেখা হইয়াছে। কিন্তু উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রেই এক—অর্থাৎ জাতীয় জীবনের মানের উন্নয়ন। এই উদ্দেশ্যে কৃষিকে নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলা হইয়াছে। পরীক্ষায় দেখা যায় কৃষির বিপদ দ্বিবিধ মধ্যস্বত্ব—মালিকানা ও কৃষিকার্যের উপাদান। পরিকল্পনায় কৃষিকে এই দুই বিপদের হাত হইতেই রক্ষা করার প্রয়োজন বলা হইয়াছে। কৃষির বিপদ ভূমিস্বত্ব আইনের বিচিত্র ব্যবস্থা, শিল্পের বিপদ যন্ত্র-সরবরাহের অসুবিধা। শিল্পের বেলায় সর্বপ্রথমেই খনিশিল্পে বিদেশী মালিকানার বিরোধিতা করা হইয়াছে।

শিল্পকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এক ভাগে আছে লৌহ, কয়লা, তৈল, ইস্পাত ও যানবাহন ইত্যাদি মৌলিক শিল্প। এইগুলিকে সরকারী মালিকানায় রাখিতে হইবে। এ ছাড়াও যে সব শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মূলধন সহজে আসে না সেই সব শিল্পে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে। এ ছাড়া সাধারণভাবে শিল্প-প্রতিষ্ঠায় সরকারের উৎসাহ থাকিবে। শিল্পপতিদের সুবিধার জন্য পরিকল্পনা-কমিশন মাঝে মাঝে জগতের আর্থিক গতিপ্রকৃতির তথ্যাদি প্রকাশ করিবেন।

এই পরিকল্পনাকে কাজে লাগাইতে হইলে বহু পরিমাণে যন্ত্রকুশলী শ্রমিকের প্রয়োজন। বোর্ডের রিপোর্টে এই দিকেও নজর দেওয়া হইয়াছে। যান্ত্রিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য একটি ক্ষুদ্রতর সাবকমিটি নিয়োগের কথা বলা হইয়াছে। এই সাবকমিটি বেভিন-পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করিয়া এক ব্যাপক পরিকল্পনার বিধান করিবে। এই কাজে সরকারের শ্রম ও শিক্ষা বিভাগের পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজনও উল্লিখিত হইয়াছে।

পণ্ডিত নেহরু এই রিপোর্টের গঠনমূলক সমালোচনা চাহিয়াছেন। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সর্বজন-স্বীকৃত। এমন কি কৃষি ও শিল্প সম্পর্কে পরিকল্পনার প্রয়োগ-নীতিকেও আমরা ভারতীয় সমস্যার বিচারে যথার্থই মনে করি। কিন্তু এই কাজ সম্ভব করিতে হইলে পরিকল্পনা-ব্যবস্থায় নিম্নস্তরে যে ধরণের সংগঠন হওয়া প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সরকারের বর্তমানে সেই যোগ্যতা নাই। এই অভাব রিপোর্টেও স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু পরিবর্তনের কোন স্পষ্ট ছবিও তুলিয়া ধরা হয় নাই। এখানে আমরা সোভিয়েট পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। সোভিয়েটে প্রত্যেকটি প্রাথমিক পরিকল্পনা কমিটিতে সরকারী কর্মচারী ছাড়াও এক জন সাংবাদিক, এক জন যন্ত্রকুশলী ও এক জন শ্রমিক প্রতিনিধির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অনেকটা এইজন্যই সোভিয়েট পরিকল্পনা এত তাড়াতাড়ি এত বেশী জনপ্রিয় হয়। আমাদের দেশে সরকারী কর্মচারীদের অযোগ্যতা বিবেচনা করিয়া আমরা জেলা কমিটি-গঠনে এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ লাভজনক মনে করি।

দুর্নীতি-দূরীকরণ বিল

উৎকোচ ও দুর্নীতি দূরীকরণ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় আইন সভায় একটি বিল পাস করা হইয়াছে। যুদ্ধের সুযোগে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ ও দুর্নীতি বিশেষভাবে বাড়িয়াছিল। যুদ্ধ আজ আর না থাকিলেও দুর্নীতির সুযোগ-গুলি আরও কিছুকাল থাকিয়া যাইবে। এখনও সরকারী কন্‌ট্রাক্ট বিতরণ করা হইতেছে, উদ্বৃত্ত সরকারী সমরোপকরণ বিক্রয়ও চলিতেছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর আরও কিছুদিন কন্ট্রোল বজায় রাখা আবশ্যক হইবে। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাসমূহের জন্য বহু সরকারী অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে ও হইতেছে। এই সব কার্যের মধ্যে দুর্নীতির বিস্তর স্থান রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও বিস্তার লাভ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই বিল পাস করা হইয়াছে। বাংলাদেশের শাসনবিভাগের কার্য-কলাপ অনুসন্ধানের পর রোল্যাণ্ড কমিটি এ বিষয়ে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। রোল্যাণ্ড কমিটির রিপোর্টের পর বাংলা-সরকার রায়বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখুয্যেকে (কৃষি-জরীপ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর) দুর্নীতির কারণগুলি ও তাহা দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ করিতে নিয়োগ করেন। ৯৩ ধারার শাসন-আমলের শেষ দিকে তাঁহাকে এই কার্যের ভার দেওয়া হয় ও পরবর্তী লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর আমলে তিনি রিপোর্ট দাখিল করেন। কিন্তু ঐ রিপোর্ট গোপন রাখা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি ঐ রিপোর্টের এক কপি চাহেন তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন যে বাংলায় শাসন-যন্ত্র কতখানি দুর্নীতিপরায়ণ। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্নীতি নিবারণ আইনে ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ১৬১ ধারা ও ১৬৫ ধারা দুইটিকে পুলিসগ্রাহ্য অপরাধ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই ভাবে দুর্নীতি দূরীকরণের পথে একটা বড় বাধা অপসারণ করা হইয়াছে। এই বিলে আরও বলা হইয়াছে যে যদি কোন সরকারী কর্মচারী বা তাহার পক্ষে অপর কোন লোক তাহার আয় বা সম্পত্তির বিষয়ে কোনও সন্তোষজনক কারণ না দর্শাইতে পারে তবে বিচারক মনে করিতে পারেন যে ইহা অসদুপায়ে গৃহীত সম্পত্তি এবং ঐ ব্যক্তি ফৌজদারী আইনে দোষী। বিলের এই ধারা বিলাতের ১৯০৬ সালের দুর্নীতি-দূরীকরণ আইনের অনুকরণে রচিত। এই বিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আমলাদের উপর সমভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু এই বিলের দুইটি ত্রুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রোল্যাণ্ড কমিটি ফৌজদারী আইনের ১৬২ ধারাকে পরিবর্তন করিতে সুপারিশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে কোনও দুর্নীতির মামলার তদন্তের সময় পুলিসের নিকট যে বিবৃতি দেওয়া হইবে তাহা যেন পরে সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। কারণ ঘটনাস্থলে ধরা পড়িয়া আসামী যে বিবৃতি দিবে তাহা হইতে সত্য ঘটনা

প্রকাশ পাইবে। পরে ভাবিয়া-চিন্তিয়া যে বিবৃতি দেওয়া হয় তাহাতে সত্য গোপন করিবার যথেষ্ট সুযোগ আসামী পাইবে। বিলে এই সুপারিশ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে ফৌজদারী আইনের ১৬২ ধারা, ১৬৫ ধারা বা ৫ ধারার অধীন পুলিস হইতে প্রাপ্ত অপরাধ-বিষয়ের কোন মামলায় কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সম্মতি পূর্বাহ্নে লইতে হইবে। এই ধারা বিলের আসল উদ্দেশ্যকেই মাটি করিয়া দিবে। বিশেষতঃ বাংলা ও সিন্ধু প্রদেশে যেখানে এই আইনের বেশী প্রয়োজন, সেখানেই ইহার প্রয়োগ হইবে না। নির্দোষ কর্মচারীদিগকে অযথা হায়রানি হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি গোপনীয় প্রাথমিক বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটিই যথেষ্ট হইত।

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধীয় সমস্তাগুলির সম্যক আলোচনা ও তাহার সুরাহার জন্য ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ড একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। এই সম্মেলন স্থির করিবে যে ইস্পাত ও লোহার কারখানাগুলিকে যুদ্ধোত্তর প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচাইবার জন্য সংরক্ষণ-শুল্ক (Protection) বসাইবার ব্যবস্থা হইবে কি না এবং হইলে উহা কি প্রকার হইবে।

কিন্তু যে কোন প্রকারের শিল্প-ব্যবস্থাই হোক না কেন, তাহাদের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবার পূর্বে কতকগুলি কথা বিবেচনা করিবার আছে।

আমরা যখনই কোন প্রতিষ্ঠানের রক্ষা-ব্যবস্থা করি বা তাহার অনুমোদন করি তখন বিশেষ করিয়া সেই শিল্পটি সমগ্র শিল্পজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি ও তাহার সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করি। সমগ্র শিল্পজগৎ ও অর্থনীতির সহিত সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া আমরা প্রায়শঃই ভাবিয়া দেখি না যে এই ব্যবস্থা করিলে দেশের শিল্প ও অর্থের দিক দিয়া কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। বর্তমান ট্যারিফ-বোর্ডও প্রত্যেক শিল্প-বিষয়ে বিশেষভাবে নজর রাখিয়া ও তাহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া কাজ করিয়া যাইতে পারিবে তাহা আশা করা যায় না। কারণ তাহা হইলে এই বোর্ডকে ইস্পাত ও লৌহের কিম্বা বস্ত্রশিল্প ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হইবে।

ফিসক্যাল কমিটির রিপোর্টে যথোপযুক্ত রক্ষা-ব্যবস্থার কথা অনুমোদন করা হইয়াছিল। স্থির হইয়াছিল যে ট্যারিফ-বোর্ডগুলির মধ্যস্থতায় দেশের শিল্প-ব্যবস্থার ও কল-কারখানার উন্নতিসাধন করা হইবে। বোর্ডগুলি কেবলমাত্র কোন কোন বিশেষ শিল্প-ব্যবস্থার সুবিধা করিয়া দিবে তাহা নহে—দেশের সর্বাঙ্গীণভাবে যাহাতে শিল্পগত ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে তাহাই করিবে। রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য প্রথমতঃ আমাদের দেখিতে হইবে যে, যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পূর্বোক্ত সুবিধা দেওয়া হইবে সেই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত কাঁচামাল ও শ্রমশক্তি আছে কিনা এবং দেশের মধ্যেই সেই প্রতিষ্ঠানজাত জিনিষপত্রগুলির বিক্রয় ও প্রসারের জন্য উপযুক্ত বাজার আছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে হইবে যে সেই বিশেষ প্রতিষ্ঠান রক্ষা-ব্যবস্থা পাইলে অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি করিতে পারিবার সম্ভাবনা আছে কিনা এবং তৃতীয়তঃ, একথাও চিন্তা করিয়া দেখিবার যোগ্য যে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিশেষে সারা জগতের শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়গুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কিনা। এখানে আর একটি কথাও মনে রাখিতে হইবে যে সারা পৃথিবীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সহিত প্রতিযোগিতার সময় রক্ষা-ব্যবস্থার কথা অবান্তর।

ভারতের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা সম্বন্ধে অবশ্য এই সমস্ত বিষয় আর ভাবিবার প্রয়োজন নাই। কারণ এই প্রাথমিক স্তরগুলি ইহারা অতিক্রম করিয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত কারখানাই প্রথম ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য আবেদন জানাইয়াছিল। এতকাল ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠান যে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা মূলতঃ রক্ষণনীতির জন্যই। এখন এই শিল্পপ্রতিষ্ঠান জগতের সমজাতীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইবার মত ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে কিনা তাহাই ভাবিবার কথা। দেশের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপারে লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজনীয়তা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। তবে এ কথা সহজেই বলা চলে যে এই ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ। যুদ্ধের সময় ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যেই যুদ্ধের বহু অপরিহার্য দ্রব্যাদি ও অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার হইয়াছে। দেশের সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনের জন্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত দ্রব্যাদির চাহিদা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে সামরিক ও বেসামরিক সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা জারি করিতে হইয়াছিল।

এই শিল্প কতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার বাৎসরিক উৎপাদন-পরিমাণের কিছুকালের হিসাবেই তাহা প্রতীয়মান হয়। ১৯১৬-১৭ সালের ১৩৯,০০০ টন পরিমাণ উৎপাদন বর্ধিত হইয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে ৯১৭০০০ টন হইয়া উঠিয়াছে। ইস্পাতের উৎপাদন পরিমাণ ১৯১৬-১৭ সালের ৯৮,০০০ টন হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালে ৭২৬,০০০ টনে উঠিয়াছে। লৌহপিণ্ডের উৎপাদন উনিশ শতকের প্রথম দিকে ছিল ৩৫০০০ টন, কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই উৎপাদন ১৫৭৬০০০ টনে উঠিয়াছে। এই পরিমাণের একটি বিরাট অংশ সমুদ্র পারে চালান গিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে রপ্তানীর পরিমাণ ঢের কমিয়া গিয়াছে। শুধু কমিয়াছে বলিলে ভুল হইবে বরং এই রপ্তানী এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে তাহা গ্রহণীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। যুদ্ধের জন্য মাল সরবরাহের অসুবিধা এবং

বাহিরে অন্যান্য দেশে মাল তৈয়ারী হওয়ার কারণে ভারতবর্ষের রপ্তানী কমিয়া গিয়াছে। কেবল দুই একটি বিশেষ ধরণের জিনিষপত্র ছাড়া রপ্তানীর কথা আর ধর্তব্যের মধ্যে নহে।

যে প্রকার উন্নতির কথা বলা হইল তাহা খাপছাড়া সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সত্ত্বেও ঘটিয়াছে। ১৯২৭ সালে "ট্যারিফ বোর্ড" যে শুল্ক অনুমোদন করিয়াছিল তাহাতে অবস্থা-।বশেষে সংরক্ষণের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। উহা এই ছিল যে ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী লোহার উপর ভিন্ন রূপ শুল্ক থাকিবে। তা ছাড়া, অটোয়া চুক্তি (Ottwa Agreement 1932) অনুসারে অ-ব্রিটিশ দেশগুলি হইতে আমদানী করা গ্যালভানাইস্‌ড্‌ টিনের পাতের উপর আরোপিত কর টনপ্রতি ৮০ টাকা ধার্য হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ-টিনের সেই সমপরিমাণ ওজনের দ্রব্যের উপর ৫৩ টাকা কর ধার্য্য করা হইয়াছিল এবং ভারতীয় লৌহ বা ইস্পাতের দ্বারা প্রস্তুত এরূপ টিনের উপর কর ৩০৲ হিসাবে ধার্য করা হইত। ইহাতে ভারত হইতে কাঁচা মাল রপ্তানী ও ব্রিটেন হইতে তৈয়ী মাল আমদানীর ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দেখা দিল। তাহার ফলে দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তবে এখন আমরা উন্নতির এমন একটা পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছি যে এখন ভারতবর্ষ আর কোন প্রকারের কলকাঠি নাড়া সহ্য করিবে না। কারণ তাহাতে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশের এই প্রতিষ্ঠানগুলির একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। এই সময়ে এমন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা উচিত যাহাতে সরকারী পরিদর্শনের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অগ্রসর হইতে পারে। দেশের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার অনেক কিছুই এই প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির উপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় যে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাগুলির উপর হইতে সংরক্ষণ-শুল্ক তুলিয়া লওয়াই প্রয়োজন। কারণ যে যে অবস্থায় সংরক্ষণের প্রয়োজন ইহারা তাহা অতিক্রম করিয়াছে এবং জগতের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে।

শ্রমিক কল্যাণ ও কমিউনিষ্ট

সম্প্রতি মাদ্রাজ প্রাদেশিক সরকারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রকাশম্‌ নাগরিক জীবনের শান্তি বিধান ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে অর্ডিন্যান্স জারি করা হইয়াছিল তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, দেশের সাময়িক বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং ধারাবাহিক ও পৌনঃপুনিক ধর্মঘটের জন্য দায়ী করা যাইতে পারে কম্যুনিষ্টদের। তাহারা দেশের সরকারী ব্যবস্থাকে অচল করিয়া তুলিবার জন্য সর্বত্র একই ঘটনা ঘটাইতেছে। সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুরে শ্রীযুক্তা হংস মেটা বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে কম্যুনিষ্টরা দুঃস্থ দরিদ্র শ্রমিক কৃষক প্রভৃতির দাবি-দাওয়া ও অসন্তোষগুলিকে ভাঙাইয়া আপনাদের প্রতিষ্ঠার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এই মর্মে খবর পাওয়া গিয়াছে দিল্লীর কম্যুনিষ্টরা স্থির করিয়াছে তাহারা পৌনঃপুনিক ভাবে ধর্মঘট চালাইয়া সেই ধর্মঘটের পরিস্থিতি যাহাতে দেশব্যাপী ভাবে একটি সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হয় তাহার প্রচেষ্টা করিবে। ইহার দ্বারা যাহাতে তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহারও চেষ্টা করিবে।

বর্তমানে দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাকে নানাপ্রকারে সঙ্গীন বলা ছাড়া উপায় নাই। অনুপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা, খাদ্যাভাব ও অন্যান্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ও সর্বোপরি একটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ভাব দেশের আবহাওয়াকে গুরুতার করিয়া তুলিয়াছে। কম্যুনিষ্টরা দেশের বর্তমান অবস্থার এই গুরুত্বের সুযোগে আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তাহারা এই সুযোগে দেশপ্রেমিক সাজিয়া কাজ হাসিল করিবার চেষ্টায় ত্রুটি করিতেছে না। এইজন্য মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতির কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্টসমূহ তাহাদের বিরুদ্ধে এমন প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন যাহাতে তাহারা এই সময়ে হিংস্র নীতিকে বাড়াইয়া তুলিতে না পারে, দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করে। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, ইহারা ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত যে সমস্ত কার্য চালাইয়া যাইবে তাঁহারা তাহারও বিরুদ্ধাচরণ করিবেন।

শ্রমিক কল্যাণে কংগ্রেসের আন্তরিকতার অভাব কোন দিনই ছিল না, বর্তমানে উহা কার্যে পরিণত করিবার সুযোগও কতক পরিমাণে তাঁহাদের হাতে আসিয়াছে। শ্রমিকদের এখন বুঝাইতে হইবে যে দেশের কেন্দ্রস্থলের সরকারী শাসনভার এখন দেশেরই প্রধান প্রধান নেতাদের হাতে। তাহাদের অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রার পথ মসৃণ করিয়া তোলাই এই নেতৃগণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ও তাঁহারা সেই প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সামর্থ্য রাখেন। শ্রীযুক্ত অশোক মেহ্‌তা বলিয়াছেন যে যাহাতে শ্রমিকগণের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য দ্রুতভাবে গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করা যায় সেই বিধানই আগে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে যে সময় লাগিতেছে, তাহার মধ্যবর্তী সময়ের যে সমস্যাগুলি শ্রমিক ও অন্যান্য দুঃস্থদের পীড়িত করিয়া তুলিতেছে সেই সাময়িক অসন্তোষের কারণগুলিকেই কম্যুনিষ্টগণ ভাঙাইয়া অশান্তি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। প্রায়শঃ এইরূপই ঘটিয়া থাকে যে ধর্মঘটিদের অভাব-অভিযোগ আমরা শীঘ্র শীঘ্র কানে তুলি না। উদাহরণ-স্বরূপ দিল্লীর শিক্ষক সম্প্রদায়ের ধর্মঘটের কথা বলা যাইতে পারে। এই নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে সরকার চিরস্থায়ী ভাবে শ্রমিকগণের সকল সুখ-সুবিধা ও

দাবি-দাওয়ার সহিত পরিচিত থাকে। যদি কোন সময় এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যাহাতে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া কোন কিছুর মীমাংসার সম্ভাবনা নাই তাহা হইলে সেই স্থলে এইরূপ নিরপেক্ষ বিচারের ব্যবস্থা করা হইবে যাহাতে মালিক ও শ্রমিককে একই চক্ষে দেখা হইবে।

এই ব্যবস্থা ছাড়া দুর্মূল্যের অসুবিধার জন্য শ্রমিকগণ যে খাদ্যবস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহে অসুবিধা ভোগ করিবে তাহার প্রতিরোধকল্পে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে সাময়িক অসুবিধার সুযোগে কম্যুনিষ্টরা তাহাদের স্বার্থ পরিপুষ্টির উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে না পারে। শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যে এমন একটি যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক যাহাতে গত যুদ্ধের ছয় বৎসরের ধারাবাহিক অত্যাচারে দুর্বল ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মেরুদণ্ড আবার শক্তি অর্জন করিতে পারে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে যখন সকল পরিষদগুলিতে সাংবৎসরিক হিসাবনিকাশ হইবে তখন যদি জনসাধারণের বিশেষ করিয়া শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের অভাব-অভিযোগের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় তাহা হইলে এই বিষয়ে সুরাহা হইবার আশা আছে। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলে দরিদ্র জনসাধারণের উপর হইতে কম্যুনিষ্ট প্রভাব কমিয়া যাইবে এবং গণতান্ত্রিক সমাজগঠনের পথ পরিষ্কার হইবে।

দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপ সর্বত্র একই প্রকার। সর্বত্রই উহাদের লক্ষ্য এক—লীগের সহিত একযোগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তি বৃদ্ধি। সিন্ধুতে শ্রমিক-কেন্দ্র হইতে পূর্বে যিনি নির্বাচিত হইয়াছিলেন তিনি কংগ্রেসের সহিত যোগ দেন। গত নির্বাচনে তাঁহার বিরুদ্ধে লীগ ও কম্যুনিষ্ট উভয়ে মিলিয়া এক ব্যক্তিকে দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে জয়যুক্ত করান এবং ইনি নির্বাচনের পরেই লীগদলের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। বাংলাদেশেও লীগের সহিত কম্যুনিষ্টদের যোগাযোগ অত্যন্ত স্পষ্ট। ৫ই ফেব্রুয়ারী যে হরতালের আয়োজন করা হইয়াছিল তাহাতে তাঁহারা পরিষ্কার করিয়াই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে হরতালের উদ্দেশ্য লীগ গবর্মেণ্টের অবসান ঘটানো নয়, ২১শে জানুয়ারী ভিয়েৎনাম দিবসে ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ছাত্র বা পথচারীর উপর গুলি বর্ষণ বর্তমান লীগ রাজত্বে প্রায়ই ঘটিতেছে। বর্তমান লীগ গবর্মেণ্ট বজায় রাখিয়া এরূপ প্রতিবাদ করিতে গেলে প্রায়ই উহা করিতে হইবে। কম্যুনিষ্টদের তাহাতেই উৎসাহ কিন্তু রোগের মূল লীগ গবর্মেণ্টের অবসানে অগ্রণী হইতেই তাঁহাদের আপত্তি।

আন্দোলনের সূত্রপাত সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদের কার্যপ্রণালীও ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। ২১শে জানুয়ারী কলিকাতায় ভিয়েৎনাম দিবস ঘোষণা করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বিচার-বিবেচনার সুযোগ মাত্র না দিয়া তাহাদিগকে শোভাযাত্রা সহকারে পথে বাহির করা হয়। শহরে ১৪৪ ধারা জারী আছে, শোভাযাত্রা করিলে উহা ভঙ্গ হয়। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে শোভাযাত্রা বাহির করা উচিত কিনা, বাহির করিলে তাহার পরিণাম কি হইবে, দেশের বর্তমান অবস্থায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের আন্দোলন আরম্ভ করিতে গেলে কংগ্রেসের সম্মতি আবশ্যক কিনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার সুযোগ না দিয়াই অতর্কিতে ছাত্রছাত্রীদের পথে বাহির করিয়া তাহাদিগকে পুলিসের গুলি ও গ্যাসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে দুইটি ছাত্রের মৃত্যুও ঘটে। অথচ ইহা ভালভাবেই লক্ষ্য করা গিয়াছে যে পুলিসের গুলি ও গ্যাস চলিবার পূর্ব মুহূর্তে কম্যুনিষ্ট নেতারা সরিয়া পড়িয়াছেন। শোভাযাত্রা বাহির করিয়া এবং অন্তরাল হইতে ঢিল ছুঁড়িয়া 'সিচুয়েশন' সৃষ্টি করিয়াই ইঁহারা অন্তরালে সরিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের এই 'ট্যাকটিক্স' কলিকাতাবাসী জনসাধারণ এবং ছাত্রছাত্রীরাও যে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন ৫ই ফেব্রুয়ারীর হরতালের ব্যর্থতা তাহার প্রমাণ। বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট চালিত যদিও উহার সভাপতি নিজে কম্যুনিষ্ট নহেন। নামের মোহে তিনি নিজেকে কম্যুনিষ্টদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতে দিতেছেন এবং ইহা করিতে গিয়া কংগ্রেসেরও বিরুদ্ধাচরণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। ইঁহাদের ন্যায় সুবিধাবাদী ও স্বার্থসর্বস্ব লোকদের সম্মুখে রাখিয়া ৫ই ফেব্রুয়ারির হরতালে কম্যুনিষ্টরা নিজে আড়ালে থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রামের বিচার আদালত

গ্রাম্য স্বরাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে যুক্তপ্রদেশ সরকার কর্তৃক "গাঁও হুকুমত বিল" আনা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের মর্যাদা বাড়াইবার দিকেও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

এই বিলের একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল পঞ্চায়েতী আদালত। এই আদালত ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিতে পারিবে। অপব্যয় ও ঘন ঘন আদালত যাতায়াতের অসুবিধা হইতে দরিদ্র গ্রামবাসীদিগকে ইহার চেয়ে বেশী কোনও সাহায্য করা সম্ভব নয়। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা করিবার অভ্যাস বেশী। যদি এই কু-অভ্যাস দূর করিতে পারা যায় তবে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণভাবে না হইলেও আংশিকভাবে সফল হইবে। এই দিক দিয়া গ্রাম্য আদালতগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল।

জেলাগুলি কতকগুলি সার্কেলে ভাগ হইবে এবং কতকগুলি গ্রাম মিলিয়া এক একটি সার্কেল থাকিবে। প্রত্যেক সার্কেলেই পঞ্চায়েতী আদালত থাকিবে। সার্কেলের প্রত্যেক

ইউনিট পাঁচ জন পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করিবে। নির্বাচিত পঞ্চায়েৎগণ কর্ত্তৃক আদালত গঠিত হইবে। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মতামত পারস্পরিক ঈর্ষা, বিদ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে। বিলে এমন ভাবে পঞ্চায়েৎ গঠনের কথা বলা হইয়াছে যাহাতে উহা উপরোক্ত দোষ হইতে মুক্ত থাকিবে। অধিকন্ত অর্থনৈতিক সুবিধাও আছে। প্রত্যেক গ্রামের উপর (পঞ্চায়েতের ব্যয়ের জন্ত) আর্থিক চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প হইবে।

সরপঞ্চ আদালতের সভাপতিত্ব করিবেন এবং তিনিও নির্বাচিত হইবেন। ফলে সরপঞ্চ প্রত্যেকের বিশ্বাসভাজন হইবেন। ১৯২০ সালের গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ আইন অনুসারে সরপঞ্চ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। এবার এই দুইয়ের মধ্যে মস্ত ব্যবধান সৃষ্টি হইল। প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর নির্বাচন প্রত্যেক পঞ্চায়েৎকে কায়েমী স্বার্থের হাত হইতে রক্ষা করিবে। বিশেষতঃ, বিচারের প্রধান অন্তরায় পক্ষপাতিত্বের হাত হইতে পঞ্চায়েৎ মুক্ত থাকিবে।

আমেরিকার কোন কোন রাষ্ট্রে জনসাধারণ এই ভাবে বিচারক নির্বাচন করেন। সমালোচকদের মতে এই সব বিচারক অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের সমর্থকদিগকে খুশী করিতে চেষ্টা করেন। আরও বলা হয় যে অনেক ক্ষেত্রেই শুধু ভোটের জোরে অনুপযুক্ত ব্যক্তিই আসন দখল করিয়া থাকে। বহু উপযুক্ত ব্যক্তি পরাজিত হইয়া বাদ পড়িয়া যান। এ কথা স্বীকার করিয়াও বলা যাইতে পারে যে মানুষের সুবুদ্ধির উপর আস্থা হারান উচিত নয়। ভাল মন্দের মধ্যে তারতম্য করিবার ক্ষমতা মানুষ মাত্রেরই আছে।

বিবদমান পক্ষদ্বয়ের এক জন যে গ্রামের অধিবাসী, বিচারকদের অন্ততঃ এক জন সেই গ্রামের এবং অন্যূন তিন জন ভিন্ন গ্রামের লোক হওয়া চাই। বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, যে মামলায় কোন পঞ্চ বা সরপঞ্চ বা তাহার নিকট আত্মীয় মামলার পক্ষভুক্ত অথবা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সেই মামলার বিচারে পঞ্চ বা সরপঞ্চ বসিতে পারিবেন না। এই রকম নিরপেক্ষ পদ্ধতির প্রশংসার জন্ত বেশী কথা বলা দরকার হয় না। পঞ্চ বিচারকদিগকে সাহায্য করিবেন। তিনি গ্রামের ও প্রতিবেশীর অভ্যাস, রীতিনীতি ইত্যাদি সর্ব্বদা অবগত থাকিবেন। বিচারকদের অনেকেই ভিন্ন গ্রামের লোক হওয়ায় রায় দলগত বা ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব হইতে মুক্ত থাকিবে। এই ভাবে গণতান্ত্রিক আদালতে নিরপেক্ষ বিচার পাওয়া যাইতে পারিবে।

১৯২০ সালের পঞ্চায়েৎ আইন হইতে নূতন আইন পৃথক। নূতন পঞ্চায়েৎ অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী, তাহার অধিকার বহু দূর বিস্তৃত। নূতন পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে মানুষ অধিকতর সচেতন। ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যের সঙ্কোচন বৃহৎ কার্য্যের পথে অন্তরায়। যথাযথ ক্ষমতা হাতে থাকিলে মানুষ আপনার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্ত সচেষ্ট হইয়া থাকে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলায়ই পঞ্চায়েতের ক্ষমতা অধিক।

পঞ্চায়েতী আদালতে আইন-ব্যবসায়ী বা উকিলের অনুপস্থিতি গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকদিগের পক্ষে আশীর্বাদ-স্বরূপ। কারণ তাহাদের অনুপস্থিতির সুযোগে অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকেরা আর কথায় কথায় উকিলের পরামর্শের জন্ত ছুটাছুটি করিবে না। বরং তাহারা প্রতিবেশী বা স্বজাতীয় লোকদিগের সঙ্গে আপোষ করিতেই পছন্দ করিবে। অন্ততঃ ছোট ছোট মোকদ্দমায় তাহা করিবেই। বিলের এই সস্তা অথচ দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা আইন-ব্যবসায়ী বা উকিলের হাতে পড়িলে মারা যাইত।

কোন মোকদ্দমায় নিজে বা অন্তের দ্বারা উপস্থিত হইবার সুযোগ আছে। কোন মোকদ্দমায় প্রয়োজন হইলে পঞ্চায়েৎ সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারেন। বিবাদী বা আসামীকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্ত সমন দিতে পারেন। এমন কি অনিচ্ছুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পর্য্যন্ত বাহির করিতে পারেন। সামান্ত খুঁটিনাটি কারণে মোকদ্দমা হইবে না। তাহার জন্ত যথেষ্ট বাস্তব কারণ থাকা চাই।

নিজেকে বড় মনে করা মানুষের স্বভাব এবং অনেক সময় এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পঞ্চায়েৎ লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড প্রদান করিতে পারে। এই অবস্থা এড়াইবার জন্ত শাস্তি বিষয়ে আদালতের ক্ষমতা কিছু খর্ব্ব করা হইয়াছে। পঞ্চায়েতী আদালত দশ দিনের বেশী জেল ও পঞ্চাশ টাকার অতিরিক্ত জরিমানা করিবার অধিকারী হইবে না।

নাগরিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে গ্রাম্য দলাদলিতে অত্যন্ত লোকের খেয়াল-খুশির নিকট বলি দেওয়া হয় নাই। পরন্তু যে সকল জটিল মোকদ্দমা বা বিষয় পঞ্চায়েতের বিচারকদিগের দ্বারা মীমাংসা সম্ভব নয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে সেই সব মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন। অথবা এই সব জটিল মোকদ্দমা অপর ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট বিচারের নিমিত্ত হস্তান্তর করিতে পারেন।

পঞ্চায়েতী আদালতের রায়ই চূড়ান্ত। ইহার বিরুদ্ধে কোন রকম আপীল করা যাইবে না। বিলের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি করা হয় যে আইন-অনভিজ্ঞ বিচারকের হাতে বিচারের ভার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা অমূলক। কারণ মোকদ্দমার বিচার ঠিক ঠিক মত হইতেছে না বা হইবার সম্ভাবনা নাই মনে করিলে ডিক্রি বা আদেশের এবং মুলতুবী মোকদ্দমার যাট দিনের ভিতর ঐ অঞ্চলের মহকুমা হাকিম বা মুনসেফ্ নূতন ভাবে নিজ আদালতে মামলার শুনানীর আদেশ দিতে পারিবেন।

দুর্গাপূজা শরৎকালীন যজ্ঞ

(পঞ্চম প্রকরণ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

আমরা দুর্গোৎসবের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিণাম অনুসন্ধান করিতেছি। পূর্ব পূর্ব প্রকরণে ফলও যথাজ্ঞান বিবৃত করিয়াছি। যদি দুর্গাপূজায় ও উৎসবে তাহার সমর্থন থাকে, তাহা হইলে অনুমান বিশ্বাসযোগ্য হইবে, নচেৎ কল্পনা-প্রসূত মনে করিতে হইবে। এই নিমিত্ত দুর্গাপূজা-পদ্ধতির কয়েকটি প্রধান অঙ্গ অবলোকন করিতে হইবে।* রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য দুর্গার্চন-পদ্ধতিতে বহু ব্যবস্থার প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি নিজে ব্যবস্থা করেন নাই। পূর্বকালের স্মৃতি ও পুরাণের প্রমাণে পদ্ধতি লিখিয়াছেন। পূর্বে পূর্বে যে পদ্ধতিতে পূজা হইত, বর্তমানেও সেই পদ্ধতিতে পূজা হইবে। পূর্বে যে ব্যবস্থা ছিল, এখনও সেই ব্যবস্থা মানিতে হইবে। ইহা যাবতীয় স্মৃতির অভিপ্রায়। কিন্তু স্মৃতি ও পুরাণ সে সে ব্যবস্থার হেতু দেন নাই। যেমন, দুর্গাপূজায় কুমারীপূজন অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু দেবীপুরাণে এই ব্যবস্থা আছে। দেবীপুরাণ কেন এই ব্যবস্থা লিখিয়াছেন, তাহা পুরাণে নাই। নিশ্চয় কোন হেতু ছিল। আমরা সেই হেতু অনুসন্ধান করিতেছি। এই নিমিত্ত কয়েকখানি পুরাণের রচনার দেশ ও কাল জানিতে হইবে। নচেৎ ইতিহাস পাওয়া যাইবে না। পরবর্তী প্রকরণে সে বিষয়ে যত্ন করা যাইবে।

প্রথমে দুর্গাপূজা-প্রকরণ স্মরণ করিতেছি। পূজার সাতটি কল্প অর্থাৎ সাতটি বিধি আছে। যথা—

১। ভাদ্রকৃষ্ণনবমী। সেদিন দেবীর বোধন করিতে হয়। তদবধি আশ্বিনশুক্লনবমী পর্যন্ত ১৬ দিন পূজা।

২। আশ্বিনশুক্লপ্রতিপদ। প্রতিপদে কেশসংস্কারদ্রব্য দিতে হয়। দ্বিতীয়ায় কেশবন্ধনের পট্টডোর, তৃতীয়ায় পদরঞ্জনের জন্য অলক্তক, ললাটের জন্য সিন্দূর, মুখদর্শনের জন্য দর্পণ, চতুর্থীতে মধুপর্ক, নেত্রের কজ্জল, পঞ্চমীতে অগুরুচন্দন প্রভৃতি অঙ্গ-রাগ দ্রব্য ও অলঙ্কার দিতে হয়।

৩। আশ্বিনশুক্লষষ্ঠী। সন্ধ্যাকালে বিল্বশাখায় দেবীর বোধন, দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

৪। উক্ত তিন কল্পেই ষষ্ঠী পর্যন্ত ঘটে পূজা। সপ্তমী হইতে তিন দিন মৃন্ময়ী প্রতিমায় পূজা। পূর্বাহ্নে প্রতিমার পার্শ্বে নবপত্রিকা স্থাপন।

৫। শুক্ল-অষ্টমী। অষ্টমী নবমী দুই দিন পূজা।

৬। কিম্বা কেবল অষ্টমীতে পূজা এবং সেই দিনই বিসর্জন।

৭। শুক্ল-নবমী। কেবল সেই দিনই পূজা ও বিসর্জন। কেবল অষ্টমী কিম্বা কেবল নবমীতে ঘটে পূজা করা হয়।

দশমীতে বিসর্জন। সন্ধ্যাকালে ঘট ও প্রতিমা নদী কিম্বা বৃহৎ পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিয়া জল ও কর্দম লইয়া কৌতুকক্রীড়া। ইহার নাম শবরোৎসব। গৃহে প্রত্যাগমনকালে খঞ্জন পক্ষী (কিম্বা নীল-কণ্ঠ পক্ষী) দৃষ্ট হইলে শুভ। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া গুরুজনের আশীর্বাদ, আত্মীয়-স্বজনের কুশল কামনা ও তদনন্তর অল্প সিদ্ধিপান প্রচলিত আছে।

এক্ষণে পূজা দেখি। ঋগ্‌বেদের কালে হিম. (শীত) ঋতু ও শরৎ ঋতু হইতে দুই বৎসর গণিত হইত। রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতে হিম. বৎসর এবং তাহার চারি ঋতুর পরে শরৎ ঋতু হইতে শরৎ বৎসর আরম্ভ হইত। ইহা পূর্বে মহিষমর্দিনী প্রকরণে বলা গিয়াছে। প্রত্যেক ঋতু আরম্ভেই যজ্ঞ হইত। হিম.-ঋতু ও শরৎ ঋতু আরম্ভেও যজ্ঞ হইত। শরৎকালীন যজ্ঞই রূপান্তরিত হইয়া দুর্গাপূজা হইয়াছে।

যজ্ঞের ও পূজার কর্মে প্রভেদ আছে। কিন্তু উভয়ের অভিপ্রায় একই। দেবতার প্রসাদের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রীতিকর দ্রব্য সমর্পণের নাম যজ্ঞ। যে দ্রব্যে আমরা প্রীত হই, আমরা মনে করি, সে দ্রব্যে দেবতাও প্রীত হন। ঘৃতাহুতি যজ্ঞের এক প্রধান অঙ্গ। দুর্গাপূজায় হোম একান্ত কর্তব্য। যজ্ঞবিশেষে ঘৃতাক্ত পুরোডাশ (পিষ্টক-বিশেষ) মাংস ও সোমরস দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে অর্পিত হইত। দেবতার স্তব অর্থাৎ গুণ ও কর্মের প্রশংসা উচ্চারিত হইত। ধন দাও, প্রচুর অন্ন দাও, বীর পুত্র দাও, শত্রু বিনাশ কর ইত্যাদি স্বাভাবিক মানুষের প্রার্থনা থাকিত। দুর্গাপূজাতেও তাহাই হয়। চণ্ডীমাহাত্ম্য তাঁহার স্তব। নৈবেদ্য

---

* মাস-সংক্রান্তি-গণনা হইতে জানিতেছি নবদ্বীপে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" লিখিয়াছিলেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-কর্তৃক সম্পাদিত এই স্মৃতি-তত্ত্বের শেষে "শ্রীদুর্গার্চন-পদ্ধতি" সন্নিবিষ্ট আছে। পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্ত-ভূষণ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "দুর্গাপূজা-তত্ত্বম্" বিস্তৃত ভূমিকার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দুই ভাগ প্রমাণতত্ত্ব ও প্রয়োগতত্ত্ব। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যা-বারিধি টীকা-টিপ্পনীর সহিত "কালিকা-পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা-পদ্ধতি" প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বহু বৈদিক মন্ত্র আছে। "আর্য-শাস্ত্র-প্রদীপ" প্রণেতা যোগ-ব্রহ্মানন্দ "দুর্গার্চন ও নবরাত্র-তত্ত্ব" লিখিয়াছিলেন। ইহা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। (প্রকাশক শ্রীনবকিশোর বিদ্যানন্দ, উত্তরপাড়া, হুগলী)।

ও পশু-বলি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করা হয়। আর দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রার্থনা করা হয়,

"আয়ুরারোগ্যং বিজয়ং দেহি দেবি নমস্তুতে।
রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বকামাংশ্চ দেহি মে।"

দুর্গাপূজার মন্ত্রে যজ্ঞ শব্দ বহু বার ব্যবহৃত হইয়াছে। "দেবি যজ্ঞভাগান্ গৃহাণ," হে দেবি! যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন। পশুবলি দিবার সময় বলা হয়,

"যজ্ঞার্থে পশবঃ স্রষ্টাঃ তস্মিন্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।" যজ্ঞের নিমিত্তই পশু সৃষ্ট হইয়াছে। সে যজ্ঞে যে বধ, তাহা অবধ। দুর্গাপূজা যজ্ঞ না হইলে পশুবলি প্রাণিহিংসায় দাঁড়ায়। আরও আশ্চর্যের বিষয়, পশুচ্ছেদের সময় ভক্ত-দর্শকেরা "মো মো" শব্দ করিতে থাকেন। সংস্কৃত মহস্ শব্দের সংক্ষেপে এই "মো মো" আসিয়াছে। মহস্ শব্দের অর্থ যজ্ঞ।* হোমের সমুদয় ক্রিয়া বৈদিক। (পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন প্রণীত কালিকাপুরাণোক্ত পূজা-পদ্ধতি পশ্য।) যাগ ও হোমের অনুষঙ্গে প্রভেদ আছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন, দাঁড়াইয়া আহুতি দিলে যাগ, বসিয়া দিলে হোম। কিন্তু কর্মে প্রভেদ নাই। দুর্গাপূজা পশুযাগ। ইহাকে সোমযাগ বলিতে পারি। সোমযাগে পশুবলি হইত ও সোমরস প্রদত্ত হইত। আমার অনুমানে বেদের সোমবৃক্ষ সিদ্ধিগাছ। সিদ্ধির প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাম ভঙ্গা। বাংলায় বলি ভাং। ইহার অপর প্রসিদ্ধ নাম বিজয়া। রঘুনন্দন বিজয়াকালে দেবীকে সিদ্ধি দিবার ব্যবস্থা লিখেন নাই। কিন্তু ইহা বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত আছে।

দুর্গাপূজা বৈদিক যজ্ঞের রূপান্তর, তন্ত্র দ্বারা সমাচ্ছন্ন। তন্ত্রের উৎপত্তি বহু প্রাচীন। ঋগ্‌বেদে ইহার অঙ্কুর আছে। অথর্ববেদে তন্ত্রের প্রসার হইয়াছে। তন্ত্রে রেখা দ্বারা নির্মিত প্রতিকৃতির নাম যন্ত্র। বর্ণমালার এক এক বর্ণ এক এক দেবতার দ্যোতক। এই সকল বর্ণের নাম বীজ। প্রাচীনেরা তন্ত্রকে শ্রুতি মনে করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, শ্রুতি দ্বিবিধা, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। ইহা দেবী-ভাগবতে ও মনুসংহিতার কুল্লূক ভট্টের টীকায় আছে। দেবীপুরাণ দুর্গাপূজাকে বৈদিক বলিয়াছেন।

দেবীর বোধন।

বোধন নিদ্রা-ভঞ্জন। দেবী নিদ্রিতা থাকেন। তাঁহাকে জাগাইয়া পূজা করিতে হয়। কেন নিদ্রিতা থাকেন? যেহেতু রবির উত্তরায়ণ ছয় মাস দেবতার দিবা, দক্ষিণায়ন ছয় মাস তাঁহাদের রাত্রি। দিবা কর্মের কাল, রাত্রি নিদ্রার কাল। শরৎ ঋতু দক্ষিণায়নে পড়ে। দেবী তখন নিদ্রিতা থাকেন।

কালিকাপুরাণ বোধনের এই প্রয়োজন লিখিয়াছেন। কিন্তু এমন অসম্ভব ব্যাখ্যা পুরাণে কদাচিৎ আছে। জগন্ময়ী নিদ্রিতা, বাতুলের প্রলাপ। বোধনের প্রকৃত তাৎপর্য ভুলিয়া গিয়া এই অদ্ভুত ব্যাখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। কালিকাপুরাণে আরও আছে, রাবণবধার্থে রামচন্দ্রকে অনুগ্রহ করিয়া পুরাকালে ব্রহ্মা দেবীর অকাল বোধন করিয়াছিলেন। কালিকাপুরাণ আলোচনার সময় দেখা যাইবে পুরাণ-কর্তা জ্যোতিষচর্চা করিতেন। তিনি প্রকৃত তত্ত্ব ঢাকা দিয়াছেন, অসঙ্গতি চিন্তা করেন নাই। পরে পরে দেখাইতেছি।

প্রথম কথা, বাল্মিকী-রামায়ণে দুর্গাপূজার কোন উল্লেখ নাই। রাবণবধের পূর্বে রামচন্দ্র আদিত্যহৃদয়স্তব পাঠ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কথা, শরৎ ঋতুতে রামরাবণের যুদ্ধও হয় নাই। শরৎ ঋতু যুদ্ধকালও নয়, হেমন্ত ও বসন্ত যুদ্ধোদ্যমের কাল। ইহা বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে। তৃতীয় কথা, যদি দক্ষিণায়ন কালে দেবতারা নিদ্রিত থাকেন, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায়, শ্যামাপূজায়, জগদ্ধাত্রী পূজায়, কার্তিক পূজায় বোধন নাই কেন? চতুর্থ কথা, সপ্তম্যাদি অষ্টম্যাদি ও কেবল অষ্টমী ও নবমীতে পূজায় বোধন করিতে হয় না কেন? আশ্বিন শুক্লাপ্রতিপদ হইতে পূজা আরম্ভ, ষষ্ঠীর সায়ংকালে বোধন। তবে কি প্রতিপদ হইতে ষষ্ঠী পর্যন্ত ঘটে যে পূজা হয়, তাহা নিষ্ফল? পঞ্চম কথা, 'নবরাত্র ব্রতে বোধন নাই কেন? ষষ্ঠ কথা, ঘটে নয়, প্রতিমায় নয়, বিল্ব বৃক্ষে, বিল্ব শাখায় দেবীর বোধন! কেন বিল্ববৃক্ষে বোধন? ইহার অর্থ কি?

এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমার মনে হইয়াছে, অরণি দ্বারা অগ্নি-উৎপাদনের নাম বোধন। বিল্বকাষ্ঠের অরণি; এই হেতু দেবী বিল্ববাসিনী। দুর্গা অগ্নি-স্বরূপা। অরণিতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সেই অগ্নি কুমার। তিনিই কুমারী দুর্গা। কাষ্ঠে যে অগ্নি সুপ্ত থাকে, মন্থন দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়, যেন নিদ্রিত অগ্নি জাগ্রত হয়।

বৃহদ্-ধর্মপুরাণে (পৃ. ২২) এই ব্যাখ্যার আভাস আছে। লিখিত আছে, "রাবণের বধার্থে ব্রহ্মাদিদেবগণ দেবীর স্তব করিলে তিনি বিল্ববৃক্ষে বোধন করিতে বলিলেন। তাঁহারা ভূতলে আসিয়া এক দুর্গম নির্জন স্থানে একটি বিল্ববৃক্ষ দেখিলেন। তাহার এক পত্রে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুরুচিরা অচিরপ্রসূতা এক বালিকা নিদ্রিতা। বালিকা অনাবৃতাঙ্গা, নিশ্চেষ্টা। দেবগণের স্তবে বালিকা প্রবুদ্ধা হইয়া যুবতীরূপ ধারণ করিলেন।" অতএব দেখিতেছি বিল্ববৃক্ষে কুমারীর

*পূর্ববঙ্গের মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়ায়, "আম কাঁঠালিয়া পীড়িখানি ঘৃতে ম ম করে।" কাঁঠালের পীড়ি ঘৃতসিক্ত হইয়া উৎসবগন্ধ ছড়াইতেছে।

জন্ম হয়। কুমারীকে শুক্ল বিল্বপত্রে প্রথমে নিদ্রিতা পরে প্রবুদ্ধা দেখা যায়।

শমী-কাষ্ঠই অরণির প্রসিদ্ধ কাষ্ঠ, ঋগ্‌বেদের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দুর্গাপূজা-যজ্ঞের নিমিত্ত অগ্নি উৎপাদন আবশ্যক। শমীবৃক্ষ ভারতের পশ্চিমাংশে সুলভ, কিন্তু পূর্বাংশে দুর্লভ। বঙ্গদেশে প্রায় অজ্ঞাত। দেখা যাইতেছে, যে দেশে শমীবৃক্ষ দুর্লভ, সে দেশে বিল্বকাষ্ঠের অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদন প্রচলিত হইয়াছিল। অমরকোষে বিল্ববৃক্ষের এক নাম শাণ্ডিল্য; মেদিনীকোষে এক অগ্নির নাম শাণ্ডিল্য এবং শাণ্ডিল্য এক মুনির নাম। বোধ হয় শাণ্ডিল্য গোত্রের কোন ব্রাহ্মণ বিল্বকাষ্ঠের অরণি প্রচলিত করিয়াছিলেন।

পূর্বকালে রাক্ষস ও পিশাচেরা যজ্ঞের বিঘ্ন করিত। দুর্গাপূজা দুর্গাযজ্ঞ, বোধনের সময় যজ্ঞ-বিঘ্নকারকদিগকে মন্ত্রিত শ্বেত সর্ষপ বিক্ষেপের দ্বারা অপসারিত করা হয়।

চণ্ডীমণ্ডপে বোধন হয় না। বোধনের নিমিত্ত সূত্রদ্বারা এক পৃথক বস্ত্রগৃহ নির্মিত হয়। (এক বেদীর চারি কোণে শর পুঁতিয়া কয়েকবার সূত্র বেষ্টন পূর্বক বস্ত্রগৃহ মনে করা হয়)। সেই বস্ত্রগৃহে যুগ্মফলবিশিষ্ট বিল্বশাখা স্থাপিত হয়। বেদীতে অলক্তক, সূত্র ও ছুরি রাখা হয়। ভাবিলা দেখিলে এই বস্ত্রগৃহ সূতিকাগৃহ, যুগ্মফলের একটি মাতার কুক্ষি, অপরটি ভ্রূণ। নাড়ীচ্ছেদের নিমিত্ত ছুরি। নাড়ীবন্ধনের নিমিত্ত সূত্র। অলক্তক শোণিতের দ্যোতক। ইতিপূর্বে প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত ঘটস্থদেবীর নিমিত্ত কেশ-সংস্কার দ্রব্য, অঙ্গরাগ দ্রব্য, অলঙ্কার ও মধুপর্ক প্রদত্ত হইয়াছে। গর্ভ সম্ভাবনা না করিলে এই এ সবের প্রয়োজন থাকে না। অতএব বিল্বশাখা ও ফলে দেবীর বোধন অর্থে বুঝিতে হইতেছে বিল্বশাখায় দুর্গারূপ অগ্নির আবির্ভাব। বিল্বফল দেবীর প্রতিরূপক। সূর্যোদয়ের পর অগ্নিমন্থন ও যজ্ঞ হইত, রাত্রিকালে হইত না। অতএব সায়ংকালের বোধন অকালবোধন। সায়ংকালে কেন? কারণ রাত্রি সন্তানপ্রসবের কাল।

এই ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ, দেবীকে ঘটে পূজা করিতেছি। তখন তাঁহার বোধন হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত কেশ-সংস্কারাদি দ্রব্য কাহাকে প্রদত্ত হয়? কাহার জন্মের নিমিত্ত সূতিকাগৃহ নির্মিত হয়? দেবীর হইতে পারে না। আদ্যা বিশ্বারণির জন্ম কল্পনা করা যাইতে পারে না। আমার বোধ হয়, দুইটি পৃথক ভাবনা মিশ্রিত হইয়াছে। একটি বিল্বশাখায় অগ্নি-উৎপাদন, অপরটি অন্যের জন্ম কল্পিত হয়। পরবর্তী প্রকরণে সে অন্যের অনুসন্ধান করা যাইবে।

আমি নবপত্রিকার উৎপত্তি ও প্রয়োজন বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। নবপত্রিকা নবদুর্গা, ইহার দ্বারাও কিছুই বুঝিলাম না। দেবীপুরাণে নবদুর্গা আছে, কিন্তু নবপত্রিকা নাই। ইহা কোন্ পুরাণে প্রথম পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য। নবপত্রিকা দুর্গা পূজার এক আগন্তুক অঙ্গ হইয়াছে। কোন্ দেশে কবে ইহার উৎপত্তি? বোধ হয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিব। তাহাদের নবপত্রী দুর্গা-প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হইতেছে। মানুষের স্বভাব যেটা কোথাও হয়, সেটা অন্যত্র প্রচারিত হয়। নবপত্রের মধ্যে জয়ন্তী একটা। জয়ন্তী কি গাছ? জয়ন্তী নাম সংস্কৃত। অগ্নিমন্থের নাম জয়ন্তী আছে। আমরা বঙ্গদেশে যে গাছকে জয়ন্তী বলি, সে নাম বাঙ্গলা, সে গাছই সংস্কৃত নামের জয়ন্তী, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। রঘুনন্দন ভবিষ্যপুরাণ হইতে নবপত্রিকার নয়টি গাছের নাম দিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণের বচন কোন্ দেশের, কোন্ কালের তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য।

দুর্গোৎসব নববর্ষোৎসব

(ষষ্ঠ প্রকরণ)

দুর্গাপূজা কবে? পূর্বে দেখিয়াছি, কেবল আশ্বিন শুক্লাষ্টমীতে, কিম্বা কেবল শুক্লনবমীতে পূজা করিতে পারা যায়। হেতু কি? ঘটে পূজা হইলেও পূজা সিদ্ধ হয়।

শরৎ ঋতু আরম্ভে পূজা করিতে হয়। দৈবক্রমে চান্দ্র আশ্বিন মাসে শরৎ ঋতুর আরম্ভ, কিন্তু পূজা আশ্বিন-মাসীয়া নয়, শারদীয়া। খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দে কৃষ্ণযজুর্বেদের কালে বসন্তাদি ছয় ঋতু ও প্রত্যেক ঋতুর দুই সমান ভাগ প্রচলিত হইয়াছিল। যথা,—মধু ও মাধব বসন্ত, ইষ ও উর্জ শরৎ, ইত্যাদি ঋতু-সম্বন্ধীয় ভাগ। এই সকল ভাগকে আর্তব মাস বলা যাইতে পারে। ইষ শরৎ-ঋতুর প্রথম মাস। পূজার সংকল্পে ইষ মাস বলিতে হয়। আশ্বিন মাস অশ্বিনীনক্ষত্রের সহিত যুক্ত আছে। অতএব সে মাস স্থির ও নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু ইষ মাস স্থির নাই। ঋতু পিছাইতেছে, ইষমাসের আরম্ভও পিছাইতেছে। বর্তমানে ভাদ্রমাসের ৮ই ইষমাসের আরম্ভ হইতেছে।

দেখা গেল, সূর্যের ভোগ দেখিয়া পূজার দিন নিরূপিত হইয়াছে। সৌরমাসে নিরূপিত হইলে বর্ষে বর্ষে সৌর মাসের একই দিবসে পূজা হইত। চান্দ্রমাস ধরিয়া তিথির দ্বারা দিন গণিত হইতেছে। কিন্তু তিথি যথেষ্ট নয়। কেবল তিথি জানিলে কিম্বা চন্দ্রের নক্ষত্র জানিলে সূর্যের ভোগ জানিতে পারা যায় না। তিথি ও চন্দ্রের নক্ষত্র, এই দুই না পাইলে সূর্যের ভোগ জানিতে পারা যায় না।

এই কারণে স্মৃতিকার তিথির সহিত নক্ষত্র দেখিতে বলিয়াছেন। (পরিশিষ্ট পশ্ড)

পূর্বে লিখিত হইয়াছে, রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতে হিমবৎসর আরম্ভ হয়। চান্দ্রমাঘ শুক্ল প্রতিপদে উত্তরায়ণ আরম্ভ ধরা হইতেছে। ইহার আট মাস পরে এবং প্রতি মাসে এক তিথি বৃদ্ধি ধরিয়া আশ্বিন শুক্ল অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে শরৎ ঋতুর আরম্ভ ধরিতে হইতেছে। এই কারণে সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য। মাঘ শুক্ল প্রতিপদের পূর্ব-তিথি পৌষ অমাবস্যা। যদি সেদিন মধ্যরাত্রিতে অমাবস্যা পূর্ণ হয় এবং সেই সময়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে আশ্বিন শুক্লাষ্টমীর মধ্যরাত্রে আট তিথি পূর্ণ হয়। মধ্যরাত্রে সন্ধিক্ষণের আরও মাহাত্ম্য।

এই আলোচনা দ্বারা শারদীয়া পূজা প্রচলনের পূর্বসীমা পাইতেছি। বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ার দিন গণনার নিমিত্ত এক পুস্তিকা ছিল। তাহার নাম বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। ইহা খ্রি-পূ ১৩৭২ অব্দে প্রণীত হইয়াছিল। তাহাতে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ তিথি বৃদ্ধি এবং মাঘ শুক্ল প্রতিপদে উত্তরায়ণ গৃহীত হইয়াছে। দুর্গাপূজা যজ্ঞক্রিয়াবিশেষ মনে করিলে উক্ত অব্দের পরে প্রবর্তিত হইয়াছে।

ইহার পূর্বে কবে হইত? দৈবক্রমে তাহার প্রমাণ আছে। আমরা জানি আশ্বিন অমাবস্যায় শ্যামাপূজা এবং প্রদোষে লক্ষ্মীপূজা। পরদিন কার্তিক শুক্ল প্রতিপদে দ্যূতক্রীড়া। এই দিন গুজরাটে বণিকেরা নূতন বৎসর আরম্ভ করে এবং নূতন খাতা খুলে। সে প্রদেশে এই দিন হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। হেতু কি? তাহারা যজুর্বেদের ও অথর্ববেদের কালের শরৎ বৎসর গণনা করে। এই দুই বেদে মাঘ কৃষ্ণাষ্টমীতে উত্তরায়ণ ধরা হইত। এই তিথির নাম একাষ্টকা ছিল। "একাষ্টকা সম্বৎসরের প্রথমা রাত্রি।" (রাত্রি দিবস)। সেদিন হইতে আট মাস আট তিথি গণিলে আশ্বিন অমাবস্যা আসে। পরদিন কার্তিক শুক্লপ্রতিপদে শরৎবৎসর আরম্ভ। দ্যূতক্রীড়া দ্বারা ভাগ্য-পরীক্ষা হয়। নূতন বৎসর কেমন যাইবে, তাহা জানিবার ইচ্ছা। এখন কোথাও ভাগ্যপরীক্ষার এই বিধি প্রচলিত আছে কিনা জানি না। যদি থাকে, সকলেরই ভাগ্য সুপ্রসন্ন দেখিবার কথা। অমাবস্যার প্রদোষে লক্ষ্মীপূজার বিধিরও সেই অভিপ্রায়। নববর্ষের পূর্বদিন লক্ষ্মীর প্রসাদ ও শ্যামার নিকট অভয় প্রার্থনা করা হয়। আশ্বিন শুক্লনবমীতে যেমন দুর্গাপূজা, আশ্বিন অমাবস্যায় তেমন শ্যামাপূজা। সে রাত্রের দীপালীর সহিত এই পূজার ও নববর্ষোৎসবের কোন সম্বন্ধ নাই। দীপালীর হেতু ভিন্ন। মহালয়ায় যেমন পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও দীপদান, আশ্বিন অমাবস্যাতেও তেমন পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও দীপদান করা হয়।

মাসপ্রতি একদিন বৃদ্ধি স্থূল গণনা। সূক্ষ্ম গণনায় আশ্বিন শুক্লনবমীতে বর্ষা ঋতুর শেষ হয়। দশমীতে শরৎ ঋতু ও শরৎ বৎসর আরম্ভ হয়। নবমী অন্তে রবির ভোগ ৫ রাশি পূর্ণ হয়। (পরিশিষ্ট পশ্ড)। ২৪১ শক=৩১৯ খ্রিষ্টাব্দ হইতে বর্তমান কালের গণনা চলিয়াছে। অতএব মনে হয়, ঐ শকের পূর্বে নয়দিন দুর্গাপূজা ও নবরাত্রিব্রত প্রচলিত ছিল না।

কিন্তু এতদ্দ্বারা সপ্তমীতে ও ষষ্ঠীতে কল্পারম্ভের হেতু ও নবরাত্র ব্রতের উৎপত্তি পাইতেছি না। বঙ্গদেশে আমরা প্রতিমায় পূজা করি, নবরাত্রব্রত ভুলিয়া গিয়াছি। দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর ভারতে নবরাত্র প্রসিদ্ধ। নবরাত্র নয় রাত্রি, নয় তিথির ব্রত। আশ্বিনশুক্লপ্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নয় তিথির ব্রত। রাত্রি শব্দে তিথি বুঝায়। দশমী দশ-রাত্রি। ইহার সংক্ষেপে দশ-রা। সে সে প্রদেশের লোক "দশরা পরব" বলে, ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করে। ঘটের সম্মুখে নয় দিন চণ্ডীপাঠ হয়। দশমীতে ঘটের বিসর্জন।

আমাদের কোনও ব্রত বা পূজা বৎসরের যে-সে দিনে অনুষ্ঠিত হয় না। প্রত্যেকের দিন নির্দিষ্ট আছে। সে দিন জ্যোতিষে বিশেষ দিন। সকল জাতিই এই বিধি অনুসরণ করে। ব্রতপালন ও দেবদেবীর পূজার দ্বারা আমরা সেদিন স্মরণ করি। কোন্ স্মরণীয় দিনের সহিত নবরাত্রব্রত যুক্ত হইয়াছে? কিন্তু কোন অনুষ্ঠানের উৎপত্তি নির্ণয় অতিশয় কঠিন। এখানে একটা উৎপত্তি উপলক্ষ্য করিতেছি।

মাহেশ্বরযুগ নামে এক যুগ-গণনা প্রচলিত ছিল। (পরিশিষ্ট পশ্য)। ২৪৭ সায়ন বৎসর ও ১ মাস এই যুগের পরিমাণ। প্রত্যেক যুগ শুক্ল সপ্তমীতে আরম্ভ হইত। ইহা এই যুগের বিশেষ লক্ষণ। প্রত্যেক শুক্ল সপ্তমীর এক নাম ছিল। কয়েকটি নাম মৎস্যপুরাণে আছে, কয়েকটি পাঁজিতে লিখিত হইতেছে। যেমন মিত্র সপ্তমী, রথ সপ্তমী। শুক্ল ষষ্ঠীতে যুগ সমাপ্ত হইত। শুক্ল ষষ্ঠীরও নাম ছিল। কয়েকটি নাম পাঁজিতে লিখিত হইতেছে। যেমন গুহষষ্ঠী, আরণ্য ষষ্ঠী। ইহা হইতে প্রতিমাসের শুক্ল সপ্তমী রবির এবং শুক্ল ষষ্ঠী লক্ষ্মীর তিথি হইয়াছে। যদি কোন যুগ আশ্বিন শুক্ল সপ্তমীতে আরম্ভ হয়, পরবর্তী যুগ কার্তিক শুক্ল সপ্তমীতে আরম্ভ হইত। এই ক্রমে পূর্বাপর যুগ গণনা চলিতে থাকে। এই কারণে এই যুগ-গণনা কবে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। আমার অনুমান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর বৎসর হইতে এই গণনার প্রচলন হইয়াছিল। খ্রি-পূ ১৪৪১ অব্দের হেমন্তে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। পরবৎসর খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দে প্রথম যুগ ভাদ্র শুক্লসপ্তমীতে আরম্ভ হইয়া ২৪৭

বৎসর একমাস পরে খ্রি-পূ ১১৯৩ অব্দের আশ্বিন শুক্ল ষষ্ঠীতে পূর্ণ হইয়াছিল। এই ষষ্ঠীর নাম আদিকল্প ষষ্ঠী ছিল। পরদিন সপ্তমীতে দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ, ইত্যাদিক্রমে যুগ-গণনা চলিয়াছিল। প্রথম যুগে আশ্বিন শুক্ল সপ্তমীতে রবির ভোগ ১৫০° অংশ হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুগে আশ্বিন শুক্ল ষষ্ঠীতে, তৃতীয় যুগে আশ্বিন শুক্ল পঞ্চমীতে ইত্যাদিক্রমে সপ্তমযুগে খ্রি-পর ২৯১ অব্দে (২১৩ শকে) আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদে রবির ভোগ ১৫০° হইয়াছিল। আমার বোধ হয়, শুক্ল অষ্টমী ও নবমীর সহিত এই সাতদিন যুক্ত হইয়া নবরাত্র হইয়াছে। দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ খ্রি-পূ ১১৯৩ অব্দে এক বিশেষ যোগ ঘটিয়াছিল। আশ্বিন শুক্লষষ্ঠীতে রবির ভোগ ১৫০° অংশ পূর্ণ হইয়া পরদিন সপ্তমীতে নবযুগ ও নব শরৎবৎসর আরম্ভ হইয়াছিল। এমন যোগ দুর্লভ। যুগচক্র একবার ঘুরিয়া না আসিলে আর ঘটে না। খ্রি-পর ২৯১ অব্দে সপ্তমযুগে আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদে রবির ভোগ ১৫০° হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান হয় এই অব্দের পরে ও অষ্টম যুগের পূর্বে নবরাত্র ব্রতের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার সহিত পূর্বোল্লিখিত খ্রি-পর ৩১৯ অব্দের ঐক্য হইতেছে। এই অনুমানের এক প্রমাণ দিতেছি। কালিকা পুরাণ লিখিয়াছেন, আশ্বিন কৃষ্ণ চতুর্দশীতে দশভূজা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ সেদিন শরৎ ঋতুর আরম্ভ হইয়াছিল। কালিকা পুরাণের মাস পূর্ণিমান্ত। আমরা যে অমান্ত মাস গণি, তদনুসারে ইহার নাম ভাদ্রকৃষ্ণ চতুর্দশী হয়। ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সে যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। কালিকাপুরাণে উহার পরের তিথি নাই। অতএব মনে হয় কালিকাপুরাণ অষ্টম খ্রিষ্ট শতাব্দ হইতে একাদশ খ্রিষ্ট শতাব্দের মধ্যে প্রণীত হইয়াছিল।

উক্ত যুগগণনায় খ্রি-পূ ১১৯৩ অব্দের যুগে আশ্বিন-শুক্ল ষষ্ঠীর নাম আদিকল্পষষ্ঠী ছিল। বোধ হয় ইহাকেই আমরা ষষ্ঠ্যাদি কল্প বলিতেছি। ষষ্ঠীতে বোধন সঙ্গত হইতেছে। পরদিন শুক্ল সপ্তমীতে নূতন যুগের সহিত নব বর্ষের রবির উদয় হইয়াছিল। ষষ্ঠীর রাত্রে এই রবির বোধন হয়। উদয়ের নাম জন্ম, বেদে প্রসিদ্ধ আছে। সপ্তমী রবির তিথি। রবির নিকট পশুবলি নিষিদ্ধ। বোধ হয়, এই কারণে দুর্গাপ্রতিমা পূজাতেও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

রঘুনন্দন দেবীপুরাণের প্রমাণে ভাদ্রকৃষ্ণনবমীতেও কল্পারম্ভ লিখিয়াছেন। দেবীপুরাণের মাস পূর্ণিমান্ত। তদনুসারে আমরা যাহা ভাদ্রকৃষ্ণনবমী বলিতেছি, তাহা আশ্বিন-কৃষ্ণনবমী। এই আশ্বিনকৃষ্ণনবমী হইতে আশ্বিনশুক্লনবমী পর্যন্ত ১৬ দিন পূজা হয়।

১৩২৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের "প্রবাসী"তে বন্ধুবর বিজয়-চন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছিলেন, ছত্রিশগড় অঞ্চলে গ্রামের কুমারীরা "কুমারী ওয়া" (কুমারীর উপবাস) নামক ব্রত করে। ভাদ্রকৃষ্ণঅষ্টমীতে আরম্ভ ও আশ্বিনশুক্লনবমীতে শেষ। এই ১৭ দিন তাহারা একবেলা ভোজন করে, কুমারী দেবীর পূজা করে। পাড়ায় পাড়ায় বাজনা বাজে, নিম্নশ্রেণীর নারীরা নাচিয়া গাহিয়া বেড়ায়। শেষদিন বেহায়া বর্ষীয়সী নারী অশ্লীল গান গাহিয়া থাকে। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন; "কুমারী ওবায় কুমারীরা পূর্বে অনার্য্য ছিল। এখন আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছে।" তাহারা আর্য হউক, অনার্য হউক ১৭দিন পূজার সমর্থন পাইতেছি।

পূর্ণিমান্ত আশ্বিন, অমান্ত ভাদ্রকৃষ্ণনবমীতে পূজার হেতু বুঝিতে কষ্ট নাই। রবির উত্তরায়ণ হইতে হিমবৎসর আরম্ভ। আমরা অমান্ত চান্দ্রমাস গণি। তদনুসারে পৌষ অমাবস্যায় উত্তরায়ণ। পরদিন, মাঘ শুক্ল প্রতিপদ হইতে নূতন বৎসর। কিন্তু পূর্ণিমান্ত মাস গণিলে পৌষ পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ, এবং পরদিন মাঘ কৃষ্ণপ্রতিপদে হিমবৎসর আরম্ভ হইবে। অবশ্য একই বৎসরের পৌষ পূর্ণিমায় ও পৌষ অমাবস্যায় উত্তরায়ণ হইতে পারে না। একের চারি বৎসর পরে অপরটি হয়। পৌষ পূর্ণিমা হইতে ৮ মাস ৮ তিথি গণিলে ভাদ্রকৃষ্ণ নবমীতে শরৎ ঋতুর আরম্ভ হয়। সেদিন দেবীপূজা সমাপ্ত হইবার কথা। (পরিশিষ্ট পশ্য)। সেদিন বোধন ও পূজার আরম্ভ হইবার হেতু পাই না, নবরাত্র ব্রতও পাই না। পূজার এত কল্প কদাপি একদেশে কিম্বা এককালে আসে নাই। একের সহিত অন্যের স্বাভাবিক যোগও নাই। ফলে দুর্গাপূজাপদ্ধতি জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্গাপূজার সম্বন্ধে দেখিতেছি, কেহ অতুল বিভূতি, কেহ সম্বৎসর সুখপ্রাপ্তি, কেহ দুর্গাপ্রীতিকামনায় বার্ষিক শরৎকালীন দুর্গামহাপূজা করেন। রাজা প্রথমটি, প্রজা দ্বিতীয়টি এবং ভক্ত তৃতীয়টির কামনা করেন। সম্বৎসর সুখপ্রাপ্তি, অর্থাৎ দুর্গাপূজা হইতে সম্বৎসর আরম্ভ। "বৃহদ্ধর্মপুরাণে" আশ্বিনাদি মতাঃ মাসাঃ, আশ্বিন হইতে বৎসরের মাস গণনা হইয়াছে। বিজয়া দশমী হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। এই পুরাণ রঘুনন্দনের প্রায় শত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে রচিত হইয়াছিল।

সকল জাতিই নববর্ষের আরম্ভে উৎসব করিয়া থাকে। গৃহ মার্জিত ও সজ্জিত হয়, সকলে নববস্ত্র পরিধান করে, আত্মীয়স্বজনের সহিত সম্মিলিত হয়, সুস্বাদু অন্ন ভোজন করে, নূতন বৎসরে সুখসৌভাগ্য ও বিজয় কামনা করে। পূজা-প্রাঙ্গণে মঙ্গলঘট স্থাপিত হয়, মণ্ডপের চারি দিকে বনমালা লম্বিত হয়, তোরণ নির্মিত হয়, ধ্বজা উত্তোলিত হয়; নানাবিধ বাদিত্র উৎসব ঘোষণা করিতে থাকে। গ্রামে কাহারও বাড়ীতে দেবীর পূজা হইলে, গ্রামস্থ সকলে মনে করে তাহাদেরও মঙ্গল হইবে। যিনি পূজা করেন, তিনি

গ্রামস্থ সকলকে উৎসবে আহ্বান করেন। সকলেই হৃষ্টচিত্তে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। (কয়েক বৎসর হইতে কালধর্মে এই ভাব ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।)

গুজরাট ও কাঠিবাড় প্রদেশে নবরাত্রের সময় নারীরা "গর্বা" নৃত্য করে। এক শতছিদ্র শ্বেতরঞ্জিত হাঁড়ির ভিতরে প্রজ্বলিত দীপ রাখে এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে করিতে গান গায়। এই নৃত্য ও গীতের নাম গর্বা। শব্দটি গর্ভ (ভ্রূণ) তাহাতে সন্দেহ নাই। হাঁড়ির শতছিদ্র পথে রশ্মি বাহির হইতে থাকে যেন সূর্য। নববর্ষের সূর্যই গর্ভ। নবরাত্রের অন্তে নববর্ষের সহিত নবসূর্য উদিত হইবে, এই আহ্লাদে নৃত্যগীত করে। বিবাহাদি উৎসবেও গর্বানৃত্য হয়। বোধ হয় সেখানেও গর্ভসম্ভাবনা কল্পিত হয়।

নদীর স্রোতে প্রতিমা বিসর্জনের পর শবরোৎসব, জল ও কর্দমক্রীড়া। সে সময়ে অশ্রাব্য অকথ্য ভাষায় গান হইত। ইহা দুর্গোৎসবের অঙ্গ, কালিকাপুরাণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে কেহ রুষ্ট হইত না। উত্তর-ভারতে হোলি খেলায় এইরূপ অশ্রাব্য ভাষায় গান হয়। দোলযাত্রায় আমরা পূর্বকালের হিম বর্ষারম্ভের স্মৃতি পালন করিতেছি। সে দিন মহারাষ্ট্র দেশে কোন কোন ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ স্পর্শপূর্বক দেহ অশুচি করেন, অভিপ্রায় একই। নববর্ষ প্রবেশহেতু সেই একই কারণে শবরোৎসবের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে শবরজাতির বাস ছিল। বোধ হয় তাহাদের রাজা নবরাত্র করিতেন। তাঁহার শবরজাতীয় প্রজা ঘট বিসর্জনের পর জলকাদা লইয়া খেলা করিত। নববর্ষারম্ভে হর্ষক্রীড়া স্বাভাবিক। এই আচার দুর্গাপূজা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিন্তু ক্রীড়া-কৌতুক এক কথা, আর 'কেউড়' আর এক কথা। ছত্রিশগড় অঞ্চলে কুমারী ওবা নামক ব্রতের সমাপ্তি দিনেও নির্লজ্জা নারী অশ্লীল গান গাহিয়া বেড়ায়। কৃষ্ণযজুর্বেদে আছে, সম্বৎসরব্যাপী সত্রের পর ঋত্বিকেরা হর্ষক্রীড়া করিতেন, আর তাঁহাদের সম্মুখে দাসজাতীয়া বারাঙ্গনা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গিসহ নৃত্য ও অশ্লীল গীত করিত। আমার বোধ হয় লোকের বিশ্বাস ছিল, নববর্ষের প্রথম দিন অশ্লীল ভাষা শুনিলে দেহ অশুচি হয়, যমরাজা সে বৎসর স্পর্শ করেন না।

দশরা দিনে দেশীয় রাজ্যে মহাসমারোহে নীরাজনা হয়। দশমীর পূর্ব হইতে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কৃত ও তৈল মার্জিত হয়। সেদিন অশ্বগজের গাত্র ধৌত ও অলঙ্কৃত হয়। রাজ-পুরোহিত অশ্বগজ ও অস্ত্রের পূজা করেন। অপরাহ্নে রাজা সুবেশে সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করেন। অমাত্য, সামন্ত ও উচ্চপদস্থ পাত্রমিত্র স্ব-স্ব মর্যাদা অনুসারে অন্যান্য হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হন। পদাতিক ও অশ্বারোহী রণবেশে প্রাসাদের বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতে থাকে। রাজা দেবী প্রণাম করিয়া প্রাসাদ হইতে বহির্গত হন। দামামা বাজিতে আরম্ভ হয়। পথের জনাকীর্ণ দুই পার্শ্বের মধ্য দিয়া রাজা সদলবলে যাত্রা করেন। কিছু দূরস্থিত মন্দিরে দেবীকে প্রণাম করেন এবং শমীপত্র লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। সেদিন যাত্রা করিলে সম্বৎসর বিজয় হয়। এই উৎসবের নাম দশরা।

পূর্বের আলোচনা হইতে মনে হয়, তৃতীয় খ্রিষ্ট শতাব্দের পরে নবরাত্র ও দশরা আসিয়াছে। তৎপূর্বে উত্তর-ভারতের কোথাও কোথাও মহিষ-মর্দিনীর পাষাণ প্রতিমা নির্মিত ও পূজিত হইত। মনে হয় দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে মহিষমর্দিনী কল্পনার বিস্তার হইয়াছিল। চামুণ্ডা মহীশূর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও মহারাজার কুলদেবী। মৎস্যপুরাণে মহিষমর্দিনী-দশভুজা প্রতিমা লক্ষণ আছে, অন্য পুরাণে নাই। মৎস্যপুরাণ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে রচিত মনে হয়, পরবর্তী প্রকরণে প্রমাণ দেওয়া যাইবে। সেখান হইতে কামরূপে কালিকাপুরাণে দুর্গাপূজা বিস্তৃত হইয়াছিল। এই পুরাণ বঙ্গের দুর্গাপূজার আদি। এই অনুমান সত্য হইলে দশম খ্রিষ্ট শতাব্দের পরে বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা প্রচারিত হইয়াছে। ইহার পূর্বের দুর্গাপূজা-বিষয়ক নিবন্ধও পাওয়া যায় নাই।

কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, রাজা সুরথ দুর্গার মৃন্ময়ী-মূর্তি পূজা করিয়াছিলেন। পরে সেই রাজা সাবর্ণি মনু হইয়াছিলেন। দেবী ভাগবত অন্য রাজারও নাম করিয়াছেন। এইরূপ দেবীর মাহাত্ম্য প্রদর্শনের নিমিত্ত কালিকা-পুরাণ লিখিয়াছেন, ত্রেতাযুগে রাবণ বধের নিমিত্ত রামচন্দ্রের হিতার্থে ব্রহ্মা দেবীপূজা করিয়াছিলেন। আরও আছে, রাবণ বসন্তকালে দেবীপূজা করিত। এই সকল উপাখ্যান পুরাণকারের স্বেচ্ছাকল্পিত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত সুরথ রাজার উপাখ্যানে কিছু সত্য থাকিতে পারে। কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

মনু এক কাল-সংখ্যা। একমনু কাল ২৮৪ বৎসর। (পরিশিষ্ট পশ্য)। এই গণনার আদি হইতে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় মনু ইত্যাদি না বলিয়া এক এক নাম হইয়াছিল। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় নক্ষত্র ইত্যাদি না বলিয়া যেমন অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা ইত্যাদি নাম আছে, তেমন মনু গণনাতেও আছে। আমরা শুনিয়া আসিতেছি বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতিতম যুগের দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। সে কোন্ বৎসর? আমার মতে খ্রী-পূ ১৪৪১ অব্দ। তখন বৈবস্বত মনুকাল চলিতেছিল। পরে সার্বর্ণি মনু আসিয়াছিলেন। খ্রী-পূ ১২৬৮ অব্দে সাবর্ণি মনুর আরম্ভ এবং

১৮৪ অব্দে শেষ। পুরাণ মানিলে এই দুই অব্দের মধ্যে সুরথ রাজা ছিলেন। রাজা অবশ্য মনু হন নাই। মনু নামগুলি সংজ্ঞা মাত্র। বুঝিতে হইবে রাজা সুরথ সাবর্ণি-মনুকালে ছিলেন।

ইহার সহিত পূর্ববর্ণিত মাহেশ্বর যুগ স্মরণ করিতে হইবে। দেখিয়াছি খ্রি-পূ ১১৯৩ অব্দে মাহেশ্বর যুগ আশ্বিন শুক্লষষ্ঠীতে পূর্ণ হইয়া পরদিন সপ্তমীতে শরৎ বৎসর আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা সপ্তমীতে দুর্গাপ্রতিমার পূজা হইবার হেতু মনে হয়। দেখা যাইতেছে দ্বিবিধ গণনাতে খ্রি-পূ দ্বাদশ শতাব্দ আসিতেছে। ইহা আকস্মিকও হইতে পারে।

সুরথ কোন দেশের রাজা ছিলেন। ছোটনাগপুরে বিন্ধ্যপর্বতের পূর্বাঞ্চলে এখনও কোল জাতির বাস আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ নাগপুর প্রদেশে পঞ্চম খ্রিষ্ট-শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। বোধ হয় সে দেশে দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মিত হইত। অদ্যাপি জব্বলপুর অঞ্চলে হিন্দী-ভাষীর মধ্যে দেবী-প্রতিমার পূজা চলিতেছে। এই পুরাণ কিম্বদন্তী আশ্রয় করিয়া সুরথ রাজার উপাখ্যান লিখিয়া থাকিবেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে আর এক কল্পে বৈবস্বত মনুর পর সাবর্ণি মনুকালে মহিষাসুরের সহিত দেবীর যুদ্ধ হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদে বৈবস্বত মনুর জন্মবৃত্তান্ত আছে। বিবস্বান্ অম্বুবাচি দিনের সূর্য। সেই সূর্যের পুত্র বৈবস্বত মনু। সব কথা দেবলোকের। মহিষাসুর বধও দেবলোকে হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বৈবস্বত মনু, যম ও সাবর্ণি মনুর জন্মবৃত্তান্ত উপাখ্যান আকারে লিখিত হইয়াছে। অতএব সেকালের সহিত সুরথ রাজার কালের বিরোধ নাই। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে উপাখ্যানের অর্থ করা গিয়াছে। যে অর্থই করি, মনে রাখিতে হইবে আখ্যান নয়, উপাখ্যান। খ্রি-পূ দশম শতাব্দে দুর্গার কিম্বা অন্য দেবদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণের অন্য কোন প্রমাণ নাই।

পরিশিষ্ট

১। রাশি নক্ষত্র তিথি

রবি এক বৃহৎ বৃত্তপথে ভ্রমণ করিতেছে। এক তারা হইতে সে-তারায় পুনরাগমন হইতে রবির যতদিন লাগে তাহা বৎসরের পরিমাণ। ইহা ৩৬০° অংশে বিভক্ত। এই বৃত্তকে ১২ ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম রাশি। ∴ ১ রাশি = ৩০° অংশ। রবির এক রাশি ভ্রমণ কালের নাম এক সৌর মাস। কিন্তু বৃত্তের আদি নাই, অন্ত নাই। কোন্ বিন্দু হইতে ১২ ভাগ করা যাইবে? এই প্রশ্ন লইয়া বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশের মতে ৪২১ শকে (৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) যে বিন্দুতে বাসন্ত-বিষুব হইয়াছিল, সেই বিন্দু রাশি-ভাগের আরম্ভ। কিন্তু পূর্বকাল হইতে যে পারম্পর্য্য চলিয়া আসিতেছিল, তাহার সহিত এই আদি বিন্দুর বিরোধ ঘটে। এই কারণে ৪২১ শক পরিত্যাগ করিয়া ২৪১ শকের (৩১৯ খ্রীষ্টাব্দের) বাসন্ত-বিষুব স্থানে আদি-বিন্দু স্বীকার করিতে হইয়াছে। সে বৎসর গুপ্তাব্দেরও আরম্ভ।

সে বৎসরকে ৬ ঋতুতে ভাগ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

ঋতু	মাস	অংশ	
বসন্ত	চৈত্র	৩৩০°—৩৬০°	(বাসন্ত-বিষুব)
	বৈশাখ	০°— ৩০°	
গ্রীষ্ম	জ্যৈষ্ঠ	৩০°—৬০°	
	আষাঢ়	৬০°—৯০°	(দক্ষিণায়নাদি)
বর্ষা	শ্রাবণ	৯০°—১২০°	
	ভাদ্র	১২০°—১৫০°	
শরৎ	আশ্বিন	১৫০°—১৮০°	(শারদ-বিষুব)
	কার্তিক	১৮০°—২১০°	
হেমন্ত	অগ্রহায়ণ	২১০°—২৪০°	
	পৌষ	২৪০°—২৭০°	(উত্তরায়ণাদি)
শিশির	মাঘ	২৭০°—৩০০°	
	ফাল্গুন	৩০০°—৩৩০°	

শিশির ঋতুর বৈদিক নাম হিম। দেখা যাইতেছে সূর্য ১৫০° অংশে আসিলে শরৎ ঋতুর আরম্ভ হয়।

তারা স্থির আছে। উক্ত বৎসরের পরিমাণও স্থির আছে। তাহার তুলনায় বিষুব-বিন্দু মৃদুগতিতে পশ্চিম দিকে সরিয়া আসিতেছে। প্রায় ৭২ বৎসরে ১ অংশ। ২৪১ শকে বাসন্ত-বিষুব বিন্দু যে তারার সমসূত্রে ছিল, পরে উভয়ের মধ্যে অন্তর দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান ১৮৬৮ শকে ১৮৬৮ — ২৪১ = ১৬২৭ বৎসরে সে অন্তর ২২·৬৫ অংশ হইয়াছে। এই অন্তর গমন করিতে রবির প্রায় ২৩ দিন লাগে। চৈত্র ও আশ্বিন মাসে ৩০ দিন। এই হেতু ৭ই চৈত্র ও ৭ই আশ্বিন বিষুব দিন হইতেছে। ভাদ্র মাসে ৩১ দিন; এই হেতু ৮ই ভাদ্র ইষ মাসের আরম্ভ হইতেছে। কিন্তু আমরা ২৪১ শকের মাস ও ঋতু বিভাগ মানিয়া চলিয়াছি।

বিষুব বিন্দুর পশ্চিমগতি যত, বলা বাহুল্য, অয়নাদি বিন্দুরও তত। এক অয়নাদি হইতে সেই অয়নাদিতে পুনরাগত হইতে রবির যত দিন লাগে, তাহার নাম, সায়ন-বর্ষ। ইহার ১২ ভাগের ১ ভাগের নাম আর্তব মাস। সায়নবর্ষের পরিমাণ ৩৬৫·২৪২২ দিন। নাক্ষত্র বা নিরয়ন বর্ষের পরিমাণ ৩৬৫·২৫৬৪ দিন। নিরয়ন বর্ষ অচল ঠাট, সায়ন বর্ষ সচল ঠাট বলা যাইতে পারে। সায়ন বর্ষের মাস ও ঋতু বিভাগ এইরূপ—

ঋতু	মাস	অংশ	
শিশির	তপস্	২৭০°—৩০০°	
	তপস্য	৩০০°—৩৩০°	
বসন্ত	মধু	৩৩০°—৩৬০°	(বাসন্তবিষুব)
	মাধব	০°— ৩০°	

গ্রীষ্ম	শুক্র	৩০°— ৬০°	
	শুচি	৬০°— ৯০°	(দক্ষিণায়নাদি)
বর্ষা	নভস্	৯০°—১২০°	
	নভস্য	১২০°—১৫০°	
শরৎ	ইষ	১৫০°—১৮০°	(শারদবিষুব)
	ঊর্জ	১৮০°—২১০°	
হেমন্ত	সহস্	২১০°—২৪০°	
	সহস্য	২৪০°—২৭০°	(উত্তরায়ণাদি)

রবিপথ-বৃত্ত ২৭ ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম নক্ষত্র। অতএব এক নক্ষত্র = ৩৬০ ÷ ২৭ = $\frac{৪০}{৩}$ অংশ। সেই একই আদি-বিন্দু হইতে নক্ষত্র ভাগ হইয়াছে। প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় নক্ষত্র ইত্যাদি না বলিয়া অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ইত্যাদি নাম আছে। রবি যে নক্ষত্র ভাগে থাকে তাহার নাম রবিনক্ষত্র। চন্দ্র যে নক্ষত্র ভাগে থাকে তাহা চন্দ্রনক্ষত্র। পাঁজিতে প্রতি দিনের যে নক্ষত্রের নাম থাকে তাহা চন্দ্রনক্ষত্র। চন্দ্রসূর্যাদি গ্রহ রাশিচক্রের বা নক্ষত্রচক্রের যত অংশাদি অতিক্রম করিয়াছে, তাহার নাম ভোগ। নক্ষত্র শব্দের মূল অর্থ নিকটস্থ কয়েকটি তারা লইয়া কল্পিত আকৃতি। যেমন মৃগাকার মৃগনক্ষত্র।

তিথি এক কাল-মান। রবি ও চন্দ্র পূর্বদিকে গমন করিতেছে। রবির গতি মন্দ। কিন্তু প্রত্যহ সমান নয়। চন্দ্রের গতি দ্রুত। কিন্তু প্রত্যহ সমান নয়। অমাবস্যায় রবি ও চন্দ্রের ভোগ একই থাকে। চন্দ্র রবিকে ছাড়িয়া পূর্বদিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। উভয়ের ১২° অংশ অন্তর হইতে যত দণ্ডাদি লাগে, তাহার নাম তিথি। ৩০ তিথিতে এক চান্দ্র মাস। ১, ২, ৩ ইত্যাদি গণিয়া গেলে পূর্ণিমা ১৫ তিথি, অমাবস্যা ৩০ তিথি। ১২° অংশকে নক্ষত্র করিলে,

$$\frac{১২ \times ৩}{৪০} = \frac{৯}{১০} \text{ নক্ষত্র।}$$

তিথির অর্থ হইতে পাইতেছি,

$$\frac{চ° - র°}{১২} = তি$$

এখানে চ° চন্দ্রের ভোগাংশ, র° রবির ভোগাংশ, তি তিথির সংখ্যা। রবি ১৫০° অংশে আসিলে শরৎ ঋতুর আরম্ভ ও আশ্বিন শুক্লনবমীর অন্ত। তখন চন্দ্র ভোগাংশ কত?

শুক্লনবমী = ৯ × ১২ = ১০৮°। র = ১৫০°। অতএব চ = ১০৮° + ১৫০° = ২৫৮°। ইহাকে নক্ষত্রে আনিলে ২৫৮ × $\frac{৩}{৪০}$ = ১৯·৩৫ নক্ষত্র অর্থাৎ ১৯ নক্ষত্র গতে ২০ নক্ষত্রের অর্থাৎ পূর্বাষাঢ়ার ৩৫ শতাংশ গত। অথবা, নক্ষত্রে গণিলে রবি ১৫০ × $\frac{৩}{৪০}$ = ১১·২৫ নক্ষত্র। তিথি শুক্লনবমী = ৯ × $\frac{৯}{১০}$ = ৮·১, অতএব চন্দ্র নক্ষত্র = ৮·১ + ১১·২৫ = ১৯·৩৫।

রঘুনন্দন ধৃত দেবীপুরাণ মতে আর্দ্রা-নক্ষত্রযুক্ত ভাদ্র কৃষ্ণনবমীতে নবম্যাদি-কল্প আরম্ভ হয়। সেদিন রবির ভোগ কত? পূর্বদিন ধরি। কৃষ্ণ-অষ্টমী = ২৩ তিথি। চন্দ্র নক্ষত্র, মৃগশিরা = ৫ন = ৫ × $\frac{৪০}{৩}$ = ৬৬·৬ অংশ।

চ° − র° = ১২ × তি। ৬৬·৬ − র = ১২ × ২৩ = ২৭৬°।

অতএব − র = ২৭৬° − ৬৬·৬° = ২০৯·৪।

+ র = ৩৬০° − ২০৯° = ১৫০·৬।

দেখা যাইতেছে কৃষ্ণ-অষ্টমীর দিনে রবি শরৎ ঋতুতে প্রবেশ করে। নবমী শরৎ ঋতুর প্রথম দিন।

২। মাহেশ্বর যুগ

এই যুগ অজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে। শতাধিক বর্ষ হইল জন বেণ্টলী নামে এক ইংরেজ বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। তিনি জ্যোতির্গণিত চর্চা করিতেন। হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন। কিন্তু অধিকাংশ গবেষণা বিকৃত ও হিন্দু জ্যোতিষের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত। তিনি এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহার পুস্তকের নাম '*Historical view of Hindoo Astronomy.*' (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এক খণ্ড আছে।) তাহাতে সংক্ষেপে কয়েকটা যুগের তালিকা আছে। কিন্তু কোন বিবরণ নাই, যুগের উপযোগ নাই, প্রয়োগও নাই। বোম্বাইয়ের জ্যোতির্বিৎ কেতকর মহাশয় সেই তালিকা পুনরুদ্ধার করিয়া প্রয়োগ বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক যুগ শুক্লসপ্তমীতে আরম্ভ হইয়াছে। যুগের পরিমাণ = ২৪৭ সায়ন বর্ষ ১ মাস। প্রথম যুগ ভাদ্র শুক্লসপ্তমীতে আরম্ভ হইয়া ২৪৭ বৎসর ১ মাস পরে আশ্বিন শুক্লষষ্ঠীতে পূর্ণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুগ পরদিন আশ্বিন শুক্লসপ্তমীতে আরম্ভ হইয়াছিল। আশ্বিন শুক্লষষ্ঠীর নাম আদিকল্পষষ্ঠী ছিল। বোধ হয় কল্প শব্দের অর্থ যুগ। আদিকল্পষষ্ঠী প্রথম যুগের ষষ্ঠী, সেদিন রবির ভোগ ১৫০° অংশ হইয়াছিল। পরদিন আশ্বিন শুক্লসপ্তমীতে দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ। তৃতীয় যুগ কার্তিক শুক্লসপ্তমীতে হইয়াছিল ইত্যাদি ক্রমে এক এক যুগ এক এক মাস আগাইয়া আসিয়াছিল। খ্রি-পূ ১৪৪০ (শকপূর্ব ১৫১৭) অব্দে প্রথম যুগ। সে যুগের বৈশাখ শুক্লতৃতীয়া বাসন্ত-বিষুব হইয়াছিল। পাঁজিতে অক্ষয়া তৃতীয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রাবণ শুক্লপঞ্চমীতে দক্ষিণায়নাদি। সেদিন নাগপঞ্চমী। কার্তিক শুক্লাষ্টমীতে শারদ-বিষুব। পাঁজিতে এই দিনের বিশেষ নাম পাওয়া যায় না। মাঘ শুক্ল-একাদশীতে উত্তরায়ণাদি। সেদিন ভীম একাদশী নামে খ্যাত। এই চারি দিনের প্রসিদ্ধি ও ঐক্য হেতু আমি মনে করি খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দে এই যুগমালিকা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার অন্য প্রমাণও আছে। বেণ্টলী এই সকল যুগের কোন নাম দেন নাই। কেতকরও কোন

নাম আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সোমসিদ্ধান্তে (মধ্যমাধিকারে) এক গার্গ্য শ্লোক উদ্ধৃত আছে। তাহার অর্থ অধুনা সপ্তম মনুর অষ্টাবিংশ দ্বাপরে মহেশ্বর ব্রহ্মা হইয়াছেন। অর্থাৎ, মহেশ্বর কালবিভাগকর্তা হইয়াছেন। বায়ু পুরাণে (৩২) চতুর্মুখ মহেশ্বর সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগের কর্তা হইয়াছেন। চতুর্মুখ মহেশ্বরের প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোমসিদ্ধান্ত ও বায়ু পুরাণের শ্লোক হইতে আমার মনে হয় এই যুগের নাম মাহেশ্বর যুগ ছিল। মাহেশ্বর যুগের কয়েকটি তিথি ধরিয়া আমাদের কয়েকটি পূজার তিথি নির্দিষ্ট হইয়াছে।

মাহেশ্বর যু সাহায্যে বিষুব, অয়নাদি ও আর্তব মাস সংক্রান্তি দিনের তিথি বাহির করিতে পারা যায়। ১২ আর্ত মাসে ১২ যুগ পূর্ণ হয় অতএব ১২ × ২৪০ $\frac{1}{2}$— ২৯৬৫ সা - বর্ষে যুগ-চক্র একবার আবর্তন করে খ্রি-পূ ১১৯৩ অব্দে = ১২৭০ শকপূর্ব আশ্বিন শুক্ল সপ্তমীতে এক যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব ২৯৬৫ – ২৭০ = ১৬৯৫ শকেও সেইরূপ যুগ আসিয়াছিল। বর্তমান ১৮৬৮ শকে সে যুগ চলিতেছে।

উদাহরণ দ্বারা যুগের উপযোগিতা দেখাইতেছি · উদাহরণ ১৮৬৮ শকে বাসন্ত-বিষুব দিন কি তিথি হইয়াছিল? শকের পঞ্চম মাসে যুগ আরম্ভ হইয়াছিল অতএব সে বৎসরের ৭ মাস অবশিষ্ট ছিল। ১৮৬৮ শকের বাসন্ত বিষুব দিন = ১৮৬৭ বৎসর + ২ মাস এখন বিয়োগ কর,—

১৮৬৭ + ১২
১৬৯৫ + ৭
১৭২ বৎসর + ৫ মাস

সায়ন বৎসরে ১১°০৪৮ তিথি
মাসে °৯২ তিথি বৃদ্ধি হয় অতএব
১৭২ × ১১°০৪৮ = ১৯০০°২৬
৫ × °৯২ = ৪°৬০
যুগারম্ভে গত ৬
১৯১০°৮৬

৩০ দিয়া ভাগ করিলে অবশেষ ২০°৮৬ তিথি থাকে। অর্থাৎ সেদিন ২১ তিথি কৃষ্ণষষ্ঠী হইয়াছিল। কোন্ চান্দ্র মাসের? আমরা জানি বাসন্ত বিষুবদিন চৈত্র মাসের ৭ই হইয়াছিল অতএব সেদিন চান্দ্রচৈত্র হইতে পারে না। পূর্ববর্তী চান্দ্র ফাল্গুন কৃষ্ণষষ্ঠী হইয়াছিল।

২। ১৮৬৮ শকের উত্তরায়ণাদি দিবসে কি তিথি ছিল? ২৭০° অংশে উত্তরায়ণাদি, ও নবম আর্তব মাস আরম্ভ। অতএব

১৮৬৮ + ৯
১৬৯৫ + ৭
১৭৩ বর্ষ ২ মাস গত

১৭৩ বর্ষে ১৭৩ × ১১°০৪৮ = ১৯১১°৩০ তিথি
২ মাসে ২ × °৯২ = ১°৮৪
যোগ = ৬°
১৯১৯°.৪

৩০ দিয়া ভাগ করিলে অবশেষ ২৯°১৪ থাকে। ৭ই পৌষ উত্তরায়ণ দিন। সেদিন চান্দ্রপৌষ অমাবস্যা হইতে পারে না। অতএব চান্দ্র অগ্রহায়ণ অমাবস্যা।

অথবা, সে বৎসর বাসন্ত বিষুব দিনে তিথি ২০°৮৬। ৯ মাসে ৮°২৮ তিথি বৃদ্ধি। যোগ করিলে ২৯°১৪ তিথি হয়। রবির ভোগ জানা আছে। তিথি জানা গেল। পূর্বপ্রাপ্ত সমীকরণ দ্বারা নক্ষত্র পাওয়া যাইবে তিন সহস্র বর্ষ পূর্বে পরিকল্পিত যুগদ্বারা অদ্যাপি প্রায় শুদ্ধফল পাওয়া যাইতেছে। ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নয়।

৩। বৎসর যুগ মনু

প্রয়োজনানুসারে বহুবিধ কালমান প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে মানুষমান ও দেব বা দৈবমান প্রসিদ্ধ। মানুষের ব্যবহারের নিমিত্ত মানুষমান ও নৈসর্গিক ঘটনার কাল জ্ঞাপনের নিমিত্ত দৈবমান আমাদের দিবস, বৎসর, যুগ বা কতিপয় বৎসরের সমষ্টি আছে। দৈবমানেও তেমন দিবস বৎসর ও যুগ আছে। আমাদের ছয় মাসে উত্তরায়ণ দৈবমানে নাম দৈবদিবা, ছয়মাস দক্ষিণায়ন দৈবরাত্রি। আমাদের এক বৎসর এক দৈবদিবস। আমাদের ৩৬০ বৎসর দৈববৎসর ইত্যাদি। বর্তমানে আমাদের দৈবমান প্রয়োজন নাই। যাহা লিখিতেছি, তাহা মানুষমানের বুঝিতে হইবে

১ কল্প যুগ-সহস্র অর্থাৎ ৪০০০ বৎসর ১ কল্পে ১৪ মনু বা মন্বন্তর অতএব ১ মনু-কাল ২৮৫°৭ বৎসর কিঞ্চিদধিক ৭১ যুগে ১ মনু। অতএব ১ যুগ = ৪ বৎসর। এই চারি বৎসরের নাম কৃত বা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। এখানে এই চারি নাম চারি বৎসরের, যুগের নয় ইহার প্রমাণ দিতেছি মহাভারতে বনপর্বে পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে লোমশ ঋষি বলিতেছেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! ইহা ত্রেতা দ্বাপরের সন্ধি" (১২১।১৯)। আর এক স্থানে (১২৫।১৪), সেইরূপ কথা আছে। পাণ্ডবেরা বনবাসে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই সময় মধ্যে অন্ততঃ দুইবার ত্রেতা দ্বাপরের সন্ধি হইয়াছিল। আর একস্থানে (১৪৮।৩৭), ভীম ও হনুমানের তর্ককালে উক্ত হইয়াছে, "অচিরে কলিযুগ প্রবর্তিত হইয়াছে।" অতএব ৪ বর্ষে ১ যুগ জানিতে হইতেছে। এই মনু গণনার আদি কোথায়? সেই আদি আমাদের

আত কোন অব্দ দ্বারা ব্যক্ত না করিলে মন্থ দ্বারা কাল নির্ণয় হইতে পারে না। নানা কারণে আমার মনে হইয়াছে, খ্রি-পূ ৩২৫৬ অব্দে মন্থগণনার আদি বা কল্পাদি। এই বৎসর রোহিণী তারার সমসূত্রে বাসন্ত-বিষুব হইয়াছিল। সেদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লনবমী, পরদিন শুক্লদশমী আমরা দশহরা নামে পালন করিতেছি। এখন আমরা সপ্তমমন্থ, বৈবস্বত মন্থর অষ্টাবিংশতি যুগের দ্বাপরের খ্রিষ্টাব্দ পাইতেছি। যথা। কল্পাদি—খ্রি-পূ ৩২৫৬ অব্দ হইতে গত, ৬ মন্থ ২৮৪ × ৬ — ১৭০৪ বৎসর সপ্তম মন্থর ২৭ যুগ ৪ × ২৭ — ১০৮, কৃত ত্রেতা দ্বাপর ৩ বর্ষ — ১৮১৫ বর্ষ। খ্রি-পূ ৩২৫৬ — ১৮১৫ — খ্রি-পূ ১৪৪১ অব্দ। ইহা কলি বৎসর। অতএব খ্রি-পূ ১৪৪১ অব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার পর বৎসর প্রথম মাহেশ্বর যুগ আরম্ভ হইয়াছিল।

বৈবস্বত মন্থ সপ্তম মন্থ। অতএব ২০০০ বৎসরে সমাপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ খ্রি-পূ ৩২৫৬ — ২০০০ = ১২৫৬ অব্দের পরে অষ্টম মন্থ সাবর্ণি মন্থ আরম্ভ হইয়া ২৮৪ বৎসর চলিয়াছিল।

ঋগ্‌বেদের কাল হইতে যাজ্ঞিকেরা পাঁচ বৎসরে যুগ গণনা করিতেন। এই পাঁচ বৎসরের সম্বৎসর, পরিবৎসর ইত্যাদি পাঁচ নাম ছিল। পুরাণে ও পাঁজিতে এই পাঁচ বৎসরের নাম আছে।

কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ প্রসিদ্ধ। প্রথমে প্রত্যেক যুগের পরিমাণ সহস্র মানুষবর্ষ ছিল। চারি যুগে চারি সহস্র বৎসর এক কল্প। পরে ধর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে কলির পরিমাণ ১২০০ মানুষ বৎসর হইয়াছিল। দ্বাপর কলির দ্বিগুণ, ত্রেতা ত্রিগুণ, কৃত বা সত্য চতুর্গুণ। একুনে চারি যুগে দ্বাদশ সহস্র বৎসর হইয়াছিল। পাঁজিতে যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির পরিমাণ লিখিত হইতেছে তাহা দৈবযুগের। মানুষকলি ১২০০ মানুষবৎসর, দৈবকলি ১২০০ × ৩৬০-৪৩২০০ মানুষবৎসর। তদনুসারে মন্বন্তরাদি দৈবমানে অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছে। পাঁজিতে দৈবমান লিখিত হয়।

দেহ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরি যে ব্যাকুল বাণী
যত অশ্রুধৌত শান্তি লইয়াছে মানি
আপনার পরিণাম সদেহ প্রকাশে
বিকশি উঠেছে আজি শোভা আর বাসে
পুষ্প সম পূর্ণ হয়ে ; কিছু সার্থকতা
লভেছে কোটার মাঝে, আর যত কথা
কহিবার বাকী আছে—নৈবেদ্য তোমার
শুধু উৎসর্গের মাঝে পরিচয় তার।

তুমি জেনো এই দেহ প্রাণের বিকাশ
তাই এত বাণী ফুটে, গানের আভাষ
হেথা বিশ্বলোক আনি বাসা বাঁধিয়াছে
তোমারে শুনাবে ব'লে ; তাই মিশে আছে
দেহের অতীতাকাশে তোমার প্রভাতে
এ জীবনে যা শুভ্রতা নক্ষত্রের সাথে।

নব-যুগ-রবি

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

আকাশের কূলে কূলে নিবিড় আঁধার,
নিশাচর শ্বাপদেরা করে কলরব,
দিকে দিকে দানবের বীভৎস তাণ্ডব ;
কম্প্র বক্ষে দেখে, আর রুদ্ধ করে দ্বার
প্রাণপণে ভীরু মনে পীড়িত মানব।
ভাবে—অবসান বুঝি নাহি হবে তার
এ দুখ-রাত্রির, আর এ বিভীষিকার,
জাগিবে না কোন দিন আলোর গৌরব।
তাই চুপে চুপে আসে নক্ষত্র-আলোক,
নিঃশব্দে চুম্বন করে সুদীর্ঘ চিকুর
শ্রান্ত ধরণীর। জাগে অপূর্ব্ব পুলক
বেদনার বীণাটিতে বঙ্কারিয়া সুর
নিখিলের কানে কানে কহে—ওরে কবি,
পূরব গগনে ওঠে নব-যুগ-রবি।
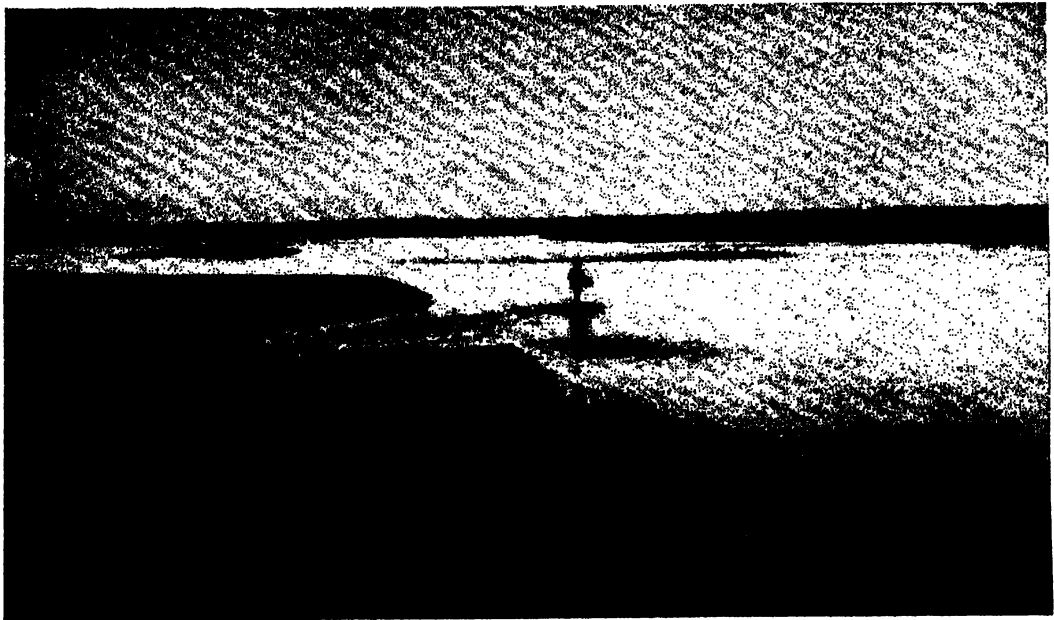
জলপাইগুড়ি : তিস্তানদীর বুকে

অরণ্যপথের ডায়ারি

শ্রীপরিমল গোস্বামী

১

ডুয়ার্সের জঙ্গলে বাঘের ফোটোগ্রাফ তোলা কি ভাবে সম্ভব এই নিয়ে ডুয়ার্স জঙ্গলের সঙ্গে পরিচিত শিকারপ্রিয় অশোকের সঙ্গে আমার অনেক দিন আগে কথা হয়। ডুয়ার্সের জঙ্গল শিকারী মাত্রেরই কাছে একটি তীর্থস্থানবিশেষ। অনেকেই এখানে বাঘ মেরেছেন কিন্তু জংলী বাঘের ফোটোগ্রাফ নেওয়া সম্পর্কে কোনো বাঙালী শিকারীর কখনও কোনো আগ্রহ হয়েছে বলে জানা নেই। শিকার করা এবং শিকারের ছবি তোলা একই সঙ্গে একা লোকের পক্ষে অবশ্য সব সময় সম্ভব হয় না, অথচ বন্দুক নিয়ে শিকার করা আর ক্যামেরা নিয়ে শিকার ধরা এ দুটি কাজই যে-কোনো অভিজাত শিকারীর পক্ষে সমান লোভনীয়।

অশোকের কাছে শুনলাম ইউরোপীয়ান ছাড়া এ দেশে সে রকম সফল চেষ্টা কেউ করেন নি। (এবারে একটি কয়েন্ট অফিসে গিয়ে আমি কয়েকখানা বাঘের ছবি দেখে চমৎকৃত হয়েছি। সেগুলো সবই ফ্ল্যাশ আলোতে তোলা এবং প্রত্যেকখানাই অতি সুন্দর।)

এ রকম ছবি তোলা একটা অসম্ভব কিছু নয়, সবই পূর্ব আয়োজন সাপেক্ষ। খরচও বিশেষ কিছু নয়। এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে ধৈর্যের। যে-কোনো বুদ্ধিমান ফোটোগ্রাফার এ কাজ অনায়াসে করতে পারেন। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে নিরুৎসাহজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ রকম ছবির চাহিদা এ দেশে সে রকম নেই। কাজেই এ দেশের শিকারী বাঘ মেরে তার উপর একখানা পা তুলে দিয়ে হাতে বন্দুক নিয়ে যে জবড় ছবি তোলান তাইতেই তিনি ও সে ছবির দর্শকেরা তৃপ্ত।

যুদ্ধের পরে, গত বৎসর অশোক জঙ্গলে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা পাইথন শিকার করেছিল; তার ছবিখানা এবারে আমাকে দেখাল, এবং পুরাতন প্রস্তাবটি পুনরায় উত্থাপন ক'রে বলল, তুমি শিকারের ছবি তুলতে রাজি থাক তো এবারে চল।

কিন্তু শিকারের সমস্ত আবহাওয়ার সঙ্গে অন্তত একবার পরিচয় না ঘটলে কথা দেওয়া শক্ত। তা ছাড়া ক্যামেরার শাটার টেপার সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশ আলো জ্বালাবার যে পৃথক বন্দোবস্ত থাকা দরকার তা আমার নেই—বাজারে এখন সে রকম ফ্ল্যাশ কিনতেও পাওয়া যায় না, কাজেই ইতস্তত করছিলাম।

শিকারের ফোটোগ্রাফ আমাদের দেশে যে তোলা একান্ত প্রয়োজন সে কথা অশোক গভীর ভাবে চিন্তা করছে। এ জন্যে আমার খুব আনন্দই হ'ল। সত্যিই কোনো ফোটোগ্রাফার যদি একান্ত ভাবে শিকারের ছবি নেওয়ার জন্যে উঠে-

পছে লাগেন তা হলে তাঁর ছবিগুলো বিদেশে উচ্চমূল্যে বিক্রি হতে পারে। তবে তাঁকে আর সব ভুলে একমাত্র ক্যামেরা নিয়েই থাকতে হবে। আমাদের মতো ছুটির দিনের সৌখিন ফোটোগ্রাফার হলে চলবে না।

গৌরীপুরহাট সংলগ্ন মদনমোহন মন্দির ও পূজারী

আমি বললাম ক্যামেরা নিয়ে বেরলে অবশ্য অনেক কিছুই কাজ হতে পারে। বাঘের ছবি না তুললেও অন্তত হরিণের ছবি তোলা যেতে পারে।

অশোক বলল, তার চেয়েও ভাল জিনিস আছে। এবারে হাতী-খেদার হাতী ধরা দেখার একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, তুমি যদি যাও তা হলে একটা নতুন জিনিসের ছবি নিতে পারবে।

তবে কি আসাম যেতে হবে?

অশোক বলল, এই বাংলাদেশেই হাতী ধরা হয়। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভুটানের পায়ের কাছে যে গভীর জঙ্গল আছে সেইখানে হাতী ধরা হয়। জায়গাটা আসামের খুবই কাছাকাছি এবং নামে বাংলাদেশ হলেও পরিচিত বাংলাদেশের কোনো চিহ্নই সেখানে নেই।

বলা বাহুল্য, এ রকম নিরাপদ প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। স্বাস্থ্য কিছু খারাপ ছিল, সেজন্যে স্বভাবতই দুর্গম স্থানে ভ্রমণ আমার পক্ষে একটু দুঃসাহসিকতার ব্যাপার ছিল, কিন্তু তবু এ সুযোগ ছাড়ার মন রাজি হ'ল না। তা ছাড়া ঠিক এই সময়েই খবরের কাগজে পড়লাম দক্ষিণ মেরু অভিযানের জন্যে ইউরোপ আমেরিকা থেকে তোড়জোড় চলছে।—কল্পনা ক'রে নিজের সাহস বেড়ে গেল।

কিন্তু কথাটা বন্ধুমহলে প্রচার ক'রে হ'ল মুশকিল। তারা বলতে লাগল ডুয়ার্সে এমন ভীষণ ম্যালেরিয়া যে সেখানে কেউ এক বার গেলে সুস্থ দেহে ফিরে আসে না। আর সে না কি সবই প্রায় ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। বিশেষ ক'রে যারা বাইরে থেকে ওখানে নতুন যাচ্ছে তাদের ভয় সব চেয়ে বেশি। তাদের মৃত্যু প্রায় অনিবার্য।

দু-তিন দিন ধ'রে এই ধরণের সব কথা শুনে শুনে মনে বেশ ভয় জেগে উঠল, এবং সর্বশেষ যাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি বক্তৃতা দিয়ে রক্ত জমিয়ে দিলেন।

ভূষণকে আরও কয়েকবার বক্তৃতা দিতে দেখেছি। দাঙ্গার সময়, শহরের লোকের তখন মাথার ঠিক নেই, সেই সময় তাঁর বক্তৃতার অদ্ভুত ক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলাম। পাড়া রক্ষা করা যায় কি ভাবে এই বিষয়ে যাঁরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছেন, আসবার সময় বেশ উৎসাহ দেখেছি তাঁদের মনে. কিন্তু ভূষণের কাছে এসে তাঁরা একটি কথা বলবারও সুযোগ পান নি, চুপ ক'রে শুনেছেন তাঁর উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা এবং শোনবার পরে তাঁরা আধমরা হয়ে ফিরে গেছেন। অনিবার্য ধ্বংসের বিভীষিকাপূর্ণ চেহারা তাঁদের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে। অবসন্ন মনে, কম্পিত চরণে, তাঁরা ঘরে ফিরে গিয়ে ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন।

২৩ নবেম্বর। সন্ধ্যায় আমার পুরাতন ভ্রমণসঙ্গী সুধাংশু-প্রকাশ এবং আমি রওনা হব, আয়োজন করছি এমন সময় হঠাৎ ভূষণ এসে হাজির।

কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

ডুয়ার্সে।

বলেন কি? উদ্দেশ্য?

দেহটা ভাল নেই, দিন পনেরো একটু বাইরে কাটাব।

তাতে আমার সম্মতি হতে পারে, দেহটার নয়।

কি রকম?

সেটাকে ওখানেই রেখে আসতে হবে, আগেই বলে দিচ্ছি।

ভয়ের কারণ আর এমন কি থাকতে পারে, মানুষ তো সেখানে থাকে?

রেখে দিন মানুষ। আমি বলছি যাবেন না।

মনে পড়ল গত বারে অশোকের ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়েছিল। কিন্তু তবু সে এবারেও যাচ্ছে সেই ডুয়ার্সেই। তাই বললাম, যিনি আমাদের ডাকছেন তিনি মারাত্মক কিছু আশঙ্কা করলে নিজেও যেতেন না। তা ছাড়া ম্যালেরিয়া যখন কলকাতাতেও হয়, তখন ভয় ক'রে লাভ কি? তিনি অনেক বার ওখানে শিকার করতে গিয়েছেন।

তিনি তো তা হলে বাঘের মুখে যাচ্ছেন—মশার মুখে যেতে তাঁর তো ভয় থাকবার কথা নয়। কিন্তু আপনি কেন যাবেন? বিশ্বাস করুন, আমি ডুয়ার্সে থেকে জানি। এখন হাজার টাকা দিলেও দ্বিতীয় বার আর যাব না।

এ কথার পরে আমাদের ভয় যে বেড়ে গেল তা বলা বাহুল্য। তখনই ছুটলাম ডাক্তারের কাছে। বললাম সাবধানের

যখন মার নেই, তখন আগেই দুইদিন ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে নিলে হয় না?

ডাক্তার বললেন, দরকার নেই, রোজ একটা ক'রে মেপাক্রিন খেলেই চলবে। ভয় কমে গেল, এবং এই ব্যবস্থা-মতে চলে কোনো বিপদেই পড়ি নি। (তা ছাড়া আরও একটি কথা আগে থাকতেই বলে রাখি যে জলপাইগুড়ি শহরে দু চারটে মশার দেখা পেলেও ডুয়ার্সের অরণ্যে যত দিন ছিলাম একটি মশার চেহারাও দেখি নি।)

সন্ধ্যা সাতটায় দার্জিলিং মেল। নবেম্বরের শেষে যাচ্ছি, কাজেই জলপাইগুড়িতে নিশ্চয় প্রবল শীত, এই আশঙ্কা করে আগে থাকতেই প্রায় দার্জিলিং যাবার পোষাক পরে নিয়েছিলাম। জানতাম গাড়িতে ভিড়ের মধ্যে আর মাঝপথে গরম জামা পরার সুবিধা হবে না, কারণ আমরা তৃতীয় শ্রেণীতে যাচ্ছিলাম। গাড়ি ছাড়বার সময় হচ্ছে ৬-৫০, কিন্তু আমরা সাড়ে পাঁচটায় গিয়েও কোনো রকমে বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। তারপর থেকে ভিড় বাড়তে লাগল এবং গাড়িও নড়ছিল না। ব্যতিক্রম করেও কেন যে ছাড়তে অকারণ দেরি হয় তা জানি না, কিন্তু আমরা ঘর্মাক্ত হয়ে পড়লাম গরম পোষাকে। দার্জিলিং মেলই যে দার্জিলিং নয়, এ কথাটা ভবিষ্যৎ শীতকে অগ্রাহ্য করেও আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

দার্জিলিং মেল দার্জিলিং নয়, কিন্তু আমরা যে গাড়িখানায় বসেছিলাম তাকে ভারতবর্ষ বলতে কারও আপত্তি হবে না। একেবারে অখণ্ড ভারতবর্ষ। মানুষকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা ভারতবর্ষীয় রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করবেন। দেখবেন মুমূর্ষু রোগী থেকে সুরু করে বিশালদেহ পালোয়ান সবাই এসে ভিড় করেছে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, ওড়িয়া, আসামী, বিহারী, পঞ্জাবী, নেপালী, ভুটিয়া, মাদ্রাজী সবাই আছে। মালপত্র এক এক জায়গায় পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। ভিড়ের চাপে প্রত্যেকে নিষ্পেষিত, কিন্তু সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই, মনকে পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্ত রাখবার অভাবনীয় কৌশল এদের জানা আছে। একই কামরায় তিন-চারটি প্রদেশের তিন-চার জন লোক বিভিন্ন সুরে গান ধরেছে—অথচ কারও কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ম্যালেরিয়ার রোগী জ্বরে আর্তনাদ করছে, মেয়েদের কোলের কোনো কোনো শিশু-সন্তান তারস্বরে চীৎকার করছে, আর একজন রোগী ক্রমাগত কাসতে কাসতে মরবার উপক্রম হচ্ছে, কিন্তু কারও দিকে কারও চেয়ে দেখবার দরকার নেই। ভারতবর্ষের লোকেরা চিরকাল ধরে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে পথের সকল রকম দুর্দশা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে। রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতেও দেখা যাবে সেই একই ভারতীয় জীবন-দর্শনের প্রতিচ্ছবি।

এর জন্যে রেল কোম্পানীকে ধন্যবাদ। যারাই টিকিট কিনতে গিয়েছে তাদেরই কাছে টিকিট বিক্রি করেছে, এবং যত চেয়েছে তত দিয়েছে। আসনের হিসাব নেই, সুখ-সুবিধার প্রশ্ন নেই, হিসেব চলছে শুধু বুকিং আফিসে। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যদি কেউ তোমার ঘাড়ের উপর দিয়ে যাতায়াত করে তবে সেই যাত্রীর কোনো অপরাধ নেই। ঐ কামরায় যে তোমাকে উঠতে দিয়েছে, তাকেও সেই উঠতে দিয়েছে। তোমারও যেমন যাওয়া দরকার, তারও তেমনি যাওয়া দরকার। সুতরাং বিনা প্রতিবাদে সব মেনে নাও, এবং যদি মনের অবস্থা অনুকূল থাকে তা হলে ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপটি প্রত্যক্ষ করবার পুরো সুযোগ গ্রহণ কর চতুর্দিকের মানবিক চাপের মধ্যে বসে।

২৪শে নবেম্বর ভোর ছটায় গিয়ে নামলাম জলপাইগুড়িতে। কলকাতা বসে হিমালয়ের কাছাকাছি যে শীতের আশঙ্কা করেছিলাম, এখানে এসে দেখি সে রকম কিছুই নয়। আমরা ষ্টেশন থেকে চা খেয়ে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম দশ মিনিটের মধ্যে। সাইকেল-রিক্‌শ এখানকার প্রধান বাহন। শহরের পথও বেশ চমৎকার। আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অশোক আমাদের টেনে নিয়ে গেল দোতলার ছাদে। বলল একটা দৃশ্য দেখবে চল। ছাদে উঠেই দেখি নির্মল নীল আকাশের বুকে স্বর্ণবর্ণ কাঞ্চনজঙ্ঘার অনাবৃত অপরূপ মূর্তি। ইতিপূর্বে দার্জিলিঙের পথে জলপাইগুড়ি থেকেই এ দৃশ্য বার বার দেখেছি, কিন্তু এত ভালভাবে দেখবার সুযোগ পাই নি। কিন্তু সব সময়েই এ দৃশ্য কেন জানি না সম্পূর্ণ অবাস্তব মনে হয়। হয় তো আমি যত বার দেখেছি তত বারই একভাবে বহুক্ষণ ধ'রে দেখতে পারি নি। সে দিনও দেখতে দেখতে নিচের মেঘ ধীরে ধীরে উপরে উঠে সমস্তটা দৃশ্য ঢেকে ফেলল। ভোরে প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘার আবির্ভাব না দেখলে এর সৌন্দর্য সম্পূর্ণ দেখা হয় না। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। সূর্যোদয়ের কয়েক মুহূর্ত আগে সর্বোচ্চ চূড়াটি প্রথম আলোর স্পর্শে একটুখানি দৃশ্য হয়। মনে হয় যেন কোনো অদৃশ্য হাতের তুলির স্পর্শে ঐ জায়গাটায় প্রথম রং লাগল। তারপর তুলি চলতে লাগল ধীরে ধীরে। অনেকগুলো চূড়ার উপরের লাইনটি আঁকা হয়ে গেল। উপরে নিচে কিছুই নেই—আকাশের গায়ে শুধু পূব-পশ্চিম ব্যাপী একটি স্বর্ণবর্ণ তরঙ্গায়িত রেখা। তারপর ধীরে ধীরে নিচের দিকেও রঙীন হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তবু এ দৃশ্য একমাত্র আঁকা ছবির সঙ্গেই তুলনীয়। এমন জীবন্ত প্রকাশ, এবং পরিচিত সকল বস্তুসীমার এত ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং এমন দ্রুত পরিবর্তনশীল যে এ দৃশ্যকে অবাস্তব না ভেবে পারা যায় না।

অবাস্তবকে উড়িয়ে দিয়ে এবারে বাস্তবে আসা যাক। এখানকার খাওয়ার কথাটা দীর্ঘকাল ক্যাম্প এলাকাবাসী খাদ্যভোজীর পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। উত্তর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সুগন্ধ সরু চাল এখানে সব সময়েই মেলে। এখানকার মাছও বেশ সুখাদ্য। মিঠাইও অতি উপাদেয়। সন্দেশ বা

রসগোল্লায় এমন একটা কোমল মাধুর্য্য আছে যা কলকাতার শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্নের চেয়েও স্বতন্ত্র। কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো মহিমময় দৃশ্যের পাশে বসে ভাতের সঙ্গে হিমালয়ের পাথর চর্বণ নিতান্তই বিসদৃশ ঠেকত, যদিও সেইটেই স্বাভাবিক বলে আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু ভাগ্য আমাদের নিতান্তই অনুকূল। এখানে এসে হিমালয়কে আর উদরে পুরতে হ'ল না।

প্রত্যুষের প্রথম দৃশ্যে মন ভরে উঠেছিল, দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে পরম তৃপ্তি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জলপাইগুড়ি জেলা অত্যন্ত ভাল লাগতে লাগল। বিকালে বেড়াতে যাওয়া গেল তিস্তা নদীর দিকে। এখানে এই নদীটি বিশেষ ভাবে দর্শনীয়। বহু প্রশস্ত নদী, কিন্তু এখন জল শুকিয়ে গেছে এবং তার ফলে নদীর মাঝখানে অনেক-গুলো চর জেগে ওঠাতে দৃশ্য নতুনতর হয়ে উঠেছে, এক নদী বহু চর বুকে নিয়ে বহু নদীতে পরিণত হয়েছে। আমাদের পায়ের কাছের নদীর অংশটি খুবই সঙ্কীর্ণ। বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যা হয়ে এল। সম্মুখের প্রকাণ্ড চরের আর এক প্রান্ত থেকে মধুর গান গেয়ে এক রাখাল তিনটি বাছুর নিয়ে আমাদের দিকে আসছে। তিনটি বাছুর ও রাখালের চলমান মূর্ত্তি শাদা বালির উপর বহু দূর থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে। সূর্য ডুবে গেছে অল্পক্ষণ আগে। ওরা ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল। তার পর তিনটি বাছুর ও তাদের রাখাল জলে নামল। জল অগভীর। অত্যন্ত স্বচ্ছ। ওরা যখন মৃদু স্রোত ঠেলে আমাদের খুব কাছে এসে পড়ল তখন সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি রাখাল রাখাল-বালক নয়, বাঙালী গৃহস্থ বালিকা। বয়স বছরদশেক হবে। ফ্রক পরে হাতে ছোট লাঠি নিয়ে ওপারে বাছুর আনতে গিয়েছিল। তার গানের সুর তখনও থামে নি। গানের কথাগুলো বোঝা যাচ্ছিল না, মনে হ'ল কথা তার কাছে অবান্তর। আমাদের কাছেও। কিন্তু সেই গোধূলি অন্ধকারে দিগন্তবিস্তৃত বালুচরের উপর সেই ছবি, সেই সুর, মনকে একটি অপরূপ আনন্দে ভরে তুলল।

সন্ধ্যায় ফিরে এসে শোনা গেল আমাদের অরণ্য-পথে যাওয়ার আরও দু-এক দিন দেরি হবে, গাড়ি তেল ইত্যাদির যোগাযোগ ঠিকমত ঘটে উঠছে না। তা ছাড়া যে সব পথে সোজা যাওয়া যায় সে সব পথের সব জায়গায় এখনও বড় গাড়ি চলবে না। বড় গাড়ি মানে ট্রাক। ট্রাক ভিন্ন অন্য কোনো গাড়িতে যাওয়াও সম্ভব নয়। কারণ সঙ্গে অনেক মাল-পত্র। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু দমলাম না। যদি জলপাইগুড়িতে দু-এক দিন থাকতেই হয় তা হলে এখানকার পল্লী অঞ্চলের কিছু পরিচয় ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা যাবে এই ভেবে কিছু উৎসাহ বোধ করলাম।

২৫ নবেম্বর। শহরের প্রান্তে ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলেছি। বেলা নটা। ক্ষেতের পারে বহু দূরে দিগন্তে গাছপালার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ধান পাকতে সুরু হয়েছে কিন্তু এখনও কাটা সুরু হয় নি। বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই এই রকম সুবিস্তীর্ণ ধানক্ষেত দেখা যায়। এর দিকে চাইলে কল্পনা করা শক্ত যে এ দেশে লোকে ভাতের অভাবে মারা যেতে পারে। অথচ এ দেশে ধানের প্রাচুর্যও যেমন সত্য, দুর্ভিক্ষও তেমনি সত্য। আমরা ভাঙাচোরা উঁচুনিচু পথে এগিয়ে চলেছি। ধানক্ষেতের এপারে চাষী পল্লী। ওদের সবই ছোট ছোট খড়ের ঘর। বাড়ির জমির সঙ্গে অনেকগুলো ক'রে কলা গাছ। সমস্তটা মিলে বেশ একখানি ছবির মতো মনে হচ্ছে। আমরা যে পথে চলেছি সে পথে বহু যাত্রী চলেছে নদীর দিকে। একটু পরেই তিস্তার ধারে এসে পড়লাম। চার-পাঁচ জন ডাক-হরকরা বড় বড় চিঠির থলে মাথায় নিয়ে হন হন করে চলেছে। তারা নদী পেরিয়ে যাবে রেল-স্টেশনের দিকে।

দিনের প্রখর আলোয় তিস্তার রূপ ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ পাওয়া গেল। নদীর অগভীর জল ঠেলে পিঁপড়ের সারের মতো মানুষের সার নদী পারাপার করছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে নদীর পাড়, কিন্তু জল বহু দূরে। হিমালয় পর্বতশ্রেণী দিগন্তে মেঘের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। এই বিস্তীর্ণ নদীর বুকে অগভীর জলে এক বৃদ্ধা একটা ছোট ধামা কাঁধে নিয়ে লাঠি হাতে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। মাছ ধরা ব'লে মনে হ'ল না। আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা সেখানে ছিলাম, তার খোঁজা তখনও শেষ হয় নি। তাকে দেখে পরশ-পাথর-খোঁজা ক্ষ্যাপার ছবিটি মনে জাগছিল। মুদ্রিত ছবিখানা দেখলেই সেটা কল্পনা করা যাবে।

তিস্তা নদীর ধারে বেড়ানো এমনি ভাল লাগল যে বিকেলে আমরা আবার এলাম সেখানে। নদীর ধারে এই রকম খোলা স্বাস্থ্যকর জায়গায় শহরের কাউকে বেড়াতে দেখলাম না। বেড়ানোর মত এমন মূল্যবান জায়গা, অথচ একেবারে নির্জন, কেবল যারা পার হয়ে যাচ্ছে তারা ভিন্ন আর লোক নেই।

সন্ধ্যায় যখন ফিরছি তখন মুসলিম লীগের বাইরে-থেকে-আসা কয়েকজন লোক নাকি একটি সভা বসিয়েছিল, তার আভাস পাওয়া গেল পথে। বহু উৎসাহী যুবকের ছুটোছুটি এবং ব্যস্ততা দেখলাম। পূর্বদিন ওদের একটা শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল শহরে—শহরে উত্তেজনা সৃষ্টির নাকি চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু স্থানীয় নেতারা নাকি হিন্দু-মুসলিম প্রীতি নষ্ট করার বিরোধী, তাই বাইরের লোকের বিশেষ কোন সুবিধা হয় নি।

বিদ্যুতের আলোতে পথের উপর একটি বিজ্ঞাপন দেখে চমকিত হলাম। পাঁউরুটির বিজ্ঞাপন। স্বভাবতই আনন্দিত হবার কথা, কিন্তু হওয়া গেল না। দেখে মনে হ'ল রুটি প্রস্তুতকারক রুটির ক্রেতাকে স্তম্ভিত করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনটি ফরাসী ভাষায় প্রচার করতে চেয়েছেন। তাই বড় বড় বাংলা হরফে সাইনবোর্ডে লেখা হয়েছে, "দ্য লোফ দ্যা"। দেশী রুটিতে এই জাতীয় ফরাসী স্বাদ মিশ্রিত হয়ে কি দাঁড়িয়েছে তা ভুক্তভোগীরাই জানেন।

২৬শে নবেম্বর। আজ দুপুরের একটু পরেই যাওয়া গেল জলপাই-গুড়ির উত্তরে একটি পল্লীগ্রামের হাট দেখতে। হাটটির নাম গৌরীর-হাট, কেউ কেউ রাজারহাটও বলে। মোটর গাড়িতে গিয়েছিলাম। আমরা যখন হাটের কাছে এলাম তখন হাট সবে বসতে সুরু করেছে, তাই তখনই সেখানে না থেমে ঐ পথে আরও আধ মাইল এগিয়ে গিয়ে একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে বসলাম ঘণ্টা-খানেকের জন্যে। আমরা যে পথে এলাম সে হচ্ছে শিলিগুড়ি রোড। শিলিগুড়ি ঊনত্রিশ মাইল দূরে। উঁচু জায়গাটা থেকে চারদিক বেশ দেখা যাচ্ছিল। এর পিছনেই মাঝারি আকারের একটা দীঘি। চারদিক দিয়ে মাঠ পেরিয়ে গ্রামে যাবার বহু পথের চিহ্ন। নানা গ্রাম থেকে হাটের পথে বেরিয়ে আসছে নানাজাতীয় স্ত্রীপুরুষ। হিন্দু মুসলমান সবাই চলেছে। কেউ বা চলেছে গরুর গাড়িতে। এখানকার আদি-বাসিন্দারা রাজবংশী। আমাদের দেশে এরা "বাহে" নামে পরিচিত। এদের মেয়েরা একখানা লুঙি জাতীয় বস্ত্র বুকের মাঝামাঝি জায়গায় এঁটে পরে। সে কাপড়ে আর কোনো বাহুল্য নেই, দেহটাকে শুধু ঘিরে রাখে মাত্র। এই অদ্ভুত শাড়ীর নাম হচ্ছে পোতা।

গৌরীরহাটের পথে

আমরা চারটের পর এলাম হাটে। বেশ বড় হাট। তরিতরকারী, কমলালেবু, কলা, চাল, পান, সুপারি, চুন, খেলনা এবং কলকাতা থেকে আমদানী নানা রকম সস্তা মনোহারী জিনিষ। পোতা শাড়ী এবং গামছা ইত্যাদিও অনেক এসেছে। তা ছাড়া স্থানীয় রাজবংশী মালাকরদের শোলার উপর চিত্র-বিচিত্র আঁকা দেবদেবীর মূর্তি। হাটে সাঁওতাল মেয়েপুরুষও অনেক এসেছে। হিন্দু মুসলমান সবাই আছে। তারা সবাই গ্রামবাসী। স্বাস্থ্য তাদের কারোই বিশেষ ভাল দেখলাম না। অত্যন্ত নিরীহ, চাষবাস ক'রে কিংবা তরিতরকারী বেচে খায়। জলপাইগুড়িতে বহিরাগত লীগনেতার আগমনে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য জেগেছে কিনা লক্ষ্য করছিলাম। দেখে মনে হ'ল এরা বহু পুরুষ ধ'রে যেভাবে এদেশে হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস ক'রে আসছে তার ছাপ প্রত্যেকের মুখে লেগে আছে। এরা খেতে পায় না, দরিদ্র, স্বাস্থ্যহীন, ঠিক এখানকার হিন্দু গ্রাম-বাসীদের মতোই। তাই এদের মধ্যে কোনো আত্মঘাতী প্রবৃত্তি জাগে নি। হিন্দু মুসলমান দুই গরিব প্রতিবেশী—দুজনের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, আজ হঠাৎ এরা পরস্পর মারামারি করবে কেন তা এরা জানে না।

হাটের পাশেই একটি মন্দির আছে—মদনমোহন বিগ্রহের মন্দির। বিগ্রহ বহুদিনের, কিন্তু মন্দিরটি অল্পদিন হ'ল জলপাই-গুড়ির রাজার টাকায় তৈরি হয়েছে শুনলাম। মন্দিরের সংলগ্ন জমিতে সুপুরি গাছের বাগান। বাগানকে ঘিরে রেখেছে দুর্ভেদ্য বাঁশবন। এত লম্বা লম্বা বাঁশ এর আগে দেখি নি। এর পাতাগুলো একটু বেশি সরু ব'লে মনে হ'ল। এই বাঁশবনের ছায়ায় ঘেরা সুপুরি গাছগুলোর প্রত্যেকটিতে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে পানের গাছ। সুপুরী গাছ যত উঁচু পানের লতাও ততখানি উঁচু হয়ে উঠেছে। একে বলে গাছ পান। পান গাছ ও সুপুরি গাছের এই অদ্ভুত মিলন বেশ মজার মনে হ'ল।

আমাদের সঙ্গে স্থানীয় সরোজবাবু ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ গায়ক এবং সকলের পরিচিত। এঁর সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে আমরা বেশ খাতির পেলাম। পূজারী আমাদের চা খাইয়ে অভ্যর্থনা করল।

আমরা বসে থাকতে থাকতে এক ভিখারী রোগী এল ঐ মন্দিরে। সে পূজারীর কাছ থেকে দেবতার কৃপা ভিক্ষা করতে এসেছে। জ্বরে কাঁপছিল। ম্যালেরিয়া কিংবা কালাজ্বর হবে। তাকে কিছু পয়সা দিয়ে বিদায় ক'রে দেওয়া হ'ল। এইখান থেকে আবার আমরা হাটে এলাম। হাটের ভিতরে ধান চালের আমদানী হয়েছিল অনেক। খুব সরু চাল টাকায় সওয়া সের এবং মোটা লাল আমন চাল আড়াই সের ক'রে বিক্রি হচ্ছিল। আমরা মালাকরদের শোলার উপর আঁকা

ছবিগুলোর দিকে আকৃষ্ট হলাম। মনসা দেবী, কালী ও পূজারিণীদের ছবি তুলি ও রঙের সাহায্যে আঁকা। কালীর মূর্তিতে অসাধারণ শক্তির প্রকাশ পেয়েছে। পূজারিণীদের ছবি সবই এক রকম। কিন্তু অনেকগুলো পর পর আঁকলে অতি চমৎকার একটি প্যাটার্ন হয়। আমরা ইচ্ছে করলে এই প্যাটার্ন বইয়ের মলাটে বা অন্যত্র ব্যবহার করতে পারি। কালী ও পূজারিণীদের মূর্তি এঁকে এরা যে জিনিষ তৈরি করেছে তা ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রাখা যায়— অথবা ল্যাম্পের শেড হিসাবে ব্যবহার করা যায় ল্যাম্পে লাগিয়ে দেখা গেছে তার সুন্দর দেখায়। আলোক নিয়ন্ত্রণের সময় যে রকম শেড ব্যবহার করা হ'ত এগুলোও সেই ধরণে তৈরি, কিন্তু সেগুলো মুদ্রিত ছবিতে আর নেই কারণ ফোটো নেবার জন্যে কেটে টান করে নেওয়া হয়েছিল। মনসা মূর্তি আঁকা 'জড়াইমটি ছ-ফুট লম্বা। দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা যায়।

২৭শে নবেম্বর। রওনা হবার জন্যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু তবু সব ঠিকমতো যোগাযোগ ঘটছে না। সেজন্যে আজ আর কোথায়ও যাওয়া হ'ল না। সন্ধ্যায় স্থানীয় অনেকে এলেন এবং নানা রকম গল্প শোনা গেল তাঁদের কাছ থেকে। সবই প্রায় শিকারের গল্প। এ অঞ্চলের অরণ্যে যাঁদের ঘোরা-ফেরা করতে হয় তাঁদের জীবনে একমাত্র উত্তেজনা বাঘ মারা। বাঘ মারার চেষ্টা অনেকেই করেন, কিন্তু বাঘ পাওয়া নিতান্তই দৈবের উপর নির্ভর করে। অনেকে আবার সামনে পাওয়া সত্ত্বেও মারতে পারেন না। সরোজবাবু বললেন শিকারী দলের সঙ্গে যে দিন তিনি প্রথম হাতীর পিঠে বাঘ মারার হাতে খড়ি দিতে যান সেদিন তিনি সুযোগও পেয়েছিলেন, লক্ষ্যও ঠিক করেছিলেন এবং গুলি করতেও ভোলেন নি, কিন্তু তবু বাঘ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে তাঁকেই পাকা শিকারীদের বাক্যগুলির লক্ষ্য পরিণত করেছিল। এর কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারা গেল, সবই রুটিন মত করেছিলেন, কেবল বাঘ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বন্দুকে টোটা পুরতে ভুল হয়েছিল! অত্যন্ত ভয়ে তাঁর তখন জ্ঞান ছিল না, যন্ত্রচালিতবৎ কি করেছিলেন খেয়াল করতে পারেন নি। রামুবাবু বললেন এক আনাড়ি দল এক চা বাগানে মাচা বেঁধে বাঘের অপেক্ষায় বসে আছেন, এমন সময় একজন ভয়ে বা-বা-করে চেঁচাতে লাগলেন এবং সবাই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সমবেত ভাবে গুলি চালালেন কালো অর্ধবৃত্ত বস্তটার উপর। অব্যর্থ গুলি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বস্তুটি কোন্ সাহেবের একটি পোষা কুকুর। মহা সমস্যা। অতঃপর আত্মরক্ষার পাকা বন্দোবস্ত করলেন অন্য একটি কুকুর মেরে—এবং নিহত পোষা কুকুরটিকে সরিয়ে ফেলে।

২৮শে নবেম্বর। আজ রওনা হওয়া যাবেই এই রকম বন্দোবস্ত হওয়া সত্ত্বেও অনিবার্য কারণে হ'ল না। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। সকালে উঠেই বিছানাপত্র বাঁধা হয়েছিল, এমন অবস্থায় না যাওয়া অস্বস্তিকর। শেষ পর্যন্ত জলপাই-গুড়ির জনারণ্যকেই আশ্রয় করলাম আজকের দিনের মতো। দুপুরের পরেই আমরা তিন জনে গেলাম এখানকার আর একটি হাটে। নাম নতুনহাট, বেশি দূরে নয়, রিক্‌শতেই যাওয়া সম্ভব হ'ল। হাটটি গৌরীহাটের তুলনায় খুবই ছোট, কিন্তু চেহারা একই এখানে অতিরিক্ত আমদানী দেখলাম বাঁশের নানা রকম ঝুড়ি কুলো ইত্যাদি। বহু রকম ডিজাইনের তৈরি। এখানেও মালাকরদের শোলার উপর আঁকা দেবদেবীর ছবি বিক্রি হচ্ছে। আরও কিছু কিনলাম এখান থেকে। বহুকাল ধ'রে এরা একই ধরণের ছবি এঁকে আসছে, ছবির অর্থও এরা ভাল করে জানে না, কিন্তু আঁকার হাত এদের পাকা। বংশানুক্রমিকভাবে একই ভঙ্গীতে এঁকে এদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে আঁকবার সময় একটুও ভাবতে হয় না—অভ্যস্ত হাত দ্রুত চালিয়ে যেতে পারে। হাটে বসে বসেই কতকগুলো অর্ধসমাপ্ত ছবি শেষ করছিল দেখলাম।

২৯শে নবেম্বর। বিছানা রাত্রে একটুখানি খুলে তারই উপর শুয়ে যথাপথে জরুরি অবস্থায় রাত কাটানোর মতো রাত্রিটা কাটিয়ে দিলাম। পাঁচটি রা'ত্র এখানে কাটানো গেল, কিন্তু একদিনও মশারি ব্যবহার করতে হয় নি। শোবার সময় 'ইন্‌সেক্ট রিপেল্যান্ট' নামক এক দুর্গন্ধ মার্কিন তেল মুখে ও হাতে মেখে শুতাম মশা খুব অল্পই ছিল, রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় সেই তেলকে অগ্রাহ্য করে কোনো মশা আমাদের রক্ত পান করেছে কিনা জানি না। যাই হোক ভোরে উঠে বিছানা ভাল করে বেঁধে নিয়ে চা খেয়েই গিয়ে উঠলাম ট্রাকে। মার্কিন যুদ্ধকালীন ট্রাক—অতি চমৎকার—কলকজা অতি মজবুত, পথ চলতে কিছুমাত্র ঝাঁকানি লাগে না। আমরা খোলা ট্রাকের উপর ডেক-চেয়ারে এবং প্যাকিং বাক্সের উপর গদি বিছিয়ে খুব আরামে যেতে লাগলাম। মোটর-যন্ত্রের পাকা শিল্পী সুশীল গোস্বামী গাড়ি চালিয়ে চললেন। অশোকের এক মাসের রসদ সঙ্গে, তা ছাড়া বন্দুক গুলি ইত্যাদি।

আমাদের পার হতে হবে মণ্ডলঘাট ফেরি। জলপাইগুড়ির সম্মুখে পার হয়ে বার্নেস ঘাটে যাওয়ার পথ তখনও খোলা হয় নি। মণ্ডলঘাট শহর থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে। অনেকখানি পথ তিস্তানদীর পাড়ের উপর দিয়ে আসতে হ'ল। সে পথ অত্যন্ত খারাপ এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। ট্রাক চালনার এক মুহূর্তের ভুলে সবসুদ্ধ নদীর মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। পথ সব জায়গাতেই উঁচুনিচু এবং ভাঙা, চলবার সময় মনে হচ্ছিল বাঁয়ের দিকের চাকা নদীতে পা বাড়িয়েই আছে।

মণ্ডলঘাট পার হতে বেশ খানিকটা দেরি হ'ল। নদীর মাঝখানে প্রকাণ্ড চর। তাতে নদী দুই ভাগ হয়ে দুটো নদীতে পরিণত হয়েছে, কাজেই দুবার পার হতে হ'ল একই

গৌরীরহাট : সাধারণ দৃশ্য

গৌরীরহাটের পাশে গাছপানের বাগান। পানের লতা সুপারি গাছের সঙ্গে জড়াইয়া উঠিয়াছে
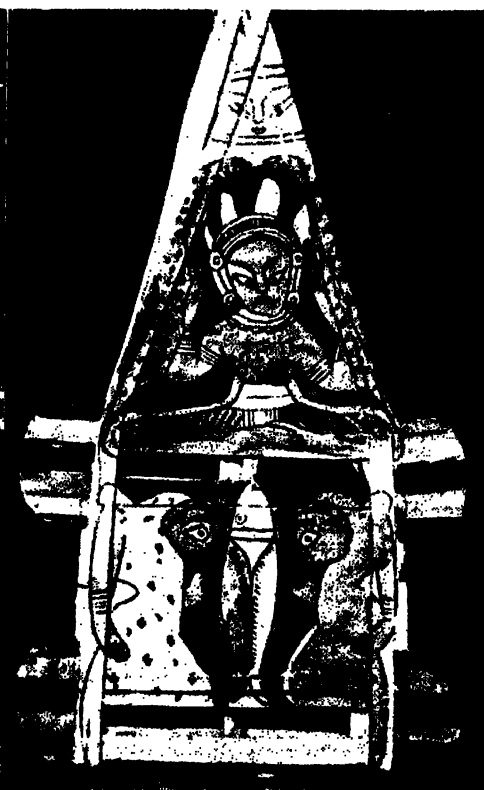
জলপাইগুড়ির প্রাচীন বাসিন্দা মালাকারদের আঁকা সোলার উপর মনসাদেবীর মূর্তি

গৌরীরহাট : চাল বিক্রি

বাম পার্শে :

মালাকারদের আঁকা কালীমূর্ত্তি ও পূজারিণী দল, বিভিন্ন ভঙ্গীতে

উপরে :

মালাকারদের আঁকা কালীমূর্ত্তি

নদী। দু-খানা বেয়ানৌকা একসঙ্গে জোড়া। তার উপর ট্রাক গিয়ে দাঁড়াতে পারে এজন্যে চওড়া তক্তা পেতে দেওয়া আছে। আমরা সেকরকটা ক'রে দুটি জায়গা পার হয়ে ওপারে এসে উঠলাম ঘন কাশবনের 'এলিফ্যান্ট গ্র্যাস) মধ্যে। এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে গাঁয়ের পথ। এ পথের দৃশ্য খুবই ভাল লাগল, কিন্তু ট্রাক দ্রুত চালিয়ে নেবার মতো ভাল পথ নয়। ময়নাগুড়ি পর্যন্ত কোন রকমে এসে ভাল পথ পাওয়া গেল। আমরা বেলা একটার সময় দলগাঁওতে পৌঁছলাম। এইখানে কিছুক্ষণ থেমে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। সঙ্গেই খাবার ছিল। এখানে কয়েকটা বড় দোকান আছে। পথ চলতি যা-কিছু দরকার প্রায় সবই পাওয়া যায়। এখান থেকে কালাকাটার পথ আরও বেশি ভাল লাগল। দুধারে অবিচ্ছিন্ন চায়ের বাগান। বাগানে কুলি মেয়ে পুরুষেরা ছুরি চালিয়ে চা গাছ ছাঁটাই করছে—দুটি হাত সমানে চালিয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ দেখে মনে হয় যেন সবুজের সমুদ্রে সাঁতার কাটছে।

আমরা কখনও কাঞ্চনজঙ্ঘাকে পিছনে ফেলে চলেছি, কখনও তার দিকেই এগিয়ে চলেছি, কখনও বা হিমালয়ের সমান্তরাল চলেছি। চলতে চলতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এ দিকটায় প্রথম আসছি, তাই গ্রামগুলোর চেহারা পরিচিত লাগলেও সমস্ত মিলে, বিশেষ ক'রে হিমালয়ের পটভূমিতে সবই অভিনব মনে হচ্ছিল। তা ছাড়া ছোট ছোট নদী যে কত আছে তার সংখ্যা নেই। মনে হচ্ছিল যেন পাঁচ-দশ মিনিট পর পরই একটি ক'রে সেতু পার হয়ে চলেছি। এ পথে 'জলঢাকা' নদীটিই সবচেয়ে প্রশস্ত। গ্রামে অধিকাংশই দোচালা ছোট ছোট খড়ের ঘর। দু'তিনখানা ঘর মিলিয়ে এক একটা বাড়ি। বাড়ির সঙ্গে কয়েকটি কলাগাছ। সমুখে বা পাশে একটুখানি তরিতরকারীর বাগান। যাদের অবস্থা একটু ভাল তাদের ঘরগুলো টিন ও কাঠ দিয়ে তৈরি এবং জমি থেকে অনেকটা উঁচু। এ অঞ্চলে অনেক বাড়িই এই রকম উঁচু ভিতের তৈরি। এদেশের বর্ষা খুব ভীষণ—অবিরাম বৃষ্টিতে সব ভিজে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে, তাই ঘরের নিচে ফাঁকা রাখতে হয়, অবশ্য যারা পারে তারাই রাখে। ঠিক যেন দোতলা বাড়ি, নিচের তলাটা শুধু শূন্য। ঘরগুলো দেখতে খুব সুন্দর।

আমরা এগিয়ে চলতে চলতে একটা জায়গায় এলাম সেখান থেকে একটা পথ উত্তরের দিকে গেছে আর একটা পথ দক্ষিণের দিকে গেছে। দক্ষিণ দিকের পথটি কুচবিহারের দিকে গেছে। ঐখানে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল আমাদের গন্তব্যস্থলে যেতে হলে উত্তরের পথটিই ধরতে হবে। কিন্তু সে পথটি ছিল খুব খারাপ। ভাঙাচোরা, এবং উপরে বেশ বড় বড় পাথরখণ্ড এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। একটু দূর এগিয়ে যাবার পর মধুরা নামক জায়গায় এসে আবার পথ জিজ্ঞাসা করে নেওয়া গেল। একটা চা-বাগানের শেষ প্রান্ত থেকে বাঁয়ের দিকে ঘুরতেই পথ অনেকটা ভাল মনে হ'ল। আমরা বেলা সাড়ে তিনটে আন্দাজ সময়ে চিলাপাতা রেঞ্জ অফিসের সম্মুখে গিয়ে একটুখানি থামলাম এবং ওখান থেকে আবার পথের খবর জেনে নিয়ে এগিয়ে চললাম।

মিনিট পাঁচেক এগিয়ে যাবার পরই জঙ্গল সুরু হ'ল। জঙ্গল ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর। বাঘ ভালুকের রাজত্বে প্রবেশ করছি। পথের পাশে তখনও দু-একটি লোকের দেখা মিলল। তারপর অরণ্য সম্পূর্ণ জনহীন। আমরা যে পথে চলেছি সে পথ নামমাত্র, আসলে তা অরণ্যেরই অংশ। গাড়ি চলতে পারে সহজেই, কিন্তু কোনো পথচারী একা মানুষ সে পথে যায় কি না সন্দেহ। লোকালয়ের চিহ্ন নেই। চারদিক থমথম করছে। কোথায়ও কোনো শব্দ নেই। ট্রাকের ইঞ্জিনের ধকধক শব্দ সমস্ত অরণ্যে যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। যত এগিয়ে চলেছি ততই বেশি ঠাণ্ডা। হাত যেন জমে যাচ্ছে। কোনো হিংস্র জন্তু আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে পালাবার কোনো পথ নেই। প্রকাণ্ড এক একটা শালগাছ, তার সঙ্গে আরও কত রকম গাছ লতা গুল্ম। গাড়ি চলার সরু পথের দুধারে অজস্র হাল্কা সবুজ রঙের ফার্ন গাছ। ট্রাকের শব্দে গাছ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখী ডাকতে ডাকতে উড়ে পালাচ্ছে। গাড়ির সামনে দিয়ে একটা ছোট বানর এক পাশ থেকে আর এক পাশে লাফিয়ে গেল। বাইরের কড়া রোদ থেকে ক্রমে অন্ধকার রাজত্বে চলেছি। সব আলো যেন হঠাৎ নিবে গেছে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে গায়ে। অশোক জঙ্গলের অন্ধকার ভেদ ক'রে তার সতর্ক দৃষ্টি চালনা করছে চারদিকে। চাপা গলায় বলছে ক্যামেরা তৈরি রাখ।

কেন?

যে-কোন অবস্থার জন্যে তৈরি থাকা ভাল। আচমকা সুযোগ আসতে পারে।

বুঝলাম হরিণ কিংবা বাঘ অথবা ভালুক হঠাৎ সামনে এসে যাওয়া বিচিত্র নয়। ক্যামেরা আমার খোলাই ছিল। চলতে চলতে একটা বাঁক ঘুরতেই মনে হ'ল যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। হঠাৎ আমরা ছোট দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে এসে পড়েছি। সূর্যের আলো তার প্রবল স্রোতকে এমন ঝলকিত ক'রে তুলেছে যে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। নদীর দুই পাড়ে শত শত কাশফুল। আলো-উত্তাপহীন প্রাচীন অরণ্যের বুকে ঐ একটুখানি যেন দুটির আনন্দ হাসি। মনে হ'ল এইখানে একটু থামি, কিন্তু মনে হতে হতেই গাড়ি বহুদূর এগিয়ে চলে গেছে। এর পর থেকে ঐ নদীর ফাঁকা পথের দেখা কিছুক্ষণ পর পরই পেতে লাগলাম। তার পর আবার সব অন্ধকার। পুরো এক ঘণ্টা এই রোমাঞ্চকর অরণ্যকে বাস ক'রে বেরিয়ে এলাম খোলা আকাশের নিচে। এলাম আর এক অভিনব অরণ্যে। দুধারে শুধু কাশবন।

প্রত্যেকটি গাছ পনেরো-ষোল হাত উঁচু—এবং প্রত্যেকটি গাছ থেকে এক একটা শিষ আকাশের দিকে বেরিয়ে গেছে। যে সব কাশফুল তাতে ছিল তা অনেকদিন হ'ল শুকিয়েছে, তবু বেশ লাগছিল।

এর পর আবার অরণ্য পথ সুরু হ'ল। তবে এ অরণ্য ভয়ঙ্কর নয়, এখানে মানুষের বসতি আছে। আরও কিছুদূর এগিয়ে আসার পর একটা নতুন জিনিষ দেখলাম। শালবনের ভিতর আধুনিক ধরণে তৈরি সব বাড়িঘর—কংক্রীটের দেয়াল ও অ্যাসবেসটসের চাল। প্রথমে দু একখানা ঘর, ক্রমে যত এগিয়ে চলেছি ততই ঘরের সংখ্যা বাড়ছে। একটি মানুষের চিহ্ন নেই, তবু ঘর। তারপর জঙ্গল ছেড়ে খোলা জায়গায় এসে দেখি সেখানে ঘরের সংখ্যা আরও বেশি। সব মিলে একটা ছোটখাট শহর। সিনেমাঘর, জলকল, সবই আছে, কেবল মানুষ নেই।

শুনলাম যুদ্ধের শেষ দিকে এখানে এইভাবে সেনানিবাস তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সৈন্যেরা এ সব বাড়ি সম্পূর্ণ দখল করার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তাই কোনো কাজে লাগে নি। এ রকম টাটকা নতুন শহর অথচ সম্পূর্ণ শূন্য—দেখলে মনের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

ক্রমশঃ

নিন্দুক

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

হস্তলিপিবিজ্ঞানের শিক্ষক সার্জে ক্যাপিটৌনিচ আখিনেয়েভের মেয়ে ন্যাটালিয়ার সঙ্গে ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষক ইভান পেট্রোভিচ লোশাডিনিখের বিবাহ উপলক্ষে ভোজের উৎসব চলেছে। নাচগান আর হল্লায় বসবার ঘর সরগরম হয়ে উঠেছে। ক্লাব থেকে ভাড়া-করে-আনা খানসামার দল কালো ফ্রক কোট ও ধূলিমলিন সাদা নেকটাই পরে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছে ব্যস্তভাবে। অতিথি অভ্যাগত ও চাকর-বাকরদের কোলাহলে কান পাতবার জো নেই। বাইরে থেকে এক দল লোক খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে আছে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে—সামাজিক পদমর্য্যাদা নেই বলে ভিতরে ঢুকতে ভরসা পায় না তারা।

রাত ঠিক বারটার সময় গৃহস্বামী আখিনেয়েভ রান্নাঘরে এসে হাজির হলেন—খাবার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা দেখবার জন্ত। রান্নাঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্য্যন্ত ধোঁয়ায় ভর্ত্তি—ধোঁয়ায় রাজহাঁস ও অন্তান্ত পশুপক্ষীর মাংসের লোভনীয় গন্ধ। হরেকরকমের খাবার আর পানীয় ছটো টেবিলের উপর ছড়ানো রয়েছে নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবে। রাঁধুনী মার্থা খাবারের টেবিলের কাছে ঘোরাফেরা করছে ব্যস্ত-ভাবে। অত্যন্ত স্থূল তার দেহ, মুখের রঙটা ঘোর লাল।

"ষ্টার্জনটা কেমন তৈরি করেছ দেখি," লুব্ধ দৃষ্টিতে রান্নার পাত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে বললেন আখিনেয়েভ—"কি চমৎকার গন্ধ! ইচ্ছে করছে সমস্ত রান্না-ঘরটাই গিলে ফেলি! ষ্টার্জনটা দেখাও তো একবার।"

মার্থা একটা বেঞ্চির কাছে গিয়ে চর্ব্বিমাখা একখানা খবরের কাগজ তুললে অতি সাবধানে। কাগজটার নীচে প্রকাণ্ড একটা ডিসে মস্ত একটা ষ্টার্জন্—তার চার পাশে একরাশ জলপাই আর ক্যারট। ষ্টার্জনটার দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন আখিনেয়েভ। মাছটা তৈরি হয়েছে খাসা! তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চোখের তারা বিস্ফারিত হয়ে উঠল আনন্দের আবেগে। নীচু হয়ে অধর ও ওষ্ঠ সংযুক্ত করে তৃপ্তির একটা আওয়াজ করলেন তিনি—চলন্ত গাড়ীর চাকায় যেমন আওয়াজ হয় তেমনি। এক মুহূর্ত্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, তারপর আনন্দে তুড়ি দিলেন একটা এবং আবার ঠোঁট ছটো যুক্ত করে আওয়াজ করলেন আগের মত।

"এ্যাঁ! চুমু খাওয়ার আওয়াজ শুনি যে! বলি, কাকে চুমু খাচ্ছো, মার্থশকা?" কে একজন বলে উঠল পাশের ঘর থেকে এবং এক মুহূর্ত্ত পরেই স্কুলমাষ্টার ভ্যানকিনের কদম-ছাঁট দেওয়া মাথাটা দেখা গেল দরজার সামনে।

"কাকে চুমু খাচ্ছিলে, মার্থা? এ্যাঁ! সার্জে ক্যাপি-টৌনিচ যে! বুড়ো বয়সেও মনটা বেশ কাঁচা রেখেছ দেখছি! বলিহারি ভাই!…মেয়েমানুষের কাছে নিরালায় দাঁড়িয়ে কি করছিলে বল তো?"

"চুমু আমি খাই নি মোটেই," হতবুদ্ধির মত জবাব দেন আখিনেয়েভ—"চুমু খাচ্ছিলাম এ কথা তুমি বললে কি করে? মাছটা খাসা রান্না হয়েছে দেখে আমি শুধু একটা আওয়াজ করেছিলাম মুখে।"

"ও কথা আর কাউকে ব'লো," ব্যঙ্গের সুরে বললেন ভ্যানকিন এবং কথাটা বলেই দরজার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁর মুখে বিদ্রূপের একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল।

"ব্যাপারটা যে কতদূর গড়াবে ভগবানই জানেন!" আখিনেয়েভ বললেন মনে মনে—"লোকটা এবার চতুর্দ্দিকে ঐ কথা রটাবে নিশ্চয়। পাজি নচ্ছার কোথাকার! সারা শহরে ওর জন্তে দেখছি মাথা হেঁট হবে আমার।"

ভীতকুণ্ঠিতপদে বসবার ঘরে ঢুকে আখিনেয়েভ বার বার তাকাতে ''কন ভ্যানকিনের দিকে—ওর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য

করবার জন্ত। ভ্যান্‌কিন দাঁড়িয়েছিলেন পিয়ানোর কাছে। হঠাৎ নীচু হয়ে কি যেন ফিস্ ফিস্ করে বললেন ইন্‌স্পেক্টারের ভাগ্নির কানে আর অমনি সেই মেয়েটি হেসে উঠল খিল খিল করে।

"আমারই কথা বলাবলি করছে ওরা!" মনে মনে বলেন আখিনেয়েভ, "আমারই কথা নিশ্চয়! লোকটা পাকা শয়তান। মেয়েটা বিশ্বাস করেছে বলেই মনে হচ্ছে, নইলে অমন করে হাসবে কেন? আচ্ছা বিপদেই পড়লাম!...না, চুপ করে থাকলে চলবে না—এমন কিছু করতে হবে যাতে লোকে ওর কথা বিশ্বাস না করে। সকলের কাছেই ব্যাপারটা আমি বলব—তা হলে ও জব্দ হবে খুব—কেউ ওর কথা শুনতে চাইবে না—সকলেই বুঝবে ও কত বড় মিথ্যেবাদী।"

আখিনেয়েভ বার কতক মাথা চুলকোন, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যান পাদেকয়ের দিকে।

"মঁসিয়ে পাদেকয়, একটু আগে আমি ছিলাম রান্নাঘরে—খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করছিলাম সেখানে," ফরাসী ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ ক'রে বলেন আখিনেয়েভ। কথার খেই হারিয়ে যায় যেন, একটু ইতস্ততঃ করে আবার বলতে সুরু করেন, "আপনি যে মাছ ভালবাসেন তা আমি বিলক্ষণ জানি। এই এত বড় একটা ষ্টার্জন রান্না হয়েছে—প্রায় চার হাত—খেতে যা হবে!...হ্যাঁ, ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম আর কি! রান্নাঘরে ঐ ষ্টার্জনটা নিয়ে ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে। খাবার জিনিষপত্র দেখছিলাম ঘুরে ঘুরে। ষ্টার্জনটার দিকে তাকিয়ে ভারি খুশি হ'ল মনটা—চমৎকার রান্না হয়েছে! দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় আনন্দে একটা আওয়াজ করেছি মুখে আর অমনি ঐ বোকা ভ্যান্‌কিনটা এসে ঢুকল ঘরে আর বললে কিনা...হা হা...বললে কিনা—'তুমি চুমু খাচ্ছিলে লুকিয়ে।' বুঝুন ব্যাপারটা! আমি চুমু খাবো মার্ফাকে—ঐ রাঁধুনী মাগীকে? লোকটার বুদ্ধিসুদ্ধি নেই একেবারে—নিরেট বোকা! মার্ফাকে দেখেছেন তো? মোটা কদর্য্য চেহারা—বাঁদরের মত মুখ—আর ভ্যান্‌কিন বলে কিনা আমি চুমু খেয়েছি ওকে! এমন আহাম্মক আপনি দেখেছেন কোথাও?"

"কার কথা বলছ, আখিনেয়েভ? আহাম্মকটা কে?" এগিয়ে আসতে আসতে প্রশ্ন করেন টারান্টুলোভ।

"ভ্যান্‌কিনের কথা বলছিলাম। খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে গিয়েছিলাম রান্নাঘরে—"

মার্ফা ও ষ্টার্জন ঘটিত কাহিনীটির পুনরুক্তি করেন আখিনেয়েভ।

"ভ্যান্‌কিনের বুদ্ধির বহর দেখে হাসি পায় আমার। কি বদ্ বেয়াক্কেলে লোক বল তো? আমার কি মনে হয় জান? মার্ফাকে চুমু খাওয়ার চেয়ে কুকুরের মুখে চুমু খাওয়া ঢের বেশী তৃপ্তিকর।" কথাটা শেষ ক'রে মুখ ফেরাতেই দেখা হ'ল মাজ্‌রার সঙ্গে।

"ভ্যান্‌কিনের কথা আলোচনা করছিলাম আমরা। অদ্ভুত ঐ লোকটা! রান্নাঘরে ঢুকে ও আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মার্ফার পাশে আর অমনি আজগুবি গল্প বানাতে সুরু করল আমাদের সম্বন্ধে! বলে কিনা আমরা নাকি চুমু খেয়েছি পরস্পরকে!...নেশাটা হয়তো একটু বেশী করেছে আজ, তাই আবোলতাবোল বকতে সুরু করেছে! আমি বললাম ওকে—'আমি বরং হাঁসের মুখে চুমু খেতে রাজী আছি, তবু মার্ফাকে চুমু খাবো না কিছুতেই। তা ছাড়া আমি তো আর অবিবাহিত নই, আমার স্ত্রী বর্ত্তমান—'। ওর জন্যে হাস্যাস্পদ হতে হয়েছে আমায়।"

"কে তোমায় হাস্যাস্পদ করলে হে?" আখিনেয়েভকে জিজ্ঞাসা করেন ধর্ম্মতত্ত্বের শিক্ষক।

"ভ্যান্‌কিন। রান্নাঘরে ষ্টার্জনটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি—"

সমস্ত কাহিনীটা গড় গড় করে বলে যান আখিনেয়েভ। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভ্যানকিন ও ষ্টার্জন সংক্রান্ত কাহিনীটা সকলের কানেই গেল পৌঁছে।

"এখন ও বলুক আমার সম্বন্ধে যা খুশী," মনে মনে বলেন আখিনেয়েভ। "হ্যাঁ, বলুক যত পারে। ও বলতে সুরু করবে আর অমনই ওকে থামিয়ে দেবে লোকে, 'বাজে কথা বলো না আমাদের কাছে। ব্যাপারটা সবই আমরা জানি'।"

আখিনেয়েভ মনে মনে এত খুশি হয়ে উঠলেন যে ভরপুর মদ খাওয়ার পরেও আরও চার গ্লাস ব্র্যাণ্ডি দিলেন নিঃশেষ করে। মেয়েকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে, নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে ওঠার পর ষ্টার্জন-সংক্রান্ত ব্যাপারটা মনেই রইল না তাঁর। কিন্তু হায়, মানুষ ভাবে এক, ঘটে আর! দুষ্ট লোকের জিভ তলোয়ারের মত ধারাল আর তার কর্ম্মতৎপরতাও অসাধারণ। বেচারা আখিনেয়েভের সমস্ত কৌশলই হ'ল ব্যর্থ। এক সপ্তাহ পরের ঘটনা। সেদিন বুধবার, ক্লাসে পড়ান শেষ করে আখিনেয়েভ যখন টিচার্স রুমে এসে ছাত্র ভিসিয়েকিনের অশিষ্ট আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, প্রধান শিক্ষক তাঁর কাছে এগিয়ে এসে ইসারা করে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন এক পাশে।

"দেখুন সার্জে ক্যাপোনিটোনিচ," ঢোক গিলে বলতে সুরু করেন প্রধান শিক্ষক, "ক্ষমা করবেন আমায়। ব্যাপারটা অবশ্য ঠিক সম্পর্কিত নয়, তবু এ সম্বন্ধে কিছু না বলেও পারছি না। এটা আমার কর্ত্তব্য। দেখুন গুজব রটেছে ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে...অর্থাৎ কিনা আপনার রাঁধুনীর সঙ্গে আপনার নাকি অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে। এ ব্যাপারে অবশ্য আমার কিছু বলা সাজে না...ওর সঙ্গে আপনি ঘনিষ্ঠতা করতে পারেন, ওকে চুমু খেতে পারেন, যা খুশি করতে পারেন, তবে আমায়

অনুরোধ, অনুগ্রহ করে অত প্রকাশ্য ভাবে করবেন না। ভুলবেন না যে আপনি ভুলমাষ্টার।"

আখিমেয়েভ নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ—কি যে বলবেন ভেবে পেলেন না। ছুটির পর বাড়ী চললেন অসহ্য জ্বালা নিয়ে—এক ঝাঁক মৌমাছি সর্বাঙ্গে হুল ফুটিয়েছে যেন। পথে যেতে যেতে তাঁর মনে হতে লাগল সারা শহরের লোক কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে—যেন সর্বাঙ্গে আলকাতরা মেখে রাস্তায় বেরিয়েছেন তিনি।

বাড়ীতে পৌঁছেও নিস্তার নেই।

"আজ কিছু খাচ্ছো না যে?" খেতে বসে জিজ্ঞাসা করলে স্ত্রী।—"কি ভাবছ একমনে? প্রণয়-দেবতার কথা বুঝি? মার্ফিকার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছো আজকাল। ভেবেছ কেউ কিছু জানতে পারবে না? সব টের পেয়েছি আমি। ভাগ্যিস্ পাড়ার মেয়েরা বেড়াতে এসেছিল আজ! বুড়ো বয়সে এ আবার কি বিদ্‌ঘুটেপনা!" ঠাস্ করে সে একটা চড় বসিয়ে দিলে আখিমেয়েভের গালে।

খাওয়া শেষ করা হ'ল না, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন আখিমেয়েভ, তারপর টলতে টলতে চললেন ভ্যান্‌কিনের বাড়ীর দিকে—মাথায় যে টুপী নেই, গায়ে কোট নেই সেদিকে খেয়াল নেই তাঁর।

"পাজী বদমায়েশ!" সজোরে ভ্যান্‌কিনের কলারটা ধরে গর্জন ক'রে ওঠেন আখিমেয়েভ—"দুনিয়াশুদ্ধ লোকের কাছে তুমি আমার খাটো করেছ কেন? কেন আমার বদ্‌নাম রটালে মিছামিছি?"

"বদ্‌নাম? আমি রটিয়েছি? কি বলছ তুমি?" ভ্যান্‌কিনের চোখ কপালে ওঠে।

"কে তবে সকলকে বললে যে মার্ফাকে চুমু খেয়েছি আমি? তুমি নও...বল তুমি নও? বেল্লিক...বেয়াদব...ঘুঘু কোথাকার!"

ভ্যান্‌কিন হাঁ করে চেয়ে থাকেন আখিমেয়েভের দিকে—মুখে ফুটে ওঠে একটা অসহায় ব্যাকুলতা। যীশু খ্রীষ্টের মূর্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলেন, "তোমার সম্বন্ধে একটিও কথা যদি আমি কারও কাছে বলে থাকি তা হলে ভগবান যেন শাস্তি দেন আমায়, চোখের দৃষ্টি যেন আমি হারাই, আমার মৃত্যু হয় যেন...আমার ঘর-সংসার যেন ছারখার হয়ে যায়!"

ভ্যান্‌কিনের উক্তির মধ্যে আন্তরিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে আখিমেয়েভের নিন্দা রটায় নি তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

"তবে কে এ কাজ করেছে? কে সে?" পরিচিত সকলেরই মুখ পর্য্যায়ক্রমে ভেসে ওঠে আখিমেয়েভের মনে আর নিষ্ফল আক্রোশে বক্ষে করাঘাত করে বার বার তিনি গর্জন করেন, "কে সে?"*

* রুশ লেখক এ্যাণ্টন শেখভ হইতে

তুমি কি ভুলেছ সবে

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

তুমি কি ভুলেছ সবে—ভারতের ভাগ্যবিধাতা গো,
শতাব্দীর তন্দ্রা ভাঙি আজি তুমি জাগো, তুমি জাগো।
হানো তব সুকঠোর বজ্র, হানো হীন স্বার্থ লাগি
শোষণ করিছে যারা; তিলে তিলে দিবারাত্র জাগি
অসহায় দুঃস্থজনে বিদ্বেষের তীব্র বহ্নি জ্বালি
শ্মশান করিছে গৃহ, ছড়াইছে কলঙ্কের কালি
লুপ্ত করি অতীতের ইতিহাস, গৌরবের গাথা,
যাহারা ভুলেছে তোমা। জয়ঙ্কর হে ভাগ্যবিধাতা,
নির্মম আঘাত হানি রুদ্র তব মৃত্যু-অভিশাপ
তাদের বর্ষণ কর—দূরে যাক সর্ব দুঃখ তাপ।

অভাগিনী পুত্রহীনা অন্নহীনা বস্ত্রহীনা যারা,
শোকতপ্ত বুকে আজও বেঁচে আছে যারা সর্বহারা,
তাদের সান্ত্বনা দাও। তুমি ত ভোল নি মাধবীরে,
অকৃপণ হস্তে তারে পত্র দাও পুষ্প দাও ফিরে,
শিশিরে জাগাও আশা শুষ্ক রিক্ত মৃত ধরণীর,
তোমার অমৃত শক্তি চিরপূর্ণ প্রাণ প্রকৃতির।
শুধু কি ভুলিয়া রবে যারা তব প্রেম-ভালবাসা
অন্তরে জাগায়ে রাখে? চারিদিক দারুণ হতাশা—
কোথা আলো, শান্তি কোথা? সর্ব দুঃখ গ্লানি করি দূর
তোমার আনন্দ-গানে পৃথ্বী পুনঃ করো ভরপুর।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭০—১৮৯৯

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুবৃহৎ সম্ভাবনা লইয়া যাহার জন্ম, অকস্মাৎ কালের নির্মম আঘাতে অকালে তাহার তিরোধান ঘটার মত শোকাবহ ঘটনা পৃথিবীতে বিরল; বাংলা সাহিত্য-সংসার হইতে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরবিদায় এইরূপ একটি শোকাবহ ব্যাপার। তাঁহার অল্পস্থায়ী জীবনেই কয়েকটি কবিতা এবং অনেকগুলি প্রবন্ধের মধ্যে প্রতিভার যে-পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিচিত্র প্রবন্ধে' বাংলা-সাহিত্যে প্রবন্ধ-রচনার যে নবধারার প্রবর্তক, বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিতে সেই ধারার পূর্ণ পরিণতি দেখিতে পাই। আজও পর্য্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে এমন কাব্যময় গদ্য আর কেহ রচনা করিতে পারেন নাই, বস্তুতঃ প্রবন্ধ-সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথ এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, অকালমৃত্যুর জন্য বাংলা-সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার স্পর্শ দিয়া তিনি চিরস্থায়ী ও সর্বজনমান্য আসন দখল করিতে পারেন নাই; যেটুকু তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেই আমরা এক বিপুল সম্ভাবনার আকস্মিক বিনাশের জন্য হাহাকার করিতে পারি।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নবেম্বর (২১ কার্ত্তিক ১২৭৭) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা বীরেন্দ্রনাথ— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র; মাতা প্রফুল্লময়ী—বাঁশবেড়িয়ার কুলীনপ্রধান হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম বর্ষ বয়সে বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজের অষ্টম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।* এখানে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি হেয়ার স্কুলে চলিয়া যান এবং ১৮৮৬ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই সময় তাঁহার বয়স "১৫ বৎসর ৩ মাস" বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে উল্লেখ আছে।

ছাব্বিশ বৎসর বয়সে, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ (২২ মাঘ ১৩০২) তারিখে সাহানা দেবীর সহিত বলেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন।

* বলেন্দ্রনাথের সহপাঠী ও আত্মীয় (জ্যেষ্ঠতাত হেমেন্দ্রনাথের পুত্র) ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন:—"অষ্টম বর্ষ বয়সে তিনি [বলেন্দ্রনাথ] সংস্কৃত কলেজের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। সেই বৎসর ৺মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রথম সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত হন। তৎপূর্ব্বে ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রিন্সিপাল ছিলেন।" ১৮৭৭ সনের মার্চ মাসে প্রসন্নকুমার বহরমপুর কলেজে বদলি হন এবং তাঁহার স্থলে সংস্কৃত কলেজে ন্যায়রত্ন মহাশয় অস্থায়ী ভাবে (officiating) প্রিন্সিপাল হন।

ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন:—"তিনি বাণিজ্য-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। এ বিষয়েও তাঁহার কল্পনা প্রবল ছিল; একটা কিছু মস্ত ব্যাপার করিয়া তুলিব এই আশা তাঁহার মনে অহরহ জাগ্রত ছিল।...বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার এই অর্থকরী বিদ্যার দিকে মনের টান

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গিয়াছিল। স্বদেশী বস্ত্রের কারবারে তিনি প্রথমে হস্তক্ষেপ করেন। এই বাণিজ্যে বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ উভয়ে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও পরে যোগদান করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল পরামর্শদাতা ছিলেন, আমরা দেখিতাম যাহা কিছু করিতেন তাহা বলেন্দ্রনাথই। যাহা হউক, বলেন্দ্রনাথের যত্নেই প্রথম স্বদেশী ভাণ্ডার আদির একরূপ সূত্রপাত হয় বলা যায়। এই সকল বাণিজ্যোপলক্ষে অধিক কায়িক পরিশ্রমই বোধ হয় তাঁহার শারীরিক বলক্ষয় করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহার মনোবলের বড় একটা হ্রাস হয় নাই। তিনি জীবনের শেষ ভাগে আর্য্যসমাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিসে আর্য্যসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলন ও একতা সাধিত হয় তাহার জন্য তাঁহার মনের একাগ্রতা [ছিল]।"†

† "বলেন্দ্রজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়"—গ্রন্থাবলী, পৃ. ৬।

বলেন্দ্রনাথ বন্ধায়ু ছিলেন। মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে, ২০ আগষ্ট ১৮৯৯ (৩ ভাদ্র ১৩০৬) তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রফুল্লময়ীর স্মৃতিকথা

বলেন্দ্রনাথের মাতা প্রফুল্লময়ী দেবী সংক্ষেপে তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই স্মৃতিকথায় পুত্র বলেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। স্মৃতিকথায় সাল-তারিখের এক-আধটু গোল থাকা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। কোন্ সালে এবং কত বৎসর বয়সে বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তাহা তিনি ঠিকমত বলিতে পারেন নাই।—

"সেই বছর ফাল্গুন মাসের ৮ই তারিখে আমার বিবাহ হয়। দিদির বিবাহের দুই বৎসর পরেই ওই বাড়ীতেই মহর্ষির চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল, তখন আমার বয়স বার বৎসর ছয় মাস মাত্র। আশ্বিনের ঝড়ের বছরেই* আমার বিবাহ হয়,···। চার বৎসর বেশ সুখেই কাটিয়াছিল। বিবাহের চার বৎসর পরে আমার স্বামী মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হইয়া সাড়ে তিন বৎসর ওই ভাবে কষ্টে কাটান। আমার বিবাহের পরই তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।†···দিন দিন শরীরের অবস্থা খারাপ হইতে থাকায় আমার শ্বশুর কিছু দিনের জন্ত তাঁহাকে আলিপুর পাগ্‌লাগারদে পাঠাইয়া দেন। সেখানে ছয় মাস থাকিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসেন। সেই সময় আমার শরীর নানা চিন্তায় মধ্যে বড়ই খারাপ হইয়াছিল, তাঁর কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত, মনে কিছুতেই আনন্দ পাইতাম না। পাগ্‌লাগারদ হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছু দিন পরে বলুর (বলেন্দ্রনাথের) জন্ম হয়।···

১২৭৭ সাল ২১শে কার্ত্তিক রবিবার বিকাল ৫টার তার জন্ম হইয়াছিল। সে ভূমিষ্ঠ হইবার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারেই কোনও কান্নার শব্দ পাওয়া যায় নাই, নির্জ্জীব অবস্থায় পড়িয়া ছিল। তাহার পর ডাক্তারেরা নানা উপায়ে তাহাকে কাঁদাইতে সক্ষম হন। আমারও সেই সময় খুবই অসুখ। মাড়ী ছাড়িয়া কয়েক দিন অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছিলাম। আমার নানা রকম মনের অশান্তির মধ্যে ওর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহারও শরীরটা তেমন সুস্থ ছিল না, দুটি পা-ও একটু বাঁকা মতন হইয়াছিল। তাহার দরুন অনেক দিন পর্য্যন্ত পা ঘসিয়া ঘসিয়া চলিত।···

বলু যখন সাড়ে চার বছরের, তখন আমার কাছেই তাহার হাতে খড়ি হয়। তখন হইতে পাঁচ বছর পর্য্যন্ত আমি নিজেই তাকে অল্প অল্প পড়াইতাম। ছয় বছরের সময় তাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলাম। সে তার মামাতো ও জ্যেঠতুতো ভাইদের সঙ্গে আমাদের সরকারী গাড়ীতে করিয়া পড়িতে যাইত, কিন্তু তার পায়ের দোষ থাকায় অন্ত ভাইরা ঠাটা করিত। এই কথা শুনিতে পাইয়া আমি প্রিয়নাথ ডাক্তারের গাড়ী কিছু দিনের জন্ম ভাড়া করিয়া পাঠাইতে লাগিলাম। তাহার পর তার জন্য ঘোড়াগাড়ী কিনিয়া দিয়াছিলাম, সে তাহাতে করিয়া যাইত। বার বছর বয়সের সময় সে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হয় ও পনের বছর বয়সে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেয়। যে বছর বলু বিদ্যালয়ে যায় সেই বছরে আমার শাশুড়ীর মৃত্যু [১১ মার্চ ১৮৭৫]* হইয়াছিল। বলুর বিদ্যালয়ে যাইবার সংবাদ আমার কাছে পাইয়া, তিনি খুবই খুশী হইয়াছিলেন।···

আমাদের এই সব সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া বলু বড় হইতেছিল। বাপের ওই রকম অবস্থা হওয়াতে তার মনে তখন হইতেই একটা বড় হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। যখন আট-নয় বছরের, সেই সময় আমাকে প্রায় বলিত যে, সে লেখাপড়া শিখিয়া ইঞ্জিনিয়ার হইবে। লেখাপড়া তার নিকট একটা প্রিয় বস্তু ছিল, কোনও দিন তাহাতে অবহেলা করে নাই। যখন ওর তের বছর বয়স সেই সময় আমরা একবার শ্রীরামপুরে যাই। সেখানে থাকিবার সময় একদিন একটা মাঝি নৌকায় চড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল "আমার খুড়োখুড়ী পায় না বুড়ী" ইত্যাদি। এই গান শোনার পর হইতেই ওর মনে কি এক রকম ভাব উপস্থিত হয়, তখন হইতে সে প্রায়ই এক-একটা প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে শোনাইত। বুঝিবার মত লেখাপড়া যদিও আমার তেমন জানা ছিল না, কিন্তু তবুও শুনিয়া ভালই লাগিত। তখন হইতেই সাহিত্যের প্রতি তাহার দিন দিন অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বলুর যখন ছাব্বিশ বছর বয়স সেই সময় ডাক্তার ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সাহানা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহে খুবই ঘটা হইয়াছিল।···বলুর বিবাহ ১৩০২ সালে ২২শে মাঘ হয়। বউ যখন ঘরে আসিল তখন এত কষ্ট

---

* ৫ অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখে এই ঝড় হয়। ১২৭১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ:—"গত ২০এ আশ্বিন বুধবার বেলা ১০টা হইতে বেলা ৪॥ পর্য্যন্ত যে প্রবল ঝড় হয়, তাহাতে অনেকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।"

† বীরেন্দ্রনাথ ১৮৬৬ সনে বেঙ্গল একাডেমি হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্নী—সারদা দেবীর মৃত্যু হয় ২৭ ফাল্গুন ১২৮১। ১৭৯৭ শকের বৈশাখ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ:—"৩০ ফাল্গুন শনিবার। মাতায় চতুর্থী শ্রাদ্ধক্রিয়াতে শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর প্রার্থনা।·তিন রাত্রি গত হইল আমার মাতা তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় এলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন।" "ব্রাহ্মমুহূর্তে" সারদা দেবীর মৃত্যু হয় (সৌদামিনী দেবী: "পিতৃস্মৃতি"—'প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩১৮), সুতরাং ইংরেজী-মতে তাঁহার মৃত্যু-তারিখ—১১ মার্চ ১৮৭৫।

ভোগের পর মনে বড় আহ্লাদ হইল, ভাবিলাম এইবার ঈশ্বর আমাকে একটু বুঝি সুখের মুখ দেখাইলেন। সাহানার যখন বিবাহ হয় তখন তাহার বয়স বার পূর্ণ হইয়া তের বছর। মেয়ের রং যদিও শ্যামবর্ণ, কিন্তু চেহারা খুবই সুশ্রী ছিল। স্বভাবটি সরল শিশুর মত, যে যাহা বলিত বা ঠাট্টা করিত, সে তাহাই সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া লইত। আমার কন্যা হয় নাই, সে আমার কন্যার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল।...

একবার আমাকে বলুকে সঙ্গে লইয়া কোন একটি আত্মীয়ের দুটি কন্যার বিবাহ স্থির করিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল। যখন বাড়ীতে ফিরিলাম তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। পথের মধ্যে হঠাৎ শুনিলাম যে, মুসলমান এবং ইংরাজদের ভিতর ভীষণ রকম মারামারি আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমানেরা ইংরাজ দেখিলেই তাহাকে অতি ভয়ানক রকমে মারিতেছে। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জমীর উপর একটা মস্জিদ্ ছিল, সেই মস্জিদ্‌টি ইংরাজের সাহায্যে তিনি ভাঙিয়া ফেলেন। তারই জন্য ইহাদের আক্রোশ। আগে জানিতাম না, রাস্তার মাঝে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিলাম—আমাদের ঘরের গাড়ী ছিল, আমারই এক ভাক্তার নন্দাইয়ের গাড়ীতে সেদিন গিয়াছিলাম। তাহারা কোচম্যানকে প্রথমে কার গাড়ী জিজ্ঞাসা করাতে সে অত বিবেচনা না করিয়া বলে যে 'সাহেবের'। এই কথা বলিবামাত্র অজস্র ধারায় ইট লাঠি সমানে গাড়ীর উপর পড়িতে লাগিল। গাড়ীর কাঁচ ভাঙিয়া চারি দিকে ছিটকাইয়া পড়িল। আমি বলুর মাথাটা আমার বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার পিঠের উপর অনেক ইট আসিয়া পড়িয়াছিল। আমাদের যখন এই অবস্থা, তখন কোচম্যান চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "এ গাড়ী বাঙ্গালীবাবুর—সাহেবের নয়।" তাহারা গাড়ীর নিকটে যখন আসিয়া দেখিল সত্যসত্যই ইহা বাঙ্গালীর গাড়ী তখন নিরস্ত হইল। আমরাও কোন রকমে প্রাণটুকু হাতে লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী আসিয়া তিন-চার দিন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় দুজনে পড়িয়া ছিলাম। সারা দেহে অসহ্য রকম বেদনা এবং তার দরুন যন্ত্রণায় আমার সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার আসিয়া ঔষুধপত্তর ব্যবস্থা করিবার পর ক্রমশঃ আরাম পাই। বলুর কপালের ভিতর একটি ছোট কাঠের টুকরা বিঁধিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল, তার পর আপনা হইতেই সেটা বাহির হইয়া যায়।

পঞ্জাবে আর্য্যসমাজের সহিত আমাদের ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাহাতে মিলন স্থাপন হয়* সেই জন্য তাহার প্রাণের প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং তাহারই জন্য বলু আর্য্যসমাজে যাতায়াত করিতে থাকে, তাঁহারাও তাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যদি কখনও বিবাদ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে বলুকে মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিতেন, এবং সে গিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া মিলন স্থাপন করিয়া আসিত। তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ আর জীবনে ঘটিয়া উঠিল না। দ্বিতীয় বার যখন সে তাঁহাদের টেলিগ্রাম পাইয়া চলিয়া যায় [মাঘ ১৩০৫], সেই দিন আমার মেজ জায়ের কন্যা ইন্দিরার ফুলশয্যা। সেই জন্য সকলেই তাকে যাইতে বারণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের টেলিগ্রাম পাওয়াতে পাছে কর্ত্তব্যের অবহেলা হয় বলিয়া নিষেধ সত্ত্বেও সে চলিয়া গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে মথুরা, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ এবং কাছাকাছি অনেক তীর্থস্থান দর্শন করিয়া আসিল। সীতাকুণ্ডতে স্নান করিবার পর তার কানে খুব যন্ত্রণা হয় এবং তাহা লইয়াই বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। বাড়ী আসার পর নানা রকম সেবা-যত্নে কানের যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সেই সময় ঠাকুর কোম্পানীর হিসাবপত্তর চুকাইবার জন্য তাহাকে শিলাইদহে জমীদারিতে যাইতে হয়। সাহানা ওখানে আমার ছোট জায়ের কাছে ছিল, তাহাকে সেই সময় ওখানে একজন ইংরাজ মাষ্টার পড়াইত। সারা দিনরাত হিসাবপত্র লইয়া বলু এত ব্যস্ত থাকিত যে, সময়মত স্নানাহার তাহার হইত না, কখনও বা বেলা তিনটায় কখনও বা পাঁচটায় খাইত, এইরূপ অনিয়ম হওয়াতে পুনরায় কানের যন্ত্রণা খুব বাড়িয়া উঠে। সে যখন শিলাইদহে, তখন একদিন স্বপ্নে দেখিলাম যে, বলু আমার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "মা, আমার শরীর ভাল নাই।" ইহার পর আমার মন তাহার জন্য আরও অধিক অস্থির হইতে লাগিল। আমি সাহানাকে লিখিলাম যে, তাহাকে আমার কাছে শীঘ্র পাঠাইয়া দাও, আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমার চিন্তার অবধি রহিল না, কিসে সে আরাম হইবে এই কেবল ভাবিতে লাগিলাম। অঘোর ডাক্তার, উমাদাস বাঁড়ুয্যে, ডাক্তার সালজার এই তিন জনে দেখিতে লাগিলেন। তাঁরা আমাকে বলিতেন, যে, ভয়ের কোনও কারণ নাই, ভাল হইয়া যাইবে, কিন্তু আমি কিছুতেই সে ভরসা পাইলাম না। বাড়ীর সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখাইতে চাই কি না, আমার তখন ভাবনা-চিন্তায় মনের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম, কিছুই বলিতে পারিলাম না।

* এই মিলন সাধনের জন্য বলেন্দ্রনাথ ১৮৯৮ সনের যে ও জুলাই মাসে আর্য্যসমাজের সহিত ইংরেজীতে যে পত্রবিনিময় করিয়াছিলেন, ১৮২০ শকের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত দুইখানি পত্রের অনুবাদ পরবর্ত্তী শ্রাবণ-সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

তাঁহারাই তখন সাহেব ডাক্তারকে আনাইয়া দেখান। বলুর অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। যেদিন সে জন্মের মত আমাকে তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া চলিয়া গেল, সেই দিন রবি (আমার ছোট দেওর) এসিয়া আমাকে বলিলেন যে, "তুমি একবার তার কাছে যাও, সে তোমাকে মা, মা করিয়া ডাকিতেছে।" আমি এক এক সময় তাহার যন্ত্রণা দেখিতে না পারিয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। রবির কথা শুনিয়া যখন তার কাছে গিয়া তার পাশে বসিলাম, তখন তাহার সব শেষ হইয়া আসিয়াছে। মনে হইল, আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল, তাহার পর একবার বমি করিয়া সব শেষ হইয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে। সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে তাঁহার কিরণচ্ছটায় পৃথিবীকে সজীব করিয়া তুলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাহার দীপ নিভিয়া গেল।... যেদিন তার মৃত্যু হয় সেই দিন আমার স্বামী ক্রমাগত ঘর আর বাহির করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, চাকরদের নিকট বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "বাড়ীতে সব তালাবন্ধ কেন?" যদিও তখন তিনি উন্মাদ অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁর ভিতরেও পুত্রশোকের দারুণ যন্ত্রণার অনুভব-শক্তি দিয়াছিলেন।

যাহাকে ছাড়িয়া কখনও থাকিতে হইবে একথা মনেও আনিতে পারি নাই, তাহাকে ছাড়িয়া একত্রিশ বছর কাটিয়া গেল। উনত্রিশ বছর বয়সে ১৩০৬ সাল, ৩রা ভাদ্র তাহার মৃত্যু হয়।"—"আমাদের কথা" :—'প্রবাসী', বৈশাখ ১৩৩৭।

রচনাবলী

অল্প বয়স হইতেই বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋতেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—"[সংস্কৃত কলেজের] ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিয়া সংস্কৃত কাব্যরসের আস্বাদ অল্প অল্প লাভ করিলাম। সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম নবম বর্ষ মাত্র। সেই সময়ে আমাদের সাহিত্য রচনার প্রবৃত্তি ঊষাকিরণের রক্তিম আভায় তার প্রথম দেখা দিল। আমরা দুজনেই কোন একটা বিষয় লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিতাম। একই বিষয়ে বলেন্দ্রনাথ লিখিতেন গদ্যে আমি লিখিতাম পদ্যে।" কিশোর বলেন্দ্রনাথ যখন হেয়ার স্কুলের ছাত্র, সেই সময়ে তাঁহার "একরাত্রি" প্রবন্ধটি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-সম্পাদিত 'বালকে' (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, ইং ১৮৮৫) "বালকের রচনা" বলিয়া মুদ্রিত হয়। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা। তাঁহার সাহিত্য-ক্ষমতার প্রতি পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথেরই উৎসাহ-বারি-সিঞ্চনে তাঁহার সাহিত্য-জীবন বিকশিত হইবার সুযোগ লাভ করে।

তরুণ বয়সেই বলেন্দ্রনাথের জীবনাবসান ঘটে। জীবদ্দশায় তিনি মাত্র তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; সেগুলি—

১। চিত্র ও কাব্য (নিবন্ধ)। ৫ ভাদ্র ১৩০১ (২০ আগষ্ট ১৮৯৪)। পৃ. ১১৭।

সূচী:—কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, জয়দেব, পশুপ্রীতি, কাব্যে প্রকৃতি, রবিবর্ম্মা, হিন্দু দেবদেবীর চিত্র।—এই প্রবন্ধগুলি প্রথমে 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে এগুলি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

২। মাধবিকা (কাব্য)। ১০ বৈশাখ ১৩০৩ (২১ এপ্রিল ১৮৯৬)। পৃ. ৩২।

৩। শ্রাবণী (কাব্য)। ৪ আষাঢ় ১৩০৪ (১৭ জুন ১৮৯৭)। পৃ. ২৬।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর আট বৎসর পরে—১৯০৭ সনের আগষ্ট মাসে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-লিখিত ভূমিকা ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "বলেন্দ্রজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" সহ 'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী' (পৃ. ৭৩৫) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থাবলীতে বলেন্দ্রনাথের পুস্তক তিনখানি ও নানা মাসিকপত্রে প্রকাশিত রচনাগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত অনুসন্ধানের অভাবে কতকগুলি রচনা ইহাতে বাদ পড়িয়াছে। এই গ্রন্থাবলীর একটি ত্রুটি সম্বন্ধে সঙ্কলনকর্ত্তা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নিজেই বলিয়াছেন, "রচনার কালানুক্রমে সঙ্কলন করিলেও লেখকের শক্তির ও মতামতের ক্রম-পরিণতি বুঝিবার সাহায্য ঘটিত; কিন্তু তাহাও ঘটিয়া উঠে নাই।" এমন কি পুনর্মুদ্রিত রচনাগুলি কোন্ পত্রিকার কোন্ সংখ্যা হইতে গৃহীত, তাহার নির্দ্দেশও গ্রন্থাবলীতে পাইবার উপায় নাই। স্থানাভাবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা কেবল যে-রচনাগুলি গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই, তাহারই উল্লেখ করিতেছি:—

১। কল্লোলিনী (কবিতা)— 'ভারতী ও বালক', জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭

২। বিজ্ঞতা (কবিতা)— 'সাহিত্য', আষাঢ় ১২৯৭

৩। কবি ও সেন্টিমেণ্ট্যাল— 'সাহিত্য', জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮

৪। প্র্যাক্টিক্যাল— 'সাহিত্য', ভাদ্র ১২৯৮

৫। লণ্ডনে কংগ্রেস— 'ভারতী ও বালক', ভাদ্র ১২৯৮

৬। রবিবর্ম্মা (অসমাপ্ত); লাহোরের বর্ণনা (অসমাপ্ত); শিবসুন্দর*— 'প্রদীপ', আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০৬

* রবীন্দ্রনাথ এই রচনাটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"বলেন্দ্র কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার বিষয় প্রসঙ্গ লইয়া

সম্প্রতি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩) বলেন্দ্রনাথের তিনটি ছোট কবিতা—"সৌরভ", "হুঙ্কার" ও "বিদায়" প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত "পারিবারিক-স্মৃতিলিপি-পুস্তক" অনুসন্ধান করিলেও হয়ত তাঁহার কিছু অপ্রকাশিত রচনা মিলিতে পারে।

ব্রহ্মসঙ্গীত

সঙ্গীত-রচনাতেও বলেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত দুইটি গান 'ব্রহ্মসঙ্গীত' পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। গান দুইটি—

(১)

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়!
জগত শিশুর মত চরণে ঘুমায়ে রয়!
অভিমান অহঙ্কার মুছে গেছে নাহি আর,
ঘুচে গেছে শোক তাপ, নাহি দুঃখ নাহি ভয়!
কোটি রবি শশী তারা, তোমাতে হয়েছে হারা,
অযুত কিরণ-ধারা তোমাতে পাইছে লয়!

(২)

নিশীথ নিদ্রার মাঝে জাগে কার আঁখি-তারা,
সুপ্ত লোক লোকান্তরে সে আঁখি নিমেষহারা!
শ্বাসহীন মহাপ্রাণ মহাকাশে ভাসমান,
অচেতন বিশ্বে বহে অনন্ত চেতনা-ধারা।
ছাড় যোগী নিদ্রাবেশ, হের আঁখি অনিমেষ,
মিল' সে জাগ্রত প্রাণে, ভাঙ এ কুহক-কারা।

বলেন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে মনীষী প্রিয়নাথ সেন আলোচনা করেন। এই আলোচনা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রদীপে' (আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০৬) প্রকাশিত হয়। আমরা উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মাত্রেই শোক-সন্তপ্ত হইয়াছেন। প্রথম হইতেই তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা-শক্তি বঙ্গীয় পাঠককে মুগ্ধ করিয়াছে। কি গদ্যে—কি পদ্যে তাঁহার একটি অভিনব সুন্দর মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রথম গদ্য-প্রবন্ধে—তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তকে বিকাশোন্মুখ প্রতিভার নবীন উন্মেষ পরিণত ভাষা ও ছন্দে প্রকাশিত। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিশোর প্রতিভা প্রায়ই পূর্ব্বতন আচার্য্য-দিগের পদানুসরণ করে। আমরা তাহার তরুণ কণ্ঠস্বরে পরিচিত পুরাতন স্বরভঙ্গী শুনিতে পাই—ভাষা-গঠনে পরিচিত শব্দবিন্যাসপদ্ধতি দেখিতে পাই—এবং ছন্দ-রচনায় পূর্ব্বতন কবিদিগের শিল্পচাতুর্য্য অনুভব করি। বলেন্দ্রনাথের ইহা কম প্রশংসার কথা নয় যে প্রথম হইতেই তাঁহার রচনা-প্রণালী তাঁহার নিজের এবং তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার ইহা অপেক্ষা আর স্পষ্ট নিদর্শন কি থাকিতে পারে যে, যখন সমস্ত বঙ্গদেশ রবীন্দ্রনাথের বীণাঝঙ্কারে কম্পিত উচ্ছ্বসিত—যখন যে কোন আধুনিক কবিতা পড়িবে তাহারই ভিতর অল্প বা অধিক পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, ভাব, ভাষা বা ভঙ্গীর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে, বলেন্দ্রনাথ তাঁহার ঘরের—তাঁহার সেই শিক্ষা-গুরুর প্রভাব হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। আমি এমন বলিতেছি না যে বলেন্দ্রনাথের গদ্যে বা পদ্যে রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাবই লক্ষিত হয় না। পরবর্ত্তী লেখককে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পূর্ব্বতন সম্পন্ন লেখকের নিকট কিছু না কিছু পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইতেই হইবে। তবে যাঁহার মূলধন আছে, প্রকৃতির হাত হইতে যিনি কোনরূপ বিশেষত্ব পাইয়াছেন, বিলম্বে অবিলম্বে তাঁহার প্রতিভা-গৌরব স্বাধীন আকারে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। বলেন্দ্রনাথের সেই বিশেষত্ব ছিল। কল কথা, তিনি জন্মকবি—আজন্ম রচনা-রসিক (stylist)। গদ্যে এবং পদ্যে উভয়েই তাঁহার নিজত্ব ছিল—এবং উভয়েই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গদ্যে তিনি যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন পদ্যে আজও তাহা পারেন নাই। ইহার অর্থ নয় যে, তাঁহার ছন্দোময়ী রচনা অপরিণত বা অসম্পূর্ণ। আমার বক্তব্য এই যে গদ্যের সকল পর্দ্দাই তাঁহার ক্ষমতার অধীন ছিল—গদ্যের এমন কোন রহস্য বা ভঙ্গী নাই যাহা তাঁহার লেখনীর আয়ত্ত ছিল না। কিন্তু তাঁহার পদ্য সম্বন্ধে আমরা ঠিক এ কথা বলিতে পারি না। তাঁহার পদ্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেও আমাদের মনে হয় কবির অন্তর্লীন ক্ষমতা এখনও সমস্ত বিকাশ পায় নাই এবং কালে এই সৌন্দর্য্য পরিসরে আরও বিস্তৃত হইবে—ইহার গভীরতা আরও বাড়িবে এবং ইহার ঝঙ্কার ও উন্মাদনা আরও বৈচিত্র্য লাভ করিবে। গদ্য এবং পদ্যের মৌলিক বিভিন্নতা কিন্তু এইরূপ ভাবিবার অপর কারণ। গদ্যের শক্তি ও উৎকর্ষের সীমা আছে—পদ্যের নাই। গদ্যে মানব-হৃদয়ের সমস্ত উচ্চতার 'নাগাল' পায় না—গভীরতার 'থৈ' পায় না—সৌন্দর্য্যের সমস্ত উচ্ছ্বাস, ললিত-তরঙ্গ ধরিতে পারে না—জীবনের অসীম বিস্তৃতি ব্যাপিতে পারে না। কিন্তু মিল ও ছন্দে—ঝঙ্কার, উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনায়—কমনীয়তায় ও নমনীয়তায় পদ্য জীবনের সমস্ত অনির্দ্দেশ্য পরিধি তাঁহার আলোকময়ী

আমার সহিত আলোচনা করিতেন। প্রদীপের জন্য যে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার বিষয়টিও আমার অগোচর ছিল না। তাহা ছাড়া নিজের স্মরণার্থ সঙ্কলিত প্রবন্ধের ভাবসূচনাগুলি তিনি স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অসমাপ্ত লেখা ও সূচনাগুলির সাহায্য লইয়া যথাসম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় প্রবন্ধটি সংক্ষেপে সম্পূর্ণ করিয়া সেই সত্যসঙ্কল্প মহদাশয়কে 'প্রদীপ' সম্পাদকের নিকট ঋণমুক্ত করিলাম।"

গতির চারু বিকম্পনে উজ্জ্বল ও উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে। একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি ও প্রথম শ্রেণীর গদ্য-লেখক সত্যই বলিয়াছে যে পদ্যের পক্ষ ও চরণ দু-ই আছে—কিন্তু গদ্যের পক্ষ নাই কেবলমাত্র চরণ আছে। বলেন্দ্রনাথের গদ্যপাঠে আমরা পরিতৃপ্ত হই। গদ্যপাঠে আনন্দলাভ করিলেও, আরও উচ্চতর রচনার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

'ভারতী'তে কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া গদ্যে বলেন্দ্রনাথ একখানি পুস্তক 'চিত্র ও কাব্য' এবং পদ্যে 'মাধবিকা' এবং 'শ্রাবণী' নামে দুইখানি পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন।

'চিত্র ও কাব্য' সাহিত্য ও ললিতকলা-বিষয়িণী সমালোচনা। এই সকল প্রবন্ধে তরুণ লেখকের রস-গ্রাহিতা-শক্তি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—ততোধিক আশ্চর্য্য হইতে হয় ভাবোচ্ছল ভাষার কলাকুশল সংযম দেখিলে। লেখার ভিতর বুদ্ধির কোন প্যাঁচ নাই—পাণ্ডিত্য-প্রকাশের কোন প্রয়াস নাই—চকচকে কথা বা কল্পনা লইয়া খেলা নাই। কেবল কাব্য ও কলা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ তন্ময় হৃদয়ের বিভোরতা আছে। এই গ্রন্থে কালিদাস ভবভূতি ও জয়দেব প্রভৃতি কবির কাব্য-সমালোচনায় তাঁহাদিগের প্রতিভার স্বরূপ অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে নির্ণীত হইয়াছে। কাব্যোপভোগ-জনিত আনন্দের সহিত অমৃত-মিশ্রণে প্রোজ্জ্বল ও প্রস্ফুটিত অতি সহজ সরল যুক্তি সকল হৃদয়কে মধুর আকর্ষণে সত্য ও সৌন্দর্য্যের কনক মন্দিরে উপনীত করে। গ্রন্থের ভিতর কোথাও দেখিলাম না মিথ্যা বাকচাতুরীর জালে চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্য সকলের মর্য্যাদা লোপ করিয়া তাহাদের স্থানে উৎকট অভিনব মত-স্থাপনের চেষ্টা—এবং রস ও সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রধান অন্তরায় কাব্যকলার তত্ত্বোদ্ভাবন-রূপ হালের আমদানী রোগ এ সুস্থ লেখকের লেখায় স্থান পায় নাই।

জয়দেব সম্বন্ধে প্রবন্ধটি কাব্য-সমালোচনার আদর্শ। রসগ্রাহী লেখক জয়দেবের দোষ ও গুণের মর্ম্মস্থান দেখাইয়া দিয়াছেন। "গীত-গোবিন্দ" যে প্রকৃত গীত—তাহার ভাব-দরিদ্র, বিরল-চিত্র পদাবলী কাব্যাংশে তেমন উপাদেয় না হইলেও তাহাদের কোমল-কান্ত শব্দ-বিন্যাস এবং বিচিত্র ঝঙ্কার যে গানের সর্ব্বথা উপযুক্ত ইহা দেখাইয়া সন্দিহান পাঠককে জয়দেবের গানের প্রকৃত গৌরব এবং অসাধারণ উৎকর্ষ বুঝাইয়াছেন, এবং অপর দিকে দেখাইয়াছেন বিলাসকলাবর্ণনা-পটু কবির গীতের কোথাও প্রেমের অসীম স্বরূপ প্রতিভাত হয় নাই—কবিসুলভ স্বাভাবিক আত্মবিস্মৃতি তাঁহার কাব্যকে উজ্জ্বল পবিত্র করে নাই।

প্রবন্ধান্তরে ঐরূপই সুন্দর যুক্তি ও ভাষায় লেখক বুঝাইয়াছেন কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা প্রকৃতির মহান্ ও বিরাট রূপবর্ণনে কেন অকৃতকার্য্য, এবং ভবভূতিই বা কেন একটি "মেঘমন্দ্র সমাসে"—নিবিড় শব্দ-যোজনায় তাহাতে সিদ্ধহস্ত।

চিত্র ও কাব্যে আর একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা আছে—ললিত কলার (Fine arts) আলোচনা। ভারতবর্ষ হইতে অনেক দিনই ভাস্কর্য্য ও চিত্র বিদ্যার তিরোধান হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অমোঘ নিয়মবলে ঐ সকল বিষয়ে আমাদের রসাস্বাদনশক্তিও লোপ পাইয়াছে। আজকাল আবার রবিবর্ম্মা—ক্রমে প্রভৃতির শিল্পচাতুর্য্যে এই দীন দেশের পূর্ব্ব গৌরব জাগ্রত হইবার সূচনা দেখিতেছি। এই পুস্তকে এবং অন্যত্র বলেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক গুণগ্রাহিতাবলে তাহাদের নবীন প্রতিভার যথোচিত আদর করিয়াছেন।

'ভারতী'তে প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের যে সকল গদ্য প্রবন্ধ এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই, ভাব-গৌরবে ও রচনা-সৌন্দর্য্যে তাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়। সে গদ্য সকল কথা কহিতে জানে, সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারে। তাহার অভিধান যেমন বিস্তৃত, তাহার ছন্দও তেমনই সুমধুর। শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা—এক একটি কথা এক একটি চিত্র—এমন পূর্ণপ্রাণ পূর্ণ-অবয়ব কথা বাঙ্গালা গদ্যে কোথাও দেখি নাই। এই বিস্তৃত অভিধান ভাষার অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে—সে ভাষা কোথাও নিতান্ত সহজ, সরল, শুভ্র গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গণের ন্যায় অলঙ্কারশূন্য—কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—কোথাও প্রচ্ছন্ন সরসীর ন্যায় স্বচ্ছ স্নিগ্ধ—কোথাও পুষ্পবাটিকার ন্যায় বিবিধ ফলপুষ্পাভরণে বিচিত্র—এবং কোথাও নক্ষত্র-নিবিড় অনন্ত নৈশ গগনের ন্যায় সমুজ্জ্বল। 'বসুমতী'র লেখক যে বলিয়াছেন, "বলেন্দ্র সুলেখক;—সুলেখকই নয়, অমন গদ্য লেখা বুঝি আর পড়ি নাই; তেমন শব্দ-লালিত্য, ভাব-মাধুর্য্য অলঙ্কারের সামঞ্জস্য অনেক সময়ে খুল্লতাত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেখাইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ" ইহা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়।

বলেন্দ্রনাথের পদ্যগ্রন্থ দুইখানির একটি বিচিত্র আকর্ষণ—অপূর্ব্ব সম্মোহনী আছে। ইহাদের মধ্যে যে কবিতাটিই পড়িবে তাহারই ভিতর শুনিতে পাইবে এক নূতন কণ্ঠ, নূতন সুর। এরূপ কণ্ঠস্বর পূর্ব্বে শ্রুত হয় নাই। গদ্যে বলেন্দ্র-নাথের সমীচীন প্রাধান্য ও বিশেষত্ব থাকিলেও তাঁহার মৌলিকতা পদ্যে, কবিতায়। এই সিদ্ধহস্ত গদ্য-লেখক, মূলে কবি। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, বলেন্দ্রনাথের এক একটি কথা এক একখানি চিত্র, তাহার অর্থই এই। গদ্যরচনায় রবীন্দ্র-নাথ অল্প বা অধিক পরিমাণে তাঁহার কলম দোরস্ত করিয়া দিতে পারেন, তাঁহার স্বাভাবিক শক্তির উদ্বোধনে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু পদ্যে একা প্রকৃতি নিজেই তাঁহার শিক্ষক। এই সকল কবিতার বিষয় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, কিন্তু ইহাদের কবিত্ব ও কল্পনা নিতান্ত অন্তরের। গোলাপ বা পদ্মের সৌন্দর্য্যগৌরব ইহাদের নাই, কিন্তু বকুল বা কামিনীর মৃদু সৌরভ আছে। যাহাদের এই সকল কবিতা ভাল লাগিবে, তাহাদের বড়ই ভাল লাগিবে। ইহাদের মধুরিমার মোহ সহসা ছাড়ে না।

এই দুই পুস্তকে বসন্ত ও বর্ষার বিভিন্ন শোভা ও বিচিত্র প্রভাবের মধ্যে কবির অন্তরের প্রেম আর অন্তরতমা সুন্দরী "দিশে দিশে গীতে গন্ধে" মঞ্জরিত। বিরহে মিলনে, অন্তরে বাহিরে, শয়নগৃহে, নদীবক্ষে—প্রেমের সেই নিত্য নব বসন্তোৎসব—আর হৃদয়ের সেই বর্ষা-ঘন নিবিড় অনুরাগ। কিন্তু এ সুন্দরীর অবস্থান কোথায়—ইহার নাম কি? হৃদয়ের অন্তঃপুরে—কল্পনার দোলায় বাস এবং নাম মানসী। এক কথায় কবি তাঁহার হৃদয়বাসিনীকে সকল সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে—সকল বিলাস-কলার শোভায় মণ্ডিত করিয়াছেন— "একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি"।

কালিদাসের 'ঋতুসংহারে'র সহিত 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী'র কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে—কিন্তু 'ঋতুসংহারে' বৈচিত্র্যের বড়ই অভাব। তাহার অনেক কবিতার ভিতরই একই ভাব, একই বিষয়, কেবল ভাষা বিভিন্ন। কিন্তু এই দুই পুস্তকের প্রত্যেক কবিতারই প্রাধান্য আছে। তাহা ছাড়া 'ঋতুসংহার' বাহ্যশোভা বর্ণনেই পরিপূর্ণ। এই দুই পুস্তকের কবিতা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিতান্ত অন্তরের। ইহাদের ভিতর একটি প্রেমমুগ্ধ হৃদয় জাগ্রত। ইহাদের ভাষা ও ছন্দ সুন্দর ও পরিপাটি। প্রথম কবিতাপুস্তকে এমন পাকা হাত প্রায়ই দেখা যায় না। স্বচ্ছ সরল ভাষার অন্তরে কল্পনার স্বর্ণ-রেণু চিক্ চিক্ করিতেছে।

প্রতিভার আর একটি মনোহর এবং প্রকৃত লক্ষণ বলেন্দ্রনাথে বিদ্যমান—নির্ভীকতা। সমালোচনায় বা মৌলিক রচনায় যখন যাহা তিনি অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, বিনা সংশয়-সঙ্কোচে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এ নির্ভীকতা ক্ষমতার পরিচায়ক এবং প্রথম শ্রেণীর কলা-প্রবীণের স্বভাবগত ধর্ম্ম।

সাহিত্যে এমন অনুরাগ এমন অপূর্ব্ব ক্ষমতার অকাল অবসানে বাঙ্গালা ভাষার, বিশেষতঃ অভিনব ও উপচীয়মান বাঙ্গালা গদ্যের যে সুমহান্ ক্ষতি হইয়াছে তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে।"

রচনার নিদর্শন

বলেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল দেখাইবার জন্য আমরা তাঁহার "কণারক (উড়িষ্যার সূর্য্যমন্দির)" প্রবন্ধ হইতে অংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

"কণারকে এখন কিছুই নাই, ধু ধু প্রান্তরমধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধি-মন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন—যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্য্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণের আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিত। তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোণার্কমন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত; এবং দেবতার যশঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে, দ্বারের সম্মুখে, সিন্দূরচর্চ্চিত-সেবিত প্রাচীন কল্পবটমূলে শত সহস্র যাত্রী—কত দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আসিয়াছে। একবার যদি সূর্য্যদেবের অনুগ্রহ হয়, একবার যদি মহাদ্যুতি আপন কনক কিরণে সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা হরণ করিয়া লয়েন।......

পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জ্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, ছিন্ন শিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লিমুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিকজন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্নসূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে।— কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবাল-শয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে—এবং অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়।"—'সাধনা', ভাদ্র ১৩০০।

বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ ও ধর্ষণ সম্বন্ধে স্মৃতির বিধান

শ্রীরমা চৌধুরী

নোয়াখালির মর্মান্তিক ব্যাপারের পর আজ হিন্দুসমাজ এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কারণ নোয়াখালির ঘটনাবলীকে সাধারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর্যায়ে ফেলা চলে না। সাধারণ দাঙ্গায় যে সব ঘটনা ঘটে, যেমন নরহত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন প্রভৃতি, সে সব ছাড়াও যে দুটি ব্যাপারে সকলেই বিক্ষুব্ধ হয়েছেন সে দুটি হ'ল বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ এবং বিবাহ বা ধর্ষণ। বলা বাহুল্য যে, বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণের কোনই অর্থ বা মূল্য নেই। পৃথিবীর কোনো ধর্মই এটা অনুমোদন করে না। সেজন্য এটা সম্পূর্ণরূপে ইস্লাম ধর্মবিরোধী, এবং প্রত্যেক চিন্তাশীল মুসলমানই এক বাক্যে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ধর্ম মনের জিনিষ—বুদ্ধি দিয়ে বুঝে, হৃদয় দিয়ে অনুভব ক'রে, স্বেচ্ছাক্রমে যা গ্রহণ করা হয় তাই কেবল হতে পারে মানুষের প্রকৃত ধর্ম। কিন্তু প্রাণের ভয় দেখিয়ে, বলপূর্বক নিষিদ্ধ মাংস প্রভৃতি ভোজন করিয়ে, অর্থহীন কতকগুলি আচারানুষ্ঠান করতে বাধ্য করিয়ে যে ধর্মগ্রহণ করান হয়, তাকে 'ধর্ম' নামে অভিহিত করাই মূঢ়তা মাত্র। বলপূর্বক বিবাহ বা ধর্ষণের সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। ধর্মের মত সতীত্বও মনের ধর্ম। পশুপ্রকৃতির দুরাত্মাদের অত্যাচারে নারীর দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতার কণামাত্র হানি হয় না, এ ত স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে, অতীতে আমাদের এই হিন্দুসমাজই এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যকেই অবহেলা ক'রে, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত নরনারী এবং বলপূর্বক বিবাহিতা বা ধর্ষিতা নারীদের অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে ত্যাগ করেছে। যুক্তি, ন্যায়, দয়া—সমস্ত কিছুই বিসর্জন দিয়ে তৎকালীন সমাজপতিরা কেন এরূপ অদ্ভুত নিয়মের প্রচলন করেছিলেন, সে আলোচনা আজ আর করে লাভ নেই। কিন্তু তাঁদের সেই দুর্বুদ্ধিপ্রসূত বিধানের জন্যই যে শত শত বৎসর পরেও আজ এরূপ পৈশাচিক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হতে পারল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিন্দু নরনারীদের ধর্মান্তরিত করা এবং হিন্দু নারীদের বিবাহ করে স্বসমাজভুক্ত করা এত সহজ বলেই ত দুর্বৃত্তেরা এ বিষয়ে এত সাহস করতে পারে। যদি তারা জানত যে হিন্দু সমাজ এদের ত্যাগ করবে না, বরং সাদরে স্থান দেবে, তা হলে নিশ্চয় তারা এ সব করাকে পণ্ডশ্রম বলেই গণ্য করে এ থেকে নিবৃত্ত হ'ত।

যা হোক, অতি সুখের বিষয় যে, অতীতে হিন্দুসমাজ এই প্রকার নিরপরাধদের প্রতি ঘোরতর অন্যায় করে থাকলেও বর্তমানে তার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। প্রবাদ আছে যে, প্রতি অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের বীজও নিহিত থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অতি প্রচণ্ড আঘাতে আজ হিন্দুসমাজের যুগযুগান্তব্যাপী জড়তা ও মূঢ়তা অনেকাংশে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, এবং ফলে সমাজ-সংস্কার ও প্রগতির পন্থা আজ সুগম হয়ে এসেছে। নোয়াখালির ঘটনাবলীর অব্যবহিত পরেই নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভা সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছেন যে, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হিন্দু নরনারী ও বলপূর্বক বিবাহিতা বা ধর্ষিতা হিন্দু নারীরা 'হিন্দুই' আছেন, এবং তাঁদের দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতার কোনই হানি হয় নি বলে তাঁদের কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন নেই। এই বিধান যে সর্বতোভাবে ন্যায়ধর্মানুমোদিত, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যুগযুগান্তব্যাপী সংস্কারের উচ্ছেদ এক দিনে হবার নয়। সেজন্য আজ সমাজ তাঁদের সাদরে আহ্বান করলেও, ধর্মান্তরিত নরনারী ও অপহৃতা নারীদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের অশুচি মনে ক'রে সমাজের বাইরেই থাকতে চাইছেন। এমন খবরও শোনা গেছে যে উদ্ধারপ্রাপ্তা নারীরা কয়েকজন হিন্দুসমাজে ফিরে আসতে অস্বীকৃতা হয়েছেন, যাতে তাঁদের পরিবার তাঁদের অশুচিসংস্পর্শে বিপদ্গ্রস্ত না হন। এঁদের মানসিক শান্তির জন্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা বিধান দিয়েছেন যে প্রকৃতপক্ষে সমাজের দিক থেকে তাঁদের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন না হলেও, তাঁরা তাঁদের নিজেদের দিক থেকে নিজেদের অশুচি বলে মনে করলে গঙ্গাস্নান বা সহস্রবার নামজপ প্রভৃতি নাম মাত্র প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন। যাঁরা প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত মানসিক শান্তি পাবেন না তাঁদের জন্য এই বিধানও যে সময়োপযোগী হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

অতীতের সমাজ-ব্যবস্থায় বলপূর্বক ধর্মান্তরিত নরনারী ও বলপূর্বক বিবাহিতা বা ধর্ষিতা নারীদের সাধারণতঃ সমাজে স্থান না থাকলেও আমাদের পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের কয়েকটি স্থানে সুস্পষ্ট বলা আছে যে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত ও ধর্ষিতাদের কোন অপরাধ হতে পারে না। কোনো কোনো স্মৃতিকার এঁদের জন্য নানারূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও করে তাঁদের সমাজে স্থান দিয়েছেন। বর্তমানে আমাদের দেশে সংস্কৃতের চর্চা বহুলাংশে হ্রাস পাওয়ায়, এবং স্মৃতিশাস্ত্রাদির মুদ্রিত সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এ সম্বন্ধে সাধারণের অনেকেই কিছু জানেন না। সেজন্য এরূপ কয়েকটি বচন সংগ্রহ করে বঙ্গানুবাদ সহ এ স্থলে সন্নিবিষ্ট করা হ'ল।

মহাভারত

মহাভারতের শান্তিপর্বভুক্ত মোক্ষধর্ম পর্বে কয়েকটি সুন্দর শ্লোক আছে। এই শ্লোকগুলিতে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, নারীরা পুরুষের প্রতি নির্ভরশীলা বলে, নারীদের কোন অপরাধ হতে পারে না, সব অপরাধ কেবল পুরুষেরই। অর্থাৎ, সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষই যখন নারীর ভরণপোষণ ও রক্ষণা-

রক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন, তখন পুরুষের ত্রুটি বা অক্ষমতার জন্য নারীর বিপদ ঘটলে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী পুরুষই, নারী কেন সেজন্য সামাজিক দণ্ড ভোগ করবে? এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার নীলকণ্ঠ আরো স্পষ্ট করে বলেছেন যে, বলপূর্বক ধর্ষিতা নারী সম্পূর্ণ নিরপরাধ; এমন কি, ব্যভিচারিণী নারীকেও কোন দণ্ড সমাজ দিতে পারে না, কারণ এ ক্ষেত্রেও পুরুষই প্রথম নারীকে প্রলোভিত করেন বলে, সব দোষ কেবল পুরুষেরই। শ্লোকগুলি নিম্নলিখিত রূপ:—

মূল সংস্কৃত:—"পাণিবন্ধনং স্বয়ং কৃত্বা সহধর্মমুপেত্য চ। যদা যাস্যন্তি পুরুষাঃ স্ত্রিয়ো নার্হন্তি যাচিতাম্॥ ভরণাদ্ধি স্ত্রিয়ো ভর্তা পাত্যাচ্চৈব স্ত্রিয়ঃ পতিঃ। গুণস্যাস্য নিবৃত্তৌ তু ন ভর্তা ন পুনঃ পতিঃ॥ এবং স্ত্রী নাপরাধ্নোতি নর এবাপরাধ্যতি। ব্যুচ্চরংশ্চ মহাদোষং নর এবাপরাধ্যতি॥ স্ত্রিয়া হি পরমো ভর্তা দৈবতং পরমং স্মৃতম্। তস্যাত্মনা তু সদৃশমাত্মানং পরমং দদৌ॥ নাপরাধোঽস্তি নারীণাং নর এবাপরাধ্যতি। সর্বকার্যাপরাধ্যত্বান্নাপরাধ্যন্তি চাঙ্গনাঃ॥" (শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম, ২৬৫ অধ্যায়, শ্লোক ৩৭—৪০)

নীলকণ্ঠকৃত টীকা—"নন্ বাভিচারিণী স্ত্রীহন্তব্যৈবান্যথা কুলসঙ্করাপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ— এবমিতি। এবমপীত্যর্থঃ। ব্যুচ্চরন্নাচরন্ মহাদোষং পারদার্যম্; যদি প্রার্থয়িতৈব ন স্যাত্তর্হি নায়ং দোষঃ প্রসজ্যেতাতঃ প্রথম প্রবৃত্তে পুংস্যেবায়ং দোষ ইত্যর্থঃ। নন্ স্ত্রিয়া অপি তদনুমোদনাদপরাধোঽস্ত্যেবেত্যাশঙ্ক্যাহ স্ত্রিয়া হীতি। তস্যাত্মনা শরীরেণ সদৃশমন্যমালোক্য আত্মানং শরীরং পরমং শ্রেষ্ঠং দদৌ স্বপতিবেষেণাগতায় পরস্মৈ পতিবুদ্ধ্যা শরীরং প্রযচ্ছন্ত্যা মম মাতুর্ন ব্যভিচারদোষোঽস্তি গর্ভাস্যৎপত্তেঃ কুলসঙ্করো ভাবাচ্চ নেয়ং বধ্যেত্যর্থঃ। উপসংহরতি নাপরাধ ইতি। কিঞ্চ সর্বেষু কার্যেষ্বপরাধ্যত্বাদস্বতন্ত্রত্বাদবলত্বেন সর্বথা পুরুষাধীনত্বাৎ। তথা চ বলাৎকারকৃতে ব্যভিচারাদৌ স্ত্রিয়ো নাপরাধ্যন্তীত্যর্থঃ॥"

বঙ্গানুবাদ:—"এক নারীর পাণিগ্রহণ করে এবং তাঁকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করে যদ পুরুষ পরদারগামী হন, তা হলে তিনি স্ত্রীর নিকট পূজনীয়ও আর থাকেন না। ভরণপোষণ করেন বলেই তিনি (স্বামী) স্ত্রীর 'ভর্তা', এবং পালন করেন বলেই তিনি স্ত্রীর 'পতি'। এই গুণের নিবৃত্তি হলে তিনি 'ভর্তা'ও থাকেন না, 'পতি'ও থাকেন না। এরূপে স্ত্রীর কোনো অপরাধ হয় না, কেবল পুরুষেরই অপরাধ হয়। মহাদোষ অনুষ্ঠিত হলেও, কেবল পুরুষেরই অপরাধ হয়। ভর্তাই স্ত্রীর পরম দেবতা—স্মৃতির এই মত। (অহল্যা) পতি জ্ঞানেই (ইন্দ্রকে) আত্মদান করেছিলেন, (সেজন্য তাঁর কোন দোষ হয় নি)। নারীর কোন অপরাধ নেই, পুরুষই অপরাধ করেন। সর্বব্যাপারে পুরুষাধীন বলে নারীদের কোন অপরাধ হতে পারে না।"

টীকা:—"ব্যভিচারিণী স্ত্রী নিশ্চয়ই হত্যার যোগ্য, নতুবা কুলসঙ্করের উৎপত্তি হবে—এই মতের নিরসনের জন্য বলা হচ্ছে যে, পরদারগমন রূপ মহাদোষে পুরুষেরই অপরাধ হয়, কারণ নারীকে পুরুষ প্রার্থনা করেন বলেই এই মহাদোষ ঘটে। সুতরাং (এই দুষ্কার্যে) পুরুষই প্রথম প্রবৃত্ত হয় বলে এই দোষ পুরুষেরই। যদি বলা হয় যে, নারীরও এই কার্যে অনুমোদন আছে ব'লে তাঁরও অপরাধ হয়—তার উত্তর এই যে, নারী পতিজ্ঞানেই পরপুরুষকে আত্মদান করেন বলে তিনি ব্যভিচারিণী হন না। এইজন্য উপসংহারে বলা হচ্ছে যে, নারীর কোন অপরাধ হয় না। বস্তুতঃ, সর্বকার্যে নারী পুরুষের অধীন ব'লে বলাৎকারকৃত ব্যভিচারাদিতে নারীদের কোন অপরাধ হয় না।"

মহাভারতে অপর এক স্থলে বলা আছে;—"ন তু স্ত্রিয়া ভবেদ্দোষো ন তু সা তেন লিপ্যতে॥ ভোজনং হন্তরা শুদ্ধং চাতুর্মাস্যো বিধীয়তে। স্ত্রিয়স্তেন প্রশুধ্যন্তি ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ॥ স্ত্রিয়াস্ত্বাশঙ্কিতাঃ পাপাঃ নোপগম্যা বিজানতা। রজসা তা বিশুধ্যন্তে ভস্মনা ভাজনং যথা॥" (শান্তিপর্ব, রাজধর্মপর্ব, ৩৫.২৮–৩০)।

অর্থাৎ "নারীর কোনো দোষ হয় না, তিনি দোষে লিপ্ত হন না। (মহাপাতক করলেও) তাঁরা চতুর্মাসব্যাপী পারণব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করেন—ধর্মবিদ্‌গণের এই মত। পণ্ডিতগণ নারীদের মানসিক বা একবার মাত্র কৃত পাপকে গুরুতর বলে মনে করেন না। সেই পাপ রজঃদ্বারা শুদ্ধ হয়, যেরূপ ভস্ম দ্বারা পাত্র শুদ্ধ হয়।"

অত্রিসংহিতা, অত্রিস্মৃতি, বশিষ্ঠস্মৃতি ও বৌধায়ন স্মৃতি

এই স্মৃতিগুলি অতি প্রাচীন, এবং এদের সবগুলিতেই প্রায় একই শ্লোক উদ্ধৃত করে প্রমাণ করা হয়েছে যে নারীরা সর্বদাই পবিত্র, সেজন্য তাদের কোন অপরাধ হতে পারে না; বলপূর্বক ধর্ষিতা নারীদের ত্যাগ অবিধেয়। অত্রিস্মৃতির শ্লোকগুলি নিম্নলিখিত রূপ। অত্রিসংহিতায় (শ্লোক ১৯৩-১৯৮) এর অনেকগুলি উদ্ধৃত আছে, বশিষ্ঠস্মৃতিতে (শ্লোক ২৮।১-১০) এর সবগুলিই হুবহু পাওয়া যায়; এবং বৌধায়নস্মৃতিতে (২।৬৩-৬৪) এর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ আছে।

মূলসংস্কৃত:—"ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ ন বিপ্রো বেদকর্মণঃ। নাপো মূত্রপুরীষেণ নাগ্নির্দহনকর্মণা॥ বলাৎকারোপভুক্তা বা চৌরহস্তগতাপি বা। স্বয়ং চাপি বিপন্না বা যদি বা বিপ্রবাসিতা॥ ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী নাস্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে। পুষ্পকালমুপাসীত ঋতুকালেন শুধ্যতি॥ স্ত্রিয়ঃ পবিত্রমতুলং নৈতা দুষ্যন্তি কেনচিৎ। মাসি মাসি রজো হ্যাসাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি॥ পূর্বং স্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তাঃ সোমগন্ধর্ববহ্নিভিঃ। ভুঞ্জতে মানুষৈঃ পশ্চান্নৈতা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ॥ অসবর্ণেন যো গর্ভঃ

স্ত্রীণাং যোনৌ নিষিচ্যতে। অশুদ্ধা তু ভবেন্নারী যাবচ্ছল্যং ন মুঞ্চতি। নিঃসৃতে তু ততঃ শল্যে রজসোঽপীহ দর্শনাৎ। ততঃ সা শুধ্যতে নারী বিমলা কাঞ্চনোপমা। সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্বশ্চ শুভাং গিরম্। পাবকঃ সর্বমেধ্যত্বং তস্মান্নিষ্কল্মষাঃ স্ত্রিয়ঃ। ব্যঞ্জনেষু চ জাতেষু সোমো ভুঙ্‌ক্তে চ কন্যকাম্। পয়োধরেষু গন্ধর্বা রজস্যগ্নিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং তাম্রমম্লেন শুধ্যতি। রজসা শুধ্যতে নারী নদী বেগেন শুধ্যতি। গোকরীষেণ রজতং সুবর্ণং চাপি বারিণা। আকরাঃ শুচয়ঃ সর্বে বর্জয়িত্বা সুরাকরম্। আসনং শয়নস্থানং স্ত্রীমুখং কুতপং কুশম্। ন দূষয়ন্তি বিদ্বাংসো যজ্ঞেষু চমসং যথা। মক্ষিকাসন্ততির্ধারা ভূমিস্তোয়ং হুতাশনঃ। মার্জারশ্চৈব দর্বী চ নকুলশ্চ সদা শুচিঃ। বৎসঃ প্রস্রবণে মেধ্যঃ শকুনিঃ ফলপাতনে। স্ত্রিয়শ্চ রতি-সংযোগে শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ। পাদুকে ধর্মতো মেধ্যে দুষ্টমার্গে হ্যুপানহৌ। বস্ত্রং কৌপীনকে মেধ্যং স্ত্রিয়ো মেধ্যাস্তু সর্বতঃ। অজাশ্বৌ মুখতো মেধ্যৌ গাবো মেধ্যাস্তু পৃষ্ঠতঃ। ব্রাহ্মণাঃ পাদতো মেধ্যাঃ স্ত্রিয়ো মেধ্যাস্তু সর্বতঃ।"

বঙ্গানুবাদ :—"উপপতি কর্তৃক স্ত্রী দোষদুষ্টা হন না, বেদজ্ঞব্রাহ্মণও (বেদোপদিষ্ট হিংসামূলক কর্ম দ্বারা) দোষদুষ্ট হন না। জল মূত্র পুরীষ দ্বারা এবং অগ্নি (অশুচি দ্রব্যের) দাহকার্য দ্বারা দোষদুষ্ট হয় না। বলপূর্বক উপভুক্তা, অথবা চৌরহস্তগতা, অথবা স্বয়ং বিপন্না, অথবা প্রতারিতা নারী অদূষিতা বলে ত্যাজ্যা নয়, তাঁকে ত্যাগ করা উচিত নয়। ঋতুকালে নির্দিষ্ট কাল অতিক্রম করলে তিনি শুদ্ধা হন। নারীরা অতুল পবিত্রতা ভাজন, তাঁরা কিছুতেই দোষদুষ্টা হন না। প্রত্যেক মাসে ঋতু এঁদের দোষ অপহরণ করে। পূর্বে নারীরা সোম, গন্ধর্ব ও অগ্নি—এই দেবতাগণ কর্তৃক উপভুক্তা হয়েছিলেন। পরে মানুষ তাঁদের উপভোগ করে, (সেজন্য) তারা কোনপ্রকারেই দোষদুষ্টা হন না। অসবর্ণ কর্তৃক যে গর্ভ নারীতে নিষিক্ত হয়, সেই গর্ভ যত দিন পর্যন্ত নিঃসৃত না হয় তত দিন নারী অশুদ্ধা থাকেন। কিন্তু গর্ভনিঃসৃত হবার পরে এবং রজোদর্শনের পরে তিনি বিমল কাঞ্চনের ন্যায় শুদ্ধা হন। তাঁদের সোম শুচিতা, গন্ধর্ব শুভবাক্য ও অগ্নি সর্বপবিত্রতা দান করেছেন, সে জন্য নারীরা নিষ্কলুষা। কাংস্য পাত্র ভস্ম দ্বারা ও তাম্রপাত্র অম্ল দ্বারা শুদ্ধ হয়। নারী রজঃ দ্বারা ও নদী বেগ দ্বারা শুদ্ধা হয়। রৌপ্য গোময় দ্বারা, স্বর্ণ জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। সুরাপাত্র ব্যতীত অপর সকল পাত্রই শুচি। বিদ্বান্‌গণ যেরূপ যজ্ঞে যজ্ঞপাত্রাদির নিন্দা করেন না, সেরূপ আসন, শয়নস্থান, স্ত্রীমুখ, কুশ (বা কম্বল) ও কুশেরও নিন্দা করেন না। ভ্রমরপুঞ্জ, জলধারা, ভূমি, জল, অগ্নি, মার্জার, যজ্ঞহাতা ও নকুল সর্বদা শুচি। গোবৎস দুগ্ধ ক্ষরণ সময়ে, পক্ষী ফলপাতন সময়ে, নারীরা রতি-সংযোগ সময়ে ও কুকুর মৃগ গ্রহণ সময়ে শুচি হয়। যজ্ঞের নিকট পাদুকা এবং দুর্গম মার্গে পাদুকা শুচি। বস্ত্রের মধ্যে কৌপীন শুচি, কিন্তু নারীরা সর্বত্র শুচি। অজ ও অশ্বের মুখ পবিত্র, গাভীর পৃষ্ঠ পবিত্র, ব্রাহ্মণের চরণ পবিত্র, কিন্তু নারীদের সর্বত্র পবিত্র।" (অত্রিস্মৃতি ৫।১-১৬)।

অত্রিসংহিতায় ধর্ষিতা নারীদের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত নূতন দুটি শ্লোক আছে।

মূল সংস্কৃত :—"সকৃদ্‌ভুক্তা তু যা নারী ম্লেচ্ছৈর্বা পাপকর্মভিঃ। প্রাজাপত্যেন শুদ্ধ্যেত ঋতুপ্রস্রবণেন তু। বলাদ্‌ধৃতা স্বয়ং বাপি পরপ্রতারিতা যদি। সকৃদ্‌ভুক্তা তু যা নারী প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি।" (অত্রিসংহিতা ১৯৭-১৯৮)।

বঙ্গানুবাদ :—"যে নারী ম্লেচ্ছ বা পাপিষ্ঠ কর্তৃক একবার উপভুক্তা হয়েছেন, তিনি প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান ও ঋতু দ্বারা শুদ্ধা হন। যে নারী বলপূর্বক অপহৃতা অথবা স্বয়ং প্রতারিতা হয়ে একবার উপভুক্তা হয়েছেন, তিনি প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধা হন।"

অত্রি সংহিতায় বিধর্মী স্ত্রী সংস্পর্শদুষ্ট পুরুষের জন্যও নিম্ন-লিখিত প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।

মূল সংস্কৃত :—"স্ত্রিয়া ম্লেচ্ছস্য সম্পর্কাচ্ছুদ্ধিঃ সান্তপনে তথা। তপ্তকৃচ্ছ্রং পুনঃকৃত্বা শুদ্ধিরেষাভিধীয়তে। সংবর্তেত যথা ভার্যাং গত্বা ম্লেচ্ছস্য সঙ্গতাম্। সচেলং স্নানমাদায় ঘৃতস্য প্রাশনেন চ।…চাণ্ডাল-ম্লেচ্ছ-শ্বপচ-কপালব্রতধারিণঃ অকামতঃ স্ত্রিয়োগত্বা পরাকেন বিশুধ্যতি।" (অত্রিসংহিতা, ১৮০-১৮১, ১৮৩)

বঙ্গানুবাদ :—ম্লেচ্ছ স্ত্রীর সংস্পর্শে আসিলে সান্তপনব্রত দ্বারা শুদ্ধিলাভ হয়। পুনরায় তপ্তকৃচ্ছ্র সাধন করলে শুদ্ধি-লাভ হয়। ম্লেচ্ছোপভুক্তা ভার্যার সহিত ব্যবহার করলে সবস্ত্র স্নান ও ঘৃত ভোজন দ্বারা শুদ্ধিলাভ হয়।…অনিচ্ছা সত্ত্বে চণ্ডাল ম্লেচ্ছ, শ্বপচ ও কপালব্রতধারীদের স্ত্রীগমন করলে পরাক-ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধিলাভ হয়।"

মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ও বিষ্ণুস্মৃতি

মনুস্মৃতি প্রাচীনতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিরূপে সমাজে সম্মানার্হ হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিও অতি প্রাচীন। মনুস্মৃতিতে একটি সুন্দর শ্লোক আছে। তাতে বলা হয়েছে যে বলপূর্বককৃত কার্যাদি অর্থশূন্য বলে কর্তার কোন অপরাধ হয় না। শ্লোকটি নিম্নলিখিতরূপ :—

মূল সংস্কৃত :—"বলাদ্দত্তং বলাদ্‌ভুক্তং বলাদ্‌যচ্চাপি লেখিতম্। সর্বান্ বলকৃতানর্থানকৃতান্ মনুরব্রবীৎ।" (মনু-স্মৃতি ৮।১৬৮)।

বঙ্গানুবাদ :—"বলপূর্বক যা দত্ত হয়, বলপূর্বক যা ভুক্ত হয়, বলপূর্বক যা লিখিত হয়, বলপূর্বক যা কৃত হয় মনু বলেছেন যে, সে সবই অকৃত অর্থাৎ অসিদ্ধ।"

অন্য এক স্থানে মনু অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত পাপের মধ্যে প্রভেদ বোঝাবার জন্য বলেছেন যে, কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে অনিচ্ছাকৃত পাপেরই কেবল প্রায়শ্চিত্ত বা স্খালন সম্ভব,

ইচ্ছাকৃত পাপের নয়। মনুর মতে, অনিচ্ছাকৃত পাপের জন্য কেবল লঘু প্রায়শ্চিত্তেরই প্রয়োজন, যেমন বেদাভ্যাস; কিন্তু ইচ্ছাকৃত পাপের জন্য অন্যান্য গুরু প্রায়শ্চিত্তও অত্যাবশ্যক। শ্লোক দুটি এইরূপ—

মূল সংস্কৃত :—অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিদুর্বুধাঃ। কামকারকৃতেঽপ্যাহুরেকে শ্রুতিনিদর্শনাৎ। অকামতঃ কৃতং পাপং বেদাভ্যাসেন শুধ্যতি। কামতস্তু কৃতং মোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ।" (মনুসংহিতা, ১১।৪৫।৪৬)

বঙ্গানুবাদ :—কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে (কেবল) অনিচ্ছাকৃত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। কেহ কেহ শ্রুতি প্রমাণের উপর নির্ভর করে বলেন যে ইচ্ছাকৃত পাপেরও (প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব)। অনিচ্ছাকৃত পাপই বেদাভ্যাসে শুদ্ধ হয়। কিন্তু মোহবশতঃ ইচ্ছাকৃত পাপের ক্ষালন পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই সম্ভবপর।"

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় লেখ্যপ্রকরণে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে বলপূর্বক বা ছলপূর্বক যা লিখিত হয় তা অপ্রমাণ। এই নিয়মটি নিঃসন্দেহে অন্যান্য বিষয়েও সমান প্রযোজ্য।

মূল সংস্কৃত :—"বিনাপি সাক্ষিভির্লেখ্যং স্বহস্ত লিখিতন্তু যৎ। তৎপ্রমাণং স্মৃতং লেখ্যং বলোপধিকৃতাদৃতে।" যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, ৯১।

বঙ্গানুবাদ :—"সাক্ষী ব্যতীত ও স্বহস্তে লিখিত লেখ্য (দলিল) প্রমাণ বলে পরিগণ্য কিন্তু যা বলপূর্বক ও ছলপূর্বক লিখিত হয়, তা প্রমাণ নয়।"

বিষ্ণু-সংহিতাতেও এই একই কথা আছে।

মূল সংস্কৃত :—তদবলাৎকারিতমপ্রমাণম্। উপধিকৃতাশ্চ সর্ব এব। (বিষ্ণু-সংহিতা ৭।৬-৭)

বঙ্গানুবাদ :—"বলপূর্বক সাধিত (লেখ্য) অপ্রমাণ, ছলপূর্বক সাধিতও তাই।

বৃহৎ-যমস্মৃতি

বৃহৎ-যমস্মৃতির মতেও বলপূর্বক-ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের জন্যও প্রায়শ্চিত্ত আছে, এবং সেজন্য সমাজ তাদের ত্যাগ করতে পারে না। শ্লোকটি এইরূপ—

মূল সংস্কৃত :—"বলাদ্দাসীকৃতা যে চ ম্লেচ্ছ-চাণ্ডাল-দস্যুভিঃ। অশুভং কারিতা কর্ম গবাদি প্রাণিহিংসনম্। প্রায়শ্চিত্তং চ দাতব্যং তারতম্যেন বা দ্বিজৈঃ।" (বৃহৎ-যমস্মৃতি ৫।৫-৬)

বঙ্গানুবাদ :—"যাঁদের ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল ও দস্যু বলপূর্বক দাসরূপে পরিণত করেছে এবং যাঁরা গবাদি প্রাণিহিংসারূপ অশুভ কর্ম করতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের জন্য ঐ সবের তারতম্যানুসারে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা ব্রাহ্মণগণের কর্তব্য।"

দেবলস্মৃতি

এই স্মৃতি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। সমগ্র স্মৃতিটিতেই বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ ও ধর্ষণের বিষয়ে বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। মূলস্মৃতিটি বা তার সমগ্র বঙ্গানুবাদ এ স্থলে দেওয়া সম্ভবপর নয় বলে, বাংলা সারাংশ মাত্র প্রদত্ত হচ্ছে।

১। যদি কোন ব্যক্তি বলপূর্বক বিধর্মী কর্তৃক নীত হয়ে অপেয় দ্রব্য পান, অভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ এবং অগম্যা স্ত্রী গমন করতে বাধ্য হন, তা হলে ব্রাহ্মণ প্রমুখ চতুর্বর্ণ এবং ঐরূপ অবস্থার কাল ভেদে নিম্নলিখিত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হবে।

(ক) এক বৎসর কাল এই অবস্থায় থাকতে বাধ্য হলে, ব্রাহ্মণের পক্ষে চান্দ্রায়ণ ও পরাকব্রতের অনুষ্ঠান আবশ্যক। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে চতুর্দশ গ্রাস, দ্বিতীয়ায় ত্রয়োদশ, এইরূপে ক্রমশঃ এক এক গ্রাস হ্রাস করে চতুর্দশীতে এক গ্রাস মাত্র ভোজন ও অমাবস্যায় সম্পূর্ণ উপবাস করতে হবে। পুনরায় শুক্লপক্ষের প্রতিপদে এক গ্রাস, দ্বিতীয়ায় দুই গ্রাস, এইরূপে ক্রমশঃ এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করে পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করতে হবে। এই ব্রতের নাম "চান্দ্রায়ণ"। সংযতচিত্তে দ্বাদশ দিন উপবাস করার নাম "পরাক" ব্রত। ক্ষত্রিয়কে একটি পরাক ব্রত এবং পাদকৃচ্ছ্র ব্রত করতে হবে। এক দিন দিবসে একবার মাত্র ভোজন, এক দিন রাত্রিতে একবার মাত্র ভোজন এবং এক দিন উপবাস করার নাম "পাদকৃচ্ছ্র।" বৈশ্যের অর্ধপরাকব্রত সম্পাদন, অর্থাৎ ছয়দিন উপবাস, এবং শূদ্রের পাঁচ দিন উপবাস করা কর্তব্য (শ্লোক ৭-৯)।

বিধর্মী কর্তৃক বলপূর্বক নীত কোনো ব্যক্তির দণ্ড ও মেখলা অপহৃত হলে, তিনি সংস্কার প্রমুখ সব কার্যে (যথা—বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে) যথাবিধি অধিকারী থাকবেন। কিন্তু শুদ্ধিলাভে ইচ্ছুক হলে তাঁকে ব্রাহ্মণগণকে ধেনু, ভূমি ও স্বর্ণ দান করতে হবে। অন্যথা তিনি কুটুম্বগণের সঙ্গে পংক্তি ভোজনে অধিকারী হবেন না। (শ্লোক ১২-১৩)।

(খ) যিনি বৎসরাধিক কাল বিধর্মী কর্তৃক বলপূর্বক নীত বা অপহৃত হয়ে থাকবেন, তিনি উপরি উক্ত প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদনের পরে গঙ্গাস্নানের দ্বারা শুদ্ধ হবেন (শ্লোক ১৫)।

(গ) যিনি পঞ্চ, ষট্, সপ্ত, বা দশ থেকে বিংশতি বৎসর বিধর্মী কর্তৃক বলপূর্বক নীত বা অপহৃত হয়েছেন, তিনি দুটি প্রাজাপত্যব্রত পালন করে শুদ্ধি লাভ করবেন (শ্লোক ৫৩-৫৪)। একটি প্রাজাপত্য ব্রত দ্বাদশ দিন ব্যাপী। এর মধ্যে প্রথম তিন দিন একবার মাত্র প্রত্যূষে, দ্বিতীয় তিন দিন একবার মাত্র সন্ধ্যায়, তৃতীয় তিন দিন ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন, এবং শেষ তিন দিন উপবাস করতে হবে।

২। যাঁরা বিধর্মী, চণ্ডাল বা দস্যুকর্তৃক বলপূর্বক দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য হবেন, এবং গবাদি বধ প্রভৃতি অশুভ কার্য, তাদের উচ্ছিষ্ট মার্জন বা ভোজন, উষ্ট্র, শূকর প্রভৃতির মাংস ভোজন, তাদের স্ত্রীসঙ্গ ও সেই স্ত্রীগণের সঙ্গে একত্রে ভোজন করতে বাধ্য হবেন, তাদের জন্য নিম্নলিখিত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন (শ্লোক ১৭-১৯)।

(ক) এক মাস এই অবস্থায় থাকলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও

বৈশ্য প্রাজাপত্য এবং শূদ্র পাদকৃচ্ছ্র ব্রতদ্বারা শুদ্ধিলাভ করবেন। (শ্লোক ১৯-২১)।

(খ) ছয়মাস বা তিন মাস বিধর্মীর সঙ্গে বসবাস করলে শূদ্রের পক্ষে যথাক্রমে পরাক ও অর্দ্ধপরাক ব্রত অনুষ্ঠান করতে হবে (শ্লোক ২১)।

(গ) একবৎসরকাল বিধর্মীর সঙ্গে বসবাস করলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য চান্দ্রায়ণ ও পরাক এবং শূদ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত ও যবমিশ্রিত জলপান দ্বারা শুদ্ধ হবেন। (শ্লোক ২০, ২৬)।

(ঘ) বৎসরাধিক এই অবস্থায় থাকলে, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ অন্যান্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেবেন (শ্লোক ২২)।

৩। বিধর্মীর সঙ্গে একত্রে বসবাস, আলাপ ও ভোজন করলে নিম্নলিখিত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন।

এক থেকে পাঁচ দিন এই সব করলে গোমূত্র, গোময়, গোক্ষীর, দধি ও ঘৃত যথাক্রমে একটি, দুটি, তিনটি চারটি ও পাঁচটি গ্রহণ করতে হবে। (শ্লোক ১৫-১৭) তদূর্দ্ধে পঞ্চগব্য গ্রহণের বিধান আছে।

৪। চতুর্বর্ণের যারা ম্লেচ্ছ বা চৌর কর্তৃক অপহৃত হয়ে বনে বা বিদেশে নীত হন, এবং ক্ষুধার্ত হয়ে বা ভয়বশতঃ অভক্ষ্য ভক্ষণ করেন, তাঁরা স্বদেশ পুনঃপ্রাপ্ত হলে নিষ্কৃতিলাভ করেন। এ স্থলে ব্রাহ্মণ একটি কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য, ক্ষত্রিয় অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র, বৈশ্য এক পাদ কম, শূদ্র এক পাদ কম কৃচ্ছ্রব্রত পালন করবেন (শ্লোক ৪৫-৪৬)।

৫। (ক) নারীরা যদি বিধর্মী কর্তৃক অপহৃতা হয়ে বলপূর্বক ধর্ষিতা হন তা হলে ব্রাহ্মণী এক পরাক ব্রত এবং ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা যথাক্রমে এক এক পাদ কম পরাক ব্রত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করেন (শ্লোক ৩৭)।

(খ) যাঁরা ধর্ষিতা হন নাই বা অভক্ষ্য ও স্বেচ্ছায় ভক্ষণ করেন নাই, তাঁরা ত্রিরাত্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধা হন (শ্লোক ৩৯)

(গ) চতুর্বর্ণের যে নারী স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিধর্মী কর্তৃক সন্তান সম্ভাবিতা হয়েছেন এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ করেছেন, তিনি সান্তপন কৃচ্ছ্র ব্রত পালন ও ঘৃত লেপনদ্বারা বিশুদ্ধা হন। (শ্লোক ৪৯): প্রথম দিনে সম্পূর্ণ উপবাস, দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ দিনে যথাক্রমে মাত্র গোমূত্র, গোময়, গোদুগ্ধ, দধি ও ঘৃত ভোজন এবং সপ্তম দিনে কেবল কুশোদক পান—এই হ'ল "কৃচ্ছ্র সান্তপন" ব্রত।

(ঘ) অসবর্ণ কর্তৃক যে নারী সন্তানসম্ভবা হন, তিনি সন্তান জন্মের পূর্ব পর্যন্ত অশুদ্ধা থাকেন, কিন্তু তৎপরে তিনি বিমল কাঞ্চনের ন্যায় শুদ্ধা হন (শ্লোক ৫১)।

অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ, এবং ঊনষোড়শ বর্ষ বালক, নারী ও রোগীর পক্ষে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তই যথেষ্ট। পঞ্চ থেকে দশ বৎসরের বালকের পক্ষে স্বয়ং প্রায়শ্চিত্তের স্থানে পিতা, বা যিনি লালন-পালন করেন বা এরূপ অন্য কেহ প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

মহাভারত ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত অষ্টবিধ বিবাহ

মহাভারত ও স্মৃতিশাস্ত্রে অষ্টবিধ বিবাহের উল্লেখ আছে। যথা—ব্রাহ্ম বা উপযুক্ত পাত্রকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে সুসজ্জিতা কন্যাদান; দৈব বা যজ্ঞের পুরোহিতকে সুসজ্জিতা কন্যাদান; আর্ষ বা বরের নিকট থেকে গোবলীবর্দ্দ গ্রহণ করে কন্যাদান; প্রাজাপত্য বা যে স্থলে স্বয়ং বরই কন্যা প্রার্থনা করেন; গান্ধর্ব বা বর কন্যার প্রেমমূলক ও পরস্পর স্বীকৃত বিবাহ; রাক্ষস বা কন্যাপক্ষীয় লোকদের হত্যা ও তাঁহাদের গৃহাদি ধ্বংস করে রোরুদ্যমানা অনিচ্ছুকা কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করে বিবাহ; পৈশাচ বা নিদ্রিতা, মদ্যপানমত্তা অথবা উন্মত্তা কন্যা-গমন। এর মধ্যে, সকলের মতেই, প্রথম চার প্রকার বিবাহ "ধর্ম্ম্য" বা ধর্মসঙ্গত ও আইনসঙ্গত। গান্ধর্ব বিবাহ সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে। মহাভারতে রাক্ষস ও আসুর বিবাহকে "অধর্ম" বা ধর্মসঙ্গত ও আইনসঙ্গত নয় বলে নিন্দা করা হয়েছে, এবং এরূপ তথাকথিত বিবাহ কোনক্রমেই করা উচিত নয় বলে বিধান দেওয়া হয়েছে ("পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্তব্যৌ কথঞ্চন"। অনুশাসন পর্ব, ৪৪।৮-৯)। এই একই পর্বে পুনরায় বলা হয়েছে যে, অনিচ্ছুকা কুমারীকে বলপূর্বক বিবাহ করলে অন্ততঃ নরকগামী হতে হয় (অনুশাসন পর্ব, ৪৫।২২)। মহাভারতের আদি পর্বে অবশ্য ভীষ্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কন্যাপ-হরণপূর্বক বিবাহ ধর্মসঙ্গত বলে নির্দেশ দিয়েছেন (আদি পর্ব, সম্ভব পর্ব, ১০২ অধ্যায়)। কিন্তু এরূপ বিবাহকে সাধারণ রাক্ষস বিবাহ বলা চলে না, কারণ কন্যার আত্মীয়-স্বজনকে আক্রমণ ও হত্যা করা হলেও, এস্থলে কন্যা স্বয়ং অনিচ্ছুকা নন। ভীষ্মও কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বীয় ভ্রাতার জন্য হরণ করেন। কিন্তু প্রথমা কন্যা অম্বা এই বিবাহে অনিচ্ছুকা জেনে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে মুক্তি দেন। সুভদ্রা হরণও রাক্ষস-বিবাহ নয়, কারণ স্বয়ং সুভদ্রার এ বিবাহে পূর্ণ সম্মতি ছিল। সেজন্য মহাভারত কদাপি অনিচ্ছুকা কন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ ধর্মসঙ্গত এ কথা বলেন নি—অনিচ্ছুক অভি-ভাবকের গৃহ থেকে বিবাহেচ্ছুকা কন্যার সহিত পলায়নই যে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দোষাবহ নয়—এই কেবল বিহিত হয়েছে। মনুও যখন বলেছেন যে গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মসঙ্গত বলে স্মৃত আছে (৩।২৬), তিনিও কেবল উপরি-উক্ত বিবাহের কথাই বলেছেন, অনিচ্ছুকা কুমারীকে বলপূর্বক বিবাহ করা নয়—কারণ, তার আগের শ্লোকেই স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, শেষ দুটি, অর্থাৎ রাক্ষস ও পৈশাচ "অধর্ম্ম্য" এবং আসুর (আইনসঙ্গত হলেও) ও পৈশাচ বিবাহ কদাপি করা উচিত নয় (৩।২৫)। এরূপে মনু, বৃহস্পতি, নারদ প্রমুখ স্মৃতিকারগণ সকলেই একমত যে রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ অর্থাৎ বলপূর্বক অনিচ্ছুকা কন্যাকে বিবাহ সম্পূর্ণরূপেই "অধর্ম্ম্য"। সুতরাং ন্যায় ও যুক্তির কথা বাদ দিলেও হিন্দু-শাস্ত্রানুসারেও বলপূর্বক বিবাহ হিন্দুসমাজে ধর্ম, সমাজ, আইন কোনদিক থেকেই সিদ্ধ বলে স্বীকৃত হতে পারে না। সেজন্য বলপূর্বক বিবাহিতা নারীর তথাকথিত বিবাহ যে

সকল দিক থেকেই সম্পূর্ণ অজিদ বর্ত্তমানে পণ্ডিতমণ্ডলীর এই বিধান কেবল যে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত তাই নয়, শাস্ত্রসম্মতও নিশ্চয়। অবশ্য শাস্ত্রের চেয়েও বড় কথা ন্যায়ধর্ম ও যুক্তি—যা ন্যায়বিচার ও যুক্তিসঙ্গত তা শাস্ত্রসম্মত হলেই অবশ্য ভাল, কিন্তু না হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা ছোট বড় সব কথাতেই শাস্ত্রের দোহাই দিতেই অভ্যস্ত এবং শাস্ত্রের অনুমোদন না পেলে আমাদের মনের সন্তুষ্টিও হয় না। সেজন্য বিশেষ করে বর্ত্তমানে এ সব লাঞ্ছিত নরনারীদের মানসিক তৃপ্তি ও সান্ত্বনার জন্য আমাদের শাস্ত্রের এই সকল উদার ও উন্নত মতবাদগুলির সমাজে বহুল প্রচার হওয়া কর্তব্য।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২৬

নারী পুরুষকে করে পূর্ণ। চম্পা ও টুলুর বিষয়েও তাহাই করিতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে নিজে হইয়া উঠিতেছে পূর্ণতর।—

কয়েক দিন পরের কথা। সন্ধ্যা উত্তরাইয়া গিয়াছে। টুলু কর্ত্তাপাড়ায় তাহার কাকার বাসা হইতে ফিরিতেছিল। সঙ্গে পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্কের একটা পাস-বুক থাকে ওর সর্বদা। সাধুসঙ্গে পরলোকের পথ অনুসন্ধান করিবার সময়ও ওটা দরকার হইত। বইটা আনিতে গিয়াছিল। কাকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা এড়াইবার জন্য সন্ধ্যার অল্প একটু আগে বাহির হইয়াছিল ; ঐ সময়টায়ই বিক্রয় বেশী, তিনি দোকানেই থাকেন।

যখন সেই তেমাথার কাছটায় আসিয়াছে যেখান থেকে বস্তির রাস্তাটা নামিয়া গেছে, টুলুর মনে হইল স্কুলে বা তাহার বাসায় হঠাৎ একটা হটগোল উঠিল। তাহার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল,—এতদিন যে আশঙ্কা করিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত ফলিলই নাকি সেটা ? বেশ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে আওয়াজটা, যেন আট-দশ জন লোকের একটা মিশ্র কলরব। ভাল করিয়া শুনিবার জন্য টুলু দাঁড়াইয়া পড়িল একটু, ভয়ে বুকের স্পন্দনটা আরও দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে,—ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত ঘটাইলই কাণ্ডটা।—উপরে উপরে একটা অত চাল দিয়া, নিজেও সরে-জমিন থেকে সরিয়া পড়িয়া—টুলু বেশ যখন অসতর্ক, নিজের সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিল।...ব্যাপারটা বুঝিবার জন্য সেকেণ্ড কয়েক দাঁড়াইয়াছে, তাহার মধ্যে সমস্তটুকু পরিষ্কার হইয়া গেল।...পা চালাইয়া দিল। তিনটি স্ত্রীলোক রহিয়াছে—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—কোলের শিশু পর্যন্ত ; কি মতিভ্রম হইল তাহার যে সবাইকে এই দুর্বিপাকের মধ্যে টানিয়া আনিল।

গোলমালের মধ্যে বনমালীর গলা একটু স্পষ্ট—"নেকালো।...তুরা যেরোক হারামজাদারা। খুন্টি করে ফিলবোক।..." উত্তরে যে আওয়াজ হইতেছে সেগুলা অস্পষ্ট,—অনেকগুলো উগ্র কণ্ঠস্বর যেন জড়াজড়ি হইয়া গিয়াছে। টুলু চলাই ভাঙিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। চিন্তায় যেন জট পাকাইয়া যাইতেছে।

স্কুলের খানিকটা কাছে আসিয়া পড়িতে গোলমালটা হঠাৎ থামিয়া গেল। টুলু ছুটিয়াই আসিতেছে, দেখে বনমালী তাহার বাসা হইতে হন হন করিয়া এই দিকে চলিয়া আসিতেছে ; শরীরটা গতির বেগেই সামনের দিকে ঝুঁকিয়া গিয়াছে, এক-একবার ঠেলিয়া পিছন দিকে ঘুরিয়া শাসাই-তেছে—"তুরা রোস্ ক্যানে...কেমন না যাস দিখবো...মরোদকা বাচ্চা হোস তো তুরা থাকবি আমি না আসা তক, হঁ।..."

টুলু ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া পড়িল, প্রশ্ন করিল—"কি ব্যাপার বনমালী ?"

বনমালী আরও রাগিয়া উঠিল, বলিল—"হইঁছে ব্যাপার ; বনমালীকে জিগ্যেসটি করবেন না—উয় কথাটিতে কান দিবেন না, ব্যাপার হবেক নাই ? বাদ দিবেন।...হ, বাহির হবেন না, দিখি হয় কিনা বাহির।"

নিজের ঝোঁকেই ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

চম্পা গেটের পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, মুখটা কঠিন ; একটু ভিতরে ছেলে কোলে করিয়া প্রহ্লাদের বউ।

টুলু প্রশ্ন করিল—"ব্যাপারখানা কি ?"

চম্পা নির্বিকার কণ্ঠে বলিল—"বিশেষ কিছু নয়,—বস্তির সবাইকে ভয় দেখিয়ে বাসায় তুলেছেন, বাসা বস্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে ; নতুন কথা কিছু নয়।"

মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইল। প্রহ্লাদের বউয়ের দিকে চাহিতে সে কোন উত্তরই দিল না। চম্পাই আবার বলিল—"যান, দেখুন, এর পরেও যদি থাকে সখ।"

অন্তরের একটা যেন তীব্র বিতৃষ্ণায় ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে পা বাড়াইল।

ওদিকে সব চুপচাপ। টুলু বিমূঢ় ভাবে অগ্রসর হইল। গিয়া দুয়ার ঠেলিয়া দেখে ভিতর হইতে বন্ধ, এদিকে দুয়ার উগ্র গন্ধে সমস্ত জায়গাটা ছাইয়া গিয়াছে, হাঁকিল—"কে দোর দিয়েছে ?—খোল দোর।"

ভিতর হইতে দুইটি গাঢ় জড়িত কণ্ঠে উত্তর হইল—"কে বটে ?...কোন্ হায় ?"

চেনা গলা, টুলু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিল চরণদাস নেশা করিয়া

আসিয়াছে। এখানে আসিয়া অবধি সে এক দিনও দেখা করে নাই। হয়ত মাণিকসই একটু করিয়া বলিতেই তাহার প্রস্তাবটা মিটাইয়া লইয়া বাসায় আসে। হয়তো চম্পা খুব চোখে চোখে রাখিতেছিল, কিম্বা হয়তো চক্ষুলজ্জার খাতিরে পড়িয়া প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতেছিল, আজ আর পারে নাই। টুনুও একটু ভাবিল, তাহার পর নরম গলাতেই হাঁকিয়া বলিল—"কে, চরণ? দোরটা খোল ত একবার।"

কয়েকবার হাঁকাহাঁকি করিয়াও আর উত্তর নাই। শেষে রাস্তার ধারের ঘরের জানালা-পথে সাড়া পাওয়া গেল,—ঠিক উত্তর নয়, একটা গম্ভীর গলাখাঁকারি। টুনু ঘুরিয়া দেখে জানালার গরাদে ধরিয়া অন্ত একটা লোক মাথা নিচু করিয়া অল্প অল্প টলিতেছে, খনির কাপড় পরা, সর্বাঙ্গে কয়লার ছোপ। টুনুর সেকেণ্ড কয়েক বাক্‌স্ফূর্তি হইল না, তাহার পর বলিল—"দোরটা খুলে দাও একবার।"

লোকটা মাথাটা একটু তুলিল, চোখ চাড়া দিয়া চাহিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"কি দরকারটা আছে?"

"এটা আমার বাসা।"

আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইল টলিতে টলিতেই; প্রথম লোকটার হাতে একটা টান দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"চল্ ক্যানে, সর্দার ডাকছে।"

টুনু জানালার দিকে একটু সরিয়া আসিয়াছে, লোকটা তাহার দিকে একটু চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কে, কোন্ হায়?"

টুনু বলিল—"আমার বাসা এটা, বলছি দোরটা খুলে দাও।"

প্রথম লোকটা ঘাড় নিচু করিয়া শুনিতেছিল, একেবারে খাড়া হইয়া উঠিল, দুই হাতে গরাদে চাপিয়া বিরক্ত কণ্ঠে বলিল—"আমি যা বুল্‌ছি তার জবাব দেও ক্যানে—কি দরকারটা আছে—না, আমার বাসা—আমার বাসা।...কথাটি বুঝবেক না!"

বনমালী গদ গদ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে একটা লাঠি, নূতন সাজানো-গোছানোর গোলমালে বোধ হয় সেইটিই খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া গেছে; আসিয়াই সামনের লোকটার হাত গরাদেসুদ্ধ চাপিয়া ধরিয়া লাঠিটা উঠাইল। টুনু ক্ষিপ্রগতিতে তাহার ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল—"লাঠি রেখে এস বনমালী; দাও, বরং আমার হাতে দাও।"

একরকম জোর করিয়াই কাড়িয়া লইল। লাঠি হাতে আসায় বনমালী যেন আরও ক্ষেপিয়া গিয়াছিল, কাড়িয়া লইলেও একজন দুয়ার মতই লাফাইতে লাফাইতে হুকার ছাড়িতে লাগিল—"আমি খুনটি করবোক—মাষ্টারমশাই আমার জিম্মায় বাসাটি দিয়া গেছেন—উয়া সরাব আনলেক—আমি খুনটি করব বটে...উয়া আমার ঠাকুর ঘরে সরাবটি এনে খুন লেক!..."

ঘরের মধ্যে আরও জন-চারেক আসিয়া দাঁড়াইল, সবার পিছনে চরণদাস। সেদিনকার মত মুখ গুঁজরাইয়া পড়িবার অবস্থা না হইলেও, খুব অপ্রকৃতিস্থ, টুনু শান্ত ভাবেই ডাকিল—"এই যে চরণদাস, একবার এদিকে এস না।"

বনমালী ওদিকে সমানে হুকার ছাড়িয়া যাইতেছে।

চরণদাস টলিতে টলিতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। টুনু বলিল—"দোরটা খোল একটু। আর, একি কাণ্ড চরণ? তুমি নিজে রয়েছে, অথচ এরা করছে কি?"

চরণ স্থির দৃষ্টিতে বনমালীর উল্লম্ফন দেখিতেছিল, হাতটা উঁচাইয়া টুনুকে থামিতে ইসারা করিল, একটু পরে বলিল—"আপুনি র'ন ক্যানে, দোর খুলবোক; উর তড়পানিটা একটু দিখি—কত তড়পাতে পারে উ।"

দলের সবাইকে বলিল—"তুরা চুপ করে দেখ উর তামাশাটি; কথাটি বুলিস না।"

মাতালের নানা ভঙ্গী, আগের বারে হৈ-হল্লা খুব করিলেও এবারে কি ভাবিয়া সবাই একেবারে নিশ্চুপ হইয়া নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়াইয়া টলিতেছিল, চরণদাসের হুকুমে সাধ্যমত বনমালীর দিকে দৃষ্টিটা তুলিয়া রাখিয়া গভীর অভিনিবেশের সহিত তামাশা দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বনমালীকে সরাইতে পারিলে বোধ হয় একটা সুরাহা হয়, কিন্তু তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, টুনু কয়েকবার বারণ করিলেও নড়িল না; উহারা কিছুমাত্র না বলিয়া তামাশা দেখিতে থাকায় যেন আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই ভাবেই খানিকটা গেল; চরণ দোর খুলিতে রাজী হয়, কিন্তু তড়পানি দেখা বন্ধ করিয়া নিজেও অগ্রসর হয় না, কাহাকে দেয়ও না অগ্রসর হইতে।...টুনুরও মনে হইল যেন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছে।

এমন সময় প্রহ্লাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার আজ খনি হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, হৈ চৈ শুনিয়া ফটকের মুখে চম্পা আর নিজের স্ত্রীর নিকট তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া পা চালাইয়া আসিয়া পড়িল এবং টুনুর হুকুমে অনেক কষ্টে বনমালীকে সরাইয়া স্কুলের দিকে লইয়া গেল।

এদিকটা শান্ত হওয়ার পর চরণ বলিল—"হঁ, খুলবোক, আপুনির তরে খুলবোক নাই ক্যানে? র'ন, একটু বুঝি উ এত তড়পায় ক্যানে।"

তড়পানোর রহস্য বুঝিতে বেশ আরও একটু বিলম্ব হইল, তাহার পর চরণদাস টলিতে টলিতে গিয়া দুয়ারটা খুলিয়া দিল। কিন্তু তখন আর তাহার দাঁড়াইবার মত অবস্থা নাই। দুয়ার ঠেলিয়া টুনু তাহার ঘাড়ে পড়িতে পড়িতে কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। যাই হোক, কোনরকমে মিটিল ব্যাপারটা। এক এক করিয়া সবাই চরণদাসের মত জমি লইল।

বনমালীকে রাজী করানো গেল না কোনমতেই। প্রহ্লাদকে

লইয়া টুনু সবাইকে টানিয়া টানিয়া ওদিককার ঘরের বারান্দায় শোয়াইয়া দিল।

নিজের ঘুমাইতে বেশ বিলম্ব হইল। মেহনত হইয়াছে, অপরিসীম ক্লান্তি, কিন্তু সমস্ত ঘটনাটুকুর গ্লানি ক্লান্ত চক্ষুর নিদ্রাকে ক্রমাগতই ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিতে লাগিল।

পরদিন পোষ্ট আপিসে গিয়া কিছু টাকা বাহির করিল। ফিরিল বস্তির মধ্য দিয়াই। লোকে আরও একটু চিনিয়াছে, অনেকে আবার নূতন দুইটি পরিবারের সম্পর্কে ঘুলে যায়,—অভিবাদন কুড়াইতে, প্রশ্নের উত্তর দিতে আরও দেরি হইয়া গেল। বস্তির শ্রী সেই রকমই,—সেই নোংরা, সেই কল-তলায় ভিড়, তবে এবার একটা নূতন ব্যাপার এই যে, টুনু যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল ঝগড়া আর গালি-গালাজের কণ্ঠ সবার নরম হইয়া আসিতে লাগিল; অনেক স্থানে নরম হইয়া নীরবও হইয়া গেল। এই সম্ভ্রমটুকু লাগিল বড় মিষ্ট। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কয়েকজন বয়স্গোছের লোকের সঙ্গে একটু আলাপও করিল—নিত্যকার দরকারী কথায় কিছু কিছু, আবার অদরকারী কথাও—এই নূতন জগতের সহিত পরিচয়ের আনন্দটুকু সঞ্চিত করিয়া লওয়া। একটু লজ্জায়ও পড়িয়া গেল,—ভিখারিণীকে যে আশ্রয় দিয়াছে সে সংবাদটুকু বস্তিতে চারাইয়া পড়িয়াছে। তাহারা নিজে বিশেষ কিছু করে নাই বোধ হয়, তবে ঐ যে উপর থেকে নামিয়া টুনু তাহাকে তুলিয়া লইয়াছে—তাহাদেরই একজনকে—তাহাতে তাহাদের সবার অন্তরই কৃতজ্ঞতায় উঠিয়াছে ভরিয়া। কেহ প্রকাশ করিল বাক্যে, কেহ বাক্যের সমর্থনে একটু হাসি দিল, কেহ মাত্র সস্মিত একটু চাহনি; সঙ্কোচ হয়, কিন্তু আন্তরিকতায় পুষ্ট বলিয়া লাগে বড় চমৎকার।

যেন সেই দ্বিতীয় দিনে বস্তিতে আসার জের ধরিয়াই টুনু সোজা স্কুলে না গিয়া ঘুরিয়া বটতলায় আসিয়া বসিল। একটু পরিবর্তন হইয়াছে, দলটা একটু পাতলা, মেয়ে একেবারেই নাই। টুনুর মনে পড়িল দলের গুটিচারেক মেয়ে এবং নিতান্ত যাহারা ছোট এই রকম দু-তিনটি ছেলে বৈকাল হইলে স্কুলে গিয়াই জোটে আজকাল। স্কুল হইতে বাহির হইয়াই রাস্তার ধারে একটা মহুয়া গাছ আছে, বুড়ীর নাতি মাতনীকে ডাকিয়া ওদের আলাদা একটি দল হয় তাহার নিচে।...এখানকার ভাঙন ওখানে একটি সৃষ্টির সূত্রপাত করিয়াছে।

ঐটুকুকে আশ্রয় করিয়া মনটা স্কুলে গিয়া পড়িল; বেশ গুছাইয়া ভাবিবার জন্যই টুনু বেশ ঘন ছায়ায় একটা শিলা-খণ্ডের উপর গিয়া বসিল।

হ্যাঁ, এইবার যেন আরম্ভ হইয়াছে একটু কাজ। চম্পা আসিয়াছে আজ বুঝি সাত দিন হইল, বুড়ী আসে দিন দুয়েক পরে। একটা পরিবর্তন আসিয়াছে বৈকি—আজ সাত সন্ধ্যায় এই নিরিবিলিতে বসিয়া বোধ হয়, প্রথম বার সমস্ত ছবিটুকু একটি সুসমঞ্জস রূপে দেখিতে পাইল টুনু: বুড়ী ভাল হইয়া উঠিয়াছে; চম্পা তাহার ঔষধের বাহাদুরি দেয়, হয়তো পড়িয়া গেছে ঠিক ঔষধটা, অন্তত এটা তো ঠিক যে, ঔষধ ইহাদের পেটে বড় একটা পড়ে না বলিয়া লাগে বড় শীঘ্র। ভাল হইয়াছে বুড়ী, শুধু শরীরের দিক দিয়াই নয়, ওর একটি চমৎকার রূপ ফুটিয়াছে মনেরও,—শুধু ওরই নয়, ছেলেমেয়ে দুটিরও; এই সচ্ছলতায় আর মানুষের মধ্যে মানুষের মত ব্যবহার পাইয়া এই সামান্য ক'টি দিনেই ওদের ওপর থেকে সেই দীনতা, সেই গ্লানি, সেই নিজের মধ্যে গুটাইয়া থাকার ভাব নিঃশেষে মিটিয়া গিয়াছে। তিন জনেই বেশ একটি মুক্ত সহজ মনুষ্যত্বে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বড় আশ্চর্য বোধ হয়—সেই একই মানুষ, পাঁচটি দিনের এদিক-ওদিকে কত তফাৎ! মাত্র একটু মানুষের মত থাকিতে পাইয়াছে বলিয়া।...পরশু-কার কথা মনে পড়িল। সন্ধ্যার সময় টুনু কাঞ্চনতলাটিতে বসিয়াছিল; কি মনে করিয়া বনমালী আসিয়া বসিল। কোন কারণ নাই, শুধু বলিল—মাষ্টারমশাইও সন্ধ্যার সময় বসিতেন এই জায়গাটিতে; যেমন ভাবে ধীরে ধীরে আসিয়া বসিল, টুনু বুঝিল জায়গাটিরও মোহ ওকেও আকৃষ্ট করে। গল্পভিহির পুরানো গল্প হইল। খেলার পর ছেলেমেয়ে দুটিও একটু কুণ্ঠিত ভাবে আসিয়া বসিল, দুটিই টুনুর নিতান্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষ করিয়া মেয়েটি,—বড় স্নিগ্ধ স্বভাব। টুনু বলিতেই তাড়াতাড়ি গিয়া বুড়ীকেও হাত ধরিয়া লইয়া আসিল। এই যে সমাবেশ, এটাকে যেন পূর্ণতা দিবার জন্যই টুনু কথায় কথায় মাষ্টারমশাইয়ের প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলিল। বনমালী হইয়া উঠিল মুখর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়, তাঁহার একটি ধ্যান-রূপকে যেন সবার মাঝখানটিতে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। তাহার পর এক সময় আসিল চম্পা। ঠাকুরদাদাকে বলিল—"তু ইখানে? আমি চারিদিক খুঁজে মরছি।" ঠাকুরদাদা বলিল—"তু বোস ক্যানে একটু, সারাদিন চরখি ঘুরছিস! দুটো ভাল কথা শোন বসে।" চম্পা উত্তর করিল—"তুর মতন বসলে যেন আমার চলে।"...তবুও বসিল খানিকক্ষণ, বেশ বোঝা যায় বসিবার জন্যই একটা ছুতা করিয়া আসা; তাহার পর একবার বাসার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"এখনও আলো জালিস নাই ঘরে? দিবো কাণ্ডটি!" —বলিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

এই নূতন ব্রতে চম্পাই টুনুর হাতে আসিয়া পড়িয়াছে সর্বপ্রথম,—সেইজন্যও, আর সবার মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট বলিয়াও চম্পার প্রত্যেক গতিবিধির উপর টুনুর দৃষ্টি গিয়া পড়ে। বড় পবিত্র বোধ হয় ওকে, একটি শতদল যেন ধীরে ধীরে বিক-শিত হইয়া উঠিতেছে,—মনে হয় চম্পা যেন টুনুর ধারণাকেও ছাড়াইয়া যাইতেছে। এমন সামঞ্জস্যবোধ টুনু যেন আর কোথাও দেখে নাই। টুনু তার প্রথম শিক্ষার মর্ম বোঝে,—ও চায় টুনুর সেবা করিতে, কিন্তু এই নূতন ব্যবহার পর

সন্ধ্যার এদিকে এই প্রথম এ বাসায় পা দিল,—যেন সেথায় পথ খুঁজিতেছিল—ঘরে আলো জ্বালা না হওয়ায় একটা স্বস্তি পাইয়া বাঁচিল।

এই চিত্রের পাশেই ফুটিয়া উঠিল কালকের চিত্র। ততদিন সংযত থাকিয়া যেন নিজের এবং আর সবার ওপর আক্রোশ বশেই চরণদাস মাষ্টারমশাইয়ের বাসাটা একেবারে তাটখানা করিয়া তুলিল। টুলুর মনটা বড় বিষণ্ণ হইয়া উঠিল—কোন উপায় নাই।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ছেলের দল তাহাদের গরু-ছাগল লইয়া বটতলা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা বেশ ঘনাইয়া আসিল। চিন্তের ওটুকু কালিমা মুছিয়া ফেলিবার যেন কোন উপায়ই দেখিতেছে না টুলু। অনেকক্ষণ গেল, মনে ক্রমে যেন একটা অবসাদ আসিয়া পড়িতেছে।—কোন উপায়ই কি নাই? তাহার পর একসময় চিন্তার মধ্যেই হঠাৎ শিলাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

ঐ চম্পারই কথা মনে পড়িয়া গেছে। চম্পাই পারিবে।

তাড়াতাড়ি বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

একবার প্রবেশ করিয়া চম্পা কায়েমী ভাবেই ঠাকুরদাদাকে বেদখল করিবার মতলব করিয়াছে। টুলুর বাসায় ঝাঁটপাট দিয়া আলো জ্বালিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, দরজার মুখে দেখা হইল। টুলু উৎসাহের ঝোঁকে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া আসিয়াছে, অল্প অল্প হাঁপাইতেছে, বলিল—"তোমাকেই খুঁজছিলাম চম্পা—কালকের ব্যাপার সম্বন্ধে—কাল রাত্তিরে যে..."

ওর বাপের সম্পর্কে কথাটা বলিতে গলায় যেন আটকাইয়া গেল।

চম্পা পূরণ করিয়া দিল—"নেশা ভাঙ করে যা করলে সব?"

তাহার পর বোধ হয় টুলুর বিপর্যস্ত ভাব দেখিয়া একটু হাসিয়াই বলিল—"ওতো আবার করবে—আপনার উপকারের নেশা না ভাঙা পর্যন্ত।"

টুলু বলিল—"না, ও যাবে, আমি উপায় ঠাওরেছি।"

"কি?"

"তুমি।"

"আমি!...বুঝতে পারলাম না।"

টুলু একটু চুপ করিল, তাহার পর যেন গুছাইয়া লইয়া বলিল—"একদিন মাষ্টারমশাই আমায় বলেছিলেন পরে আমিও মিলিয়ে দেখলাম—যতদিন ওকে খনির ঐ কালো গলির মধ্যে কাজ করতে হবে ততদিন নেশা ওকে করতেই হবে চম্পা, ওই ভীষণ মেহনতের শক্তি ওর আর নেই এ বয়সে। এখন দরকার ওকে ঐখান থেকে সরিয়ে অন্য কাজ দেওয়ানো—একটু হালকা কাজ।"

চম্পাও এবার একটু চুপ করিয়া মাথা নিচু করিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"আমি কি কাজ দেওয়াবার মালিক?"

কোথায় যেন একটা আঘাত লাগিয়াছে তাহার। টুলুর কিন্তু সেদিকে মোটেই দৃষ্টি গেল না, নিজের ঝোঁকেই বলিয়া গেল—"তুমি বলে-কয়ে দেওয়াতে পার—ম্যানেজার নেই, তুমি এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারকে দিয়ে ব্যবস্থা করতে পার।"

"আমার কথা শুনবে কেন?"

সোজা মুখের পানে চাহিয়া রহিল চম্পা।

সেই প্রথম বার চম্পাকে খনির মধ্যে দেখা,—একটা গলির মাঝখানে একটা উল্টানো বেতের চুপড়ির ওপর পা দিয়া চম্পা এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার পরেশের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া লঘুভাবে গল্প করিতেছে, সেই জোরেই টুলুর মনে উদয় হইয়াছে কথাটা। এতক্ষণ চরণকে ফিরাইবার একটা উপায় আবিষ্কারের আনন্দে ছিল বিভোর, এদিকে গিয়া কিন্তু তাহার কদর্যতায় মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়া এমনই অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে, চম্পার দৃষ্টি থেকে মুখটা কি করিয়া ফিরাইয়া লইবে যেন বুঝিতে পারিতেছে না। শেষে চম্পাই কথা কহিল, একটু হাসিয়াই বলিল—"আপনি অমন হয়ে গেলেন কেন? যাব আমি, অবশ্য দেওয়াতে পারব কিনা বলতে পারি না, তবে চেষ্টা করতে দোষ কি?—যদি মনে করেন একটু হালকা কাজ পেলে বাবার বদ অভ্যেসটা যেতে পারে।...সরুন, যান ভেতরে আপনি।"

আরও একটু গা-ঢাকা-গোছের হইলে চম্পা গিয়া পরেশের সঙ্গে দেখা করিল। পরেশ রাজী হইল বেশ সহজেই, বরং বেশ আগ্রহের সহিতই। আজকাল চম্পার ভাবটা একটু অন্য রকম—আসেও কম, থাকেও অল্পক্ষণ, একটু উপকার করিতে পারিয়া যেন বাঁচিল পরেশ। আপাতত দিনকয়েকের জন্য অন্যত্র কাজ দিবে, ম্যানেজার আসিলে পাকা ব্যবস্থা করিবে।

সকাল বেলা, দশটা প্রায় হইয়াছে। টুলু একটা হোমিওপ্যাথি বই পড়িতেছিল—একটু-আধটু চর্চা করে আজকাল, চম্পা আসিয়া তাহার নিজের পদ্ধতিতে দুইটি হস্ত পিছনে দিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল; টুলু মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিতে বলিল—"রাজী হয়ে গেল। ট্রাকে কয়লা তুলে দেবার কাজ দিয়েছে।"

টুলু বলিল—"সে তো খুব সহজ কাজ।"

"হ্যাঁ, সবচেয়ে সহজ এইটেই, বিশেষ করে বাবার পক্ষে তো বটেই—এত শক্ত কাজের পর।"

"দিলে যে একেবারে এত সহজ?"

কথাটা বলিয়াই টুলুর হুঁস হইল; বেশ খানিকক্ষণই আর কিছু বলিতে পারিল না। চম্পাও চুপ করিয়া রহিল। টুলু বড়ই অস্বস্তিতে পড়িয়া গিয়াছে, কাল চম্পাকে কথাটা বলা পর্যন্ত ভীষণ অশান্তিতে কাটিতেছে ওর। চম্পাকে কিছু বলিয়া ওটুকু কাজ কড়িয়া লইবার সুযোগ খুঁজিতেছে, কিন্তু এতক্ষণ

পায় নাই। বোধ হয় ঐ ধরণেরই কিছু বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার সময়ের দিকে খেয়াল হইল, বলিল—"দশটা বাজে, এখনও খদিতে যাও নি যে ?"

. চম্পা মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"না, গেলাম না ; আর যাব না ভাবছি···ঠিকই করেছি আর যাব না।"

টুনু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"কেন !"

চম্পা সেই ভাবে হাসিয়া বলিল—"এত বড় উপকার চেয়ে নেবার পর আর মান-সম্ভ্রম নিয়ে দাঁড়ান যাবে ওদের সামনে ? —জানেনই ত সবাইকে আপনি।"

টুনুর বিস্ময়ের যেন শেষ নাই, তাহার উপর অনুতাপের স্বরে বলিল—"এ কি হ'ল !—তুমি কাজ ছেড়ে দিয়ে এলে—আমার কথায় ?···তোমার কষ্ট হবার কথাই চম্পা, আমি কেমন না বুঝেই তোমায় পরেশবাবুর কাছে চেষ্টা করতে বলি—বলে ফেলেই বলা ঠিক—তার পর সত্যিই তুমি কি ভীষণ আঘাত পেয়েছ জেনে শুনি যাই আমি ও বাসায়, শুনলাম তুমি বাইরে কোথায় গেছ তার পর থেকে সমস্ত রাত···"

চম্পার হাসিতে এবার একটু অন্ত ধরণের আলো ফুটিল, বলিল—"আপনার কথায় মনে হচ্ছে ভেবে নিয়েছেন—আমি রাগে বা আক্রোশে কাজ ছেড়ে দিয়ে এলাম। তা তো নয়—অনেক দিকেই যেমন চোখ খুলে দিয়েছেন, এদিকটাও তেমনই দিলেন খুলে। সত্যি কি অপমান যাচে করে আমার কাজ তা তো আমারই বোঝা উচিত ছিল। বাকি থাকে পেট চলার কথা,—তা বাবা যদি শোওয়ার ত একটা মেয়ের পেট চালিয়ে নিতে আর পারবে না ?···তা ভিন্ন কাজ যে ছেড়ে দিয়েই এলাম একেবারে এমনও তো নয়। যাচ্ছি না—বলেন যেতে, যাব।"

মুখের দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"কিন্তু সত্যিই কি আপনি আর বলবেন ?" ক্রমশঃ

আমাদের নেতাজী

শ্রীশিউলী সেনগুপ্তা (মালয়)

১৮৯৭ সালে ২৩শে জানুয়ারী স্বর্গীয় জানকীনাথ বসুর গৃহে একটি ছোট শিশুর আবির্ভাব হয়। ইনিই আমাদের নেতাজী —শ্রদ্ধেয়, দেশপূজ্য, কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ নেতাজী—আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বময় কর্ত্তা—সুভাষচন্দ্র বসু।

বাল্যকাল হতেই সুভাষচন্দ্র খুব তেজস্বী, শক্তিশালী ও সাহসী ছিলেন। অন্যায় তিনি কখনও সহ্য করতে পারতেন না। পাঠ্যাবস্থায় সহপাঠীদের মধ্যে কোন দিন ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হলে তিনি মধ্যস্থ হয়ে দুর্ব্বলের পক্ষই অবলম্বন করতেন। তাঁর সে সময়কার সাহসিকতার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি যে কলেজে পড়তেন সে কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ ভারতবাসীদের অপমানসূচক কি কথা বলেছিলেন—তিনি সেই সাহেবকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং ছাত্রগণ দলবদ্ধ হয়ে অধ্যক্ষকে কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম প্রদান করে। সে কারণ কিছু কালের জন্তে তাঁকে কলেজে পড়তে দেওয়া হয় নি। সংগঠনের ক্ষমতা বাল্যকালেই তিনি অর্জ্জন করেন।

ছোটবেলায়ই তাঁর আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ হয়। তিনি মনের মত গুরুর অন্বেষণে পাঠ্যাবস্থায় এক দিন সকলের অজ্ঞাতে বাড়ী হতে বার হন এবং হিমালয় অঞ্চল ভ্রমণ করে ফিরে আসেন। তাঁহার ধীশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। স্কুল-কলেজেই তার আভাস পাওয়া যায়। ১৯১৯ সালে বি-এ পাস করে তিনি আই-সি-এস পরীক্ষার জন্তে বিলাত গমন করেন। সম্মানের সহিত ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে গবর্ণমেণ্ট তাঁকে এক উচ্চপদ গ্রহণ করতে আহ্বান করেন। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বিলেতের লোকদের হাবভাব চালচলন দেখে তাঁর জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছিল। চল্লিশ কোটি নিপীড়িত ভারতবাসীর অবস্থার সঙ্গে তুলনায় বিলাতের লোকদের জীবনযাত্রার উচ্চ মান তাঁর চোখে নূতন করে ধরা পড়ে। বস্তুতঃ, বিদেশে না গেলে, নানা জিনিষ না দেখলে লোকের সম্যক্ জ্ঞান হয় না। তা ছাড়া একই জিনিষ প্রতি-নিয়ত একই স্থানে দেখলে তার পরিবর্ত্তন বা প্রভেদ সহজে চোখে ধরা পড়ে না।

দেশে আসবার পথেই নেতাজী তাঁর ভাবী জীবনের কর্ম্ম-পন্থা ঠিক করে এসেছিলেন। দেশসেবায় মানসে বোম্বাইয়ে নেমেই তিনি মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মহাত্মাজী এই উৎসাহী যুবককে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত দেখা করতে নির্দেশ দেন। দেশবন্ধু এই প্রতিভাদীপ্ত যুবককে সাদরে গ্রহণ করলেন। ইনিই ছিলেন নেতাজীর রাজনৈতিক দীক্ষা-গুরু। দেশবন্ধুর সংস্পর্শে নেতাজীর দেশপ্রীতি দিন দিন পরি-বর্দ্ধিত হতে লাগল। দেশবন্ধুর "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন তিনি এবং দেশবন্ধু কলিকাতার মেয়র হলে তিনি হন তাঁর প্রধান সহায়ক। ঐ সময় নানা স্থানে বক্তৃতা দেওয়ার ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক বার দু' বার নয়, এগার বার তিনি কারাবরণ করেন।

মাণ্ডালে জেলে থাকবার সময় দেশবন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি কিছুকাল একেবারে ম্রিয়মাণ অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তাঁর সিংহতেজ আবার ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত হতে লাগল। তিনি বুঝলেন, দেশবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাঁর জন্যে শোক প্রকাশে বা বিলাপে হবে না—তাঁর আরব্ধ কার্য্যের সমাধিতেই হবে তাঁর শ্রেষ্ঠ স্মৃতিপূজা। কারামুক্ত হয়ে তিনি পূর্ণ উদ্যমে কাজ চালাতে লাগলেন—তখন বাংলাদেশে তাঁর অপরিসীম প্রতিপত্তি —ইংরেজ প্রভুদের তা সইবে কেন—পুনরায় তিনি কারাগারে আবদ্ধ হলেন। জেলে থাকতেই তিনি কলিকাতার মেয়র পদে নিযুক্ত হন এবং আবার জেলে গেলে ১৯৩৩ সনে অসুস্থতা নিবন্ধন মুক্তি পেয়ে তিনি চিকিৎসার জন্যে "ভিয়েনা"র গমন করেন।

দেশবাসী তাঁর গুণে এবং কর্ম্মে মুগ্ধ হয়ে ১৯৩৮ সনে তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতিপদে বরণ করে। ১৯৩৯ সনে গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের উচ্চমণ্ডলের মতের বিরুদ্ধে এবং তাদের দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় রাষ্ট্রপতি পদেই বহাল রইলেন। গান্ধীজী এই পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে একে তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় বলে ঘোষণা করলেন। পরবর্ত্তী ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছায় ঐ পদ ত্যাগ করেন।

কিন্তু এতে তিনি দমবার পাত্র নন। তাঁর মত উদ্যমশীল দেশপ্রেমিকের পক্ষে বসে থাকা বড়ই কঠিন—তাই তিনি তাঁর মনোমত কয়েকজন সাহসী ও কর্ম্মঠ যুবককে নিয়ে একটি দল গঠন করে তার নাম দিলেন "ফরওয়ার্ড ব্লক"। তাদের লক্ষ্য সামনের দিকে, রাজনৈতিক প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া। ইংরেজ শাসনের এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করলেন, ফলে তাঁকে আবার জেলে যেতে হয় এবং তিনি প্রতিবাদে অনশন-ব্রত গ্রহণ করলে সরকার তাঁকে কারামুক্ত করলেন বটে, কিন্তু তাঁর বাড়ীর চারদিকে কঠোর পাহারার বন্দোবস্ত করে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন সুভাষচন্দ্র সুনিপুণ বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে আফগানিস্থান হয়ে অপরিসীম কষ্ট সহ্য করে এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির সাহায্যে জার্ম্মানীতে গমন করেন। সেখানে হের হিটলার তাঁকে সম্মানের সহিত অভিনন্দন জানান। জার্ম্মানীতে ও ইটালীতে সুভাষচন্দ্র ভারতীয়দের নিয়ে হিন্দ সৈন্য-দল গঠন করেন।

১৯৪১ সনের ৮ই ডিসেম্বর জাপানীরা সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেদিনই টোকিয়োতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এবং অন্যান্য ভারতীয়েরা মিলে এক সভা আহ্বান করেন—তার মূল উদ্দেশ্য হিন্দুস্থানের মুক্তিসংগ্রাম চালাবার উপায় নির্দ্ধারণ; তারা এ সুযোগ কিছুতেই অবহেলায় ব্যর্থ হতে দেবেন না।

১৯৪২ ইংরেজের ৯ই এবং ১০ই মার্চ মালয়দেশীয় প্রাদেশিক নেতাদের প্রথম সভা হয়। সেখানে স্থির করা হয় যে, শ্রীনীলকণ্ঠ আইয়ার (মালয়), স্বামী সত্যানন্দ পুরী, সরদার প্রীতম সিং (শ্যামদেশ) এবং ক্যাপ্টেন আক্রাম খাঁকে (আজাদ হিন্দ ফৌজ) টোকিও কন্‌ফারেন্সে পাঠানো হবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার পূর্ব্বেই তাঁরা বিমান-দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করেন—এঁরাই আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগামী শহীদ। কিন্তু ঐ অশুভ ঘটনা সত্ত্বেও অন্যান্য নেতাদের উপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ টোকিও কনফারেন্স শেষ হয়। জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো ঐ সভায় জাপান সরকারের তরফ থেকে ভারতীয়দের স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি জানালেন।

এর পর ১৫ই জুন "ব্যাঙ্কক কন্‌ফারেন্সে"র উদ্বোধন হয়। সেখানে সমস্ত পূর্ব্ব-এশিয়ার আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সভাপতিগণ, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিনিধিবর্গ এবং অন্যান্য দেশানুরাগী ব্যক্তিগণ মিলিত হন। ঐ সভায় উপস্থিত হবার জন্যে নেতাজীকে পূর্ব্বেই জানানো হয়েছিল—কিন্তু তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকা অসম্ভব বলে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি এক বার্ত্তা প্রেরণ করেন এবং এই সঙ্ঘের প্রতি তাঁর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। ঐ সভাতে শ্রীযুত রাসবিহারী বসুকে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সভাপতি নিযুক্ত করা হয় এবং সঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র সিঙ্গাপুরে স্থাপিত করার প্রস্তাব হয়।

এদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন-কার্য্য ও নূতন লোকদের শিক্ষিত করে ফৌজে ভর্ত্তি করার কাজ পূর্ণোদ্যমে চলছিল, কিন্তু ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের সঙ্গে জাপানীদের মতদ্বৈধ হওয়াতে একটু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়—সে অনেক কথা। কিন্তু তাই বলে কেউই মতানৈক্যবশতঃ চুপ করে বসে ছিল না।

ইতিমধ্যে ইউরোপে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় পূর্ব্ব-এশিয়া থেকে স্বাধীনতা-যুদ্ধ পরিচালনার সঙ্কল্প করে নেতাজী নানা বিপদ মাথায় নিয়ে কতিপয় সহচর সহ প্রায় এক মাসে ডুবো জাহাজে টোকিয়ো নগরীতে আগমন করেন (১৪ই জুন ১৯৪৩ সন)। এই সংবাদ অচিরাৎ সর্ব্বত্র প্রচারিত হ'ল। পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়েরা পরম উৎসাহে তাঁর ভাবী কার্য্যকলাপের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। টোকিয়োতে তিনি জাপানী প্রধান মন্ত্রী ও সামরিক বিভাগের বড়কর্ত্তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে নানা সমস্যার সমাধান পূর্ব্বক ২রা জুলাই আজাদ হিন্দ ফৌজের এবং আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের উদ্ভব-স্থল ও তৎকালীন প্রধান কেন্দ্র "শোনানে" (সিঙ্গাপুরের জাপানী প্রদত্ত নাম) অবতরণ করেন। সেদিন মালয় দেশের এক স্মরণীয় দিন। তাঁর আগমনবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হতে লাগল এবং তাঁকে দেখবার জন্যে এবং তাঁর মুখের কথা শুনতে চারদিক থেকে দলে দলে নরনারী এসে সমবেত হ'ল।

আজাদ হিন্দ ফৌজ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে উপস্থিত,

চারদিকে অগণিত জনতার কল-কোলাহল ও উচ্ছ্বাস। নেতাজী উড়ো-জাহাজ হতে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র সমস্ত কোলাহল মুহূর্ত-মধ্যে শান্ত হয়ে গেল। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সম্মুখে দণ্ডায়মান মুক্তিকামী হিন্দ ফৌজকে উদ্দেশ পূর্ব্বক আবেগভরা কণ্ঠে, সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, "ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে একমাত্র সশস্ত্র বাহিনীরই অভাব বহুদিন হতে আমরা অনুভব করে এসেছি। হে স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত যোদ্ধাগণ! তোমরা এসে আজ তা পূরণ করেছ। এস, আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে সমবেত ভাবে সম্মুখ রণাঙ্গনে জীবন উৎসর্গ করি।" ফৌজ তাঁর আদেশ গগন কাঁপিয়ে সমর্থন করল।

৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত "ক্যাথে" সিনেমা-প্রাঙ্গণে বিপুল জনতার সমাবেশ হ'ল। নেতাজী প্রেসিডেন্ট রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র জনতা সসম্মানে উঠে দাঁড়াল এবং "সুভাষ বসু কী জয়" "রাসবিহারী বসু কী জয়", "মহাত্মা গান্ধী কী জয়" প্রভৃতি জয়ধ্বনি সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করল। সে সভায় প্রেসিডেন্ট রাসবিহারী বসু

রাসবিহারী বসু কর্তৃক সুভাষচন্দ্রের হস্তে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সভাপতিত্ব-ভার অর্পণ

সকলকে সম্বোধন করে বললেন, "বন্ধুগণ ও যোদ্ধাগণ, তোমরা হয়ত জিজ্ঞেস করবে আমি টোকিয়ো হতে তোমাদের জন্যে কি উপহার, কি শুভ সংবাদ এনেছি। হাঁ, আমি তোমাদের জন্যে এই (নেতাজীর দিকে চেয়ে) উপহার এনেছি। যা কিছু উৎকৃষ্ট, যা কিছু মহৎ এবং সাহসিকতার আদর্শ এবং যুব-শক্তির প্রেরণা সবই এঁর মধ্যে বিদ্যমান। আজ আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব এঁকে অর্পণ করলাম, এখন হতে ইনিই তোমাদের প্রেসিডেন্ট, ইনিই তোমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা এবং আমার বিশ্বাস এঁর নেতৃত্বে তোমরা জয়ী হবে।" এই ঘোষণায় জনতা মুক্তকণ্ঠে সম্মতি জ্ঞাপন করল। নেতাজী উঠে পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতে বললেন—"গত মহাযুদ্ধের সময় অনেকেই স্বাধীনতার এই পূজারীকে জানতেন—আর হয়ত অনেকেই এঁকে ভুলে গিয়ে থাকবেন। জীবন বিপন্ন করেও ইনি যে ভাবে দেশসেবা করেছেন, সে স্মৃতি এখনো আমাদের মনে সজীব হয়ে আছে। আমার অনুরোধ ইনি 'প্রধান পরামর্শদাতা' হয়ে আমাদের এই আন্দোলনকে ঠিক পথে চালিত করে সাফল্যমণ্ডিত করবেন।" তারপর তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন—"আপনাদের এই সমর্থনকে আমি আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করছি; এর সঙ্গে সঙ্ঘের দায়িত্বও গ্রহণ করছি এবং ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন আমাকে অসীম শক্তি দেন যাতে আমি আমার দেশবাসীকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করতে পারি। ইতিহাসে এই প্রথম বিদেশ হতে হিন্দুস্থানীরা এইভাবে সুগঠিত হয়ে এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেশমাতার স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছে। আপনাদের এই দুঃসাহস, উৎসাহ ও আয়োজন দেখে আমার আশা আরো বলবতী হয়েছে। আমি আপনাদের অত
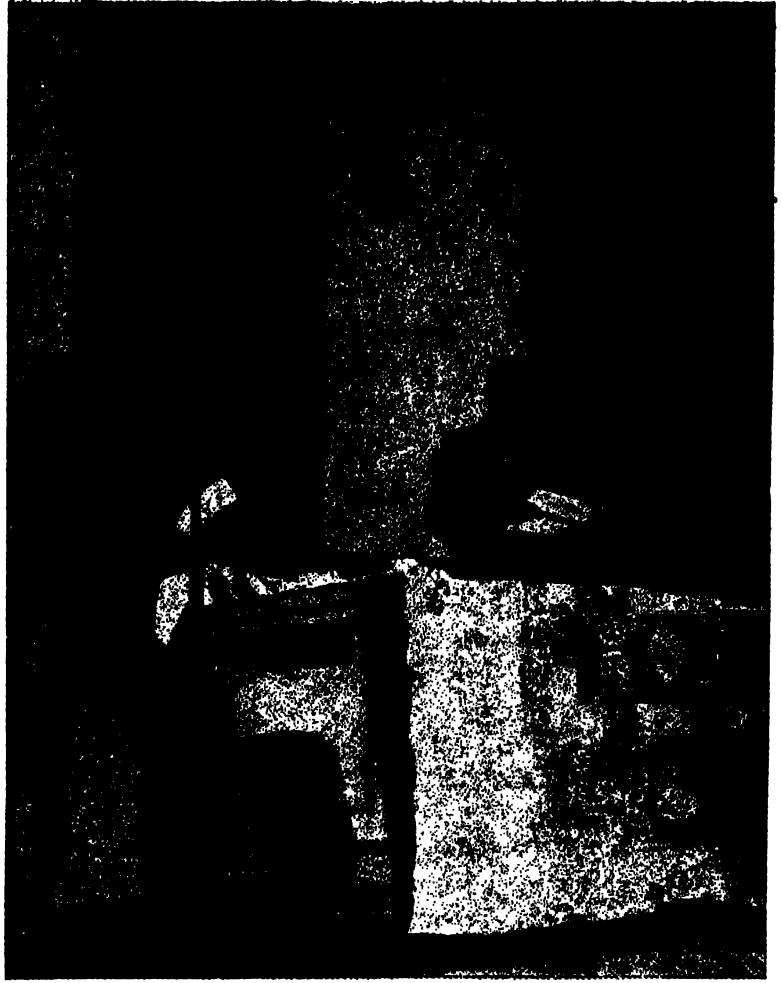
দিকেও সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আপনারা যেন শত্রু-শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান না করেন। আমাদের আসন্নপ্রায় যুদ্ধ হবে খুবই ভীষণ, খুবই কঠিন, অবর্ণনীয়—ইংরেজ তার সাম্রাজ্য রক্ষার্থে যে-কোন পন্থা বা কৌশল প্রয়োগ করতে ছাড়বে না। আমাদের প্রাণপণ চেষ্টায় ও জীবনদানেই আমরা পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে পারব। আত্ম-বিসর্জ্জনের জন্যে সকলকে প্রস্তুত হতে হবে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।"

এর পর লেঃ কর্ণেল ভোঁসলে সেনা বিভাগের পক্ষ হতে বললেন, "আমাদের নিকট আপনি আজ নূতন আশার বাণী বহন করে এনেছেন; আপনার আগমনে সৈন্যদের মধ্যে আজ এক অপূর্ব্ব জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। এতদিন আমরা এক মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে আসছি, আজ আমরা নেতার মত নেতা পেয়েছি যিনি আমাদের উৎসাহিত করে, পথ প্রদর্শন করে আমাদের বহুকালের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির, স্বাধীনতার পথে নিয়ে যাবেন। আমরা আপনার আদেশের জন্যে অপেক্ষা করছি—অনুমতি করুন উপযুক্ত সময়ে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

পরের দিন, ৫ই জুলাই—মিলিটারী পোশাকে সজ্জিত নেতাজী উন্নতশিরে দণ্ডায়মান; মুখে তাঁর এক অপূর্ব্ব দীপ্তি—তাঁকে ঘিরে সশস্ত্র রক্ষী দাঁড়িয়ে, সম্মুখে আজাদ হিন্দ বাহিনী। তিনি গুরুগম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন—"আজ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। আজ জগদীশ্বর আমাকে হিন্দুস্থানের মুক্তিকামী সৈন্যদলের অস্তিত্ব সমস্ত জগৎকে জানাবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ দিয়েছেন। এই সৈন্যদের কাজ শুধু হিন্দুস্থানের মুক্তিই নয়—ভবিষ্যতে জাতীয় সেনাদল গঠন করে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখাও এর কর্তব্য হবে। তা ছাড়া দরকার হলে যে-কোন শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে, এমন কি জাপানীদের বিরুদ্ধেও। আজ প্রত্যেক দেশবাসীর গর্ব্বের বিষয় এই যে, তাদের বাহিনী দেশীয় নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে এবং উপযুক্ত মুহূর্ত্তে সেই নেতার আদেশে তারা রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে * *। ১৯৩৯ সনে যখন ফরাসী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন প্রত্যেক জার্মান সৈন্যের মুখে রব উঠেছিল 'চলো প্যারিস', সেইরূপ জাপানীদের মুখে ধ্বনি উঠেছিল, 'চলো সিঙ্গাপুর'—তেমনই আমাদেরও যুদ্ধরব হবে 'চলো দিল্লী, চলো দিল্লী'। এই যুদ্ধে আমাদের মধ্যে কে কে বেঁচে থাকবে বলা কঠিন—কিন্তু আমরা জয়ী হবই হব এবং আমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তাদের কর্তব্য শেষ হবে না যে পর্যন্ত না তারা দিল্লীর লাল কেল্লাতে বিজয়োৎসব করবে। * * প্রত্যেক সিপাহীর আদর্শ হবে বিশ্বাস, কর্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মবলিদান এবং প্রত্যেককে হতে হবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ভীক ও অটল। বন্ধুগণ, তোমরা আজ যে কাজে ব্রতী এর চেয়ে মহৎ কাজ, গর্ব্বের কাজ ও সম্মানের কাজ আর নেই। আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি যে, আমি সুখে দুঃখে, আলোতে অন্ধকারে এবং জয়ে পরাজয়ে তোমাদের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করব * *।

৬ই জুলাই—জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো নেতাজীর পাশে দাঁড়িয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শন করেন। আজ নেতাজী ফৌজের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করলেন—আজ তিনি "সুপ্রীম কমাণ্ডার"—আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক। তিনি সে দিবস তাঁর একান্ত মনের কামনা জানাতে গিয়ে বললেন, "আমার পক্ষে এ আজ আনন্দের ও গর্ব্বের বিষয়, দেশের স্বাধীনতাকামী ফৌজের কমাণ্ডার হওয়ার চেয়ে বড় সম্মান আর নেই, আজ আমার দেশবাসী আমায় সেই সম্মানে বিভূষিত করেছেন যদিও এর গুরুত্ব, দায়িত্ব আমার নিকট অজ্ঞাত নয়। আমি ৩৮ কোটি দেশবাসীর সেবক এবং তাদের সুবিধার জন্যে নিজেকে সর্ব্বপ্রকারে নিয়োজিত করব। এ ছাড়া আপনাদের প্রত্যেককে আমাদের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা আয়ত্ত করবার জন্য আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে।"

নেতাজী সভাপতিত্ব গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের নানা পরিবর্ত্তন সাধন করেন এবং নূতন নূতন বিভাগ খোলেন, যথা—১। সামরিক প্রচার বিভাগ, ২। সিপাহী বিভাগ, ৩। সামরিক শিক্ষা বিভাগ, ৪। মহিলা বিভাগ, ৫। শিক্ষা ও চর্চ্চা বিভাগ ৬। অর্থ বিভাগ ৭। স্বাস্থ্য বিভাগ ৮। প্রচার, বিভাগ, ৯। সম্পাদকীয় বিভাগ, ১০। সামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ, ১১। বিজিত প্রদেশ সংগঠন ও শাসনবিভাগ ইত্যাদি। নিম্নে এ সকল বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হ'ল :—

সামরিক শিক্ষা বিভাগ—সৈন্য বিভাগে যোগ দেবার পূর্ব্বে প্রত্যেক শহরের আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের শাখার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বালক-বালিকাদের জন্যেও সে ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৈন্য বিভাগের মত ট্রেনিং ক্যাম্প (সেনানিবাস) খোলা হয় এবং অসংখ্য উৎসাহী ও উদ্যোগী বালক-বালিকা সামরিক শিক্ষা লাভার্থে সেগুলোতে যোগদান করে। এদের মধ্যে বাল-সেনাদলের কয়েকজন সাহসী বালক সামরিক শিক্ষার জন্যে টোকিয়োতে গমন করে। নেতাজী জানতেন—হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে এদেরই উপর—তাই এদের ঠিকমত গড়ে তুলতে হবে। এদের মধ্যে গোড়া থেকেই দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে—দেশকে, দেশবাসীকে, দেশের সম্মানকে, দেশের স্বাতন্ত্র্যকে কি করে রক্ষা করতে হয় শেখাতে হবে এবং সর্ব্বোপরি দেশকে কি করে ভালবাসতে হয় সে শিক্ষা তাদের দিতে হবে, কারণ যাকে ভালবাসা যায় তার জন্যে মরাও যায়। এই আদর্শে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের হাবভাব, চালচলন, তাদের মুখের সঙ্গীত, "জয় হিন্দ" সম্ভাষণ, তাদের প্রফুল্ল বদন, তাদের সত্যপরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা দেখে মনে হ'ত যেন এক নব আলোড়ন এসেছে এদের মধ্যে—এরা যেন এক নূতন যুগ সৃষ্টি করছে।

মহিলা বিভাগ—এই বিভাগের কাজ ছিল পূর্ব্ব-এশিয়ার সকল নারীকে একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করে স্বাধীনতা-আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা। এ ছাড়া যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষার্থিনী এবং সেবাব্রত গ্রহণে ইচ্ছুক মহিলাদের "রাণী ঝাঁসী" নামক সামরিক শিক্ষা বিভাগে ভর্ত্তি করা—যাতে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ভাইদের সেবা করেন এবং দরকারমত অস্ত্র ধরতেও পরাঙ্মুখ না হন। লেঃ কর্ণেল শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথন এর অধিনায়িকা।

এদিকে নেতাজী নানা দেশ ঘুরে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের ও ফৌজের তত্ত্বাবধান করে অবস্থানুযায়ী নির্দ্দেশ প্রদান করেন ও নানা স্থানে বক্তৃতা করে সিঙ্গাপুর ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে তিনি "সাময়িক আজাদ হিন্দ সরকার" স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। স্থির হ'ল যে, শুধু সাধারণ শান্তি রক্ষা করাই নয়—সংগ্রাম পরিচালনাদিই হবে এর প্রধান কাজ। এই সরকার মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের মুক্তির শেষ যুদ্ধ পরিচালিত করবে। ২১শে অক্টোবর তিনি সাময়িক গবর্ণমেণ্ট গঠনের এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করেন। বেলা ৪ ঘটিকার সময় বৈকালিক অধিবেশন সুরু হয়—হলঘর লোকে লোকারণ্য। নেতাজী "সাময়িক সরকার" স্থাপনের উদ্দেশ্য সকলের নিকট জ্ঞাপন করে বলেন—"আমরা যখন হিন্দুস্থানে প্রবেশ করব তখন এই সরকার অন্যান্য স্বাধীন দেশীয় সরকারের মত স্বরাজ্যে বসে শাসনকার্য্য পরিচালিত করবে। পূর্ব্ব হতেই আমাদের সব কিছুই প্রস্তুত আছে কেবলমাত্র যুদ্ধ আরম্ভেরই বিলম্ব। আমরা শুধু অপেক্ষা করছি কোন্ শুভক্ষণে আমাদের ফৌজ হিন্দুস্থানের সীমানার ভিতর পৌঁছে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হবে এবং আমাদের জাতীয় পতাকা নয়া দিল্লীতে বড়লাটের প্রাসাদের উপর গর্ব্বভরে উড়বে।" এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক হতে তুমুল হর্ষধ্বনিতে হলঘর পরিপূর্ণ হ'ল। যথাক্রমে মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করা হ'ল। এরপর সুরু হ'ল "আর্জ্জী হকুমাৎ"—সরকার ও নেতার উপর আনুগত্যসূচক শপথ গ্রহণ।

সে এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য। নেতাজী প্রথমে প্রতিজ্ঞাপত্র সামনে ধরে দাঁড়ালেন এবং গম্ভীর স্বরে পড়তে লাগলেন, "ভগবানের নামে আমি এই মহান্ শপথবাক্য গ্রহণ করছি যে, হিন্দুস্থানকে এবং আমার ৩৮ কোটি দেশবাসীকে মুক্ত করতে আমি, সুভাষচন্দ্র বসু, আমার শেষ দিন পর্য্যন্ত এই পবিত্র মুক্তি-যুদ্ধ চালাতে থাকব।" বলতে বলতে নেতাজীর বাক্‌রোধ হয়ে এল এবং তাঁর চোখ হতে কয়েক ফোঁটা জল বেরিয়ে এল। চারদিক নিস্তব্ধ, সকলের চোখ ছল ছল—নেতাজী চোখ মুছে পড়তে লাগলেন, "আমি সর্ব্বদা দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করব এবং ৩৮ কোটি ভ্রাতাভগ্নীর সুখসুবিধা দেখাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরেও তা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকব।"

এর পর একে একে সকলেই নেতাজীর নিকট শপথবাক্য গ্রহণ করলেন।

২২শে অক্টোবর—নেতাজী "রাণী ঝাঁসী" রেজিমেণ্টের উদ্বোধন করেন এবং হিন্দুস্থানের বীর নারীদের দৃষ্টান্ত সকলের নিকট ব্যক্ত করেন।

২৪শে অক্টোবর—আজ তিনি ৫০,০০০ লোকের সম্মুখে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ২৩শে অক্টোবর ১৯৪৩ সন রাত্রি ১২.০৫ মিনিটের সময় আজাদ হিন্দ সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার কথা বিবৃত করেন। জনতা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—চতুর্দ্দিক হতে ইনক্লাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, নেতাজী কী জয় রবে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল।

ইতিমধ্যে নেতাজী বেতার যোগে গান্ধীজীর নিকট এই বার্ত্তা প্রেরণ করেন, "আপনি জাতির পিতৃস্বরূপ, হিন্দ-স্বাধীনতার ধর্ম্মযুদ্ধে আমরা আপনার আশীর্ব্বাদ এবং শুভেচ্ছা যাচ্ঞা করি * * *।"

এর পর ৬ই নভেম্বর টোকিয়োতে বিখ্যাত "পূর্ব্ব-এশিয়া সম্মেলনের অধিবেশন" বসে, সেখানে পূর্ব্ব-এশিয়ার সকল দেশের বড় বড় নেতারা যোগ দিয়েছিলেন। নেতাজী সেখানে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং পরদিন জাপান সম্রাট "তেন্নো হেইকা"র সহিত আলাপ করেন।

৯ই ডিসেম্বর আজাদ হিন্দ সরকারের এক বৈঠক বসে। সেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ঠিক করা হয়—১। হিন্দুস্থানী হবে রাষ্ট্রভাষা, ২। জয়হিন্দ হবে হিন্দুস্থানীদের সম্ভাষণ, ৩। ত্রিবর্ণ পতাকা হবে হিন্দুস্থানের জাতীয় পতাকা, ৪। "সুখ-সুখ-চয়ন কি বরখা বরষে ভারত নাম হায় জাগা"—এই গানটি হবে জাতীয় সঙ্গীত, ৫। "ব্যাঘ্র" হবে জাতীয় চিহ্ন, ৬। 'চলো দিল্লী' হবে জাতীনাদ (যুদ্ধনিনাদ)।

১৯শে ডিসেম্বর নেতাজী আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করেন এবং পোর্ট ব্লেয়ারের কয়েদখানা পরিদর্শন করেন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ সরকারের দ্বারা শাসিত হয়। মেজর জেনারেল লোকনাথনকে নেতাজী এর "চিফ্ কমিশনার" নিযুক্ত করে পাঠান। নেতাজী আন্দামানকে "শহীদ দ্বীপ" ও নিকোবারকে "স্বরাজ দ্বীপ" নামে অভিহিত করেন।

৭ই জানুয়ারী ১৯৪৪ সন, নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকার এবং সামরিক বিভাগ, "সুপ্রিম কমাণ্ড"কে ব্রহ্মদেশে স্থানান্তরিত করেন হিন্দুস্থানের পূর্ব্বদ্বারে আক্রমণাত্মক অভিযানের আদেশের অপেক্ষায়। 'ঝাঁসী রাণী বাহিনী'র নারীসৈন্যেরাও তাঁর আদেশ মুক্তার্থে প্রস্তুত হ'ল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ সন আজাদ হিন্দ ফৌজ আরাকান প্রদেশে ব্রিটিশ সৈন্যদের উপর বীর বিক্রমে লাফিয়ে পড়ল।

—"ঐ দূরে, নদী বন পর্ব্বতমালার শেষে আমাদের পুণ্য জন্মভূমি। দিল্লী আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওঠ, অস্ত্র ধর, সম্মুখে অগ্রসর হও। হয় আমরা জয়ী হব নয় মৃত্যু বরণ করব এবং আমাদের অন্তিম সময়ে আমরা দিল্লী যাওয়ার পথকে আলিঙ্গন করব—দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ—চলো দিল্লী।"—নেতাজীর এই বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ মৃত্যুবরণ করতে বদ্ধপরিকর হ'ল। সকল ভারতীয়ের মনে আজ নব আশা, নব প্রেরণা, অভিনব উত্তেজনা।

২১শে মার্চ্চ, ১৯৪৪ সন আজাদ হিন্দ বাহিনী মাতৃভূমি হিন্দুস্থানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নেতাজী ব্রিগেডের কমাণ্ডার মেজর-জেনারেল শাহ্ নওয়াজ প্রথম হিন্দুস্থানের মাটির উপর তিনরঙা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। ফৌজ প্রবল উৎসাহের সহিত মণিপুর-রাজধানী ইম্ফল অবরোধ করে তুমুল যুদ্ধ চালান এবং অন্য দিকে আসামে ঢুকে অগ্রসর হতে লাগল।

ইতিমধ্যে আজাদ হিন্দ "ব্যাঙ্ক"ও খোলা হ'ল। অতঃপর নেতাজী সামনে গিয়ে সৈন্যদের উৎসাহ বর্দ্ধন করতে লাগলেন, সাধারণ সিপাহীর ন্যায় সব রকম অসুবিধা স্বেচ্ছায় সানন্দে বরণ করলেন।

কিন্তু হঠাৎ ইম্ফল পাহাড়ে বর্ষাবৃষ্টির সূচনা হ'ল এবং বারি-বর্ষণ ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে সংবাদ আদান-প্রদান, খাদ্য সরবরাহ এবং ফৌজের চলাচলের পথ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হ'ল। এটা জানা কথা যে,কয়েক মাসের জন্যে রাস্তাঘাট জলপ্লাবিত থাকবে, কাজেই "ফিরে আসার" আদেশ দেওয়া হ'ল। কিন্তু জলকষ্ট ও খাদ্যাভাব উপেক্ষা করে ফৌজ সেখানেই থেকে যেতে চাইলে এবং তীব্র প্রতিবাদ করে জানালে "নেতাজী আমাদের আদেশ দিয়েছেন দিল্লীর দিকে অগ্রসর হতে—পিছনে ফেরবার ত আদেশ দেন নি, বরঞ্চ তিনি সাবধান করে দিয়েছেন আমরা যেন কিছুতেই পিছু না হটি। এত দিন আমরা ঘাস-পাতা খেয়েই বেঁচে আছি—এখনও আমরা তাতেই চালাতে পারব—আমরা শত্রুকে তাড়া করে সামনের দিকেই পা বাড়াব।" কিন্তু নেতাজীর স্বহস্তলিখিত আদেশ পেয়ে কারুরই প্রতিবাদ টিকল না—অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগ্নহৃদয়ে তারা ফিরে এল। নেতাজী তাদের সান্ত্বনা দিয়ে পরবর্তী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে বললেন। তিনি সমস্ত মালয় দেশ ঘুরে ঐ বিপর্য্যয়ে আলোড়িত জনসাধারণের মনকে আবার জাগিয়ে তুলতে লাগলেন।

২১শে জানুয়ারী ১৯৪৫ সনে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী বসু পরলোকগমন করেন।

ক্রমে ইংরেজরা ব্রহ্মদেশের ভিতর প্রবেশ করতে লাগল। রেঙ্গুন দখলের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও নেতাজী তাঁর প্রিয় ফৌজকে ছেড়ে চলে আসেন নি। তিনি একরকম ঠিকই করেছিলেন, "হয় করব, নয় মরব"। ফৌজ রেঙ্গুনের আশে-পাশে যুদ্ধ চালাচ্ছে। মন্ত্রিগণ ও মিলিটারী অফিসারগণ তাঁকে বারংবার ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থান হতে আবার যুদ্ধ চালাবার জন্যে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। পরিশেষে সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে 'রাণী ঝাঁসী' বাহিনীর নারী-সৈন্যদের ও কিছু সিপাহী নিয়ে পদব্রজে ৩০০ মাইল পথ তিন সপ্তাহে অতিক্রম করে ১৪ই মে রাজধানী ব্যাঙ্কক পৌঁছলেন। পথে শত্রুর গোলবর্ষণ চলছিল। সম্মুখে এক নদী পার হওয়ার সময় সকলকে নিরাপদে ওপারে না পাঠিয়ে কিছুতেই তিনি নদী পার হতে রাজী হলেন না। সকলের শেষে তিনি এলেন।

ব্যাঙ্কক পৌঁছে ২১শে মে তিনি যুদ্ধরত সৈনিক ও অফিসারদের একটি বিশেষ আদেশ প্রেরণ করেন, "ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমাকে ব্রহ্মদেশ—যেখানে তোমরা আজো যুদ্ধ চালাচ্ছ এবং যে স্থানের শত স্মৃতি আমার মনে ভেসে আসছে—ছেড়ে আসতে হ'ল। তোমাদের সেই সব বীরত্বপূর্ণ কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। বন্ধুগণ, আজ তোমাদিগকে আমার একটিমাত্র আদেশ দেওয়া বাকি আছে—যদি কিছু কালের জন্যে তোমাদিগকে আবার এসে ঘিরে ফেলে তা হলে বীরত্বের সহিত, সুশৃঙ্খলার সহিত এবং ইজ্জতের সহিত আমাদের জাতীয় পতাকার সম্মান রেখে মরো। অনাগত হিন্দ-সন্তান, যারা স্বাধীন হয়ে জন্মাবে, তারা তোমাদের বীরত্বের কাহিনী এবং ত্যাগের আদর্শ জগতের নিকট ঘোষণা করবে। আমি তোমাদের হাতে হিন্দুস্থানের সম্মান এবং আমাদের জাতীয় পতাকা রেখে নিশ্চিন্ত। কারণ তোমাদের শক্তির উপর আমার অটল বিশ্বাস আছে—মনে রেখো অন্ধকারের পরেই আলো। হিন্দুস্থান অচিরেই স্বাধীন হবে। জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।"

ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতিরক্ষার্থে ৮ই জুলাই, ১৯৪৫ সনে নেতাজী "আজাদ হিন্দ স্মৃতিস্তম্ভ" নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু বৃটিশ ভারতীয় সৈন্য সিঙ্গাপুর দখল করলে এবং ঐ পথে যাবার সময় মিলিটারী কায়দায় সম্মান দেখালে ইংরেজ তা ধূলিসাৎ করে দেয়।

পূর্ব্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়দের উপর দিয়ে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা বইবার পরও তাদের অদম্য উৎসাহ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে নেতাজী নূতন করে যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন—কিন্তু ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৫ সনে জাপানের হঠাৎ আত্মসমর্পণে সবই অসম্পূর্ণ রয়ে গেল এবং সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে নেতাজী টোকিয়োর উদ্দেশে যাত্রা করেন। যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে সম্বোধন করে তাঁর শেষ আদেশ রেখে যান, "বন্ধুগণ, আমাদের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমরা বহু অচিন্তনীয় সমস্যার সম্মুখে এসে পড়েছি। তোমরা হয়ত মনে করবে, তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে অকৃতকার্য্য

হয়েছে এবং অনেক কিছু হারিয়েছ, কিন্তু না, তোমরা বিশেষ কিছুই হারাও নি, তোমরা যা পেয়েছ তা অতুলনীয়। তোমরা অনেকেই তোমাদের শক্তির এবং আত্মোৎসর্গের প্রকৃত প্রমাণ দিয়েছ সকল স্থানে। শৃঙ্খলার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত প্রকৃত বিপ্লবী সেনার উপযুক্ত সম্মান—যা তোমরা এতদিন অক্ষুণ্ণ রেখেছ—শত বাধাবিঘ্ন ও দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে তা রক্ষা করা এবং সে পথ হতে বিচলিত না হওয়াই এখন তোমাদের কর্ত্তব্য। দিল্লী যাওয়ার পথ অনেক দূর—দিল্লীই আমাদের গন্তব্য স্থান। জগতে কোন শক্তিই নেই যা হিন্দুস্থানকে আর বেঁধে রাখতে পারে—অচিরেই হিন্দুস্থান স্বাধীন হবে। জয় হিন্দ।"

তিনি আর এক বার্ত্তা সমস্ত ভারতীয়ের জন্যে রেখে যান। "ভগ্নী ও ভাইগণ, হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা-যুদ্ধের এক অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত শেষ অধ্যায়ে তোমাদের স্থান হবে অমর। ধন-দৌলতের অফুরন্ত স্রোতের ধারা এবং আন্তরিক উৎসাহদ্বারা স্বাধীনতা-যুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করবার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জীবনে আমি কখনও ভুলতে পারব না। তোমরা দেশের প্রকৃত সন্তানের কর্ত্তব্য করেছ। তোমাদের চেয়েও আমার দুঃখ বেশী এই যে, তোমাদের ত্যাগের ফল যথানুরূপ সময়ে ফলে নি, কিন্তু তা বৃথা যাবে না—সমস্ত হিন্দুস্থান তোমাদের ত্যাগে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। এ ক্ষণিকের বিপর্য্যয়ে নিরুৎসাহ হয়ো না, নিজেদের উদ্যোগী করে তোলো—কাজ রয়েছে অনেক। হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা সম্মুখে, জয় হিন্দ।"

নেতাজীর চরিত্রবিশ্লেষণ করা কঠিন। তাঁকে জগতের যে-কোন বড় নেতার সমান সম্মান দেওয়া যায়। তিনি একবার যা মনস্থ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন তা কার্য্যে পরিণত করতে উঠে-পড়ে লাগতেন, এ ছিল তাঁর বিশেষত্ব। শত বাধাবিঘ্ন তাঁকে তাঁর কর্ত্তব্য হতে বিচলিত করতে পারে নি। তাঁর অসাধারণ কর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁর চরিত্রবল, তাঁর ক্ষমতা, তাঁর উপদেশ, তাঁর স্বভাব, তাঁর দেশপ্রীতি সকলকে মুগ্ধ করেছে। তিনি যখন কাজ করতেন তখন অন্য কোন দিকেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ থাকত না—না আহার, না নিদ্রা—অনেক সময়ই তিনি মাত্র দু'তিন ঘণ্টা ঘুমোতেন।

১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ সনে বিমান-দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ আসে। কিন্তু কেউই তা আজ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারে নি। আমাদের বিশ্বাস নেতাজী জীবিত আছেন—উপযুক্ত সময়ে তিনি ফিরে আসবেন।

কিন্তু তিনি যদি ফিরে না আসেন—তাঁর কাজ, তাঁর উচ্চ আদর্শ কি তাঁর সঙ্গেই শেষ হবে? তা নয়, চোখের জলেই নেতাজীর স্মৃতিপূজা শেষ হবে না তাঁর অসমাপ্ত কাজকে সুসম্পূর্ণ করলেই দেশবাসী নেতাজীর প্রতি তাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে।

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মানুষের চোখে দেখার ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। অতি ক্ষুদ্র বস্তুর স্বরূপ সাদা চোখে ধরা পড়ে না। এক সেন্টিমিটারের শতাংশ ('০০৪ ইঞ্চি) পরিমিত ক্ষুদ্র বস্তুর একটির সঙ্গে অপরটি অঙ্গাঙ্গি হইয়া থাকিলে উহাদের পৃথক অস্তিত্ব আমরা চোখের দৃষ্টিতে বুঝিতে পারি না। চিনির দানা একটি একটি করিয়া বাছাই করিতে পারিলেও ময়দার কণিকার স্বাতন্ত্র্য চোখে ধরিতে পারি না। বহুকাল মানুষ দৃষ্টির এমনই সীমাবদ্ধ শক্তি দ্বারা বিশ্বের বিচার করিয়াছে, চোখে-দেখা গণ্ডীর বহির্ভূত বিরাট সত্তার কথা সে ভাবিতেও পারে নাই।

একাদশ শতাব্দীতে কাচের লেন্সের সাহায্যে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখিবার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তখন মানুষের দৃষ্টির পরিধি আরও দশগুণ প্রসারিত হইয়াছিল, '০০১ সেন্টিমিটার স্থান জুড়িয়া যাহারা অবস্থান করে তেমনি ক্ষুদ্র বস্তুর স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়িয়াছিল।

হল্যাণ্ডের এণ্টনি লিওয়েন হোয়েক (১৬৫০) সর্ব্বপ্রথম একাধিক লেন্সের সমন্বয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নির্ম্মিত যন্ত্রের সাহায্যেই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টির অন্তরালে স্থিত জীবলোকের অস্তিত্ব জানা যায়। তৎপূর্ব্বে জীবাণুর কথা মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। তারপর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্রমোন্নতি হইয়াছে এবং মানুষের দৃষ্টিশক্তি সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইয়া এক সেন্টিমিটারকে লক্ষ ভাগে ভাগ করিয়াও দেখিতে সমর্থ হইয়াছে। যদিও একথা বেশ জানা ছিল যে, বস্তুর আকৃতির ক্ষুদ্রত্বের উহাই শেষ সীমা নহে তবুও ইহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল যে, যান্ত্রিক দৃষ্টির গণ্ডী উহার পরে আর সম্প্রসারিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেন?

আলোকরশ্মি সরল রেখায় গমন করে এবং ইহারই ফলে অনচ্ছ পদার্থের ছায়া পড়ে—জ্যামিতিক আলো-বিজ্ঞানের ইহা মূল স্বীকৃত সত্য। অণুবীক্ষণের কার্য্য-প্রণালী অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে উহাতে প্রধানত দুইটি লেন্স থাকে—একখানা লক্ষ্য-বস্তুর খুবই কাছে (অবজেকটিভ) অপর খানা

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ
(পার্শ্বে দণ্ডায়মান জোরিকিন, উপবিষ্ট হিলিয়র)

চোখের সামনে (আইপীস)। তৃতীয় আর একখানা লেন্সের (কণ্ডেনসর) সাহায্যে কোনো আলোর উৎস হইতে রশ্মি গ্রহণ করিয়া উহা কেন্দ্রীভূত অবস্থায় অবজেকটিভের উপর ফেলানো হয়। কণ্ডেনসর ও অবজেকটিভ উভয়ের মাঝখানে থাকে দ্রষ্টব্য বস্তু। তাই আলোকরশ্মিকে অবজেকটিভে পৌঁছিবার পূর্ব্বে এই বস্তুকে অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। ইহারই ফলে আপতিত আলোকরশ্মির খানিকটা অংশ দ্রষ্টব্য বস্তুতে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া অবজেকটিভ লেন্সে যে আলো প্রবেশ করে তাহা অবিমিশ্র আলো নহে, উহাতে লক্ষ্য-বস্তুর ছায়া থাকিয়া যায়। অবজেকটিভ লেন্সে গৃহীত আলোকরশ্মি লেন্স হইতে নির্গত হইয়া আইপীসের সম্মুখদেশে লক্ষ্য-বস্তুর একটি আলোছায়ার আঁকা প্রতিকৃতি বা সদ্‌বিম্ব সৃষ্টি করে—যাহা লক্ষ্যবস্তুর চেয়ে আকারে অনেকাংশে বৃহত্তর। অতঃপর আইপীসের সাহায্যে এই সদ্‌বিম্বকে আরও বৃহদাকারে চোখে দেখিবার ব্যবস্থা কিংবা ফোটো লেন্সের দ্বারা ফোটোপ্লেটে ফেলিবার উপায় করা হইয়া থাকে।

এই যন্ত্রের কার্য্য-প্রণালী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে আলো সরল রেখায় গমন করে বলিয়া অনচ্ছ লক্ষ্যবস্তুর যে ছায়ার উৎপত্তি হয় লেন্সের সাহায্যে ঐ ছায়াকে বৃহদাকারে পরিণত করা হইয়া থাকে। লেন্স যত শক্তিশালী হইবে ছায়ার আকার তত বড় হইবে। কোন বস্তুকে চোখে দেখিবার উপযুক্ত হইতে হইলে উহার আকৃতি অন্তত '০১ সেন্টিমিটার হওয়া প্রয়োজন। বস্তুর আকৃতি ঐ পরিমাণের কম হইলে উহার ছায়া সৃষ্টি করিয়া তাহার আকৃতি ইচ্ছামত বড় করিয়া লইতে পারি। সুতরাং ছায়ার মধ্যবর্ত্তিতায় অদৃশ্য ক্ষুদ্র বস্তুকে দেখা সম্ভব। ছায়া সৃষ্টি ও উহার বিবর্দ্ধনকার্য্য এই দুই ব্যাপারকে পৃথক করিয়া ভাবিলে সুবিধা হইবে— ছায়া সৃষ্টির জন্য আলোক-রশ্মিকে সরল রেখায় চলিতে হইবে, আবার সেই ছায়াকে চোখে দেখিবার উপযুক্ত করিতে হইলে উহার বিস্তৃতি অন্তত '০১ সেন্টিমিটার করিতে হইবে। আলোর গতি-পথে কোন বস্তুকণিকা পতিত হইলে আলোর ধর্ম্মানুযায়ী পদার্থটির আকৃতির অনুসারে ছোট-বড় একটি ছায়ার উৎপত্তি হয়, উহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার উপযুক্ত আকৃতি প্রদান করিতে পারে লেন্স উহার বিশেষ গুণের প্রভাবে। কিন্তু যদি কোন বস্তুর ছায়া না পড়ে (অর্থাৎ যদি উহা স্বচ্ছ হয়) তবে লেন্সের ক্রিয়া নিষ্ফল। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রোগ-জীবাণু দেখিবার পূর্ব্বে জীবাণুর স্বচ্ছতা দূরীকরণার্থ উহাদের গায়ে রং লাগান হয়।

খুবই ক্ষুদ্র অনচ্ছ বস্তুর সম্মুখ দিক হইতে আলো ফেলিয়া তাহার পিছনের ছায়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, সেখানে বস্তুটির আকৃতির অনুরূপ অবিকৃত ছায়া পড়ে না। একটি সূঁচ বা ব্লেডের ধারালো অংশের ছায়াকে লেন্সের সাহায্যে বড় করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে উহা মোটেই মূল জিনিসের প্রতিকৃতি নহে। ছায়া দেখিয়া কায়ার ধারণা করা চলিবে না, যেখানে ছায়া হইবার কথা সেখানে আলো প্রবেশ করিয়া ছায়ার বৈশিষ্ট্য তথা বস্তুটির আকৃতির স্বরূপ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। হাতের যে-কোন দুই অঙ্গুলিকে একত্রিত অবস্থায় রাখিলে উহাদের অভ্যন্তরে সামান্য ফাঁক থাকিয়া যায়। তাহার ভিতর দিয়া তাকাইলে ঐ ফাঁকের মধ্যে কতকগুলি কালো দাগ দেখা যাইবে। এই ক্ষেত্রে যে স্থানে আলো থাকা উচিত সেখানে রহিয়াছে অন্ধকার। এই ব্যাপারের কারণানু-সন্ধান করিতে গিয়া দেখা গেল যে, আলোকরশ্মি একান্তভাবে সরল রেখায় গমন করে না—খানিকটা বাঁকিয়া যাইতে পারে। খুবই ছোট পদার্থ হইলে আলোকরশ্মি উহাকে ডিঙাইয়া যাইতে সমর্থ হয়, তাই সূঁচ বা তারের ছায়ার ভিতরেও আলোর রেখা থাকে, আবার ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে আলোকরশ্মি নির্ব্বিবাদে চলাফেরা করিতে পারে না বলিয়াই অঙ্গুলির ফাঁকে কালো রেখার সৃষ্টি হয়। সূঁচের চেয়ে আরও ক্ষুদ্রাকৃতি বস্তুতে আলোকরশ্মি মোটেই বাধা পায় না এবং অঙ্গুলির ফাঁকের চেয়েও রন্ধ্রপথকে আরও এমন ছোট করা যাইতে পারে যে আলো যাহার ভিতর দিয়া যাইতেই পারে না।

অণুবীক্ষণের নীচে একান্ত ক্ষুদ্র কণিকা রাখিয়া দিলে উহারা আলোকরশ্মির পথে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে না, সুতরাং উহাদের কোন সুস্পষ্ট ছায়াও পড়ে না। যে সকল অনচ্ছ বস্তুর আকৃতি এক সেন্টিমিটারের লক্ষ ভাগের চেয়েও কম,
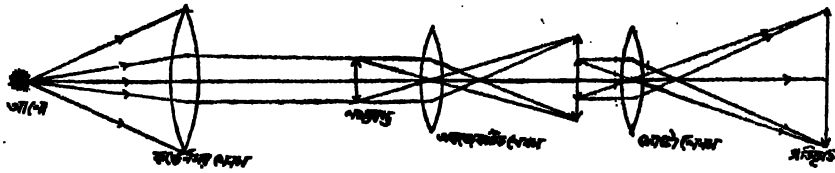
অণুবীক্ষণের কার্য্যপ্রণালী

উহারা আলোকরশ্মির কাছে স্বচ্ছ পদার্থের ন্যায় প্রতিভাত হয় বলিয়া অণুবীক্ষণে উহাদের স্বরূপ জানা যায় না। অণুবীক্ষণের এই অক্ষমতা লেন্সের ত্রুটিজনিত নহে। ইহার মূলে রহিয়াছে আলোকতরঙ্গের বৈশিষ্ট্য। যে বস্তুর আকৃতি আলোর তরঙ্গের তুলনায় বড়, তরঙ্গ উহাদের ডিঙাইয়া যাইতে পারে না এবং আলো এই প্রকার বস্তুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়—এইজন্য আলো সরল রেখায় গমন করে এবং বস্তুর আকারের অনুরূপ একটি ছায়া সৃষ্টি করে। কিন্তু অস্বচ্ছ বস্তুর আকৃতি আলোকতরঙ্গের সমপর্য্যায়ের হইলে আলোকরশ্মি বাঁকাপথেও চলে। এই সব ক্ষেত্রে ছায়াসৃষ্টির জ্যামিতিক নিয়মগুলি আর প্রযোজ্য হয় না।

দুইটি কণিকা যদি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেক দূরত্বে অবস্থিত হয় তবে উহাদের স্বতন্ত্র ছায়া পড়ে না, উহারা মিলিতভাবে একটি ছায়া সৃষ্টি করে। সেই অবস্থায় লেন্সের বিবর্দ্ধনক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া গেলেও উহাদের পৃথক অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। আমরা বিভিন্ন বর্ণের যে আলো দেখি উহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তারতম্য আছে। কোন আলোর তরঙ্গই দৈর্ঘ্যে এক সেণ্টিমিটারের লক্ষাংশের চার হইতে আটগুণের (·০০০০৪-·০০০০৮ সেঃ মিঃ) বেশী নহে। বেগুনী আলোর তরঙ্গ সবচেয়ে ছোট। ঐ আলোতে কোন বস্তুকে দেখিলে অণুবীক্ষণের ক্ষমতা চরমে পৌঁছায়। কিন্তু তাহাতেও ·০০০০২ সেণ্টিমিটারের চেয়ে ছোট জিনিষকে দেখা যায় না। এখানে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই আকারের জিনিষকে চোখে দেখিতে হইলে উহাকে অন্তত পাঁচ শত গুণ বড় করিয়া লইলেই চলে। অণুবীক্ষণের লেন্সের বিবর্দ্ধন-ক্ষমতা ইহার চেয়েও তিন গুণ (পনর শত) করা সম্ভব হইয়া থাকিলেও তাহাতে ·০০০০২ সেণ্টিমিটারের চেয়ে ক্ষুদ্রতর জিনিষকে দেখা যায় না। মনে করুন দুইটি কণিকা ·০০০০২ সেণ্টিমিটারের কম দূরত্বে রহিয়াছে। অণুবীক্ষণযন্ত্রে চরম বিবর্দ্ধন করিয়াও উহাদের পৃথকত্ব উপলব্ধি করা চলিবে না। কারণ আলোর তরঙ্গ উহাদের আভ্যন্তরীণ ফাঁক দিয়া সুষ্ঠুভাবে নির্গত হইতে পারে না। দুই ছায়ার ভিতরেও আলোকরেখার ব্যবধান না থাকিলে উহাদের স্বাতন্ত্র্য বুঝা যায় না। যন্ত্রের সাফল্য এখানে আসিয়া আলোর তরঙ্গের বিচিত্র ব্যবহারের কাছে হার মানিয়া গেল। আলোক-তরঙ্গের আকৃতি ছোট করিতে না পারিলে অণুবীক্ষণের ক্ষমতা বাড়াইবার উপায় নাই জানিয়াই একথা বলা হইত যে ·০০০০২ সেণ্টিমিটারের চেয়ে ছোট জিনিষকে আমরা কোনক্রমেই দেখিতে পারিব না। অতঃপর অণুবীক্ষণের ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য আলোকে বাদ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

বেগুনী আলোর তরঙ্গের চেয়ে আরও ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ রহিয়াছে অদৃশ্য আলট্রা-ভায়লেট রশ্মির। এই রশ্মি আলোর অনুভূতি জাগায় না বটে, কিন্তু তবুও ইহারা আলোর সমধর্মী। দর্শনেন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিয়া চলিলেও ইহারা ফোটোপ্লেটে ধরা দেয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কণ্ডেনসরে দৃশ্য আলো ব্যবহার না করিয়া আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিদ্বারা ছায়া সৃষ্টির কাজ চালাইলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর বস্তুর অবিকৃত ছায়ার উৎপত্তি সম্ভব, কেননা, এই রশ্মির তরঙ্গের আকৃতি ছোট। আলট্রা-

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের কার্য্যপ্রণালী
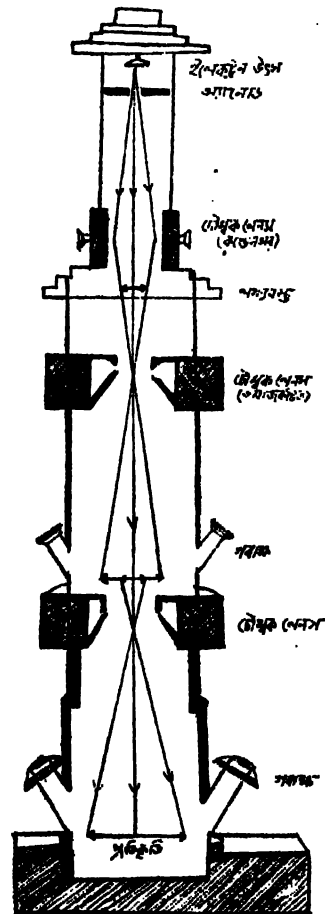
ভায়লেট রশ্মির যে ছায়া পড়িবে উহা চোখে দেখা না গেলেও ফোটো-প্লেটে ধরা পড়িবে। আলট্রা-ভায়লেট অণুবীক্ষণদ্বারা ·০০০০১ সেন্টিমিটার পরিমিত বস্তুর স্বতন্ত্র ফোটো তোলা সম্ভব হইয়াছে।

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে যক্ষ্মা জীবাণু
(সাধারণ অণুবীক্ষণে এই জীবাণুর এত খুঁটিনাটি অংশ দেখা যায় না)

রণ্টজেন-রশ্মি ও গামা-রশ্মির তরঙ্গ আলট্রা-ভায়লেট তরঙ্গ অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর। কিন্তু ইহাদের সাহায্যে অণুবীক্ষণের কার্য্য করা সম্ভব নহে। লেন্সদ্বারা আলোকরশ্মির গতিপথ পরিবর্ত্তিত করিয়া উহাকে কেন্দ্রীভূত করিতে না পারিলে কোন বস্তুর ছায়া বা সদবিম্বকে বৃহত্তর আকার দেওয়া সম্ভব নহে। আলোকরশ্মি সরল রেখায় গমন করে বটে, কিন্তু এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে গমনকালে উহার গতিপথ ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হয়। আলোকরশ্মি বায়ু ছাড়িয়া যখন কাঁচের লেন্সে প্রবেশ করে তখন ঐ রশ্মি বাঁকিয়া যায়। লেন্সের বক্রপৃষ্ঠ উহাকে একটি বিশেষ গুণের অধিকারী করিয়া থাকে। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দু হইতে যতগুলি রশ্মিই লেন্সের বিভিন্ন অংশে আপতিত হউক না কেন, লেন্স হইতে বহির্গত হইয়া উহারা আবার একই বিন্দুতে মিলিত হয়। লেন্সের এই বিশেষ গুণ আছে বলিয়াই উহারই মধ্যবর্ত্তিতায় কোন বস্তুর সদবিম্ব সৃষ্টি করা সম্ভব এবং ইচ্ছামত ঐ সদ্‌বিম্বের আকৃতি বড় বা ছোট করিয়া লওয়া চলে। দৃশ্য আলোক এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর ভিতরে প্রবেশকালে বাঁকিয়া যায়, কিন্তু রণ্টজেন-রশ্মি বা গামা-রশ্মি অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এই জাতীয় রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারে এমন ক্ষমতা কোন লেন্সেরই নাই। অণুবীক্ষণের কার্য্যে ইহাদের ব্যবহার সম্ভব না হইলেও ইহা জানা ছিল যে, রণ্টজেন-রশ্মির অনুরূপ ছোট তরঙ্গ সুবিধামত ব্যবহার করিতে পারিলে অণুবীক্ষণের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি করা সম্ভব।

দৃশ্য আলোকে দেখা অণুবীক্ষণের ক্ষমতার গণ্ডী অধিকতর সম্প্রসারিত করা কেন সম্ভব নয় সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির জটিলতা পরিহার করিয়া মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, আলোর তরঙ্গের চেয়ে যথেষ্ট ছোট আকারের জিনিসকে পৃথক ভাবে দেখা সম্ভব নহে, কারণ আলোক-তরঙ্গের এই বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যে, উহার আকৃতির তুলনায় ক্ষুদ্রতর অবচ্ছ বস্তু রশ্মিকে প্রতিরোধ করিতে পারে না, আবার কোন রন্ধ্রপথ যদি আলোর তরঙ্গের তুলনায় ক্ষুদ্রতর হয় তবে ঐ পথে আলোকতরঙ্গের পক্ষে যাহা অসম্ভব ইলেকট্রনের তাহা সাধ্যায়ত্ত বটে।

পদার্থের পরমাণুর অন্যতম উপাদান ইলেকট্রন। ইহাই তড়িৎ-গ্রস্ত ক্ষুদ্রতম পদার্থ কণিকা। ইলেকট্রনের চলাচলের ফলেই তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি। কোন কোন ধাতব তারকে উত্তাপ দিলে উহার পরমাণু হইতে স্বতঃই ইলেকট্রন নির্গত হয়। তড়িৎক্ষেত্রের আকর্ষণে ইহাকে বেগযুক্ত করা যায়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, অতি বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রন চলিবার সময় আলোর তরঙ্গের ন্যায় ব্যবহার করে। ইহারাও সরল রেখায় গমন করে এবং ইহাদের গতিপথে কোন বস্তু পতিত হইলে ইলেকট্রন তাহাতে আটকাইয়া যায়। ডিব্রোগলি (১৯২৪) প্রমাণ করেন, বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রনের চলার রীতির সঙ্গে আলোর তরঙ্গের মিল আছে। কোন পদার্থের নিকট দিয়া চলিবার সময় আলোর রশ্মি যে নিয়ম মানিয়া চলে ইলেকট্রন-রশ্মিও অনুরূপ নিয়ম অনুসরণ করে। আলোক-তরঙ্গের চলিবার রীতি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে বদলায় ---ইলেকট্রন-রশ্মির গুণও উহার বেগের উপর নির্ভর করে।

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে ষ্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণু

ইলেকট্রন-রশ্মিকে আলোক-রশ্মির সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায়, যে ইলেকট্রন প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মাইল বেগে চলে তাহা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিক দিয়া রণ্টজেন-রশ্মির সমপর্য্যায়ভুক্ত। কার্য্যতঃ আমরা বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রনকে এমন আলোক-রশ্মিরূপে বিচার করিতে পারি যাহার তরঙ্গ খুবই ছোট। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দৃশ্য আলোকরশ্মি ·০০০০২ সেন্টিমিটারের চেয়ে অপরিসর রন্ধ্রপথ দিয়া কার্য্যতঃ নির্গত হইতে পারে না, কিন্তু বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রন উহার চেয়ে অনেক কম পরিসর স্থান দিয়া নির্গত হইতে সক্ষম। আলোক-রশ্মির পরিবর্ত্তে ইলেকট্রন-রশ্মি ব্যবহার করিলে এমন কণিকার ছায়া পাওয়া যাইতে পারে যাহারা আলোক-রশ্মিতে ছায়া গঠন করে না। ইলেকট্রন-রশ্মি ব্যবহার করিয়া অণুবীক্ষণের কার্য্য করিলে যন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

রঞ্জেন-রশ্মি-অণুবীক্ষণ নির্ম্মাণ কেন সম্ভব হয় নাই সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রঞ্জেন-রশ্মি কেন্দ্রীভূত করিবার উপযুক্ত লেন্স নাই। ইলেকট্রন-রশ্মিকে (বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রন স্রোত) তড়িৎ বা চুম্বকের প্রভাবে বাঁকানো যায়। বুশ (১৯২৬) সপ্রমাণ করেন যে, কোন ফাঁপা চোঙের আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুতে চৌম্বকত্ব প্রদান করিলে উহার অভ্যন্তরে যে আকর্ষণক্ষেত্র স্থাপিত হয় তাহার ফলে প্রবহমাণ ইলেকট্রন-রশ্মি বাঁকিয়া যায়। আলোক-রশ্মি লেন্সের ভিতর দিয়া যাইবার সময় যে প্রকার কেন্দ্রীভূত হয়, উল্লিখিত চৌম্বক-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া প্রবহমাণ ইলেকট্রন-রশ্মিও সেই একই নিয়মে কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। এইরূপে বিশেষ ভাবে স্থাপিত চৌম্বক-ক্ষেত্রের নাম চৌম্বক লেন্স। ইলেকট্রন-রশ্মি ও চৌম্বক লেন্সের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ।

উত্তপ্ত ধাতব তার হইতে নির্গত ইলেকট্রন-রশ্মিকে ৫০ হাজার (বা তদপেক্ষা বেশী) ভোল্ট-বিভবযুক্ত তড়িৎক্ষেত্রের আকর্ষণে বেগযুক্ত করা হয়। ইলেকট্রন প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ মাইল বেগে সরল রেখায় চলিতে থাকে এবং এই রশ্মিকে চৌম্বক লেন্সের (কণ্ডেনসর) প্রভাবে কেন্দ্রীভূত করিয়া লক্ষ্য বস্তুর উপরে ফেলানো হয়। আলোক-রশ্মির মতই লক্ষ্যবস্তুর বিভিন্ন কণিকার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসে ইলেকট্রন-রশ্মি। কিন্তু যে ফাঁক দিয়া আলোক-রশ্মি নির্গত হয় না, ইলেকট্রন সেখানে অনায়াসে পথ করিয়া চলিয়া আসে। আবার যে ক্ষুদ্র কণিকা আলোকরশ্মিকে আটকাইতে পারে নাই, ইলেকট্রন সেখানে আটকাইয়া যায় সেইজন্ত নির্গত ইলেকট্রন-রশ্মিতে লক্ষ্যবস্তুর সূক্ষ্ম ছাপ থাকিয়া যাইবে। অতঃপর এই রশ্মিকে দ্বিতীয় চৌম্বক লেন্সের (অবজেকটিভ) প্রভাবে ফেলিয়া অপর পার্শ্বে কেন্দ্রীভূত করা হইল। এখানে ইলেকট্রন রশ্মি লক্ষ্য-বস্তুর কণিকা-বিন্যাসের এক বৃহদাকৃতি প্রতিবিম্ব (ইলেকট্রনে-গড়া) গঠন করিল। পুনরায় তৃতীয় চৌম্বক লেন্সের সাহায্যে এই ইলেকট্রনের চিত্রকে আরও বিবর্দ্ধিত করিয়া লইয়া সুগ্রাহী পর্দ্দার উপরে ফেলানো হইল। ইলেকট্রনের আঘাতে এই পর্দ্দার গায়ে আলোকবিন্দু ফুটিয়া উঠে। লক্ষ্য-বস্তুর যে সকল অংশ দিয়া ইলেকট্রন নির্গত হইয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে পর্দ্দায় অনুরূপ সেই সকল স্থানে আলোক উৎপন্ন হইবে—অন্যত্র হইবে অন্ধকার। ইহাতেই লক্ষ্যবস্তুর একটি ছায়াচিত্র পাওয়া যাইবে। ইচ্ছা করিলে ইলেকট্রন-রশ্মিকে ফোটোপ্লেটে ফেলিয়া লক্ষ্য-বস্তুর ফোটো তোলাও সম্ভব।

জার্ম্মানীতে নোল ও রুস্কা (১৯০১) সর্ব্বপ্রথম ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ নির্ম্মাণ করেন। তিন বৎসর পরে তাঁহাদের যন্ত্র কার্য্যোপযোগী হয়। তৎপরে কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যোরিকিন, হিলিয়র, মার্টিন, বার্টন প্রভৃতির চেষ্টায় আরও দুইটি যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল (১৯৩৯)। বিগত মহাসমরের সময়ে এই যন্ত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছে। তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডকে সাতটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। তৎপর ইংলণ্ডেও এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের বিভিন্ন অংশের জন্য নানা প্রকার সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা দরকার। যন্ত্রের উপরিভাগে থাকে ইলেকট্রন-রশ্মির উৎস—উত্তপ্ত ধাতব তার (ক্যাথোড)। ইহারই অদূরে রহিয়াছে ৫০ হাজার ভোল্টযুক্ত একটি সচ্ছিদ্র ধাতব প্লেট (অ্যানোড)। অ্যানোডের ভোল্টবিভবের উপরেই ইলেকট্রনের গতি নির্ভর করে। ইলেকট্রনের বেগের সঙ্গে রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য তথা অণুবীক্ষণের ক্ষমতার সাক্ষাৎ সম্পর্ক রহিয়াছে।

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের নীচে ক্ষুরের ব্লেড। চিত্রে প্রদর্শিত অংশের বিস্তৃতি '০০০০৩ সেন্টিমিটার। সাধারণ অণুবীক্ষণে এই প্রকার ক্ষুদ্রাংশের এত স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় না

অ্যানোডের আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে বহির্গত হওয়ার পর ইলেকট্রন-রশ্মি কণ্ডেন্সর লেন্সের প্রভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া লক্ষ্য-বস্তুর উপরে পড়ে। সাধারণ আলোর অণুবীক্ষণে স্বচ্ছ কাচের প্লেটের উপর লক্ষ্য-বস্তুকে রাখা হয়। ইহাকে বলে মাউণ্ট। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে মাউণ্ট-নির্ব্বাচন কঠিন সমস্যা। কাচ যে প্রকার আলোক-রশ্মির কাছে স্বচ্ছ, সেইরূপ ইলেকট্রনরশ্মিকে বাধা দিবে না এমন পদার্থই ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে মাউণ্ট হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। কাচ বা ঐ জাতীয় কোন জিনিষ এই কার্য্যের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব নহে, কারণ কাচের দানায় ইলেকট্রন আটকাইয়া যাইবে ও তাহার ছায়া পড়িবে। '০০০০০১৫ সেন্টিমিটার পুরু কলডিয়নের ফিল্ম প্রায়শঃ এই কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার ভিতর দিয়া ইলেকট্রন অনায়াসে চলিয়া আসিতে পারে।

চৌম্বক লেন্সের জন্য চোঙের মত তারের কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করা হয়। প্রবাহের শক্তি লেন্সের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করে।

ইলেকট্রন-রশ্মির চলাচলের জন্য মাইক্রস্কোপ নলকে প্রায় বায়ুশূন্য করা প্রয়োজন। সেইজন্য যন্ত্রের সঙ্গেই পাম্পের ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষাধীন বস্তু বা ফোটোপ্লেটকে যথাস্থানে বসাইয়া দিবার জন্য বা বাহির করিয়া আনিবার জন্য 'লকে'র ব্যবস্থা থাকে যাহাতে নলের ভিতরে বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। যন্ত্রের কার্য্যাদি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিবিম্ব চোখে

দেখিবার উদ্দেশ্যে নলের স্থানে স্থানে গবাক্ষের ব্যবস্থা থাকে। এক একটি মাইক্রস্কোপের দৈর্ঘ্য সাত-আট ফুট।

এই মাইক্রস্কোপের সাহায্যে কোন কণিকাকে পঞ্চাশ হাজার হইতে লক্ষ গুণ বড় করিয়া দেখা সম্ভব। ·০০০০০০৩ সেণ্টিমিটার আকৃতির জিনিসও ইহার সাহায্যে স্পষ্ট দেখা যায়। মানুষের দৃষ্টিশক্তি অন্যূন ত্রিশ হাজার গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের দৌলতে নূতন এক অজ্ঞাত জগৎ মানুষের কাছে উন্মুক্ত হইয়াছে। বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগজীবাণুর সাধারণ সংজ্ঞা ভিরাস। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে এতাবৎকাল ইহাদের স্বরূপ অণুবীক্ষণেও ধরা পড়ে নাই। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের নীচে ইহারা এত দিনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ব্যাসিলাস বা ব্যাক্টিরিয়া জাতীয় জীবাণুর আকৃতিমাত্রই জানা ছিল; একণে উহাদের দেহের ভিতরকার গঠনপ্রণালী মানুষের কাছে প্রকটিত হইতেছে। অনেক নানাদার পদার্থের গঠন এবং যে সকল যৌগিক পদার্থের অণু আকারে অপেক্ষাকৃত বড় তাহাদের রূপ যান্ত্রিক চক্ষুর পর্দায় উদ্ভাসিত হইয়াছে।

যে যন্ত্র ছোটকে বড় করিয়া দেখায় তাহার নাম এক সময় দেওয়া হইয়াছিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র। কিন্তু পদার্থের অণুর স্বরূপ চোখের সামনে উন্মুক্ত করিয়া দিবার কোন ক্ষমতাই তাহার ছিল না। এতদিনে বোধ হয় সার্থকনামা অণুবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে।

চলে গেল তারা

শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্ত্তী

চলে গেল তারা জন্মের মত বিদায় নিয়ে
সবার চোখের ওপর দিয়ে।
কেউ ডাকে নাই, কেউ বলে নাই, "কোথায় যাও ?"
এমন কি শুধু মুখের কথায় সান্ত্বনাতেও বলে নাই কেউ—
"আমরা রয়েছি, কোন ভয় নাই, যেয়ো না গাঁও,
নিরুদ্দেশের যাত্রায় তাই ভেসেছে নদীতে ছেলে বউ নিয়ে
কাহারো নাও,
পায়ে হাঁটা-পথে বাকীরা চলেছে মিছিল ক'রে
দূর সহরে,
যেখানে জীবন আগের মত
উদ্দাম গতি, উচ্ছল স্রোতে চলায় রত।
যেতে যেতে তারা বার বার ক'রে চেয়েছে ফিরে,
দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুনরায় চলেছে ধীরে,
ঝুরি-নামা বুড়ো বটের শেষে
গাঁয়ের সীমানা যেখানে মেশে,
সেখানে এসে
অপলক চোখে জন্মের দেখা দেখেছে চেয়ে,
প্লাবন ছুটেছে দু-চোখ বেয়ে।
তারা শুধু জানে কি গভীর ব্যথা পড়েছে গ'লে
ভিটে-মাটি-ছাড়া সব-হারা ঐ নিরন্নদের বিদায়-বেলায়
চোখের জলে।
সেদিনের সেই দুর্দ্দিনে যারা সুদিন পেলো,
শীতের রাতেই ভুবনে যাদের ফাগুন এলো,
হঠাৎ-পাওয়া সে টাকার গরমে আত্মহারা,
কালো বাজারের নকল আলোর মদের নেশায় মত্ত তারা।
রাতের অন্ধকারের তলে
তাদের লোভের লেলিহ-জিহ্বা শাণিত ছুরির মতন জ্বলে!
নকল আলোর মদের নেশায় রঙীন চোখ—
পৃথিবী তখন তাদের ভোগের স্বর্গলোক।
তাদেরি চোখের তলায় এদিকে ক্রমশঃ শূন্য হ'ল যে দেশ
তাদেরি লোভের খোরাক যোগাতে—কি তাতে তাদের ?
করেছে যে কাজ করেছে বেশ—
তারা ত হয়েছে লক্ষপতি—
হতভাগাদের ভাগ্যের সাথে নিজেরে জড়ালে হ'ত কি কখনো
এ উন্নতি ?
নিজেকে হারিয়ে স্বার্থ-জ্ঞান আর আত্ম-সুখে
মানুষ যখন মানুষেরে দিল নির্দ্দয়ে ঠেলা মৃত্যু-মুখে,
বহু পুরুষের বহু স্মৃতি মাখা বসতবাটি,
মায়ের মতন স্নেহাতুরা আর গাঁয়ের মাটি,
এরাই তখন কেঁদেছিল আর বার বার করে ডেকেছে পিছু,
দেয় নাই সাড়া, চলে গেছে তারা, শুনেছে তবুও শোনে নি কিছু।
মানুষ যখন মানুষের মাঝে আরেক মানুষে দিল না ঠাঁই,
তাদের তখন কেহই নাই।
জন্মের মত বিদায় নিয়ে
চলে গেল তাই সবার চোখের ওপর দিয়ে।

নোয়াখালি-শ্রীরামপুরের পূর্ব্বকথা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীরামপুর নোয়াখালি জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। কিন্তু তাহার প্রসিদ্ধি জেলার ক্ষুদ্র পরিসর অতিক্রম করিতে এত কাল সমর্থ হয় নাই। কারণ, বর্ত্তমানে কলিকাতা মহানগরীর সান্নিধ্যই স্থানসমূহের প্রসিদ্ধির নিদান হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর বিস্ময়কর নব অভিযান এই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হওয়ায় অন্যূন দুই মাস কাল তাঁহার এবং তদীয় ভক্তমণ্ডলীর চরণস্পর্শে পবিত্র হইয়া শ্রীরামপুর আজ ভারতের এক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, মহাত্মাজীর তত্রত্য আশ্রমকুটীর একটি 'রাজবাটী'র পথের ধারে অবস্থিত এবং বর্ত্তমান 'রাজা' শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় রাজোচিত বদান্যতার পরিচয় দিয়া উক্ত কুটীর সহ বিস্তৃত ভূখণ্ড দেশমাতৃকার উদ্দেশে দান করিয়াছেন। এই 'রাজ'-বংশের উল্লেখ বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্রের দপ্তরে পাওয়া যাইবে না। ইংরেজ অধিকারে 'রাজা' উপাধিদ্বারা ভূষিত না হইলেও নোয়াখালি জেলার আপামর জনসাধারণ এই বংশের রাজখ্যাতি অদ্যাপি অটুট রাখিয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা সংক্ষেপে শ্রীরামপুর ও তাহার রাজবংশের অতীত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

নোয়াখালির আদিরাজা বিশ্বম্ভর রায়ের প্রপৌত্র "রাজা শ্রীরাম খাঁ"র নামানুসারে গ্রামের নাম শ্রীরামপুর হয়। শ্রীরাম খাঁর রাজত্বকাল অনুমান ১৪৫০-১৫০০ খ্রী:—সুতরাং গ্রামটি প্রায় ৫০০ বৎসরের স্মৃতি বহন করিতেছে। শ্রীরাম খাঁর পৌত্র রাজা রাজবল্লভের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম 'রাজা কৃষ্ণরায়'; তিনিই মূল রাজবংশ হইতে পৃথক হইয়া শ্রীরামপুরে অবস্থান করেন। মূল রাজবংশ নোয়াখালিতে বহুকাল বিলুপ্ত হইয়াছে এবং তাহার একটি মাত্র রাজ্যভ্রষ্ট শাখা ত্রিপুরা জেলায় বিদ্যমান আছে (প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৩, পৃ. ৩৯৪)। সুতরাং নোয়াখালি জেলায় শূররাজগণের একমাত্র রাজোপাধি উত্তরাধিকারী রূপে শ্রীরামপুরের রাজবংশ ঐতিহাসিক গৌরবে মহিমান্বিত। রাজা কৃষ্ণ রায় বারভূঁঞার অন্যতম রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের পিতৃব্য ও সমসাময়িক, সুতরাং প্রায় ১৬০০ সনে বিদ্যমান ছিলেন। কৃষ্ণ রায় ভুলুয়া পরগণার একাংশ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরাক্রান্ত ভ্রাতৃদ্বয় উদয়মাণিক্য ও লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজত্বকালে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করার কারণ আছে। টোডরমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্তে ভুলুয়ার রাজস্বের পরিমাণ লিখিত আছে ১৩৩১৪৮০ দাম অর্থাৎ ৩৩২৮৭ টাকা। ঐ সময় হইতেই ভুলুয়া পরগণা তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছিল—তপে চৌদ্দহাজারী, তপে অষ্টহাজারী ও তপে দশহাজারী। ইহাদের নাম রাজস্বের পরিমাণ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমান করাই সঙ্গত—মোট রাজস্ব ৩২,০০০ টাকা মূলতঃ টোডরমল্লের রাজস্ব পরিমাণের সহিত অভিন্ন বটে। তপে দশ হাজারীর উল্লেখ প্রাচীন দানপত্রাদিতে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। আমরা একটি মাত্র দেবোত্তরের দানপত্রে ইহার উল্লেখ পাইয়াছি। রাজা কৃষ্ণ রায়ের বৃদ্ধপ্রপৌত্র উদয়নারায়ণ ৫৪১ পরগণাতি সনের ৫ আশ্বিন (১১৪২-৩ সন) নিজ পুত্র 'প্রাণপ্রীতিম' কীর্ত্তিনারায়ণের নামে 'রাজরাজেশ্বর' দেবতার জন্য ২।৹ দ্রোণ দেবত্র ভূমি দান করিয়াছিলেন। দানপত্রে ভূমির অবস্থান নির্দ্দেশ-স্থলে লিখিত আছে, 'পরগণে ভুলুয়া তপে দশ হাজারী জায়গীর সরকার আলী।' (ত্রিপুরা কালেক্টরীর ৪৯১৯ সংখ্যক সনদ) সুতরাং অনুমান হয় 'তপে দশ হাজারী'ই রাজা কৃষ্ণ রায়ের সম্পত্তি ছিল এবং কালক্রমে একটি ক্ষুদ্র জায়গীর মাত্র তাঁহাদের দখলে থাকে।

রাজা কৃষ্ণরায়ের সময় হইতেই বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার আসিয়া শ্রীরামপুরের রাজবাটীকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামটিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। রাজা কৃষ্ণ রায় তদীয় পুরোহিত 'সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য'কে শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামে ৩৶৭৷০ ভূমি দান করিয়াছিলেন (ত্রিপুরা কালেক্টরীর ৪৫১৫ সংখ্যক ফার্সী চুম্বক দ্রষ্টব্য)। উক্ত ভট্টাচার্য্য বাৎস্য গোত্র, কাঞ্জিলাল গাঞি—তাঁহার অধস্তন ৯-১০ পুরুষ এখনও বিদ্যমান। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের সহিত তদীয় পিতৃব্য-পুত্র অনন্তমাণিক্যের সংঘর্ষ হইয়াছিল। লক্ষ্মণমাণিক্য স্বয়ং অমিতবলশালী ছিলেন, কিন্তু অনন্তমাণিক্য তদপেক্ষাও বলীয়ান্ এবং লক্ষ্মণমাণিক্যের ঈর্ষ্যা ও বৈরভাবের কারণ হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, এক দিন রাজা লক্ষ্মণ-মাণিক্য রাজবেশে সজ্জিত হইয়া কৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শনপূর্ব্বক কল্যাণপুর রাজগৃহের এক প্রকোষ্ঠে অনন্তমাণিক্যকে আহারে বসাইয়া তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিতেছিলেন। আহার করিতে করিতে অনন্তমাণিক্যের মনে গভীর সন্দেহ ও আশঙ্কার উদ্রেক হয় এবং তিনি হঠাৎ ভোজন আসন হইতে এক প্রচণ্ড লম্ফ প্রদান করিয়া একটি ক্ষুদ্র জানালার ভিতর দিয়া গলিয়া উচ্ছিষ্ট হস্তেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া চৌদ্দ-পনর মাইল দূরবর্ত্তী রাজা কৃষ্ণ রায়ের ভবনে শ্রীরামপুরে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ রায়ের পুত্র গৌরীপ্রসাদের কীর্ত্তি কথা জানা যায় না। তৎপুত্র 'রাজা বারাহীদাস' প্রসিদ্ধ ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক দুইটি ভূমিদানের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি - একটিতে (৩১৫৬ সংখ্যক চুম্বক দ্রষ্টব্য) দানভাজন ব্যক্তি দেবীদাস এবং অপরটিতে (৪৫১৬ সংখ্যক চুম্বক) কৃষ্ণরাম ও রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী। শেষোক্ত দানের তারিখ ১১১৫ সন (১৭০৮-৯ খ্রী:) এবং ভূমির পরিমাণ ৫।৶৫ গণ্ডা। বারাহীদাসের পুত্র কংশনারায়ণ অজাত ছিলেন। তৎপুত্র 'রাজা উদয়-নারায়ণ'ই এই ধারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বহু দানপত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। আমরা দুইটি মাত্র উল্লেখ

করিতেছি, পূর্ব্বে একটি উল্লিখিত হইয়াছে।" ২০২৮ সংখ্যক সনদ পত্রে তিনি স্বপুত্র "রাজা রত্ননারায়ণ"কে আড়াই দ্রোণ দেবত্র ভূমি ১৫ ভাদ্র, ১১১৯ সনে (১৭১২ খ্রীঃ) দান করেন। ১২০২ সনে উক্ত ভূমির দখলকার ছিলেন রত্ননারায়ণের পৌত্র (অর্থাৎ নরসিংহের পুত্র) রাজচন্দ্রনারায়ণ। এই রাজচন্দ্রের প্রপৌত্র রাজা রাজবিহারীনারায়ণ অল্পকাল হইল স্বর্গত হইয়াছেন। এই দানপত্রের শীলমোহরে উদয়নারায়ণের নাম ও তারিখ ৫১১ (নকলে ৪১১ লিখিত আছে, ৫১১ হইবে সন্দেহ নাই) লিখিত ছিল। সুতরাং রাজা উদয়নারায়ণের অভ্যুদয়কাল ১৭১২-৪২ সন বলিয়া নির্ণীত হয়। ২০৩০ সংখ্যক সনদদ্বারা উদয়নারায়ণ অপর পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণকেও ঐ সনেই ভূমিদান করেন—১২০২ সনে তাহার উত্তরাধিকারী ছিলেন কীর্ত্তিনারায়ণের এক কীর্ত্তিমান্ পুত্র রাজা রঘুনাথনারায়ণ এবং এক পৌত্র রাজনারায়ণ। শ্রীরামপুরে কীর্ত্তিনারায়ণের ধারায় বর্ত্তমান রাজা শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়।

রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য রাজা লক্ষ্মণসেনের অনুকরণে[১] 'পঞ্চরত্ন' সভা স্থাপন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এই সভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন শ্রীরামপুর-নিবাসী মহাকবি রঘুনাথ কবিতার্কিক। এই রাজকবির নাম বঙ্গদেশে চির-স্মরণীয় হওয়া উচিত। ভুলুয়ার পণ্ডিতসমাজে চিরপ্রসিদ্ধি আছে যে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য-রচিত গ্রন্থসমূহ, বিশেষতঃ বিখ্যাতবিজয় নাটক, বস্তুতঃ কবিতার্কিকেরই রচনা এবং পৃষ্ঠপোষক রাজার নামে প্রচারিত। আমরা সংক্ষেপে কবিতার্কিক ও তদ্বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। রাজা বিশ্বম্ভরের সহিত তাঁহার পুরোহিতও মিথিলা হইতে ভুলুয়া আগমন করেন, তাঁহার বংশধরগণ নোয়াখালীর নানা গ্রামে প্রতিষ্ঠার সহিত বিদ্যমান আছেন। ইঁহারা ভরদ্বাজ গোত্র এবং বংশপরিচয় নির্দ্দেশ-কালে বলেন 'সাকুটাল কাঠ্ বালী'। সাকুটাল রাঢ়ীয় শ্রেণীর 'সাহড়িয়াল' হইতে অভিন্ন হইতে পারে, কিম্বা পৃথক্ একটি মৈথিল বংশও হইতে পারে।[২] এই রাজপুরোহিত বংশের এক দৌহিত্র শাখার রাঢ়ীয় মূলপাড়ার চট্টোপাধ্যায়বংশীয় কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের অধস্তন বংশধর বাণীনাথ বিদ্যালঙ্কার প্রথম শ্রীরামপুরে আসিয়া বাসস্থাপন করেন এবং রাজ-পৌরোহিত্য লাভ করেন। তাঁহার পুত্রই রঘুনাথ কবিতার্কিক। তাঁহার স্বনামে প্রচারিত 'কৌতুকরত্নাকর' নামে এক সংস্কৃত প্রহসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে একটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (এগেলিঙ্ সাহেবের পুথিবিবরণীর পৃ. ১৬১৮ দ্রষ্টব্য) এবং অপর একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি ত্রিপুরা মহারাজার রাজগ্রন্থাগারে আছে। আমরা শেষোক্ত পুথি পরীক্ষা করিয়াছি। এই গ্রন্থের বিস্তৃত প্রস্তাবনায় লক্ষ্মণরাজা ও তৎপিতার উজ্জ্বল প্রশস্তি রচনার পর কবি আত্মপরিচয় দিতেছেন :

বাণীনাথমহাত্মনঃ সুকৃতিনো বিদ্যাবিবেকক্ষমা-
ধৈর্য্যৌদার্য্যগভীরতা-সুজনতা কারুণ্যবারাংনিধেঃ।
ভূমীদেবমণেঃ সুতস্য কৃতিনঃ সৎকাব্যরত্নাম্বুধি-
রাস্তে শ্রীকবিতার্কিকস্য সরসঃ কশ্চিৎ প্রবন্ধোত্তরঃ ॥ (১৮)

পরবর্ত্তী গদ্যাংশে স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে যে তিনি লক্ষ্মণ রাজার পুরোহিত ছিলেন (এতস্য হি পুরোধসা তেন বিরচিতং কৌতুকরত্নাকরং প্রহসনম্)। এই প্রহসনের বিষয়বস্তু হইল মান নামক এক মূর্খ রাজার রাজ্ঞীর অপহরণ এবং কুমতিদেব মন্ত্রী, অশুভচিন্তক দৈবজ্ঞ, আচারকালকূট পুরোহিত, প্রচণ্ড-শেকবর্ব্বর গুপ্তচর, অজিতেন্দ্রিয় গুরু ও ব্যাধিবর্দ্ধক বৈদ্য প্রভৃতির দ্বারা তাহার উদ্ধার চেষ্টা। কবির শেষ মনোহর ভরতবাক্যটি উদ্ধারযোগ্য—

পৃথ্বীং বিস্তারশস্যাং জনয়তু বিদধদ্দেবরাজঃ সুবৃষ্টিং
ভূদেবৈর্যজ্ঞকর্ম্মাখিল-নিহিত-পুরোডাশ-সন্তর্পিতঃ সন্।
ক্ষীরং সুস্নিগ্ধগাবো দধতু বহুতরং তদ্বৈরাজ্যসংঘৈঃ
যজ্ঞৈস্তুষ্টাঃ প্রজানাং বিদধতু মিথিলানন্দবৃন্দানি দেবাঃ ॥

১৭শ শতাব্দীতে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে সমুদ্রতীরে যাগযজ্ঞের সমারোহদ্বারা প্রজাবর্গের আনন্দোৎপত্তির এই শুচিসম্পন্ন কামনার সহিত বিংশশতাব্দীর কামনার তুলনা করিলে দেব-তার প্রসাদ নির্ম্মুক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ মানবতার বর্ত্তমান উদ্দাম বিজৃম্ভণে প্রকট পার্থক্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

শ্রীরামপুর হইতে কল্যাণপুর রাজসভায় যাতায়াত সহজ-

১। লক্ষ্মণসেনের সভায় পঞ্চরত্নের নাম নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশুদ্ধভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, ত্রিপুরা জেলায় একটি প্রাচীন পুথি মধ্যে ইহা আমরা পাইয়াছিলাম।

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণঃ কবিরাজনামা,
ধ্যাতস্তথা গুণিগণৈর্জয়দেবধীরঃ।
শ্রীমানুমাপতিধরো জগদেকরত্নং
রত্নানি পঞ্চ নৃপলক্ষ্মণসেনভূমৌ ॥"

২। মিথিলায় ভরদ্বাজগোত্র সাকুটাল বংশ ছিল কিম্বা আছে কি না গবেষণা না করিয়া এ বিষয়ে তথ্যনির্ণয় অসাধ্য। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য বিখ্যাতবিজয় নাটকের প্রস্তাবনায় পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তিপ্রসঙ্গে পুরোহিতবংশের আদিপুরুষ 'ন্যায়াচার্য্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন (৮ম শ্লোক)—

ন্যায়াচার্য্য-বিশুদ্ধসন্ততিসমুদ্ভূতৈঃ বভদক্রতি-
স্মৃত্যুক্তৈঃ পরিতোপনীতবিপদাং মন্ত্রৈস্তথা স্বস্তিভিঃ।
যদ্গোত্রীয়মহীভুজামহরহঃ সর্ব্বমানৈর্ধন-
স্তোমৈঃ পূর্ণমজীর্ণহৃদ্যজঠরং ব্রহ্মাণ্ডমুজ্জ্বলতে ॥

এই ন্যায়াচার্য্য কে আমরা জানিতে পারি নাই। তার্কিক সমাজে ন্যায়াচার্য্যপদে মিথিলার মহাপণ্ডিত উদয়নাচার্য্য কিম্বা উদ্দ্যোতকরাচার্য্যকে বুঝায়। পুরোহিতবংশ ইঁহাদের অন্ততমের বংশোদ্ভূত হওয়াবিচিত্র নহে।

সাধ্য নহে। প্রবাদ অনুসারে কবিতার্কিক এবং রাজসভার অন্যান্য রত্নের ভবনে হাতী বাঁধা থাকিত এবং তাঁহারা হাতীতে চড়িয়াই প্রত্যহ রাজসভায় যাতায়াত করিতেন।

কবিতার্কিকের উপাধি হইতেই প্রতিপন্ন হয় তিনি একাধারে কবি ও পণ্ডিত ছিলেন এবং তৎকালীন প্রতিভা-প্রকাশের শ্রেষ্ঠবিদ্যা তর্কশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার অধস্তন বংশধারায় বহুকাল পাণ্ডিত্য বিদ্যমান ছিল এবং এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। কবিতার্কিকের পুত্র রত্নেশ্বর বিদ্যাবাগীশ—তিনিও পিতার সহিত লক্ষ্মণমাণিক্যের পঞ্চরত্নসভার অন্তর্গত ছিলেন বলিয়া একটি মত প্রচলিত আছে। মতান্তরে পঞ্চরত্ন সভার রত্নেশ্বর ভিন্নবংশীয় এবং ভিন্নগ্রামবাসী ছিলেন। রত্নেশ্বর বিদ্যাবাগীশের পুত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌমের পাঁচ পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামগোপাল তর্কবাগীশ ও কনিষ্ঠ রামরমণ ন্যায়ালঙ্কার। ন্যায়ালঙ্কারের চার পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় হিরণ্যগর্ভ তর্কভূষণ তৎকালে ভুলুয়ার একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমানে হিরণ্যগর্ভের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকর চক্রবর্ত্তীর [illegible] পুত্র কৃষ্ণকান্তের দুই পুত্র, গুরুচরণ ও দুর্গাচরণের পুত্র-পৌত্রগণ বিদ্যমান আছেন।

ফলতাবাড়ী টী এষ্টেটে

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

অন্যমনস্কভাবে মিনতির চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিয়া সতীন চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল। তাহার সমস্ত দেহ শক্ত হইয়া উঠিল। চিঠিখানা শেষ করিয়া পাশের টিপয়ের উপর ফেলিয়া দিয়া সে সম্মুখের দিকে চাহিল।

দূরে ডিয়াখোলের পাহাড়। থাকে থাকে চা-গাছের লাইন পাহাড়ের গা বহিয়া খানিকটা উঠিয়াছে। কুয়াশার একখানা ঘন জাল গাছগুলির উপর ভাসিয়া রহিয়াছে। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের চূড়া হইতে সূর্য্যের আলো গড়াইয়া পড়িয়া কুয়াশার আবরণীকে ফিকা করিয়া তুলিয়াছে।

সতীনের দৃষ্টি একটু সরিয়া আসিয়া গেষ্ট-হাউসের বাম-দিকে একটু দূরে ফলতাবাড়ী চা-বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর উপর পড়িল। কাঠ, টিন, কাচের দ্বিতল বাড়ী, ছবির মত দেখাইতেছে। দোতলার সার্শীগুলি খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নেটের পরদার উপর, সার্শীর উপর আলোর কালি আসিয়া পড়িয়াছে।

উচ্চ হাসির শব্দে সতীনের শূন্য দৃষ্টি সম্মুখের রাস্তার উপর নামিল। গুটি কয়েক ওরাওঁ মেয়ে হাত-ধরাধরি করিয়া ফ্যাক্টরীর পথে চলিয়াছে। সকাল বেলাতেও মাথায় গুঁজিয়াছে লাল ক্যানা ফুলের গুচ্ছ, অনুচ্চ কণ্ঠে কোরাস গান চলিয়াছে। মাঝে মাঝে গানের মধ্যে কলহাস্যের ঢেউ ভাঙিয়া পড়িতেছে।

হঠাৎ তাহাদের চোখ পড়িল সতীনের উপর। ছোট সাহেব তাহাদের দিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া তাহাদের হাসির বাঁধ ভাঙিয়া গেল। হাসিয়া এ ওর গায়ে পড়িতে পড়িতে তাহারা আগাইয়া গেল।

সতীনের মুখে এতক্ষণে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। মিনতির চিঠিতে একটা অপ্রত্যাশিত খবর আসিয়াছে। তাহার ভগ্নী ওরফে কমরেড মিনতি সেন একজন ঝাঁঝালো কমিউনিষ্ট। কমরেডী ষ্টাইলে সে লিখিয়াছে পার্টির ডেলিগেট হিসাবে কমরেড ঊষা দত্ত ও কমরেড ভেঙ্কটাপ্পা তাসখন্দ ইয়ং কমিউনিষ্ট কনফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য কিছুদিন পূর্বে রওয়ানা হইয়াছিল। পথে একটি দুর্ঘটনার ফলে কমরেড ভেঙ্কটাপ্পার মৃত্যু হইয়াছে, কমরেড ঊষা দত্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। পার্টির একজন বিশিষ্ট কর্মীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে সকলেই দুঃখিত, কমরেড ঊষা দত্ত এই দুর্ঘটনায় মর্মাহত হইয়া আছে। পার্টির মিটিঙে সে নীরবে বসিয়া থাকে, কোন কাজে উৎসাহ নাই। চেহারায় ভাইটামিন বি-ওয়ান ও বি-টু যুক্ত খাদ্যের অভাবের লক্ষণ পরিস্ফুট। এই শক্ কাটাইয়া উঠিয়া যাহাতে সে পূর্বের মত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করিতে পারে এজন্য তাহার একটু চেঞ্জ দরকার। গত ১২ই মার্চ তারিখের পার্টি মিটিঙে এই রেজোলুশন সর্বসম্মতিক্রমে পাস হইয়াছে। নন-অফিসিয়ালী স্থির হইয়াছে যে পার্টির জন্য এই কাজের ভার আমাকে লইতে হইবে। যদি তাহাকে রাজি করিতে পারি—আশা করি পার্টির নামে পারিব—তাহাকে সঙ্গে লইয়া ২১ তারিখে আমি ফলতাবাড়ী রওনা হইব।

পুনশ্চে কমরেড মিনতি লিখিয়াছে : তাহাদের ফলতাবাড়ী যাইবার প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য বাগানের ওয়ার্কারদের অবস্থা ষ্টাডি করা ও তাহাদের মধ্যে কিছু প্রোপাগাণ্ডা করা। মালিক সাবধান!

সতীন হাসিল। আলিপুর-ডুয়ার্সের ফলতাবাড়ী চা-বাগানের মালিকের কন্যা আসিতেছে বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে প্রোপাগাণ্ডা করিতে। চমৎকার আইডিয়া! কমরেড মিনতি সেনের উপযুক্ত প্রস্তাব।

পরিবারের সকলের কনিষ্ঠ সন্তান, পিতামাতার আদরের মেয়ে। আদরের আধিক্যে স্বভাব ও ক্ষুদ্র মস্তকটি বেশ বিগড়াইয়াছে। স্কুলে পড়িবার সময় হইতে কমিউনিজম তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। চৌদ্দ বছর বয়সে সে ক্লাস-ওয়ার,

বুর্জোয়া, প্রোলেটারিয়েট প্রভৃতি বড় বড় কথা বলিয়া সকলের তাক্ লাগাইয়া দিত। বাবা ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিতেন। —তারপর ছোটম্বা, তোমার ক্লাস-ওয়ার কেমন এগুচ্ছে?

দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মত সে ক্লাস-ওয়ারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কার্ল মার্কস্ কি বলিয়াছেন মুখস্থ বলিয়া যাইত। কি ব্যাপার! অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহার পাঠ্য পুস্তকের শেলফের মধ্যে পাওয়া গেল কমিউনিজম-মেড-ঈজি, সাম্যবাদী লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত, মূল্য দশ আনা দুই পয়সা মাত্র। প্রথমে সচিত্র জীবনী কার্ল মার্কস, কমরেড লেনিন ও কমরেড ষ্টালিনের। তারপর প্রশ্নোত্তরের আকারে কমিউনিষ্ট মতবাদের পঞ্চান্ন পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাখ্যা। মিনতি এই ৫৫+১০ অর্থাৎ ৭১ পাতার বইখানি বাড়া মুখস্থ করিয়াছিল। যখন তখন তাহার কমিউনিষ্ট বক্তৃতার করকাপাতে বাড়ীর লোকের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িত।

তারপর স্কুল ছাড়িয়া মিনতি কলেজে পড়িতে গেল। পার্টির সভ্য হইল। পার্টির কাজে সে গাড়ী লইয়া বাহির হইলে আর কাহারও সেদিন গাড়ী পাইবার উপায় থাকিত না। ফিরিতে সন্ধ্যা, কখনও বেশ রাত হইতে লাগিল। বাবা একদিন ডাকিয়া আড়ালে কি উপদেশ দিলেন, সোফারকে ডাকিয়া কড়া আদেশ দিলেন সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ফিরিতে হইবে।

তারপর হইতে তাহাদের বাড়ীতে কমরেডদের যাতায়াত আরম্ভ হইল।

—স্তর কি ব্যস্ত আছেন?

সতীনের চিন্তাস্রূত, নিস্পন্দ ভাব কাটিয়া গেল। সে দেখিল বাগানের নূতন ইলেকট্রিক কন্ট্রাক্টর নির্মল, তাহার হাতে একটি গোলাপের তোড়া।

এই ছোকরা কন্ট্রাক্টরটি তাহার প্রিয়পাত্র। নূতন কন্ট্রাক্ট করিবার সময়ে আগেকার পাঞ্জাবী কন্ট্রাক্টরকে ছাড়াইয়া ইহাকে সে কাজ দিয়াছে।

—এস, এস। এত গোলাপ কোথা থেকে যোগাড় করলে হে?

—আমার বাগানের স্তর। সেদিন আমাদের কোয়ার্টারের সুমুখ দিয়ে যেতে যেতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমার বাগান দেখছিলেন খবর পেয়েছি। নতুন-লাগানো পাঁচটা গাছে ফুল দিয়েছে,—তিনটে টী-রোজ, দুটো হাইব্রিড টী। কত বড় ফুল দেখেছেন?

নির্মলের হাত হইতে তোড়াটি লইয়া সতীন সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল:—এটা কি ব্ল্যাক প্রিন্স? সে জিজ্ঞাসা করিল।

—না স্তর, ইভোয়াল ড ক্রাঁস, কি রং দেখুন! কে বলবে টী-রোজ?

বাহাদুর বারান্দায় চা লইয়া আসিয়াছিল। তাহার হাতে তোড়াটা দিয়া কন্ট্রাক্টর বাবুর জন্ত চা আনিতে বলিল। নির্মল চা খাইয়া বিদায় লইবার সময় সতীন বলিল—আমার দুই একজন গেষ্ট আসছেন পরশু। তাঁরা বাগানের কাজ দেখবেন। যাবার পথে একবার ওভারসিয়র বাবুকে ডেকে দিও।

মিনতি কলেজে ভর্তি হইবার পর হইতে তাহাদের বাড়ীতে কমিউনিষ্ট বন্ধুদের যাতায়াত আরম্ভ হইল। ঢাকাই জামদানী শাড়ী-পরা কমরেড, বেনারসী ক্রেপের শাড়ী-পরা কমরেড, বরোদার পাড় জর্জেট শাড়ী-পরা কমরেড বাড়ীর গাড়ীতে চড়িয়া আসিতে লাগিল। চটকলের শ্রমিক, কাপড়ের কলের শ্রমিক, জাহাজী শ্রমিক, গ্যাসকোম্পানীর শ্রমিক, বিজলী কোম্পানীর শ্রমিকদের মালিক কর্তৃক নির্মম শোষণের প্রতিকার করিবার সঙ্কল্প তাহাদের সুরমা মাখা চোখে, লিপ স্টিক-রঞ্জিত ওষ্ঠে পরিস্ফুট। জমিদার ও মহাজনের নির্দয় শোষণের বিরুদ্ধে সর্বহারা চাষীদের সংঘবদ্ধ করিবার অটল প্রতিজ্ঞা তাহাদের ভ্যানিশিং স্নো-মার্জিত মসৃণ ললাটে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রায়ই এই কমরেডদিগের সভা বসিত দোতলার দক্ষিণ-দিকের বারান্দায়। নানাপ্রকার স্বরের বক্তৃতা-কাকলীতে বাড়ীখানি মুখরিত হইত। বক্তৃতার যতটুকু কানে আসিত তাহাতে মনে হইত সকলেই সেই কমিউনিজম-মেড-ঈজির মুখস্থ বিদ্যার পরিচয় দিতেছে। পার্টির মিটিং শেষ হইলে রিলাক্সেশন। তাহাতেও বৈচিত্র্য ছিল। ব্যাডমিন্টন, টেবিল-টেনিস, ক্যারম, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, গালগল্প, স্যাণ্ডউইচ, কেক্, চা।

বছরখানেক বাদে কমরেড দলের মধ্যে কয়েকটি চেনা মুখ অদৃশ্য হইল, বোধ হয় পরিণয়-যবনিকার অন্তরালে; কয়েকটি নূতন মুখ আবির্ভূত হইল। মিনতি থার্ড-ইয়ারে ভর্তি হইবার পর হইতে আবার তাহার বাড়ী ফিরিতে দেরি হইতে লাগিল।

সতীন চেয়ার হইতে উঠিয়া বারান্দায় পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল। ডিয়াখোল পাহাড়ের মাথা টপকাইয়া সূর্যের আলো থাকে থাকে সাজানো চা-গাছগুলির উপরের ঘন কুয়াশাজালের আড়ালে আগাইতে আগাইতে হঠাৎ কলতাবাড়ী বাগানের গেষ্ট-হাউসের বারান্দায় শত ধারায় বিকীর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়িল। এ যেন সূর্যের আলোর খানিকটা নাটকীয় ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ। সতীনের এই জিনিষটা খুব নূতন মনে হইল। গভীরভাবে নিশ্বাস টানিয়া সে চোখ তুলিয়া ডিয়া-খোলের দিকে চাহিল। ডিয়াখোলের দেহে সবুজ চা-গাছের সাড়ি আলোতে ঝলমল করিতেছে। দিকে দিকে নরম, তাপহীন আলোর সঞ্চরণ। দেহের মেদ-মাংসের আবরণী ভেদ করিয়া এই নরম, তাপহীন আলোর একটু ঝলক সতীনের মনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মিনতির সঙ্গে একদিন আসিল এক নূতন কমরেড, উষা দত্ত তাহার নাম।

হাঁ, উষাই বটে। শুভ্রবর্ণা, শুভ্রবসনা তন্বী উষাদেবী—মৃন্ময়ী মূর্তি। ঘন অন্ধকারের পরিবেশে প্রজ্বলিত দীপশিখা। ওষ্ঠের বিন্যাসে ও ক্ষুদ্র চিবুকটির গড়নে একটু বিশেষত্ব ছিল, পশ্চিম-উপকূলের কোঙ্কণী বা মালাবারী ধাঁচ।

প্রজ্বলিত দীপশিখার চারি পাশে একটা ছায়ার পরিমণ্ডল। চলনে বলনে ঈষৎ গাম্ভীর্যের বাঁধ। উষা আসিল, কোথাও কি সাড়া পড়িয়াছিল তাহার আবির্ভাবে? কিন্তু সে ত কেবল উষা নয়, সে কমরেড উষা দত্ত, কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য। তাহার সঙ্গী আবার বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি সতীন সেন নয়, তাহার সঙ্গী কমরেড ভেঙ্কটাপ্পা, কমরেড ভেলাস্কর, কমরেড উ পো, কমরেড রবি পাল—প্যামফ্লেট, পোষ্টার, স্লোগানে যাহারা সর্বহারাদের জন্য স্বর্গের সিঁড়ি রচনা করিতেছে। সতীনের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল, ব্যঙ্গের হাসি নয়, অনুকম্পার হাসি নয়, অদ্ভুত হাসি।

কমরেডী জনযুদ্ধ নাটকের কয়েকটা দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে দ্রুত ভাসিয়া উঠিল। সেই স্লোগান—"জাপানকে রুখতে হবে।" তারপর থামিয়া—"হাতিয়ার চাই।" এ হাতিয়ারটা কাহার বিরুদ্ধে কাজে লাগিবে? জাপানের?

সতীন পায়চারি থামাইয়া পথের দিকে চাহিল। বাগানের শ্রমিক মেয়েরা পিঠে ঝুড়ি বাঁধিয়া ছোট ছোট দলে বাগানের দিকে চলিয়াছে। প্লাকিং সিজন আর কয়েক দিনের মধ্যে শেষ হইবে। অনেকগুলি দল চলিয়াছে। বেশীর ভাগ ছোটনাগপুর অঞ্চলের ওরাওঁ মেয়ে, নিকষ কালো, নিটোল স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল হাসি। যাহারা পিঠে ঝুড়ির পাশে পুঁটুলীতে ছেলে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছে খোঁপায় তাহারাও ফুল গুঁজিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই-একটি উত্তর-পূর্ব সীমান্তের অধিবাসীদের মেয়ের দল, মসৃণ পীত বর্ণ, তেমনি নিটোল স্বাস্থ্য, তেমনি উজ্জ্বল হাসি। এরাও ফুলের ভক্ত। গল্পে, হাসিতে, লীলায়িত পদক্ষেপে অন্য পথচারীদের উপেক্ষা করিয়া মেয়েরা বাগানের পথে চলিয়াছে।

দূরে কলতাবাড়ী বাগানের ম্যানেজার আসিতেছেন দেখা গেল, হাতে কাগজপত্রের বাণ্ডিল। সতীন অন্যমনস্ক ভাবে সে দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর একটা সিগারেট ধরাইয়া চেয়ারে বসিল।

প্রৌঢ় বয়স্ক বাঙালী ম্যানেজার, অল্প ভাষী, মৃদু ভাষী, পাকা কাজের লোক। নমস্কার করিয়া দুই-চারিটা কথার পর তিনি ডেলি রিটার্ণ ছোট সাহেবের হাতে দিলেন, তাহা দেখিয়া মন্তব্য লিখিয়া সহি করিয়া দিতে হইবে কলিকাতায় সাহেবের কাছে পাঠাইবার জন্য। রিটার্ণ দেখিয়া সতীন মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতে লাগিল। তার পর রিটার্ণ দেখা শেষ হইলে সহি করিয়া ফেরত দিয়া ডাক্তারখানার এক্সটেনশন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। কতকগুলি যন্ত্রপাতি আনিয়া লেবরেটরীর কাজ আরম্ভ করা হইবে। মাল আসিবার দেরিতে কাজ সুরু করা যায় নাই। সাহেব কোম্পানীকে একটা তাগিদ দিতে বলিয়া সতীন বলিল—আমার বোন ও তার এক বন্ধুর আসবার কথা আছে দুই-তিন দিনের মধ্যে। দুইটি আয়ার খোঁজ করবেন, আর ছোট গাড়ীটা আগের দিন জলপাইগুড়ি পাঠাতে হবে। ঠিক সময়ে আমি আপনাকে জানাবো।

ম্যানেজার নমস্কার করিয়া কাগজপত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সতীন কি ভাবিতে লাগিল। তার পর বাহাদুর, বাহাদুর বলিয়া ডাকিল। তাহার মাথায় হঠাৎ একটা প্ল্যান আসিয়াছে।

বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা ষ্টাডি করিতে দুই কমরেড আসিতেছেন। মালিককে সাবধান করিয়াছেন। মালিকের উচিত এই ইঙ্গিতের মর্ম গ্রহণ করা। তাহাই হউক। টৌকনিয়া ও ঝাঁকাবাড়ী বাগানের কাজ দেখিয়া তাহার কলিকাতা ফিরিবার কথা। কি পরিমাণ মাল তিনটা বাগান হইতে সংগ্রহ হইতে পারে বুঝিয়া কন্ট্রাক্ট করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে চাপাচাপি করিয়া মোট উৎপন্ন মালের পরিমাণ কিছু উঠানো দরকার হইতে পারে। কমরেডরা পৌঁছিলেই সে টৌকনিয়া রওনা হইবে, সেই দিনই। টৌকনিয়া তিন দিন, সেখান হইতে ঝাঁকাবাড়ী তিন দিন। তার পর কলতাবাড়ী ফিরিয়া তিস্তাখোলের ওপারে রিকপানির জঙ্গলে এক দিন ঘুরিয়া আসিবে। শিকারীর স্বর্গ রিকপানির জঙ্গল, তিব্বতের সীমানায়। তার পর সটান কলিকাতায়। এরা ম্যানেজারের চোখের সামনে প্রোপাগাণ্ডা করুক কয়েকদিন।

বাহাদুর আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে বলিল—ম্যানেজার সাহেবকে বলো কাল দুপুরে সাইকেল-পিয়ন আমার চিঠি নিয়ে টৌকনিয়া বাগানে যাবে। তিনি যেন বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করেন।

বাহাদুর চলিয়া গেল। সতীনের ঈষৎ উত্তেজিত ভাব এতক্ষণে শান্ত হইয়া আসিল। সিগারেট-কেসটা হাতে লইয়া সে বাংলোর বারান্দার সঙ্গে লাগানো কাঠের সিঁড়ির তিনটা ধাপ নামিয়া সম্মুখের সিমেন্ট-বাঁধানো গোল চাতালে আসিল। পামের ও মরশুমী ফুলের টবে সাজানো চাতাল, মাঝখানে খানকয়েক বেতের চেয়ার ও টিপয়। চাতালটি মাটি হইতে প্রায় আড়াই ফুট উঁচু। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া টেনিস-গ্রাউণ্ডের পাশ দিয়া বাংলোর দক্ষিণের বাগানের পথে সে অগ্রসর হইল।

কাঁটাতারের ও মেদীগাছের বেড়ায় ঢাকা বেশ বড় বাগান। প্রবেশ করিতেই ব্যাডমিণ্টন মাঠ। কলোনীর মেয়েরা এখানে খেলেন। তার পর ফুল ও ফলের গাছ। মাঝখানে একটা উচ্চ বেদীর উপর কলতাবাড়ী বাগানের প্রতিষ্ঠাতা সতীনের পিতামহের উপবিষ্ট মর্মর মূর্তি। আর একটু আগাইয়া গেলে জঙ্গলাকীর্ণ নিম্নভূমি দেখা যায়। বাগানের পাশ হইতে এই দিকটা খাড়া নামিয়া গিয়াছে। দূরে

জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে কলা ও বাঁশ গাছের ঝোঁপের মধ্যে ছোট ছোট খড়ো ঘর দেখা যায়।

বাগানের এই দিকটাতে আসিয়া একটা কাঠের বেঞ্চের উপর বসিয়া সে সিগারেট ধরাইল। নীচের জঙ্গল ও বস্তী-গুলির পশ্চাতে দূরে ডিয়াখোল পাহাড়ের একাংশ দেখা যাইতেছে। যেন একটা প্রকাণ্ড ঈগল পাখী তাহার যোজন-ব্যাপী দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া উত্তর-পূর্ব সীমানা আটকাইয়া পড়িয়া আছে।

ছিন্ন চিন্তার সূত্রগুলি আবার জোড়া লাগিতে লাগিল।

কমরেড ভেঙ্কটাপ্পা, কমরেড উ পো, কমরেড তেলাঙ্কর, কমরেড ঊষা দত্ত। কমরেড রবি পালের পিতা সাপ্লাই বিভাগের বড় চাকুরীয়া। তিনি লীগভক্ত, কোয়ালিশনবাদী। ছেলে বাউড়িয়ার চটকলের গোলমালের পর কখনো কমিউনিষ্ট কখনো কংগ্রেস-মাইণ্ডেড কমিউনিষ্ট বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। দক্ষিণী, বর্মী ও মারাঠী কমরেড আন্তর্জাতিক এফিলিয়েশন বা সম্পর্ক-যুক্ত ব্যক্তি।

কমরেড ঊষা দত্ত কর্মঠতায় অবাঙালী। তাহার ওষ্ঠের বিন্যাস ও চিবুকের গঠন কোঙ্কণী বা মালাবারী মেয়ের মত। তাহাকে চিৎপাবন, কুর্দ্ বা মলয়ালী মেয়ে বলিয়া লোকে ভুল করিতে পারে। মেয়েটির সব সময়ের অনুত্তেজিত ভঙ্গীটিও আশ্চর্য। কথায় উত্তেজনা নাই, ব্যবহারে উত্তেজনা নাই, মনের টেম্পারেচরও বোধ হয় সর্বদা ৩২ ডিগ্রী ফারেনহাইটের নীচে।

সতীন সিগারেট ফেলিয়া দিয়া নিজের মনে হাসিয়া উঠিল। এই বাঙালিনী বেণী সাব-আর্টিক জগতের মেয়েটির পিছনে সে একটি বৎসর ঘুরিয়াছে তাহার কমরেড ভগ্নীর বক্তৃতার শিলা-বৃষ্টি মাথায় করিয়া। ব্ল্যাক মার্কেটে পেট্রোল কিনিয়া জগদ্দল হইতে বাউড়িয়া, বাউড়িয়া হইতে বাটানগর, বাটানগর হইতে খিদিরপুর সারাদিন গাড়ী দৌড় করাইয়াছে কমরেডদের বহন করিয়া।

সেবার ইলেকশনের সময় বজবজ হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কিছু দূর আসিতেই সামনে এক দল লোক দাঁড়াইয়া গাড়ী আটকাইয়া দিল। তার পর "মার" "মার" শব্দে গাড়ীর উপর ইট-পাটকেল বৃষ্টি। একখানা ঢিল কপালে লাগিয়া সতীনের কপাল কাটিয়া গেল। মিনতি পুলিস, পুলিস করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে কে যেন চিৎকার করিয়া বলিল—ভাই সব, এটা কংগ্রেস সেবকদের গাড়ী। আমাদের ভুল হয়েছে। এই দেখ বনেটে জাতীয় পতাকা ছিল, ঢিল লাগিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

একজন লোক পকেট হইতে টর্চ বাহির করিয়া জ্বালাইয়া দেখিল বাস্তবিক সেটা জাতীয় পতাকা। ঐ আলোতে দেখা গেল জাতীয় পতাকা হাতে দাঁড়াইয়া কমরেড রবি পাল। কোন্ ফাঁকে সে গাড়ী হইতে নামিয়া ভীড়ে মিশিয়াছিল সতীন জানে না।

গাড়ীতে কংগ্রেস সেবিকারা রয়েছেন। আমি তাঁদের নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে দিয়ে আসছি। বলো কংগ্রেস জিন্দাবাদ! কমিউনিজিম বরবাদ!

জনতা স্লোগান দিল—কংগ্রেস জিন্দাবাদ! কমিউনিজম বরবাদ!

কমরেড রবি পাল আসিয়া সতীনের পাশে বসিল, সে গাড়ী চালাইয়া দিল।

এই ব্যাপারের পর হইতে পার্টি সার্কেলে কমরেড রবি পাল সম্বন্ধে কাণাঘুষা উঠিল সে কংগ্রেস-স্পাই।

এক বছর এই ভাবে পার্টির মেম্বারদের সেবা করিয়াও সতীন কমরেড ঊষা দত্তের ব্যবহারে এমন কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইল না যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে আর এক ধাপ আগাইতে পারে। অবশ্য পার্টি সার্কেলে ও পরিবারের মধ্যে তাহার এই তপশ্চরণের হেতু অনেকেই জানিতে পারিয়া-ছিল এবং ইহা লইয়া কথাবার্তাও শুনা যাইত। তাহার নাম হইয়াছিল কমিউনিষ্টিক-মাইণ্ডেড্ আপার বুর্জোয়া। এই অপাঙ্‌ক্তেয়টিকে জাতে তুলিবার ইঙ্গিত কমরেড দলের আর কেহ না হউক কমরেড মিনতি কমরেড ঊষা দত্তকে অনেক বার দিতে ভুলে নাই কিন্তু তাহার ব্রতচারিণীর নিরাসক্ত ভাবের কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। সতীনের অবশেষে ধারণা হইল যে পার্টির খাতায় নাম লিখাইলেও কমরেড ভেঙ্কটাপ্পা, কমরেড তেলাঙ্কর প্রভৃতির মত আন্তর্জাতিক খ্যাতির কমরেড হাজির থাকিতে তাহার কোন প্রসপেক্ট নাই, গল্পের সার্কাস পার্টির গাধার যেটুকু ছিল তাহাও নাই। তাহার পার্টির খাতায় নাম লিখাইবার বাস্তবিক কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহারে সে বুর্জোয়া, অপরিবর্তনীয় রূপে বুর্জোয়া, যদিও তাহার ভগ্নী অর্বোভক্স কমিউনিষ্ট বলিয়া আন্তঃপ্রাদেশিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

সতীন কমরেড দলের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কলিকাতা ছাড়িল। সে আজ ছয় মাসের কথা। ভাবিয়াছিল কলিকাতা ছাড়িবার আগে কমরেড ঊষা দত্তের মন বুঝিবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ উদ্যম ত্যাগ করিয়াছিল। রূপের নেশা! সে প্রতিজ্ঞা করিল দুই মাস কর্মব্যস্ত জীবন যাপন করিয়া সে এ নেশা জয় করিবে। 'এণ্ড নাউ হি ইজ হিজ ওন্ড সেলফ'। ভেঙ্কটাপ্পা মরিয়া গিয়াছে। উরাল পর্বতের পশ্চিমের কমিউনিষ্টদের স্বর্গধামে তাহার আত্মার প্রয়াণ হউক। কমরেড তেলাঙ্কর, কমরেড উ পো, কমরেড রবি পাল সান্ত্বনা দিবার জন্য বর্তমান আছেন।

সতীন উঠিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল বারকয়েক ডনবৈঠক দিয়া শরীর ও মন একটু চাঙ্গা করিয়া লইবে। সে নিজের মনে হাসিয়া ফেলিল। ছোট সাহেব দুপুরবেলা বাগানে ডন-বৈঠক করিতেছেন এ দৃশ্য দেখিলে ছোট সাহেবের সঞ্চিত প্রেষ্টিজ ধূলি লুণ্ঠিত হইয়া যাইবে। সে কয়েক পা আগাইয়া

গিয়া দুই হাতে কতকগুলি কসমস ফুলের লম্বা গুচ্ছ টানিয়া ছিঁড়িল। সেগুলি বগলে চাপিয়া আবার একটা সিগারেট ধরাইয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া গেষ্ট-হাউসের পথ ধরিল।

মধ্য-এশিয়ার ভাসখন্দ অভিযান হইতে প্রত্যাগতা কমরেড ঊষা দত্তের আলিপুর ডুয়ার্সে অভিযান। কি মতলবখানা তোমাদের দুই কমরেডের? কলিকাতার ইনডাষ্ট্রিয়াল এলাকা, সুন্দরবনের সংগ্রামশীল লাট ছাড়িয়া ডুয়ার্সে কমিউনিষ্ট প্রোপাগাণ্ডা করিবে? এত য়ুরোপীয় বাগান থাকিতে কলতাবাড়ী বাগানে কেন? চা ব্যবসায়ে দেশী লোক যেটুকু দাঁত বসাইয়াছে তাহাও অসহ্য? যাইবার সময়ে ম্যানেজারকে দুই-একটা উপদেশ দিয়া যাইতে হইবে। মালিকের মেয়ের সুযোগ-সুবিধা কমিউনিষ্ট প্রোপাগাণ্ডার কাজে ব্যবহার করা চলে না। কিন্তু এরা তাহাই চায়। ব্যানার্জি জমিদারের ছেলে মহালে গিয়া ভূস্বামীর প্রাপ্য নজর পকেটস্থ করিবে আবার আড়ালে জমিদার ও তাঁহার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তেজিত করিবে। মজুমদার-পরিবারের মেয়ে বাপের পয়সায় কারপোতে কমরেড ছোকরাদের লইয়া লাঞ্চ খাইবে, গ্রেট ইষ্টার্ণে নাচিবে আবার বাপের কারখানায় গিয়া মজুরদের মধ্যে প্রোপাগাণ্ডা করিবে। ইহাদের কমিউনিজম এই প্রকারের। 'হাউএভার, দে আর ওয়েলকাম হিয়ার'।

পরের দিন জলপাইগুড়ি গাড়ী রওনা করিয়া দিয়া বাহাদুরকে নির্দেশ দিল মল্লিক সাহেবের বাড়ীতে রাত্রি থাকিবে। সকালে ষ্টেশন হইতে দিদিমণিদের আনিয়া সেখানে স্নানাহার সারিয়া বারোটার মধ্যে গাড়ী ছাড়িবে যাহাতে চারটার মধ্যে কলতাবাড়ী পৌঁছায়। সন্ধ্যাবেলা তাহাকে টৌকনিয়া বাগানে যাইতে হইবে।

তার পরের দিন। বেলা যত গড়াইয়া আসিতে লাগিল সতীনের মানসিক চাঞ্চল্য তত বাড়িতে লাগিল। কলতাবাড়ীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে কমরেড ঊষা দত্তের মত অতিথিকে লইয়া সে সহজ ভাবে চলিতে পারিবে কিনা, নিস্পৃহ ঔদাসীন্য ও অশোভন আগ্রহের মধ্যে মানাইয়া চলিতে পারিবে কিনা এই চিন্তা তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। একবার ভাবিল তখনই চলিয়া যাইবে। কিন্তু সেটা হইবে প্রত্যক্ষ অভদ্রতা। তারপর তাহার নিজের ভগ্নী আসিতেছে।

ম্যানেজারকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিয়া বলিল সে একটু বাহিরে যাইতেছে, সন্ধ্যার আগে ফিরিবে, ইহার মধ্যে মিসতিরা আসিয়া পড়িলে তিনি যেন সব ব্যবস্থা করিয়া দেন। বলিল না যে পথের মধ্যে মিসতিদের ধরিবার উদ্দেশ্যে সে যাইতেছে।

বাগানের বড় গাড়ীখানা আসিয়া গেষ্ট হাউসের সম্মুখে দাঁড়াইল। কয়েকটা বাস্কেট ও দুইটা বন্দুক উহাতে উঠিল। কণ্ট্রাক্টর নির্মলের কোয়ার্টারের কাছে গাড়ী থামাইয়া ডাকিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া সতীন বাড়ীকাটা পাহাড়ের দিকে গাড়ী চালাইল। বাড়ীকাটা পার হইয়া রাস্তা প্রধান রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে, এক প্রান্ত গিয়াছে তিস্তাঘাটমুখে, অন্য প্রান্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া আসাম ডুয়ার্সের রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে।

প্রকাণ্ড সিডান-বডির ভক্স গাড়ী, উঁচুনীচু রাস্তায় দুলিয়া দুলিয়া নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিল। বাড়ীকাটা পাহাড়ের একটা দিক বেশ ঢালু, গড়াইয়া গড়াইয়া নামিয়াছে। রাস্তার বাম দিকে বুনো ফুল ও নানা রকম ছোট গাছের অসংখ্য ঝোপ, একটানা নয়, ফাঁক ফাঁক। খরগোস ও প্যাট্রিজের আড্ডা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গাড়ী আসিয়া এখানে পৌঁছিলে সতীন গাড়ীখানা রাস্তা হইতে ঝোপ-জঙ্গলের দিকে খানিকটা সরাইয়া আনিল। তারপর দুই বন্দুক লইয়া দুই জন গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল।

সতীন নির্মলকে বলিল—তোমার হাত কতটা ঠিক হয়েছে পরীক্ষা দিতে হবে আজ। এক ডজন পুরাতে না পারলে রাস্তায় তোমাকে ফেলে রেখে যাব।

নির্মল হাসিল।

দুই জন দুই দিক হইতে এক একটি ঝোপ পরীক্ষা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

খরগোস ও তিতির কোম্পানী কি আজ দূরবর্তী কোন জায়গায় মিটিং করিতে গিয়াছে? অথবা বেতারে আততায়ী-যুগলের আক্রমণ-সংবাদ পাইয়া বাড়ীঘর ছাড়িয়া ট্রেঞ্চে আশ্রয় লইয়াছে? সতর্ক ভাবে আগাইতে আগাইতে দুই শিকারী বহুদূর চলিয়া গেল। আর খানিকটা আগে পাহাড়ের ঢাল খাড়া নামিয়া নালায় পড়িয়াছে। বৃষ্টির জল নামিবার পথ। ঢালের মাথায় একটা ঝোপ হঠাৎ নড়িয়া উঠিল। দুই শিকারী বন্দুক তুলিবার আগেই এক জোড়া বন্য মোরগ ঝোপ হইতে বাহির হইয়া নালার দিকে ছুটিল বিদ্যুতের গতিতে। পিছনের মোরগটি আগে যাইবার জন্য নীচুতে উড়িল। সতীন সেইটিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল। পাখায় ও পাঁজরায় ছররা লাগিয়া সেটি মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্যটি উড়িয়া নালার মধ্যে নামিয়া অদৃশ্য হইল। নির্মলের আর বন্দুক ছুড়িবার অবকাশ হইল না। সে উৎকর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল—স্যর, মোটরে কে হর্ণ দিচ্ছে।

—তুমি এগিয়ে দেখ ত কি ব্যাপার। আমি এটিকে সংগ্রহ করে আসছি।

নির্মল দ্রুত পদে আগাইয়া গেল। দূরে রাস্তায় একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া ক্রমাগত হর্ণ দিতেছে। আর একটু আগাইয়া যাইতে সে বাগানের গাড়ী চিনিতে পারিল। সে বুঝিতে পারিল তাহাদের গাড়ীখানা দেখিতে পাইয়া বাহাদুর হর্ণ দিয়া তাহাদের ডাকিতেছে। সে সতীনের জন্য দাঁড়াইল।

মোরগটাকে বাঁ হাতে ঝুলাইয়া সিগারেট মুখে সতীন আসিতেছিল। মোরগটা তখনও মরে নাই, সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত করিয়া এক-এক বার ঝাপটাইতেছিল। যেমন বিদ্যুতের মত গতি তেমনি শক্ত প্রাণ এই বন্য মোরগের। নির্মলের কাছে আসিয়া সে বলিল—তুমি এগিয়ে যাও, মিসতিরা এসে গেছে মনে হচ্ছে।

নির্মলকে লজ্জায় পাইয়াছিল। সে মৃদু আপত্তি করিয়া বলিল—আমি ত অপরিচিত। আপনিও আসুন।

—একেবারে র‍্যাশিং পার্ল। বলিয়া সতীন হাসিল।—

তুমি এটাকে বর দিকি। সাবধান, এখনও আঁচড়াতে চেষ্টা করছে।

নির্মল পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া পাখীর দুই পা বাঁধিল। তারপর পাখীটাকে নির্ভয়ে ঝুলাইয়া লইয়া চলিল। সতীনের হাত দুই-এক জায়গায় ছড়িয়া গিয়াছিল।

তাহারা দুই জন কাছে আসিতে বাহাদুর ও মিনতি গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি গাড়ীর মধ্যে ছিল সতীন দেখিতে পাইল।

নির্মল বন্দুক ও পাখী মাটিতে রাখিয়া মাথা নোয়াইয়া মিনতিকে নমস্কার করিল। সতীন মিনতির পিঠে এক থাবড়া মারিয়া বলিল, ওয়েলকম কমরেড মিনতি। তার পর—

সে গাড়ীর মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। নত মুখে উষা বসিয়া আছে। মিনতি চোখের ইসারা করিল। সতীন সিগারেট ফেলিয়া দিয়া হাসিমুখে গাড়ীর কাছে গিয়া এক হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, মোষ্ট ওয়েলকম মিস দত্ত। নেমে আসুন।

উষার মুখে অতি মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সতীন এক পা সরিয়া দাঁড়াইল। উষা গাড়ীর ফুটবোর্ডে এক পা রাখিতেই সে উষার ডান হাতখানি মুঠির মধ্যে ধরিয়া তাহাকে নামাইয়া লইল। মুখে বলিল, একস্‌কিউজ মাই বুর্জোয়া ম্যানারস্‌, কমরেড দত্ত।

নির্মলের সঙ্গে ইহাদের পরিচয় করিয়া দিয়া সতীন বাহাদুরকে বলিল—তাহার গাড়ী লইয়া বাগানে চলিয়া যাইতে। সে ইঁহাদের লইয়া একটু পরে যাইতেছে। সাতটায় চৌকনিয়া রওনা হইতে হইবে ম্যানেজার সাহেবকে জানাইবে।

বাহাদুর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। নির্মল ও সতীন বড় গাড়ী হইতে ঝুড়িগুলি নামাইয়া আনিল। সেগুলির মধ্য হইতে বাহির হইল একটা বড় থার্মোফ্লাস্কে চা, ক্রিম-ক্র্যাকারের বাক্স, বিস্কুটের বাক্স ভর্তি সন্দেশ, পেয়ালা, পিরিচ, ডিস ইত্যাদি।

সম্মিলিত কমরেড-যুগলের জন্ম লাইট রিফ্রেসমেন্টের আয়োজন, সতীন হাসিয়া বলিল—নির্মল ডিসগুলো সাজিয়ে চা ঢালো, আমাকে আগে দেবে, শিকারের পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত-কলেবর হয়েছি কি না? ভূমিতে শায়িত মোরগটার দিকে তর্জনী হেলাইয়া সে মিনতির দিকে মুখ বাঁকাইয়া এই মন্তব্য করিয়াই হাসিয়া উঠিল।

মিনতি হাসিল, উষা মুখটা একটু ঘুরাইল, হাসিল কি না জানা গেল না। নূতন পরিবেশে সতীনের চরিত্রের এই নূতন রূপের প্রকাশ কি তাহাকে বিস্মিত করিয়াছিল?

বিব্রত নির্মল চা ঢালিতে গিয়া খানিকটা চা মাটিতে ফেলিয়া দিল।

তোমার ভাগ ঐ গেল নির্মল, আর পাবে না, সতীন বলিয়া উঠিল—এখন হাঁ করে এদের মুখের দিকে চেয়ে থাকো বিস্কুটের দুই একটা টুকরো যদি ফেলে দেন।

মিনতি প্রতিবাদ করিয়া নির্মলকে আশ্বাস দিল। বলিল—আপনি ছাড়ুন, আমরা গুছিয়ে দিচ্ছি।

সে উষাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল—ডিসগুলো সাজা দেখি।

একলাফে বিস্কুটের বাক্স দুইটি লইয়া সতীন সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আপনারা কমরেড-যুগল আমাদের অতিথি। আপনারা দয়া করে পা মেলে আরাম করে বসুন, আমরা সার্ভ করছি।

দ্রুত হাতে একটি ডিস ভরতি করিয়া উষার দিকে ধরিল—'হিয়ার ইউ আর কমরেড দত্ত'। উষা বিনাবাক্যে ডিসটা লইল। না একটু চকিত চাউনী, না একটুখানি মোলায়েম থ্যাঙ্কস। সতীনের সে দিকে লক্ষ্য নাই। সে দুইখানা বিস্কুট মিনতির কোলের উপর ছুড়িয়া দিয়া বলিল, তুমি আর চেয়ো না, অনেক দেওয়া হয়েছে কমরেড মিনতি।

উষার মুখে এবার হাসি দেখা গেল, বেশ স্পষ্ট হাসি সতীন দেখিল। গম্ভীর ভাবে সে বলিল, থ্যাঙ্কস কমরেড দত্ত, আমরা এটা নোট ক'রে রাখবো।

ইহার পর অন্য ডিসগুলি সাজাইয়া সে মিনতি ও নির্মলকে দিল, নিজেও একটা লইল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সে তাড়াইয়া সকলকে গাড়ীতে উঠাইল। বলিল, আমার মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় হাতে থাকবে। আর দেরি নয়।

গাড়ী কলতাবাড়ী মুখে ছুটিল।

পথে মিনতি একবার জিজ্ঞাসা করিল—পৌঁছে মাত্র এক ঘণ্টা সময় তোমার হাতে থাকবে বললে, এর মানে কি?

সতীন বলিল—পরে শুনো।

কমরেডদ্বয়ের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহার মনে কি ঈষৎ সংশয়ের উদয় হইতেছিল? উষা বরাবর কম কথা বলে কিন্তু তাহাকে কি কেমন যেন একটু নরম নরম মনে হই-তেছে? তুন্দ্রা অঞ্চল কি দক্ষিণে সরিয়া আসিতেছে অথবা কমরেড জেকটাপ্লার শোক? মরুকগে এ সব চিন্তা। কাঙাল-পনা সে যথেষ্ট দেখাইয়াছে, আর নয়। সে সোজা হইয়া বসিয়া গাড়ীতে স্পীড বাড়াইয়া দিল।

কলতাবাড়ী পৌঁছিয়া পরিচয়ের পালা সারিয়া হাত-মুখ ধুইয়া তাহারা বাংলোর সম্মুখে চাতালে আসিয়া বসিল। সম্মুখে ডিয়াখোল পাহাড়ের মাথায় অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা থাকে-থাকে-সাজানো চা-গাছগুলির উপর মায়াজাল বিছাইয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে কুয়াশার ছোট ছোট কুণ্ডলী পাহাড়ের গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাগানের কাজ অনেকক্ষণ বন্ধ হইয়াছে। নবাগতা দুই জন বিস্মিতভাবে এই স্তব্ধ ম্লানায়মান দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল।

ম্যানেজার বাবু প্রচুর জলযোগের আয়োজন করিয়া-ছিলেন। সতীন ছাড়া আর কেহ বিশেষ কিছু খাইল না। সতীন একটি প্লেট উঠাইয়া লইয়া ঘরের মধ্যে গেল, ইঙ্গিতে মিনতিকে অনুসরণ করিতে বলিয়া।

মিনতি আসিলে তাহাকে বলিল—তোমাদের দু'জনের জন্ত পাকা বন্দোবস্ত করা হয়েছে, কোন অসুবিধা হবে না।

রাতেও দু'জন আয়া তোমাদের কাছে থাকবে, তা ছাড়া বুড়ো বাহাদুর ও আর একজন বিশ্বস্ত লোক পাশের কামরায় থাকবে। ম্যানেজারবাবুকে বললে তিনি তোমাদের ইচ্ছামত সব ব্যবস্থা করে দেবেন। যেমন ইচ্ছা প্রোপাগাণ্ডা ক'রে বেড়াও কয়েক দিন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে চৌকনিয়া বাগানে রওনা হব, সেখানে কাজ আছে। চৌকনিয়া থেকে ঝাঁকাবাড়ী। কাজ সেরে ফিরতে ছয় দিন লাগবে। তোমার সঙ্গিনীকে বুঝিয়ে ব'লো। এ বাগানে তুমি তার হোষ্টেস, আমার অনুপস্থিতিতে কিছু এসে যাবে না।

মিনতির মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঠোঁট কামড়াইয়া চাপা স্বরে বলিল—ইউ আর এ ফুল, নিরেট গাধা!

সতীন হাসিল। বলিল—সম্ভবতঃ তাই। অন্যের কথা কি আমার নিজেরও সেই রকম সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু তুমি কি করতে বল আমাকে?

—কিছু করতে বলি না তোমাকে। মিনতি রাগিয়া বলিল—এর পর ল্যাজনেড়ে পা চেটে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য চার পায়ে ছুটবে আমার পিছু পিছু। বনমোরগ পর্যন্ত যার দৌড়, সে আর কত উঁচুতে উঠতে পারে?

সতীন চমকিয়া উঠিল। কি ইঙ্গিত করিতেছে মিনতি? মিনতি ঝাঁকালো কমরেড, মেয়েও যে সে এ রকম ঝাঁকালো তাহা ত মনে হয় নাই।

—তোমার অতিথির মঙ্গল কামনা করি, এই বলিয়া সতীন শান্তভাবে প্লেট হইতে একটি সিঙ্গাড়া তুলিয়া মিনতির মুখে গুঁজিয়া দিল এবং নিজের মুখেও একটা পুরিল।

— কমরেড ভেঙ্কটাপ্পার কি হয়েছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল একটু ভ্রূকুটি করিয়া।

তাসখন্দ অভিযান ফেঁসে গেল কেন?

—ভেঙ্কটাপ্পা গাড়ী থেকে পড়ে গিয়ে মরেছে। সে গাড়ীতে উষা ছাড়া আর কেহ ছিল না। ইচ্ছা হয় এটা য়্যাক্সিডেন্ট মনে করতে পার, ইচ্ছা হয় অন্য কিছু মনে করতে পার। এ প্রসঙ্গ এখন থাক্, যথাসময়ে সব শুনবে। আপাততঃ যা শুনলে তোমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। খেয়ালীপনা করে কাজ নষ্ট ক'রো না—মিনতি একটু অনুনয়ের সুরে বলিল। ইউ টক্ লাইক এ সেন্সিব্ল্ গার্ল, সতীন গম্ভীরভাবে মন্তব্য করিল। তারপর দ্বিতীয় সিঙ্গাড়া মিনতির মুখে পুরিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে প্লেট খালি হইয়া গেল।

তাহারা চাতালে ফিরিয়া আসিল।

—চৌকনিয়া লোক পাঠানো মিছা হয়রানি হ'ল ম্যানেজার বাবু। সে হাসিয়া বলিল।

ম্যানেজার বাবু একটু হাসিলেন।—মায়েরা এই এলেন, এখনই আপনার চৌকনিয়া যাওয়া ঠিক হ'ত না, তিনি বলিলেন।—কাল সেখানে খবর দেওয়া যাবে।

কথাবার্তায় সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। তিয়াখোলের পাহাড় অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার দেহের অস্পষ্ট রেখাটি পর্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে।

নির্মলকে ইতিমধ্যে গল্পে পাইয়াছিল, তিয়াখোলের ওপারে ঝিকপানির জঙ্গলে আর একটু রাত হইলে বড় বড় হাতী, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাহির হইবে সে বলিতেছিল। পথের উপর বাঘ দাঁড়াইয়া, আগুনের ভাঁটার মত দুই চোখ জ্বলিতেছে। হঠাৎ হেড-লাইটের উজ্জ্বল আলো মুখের উপর পড়িতে বোকার মত দাঁড়াইয়া থাকিবে কিছুক্ষণ। তার পর ভীষণ গর্জন করিয়া প্রকাণ্ড লাফে জঙ্গলে ঢুকিবে। কখনও দেখা যাইবে মস্ত শিংওয়ালা সম্বর গাছের আড়ালে থাকিয়া লম্বা মুখ উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দাঁতালো প্রকাণ্ড হাতী হেলিয়া-দুলিয়া চলিয়াছে, পিছনে দশ-বিশটা হাতী, বাচ্চাগুলোর কি দাপাদাপি। অনর্গল সে বকিয়া যাইতেছিল। দুই কমরেড তন্ময় হইয়া তাহার গল্প শুনিতেছিল।

চৌকনিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহাদুর বড় গাড়ীখানা আনিয়া বাংলোর সম্মুখে দাঁড় করাইল। সাতটা বাজিয়াছে।

মিনতি জিজ্ঞাসুভাবে সতীনের দিকে চাহিল। তারপর এক বার উষার দিকে আবার সতীনের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িল। কি ইঙ্গিত সে করিতেছে সতীন যেন বুঝিতে পারিল।

নির্মল তখন উষার দিকে চাহিয়া বলিতেছিল—যাবেন মিস্ দত্ত ঝিকপানির জঙ্গলে বেড়াতে? মিনতিকেও সেই প্রশ্ন করিল। বলিল—সাড়ে দশটা, এগারোটার মধ্যে ফিরে আসা যাবে।

ম্যানেজার বাবু আপত্তি তুলিলেন—এঁরা বড় ক্লান্ত আছেন। কি ছেলেমানুষি করছ নির্মল?

নির্মল ধমক খাইয়া দমিয়া গেল, আর কথা বলিল না।

সতীন বলিল—আধ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জোৎস্না উঠবে। মিনতি, তোমরা যদি বেড়াতে যেতে চাও ত বল। আমার আপত্তি নাই।

মিনতি বলিল তাহারা এমন কিছু ক্লান্ত হয় নাই, যাইবে। সতীন উষার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মিস্ দত্ত কি বলেন?

উষা মুখ তুলিয়া সতীনের দিকে চাহিল, তারপর চোখ নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিল—যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

—ভাল। ম্যানেজার বাবু এদের ধরে বেঁধে কিছু খাইয়ে দিন। নির্মল, তুমি কিছু খেয়ে নিয়ে তৈয়ের হও। আমার রাইফেল আর একটা শটগান, গুলির বাক্স, বড় কয়েকটা টর্চ সব গাড়ীতে ঠিকমত তুলে দাও। কিছু চা নিতে পার।

নির্মলের তাজা উৎসাহ জোড়া লাগিল। সে দুই প্লেট খাবার মিনতি ও উষার কাছে আগাইয়া দিয়া একটা সতীনের হাতে দিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া একটা প্লেট ম্যানেজার

বাবুর দিকে ঠেলিয়া দিল। তিনি হাসিয়া নির্মলের হাতে তুলিয়া দিলেন।

খাওয়া শেষ করিয়া মেয়েরা ঘরে প্রবেশ করিল। উষা ঘরে যাইবার সময়ে সতীন তাহার মুখের একটা পাশ ভাল করিয়া দেখিতে পাইল আলোতে। ঈষৎ লাল হইয়া উঠিয়াছে মনে হইল। ভুরুর অঞ্চলে কি তবে সূর্যোদয় হইয়াছে?

চাবালো মেয়ে কমরেড মিনতি। ভিতরে চারি জনের জায়গায় সে বসাইল দুই জনকে, নিজে বসিল বাহাদুরের পাশে ভাল 'ভিউ' পাইবে বলিয়া, তাহার অন্য পাশে বসাইল শর্ট-প্যান্টধারী নির্মলকে।

গাড়ী তীব্র হেড-লাইট জ্বালিয়া পীচ-বাঁধানো রাস্তা দিয়া ডিয়াখোল পাহাড়ের দিকে ছুটিল।

নির্মল আর মিনতি আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে মিনতি বাহাদুরকে প্রশ্ন করিতেছে। ভিতরের সীটে আলো সুইচ-অফ্ করিয়া পাশে রাইফেল রাখিয়া সিগারেট ধরাইয়া সতীন ভাল করিয়া বসিল। উষাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—মিস দত্ত, দোরের একেবারে ধারে বসবেন না, ইট ইজ রিস্কি। যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, এদিকে সরে বসুন।

উষা কতটা সরিয়া বসিল অন্ধকারের মধ্যে বুঝা গেল না।

দুই দিকে চা-বাগান, মাঝের রাস্তা দিয়া গাড়ী ছুটিতেছে। এই অন্ধকারেও দুই-একটি লোক পথে চলিতেছে। কাহারও ঘাড়ে কাঠের বোঝা, কাহারও কাঁধে বাঁশের কঞ্চির আঁটি। তাহারা আলো দেখিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া এক পাশে দাঁড়াইতেছে। এক চা-বাগান শেষ হইয়া আর এক চা-বাগানের এলাকা। ক্রমে বাগান শেষ হইতে দুই পাশে জঙ্গল দেখা দিল, পীচের রাস্তা ছাড়িয়া উঁচু-নীচু কাঁচা রাস্তা আসিয়া পড়িল, গাড়ীর গতি মন্দ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে দুলুনি বাড়িল।

হঠাৎ নির্মল চীৎকার করিয়া বলিল—যাত্রা অশুভ হল, ঐ দেখুন। মিনতি দেখিল একটা ছোট জন্তু গাড়ীর আগে তীব্র বেগে ছুটিতেছে। সতীন বলিল—খরগোস নাকি? তবে হয়েছে।

এই উষা, দেখ, দেখ—মিনতি চেঁচাইয়া বলিল।

উষা কি ভাবিতেছিল। মিনতির ডাকে চমকিয়া উঠিল, বলিল—কি হয়েছে?

ততক্ষণে খরগোসটি পাশ কাটাইয়া পাশের জঙ্গলে ঢুকিয়াছে। মিনতি জিজ্ঞসা করিল—যাত্রা অশুভ বললেন কেন নির্মল বাবু? কোন বিপদ হবে?

—না না, নির্মল ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—শিকারীদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে যাবার সময়ে পথে খরগোস বেরুলে সেদিন আর শিকার মিলে না। কথাটা ঠিক কিন্তু।

আরও কিছুক্ষণ চলিয়া গাড়ী উপরে উঠিতে লাগিল। নির্মল বলিল—আমরা ডিয়াখোলের উপরে উঠছি। নামবার সময়ে সাবধান হবেন।

সতীন ভাবিতেছিল কেন মিনতি রাত্রে এই জঙ্গলে তাহাকে টানিয়া আনিল। এই নির্বাক যাত্রায় বিরক্ত হইয়া সে মিনতিকে ভিতরে ডাকিয়া বসাইবে কিনা ভাবিতেছিল।

গাড়ী ততক্ষণ নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। নামিবার পথের পাশে অগভীর খাদ। খানিকটা যাইতে হঠাৎ খাদের জঙ্গল ভয়ানক নড়িয়া উঠিল, একটা ভারী শব্দ হইল, কেমন একটা বোটকা গন্ধ নাকে ঢুকিল। বাহাদুর হাঁকিল হুঁশিয়ার।

চকিতে রাইফেল তুলিয়া ধরিয়া সতীন পাশের জঙ্গলের উপর টর্চের আলো ফেলিল। নির্মল তাহার বন্দুকে গুলি পুরিয়া ব্যারেলের মুখ জঙ্গলের দিকে ফিরাইল। জঙ্গল তখনও নড়িতেছে।

গাড়ী নামিতেছিল। কোন জানোয়ার খাদ হইতে লাফাইয়া জঙ্গলে ঢুকিয়াছে, এ শব্দ তাহার। সতীন রাইফেল নামাইয়া রাখিল। ভাল করিয়া বসিতে গিয়া মনে হইল উষা সরিয়া তাহার খুব কাছে আসিয়াছে।

ভয় পাইয়াছে, সতীন ভাবিল। সে বাঁ হাতটি বাড়াইয়া দিতে উষার হাতে লাগিল। মনে হইল উষা আরও কাছে সরিয়া আসিয়াছে।

খুব ভয় পাইয়াছে, সতীন ভাবিল। সে আশ্বাস দিয়া মৃদু স্বরে বলিল—কোন ভয় নাই মিস—

হঠাৎ হাত বাড়াইয়া সুইচ ঘুরাইয়া মিনতি আলো জ্বালিয়া দিল। ঘাড় ফিরাইয়া একটু হাসির সঙ্গে বলিল—ও. কে.। আলো নিভিয়া গেল। নির্মল হাঁকিয়া বলিল—বিকপানি এসে গেছি।

সতীন নিজ মনে বলিয়া উঠিল—হাঁ এসে গেছি। উষার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সে বলিল—কোন ভয় নাই উষা।

বিকপানির ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্যে তীব্র হেড-লাইট জ্বালিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল।

মধ্য-এসিয়ার ভাসখন্দ হইতে ডুয়ার্সের জঙ্গল। সতীন মনে মনে হাসিল। তারপর সিগারেট ধরাইয়া উষার কাছে সরিয়া আরাম করিয়া বসিয়া স্নেহের স্বরে ডাকিল—কমরেড উষা? নির্বাক উষা ধীরে ধীরে সবাক হইতে আরম্ভ করিয়াছিল কিনা। তাহার স্বরে কি প্রিয় মিলনের মৃদু পুলকাভাস?

মিনতি আদেশ দিল—বাহাদুর, গাড়ী ঘুরাও।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও হিন্দু সঙ্গীত

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভারতীয় সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারকল্পে সবিশেষ যত্নপর হইয়াছিলেন। উভয়েই, বিশেষ করিয়া শৌরীন্দ্রমোহন হিন্দু সঙ্গীতের উন্নতি ও প্রচারের জন্য তন্‌-মন-ধন বিনিয়োগ করেন। সঙ্গীত-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও প্রকাশেও তিনি তৎপর হন। তিনি স্বয়ং বাংলায় সঙ্গীত-বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে যন্ত্রকোষ, যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা, সঙ্গীত-শাস্ত্র-প্রবেশিকা, জাতীয় সঙ্গীত-বিষয়ক প্রস্তাব প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সঙ্গীতের ন্যায় ইউরোপীয় সঙ্গীতেরও তিনি বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি 'ডক্টর অফ মিউজিক' উপাধি লাভ করেন।* পাশ্চাত্ত্যের অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্বজ্জনমণ্ডলীও সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার অপরিসীম ব্যুৎপত্তির জন্য তাঁহাকে নানারূপ সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শৌরীন্দ্রমোহন একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। শৌরীন্দ্রমোহনের হিন্দু সঙ্গীত পুনরুজ্জীবন চেষ্টা যে বহুলাংশে সার্থক হইয়াছে, বর্ত্তমান কালে ইহার ব্যাপক চর্চ্চাই তাহা সপ্রমাণ করে। ২৫ নবেম্বর ১৮৬৯ তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকা "Hindu Revival of Music" শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুজ্জীবনে যতীন্দ্র-মোহন ও শৌরীন্দ্রমোহনের কৃতিত্বের কথা এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

> "The decay of Hindoo music may be said to have commenced from the death of Akbar and what remained was almost extinguished during the late Sack of Delhi —the Boston of Hindu music. It is the enlightened nobleman Babu Jotindra Mohun and his brother Sourindra who have taken upon themselves the task of reviving Hindu music. Enormously rich, extremely liberal, and fond of music, they have collected around them the remnant of ancient *calowats* and scientific Sanskrit works. They opened a musical class where instructions are given freely, but with such zeal and avidity that the learners believe that they confer an obligation on their teachers by condescending to learn. As regards the scholarship of professors, it is not with us lay people to give an opinion, but we believe theirs is the best school in India."

এখানে পত্রিকা বলিতেছেন, হিন্দু সঙ্গীত আকবরের মৃত্যুকাল হইতে এবং বিশেষ ভাবে দিল্লী লুণ্ঠনের পর হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছিল, ইদানীং যতীন্দ্রমোহন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহা পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষ চেষ্টিত আছেন। ঘরওয়ানা-কালোয়াত এবং সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রের যাহা কিছু অবশেষ তাঁহাদের যত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা সঙ্গীত শিক্ষা দানের একটি আয়োজন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা এত অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, শিক্ষার্থীরা মনে করে সঙ্গীত শিখিয়া তাঁহারা যেন উদ্যোক্তাদেরই কৃতার্থ করিতেছে! এখানকার সঙ্গীতাচার্য্যদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে অক্ষম, তবে আমাদের মনে হয় তাঁহারা ভারতের ঘরওয়ানা সঙ্গীত-অনুশীলনকারীদের শীর্ষ-স্থানে সমাসীন রহিয়াছেন।

পত্রিকা অতঃপর এখানকার প্রধান আচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর বিখ্যাত 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থের উল্লেখ করেন। ইহা তখনও প্রকাশিত না হইলেও মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া উক্ত নিবন্ধেই পত্রিকা এইরূপ মন্তব্য করেন—

> "We had fortunately a glimpse of it, and we can confidently declare that considering the deep research and the amount of facts collected, this work alone will confer immortality on the professor and his patrons."

অর্থাৎ, পত্রিকার মতে, এই গ্রন্থখানির মধ্যে যেরূপ গভীর গবেষণার ছাপ সুস্পষ্ট এবং যেমন বিপুল তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা প্রণেতা ও পৃষ্ঠপোষক-দ্বয়কে অমর করিয়া রাখিবে।

'সঙ্গীতসার' গ্রন্থ প্রণয়নে শৌরীন্দ্রমোহন যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, ক্ষেত্রমোহন ইহার অনুক্রমণিকায় (পৃ. ।/০+।৶০) তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমার আশ্রয়কল্পপাদপ সঙ্গীতাভিজ্ঞ বিজ্ঞোত্তম সুবিখ্যাত বিদ্যানুরাগী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের আদেশ ও উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক আমি প্রথমে রাগের আলাপ, তাল, লয়, গ্রাম, গমক, মূর্চ্ছনা, শ্রুতি প্রভৃতির লক্ষণ ইত্যাদি কয়েকটি স্থূল স্থূল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম। পরে উক্ত শ্রীযুক্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (আমি যাঁহাকে সঙ্গীতশাস্ত্রের ছাত্র বলিয়া অভিমান করি) সেই আয়ুষ্মান শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় মৎপ্রণীত সেই পুস্তক-দৃষ্টে আদরাতিশয়ে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক আমাকে সাধারণের নিকট প্রস্তুত করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন, হইয়া অপরিমিত যত্ন ও পরিশ্রম প্রাচুর্য্য স্বীকার করত নানা সংস্কৃত ইংরাজী ও পারস্য প্রভৃতি সঙ্গীত শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া উক্ত গ্রন্থের সারাংশ ও প্রমাণ প্রয়োগাদি সমুদয় সংগ্রহ পূর্ব্বক

---

* এই প্রসঙ্গে ২২ জুলাই ১৮৭৫ দিবসীয় অমৃত বাজার পত্রিকা লেখেন,—

"America has honored Rajah Sourindra Mohun Tagore with the title of Doctor of Music. . . . The revival of Hindoo music is mainly due to this gentleman."

আমার ঐ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রভূত রূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, এবং পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে আমাকে সেই ধনকুবের বদান্যবর মহোদয় সম্পূর্ণ ব্যয় সাহায্যও করিয়াছেন, ফলে তাঁহা হইতেই আমি এই দীর্ঘ কলেবর সঙ্গীতসার গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্তা ও প্রকাশকর্ত্তা হইয়াছি।"

'সঙ্গীতসার' গ্রন্থ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে প্রকাশিত হয়। হিন্দু সঙ্গীতের উৎপত্তিমূলক শৌরীন্দ্রমোহনের একটি রচনা এই সময়কার অমৃত বাজার পত্রিকার ফাইলে* সম্প্রতি পাইয়াছি। ইদানীং হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বাড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধটিতে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা হয়ত অনেকেরই অবিদিত নাই। তথাপি সে যুগে যিনি হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারের জন্য এতখানি সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার লেখনী-প্রসূত সঙ্গীতবিষয়ক রচনা স্বতঃই আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করিবে। এ কারণ ইহা এখানে সম্পূর্ণ প্রদত্ত হইল,—

সঙ্গীত

গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই তিনকে একত্র করিলে সঙ্গীত সংজ্ঞা হয়। বিখ্যাত কল্লিনাথ বলেন, সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ সূরিভিঃ। অর্থাৎ সঙ্গীত দ্বিবিধ, দৃশ্য, এবং শ্রাব্য। গীত এবং বাদ্য এই উভয়বিধ শ্রবণ প্রত্যক্ষ হয়। নৃত্য ইত্যাদির নাম দৃশ্য সঙ্গীত। সুতরাং নাটকাদির অভিনয়ও দৃশ্য সঙ্গীত মধ্যে পরিগণিত। সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় সঙ্গীত গ্রন্থকার ডাক্তার আডলফ বারনার্ড মার্ক সাহেব তাঁহার ইউনিভারসাল মিউজিক নামক গ্রন্থেও নৃত্য এবং নাটকাদির অভিনয়কে দৃশ্য সঙ্গীত মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এখানে আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রাব্য সঙ্গীতের সমালোচন করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রায় দুই সহস্র বর্ষ অতীত হইল, মুসলমান সম্রাটদের অধিকারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের বিশেষ আদর ও সম্মান ছিল। তখন লোকে ইহাকে বেদাধিকৃত এবং অতি পবিত্র বলিয়া মনে করিত। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ, এই সাতটি স্বরই সঙ্গীতের মূল; এই সাতটি স্বরের প্রত্যেককে এক একটি ধাতু বলে, সঙ্গীত দর্পণকর্ত্তা দামোদর মিশ্র বলেন, স্নিগ্ধশ্চ রঞ্জকশ্চাসৌ স্বর ইত্যভিধীয়তে। অর্থাৎ যে ধ্বনি-বিশেষে রঞ্জন এবং স্নিগ্ধ গুণ আছে তাহারই নাম স্বর, ইংরাজী সঙ্গীত গ্রন্থকারেরা, যাহাকে (মিউজিকল সাউণ্ড) বলিয়া থাকেন। সঙ্গীত রত্নাবলী গ্রন্থে লিখিত আছে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সাতটি স্বর চারিবেদ-সম্ভূত, ঋগ্বেদ হইতে ষড়জ এবং ঋষভ, যজুর্ব্বেদ হইতে মধ্যম এবং ধৈবত, সামবেদ হইতে গান্ধার এবং পঞ্চম, অথর্ব্ববেদ হইতে কেবলমাত্র নিষাদ। উক্ত সাতটি স্বর আবার এক একটি দেবতা-বিশেষের অধিগত বলিয়া উক্ত আছে। অগ্নির ষড়জ, ব্রহ্মার ঋষভ, সরস্বতীর গান্ধার, মহাদেবের মধ্যম, লক্ষ্মীর পঞ্চম, গণেশের ধৈবত, সূর্য্যের নিষাদ। এই সাতটি স্বরের কেবল আদিবর্ণ মাত্র গ্রহণ করিয়া সা, ঋ, প, ধ, গ, ম, নি, এইরূপ ব্যবহার করা যায়; সঙ্গীত গ্রন্থাদিতেও ইহার প্রমাণ আছে। উক্ত সাতটি স্বরকে কোমল এবং তীব্র ভাবে বিকৃত করা যায়, কল্লিনাথ বলেন, ততঃ সপ্ত স্বরঃ শুদ্ধা বিকৃতা দ্বাদশপ্যমী, অর্থাৎ শুদ্ধ স্বর সাতটি, বিকৃত করিলে বারটি হইয়া থাকে ঋ, গ, ধ, নি এই চারিটি স্বর কোমল ভাবে বিকৃত হইয়া থাকে, মধ্যমকে তীব্র ভাবে বিকৃত করা যায়, সাধারণ্যে যাহা কড়ি মধ্যম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সাতটি স্বর আবার চারি ভাগে বিভক্ত, যথা বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী এবং বিবাদী। রত্নাবলী কর্ত্তা বলেন, "স্বামী বন্দনাদ্বাদী সরাগঃ প্রতিপাদক বাদিনা সহ সম্বাদাৎ সম্বাদী মন্ত্রী তুল্যকঃ মুখে ওস্যানুবাদানাদনু বাদ' চ ভৃত্যবৎ তথা বিরাগাতুলৈ্যব ধৈবত বিবাদী বৈরীবদ্ভবেৎ" অর্থাৎ যে স্বর বিশেষের দ্বারা রাগ প্রতিপন্ন হয় এবং যে স্বর বিশেষের রাগ বিশেষের উপর স্বামিত্ব আছে তাহার নাম বাদী, মন্ত্রীবৎ যে স্বর ব্যবহার হয় তাহার নাম সম্বাদী, ভৃত্যবৎ যে স্বর ব্যবহার হয় সে সকলের নাম অনুবাদী, রাগ ভ্রষ্টকর বৈরিবৎ যে স্বর তাহার নাম বিবাদী অপরন্তু সঙ্গীত রত্নাকরকর্ত্তা শারঙ্গদেব বলেন, "রাগানৌ স্থাপিতো যস্থ সগ্রহ স্বর উচ্যতে। ন্যাসঃ ষড়স্থ বিচ্ছেদো যস্ত রাগ সমাপকঃ। বহুলত্বং প্রয়োগেষু স অংশস্বর উচ্যতে" অর্থাৎ কোন রাগ-বিশেষের আরম্ভে যে স্বর ব্যবহার হয় তাহার নাম গ্রহ স্বর, যে স্বরবিশেষে রাগের বিশ্রাম হয় তাহার নাম ন্যাস, আর যে কোন স্বর রাগবিশেষের মধ্যে বহুল প্রয়োগ হয় তাহার নাম অংশ। সঙ্গীত নারায়ণ কর্ত্তা নারায়ণদেব বলেন, "যস্ত সর্ব্বত্র বাহুল্যং বাদ্যং সোঽপি নৃপোত্তম" এই শ্লোকার্থবোধে বাদী এবং অংশ এই উভয় শব্দই একার্থবোধক বলিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। সোমেশ্বর, সুধাকর এবং সঙ্গীত দর্পণ এই তিন গ্রন্থেতেও বাদী এবং অংশ উভয় শব্দ একার্থবোধের আরও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। সঙ্গীত রত্নাকর কর্ত্তা বলেন, "যোঽয়ং ধ্বনি বিশেষস্তু স্বরবর্ণ বিভূষিত রঞ্জকো জনচিত্তানাং সরাগো কথিত বুধৈঃ।" সঙ্গীত রত্নাকর-টীকা-সুধাকর কর্ত্তা সিংহ ভূপাল কথিত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যথা—স্বরবর্ণ বিশিষ্টেন, ধ্বনি ভেদেন বা পুনঃ, রজ্যতে যেন, সচিত্তঃ

* ২০ জানুয়ারি, ১৮৭০ দিবসীয় 'অমৃত বাজার পত্রিকা'। পত্রিকার ফাইল অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সরাগঃ। অর্থাৎ স্বরবর্ণ বিশিষ্ট যে ধ্বনি যদ্দারা লোকসমূহের চিত্তরঞ্জন করে তাহার নাম রাগ।

সঙ্গীতসার কর্ত্তা বলেন, "অথ রাগাঃ সমুচ্যন্তে লয় ধাত্বাদি সংশ্রিতা, সম্পূর্ণা ষাড়বাস্তেস্যু রোড়বা চেতিতে ত্রিধা", অর্থাৎ ধাতু এবং লয় সংশ্রিত যে রাগ তাহা তিন প্রকারে বিভক্ত যথা সম্পূর্ণ, ষাড়ব এবং ওড়ব। সাতটি স্বর বিশিষ্ট যে রাগ তাহার নাম সম্পূর্ণ, ছয়টি স্বর বিশিষ্ট রাগের নাম ষাড়ব এবং পাঁচটি স্বরবিশিষ্ট রাগকে ওড়ব কহে। শাস্ত্রকারেরা আবার রাগকে তিন জাতিতে বিভাগ করিয়া থাকেন যথা শুদ্ধ, শালঙ্ক এবং সংকীর্ণ, যে সকল রাগের সহিত অন্য রাগের সংশ্রব নাই সেই সকল শুদ্ধ জাতীয়, দুই রাগ মিশ্রিত হইয়া যে রাগ জন্মে তাহার নাম শালঙ্ক, বহু রাগ মিশ্রণে যে সকল রাগ জন্মে সে সকলের নাম সংকীর্ণ। শাস্ত্রকারেরা বলেন, মহাদেবের সদ্যনামক মুখ হইতে শ্রীরাগ, বামদেব হইতে বসন্তক, অঘোর হইতে ভৈরব, তৎপুরুষ হইতে পঞ্চম, ঈশান হইতে মেঘ, এই পাঁচ মুখ হইতে পাঁচ এবং পার্ব্বতীর মুখ হইতে নট্ট নারায়ণ, সাকল্যে ছয়টি শুদ্ধ রাগের প্রথম জন্ম হয়। কথিত ঐ আদি ছয়টি শুদ্ধ রাগকে আশ্রয় করিয়া পরস্পর মিশ্রণে অপরাপর ~~বহুতর~~ শালঙ্ক এবং সংকীর্ণ রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি অদ্যাবধি আমাদের সেই প্রাচীন নামেই চলিতেছে, অপরগুলি কালভেদে নানাবিধ যাবনিক নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বাস্তবিক শুদ্ধ রাগের ভাগ অতি অল্প।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্‌-এ

অনেকের বিশ্বাস যে, 'হরিজন' কথাটি মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। কিন্তু আমার বোধ হয়, ভক্ত কবি তুলসী দাসজী এই কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। হরিজন কথাটি সেখানেও অনুন্নত লোকদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য জীব-মাত্রেই ভগবানের, মানুষমাত্রেই হরির জন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ কি আছে? কিন্তু যাহারা অক্ষম, শিক্ষাদীক্ষা-সংস্কৃতিতে পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তাহারা বিশেষভাবে যে নারায়ণের গণ, তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত হরিজন শব্দটির ব্যবহার। এই ভাবে আমরা 'দরিদ্রনারায়ণ' 'অতিথিনারায়ণ' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। যাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রযুক্ত হয়, তাঁহাদের মর্য্যাদা লাঘব করা অভিপ্রেত নয় বরং তাহার উল্টা। অর্থাৎ আমরা আমাদের অসহায় ভ্রাতাভগ্নীকে ধর্ম্মের উচ্চভূমিতে তুলিয়া গৌরবই দিতে চাহি। আজকাল শুনিতে পাই, 'হরিজন' কথাটির মধ্যে কেহ কেহ অসম্মানের আভাস পাইতেছেন। যদি কাহারও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, তাহা হইলে তেমন কথা ব্যবহার না করাই ভাল।

কিন্তু হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব যেমন সত্য, জাতিভেদ প্রথাও তেমনি সত্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার গতিকেই হউক, অথবা কালের অমোঘ প্রভাবেই হউক—অনেক স্থলে জাতিভেদ-প্রথার মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত-সমাজে জাতিভেদের কঙ্কালমাত্র বর্ত্তমান, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বর্ণাশ্রম-প্রধান হিন্দুধর্ম্ম জাতিভেদ একেবারে বর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। এই জাতিভেদ ভাল কি মন্দ, এই সংস্কার বর্জ্জন করা বাঞ্ছনীয় কিনা এবং যদি সমগ্রভাবে বর্জ্জন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কতটুকু রাখা উচিত এবং কতটুকু পরিবর্ত্তন করা উচিত, তাহা বলা কঠিন। কালবশে যাহা হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে মনে বড় একটা

স্বামী প্রণবানন্দ

দ্বিধা উপস্থিত হয় না, কিন্তু সংস্কারক সাজিয়া কোনও প্রথার হঠাৎ প্রবর্ত্তন করিতে গেলে বা কোনও চিরাগত সংস্কারের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করিতে গেলে সমাজদেহে দারুণ আঘাত লাগে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সন্ধি না করিয়া ত উপায় নাই। যাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা করে, তাহারাই বাঁচিয়া থাকে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিশ্বব্যাপী

মহাসমরের প্রথম পর্য্যায়ের পর হইতে মানবসমাজে অনেক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য জগতের মনীষীরা আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন পূর্ব্বক সমাজকে সময়োপযোগী করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা নিছক আত্মরক্ষার জন্যই করিতে হইতেছে, এ বিষয়ে ভুল নাই। যুগে যুগে এইরূপ করিবার প্রয়োজন হয়, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। আমাদের হিন্দুসমাজে এক দিন সতীদাহ প্রথা ছিল, গঙ্গাসাগরে সন্তান বলি দেওয়ার রীতি ছিল, সে সকল উঠিয়া গিয়াছে। সম্মতি আইন লইয়া কত আন্দোলনই না হইয়াছিল! হিন্দু-সমাজ তোলপাড় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ সেকথা বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিলাত-ফেরত আজ সমাজে স্বচ্ছন্দে চলিয়া গিয়াছে, অরক্ষণীয়ার আপদবালাই আর নাই। অ-সম জাতির মধ্যে বিবাহও চলিতেছে। তাই বলিতেছিলাম যে, সমাজ একটি বিরাট প্রাণবন্ত বস্তু। ইহার প্রাণ-সত্তা পরিবর্ত্তনকে উপেক্ষা করিয়া টিকিয়া থাকে।

জাতিভেদ-প্রথা একমাত্র হিন্দুসমাজ ব্যতীত অন্য কোনও জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্থ ও বিত্তজনিত বৈষম্য যাহাই থাক্, জাতিগত কোনও বৈষম্য দেখা যায় না। শ্বেত এবং কৃষ্ণ, উত্তরাগত (Nordic) এবং ইহুদী প্রভৃতি জাতিগত বৈষম্য লইয়া বিশ্বে অনেক মারামারি কাটাকাটি আছে, থাকিবেও। ধর্ম্মমত লইয়াও কম রক্তপাত হয় নাই। কিন্তু হিন্দুসমাজের মধ্যে যেরূপ জাতিভেদ দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ আর কোনও জাতির মধ্যে নাই।

এখন এই জাতিভেদের জয়োন্মুখ লৌহপঞ্জরে গণসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া লাগিতেছে। সমাজজীবনে একটি আসন্ন বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়াছে। আমাদের যে সকল ভ্রাতা এত দিন অনুন্নত ছিলেন, তাঁহারা উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন এবং এই উদগ্র জনজাগরণের মুখে পতিত হইয়াছে হিন্দুর চিরাগত সংস্কার। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই জাতিভেদ-প্রথার সৃষ্টি হইয়া থাকুক না কেন, বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনে তাহার অনুপযোগিতা অত্যন্ত নগ্নভাবে দেখা যাইতেছে এবং যে ঐক্য ও সংহতি সমাজরক্ষার, আত্মরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহার মূল শিথিল করিয়া দিতেছে। একথা আজ আর অস্বীকার করা চলে না যে, আমাদের বাংলাদেশে 'অস্পৃশ্যতা' নামক সর্ব্বনাশা ব্যাধি না থাকুক, আমরা সমাজের সকল অংশের প্রতি সমান সুবিচার করিতে পারি নাই। এই যে কোটি কোটি বলিষ্ঠ, সহিষ্ণু, কর্ম্মঠ লোক সমাজে বাস করিয়াও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে না, ইহাতে সমগ্র সমাজদেহই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এত দিন যাহারা লাঞ্ছনা, গ্লানি, নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও নীরবে সহ্য করিতেছিল, তাহারা হঠাৎ জাগ্রত হইয়াছে। অধীনতা কেহই চাহে না। গণচেতনার প্রথম উন্মেষেই দৃষ্টি পড়ে অধীনতার শৃঙ্খলের উপর—যে অধীনতা আত্মপ্রকাশে বাধার সৃষ্টি করে, যে অধীনতা আত্ম-সম্মানে আঘাত করে। আটলাণ্টিক সনদ যে সার্ব্বভৌম আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি মাত্র, তাহারই বিভিন্ন প্রকাশ মানব জাতির বিচ্ছিন্ন অংশে। আমরা ভারতীয় বলিয়া যে স্বতন্ত্রতার দাবি করি, তাহারই বিভিন্ন প্রকাশ আমাদের খণ্ড খণ্ড সমাজ-স্তরে যদি দেখা দেয়, তাহা হইলে আমরা উপেক্ষা করি কেমন করিয়া?

এই দিক দিয়া আমাদের করণীয় অনেক কিছু রহিয়াছে। অবশ্য ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজ জড়ত্ব পরিহার করিয়া সকলকে বক্ষে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। দেবমন্দিরের দ্বার অনেক স্থলে আমরা হিন্দু মাত্রকেই খুলিয়া দিয়াছি। অভিশপ্ত অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিয়াছি। একত্র ভোজন সম্বন্ধেও যথেষ্ট উদারতা দেখা যাইতেছে। সকলেই বুঝিতেছে যে, জাতি-ভেদের প্রাচীর তুলিয়া হিন্দুসমাজকে বিভক্ত করিলে সে আত্মঘাতী অপচেষ্টা ধ্বংসের সূচনা করিবে মাত্র।

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য এই কথা বুঝিয়াছিলেন এবং তিনিও তাঁহার ভক্তগণ উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভগবানের দরবারে উচ্চ-নীচ বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা কেবল ভগবদুন্মুখতার দ্বারাই পরিমিত—অর্থাৎ যে ভগবদ্বিমুখ সে-ই মূর্খ, সে-ই হীন। ভগবানকে ভজনা করিলে সে যে কোনও জাতিভুক্ত হউক না, সে-ই বড়।

যে-ই ভজে সে-ই বড় অ-ভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥

হিন্দুসমাজ যদি ধর্ম্মচেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে জাতি-ভেদকে নূতন দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হইবে। ভগবদ্বিমুখতাই একমাত্র পাতিত্যের কারণ।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী এই দৃষ্টি দিয়াই সমাজকে দেখিয়াছিলেন। শুধু ইঙ্গিত দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন আপামর সাধারণকে তাঁহার উদার বক্ষে গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বামীজীও তাঁহার হিন্দু সংগঠন-যজ্ঞের হোমানলে ভেদনীতিকে ভস্মীভূত করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সঙ্ঘের বর্ত্তমান আচার্য্যগণও সেই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। বাংলা ও বাংলার বাহিরে নানাস্থানে তাঁহারা যে মহাপ্রাণতার আদর্শ স্থাপন করিতেছেন হিন্দুদের মরণ-বাঁচন সমস্যার তাহাই হইবে প্রকৃত সমাধান। সংস্কার সহজে ছাড়িতে চাহে না, কিন্তু প্রকৃত পথের সন্ধান লাভ করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারা অসম্ভব নহে।

বর্ত্তমান যুগে অবনত ভারতীয় হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা-পাপকে পরিহারপূর্ব্বক সমাজের পতিত দলিত ঘৃণিত জন-গণকে উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণীর সহিত মিলাইয়া লইবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য মহাপুরুষ ও নেতৃবর্গ বহুভাবে প্রচারকার্য্য করিয়া গিয়াছেন ও করিতে-

ছেন। তদ্বারা অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর জনগণের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনসাধনে যথেষ্ট সহায়তা ঘটিয়াছে।

সার্দ্ধ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একটি অভিনব পন্থার মধ্য দিয়া অতি দ্রুত ও স্বাভাবিক ভাবে হিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে সাংস্কৃতিক সমতা আনয়নপূর্ব্বক অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার প্রতিকার করিয়াছিলেন। হরিনামসংকীর্ত্তনের প্রবল প্লাবন ছিল সে যুগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই অনন্যসাধারণ কর্ম্ম- ও প্রচার- কৌশল। বর্ত্তমান যুগেও দেখিতেছি—সঙ্ঘনেতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী ঠিক এ যুগের উপযোগী একটি অনন্যসাধারণ পন্থা উদ্ভাবনপূর্ব্বক অতি দ্রুত অথচ অতি স্বাভাবিকভাবে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু জনগণের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক সমতা আনয়নপূর্ব্বক অস্পৃশ্যতা, অনাচরণীয়তার মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুগণকে লইয়া "হিন্দুমিলন মন্দির গঠন"ই সেই অপূর্ব্ব গঠনমূলক অথচ বিপ্লবাত্মক কর্ম্মপন্থা।

উক্ত মিলন-মন্দিরসমূহের সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক অধিবেশনে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর সমবেত হরি-সংকীর্ত্তন, সন্ধ্যা-উপাসনা, বৈদিক-যজ্ঞ, অঞ্জলি ও আরতি প্রদান, প্রসাদ গ্রহণ, অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার কুফল আলোচনা, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ প্রভৃতি পাঠ ও আলোচনার দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব মহান্ ভাব এবং হিন্দু সমাজের উচ্চ আদর্শ হিন্দু জনগণের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইতেছে।

সভা-সমিতিতে বক্তৃতা এবং সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ ও বাণী-প্রচার অবশ্যই ফলপ্রদ। কিন্তু নিয়মিত ভাবে দিনের পর দিন সেই বাণী ও নির্দ্দেশ আলোচনাপূর্ব্বক শুনাইতে ও বুঝাইতে না পারিলে স্থায়ীভাবে জনগণের মানসিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। সাময়িক প্রচার দ্বারা জন-সমূহকে বিশেষ বিশেষ সম্মেলনে সমবেত করাইয়া পঙ্‌ক্তি-ভোজনও যে অনাবশ্যক বা নিষ্ফল তাহা বলি না। কিন্তু তাহাতে বাস্তবিক মানসিক উদারতা ও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আচার্য্য প্রণবানন্দের কর্ম্মপন্থা অতি সুচিন্তিত, স্থায়ী ও দ্রুত ফলপ্রদ। তাঁহার সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও প্রচারকবর্গ—উপরিউক্ত প্রচারমূলক ও সংগঠনমূলক—উভয় প্রকারে যে সংস্কৃতি, সমতা, মহামিলন ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাহা আদর্শস্থানীয় এবং হিন্দু-সমাজের অশেষ কল্যাণপ্রদ।

মহিলা সংবাদ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সমাবর্ত্তন উৎসবে শ্রীমতী সুষিময়ী সিংহ এম-এ, ডি-টি বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্রে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মানের অধিকারিণী হইলেন। শ্রীমতী সুষিময়ী দেরাদুনের বিখ্যাত উকিল পরলোকগত শরৎ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের একমাত্র কন্যা। এই প্রতিভাশালিনী মহিলা ছাত্রজীবনেও আগাগোড়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী সুষিময়ী সিংহ এম-এ., পিএইচ-ডি,

খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও অপচয়ে বর্ত্তমান ধনতন্ত্র

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

পৃথিবীর নানা দেশে প্রচুর পরিমাণে গম জন্মিয়া থাকে। নানা দেশের লোকের প্রধান খাদ্যও গম। গ্রীষ্মমণ্ডল ছাড়াইয়া উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে ক্রমে অগ্রসর হইলে যে বিস্তৃত ভূখণ্ড-গুলি নজরে পড়ে সেই সকল দেশেই প্রচুর গমের চাষ হয়। অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে আবহাওয়ার পার্থক্য যথেষ্ট এবং এসব অঞ্চলে পার্থক্য সত্ত্বেও এই প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। কিন্তু আজও পোল্যাণ্ড বা পঞ্জাবের দরিদ্র কৃষক প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন করিলেও স্বল্প মূল্যের অন্যান্য খাদ্যশস্য নিজে আহার করে—গম বেশী মূল্যে বিদেশে চালান হইয়া যায়।

আমেরিকা আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ খাদ্যের জন্ত গম উৎপাদন করিত বা পার্শ্ববর্ত্তী দেশ হইতে উহা আমদানী করিত। যখন আমেরিকার উত্তর আলবার্টা হইতে উত্তর টেক্সাস পর্য্যন্ত বিস্তৃত তরুহীন বিশাল প্রান্তর (prairies) আবিষ্কৃত হইতে লাগিল তখন পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা আসিয়া দলে দলে চাষবাস আরম্ভ করিয়া দিল। এই বিশাল অকর্ষিত জমি সাধারণতঃ উর্ব্বর ছিল। বৃষ্টিপাত অল্পই হইত এবং শীতও খুব প্রচণ্ড ছিল না, এজন্য গমের ফসল ভালই ফলিত। অবশ্য এই জমি পুরাতন মহাদেশের জমি অপেক্ষা উর্ব্বর ছিল না। তবে এই জঙ্গলহীন বিরাট জমিতে কলের সাহায্যে চাষ করার সুবিধা থাকায় দরুন ইউরোপের ছোট ছোট জমিতে চাষে যত বেশী খরচ পড়িত, তত পড়িত না। এই চাষে লোকজনও কম লাগিত। এজন্য অপেক্ষাকৃত কম উর্ব্বর আমেরিকার জমির চাষ ইউরোপীয় গম চাষ অপেক্ষা লাভজনক ছিল। বহু বৎসর ধরিয়া আমেরিকায় উৎপন্ন গম ইউরোপের ঘাটতি দেশগুলির অভাব মিটাইয়াছে।

প্রথম প্রথম ঔপনিবেশিকেরা অতি সামান্য ভাবেই গমের চাষ আরম্ভ করে। ছোট ছোট জঙ্গল ও গাছ কাটিয়া এবং আগুনে পোড়াইয়া জমি পরিষ্কার করিত এবং কয়েক বৎসর যে-কোন উপায়ে চাষ করিত। জমির উৎপাদন একটু কমিলেই আবার নূতন জমি লইয়া ঐরূপ করিত—নূতন দেশে জমির কোন অভাবই ছিল না। অষ্টাদশ শতক শেষ হইবার পূর্ব্বেই দেখা গেল নিউ ইংলণ্ডের ষ্টেটগু'লতে জমির উর্ব্বরতা বিশেষ রকম হ্রাস পাইয়াছে। ডাকোতাস্, নাব্রাস্কা এবং মিনেসোটা ষ্টেটে অল্প দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপ অপচয়মূলক চাষ চলিয়া-ছিল। জমির উর্ব্বরতা কমিলেই কৃষকেরা কানাডায় নূতন জমিতে চলিয়া যাইত।

এই বেপরোয়া গম চাষের ইতিহাসের শেষ পর্ব্বে দেখা দেয় বাজারের জন্য গলাকাটা প্রতিযোগিতা। কানাডাই বড় রপ্তানীর দেশ হইয়া দাঁড়ায়। আলবার্টা, স্যাস্কাচ্চিউয়াম এবং ম্যানিটোবা প্রদেশে যেমন চমৎকার আবহাওয়া তেমনই ছিল চাষের জমির প্রাচুর্য্য। আর লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম। এরূপ অবস্থায় এক দিকে যেমন রপ্তানীর জন্য প্রচুর বাড়তি গম ছিল, অন্য দিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাজার গ্রেট ব্রিটেন সাম্রাজ্য-ব্যবস্থায় (Imperial Preference) ছিল কানাডার একচেটিয়া।

বিষুবরেখার দক্ষিণে আর্জেন্টাইন ও অষ্ট্রেলিয়ায় গত কয়েক বৎসরে উপরোক্ত নানা কারণের জন্যই গমের চাষ খুব বাড়িয়াছে। এই দেশগুলি দক্ষিণ ভূভাগে অবস্থিত বলিয়া এবং উত্তর ভূভাগে যখন শীতকাল তখন এই সকল দেশের গমের ফসল ফলে এজন্য ইউরোপের বাজারে ইহাদের রপ্তানীর খুবই সুবিধা। কিন্তু এই দুইটির কোনটিতেই কানাডার মত বেশী গম উৎপন্ন হয় না। অষ্ট্রেলিয়ায় অনাবৃষ্টি লাগিয়াই আছে এজন্য ফসল অনিশ্চিত। আর আর্জেন্টিনায় চাষের অব্যবস্থার দরুণ যথেষ্ট ফসল পাওয়া যায় না। বড় বড় জমির মালিকেরা অল্প দিনের মেয়াদে জমি পত্তন দেয়। ফলে চাষীরা—যাহারা সাধারণতঃ ইউরোপ হইতে আগত ঔপ-নিবেশিক, কয়েক বৎসর বেপরোয়া চাষ করিয়াই নূতন জমিতে চলিয়া যায়। জমির মালিকানা স্বত্ব নিজে না পাইলে পৃথিবীর সকল দেশের চাষী এইরূপই করিয়া থাকে এবং এইজন্যই এই সকল জমির উৎপাদনও খুব কম হয়। পরিত্যক্ত জমিতে অনাদৃত ভাবে আলফাল্ফা (alfalfa) পশুখাদ্য ঘাস জন্মে।

ইহা ছাড়া আর্জেন্টাইনে এক-একটা ষ্টেটে শত শত বর্গমাইল জমি। এই পরিমাণ জমির উন্নতিসাধন সহজ নহে। জমির বর্দ্ধিত মূল্যের প্রত্যাশায় মালিকগণ চাষের জন্য পত্তনি দিতে চায় না, সুতরাং বহু জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই সকল পতিত জমি পশু চরাইবার উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসরের জন্য পত্তনি দেওয়া হয় এবং জমিতে আল্ফাল্ফা ঘাস জন্মাইতেও কোন ব্যয় নাই। জমির মালিক কয়েক বৎসর পর জমি ফিরিয়া পায় বলিয়া এইরূপ পত্তনি দিতে তাহাদেরও খুব উৎসাহ। কিন্তু আসলে আর্জেন্টাইনের চাষীরা অর্থের ও সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবে চিরদিনই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কৃষকের শস্য নিরাপদে রাখিবার ব্যবস্থা নাই, শস্য বাহিরে খোলা জায়গায় বস্তাবন্দী করিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়, ফলে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টন শস্যের অপচয় হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সারা পৃথিবীতে গমের উৎপাদনের হার খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পরেই এই বৃদ্ধি বিশেষভাবে রপ্তানী-কারী দেশসমূহে যথা—যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টাইন এবং অষ্ট্রেলিয়ায় খুব বেশী পরিমাণে দেখা যায়, ১৯২৪ হইতে ১৯২৮ সনের মধ্যে গমের উৎপাদন ৩০০ কোটি বুশেল হইতে বাড়িয়া প্রায় ৪০০ কোটি বুশেলে দাঁড়ায়। প্রত্যেক দেশের কৃষকেরা যত পারিল জমি কিনিল এবং গম চাষ করিল, কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখিল না যে এত গম পৃথিবীর বাজারে কাটিবে কিনা। ১৯২৮ সনের উৎপাদন চরমে পৌঁছিলেই দাম

পড়িতে সুরু হইল। লিভারপুল বাজারে এক বুশেল গম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১৫ শিলিং দরে বিক্রয় হইত, তখন তাহা ১০ শিলিঙে নামিয়া আসিল। ১৯৩১ সনে দর আরও কমিয়া চার শিলিং হয় পেন্সে নামিল। এরূপ অবস্থায়ও আমেরিকার চাষী পূর্ব্বেকার দরের এক-চতুর্থাংশ পাইলেও খুশী ছিল। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইল এই যে, অতিরিক্ত উৎপন্ন গম কিরূপে বিক্রয় করা যাইবে। চাহিদা একেবারেই ছিল না।

আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট সরকারী খরচায় গম কিনিয়া মজুত করিতে লাগিল। তুলার বাড়্তি উৎপন্নের সঙ্কটেও এই পন্থাই অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিছু কালের মধ্যেই দেখা গেল আমদানীকারক দেশসমূহের বৎসরের চাহিদা গমের তিন-চতুর্থাংশই সরকারী গুদামে মজুত হইয়াছে। তখন গবর্ণমেণ্ট নিজ খরচায় জাহাজের মাশুল দিয়াও এশিয়ার দেশসমূহে গম চালান করিতে লাগিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেখা গেল আমেরিকার গম-রপ্তানী-বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়াছে।

কানাডায় সাধারণ ব্যাপারী ও ফাট্কা-ব্যবসায়িগণও গম কিনিয়া মজুত করিতেছিল, কিন্তু গমের দর যখন ক্রমেই পড়িয়া যাইতে লাগিল তখন তাহারাও গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইল। গবর্ণমেণ্ট কোন একটা নির্দ্দিষ্ট হারের নীচে মূল্য নামিলেই তাহাদের নিকট হইতে গম ক্রয়ের ব্যবস্থা করিল। ১৯৩৫ সালে দেখা গেল গবর্ণমেণ্টের হাতে প্রচুর বাড়্তি গম জমিয়াছে। অবশ্য এক বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় এবং অপর বৎসর 'কালো মরিচা' (Black rust) নামক এক রোগের আক্রমণের ফলে ফসল খুবই কম পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও বাড়্তি উৎপাদন সমস্যার সমাধান হইল না।

পৃথিবীর এই বাড়্তি গমের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে একবার পশ্চিম ইউরোপের দিকে চোখ ফিরাইতে হইবে। যখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ফসল বাড়্তির পথে তখন 'আর্থিক স্বাধীনতার' দোহাই দিয়া জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও ইটালী নিজ নিজ দেশে গমের আমদানী কমাইয়া দিল। অবশ্য আমদানী গমের উপর খুব মোটা রকমের আমদানী-শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়াতেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

যত বার আমেরিকার কৃষকেরা দাম কমাইয়া রপ্তানী বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছে তত বারই ইউরোপে আমদানীর উপর শুল্ক বাড়ানো হইয়াছে। জার্ম্মেনীতে বুশেল প্রতি ১·৬০ ডলার শুল্ক বসানো হইয়াছিল—ইহা আমেরিকার গমের মূল্যের চারিগুণ। ফ্রান্স ও ইটালীতে শুল্কের মাত্রা ছিল যথাক্রমে এক ডলার ও ৮৫ সেণ্ট। কিন্তু শুধু ইহাতেই শুল্কবৃদ্ধির ব্যবস্থা শেষ হয় নাই। ইউরোপের এই সকল দেশ হইতে যাহাতে গ্রেট-ব্রিটেনে গম রপ্তানী হয় সেজন্য প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট নিজ নিজ দেশের রপ্তানী গমের উপর অর্থসাহায্য (bounty) ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ইহাতে গ্রেট-ব্রিটেনে আমেরিকার গম রপ্তানী আরও বাধা পাইয়াছে।

জার্ম্মানী, ফ্রান্স এবং ইটালী এই উপায়ে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বার্ষিক ১০ কোটি বুশেল গমের আমদানী হ্রাস করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে আমেরিকার গম উৎপাদনের প্রাকৃতিক সুবিধা নষ্ট করা হয় এবং আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পশ্চিম ইউরোপে গম-চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও সফল হয় নাই। শেষকালে যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট গম উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কৃষকগণকে বহু কোটি ডলার খেসারত দিল। তুলা চাষের পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইয়াছিল। এই উপায়ে গম চাষের জমির পরিমাণ ৬ কোটি ৬০ লক্ষ একর হইতে কমিয়া ৪ কোটি ২ লক্ষ একরে দাঁড়ায়। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের গম রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায় এবং গমের আমদানী আবশ্যক হয়। আবার এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা উঠাইয়া দিলেই গম চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়া ৭ কোটি ৫০ লক্ষ একরে দাঁড়ায়। ইহার অর্থই গম-রপ্তানী-বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় প্রবেশ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) আরম্ভ হইলে যে নূতন পরিস্থিতি দেখা দেয় তাহার ফলে গম উৎপাদনের পুরাতন অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় সেগুলিতে চাষবাস কমিয়া যায় এবং যুদ্ধসংক্রান্ত শিল্পগুলি প্রাধান্যলাভ করে। ফলে যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই পৃথিবীময় খাদ্যশস্যের ঘাট্তি দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানে এই সঙ্কট ও দুর্মূল্যতা হইতে বাঁচিবার জন্য সমস্ত জগতের খাদ্যদ্রব্য একত্রীভূত করিয়া যাহাতে বাড়্তি দেশসমূহ হইতে ঘাট্তি দেশে সরবরাহের ব্যবস্থা হয় সেজন্য আন্তর্জ্জাতিক চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এই চেষ্টা সাময়িক মাত্র হইলে, সঙ্কটকালের অবসানে আবার যখন বিভিন্ন জাতির মধ্যে বেপরোয়া প্রতিযোগিতা দেখা দিবে তখন এক দিকে চাষ বাড়িবে বটে, কিন্তু অন্য দিকে শুল্ক-ব্যবস্থার সাহায্যে ইউরোপীয় দেশসমূহে অস্বাভাবিকভাবে দাম বাড়াইয়া গমের চাষে উৎসাহ দেওয়া হইবে। ফলে আবার অপচয়ের পথ উন্মুক্ত হইবে। এই অপচয় নিবারণ করিতে হইলে আন্তর্জ্জাতিক বিধান অনুসারে পৃথিবীর সকল দেশের খাদ্য-শস্যের চাষ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমান পুঁজীবাদী উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য লাভ—বিশ্বমানবের স্বাচ্ছন্দ্য নহে। এজন্যই যত অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে।

ভুট্টা

পৃথিবীর অন্যতম খাদ্য-শস্য ভুট্টা। অবশ্য গরীব দেশগুলিতেই, যথা ভারতবর্ষে—ইহা মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সমৃদ্ধ দেশে ইহা পশুখাদ্য, বিশেষতঃ শূকরের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। গম উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত পৃথিবীর দুইটি দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও আর্জেণ্টিনা, ভুট্টা উৎপাদন ক্ষেত্রেও জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

আমেরিকার প্রধান প্রধান হ্রদসমূহের দক্ষিণে ২০০ মাইল ব্যাপিয়া ও পশ্চিম দিকের ষ্টেটগুলি জুড়িয়া এই বিরাট ভুট্টা চাষের অঞ্চল। উৎপন্ন ভুট্টার দশ ভাগের নয় ভাগই প্রধানতঃ শুকরের খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। শিকাগো বন্দরে শূকর-মাংসের বড় বড় কারখানা আছে (Packing-industries)। সেখানে বাক্সবন্দী হইয়া এই মাংস ও ইহা হইতে প্রস্তুত নানা খাদ্যদ্রব্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান হইয়া থাকে। আর্জেন্টাইন হইতে কিছু পরিমাণ ভুট্টা পশ্চিম-ইউরোপে চালান হয়। অবশ্য যে দেশ হইতে বহুল পরিমাণে পশুমাংস ইউরোপে রপ্তানী হয়। বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটে (১৯৪৬) আর্জেন্টাইন সরকার ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী করা চটের বিনিময়ে ভুট্টা সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আমেরিকায় ভুট্টাচাষীরা সমান উৎসাহে ভুট্টা উৎপাদন ও শূকর প্রতিপালন দুই-ই করে এবং এই উভয় জিনিষই তাহারা সরবরাহ করে। শূকরের মূল্য বেশী বলিয়া চাষীর ভাগ্য শূকরের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির উপর অধিকতর নির্ভরশীল। অবশ্য আমেরিকাতেই অর্দ্ধেক শূকরের মাংস বিক্রী হয়, কারণ ইয়াঙ্কীগণ উত্তম শূকর-খাদক। কিন্তু কোন কারণে রপ্তানীতে ঘাটতি পড়িলে কৃষকের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। ১৯৩২ সনে এরূপ এক দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। ঐ বৎসর রপ্তানীর তিন ভাগের দুই ভাগ হ্রাস পায়। ইউরোপের দেশসমূহ শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া জাতীয় উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়াতেই এই বিপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু ভুট্টা চাষের জমিগুলিতে চাষ চলিয়াছিল যদিও আর শূকরের খাদ্যের জন্ত ইহার প্রয়োজন ছিল না। বিস্তর অ্যাভ শূকর বাড়তি হইল। শেষে ৮০ পাউণ্ডের কম ওজনের সমস্ত শূকর মারিবার ব্যবস্থা হইল এবং খাদ্যের বাজারে চাহিদা না থাকায় উহা হইতে অ-ভক্ষ্য চর্ব্বি ও জমির সারের তেল তৈয়ার করা হইল।

জনবহুল পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে নানা দেশ হইতে মাংস আমদানী করিতে হয়। এই আমদানী করা মাল স্বভাবতঃই পশুপালন এলাকার সংলগ্ন শহরের প্যাকিং কেন্দ্রে বড় বড় ধনিগণের একচেটিয়া। আর্জেন্টিনা ঠাণ্ডা এবং জমাট গোমাংস রপ্তানীর জন্ত বিখ্যাত। ভেড়া ও ছাগ মাংস রপ্তানীর জন্ত নিউ জিল্যাণ্ড প্রসিদ্ধ। এই সকল ব্যবসায়ের আরম্ভে কত না অপব্যয় ও অপচয় হইয়াছে। মাংসের চাহিদা কমিলে কেবল মাত্র চামড়া ও খুরের জন্যই পালিত পশুগুলিকে হত্যা করা হইত। আর্জেন্টিনার বিরাট পশুচারণ ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ পশুকে এই ভাবে হত্যা করিয়া উহাদের মাংস চালান দেওয়া হইয়াছে।

আর্জেন্টিনার অধিকাংশ কারখানার মালিক ইংরেজ বা মার্কিন ধনপতিগণ। ১৯০৯ সালে ইহারা মাংস রপ্তানী প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৬১টির মালিক ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে এই মালিকানা স্বত্ব শতকরা ৮৫তে পৌঁছিয়াছে।

আর্জেন্টিনার গো-মাংসের কারবারে ইংরেজের মূলধন খাটিতেছে, সুতরাং এই ব্যবসায়ের উন্নতি বিশিষ্ট পুঁজিপতিদের খুবই কাম্য। অথচ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের পশুপালকেরাও সাহায্য কামনা করে। কাজে কাজেই 'সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙ্গে' এই পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। আর্জেন্টাইনের গো-মাংসের চালান কতকটা বজায় থাকে এরূপ ভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তত্র রক্ষণ-শুল্ক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

নিউ জিল্যাণ্ডে মেষ ও ছাগ প্রতিপালন করা হয় পশম রপ্তানীর জন্ত। কিন্তু পূর্ব্ব-অষ্ট্রেলিয়ায় পশম উৎপাদনের জন্ত শুধু মেষই পালন করা হয়। অবশ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পশমের স্থান তুলার নিম্নে। শীত-প্রধান দেশে ইহার চাহিদা খুব বেশী। অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টাইন, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ারের মিলের জন্ত পশম রপ্তানী হয়। ইউরোপের অন্যান্য শিল্প-কেন্দ্রেও এই পশম চালান হয়। চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধিতে বা শুল্ক-প্রাচীরের আঘাতে পশমের আমদানী-রপ্তানী খুবই উঠানামা করে। ১৯৩২ সনে অষ্ট্রেলিয়ায় ৩০ লক্ষ গাঁট পশম উৎপাদন করা হয় ও চাহিদার জোরে তাহা কাটিয়া যায়, কিন্তু পর বৎসর জার্ম্মানী ও ইটালীতে শুল্ক-প্রাচীর তোলা হইলে অষ্ট্রেলিয়ার মেষপালকগণের দুই লক্ষ গাঁট পশম বাড়তি হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

আর্থিক জাতীয়তাবাদ (Economic nationalism) হইতেই পৃথিবীতে অনেক অপচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পর পর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইয়া গেল, এজন্ত আজ এক জাতি অপর জাতিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। কারণ যুদ্ধের সময় স্বাভাবিক সরবরাহের গতি বন্ধ হওয়ায় আমদানী রপ্তানীকারী দেশসমূহ মহা অসুবিধায় পড়ে। পৃথিবীর সমস্ত জাতি একতাবদ্ধ হইয়া পৃথিবীর আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ভার লইলেই বিশ্ব-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে যত দিন এক জাতি কর্ত্তৃক অপর জাতির শাসন ব্যবস্থা ও শোষণনীতি এবং ধনতান্ত্রিক উপায়ে উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়-প্রথা বহাল থাকিবে তত দিন ইহা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। আজ বিশ্বসমস্যা সমাধানের জন্ত বিশ্বরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বহারা জনগণের দুঃখ দৈন্ত দূর করা, পৃথিবীর সুখ ও সম্পদকে কিরূপে সকলের আয়ত্তে ও ভোগে আনা যায়, ইহাই আজিকার একমাত্র সমস্যা। সমস্যার পূর্ণ সমাধান হউক আর না হউক, অন্ততঃ সমাধানের জন্য দুনিয়ার প্রগতিশীল জাতিসমূহের আন্তরিক চেষ্টার সফলতার উপরেই ভবিষ্যতের বিশ্বশান্তি ও তাহার মানবের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিবে।

[নাটিকা]

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

পটভূমি

সভ্যজগৎ থেকে বহু বহু দূরে। উত্তরে একটা ছোট পাহাড়, দক্ষিণে একটা ছোট পাহাড়, দুই পাহাড়ের মাঝখানে দূরত্ব খুবই কম। সেই অপরিসর উপত্যকার মাঝখানে রয়েছে একটা ছোট নদী। তার বালু আর পাথর বিছানো বুকের উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যায় সরু একটি স্বচ্ছ জলধারা। উত্তর পাহাড়ের কোলে যে গ্রাম তার নাম উজালী, দক্ষিণ পাহাড়ের কোলে যে গ্রাম তার নাম দুধিরা। একখানি পথ উজালী থেকে নদীপার হয়ে গেছে দুধিরাতে, সেই পথ ধরে সকাল-সন্ধ্যায় উজালী আর দুধিরার মেয়েরা আসে নদীতে জল নিতে, স্নান করতে; দুপুরবেলা দুই গাঁয়ের ছেলেরা আসে গরুর পালকে জল খাওয়াতে আর খেলা করতে।

উজালীর একটি মেয়ে, নাম গুলবী, বয়স ১৬ কি ১৭, পাতলা গড়ন, রং ফর্সা, চোখ দুটি চক্ চক্ করে, হাসলে দাঁতগুলো দেখায় ঝুটঝুটে সাদা। দুধিরার একটা ছেলে, নাম তার দেওয়া, বয়স ১৯ কি ২০, রং কুচ্‌কুচে কালো, লম্বা গড়ন, নাকটি টিকলো।

১ম দৃশ্য

সময় অপরাহ্ন, উত্তর থেকে গুলবী গাগরি নিয়ে নদীতে আসে, দক্ষিণ থেকে দেওয়া আসে গাইকে জল খাওয়াতে। এ পাড়ে গুলবী গাগরি রেখে বালুর উপর বসে, ও-পাড়ে দেওয়া একটা পাথরের উপর গিয়ে দাঁড়ায়। দুই পাড়ে শাল আর পলাশের জঙ্গল, সেই জঙ্গলে নীচে বাস করে খরগোশ, তিতির আর বনমুরগি, উপরে বাস করে ঘুঘু, টিয়ে, কাঠবেড়াল।

গুলবী—(দেওয়ার দিকে তাকায়, তারপরে মাথা নীচু করে হাসে—গাগরি মাজতে সুরু করে, গাগরির গায় কাঁকনের ঘা লেগে বাজে ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্)

দেওয়া—(গুলবীর দিকে তাকিয়ে থাকে—গুন্‌গুনিয়ে গান গায়)

গুলবী—(শেষ হয় গাগরি মাজা, আঁজলা করে জল ভরে গাগরিতে)

দেওয়া—(হঠাৎ একটু জোরে গান গেয়ে ওঠে—লাঠি ঠোকে পাথরের উপর ঠুক্ ঠুক্ করে)

গুলবী—(মাথা তুলে দেওয়ার দিকে চায়—গান শুনে হাসে)

১ম ঘুঘু—(উত্তর পাড়ের শালগাছে বসে ডাকে) ঘু ঘু (অর্থ—আহা বেশ)

২য় ঘুঘু—(দক্ষিণ পাড়ের শাল গাছে বসে ডাকে) ঘু ঘু—ঘু ঘু (অর্থ—আহা বেশ, আহা বেশ)

১ম টিয়ে—(উত্তর পাড় থেকে দক্ষিণে উড়ে যায়)

২য় টিয়ে—(দক্ষিণ পাড় থেকে উত্তরে উড়ে যায়)

দেওয়া—(আস্তে ডাকে) গুলবী ! (একটি ডাকের মধ্যে যেন অনেক কথা তার বলা হয়ে গেল)

গুলবী—(আস্তে জবাব দেয়) কি ? (এই 'কি' বলে সাড়া দেওয়ার মধ্যে যেন অনেক কথা তার শোনা হয়ে গেল)

১ম ঘুঘু—ঘু-ঘু (অর্থ—ভারি মিষ্টি)

২য় ঘুঘু—ঘু-ঘু ঘু-ঘু (অর্থ—ভারি মিষ্টি, ভারি মিষ্টি)

দেওয়া—(কি কথা বলি বলি করেও বলে না)

গাগরি রেখে বালুর উপর বসে

গুলবী—(গাগরি নিয়ে উঠি উঠি করেও ওঠে না)

দেওয়া—(আবার ডাকে) গুলবী !

গুলবী—(সাড়া দেয়) কি ?

দেওয়া—সেই কথাটার জবাব দিলি নে ?

গুলবী—(হেসে বলে) কোন্ কথাটা ?

দেওয়া—রোজই বলি তবু কেন ভুলে যাস্ ?

গুলবী—রোজই তো জবাব দি তবু কেন বুঝিস্ নে ?

১ম ঘুঘু—ঘু-ঘু (অর্থ—বাঃ, বেশ জবাব দিয়েছে উজালীর মেয়ে)

২য় ঘুঘু—ঘু ঘু—ঘু ঘু (অর্থ এইবার উজালীর মেয়ে যাবে ঘুরিয়ার)

গুলবী—(ভরা গাগরি নিয়ে উঠে পড়ে)

দেওয়া—(পাথর থেকে নেমে একটু এগিয়ে এসে থেমে যায়)

গুলবী—(চলে যায় গাঁয়ের দিকে, একবার ফিরে তাকায় পিছনে আর হাসে)

দেওয়া—(দাঁড়িয়ে থাকে, সে হাসির মানে বুঝতে চায়)

২য় দৃশ্য

আর এক দিন, সময় অপরাহ্ন। দৃশ্যপটের একটু পরিবর্তন ঘটেছে, নদীর দুই পাড়ের গাছপালা আজ আরো সবুজ, আরো ঘন। অন্তরাল থেকে বনফুলের গন্ধ ভেসে আসে। উত্তর পাড়ের বনপথে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়—কেউ গুনগুনিয়ে গান গেয়ে গেয়ে এগিয়ে আসে। একটু পরে গাগরি মাথায় নদীতে নামে গুলবী, পরনে তার কুসুমি রঙের শাড়ি, চুলে তার এক গোছা বনফুল। ঘাটে বসে আবার সে গান সুরু করে। এমন সময় উত্তর পাড়ের বনপথে আবার আওয়াজ পাওয়া যায়, জুতোর আওয়াজ, ভারী জুতো, কাঁকরের উপর আওয়াজ হয় মশ মশ। তার খানিক পরে নদীতে নামে পথিক, মাথায় লাল পাগড়ি, গায় ছিটের কুর্তা, পায় নাগরা জুতো, হাতে হাতঘড়ি। গুলবী চমকে ওঠে, ফিরে চায়, তারপর গাগরিটা কাছে টেনে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে। পথিক এসে বসে একটা বড় পাথরের ওপরে, পাগড়ি খুলে পাশে রাখে, তেল কুচকুচে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে আওয়াজ করে—'আঃ'

১ম ঘুঘু—ঘু-ঘু (অর্থ এটা কে ?)

২য় ঘুঘু—ঘু-ঘু — ঘু-ঘু (অর্থ—এখানে কেন—এখানে কেন ?)

পথিক—এ গাঁয়ের নাম কি গা ?

গুলবী—(ভয়ে ভয়ে) উজালী।

পথিক—আরো অনেক দূর যেতে হবে—অনেক দূর !

গুলবী—(আড় চোখে দেখে পথিককে)

পথিক—(পকেট থেকে একটা চকচকে সিগারেট-কেস, খট করে খুলে তুলে নেয় একটা বিড়ি, সেটা ধরায় দাঁতে চেপে ধরে—আস্তে আস্তে টানে)

গুলবী—(আড়চোখে দেখে—অবাক হয় খুব)

পথিক—তুই বিড়ি খাস্ ?

গুলবী—(লজ্জিত ভাবে) না।

১ম ঘুঘু—ঘু ঘু (অর্থ—কেমন লোক ?)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—লোক ভাল নয়, ভাল নয়)

পথিক—(বসে বসে বিড়ি টানে আর দেখে গুলবীকে)

গুলবী—(গাগরি মাজতে সুরু করে)

পথিক—তোর দেশে এবার ফসল কেমন ?

গুলবী—(এ এমন একটা আপনার জনের মত প্রশ্ন যাতে গুলবীর ভয় অনেকখানি কমে আসে, একটু ঘুরে বসে—বলে) ভাল না।

পথিক—তুই কোন্ জাত গা ?

গুলবী—গোয়ালা।

পথিক—(দাঁত বার করে হেসে) আমিও গোয়ালা।

গুলবী—(দেখে পথিকের সামনের দুটো দাঁত ঝকঝক করে ওঠে—সোনা দিয়ে বাঁধান)

পথিক—কটা বেজেছে ?

গুলবী—(কথার মানে বুঝতে পারে না—অবাক হয়ে পথিকের দিকে চায়)

পথিক—(বাঁ হাতখানা তুলে ঘড়ি দেখে বলে) আড়াইটা।

গুলবী—(অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, বলে) ওটা কি ?

পথিক—হাতঘড়ি—দেখিস্ নি কখনো ?

১ম ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—নকল ঘড়ি)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—আসল নয়, নকল ঘড়ি)

পথিক—তা দেখবি কেমন করে, তোরা জঙ্গলে বাস করিস্। যদি দেখতিস্ কলকাতা !

গুলবী—(ব্যগ্র ভাবে) কলকাতা কি ?

পথিক—(দাঁত বার করে হেসে) খাবার জিনিস নয়, কলকাতা শহর, ভারি শহর—সেখানে যাদুঘর আছে, চিড়িয়াখানা আছে, কেল্লা ময়দান আছে।

গুলবী—(আরও ঘুরে বসে) চিড়িয়াখানা কি ?

পথিক—(অভ্যাসমত দাঁত বার করে) সেখানে বাঘ আছে, ভালুক আছে, বাঁদর আছে।

১ম ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—এখানেও বাঘ আছে, ভালুক আছে)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—এখানেও বাঁদর আছে, দাঁত বার করা বাঁদর আছে)

গুলবী—(ভয় কেটে যায়, বলে) আর কি আছে ?

পথিক—বড় বড় দোকান আছে, বিজলীবাতি আছে, রাতকে দিন করে।

গুলবী—(অবাক হয়ে পথিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে)

পথিক—তোর দেখতে ইচ্ছে করে কলকাতা ?

গুলবী—(অল্প অল্প হাসে, বলে) হাঁ।

পথিক—আমি নিয়ে যাব কলকাতা—যাবি ?

গুলবী—(মাথা নেড়ে জানায় অসম্মতি)

১ম ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—বলে কি ?)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—বাঁদর বলে কি ?)

পথিক—রেলগাড়ীতে চড়িয়ে তোকে নিয়ে যাব।

গুলবী—(কথা কয় না—চুপ করে বসে থাকে)

পথিক—যাবি ? কেউ জানতে পারবে না, চুপ করে তোকে নিয়ে যাব, যাবি ?

গুলবী—(চোখ ফিরিয়ে অন্ত দিকে চায়)

পথিক—তোর নাম কি গা ?

গুলবী—আমার নাম গুলবী।

পথিক—কি সুন্দর নাম, কি সুন্দর চেহারা !

গুলবী—(মুখ ফিরিয়ে নেয়, দেখতে পাওয়া যায় না হাসে কি হাসে না)

পথিক—আমি বুধবার এই পথ দিয়ে ফিরব, যদি কলকাতা যেতে চাস্ তা হলে এই সময়ে এইখানে থাকিস—বুধবার।

পথিক তার লাল পাগড়ি বেঁধে উঠে পড়ে, একটা বিড়ি ধরায়, নদীর ওপারে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসে, তার পরে কাঁকরের ওপর দিয়ে মস্‌মস্ করে চলে যায়। আনমনা গুলবী গাগরি ভরে মাথায় তুলে উঠে দাঁড়ায়, এমন সময় ওপারে দেখা দেয় দেওরা, কালো কুচকুচে অনাবৃত নিটোল দেহ।

দেওরা—(ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে)

গুলবী—(চুপ করে ছবির মত দাঁড়িয়ে থাকে)

দেওরা—(নদীর মাঝামাঝি এসে দাঁড়ায়)

গুলবী—(পেছন ফিরে যাবার জন্তে পা বাড়ায়)

দেওরা—(ডাকে) গুলবী, গুলবী।

গুলবী—(ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায় কিন্তু হাসে না)

১ম ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—হোঁতকা বোকা)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—হুঁতকা আরও বোকা)

দেওরা—গুলবী ও গুলবী—শোন্ !

গুলবী—কি ?

দেওরা—কাল আমি হাটে যাব তোর জন্তে শাড়ি কিনতে।

গুলবী—আমি কলকাতার শাড়ি চাই।

দেওরা—কি বললি ?

গুলবী—কিছু না (যাবার জন্তে আবার পা বাড়ায়)

দেওরা—একটু দাঁড়া গুলবী !

গুলবী—আজ না—বেলা গেছে। (চলতে থাকে)

১ম ও ২য় টিয়ে—(মাথার উপরে উড়ে উড়ে আবার গিয়ে গাছে বসে)

গুলবী—(ধীরে ধীরে চলে যায়)

দেওরা—(কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যায়)

অপরাহ্নের ছায়া ঘনিয়ে আসে, উত্তর পাড়ে নেপথ্যে তিতির ডাকে, দক্ষিণ পাড়ে নেপথ্যে ডাকে বনমুরগি।

৩য় দৃশ্য

বুধবার—স্থান ও কালের কোন পরিবর্তন নাই। জলের ধারে দুটি বক দাঁড়িয়ে আছে, একটু দূরে একটা মোষ জলে গা ডুবিয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে বসে আছে। গাগরি মাথায় আসে গুলবী, ঘাটে গিয়ে বসে, বক দুটো সাদা পাখা মেলে উড়ে যায়, মোষটা নির্বিকার চেয়ে থাকে। খানিক পরে দক্ষিণ পাড় থেকে আসে জুতোর আওয়াজ, শালগাছের আড়াল থেকে নদীতে নামে পথিক—মাথায় লাল পাগড়ি, গায়ে ছিটের কোর্তা, হাতে হাতঘড়ি। নদী পার হয়ে সে এসে বসে

গুলবীর খুব কাছে—দাঁত বার করে হাসে, ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে তার সোনা-বাঁধান সামনের দুটো দাঁত।

১ম ঘুঘু—ঘুঘু্ (অর্থ—গুলবী পালা)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু্ ঘুঘু্ (অর্থ—পালা পালা—পালা পালা)

পথিক—(সিগারেট কেস থেকে বিড়ি বার করে সেটা ধরিয়ে) গুলবী!

গুলবী—কি?

পথিক—যাবি কলকাতা?

গুলবী—(জবাব দেয় না, জলের দিকে তাকিয়ে থাকে)

পথিক—দস্তার গয়না তোকে মানায় না গুলবী, আমি তোকে চাঁদির গয়না কিনে দেব। যাবি আমার সঙ্গে?

গুলবী—(জবাব দেয় না, জলের দিকে তাকিয়ে থাকে)

পথিক—আমি সর্দ্দার, আমার অনেক টাকা, আমি তোকে বিয়ে করব—যাবি?

১ম ঘুঘু—ঘুঘু্ (অর্থ—গুলবী ভুলিস্ নে)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু্—ঘুঘু্ (অর্থ—ভুলিস্ নে, ভুলিস নে)

পথিক—যাবি গুলবী?

গুলবি—(আস্তে বলে) যাব।

১ম ঘুঘু—ঘুঘু্ (অর্থ—ছি ছি)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু্ ঘুঘু (অর্থ—ছি ছি—ছি ছি)

চট্ করে উঠে দাঁড়ায় পথিক, দাঁত বার করে আর একবার নিঃশব্দে হাসে, তারপরে উত্তর-দক্ষিণের পথ ছেড়ে দিয়ে পূব দিকের ঘন শালবনে প্রবেশ করে, পেছনে যায় গুলবী—ঘাটে পড়ে থাকে তার গাগরি।

১ম ঘুঘু—ঘুঘু্ (অর্থ—কোথায় যায় গুলবী?)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু্—ঘুঘু (অর্থ—গোল্লায় যায় গুলবী)

খানিক পরে গান গেয়ে গেয়ে আসে দেওয়া, হাতে তার একখানা লাল রঙের শাড়ি। পাথরটার ওপর গিয়ে বসে, ঘাটে গাগরি দেখে খুশী হয়, চারদিকে চায়—হাসে। মনের আনন্দে গুন্‌গুনিয়ে গান গায় দেওয়া।

১ম টিয়ে—(শালগাছ থেকে উড়ে পলাশ গাছে গিয়ে বসে)

দেওয়া—(চম্‌কে ওঠে—চারদিকে চায়—মুচকি হাসে)

২য় টিয়ে—(পলাশ গাছ থেকে উড়ে শালগাছে বসে)

দেওয়া—(ফিরে সেই দিকে চায়)

সময় ধীরে ধীরে কেটে যায়।

১ম ঘুঘু—ঘুঘু্ (অর্থ—সে নাই)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু ঘুঘু (অর্থ—সে আর আসবে না)

সময় ধীরে ধীরে কেটে যায়—অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে দেওয়া।

দেওয়া—(ডাকে) গুলবী, গুলবী।

১ম ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—সে শুনতে পায় না)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু্ ঘুঘু (অর্থ—সে শুনতে পায় না—সে অনেক দূর)

এ পারে আসে দেওয়া—ঘুরে ঘুরে খোঁজে, শেষে সে ভয় পায়—চঞ্চল হয়ে ওঠে—চেঁচিয়ে ডাকে কিন্তু সাড়া আসে না। অপরাহ্নের ছায়া ঘনিয়ে আসে। লাল শাড়িখানা গাগরির পাশে রেখে দিয়ে ছুটে যায় বনের মধ্যে, ডাকে 'গুলবী গুলবী'।

সন্ধ্যা নেমে আসে, নামে ঝিঁঝিঁর নিস্তব্ধতা।

বনমুরগি নিঃশব্দে জল খেতে আসে।

১ম বনমুরগি—(সাবধানে পা ফেলে ফেলে লাল শাড়িখানার চার পাশে ঘোরে)

২য় বনমুরগি—(লাফ দিয়ে গাগরিটার উপরে ওঠে)

অদূরে ঘোষটা নির্ব্বিকার চেয়ে বসে থাকে।

(পটক্ষেপ)

বাসন্তী গীতি

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দিন যায়, বর্ষ যায়, আশাতুর মনে
তুমি আর আমি রহি দীর্ঘ প্রতীক্ষায়,
এ শীতের অবসান কবে হবে হায়,
বসন্ত আসিবে কবে জাতির জীবনে?
মত্ত হাওয়া শ্বসি ওঠে কেন ক্ষণে ক্ষণে,
দিকে দিকে শুষ্ক পত্র শুধু উড়ে যায়,
গাছগুলি রিক্তশাখা—কঙ্কালের প্রায়;
আমাদের মতনই কি তারা দিন গণে?

এ কঙ্কালে কবে হবে প্রাণের সঞ্চার?
সবুজ শোভায় হবে সুন্দর ধরণী,
ফুলে ফুলে ছেয়ে যাবে, কানন-কান্তার,
অপরূপ হবে দেশ উজ্জ্বল-বরণী।
আজি কি পেয়েছ কবি, বার্ত্তা তুমি তার?
গাও সে বাসন্তী গীতি নব-আগমনী।

স্মৃতি-কথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

১২৭৪ সালে কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী যামিনীতে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রায়ের কাঠি রাজবাটীতে বাসুকি গোত্রে আমার জন্ম হয়। বাসুকি গোত্রোদ্ভব রাজা শশিভূষণ রায় চৌধুরী আমার জনক এবং রাণী মুক্তকেশী চৌধুরাণী আমার জননী। রায়ের কাঠির রাজবংশে বাসুকি গোত্রে আমার জন্ম হইলেও নানা কারণে আমার পিতা ও মাতা নিতান্ত নিঃস্ব ও অশরণ হইয়া পড়িয়াছিলেন; নিদারুণ কৃচ্ছ্রে আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। রায়ের কাঠির মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয় হইতে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় মাসিক পাঁচ টাকা মাত্র গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তিলাভ সহকারে উত্তীর্ণ হইয়া, বর্ষত্রয়কাল পিরোজপুরস্থ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নান্তে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত বরিশাল জেলা স্কুলে অবেতনে অধ্যয়নপূর্ব্বক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যয়ন-মানসে আমি কলিকাতায় যাত্রা করি। আমার বাল্যাবধি সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি বিশেষ ঝোঁক। কলিকাতায় গিয়া তত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের অভিলাষে প্রথমেই সেই সুপ্রসিদ্ধ কলেজ মহামণ্ডপে গমনপূর্ব্বক কলেজের মহামান্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের শ্রীচরণ সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার আদেশমত আমার পরিচয় দানান্তে প্রাণের বাসনা ব্যক্ত করিলাম। তিনি আমার পরিচয় ও বাসনা অবগত হইয়া প্রথমে আমি একজন কায়স্থ জানিয়া নিতান্ত অবজ্ঞাভরে বলিলেন যে, আমি একটি শূদ্রজাতীয় ছাত্র হইয়া কিরূপে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে অধ্যয়নের সুমহতী প্রবৃত্তি হৃদয়ে পোষণে সাহসী হইতে পারি। নিতান্ত সুপদ-সম্মানানভিজ্ঞ তরুণ শূদ্র বলিয়া তিনি আমার অনধিকার প্রবেশের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমায় বিদায় প্রদান করিলেন। গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ প্রবেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈদ্যের মাত্র অধিকার, আর কাহারও নহে।

গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যামন্দির হইতে আমাদের বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শোকে ও নৈরাশ্যে আমি যারপরনাই কাতর হইয়া অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে ভগবানের অপার করুণায় শ্রীঅরুণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নামধেয় আমাদের বাসায় আমার চাইতে উচ্চতর শ্রেণীর একজন ছাত্র আমার মুখে সব শুনিলেন এবং যারপরনাই সহানুভূতি সহকারে আমাকে প্রাতঃস্মরণীয় দয়াপারাবার শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক তাবৎকথাবলী নিবেদনের উপদেশ প্রদান করিলেন। আমরা তখন বাদুড়বাগানে কালিদাস সিংহের গলিতে বাস করিতাম, পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসস্থান উহার উত্তরে নাতিদূরে বর্ত্তমান।

সেই ভদ্রলোকের সদুপদেশে আমি সেই দিনই পরমপূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাসস্থান দেখিয়া আসিলাম। অতঃপর ক্রমশঃ দুই দিন ঐ বাড়ীতে গিয়া দূরে দাঁড়াইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া আসিলাম। কিন্তু সাহসভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিলাম না। অতঃপর তৃতীয় দিনে আমি গিয়া যেমন দাঁড়াইয়া আছি, অমনি আমাকে দেখিয়া মহাপুরুষ সাদরে আহ্বান করিলেন—"ওগো কে তুমি? কাকে খুঁজিতেছ? আমার কাছে এস। তোমার ভয় হইয়াছে কি? অত কাঁপিতেছ কেন? আমার কাছে এস, আমি তোমার সহায় হইয়া সব সাহায্য করিব।" মহাপুরুষের সুমধুরবচনে আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিতে করিতে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলাম। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে ধরিয়া তুলিয়া সাদরে আমার পরিচয় ও তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার অভয়দানে আমি আমার নাম, বাসস্থান ও বংশের পরিচয় প্রদান করিলে, তিনি হাসিতে হাসিতে আমায় আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন, "বাবা, আমি তোমাদের বর্ত্তমান বাড়ী রায়ের কাঠি বেশ চিনি। রায়ের কাঠির রাজবংশ বাসুকি গোত্র আমার সুবিদিত, তোমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ রাজা শিবনারায়ণ রায় চৌধুরীর আমি যে একজন বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ। তোমায় সংস্কৃত-কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় শূদ্র বলিয়াছেন? তিনি কি জানেন না যে তোমরা কায়স্থ-কুলমণি ব্রহ্মক্ষত্রিয়। সংস্কৃত কলেজে তিনি তোমায় গ্রহণ না করিয়া আর কাকে নেবেন? অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র কি তোমায় দেখেছেন? তিনিও ত রাজা শিবনারায়ণের একজন বৃত্তিভোগী। তোমাদের গোত্র যে বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র সুবিদিত। কাল পূর্ব্বাহ্নে তুমি আমার নিকটে আসিবে, আমি তোমায় সংস্কৃত কলেজে লইয়া গিয়া সসম্মানে ভর্ত্তি করাইয়া দিব। আচ্ছা বাবা, তোমার প্রপিতামহ রাজা দেবনারায়ণ ও পিতামহ রাজা মহেশনারায়ণ অদ্যাপি জীবিত আছেন কি?" আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক বলিলাম—"আজ্ঞে, তাঁহারা কেহই জীবিত নাই, আমার পিতাও একণে জীবিত নাই। আমাদের একণে আর সে রাজসম্মান নাই। আমরা একণে প্রায় সকলেই অর্থহীন ও সম্মানহীন হইয়া পড়িয়াছি, পূর্ব্বপুরুষদের চতুর্দ্দশ পরগণা সম্পত্তি প্রায় সব পরহস্তগত হইয়াছে, আমাদের জীবিকার জন্য আমাদের প্রায় সকলেরই বেতনভোগী চাকরীজীবী হইতে হইতেছে। আমাদের দুরবস্থার কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যারপরনাই ব্যথিত হইলেন। পরদিন আবার তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে তাঁহার ভবনে গিয়া দেখিলাম যে, মহাপুরুষ আমার জন্য প্রস্তুত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি তাঁহার জন্য একখানি গাড়ী আনিতে যাইবার কথা বলিলে, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে,

তাঁহার যাতায়াতে শকটের কখনও কোন প্রয়োজন হয় না, পদব্রজে তিনি অনায়াসে বারাণসীধামে গমনে সমর্থ। সুতরাং পদব্রজেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি আবার সংস্কৃত কলেজে গমন করিলাম। কলেজের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াই তিনি তারস্বরে "মহেশ, মহেশ" বলিয়া কলেজের মহাপণ্ডিত অধ্যক্ষ মহাশয়কে ডাকিতে লাগিলেন। পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহাশয়ও মহাপুরুষের আহ্বানে প্রাসাদের নিম্নতলে আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক চেয়ারে উপবেশন করাইলেন। আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে আমার সমুদায় পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক কেন আমাকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। অতঃপর কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়কে তিনি স্বীয় কার্য্যভার বহনের নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। অবশ্য পরিশেষে অধ্যক্ষ মহাশয়ের সবিনয় অনুরোধে তাঁহার ক্রোধ উপশান্ত হইল এবং তৎসঙ্গে আমিও অবেতনে কলেজে প্রবেশের ও অধ্যয়নের অনুজ্ঞা লাভ করিলাম। সংস্কৃত কলেজ হইতেই ক্রমশঃ আমি সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত যথাসময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এই সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় ভবধাম পরিহার করেন। সুতরাং আমিও নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়ি, তবে অধ্যক্ষ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের করুণা বলে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন হইতে বঞ্চিত না হইয়া তথায় ক্রমে দুই বৎসর যাবৎ সংস্কৃতে এম. এ. অধ্যয়নের অনুমতি লাভ করি। তৎকালে আমাদের অধ্যাপক ছিলেন—(১) স্বয়ং অধ্যক্ষ ন্যায়রত্ন মহাশয়, (২) পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, (৩) বৈদিক লৌকিক সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ্ মহাপণ্ডিত গোবিন্দশাস্ত্রী, (৪) পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী, (৫) ষড়্দর্শনে মহাপণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার এবং (৬) সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী। অধ্যাপকমণ্ডলীর সকলেরই স্ব স্ব বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষায় সাহিত্য ও অলঙ্কারের সঙ্গে বৈদিক কাল হইতে লৌকিক কাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষার পূর্ণ ঐতিহাসিক জ্ঞান লাভ করিতে হইত, ঐতিহাসিক জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য প্রায় প্রতি বৎসরই জার্ম্মাণী হইতে সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন একজন মহাপণ্ডিত আসিয়া ছাত্রদের লইয়া প্রায় অর্দ্ধ বৎসর-কাল ইংরেজী ভাষায়—"History of Sanskrit Litterature from the Vedic time to the latest age" বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা করিতেন। আমাদের বৎসর আসিয়াছিলেন ডাঃ গোল্ডষ্টুকার। নিতান্ত সৌভাগ্যক্রমে আমি ডাঃ গোল্ডষ্টুকার মহোদয়ের বড় সুনজরে পড়িয়াছিলাম। জানি না কেন তিনি আমাকে পণ্ডিত বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ডাঃ গোল্ডষ্টুকারের নিকটে শুনিতাম জার্ম্মান জাতির অনেকেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যানুরাগী। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষই প্রকৃত বিদ্যা ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী। তিনি বলিতেন ভারতবর্ষে জন্মলাভ মহাপুণ্য কর্ম্মের ফল। বড়ই দুর্ভাগ্য যে, ভারতবাসীর মধ্যে এক্ষণে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি বিরল। তাঁহার মতে মহাপাপে ভারতবাসী প্রকৃত শিক্ষার অভাবে জগতে পূজিত না থাকিয়া হেয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি ইহাও বলিতেন যে, গণিত, বিজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, অধ্যাত্মসাধনা, গগন পরিদর্শন প্রভৃতি ঐহিক ও পারমার্থিক সর্ব্বজ্ঞানার্জ্জনেই একদিন ভারত বিশ্বপূজ্য ছিল।

আমার দ্বিবৎসর অধ্যয়নান্তে আমি এম. এ. পরীক্ষায় ক্রমে চারিটি প্রশ্নপত্রের প্রত্যেকটিতে প্রতিশতে নব্বই নম্বর পাইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে দুইটি প্রশ্নপত্রে প্রতিশতে ঊনবিংশতি করিয়া পাই। অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাকে বলিলেন, "বাবা, তুমি চারিটি প্রশ্ন পত্রের উত্তরে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াও দুইটি প্রশ্নপত্রের উত্তরে আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের নিকট মাত্র ঊনিশ করিয়া পাইয়াছ। তোমার বড়ই দুর্ভাগ্য।" আমি পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহাশয়ের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া রোদন করিলাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন, "আমি তোমাকে বেশ জানি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তোমাদের পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত মৈমনসিংহের লোক, তিনি তোমার উপর বড়ই রুষ্ট, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার তোমার সাধ্য নাই। এক্ষণে আর কোনও পরীক্ষা না দিয়া একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে তুমি অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করিলে ক্রমে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তোমার পূর্ণ সমাদর হইবে। কোন্ কলেজে বিশিষ্ট অধ্যাপকের আবশ্যক তুমি অনুসন্ধান করিয়া আমাকে জানাইলে আমি তোমার সেই পদলাভের জন্য যত্ন করিব।" আমার প্রতি পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহাশয়ের তাদৃশ অনুগ্রহের বাক্য শ্রবণে আমি সানন্দে তাঁহার শ্রীচরণে পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলাম এবং তৎপর একটি কর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। দুই তিন দিন যাইতে না যাইতেই সিটি কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের একটি পদ খালি জানিয়া শ্যামবাজারে গিয়া পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সকাশে নিবেদন করিলে তিনি পরম-প্রীতি-সহকারে বলিলেন, "তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কলিকাতায় দেশীয় কলেজগুলির মধ্যে সিটি কলেজ সর্ব্বোত্তম, কেননা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমোহন বসু মহাশয় বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের একজন রত্নবিশেষ। তাঁহার অধীনে কর্ম্মলাভ তোমার ভাবী মহোন্নতিসাধক। আগামী কল্যই আমি তোমাকে লইয়া তাঁহার বাটীতে যাইব। কাল সকালে তুমি এখানে আসিবে।" পরদিন আমি অধ্যক্ষ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ভবনে গমন করি। ইহারই ফলে সিটি কলেজে

আমার অধ্যাপকের পদপ্রাপ্তি হয়। সেই দিনই কলেজে গিয়া অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সিটি কলেজে প্রধানতম অধ্যাপকের পদে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। কলেজ হইতে বার্দ্ধক্যবশতঃ পণ্ডিত বরদাকান্ত বিদ্যারত্নের বিদায় গ্রহণে আমার উক্ত পদ লাভ হয়। আমার সহাধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত নৃত্যগোপাল কবিরত্ন ও পণ্ডিত ভূতনাথ বিদ্যারত্ন। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্নও মধ্যে মধ্যে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের সংস্কৃতজ্ঞানের পরীক্ষা করিতেন। সিটি কলেজে শিক্ষাদান প্রণালীতে পরম প্রীত হইয়া বসু মহাশয় ক্রমে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক রূপে নিয়োজিত করাইলেন। তিনি আমাকে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে লইয়া যান এবং তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন। সার আশুতোষের দ্বারা ক্রমশঃ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ এবং এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইলাম।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমার এম-এ পরীক্ষায় অলঙ্কারশাস্ত্রের পরীক্ষক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য আমার প্রতি এতাদৃশ প্রীতিলাভ করেন যে, আমি সিটি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছি জানিয়া তিনি একদিন আমাদের কলেজে আসিয়া আমার নানা সুখ্যাতিপূর্ব্বক আমাকে রিপণ কলেজে লইয়া গিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। আনন্দমোহন তাহা শুনিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া সবিনয়ে তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি মহাপণ্ডিত, আপনার কি আমার কলেজের একজন সুযোগ্য অধ্যাপককে অন্তত্র লইয়া যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করা উচিত? আমি এখানে উপেন্দ্রবাবুকে যে বেতন প্রদান করিতেছি, তাহা অবশ্য ইঁহার ন্যায্য বেতন অপেক্ষা কম, তথাপি আমার ও আমার কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের ইঁহার বেতন দ্বিগুণ বর্দ্ধনের ইচ্ছা, বিশেষতঃ ইঁহার এখানে আগমন অবধি ছাত্রসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। আমরা ইঁহার বেতন পরের মাস হইতে বাড়াইয়া দিব। আপনার ও সুরেন্দ্রবাবুর সম্মাননার জন্য পণ্ডিত মহাশয় আপনাদের কলেজে প্রতি সপ্তাহে তিন ঘণ্টা করিয়া বক্তৃতা করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে।" বসু মহাশয়ের বচনে কৃষ্ণকমল বাবু বলিলেন, "আপনার বাক্যগুলি সকলই সুযুক্তিপূর্ণ। শিক্ষাদানে উপেন্দ্র বাবুর এইটুকু সাহায্য পাইলেই আমাদের যথেষ্ট হইবে, কেননা আমি সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষায় অলঙ্কারশাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস বিষয়ে ইঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া এত দূর প্রীত হই যে, প্রথমে আমি উঁহাকে প্রায় পূর্ণ সংখ্যাই প্রদান করি, শেষে পরীক্ষক-সভার নির্দ্দেশে নম্বর কমাইয়া প্রতি শতে ৭২ করিয়া প্রদান করি। তদবধি উঁহাকে আমাদের রিপণ কলেজে গ্রহণে মানস করি। আজি আমি দেখিতেছি উপেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক আমাদের দুইটি কলেজেই আদর্শ সংস্কৃত শিক্ষা-প্রদান কার্য্য চলিবে।" পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এইরূপ স্থির করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। আমারও যুগপৎ দুই কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপকতা গ্রহণ করিতে হইল। অতঃপর একদিন সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্ব-সম্পাদক ও তৎপরে সহকারী অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় আমাদের কলেজে আগমনপূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস উপেন্দ্র, আমি তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছিলাম। তোমাকে সংস্কৃত পরীক্ষায় নিতান্ত অলীক আচারে অকৃতকার্য্য করিয়াছিলাম। উহার জন্য এত দিন যারপর নাই আত্মগ্লানি ভোগ করিয়া কালযাপন করিয়াছি। আজি আমি ভারত গবর্ণমেন্ট হইতে তোমার নামে 'বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী' উপাধি-পত্র বহু আয়াসে লইয়া আসিয়াছি। বৎস, তোমার পুরাতন অধ্যাপকের পূর্ব্বকৃত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া এই উপাধিপত্রখানি গ্রহণ করিয়া আমাকে সুখী কর।" আমি পণ্ডিত মহাশয়ের তাদৃশ প্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বার বার প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে উপাধিপত্রখানি গ্রহণ করিলাম।

কলিকাতা সিটি কলেজে আমার কার্য্যকালে আমার সহযোগী অধ্যাপক ইতিহাসে ছিলেন সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিজ্ঞানে ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গণিতে ছিলেন প্রথমে প্রাতঃস্মরণীয় আনন্দমোহন বসু, তৎপরে কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ, ইংরেজী সাহিত্যে ছিলেন অধ্যাপকরত্ন হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, দর্শনশাস্ত্রে ছিলেন অম্বিকাচরণ মিত্র, পশ্চাৎ ডাঃ হীরালাল হালদার, আরব্য ও পারস্য ভাষার অধ্যাপক ছিলেন মহম্মদ আব্দুল হাদি, ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যাপক ছিলেন ব্রজসুন্দর রায় চৌধুরী ও রজনীকান্ত গুহ, সংস্কৃতে অন্যতম ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যার্ণব।

অবশেষে কালেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের পরলোকগমনের পর বৎসরই বয়সাধিক্যবশতঃ আমিও স্বকর্ম্ম হইতে বিরত হইলাম।

বাংলার প্রশ্ন ও বাঙালীর দায়িত্ব

শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়

কমলাকান্ত প্রমুখাৎ বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "হায়, কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি। কই অনেক দিবসে মনের মানুষে বিধি মিলাইল কই? যাহা চাই তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়, সবারই ঈপ্সিত মেলে কমলাকান্তের মিলিবে না?" উত্তর আজও আসে নাই।

বাঙালীর বাংলা বাঙালীর চিরপ্রিয়। তার বাংলাকে ঘিরিয়া সে কবিতা রচিয়াছে, সঙ্গীত গাহিয়াছে, তার অতীতের স্বপ্ন দেখিয়াছে, ভবিষ্যৎ কল্পনায় সুবর্ণ তুলিতে আঁকিয়াছে। তার কবি অনন্যসাধারণ স্বচ্ছ অনুভূতির দ্বারা অনুভব করিয়াছেন বঙ্গ-জননীর মাতৃমূর্ত্তি। দেশমাতৃকার প্রতিমা কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত ভক্তিমুগ্ধ চক্ষে যুগ যুগ ধরিয়া দেখিয়াও বাঙালী কবি তৃপ্তি অনুভব করে নাই।

বাঙালী বিদেশীর সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যময় ঐশ্বর্য্যে আত্মবিস্মৃত হয়—কিন্তু ক্ষণকের জন্য। তার দেশ "স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।" ভাবরুদ্ধ স্বরে সে সম্বোধন করে তার দেশমাতৃকাকে,

> "তুমি তো মা সেই
> তুমি তো মা সেই
> চির গরীয়সী ধন্যা।"

বাঙালীর সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা দেশ যে শুধু কবির কল্পনা ছিল না তার সাক্ষ্য ইংরেজ লেখকদের বহু বর্ণনায় রহিয়াছে। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের ঐতিহাসিক চার্লস ষ্টুয়ার্ট ১৮১৩ সালে রচিত তাঁহার বাঙলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "প্রকৃতি বাংলাদেশকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শান্তির উপায় দান করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। প্রকৃতি বাংলাদেশকে মুক্তহস্তে দান করিয়াছে এমন সমস্ত সামগ্রী যাহা যে-কোন দেশের নিকট বাঞ্ছিত। বাংলার জমিতে মানুষ ও পশুর সর্ব্বপ্রকার খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ এত প্রচুর যে এক বৎসরের ফসল অন্ততঃ দুই বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান করিয়া দেয়। বাংলার প্রয়োজন মিটাইয়া বাংলার শস্য অন্যান্য অভাবগ্রস্ত স্থানে রপ্তানী হয়। এইজন্য বাংলাদেশই পূর্ব্বাঞ্চলের খাদ্যশস্যের ভাণ্ডাররূপে পরিগণিত হয়, যেমন মিশর পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের খাদ্য ভাণ্ডাররূপে গণ্য হয়। বাংলার ফল-ও-পশু-সম্পদ অপর্য্যাপ্ত। মানুষের ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা এ

দেশবাসী প্রস্তুত করে। বাংলার শিল্পনিপুণ অধিবাসীরা শিল্প-নৈপুণ্যের বহু প্রণালীতেই অভিজ্ঞ। অন্য দেশের অন্য জাতির কোন সাহায্য তারা চায় না, উপরন্তু বাংলারই সৌষ্ঠবযুক্ত সুন্দর পণ্যদ্রব্য দেশ-বিদেশে রপ্তানী হয়।"

'ধনধান্যপুষ্পে ভরা' এই বাংলারই শতাব্দী পূর্ব্বের চিত্রের সঙ্গে আধুনিক অবস্থার তুলনা প্রয়োজন। নীচেকার অনুচ্ছেদেরও লেখক অভিজ্ঞ ও সুপরিচিত ইঙ্গ-বঙ্গ রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতীক ইংরেজ—"পাঁচ একর অর্থাৎ ১৫ বিঘা জমি একটি সাধারণ বাঙালী পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্ত প্রয়োজন। কিন্তু ধরিজমি হইতে আমন ধান্য ব্যতীত আর কিছুই না জন্মে তাহা হইলে অন্যূন আট একর অর্থাৎ ২৪ বিঘা জমি প্রয়োজন।"

বাংলাদেশের অধিবাসী সংখ্যা ১৯৪১-এর সেন্সাস অনুসারে ৬ কোটি। তাহার শতকরা ৭২ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল। উড্হেড কমিশন রিপোর্টে দেখানো হইয়াছে, বাংলাদেশের বিশ লক্ষ পরিবারের মাত্র পাঁচ একর অর্থাৎ ১৫ বিঘার অধিক জমি আছে। ইহার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ৭ লক্ষ পরিবারের ত্রিশ বিঘার বেশী জমির সংস্থান আছে। বাকি পরিবারদের সম্পত্তি—ভরণ-পোষণের জন্ত প্রয়োজনীয় এই নিম্নতম পরিমাণেরও অনেক কম। উড্হেড কমিশনের হিসাবে বাংলায়

কৃষিজীবীর	সংখ্যা	শতকরা	৭৪
শিল্পজীবীর	,,	,,	১০.৫
চাকুরীজীবীর	,,	,,	৬.২
অন্যান্য	,,	,,	৯.৩
			১০০

১৮১৩ সালের সহিত ১৯৪৩ সালের তুলনা করিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে এই ১৩০ বৎসরের মধ্যে বাংলার আর্থিক অবস্থার দ্রুত ও সুনিশ্চিত অধোগতি হইয়াছে। পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সম্পৎশালী জাতি দারিদ্র্যের ও দুর্দশার চরম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ১৯৪৩-এর মন্বন্তর বাঙালী কৃষিজীবী ও সমাজের নিম্নস্তরের লোকের চরম অর্থনৈতিক দুর্দশার অভ্রান্ত নিদর্শন। এই দুর্দশার কথা কোন কোন দেশীয় কর্ম্মচারী বহু পূর্ব্ব হইতেই রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্ণধার ও জননায়কদের গোচরীভূত করাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন ও প্রতিকারের জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাম্য ভাষায় বলিতে গেলে—"চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" বিদেশী আমলাতন্ত্র উপার্জ্জনের জন্ত এদেশে আসেন। উপার্জন ও স্বকীয় ক্রমোন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্ব-স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। শেষে অর্থ, পদ, গৌরব ও পেন্সন লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে যেটুকু সময় ও শক্তি

থাকে তাহা ভারতের পরাধীনতার পোষকতায় ও ভারতবাসীর নিন্দায় অতিবাহিত করেন। ইঙ্গ-বঙ্গ কর্মচারী, যাঁহারা উচ্চপদস্থ হন ময়ূরপুচ্ছ সংগ্রহে তাঁহাদের অধিকাংশের জীবনের এত অধিক সময় ও শক্তি ব্যয়িত হয় যে, পুচ্ছহীন অবস্থায় তাঁহাদের আর কিছু উত্তম দেশের কোন সমস্যার সমাধানে নিয়োগ করার রুচি বা শক্তি থাকে না। দেশের স্বরাজ্যসাধকগণ "স্ব" লইয়াই এত ব্যস্ত যে রাজ্য বা সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সজাগ যেখানে নয় সেখানে তাঁহাদের কোন চেষ্টার বা চিন্তার অপব্যবহার (?) তাঁহারা করিতে চাহেন না। সার জন উডহেডও লিখিয়াছেন, "রাষ্ট্র-পরিচালকদের ও ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগ ছিল না, লাট সাহেবের সঙ্গে মন্ত্রীদের সহযোগিতা ছিল না, জনসাধারণের সঙ্গে সরকারেরও কোন সহানুভূতি ছিল না—এই সমস্ত কারণে দুর্ভিক্ষ নিবারণের কোন আয়োজন সম্ভব হয় নাই।" কি দায়িত্বপূর্ণ কর্মী সংযোগ! ফলে লাট মন্ত্রী বা রাজনৈতিক দলসমূহের অধিনায়কবৃন্দ কাহারও কোন ক্ষতি হইল না, মরিল বিশ লক্ষাধিক অসহায় নরনারী, যাহারা ট্যাক্স দেয়, লাট মন্ত্রী আমলাতন্ত্র হইতে সুরু করিয়া তথাকথিত স্বরাজ-সাধকদের ঐশ্বর্য্যের খোরাক যাহারা যোগায় কিন্তু যাহাদের অভাব-অভিযোগের, দুঃখ-কষ্টের, ব্যাধি দারিদ্র্যের কোন উপশম কখনও হয় না।

এই দুর্দশা যে কত ব্যাপক, কত গভীর গত দুর্ভিক্ষে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। দেশের আপামর সাধারণের যেখানে এই অবস্থা সেখানে ২৮টি জেলা বোর্ড, ১১৮টি মিউনিসিপ্যালিটি, ব্যবস্থাপক সভায় ২৫০ জন সভ্য, মন্ত্রীমণ্ডল, রাজকর্মচারী—কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "নন্দলাল" রূপে দেশের না হইলেও স্বগৃহের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন অবসর মত গরম বক্তৃতাও মাঝে মাঝে যে না দেন এমনও নয়।

বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে আজ বাংলায় যথার্থ দেশপ্রেমিক ও অভিজ্ঞ নেতার একান্তই অভাব। আজ দেশ অপেক্ষা দল বড়, দল অপেক্ষা দলের অধিনায়ক বড়। অধিনায়কদের জন্য চরিত্র, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতিনিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না। বাংলা কংগ্রেসমণ্ডলীর নির্ব্বাচনে সভাপতির গুণাবলীর বিশ্লেষণ নিষিদ্ধ। দেশবিশেষে দৃষ্টি-বহির্ভূতা বোরখা পরিহিতা স্ত্রীনির্ব্বাচনের বিধি আছে শুনিয়াছি। কিন্তু গুণবিচার-নিষিদ্ধ সভাপতিবরণ বোধ হয় আর কোথাও নাই। প্রাচীন ঋষিরা উপদেশ দিয়াছিলেন, "আত্মানং সততং রক্ষেৎ।" বাংলাদেশে ঋষিবাক্য ব্যর্থ হয় নাই। কংগ্রেস কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা কর্পোরেশন, ২৮টি জেলা বোর্ড, ১১৮টি মিউনিসিপালিটি, এমন কি ভারত সভা (Indian Associa-

---

tion) হইতে ইউনিয়ন বোর্ড পর্য্যন্ত নেতারা আত্মরক্ষার ব্যস্ত।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ভাবাবেগের সহিত কলিকাতা নগরীতে বলিয়াছিলেন, "স্বরাজ্য আসিবেই; বৃটিশ শাসন শেষ হইবেই ইহা স্থির নিশ্চয়। কিন্তু আজ বিচারের বিষয় এই যে, স্বরাজ্য পাইয়া আমরা কিরূপে তাহার পরিচালনা সার্থকতার দিকে লইয়া যাইতে পারি। আমাদের মধ্যে কত লোক আছেন যাঁহারা শুধু দেশসেবাকে আদর্শ করিয়া জনগণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিবেন। আজ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সেবার আগ্রহ এবং সংযত ও সংহত সেবাকার্য্য।"

হয়ত বাংলার নেতৃবৃন্দ সমস্বরে বলিবেন, "আমিই সেই একমাত্র দেশসেবক।" প্রত্যেকেই হয়ত নিজ নিজ ত্যাগের দীর্ঘ বৃত্তান্ত পেশ করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবেন।

আজ বাংলার দুর্দ্দিন। সে দুর্দ্দিন প্রমাণ করিতেছে তার রাষ্ট্রপদ্ধতি ও রাষ্ট্রপরিস্থিতি—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার না বর্জ্জন না গ্রহণ সিদ্ধান্ত, দেশবিদ্বেষীর শাসনক্ষমতা, কর্ম্মী নিয়ন্ত্রণে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা; বুদ্ধিহীন, চরিত্রহীন, উপযুক্ততাহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা। ফলে দুর্ভিক্ষ—কলিকাতা, নোয়াখালী, ত্রিপুরায় তাণ্ডব লীলা। উৎকোচ গ্রহণকারী, অকর্ম্মণ্য ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সমগ্র জাতীয় ক্ষেত্র পরিপূর্ণ। এর মীমাংসা কোথায়? কে সে মীমাংসা করিবে? কে পথের সন্ধান বলিবে? এ দায়িত্ব প্রত্যেক বাঙালীর—প্রত্যেক বাঙালী সন্তানের, পুরুষ ও নারীর। সে সিদ্ধান্ত করিবার ও স্পষ্ট তাহার পথের নির্দ্দেশ দিবার দিন আজ আসিয়াছে।

প্রত্যেক বাঙালীকে স্থির করিতে হইবে বাংলার এ পরিস্থিতির মূল কি ও কোথায়? কোন্ নীতির বলে, বুদ্ধিহীন, চরিত্রহীন, নীতিহীনের হস্তে দেশের জীবন-মরণের চাবিকাঠি চলিয়া গিয়াছে? বাংলাকে উদ্ধার করিতে হইলে, (ক) প্রথমতঃ আত্মসর্ব্বস্ব তথাকথিত নেতৃবৃন্দের হাত হইতে উদ্ধার করিতে হইবে কংগ্রেসকে। স্বচ্ছ গণতন্ত্র সহজ ভাবে শৈবালমুক্ত হইয়া দেশকে প্লাবিত করিবে। (খ) প্রত্যেক গ্রামে ও প্রত্যেক গৃহে স্বদেশের উন্নতিকামী, সৎসাহসী দেশপ্রেমিকের উদ্বোধন করিতে হইবে। কংগ্রেসের গঠনমূলক পরিকল্পনা স্বহস্তে লইতে হইবে। (গ) রাষ্ট্রপদ্ধতি পরিবর্ত্তনের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—(১) বিচ্ছিন্ন বাংলার অংশকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিতে হইবে জনগণের সম্মতিক্রমে।

(২) বাংলায় যৌথ-নির্ব্বাচন-পদ্ধতি পুনঃ-প্রবর্ত্তন করিতে হইবে—পূর্ণ বয়স্কের ভোটাধিকার (adult suffrage)

আদর্শ রাখিয়া নির্বাচন-লিপি (Electoral Roll) প্রস্তুত করিতে হইবে। তার সংখ্যার অনুপাতে ব্যবস্থা-পরিষদের সংখ্যা নির্ণীত হইবে। সম্পূর্ণ পূর্ণবয়স্কের নির্বাচন অধিকার না পাওয়া পর্য্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নির্বাচন-লিপির সংখ্যা অনুপাতে এক যৌথ-নির্বাচন-পদ্ধতির দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে।

(৩) যোগ্যতা অনুপাতে সকল শ্রেণীর সহজসাধ্য পরীক্ষার বা পরীক্ষা ও নির্বাচনের দ্বারা জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে চাকুরি, ব্যবসায় বা বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রগ্রহণ, নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। অনগ্রসর কোনও শ্রেণীর শিক্ষার জন্ত বিশেষ বিধি বা বিশেষ ভাবে অর্থ দান নির্দ্ধারিত সময়ের জন্ত নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপযুক্ততাই একমাত্র মানদণ্ড হইবে। যদি এই সব পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে কোনও শ্রেণী বা ধর্ম্মা-বলম্বী বাধা দেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলে তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হইবে। যাহা অন্যায় তাহা জাতির পক্ষে সহ্য করা সর্ব্বতোভাবে অকল্যাণকর।

(ঘ) যদি এই যৌথ-নির্বাচন-পদ্ধতি ও উপরিলিখিত বিধির অপেক্ষা সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া বঙ্গ বিভাগ শ্রেয়ঃতর পথ মনে হয় তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে ও উভয় প্রণালীর মধ্যে দূরদৃষ্টিতে বঙ্গের কল্যাণজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় আন্তরিকতার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে।

বাংলার নেতৃবৃন্দ যদি স্বার্থপরতা ও ক্ষমতাপ্রিয়তা পরিহার করিয়া দেশের সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন তবে তো সত্যই দেশের সুদিন। কিন্তু যদি তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত না হয় তবে দেশের প্রত্যেক সন্তানকেই বাঙালীর জীবনমরণ সমস্যা মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

সাহিত্য প্রসঙ্গ—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন। প্রাপ্তিস্থান—সেন রায় এণ্ড কোং লিঃ। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৪৲।

লেখক সাহিত্যরসিক, সুসমালোচক এবং ইংরেজী ও বাংলা উভয় সাহিত্যেই সুপণ্ডিত। ওড়িয়া, গুজরাটী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি আছে। কাজেই সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য শ্রদ্ধার সহিত প্রণিধানযোগ্য। বর্তমান পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও জাগের গান, রাজনারায়ণ বসু, কামিনী রায়, বাংলা-সাহিত্যে পশ্চিমের হাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে সতেরটি প্রবন্ধ আছে। এগুলির অধিকাংশই ইতিপূর্ব্বে সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া বিদগ্ধ ও রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। লেখকের পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানের পরিচয় পুস্তকখানিতে পাই না। তিনি সাহিত্যবিচার করিয়াছেন রস-রসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে। শুধু বাংলা সাহিত্য নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যের রস আহরণ করিয়া সুষ্ঠুভাবে তাহা পরিবেশন করাতেও যে তাঁহার নৈপুণ্য আছে, সে পরিচয় পাওয়া যায় বাংলা ও উড়িয়ার যোগ এবং কল্কি প্রভৃতি প্রবন্ধে। আর একটি জিনিষ পাঠকের মনকে মুগ্ধ করে, সেটি তাঁহার ভাষার প্রসাদগুণ এবং অনায়াস সাবলীলতা। এই সমস্ত গুণের সমন্বয়ে পুস্তকখানি বাংলা মনন-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

দুঃখের বিষয়, চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় এই তথ্যবহুল সমালোচনামূলক গ্রন্থখানির মধ্যেও কতকগুলি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে মারাত্মক মুদ্রাকরপ্রমাদ ও সন-তারিখের কিছু গণ্ডগোল আছে। দুই-চারিটির উল্লেখ করিতেছি :—(১) পৃ. ৩২ : রাজনারায়ণ বসু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"১৮৫১ সালে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ, ১৮৬৬ পর্য্যন্ত মেদিনীপুরে কর্ম্মস্থল"। "জন্মগ্রহণ" না হইয়া "কর্ম্মগ্রহণ" এবং "১৮৬৬" না হইয়া "১৮৬৮" হইবে। (২) পৃ. ১৩৯ : "মনোমোহন বসুর 'সতী' নাটকের প্রথম সংস্করণের ভূমিকার তারিখ, ১৭ই মাঘ,..."। লেখক প্রথম সংস্করণের 'সতী নাটক' দেখিলেই ধরিতে পারিতেন যে তারিখটি "১৮ই মাঘ।" (৩) পৃ. ১৫৫ : অধ্যাপক সেন লিখিয়াছেন, "আর এক বিষয়ে মনোমোহন বাবুর মত অত্যন্ত দৃঢ় ছিল ; স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অভিনেত্রী নিয়োগের তিনি অনুমোদন করেন নাই ; ওরূপ ব্যবহার দেশের দুষ্প্রবৃত্তি বাড়িবে ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা।" কিন্তু পরবর্ত্তী কালে মনোমোহনের এই ধারণা যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। গোপাললাল শীল-প্রতিষ্ঠিত এমারেল্ড থিয়েটারে স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অভিনেত্রীরাই অভিনয় করিতেন। মনোমোহন সেই থিয়েটারের 'ডাইরেক্টর' ছিলেন এবং তাঁহারই সময়ে এই রঙ্গমঞ্চে তাঁহার "রাসলীলা" নাটক অভিনীত হইয়াছিল। (৪) পৃ. ১৬৭ : "বারো বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ইং ১৯২১ সনে কবির [কামিনী রায়ের] 'গুঞ্জন' প্রকাশিত হয়।" ইহা ঠিক নহে। 'গুঞ্জন' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সনের মে মাসে।

দ্বিতীয় সংস্করণে তথ্যঘটিত এই সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করিলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন এবং বহু-বিবাহ নিবারণ আন্দোলন নারীর মুক্তি আন্দোলনের দুইটি বিশিষ্ট দিক্। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বঙ্গের নারীজাগরণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। গ্রন্থকার বাংলার নারী জাগরণ-বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নারী আন্দোলনেরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া আন্দোলনের সর্ব্বভারতীয় রূপের আভাস দিয়া বিষয়টি সুপাঠ্য করিয়াছেন। চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়—বাংলার এই কন্যাদ্বয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট (১৮৮২)। তখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দ্বার নারীদের জন্য উন্মুক্ত হয় নাই। চন্দ্রমুখী পাস করিলেও সার্টিফিকেট দাবি করিতে পারিবেন না, এই সর্ত্তে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। যাহা হউক ক্রমে ক্রমে বাংলার, তথা ভারতের নারী-সমাজ নিজেদের যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিতেছেন। এখন নারী-আন্দোলন পরিচালনা নারীরা নিজেরাই করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, ভারতের কোন কোন প্রগতি-মূলক প্রচেষ্টায় আজ নারীরা নেতৃত্ব করিতেছেন। সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারীরা আজ তাঁহার সমান অধিকার দাবি করিতেছেন এবং তাহা লাভও করিতেছেন। ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতে নারীর আসন আরও উর্দ্ধে হইবে সন্দেহ নাই।

পুস্তকে মুসলমান নারী-আন্দোলনের নেত্রী জাহানারা (সাওকৎ মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়) ও সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ না থাকায় যে ত্রুটি হইয়াছে ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা সংশোধন করিলে শোভন হইবে। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

প্রশ্ন—শ্রীজগদীশ ঘোষ। কাত্যায়নী বুক ষ্টল, ২০৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তটি পাঁচ-ছয় মুখ্য চরিত্র লইয়া লেখক এই উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এটি 'প্রবাসী'তে ধারা-বাহিক রূপে বাহির হইয়াছিল। তিনটি ছন্নছাড়া যুবকের আদর্শ-নিষ্ঠাকে কেন্দ্র করিয়া গল্পাংশটি গঠিত, মোটামুটি একটা কৌতূহল আগাগোড়া বজায় আছে। তবে রচনার দিকটা, বিশেষ করিয়া সংলাপ একটু দুর্ব্বল। এবিষয়েও মাঝে মাঝে শক্তির পরিচয় পাওয়ায় মনে হয় লেখক প্রয়োজনমত ধৈর্য দিয়া বইখানি লেখেন নাই। উদাহরণ-স্বরূপ পুস্তকে বর্ণিত ভালবাসার বিকাশের কথাটা ধরা যায়—এক জায়গায়, অর্থাৎ পরেশ আর মালতীর মধ্যেকার ভালবাসার চিত্রণে যে নিপুণতাটুকু লক্ষ্য করা যায়, অবনী আর লতিকার ব্যাপারে তা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

বইটি ১২৮ পাতায় শেষ হইয়া গেছে,—যেমন গল্পের আয়োজন তাহাতে আরও কিছু জায়গা পাইলে ভাল হইত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গ্রামে ও পথে—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়। দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড। ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

লেখক একজন নিষ্ঠাবান্ বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার ধান্যগোরী, সাবলসিংপুর, পলাশপাই প্রভৃতি পল্লীগ্রামে প্রচারকার্য্য করিতে গিয়া তিনি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। পল্লীর ব্যথা লেখক সমস্ত অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন এবং রোগ-শোক-আধিব্যাধি প্রপীড়িত পল্লীর নরনারীর প্রতি তাঁহার অপরি-

সীম দরদ পুস্তকটির ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কর্ম্মী হইলেও লেখক আসলে কবি। পল্লীর মানুষগুলিকে তিনি ভালবাসেন, 'গ্রাম ও পথে'র আকর্ষণ তাঁহার নিকট প্রবল এবং তিনি স্বপ্ন দেখিতে জানেন। তাঁহার ভাষায় এমনি একটি যাদু আছে যে পড়িতে পড়িতে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতে হয় এবং ভাবাবেগে মন আন্দোলিত হয়। তাঁহার নিপুণ তুলিকায় পল্লীর ছবি যেন চোখের সামনে একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠে। শুধু প্রকৃতি বর্ণনায় নহে, চরিত্র-চিত্রণেও লেখকের শিল্পীমনের পরিচয় মেলে। সাগর হাজরা, খাঁ সাহেব, হাবুর মা (বরদাময়ী) প্রভৃতি চরিত্র পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে। লেখকের শিল্প-চাতুর্য্যের দরুন এই প্রবন্ধ-পুস্তকটিতে কথাসাহিত্যের আমেজ লাগিয়াছে। আজ সমস্ত দেশ জুড়িয়া গণ-জাগরণের বড় বড় বুলি শোনা যাইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের সহিত যোগস্থাপন না করিলে গণ-আন্দোলন যে ব্যর্থ হইতে বাধ্য, তাহা আজ বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী তাই আজ পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগ্রামকেই তাঁহার শেষ-সাধনার পাদপীঠরূপে বাছিয়া লইয়াছেন। লেখক তাঁহারই স্ব-শিষ্য এবং কোন্ পথে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, পল্লীগ্রামের দারিদ্র্য ইত্যাদি নানা সমস্যা দূরীভূত হইয়া প্রকৃত গণ-সংযোগ স্থাপিত হইতে পারে আলোচ্য পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে তিনি সে বিষয়ে সময়োপযোগী ইঙ্গিত দিয়াছেন। ভূমিকায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই মূল বিষয়টির দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ইহার জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

পৃথিবীর মানুষ নয়—শ্রীশামুক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮ সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট—কলিকাতা মূল্য ১।০ টাকা।

লেখার বৈশিষ্ট্য এবং বিচিত্রতার জন্য বইখানি শিশু-বৃদ্ধ সকলেরই ভাল লাগিবে। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ছাপা, ছবি ও বাঁধাই সুন্দর।

বইখানি সাহিত্য-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

২৬শে জানুয়ারী—শ্রীনরেন সেনগুপ্ত ও শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১১ ষ্টেশন রোড—ঢাকুরিয়া হইতে শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ টাকা।

দেশাত্মবোধক কবিতার পুস্তক। প্রত্যেকটি কবিতাই ভাষা ও ভাবের ঔজ্জ্বল্যে মনোহারী। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ গ্রন্থের প্রকাশ আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কবিতাগুলি পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম।

যুগের যাত্রী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ভারতী ভবন—১১ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।০ টাকা।

পাঁচটি অংশে বিভক্ত উপন্যাস। লেখকের গল্প বলার ভঙ্গীতে মৌলিকত্ব আছে এবং তাঁহার ভাষাও বেশ সাবলীল।

অমরার অমৃত সাধনা—শ্রীদেবদাস ঘোষ; শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

লেখকের রচনার মধ্যে যে আবেগ-প্রবণতা দেখা যায়, তাহা সংযমের সহিত ব্যবহৃত হইলে সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে—ইহা লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলাম। দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যেও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। পুস্তকখানি সকলের পড়িয়া দেখা উচিত।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

খাদ্য ও টনিক

আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সময়ে একটা উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অসুখেই হউক বা সুস্থ অবস্থাতেই হউক, যখনি কোনো কারণে আমাদের জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ একটা টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার প্রধান একটা কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন আহার্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনে দৈনিক আহার্য্যের এই অক্ষমতা টনিকের দ্বারা পূরণ হয়।

কিন্তু টনিক যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন তাহার একটা দোষ এই যে উহাদ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। সাময়িক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহা বিশেষ কার্য্যকরী হইলেও উহার প্রভাব অল্পকালেই নিঃশেষিত হয়। একমাত্র সুনির্ব্বাচিত কোনো খাদ্যদ্বারাই দৈহিক পরিপুষ্টির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর।

স্যানা-ভিটা এই সকল কারণেই একটা আদর্শ পানীয়-রূপে পরিগণিত। ইহা একাধারে একটা শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটা উৎকৃষ্ট খাদ্যকে আশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে। তাই ইহার নিয়মিত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে।

স্যানা-ভিটা সুনির্ব্বাচিত ও মূল্যবান উপাদানসমূহের সুষম সমন্বয়ে প্রস্তুত। ইহাতে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, ভিটামিন "বি" কমপ্লেক্স, মল্টযুক্ত স্যাসীম ও অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাযথরূপে বিদ্যমান। ইহা সুস্থ কি অসুস্থ যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী। বিশেষ করিয়া রোগান্তে, প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে, বার্দ্ধক্যে এবং বর্দ্ধিষ্ণু শিশু ও মস্তিষ্কজীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়া স্যানা-ভিটা রোগান্তে ও বর্দ্ধিষ্ণু শিশুদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য ও টনিক। রোগবিধ্বস্ত শরীরের দ্রুত সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করিতে ও শিশুদের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য-গুণটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাই প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত স্যানা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি সহজেই আমরা এই ভিটামিন যথাযথরূপে পাইতে পারি। অধিকন্তু খাঁটি দুগ্ধ ও কোকো থাকাতে স্যানা-ভিটা মস্তিষ্ক, পেশী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য করে।

স্যানা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিষ্কজীবীদের পক্ষে অপরিহার্য্য। বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কের পুষ্টি ও শক্তি-বর্দ্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মল্টযুক্ত স্যাসীম স্যানা-ভিটার আর একটি অপূর্ব্ব সম্পদ। বস্তুতঃপক্ষে স্যাসীম খাদ্যতত্ত্বের এক বিস্ময়কর অবদান। উদ্ভিজ্জ জাতীয় হইলেও ইহা আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ। স্যানা-ভিটাতে এই স্যাসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ ও উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে অতুলনীয় বলা চলে। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে প্রোটিন ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও স্নায়ুমণ্ডলীর সুষ্ঠু পোষণ ও সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই অনুপাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন ২'৫ গ্রাম প্রোটিন। প্রোটিনের এই অপরিহার্য্য দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি কাপ স্যানা-ভিটাতে অন্যান্য নানা মূল্যবান্ উপাদান ছাড়াও দুইটা ডিমের সমান প্রোটিন থাকে। প্রত্যহ দুই কাপ স্যানা-ভিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। উপরন্তু মল্ট ও স্যাসীম থাকাতে স্যানা-ভিটা কেবল যে সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অন্যান্য খাদ্য পরিপাক করিতেও এই অপূর্ব্ব খাদ্য-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে।

প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে জননীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঐ সময়ে নিয়মিত স্যানা-ভিটা ব্যবহার করিতে দিলে যাবতীয় অশুভ উপসর্গ হইতে সহজেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। স্যানা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো ও অন্যান্য মূল্যবান উপাদান থাকাতে ইহা দ্রুত মাতৃদেহের সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করে। চর্ব্বি, প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ-গঠনোপযোগী ও শক্তিবর্দ্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত সহজপাচ্য অবস্থায় স্যানা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়।

স্যানা-ভিটা কি সুস্থ কি অসুস্থ সকলের পক্ষেই সমান উপকারী। যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। স্যানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও সুমিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্তিদায়ক। ইহা গরম বা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে।

বিজ্ঞাপন

দেশ-বিদেশের কথা

ব্যায়ামবীর মনতোষ রায়

মনতোষ রায় কর্তৃক "সমুদ্র-শাসন" প্রদর্শন

অমরাবতীতে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত শরীরচর্চা সম্মেলনে বিষ্ণুচরণ ঘোষের প্রধান শিষ্য ব্যায়ামবীর শ্রীযুক্ত মনতোষ রায় পাঁচ হাজারেরও অধিক প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। ক্রমাগত পাঁচ দিন প্রতিযোগীদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার পর মেজর-জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ মনতোষ বাবুর প্রথম স্থান অধিকার করিবার কথা ঘোষণা করেন এবং তাঁহাকে মাল্যভূষিত করেন।

অধ্যাপক হরিরঞ্জন ঘোষাল

মজঃফরপুর সরকারী জি. বি. বি, কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিরঞ্জন ঘোষাল এম-এ, বি-এল, বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ "বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস (১৭৯৩-১৮৩৩)" সম্বন্ধে গবেষণায় রত ছিলেন। সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি "ডক্টর অব লিটারেচার" উপাধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষাল এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন কৃতী ছাত্র।

"এটম চরকা"
(ATOM CHARKA)

আমরা এই চরকা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহা মাত্র সাত ইঞ্চি দীর্ঘ এবং প্রস্থে দেড় ইঞ্চি। অথচ ইহা দ্বারা সাধারণ চরকার ন্যায় সুতা কাটা যায়। এই চরকা এত ছোট যে যে-কোন স্থানে বসিয়া সুতাকাটা চলে। ইহার কলকব্জা খুবই সরল। দীর্ঘকাল ব্যবহারেও অটুট থাকে। ইহা ছাত্রছাত্রী ও ভ্রমণরত কর্মীর খুব উপযোগী হইয়াছে। সহজেই পকেটে করিয়া লওয়া যায়। মূল্য মাত্র ২৷৷০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান: ১। দশগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, দশগ্রাম, মেদিনীপুর। ২। গান্ধীভবন, কৃষ্ণনগর, হেঁড়্যা, মেদিনীপুর। ৩। শিল্পাশ্রম, বি ১১ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ভারতবর্ষে মহাজাতি গঠনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মপ্রচার, তীর্থসংস্কার, সন্ন্যাসী সঙ্ঘ-সংগঠন, হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন, শিক্ষাপ্রচার, লোক-সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সঙ্ঘ বহু সন্ন্যাসীকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বহির্ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। হিন্দু জাতি যাহাতে আবার আত্মস্থ হইয়া, বিভেদ ভুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুর মিলনক্ষেত্র রূপে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে হিন্দু মিলন-মন্দির স্থাপন ও হিন্দু রক্ষীদল গঠন করিতেছেন। সঙ্ঘের এই জাতিগঠনমূলক প্রচেষ্টায় হিন্দু মাত্রেরই সহায়তা ও সহযোগিতা করা উচিত। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র-ব্যবহার করিলে এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে। স্বামী বেদানন্দ, জেনারেল সেক্রেটারী—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

খুলনার জননায়ক নগেন্দ্রনাথ সেন

খুলনার বিখ্যাত জননায়ক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, বি-এল, গত ২২শে ডিসেম্বর, ৭৪ বৎসর বয়সে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করেন। খুলনা জেলার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং জনহিতকর প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাংলাদেশে তিনি অনাড়ম্বর প্রবীণ কংগ্রেস-সেবী রূপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ আকৈশোর কংগ্রেসের অনুরাগী ছিলেন। ১৮৮৬ সালে টিভোলি গার্ডেনসে কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় তখন নগেন্দ্রনাথ স্কুলের ছাত্র। সেই কিশোর বয়সেই তিনি ইহার স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ একজন সুযোগ্য সাংবাদিকও ছিলেন। ১৮৯৯ সালে খুলনায় প্রথম সাপ্তাহিক পত্র "খুলনা"র সম্পাদক হিসাবে সম্পাদকীয় স্তম্ভের শিরোভূষণ (Motto) রূপে তিনি "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র ব্যবহারের প্রথম গৌরব অর্জ্জন করেন। বুয়র যুদ্ধের সময় তাঁহার সম্পাদকতায় মফস্বলে "খুলনা"ই প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র হইয়া উঠিয়াছিল। "খুলনা"র সম্পাদক রূপে এবং পিপলস এসোসিয়েশনের সম্পাদক ও সভাপতিরূপে তিনি খুলনার জনহিতকর নানা আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ১৮৯৪ সালে খুলনা বারে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বার এসোসিয়েশনের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ইহার সভাপতি ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ কংগ্রেসসেবী রূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৩৭ সালে পুনরায় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হন।

হিন্দু শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। তিনি খুলনা আর্য্যধর্ম্ম সভার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য হওয়ার পরে তিনি কংগ্রেসের নির্দ্দেশমত সভ্যপদ ও ওকালতী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকর্ম্মা হইয়া তাঁহার অধ্যাপক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত খুলনা ও উত্তর বঙ্গে দুর্ভিক্ষে ও বন্যায় আর্ত্তত্রাণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বিগত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি খুলনা জিলা-কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি সপরিবারে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মভূমি রাড়ুলি গ্রামে আইন অমান্যের জন্য অভিযান করিয়া কারারুদ্ধ হন।

ডাঃ সারদাচরণ দাশগুপ্ত

কোটালিপাড়ার (ফরিদপুর) ডাঃ সারদাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয়

সারদাচরণ দাশগুপ্ত

সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি এতদঞ্চলের সুপরিচিত জননেতা ও সমাজসেবক রূপে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দারভাঙ্গা ডিষ্ট্রিক্ট জজ কোর্টের অফিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় গত ১৭ই জানুয়ারি পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি দারভাঙ্গা বাঙালী সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং স্থানীয় বাংলা স্কুল, বারোয়ারি সভা প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠানের সহিত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। অমায়িক ব্যবহার এবং মধুর প্রকৃতির জন্য শশিভূষণ স্থানীয় বিহারী এবং বাঙালী উভয় সম্প্রদায়েরই বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ত্রিহুতের এ-প্রান্তের বাঙালীসমাজ সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

শ্রীমতী আমতুস সালাম
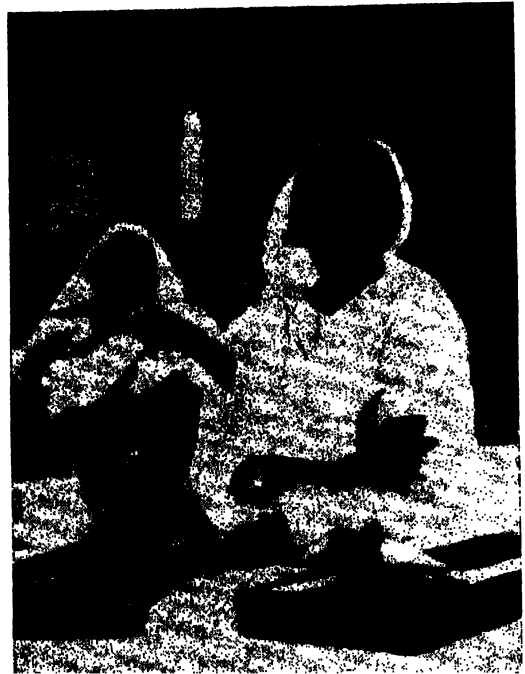
হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমতুস সালাম অনশন-ব্রত অবলম্বন করেন। অনশন ভঙ্গের দুই দিন পরে তিনি চরকায় সূতা কাটিতেছেন এবং চরকার প্রয়োজনীতার কথা সমবেত নারীদিগকে বুঝাইয়া বলিতেছেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

দেবতার গ্রাস
শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহ্‌রুর প্রস্তরমূর্তি নির্মাণরত শ্রীসুধীর খাস্তগীর

শিল্পী সুধীর খাস্তগীর শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের মূর্তি গড়িতেছেন

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৫৩

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারত ত্যাগের তারিখ

পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী ঘোষণা করিয়াছেন, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটেন ভারত শাসনের পূর্ণ দায়িত্ব ভারতবাসীর হাতে অর্পণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে সরিয়া যাইবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্বন্ধে বলা হয় যে, প্রয়োজনবোধে ব্রিটেন উহা কেন্দ্রীয় গবর্মে‍ণ্টের হাতে অথবা প্রাদেশিক গবর্মে‍ণ্টের হাতে দিতে পারিবে। ঐ সঙ্গে লর্ড ওয়াভেলের কার্যকালের অবসান ঘোষণা করিয়া বড়লাটপদে লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এই ঘোষণার পর হাউস অব লর্ডসে এবং হাউস অব কমন্সে রক্ষণশীল দল বিতর্ক উপস্থিত করেন এবং শ্রমিক গবর্মে‍ণ্টের কার্যের বিরূপ সমালোচনা করেন। লর্ডস সভার প্রাক্তন সার সামুয়েল হোর, বর্ত্তমানে লর্ড টেম্পলউড, গবর্মে‍ণ্টকে নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন, কমন্স সভায় বাক্‌বিভূতি বিকীরণ করেন মিঃ চার্চ্চিল এবং সার জন এণ্ডার্সন। ইঁহাদের কাহারও বক্তৃতায় মাইনরিটি সংরক্ষণের মামুলী বুলি ছাড়া সার কথা কিছুই ছিল না। ভারত ত্যাগের তারিখ নির্দেশের প্রতিবাদ সম্বন্ধে উদারনৈতিক দলের নেতা লর্ড সামুয়েল শুনাইয়া দেন যে রক্ষণশীল দলের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতার জন্যই ব্রিটেন আমেরিকা, আয়ার্লাণ্ড এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা হারাইয়াছে এবং ইহারা কেহই আজ ব্রিটেনের আন্তরিক মিত্র নহে। শ্রমিক দল স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগে স্বীকৃত হইয়া ভারতবাসীর বন্ধুত্ব রক্ষা করিবারই চেষ্টা করিতেছেন। রক্ষণশীল দলের নেতারা পণ্ডিত নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস-নেতাদের সম্বন্ধে কটু কথা বলিবার চেষ্টা করিলেই শ্রমিক দলের মিঃ আলেকজাণ্ডার, সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস প্রভৃতি তাহাতে বাধা দেন এবং বুঝাইয়া দেন যে কংগ্রেস-নেতাদের আন্তরিকতা, দূরদর্শিতা এবং রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা গভীর শ্রদ্ধাবান।

মাইনরিটি সংরক্ষণের বুলি যাঁহারা আওড়াইয়াছেন এবার তাঁহারা প্রধানতঃ ভারতবর্ষের আদিমজাতি এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের কথাই বেশী করিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষে মাইনরিটি স্বার্থ-সংরক্ষণের ভার ইংরেজ চিরদিন নিজেদের হাতেই রাখিয়াছে। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে মাইনরিটি রক্ষার দায়িত্ব মন্ত্রীদের উপরে পর্যন্ত অর্পিত হয় নাই, উহা দেওয়া হইয়াছিল গবর্ণরের হাতে। ইহার ফলে কোথাও মাইনরিটির উন্নতি হয় নাই। কংগ্রেস প্রদেশে যে উন্নতি হইয়াছে তাহা কংগ্রেসের ও সমাজসেবকদের চেষ্টায়, গবর্ণরের উদ্যোগে নহে।

মাইনরিটি বলিতে রক্ষণশীল ইংরেজ চিরদিন বুঝিয়াছে প্রধানতঃ মুসলমান, এবং তৎপরে তপশীলী হিন্দু ও আদিম জাতি। কিন্তু মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের হিন্দু মাইনরিটির দুর্দশা সম্বন্ধে তাঁহাদের মুখে একটি কথাও যোগায় নাই। বাংলায় ও সিন্ধুতে হিন্দুদের উপর যে সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচার চলিতেছে তাহা নিবারণে মাইনরিটি রক্ষার ভারপ্রাপ্ত গবর্ণরদের কোনই দুশ্চিন্তা নাই, এই অত্যাচারের নায়ক লীগ গবর্মে‍ণ্টসমূহের অপচেষ্টা বন্ধ করিবার কোন স্পৃহাও তাঁহারা কখনও দেখান নাই। গবর্ণরদের যে রাজকীয় উপদেশপত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের সময় তাঁহারা যেন উহাতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিদের ব্যবস্থা করেন। বাংলা ও সিন্ধুর গবর্ণরেরা রাজার এই উপদেশ অমান্য করিতেও দ্বিধা করেন নাই। বাংলাদেশে হাইমচরে অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের উপর লীগওয়ালারা যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার প্রতিকারে বাংলার গবর্ণর কোন কাজই করেন নাই, চার্চিল, এণ্ডার্সন, টেম্পলউড প্রভৃতির কণ্ঠেও তাহাদের প্রতি একটু সমবেদনাও ধ্বনিত হয় নাই।

ওয়াভেলের অপসারণকে চার্চিল পদচ্যুতি বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং ইহা স্বীকার করাইবার জন্য পরম বার মিঃ এটলীকে প্রশ্ন করিয়াছেন। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কার্যে যে ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং লীগকে ডাকিয়া আনিয়া অন্তর্বর্তী গবর্মে‍ণ্টে

কাজে যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই তাঁহার অপসৃতির মূল কারণ ইহা সকলেই অনুমান করিতেছেন। লর্ড ওয়াভেলের কার্যকলাপ সমালোচনার অতীত নহে। ব্রিটিশ শ্রমিক দল কর্তৃক ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অভিপ্রায় সার্থক করিবার কোন সহায়তা তিনি তো করেনই নাই, অধিকন্তু নিজে এবং সিন্ধুলাট মুডী ও সীমান্তলাট ক্যারোর প্রগতিবিরোধী কার্য সমর্থন করিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য বানচাল করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। শেষ মুহূর্তে আসামের গবর্ণর পদে একজন মুসলমান নিয়োগের ব্যবস্থাও তিনিই করিয়াছেন। পঞ্জাবের গোলযোগ সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী আবেল সাহেবের কীর্তিকলাপও প্রকাশ পাইয়াছে। রাজনৈতিক দপ্তরের খুনা রক্ষণশীলদের সাহায্যে দেশীয় রাজ্য এবং কংগ্রেসের মিলন-পথে বাধা সৃষ্টি করিবারও কম চেষ্টা তিনি করেন নাই। এলেনবির শিষ্যরূপে তিনি নিজেকে জাহির করিয়া আসিয়াছেন এবং ভারতবাসীও তাঁহার কথায় এতদিন বিশ্বাসই করিয়াছেন। প্রথম তিনি ধরা পড়েন কংগ্রেসকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া অন্তর্বর্তী গবর্মেণ্টে লীগকে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে। তাঁহার এই আচরণের প্রকাশ্য নিন্দা কংগ্রেস-নায়কেরা নীরাট কংগ্রেসে করিতে বাধ্য হন। বড়লাটের পদচ্যুতি ব্রিটিশ ইতিহাসে এই প্রথম। ওয়াভেলকে অপসারণে শ্রমিক গবর্মেণ্ট যে দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের উপর দেশবাসীর আস্থা আরও দৃঢ় হইয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলীর ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ঘোষণা সম্পর্কে কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন :—

১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পূর্ব হইতে এজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে যে ঘোষণা করা হইয়াছে কমিটি তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিতেছেন।

এই ক্ষমতা হস্তান্তর যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে হইতে পারে, এজন্য কার্যতঃ অন্তর্বর্তী গবর্মেণ্টকে আগেই ডোমিনিয়ন গবর্মেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। কর্মচারী ও শাসন-ব্যবস্থা ইহার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে এবং বড়লাট ইহার নিয়মতান্ত্রিক নেতা হইবেন। সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সহ কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট মন্ত্রিসভারূপে কার্য করিবেন। অন্য কোন ব্যবস্থাই সুশৃঙ্খল শাসনকার্যের সহায়ক হইবে না এবং এই সন্ধিকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট বিপজ্জনক বিবেচিত হইবে।

কংগ্রেস মন্ত্রী-মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই মের বিবৃতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যাও মানিয়া লইয়াছেন তাহা পূর্বেই জানাইয়াছেন। এই ভিত্তিতেই গণ-পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইতেছে এবং বিভিন্ন কমিটি গঠিত হইয়াছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইহার বিভিন্ন অংশের শাসনতন্ত্র যাহাতে রচিত হইতে পারে, এজন্য গণ-পরিষদের কার্য আরও দ্রুততর হওয়া প্রয়োজন।

কতিপয় দেশীয় রাজ্য গণ-পরিষদে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, কমিটি এজন্য তাঁহাদের অভিনন্দিত করিতেছেন। কমিটির বিশ্বাস ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা ব্যাপারে সমস্ত দেশীয় রাজ্য এবং তাঁহাদের প্রজাগণ যোগদান করিবেন। এই ঐতিহাসিক কার্যে যোগদান করিবার জন্য কমিটি গণ-পরিষদে নির্বাচিত মুসলিম লীগ সদস্যদের নিকট আবার অনুরোধ জানাইতেছেন।

গণ-পরিষদের কার্য স্বেচ্ছাধীন। ওয়ার্কিং কমিটি বহু বার জানাইয়াছেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনায় বাধ্যতামূলক কোন ব্যবস্থা থাকিতে পারে না। এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় ভীতি, অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভয় দূর হইলেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা সহজ হইবে এবং সকলের পক্ষে সমান সুবিধাজনক ভাবে সকল সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারিবে। সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, গণ-পরিষদ যে শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন, যাঁহারা উহা গ্রহণ করিবেন, একমাত্র তাঁহাদের উপরই উহা কার্যকরী হইবে। যদি কোন প্রদেশ বা প্রদেশাংশ ইহা গ্রহণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে চায় কোনক্রমেই তাহাকে বাধা দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং কোন পক্ষেই বাধ্যতামূলক কিছু থাকিবে না, জনসাধারণই তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিবেন। এই ভাবেই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মতিসূচক সাধারণতন্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব।

বর্তমানে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উপস্থিত এবং ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ভার ভারতীয়গণেরই উপর। এজন্য ওয়ার্কিং কমিটি সমস্ত দল, সকল সম্প্রদায় এবং সমস্ত ভারতবাসীর নিকট আবেদন জানাইতেছেন যে, তাঁহারা হিংসা ও বলপ্রয়োগ নীতি পরিহার করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে শাসনতন্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হউন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আসিয়াছে। কেহই বাধা দিতে পারিবে না অথবা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবে না। যুগ পরিবর্তনের সময় উপস্থিত, শীঘ্রই নূতন যুগের সৃষ্টি হইবে। নূতন যুগের এই নূতন ঊষাকে আমরা যেন সানন্দে অভিনন্দিত করিতে পারি। হিংসা যেন অতীতের বস্তু হউক।

ওয়ার্কিং কমিটি পঞ্জাব সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন :—

পৈশাচিক হিংসা, হত্যাকাণ্ড এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টার ফলে গত সাত মাস ভারতবর্ষে বহু বীভৎস ও শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। ঐ সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ

হইয়াছে ; উহা ব্যর্থ হইবেই। ইহার ফলে ব্যাপক হিংসা এবং নরহত্যাই দেখা গিয়াছে।

পঞ্জাব প্রদেশ এত দিন উক্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত ছিল। ছয় সপ্তাহ পূর্বে ঐ স্থানে এক আন্দোলন সুরু হয়। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কয়েক ব্যক্তির উহাতে সমর্থন ছিল এবং জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলীকে চাপ দিয়া ভাঙিয়া ফেলাই উক্ত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। শাসনতান্ত্রিক কোন উপায়েই উহার ক্ষতি করা সম্ভব হইত না। উহাতে কিছু সফলতা দেখা দেয়। যে দল উক্ত আন্দোলন চালনা করে, তাহাদের সাহায্যেই একটি মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করার চেষ্টা হয়। উহার তীব্র বিরোধিতা করা হয় ; ফলে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নরহত্যা এবং অগ্নিকাণ্ড সুরু হয়। অমৃতসর এবং মুলতানে বীভৎসতা এবং ধ্বংসের পরিমাণ অত্যধিক।

এই সমস্ত শোকাবহ ঘটনায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বলপ্রয়োগদ্বারা পঞ্জাবের সমস্যা সমাধান করা যাইবে না ; ঐরূপ কোন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হইতেও পারে না। যতদূর সম্ভব স্বল্প বাধ্যতামূলক প্রভাবের ভিত্তিতে উক্ত সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। **পঞ্জাবকে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে অ-মুসলমান অঞ্চলকে পৃথক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইবে।**

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ওয়ার্কিং কমিটি এইরূপ সমাধানের প্রস্তাব করিতেছে। ইহা দ্বারা পরস্পর বিবাদ, ভয় বা সন্দেহ হ্রাস পাইবে। এই হত্যাকাণ্ড এবং নৃশংসতা বন্ধ করিবার জন্য এবং বর্ত্তমান শোকাবহ ঘটনার সম্মুখীন হইয়া উহা সমাধানের চেষ্টা করিবার জন্য কমিটি পঞ্জাবের জনসাধারণকে অনুরোধ করিতেছে। সমস্যার এরূপ সমাধান করিতে হইবে যে, উহা কোন ক্রমেই বাধ্যতামূলক হইবে না এবং বিপদের মূল কারণ সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইবে।

বঙ্গ বিভাগ

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির উপরোক্ত ঘোষণার মধ্যে কয়েকটি অংশ বাঙালী হিন্দুর পক্ষে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কেননা বর্ত্তমানে মিঃ এটলীর ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণার পর, বাংলার ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার আলোয় আলোকিত হইবে বা দাসত্বের আঁধার অন্ধকারে আবৃত থাকিবে সে বিষয়ে চরম সিদ্ধান্তের দিন আসিয়া পড়িয়াছে। বাঙালী আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর স্বাধীনতার যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছে। "গত গৌরব, হৃত আসন, নত মস্তক লাজে" যদি আজ সারা ভারতবর্ষে কেহ থাকে তবে সে বাঙালী। তাহার আত্মগ্লানি মোচনের, তাহার সকল জাতিগত ব্যাধি ক্ষালনের যদি কোনও উপায় থাকে তবে তাহা স্বাধীনতার আলো। এ বিষয়ে আশা করি কাহারও মনে সন্দেহ নাই যে এই সর্বস্বহারা, নেতৃহীন, বুদ্ধি-বিবেচনা ও রাষ্ট্রগঠন-প্রতিভার দৈন্যে অভিশপ্ত দেশের চরম দুর্গতি নিবারণের যদি কোনও পথ থাকে তাহা হইলে সে পথ স্বাধীনতার পথ। এই স্বাধীনতার পথ কোন্ দিকে তাহার একমাত্র নির্দেশ আমরা এত দিনে পাইয়াছি ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনায়, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণায় এবং ওয়ার্কিং কমিটির উপরোক্ত প্রস্তাবগুলিতে। বাংলার ও বাঙালীর যাঁহারা মাথা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আজ আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন, এখন যাঁহারা সেই আসনগুলি অধিকার করিয়া আছেন তাঁহাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেশের অবস্থার দ্রুত অবনতিতেই এত দিন পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে যে সুযোগ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়াছে সে সুযোগ গ্রহণের জন্য তাঁহারা দেশকে কি ভাবে চালনা করেন তাহাই দ্রষ্টব্য। যিনি দৃঢ়ভাবে বাধা উপেক্ষা করিয়া দেশকে ঠিক পথে চালাইতে পারিবেন, তাঁহারই নাম বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে, যিনি বুদ্ধির অভাবে বা অন্য কারণে ভুল নির্দেশ দিবেন তাঁহার উদ্দেশ্যে বাঙালীর অভিশাপ চিরদিনই বর্ষিত হইবে।

ভারতে স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার দিনক্ষণের শেষ নির্দেশ হইয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও চরমভাবে ঘোষিত হইয়া গিয়াছে যে, যে প্রদেশাংশ উক্ত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে ইচ্ছুক কোনক্রমেই তাহাকে বাধা দেওয়া হইবে না, অন্যপক্ষে যাহারা অনিচ্ছুক তাহাদিগকেও জোরজবরদস্তি করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে টানিয়া আনা হইবে না। বলা বাহুল্য, এই ইচ্ছা বা অনিচ্ছার একমাত্র ইঙ্গিত আসিতে পারে জনমত হইতে এবং কোন্ অঞ্চল ইচ্ছুক বা কোন্ অঞ্চল অনিচ্ছুক তাহা নির্ধারিত হইবে কেবলমাত্র সেই অঞ্চলের অধিকাংশের জনমতের উপর। যদি ইচ্ছুক দল সেই অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকেন তবে তাহা যুক্তরাষ্ট্রে যাইবে, অন্যথা যাইবে না। বাংলায় কোন্ জাতীয়তাবাদী বাঙালী আছে যে ঐ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়া স্বাধীন হইতে চাহে না ? কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার সকল অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের ওজন সমান নহে, সুতরাং সেই প্রদেশাংশই যুক্তরাষ্ট্রে যাইতে পারিবে যেখানে বাঙালী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ, কেননা বাঙালী হিন্দুর প্রায় সকলেই জাতীয়তাবাদী।

বাংলার দেশ খানিকটা যদি স্বাধীন হয় তবে বাঙালীর দেশে জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ কতকটা পরিষ্কার হইবে, বাঙালী জাতির ভবিষ্যতে আশার আলো জ্বলিতে থাকিবে, সকল জাতীয়তাবাদীর একটা আশ্রয়স্থল, একটা দুর্গ থাকিবে যেখানে যে কোনও বাঙালী দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে "আমি স্বাধীন, আমি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতীক···।"

ঐ কথা যেমন নিছক সত্য তেমনই ইহাও সত্য যে, যে পথে জাতীয়তাবাদী বাংলা ও বাঙালী আজ দুর্গতির ও ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে, সমস্ত বাংলা যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া গেলে সে ধ্বংসের পথে সমস্ত জাতীয়তাবাদী বাংলার—বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুর—গতি দ্রুততর হইবে। আজ যাহারা বাহির হইতে আসিয়া বাঙালী হিন্দুকে সর্ব্বনাশী ও সর্ব্বগ্রাসী শত্রুর হাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কাল সমগ্র বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া গেলে তাঁহাদের আগমনের পথও বিষম ভাবে সঙ্কীর্ণতর হইবেই। দেশের ভিতরে যাঁহারা আছেন ও থাকিবেন, যাঁহাদের মধ্যে এখন কয়েকজন নানারূপ কূটতর্কের অবতারণা করিতেছেন, তাঁহারা তখন কি করিবেন তাহার পরিচয় নোয়াখালীতেই পাওয়া গিয়াছে। আজ বাংলাদেশে পূর্ণ পাকিস্থান হয় নাই, এ অবস্থাতেও সেখানে বাঙালীকে রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন এক জন প্রণম্য ক্ষীণদেহ অতিবৃদ্ধ অবাঙালী। কাল তাঁহার অবর্ত্তমানে লীগের করাল গ্রাস হইতে বাঙালী হিন্দুকে রক্ষা করিবে কে?

স্বাধীনতা মানুষের ঈশ্বরদত্ত জন্মগত অধিকার। অন্যের স্বাধীনতা অপহরণ করা যত বড় পাপ, তাহার স্বাধীনতালাভের পথে বাধা দেওয়াও তত বড় পাপ। স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সকল যুক্তিই ভুয়া, সকল তর্কই মিথ্যা, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। স্বাধীনতা লাভের উপায় যাহার রহিয়াছে তাহাকে বাধা দেওয়ার জন্য যত কূট তর্কের, যত যুক্তির অবতারণাই করা হোক স্বাধীনতাকামীর নিকট—মোক্ষকামীর সম্মুখে পাপের প্রলোভনের ন্যায়—সে সকলই অগ্রাহ্য ও তুচ্ছ। রাম ও শ্যাম দু-জনেই স্বাধীনতাকামী, যদি রাম স্বাধীনতা পাইয়া যায়, ছোট ভাই শ্যাম তাহার অংশ চাহিতে পারে বা নিজের স্বাধীনতা লাভের জন্য সাহায্য চাহিতে পারে, কিন্তু "আমি স্বাধীন না হইলে তোমাকে স্বাধীন হইতে দিব না" একথা বলা তাহার অধিকার তো নাই-ই, বরঞ্চ একথা ঘুরাইয়া বলিলেও সে রামের শত্রু, এবং রামের সহিত তাহার সম্পর্ক যতই নিকট, এরূপ বাধাদান ততই ঘৃণ্য, ততই নীচ, ততই বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত এ সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখা এবং আমাদের বিশ্বাস আছে যে স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রত্যেক বাঙালী জাতীয়তাবাদীই বুঝিবেন যে বাংলা আংশিক ভাবেও স্বাধীন হইলে বাঙালীর তবু কিছু আশা-ভরসা আছে। ভবিষ্যতে বাঙালীর ছেলে-বুড়োর, স্ত্রী-পুরুষের একটা আশ্রয়-স্থল থাকিবে যেখানে তাহারা নির্বিবাদে শক্তিগঠন করিতে ও নিজের মত নিজের জীবন যাপন করিতে পারিবে। অন্যথা বাঙালী হিন্দুর চরম দুর্দশা ও দাসত্ব অনিবার্য। যাঁহারা বলিতেছেন "এখন আংশিক স্বাধীনতা লইও না, পরে আমরা সমস্ত দেশকে লড়িয়া স্বাধীন করিব" সেই সকল বাক্সর্বস্ব লোকের কার্যশক্তির ও বুদ্ধমানের ক্ষমতার পরিচয় তো আজ বিশ বৎসর যাবৎ বাঙালী হাতে হাতে পাইয়াছে, আজ আর স্তোকবাক্যে ভুলিবার বা মিথ্যা তর্কজালে বদ্ধ হইবার সময় নাই। এই সন্ধিক্ষণে ভাবের উচ্ছ্বাসে গা ভাসাইয়া নির্বোধের মত আত্মঘাতী হওয়ার কোনই ফল ফলিবে না, কেননা ঐরূপ বলিদান, ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়, উহা বলিই নহে, উহা বিকৃতমস্তিষ্কের আত্মহত্যা। বাংলার যে যে অঞ্চলে স্বাধীনতাকামী জাতিয়তাবাদিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ আছেন তাঁহাদের এখন সুস্পষ্টভাবে সমস্বরভাবে ঘোষণা করা উচিত যে, "আমরা স্বাধীনতা চাই, আমরা এখনই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে চাই। আমাদের আত্মীয়স্বজন, সন্তান-সন্ততির স্বাধীনতার ব্যবস্থাই আমাদের নিকট সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়, অন্য সকল কথা পরে আসিবে।"

আসামকে মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে, আসাম যদি স্বাধীনতা চায় তবে দুনিয়ায় কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না। আজ আমরা বাংলার হিন্দুগরিষ্ঠ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে বলিতেছি যে, যদি তাঁহারা স্বাধীনতা চাহেন তবে দুনিয়ায় কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না। মহাত্মাজী যে যুক্তিতে আসামকে বাংলা হইতে পৃথক হইতে বলিয়াছেন সেই যুক্তিই এ স্থলে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। পশ্চিম বঙ্গের স্বাধীনতার পথে যাঁহারা কাঁটা দিতে চাহেন তাঁহাদের এক দল মহাত্মাজীর উক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে পশ্চিম বাংলার পক্ষে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করা মহা পাপ। আমরা বলি মহাত্মাজীর ঐ উক্তি অবিশ্বাস্য। আমরা বিশ্বাস করি না যে, তিনি আসামকে স্বাধীন থাকিতে বলিয়া পশ্চিম বঙ্গকে বলিবেন দাসত্ব বরণ করিতে। সুতরাং ঐ উক্তি প্রচারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন মিথ্যা আছেই। মহাত্মাজী বলিয়াছেন বাংলাদেশকে হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক বসতি হিসাবে বিভাগ করিলে এদেশে অন্তঃকলহ চিরস্থায়ী হইবে। সে কথা ঠিক, কিন্তু বাংলাকে ধর্ম হিসাবে বিভাগ করার কথা কে তুলিয়াছে? আমরা তো সে কথা শুনি নাই, বলিও নাই। আমরা চাই বাংলার যতটা অংশ সম্ভব স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত করায়, সে অংশে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকলেই যেমন আছে থাকিবে। সুতরাং বাংলা বিভাগের ঐরূপ ব্যবস্থার কথা তিনিই মহাত্মাজীকে বলিতে পারেন যিনি নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিতে উদ্যত। সর্বশেষে পুনর্বার বলিব যে, যদি মহাত্মাজী সব ঠিক শুনিয়াই ঐরূপ মত দিয়া থাকেন তাহা হইলেও তাঁহার ঐ মত অগ্রাহ্য, কেননা, তাঁহার বিচারে ভুল হইয়া থাকিবে। কারণ, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ও দাসত্ব বরণের সপক্ষে কোন যুক্তিই ন্যায় বা ধর্ম সঙ্গত হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলিবার অধিকার কোনও মানুষের আছে একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

"হিন্দু-মুসলমান পৃথক হইলে দেশের সর্বনাশ," "ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই," ইত্যাদি উপদেশ মহাত্মাজী বহু বার দিয়াছেন, এবং তাঁহারও বহু পূর্বে বহু দেশপূজ্য ব্যক্তি আমাদের সে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমরা সে উপদেশ

আজ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ শুনিয়াছি, মানিয়াছি এবং মানিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু অন্য পক্ষ সে কথা শুনিতেছে না, মানিতে প্রস্তুতও নহে, বরঞ্চ যতই তাহার জন্য এ পক্ষ স্বার্থ ছাড়িয়া দিতেছে ততই তাহার লালসা ও হিংসাবৃত্তি বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার কোনও প্রতিকার কাহারও দ্বারা হয় নাই, মহাত্মাজী বহুবার চেষ্টার পর এখন শেষ চেষ্টা করিতেছেন, এবং তাঁহাদের মুখেই আমরা শুনিতেছি যে সে চেষ্টা সফল হওয়ার কোনও চিহ্ন এখনও দেখা যায় নাই। এইরূপ অবস্থায় আমাদের উচিত বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসা এবং মহাজনের উপদেশ স্থানকালপাত্র বিবেচনা করিয়া তবে প্রয়োগ ও প্রচার করিবার চেষ্টা করা। লীগপন্থী মুসলমান যেদিন বলিবে, সে হিন্দুর ভাই—সেদিন সকল সমস্যারই সমাধান হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাকে সে কথা বলাইবে কে, কবে ও কি উপায়ে? তাহার বর্তমান মনোবৃত্তি যতদিন থাকিবে ততদিন মহাত্মাজীর উপদেশ যে ভাবে প্রচারিত হইয়াছে তাহার অনুযায়ী কার্য করিলে সমস্ত বাঙালী হিন্দুর স্বত্বসর্বস্ব ক্রীতদাস হইয়া থাকা ভিন্ন আর অন্য উপায় থাকিবে না। অবশ্য বাঙালী হিন্দু সর্বস্বান্ত হইয়া আজ্ঞাবহ পশুর মত থাকিবার জন্য কিছু স্থান বাংলায় পাইতে পারে, তবে সে, স্বাধীনতার কথা দূরে থাক, মনুষ্য পর্যায়ে থাকার কথাও ভাবিতে পারিবে না। মহাত্মাজী স্বচক্ষে ঐরূপ অবস্থা নোয়াখালীতে দেখিয়াছেন। সমস্ত বাংলাদেশে হিন্দুর ঐরূপ অবস্থা হউক ইহা তিনি নিশ্চয়ই চাহেন না। উহার প্রতিকারের উপায় এখনও তিনি পাইতেছেন না, খুঁজিতেছেন মাত্র। তবে যদি উঁহার এরূপ মন্তব্য বাস্তব জগতে প্রযোজ্য নহে এ কথা বলা হয় তাহা হইলে তাহাতে ভুল কোথায়?

পশ্চিম বঙ্গ স্বাধীনতার আশা ছাড়িয়া দাসত্ববরণ করিলে পূর্ববঙ্গের উপকার হইবে এ কথা প্রমাণ হইলে—সে কথা যতই স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হউক—বরঞ্চ তাহাতে কিছু থাকিত। যখন তাহাও নহে তবে এ ভুয়া স্তোকবাক্য ও কূটতর্ক কিসের জন্য?

বঙ্গ বিভাগের বিপক্ষে অভিমত

বঙ্গ ভঙ্গের বিপক্ষে অনেক কিছু বলা হইয়াছে। তাহার সম্পূর্ণ বিচার বারান্তরে করার ইচ্ছা আছে। সম্প্রতি যুক্তিগুলি আমরা একত্রে পাঠকবর্গের বিচারের জন্য উপস্থিত করিতেছি।

১৯শে ফেব্রুয়ারী 'জয়হিন্দ' পত্রিকা আপিসে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের আহ্বানে একটি সভায় বঙ্গ ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ:

(১) হিন্দুদের রক্ষার জন্য যখন সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা উচিত, তখন বঙ্গ ভঙ্গদ্বারা প্রতিকার করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

(২) ইহা পাকিস্থান নীতির পরিপোষক।

(৩) সমগ্র আন্দোলনটি অবসাদ ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে উদ্ভূত পরাজয়সুলভ মনোভাবসম্পন্ন। ইহার দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা উগ্র ভাব ধারণ করিতে বাধ্য এবং ইহা সমস্যার সমাধানে সাহায্য না করিয়া আরও জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিবে।

(৪) ইহা পশ্চাদ্‌গামী ও প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন। সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় জীবনে একটি সাময়িক ঘটনা মাত্র। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিই আমাদের দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং ইহার কার্য সুরু হইয়াছে। বঙ্গ ভঙ্গ করা হইলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক চিরস্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি হইবে এবং দেশের ক্ষতি হইবে।

(৫) বঙ্গ ভঙ্গের দ্বারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক ঐক্য নষ্ট হইয়া যাইবে।

(৬) ইহার দ্বারা তপশীলী সম্প্রদায়ের হিন্দুদের গুরুতর ক্ষতি হইবে, কারণ পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে তাহারা এক বিরাট অংশ। যদি বঙ্গ ভঙ্গ হয় তবে সম্পৎশালী বর্ণহিন্দুরা দরিদ্র তপশীলী ও বর্ণহিন্দুদের তাহাদের অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দিয়া পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিবে। সুতরাং যখন জাতিভেদ উচ্ছেদের জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি ঠিক সেই সময়ে বর্ণহিন্দু ও তপশীলীদের মধ্যে পুনরায় এক ব্যবধান সৃষ্টি হইবে।

(৭) আদম সুমারীর সংখ্যায় দেখা যায় যে প্রস্তাবিত পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় সমান। এই কারণে হিন্দুদের জন্য পৃথক আবাসস্থলের নীতি গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত বঙ্গ ভঙ্গের বিপক্ষে মতপ্রকাশ করিয়া এইরূপ যুক্তি দিয়াছেন:

(৮) এই আন্দোলনের ফলে সুস্থ এবং সবল জাতিগঠন-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে। বাংলাদেশে হিন্দুরা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগ হইয়াও যথোপযুক্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন এবং তাহাদের দাবি কার্যকরী করিয়া তুলিতে অক্ষম—এইরূপ ভাবিয়াই বর্তমান আন্দোলন চালানো হইতেছে।

(৯) হিন্দুদের স্বার্থহানি করিয়া মুসলমানেরাই চিরদিন রাষ্ট্রতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং হিন্দুদের কোন ইচ্ছাই কার্যকরী হইবে না—এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধারণা করা ভুল। পশ্চিম বঙ্গের যদি এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের মত যথেষ্ট শক্তি থাকিয়া থাকে তবে কেন তাহারা উহা সম্মিলিত বঙ্গ বা বৃহত্তর বঙ্গ গঠনের কার্যে বিনিয়োগ করে না?

(১০) স্বাধীন বঙ্গের নূতন শাসনতন্ত্র এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করিতে হইবে যেন হিন্দুরা রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে তাহাদের ইচ্ছা কার্যকরী করিয়া তুলিতে পারে এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতালিপ্সু যে কেহ হিন্দুদের ন্যায্য দাবি প্রতিপালনে বাধ্য হন। হিন্দুরা যদি নাগরিক অধিকার দাবী ও ভোগ করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারাইয়া না থাকে তবে অন্য কোনরূপ সমাধানের কথা ভাবাও যায় না।

(১১) ভবিষ্যৎ সমাজ সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিবে না, উহা অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিবে।

(১২) এই দাবির পশ্চাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি স্থায়ী বিচ্ছেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা রহিয়াছে।

(১৩) পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে থাকার দরুণ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের স্বার্থ কিছুতেই একরূপ হইতে পারে না; ফলে বর্তমানে তাহাদের মধ্যে যে সংস্কৃতিগত ঐক্য আছে তাহাও ক্রমশঃ নষ্ট হইবে; জাতি হিসাবে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ভীষণ ভাবে ব্যাহত হইবে; পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যাইবে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মনকষাকষির জন্য পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

(১৪) কলিকাতা বন্দর হিসাবে কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গ কর্তৃকই সৃষ্ট হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠানগুলি পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সম্মিলিত সাধনার ফল। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর আইনগত ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণাধিকার না থাকিলে পূর্ববঙ্গ ঐরূপ ব্যবস্থায় কিছুতেই রাজি হইতে পারে না। তা ছাড়া এই দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের ফলে নানারূপ জটিলতা দেখা দিবে।

(১৫) হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রকাণ্ড বড় এবং তুলনায় দরিদ্র অংশের স্বার্থকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। মাত্র কয়েক জনের কায়েমী স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই আন্দোলন চালনা করা হইতেছে।

(১৬) পশ্চিম বঙ্গে হিন্দু রাষ্ট্রগঠনের দাবি পাকিস্থান দাবিকেই সমর্থন করে। উভয় প্রস্তাব জাতীয়তাবিরোধী এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে ক্ষতিকর। এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে গমন বাস্তবতার দিক হইতে সম্ভবপর নয়। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট মাতৃভূমি দাবি মরীচিকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের যুক্তি এইরূপ:

(১৭) বাংলাকে ভাগ করা হইবে কি না এই ভুয়া সমস্যা লইয়া জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিচ্ছেদের লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

(১৮) বঙ্গ ভঙ্গের পক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলন দ্বারা জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হইবে এবং মুসলিম লীগের প্রভুদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

(১৯) নোয়াখালীর ধ্বংসকার্য সত্ত্বেও বাংলার বৃহত্তর অংশের হিন্দুরা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত একত্র শান্তিতে বসবাস করিতে সক্ষম হইয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোকই ইহা চায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুরা আজ মুসলিম অত্যাচারে জর্জরিত বলে কহিতেছে। নোয়াখালী এই পৈশাচিক ঘটনার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

উত্তর হিসাবে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। সেগুলি নম্বর অনুযায়ী দেওয়া গেল।

(১) পশ্চিম বঙ্গের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাংলার হিন্দুর প্রধান অংশ রক্ষা পাইবে। ইহাতে অন্য অংশকে সাহায্য করার ক্ষমতাও স্বাধীন অংশের বাড়িবে। রক্ষার অন্য কোনও ব্যবস্থা এ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই, কথায় আরম্ভ ও কথায় শেষ হইয়াছে।

(২) যে সকল অঞ্চল পাকিস্থানে যাইতে ইচ্ছা করে তাহাদের বাধা দেওয়ার বা নিবৃত্ত করার উপায় কিছুই দেখানো হয় নাই, চেষ্টা তো দূরের কথা। বঙ্গ বিভাগে বরঞ্চ খানিক অংশ পাকিস্থান হইতে বাঁচিয়া যাইবে এবং বঙ্গভঙ্গের নির্দিষ্ট পথ রহিয়াছে, অন্য দিকে আছে ভুয়া কথা।

(৩) স্বাধীনতালাভের চেষ্টা অবসাদ ও আত্মবিশ্বাসের অভাবের পরিচায়ক ইহা অতি অদ্ভুত যুক্তি। পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদিগের নিজের জীবন ও নিজের সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার অধিকার আছে এ কথা বোধ হয় দত্ত মহাশয়ের দলস্থ লোকে বিশ্বাস করেন না।

(৪) ইহাও কূটতর্কের ফাঁকির এক দৃষ্টান্ত। "সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় জীবনে একটি ঘটনা মাত্র"। কত বড় ঘটনা এবং তাহার দ্বারা বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ কি ভাবে বিপন্ন তাহা কি কাহাকেও বুঝাইতে হইবে? সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এক পক্ষের মধ্যে বাড়িয়াই চলিয়াছে ইহা ত বাস্তব সত্য। সেই বিদ্বেষ নিবারণের পথ এ পর্যন্ত দেখাইতে কেহই পারেন নাই। "অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে" ইহা সত্য, কিন্তু "ইহার কার্য সুরু হইয়াছে" ইহা সত্য নহে। বঙ্গ বিভাগ উক্ত রাজনৈতিক পথ।

(৫) ইহা সম্পূর্ণ ভুল। হিন্দু সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের কথা বহুদূরে থাক, অস্তিত্বনাশের চেষ্টা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং দ্রুতবেগে আরও অগ্রসর হইতেছে ইহা অস্বীকার করা সম্ভব নহে এবং সে চেষ্টা করিতেছে যাহারা তাহাদের কবল হইতে কিছু অংশের বাঁচিবার চেষ্টাই বঙ্গ বিভাগে করা হইতেছে। বাঙালী হিন্দু সাধারণ সর্বস্বান্ত হইয়া গেলে—কয়েকজন হিন্দু চোরাকারবারী বা লীগের ও ব্রিটিশ সরকারের চাটুকার বাদে—বাংলার "অর্থনৈতিক ঐক্য" কাহার ভোগে আসিবে?

(৬) "সম্পংশালী বর্ণহিন্দুগণ" কি বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বহুপূর্ব হইতে "দরিদ্র তপশীলী ও বর্ণহিন্দুদের তাহাদের অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দিয়া পশ্চিম বঙ্গে" দলে দলে চলিয়া আসেন নাই? এ যুক্তি কি করিয়া লোক সমাজে উপস্থিত করা হয় তাহাই আশ্চর্য।

(৭) সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ১৯৪১ সালে ছিল ১,৫৯,৬০,৪০২। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা যোগ করিলে হয় ১,৭১,৬৮,৬৯৯। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা উক্ত দুই জেলা বাদ দিলে হয়, ১,০১,৩২,১৯২। উক্ত দুই জেলা যোগ করিলে হয় প্রায় ১,১৪,০০,০০০। সুতরাং প্রস্তাবিত পশ্চিম বঙ্গে দেড়গুণের বহু অধিক বাঙালী হিন্দু

থাকিবে। এই মিথ্যা যুক্তির শেষ আরও অপরূপ। যদি সমান সমানই হইত তবে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু স্বাধীনতা পাইবে না কেন? স্বাধীনতা কি গবর্ণেমেন্টের কন্ট্রাক্ট না কারবারের হিস্যা?

(৮) এই অপরূপ যুক্তির আলোচনাই বৃথা। "সুস্থ ও সবল জাতি গঠনের প্রচেষ্টা" কোন কল্পনা রাজ্যের ধূম্রজালে আবৃত আছে, তাহার বাস্তব জগতে কোনও চিহ্নই নাই, অথচ তাহার জন্য পশ্চিম বঙ্গকে দাসখত লিখিতে হইবে। বরঞ্চ প্রস্তাবিত বিভাগে বাঙালী জাতীয়তাবাদীর শতকরা ৬০ ভাগ লীগের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া "সুস্থ ও সবল জাতি গঠন" করিবার সুযোগ পাইবে।

(৯) এই যুক্তিও বাজে তর্কের সামিল। পশ্চিম বঙ্গ পৃথক হইতে চাহিলে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্র তাহাকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে। ইহার স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। অন্য সকল বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের বর্তমানে ক্ষমতার অভাব। স্বাধীনতা পাইলে সে ক্ষমতা আসিতে পারে।

(১০) উত্তম কথা। কিন্তু পথ ও উপায় কি? এবং ঐ চেষ্টার সাফল্যের আশা বর্ত্তমানে কতটা? হিন্দুর "নাগরিক অধিকার দাবী ও ভোগ করিবার ক্ষমতা" কতটুকু বাকী আছে? সব শেষ হইয়া গেলে এবং যে পথ এখন খোলা আছে তাহাও হারাইয়া ফেলিলে তখন কি হইবে?

(১১) আমরা ভবিষ্যৎ বক্তা নহি। তবে যে ভাবে এই তর্কবাগীশগণ সমস্ত দেশকে অকূল পাথারে ভাসাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে আমরা বলিতে বাধ্য যে বঙ্গবিভাগ না হইলে ঐ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র লীগের কর্ণধারগণ দিতে পারিবেন। বাঙালী হিন্দুর এখনও কোনও কথা প্রায় গ্রাহ্য হইতেছে না, তখন একেবারেই হইবে না।

(১২) ইহা মিথ্যা কথা এবং যাঁহারা একথা বলিতেছেন তাঁহাদের লজ্জা হওয়া উচিত যে অন্যের অনিষ্ট করার জন্য তাঁহারা এরূপ মিথ্যা যুক্তির অবতারণা করিতেছেন।

(১৩) ইহাও ভয়জনিত তর্ক। বর্ত্তমানে বাস্তব অস্তিত্ব থাকে কিনা সন্দেহ, সে স্থলে ভবিষ্যতের কাল্পনিক অবস্থার ভয় বিবেচনার অভাবের লক্ষণ।

(১৪) ঐতিহাসিক তর্ক করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু সহজ কথা এই যে পশ্চিম বঙ্গের লোক কোন পথে যাইবে সে কথা বলিবার অধিকার একমাত্র পশ্চিম বঙ্গবাসীদের আছে।

(১৫) ইহাও মিথ্যা কথা। (১২)নং যুক্তির উত্তর দেখুন।

(১৬) তর্কের খাতিরে বলা যায় যে লীগ দল মরীচিকাকে প্রায় বাস্তবে আনিয়াছে। তবে ইহা সহজ উত্তর যে এই বিভাগ সাম্প্রদায়িক হিসাবে হইতেছে না, হইতেছে জাতীয়তাবাদ ও যুক্তরাষ্ট্র সমর্থনের হিসাবে। সুতরাং এই প্রস্তাব পাকিস্থান বিরোধী।

(১৭) ইহা অন্নমাত্রায় ঠিক কিন্তু সেইজন্য কি পশ্চিম বঙ্গ দাসত্ব বরণ করিবে?

(১৮) ইহা সম্পূর্ণ বিবেচনাহীন বাজে যুক্তি।

(১৯) বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া শুধু কল্পনার ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে কি হয় এই যুক্তি তাহার এক দৃষ্টান্ত।

বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বক্তব্য

পাবনা হিমায়েতপুরে এক সভায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলেন, "কিছু লোকের ইচ্ছা যে বাংলা বিভক্ত হওয়া উচিত। দেশের এক শ্রেণীর লোক—দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা পেন্সন ভোগী ও বিলাসীর দল—সাধারণ বাঙালীর মনোভাবের কোন খবরই রাখেন না। তাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই বাংলাকে ভাগ করিতে চাহেন।" বৃহত্তর বাংলা ও বৃহত্তর ভারত গঠনই নেতাজীর কাম্য ছিল এই কথা বলিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলেন যে তিনি নিজেও শ্রীহট্ট, সিংভূম, মানভূম ও পূর্ণিয়া প্রভৃতি বাংলা ভাষাভাষী জেলাসমূহ বাংলার সহিত যুক্ত করিতে চাহেন। তিনি এই বলিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেন যে এই মনোরম বঙ্গদেশকে ভাগ করিবার জন্য যদি কোন চেষ্টা হয় তবে আবার এক শক্তিশালী আন্দোলন সুরু হইবে এবং সকল শ্রেণীর লোকই এই আন্দোলনে যোগ দিবেন। সর্বশেষে তিনি বলেন, "আমরা সকলেই বাঙালী। পশ্চিম ও পূর্ব বঙ্গের অধিবাসীরা সম্মিলিত ভাবেই বসবাস করিবেন। যাঁহারা একসঙ্গে বসবাস করিতে চাহেন না তাঁহারা যেন পিঁজরাপোলে চলিয়া যান। বাংলা কিম্বা ভারত বিভক্ত হউক ইহা আমরা চাই না।"

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মন্তব্য সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা চলে। কিন্তু আমরা এখন কেবলমাত্র তাঁহাকে কিছু অনুরোধ করিয়া ঐ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ শেষ করিব। বসু মহাশয় সম্প্রতি কিছু দিন এক দল অনুচরের কথাই শুনিতেছেন এবং তাহাদেরই পরামর্শে চলিতেছেন। ইহার ফল শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই। বাংলার ভাগ্য নির্ণয়ের এখন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। পশ্চিম বঙ্গে ও উত্তর বঙ্গের অংশবিশেষে স্বাধীনতার পতাকা উড়াইবার সুযোগ দেখা দিয়াছে। যাহারা ছলে, বলে বা কৌশলে এ বিষয়ে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা শুধু পশ্চিম বঙ্গের নহে, সমস্ত বাঙালী হিন্দুর শত্রু। এই শত্রুতা বিশেষে অসূয়াপ্রসূত, কিছু ভয়জনিত এবং কিছু বিবেচনা বুদ্ধির অভাবজনিত। কারণ যাহাই হউক এই সুযোগ হারাইয়া সমস্ত বাঙালী যদি দাসত্বে নিমজ্জিত হয়, তবে ইতিহাস বলিবে যে পরশ্রী-কাতর, হিংসা বিদ্বেষপরায়ণ, নির্বোধ বাঙালী জাতি কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক চক্রান্তকারীর ফাঁদে পড়িয়া সোনার সুযোগের সময় বাক্‌যুদ্ধে কাটাইল। বসু মহাশয়কে অনুরোধ এই যে তিনি উপযুক্ত লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া সুবিবেচনার সহিত কার্য্যক্রম আরম্ভ করুন। যাহারা তাঁহাকে বুঝাইয়াছে যে এই বঙ্গ-বিভাগ প্রস্তাব আসিয়াছে কেবলমাত্র পেন্সনভোগী

বিলাসীদিগের নিকট হইতে, তাহারা যে কত বড় মিথ্যাবাদী তাহা তিনি অল্প অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন। তিনি নেতাজীর নাম করিয়া বৃহত্তর বঙ্গের কথা বলিয়াছেন। নেতাজীর সাহস, আত্মবলিদান, কার্যক্ষমতা ও অনাসক্তির সহস্র ভাগের এক ভাগও আছে এইরূপ কে আছে আজ বাংলাদেশে যে ঐ উদ্দেশ্য সফল করিবে? বৃহত্তর বাংলা একত্র ও স্বাধীন না হইলে সারা বাংলাদেশে স্বাধীনতার আলো প্রবেশ করিতে পারিবে না, এ কথা স্বাধীনতার জলন্ত পাবকের প্রতীক যে নেতাজী, তাঁহার মনে স্থান মাত্র পাইতে পারিত কি? পশ্চিম বঙ্গ স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রে সংযুক্ত হইলে নেতাজীর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পথই পরিষ্কার হয় কিনা একথা শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু বিচার করিয়া দেখুন।

বাংলা বিভাগ সম্বন্ধে সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরুর অভিমত

কেন্দ্রীয় পরিষদের বাংলার সদস্যগণ সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ গবর্ণেণ্টের সাম্প্রতিক ঘোষণার ফলে বাংলার হিন্দুদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাঁহারা তৎসম্পর্কে আলোচনা করেন।

আলোচনাকালে সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরু এই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতের নূতন বড়লাট আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমতা হস্তান্তর কার্য আরম্ভ হইয়া যাইবে। এক্ষণে বাংলার জাতীয়তাবাদীদিগকে স্থির করিতে হইবে যে, তাঁহারা "সাম্প্রদায়িক সরকারে"র অধীনেই থাকিবেন, না অন্যান্য কংগ্রেস প্রদেশের মত শক্তিশালী কেন্দ্রে যোগ দিবেন।

কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বলেন, প্রয়োজন হইলে বাংলাকে দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভাগ করা যাইবে এবং ইহাতে কোন কিছুই বাধার সৃষ্টি করিবে না, আমরা এ বিষয়ে পূর্ণ আশ্বাস পাইয়াছি। কংগ্রেস আশা করেন যে, বাংলার দুইটি প্রদেশই কেন্দ্রে যোগ দিবে। তবে লীগ গণ-পরিষদে যোগ না দেওয়ার দরুণ উহা যদি সম্ভব না হইয়া উঠে তবে পশ্চিম বঙ্গ অবশ্যই কেন্দ্রে যোগ দিবে।

বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারদের বিবৃতি

কলিকাতা হাইকোর্টের পঞ্চাশ জন ব্যারিষ্টার বঙ্গ-বিভাগের দাবি জানাইয়া এবং উহার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে:—সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমান অঞ্চলে একটি প্রদেশ গঠনের জন্য যে আন্দোলন চলিতেছে, আমরা তাহা সমর্থন করিতেছি। আমরা যে সকল কারণে এই দাবি সমর্থন করিতে বাধ্য হইতেছি তাহা এই:—(১) আমরা জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের আদর্শে একটি রাষ্ট্রগঠন করিতে চাই। এই রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার (প্রত্যেকের একটি করিয়া ভোট) ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের পূর্ণ রক্ষা-ব্যবস্থা থাকিবে এবং প্রত্যেক নাগরিক চিন্তা ও পূজার্চনায় পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে; (২) একটি শক্তিশালী ও জাতীয়তাবাদী বাংলা প্রদেশ গঠিত হইলেই পূর্ববঙ্গের অত্যাচরিত সংখ্যালঘিষ্ঠদের কার্যকরী রক্ষা-ব্যবস্থা হইবে; (৩) অন্যান্য বিষয়ের সহিত সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার বিলোপসাধন, একটি জাতীয় মন্ত্রীসভা গঠন, অধিকন্তু সরকারী চাকুরী এবং শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতে সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদের জন্য আমরা যে ন্যায়সঙ্গত দাবি জানাইয়া আসিতেছি, মুসলিম লীগ তাহাতে কর্ণপাত করিতে রাজী নয়; (৪) যে সাম্প্রদায়িক গবর্ণেণ্ট আমাদিগকে পঙ্গু ও ধ্বংস করিতে চায় আমরা তাহাদিগকে কর দিতে রাজী নই। অধিকন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের কাঠামো ধ্বংস করাই যে সাম্প্রদায়িক আইনের লক্ষ্য আমরা তাহা বন্ধ করিতে চাই; (৫) আমরা বাংলার বর্তমান গবর্ণেণ্টকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোর বিরোধী; (৬) পাকিস্থানে আমাদের বিশ্বাস নাই; কাজেই কোনও আকারে আমাদের উপর উহা চাপাইয়া দেওয়া হইলে আমরা উহার প্রতিরোধ করিব। আমরা স্বেচ্ছায় সর্বভারতীয় ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে থাকিবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ; (৭) আমরা বাংলার সংস্কৃতি এবং বাংলার মহাপ্রাণ সন্তানদের ত্যাগ ও সেবার দ্বারা যে সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা রক্ষা করিতে চাই; (৮) আমরা আমাদের মাতৃভূমিতে ক্রীতদাসের ন্যায় বাস করিতে চাই না। আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার হিসাবে স্বাধীনতার দাবী জানাইতেছি। আমরা এক দাসত্বের বিনিময়ে অন্য দাসত্ব চাই না।

বাংলায় আবার অন্নকষ্টের আশঙ্কা

বাংলার নানাস্থানে এখন হইতেই এমন ভাবে চাউলের দর বাড়িতে সুরু হইয়াছে যে লোকের মনে আবার গুরুতর অন্নকষ্টের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। নোয়াখালী, ফরিদপুর প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের ঘাট্‌তি জেলায় স্থানে স্থানে চাউলের অভাব এত তীব্র হইয়াছে যে দরিদ্রদের ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের পক্ষে চাউল সংগ্রহ দুঃসহ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। বাংলার লীগ মন্ত্রীরা এই মূল্য বৃদ্ধির নানাবিধ ব্যাখ্যা করিয়া অবস্থার গুরুত্ব লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। গ্রাম-গ্রামান্তরে ফিরিয়া জনসাধারণের সেবকগণ যে বিবরণ দিতেছেন এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে চাউলের মূল্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে লোকে তাহাই বিশ্বাস করিবে, না মন্ত্রীদের ফাঁকা কথায় আস্থা স্থাপন করিবে? সাংবাদিক বৈঠকে সিভিল সাপ্লাই কমিশনার মিঃ এস. এন. রায় বলেন,

বাংলার চাউল যাহাতে বাংলার বাহিরে চলিয়া যাইতে না পারে বা উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে ঘাট্‌তি অঞ্চলে চোরাই ভাবে না যাইতে পারে, তাহার জন্য পাহারা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দুইটি উপায়ে গবর্ণেণ্ট মুশকিল হইতে আসান পাইতে পারেন। একটি হইতেছে সমগ্র বাংলা দেশটাতেই চাউলের বরাদ্দ-প্রথা প্রবর্তন করা এবং মজুতদারদিগকে চাউল বিক্রয় করিতে বাধ্য করা। দ্বিতীয় উপায়টি হইতেছে যেখানে চাউলের টান পড়িবে সেখানেই দ্রুত চাউল পাঠাইয়া দেওয়া এবং বেশী দামে যাহারা বিক্রয় করে তাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কম দামে বিক্রয় করা। তবেই প্রতিযোগীরা দাম কমাইতে বাধ্য হইবে।

বাংলার লীগ সরকারের অকর্মণ্য ও অপদার্থ কর্মচারী বাহিনী লইয়া প্রথমটা করা অসম্ভব এবং করিলে উহা এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে দারুণ নিপীড়নের যন্ত্র হইয়া উঠিবে ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ বিশেষ নাই। তদপেক্ষা দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করা অনেক সহজ এবং ইহাতে হাতে হাতে ফল ফলিবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। ময়মনসিংহে মাস খানেক আগে চোরাকারবারীদের সমবেত চেষ্টায় চাউলের দর বাড়াইয়া তোলা হইয়াছিল। তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নূরন্নবী চৌধুরী তাহাদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করেন। কলিকাতা হইতে চাউল আনাইয়া তিনি নিয়ন্ত্রিত দরে নিজের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে বিক্রয় আরম্ভ করিবামাত্র চোরাকারবারীরা ভীত হইয়া সস্তায় চাউল বাজারে ছাড়িতে আরম্ভ করে। এই ধরণের কর্তব্যপরায়ণ ও প্রজাদরদী লোককে দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখা লীগ সরকারের ইচ্ছা নহে, সুতরাং অল্প দিনের মধ্যে চৌধুরী সাহেবকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নূতন আইন ও সাম্প্রদায়িকতা

বাজেটে সাম্প্রদায়িক স্বার্থে বেশী বেশী টাকা বরাদ্দ করিয়া এবং সিভিল সাপ্লাইয়ের মারফত পুরনো ও সুপরিচিত ব্যবসায়ীদের অসুবিধায় ফেলিয়া সাম্প্রদায়িক কারণে নূতন ভুঁইফোঁড়দের দরাজ হাতে লাইসেন্স দিয়া পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার কাজ চলিতেছে। শাসন বিভাগে, বিচার বিভাগে, রেশন ও সরবরাহ বিভাগে, শিক্ষা বিভাগের উচ্চতম পদগুলিতে মুসলমান নিয়োগ অনেক দিন হইতেই এমন ভাবে চলিতেছে যেন বাঙালী হিন্দু কোনক্রমে কোন ক্ষমতাপূর্ণ পদে না থাকিতে পারে। সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীমণ্ডল কায়েম হওয়ার পর হইতে এই কার্য চলিতেছে। শুধু সরকারী বিভাগগুলিতে নয়, কলিকাতা কর্পোরেশনের উপরও লীগ-মন্ত্রীমণ্ডলের ক্ষমতা প্রবল করিবার জন্য আয়োজন হইতেছে। প্রকাশ, বাংলা-সরকার কর্পোরেশন আইন পরিবর্তন করিয়া এমন ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন যাহার ফলে কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি পদে কর্মচারী নিয়োগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা বাংলা-সরকারের হাতে চলিয়া আসিবে। বর্তমান আইনে ঐ সব পদে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা কর্পোরেশনের আছে কিন্তু ঐ নিয়োগ বাংলা-সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ। আইন পরিবর্তন করিয়া লীগ গবর্ণমেণ্ট নিয়োগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজেদের হাতে আনিতে উদ্যত হইয়াছেন। নিম্ন পদগুলিতে কর্মচারী নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ন্যায় একটি কমিশন গঠনেরও প্রস্তাব হইয়াছে। এই আইন পাস হইলে সরকারের উক্ত ক্ষমতা কর্পোরেশন ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উপরেও বর্তিবে। কলিকাতায় এবং শহরগুলিতে লীগের ক্রট মেজরিটি নাই বলিয়া কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ করায়ত্ত করিবার জন্য এই আয়োজন।

বাংলার লীগের অভিধানে এখন আর চক্ষু লজ্জার লেশমাত্র নাই। বাংলায় পরিপূর্ণ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় লীগ কোন সময়েই গোপন করে নাই এবং পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইলে মুসলমান ভিন্ন অপর সকলের অবস্থা কি হইবে তাহা নোয়াখালীতে দেখাইয়াও দেওয়া হইয়াছে। বাংলার সাম্প্রদায়িক অনুপাত সমগ্র প্রদেশের হিসাবে বেশী হইলেও পশ্চিম বঙ্গে এবং উত্তর বঙ্গের পশ্চিম ভাগে হিন্দুর অনুপাত অনেক বেশী। মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু পূর্ববঙ্গে এবং উত্তর বঙ্গের পূর্বভাগে। পূর্ববঙ্গের ক্রট মেজরিটির জোরে হিন্দুপ্রধান পশ্চিম বঙ্গে কি ভাবে লীগ-প্রভুত্ব কায়েম করিবার চেষ্টা চলিতেছে তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা দরকার। কলিকাতা, পশ্চিম বঙ্গ এবং উত্তর বঙ্গের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি গ্রাস করিবার চেষ্টা লীগ প্রকাশ্যেই করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতার পুলিস বিভাগ কি ভাবে দখল করা হইয়াছে তাহার পরিচয় আমরা দিয়াছি। ইহার পর আরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অভিযোগের তদন্তের ভার কলিকাতায় সাত জন ডিভিসনাল ইন্‌স্পেক্টরের উপর ন্যস্ত আছে, ইঁহাদের এক এক জনের অধীনে তিনটি বা চারিটি করিয়া থানা থাকে। ইঁহাদের মধ্যে এখন ছয় জন মুসলমান এবং এক জন মাত্র হিন্দু। শেষোক্ত ইন্‌স্পেক্টরের অধীনে আছে মাত্র ২টি থানা, অবশিষ্ট ২৩টি থানা মুসলিম ইন্‌স্পেক্টরদের হাতে। জেলা দুইটির ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনারদ্বয় এখনও মুসলমানই রহিয়াছেন। এবং ইঁহাদেরই উপরে সমস্ত থানা পরিচালনের চরম দায়িত্ব অর্পিত আছে। থানাগুলির অর্দ্ধেকের বেশীতে মুসলমান অফিসার-ইন্-চার্জ মোতায়েন করা হইয়াছে। ইঁহাদিগকে মুসলমান না বলিয়া পাকিস্থানী সৈনিক বলাই অধিকতর সঙ্গত, কারণ দেখা গিয়াছে যে কোন মুসলমান কর্মচারী সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিবেক বিসর্জন দিতে না চাহিলে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে সরাইয়া দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষা বিভাগ গ্রাস করিয়া কিভাবে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগকে উর্দু-মিশ্রিত খিচুড়ী বাংলা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কেমন করিয়া তাহাদিগকে মোল্লা-শ্রেণীর শিক্ষকদের নিকট হইতে হিন্দুধর্ম শিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইতেছে তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পাস করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পঙ্গু করিবার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি দখল করিবার আয়োজন দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে। সমগ্র শাসনযন্ত্র লীগের কবলে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে তিন-চারিটির বেশী বাঙালী হিন্দু নাই। জেলা বোর্ডগুলিও লীগের কবলে। নূতন একটি আইন করিয়া জেলা-বোর্ড নির্বাচনের বর্তমান যৌথ নির্বাচন ভাঙিয়া সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনের

চেষ্টা হইতেছে। এখনই ঐগুলি লীগের এক একটি ঘাঁটি, সকলের টাকায় কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে নলকূপ বসানো, রাস্তা মেরামত প্রভৃতি তো এখনই চলিয়াছে, এই আইন পাস হইলে মুসলমান প্রধান জেলাগুলিতে করের কড়ি গুনিয়া দিয়া পড়িয়া পড়িয়া মার খাওয়া ছাড়া হিন্দুর আর কোনই কাজ থাকিবে না। জেলা-বোর্ডের উপর সরকারের প্রাধান্য যথেষ্ট, ভবিষ্যতে উহা বাড়িবে বই কমিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। যেখানে নির্বাচনের দ্বারা চেয়ারম্যানের পদে লীগওয়ালা বসিবার সম্ভাবনা নাই সেখানে জেলা-বোর্ড নির্বাচন বন্ধ রাখিয়া সরকার কর্তৃক মনোনীত পাকিস্থানী চেয়ারম্যানের হাতে বোর্ডের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত কিছু নূতন নয়। বিচার বিভাগেও এই অবস্থা ক্রমশঃ আসিতেছে। কলিকাতার ছোট আদালতের সব কয়জন জজই মুসলমান, এক জন মাত্র তপশীলী হিন্দু। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদেও ইংরেজ ও মুসলমানেরই প্রাধান্য, বাঙালী হিন্দুর স্থান নাই।

শাসন বিভাগের উচ্চপদে নিয়োগে বাঙালী হিন্দুর বিরোধিতা আরও একটি ব্যাপারে সম্প্রতি প্রকট হইয়াছে। নূতন দুই জন বিভাগীয় কমিশনার কয়েক দিন আগে নিযুক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে একজন মাদ্রাজী অপর জন ইংরেজ। দুই জনেরই উপরে কয়েকজন বাঙালী হিন্দু সিভিলিয়ান রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের দাবি অতিক্রম করিয়া তালিকার নীচের দিক হইতে এই দুই জনকে বসাইবার একমাত্র এই অর্থই হইতে পারে যে মুসলমান যদি না পাওয়া যায় তবে বাঙালী হিন্দু ভিন্ন আর যাহাকে হউক নিযুক্ত করা চলে।

উচ্চপদে মুসলমান নিয়োগে আমাদের আপত্তি ইহা সত্য নহে। যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করিয়া উপযুক্ত মুসলমান কর্মচারী নিযুক্ত করিলে আমরা আপত্তি করিতাম না। নিছক সাম্প্রদায়িক কারণে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সুবিধার জন্য অযোগ্য কর্মচারী নিয়োগের আমরা ঘোর বিরোধী। কারণ অযোগ্য লোকের পক্ষে উচ্চপদে বহাল থাকিতে হইলে উপরওয়ালার তোষামোদ ভিন্ন অন্য উপায় নাই, এবং এই সুযোগে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠায় অভিলাষী মন্ত্রীরা ইহাদের দ্বারা বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করাইয়া লইতে অসুবিধা বোধ করেন না। নিরপেক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ মুসলমান কর্মচারীর উপরেও যে শাসন কার্যের ভার দিয়া মন্ত্রীরা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নূরন্নবী চৌধুরীর অপসারণ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকায় মুসলিম কর্মচারী দেওয়া হইতেছে—কারণ উহা তো মুসলমানেরই এলাকা। কোন হিন্দু কর্মচারী এরূপ স্থলে কোন কারণে মোতায়েন হইলে স্থানীয় লীগ হইতে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সরাইবার দাবি উঠে এবং লীগ মন্ত্রীরাও বদলীর আদেশ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। হিন্দু প্রধান এলাকাতেও লীগ-মার্কা কর্মচারী বাড়ানো হইতেছে, কারণ সেখানে মুসলিম মাইনরিটির স্বার্থরক্ষা করিতে হইবে। গাছেরও খাইব, তলারও কুড়াইব, কিন্তু গাছে উঠিবার পরিশ্রম তো করিবই না বরং অপরকে দিয়া ফল পাড়াইয়া লইব—লীগের এই নীতি বাংলাদেশের কেন, ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রশ্রয় পাইয়া মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম বাংলার জেলাগুলিতে ম্যাজিষ্ট্রেট, সিভিল সাপ্লাই অফিসার, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, দারোগা, এমনকি সরকারী স্কুল-মাষ্টারদের মধ্যেও মুসলমানের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে।

জাতীয়তাবাদী বাঙালীর মেরুদণ্ড ভাঙিবার জন্য তাহাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয়ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করা হইতেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিকৃত করিয়া তাহাকে গোড়া হইতেই দেহে ও মনে পঙ্গু করিবারও চেষ্টা হইতেছে। ইহাই পাকিস্থানী অভিযানের মূল মন্ত্র। ইংরেজ শাসনের প্রাক্কালে যে সতর্কতার সহিত বাংলার শিক্ষা বিভাগ ইংরেজ নিজের কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছিল, আজ লীগও ঠিক তাহাই করিতেছে। যে কারণে ইংরেজ সেদিন পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, স্কুলের স্থান ও সংখ্যা নির্ণয় প্রভৃতি ব্যাপারে তেজ দৃষ্টি রাখিত, সরকারী অর্থ সাহায্যের প্যাঁচে ও পরিদর্শনের চোটে স্কুলে কোনরূপ স্বদেশপ্রেম প্রচার অসম্ভব করিয়া তুলিত, ঠিক সেই কারণে এবং সেই ভাবে লীগ আজ শিক্ষা-সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই অবস্থা আর দশ বৎসর চলিতে দিলে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের যে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে নেতারা আজও তাহা উপলব্ধি করিবার সময় পান নাই। ইংরেজের আক্রমণের জের অপেক্ষা লীগের আক্রমণ অনেক বেশী ব্যাপক, উহার ফলও অনেক বেশী সুদূরপ্রসারী হইতে বাধ্য। কেননা এই আক্রমণের গোড়ায় ইংরেজের কূটবুদ্ধি, জোর, মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সহায়ক বাঙালী হিন্দুর নিদারুণ বুদ্ধির অভাব।

বৈষয়িক ক্ষেত্রে বাঙালীকে কিভাবে পঙ্গু করিয়া আনা হইতেছে তাহা তো সর্বত্র দৃশ্যমান। কন্ট্রোলের বেড়াজালে পড়িয়া প্রতিটি মানুষ চাউল, আটা, তেল, চিনি, কাপড়, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের জন্য হায় হায় করিয়া ঘুরিতেছে। মানুষের সকল শক্তি আজ অর্থোপার্জনে এবং প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসংগ্রহে নিঃশেষ হইতেছে। দেশের কাজে মন দিবার সময় খুব কম লোকেরই আছে। তার উপর পারমিট বিতরণের কৌশলের দ্বারা হিন্দু ব্যবসায়ীদের পিষিয়া মারিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। লাইসেন্স, পারমিট প্রভৃতি ভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য অসম্ভব করিয়া রাখিয়া সকল ব্যবসায়ীকে লীগের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখা হইয়াছে। পারমিট বিতরণ চলিতেছে সাম্প্রদায়িক কারণে ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। আমরা শুনিতেছি যে নারিকেল তৈলের পারমিট সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিতরণ সুরু হইয়াছে এবং মোট তেলের শতকরা ৬০ ভাগ মুসলমান এবং ৪০ ভাগ হিন্দু ব্যবসায়ীদের দেওয়া

হইতেছে। কোন্ ব্যবসায়ীর চাহিদা কত অথবা কে কি কার্যে উহা ব্যবহার করিবে তাহার কোন সন্ধান না লইয়াই শুধু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে তেলের পারমিট বিলি করার আয়োজন হইতেছে। ভারত-সরকার স্টীল কণ্ট্রোল তুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু বাংলা-সরকার উহা বজায় রাখিয়া উহাকেই লোহার ব্যবসা হইতে বাঙালী বিতাড়নের যন্ত্রে পরিণত করিয়াছেন। পুরান ব্যবসায়ীদের পক্ষে লোহা পাওয়া দুঃসাধ্য, কিন্তু ভুঁইফোঁড় নূতন ব্যবসায়ীদের নিকট সাম্প্রদায়িক কারণে উহা সহজলভ্য। মফঃস্বলের লোকের পক্ষে ঢেউ-টিন একান্ত প্রয়োজন। উহারও বিলি-ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক কারণে এমন ভাবে কণ্ট্রোলের যন্ত্র-ঝাঁটুনির মধ্যে আনিয়া ফেলা হইয়াছে যে এক দলের নিকট উহা অপ্রাপ্য, অপর শ্রেণীর নিকট সহজলভ্য। মফঃস্বলে কাপড়, চিনি, কেরোসিন তেল প্রভৃতির বিলি-ব্যবস্থাতেও এই একই অবস্থা। লীগের লোকের অনুমোদন ভিন্ন কাহারও পক্ষে ঐ সব দ্রব্য সংগ্রহ করা সহজ নহে। নূতন ব্যবসা অসম্ভব করিয়া তুলিয়া এবার নজর পড়িয়াছে পুরান ব্যবসার দিকে। নারিকেল তেলের লাইসেন্স দেওয়ার নূতন নিয়মটা ইহারই পরিণতি, শোনা যাইতেছে কাগজের পারমিট সম্বন্ধেও ঐ একই ব্যবস্থা হইতেছে, মুসলমান কাগজ বা পুস্তক ব্যবসায়ীর সংখ্যানুপাত ব্যবসা ক্ষেত্রে পাঁচই হউক আর দশই হউক তাহারা মোট কাগজের ষ্টকের শতকরা ৬০ ভাগ পাইবে এবং হিন্দু পাইবে ৪০ ভাগ। বাংলাদেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বোধ হয় শতকরা ২০ ভাগের বেশী মুসলমান নহে, তৎসত্ত্বেও তাহাদের জন্য ৬০ ভাগ কাগজ বরাদ্দ করিবার অর্থ মুসলমানের উন্নতি নয়, কারণ শুধু বেশী করিয়া কতকগুলি কাগজ পাইলেই কেহ রাতারাতি শিক্ষিত হইয়া উঠিতে পারে নাই, উহার আসল অর্থ হিন্দুকে বঞ্চিত করা। চোরা-বাজারে কাগজ কিনিতে হইলেও দালালীর টাকাটা যাহাতে লীগওয়ালাদের পকেটে আসে তাহার ব্যবস্থা করা। পুরানো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সব কর্মচারী কাজ করে তার অর্ধেক মুসলমান লওয়ার দাবি উঠিয়াছে, অপরের অর্থে ও রক্তে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ম্যাকডোনাল্ডী ক্রট মেজরিটির জোরে জাতীয় করণের নামে লীগায়ত্ত-করণের দাবিও উঠিয়াছে।

মুসলমান হিন্দু হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র জাতি—এই ধুয়া তুলিয়া যাহারা হিন্দুর সঙ্গে একত্র বাস করিতে চাহে না, যৌথ নির্বাচন আনিয়া লইয়া একসঙ্গে থাকিতে আপত্তি করিয়া নিজের জন্য স্বতন্ত্র পাকিস্থান দাবি করে, বাংলায় মাত্র একসঙ্গে সংখ্যাগুরু বলিয়া তাহারাই অপর অংশের সংখ্যাগুরু হিন্দুর উপর প্রভুত্ব করিতে লালায়িত। পূর্ব বঙ্গের সংখ্যা-গুরুত্বের দাবিতে যাহারা সেখানে পাকিস্থানী শাসন, অর্থনীতি ও শিক্ষা প্রণালী চালু করিয়াছে, পূর্ব বঙ্গের ঐ মেজরিটির জোরেই তাহারা কলিকাতা এবং পশ্চিম-বঙ্গ ও উত্তর-বঙ্গের পশ্চিম ভাগের হিন্দু প্রধান এলাকায় পাকিস্থানী শাসন সম্প্রসারণে উদ্যত। ম্যাকডোনাল্ডী বাঁটোয়ারা-প্রসূত ব্যবস্থা-পরিষদ এই অভিযানের প্রধান অস্ত্র। যে কলিকাতায় হিন্দুর সংখ্যা তিন-চতুর্থাংশেরও বেশী, যেখানে করের শতকরা নব্বই ভাগ দেয় হিন্দু, সেই কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বা চীফ ইঞ্জিনিয়ার কে হইবে তাহা নির্ধারিত হইবে লীগ-পূর্ব বঙ্গের ক্রট মেজরিটির জোরে। মুসলমান যদি নিজেকে হিন্দু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বিশ্বাস করে এবং সেই যুক্তিতে যদি হিন্দুর সঙ্গে হিন্দু সংখ্যাগুরু প্রদেশে হিন্দুর দ্বারা শাসিত হওয়ার ধুয়া তুলিয়া বাস করিতে না চায়, তবে বাংলার একাংশে মাথা গুনতির জোরে অপর অংশের হিন্দুদের সকল অধিকার হরণ করিয়া হিন্দু-অধ্যুষিত জেলাগুলি পর্যন্ত গ্রাস করিবার চেষ্টা করে কোন যুক্তিতে কিসের জোরে? যুক্তির বালাই এখানে নাই, জোর ছিল শুধু পিছনে চার্চিলপন্থী ব্রিটেনের বেয়নেট এবং সেই ভরসাতেই এতদিন এই পাকিস্থানী অভিযান চলিয়াছে। এক দিকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর দমননীতি, অপর দিকে পাকিস্থানী আক্রমণে অভিভূত হইয়া বাঙালী যেন আত্মরক্ষার ক্ষমতা পর্যন্ত হারাইয়া বসিয়াছে। বাঙালীর মুখে আদর্শবাদের যে বুলি আজ শোনা যায় তাহা প্রাণহীন, পুরাতন বুলির পুনরাবৃত্তি মাত্র। ভাবপ্রবণতার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া এক দল এই পরাজয়ের গ্লানি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন, আর এক দল লীগের সহিত মিশিয়া স্বার্থসিদ্ধির সুযোগের সন্ধানে রত আছেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরাজিতের মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছেন এবং যাঁহারা বঙ্গবিভাগের দ্বারা এক দিকে আত্মরক্ষা এবং অপর দিকে লীগের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে পরাজিতের মনোবৃত্তির সন্ধান করিয়া আত্মগ্লানি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহাদের ভুয়া ভাবপ্রবণতার পূর্ণ সুযোগ লইয়া লীগ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতেছে।

বাংলার বাজেট

বাংলার লীগ গবর্মেণ্ট এবার যে বাজেট প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাকে অনায়াসে পাকিস্থানী বাজেট আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ক্ষমতা হাতে পাইলে লীগ যে কি ভাবে সাধারণের অর্থ অপচয় করিতে পারে গত কয়েক বৎসরে তাহা দেখা গিয়াছে, সাম্প্রদায়িক কারণে এবং দলগত পোষ্যপ্রতিপালনের জন্য রাজস্ব ব্যয়ে যে কতদূর বৈষম্যমূলক আচরণ করা সম্ভবপর তাহাও এবার দেখা গেল। যুদ্ধের বৎসর হইতে আজ পর্যন্ত বাংলার আয়ব্যয়ের অবস্থা তুলনা করিলেই পাকিস্থানী বাজেটের মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ ভাবে প্রকট হইবে।

বৎসর	আয়	ব্যয়
১৯৩৯-৪০	১৪,৩১,৬৬,০০০ টাকা	১৩,৭১,২৪,০০০ টাকা
১৯৪০-৪১	১৩,৫৪,৫০,০০০ "	১৪,৪৫,৩৯,০০০ "
১৯৪১-৪২	১৪,৯৪,২৮,০০০ "	১৫,৫০,৩৮,০০০ "

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপানী যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং বাংলাদেশে এ.আর.পি এবং অন্যান্য সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালে স্লিট ট্রেঞ্চ কাটা, নৌকা সরানো, ঝাপ্‌সি ভাতা প্রভৃতির জন্য মোটা মোটা টাকা ব্যয় অথবা অপচয় সুরু হয়। এই বৎসর প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডল কাজ করিতেছিলেন এবং অর্থসচিব ছিলেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আয়ব্যয়ের অবস্থা তাঁহাদের বাজেটে ছিল নিম্নোক্তরূপ :

আয়— ১৬,৪৬,৪২,০০০ টাকা
ব্যয়— ১৬,৭৯,০০,০০০ "

যুদ্ধের এই ডামাডোলের বাজারেও তখন ৩৩ লক্ষ টাকার বেশী ঘাটতির ভয় ছিল না।

পর বৎসর সার জন হার্বার্টের চক্রান্তে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙিয়া যায়। লীগ মন্ত্রিমণ্ডলে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষও আসিয়া পড়ে। এই বৎসর লীগের হাতে রাজকোষ পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি পায় দশ কোটি টাকা। আয়ব্যয় হয় এইরূপ :

আয়— ২৩,৭১,৭২,০০০ টাকা
ব্যয়— ২৬,৭৫,১৮,০০০ "
ঘাটতি— ৩,০৩,৩৬,০০০ "

বাজেটের দোষ ঢাকিবার জন্য এই বৎসরের বাজেটকে "দুর্ভিক্ষের বাজেট" আখ্যা দেওয়া হয় এবং এমন ভাব দেখানো হয় যেন দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্যই বেশী টাকা খরচ হইয়াছে এবং ঘাটতি পড়িয়াছে। অথচ দুর্ভিক্ষে যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ভারত-সরকার মিটাইয়া দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের জন্য প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে নিম্নোক্তরূপ :

খয়রাতি ব্যয়— ৩,২৯,৬১,০০০ টাকা
টেষ্ট-রিলিফ প্রভৃতি—১,১৬,৬৮,০০০
কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতি— ৪৬,৩৩,০০০
মোট— ৪,৯২,৬২,০০০

ইহার মধ্যে তিন কোটি টাকা ভারত-সরকার দিয়াছেন, বাংলা-সরকারকে বহন করিতে হইয়াছে মোট ১,৯২,৬২,০০০ টাকা।

এই বৎসরই চাউলের সরকারী কারবার সুরু হয় এবং এই কার্যে এই বৎসর মোট ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় অথবা লুঠ হয়।

পর বৎসর ১৯৪৪-৪৫ সালও লীগের রাজত্ব। এই বৎসর অক্টোবর মাসে যুদ্ধ শেষ হয়। ব্যয় বৃদ্ধি পায় পূর্ব বৎসরের প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি, দেড় গুণের অনেক বেশী। এই বৎসরে রেশনিং সুরু হয়। বোম্বাইয়ের দৃষ্টান্তে রসদ সরবরাহের ভার লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানদারদের হাতে না দিয়া বিপুল অর্থ ব্যয়ে সরকারী দোকান খোলা হয় এবং উহাদের হাতে রেশন সরবরাহের অর্দ্ধেক ভার দেওয়া হয়। লীগের পোষ্যবৃন্দের চাকুরির সুরাহা করিবার জন্যই বিশেষ ভাবে এই ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। চাউল ও গমের কারবারের নামে ১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা অতল গহ্বরে অদৃশ্য হয়। বাংলা-সরকার পঞ্জাব হইতে সস্তায় গম কিনিয়া চড়া দরে রেশন দোকান মারফত বিক্রয় করিতেছেন এই ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া যাওয়ায় আটার দাম দুই পয়সা কমে বটে, কিন্তু সরকারের খাতায় লোকসান কমে নাই। সস্তায় গম কিনিয়া বেশী দামে বিক্রয় করিয়াও ঐ বৎসর মবলগ ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা লোকসান হয়। চাউলের সরকারী এজেন্টরা একচেটিয়া কারবার এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পূর্ণ সুযোগ লইয়া গ্রামাঞ্চল হইতে অতি সস্তায় চাউল কিনিয়াছেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এইরূপ প্রকাশ্য অভিযোগ হওয়া সত্ত্বেও দেখা গেল বৎসরান্তে চাউলের কারবারে সরকারের মোট ৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে। নৌকা তৈয়ারির নামে আর একটি বিরাট চুরি ও অপচয়ের পথও খুলিয়া দেওয়া হয়। লোকের দুর্দশার সুযোগে লীগের পোষ্যবৃন্দের চাকুরি দেওয়ার যে ব্যবস্থা এ বৎসর হয় পৃথিবীর কোন অসভ্য দেশেও তাহার তুলনা আছে কি না সন্দেহ। এই বৎসর দুর্ভিক্ষের নামে দুর্গতদের ১,২০,০৪,০০০ টাকা খয়রাতি সাহায্য এবং ১২,৪৩,০০০ টাকা টেষ্ট-রিলিফ প্রভৃতিতে ব্যয় হয়, কিন্তু এই খয়রাত করিবার জন্য কেরাণী প্রভৃতির বেতন ও আপিস খরচা ইত্যাদি বাবদ ব্যয় হয় ২,০৯,৬৩,০০০ টাকা। এ বৎসর দুর্ভিক্ষ সাহায্য বাবদ লোক-দেখানো ব্যয় ধরা হয় মোট ৩,৫৩,৬৯,০০০ টাকা এবং এই টাকার ভিতর হইতে ২ কোটি টাকার বেশী বাহির হইয়া যায় পোষ্যদের জন্য। যুদ্ধের জন্য খরচ হয় মোট ১,০৬,২৮,০০০ টাকা। আয়ব্যয়ের অবস্থা ছিল নিম্নোক্ত রূপ :

আয়— ৩৯,৩৯,১৩,০০০ টাকা
ব্যয়— ৪৪,১২,২৭,০০০ "
ঘাটতি— ৪,৭৩,১৪,০০০ "

কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ৭ কোটি টাকা খয়রাৎ পাইয়া লীগ গবর্ণমেন্ট বাঁচিয়া যায়।

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের অবসান ঘটে এবং ৯৩ ধারা অনুসারে পর বৎসর শাসনকার্য চলে। এই এক বৎসরের মধ্যে ঘাটতি ঘুচিয়া একেবারে ৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়া যায়। অপচয় এবারও যথেষ্টই হইয়াছে কিন্তু লীগের হাতে কর্তৃত্ব থাকিলে যতটা হওয়ার কথা ততটা হয় নাই। আয়ব্যয়ের অবস্থা এ বৎসর এইরূপ :

আয়—৪৫,৫৬,২৬,০০০ টাকা
ব্যয়—৪০,৬০,৪৭,০০০ "
উদ্বৃত্ত—৪,৯৫,৭৯,০০০ "

লীগ মন্ত্রীরা এ বৎসর গদীতে ছিলেন না। প্রথমেই দেখা যায় চাউল প্রভৃতির কারবারে লোকসান ১৪ কোটি টাকা হইতে সওয়া দুই কোটিতে নামিয়া আসিয়াছে। নৌকা-বিলাসে এবার ব্যয় হইয়াছে ১,৯২,৮৩,০০০ টাকা। পূর্ব বৎসর মন্ত্রীরা দুর্ভিক্ষে সাহায্য দানের জন্য যে বিরাট কর্মচারী-বাহিনী মোতায়েন করিয়াছিলেন এ বৎসরও তাহা বহাল রাখা হয় এবং দুর্ভিক্ষ সাহায্যে ৭৫,১৪,০০০ টাকা ব্যয় করিবার জন্য কর্মচারী প্রভৃতির বেতন, ভাতা ও আপিস খরচা ইত্যাদিতে ২,১৩,৪৮,০০০ টাকা বাহির হইয়া যায়। এত করিয়াও এবার গত বৎসর অপেক্ষা মোট ব্যয় প্রায় ৪ কোটি টাকা কম হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এ বৎসর দান করেন ৮ কোটি টাকা।

১৯৪৬ সালে মন্ত্রিমণ্ডলে লীগের পুনরাবির্ভাব হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ভাবে আবার ব্যয় বৃদ্ধিও হয়। যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে, যুদ্ধের নামে অপব্যয়ের পথ আর নাই কিন্তু 'রন্ধ্র' আবিষ্কারে দুর্জনের অসুবিধা কখনও হয় নাই। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের নামে এবার বড় বড় বরাদ্দ সুরু হইয়াছে এবং সেই ফাঁকে অপচয় ও চুরির রাস্তাও খোলা রহিয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে বাজেটের অবস্থা এইরূপ :

আয়—৪২,৫০,৫৬,০০০ টাকা
ব্যয়—৫২,২০,৬৯,০০০ "
ঘাটতি—৯,৭০,১৩,০০০ "

এই বৎসর হইতে লীগের কার্য একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়াছে। আপত্তি করিবার কেহ নাই, ভাগ আদায়ের সম্ভাবনাও কম। কাজেই এবার হইতে লোভও হইয়াছে দুর্জয়। আগামী বৎসরের জন্য যে বাজেট দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে লোভ আরও সুস্পষ্ট। উহাতে আয় ব্যয় ধরা হইয়াছে এই ভাবে—

আয়—৪৭,৬৭,৮৯,০০০ টাকা
ব্যয়—৫৩,৮৮,০৩,০০০ "
ঘাটতি—৬,২০,১৪,০০০ "

এ বৎসর পুনর্বসতি প্রভৃতিতে ব্যয় হইবে ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে দুর্ভিক্ষের নামে মোতায়েন কর্মচারীবাহিনী আছে, বিহারে লোক পাঠাইয়া যাহাদিগকে বাংলায় আনা হইয়াছে তাহাদেরও খরচ আছে। চাউল, গম প্রভৃতির কারবারে এবারও যথারীতি ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা লোকসান ধরা হইয়াছে। তবে এবারকার লোকসান অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক কম। অন্য কোন বৎসরেই সওয়া দুই কোটি বা আড়াই কোটি টাকার কম লোকসান হয় নাই, দুর্ভিক্ষের পর বৎসর উহা ১৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছিল। নৌকা-বিলাসে এবারও ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা লোকসান ধরা হইয়াছে। মোট ৪৪৩৫টি নৌকা গবর্মেণ্টের হাতে আছে। ১৯৪৪ সাল হইতে এইগুলিকে ক্রমাগত পুষিয়া রাখিয়া উহাদের তদারকী বাবদ প্রতি বৎসর মোটা টাকা ব্যয় হইতেছে। বেচিয়া ফেলিলে ত আর এই আয়টা থাকে না, কারণ নৌকা তদারকী বিভাগটাই উঠিয়া যায়। নৌকা তদারকীর এবং উহার বিক্রয়লব্ধ আয়ের হিসাব এইরূপ :

তদারকীর ব্যয়—

১৯৪৪-৪৫	৪,০৬,০০০	টাকা
১৯৪৫-৪৬	৩৫,৬৮,০০০	"
১৯৪৬-৪৭	৫৫,৭৭,০০০	"
(সংশোধিত বাজেট)		
১৯৪৭-৪৮	৩০,৭৩,০০০	"
মোট	১,২৬,২৪,০০০	টাকা

সরকারী হিসাবে মনে হয় যে ৪৪৩৫টি নৌকার খবরদারী করিবার জন্য এই টাকাটা খরচ হইয়াছে। এই কার্যে কাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহা বোধ হয় বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

নৌকার বিক্রয়লব্ধ আয়—

১৯৪৫-৪৬ সালে আদায় হইয়াছে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা।

১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে বলা হইয়াছিল নৌকা বিক্রয়ে আয় হইবে ৫২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা কিন্তু সংশোধিত বাজেটে উহা বদলাইয়া করা হইয়াছে ১৬ লক্ষ ৮৪ হাজার। এবারকার বাজেটে বলা হইয়াছে গবর্মেণ্ট আগামী বৎসর ৪২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা আদায়ের আশা রাখেন। বৎসরান্তে একটা সংশোধিত বাজেট খাড়া করা, এবারও উহা কমাইয়া লাখ বারো করা হইবে কি না এবং পর বৎসরের বাজেটে আবার একটা মোটা আদায়ের ভরসা দেখাইয়া ধাঁওতা দেওয়ার চেষ্টা হইবে কি না তাহা এখনও বলা যায় না; তবে কৌশলটা স্পষ্ট। এই হিসাবের সারমর্ম এই যে আজ পর্যন্ত নৌকা বিক্রয়ে প্রকৃত পক্ষে আদায় হইয়াছে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা এবং উহার তদারকীর জন্য ব্যয় হইয়া গিয়াছে ৩৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। ভবিষ্যতে আর কত টাকা আদায় সত্যই হইবে গবর্মেণ্ট তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তদারকী বাবদ যে ৮৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে সেই টাকাটা খরচ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। ১৯৪৬-৪৭ সালের মূল বাজেটে বিক্রয়লব্ধ আয় ৫২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা দেখাইয়া তদারকী ব্যয় ধরা হইয়াছিল ১৪ লক্ষ ৮৮ হাজার কিন্তু সংশোধিত বাজেটে দুইটাই বদলাইয়া আয় কমাইয়া ধরা হইয়াছে ১৬ লক্ষ ৮৪ হাজার এবং তদারকী ব্যয় বাড়াইয়া করা হইয়াছে ৫৫ লক্ষ ৭৭ হাজার। মূল বাজেট লইয়া যে পরিমাণ সমালোচনা হয় সংশোধিত বাজেটে তাহা হয় না, এই সুযোগটি পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, সুতরাং অপচয়ের ব্যাপারে লীগ কর্তাদের দূরদর্শিতা বা পরিকল্পনা নাই এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে না। গবর্মেণ্ট নিজেই বলিতেছেন যে

বর্ত্তমানে নৌকার বাজার এত পড়িয়া গিয়াছে যে সরকারী নৌকা তৈরিতে যে টাকা খরচ হইয়াছে তার এক-চতুর্থাংশের বেশী দাম পাওয়ার আশা নাই, তথাপি একসঙ্গে সমস্তগুলি বেচিয়া ফেলিয়া তদারকী ব্যয় কমাইবার কোন চেষ্টা হইতেছে না। কারণ তাহা করিলে নৌকার খবরদারীর নামে যে পাকিস্থানী বাহিনী মোতায়েন রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে বিদায় দিতে হয়।

যে নৌকা বিক্রয় করিয়া এক-চতুর্থাংশ টাকাও দাম পাওয়া যাইবে না বলিয়া গবর্মেণ্ট নিজেই স্বীকার করিতেছেন তাহা নির্মাণের জন্ত গত বৎসর পর্য্যন্ত কি উৎসাহের সহিত টাকা খরচ হইয়াছে তাহাও দ্রষ্টব্য।

নৌকা তৈরির ব্যয়—

১৯৪৪-৪৫	১০,৪৪,০০০ টাকা
১৯৪৫-৪৬	১,৫৭,১৫,০০০ "
১৯৪৬-৪৭	৮৭,৬১,০০০ "
মোট—	২,৫৫,২০,০০০ টাকা

ইহার মধ্যে প্রথম দুই বৎসরের টাকাটা খরচের পাকা হিসাব, ১৯৪৬-৪৭ এর টাকাটা বরাদ্দ, তবে এটাও যে খরচ হইবে তাহা মনে না করিবার কোন কারণ নাই। লীগ রাজত্ব কায়েম থাকিতে দল ঠিক রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে না ইহা হইতেই পারে না। ১৯৪৪-৪৬ এই দুই বৎসরে মবলগ ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা যে নৌকা তৈরিতে ব্যয় হইয়াছে তাহা বিক্রয় করিয়া আদায় হইয়াছে মোট ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। গবর্মেণ্ট অবশ্য এখনও চার ভাগের এক ভাগ টাকা তুলিবার আশা ছাড়েন নাই।

অপচয়ের হিসাব শুধু এই একটি নহে, আরও অনেক আছে। লীগের হাতে রাজস্ব ব্যয়ের কর্তৃত্ব থাকিলে কি অবস্থা হয় ইহা তাহার একটি নিদর্শন মাত্র।

কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা

বাংলাদেশে লীগের হাতে এই ভাবে যে বিপুল টাকা অপচয় হইতেছে তাহার ঘাটতি পূরণের বেলায় কিন্তু অগ্রসর হন কেন্দ্রীয় সরকার। লীগ কথায় কথায় ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না কিন্তু টাকার বেলায় হাত পাতিবার ব্যগ্রতা তাহার কাহারও অপেক্ষা কম নয়। গত কয়েক বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার লীগ গবর্মেণ্টকে ঘাটতি মিটাইবার জন্ত ২৩ কোটি টাকা সাহায্য দিয়াছেন। বাংলার রাজস্ব গত কয়েক বৎসরে অনেক বাড়িয়াছে। একটু বুঝিয়া খরচ করিলে এবং চুরি ও অপচয় নিবারণ করিলে ঘাটতি হওয়ার কোন কারণ তো নাই-ই, অধিকন্তু বাংলার বাজেটে প্রতি বৎসর প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকিবারই কথা। কিন্তু লীগের হাতে গবর্মেণ্ট পড়িবার পর হইতে তার কোন উপায় নাই।

কেন্দ্রীয় সরকার যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্ত যে টাকা বাংলা-সরকারকে দিয়াছেন তাহারও অপচয় কি ভাবে হইতেছে তাহাও দেখা দরকার। গত বৎসরের জন্ত ভারত-সরকার দিয়াছিলেন সাড়ে দশ কোটি টাকা, বাংলা-সরকার উহা কাজে লাগাইতে পারেন নাই, ইহার মধ্যে সাত কোটি টাকা মাত্র তাঁহারা কাজে লাগাইতে পারিয়াছেন। আগামী বৎসরের জন্ত সাড়ে বার কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং ইহারও কতটা শেষ পর্যন্ত ব্যয় হয় তাহা পরে দেখা যাইবে। খরচের নমুনাটা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে ভারত-সরকার-প্রদত্ত এই টাকাটা দেশের উন্নতি সাধনের জন্ত পাওয়া গেলেও উহা লীগ মন্ত্রীদের মতলব সিদ্ধির কাজেও যথেষ্ট পরিমাণে লাগিতেছে। জেলা ও সাবডিভিসনের সরকারী আপিসের বাড়ী তৈরি, সার্কেল অফিসারদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাঁহাদের বাড়ী তৈরি, পুলিসের বাড়ী তৈরি ও সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদিতে যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, অথচ এই সব টাকা বাংলা-সরকারের নিজস্ব রাজস্ব হইতেই দেওয়া উচিত ছিল। দেশের উন্নতি বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহার সহিত এই সব ব্যয়ের সম্পর্ক খুবই কম। ঢাকার আশাহুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নূতন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ইস্‌লামিয়া কলেজের বাড়ী তৈরি ইত্যাদির জন্ত ভারত-সরকারের বরাদ্দ হইতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা উসুল হইয়াছে কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের জন্ত যে টাকাটা দেওয়ার কথা ছিল তাহা বাতিল করা হইয়াছে। বাংলা-সরকারের নিজের রাজস্বে না কুলাইলে ভারত-সরকারের বরাদ্দ হইতে এই টাকাটা না দেওয়ার কোন কারণ নাই—সাম্প্রদায়িক বিরূপ মনোবৃত্তি ছাড়া।

চট্টগ্রামের অবস্থা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা চট্টগ্রামে গত দুই মাসে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা চট্টগ্রামের মুসলিম লীগের সম্পাদক ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্যকলাপ সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ করেন।

অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা চট্টগ্রামের কয়েকটি দুঃখজনক ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, সেখানে গত দুই মাস সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে অতি বিপদের সময় গিয়াছে। তিনি এই অভিযোগ করেন যে, চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক মিঃ ফজলল কাদের চৌধুরী সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে শাসাইয়াছিলেন। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সেনকেও তিনি শাসাইয়াছেন। শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা বলেন যে, চট্টগ্রামে 'বিহার দিবস' পালনের সময় ব্যবসায়ীদের নিকট মোটা টাকা দাবি করা হইয়াছিল। একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা

বলেন যে, একটি নির্দোষ বালকের হত্যাকারীকে ঘটনার দুই মাস পর গ্রেপ্তার করিয়া থানায় দেওয়া হয়। মিঃ কাদের চৌধুরী থানায় গিয়া ঐ লোকটির জামিনের জন্য চেষ্টা করেন। পুলিস জামিন দিতে অস্বীকার করিলে মিঃ চৌধুরী রাত্রে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করেন এবং আসামীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ঐ সময়ের পর দুই মাস পার হইয়া গিয়াছে অথচ ঐ মামলা সম্পর্কে আর কিছুই শোনা যাইতেছে না।

সাম্প্রদায়িক মনোভাবে উস্কানি দিবার জন্য কিরূপ প্রচার-কার্য চালানো হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্তা সেন-গুপ্তা বলেন যে ব্যবস্থা-পরিষদের জনৈক সদস্য এক জায়গায় কতকগুলি লোককে বুঝাইতেছিলেন যে গত দাঙ্গায় মিঃ সুরাবর্দী নিজে দশ জন লোককে হত্যা করিয়াছেন। তিনি (ঐ সদস্য) শ্রোতাদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাহারাও যদি মিঃ সুরাবর্দীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারে তাহা হইলে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহাদেরও নিজেদের জীবনে যথেষ্ট উন্নতি হইবে।

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আচরণের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা বলেন যে তিনি সর্বদা রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ দিয়া থাকেন, ইহা ব্যতীত তিনি মুসলিম লীগের এক জন প্রধান কর্মীর সহিত সর্বক্ষণ ঘোরাফেরা করেন। শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা ঐ বিষয়টি সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রশ্ন করিলে তিনি এই উত্তর দেন যে লোকটি অতি বদমায়েস, সেজন্য তিনি উহাকে চোখে চোখে রাখিবার জন্য সর্বদা উহার সঙ্গে থাকেন।

মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা বলেন যে ঐ দলের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রতি রাত্রে রাস্তায় প্যারেড করে কিন্তু হিন্দুরা দলবদ্ধভাবে পথে বাহির হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে গুরুতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। কিছুদিন হইল অতিরিক্ত পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বদলী করিয়া তাঁহার স্থলে একজন মুসলমানকে সেখানে পাঠানো হইয়াছে। অন্যান্য হিন্দু অফিসারদের স্থানে মুসল-মান বসাইবার চেষ্টা চলিতেছে। শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা বলেন যে, ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে অক্টোবর সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর আক্রমণ, সম্পত্তি লুণ্ঠন ও নরহত্যা চলিয়াছে কিন্তু তাহারা কোন পাল্টা আক্রমণ করে নাই। তিনি আরও বলেন যে, দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কোনই সাহায্য দেওয়া হয় নাই।

নোয়াখালী-ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থা

নোয়াখালী এবং ত্রিপুরার বহুস্থান হইতে এখনও সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডামির সংবাদ আসিতেছে। আনন্দ বাজারের সংবাদে প্রকাশ, ৬ই মার্চ চাঁদপুর মহকুমার সীমান্তে নোয়াখালীর কোন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি প্রকাশ্য দিবালোকে পথিমধ্যে এক দল গুণ্ডাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গুরুতররূপে প্রহৃত হন। এই গুণ্ডাদলের সর্দার গত হাঙ্গামার সময় কুখ্যাতি অর্জন করে এবং সে আহত ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলে আহত ব্যক্তি কোন প্রকারে নিকটবর্ত্তী স্ব-সম্প্রদায়ের এক জন লোকের বাড়ী পলাইয়া যাইতে সক্ষম হয়। দুর্বৃত্তেরা তাহাকে তাড়া করিয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং পলায়িত লোকটিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এক ঘণ্টা যাবৎ চেষ্টা করে কিন্তু তাহাকে বাহির করিতে পারে নাই। বাড়ীর মালিক লোকটিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এই অভিযোগে দুর্বৃত্তেরা তাঁহাকেও খুঁজিতে থাকে। তিনি পরিবারের অন্যান্য লোকসহ নিকট-বর্ত্তী জঙ্গলে লুকাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। দুর্বৃত্তেরা চলিয়া যাওয়ার পর এজাহার দেওয়াইবার জন্য আহত ব্যক্তিকে একটি পুলিস ক্যাম্পে লইয়া যাওয়া হয় ও পরে তাহাকে রায়পুরা হাসপাতালে পাঠানো হয়। আরও জানা গিয়াছে যে, ঐ দিনই সন্ধ্যায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া প্রায় পাঁচ শত লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সমবেত হয় এবং নানাপ্রকার ধ্বনি করিতে থাকে।

চাঁদপুরে আসামী ধরিতে গিয়া পুলিস বাধা পাইতেছে এ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। চাঁদপুরের হানারচর অঞ্চলে এক দল পুলিস কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে এক দল লোক পুলিসকে বাধা দেয়। পুলিস বাধাদানকারীদের উপর গুলি চালাইতে বাধ্য হয় এবং ইহাতে একব্যক্তি নিহত হয়। এই ঘটনায় কয়েকজন পুলিস কনেষ্টবলও আহত হইয়াছে। আনন্দ বাজারের সংবাদে প্রকাশ, জামীন গ্রাহ্য নহে এইরূপ এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সহ সশস্ত্র পুলিস গত হাঙ্গামায় সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে যায়। পুলিস বাড়ী ঘেরাও করিলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বাড়ীর লোকজন সহ পুলিসকে বাধা দেয় ও ধারাল অস্ত্র দ্বারা এক জন সশস্ত্র কনেষ্টবলকে জখম করে। ফলে পুলিস গুলি চালায় এবং ঐ অভিযুক্ত লোকটিই নাকি উহাতে মারা যায়।

এই ঘটনা "আনন্দ বাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত হওয়ার পর লীগের অন্যতম মুখপত্র "আজাদ" নিম্নোক্ত রূপ মন্তব্য করিয়া-ছেন, "চাঁদপুরে আবার জনতার উপর পুলিসের গুলি চলিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। তার ফলে এক ব্যক্তি নিহত হইয়াছে বলিয়াও জানা গেল। চাঁদপুরের পুলিস বাহিনীর আস্পর্দ্ধার সীমা নাই বলিয়া মনে হইতেছে। সেই যে নোয়াখালীর দুর্ঘটনার পর হইতে নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় পুলিসী জুলুম শুরু হইয়াছে এখনও তার ইতি হইল না। ঐ অঞ্চলটা যেন মগের মুল্লুকে পরিণত হইয়াছে। পুলিসরাই এখানে জনসাধারণের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ মোহ্‌রাওয়ার্দী কতবার যে এ-পুলিস জুলুম বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু পুলিস জুলুম এখনও বন্ধ হইল না এবং তার ফলে

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির যে এক কাণাকড়িও মূল্য নাই, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সত্যই কি এ ব্যাপারে কোন ক্ষমতা নাই, না তিনি এ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া দরকার মনে করেন না ?" কথায় কথায় বিহারের কথা তুলিয়া নোয়াখালীর বীভৎসতাকে লঘু করিয়া দেখাইবার চেষ্টা চলিতেছে এবং এই প্রচার-কার্যে বিভ্রান্ত হইয়া ভালমানুষ শ্রেণীর এক দল গোবেচারী লোক লজ্জায় অধোবদনও হইয়া থাকেন। সত্য কথা বিবেচনা করিলে এই জিনিষটাই আমাদের মনে হয় যে বিহারের হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ ছিল কলিকাতায় বিহারী মুসলমান কর্তৃক বিহারী হিন্দুদের হত্যা ও লাঞ্ছনা। নোয়াখালী ছিল উপলক্ষ্য মাত্র। নোয়াখালীতে সুপরিকল্পিত ভাবে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে, দৈহিক মৃত্যু অপেক্ষা ধর্মান্তর ঘটাইয়া আত্মার মৃত্যু ঘটাইবার চেষ্টা হইয়াছে নোয়াখালীতে, বিহারে নয়। বিহারের ব্যাপারের পিছনে পরিকল্পনা ছিল না, ছিল চূড়ান্ত provocation-এর পর পৈশাচিক উত্তেজনা। বিহার-পরিষদে প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ হত্যাকাণ্ডের পূর্ববর্তী এক মাস মুসলিম লীগ পাকিস্থান প্রচারের নামে কি ভাবে উত্তেজনার খোরাক জোগাইয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন এবং লীগ সদস্যেরা তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। নোয়াখালী-দিবস পালনের অনুমতি দেওয়ার পূর্বে বিহার গবর্মেণ্ট স্থানীয় লীগ কর্মকর্তাদের মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা আপত্তি না করাতেই ঐ অনুমতি দেওয়া হয়। নোয়াখালীতে মাসাবধিকাল যাবৎ ঐরূপই পাকিস্থানী প্রচার কার্য্য চলিয়াছিল। স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা উহার সংবাদ গবর্মেণ্টকে জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া কোন সাহায্য পান নাই।

হাঙ্গামা দমনে বিহারের কংগ্রেস গবর্মেণ্ট সর্বশক্তি নিযুক্ত করিয়াছেন, প্রয়োজন মাত্র নির্বিচারে গুলি চালাইয়াছেন, পণ্ডিত নেহরু সেখানে ছুটিয়া গিয়াছেন এবং প্রয়োজন বোধ করিবামাত্র এরোপ্লেন হইতে বোমাবর্ষণ করা হইবে এই কথা বলায় তীব্র সমালোচনা সহ্য করিয়াছেন। প্রায় ছয় হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দুর্গতদের সাহায্যের জন্য পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং সাহায্যদানের ভার লীগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তির দাবিও কেহ করে নাই, হত্যাকাণ্ডের নায়কদের মাথায় তুলিয়া নাচিবার চেষ্টাও হয় নাই, সংবাদপত্রগুলিও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় নাই। মুসলমানের প্রার্থনায় আজান শুনিয়া কোন হিন্দু উহা বন্ধ করিতে বলে নাই, বরং উত্তেজনা থামিয়া গেলে নিজেরাই ভাঙা মসজিদ মেরামত করিয়া দিয়াছে, দুর্গতদের ঘরবাড়ীও নিজেরাই তৈরি করিয়া দিয়াছে, তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি পাহারা দিয়াছে।

আর নোয়াখালীতে ? লীগ গবর্মেণ্ট প্রথম হইতেই পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। লীগের উচ্চতম নেতারা নোয়াখালী গিয়া যে দুর্বৃত্তেরা ছোরা দেখাইয়া প্রাণভয়ে মানুষকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে, নারীহরণ, নারীধর্ষণ, গৃহদাহ, লুণ্ঠন প্রভৃতি ঘৃণিত কাজ যাহারা করিয়াছে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন চেষ্টা তো করেনই নাই, বরং এমন কথা বলিয়াছেন এবং এমন আচরণ করিয়াছেন যাহার ফলে দুর্বৃত্তেরা প্রকারান্তরে উৎসাহই পাইয়াছে। তাহাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, যে কাজ তাহারা করিয়াছে তাহা অন্যায় নহে, শুধু এখনও পুরাপুরি পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়াই তাহাদিগকে একটু অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে, পুলিসে টানাটানি করিতেছে, পাকিস্থানটা ভাল করিয়া কায়েম হইলেই আর ভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বস্ব লুণ্ঠনে ও নারীহরণে আপত্তি করিবার কেহ থাকিবে না। নরহত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নারীহরণ ও নারীধর্ষণ প্রভৃতি মানব সমাজের জঘন্যতম অপরাধের অভিযোগে যাহারা অভিযুক্ত হইয়াছে তাহাদের জামিন ও গ্রেপ্তারকালীন সময়ের জন্য পারিবারিক ভাতা প্রভৃতি লীগ পত্রিকাগুলি দাবি করিতেছে এবং এই নারকীয় কাণ্ডের নায়ক গোলাম সারোয়ারকে মৌলানা আখ্যা দিয়া তাহাকে উচ্চস্থান দানের জন্য লীগের সব কয়টি পত্রিকায় প্রতিযোগিতা সুরু হইয়া গিয়াছে। গ্রেপ্তার, জামীনদান প্রভৃতি সর্ববিষয়ে কোমলতা এত বেশী দেখান হইতেছে যে তার ফলে নোয়াখালী বা ত্রিপুরায় স্থায়ী শান্তি কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না, পারেও না। মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালী যাওয়ায় স্থানীয় লোকদের মনোভাবে পরিবর্তন আসিতে দেখিয়া লীগনেতারা কি ভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা এখনও সকলেরই মনে আছে। নোয়াখালীর ঘটনার নায়কদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন তো দূরের কথা তাহাদের প্রতি কে বেশী দরদ দেখাইবেন তাহারই প্রতিযোগিতা তাঁহারা করিয়া চলিয়াছেন। বিহার ও নোয়াখালীর ঘটনায় প্রতি কংগ্রেস ও লীগ গবর্মেণ্টদ্বয়ের মনোভাব লক্ষ্য না করিলে এই দুইটি স্থানের সমস্যার আসল রূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। শ্রীযুক্ত এ. ভি. ঠক্কর ৯ই মার্চ চাঁদপুর হইতে যে বিবৃতি দিয়াছেন, এই দিক হইতে বিবেচনা করিলেই তাহার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি হইবে। শ্রীযুক্ত ঠক্কর বলিতেছেন যে নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় এখনও অরাজকতা চলিতেছে। অক্টোবর হাঙ্গামার পর পাঁচ মাস কাটিয়া যাওয়া সত্ত্বেও উপদ্রব হ্রাস পাইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পক্ষান্তরে কোন কোন অস্থায়ী থানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার অর্থ দুর্বৃত্তদের আরও অবাধে দুষ্কর্ম চালাইবার অনুমতি দান। তিনি বলেন যে, পুনর্বসতি কার্যের জন্য তিনি আর পূর্ববঙ্গে আসিবেন না। শ্রীযুক্ত ঠক্কর বোম্বাই রওনা হইয়া গিয়াছেন।

বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আর্য

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

(২)

বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আর্য সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে (প্রবাসী কার্তিক, ১৩৫৩) প্রাচীন ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থ ভেন্দিদাদে বর্ণিত ষোলটি আর্য-বসতির উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আর্য-বসতিগুলির অবস্থান হইতে বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আর্যদিগের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিরূপ অনুমান করা চলে বর্তমান প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করা হইবে।

ভেন্দিদাদ প্রাচীন ইরাণীয়দিগের ধর্ম ও সমাজ এবং আচার ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অনুশাসন এবং মোটামুটি স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত তুলনীয়। 'Vendidad' নামটি vi-daevo-datem হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ "যাহা দেবের বিরুদ্ধে প্রদত্ত", অর্থাৎ যাহাতে দেবদিগের (ইরাণীয় ধর্মশাস্ত্রের অপদেব) অনিষ্টকর প্রভাব হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বিধান করা হইয়াছে। বাইশটি অধ্যায়ে (fargards) বিভক্ত ভেন্দিদাদ বিভিন্ন সময়ে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের প্রধান পুরোহিতগণের দ্বারা রচিত হইয়াছিল এবং ইহার প্রাচীনতম অংশ সম্ভবতঃ জরাথুস্ত্রের আবির্ভাবে দুই-এক শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভেন্দিদাদের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বিবিধ পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে অহুর মাজদা কর্তৃক সৃষ্ট ষোলটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে এই ষোলটি অঞ্চল ষোলটি প্রাচীন আর্য-বসতি এবং এইগুলি জরাথুস্ত্রের প্রচারিত ধর্মের প্রভাবের মধ্যে আসিয়াছিল। এই মত বিচারসহ কিনা পরে দেখা যাইবে।

ভেন্দিদাদের প্রথম অধ্যায়ের আবেস্তা অংশে দেখা যায় স্পিতম জরাথুস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া অহুর মাজদা বলিতেছেন যে প্রথম যে বাসযোগ্য উত্তম অঞ্চল তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার নাম আইরিয়ানা বেজো (Airyana vaejo)। আইরিয়ানা বেজোর অর্থ করা হইয়াছে পার্থিব স্বর্গ। জেন্দ অংশে (আবেস্তার ভাষ্য অংশে) বলা হইয়াছে যে, বাসযোগ্য হইবার পূর্বে সেখানে দশ মাস শীত এবং দুই মাস মাত্র গ্রীষ্ম প্রচলিত ছিল, এবং এই দুই মাসেও এত প্রচণ্ড শীত ছিল যে জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব হইত ("cold as to water, cold as to earth, cold as to plants")। যাঁহারা উত্তরের আর্টিক বা তুষার অঞ্চলে আর্য জাতির আদিম বাস ছিল এইরূপ মত পোষণ করেন তাঁহারা ভেন্দিদাদের এই সূক্তকে একটি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ভেন্দিদাদের আবেস্তা ও জেন্দ অংশ এবং উহার পহ্লবী অনুবাদ হইতে আইরিয়ানা বেজোর অবস্থান সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা করা সম্ভব নহে। সে যাহা হউক, দশ মাস শীত ও দুই মাস গ্রীষ্ম বিশিষ্ট আর্টিক অঞ্চল পর্যন্ত জরাথুস্ত্রের ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল বা ইরাণী ও ভারতীয় আর্যগণ এইরূপ কোন অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন এই প্রকার মতবাদের বাস্তব কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক বর্ণনা মিলাইয়া আইরিয়ানা বেজোর ভৌগোলিক অবস্থান সন্তোষজনক ভাবে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই এবং ইরাণীয় ধর্মশাস্ত্রের সৃষ্টিকল্পের যে পুরাণ পাওয়া যায় তাহা হইতে এই সমস্যার সমাধানে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না।

অহুরা মাজদার সৃষ্ট দ্বিতীয় উত্তম অঞ্চল "গৌ (Gau) যেখানে সুগধা অবস্থিত।" পহ্লবী অনুবাদে গৌকে গাবা (Gava) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মিহির ইয়াষ্টে একবার গৌ-সুগধার উল্লেখ পাওয়া যায়। মিথের (বৈদিক মিত্র) স্তুতিতে বলা হইয়াছে যে তাঁহার অনুগ্রহে বিশাল-কায়া নদীসকল আইস-কাতা (Aish-kata), পুরুতা (Pourta, Parthia), মৌরু (Mouru, Merv), হারোয়ু (Haroyu, Herat), গৌ-সুগধা (Sugdha) এবং কাইজেরিজেম (Khoraesmia) এর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। আইসকাতার অবস্থান অজ্ঞাত। পার্থিয়া বা পার্থব, মার্ভ, হিরাট, সুগধা এবং খিবার উল্লেখ হইতে মনে করা যাইতে পারে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম এই সকল অঞ্চলকে প্রভাবিত করিয়াছিল। অহুরা মাজদার সৃষ্ট তৃতীয় উত্তম অঞ্চল মৌরু বা মার্ভ। লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, খিবা ও মার্ভ উভয় অঞ্চল ইরাণের ভৌগোলিক সীমানার বাহিরে। সুগধা, মার্ভ, খিবা বর্তমানে রাশিয়ার অধীন। চতুর্থ অঞ্চল বাখধি (Bakdh), অর্থাৎ ব্যাকট্রিয়া বা বালখ। বালখের উচ্চভূমির (berekdha kehrpa) উল্লেখ অনেকবার পাওয়া যায়। পহ্লবী অনুবাদের নাম বুখার। বাখধিকে সৌভাগ্য-শালী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পঞ্চম অঞ্চল নিশাই (Nisai)। জেন্দের ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন নিশাই বাখধি ও মৌরুর মধ্যে অবস্থিত। নিশাইয়ের অধিবাসী যে বিধর্মী ও অবিশ্বাসী ছিল আবেস্তায় তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। পহ্লবী অনুবাদক বলিতেছেন যে তাহারা দেবতা ও অপদেবতা উভয়ের অস্তিত্বে সংশয়ী ছিল। ষষ্ঠ অঞ্চল হারোয়ু বা হিরাট, পহ্লবীতে হরিব বা হরাব। অনুবাদকের বর্ণনায় দেখা যায় হিরাটের বৈশিষ্ট্য মশক ও ঝিঁঝিঁপোকার প্রাচুর্যে। সপ্তম অঞ্চল বেকেরেত (Vaekereta)।

পহলবী অনুবাদকের মতে বেকেরেত কাবুল, কিন্তু এইরূপ অনুমান করা হয় বেকেরেত সজস্থান বা শকস্থান (Seistan, Gk. Drangiana)। আবেস্তা হইতে জানা যায় বেকেরেতের অধিবাসী যাদুবিদ্যার পক্ষপাতী ছিল। পহলবী অনুবাদক বলিতেছেন তাহারা যাদুবিদ্যা ও প্রতিমাপূজায় আসক্ত ছিল এবং নিয়মানুসারে ক্রিয়াকর্ম করিত না। প্রতিমা পূজার এই উল্লেখ লক্ষ্য করিতে হইবে। অষ্টম অঞ্চল বিস্তীর্ণ গো-চারণভূমি-বিশিষ্ট উর্ব (Urva)। উর্ব কাবুল এইরূপ অনুমান করা হয়। নবম অঞ্চল খেণ্‌ত (Khnenta, পহলবী Khnan)। খেণ্‌ত কান্দাহার এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। খেণ্‌তের বৈশিষ্ট্য নেকড়ে বাঘের প্রাচুর্য ও ইহার অধিবাসীদিগের পুংমৈথুনে আসক্তি। দশম অঞ্চল হারাকাইতি (Haraqaiti, পহলবী Harakhmond) হারাকাইতি বা হারৌবতী গ্রীকদিগের আরাকেশিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে। হারাকাইতির সৌন্দর্যের প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহার অধিবাসীদিগের নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে,

> "The vile sin which cannot pass the bridge, which is burying the dead; this is heathenish and according to their law."

আবেস্তা অংশে বলা হইয়াছে "the inexpiable deeds of burying the dead." মৃতদেহ কবর দেওয়া বা দাহ করা জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের মতে ঘোরতর পাপ। হারাকাইতিতে এই ধর্মবিগর্হিত প্রথা প্রচলিত ছিল দেখা যাইতেছে এবং জানা যাইতেছে সেখানকার অধিবাসীরা জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মরীতি অনুসরণ করিত না। একাদশ অঞ্চল হেতুমত (Hætumat, পহলবীতে Het-homand)। হেতুমত আধুনিক হিলমণ্ড এবং গ্রীকদিগের এটিমাণ্ডার। ইহাকে গৌরবোজ্জ্বল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পহলবী অনুবাদক বলিতেছেন বেহ (Veh) নদী এখানে প্রবাহিত। এই পৌরাণিক বেহ নদী বুন্দাহিসের (Bundahish পার্শী ধর্মগ্রন্থ, রচনাকাল অনুমান খ্রীঃ পূঃ ৪০০) মতে পূর্ব এলবোরজ্‌ হইতে বাহির হইয়াছে। পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ইহা সিন্ধুর মধ্য দিয়া হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। সিন্ধুদেশে ইহার নাম মেহরা (Mehra)। সম্ভবতঃ ইহা মেসকিদ নদী। হেতুমতের অধিবাসীদিগের যাদুবিদ্যায় প্রতি আসক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বাদশ অঞ্চল রাঘা (Ragha বা Rai)। রাঘা তেহেরাণের নিকটবর্তী রায় নগর। রাঘার অধিবাসীদিগকে সংশয়বাদী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ অঞ্চল চখ্র (Chakra, পহলবী Chakhar)। আবেস্তায় চখ্রকে বলশালী ও ন্যায়পরায়ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আবেস্তার মতে সেখানে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল দেখা যায়। চখ্রের অধিবাসীরা জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম গ্রহণ করে নাই বুঝা যায়। চতুর্দশ অঞ্চল বরেন (Varena)। বরেনকে চতুষ্কোণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। চতুষ্কোণের অর্থ করা হইয়াছে চারটি রাস্তা বা ফটকবিশিষ্ট। পহলবী অনুবাদক বলেন বরেন কিরমান, কেহ কেহ বলেন গিলান। ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে ইহা অনার্য জাতির দ্বারা পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইত ("non-Aryan plagues of the country")। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে। পঞ্চদশ অঞ্চল সপ্ত সিন্ধুর দেশ (Hapta Hindu)। আবেস্তায় পূর্ব সিন্ধু হইতে পশ্চিম সিন্ধুর (Ushastara Hendva avi daoshastarem Hendum) উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ব সিন্ধুর পরে পশ্চিম সিন্ধুর উল্লেখ লক্ষ্য করিবার বিষয়। পহলবী অনুবাদকের মতে সপ্তসিন্ধুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে সাত জন প্রধান রাজার সংখ্যা হইতে। আবেস্তায় সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ থাকিলেও মাত্র পূর্ব ও পশ্চিম সিন্ধুর নাম করা হইয়াছে এবং তাহা হইতে প্রকৃত সংখ্যা সাত কিম্বা দুই এরূপ সন্দেহ উঠিতে পারে অনুবাদক এ কথায় উল্লেখও করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে কাহারও কাহারও মতে সাতটি অঞ্চলে প্রবাহিত নদী হইতে সপ্তসিন্ধুর সংখ্যা পাওয়া যায়। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত গ্রীষ্ম ও জ্বর। মিহির ইয়াষ্টে পূর্ব ও পশ্চিম হিন্দু (Hindvo) বা সিন্ধুর নাম পাওয়া যায়। অহুরা মাজদার সৃষ্ট ষোড়শ অঞ্চলের বর্ণনা অস্পষ্ট। দেশের নাম নাই। বলা হইয়াছে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রাকারে পরিবেষ্টিত না হইয়া সমুদ্র-উপকূলে বাস করে। অর্থাৎ ইহা উপকূল-অঞ্চল। পহলবী অনুবাদে এই অঞ্চলের নাম আরাঙ্গিস্থান (Arangistan) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আরাঙ্গিস্থানের অর্থ আরাজ নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। আরাজ নদী বুন্দাহিসের বর্ণনায় এলবোরজ্‌ হইতে বাহির হইয়া পশ্চিমে প্রবাহিত। সুতরাং যে উপকূলের কথা বলা হইয়াছে তাহা স্পষ্টতঃ কাস্পিয়ান সাগরের উপকূল নহে। এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইয়াছে অতিরিক্ত শীত ও তুষারপাত। পহলবী অনুবাদক বলিতেছেন প্রাকারবেষ্টিত না হইয়া বাস করিবার কারণ যাহাতে শত্রুর আগমনে তাহারা দ্রুত পশ্চাদপসরণ করিতে পারে। এই অঞ্চলে প্রকৃত কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন রাজা নাই কেহ কেহ এইরূপ বলেন, অনুবাদক ইহা জানাইয়াছেন।

ইহার পর জেন্দ অংশে এইগুলি ছাড়া যাহাদের নাম করা হয় নাই এরূপ আরও অনেক উপত্যকা ও সমতল অঞ্চল আছে এ কথা বলা হইয়াছে। পহলবী অনুবাদক

দৃষ্টান্তস্বরূপ ফার্সের (Fars বা Farsistan) নাম করিয়াছেন।

ভেন্দিদাদে উল্লিখিত ষোলটি অঞ্চলের যে বর্ণনা উপরে দেওয়া হইল তাহা হইতে দেখা যায় যে ষোলটির মধ্যে এগারটি অঞ্চল অবিসম্বাদীরূপে পূর্ব ইরাণ, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে। এই এগারটির নাম, গৌ-সুগধা, মার্ভ, বালখ, নিশাই, হিরাট, বেকেরেত বা শকস্থান, উর্ব বা কাবুল, খেওত বা কান্দাহার, হারাকাইতি, হেতুমত বা হিলমণ্ড ও সপ্তসিন্ধু, বাকী পাঁচটির মধ্যে চখ্‌র বা চাখারের অবস্থান পরিষ্কার নহে; উপকূল অঞ্চল সম্বন্ধে পহ্লবী অনুবাদকের ব্যাখ্যার ফলে অবস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়; এবং আইরিয়ানা বেজোর বর্ণনা হইতে ইহার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভব হয় না। বাকী দুইটির মধ্যে রাঘা বা রায় পশ্চিম ইরাণের মধ্যে। একটি মতানুসারে ইস্পাহান, রায়, হামাদান, নিহাবন্দ ও আদর বা আজারবাইজান প্রাচীন পহ্লব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই সকল অঞ্চল লইয়া প্রাচীন মিডিয়া গঠিত ছিল। অবশিষ্ট থাকে বরেন। বলা হইয়াছে যে বরেন কাহারও মতে গিলান কাহারও মতে কিরমাণ। কিরমাণ ইরাণের দক্ষিণ-পূর্বে, গিলান উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলে। বরেনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় ইহা অনার্য দেশের নিকটবর্তী বা বাহির হইতে তাহাদের ইরাণ-আক্রমণের পথে। গিলানে আর্য-বসতি থাকিলে পূর্বে মাজানদারেন ও পশ্চিমে আজারবাইজানও প্রাচীনকালে আর্য-বসতির অন্তর্ভুক্ত ছিল মনে করা যায়। মাজানদারেনের পূর্বে প্রাচীন হিরকানিয়া অনার্যদেশের অন্তর্ভুক্ত। কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বে দাহী (Dahae) সিথিয়ান (Scythian) বলিয়া পরিচিত অনার্য জাতিদিগের অঞ্চল। কাস্পিয়ানের পশ্চিমে আজারবাইজান বা প্রাচীন আত্রোপাতেন ককেশাশের সংলগ্ন। ককেশাশ ও পূর্ব-রুশিয়া প্রাচীন মিডিয়ান ও হাকামণি সাম্রাজ্যের আমলে সিথিয়ান বলিয়া পরিচিত গোষ্ঠীসমূহের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। দেখা যায় সাসানীয় সাম্রাজ্যের আমলে ইহাদের বিরুদ্ধে ককেশাশের দ্বার রক্ষা করিবার জন্ম রোম সাম্রাজ্য সাসানীয় সম্রাটগণকে কর দিত। মিডিয়ান সাম্রাজ্যের আমলে অনার্য জাতিদিগের আক্রমণ কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল হইতে ঘটিয়াছিল। আরসিকিডান আমলে এই আক্রমণ প্রধানতঃ ইরাণের পূর্বদিকে কিরমানের সন্নিহিত অঞ্চল হইতে ঘটে। বরেন সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা হইয়াছে যে উহা খেুতাওনা বা ফ্রেতুনের জন্মস্থান। ফ্রেতুন অহি দাহকের (Azhi Dahak) বিনাশকারী বলিয়া ইরাণীয় পুরাণে প্রসিদ্ধ। ফ্রেতুন, যিম, কবয়ুস প্রভৃতি ইরাণীয় পুরাণের বিখ্যাত বীর এবং দেবতারূপে পরিচিত। ইহার পরে দেখা যাইবে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের অভ্যুদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় মিডিয়ায়। মিডিয়ার মাজি গোষ্ঠী জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের ইতিহাসে পুরোহিত সম্প্রদায়রূপে বিখ্যাত। এই সকল কথা মনে রাখিলে বরেনকে কিরমান অপেক্ষা গিলান বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু পহ্লবী অনুবাদে কিরমানের উল্লেখের ভিত্তি যে কোন প্রাচীন প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। হান-বংশের আমলের প্রাচীন চীনা ক্রনিকেলে উল্লিখিত Great Wan ভেন্দিদাদের বরেন হইতে অভিন্ন কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। হান আমলের প্রসিদ্ধ রাজদূত চ্যাং কিয়েনের বর্ণনা হইতে Great Wan-এর অবস্থান ফরগণার সহিত মিলিয়া যায় এইরূপ বলা হইয়াছে। সে যাহা হউক, এ আলোচনা বাহুল্য, কারণ বরেন ছাড়া আরও কতকগুলি অঞ্চলের অবস্থান অজ্ঞাত থাকিয়া যায়।

মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে, ভেন্দিদাদের প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত যে ষোলটি অঞ্চলকে প্রাচীন আর্যবসতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় তাহার মধ্যে এগারোটি পূর্বদিকে। এই এগারোটির মধ্যে গৌ-সুগধা, মৌরু, নিশাই ও বাখদি-বাদে বাকী সাতটি ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত (মৌর্যসাম্রাজ্য) এবং বাকী চারটিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির সীমানার মধ্যে ফেলা যায়। আরব-আক্রমণের সময় পর্যন্ত সুগধায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল ছিল।

"Even for a long time after the invasion of Islam Buddhistic idols are said to have been sold in the bazars of Bokhara". Buddhism flourished in Sogdiana until Arab conquest in the 8th century" (Aurel Stein).

উপকূলবর্তী অঞ্চল সম্বন্ধে সন্দেহের কথা বলা হইয়াছে। পহ্লবী অনুবাদে আরাব্জিস্থান সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও এই কথা বলা যায় যে উহা মাক্রাণ উপকূল হওয়া অসম্ভব নহে। আরঙ্ প্রকৃতপক্ষে একটি পৌরাণিক নদীর নাম। আরাব্জিস্থানের সম্পর্কে অনুবাদে Arum কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে এবং উহার অর্থ করা হইয়াছে রোমের-পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্য। ইহাতে প্রাচীন ইরাণীয় ও রোমক-সাম্রাজ্যের সীমানা য়ুক্রেতিস নদীর কথা আসিয়া পড়ে। ইতিহাস হইতে যতদূর জানা যায় এই অঞ্চল বরাবর সেমিটিক জাতির অধ্যুষিত অঞ্চল বলিয়া পরিচিত। তারপর বরেনকে কিরমাণ বা ফরগণা বলিয়া স্বীকার করিলে রাঘা বা রায় পশ্চিম ইরাণে একমাত্র আর্যবসতি দাঁড়ায়।

প্রাচীন আর্যজাতির উপনিবেশ বলিয়া ব্যাখ্যাত

ভেন্দিদাদে অহুরা মাজদার সৃষ্ট উত্তম (perfect) অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে উপরের আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে আর্যবসতিগুলি সুগধা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে ভারতবর্ষের মধ্য পর্যন্ত প্রসারিত। সুগধার পশ্চিমে মার্ভ ও খোরাসানের দক্ষিণে কিরমান পর্যন্ত এই বসতি বিস্তৃত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অক্সাস, হরিরুদ ও সিন্ধুর অববাহিকা লইয়া একটা compact ভৌগোলিক অঞ্চল পাওয়া যাইতেছে যাহার মধ্যে অধিকাংশ আর্যবসতিগুলি অবস্থিত। দূরবর্তী রাঘা এই সীমানার বাহিরে। এই সিদ্ধান্ত প্রচলিত আর্যবাদের, অর্থাৎ আর্যজাতি পশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল এই মতবাদের সমর্থন করে না। তারপর অহুরা মাজদার সৃষ্ট এই সকল উত্তম অঞ্চলের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আবেস্তা অংশে যাহা বলা হইয়াছে ও পহ্লবী অনুবাদে যাহা বিশদ করা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলে কি উত্তম অঞ্চল কি জরাথুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্মের প্রতি আনুগত্য, কোন হিসাবে তাহাদের অনেকগুলির প্রশংসা করা চলে না। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে আইরিয়ানা বেজো সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

দশ মাস শীত ও দুই মাস গ্রীষ্মবিশিষ্ট আইরিয়ানা বেজো অহুরা মাজদা মনুষ্যবাসের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আইরিয়ানা বেজোর অর্থ করা হইয়াছে পৃথিবীর স্বর্গ। একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী আর্যজাতির উপনিবেশ-বিস্তার সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে আর্যজাতি উত্তর অঞ্চল হইতে ইরাণে পৌছিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়; এক দল পশ্চিম মুখে ও অন্য দল পূর্ব দিকে প্রস্থান করে। এই উত্তর অঞ্চল তাঁহার মতে আইরিয়ানা বেজো।

"From Airyana Vaejo, a sub-artic region to the north of Sogdiana, with ten months of winter (which explains the origin of the cult of Fire) and two of summer--"

অর্থাৎ গৌ-সুগধার উত্তরে এই সাব-আর্টিক অঞ্চল হইতে আর্য জাতি ইরাণে প্রবেশ করে। সুগধার উত্তরের অঞ্চল গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণের নিকট সিথিয়া বলিয়া পরিচিত (Scythia intra Imaum ও Scythia extra Imaum) এবং ইতিহাসের আরম্ভ হইতে উহা মোঙ্গল-তুর্কী যাযাবর গোষ্ঠীর অধ্যুষিত অঞ্চল বলিয়া প্রসিদ্ধ। মেয়ারের (Meyer) মতে আর্যজাতি খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসর পর্যন্ত কাস্পিয়ান সাগর ও আরল সাগরের পূর্বাঞ্চলে অবস্থান করে, তারপর দক্ষিণে ভারতবর্ষের দিকে চলিতে আরম্ভ করে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের এই সকল মতের পশ্চাতে রহিয়াছে এই দৃঢ় ধারণা যে আর্যজাতির আদি বাসভূমি ককেশাশ বা পূর্ব-রুশিয়া এবং এই বাসভূমি হইতে আর্যজাতি দক্ষিণ-পূর্ব মুখে চলিতে চলিতে ইরাণ ও ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। যে ব্যাপার খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে কিম্বদন্তী অনুমান খ্রীঃ পূঃ ৪০০ বৎসরের পরে লিখিত ভেন্দিদাদের লেখকের নিকট সুপরিচিত ছিল বিনা দ্বিধায় এইরূপ অনুমান করা আবশ্যক। তাহা না হইলে আইরিয়ানা বেজো যে সুগধার উত্তরে আলতাই পর্বত অঞ্চলে অবস্থিত এই প্রকার মতবাদের কোন ভিত্তি দেখা যায় না।

বলা বাহুল্য, আইরিয়ানা বেজোর মাত্র শীতের বর্ণনা উপরের মতবাদের ভিত্তি। ভেন্দিদাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় যে সৃষ্টিকল্পের আরম্ভে অহুরা মাজদা, মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রথম রাজা যিম ও দেবগণের মধ্যে পরামর্শ আরম্ভ হইল। অহুরা মাজদা বলিলেন, পৃথিবীতে শীতের প্রকোপ হইবে ও ভয়ানক তুষারপাত হইবে। শীতের পূর্বে পৃথিবীতে বহু পশুখাদ্য তৃণ জন্মিত। তারপর জলে পৃথিবী প্লাবিত হইল ও তুষার গলিয়া নালার সৃষ্টি হইল। জলাশয় খনন করিয়া এই জল নিকাশ করিয়া যিম মনুষ্য-বসতি স্থাপন করিলেন। শীতের প্রাবল্য সম্বন্ধে এখানে যাহা বলা হইতেছে তাহা পৃথিবীব্যাপী শীত এবং মনুষ্যসৃষ্টির পূর্বের ব্যাপার। আইরিয়ানা বেজোতে দশ মাস শীতের প্রভাব এবং গ্রীষ্মকালেও অতিশয় শীতের প্রকোপ ছিল। অহুরা মাজদা ইহাকে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করিয়াছিলেন। শুধু শীতের বর্ণনা হইতে আইরিয়ানা বেজোকে কাস্পিয়ান ও আরল সমুদ্রের দিকে ঠেলিয়া দিবার হেতু নাই।

জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে Dr. Haug বলিতেছেন যে জরাথুষ্ট্রকে বিশেষভাবে আইরিয়ানা বেজোতে বিখ্যাত বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ

"Famous in the *Aryan home*, whence the Iranians and Indians emigrated in times immemorial".

Dr. Haug বলেন, জরাথুষ্ট্রের শিষ্যগণ তাঁহাকে এই রূপ বিশেষণে ভূষিত করিতেন না যদি তাঁহাদের এ বিশ্বাস না থাকিত যে জরাথুষ্ট্র অতি প্রাচীনকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাবকালের প্রাচীনত্ব নিরূপণে এই ধরণের যুক্তির মূল্য যাহাই হউক দেখা যায় যে অহুরা মাজদা ও রাজা যিমকেও আইরিয়ানা বেজোতে বিখ্যাত বলা হইয়াছে। উপরে দেখা গিয়াছে যে আর্যবসতিগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে আইরিয়ানা বেজোর অর্থ করা হইয়াছে পৃথিবীর স্বর্গ, এখানে অর্থ করা হইয়াছে আর্যদিগের বাসভূমি। ভেন্দিদাদের পহ্লবী অনুবাদে Airyana Vaejoকে Airan vej রূপে দেখা যায়। সুতরাং প্রাচীন Airyan-এর পহ্লবী রূপান্তর Airan. Airan হইতে Eran, Irun ও আধুনিক রূপ Iran:আসিয়াছে। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীগণ যে

আইরিয়ানা বেজোকে সুগধার উত্তরের সাব-আর্টিক অঞ্চল এবং খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের Aryan home বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে উহা Airan বা Iran vej, অর্থাৎ ইরাণের স্বর্গ বা ইরাণের পবিত্র ভূমি। ভেন্দিদাদের আর্যবসতিগুলির তালিকার প্রথম অঞ্চল আইরিয়ানা বেজোর প্রকৃত অর্থ পবিত্র Iranian home এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তালিকার প্রথম উল্লিখিত অঞ্চল ইরাণের স্বর্গ হউক বা আর্যবাসভূমি হউক ইহা একটি পৃথক অঞ্চল নহে, তালিকার পরবর্তী অঞ্চলগুলি এই আইরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত—ইহাই সহজ ও সরল অর্থ। পণ্ডিতগণ ইহাকে পৃথক একটি অঞ্চল কল্পনা করিয়া সুগধার উত্তরে ইহাকে স্থাপন করিয়াছেন।

এখন এই অঞ্চলগুলির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে।

আইরিয়ানা বেজোতে শীতাধিক্য, গৌ-সুগধায় গোমড়ক, মৌরুতে যুদ্ধবিগ্রহ ও লুণ্ঠতরাজ, বাকধিতে কীট ও বিষাক্ত গাছপালা, নিসাইতে অবিশ্বাস (unbelief), হারোয়ুতে শিলাবৃষ্টি ও দারিদ্র্য, বেকেরেতে ভূতপ্রেতে বিশ্বাস, উর্বে যুদ্ধবিগ্রহের দরুণ ধ্বংস, খেঙ্‌তায় অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়াশক্তি, হারাকাইতিতে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা, হেতুমন্তে যাদুবিদ্যায় আসক্তি, রাঘায় সংশয়বাদিতার প্রাধান্য, চখ্রে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা, বরেনে অনার্য জাতির আক্রমণ, সপ্তসিন্ধুতে জ্বর ও উপকূল অঞ্চলে তুষার পাত—অহুরা মাজদা কর্তৃক সৃষ্ট উত্তম অঞ্চলগুলির এই সকল ত্রুটির উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে উত্তম অঞ্চলগুলির এই সকল ত্রুটির জন্য Angro-mainyush দায়ী, শত্রুতা করিয়া সে উত্তম অঞ্চলগুলিকে এই ভাবে কলঙ্কিত করিয়াছে। দেখা যাইতেছে এই ত্রুটিগুলির কতক নৈসর্গিক, কতক নৈতিক। অন্যান্য অঞ্চলের কথা বাদ দিয়া নিশাই, হারাকাইতি, রাঘা ও চখ্রের ত্রুটির বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। হারাকাইতি ও চখ্রে মৃতদেহ কবর দিবার ও দাহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মমতে এই দুইটি গুরুতর অপরাধ, বিধর্মীর প্রথা। অহুরা মাজদার সৃষ্ট উত্তম অঞ্চলে এই প্রথার প্রচলন থাকিবার সরল অর্থ জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মমত এই দুই অঞ্চলে গৃহীত হয় নাই। নিশাইতে এই ধর্মমত সম্ভবতঃ প্রবল ছিল না। রাঘায় সংশয়বাদিতার (over scepticism) উল্লেখ আশ্চর্যের বিষয়। কারণ, একটি মতানুসারে জরাথুস্ত্রের জন্মভূমি বলিয়া রাঘার প্রসিদ্ধি আছে। তাহা ছাড়া রাঘা প্রকৃত প্রস্তাবে জরাথুস্ত্র উপাধিধারী জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের প্রধান পুরোহিতগণের দ্বারা শাসিত হইত।

কয়েকটি অঞ্চলের মারাত্মক ত্রুটির উল্লেখ হইতে মোটামুটি এই কথা জানিতে পারা যাইতেছে যে এই সকল অঞ্চলের সম্ভবতঃ তিনটিতে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মমত গৃহীত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। এই অঞ্চলগুলি পূর্ব-ইরাণের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। জোরোষ্ট্রিয়ান মত এই অঞ্চলগুলিতে গৃহীত না হইয়া থাকিলে অহুরা মাজদার সৃষ্ট উত্তম অঞ্চলগুলির তালিকায় এইগুলির স্থান পাইবার কারণ কি? ইরাণীয় বা আর্যজাতির উপনিবেশ হিসাবে ভেন্দিদাদের লেখক এইগুলির নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মমত এই সকল অঞ্চলে গৃহীত না হওয়া সত্ত্বেও, এই কথা স্বতঃই মনে আসে। অহুরা মাজদার জবানীতে এই অঞ্চল তাঁহার সৃষ্ট উত্তম অঞ্চলগুলির মধ্যে, এইরূপ প্রচারণার পশ্চাতে অহুরা মাজদাকে ইরাণীয় আর্যজাতির জাতীয় দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা রহিয়াছে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত মনে হয় না।

আর্যজাতির আদি বাসভূমি এবং এই বাসভূমি হইতে কতকগুলি গোষ্ঠীর নীপার নদীর গতি অনুসরণ করিয়া উক্রাইনের মধ্য দিয়া পোলাণ্ড,বাল্টিক অঞ্চল, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, মধ্য ইউরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে এবং কতকগুলি গোষ্ঠীর পূর্বমুখে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ইরাণ ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার কল্পিত কাহিনীর উল্লেখ পূর্বের কয়েকটি প্রবন্ধে করা হইয়াছে। আইরিয়ানা বেজোর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনায় এই orthodox আর্যবাদের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। এখন সংক্ষেপে দেখা প্রয়োজন অহুরা মাজদার সৃষ্ট উত্তম অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া গেল তাহা এই প্রচলিত আর্যবাদের সমর্থন করে কিনা এবং এই সকল তথ্য হইতে ইরাণীয় ও বৈদিক আর্যগণের সম্পর্ক সম্বন্ধে কি ধারণ করা সম্ভব।

আইরিয়ানা বেজোকে সুগধার উত্তরে অবস্থিত সাব-আর্টিক Aryan home বলিয়া দাবি করা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক দাঁড়ায় যদি আগে হইতে প্রচলিত আর্যবাদ স্বীকার করিয়া না লওয়া হয়। কাস্পিয়ান সাগর ও আরল সাগরের পূর্বাঞ্চলের কথা উঠে আর্যজাতি মধ্য-এশিয়ার পথে ইরাণ ও ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এই মত গ্রহণ করা হইলে। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিতে উত্তরের এই পথ ছাড়া আরও পথ ছিল। ককেশাশ হইতে আজারবাইজান, মিডিয়া, সুসা, ফার্শ, খোরাশান হইয়া বালখ বা কিরমান হইয়া বেলুচীস্থান অথবা আজারবাইজান, কুর্দীস্থান, মেশোপটেমিয়া হইয়া ইরাণ, এই সকল পথ ছিল। যাঁহারা মেশোপটেমিয়ার পথে আর্যজাতি ইরাণে ও ভারতবর্ষে আসিয়াছিল বলেন মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন ইতিহাস তাঁহাদের কিছুটা সমর্থন করে এ কথা অস্বীকার করা চলে

না। কাস্পিয়ান ও আয়লের পূর্ব-উত্তরের পথে আর্যজাতি ইরাণে আসিয়াছিল যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মতের সমর্থনে ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক কোন প্রমাণ নাই, নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের প্রমাণের কথা বলা বাহুল্য। উপরে দেখা গিয়াছে যে আইরিয়ানা বেজো বাস্তবিক ইরাণ. অথবা পূর্ব-ইরাণ। সুগধা ও মার্ভের উত্তরে ইরাণের সীমানা বিস্তৃত ছিল ইরাণের প্রাচীন ইতিহাস এরূপ সাক্ষ্য দেয় না।

ষোলটি অঞ্চলের মধ্যে আইরিয়ানা বেজো বাদে পনরটি অঞ্চলের মধ্যে এগারোটি পূর্ব-ইরাণ, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে পড়ে এবং এই এগারোটি অঞ্চল একটি compact ভৌগোলিক অঞ্চল ইহা দেখা গিয়াছে। এই তথ্য বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। ষোলটি অঞ্চলের অধিবাসী যে জাতি বা গোষ্ঠীভুক্ত সেই জাতির, সংখ্যার দিক দিয়া এবং কৃষ্টির দিক দিয়াও বটে, প্রধান কেন্দ্র এই ভৌগোলিক অঞ্চল। এই জাতিকে যদি আর্যজাতি বলা হয় তাহা হইলে মধ্য-এশিয়ার পথে বা মেসোপটেমিয়ার পথে আর্যজাতি পূর্ব-ইরাণে আসিয়াছিল যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মত মূল্যহীন হইয়া যায়। অর্থাৎ আর্যজাতি যে পশ্চিম দিক হইতে (ককেশাশ বা উত্তর-পশ্চিম থিরগিজ অঞ্চল বা দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া) আসিয়াছিল তাহা বিশ্বাস করা অসম্ভব হয়। ভেন্দিদাদের এই তালিকার কিছুমাত্র প্রামাণিকতা আছে স্বীকার করিলে রাঘা বাদে পশ্চিম-ইরাণের অন্যান্য অঞ্চলগুলির অনুল্লেখ নিশ্চয় তাৎপর্যহীন ব্যাপার নহে। জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের পীঠস্থান মিডিয়ার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই। ভেন্দিদাদের রচনাকাল যদি খৃঃ পূঃ ৪০০ বৎসর হয় তাহা হইলে মিডিয়ার নাম এবং হাকামণি সাম্রাজ্যের উৎপত্তিস্থান কার্শের নাম উল্লেখ না করিবার হেতু কি? এই অনুল্লেখ যদি কোন প্রকার অভিসন্ধিমূলক না হয় তাহা হইলে বলিতে হয় লেখক আর্য বা ইরাণী আদি বসতি সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসরণ করিয়াছেন। এই কিম্বদন্তীর মর্ম এই যে আর্যজাতি পশ্চিম হইতে আসে নাই, পূর্বাঞ্চল হইতে পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, Eratesthenes, Strabo এবং আরও অনেকের মতে আবেস্তার আইরিয়ানা পূর্ব ইরাণ, আফগানিস্থান, বেলুচীস্থান প্রভৃতি অঞ্চল। হাকামণি সম্রাট প্রথম দারিয়ুসের একটি লেখনের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। আত্মপরিচয় দিয়া তিনি বলিতেছেন যে তিনি "Aryan, son of an Aryan, Persian, son of a Persian." পারশীক হইয়াও যে তাঁহাকে কুলগৌরব জানাইবার জন্ম বলিতে হইয়াছে যে তিনি আর্য ও আর্যের পুত্র ইহার প্রাঞ্জল অর্থ পারস্ত গোড়ায় আর্য দেশ ছিল না। ভেন্দিদাদের তালিকা এই কথা সমর্থন করে।

ইহার পর মিডিয়া ও পারস্তের প্রাচীন ইতিহাস ও জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের পশ্চিমমুখী গতি হইতে এই বিষয় সম্বন্ধে কি তথ্য পাওয়া যায় তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এই আলোচনার স্থান নাই। উপরের আলোচনা হইতে ইরাণী আর্য ও ভারতীয় আর্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহার কথা সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

ভেন্দিদাদের তালিকায় ষোলটি অঞ্চলের প্রথমটি যদি আর্য দেশ (আইরিয়ানা) অর্থে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে অকসাস ও সিন্ধুর অববাহিকা ও পশ্চিমে হরিরুদের অববাহিকা এই দেশের মধ্যে পড়ে ইহা বলা হইয়াছে। এই দেশের পশ্চিমে কিরমান ও শকস্থানের মরুভূমি; দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগর। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমানার মধ্যে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত পড়ে। অহুরা মাজদা এই দেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সুতরাং এই দেশের অধিবাসীরা এক জাতিভুক্ত মনে করা যাইতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের প্রতি বিরোধিতা সত্ত্বেও যখন তালিকায় সেই সকল অঞ্চল স্থান পাইয়াছে তখন তাহারা যে একজাতিভুক্ত ছিল এই ধারণা সমর্থিত হয়। এই জাতিকে যখন সপ্তসিন্ধু বা বর্তমান কালের পঞ্চসিন্ধু বা পঞ্জাব পর্যন্ত অবস্থিত দেখা যাইতেছে তখন জাতি (race) হিসাবে ইরাণী আর্য ও ভারতীয় আর্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল কিনা বিচার করা অনাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বিচার করিলে এই আর্য দেশের বর্তমান কালের অধিবাসিগণের এক বৃহৎ অংশকে অল্পবিস্তর তারতম্য সত্ত্বেও একটি প্রধান টাইপের অনুযায়ী দেখা যায়।

উপরের আলোচনার ফলে যে সকল সিদ্ধান্ত করা সম্ভব সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

আবেস্তার আইরিয়ানার অর্থ আর্য দেশ হইলে দেখা যায় যে এই আর্য দেশ হিমালয় হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত mountain axis ও মালভূমির পূর্ব-অঞ্চলে অবস্থিত। পূর্ব-ইরাণ, বর্তমান আফগানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ লইয়া এই দেশ গঠিত। এই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যাহারা বাস করিত তাহারা এক জাতীয় ও এক ভাষাভাষী ছিল অনুমান করা যায়। তাহাদের নাম আর্য হইতে তাহাদের দেশের নাম আইরিয়ানা হইয়াছে। এই আইরিয়ানা পরবর্তীকালে ইরাণে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই জাতি পশ্চিম অঞ্চল হইতে তাহাদের প্রাচীন বাস-

ভূমিতে আসিয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোন বিচারসহ যুক্তি বা প্রমাণ কেহ উপস্থিত করেন নাই। সুতরাং ককেশাশ বা দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়া বা খিরগিজ অঞ্চল হইতে মধ্য-এশিয়া বা মেশোপটেমিয়ার পথে অগ্রসর হইয়া ইরাণে তাহারা উপনিবিষ্ট হয় এবং ইরাণে উপনিবিষ্ট দলগুলির মধ্যে কয়েকটি দল বিচ্ছিন্ন হইয়া সিন্ধু-উপত্যকায় প্রবেশ করে এই মতবাদ ভিত্তিশূন্য। ইরাণে উপনিবিষ্ট আর্য জাতির মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মসংক্রান্ত বিবাদের ফলে ইরাণীয় আর্য ও ভারতীয় আর্যদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং জরাথুষ্ট্রের ধর্মান্দোলন এই বিচ্ছেদের প্রমাণ,—অর্থাৎ জরাথুষ্ট্রের ধর্মমত প্রচার ও ভারতীয় আর্যদিগের ইরাণ পরিত্যাগ এই দুইটি সমসাময়িক ঘটনা, এই মত গ্রহণ করা যায় না। জরাথুষ্ট্রের ধর্মমত বাখধি হইতে প্রচারিত হইলেও আবেস্তায় বর্ণিত এই আর্য দেশে স্থায়ী হইতে পারে নাই। নিশাই, চখ্রু ও হারাকাইতি সম্বন্ধে আবেস্তায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এ কথা প্রমাণ হয়। তার পর গৌতম বুদ্ধের উল্লেখ, Fravardin Yasht-এ বৌদ্ধ চক্রের (turning wheel) উল্লেখ ও প্রাচীন গাথা অংশে ও পরবর্তী ধর্মসাহিত্যে পুনঃ পুনঃ প্রতিমাপূজার প্রতি আক্রমণ প্রভৃতি হইতে প্রমাণ হয় যে জরাথুষ্ট্রের ও তাঁহার শিষ্যগণের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম। জরাথুষ্ট্রের পূর্বে বৈদিক ধর্ম এই অঞ্চলে প্রচারিত ছিল, গাথার সোমস্তুতি হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। জরাথুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্মের প্রকৃত অভ্যুদয় হইয়াছিল সুদূর মিডিয়ায়।

জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের এই পশ্চিমমুখী গতি বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের উপর কিরূপ আলোকপাত করে দেখা প্রয়োজন।

দয়াময় নাম কে রেখেছে ?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দয়াময় নাম তোমারে দিয়েছে
বড় বড় চাটুকারে,
এত নির্দয় কঠিন কঠোর
হইতে কি কেহ পারে ?
হে নাট্যকার, তোমার কি সখ ?
বিয়োগান্তই সকল নাটক,
হে মহাশিল্পী, সৃষ্টি তোমার
মেহাত লয়ের ধারে।

তোমার বাঁশীর সব শেষ সুর
সেই এক পূরবী তো,
যাহা সুমিষ্ট তাহার শেষেই
রেখেছ প্রচুর তিতো।
হাসিয়া বর্ণলঙ্কা পোড়াও,
সুন্দর ট্রয় নিমেষে ওড়াও,
সকল আলোক নির্বাণ লভি
মিশে এক অন্ধারে।

মানুষে দিয়াছ কতটুকু হাসি,
কতটুকু স্নেহ বল ?
তাহার শুষ্ক চক্ষে ঝরাও
একটা মেঘের জল।

এমন মাথা কি আছে উন্নত ?
চরণে তোমার হয় নাই নত।
হাঁটু গাড়া থেকে রেহাই দিয়াছ
বল দেখি তুমি কারে ?

তোমার ভুবনে দেখ্‌ছি কেবল
ব্যথাতুর চারি দিক,
নুরেনবার্গে ফাঁসির মতন
অতি মর্মস্পৃক।
শুধু লাঞ্ছনা হত্যা দম্ভ
কাল শেষ, যার আজি আরম্ভ
প্রসন্ন রূপ দেখিতে পাইনে
আঁখি মম জলভারে।

আনন্দময় আনন্দ তব
বুঝিতে পারিনে কি সে ?
তুমি সুধাময় সৃষ্টি তোমার
ভরা কেন এত বিষে ?
পদে পদে পাই শত দুখ তবু
মোরা যে সাগর-কপোত হে প্রভু
ভিজে হলেও বাঁচিতে পারিনে
পরিহরি পারাবারে।

(নাটিকা)

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

পাত্র-পাত্রী

সেলেস্ত—ফরাসী রূপসী, মুখখানা পুড়ে গেছে।

আনা—রুশ নর্তকী, একখানা পা কাটা গেছে।

এভা—জার্মান বালিকা, বাপ মা ভাইবোন সব মারা গেছে।

অপূর্ব—বাঙালী শিল্পী ; অন্ধ হয়ে গেছে।

পল—পোলীশ পিয়োনোবাদক, তার হাতের আঙুল উড়ে গেছে।

জন—অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড়, বুকের রোগে ভুগছে।

অদূরে একখানা বাড়ী, ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে এসেছে বাগানে। বাগানে ছোট বড় ফুল-ফলের গাছ, একটা গাছের নীচে একখানা বেঞ্চ ও কয়েকখানা বেতের চেয়ার পাতা। সিঁড়ি বেয়ে বাগানে নেমে আসে অপূর্ব আর সেলেস্ত, অপূর্বকে হাত ধরে নিয়ে আসে সেলেস্ত।

অপূর্ব—তুমি কি বললে সেলেস্ত, আকাশ আজ খুব নীল ?

সেলেস্ত—খুব নীল আর গাছের পাতা বড় সবুজ।

অপূর্ব—আমি যে দেখতে পাচ্ছি না, তবু আকাশ আজ খুব নীল, গাছের পাতা বড় সবুজ।

(অপূর্বকে বেঞ্চে বসিয়ে দিয়ে সেলেস্ত পাশে বসে)

সেলেস্ত—একটা সাদা কারনেশানের উপরে একটা হলদে প্রজাপতি বসেছে—কি চমৎকার !

অপূর্ব—সত্যিই চমৎকার ! নীল, সবুজ, সাদা, হলদে—চমৎকার ! তুমি কি কোন দিন ছবি এঁকেছ সেলেস্ত ?

সেলেস্ত—না, ছবি আঁকি নি।

অপূর্ব—আমি আর ছবি আঁকব না, আমি আর রং দেখতে পাব না ; আমার জগতে আজ একটি মাত্র রং—গভীর কালো।

সেলেস্ত—হয়তো একদিন তুমি আবার দেখতে পাবে।

অপূর্ব—না, দেখতে পাব না—চোখ আমার এ জন্মের মত গেছে। পৃথিবীকে শেষ দেখা দেখেছিলাম সিঙ্গাপুরের সমুদ্র-উপকূলে।

সেলেস্ত—বম্ ?

অপূর্ব—বম্। আর রং দেখব না, আর রূপ দেখব না সেলেস্ত ! (অপূর্বের হাতের উপর হাত রেখে) কি অপূর্ব ?

অপূর্ব—তুমি সুন্দরী।

সেলেস্ত—না।

অপূর্ব—তুমি সুন্দরী, আমি সেটা বুঝতে পারি আমি সেটা অনুভব করতে পারি।

সেলেস্ত—তুমি তো জান আমার ইতিহাস, রূপ আমার ছিল কিন্তু এখন আর নাই। রূপ পুড়ে গেছে।

অপূর্ব—(সেলেস্তের হাতের উপর হাত দিয়ে) কিন্তু আমার অনুভব কেমন করে মিথ্যা হবে ? আমার যেন মনে হয় তুমি সুন্দরী, তুমি তন্বী তরুণী, গোলাপের মত তোমার গায়ের রং, সরু দুটি ভুরুর নীচে দুটি নীল চোখ—কৌতুকে ভরা।

সেলেস্ত—(একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—একটু হাসে)

অপূর্ব—আমার চোখ থাকলে আমি তোমার ছবি আঁকতাম।

সেলেস্ত—চোখ থাকলে? চোখ থাকলে, তুমি আমার ছবি আঁকতে না।

অপূর্ব—আঁকতাম, নিশ্চয় আঁকতাম।

(সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে লাঠি ভর দিয়ে জন, পাশে পাশে আসে পল, ডান হাতখানা তার দস্তানা দিয়ে ঢাকা)

জন—আজ কোন্ তারিখ পল?

পল—১৩ই নবেম্বর।

জন—নবেম্বরের মাঝামাঝি। ক্রিকেট খেলা সুরু হয়েছে অষ্ট্রেলিয়ায়।

পল—হ্যাঁ, অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলা চলছে।

জন—কি অপূর্ব খেলা এই ক্রিকেট! উম্মুক্ত আকাশের নীচে সবুজ মাঠের বুকে সারাদিন ছুটোছুটি; কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বল করে চলেছি, ক্লান্তি নেই। কখনো ব্যাট করছি···(দাঁড়িয়ে লাঠি-খানা ব্যাটের মত ধরে বল মারবার ভঙ্গী করে, তারপরে হঠাৎ কাশতে সুরু করে)

পল—(জনের পিঠে হাত দিয়ে) আজ বড্ড কাশছ জন।

জন—এই বুকটাতে আর কিছু নেই পল।

(দু'জনে এগিয়ে আসে)

অপূর্ব—কারা আসছে?

সেলেস্ত—পল আর জন।

(পল আর জন এসে চেয়ারে বসে)

সেলেস্ত—আজ কেমন আছ, জন? আজ দিনটা ভারি চমৎকার, কত রোদ!

জন—চমৎকার দিন, কত রোদ, ক্রিকেট খেলার আদর্শ দিন। জানো সেলেস্ত, আমি এক দিন একা ছয়টা উইকেট নিয়েছিলাম আর করেছিলাম একটা সেঞ্চুরি, ক্লান্তি কাকে বলে জানতাম না—পেশীগুলো ছিল ইস্পাতের, কিন্তু আজ?

সেলেস্ত—তুমি ভাল হয়ে যাবে জন।

জন—(ম্লানভাবে হাসে তারপরে খক্ খক্ করে কাশে)

অপূর্ব—সেলেস্ত বলে এক দিন আমার চোখও ভাল হয়ে যাবে।

পল—আচ্ছা বল তো সেলেস্ত আমার হাতের কাটা আঙুলগুলো আবার গজাবে কিনা?

(সবাই হাসে)

পল—(দস্তানা খুলে ফেলে আঙুলহীন হাতখানা উঁচু করে) হে স্বর্গগত বিটোফেন, দেখুন আপনার দেশবাসীরা আমার দামী আঙুলগুলো বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে, নাইনথ সিম্‌ফনী আর এ হাতে বাজবে না।

(সবাই হাসে)

(হাতে আবার দস্তানা পরতে পরতে) মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি আঙুলগুলো আমার ঠিকই আছে, টিপে দেখে দেখে দেখি, ভারি আনন্দ হয়—ছুটে গিয়ে পিয়ানোর সামনে বসি, একটার পর একটা সুর বাজাই!

(সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে)

জন—আমিও স্বপ্ন দেখি, ক্রিকেট খেলছি।

অপূর্ব—আমিও দেখি, (হেসে) অন্ধেও স্বপ্ন দেখে!

(সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে)

সেলেস্ত—১৯৩৮ সালে প্যারিতে আমি পলের পিয়ানো বাজনা শুনি। এখনও মনে পড়ে পিয়ানোর চাবিগুলোর উপরে ওর লম্বা আঙুলগুলোর নাচ।

পল—(হাঁটুর উপর হাতখানা রেখে) সে আঙুলগুলো আজ কোথায়? সুর হয়ে শূন্যে উড়ে গেছে!

(সবাই করুণভাবে হাসে)

জন—১৯৩৮ সালে? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সিডনিতে আমি ক্রিকেট খেলছি, বোলার-হিসেবে আমার নাম হ'ল সেবারই।

অপূর্ব—১৯৩৮ সালে আমি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করছি; কি অপূর্ব দেশ, কি সুন্দর দৃশ্য, ছবির পর ছবি এঁকে চলেছি। তারপরে যাই অজন্তা—সে রেখা, সে রং আর দেখতে পাব না।

সেলেস্ত—১৯৩৮ সাল, মনে পড়ে, অনেক কথা মনে পড়ে—থাক; চল অপূর্ব, তুমি যে একটু ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিলে?

অপূর্ব—(উঠে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, চল (হাত বাড়িয়ে দেয়, লেলেভ হাত ধরে, দু'জনে আস্তে আস্তে চলে যায়)

পল—তুমি ওর ফটোগ্রাফ দেখেছ ?

জন—কার ?

পল—লেলেভের।

জন—দেখেছি, ওর টেবিলের উপর সেখানা সব সময়েই থাকে।

পল—কি রূপই ছিল ওর ! যে মুখখানার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মানুষের আশ মিটত না, সেই মুখখানার দিকে আজ তাকাতে ভয় হয়। আগুনের শিখা ওর মুখ থেকে সবটুকু রূপ লেহন করে নিয়েছে।

জন—লক্ষ্য করেছ ও আমাদের কাছে বেশীক্ষণ বসে না ?

পল—হ্যাঁ, কেন তা জানো ?

জন—জানি।

পল—ও অপূর্বকে সঙ্গী বেছে নিয়েছে।

জন—ঠিকই করেছে, অপূর্ব দেখতে পায় না। যদি ওর মত আমার মুখটা পুড়ে যেত তা হলে কিছু ক্ষতি হ'ত না। আমার এই পেশীগুলো যদি সবল থাকত তা হলে আমি ক্রিকেট খেলতে পারতাম, কিন্তু এই রোগটা (বুকে হাত দিয়ে), এই রোগটা—(কাশতে সুরু করে)

পল—ও রকম কথা আমারও মনে হয় ; সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়েও যদি আমার আঙুল ক'টা আজ বজায় থাকত।

(দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে এতা, হাতে তার এক গোছা ফুল)

পল—বাঃ কি সুন্দর ফুল, এত ফুল কোথায় পেলে এতা ?

এতা—অনেক দূরে একটা বাগান আছে, কত ফুল সেখানে। এই ক'টা আজ নিয়ে এলাম।

পল—বেশ করেছ, ঘরে নিয়ে সাজিয়ে রাখ।

এতা—(কাছে এসে) আমি যে আপনার জন্যেই নিয়ে এলাম !

পল—আমার জন্যে ?

এতা—হ্যাঁ, আপনার জন্যে (ফুলের গোছা এগিয়ে দিয়ে) নিন্।

জন—এতা তোমার অত্যন্ত পক্ষপাতী, ও কেবল তোমাকেই ভালবাসে।

পল—তাই নাকি এতা, এ তো ভারি অন্যায়।

এতা—(লজ্জিত হয়ে পড়ে)

পল—(এতাকে কাছে টেনে) বড় ভাল মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে, আমাকে তুমি ভালবাস এতা ?

এতা—(ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়)

পল—(হেসে) কেন বল তো, আমি বুড়ো বলে বুঝি ?

এতা—না, আপনি, আপনি আমার বাবার মত দেখতে।

(পল এতার মাথায় হাত বুলোয়)

পল—লক্ষ্মী মেয়ে, ফুল পেয়ে আমি খুব খুশী হয়েছি ; যাও আমার ঘরে টেবিলের উপর রেখে এস।

(এতা চলে যায়)

পল—বাপ, মা, ভাই বোন সবাইকে একই মুহূর্তে হারিয়েছে, আহা বেচারা !

জন—(কাশতে থাকে)

পল—(আঙুলহীন হাতখানা হাঁটুর উপর রাখে)

(সিঁড়িতে খট্ খট্ আওয়াজ হয়, পল আর জন সেই দিকে তাকায়, কাঠের ঠেকা নিয়ে এঁকে বেঁকে আসে আনা, এক বার দাঁড়ায়)

জন—আজও ঠেকা নিয়ে চলতে আনা অভ্যস্ত হয় নি।

পল—কোন দিনই অভ্যস্ত হবে না। একটা পখচিলের ডানা কেটে যদি কাঠের ডানা বেঁধে দেওয়া যায় তা হলে যেমন হয় এ যে তার চেয়েও করুণ ! আনার একখানা পা কাঠের।

জন—তুমি ওর নাচ দেখেছ ?

পল—দেখেছি, এক বার নয়, অনেক বার—মস্কোতে। ওর সুঠাম পা দু'খানার লঘুগতি আর অপূর্ব ভঙ্গিমার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। আজ তার একখানা পা—(থেমে যায়)

জন—নেই।

(আনা এসে উপস্থিত হয়, পল উঠে তার কাঠের ঠেকা দু'খানা নেয়, একখানা চেয়ারে তাকে সযত্নে বসিয়ে দেয়)

আনা—(চেয়ারে বসে লম্বা গাউনে কাঠের পা ঢাকতে চেষ্টা করে) ধন্যবাদ পল, কি চমৎকার দিন, ঘরে বসে থাকতে পারলাম না—চলে এলাম, অথচ আমার চলা তো যেমন-তেমন চলা নয়, যেন—যেন—একটা উপমা দাও পল।

পল—(যেন শুনতে পায় না, অনেক দূরে কি যেন দেখে)

জন—চমৎকার দিন, সত্যিই চমৎকার দিন, ভেতরে থাকতে পারি নে, বাইরে ছুটে আসি—আলো-ঝলমল মাঠের দিকে চেয়ে থাকি—হঠাৎ যেন দেখতে পাই সেই মাঠের এখানে ওখানে মানুষ ঘুরছে ফিরছে, ছুটছে—তারা ক্রিকেট খেলছে। আর চেয়ে থাকতে পারি নে, ভেতরে ফিরে যাই। চমৎকার দিন !

(পল উস্‌খুস্‌ করে—জন আর আনাকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে হঠাৎ উঠে একটা প্রজাপতির পেছনে ছোটে, তারপরে এসে বসে)

আনা—ভারি সুন্দর, ভারি চমৎকার !

পল—কি ?

আনা—আমি তোমার গতিশীল পা দু'খানা দেখছিলাম, ভারি সুন্দর !

পল—আমার পা সুন্দর—বলো কি আনা। এমন কদাকার ভারী পা দু'টিকে তুমি সুন্দর বললে কেমন করে?

আনা—(হাসে)

জন—যেমন এক জোড়া উটের পা-ও কাঠের ঠেকার চেয়ে সুন্দর।

পল—(চোখের ইশারায় জনকে তিরস্কার করে)

আনা—এ আমার কি হয়েছে বল তো পল, নজর আমার সব সময় সবার পায়ের দিকে।

পল—অত্যন্ত ছোট নজর।

(সবাই হাসে)

আনা—আবার কি মনে হয় জানো, মনে হয় সবাই আমার একটা পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

পল—অন্তত আমি এক সময়ে তাকিয়ে থাকতাম, অবিশ্যি তখন দুটো পা-ই তোমার ছিল।

আনা—মনে পড়ে আমার নাচ? কেমন ছিল আমার পা দু'খানা?

পল—মনে পড়ে, পরিষ্কার মনে পড়ে।

আনা—আমি অনেক সময় স্বপ্ন দেখি আমি নাচছি, আমার পা ফিরে পেয়েছি।

পল—প্রিন্সেস হার্মহিসের মত?

(সবাই হাসে)

জন—তুমি স্বপ্ন দেখ ঘুমিয়ে, আমি স্বপ্ন দেখি জেগেই।

(এভা আবার ছুটে আসে)

পল—এভা চলবে তো ছুটে!

আনা—কি সুন্দর ওর হাত-পাগুলো, সবল আর নিটোল। ঐ বয়সে আমি নাচতে সুরু করি।

পল—আঙুলগুলোও বেশ লম্বা।

জন—(উঠে দাঁড়ায়) আমি যাচ্ছি পল।

আনা—শরীরটা কি ভাল নেই?

জন—(হাসবার চেষ্টা করে, তারপরে কাশে)

পল—(উঠে) চল, আমিও যাচ্ছি।

(দু'জনে চলে যায়)

এভা—(আনার কাছে এসে দাঁড়ায়)

আনা—(এভার চুলগুলো নাড়ে)

এভা—তুমি খুব বড় নর্তকী, না আনা?

আনা—কে বলেছে তোমাকে?

এভা—ওরা বলেছে।

আনা—এক সময়ে ছিলাম।

এভা—তোমার নাচ দেখতে ইচ্ছে করে।

আনা—আমার নাচ আর দেখতে পাবে না।

এভা—আমি ছবিতে দেখেছি তুমি একখানা পায়ের উপর ভর দিয়ে আর একখানা পা উঁচুতে তুলে দাঁড়িয়ে আছ, হাঁটু পর্যন্ত সাদা লেসের গাউন তোমার—কি সুন্দর যে দেখতে!

আনা—খুব সুন্দর?

এভা—খুব সুন্দর। আমার ইচ্ছে করে ঐ পোশাকে তোমাকে নাচতে দেখি। ঐ রকম ভাবে একটু দাঁড়াও না আনা?

আনা—একটা পায়ের উপর? আজ একটা পা-ই যে সম্বল!

এভা—কি সুন্দর তোমার ঐ একটি পা, এক বার দাঁড়াও আনা।

আনা—(এভার মুখের দিকে চায়, আস্তে আস্তে চেয়ারের হাতল ধরে উঠে দাঁড়ায়, চারদিকে চেয়ে দেখে, তার পরে একটি পায়ের উপর ভর দিয়ে কাঠের পা উঁচু করে দাঁড়ায়—সেটা ছিল তার নাচের একটা অপূর্ব ভঙ্গী)

এভা—কি সুন্দর, কি সুন্দর! (হাততালি দেয়)

আনা—(চেয়ারে বসে পড়ে) না-না, হাততালি দিও না এভা।

এভা—(থেমে গিয়ে) কেন?

আনা—ভালো লাগে না, কি যেন মনে পড়ে।

(কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে)

এভা—(কাছে এসে) আমি নাচ শিখবো—নর্তকী হব।

আনা—(মুখের দিকে কেমন একভাবে তাকায়) নাচতে শিখো না।

এভা—কেন শিখবো না ?

আনা—যদি, যদি আর একটা যুদ্ধ বাধে।

(দু'জনে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে)

এভা—কিন্তু নাচতে বড় ভাল লাগে।

আনা—আমারও ভাল লাগতো, কিন্তু হঠাৎ যদি এক দিন এমন হয় যে আর নাচতে পারবে না—বেঁচে থাকবে, হাসবে, কথা কইবে কিন্তু নাচতে পারবে না—তা হলে ?

(এভা বোঝে না, চেয়ে থাকে)

আনা—(নিজের মনেই বলে যায়) নাচ যার আনে অর্থ, আনে যশ, আনে উত্তেজনা, আনন্দ—জীবন মানেই যার নাচ, যদি হঠাৎ এক দিন সে আর নাচতে না পারে তা হলে ?

(একটু থেমে)

ঐ যে দুটো মানুষ চলে গেল, এক জন আর পিয়োনো বাজাবে না, আর এক জন ক্রিকেট খেলবে না, ঐ যে দুটো মানুষ গাছের আড়ালে আড়ালে ছায়ার মত ফিরছে, এক জন আর কারো মুখ দেখবে না, আর এক জন কাউকে মুখ দেখাবে না—ওরা কি মানুষ ? ওরা মানুষ নয়, ওরা ভূত, ওদের বর্ত্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই, অতীত নিয়ে বেঁচে আছে।

(কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে থাকে)

আনা—(উঠে দাঁড়ায়) চলো এভা, লাঠি দু'টো দাও তো লক্ষীটি। (এভা লাঠি দুটো এগিয়ে দেয়, এঁকে-বেঁকে আনা চলে, এভা চলে তার পাশে পাশে—একটু পরে আসে অপূর্ব আর সেলেস্ত)

অপূর্ব—ওরা বুঝি চলে গেছে ?

সেলেস্ত—চলে গেছে। (চেয়ার টেনে নিয়ে) বসো।

(অপূর্ব বসে, সেলেস্তও বসে)

অপূর্ব—সেলেস্ত !

সেলেস্ত—কি ?

অপূর্ব—কোন শিল্পী কি তোমার ছবি এঁকেছে ?

সেলেস্ত—এঁকেছে, অনেক এঁকেছে ; এক সময়ে কত শিল্পী যে আসতো তার ঠিকানা নেই। কিন্তু আজ ?

অপূর্ব—(চুপ করে থাকে)

সেলেস্ত—কিন্তু আজ কেন আসে না ?

অপূর্ব—(চুপ করে থাকে)

সেলেস্ত—বলো শিল্পী, আজ কেন আসে না ? আমার রূপ আর নেই বলে ? তোমরা যে রূপের এত উপাসনা কর, যে রূপ ছবিতে ফোটাতে এত সাধনা কর সে কি এত পল্‌কা, এত কাঁচা যে, একটু আঁচে একেবারে গলে যায় ? সে কি চেয়ার টেবিলের বার্নিশের মত একটুতেই চটে যায়—তার কি স্থায়ী কোন ভিত্তি নেই ?

(দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে)

সেলেস্ত—রূপ কি ?

অপূর্ব—রূপ কি ? বলতে পারছি নে। এক সময়ে হয়তো বলতে পারতাম। এক সময়ে ধারণা ছিল রূপ কি, কিন্তু এখন যেন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, একটা অন্তহীন অন্ধকারে রং-রেখা, ভাব-ভঙ্গিমা ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সেলেস্ত—(চুপ করে থাকে)

অপূর্ব—বল তো সেলেস্ত, আজও কি মাথার উপরে আকাশ আছে, সেখানে মেঘ ভেসে আসে ভেসে যায়, আজও কি পাহাড়গুলো উঁচু হয়ে আছে—না—সমতল হয়ে গেছে ? বল তো সেলেস্ত আজও দিনরাত্রি হয়, গাছের ডালে কচি পাতা গজায় ?

সেলেস্ত—(চুপ করে থাকে)

অপূর্ব—বলো সেলেস্ত, আজ সব ফুলের কি একটা রং ? পৃথিবীতে আজও কি রূপ আছে ?

সেলেস্ত—পৃথিবীতে আজও কি রূপ আছে, রূপের পুজো আছে ?

অপূর্ব—বলো, আছে ?

সেলেস্ত—জানি না।

(দু'জনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তার পরে পট পড়ে)

শ্রেষ্ঠ দান

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

আমার সে কল্পলোক আপনারে লয়ে
কত ফুল ফুটায়েছে, প্রাণ্ত উথলিয়ে
উঠেছে অমৃত বিন্দু, সুখ শতদল
ফুটেছে আলোক ভরে, লীলা অচঞ্চল
কৌতুকে রয়েছে জাগি', বসন্ত বাতাস
ছুঁয়ে গেছে মল্লীমালা, শুভ্র নভকাশ
জানায়েছে হাসি, নদী গেয়ে গেছে গান ;
তুমি শুধু নেছ তব সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান।

যেথা দাঁড়ায়েছ তুমি আমার জীবন
পারিবে না সেথা যেতে, অনন্ত স্বপন
তবু ত ভেঙেছ তুমি অঙ্গুলী পরশে—
তাই তাহা তোমা' দিনু, তুমি ব্যথারসে
তাহারে ডোবালে, মোর সুখের সন্তান
বেদনায় ফুটে র'ল—তব শ্রেষ্ঠ দান।

'অমৃত বাজার পত্রিকা' ও স্বাধীনতা আন্দোলন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

রাজা রামমোহন রায় ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুসংস্কৃত ও শৃঙ্খলমুক্ত করিবার জন্য সময়োচিত ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৩৩ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে যে ধারায় ভারতীয় শাসনভার ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ক্রমশঃ সমগ্র ইংরেজ-সমাজের উপর গিয়া বর্ত্তে তাহা তখন হয়ত তিনি আঁচ করিতে পারেন নাই। এই ধারা অব্যাহত ভাবে চলিয়া সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যেই ১৮৫৮ সনে রাণী ভিক্টোরিয়া-কর্তৃক শাসনভার গ্রহণের ফলে পরিণতি লাভ করিল। তখন একটি বিশেষ ইংরেজ কোম্পানীর পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট মারফত ইংরেজ জাতিই আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা হইল। ইংরেজ-রাজ বিজ্ঞানের পূর্ণ সহায়তা লইয়া তার ও রেলপথ দ্বারা ভারতের দূর দূরান্তের দুর্গম অঞ্চলের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিয়া ফেলিলেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের পথও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া যাতায়াতের সুবিধা হয় এবং ইংরেজদের পক্ষে এ দেশ নিতান্তই প্রবাস বলিয়া বিবেচিত হয়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে একাদিক্রমে দীর্ঘকাল অবস্থানহেতু ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্প্রীতি ঘটিবার যে কথঞ্চিৎ সম্ভাবনা ছিল তাহাও আর রহিল না। কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষের শাসন-কাঠামোতে যে সব খুঁত ছিল, ব্রিটিশরাজ রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার পর তাহা সংশোধিত হইয়া ক্রমে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিল। ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের সর্ব্ব বিভাগই শাসন-সৌকর্য্যে ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গেল, আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ করের পর কর বসাইয়া ভারতীয় জনগণকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ভারতবাসীদের টাকায় শাসনকার্য্য চলিবে, অথচ ইহাতে তাহাদের কোন হাত থাকিবে না। এক দিকে ভারতীয় মনীষিগণ এবং অন্য দিকে 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি প্রগতিশীল সংবাদপত্র এই অন্যায় ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিতে সুরু করেন। কেহ কেহ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার লাভে তৎপর হইয়া আন্দোলন পরিচালনে অগ্রসর হন। কিন্তু 'অমৃত বাজার পত্রিকা'ই সর্ব্বপ্রথমে ঘোষণা করিলেন যে, ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে জেতৃ-বিজিতের সম্বন্ধ, কাজেই একের লাভে অন্যের ক্ষতি, এবং স্বাধীনতা লাভ না হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই। পত্রিকা ইহার উপায়ও নির্ণয় করিতে ত্রুটি করেন নাই।

অমৃত বাজার পত্রিকা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি যশোহরের অন্তর্গত অমৃত বাজার (পূর্ব্ব নাম পলুয়া-মাগুরা) হইতে শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হইল। প্রথম সংখ্যার অনুষ্ঠান-পত্রে আলোচ্য বিষয়াদি প্রসঙ্গে সম্পাদক লেখেন,

> আমাদের বিশেষ যত্ন থাকিবে যে, যে স্বার্থশূন্য মহাত্মা ইংরেজ বাহাদুরেরা আমাদের দেশ, পরম অত্যাচারী যবন অধিকার হইতে স্বীয় হস্তে লইয়া আমাদের এত উন্নতি করিয়াছেন—যাঁহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, রাজ্যশাসনের ন্যায় অতি ক্লেশকর ও কঠিন কার্য্যে আমাদিগকে হস্তক্ষেপণ করিতে দেন না, তাঁহাদিগের রীতি, নীতি, উদ্দেশ্য, স্বার্থশূন্যতা ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের নিকট যে ঋণপাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পরিশোধের যত্ন করি।

সদাশয় ইংরেজ কর্ম্মচারীদের 'রীতি নীতি উদ্দেশ্য' প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে পত্রিকার শীঘ্রই সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। পত্রিকা জনৈক সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারীর দুষ্কার্য্যের কথা প্রকাশ করায় একটি মানহানির মোকদ্দমায় জড়াইয়া পড়িলেন। ইহার পর সম্পাদক ৯ জুলাই ১৮৬৮ সংখ্যায় যাহা লেখেন তাহাতে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য অধিকতর পরিস্ফুট হয়। তিনি লেখেন,

> বলের দ্বারা সত্য লুকাইয়া রাখা আর কাপড় দিয়া আগুন বাঁধার চেষ্টা সমান। আমরা প্রায়ই স্পষ্ট কথা বলি। যে ঘটনা যে রকম তাহা সাধারণকে স্পষ্ট করিয়া দেখাই। কাহার অনুরোধে কিংবা কাহাকে বিরক্ত করিবার ভয়ে কোমল করিয়া লিখি না। ফল আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কর্ত্তৃপক্ষকে প্রার্থনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমাদের দেশীয়েরা কিরূপ অবস্থায় আছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কিরূপ হীনাবস্থায় আছেন, তাহা তাঁহারদিগকে দেখানই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা কটগ্রাকার মাত্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক কটগ্রাফ লইয়া আমরা এদেশীয়দিগকে দেখাইয়া থাকি, যদি কটগ্রাফি তুলিতে এরূপ ছবি উঠে যে, কেহ অন্যের মুখের ভাত কাড়িয়া খাইতেছে; বলবান্ দুর্ব্বলের গলা টিপিতেছে, অভদ্র অপমান করিতেছে; এক জনের ন্যায্য স্বত্ব অন্যকে দেওয়া হইতেছে; বিচারক অবিচার করিতেছেন, তবে আমাদের হাত কি?
>
> কোন২ প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ আমারদিগকে এরূপও বলিয়াছেন যে, আমাদের পত্রিকা কর্ত্তৃক জাতিবৈরতা নষ্ট না হইয়া আরো বৃদ্ধি হইবে। এই উপদেশের নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ। কিন্তু জাতিবৈরতা নিবারণ করার কর্ত্তা কে? আমরা অধিক ত কিছু চাই না, দুটি মিষ্ট কথা আর পাতের চারিটি প্রসাদ পাইলেই কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞতায় গদগদ হই। প্রতিহিংসার স্থান হিন্দুদিগের মন নয়। আমরা প্রহার খাইয়া যদি প্রহারকের নিকট

দুটি মিষ্ট কথা শুনি তাহা হইলেই আমাদের মন গলিয়া যায়। আমরা ইংরেজ অপেক্ষা এ দেশীয়দিগকে অধিক ভালবাসি, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু বোধ হয় ন্যায়পরতা আমাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। মনে একটি মুখে অন্ত প্রকার যাঁহারা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা মনের কথা যাঁহারা খুলিয়া বলেন, তাঁহারা কি ভাল করেন না? অতএব সত্য কথা বলিতে যে ফল হউক না কেন, আমরা তদ্বিষয় একবার চিন্তাও করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার একটি 'মটো' বা শিরোভূষণ ছিল। ৭ই মে, ১৮৬৮ তারিখ হইতে ইহা প্রদত্ত হয়। পর বৎসরের প্রথম তিন সংখ্যায় ইহা ব্লকে উৎকীর্ণ ছিল। ইহার পর শিরোভূষণটি আর মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু এই শিরোভূষণ হইতেও পত্রিকার উদ্দেশ্য ও স্বাধীনচিন্ততা পরিস্ফুট হইতেছে—

"অধীনতা* কালকূটে মরি হায়২
করেছে কি আর্য্যসুতে চেনা নাহি যায়।"

সমসাময়িক সংবাদপত্রে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার কথা উল্লিখিত হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রাচীনপন্থী ও কতকটা সরকার-ঘেঁষা সংবাদপত্র, কাজেই পত্রিকার মতামত অধিকাংশ সময়ই সমর্থন করিতে পারিতেন না। তথাপি উপরোক্ত গুণ-নিচয়ের প্রশংসা করিয়া লেখেন,—

"অমৃত বাজার অল্পদিন হইল বঙ্গদেশের রঙ্গভূমিতে ক্রীড়া করিতেছে, চন্দ্রিকার নিকট বালাক্রীড়া ব্যতীত আর কি বোধ হইবেক? যাহা হউক তাহার বিষয় দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অমৃত বাজারের বাক্যগুলি তেজীয়ান, বাঙ্গালাদিগের নিকট অমৃত তুল্যই বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের নিকট সর্ব্বদা বিষবৃষ্টি ব্যতীত অনুভূত হয় না। বস্তুতঃ নিরপেক্ষ ভাবে স্বাধীনতা প্রদর্শন ও দেশের প্রকৃত স্বাধীনতার চেষ্টা অমৃত বাজারের ন্যায় কোন পত্রিকায়ই দেখা যায় না। এমন কি কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতেছেন।...(১৮ জানুয়ারি ১৮৭২ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' উদ্ধৃত)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সার্থক বাহন এই অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার সে যুগে ভারতবাসীদের, এমন কি ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রাণেও কিরূপ স্বদেশভক্তির উদ্রেক করিয়াছিলেন কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি অমৃত বাজার পত্রিকা প্রকাশের অল্পকাল পরেই, ১৮৬৮ সনের জুলাই মাসে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া যশোহরে গমন করেন এবং ঘটনাচক্রে শিশিরকুমারের সংস্রবে আসিয়া পড়েন। তিনি লিখিয়াছেন,

শিশিরকুমার তখন মাতৃভূমির দুঃখের কথা কহিতে কহিতে কাঁদিয়া ফেলিতেন, উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইতেন।...যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড কবিতা ও 'পলাশীর যুদ্ধে' স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক। (আমার জীবন, ২য় ভাগ)

ভারতের বর্ত্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনের মর্ম্মকথা জানিতে ও বুঝিতে হইলে অমৃত বাজার পত্রিকার প্রথম যুগের রচনাবলী বিশেষভাবে অনুধাবন ও অনুশীলন করা প্রয়োজন। ইহার প্রথম দুই বৎসরের ফাইল এতদিন না পাওয়ায় এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অসম্পূর্ণ ছিল। সম্প্রতি এই ফাইলগুলি* পড়িবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। ইহা হইতে অবশ্যজ্ঞাতব্য কতকগুলি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল। সামাজিক জীবনের নানা সমস্যার কথা ছাড়াও শাসনে অনাচার, বিচারে পক্ষপাতিত্ব, শ্বেত-কৃষ্ণের জাতিবৈরিতা, জেতৃ-বিজিত সম্পর্ক, আপোষে ইংরেজের ভারতবর্ষ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা, এশিয়াবাসী-দের জন্য এশিয়া, জাতীয় ঐক্যসাধন এবং সর্ব্বোপরি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা পত্রিকার বিভিন্ন রচনায় পরিব্যক্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্লেমেণ্ট এটলী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী বৎসরে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজেরা চলিয়া যাইবে, অর্থাৎ এ দেশে ব্রিটিশ কর্ত্তৃত্বের অবসান ঘটিবে। ঠিক আশী বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬৮ সনের ২৬শে মার্চ্চ তারিখে পত্রিকা বেথুন সোসাইটির একটি অধিবেশনের বিষয় আলোচনা-কালে উক্ত সমিতিতে উত্থাপিত ব্রিটিশের ভারত-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তার কথা আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেন এবং এই মন্তব্য করেন যে, ভারতবাসী পূর্ণস্বাধীনতা লাভ না করিলে ভারতবর্ষের পূর্ণ উন্নতি অসম্ভব।

ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবর্ষ

১৮৫৯ সালে যশোহরে ঘোড়দৌড় হয় ও তখন শতাবধি নীল কুঠিয়াল ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত আমোদ-প্রমোদ করে; পর বৎসর সেই সময়ে আর কয়েকটি কুঠিয়ালের আমোদ-প্রমোদে ইচ্ছা ছিল? '৫৭ সালে যে তদ্রূপ বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল তাহা কি কেহ স্বপ্নেও ভেবেছিলেন? লং সাহেব যখন নীল কুঠিয়ালদের যত্নে কারারুদ্ধ হন তখন বলিয়াছিলেন যে আমি

---

* ৭ই মে-সংখ্যায় 'অধীনতা' স্থলে 'পরাধীন' মুদ্রিত হয়।

* ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় 'পুস্তকালয়' শীর্ষক নিবন্ধে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারগুলির উল্লেখ আছে। ইহার ভূমিকায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চুঁচুড়ার গ্রন্থাগারটির কথাও বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ-সংগ্রহটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার পথে ছিল। সম্প্রতি বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় ইহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে এবং তন্মধ্যেই অমৃত বাজার পত্রিকার প্রথম দুই বৎসরের ফাইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ফাইলগুলি উক্ত ফণ্ডের সভাপতি শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কারারুদ্ধ হইয়াছি ইহাতে নীলকরেরা জিতিল না প্রজারা জিতিল ? আমরাও বলি যে ড্যালহাউসি যখন অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন তখন কি তিনি জিতিয়াছিলেন ? কন্যাকুমারী হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের তাবৎ অধিবাসিগণের অমতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যে ভারতবর্ষীয় অর্থ লইয়া তুর্কীর সুলতানের ভোজ দিলেন কি আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ব্যয় করিলেন ইহাতে কি ইংলণ্ড গবর্ণমেন্ট জিতিলেন ? যদি মনুষ্যের মন দেখা যাইত তবে ইংরেজেরা দেখিতে পাইতেন যে, এই অপমান ও গ্লানি সুশিক্ষিত বাঙালী মাত্রের হৃদয়ে অনবরত জাগরূক। ইহা কি ইংরেজেরা বুঝেন না যে বিদেশী কর্ত্তৃক শত বর্ষের অনুগ্রহ ও ভদ্রতা এইরূপ একটি অত্যাচারে ধৌত হইয়া যায় ? আয়ারলণ্ড ও ইংলণ্ডে কত নৈকট্য সম্বন্ধ, মধ্যে কেবল একটি ক্ষুদ্র সাগর বই নয়। উভয় দেশের লোকেরা এক জাতি ও তাহাদের আচার, ব্যবহার, নীতি, পদ্ধতি, ভাষা, মানসিক ভাব সমুদায় প্রায় এক প্রকার। আইরিশ রাজ্য ইংরেজদের ন্যায় পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠাইতেছেন, সুতরাং নিজের দেশ নিজে শাসন করিতেছেন, তবু ত তাঁহারা ইংরেজদের বাধ্য হইলেন না। আমরা আইরিশদের ন্যায় একণে স্বাধীনতা প্রার্থনা করি না। ইংরেজেরা আমাদের পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও আমরা একণে তাহাদিগকে ছাড়িতে পারি না। আমরা একণে আর কিছুরই প্রার্থী নই, রাজপুরুষেরা পার্লিয়ামেণ্টে আমাদিগকে প্রতিনিধি পাঠাইতে দিউন ইহাই আমাদের মানস। আমাদের দেশীয়দের মধ্যে পার্লিয়ামেণ্টে বসিবার উপযুক্ত পাত্র নাই এরূপ আপত্তি যিনি করেন, তিনি হয় নির্ব্বোধ নয় অজ্ঞ নয় মিথ্যাবাদী।

পরিশেষে আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে যত দিন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আমাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য না করিবেন তত দিন সহস্র স্কুল স্থাপন কি সিবিল পরীক্ষার দ্বারোদ্ঘাটন অথবা অন্য কোন অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা ভারত সন্তানগণের প্রকৃতরূপে বাধ্য করিতে সক্ষম হইবেন না—ততদিন বহুতর সৈন্য রাখার ব্যয় ও ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হইবে এবং ততদিন অনবরত স্থানে স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইবে, সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড প্রকৃত লাভ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। (১২ মার্চ্চ, ১৮৬৮)

বিশ্ববিদ্যালয়

বিগত ২৯শে ফেব্রুয়ারি দিবসে কলিকাতায় টাউন হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উপাধি প্রদান করিবার জন্য একটি সভা অধিবেশিত হয়। ভাইস-চ্যান্সেলর অনরেবল মিষ্টার সিটন-কার সভাপতি হইয়া কার্য্য সমাপনান্তে একটি মনোহর ও প্রাঞ্জল বক্তৃতা করিলেন।...মুসলমান ভ্রাতাদিগের অনুন্নত অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন কথা বলিয়া তাহাদিগকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় উন্নত হইতে প্রার্থনা করিলেন। [তিনি বলেন], প্রতি বৎসর পরীক্ষার তালিকায় প্রতি দৃষ্টিপাত কর, মহম্মদীয়দিগের নাম অতি বিরল দৃষ্টি করিবে, ভারতবর্ষের কোন মঙ্গলকর কার্য্য দৃষ্টি কর, অত্যল্প সংখ্যক মুসলমানদিগকে অগ্রসর পাওয়া যাইবে। হিন্দু ও মুসলমান এক দেশবাসী, উভয়ে এক জলবায়ু সেবন করে, তথাপি তাহাদিগের মধ্যে এত প্রভেদ থাকা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। সিটন-কার মহাশয় যে এই নূতন নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। যাহারা জাতি গর্ব্ব ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ও দেশীয় রীতি নীতি কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত করিতে চাহেন না, তাঁহারা তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য-গণনা দ্বারা ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন না ; এবং তাঁহারা যাহাকে উন্নতি বলেন তাহা কেবল বিকারী রোগীর ক্ষণিক সুস্থতা মাত্র। বীর্য্য চাই, জ্ঞান চাই, সাহস চাই, এবং প্রকৃত প্রীতি চাই, তাহা হইলেই ভারতের হীনতা দূর হইবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান সকলেই ভ্রাতৃভাবে পরিপূর্ণ হইয়া এক মনে ও এক হৃদয়ে স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবে। এক অংশ উন্নত হইলে হইবে না, মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত উন্নত হওয়া চাই। ঈশ্বর করুন যেন মুসলমান ভ্রাতাগণ হিন্দুদিগের সহিত উন্নত হইয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। (১২ মার্চ্চ ১৮৬৮)

বেথুন সোসাইটী

বিগত ১১ই মার্চ্চ সন্ধ্যার পর কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থিয়েটরে উপরিউক্ত সভা অধিবেশিত হয়। সভ্যেরা উপস্থিত হইলেন, শ্রোতাবর্গে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। সম্পাদক কর্ত্তৃক পূর্ব্ব অধিবেশন দিবসের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইল, তৎপরে সভাপতি অনরেবল জস্টিস ফিয়র মহোদয়ের প্রার্থনানুসারে রেবং উইলি, মিঃ, স্পষ্ট ও অত্যুচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত, হৃদয় গ্রাহক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শারীরিক শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, এই বিষয়ে বক্তা মহাশয় যাহা বলিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতাগণের মধ্যে অধিকাংশই যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হইলেন। বঙ্গবাসীদিগের পক্ষে বক্তৃতাটি অমৃতময় ঔষধস্বরূপ ; সুবিচক্ষণ বক্তা যে সকল কথা বলিলেন তাহা আমাদিগের নিকট যেন নিষ্ফল হইয়া না যায় ; এবং যতদিন আমাদের শারীরিক উন্নতি না হয় ততদিন যেন আপনাদিগকে প্রকৃতরূপে উন্নত জ্ঞান না করি।

বক্তৃতাটি যে প্রকার মনোহর, তৎসম্বন্ধীয় বাদানুবাদও সেই পরিমাণে, বা ততোধিক, কৌতুকাবহ হইয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে সুবিখ্যাত শ্রীযুত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়* মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া কতিপয় কথা বলিলেন, তন্মধ্যে দুইটি

---

* ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৫৯ সনে বি-এ পাস করেন। প্রথম কিছুকাল শিক্ষকতা করিয়া পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তারাপ্রসাদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা। ইনি বারাসতের অধিবাসী।

উল্লিখিত হইবার যোগ্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ তিনি বলিলেন যে এদেশে বিদ্যানুশীলনের বিদেশীয় ভাব দিয়া স্বাভাবিক ভাব হয় নাই, কৃতবিদ্যানদিগের মধ্যে সত্য নির্ণয় স্পৃহা সম্যকরূপে বলবতী হয় নাই। বিদ্যার উদ্দেশ্য যে মনোবৃত্তি-চয়ের পূর্ণ উন্নতি, ইহা প্রকৃতরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ভাষা শিক্ষা যে সেই মহৎ উদ্দেশ্যের একটি উপায় মাত্র এই জ্ঞান প্রায় কাহারও মনে অঙ্কুরিত হয় নাই। তারাপ্রসাদ বাবুর দ্বিতীয় মতটি এই, "যত দিন পর্য্যন্ত ইংরেজেরা ভ্রাতৃভাবে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন না করিবেন তত দিন আমাদিগের মন প্রকৃত স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে পারিবে না ও আমাদিগের স্থায়ী ও প্রকৃত মঙ্গল হইবে না।"* বোধ হয় তিনি ইহা অস্বীকার করেন না যে ইংলণ্ডের অধীনে ভারতবর্ষ সভ্যতার সোপানে দিন দিন অধিরোহণ করিতেছেন এবং অশেষ প্রকারে উপকৃত হইতেছেন। বক্তার যদ্যপি এই অভি-প্রায় হয় যে যদিও ইংলণ্ড ভারতবর্ষের হস্ত ধারণ করিয়া এত দিন উন্নতি করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করিবেন তথাপি ভারতভূমি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন হইতে না দিলে তাহার উন্নতির পরিসমাপ্তি হইবে না; তবে এ মতটি নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে।

এই মত খণ্ডন করিতে শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয় যাহা বলিলেন তাহা উল্লেখ না করিয়া বিচক্ষণ মেং উইলি যাহা বলিলেন তাহা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। স্বমত অখণ্ডনীয় এই মত বিবেচনা করিয়া বলিলেন যে "কোন জাতি পরাজিত না হইয়া উন্নত হইতে পারে নাই।" ইহা সম্পূর্ণ রূপে সত্য বলিতে পারি না। ইংলণ্ড নর্ম্মানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইবার পর উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু সকল জাতির এইরূপে শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। রোম গ্রীসকে পরাজিত করিয়া বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে। এক জাতির সাহায্যে অন্য জাতির উন্নতি হইয়াছে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কিন্তু পরাজিত হওয়া যে উন্নত হইবার একমাত্র উপায় ইহা স্বীকার করিতে পারিলাম না। অতএব উইলি সাহেবের এ যুক্তিটি নিতান্ত অমূলক। যাহা হউক তাঁহার অনুরোধে স্বীকার করা গেল যে পরাজয়ই উন্নতির মূল। কিন্তু ইহা হইলেই যে তারাপ্রসাদ বাবুর মত খণ্ডিত হইল ইহা বলিতে পারি না। পরাজিত জাতি অনেক সাহায্য লইয়া উন্নতির পথে গমন করিতে শিক্ষা করে বটে কিন্তু কিছু দূর গমন করিলে পর আর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। অধীনতা হইতে উন্নতি আরম্ভ হইতে পারে বটে কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা না হইলে পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না। অদূরদর্শী লোকদিগের নিকট বোধ হইতে পারে যে অধীনতার অবস্থাতে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু দূরদর্শী উইলি সাহেব যে এ কথা বলিবেন ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। (২৬ মার্চ ১৮৬৮)

জাতি-ঐক্যতা

হিন্দু জাতির পরাধীনতার কারণ যাঁহারা সাহস ও বীর্য্যের অভাব বলেন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়গণকে চেনেন না। তাঁহাদের বীর্য্যের, সাহসের, বুদ্ধির কি রাজকৌশলতার অভাব নাই, তাঁহাদের এক মহৎ অভাব—ঐক্যতা এবং ইহাই তাঁহাদের সকল সর্ব্বনাশের মূল। যদি জাতি-ঐক্যতা থাকিত, তবে ভারত-ভূমি স্বাভাবিক যেমন পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, ভারত সন্তানগণের যেমন বীর্য্য, যেমন সাহস, তাহাতে কখনই কোন ভিন্ন জাতি এ দেশে প্রবেশ করিতে পারিত না কিন্তু এই অনৈক্যতার জন্য এতদ্দেশীয়গণের কোন দোষ নাই। যে দেশ কস্মিন্ কালে সম্পূর্ণরূপে একছত্রাধীন হয় নাই, যে দেশে ভিন্ন২ জাতির অবস্থিতি, যে দেশে ভিন্ন২ ভাষা ও ভিন্ন২ ধর্ম্ম প্রচলিত, সে দেশে সকলের মধ্যে ঐক্যতা থাকা কঠিন; কল কঠিন বই অসম্ভব নয়।

ভারতবর্ষীয়গণ হৃদয়শূন্য নন; পূর্ব্বে ঐক্যতা হওয়ার যে সমুদয় প্রতিবন্ধক ছিল, তাহাও এখন অনেক গিয়াছে; এখন সকলেরই এক দশা, আবার পরাধীনতাতে সকলকে ঐক্যতা কত প্রয়োজনীয় বস্তু তাহার শিক্ষা উত্তমরূপ দিয়াছে, অতএব এখন যত্ন করিলে আমাদের এই সর্ব্বনেশে অভাবটি দূরীভূত হওয়া সম্ভব। যদি কোন দেশহিতৈষী, ব্রাহ্মগণের ন্যায়, ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রাতৃভাব উদ্দীপনের জন্য ভ্রমণ করেন তবে বোধ হয় তিনি অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

কিন্তু এইরূপে প্রীতিভাজন দ্বারা সকলের পরস্পরের ভাল-বাসা জন্মাইতে পারে মাত্র এবং ভালবাসা আর ঐক্যতা ঠিক এক নয়। ভালবাসা ঐক্যতার ঘটক মাত্র। জাতি-ঐক্যতার সংস্থাপন করিতে গেলে একটি এমন উদ্দেশ্য আবশ্যক করে যেখানে সকলের স্বার্থ সমানরূপে সম্মিলিত হয়। এবং আমাদিগের মধ্যে এমন কি আছে যেখানে গিয়া সকলে মিশ্তে পারে? কেহ২ বলেন ইংরেজ প্রতি ঘৃণা বিষয়ে সকলে এক মত হইতে পারেন—এমন কি ইহাতে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতিতে ঐক্য হইবে, কিন্তু এটি কি কর্ত্তব্য? কোন জাতিকে ঘৃণা করা নীচত্বের কার্য্য,...এতদ্দেশীয়গণের সম্মিলিত হইবার এক মহৎ উদ্দেশ্য আছে এবং যেখানে বোধ করি সকলের স্বার্থ থাকিতে পারে। সেটি ভারতভূমিকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে উন্মোচন করা। ইহাতে শুদ্ধ হিন্দুরা কেন, পৃথিবীর সকল মহৎ জাতিই সম্মিলিত হইতে পারেন। হিন্দু জাতির ন্যায় মহৎ একটি জাতি স্বাধীন হইবে, ইহাতে কাহার না আন্তরিক আনন্দ হইবে? ইংরেজগণ আমাদিগকে এই রত্ন উপ-ভোগের জন্য এত যত্ন পাইতেছেন। এ দেশে থেকে, স্বদেশে অবস্থিতি করিয়া, ক্রমে আমাদিগকে সভ্যতার সোপানে তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যদি দেখেন যে আমরা

* এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান কালের 'Quit India' বা 'ভারত ছাড়িয়া যাও' আন্দোলনের কথা স্মরণীয়।

স্বদেশকে স্বাধীন করিবার জন্য যত্নশীল হইতেছি তাহা হইলে তাঁহারাও আনন্দে নৃত্য করিবেন। কল কি উদ্যোগে দেশকে স্বাধীন করা যাইতে পারে?

এদেশে প্রতিনিধি সভা সংস্থাপনের কথা হইতেছে। উদ্যোগটি মন্দ নয়, বোধ করি যদি সমুদয় ভারতবর্ষীয়গণ ইহার মর্ম সুন্দর রূপে অবগত হয় তবে সকলে এক তানে "জয় জয় ভারতেরই জয়" বলিয়া উঠিতে পারেন। (৭ মে ১৮৬৮)

ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে মণ্টগমারী সাহেবের মত

ব্রিটিশ শাসনের উপর এ দেশস্থ লোক কেন বিরক্ত, মণ্টগমারী সাহেব তাহার এই২ হেতু দর্শান। (১) ইংরেজেরা বিদেশী (২) বিচার প্রণালীর জটিলতা (৩) আইনের অস্থৈর্য্যতা (৪) বাকী খাজনার নিমিত্ত জমিদারী বিক্রয় (৫) ব্যভিচারিণীদিগকে দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি (এটী কোন কাযের কথা নয়) প্রভৃতি (৬) সাক্ষীদিগের কষ্ট (৭) ব্রহ্মোত্তর বাজাপ্ত করা (৮) পদস্থ ব্যক্তিদিগকে অপদস্থ করা, সৎবংশীয়দিগকে মর্য্যাদাজনক পদ না দেওয়া, কি সদ্বংশোদ্ভূত যুবা ব্যক্তিদের উত্তম উত্তম পদ হইতে বঞ্চিত রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি।

মণ্টগমারী সাহেব বেশ বলিয়াছেন, কেবল গুটিকয়েক প্রধান২ কারণ ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনেকে জাতি বৈরিতার কারণ শুদ্ধ এইগুলিকে বলিয়া থাকেন। বিচারপতিদের পক্ষপাতিত্ব, এদেশবাসী ইংরেজদিগের অর্থাৎ নীলকুঠিয়াল প্রভৃতির অত্যাচার, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের অন্ন মারা, ও ইংরেজদিগের অহঙ্কার ও এদেশীয়দের প্রতি ঘৃণা। আর একটি কারণ আছে। এদেশে নূতন২ ইংরেজের আগমন এবং প্রচুর অর্থের সংগ্রহ হইলে, ইংরেজদিগের এদেশ হইতে প্রস্থান।

মণ্টগমারী সাহেব বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের প্রজার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের দুঃখে দুঃখ, সুখে সুখ দেখান কর্ত্তব্য। প্রজাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা, অধিবাসীদের মত লইয়া আইন প্রস্তুত করা, দেশ শাসনের ভার কতক কতক এদেশীয়দের উপর দেওয়া উচিত ইত্যাদি। মণ্টগমারী সাহেব যে উপদেশগুলি দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে আমরা শত শত ধন্যবাদ দিই। গবর্ণমেণ্ট যদি সুবোধ হয় তবে সত্বর সত্বর মণ্টগমারী সাহেবের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে থাকুন। তাঁহারা যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তাঁহাদের জিত থাকিবে, আর যদি বাধ্য হইয়া করেন, তবে সম্পূর্ণরূপে ঠকিবেন। (১৪ মে ১৮৬৮)

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

ডেলিনিউজ সম্পাদক বলেন যে, ইংরেজেরা আমাদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমাদের অবস্থা আরো মন্দ হইবে। সম্পাদক রাজবংশীয়, সুতরাং তাঁহার এ কথায় আমরা চুপ করিয়া থাকিতাম, কিন্তু এদেশস্থ কোন কোন কৃতবিদ্যেরও এইরূপ মত। অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের গুটিকয়েক কথা বলিতে বাসনা হইতেছে।

ইংরেজেরা আমাদিগকে হঠাৎ ত্যাগ করিয়া গেলে যে আমরা আন্ধার২ দেখিব, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অহিফেনসেবীরা যদি উহার সেবন অভ্যাস ত্যাগ করিতে যায় তবে ঐ রূপ প্রথমে আন্ধার২ দেখিয়া থাকে। সতীত্বভ্রষ্ট স্ত্রীর একমাত্র সম্বল উপপতি, তাই বলে কি তাহার চিরকাল ব্যভিচার করিতে হইবে? পীড়া হইলেই ঔষধ সেবন কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ঘোড়া হইতে পড়িয়া অস্থি ভঙ্গ করিলে হাড় যোড়া লাগাইবার কষ্ট একবার অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে। যখন ভারতবর্ষীয়েরা একবার স্বাধীনতা ধন হারাইয়াছেন, যখন তাঁহাদের একবার জাতি গিয়াছে, তখন প্রায়শ্চিত্ত রূপ কষ্ট আজি হউক, কালি হউক, একদিন করিতেই হইবে।

"অদ্যাপি ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হয় নাই" ইংরেজ মাত্রের মুখে এই কথা শুন, ও একথার উত্তর দিবার যোও নাই। কেন উপযুক্ত হয় নাই? ইহার প্রমাণের ভার ডেলিনিউজ সম্পাদকের উপর। তিনি কি ইহার উত্তর দিতে পারেন? সিন্, কোসিন্, টাসবেক্ট দ্বারা ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে না। এদেশীয়দের উপর একটি দেশের ভার দিয়া দেখ, তাহারা না পারে, তখন আমরা চুপ করিয়া থাকিব। আর যত দিন এরূপ প্রমাণ না দিয়া কোন ব্যক্তি বলিবেন, তিনি হয় বুঝিয়া বলেন না, নয় ধূর্ত্ত।

"ভারতবর্ষীয়েরা ক্রমে স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হইবে।" ইহা কি কখনও হইয়া থাকে? স্বাধীনতা শিখিবার পুস্তক ইতিহাসও নয়, রাজনৈতিক বিজ্ঞানও নয়। স্বাধীনতা শিখিবার পুস্তক স্বাধীনতা। আমরা না শত শত ইংরেজী পুস্তকে পড়িয়াছি যে, অনেক দিবস পরাধীন থাকায় বাঙ্গালীর মধ্যে দুর্ব্বলের যত দোষ অর্থাৎ মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, ভীরুতা, নীচত্ব প্রবেশ করিয়াছে? আমরা না পড়িয়াছি যে, রোমানেরা যখন ইংলণ্ড প্রথমে আক্রমণ করে, তখন অধিবাসীরা অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে ও চারি শত বর্ষ পরে যখন রোমানেরা ঐ দেশ পরিত্যাগ করিয়া আইসে, তখন ব্রিটিশ জাতি এরূপ হীনবল হইয়াছিল যে, তাহাদের চেয়ে অনেক গুণ নিকৃষ্ট পিক্ট জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই? তাহারা ত রোমানদের কর্ত্তৃক সুসভ্য হইয়াছিল? মুসলমানদের ও ইংরেজদের অধিকার অগ্রে আমরা কাহার দ্বারে২ খোসামোদ করিয়া বেড়াইতাম, "ওগো তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আইস, আমাদের দেশগুলি শাসন করিও, আমরা নিষ্কণ্টকে লাঙ্গল চষিব?"

স্বাধীন থাকিবার ইচ্ছা মনুষ্যের স্বাভাবিক, এইজন্য মালেরা মাঝে২ ছুটিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, এই নিমিত্ত ১৮৫৭।৫৮ সালের ঘোর সমর হয়, আর এই নিমিত্ত আমরা নিরলে বসিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকি। ১৮৫৭।৫৮ সালে যেং স্থলে

যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানে কি কেহ আর এক শত বর্ষের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিবে? ইংরেজেরা কি এইরূপে আমাদিগকে স্বাধীনতার উপযুক্ত করিতেছেন? সমস্ত দেশ নিরস্ত্র করিয়াছেন, এ বুঝি আর একটি উপায়? এটি নিশ্চিত যে, পরাধীন অবস্থায় আমাদের যত সময় যাইতেছে, রোগ ততই অসাধ্য হইতেছে। (২৮মে ১৮৬৮)

জাবা দ্বীপ ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া

আমরা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে একটি নূতন বিষয় পাঠ করিলাম। ওলোন্দাজেরা জাবা দ্বীপে অত্যন্ত অত্যাচার সহ শাসন করিতেছে শুনিয়া ইউরোপের ও আমেরিকার সমুদায় সভ্য জাতি তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়াছেন। ডেকার নামক এক ব্যক্তি ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত জাবা দ্বীপে বাস করিয়া সেখানকার অত্যাচার নিবারণ করিবার নিমিত্ত যত্নশীল হন কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরে একখানি পুস্তক মুদ্রিত করেন। পুস্তকখানির উদ্দেশ্য অঙ্কল টমস্ কেবিনের ন্যায়, উহাতে ওলোন্দাজেরা জাবা দ্বীপ অধিবাসিগণের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিতেছে তাহাই একটি গল্পচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের লিখিত অত্যাচার শুনিয়া পৃথিবীর ভদ্রলোকের রোমাঞ্চ হইয়াছে।

নীলকরেরা যেরূপ কোন কোন জমিদারের সাহায্য লইয়া অত্যাচার করিত, কি করিতেছে, ওলোন্দাজ গবর্ণমেণ্টও সেরূপ দেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদিগের সাহায্য পাইয়া অধিবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন। এইরূপ যে হইতেছে তাহা ডেকার সাহেবের পুস্তক প্রচার না হইলেও আমরা জানিতে পারিতাম। ওলোন্দাজেরা যদি ন্যায়সঙ্গত শাসন করেন তবে জাবা দ্বীপ রাখায় তাঁহাদের কিছুমাত্র লাভ থাকিবে না বরং পদে পদে ক্ষতি। তবে জাবা রাখায় তাঁহাদের লাভ কি? অতএব যেখানে এইরূপ দুই দেশে অনৈসর্গিক সম্বন্ধ উপস্থিত হয় সেখানে নিশ্চিতই অত্যাচার হইবে—সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি কখনই হইবে না। যাঁহারা পরাধীন দেশকে স্বাধীনতা না দিয়া অথচ তথাকার অত্যাচার নিবারণ করিতে যান, তাঁহারা মিত্র নয় বরং শত্রু। তাঁহারা দুই একটি উপসর্গ নিবারণ করিয়া পীড়া সাধ্য করিয়া রাখেন, সুতরাং দেশের পরিবর্ত্তন হইতে দেন না। জগদীশ্বরের সুকৌশলানুসারে বিষ বিষঘ্ন প্রায় এক স্থানেই পাওয়া যায়। অত্যাচার অত্যাচারীর মহৌষধ। নীলকরেরা একটু কম করিয়া অত্যাচার করিলে আরো অনেক বৎসর নিষ্কণ্টকে অত্যাচার করিতে পারিত। ইংরেজেরা যদি একটু বাহ্য ঔদার্য্য ও দয়া না দেখাইতেন, তবে এতদিন এদেশ রাখিতে পারিতেন না পারিতেন, সন্দেহ স্থল। ইহা বুঝিয়াও যে অনেকে অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করেন তাহার মানে এই যে, অনেকে কুইনিয়ানকে ঘৃণা করিয়াও অনেক সময় উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ডেকার সাহেবের পুস্তকের এক স্থানে লিখিত আছে আমি যে এরূপ মুক্তকণ্ঠে এ সমুদায় অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিতেছি ইহাতে যিনি রাগ করেন তাঁহার বিবেচনা করা উচিত যে, ইংরেজেরা যদি ভারতবর্ষ কিরূপ শাসিত হইতেছে তাহার প্রতি পূর্ব্বে দৃষ্টিপাত করিতেন, তবে সিপাহী যুদ্ধের সময় এত কোটি টাকা অপব্যয় ও এত মনুষ্য বৃথা নষ্ট হইত না। এই কয়েকটি কথা ফ্রেণ্ডের মনঃপুত হয় নাই। তিনি বলেন অত্যাচার নয় বরং সোহাগে সিপাহী যুদ্ধের উৎপত্তি করে। ফ্রেণ্ড যে এরূপ দুই একটি কথা বলেন, ইহাতে ভারতবর্ষের ভদ্রলোকের তাঁহার নিকট বাধিত হওয়া উচিত, কারণ ইহাতে তাহাদের মনে পরাধীনতার নিমিত্ত ক্ষোভের উদ্রেক করিয়া দেয়। ওলোন্দাজেরা জাবা দেশের জমিদারের সাহায্য লইয়া অত্যাচার করিতেছে বলিয়া ফ্রেণ্ড বলেন, এদেশস্থ অধিবাসীদিগকে রাজ্য শাসনের কি আসিয়াটিকদিগকে আসিয়াটিকদিগের উপর ভার দেওয়া উচিত নয়। ফ্রেণ্ডের এ হিসাবে, ওলোন্দাজ গবর্ণমেণ্টের জাবা দ্বীপের উপর অত্যাচার দেখিয়া, আমরাও বলিতে পারি যে, ইউরোপীয়দিগকে আসিয়াটিকদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে দেওয়া উচিত নয়। (১৯ জুন ১৮৬৮)

স্বজাতি পক্ষপাতিতা

আমরা জাতিতে বাঙ্গালী, শাস্ত্রে শুনিয়াছি "রাজারা পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিবেন। তাঁহাদের সকলের প্রতি সম দয়া থাকিবে।" কিন্তু আজ কালি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আচরণে তেমন রীতি দেখিতে পাই না। ইহাতে হয়ত আমরা নিতান্ত অসভ্য; নতুবা ইংরেজেরা এতদূর সভ্য যে, আমরা তাঁহাদিগের সভ্য ব্যবহার বুঝিতে পারি না। যদি তাহাও না হয়, তবে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট বোকা বা পক্ষপাতী।

আমরা "সিবিল সার্ব্বিসের দ্বার উদ্ঘাটন কর২" বলিয়া চীৎকার করিতে২ গলা ভাঙ্গিলাম। বড়২ রাজপদ লাভের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু ফুলাইলাম। সকল গেল ধুমের মত উড়িয়া। যাউক, মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেই যে আমরা বিজিত, ইংরেজেরা জেতৃ; আমরা অসভ্য কৃষ্ণকায়, ইংরেজেরা সুসভ্য শ্বেতকান্তি; আমরা সপত্নীপুত্র, ইংরেজেরা পেটের সন্তান। কাজেই অধিকারের তারতম্য থাকিবে। কিন্তু বিচারের বেলাও এইরূপ জাতিভেদ করা হয়, এটি বড় অসহ্য। ইংরেজরাই আমাদের চক্ষু ফুটাইয়াছেন, আবার তাঁহারাই কলুর বলদের মত উহা ঢাকিয়া রাখিতে চান। কোন কোন ইংরেজ মহাত্মা সাধারণ্যে বক্তৃতা করেন যে, "আমরা বাঙ্গালীদিগকে সভ্য করিয়াছি,তাহাদিগকে আলোতে এনেছি" তবে আমরা তুল্য বিচার কেন না পাই? তবে কেন অন্ধকারে পড়িয়া মরি? তবে কেনই বা আমাদিগকে দেখাইয়া২ ইংরেজেরা সব উঠাইয়া যান? ইহাও বরং সহ্য করিতে পারা যায়, যদি উপযুক্ত ইংরেজেরা কেবল তাদৃশ গৌরব লাভ করেন। উচ্ছৃঙ্খল, অনভিজ্ঞ, রোষপরবশ, অদূর-

প্রকৃতি, চৈমু অবধি পর্য্যন্ত পেন্টুলনের বলে বড়২ কাজ, বড়২ অধিকার পান; এবং কঠিন অপরাধের দণ্ডস্বরূপ উচ্চপদে অভিষিক্ত হন। আর ধুতি চাদরের দোষে বাঙ্গালী হাকিম ধার্ম্মিক, পারদর্শী, শান্তচরিত্র, অক্রোধী হউন—না উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, না অল্প একটু দোষ করিলেও সারিয়া যাইতে পারেন। এই কি রাজার সুবিচার? না এই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও অপক্ষপাতিতার লক্ষণ।

যশোহরে কেম্বিয়ন সাহেব বিনাদোষে একজন সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীকে মরণান্ত প্রহার করিলেন; গবর্ণমেন্ট লিখিলেন যে পর্য্যন্ত তিনি শান্ত প্রকৃতির পরিচয় না দিতে পারেন, তাবৎ উন্নতির পথ রোধ হইল। বৎসর না ফিরিতে ফিরিতেই তাহার বেতন বৃদ্ধি হইল। তারপর, চেম্বার্স সাহেব একজন প্রসিদ্ধ ভদ্র ও মান্য বংশোদ্ভব সব্-ইনেস্পেক্টরকে প্রহার করিয়া ৫০৲ টাকা জরিমানা পর্য্যন্ত দিলেন। কিন্তু সে অপরাধ বাসি না হইতেই তাহার পদোন্নতি হইল। এই সে দিন আইরিস একটি জঘন্য মোকদ্দমাতে ঠেকিলেন। গবর্ণমেন্ট নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার পাপের দণ্ডস্বরূপ তাড়াতাড়ি ফুল ইনেস্পেক্টরি দিয়া সুবিচার প্রদর্শন করিলেন। নাম করিলে, অনেক করা যাইতে পারে। আমরা এমন অনেক শান্তিরক্ষককে জানি, যাহারা অশান্তির ভূরী দৃষ্টান্ত দেখাইয়াও উন্নতি লাভ করিয়াছেন। আবার অপর দিকে দেখ, দেখিতে পাইবে, পদে২ অবিচার। কলিকাতার স্মল কজ কোর্টের জজ কাশীপ্রসাদ মিত্র ক্ষুদ্র একটি কারণে পেনসিন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্র কি একটু দোষ করিয়াছিলেন, তাহাতেই একেবারে ডিসমিস হইলেন। অনেক দূর যাইবার প্রয়োজন কি? এই যশোহরে একটি কৃতবিদ্য কেরাণি কোন কথায় নাকি অবাধ্যতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে পদচ্যুত তো হইলেনই, আজিও কর্ম্ম পাইতেছেন না। ২৭।২৮ বৎসরের পুরাতন তিন জন আমলা প্রপিতামহের আমলে নাকি উৎকোচ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া কত গণ্ডগোল গেল। আমরা পুরুষানুক্রমে জানিয়া আসিয়াছি, যে পদের যে উপযুক্ত, রাজা তাহাকে তাই দেন; যে ব্যক্তি দোষী তার দণ্ড হয়; ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের পুরস্কার হয়। কিন্তু ইংরেজেরা আমাদিগকে নূতন রাজনীতি শিখাইতেছেন। ইংরেজেরা আমাদের এত আলোতে আনিয়াছেন যে, এখন দেখিতে২ চক্ষু ঝলসিয়া গেল। (৩০শে জুলাই ১৮৬৮)

[ঘাত-প্রতিঘাত]

আঘাত প্রতিঘাতের সমান। অন্যকে চপেটাঘাত করিলে হাতে বেদনা লাগে। এই নৈসর্গিক নিয়ম। পরমেশ্বর মনুষ্যকে এইরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যে সকলেই পরস্পর স্বাধীন। বলবান দুর্ব্বলের প্রতি আক্রমণ করিলে, দুর্ব্বল বলবান উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই নিয়ম অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সাধ্য মনুষ্যের নাই। প্রজা যে রূপ রাজার অধীন, রাজাও সেই রূপ প্রজার ভৃত্য বই নয়। কাজেই পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, মনুষ্যকে পরমেশ্বর পরস্পর স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

নীলকরেরা প্রজার উপর অত্যাচার করিত, এই নিয়মানুসারে পরিণামে তাহাদের খাট হইতে হয়। গবর্ণমেন্ট প্রজার উপর অত্যাচার করিলে প্রজারও সর্ব্বনাশ, গবর্ণমেন্টেরও সর্ব্বনাশ। উদরে ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিবাদ যে রূপ; গবর্ণমেন্ট ও প্রজাতেও বিবাদ সেই রূপ, কেহ কাহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। কোন২ স্থানে আপাতত কিছু লাভ দেখা যাইতে পারে, যেরূপ এক্ষণে ইংলিস গবর্ণমেন্ট স্বচ্ছন্দে প্রজাদিগকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া কার্য্য করিয়া স্বার্থ সাধন করিতেছেন, কিন্তু এ মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্বর ত্যাগের, ঝড়ের পূর্ব্বে শান্তির ন্যায়।

যে গবর্ণমেন্টের বহুদর্শিতা এত কম যে, বাধ্য না হইলে আর কোন কথা শুনেন না, সে গবর্ণমেন্ট বাধ্য হইলে যে শুদ্ধ সেই কথাটি শুনিয়া অব্যাহতি পান এরূপ নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বকার তাচ্ছিল্যের দণ্ড স্বরূপ আর কিছু দিতে হয়। ইংলিস গবর্ণমেন্টে ও প্রজায় যে রূপ অসদ্ভাব, আর এ অসদ্ভাব যে রূপ ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য তাহার কোন নিরাকরণের উপায় না করিলে শেষে অনুতাপ করিবেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি আঘাত প্রতিঘাতের সমান। গবর্ণমেন্ট এরূপ কিছু আমাদের ক্ষতি করিতে পারেন না, যাহাতে তাঁহার নিজের ক্ষতি না হয়। তাঁহারা দেশ সমেত লোককে বলেন যে, ভারতবর্ষের মঙ্গলের নিমিত্তই তাঁহারা ভারত-শাসন করিতেছেন। তাঁহারা আমাদিগকে শান্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ বলেন, বলিয়া বিপরীত করেন। আমরাও মনে যাহা ভাবি না ভাবি মুখে বলিয়া থাকি ইংরেজেরা আমাদের পরমোপকারী। ইংরেজেরা যে কাজ করেন তাহাতে এইটা দেখান হয় যে, প্রজাদের মঙ্গল তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, আমরাও যখন যে বিষয় বলি কি লিখি, "দয়াবান গবর্ণমেন্ট" "প্রজাবৎসল গবর্ণমেন্ট" না বলিয়া আর কোন ছত্র আরম্ভ করি না।

ইংরেজেরা অম্লান বদনে বলেন যে ভারতবর্ষীয়দিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে দেশ শাসন করিতে দেন না, আমরা সেই পিঠ পিঠ বলি ইংরেজ গবর্ণমেন্ট চিরকাল বজায় থাকুক। আবার তাঁহারা যেরূপ গোপনে গোপনে বসিয়া পরামর্শ করেন যে কিসে নিষ্কণ্টকে ভারতবর্ষকে দোহন করা যায়, আমরাও তেমনি ঘাটে, মাঠে, নগরে, বাজারে, যেখানে পারি আপনারা আপনারা সুখ দুঃখের কথা বলি। তাঁহারা যেরূপ আমাদের স্বার্থশূন্য, হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া পরিচয় দিয়া অথচ ভারতবর্ষের চারি পার্শ্বের প্রাচীর দিবারাত্র চৌকি দিতেছেন, আমরা তেমনি ইংরেজ রাজ্য চিরকাল বজায় থাকুক বলিয়া আপনারা আপনারা গণনা করিতে বসি। এই আমাদের আপাতত প্রতিশোধ। (২০ আগষ্ট ১৮৬৮)

অরণ্যপথের ডায়ারি

শ্রীপরিমল গোস্বামী

২

আমরা সন্ধ্যার একটুখানি আগে এসে পৌঁছলাম নীলপাড়া সৌভাগিনী টি এস্টেটের বাংলোয়। এইখানে আসবার একটা আকর্ষণ, এখানে একটু দূরেই গণ্ডারের রাজত্ব। কিন্তু সকালে গণ্ডার দেখতে যাওয়া হবে এই প্রস্তাবে যতখানি আশান্বিত হয়ে উঠলাম, নিরুৎসাহও বোধ করলাম ততখানি। এখান থেকে জঙ্গল পাঁচ-ছয় মাইল দূরে, যেতে হবে হাতীর পিঠে চড়ে। কিন্তু গেলেই যে গণ্ডার দেখা যাবে তার কোনো স্থিরতা নেই, তাই ভাবছিলাম। কিন্তু যেতে হবেই, যদি দৈবাৎ একটি বা একটি দলসুদ্ধ ক্যামেরায় ধরা পড়ে তা হলে ক্যামেরা ধন্য হবে।
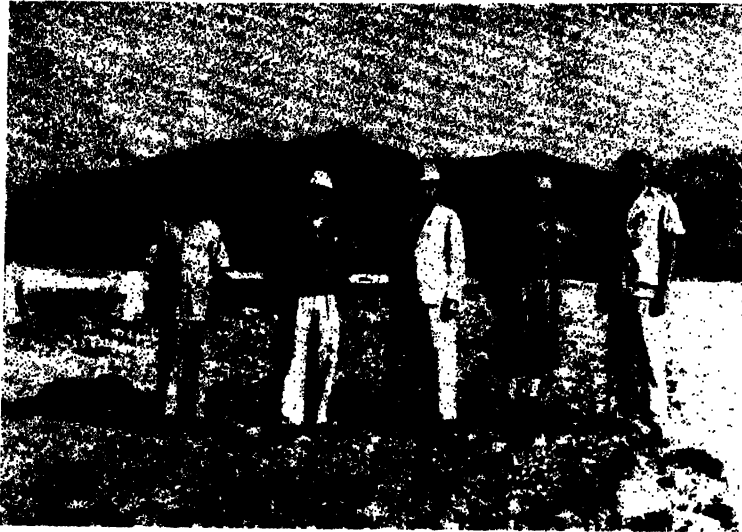
খুকলবোরা যাইবার পথে রায়ডাক নদীর বুকে

এসেছি চা-বাগানের বাংলোয়, অতএব আসার পর থেকে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে তিন বার চা খাওয়া হ'ল। বাগানের ম্যানেজার বিশ্বাস মশাই আমাদের সুখসুবিধা বিধানের জন্যে অতি তৎপর হয়ে উঠলেন।

বাংলোর বাড়িটি ছবির মত। মোটা মোটা শালকাঠের খুঁটি বা থামের উপরে টিনের চাল এবং চালের নিচে আগাগোড়া কাঠের আস্তরণ। উঁচু দোতলা বাড়ি, প্রকাণ্ড কাঠের সিঁড়ি। দামী আসবাবপত্রে ঘরগুলো সাজানো। জানালাগুলো সব কাঁচের। সব ঘরেই বিদ্যুতের আলো। দোতলাতেই স্নানের ঘর, শোবার ঘরের সঙ্গে লাগানো। স্নানের ঘরের মেঝে সিমেন্টের। দুই প্রান্তে দুখানি শোবার ঘর, প্রত্যেক ঘরে দুখানি ক'রে খাট পাতা। বারান্দাটাও অতি চমৎকার। সব সময় সেখানে বসে হিমালয়ের শোভা দেখা যায়। পাহাড়ের সঙ্গে সব সময়েই প্রায় মেঘ লেগে আছে। পাহাড়ের গাঢ় নীল রং ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে সন্ধ্যাবেলা। শুধু এক-একটা জায়গা তখনও উজ্জ্বল সাদা দেখাচ্ছে। পাহাড়ের সেই সেই অংশ প্রবল বৃষ্টিতে ধ্বসে গিয়ে সাদা মাটি পাথর বেরিয়ে পড়েছে। এখানে সমস্ত দিনের পর রাত্রে খাওয়া হ'ল উৎকৃষ্ট সুগন্ধ চালের ভাত ও মাংসের ঝোল। ঘুম হ'ল গভীর।

৩০ নবেম্বর। সকালে হিমালয়ের এ কি অপূর্ব রূপ এ এক পরমাশ্চর্য দৃশ্য। সমস্ত পর্বতশ্রেণী উজ্জ্বল বেগুনি রঙে টকটকে হয়ে উঠেছে। যথা বেগুনী কাঁচের পর্বতমালার অভ্যন্তরে যেন হাজার হাজার আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। রঙে লালের আভাই বেশি। রং ভিজে মনে হচ্ছে। যেন আকাশের বুকের উপর শিল্পী এইমাত্র তুলির টানে এই পর্বত শ্রেণী আঁকলেন, রঙ তখনও কাঁচাই আছে—রঙের মধ্যে এক অবর্ণনীয় আর্দ্র উজ্জ্বলতা। এ রকম দৃশ্য কখনো দেখি নি— কখনো হতে পারে এ রকম কল্পনাও করা যায় নি। এই অভাবনীয় দৃশ্যে আমাদের মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। এবং এ রং মিলিয়ে যেতে না যেতে আর এক উত্তেজনা। বাইরে চেয়ে দেখি আমাদের জন্যে হাতী এসে গেছে।

প্রকাণ্ড উঁচু হাতী। পোষা হাতীদের প্রত্যেকেরই একটি ক'রে নাম থাকে। এটির নাম হচ্ছে বনপিয়ারী। "দুই" শ্রেণীর। ওদের শ্রেণী পরিচয় হচ্ছে এই—

দুই—প্রৌঢ়া হস্তিনী। কুনকী—স্ত্রী হাতীর সাধারণ নাম।

শালীন—তরুণী হস্তিনী।

মাকনা—পুরুষ হাতী, কিন্তু দাঁতহীন।

দাঁতাল—দাঁতযুক্ত পুরুষ হাতী 'টাস্কার'।

গণেশ—এক দাঁতের পুরুষ হাতী। এই হাতী সৌভাগ্য-সূচক।

বনপিয়ারীকে দেখে বেশ একটা সম্ভ্রম জাগে। প্রকাণ্ড

উঁচু হাতী, চোখ দুটিতে একটা সহানুভূতিপূর্ণ অতি সহৃদয় ভাব। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। সে এমন ভাবে আমাদের দিকে চাইতে লাগল যেন এখন তাকে যা যা করতে-হবে সবই সে জানে।

আমি ক্যামেরা তৈরি ক'রে নিতে ঘরে এলাম, তার জন্যে দুচার মিনিট দেরি হচ্ছে, ইতিমধ্যে হঠাৎ দেখি আমাদের মোটর বিশারদ সুনীল পোদ্দার ঘরের মধ্যে ছুটে এসে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ক্রমাগত হাসছেন।

ঘরে এসে গোপনে হাসবার কি কারণ ঘটল, জিজ্ঞাসা করলাম।

সুনীল বাবু কোনো রকমে বললেন, বাইরে হাসলে বেয়াদপি হ'ত—কিন্তু আপনি গিয়ে দেখুন কি ব্যাপার!

রায়ডাক নদীর একটি দৃশ্য। দূরে হিমালয় শ্রেণী

গিয়ে দেখি অশোক আগেই হাতীর পিঠে বসেছে। হাতীর ঘাড়ের উপর মাহুত অশোকের বন্দুক হাতে বসে আছে। হাতীটি হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে নীচু হয়ে সুধাংশুকে পিঠে নেবার চেষ্টা করছে। সুধাংশু তার পিঠের দড়ি ধ'রে ঝুলে দুখানা পা হাতীর পেটের সঙ্গে ঠেকিয়ে পাহাড়ে ওঠার মতো দুঃসাহসিক কাজে রত। তার দুখানা পা ক্রমাগত ফসকে যাচ্ছে এবং তার ফলে সেও ঘেমে উঠেছে, হাতীও খুব লজ্জা পাচ্ছে।

মিনিট তিনেক এই ভাবে সংগ্রামের পর সুধাংশুকে পিঠে পেয়ে হাতী মস্ত বড় একটা দায় থেকে উদ্ধার পেল। আমি এ দৃশ্য দেখে হাসতে পারলাম না, কেননা এইবার আমার পালা। কিন্তু তার আগে ওদের একখানা ছবি তুলে নিলাম। তার পর আমি এগিয়ে যেতেই মাহুতের ইঙ্গিতে ধরণিশায়ী আমার দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে পিঠটা নামিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটল। ওজনে হাল্কা হলেও পা ফসকানোর বেলায় আমার অবস্থাও যে একই রকমের হাস্যকর হয়ে উঠেছিল সে কথা আমি প্রতি পদপাতেই বুঝতে পারছিলাম। এ ভাবে হাতীতে ওঠা জীবনে এই প্রথম, এবং যেমন সেদিন মনে হয়েছিল, আজও তেমনি মনে হচ্ছে, এই শেষ। আর যাই হোক, জীবনে হাতীতে ওঠার আর প্রয়োজন হবে না।

হাতী আমাদের নিয়ে গজগমনে এগিয়ে যেতে লাগল; কিন্তু সেই উঁচু হাতীর অরক্ষিত পিঠের অল্প পরিসর জায়গায় তিন জনের (মাহুত সমেত চার জন) ঠেলাঠেলি ক'রে দড়ি ধ'রে বসে থাকা আমার পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল। তদুপরি শীতের পোষাকে সবাই আরও মোটা হয়েছি, উপরন্তু আমার এবং সুধাংশুর গলায় একটি ক'রে ক্যামেরা। আমরা সামান্য কিছু দূর যাবার পরই বুঝতে পারলাম এ অবস্থায় ক্যামেরা ব্যবহার করা আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ দুই হাতে হাতীর পিঠের দড়ি শক্ত করে ধরে থাকতে হবে আত্মরক্ষার জন্যে, এবং ক্যামেরাটি গলায় লকেটের মত ঝুলবে—এতে আমি অন্তত কোনমতেই আরাম বোধ করব না, তাই অবিলম্বে স্থির করলাম আমি যাব না। কিন্তু সবার সম্মুখে তখনি নামলে সবাই হৈ হৈ ক'রে ছুটে এসে নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকবে, তাই একটু দূরে লোকচক্ষুর আড়ালে গিয়ে সঙ্গীদের কাছে সব বললাম এবং তাদের অনুমতি নিয়ে নেমে পড়লাম এবং ফিরে এসেই বিশ্বাস মহাশয়ের সঙ্গে জুটে চায়ের কারখানা-ঘরে প্রবেশ ক'রে সব দেখতে লাগলাম।
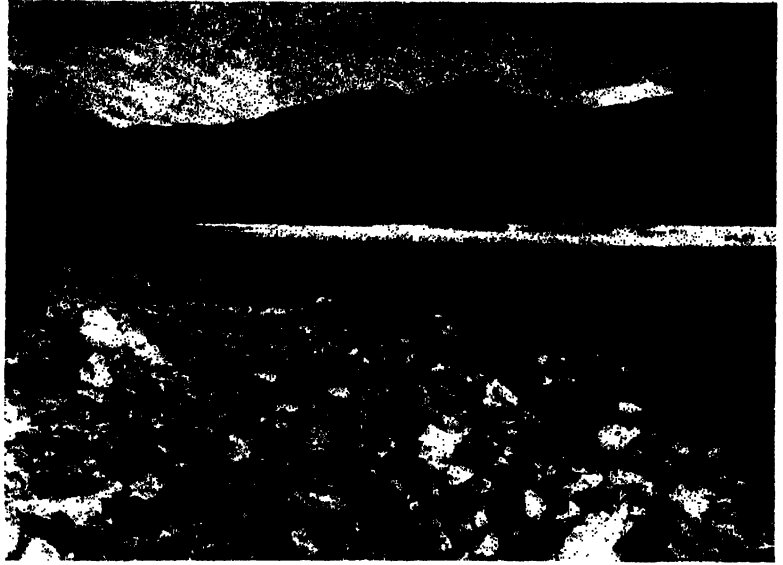
পূর্ব দিন তাঁকে সব বলা ছিল। তিনি সঙ্গে থেকে থেকে সব দেখাতে লাগলেন। প্রথমে গেলাম বাগান থেকে চা পাতা তুলে এনে আগে যেখানে শুকোতে দেওয়া হয় সেই ঘরে। তারের জালের তাক একটির পর একটি সাজানো, তার উপর কাঁচা সবুজ পাতা লাইন ক'রে ক'রে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই চা একটুখানি শুকিয়ে নরম হয়ে এলে কলের সাহায্যে পাতাগুলোকে মচড়ানো হয়। সেই কলটির নাম টুইস্টিং মেশিন বা পাক-দেওয়া যন্ত্র। দেখতে প্রায় পাকযন্ত্রের মতোই।
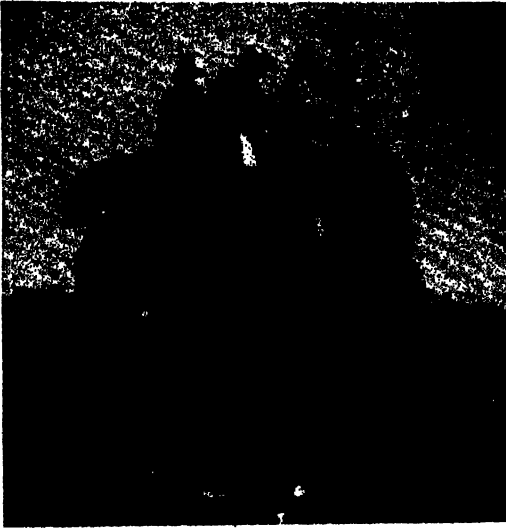
ধরমশিয়ারী

উপরের একটা তলা থেকে একটা ছোট ছেলে বসে মুঠো মুঠো পাতা চওড়া নলের মধ্যে দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো কলের মধ্যে এসে পাক খাচ্ছে। ঠিক যেন গমভাঙা যাঁতা। চা-পাতা পাক খেয়ে খেয়ে বেরিয়ে আসছে।

এর পরের প্রক্রিয়া হচ্ছে এগুলোকে ঐ ঘরের রৌদ্রহীন মেঝের ছ'ড়িয়ে দেওয়া। এই অবস্থায় থাকতে থাকতে আপনা থেকেই সবুজ পাতা শুকোতে থাকে ও হাওয়ার অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে কালো রং ধরে। তার পর আরও ভাল ক'রে শুকোনোর জন্তে গরম ঘরে রাখতে হয়। এর পর বাছাইয়ের কাজ। এই সময় গোটা চা ও গুঁড়ো চা পৃথক হয়।

এখান থেকে বেরিয়ে ওখানকার এক কর্মচারীর সঙ্গে গেলাম চায়ের বাগানে। এঁদেরই বাগান। পাঁচ-সাত শ' একর পরিমিত জায়গা জুড়ে সবুজের সমুদ্র। চা গাছকে ছায়ায় রাখবার জন্তে বাগানের ভিতর এক রকম বড় বড় গাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়। এগুলোকে শেড ট্রি বলে। বাংলা নাম কেউ কেউ বলে কড়ুই। এই গাছগুলো ভারি সুন্দর। দশ-বারো হাত বা বেশি দূরে দূরে এক একটি গাছ—ছবির মতো দেখাচ্ছে। বাগানের সমস্ত চা-গাছ ছেঁটে বুক সমান উঁচু করা হয়েছে। এই ভাবে ছেঁটে দিলে অনেক নতুন ডাল গজায় এবং তা থেকে চায়ের পাতাও বেশি সংগ্রহ করা যায়। প্রত্যেক ডাল থেকে যে সব নতুন পাতা গজায় তার মাথাগুলো ছিঁড়ে নিতে হয়। মাথার দিকে থাকে দুটি কচি পাতা এবং তার মধ্যেকার অঙ্কুর—এই হচ্ছে চা। সবশেষকালের ঐ শীষটুকু ছাড়া অন্ত কোনো পাতায় চা হবে না।

বাগানে লাইন বেঁধে কুলিরা আসছে। পুরুষ মেয়ে—নানা জাতীয়। সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েও আছে। প্রত্যেকের পিঠে একটি ক'রে ঝুড়ি, কপালের সঙ্গে ফিতে দিয়ে বাঁধা। তারা এসেই চা তোলার কাজে লাগল। তারা এ কাজে এমনই পাকা যে দেখে মনে হয় তাদের আঙুলগুলো চলছে বিদ্যুৎগতিতে। দু হাত এদের সমান চলে। অধিকাংশের স্বাস্থ্য ভাল, কিন্তু মুখে লাবণ্যের অভাব। মেয়ে-কুলিদের কেউ কেউ তার শিশুসন্তানদের পিঠের থলের পুরে চা তুলছে। শিশুরা নির্জীব অবস্থায় নীরবে ঝুলছে সেই থলের। ওরা বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়বার আগে দু-একটা ছবি নিলাম এবং পাতা তোলার সময়েও নিলাম। এই সময়ে অন্তত এদের মুখে হাসি ফুটেছিল।

চায়ের ফুলগুলো দেখতে বেশ। সাদা ফুল, মাঝখানে হলদে রেণুওয়ালা সরু সরু শোঁয়া। এখানে অনেকে চায়ের ফুল ভেজে খায়—আমরা যেমন কুমড়োফুল বা বকফুল ভেজে খাই।

চায়ের গাছ সাধারণতঃ পনর-ষোল হাত লম্বা। খুব দৃঢ় এবং তেজী গাছ। চায়ের গাছে বেশ মজবুত লাঠি হয়। কিন্তু গাছ এত বড় থাকলে তা থেকে চা সংগ্রহ করা যায় না, তাই কেটে-ছেঁটে বুক সমান উঁচু করে দিলে নতুন অনেক ডালও গজায়, সুতরাং চায়ের পাতাও বেশি সংগ্রহ করা যায়। চা গাছের বলিষ্ঠ বৃদ্ধি দেখে কচুরিপানার বৃদ্ধির কথা মনে পড়ে।

এই বাগানে চা তোলা দেখা শেষ হ'লে আমরা ফিরে এসে বিপরীত দিকের আর একটি বাগানে গেলাম। এইখানে বড় বড় চা গাছের বনে কেবল ছাঁটাই কাজ শুরু হয়েছে। যুদ্ধের দরুন মজুর কমে যাওয়াতে ডুয়ার্স অঞ্চলের অনেক বাগানে অনেক দিন কোনো কাজ হতে পারে নি—কাজেই সে সব বাগান অরণ্যে পরিণত হয়েছে। বড় বড় ধারালো ছুরি দিয়ে কুলিরা চায়ের গাছ কাটছে। তাদের অনেকেরই গা খালি। হাতের পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে। এদের স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। এদের উপার্জন মাসে কুড়ি থেকে সর্বোচ্চ চল্লিশ টাকা। যে যত পরিশ্রম করতে পারে তার উপরে উপার্জনের কম বেশি নির্ভর করে। বাগানের তরফ থেকে ওদের র‍্যাশন সস্তায় দেওয়া হয়, কেনা দামের চেয়ে কম দামে। কিন্তু চা-বাগানে অনেকের লাবণ্য-হীন রোগা চেহারা দেখে বাইরে থেকে অনুমান করা কঠিন যে এরা সব বিষয়ে ন্যূনতম সুখ-সুবিধা ভোগ করে। করা সম্ভবও নয়। দেশী চা-বাগানে তবু নাকি এরা ইউরোপীয়দের বাগানের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা পায়। ইউরোপীয়দের কুলিপ্রীতি তো সর্বজনবিদিত। তাদের পিলে বড় হওয়াও যেমন ছিল অপরাধ এবং তা ইউরোপীয় বুটকে যে অকারণ আকর্ষণ করত সেও ছিল তেমনি অপরাধ। কিছু দিন পূর্বে এ অঞ্চলের ইউরোপীয় বাগানে কুলিদের বিদ্রোহের ফলে হয় তো অবস্থার একটু উন্নতি হয়েছে।

আমরা ফিরে এলাম প্রায় এগারটায়। এখানে শীত এখনও

হাতী গড়ের বেড়া আক্রমণ করিতে আসিলে উপর হইতে
এইভাবে বর্শার খোঁচা মারিয়া হটাইয়া দেওয়া হয়

খুব বেশী নয়, রাত্রে বাইরে গেলে শীত বোঝা যায়, কিংবা দিনে গাড়িতে ছুটে চললে। খুব মনোরম আবহাওয়া এবং দৃশ্য। তাই বসে বসে উপভোগ করছি আর বড় ডাক্তার অনাদি মিত্রের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করছি—বেলা একটা বেজে গেছে—এমন সময় দূরে বরম-শিকারীর মূর্তি দেখা গেল।

অশোক সুধাংশু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। গণ্ডার দেখা যায় নি। এ সময় দেখার নাকি অসুবিধাও আছে। যে পথে তাদের চলাফেরা সেখানে কাশবনের অতিবৃদ্ধি ঘটেছে এখন। তার উচ্চতা হাতীকে ছাড়িয়ে যায়। তা ছাড়া একটা বড় বিপদের হাত থেকে ওরা বেঁচে গেছে। জঙ্গলের ভিতর একটা চোরা গর্ত ছিল, হাতী সেই গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। আরোহীরাও যে তার পিঠ থেকে পড়ে যায় নি এটা সৌভাগ্য বলতে হবে। এ রকম দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটে, কারণ হাতী চলা-ফেরায় অত্যন্ত সতর্ক। গর্তের অস্তিত্ব জানতে পারলে এ রকম হ'ত না।

১ ডিসেম্বর। আজ সকালে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম রাজাভাতখাওয়ার পথে। কিন্তু তার আগে কতকটা উল্টা পথে এগিয়ে দলসিংপাড়া ষ্টেশনটি দেখে আবার ঘুরে চললাম প্রায় রেলপথের পাশ দিয়ে। পথে কালচিনি নামক একটি বড় জায়গায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। পথের দৃশ্য আগা-গোড়াই খুব চমৎকার। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় এসে পৌঁছলাম রাজাভাতখাওয়া। এখানকার অ্যাসিষ্ট্যান্ট কন্সেট অফিসার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় অশোকের পরিচিত। গাড়ি থামিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি সুখবর দিলেন, বললেন, খেদায় হাতী তাড়ানো সুরু হয়েছে শুনেছেন, তবে ধরা পড়েছে কিনা এখনও খবর পান নি। সুতরাং আমাদের জইন্তীতে গিয়ে অপেক্ষা করাই ভাল হবে। আমরা তখনি উঠলাম সেখান থেকে।

এইবার পথ ক্রমশই উঁচু মনে হচ্ছে, অরণ্যও ক্রমশ গভীর হয়ে আসছে। দার্জিলিং যাবার পথে ট্রেন শুকনা ষ্টেশন ছাড়লে অরণ্য এবং উঁচু পথের যে অভিজ্ঞতা হয়, এখানেও ঠিক সেই রকমই মনে হচ্ছিল। ঘোরা-ফেরা পথে আমরা ক্রমেই একটু একটু ক'রে উঁচুতে উঠছি। একটা জায়গা এমন উঁচু যে ট্রাক সেখানে উঠতে খুব বেগ পেয়েছিল। এইবার আমরা আসল হিমালয়ের অরণ্যে প্রবেশ করছি এই রকম মনে হ'তে লাগল। এখানকার শাল, সেগুন, শিশুগাছগুলো খুব বড় বড়। অরণ্য কোথায়ও ঝোপে অন্ধকার, কোথায়ও ঝোপশূন্য পরিষ্কার। রাজাভাতখাওয়া থেকে জইন্তী পর্যন্ত যে রেলপথ আছে মোটর পথও প্রায় তার পাশাপাশি। কখনও রেলপথ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি কখনও অত্যন্ত কাছে এসে পড়ছি। সকাল থেকে আমরা দু' জায়গায় মাত্র চা খেয়েছি, সুতরাং আরও একবার গাড়ি থামিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়ার দরকার বোধ করলাম। জনহীন অরণ্য-পথে একটি জায়গায়

হাতী গড়ের বেড়া আক্রমণ করিতে আসিলে নীচে হইতে
এইভাবে বর্শার খোঁচা মারিয়া হটাইয়া দেওয়া হয়

দেখা গেল খুব বিস্তৃতভাবে কাঠ কাটার কাজ চলছে—সেই-খানেই থেমে গেলাম। সঙ্গে কিছু রুটি জেলি ছিল, কাঁচা ডিমও ছিল। কিন্তু ডিম খাবার উপায় ছিল না। সুশীলবাবু গাড়ির ইঞ্জিনের গরম বাষ্পে একটি ডিম সিদ্ধ করে খেলেন, কিন্তু এইভাবে একটি একটি করে ডিম সিদ্ধ করতে গেলে সন্ধ্যা

হাতীখেদার গড়ের বাহিরের দৃশ্য। পাশে একটি মঞ্চ দেখা যাইতেছে। উহাতে দর্শকেরা দাঁড়ায়, হাতীর প্রহরীরাও দাঁড়ায়

হয়ে যাবে আশঙ্কায় আমরা আর অপেক্ষা করা পছন্দ করলাম না। সোজা গিয়ে উঠলাম জইন্তী ডাকবাংলোয়।

জইন্তীর দৃশ্য অবর্ণনীয়রূপে সুন্দর। বাংলোর নিচেই জইন্তী নদী—নদীর পারেই হিমালয়। নদীতে এখন জল বেশি নেই, তার সাদা নুড়ি-বিছানো বুক খপ্‌ খপ্‌ করছে, বাংলোর দিকের পাড়ের নিচে সঙ্কীর্ণ ঘন নীল নদী তীব্র বেগে পশ্চিম থেকে পূব দিকে বয়ে চলেছে। তার স্রোতের শব্দ বহু দূর থেকেও শোনা যায়। পাহাড়ের চূড়াগুলোর মাথার সঙ্গে মেঘ পুঞ্জ পুঞ্জ আকারে সংলগ্ন হয়ে আছে। রৌদ্র-ছায়ার খেলা চলছে শালবন-আবৃত সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণীর উপর। প্রবল বর্ষায় ধ্বসে-পড়া জায়গাগুলো ছাড়া সমস্ত পর্বতশ্রেণী অরণ্যে ঢাকা। চূড়ার উপরেও বড় বড় গাছের সম্পূর্ণ চেহারা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু গাছগুলো বড় হওয়া সত্ত্বেও দূর থেকে সবই ছোট ছোট গাছের ঝোপ বলে মনে হচ্ছে। প্রথম দেখায় সবই সবুজ বলে ভ্রম হয়, কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে অরণ্যের বিচিত্র বর্ণে অবাক হয়ে যেতে হয়। লাল, নীল, হলুদ সব রংই আছে বিভিন্ন ঝোপগুলোতে। পূবদিকে অনেকগুলো চূড়া একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে—সেগুলোর রং গভীর নীল, সেখানে মেঘগুলো একেবারে পাহাড়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যার একটু পরেই সমস্ত দিনের পর পরম উপাদেয় খিচুড়ি খেয়ে সুন্দর জায়গায় আসার আনন্দ আরও বেড়ে গেল। আমরা আড্ডা জমিয়ে বসতে না বসতেই স্থানীয় রেলওয়ে এসিষ্ট্যান্ট ইনস্পেক্টর অব ওয়ার্কস্‌ শ্রীযুক্ত শীতলাকান্ত শীল খবর পেয়ে আমাদের কাছে এলেন। ইনি অশোকের পূর্ব পরিচিত। খেদায় হাতী ধরা পড়েছে কিনা ইনিও ঠিক জানেন না। খেদার অবস্থান কোথায় তা আমরা বীরেনবাবুর কাছ থেকে জেনে এসেছিলাম। কাজেই হাতী ধরা পড়ুক বা না পড়ুক আমাদের সেইখানে গিয়েই ক্যাম্প করতে হবে এটা প্রায় ঠিকই ছিল। কারণ হাতী ধরা পড়া একটা দৈব ঘটনা-মাত্র, দেখতে হলে খেদার কাছাকাছি জায়গায় থাকাই ভাল। যে খেদায় আমরা এখন যাচ্ছি সে হচ্ছে এখান থেকে একুশ মাইল দূরে আসাম-ভুটান সীমান্তের খুব কাছে। মাঝখানে রায়ডাক নামক একটি প্রশস্ত নদী পার হতে হবে। এ পথটি বরাবর হাতীপোতা হয়ে পূবদিকে গেছে, নদী পার হয়েও পূব-দিকে যেতে হবে প্রায় কুমারগ্রাম বা নিউল্যাণ্ড পর্যন্ত, সেখান থেকে যেতে হবে সোজা উত্তরে গভীর অরণ্যের দিকে। সেই জায়গার নাম হচ্ছে খুরুল ঝোরা।

কিন্তু আমরা যেখানেই ক্যাম্প করি, হাতী খেদায় হাতীর কাছে বা অন্যত্র বাঘের কাছে, তিনি সব জায়গাতেই ঘর তৈরিতে সাহায্য করার প্রস্তুত। যখন যে ভাবে যে সাহায্য দরকার তাঁকে বললেই তিনি লোকজন, মজুর ইত্যাদি দিতে পারবেন।

অশোক বলল এখন এইখানে চুপচাপ বসে থাকা ভাল লাগছে না, একবার শিকারের সন্ধানে গেলে হয় না? শীল মহাশয় তৎক্ষণাৎ বললেন, সে তো খুব ভাল কথা, আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করছি।
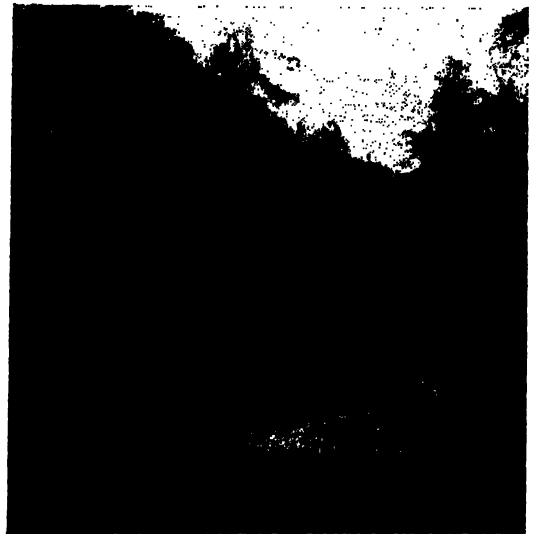
হাতীখেদায় হাতীদের গড়ে আটক করিবার আগে এইরূপ লতাপাতায় ঢাকা দীর্ঘ পথের মধ্য দিয়া তাড়াইয়া আনা হয়

আমি তো ভেবেই পেলাম না কি ব্যবস্থা তিনি করতে পারেন এত রাত্রে। তিনি বললেন যাবেন তো বলুন।

অশোক মহা উৎসাহিত হয়ে বলল, নিশ্চয় যাব, এবং তখনই টর্চ লাইটগুলো ঠিক করতে লেগে গেল। শুনলাম শীল মহাশয় ট্রলিতে ক'রে তিমার জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাবেন

চা-বাগানের একটি কুলী রমণী

খেদার গড়ে আবদ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত জংলী হাতীর দল

বামদিকে—উপর হইতে নীচে : (১) ছোট ছেলেকে থলের ঝুলাইয়া চা-বাগানে কুলী রমণী চা-গাছ হইতে চা সংগ্রহ করিতেছে
(২) কুলী রমণী পিঠে ঝাঁকা বাঁধিয়া চায়ের ডগা সংগ্রহ করিতেছে।

ডানদিকে—উপর হইতে নীচে : (১) এই অস্ত্র সাহায্যে চা-গাছ ছাঁটাই করা হয়। (২) বহু দূর হইতে মেয়েরা হাতীখেদায় হাতীর গলায় ফাঁস পরানোর দৃশ্য দেখিতে আসিয়াছে।

অশোককে। সুধাংশুও যাবে বলে প্রস্তুত হতে লাগল। আমার কল্পনায় দিনের আলোয় দেখা সেই অন্ধকার অরণ্য অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। রাত তখন প্রায় দশটা। কিন্তু আমার মনের ভাব প্রকাশ করে বলতে হ'ল না, ওরা এক রকম ধরেই নিয়েছিল আমি যাব না, তাই অশোক আমার সম্মান রক্ষার জন্যে আগে থাকতেই বলল, তুমি আর এই ঠাণ্ডায় আমাদের সঙ্গে যেয়ো না।

ওরা দশটার সময় বেরিয়ে গেল বাংলো থেকে। ওদের সঙ্গে সুশীল বাবুও গেলেন। আমি একা বসে বসে ডায়ারি লিখতে লাগলাম। এমন সময় একটি লোক এসে (বীরেনবাবুর কাছ থেকে আসা) এক জরুরি খবর বিলি করে গেল। চিঠি-খানা অশোকের নামে, ইংরেজীতে লেখা। তিনি খবর দিয়েছেন পাঁচটি হাতী ধরা পড়েছে, অতএব আগামী কাল অতি প্রত্যুষে খুরুল বোরায় রওনা হওয়া চাই। পথের নির্দেশও নতুন করে দেওয়া আছে। রায়ডাক নদী পর্যন্ত ট্রাক পার হবার বন্দোবস্ত নেই, সুতরাং সেটি এপারে রেখে খেয়া পার হয়ে যেমন ক'রে হোক, ধার ক'রে, অথবা ভিক্ষে ক'রে, অথবা চুরি ক'রে ওপার থেকে কোনো গাড়ী সংগ্রহ করতে হবে।

চিঠির শেষে লেখা আছে Mr. Goswami is really lucky—he has got this opportunity immediately on his arrival.

বীরেনবাবু জানতেন আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফোটো নেওয়া। কিন্তু খেদা সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা না থাকাতে তখনও আমার মনে একটা সন্দেহের ভাব থেকে গেল।

আমাদের ভ্রমণে একটি অতিরিক্ত সুবিধা ছিল এই যে, সুশীলবাবু সঙ্গে একটি রেডিও সেট এনেছিলেন, কাজেই অরণ্য পথে দিন কাটলেও দৈনন্দিন শেষ খবর রোজই শুনতে পেতাম। এতক্ষণ নানা উত্তেজনায় সন্ধ্যায় অথবা রাত দশটার খবর শোনা হয় নি—সে কথাটা এতক্ষণে মনে পড়ল। তখন অবশিষ্ট ছিল মাত্র বি বি সি খবর, তাই একা একা বসে শুনতে লাগলাম। নানা প্রোগ্রামে রাত এগারোটা পর্যন্ত বেশ কেটে গেল, কিন্তু তারপর? শিকারীদের ফিরে আসার অপেক্ষায় অনির্দিষ্টকাল বসে কাটানো যায় না। তারা যাবার সময়েই বলে গিয়েছিল ফিরতে অনেক রাত হবে। তাই বিছানার আশ্রয় নেবার আগে ডায়ারিটা আরও কিছু এগিয়ে রাখলাম।

শিকারীরা ফিরে এল রাত প্রায় দু'টোয়। ঘুম ভেঙে গেল। শুনলাম কিছু মেলে নি। খুবই স্বাভাবিক, কারণ শিকার কখন মিলবে তা কেউ আগে বলতে পারে না। এই অনির্দিষ্টতাই যে শিকারের একটি প্রধান আকর্ষণ এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই।

ডুয়ার্স অঞ্চলে অনেককেই হিংস্র জন্তুর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করতে হয়, তবে এ অঞ্চলের বাঘ মানুষকে নাকি আক্রমণ করে না। তবু এদের সংখ্যাধিক্যে এ অঞ্চলে শিকারীদের আনাগোনা বেশি। বাঘের সংখ্যা নাকি খুব বেড়ে গেছে এখন। শীল মহাশয় বললেন, একদিন রেল-লাইনের উপর দু'টো রয়্যাল বেঙ্গল শুয়ে ছিল, রেলগাড়ির ইঞ্জিন তাদের সম্মুখে থেমে হুইস্‌ল বাজাতে লাগল, কিন্তু ওরা তা সত্ত্বেও নড়ল না। তারপর এক সাহসী ড্রাইভার কয়লা ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাদের রেল-লাইনের উপরকার অনধিকার অবস্থানের বিষয়ে চেতনা সঞ্চার করতে সক্ষম হ'ল। আর এক দিন কয়েকজন লোকের সামনেই বাঘ একটা গরুকে ধরে নিয়ে গেছে।

এ দিককার জঙ্গলে হাতী, বাঘ, ভালুক, বাইসন, হরিণ, শুয়োর এবং সাপ আছে। তা ছাড়া ময়ূর এবং মুরগীও আছে। আসবার সময় বন মুরগী ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে নি। জঙ্গলের মধ্যে এখানকার লোকেরা বাঘের চেয়েও হাতীকে বেশি ভয় করে। কারণ মানুষের শব্দ পেয়ে বাঘ সর্বদাই প্রায় গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু হাতীর শব্দ পেলে মানুষ পালাবার পথ খুঁজে পায় না, বিশেষ করে যূথভ্রষ্ট পাগলা হাতী যদি হয়। পাগলা হাতীর সম্মুখে পড়লে কারো আর বাঁচবার আশা থাকে না।

২ ডিসেম্বর। ভোরে উঠে চা খেয়েই আমরা খুরুল বোরার দিকে রওনা হলাম ট্রাকে করে। হিমালয়শ্রেণীর সমান্তরাল-ভাবে পূবদিকে ষোল মাইল যাবার পর রায়ডাক নদী। হিমালয়ের সঙ্গে এত বড় নদী এদিকে এই প্রথম দেখলাম। নদীর মাঝখানে চর, দু'দিকে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এক দিকে পায়ে হেঁটে পার হবার মত সেতু, তারপর চর পার হয়ে খেয়া-নৌকো। নদীর চরে নুড়ির অবর্ণনীয় শোভা। রোদের আলোয় সমস্ত চরে যেন সাদা আগুন জ্বলে উঠেছে। তারই উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে আমরা উঠলাম খেয়া নৌকোয়। ট্রাক এ পারে রেখে যেতে হ'ল। নদী পার হয়ে ওপারে পৌঁছে দেখা গেল আমাদের পিছনে একখানা মোটর গাড়ি এ পারে আসছে। ছোট গাড়ির পক্ষে নৌকোয় পার হয়ে আসার কোনো অসুবিধা ছিল না। গাড়ির মালিককে অশোক দূর থেকেই চিনতে পারল। সে দাঁড়িয়ে গেল নদীর পাড়ে, আমাদের বলল এগিয়ে যেতে। শীল মহাশয়ও আমা-দের সঙ্গে ছিলেন। আর ছিল গাড়ির ক্লীনার লালু। আমরা চার জন হেঁটে যেতে লাগলাম নিউল্যাণ্ডের প্রশস্ত পথে। পথের দু'ধারে চায়ের বাগান। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই সেই গাড়িখানা এসে পড়ল, অশোকও এসেছে সেই গাড়িতে। সে বলল আপতত আর একজন যেতে পারে সে গাড়িতে, খুরুল বোরায় গিয়ে গাড়ি আবার ফিরে আসবে, তখন আর সবাই যাবে। সুধাংশুকেই আগে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। আমরা কাছেই একটা বাংলোয় বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

গাড়ি ফিরে এল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। গাড়ির মালিকও এসেছেন। তিনি শুধু গাড়ির মালিক নন, হাতীখেদার মালিকও তিনি। মালিক অর্থাৎ ইজারাদার। নাম, রায়

সাহেব অন্নদানাথ রায়। নীলপাড়া ভাংচুরাঝির গেম ওয়ার্ডেন ছিলেন, এখন অবসর নিয়েছেন। ইনি এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় শিকারী। পঁচিশটি রয়্যাল বেঙ্গল ইনি নিজে গুলি ক'রে মেরেছেন এবং অন্তত পাঁচ-শ শিকার পার্টির নেতৃত্ব করেছেন। পাকা শিকারী হিসাবে ইউরোপীয়ান শিকারীর কাছে বিশেষ মাননীয়। বাঘের মতোই তেজী লোক এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। ইনি তাঁর গাড়িতে আমাদের নিয়ে গেলেন খুরল ঝোরায়। ঐখান থেকে খুরল ঝোরা পাঁচ মাইল। গভীর অরণ্য-পথ। পথ সব জায়গাতেই কাঁচা এবং খাড়া-উঁচু এবং নিচু। গাড়ির পথ সে নয়।

আমরা খেদার ধারে গিয়ে নামলাম। চার দিকে জঙ্গল, পায়ের নিচে বালি আর ভাঙা পাথর। দু-এক পা এগিয়ে যেতেই অন্নদা বাবু সেই বালির উপর বাঘের সদ্যআঁকা পদচিহ্নের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমরা তো দেখে অবাক। এক একটা থাবার দাগ ছোটখাটো একটা হাতীর পায়ের দাগের মতো। রাত্রে বড় বাঘ এ পথে গেছে, পায়ের চিহ্ন তখনও টাটকা আছে। আমাদের চোখে এ চিহ্ন ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু শিকারীদের দৃষ্টি সর্বদা সজাগ।

হাতীর দলকে জঙ্গল থেকে তাড়াতে তাড়াতে যে ফাঁদের পথে নিয়ে আসা হয় সে পথের দু'ধার জঙ্গল থেকে কাঁটা গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। হাতী পাছে এই ষড়যন্ত্র ধরে ফেলে, তাই সেই বেড়াকে ডালপালা এবং পাতা দিয়ে এমন ঢেকে দেওয়া হয়েছে যে ওটা যেন জঙ্গলেরই একটা অংশ। এই পথে হাতীর দল এসে যেখানটায় আটকা পড়ে তাকে বলে গড়। এই গড় এবং গড়ে আসবার পথ ইত্যাদি সমস্ত মিলিয়ে নাম হচ্ছে খেদা। আমরা কাকম পাতা দিয়ে 'কামুফ্লাজ'-করা এই দীর্ঘ পথের পাশ দিয়ে দিয়ে গড়ের দিকে এগিয়ে চলেছি। পথের পাশে দু-একটা গাছে অনেক উপরের দিকে মাচা বাঁধা রয়েছে দেখলাম। হাতী আসবার সময় ঐখানে পাহারা বসেছিল। বহুদূর থেকে তাড়া খেয়ে হাতীর দল ফাঁদে ঢুকতে বাধ্য হয়। চার দিকে বহু লোক হল্লা করে, বোমার আওয়াজ করে এবং হাতীরা ভয়ে পালাতে থাকে। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? এমন ভাবে তাড়ানো হয় (beat করা বলে) যাতে খেদাপথে না এসে আর তাদের উপায় থাকে না। এই পথের শেষে গড়। গড়ের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গেট বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এই গেটের কাছে যে সব লোক থাকে তাদের সম্পূর্ণ আত্মগোপন ক'রে থাকতে হয়।

আমরা গড়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতেই দেখি চার দিকে বেশ একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে। তখনই অনেক লোক এসেছে দেখতে।

পথে অন্নদা বাবুর সঙ্গে দর্শকদের এই ভিড় সম্পর্কেই আলাপ হয়েছিল। তিনি বলছিলেন এত লোক আসে যে তাদের জায়গা করা শক্ত হয় এবং তাতে কাজেরও অনেক সময় অসুবিধা হয়। কিন্তু বৎসরান্তে বুনো হাতী ধরার দৃশ্য এ অঞ্চলের লোকেদের জীবনে হয় তো একমাত্র উত্তেজনা এবং আনন্দ। তাই দূর দূরান্তর থেকে কাজ ফেলেও বহু স্ত্রী-পুরুষ খেদায় এসে ভিড় করে। আমরা যখন গেলাম তখন বেলা এগারোটা। সে সময় লোকের ভীড় বেশি হয় নি—হয়েছিল ঘণ্টা দুই পর থেকে।

গড়ে আবদ্ধ হাতীদের দেখবার জন্যে মোটামুটি ভাল বন্দোবস্তই করা হয়েছে দেখলাম। গেটের দুই পাশে দুটি মাচা ও বিপরীত দিকে আর একটি মাচা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এক-একটা মাচায় বার-তের জন লোক কষ্ট করে দাঁড়াতে পারে। আমরা গেটের ডান ধারের মাচায় গিয়ে উঠলাম। সরু সরু গাছ কেটে মাচায় ওঠার জন্যে মৈ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বাঁশের সিঁড়িও আছে। আমরা মাচায় উঠে দেখলাম বাঁ দিকের মাচায় অশোক ও সুবাংশু দাঁড়িয়ে। গড়ের ব্যাস পঁচিশ-ত্রিশ হাত। চার দিক সরু সরু গাছ কেটে তাই দিয়ে গোল ক'রে ঘেরা। গাছের বাকলের আঁশ সব জায়গাতেই বাঁধার কাজে দড়ির মতো ক'রে ব্যবহার করা হয়েছে। মাচার বাঁধনগুলো টেনে দেখলাম, তা পাটের চেয়ে ঢের বেশি শক্ত।

মাচার উঠে দেখলাম পাঁচটি বন্দী হাতীর মূর্তি। ওদের মধ্যে তিনটি বড় ও দুটি ছোট। বাচ্চা ছোট হাতী দুটোর একটি দাঁতওয়ালা। বড় হাতীদের একটিকে বুড়া বলে মনে হ'ল। গড়ের মধ্যে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বন্দী অবস্থাটা ওদের মোটেই ভাল লাগছে না। এক এক সময় মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বেড়ার উপর—বেড়া ভেঙে বেরিয়ে যাবে ব'লে। কিন্তু তখুনি বাইরের পাহারাদারের শড়কির খোঁচা খেয়ে ফিরে আসছে। এই ব্যবস্থা না থাকলে ওদের পক্ষে সেই কয়েদখানা ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া খুব কঠিন নয় বলেই মনে হ'ল এবং এ রকম সম্ভাবনা আছে বলেই চার দিকে এবং উপরে মাচার উপর সতর্ক প্রহরী খাড়া আছে। শেষ পর্যন্ত বন্দুকের ব্যবহারও হতে পারে ব'লে সে ব্যবস্থাও রাখতে হয়েছে।

আমি যে মাচার উপর দাঁড়িয়ে ওদের ছবি নিচ্ছিলাম সেই মাচা গড়ের গেট এবং বেড়ার সঙ্গে সংলগ্ন। হাতীর আক্রমণে তা বার বার কেঁপে উঠছিল। একবার একটা হাতী শুঁড় তুলে হাঁ করে ছুটে এসে আমার পায়ের নীচেই মারল খুব জোর এক ধাক্কা। সে ধাক্কায় একেবারে গড়ের ভিতরেই আমি পড়ে যেতাম, কারণ আমার দুখানা হাতই ছিল ক্যামেরায় আবদ্ধ। সুশীল বাবু আমাকে ধরে ফেললেন। চেয়ে দেখি আমার পাশে গেটের উপর থেকে একটি ছেলে শড়কির খোঁচা মেরে হাতীকে হটিয়ে দিল। তখন সে গিয়ে চুপচাপ অন্য হাতীদের সঙ্গে অত্যন্ত শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়। কিছুক্ষণ পরেই ঐ হাতীটি নিজেদের

দলের বাচ্চা দাঁতওয়ালা হাতীটির উপর আক্রমণ চালাতে লাগল। আবার কিছুক্ষণ পরে ওরা দল বেঁধে গড়ের মধ্যে অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পিঠে ওদের রোদ লাগছিল, ওরা জঙ্গলে থাকে, এতক্ষণ ধ'রে বোধ হয় কখনও রোদে থাকে নি, তাই ওদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশলটিও বেশ অদ্ভুত লাগল। মাঝে মাঝে সম্মুখের একখানা পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে শুঁড়ে ক'রে সেই মাটি পিঠের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে। কোটোগ্রাফেও পিঠের সেই মাটির প্রলেপ দেখা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে এক দল সাহেব মেম এসে উঠল বাঁয়ের দিকের মাচায়। ওদের দু'জনের হাতে ক্যামেরা।

বড় হাতীটি অতঃপর পাঁচ-সাত মিনিট পর পরই আক্রমণ চালাতে লাগল। এরা জঙ্গলে যখন থেকে তাড়া খাচ্ছে তখন থেকে অবশ্য ভাল ক'রে খেতে পারে নি। যে পথে এসে এরা গড়ের মধ্যে ঢুকতে বাধ্য হয় সেই পথে কলাগাছ কেটে কেটে পর পর ফেলে রাখা হয়, যাতে অন্ততঃ সেই পথে আসার একটা লোভ জাগে। গড়ে আটকা পড়বার পর থেকে আর বিশেষ কিছু খেতে দেওয়া হয় না, কারণ এদের গলায় ফাঁস পরানোর কাজটি এমনই কষ্টসাধ্য যে তার আগে এরা অনেকখানি দুর্বল হয়ে না পড়লে চলে না। বড় হাতী, বন্দী হয়ে একেবারে ক্ষেপে গেছে। এরা রাগে ক্ষোভে খিদেয় অস্থির হয়ে এক এক সময় মেঘের মতো গর্জন করছে, কখনও বা কান্নার মতো শব্দ করছে।

শুনলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফাঁস পরানোর কাজ সুরু হবে। আমি ইতিমধ্যেই নেমে পড়ে গড়ের চার পাশের অবস্থা ভাল ক'রে দেখতে লাগলাম। বাইরের নানা গ্রাম থেকে লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে। ঘুরে ঘুরে কয়েকটা বাইরের ছবি নিলাম। রাত্রে গড়ের পাশে আগুন জ্বালানো হয়েছিল দু'তিন জায়গায়। মোটা মোটা কাঠের আগুন, তখনও নেভে নি, তারই পাশে তিন ফুট সাড়ে তিন ফুট উঁচু চালা বাঁধা। তার মধ্যে বসে লোকেরা গড় পাহারা দিয়েছে সমস্ত রাত ধ'রে। আগুন জ্বালানোর উদ্দেশ্য শীতের জন্তেও বটে, রাত্রে ঐ রকম অরক্ষিত জায়গায় বাঘ বা অন্য হিংস্র জন্তুকে দূরে রাখবার জন্তেও বটে। (ক্রমশঃ)

গোপন লীলার বর্ণালী বীক্ষণ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বিশ্বরূপের অসীম মায়ায় আত্মার উদয়ন
সুন্দর করে জীবের বিবর্তন।
মহা আকাশের গোপন লীলার বর্ণালী বীক্ষণ
আনে অমৃতের নব নব সন্ধান
অনন্ত ধরা জ্ঞান-যজ্ঞের শুনায় চেতনা গান,
জনমে জনমে প্রাণ-পুরুষের বিচিত্র কৌতুক
চলে চিরদিন; ইতিহাস তার দিয়ে যায় বিবরণ।
ক্ষণভঙ্গুর মর্ত্যকায়ায় জড়িত দুঃখ-সুখ
পশুর ভিতরে জন্ম লভিছে নর,
সাধনা তাহার দেবজনমের রচিছে উৎসমুখ
সুদূরপিয়াসী মানব নিরন্তর।

মানুষের সাথে মিশিছে মানুষ হৃদয়ের বিনিময়ে
প্রেমের তীর্থে আলোকের দীপ লয়ে,
হাজার হাজার বছর তবুও পরিচয়-সংশয়ে
অপূর্ণতায় জপিছে ব্যথার মালা।
অরণ্য মন ক্ষণে ক্ষণে পায় মরুর দহনজ্বালা।

সে মিলনে নব মানসলোকের এষণার অভিসার,
ভাবের আবেগে তাহার প্রবাহ দিকে দিকে যায় বয়ে,
জীবন-স্বপ্ন বিস্ময়ভরা ক্ষণিক রশ্মি তার
আসা-যাওয়া পথে রচিছে ইন্দ্রজাল;
কখনো হাসিতে কখনো বিষাদে মন দোলে অনিবার,
তাহারি চিত্র আঁকিছে চক্রবাল।

স্বার্থ যেথায় সঙ্কটময় সঙ্কীর্ণতা সনে
আনে সংঘাত বীর্য্যের প্রলোভনে;
মানুষেরে সেথা পশুর অধম দেখা যায় আচরণে,
হীন অপরাধ রুদ্র নিনাদ করে।
চাঁদের চিতায় ধূমকেতুদের কুম্ভীর-অশ্রু ঝরে।
অগ্রগতির পটভূমিকায় উল্কার মত আশা
উদ্বেগে নামে হিংসা রাতের মৃত্যু আবেষ্টনে।
কখন কি ভাবে নিয়তিচক্রে ঘুরিছে ভাগ্যপাশা
নৈতিক পাপে আনন্দ উপভোগে,
সেই কথা বিধি-বন্ধনীতি বিরচিত ভালবাসা
করে চঞ্চল নিখিল-চিত্তলোকে।

শ্রীমতী কোকোতে

শ্রীজীবনময় রায়

পাগলা গারদ থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি একটা রোগা লম্বা লোক উঠোনটার এক কোণে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য একটা কুকুরকে ডাকছে—কল্পনায়। খুব আদর ক'রে মোলায়েম সুরে ডাকছে "আয়, আয়রে কোকোতে, আয়, আয় রে সুন্দরী আমার, আয়!" আর জন্তুজানোয়ার ডাকতে হ'লে, যেমন ক'রে লোকে উরুত চাপড়ায়, তেমনি চাপড় মারছে উরুতে।

ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলুম, "ও লোকটা কি?" ডাক্তার বললে, ও, ও এমন কিছু শোনবার মত ব্যাপার নয়। ও এক-জন কোচোয়ান, নাম ক্র্যাকোয়া। নিজের কুকুরটাকে জলে ডুবিয়ে মেরে পাগল হয়ে গেছে।"

আমি ধ'রে পড়লুম, "গল্পটা বলুন আমায়। দেখুন, অতি সাদাসিধে সামান্য ব্যাপারও অনেক সময় ভারি করুণ হয়—আমাদের মনে গিয়ে লাগে।"

এই হ'ল লোকটার বিপত্তির কাহিনী—ওর এক সহিস বন্ধুর কাছ থেকে গল্পটা ডাক্তারের শোনা।

প্যারির শহরতলীতে এক ধনী ভদ্রলোক থাকতেন সপরিবারে। সীন নদীর ধারে একটা বড় বাগানের মধ্যে ছিল তাঁর প্রাসাদ। তাঁদের কোচোয়ান ছিল ঐ ক্র্যাকোয়া। পাড়াগেঁয়ে মানুষ; একটু বোকাসোকা, মায়াবী, সাদাসিধে ধরণের; তাই ওকে ঠকানো ছিল ভারি সোজা।

একদিন সন্ধ্যেবেলা যখন বাড়ী ফিরছে, একটা কুকুর ওর পেছু নিলে। প্রথমটা ও খেয়ালই করে নি, তার পর কুকুরটাকে একেবারে নাছোড়বান্দা দেখে ও ফিরে দাঁড়াল। কুকুরটা পাড়ার কুকুর কি না, একবার দেখে নিলে। না, কস্মিন্ কালেও ওকে দেখে নি, একটা ভীষণ হাড়গিলে মেয়ে-কুকুর। ভাবটা ভারি কাতর আর হ্যাংলা গোছ; পায়ের মধ্যে ল্যাজটি গুটিয়ে পেছন পেছন টুকটুক ক'রে চলেছে—চলতে সুরু করলে কি থামলে ওর কান দুটো চ্যাটালো হয়ে ওর মাথায় এসে পড়ছে।

"যাঃ, যাঃ! বেরো, দূর হ। হিস্, হিস্।" বলে ও সেই কঙ্কালটাকে খেদিয়ে দিতে চেষ্টা করলে। কুকুরটা কয়েক পা পিছিয়ে গেল, তার পর বসে অপেক্ষা করতে লাগল। কোচোয়ান যেই আবার চলতে সুরু করলে, সেও ওর পেছু নিলে।

কোচোয়ান এবার যেন পাথর কুড়োচ্ছে এমনি একটা ভঙ্গী করলে। জানোয়ারটা আরো একটু বেশী পেছিয়ে গেল দৌড়ে, কিন্তু যেই লোকটা পিছন ফিরল অমনি আবার এসে হাজির।

তার পর কোচোয়ান ক্র্যাকোয়ার ভারি মায়া হ'ল, অবোলা জন্তুটার উপর। ডাকলে তাকে। ভয়ে ভয়ে কুকুরটা এসে হাজির হ'ল। লোকটা তখন কুকুরটার দশা দেখে আদর ক'রে ওর পাঁজরার জিলজিলে হাড়গুলোর উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, বললে, "আয়, আমার কাছে আয়!" তক্ষুণি সে ল্যাজ নাড়তে লাগল—বুঝল যে ওকে পুষ্যি নেওয়া হ'ল, আর তাই বুঝে এবার সে তার নতুন মনিবের আগে আগেই দৌড়ে চলল।

লোকটা ওর জন্যে আস্তাবলের খড়ের উপর শোবার জায়গা ক'রে দিলে আর খানিকটে রুটি আনতে গেল রান্নাঘরে। পেট ঠেসে খেয়েদেয়ে কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পর দিন কোচোয়ানের মনিবরা সব কথা শুনে, আর আপত্তি করলে না কুকুরটাকে থাকতে দিতে।

কুকুরটা ভাল জাতের কুকুর—ভারি ন্যাওটা, বিশ্বাসী, চালাক আর ঠাণ্ডা।

মোট কথা ক্র্যাকোয়া কোকোতেকে প্রাণ দিয়ে ভাল-বাসত। বলত "ওটা মানুষের মত, শুধু কথা বলতে পারে না।"

খুব চমৎকার একটা লাল চামড়ার কলার তৈরি করিয়ে তার উপর তামার কলকে খোদাই ক'রে লিখে দিলে "শ্রীমতী কোকোতে। মালিক—কোচোয়ান ক্র্যাকোয়া।"

বছরে চারবার ক'রে, পালে পালে যত রকম জাতের কুকুর কল্পনা করা যায়, সব রকমের বাচ্চা দিত কুকুরটা। ওরই মধ্যে একটাকে বেছে নিয়ে, শ্রীমতীর জন্যে রেখে—বাকীগুলোকে, ক্র্যাকোয়া নদীতে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসত। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই রাঁধুনী, মালী, চাকর, সবাই এসে নালিশ সুরু করলে। বলে, যে চুলোর নীচে, কয়লার বাক্সে, মায় বরফের তোরঙ্গে পর্য্যন্ত—দেখো—কুকুর। আর যা পাবে তাই চুরি করবে।

শেষে নালিশে নালিশে হয়রান হয়ে মালিক হুকুম দিলেন—কোকোতেকে তাড়িয়ে দিতে। হতাশ হয়ে লোকটা ওটাকে বিলিয়ে দিতে চেষ্টা করলে। কেউ নিতে চায় না।

তখন ওকে একেবারে দূর করে দেবে ঠিক করে, একটা মাথালের হাতে দিয়ে, জরেম জিল-লে-পঁতের কাছে, প্যারির একেবারে বাইরে ওকে ছেড়ে দিয়ে আসতে বললে।

সেই দিনই কোকোতে ফিরে এল।

নাঃ। কিছু একটা করতেই হয়। একটা ট্রেন কণ্ডাক্টারকে পাঁচ ফ্রাঁ দিয়ে ওটাকে হাভারে ছেড়ে দিয়ে আসতে দিলে।

তিন দিন পরে আবার ওটা ফিরে এল আস্তাবলে—বেশ রোগা, পায়ে ঘা আর খুব হয়রান হয়ে।

তখন মালিকের ওর উপর আবার একটু দয়া হ'ল, ফলে ওকে থাকতে দিলেন। কিন্তু ঠিক আগের মতই, ওর টানে, যত সব কুকুর আবার আসতে লাগল।

একদিন বড় একটা ভোজ চলেছে ; আর ওদেরেই মধ্যে একটা, রাঁধুনীর মাকের তলায় থেকে একেবারে, পুর দিয়ে ঠাসা একটা আস্ত 'টার্কি'মুখে ক'রে তুলে নিয়ে যে ছুট—তাকে বাধা দিতেও শ্রীমতীর ভরসায় কুলোল না।

এবার, মনিব একেবারে ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে ক্যাকোয়াকে বললেন—"শুনছ হে, কাল সকালের মধ্যেই ঐ জানোয়ারটাকে যদি জলে না ফেলে দিয়ে এসো, তা হলে তোমার চাকরী থেকে বরখাস্ত করব। বুঝেছ ?

লোকটা একেবারে যেন হতভম্ব হয়ে গেল। চাকরীই ছাড়বে ঠিক ক'রে ফেললে ; আর বাক্স গুছোতে লেগে গেল। তার পর ভেবে চিন্তে দেখলে যে যতক্ষণ ঐ জানোয়ারটা ওর কাছে থাকবে ততক্ষণ ওকে কেউ আর চাকরি দেবে না। নিজের এমন ভাল চাকরীটা ! ভাবলে, এত মাইনে, এমন খাওয়া দাওয়া এখানে। চিন্তা ক'রে দেখলে যে একটা কুকুর এ সবের তুলনায় কিছুই না। শেষে ভেবে ঠিক করলে, যে ভোর হলে কোকোতেকে ফেলেই দিয়ে আসবে।

ভাল ঘুম হ'ল না রাতে। ভোরে উঠে একটা শক্ত দড়ি নিয়ে কুকুরটাকে বাঁধতে চলল। শ্রীমতী ওকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে একবার গা ঝাড়া দিয়ে দেহটাকে টান ক'রে নিলে, তার পর প্রভুকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল।

এর পর ওর মনটা ভেঙে পড়ল—আর ওকে আদর করে, কান টেনে, চুমু খেয়ে, পেয়ারের নাম ধ'রে ধ'রে ডেকে একসা করতে লাগল।

এমন সময় কাছেই একটা ঘড়িতে বাজল ছ'টা। আর ত তার দেরী করার সময় নেই ! দোর খুলে ডাক দিলে, "আয় !" বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে জেনে খুশী হ'য়ে সে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

ওরা নদীর ধারে এল, আর একটা জায়গা বেছে নিলে যেখানকার জলটা গভীর ব'লে মনে হ'ল ওর। তার পর চামড়ার কলারটার উপর দড়িটা জড়িয়ে বেঁধে গেরো দিলে আর দড়ির অন্য মুখটায় বেঁধে দিলে একটা ভারি পাথর। যেন মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে এমনি ভাবে ওকে জড়িয়ে কোলে তুলে নিয়ে পাগলের মত চুমু খেতে লাগল। বুকের কাছে চেপে ধ'রে দোল দিতে দিতে আদর করতে লাগল—"কোকোতে, আমার আদরের ধনরে ; ওরে মিষ্টি সুন্দর কোকোতেরে," আর শ্রীমতী আহ্লাদে খুশীতে গলে গিয়ে গর গর করে শব্দ করতে লাগল।

দশ বার ওটাকে জলে ছুড়ে ফেলে দিতে গেল, দশ বারই বুকটা ভেঙে যেতে চাইল তার।

কিন্তু শেষে হঠাৎ এক বার মনটা বেঁধে নিয়ে সে শ্রীমতীকে যতটা পারে নিজের কাছ থেকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে। প্রথমটা, ওকে চান করবার সময় যেমন করত তেমনি ক'রে, সাঁতরাতে চেষ্টা করলে ; কিন্তু ওর মাথাটাকে পাথরের ভারে নীচের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল, আর বেচারা যেন ঠিক মানুষের মত, পাগলের দৃষ্টি হেনে, চাইলে ওর প্রভুর মুখের দিকে, ডুববার সময় মানুষে যেমন ক'রে তাকায় ; সেই রকম করেই জলের মধ্যে প্রাণপণে হাঁপাই ছুড়তে লাগল। একটু পরেই মাথার দিকটা গেল ডুবে, আর তার পেছনের পা দু'খানা উন্মত্ত ভাবে জলের বাইরে দাপাদাপি করতে লাগল। তার পর তাও ডুবে গেল।

তার পর, পাঁচ মিনিট ধরে জলের উপর বুদবুদের বুড়বুড়ি কাটতে লাগল—নদীর জল যেন ফুটছে টগবগ্ ক'রে। ক্যাকোয়ার চোখমুখ বসে গেছে—চোখে যেন দেখতে পাচ্ছে যে কোকোতে কাদায় পড়ে ছটফট করছে—আর চাষীদের যেমন সাদা অবুঝ মন হয়—ও ক্রমাগতই নিজে নিজে বলছে—আহা, বেচারা অবোলা জন্তু, ও কি ভাবছে—আমাকে ? এঁ্যা !

পাগল পাগল মত হয়ে গেল ; এক মাস সে শয্যাগত হয়ে রইল—আর ঐ কুকুরটাকে স্বপ্ন দেখত। সে এসে ওর হাত চাটছে বুঝতে পারত ; ডাকছে শুনতে পেত। ডাক্তার ডাকার দরকার হয়েছিল। শেষে ও সেরে উঠলে, ওর মনিব রুয়েন কাছে বীসেয়ার এর জমিদারীতে, জুনের শেষ দিকে ওকে নিয়ে গেল।

সেখানেও সে ঐ সীন নদীর ধারেই। নদীতে স্নান সুরু করলে। ভোরে রোজ সে সহিসের সঙ্গে নদীতে যায় আর দু'জনে সাঁতার দিয়ে নদী পার হয়।

এক দিন এমনি ক'রে সাঁতার খেলছে দু'জনে, এমন সময় ক্যাকোয়া চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, দেখ হে দেখ, ওটা কি আসছে, ঐটের একটা চপ তোমায় আজ খাওয়াব। একটা মড়া ফুলে ভেসে আসছে—ঠ্যাংগুলো আকাশে তোলা।

ঠাট্টা করতে করতেই ক্যাকোয়া ওটার কাছে সাঁতার দিয়ে গেল : উঃ ! মোটেই টাটকা নয়। কি শিকারই জুটলো, খুড়ো। নিতান্ত ক্ষীণ ও নয় !" জন্তটার চার দিকে ঘুরে একটু দূরে দূরে ও সাঁতার দিচ্ছে—পচে উঠেছে ওটা—হঠাৎ চুপ ক'রে গিয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল ও। এই বার এত কাছে এল যে ছুঁতে পারে। তার পর কলারটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে হঠাৎ হাতখানা বাড়িয়ে গলাটা ধরল, মড়াটা ঘুরিয়ে নিজের কাছে টেনে আনলে আর সেই রং-জলা চামড়াটার উপর তখনো সাঁটা, সবুজ হয়ে যাওয়া তামার কলকটার উপরের লেখাটা পড়তে লাগল "শ্রীমতী কোকেতে। মালিক—কোচোয়ান ক্যাকোয়া।"

মরা কুকুরটা মনিবকে খুঁজে খুঁজে এক শ' মাইলের উপর এসে মনিবকে পেয়েছে।

বিকট একটা চীৎকার ক'রে উঠে সে ডাঙার দিকে সাঁতরাতে লাগল আর চীৎকার করতে থাকল। আর ডাঙা ছোঁয়া মাত্রই, পাগলের মত ছুটে পালিয়ে গেল—গ্রামের মধ্যে দিয়ে—সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে সে।

* মোপাসাঁর বিখ্যাত:গ্ল্প "মাদামোয়াজ়েল্ কোকোতে"র অনুবাদ

সত্যেন্দ্রনাথের 'সন্ধিক্ষণ'

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই (?) ফেব্রুয়ারি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ও ২৫ জুন ১৯২২ তারিখে ৪১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। এই স্বল্প-পরিসর জীবনে তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

শৈশবাবধি সত্যেন্দ্রনাথ কবিতাপ্রিয় ছিলেন। কৈশোরেই তাঁহার কবিতা রচনার সূত্রপাত হয়। বার বৎসর বয়সে (ইং ১৮৯৩) লিখিত তাঁহার কোন কোন রচনা 'বেণু ও বীণা'য় স্থান লাভ করিয়াছে। এফ. এ. পড়িবার সময়, ১৯০০ সনে, তাঁহার প্রথম পুস্তক 'সবিতা' মুদ্রিত হয়; ইহা পরবর্ত্তী কালে তাঁহার 'হোমশিখা'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক 'সন্ধিক্ষণ'। ইহা আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। পুস্তিকাখানি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য, অনেকে ইহার অস্তিত্বের কথাও অবগত নহেন। ডক্টর সুকুমার সেন ইহা দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু পুস্তিকায় প্রকাশকাল না থাকায় "১৯০০ ?" সনে মুদ্রিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।* বলা বাহুল্য, এই অনুমান ঠিক নহে। 'সন্ধিক্ষণ' পাঠ করিলে কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, ইহা ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে লিখিত। বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকতালিকা অনুসারেও ইহার প্রকাশকাল—১৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৫। আমরা 'সন্ধিক্ষণ' পুনর্মুদ্রিত করিলাম। যদি কখন সত্যেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়, এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকাখানিও তাহাতে সন্নিবিষ্ট করা সহজসাধ্য হইবে।—

এত দিনে। এত দিনে বুঝেছে বাঙালি
দেহে তার আজো আছে প্রাণ!
জগতের পূজ্য যাঁরা তাঁহাদেরি মাঝে
আশা হয় পাব মোরা স্থান।
যে খুসী টিট্‌কারী দিক
অন্তরে বুঝেছে ঠিক—
এ কেবল নহেক হুজুগ;
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ!

পথে ঘাটে দেখ চেয়ে অন্দরে বাহিরে
দেশহিতে বিলাস বর্জ্জন,
বিরাট সহস্র শীর্ষ উঠেছে জাগিয়া
লক্ষ মুখে এক দৃঢ় পণ।

যেথা যে বাঙালি আছে,
প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে,
শুভ লগ্ন পেয়েছে বাঙালি,
মনে হয় আর মোরা রব না কাঙালী।

এ বড় আশার দিন—পণ্য স্বদেশের
সবে তুলে লয়েছে মাথায়;
এবার পরীক্ষা হ'বে প্রতিজ্ঞার বল,
ভগবান হউন সহায়।
ভুলেছিনু মনুষ্যত্ব
বিলাস ব্যসনে মত্ত,
ভুলেছিনু পৌরুষের স্বাদ,—
আজি পুন জাগে সেই সিংহের আহ্লাদ।

এ বড় সঙ্কট কাল—পণের রক্ষণ,—
আমাদের ভ্রম পদে পদে,
সতর্ক জাগ্রত যেন রহি সর্ব্বক্ষণ,
নাহি ডুবি কলঙ্কের হ্রদে।
স্মরি স্বদেশের দুখ—
মাতা-পত্নী-কন্যা-মুখ—
নিত্য প্রাতে উচ্চারিব পণ—
"বাঁচাব দেশের শিল্প—দেশের জীবন।"

দরিদ্র দেশের কোলে দরিদ্রের বেশ
আমাদের সাজিবে সুন্দর,
'খাটো দেহে খাটো ধুতি'—লজ্জা কিবা তায়?
শ্রমের সৌন্দর্য্য মহত্তর!
শক্তিমান দেহমন,
ভীষ্মের মতন পণ,
তার চেয়ে কি আছে শোভন?
জুতায় পরাণ মন; কি ছার বসন?

ভগবান! হীনবলে তুমিই দিয়েছ
এ অপূর্ব্ব নূতন জীবন!
লইয়া অভয় নাম প্রতিজ্ঞা করেছি;
শক্তি দাও রাখিব সে পণ।
নব স্রোত, বঙ্গভূমে,
তোমার নিদেশে নেমে,
সর্ব্বপ্রাণ করেছে সজীব,
হে বরদ! শুভঙ্কর! হে সুন্দর! শিব

---

* 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৩য় খণ্ড (১৩৫৩), পৃ. ৫০৪।

তুমি দাও বুঝাইয়া নিন্দুকে, কুটিলে,—
'বাঙ্গালিও জন্মেছে মানব,
কার' চেয়ে তুচ্ছ নয় বাঙ্গালির দাবী
বৃথা সে করে না কলরব ;
মঙ্গল বিধান যত,
স্বদেশের সেবা ব্রত,
আজ সে মাথায় লবে তুলে ;
মূঢ় সে—যে দাঁড়াইবে তার প্রতিকূলে।'

'উন্মুক্ত সবারি তরে নিখিল সংসারে
মনুষ্যত্ব-মহত্ত্বের পথ,—
চিরখত সে পথে কণ্টক দিতে পারে,—
এমন জন্মে না দাসখত ;
চুক্তির বেতন পাও,—
সর্ত্তমত কাজ দাও ;
যে প্রভু অধিক করে আশ
ব'ল' তারে—কর্ম্মচারী নহে ক্রীতদাস।'

অর্থের সম্বন্ধ হ'তে কত উচ্চতর
মনুষ্যত্ব—দেশহিত ব্রত ;
স্বার্থ সাথে স্বদেশের বিরোধ যেথায়
স্বদেশেরি পায়ে হও নত।
এ কথা না ভুলে রও—
'তুমি শুধু তুমি নও—
দশের মাঝারে একজন ;
দেশের—দশের শুভে কল্যাণ আপন।'

এমন' পণ্ডিত-মূর্খ জন্মেছে এ দেশে,—
শুনিবারে সাহেবের মুখে
নিজের বুদ্ধির কথা ; স্বদেশে বিদেশে
"পণ্ পণ্ড" বলে স্ফীত বুকে ;
নিজ মুখে মাখি কালি,
লভে শুধু করতালি,—
কালি দিয়া দেশের গৌরবে !
হা বঙ্গ ! দিয়েছ শুভ ইহাদের' সবে !

শুনি' পণপত্রে কত রাজভৃত্য, হায়,
সহি করে অস্পষ্ট অক্ষরে !
কি লজ্জা ! এতই ভয় চাকুরির তরে ?—
কি লভিবে দাস্য বৃত্তি করে ?
বাণিজ্যে বসেন রমা,
কৃষি প্রায় তারি সমা,
দুই পন্থা উন্মুক্ত তোমার।
তবু দ্বিধা-কুণ্ঠ-মন ? অদ্ভুত আচার !

স্বার্থান্ধ স্বদেশদ্রোহী জান না কি হায়—
জান না কি আত্মদ্রোহী তুমি ;
পুত্র পৌত্র অন্নাভাবে মরিবে ; এখনো
প্রসারিয়া লও কর্ম্মভূমি।
কারে কর পরিহাস ?
নিজ স্ত্রীর লজ্জাবাস—
তাও নহে আয়ত্ত-অধীন !
সত্য তুমি অতি দীন—অতি দীন হীন।

আজি যারা অনাগত—ভবিষ্য যাদের
কি নাম তাদের কাছে পাবে ?
কোন্ স্বত্ব কোন্ বিত্ত (স্বস্তি ব্যতীত)
তাহাদের তরে রেখে যাবে ?
কোন্ কর্ম্ম, কোন্ নীতি,
কোন্ মহত্ত্বের স্মৃতি,—
তাহাদের হবে মূলধন ?
স্মরিয়া তাদের কথা—দৃঢ় কর পণ।

পাঠশালে ছাত্র করে বিদেশী-বর্জ্জন,
চমৎকার ! দৃশ্য চমৎকার !
বিলাস-বর্জ্জনে হের তরুণী ছাত্রীরা
অগ্রগামী আজি সবাকার।
বল' রাজপুতানারে,—
বেণী বিসর্জ্জিতে পারে
বঙ্গনারী তাঁদেরি মতন,
প্রয়োজন হ'লে ; সাক্ষী আজিকার পণ !

শিক্ষক শিখান্ আজ বালকে যুবকে
হইবারে দেশের সেবক ;
যত ধনী মহাজন পণ-বদ্ধ সবে,
ঊর্দ্ধ শিখা উৎসাহ পাবক !
মহাপ্রাণ, সমুদার,
কত শ্লাঘ্য জমীদার
লয়েছেন দেশহিত ব্রত ;
মুক্তকোষ সবে, প্রাচ্য রাজাদেরি মত।

আর আজি ধন্য তুমি দরিদ্র বাঙ্গালি,—
বিসর্জ্জন দিয়েছ সংশয়,
যেন মন্ত্রবলে তুমি মুক্তপ্রাণ এবে,
মুক্তহস্ত কথায় কথায় !
পরস্পরে এ প্রত্যয়—
বক্ষে আসিবার নয় ;
এ রত্ন দেছেন ভগবান !
অন্তরে সঞ্চিত করি রাখ দৈবদান।

বৎসরান্তে তাম্রশেষে শুধু একবার
কূল প্লাবি আসে যে জোয়ার,
তাহার তুলনা নাই ; সমস্ত বৎসরে
সে জোয়ার আসে একবার।
সে জোয়ার এসেছে রে
আমাদের ঘরে ঘরে,
এসেছে রে নূতন জীবন।
বাঙ্গালি পেয়েছে আজ সামর্থ্য নূতন।

কণা কণা স্বর্ণ ছিল মৃত্তিকার মাঝে,
ধূলি পারা ধূলি মাঝে হারা ;
আজি কোন অনির্দ্দিষ্ট ভূগর্ভের তাপে
গলে মিলে হ'ল স্বর্ণ ধারা।
হার গড়ি সে কাঞ্চনে,
এস সবে, সযতনে—
পরাইব দেশের গলায় ;
জননী! জনমভূমি! সাজাব তোমায়।

বাহিরের ঝড় এসে ভাঙ্গে যদি ঘর—
কোথা থাকে পুত্র পরিবার?
অন্তরে প্রবল বায়ু উঠিয়াছে যদি
নত হও সম্মুখে তাহার।
স্বদেশ, তোমার পানে—
দেখ গো, উদ্বিগ্ন প্রাণে
কাতর নয়নে চেয়ে আছে।
আশা করে মাতৃভূমি প্রত্যেকেরি কাছে।

পবিত্র কর্ত্তব্য-ব্রত লয়েছি মস্তকে,
মরেও রাখিতে হবে পণ।
রাজ্যপণে পাশা খেলি, পণরক্ষা হেতু
বনে গেছে হিন্দু রাজগণ।
বিদেশের মুখ চেয়ে,
শতেক লাঞ্ছনা সয়ে,
সংজ্ঞা যদি এসেছে আবার,—
প্রতিজ্ঞা স্মরিয়া, শীঘ্র লও কার্য্যভার।

এ দিন অলসে গেলে, কি ক্ষতি যে হবে—
দেখ বুঝে অন্তরে সে কথা ;—
আশা ভঙ্গ, মনঃক্ষোভ, শক্তি অপচয়,
শত দিকে পাবে শত ব্যথা ;—
শত্রু মিত্র দিবে গালি,
লেপিবে চরিত্রে কালি,—
পঙ্কে ফেলি দলিবে দু'পায়ে ;
আবার সহস্র বর্ষ পড়িবে পিছায়ে।

জাতিত্ব গৌরব যাবে অঙ্কুরে মরিয়া,
ঝরিবে রে আধ-ফোটা ফুল ;
ভগবান! রক্ষা কর—শক্তি কর দান,
প্রভু! মোরা হয়েছি ব্যাকুল!
দুর্ব্বলের বল তুমি!
দীনের শরণভূমি!
আশ্রয় লইনু তব পায়,
লজ্জা নিবারণ সখা! হও হে সহায়!

কে আছ হে ধনবান আন' স্বর্ণ-ধন,
কায়ক্লেশ আন' শ্রমী যেবা,
শিল্পী আন নিপুণতা, উদ্যোগী উদ্যম,
সবে মিলি কর মাতৃ-সেবা।
পরিশ্রমে লজ্জা নাই,
জানবীর পিনোজাই,—
করিতেন কাচের সংস্কার!
মন্ত্রদ্রষ্টা স্রষ্টা ঋষি আদি সূত্রধার!

সুবেশ রাখাল-বেশ সকল ভুলিয়া,
ব্রত হও স্বদেশের কাজে ;
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া স্থির স্থাণুর মতন
মাত হও জগতের মাঝে।
আত্মতেজে করি ভর—
কর্ম্মে হও অগ্রসর!
মূর্খে শুধু বলে এ 'হুজুগ' ;
বঙ্গ-ইতিহাসে আজি এল স্বর্ণ-যুগ!

মাটি ও সংগঠন

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

পল্লী-সংগঠন, পল্লী-উন্নয়ন প্রভৃতি অনেক কথা নানা দিক থেকে শুনতে পাচ্ছি---কিন্তু কার্য্যতঃ পল্লীর কতটুকু উন্নতি আমরা দেখতে পাই? ভারতের পল্লীগুলির দুর্দ্দশা ক্রমেই চরমে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চাশ বছরের আগেকার কথা থাক—বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও পল্লীর যে অবস্থা ছিল আজ তা নাই। আগে যে জমিতে বিঘা প্রতি পনর-বিশ মণ ধান হ'ত এখন সেখানে দুই-তিন মণের বেশী ফলে না, যে সব ক্ষেতে তরিতরকারি অজস্র উৎপন্ন হ'ত এখন তার এক-তৃতীয়াংশও হয় কিনা সন্দেহ। ফলবান বৃক্ষে আর আগের মত ফল ধরে না। গরুর সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং পরিচর্য্যার অবহেলায় গ্রামে দুধও মেলে না। নদী, বিল, পুকুরের আগেকার মত জৌলুস নাই—জল থেকে মাছ যেন উধাও হয়ে গিয়েছে।

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে এখনও যদি দেশের লোক মাটির দিকে সত্যিকারের চোখ মেলে না চায় তা হলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। আমাদের ক্ষেতে ফসল হয় না অথচ জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে। মাটির উর্ব্বরতা কমে যাচ্ছে অথচ অপ্রচুর খাদ্যশস্যের ভাগীদার হিসাবে জন্মাচ্ছে অগণিত মানব, ফলে মন্বন্তরের বিভীষিকা আমাদের ক্রমাগত লেগেই আছে।

আমাদের কিন্তু এমন অবস্থা হবার কথা নয় যে না খেতে পেয়ে মরতে হবে। জনসংখ্যা যতই বাড়ুক এখনও আমাদের আহার্য্যের অভাব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যে দৃষ্টি থাকলে এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে আমাদের সেইটারই অভাব।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে 'সংগঠনে'র দিকে সকলের দৃষ্টি দিতে হবে এবং আমাদের সমস্ত সংগঠন-পরিকল্পনার সুরু করতে হবে মাটির অর্থাৎ কৃষি-পদ্ধতির সংস্কার থেকে। এই সংগঠন-প্রচেষ্টা পরাধীন জাতির গবর্ণমেণ্ট দ্বারা কদাচ হবে না। যে দরদী মন উন্নয়ন-পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে পারে আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের সেই দরদেরই অভাব। লক্ষ্য করেছি, গবর্ণমেণ্টের পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ বৎসরে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছে কর্ম্মচারীদের মাইনে যোগাতে, কিন্তু যেজন্য অসংখ্য কর্ম্মচারীকে পোষণ করা হয়েছে জনসাধারণের অর্থে, সেই কাজটি অর্থাৎ পল্লী-উন্নয়ন ব্যাপারটিই এক তিলও অগ্রসর হয় নি—বরং দিন দিন অবস্থা খারাপ হতে চলেছে। পল্লীর লোক অনাহারে মরে, রোগজর্জ্জরিত হয়ে বিনা ওষুধে মরে—পল্লী-উন্নয়ন এই ভাবে চলছে আমাদের দেশে।

যে গুণ থাকলে প্রকৃত 'পাবলিক সার্ভেণ্ট' (জনসাধারণের সেবক) হওয়া যায়, কোনও কাজেই নিয়োগ-পর্ব্বের আগে সেই গুণের যাচাই করা হয় না। সুতরাং এদের দিয়ে কাজের চেয়ে অকাজ হয় বেশী। কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য কি ভাবে সাধারণের অর্থ খরচ করার ব্যবস্থা হয়েছে—সেই অদ্ভুত পরিকল্পনা কিছু দিন আগে গবর্ণমেণ্ট তরফের বক্তৃতা থেকে জানতে পেরে আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত এবং কৃতার্থ হয়ে গিয়েছি।

সুতরাং সরকারী পরিকল্পনার দিকে তাকিয়ে দেশবাসীর কোনও লাভ নাই। যা-কিছু করবার এদেশের দরদী লোকদেরই করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে সত্যিকারের দরদ দিয়ে কাজ করবার লোকের নিদারুণ অভাব আছে বলেই মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্য্যের পরিকল্পনা ভারতময় ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ এখনও পেল না। রাজনীতির কচকচি নিয়েই বেশীর ভাগ কর্ম্মীরা ব্যস্ত—কারণ তাতে চটকা উত্তেজনা আছে। কিন্তু সংগঠন ব্যাপার নিয়ে দেশের কাজে নামতে হলে যে ধৈর্য্য, যে মহাপ্রাণতা, যে দরদ, যে অধ্যবসায়ের দরকার—তা আমাদের ক'জনের আছে? অথচ এই দুর্দ্দিনে এমনি লোকের দরকার আমাদের শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ।

একটি মাত্র দরদী লোকও যে দেশের কি আশ্চর্য্য উন্নতি করতে পারে—তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। দৃষ্টান্তটি অবশ্য বিদেশের—কিন্তু সেই দেশের অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থার সুন্দর মিল আছে।

প্রায় বছর দুই আগে ওয়াশিংটন শহরে পৃথিবীর নানা দেশের পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ মিলিত হন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কি ভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত পল্লীবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করে উপায় ঠিক করা। ডি. স্পেন্সার হ্যাচ বক্তৃতা দিতে উঠলেন। যুক্তিতর্ক দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন—কি করে তিনি একক মেক্সিকোর ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কাজ করে সে দেশের কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছেন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের শ্রীবৃদ্ধি করে তাদের পরবশ্যতা থেকে উদ্ধার করে মঙ্গলের পথ নির্দ্দেশ করেছেন।

তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে একজন প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে বললেন, আমার তৈরি বক্তৃতা ছিঁড়ে ফেলে দিতে হ'ল হ্যাচের বক্তৃতা শুনে। এবার আমার স্থির ধারণা হ'ল যে হ্যাচ যে ভাবে কাজ করেছেন—অজ্ঞ পল্লীবাসীর মঙ্গল কামনা করলে আমাদের তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে। তাঁর কর্ম্মকেন্দ্রের মত কেন্দ্রই আমাদের সমস্যার উপযুক্ত সমাধান—যেখানে হাতে-কলমে লোকে কাজ শিখছে এবং মাটির উন্নতির জন্য যেখানে নেতা তৈরি হচ্ছে মাটির সঙ্গে সংযোগ রেখে।

স্পেন্সার হ্যাচ একজন নামজাদা উন্নয়ন-পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ। তিনি কুড়ি বছরের ওপর দরিদ্র পল্লীবাসীদের উন্নতির জন্ত কাজ করেছেন, তাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করে উপায় উদ্ভাবন করেছেন এবং তাতে কৃতকার্য্য হয়েছেন। বছর পাঁচেক আগে তিনি কিছু টাকা ধার করে মেক্সিকো শহরের পঁচাত্তর মাইল দূরে পাহাড়ের পাশে এক উপত্যকাভূমিতে বসবাস করার ব্যবস্থা করলেন। এই উপত্যকা থেকে পাহাড়ী রাস্তা চলে গিয়েছে এগারোটি আদিম লোকেদের অধ্যুষিত পল্লীর দিকে—যেখানকার অধিবাসীর সংখ্যা বার হাজার এবং যারা সভ্যতার আলো পায় নি। এমনি স্থানে হ্যাচ অসম্ভব অল্প খরচায় উন্নত ধরণের শস্য ও ফল উৎপাদন এবং পশু পালনের ব্যবস্থা করেছেন, যা দেখে কাজ সুরু করলে সমগ্র মেক্সিকোর উপকার হতে পারে। প্রত্যেকটি ঘর—হাঁস মুরগীর ছোট্ট চালা থেকে সপরিবারে বাসের উপযোগী গৃহ পর্য্যন্ত—এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে কিভাবে সহজপ্রাপ্য উপকরণ ব্যবহার করে ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করা যায় এবং দরিদ্রতম ব্যক্তিও সে উপকরণগুলি এক রকম বিনাখরচায় সংগ্রহ করে সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করতে পারে।

ক্ষুদ্র আদর্শ কার্য্য তৈরি করে হ্যাচ পরবর্তী কার্য্যক্রমের জন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি দেখতে চাইলেন যে তাঁর রেড ইণ্ডিয়ান প্রতিবাসীরা তাঁর কাজ দেখে আকৃষ্ট হয় কিনা। তিনি মুখে তাদের কিছুই বললেন না। সমস্ত দেখে শুনে তারাই জিজ্ঞাসু হয়ে তাঁর কাছে আসে কিনা তা তিনি দেখতে চাইলেন। তাঁর কাজ দেখে কি ওদের বিস্ময় উদ্রেক হচ্ছে? এ সম্বন্ধে তিনি কিন্তু তাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। ওরা কি চায় তার শস্যের মত ফলন? তাঁর প্রতিবেশীরাও কি তাঁরই মত শাকসব্জি, ফল ভালবাসে? তারা কি চায় তাঁর মুরগীর মত মুরগী যা তিন চার গুণ বেশী ডিম দেয়? এমন শূকর যারা একই পরিমাণ খাদ্য খেয়েও চর্ব্বিতে ভরপুর হয়ে ওঠে? ছাগল যা তাদের শিশুদের অপর্য্যাপ্ত দুধ জোগাবে? সুন্দর আলোকোজ্জ্বল গৃহ বাস করবার জন্ত? পরিশ্রুত জলের অবিরাম প্রবাহ?

হ্যাচ আমাদের বলেছেন, মেক্সিকোর ইণ্ডিয়ানদের ব্যঙ্গচিত্রে আমরা প্রায়ই দেখে থাকি যে তারা চোখ-পর্য্যন্ত-ঢাকা-টুপি পরা মাথাটা হাঁটুর উপর রেখে ঝিমুচ্ছে—সেটা কিন্তু তাদের সভ্যকারের চিত্র নয়। তারা সত্যই চোখ বুঁজে নেই—তাদের টুপির কিনারায় দুইটি ছোট গর্ত আছে তার মধ্য দিয়ে তারা তোমাকে নিরীক্ষণ করছে। তারা যখন স্থির নিশ্চিত জানবে যে তুমি তাদের সত্যই ভাল করতে চাও এবং তোমার কার্য্যটা তাদের শোষণ করার আর একটি ষড়যন্ত্র নয়—তখনই তারা তোমার অনুসরণ করার চেষ্টা করবে। হ্যাচ বলেন—পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের কৃষকরাই রক্ষণশীল। তারা এমন জিনিষেই আগ্রহ দেখাবে যা তাদের আয়ত্তের মধ্যে।

এক শ' মাইল দূরবর্তী পল্লী থেকেও ইণ্ডিয়ানরা দেখতে আসে, কিভাবে ক্ষেতে অপর্য্যাপ্ত শস্য ফলছে এখানে, কিভাবে খরের পর ঘর তৈরি হচ্ছে, কেমন করে হাঁস মুরগীর উন্নতি হচ্ছে। তারা নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে—তারপর ধীরে ধীরে ভাবতে থাকে এখানকার কথা বাড়ী ফিরে গিয়ে। প্রথমে অল্পসংখ্যক ইণ্ডিয়ান আসে তাঁর কাছে কিছু বীজ নিতে, কিছু উপদেশ শোনবার জন্ত। তারপর তারা ফিরে গিয়ে যখন হ্যাচের 'যাদু'তে তাদের নিজের ক্ষেতেও ফলন হয়—তখন দলে দলে সেই গ্রাম থেকে লোক আসতে থাকে পাহাড় ডিঙিয়ে, আঁকা-বাঁকা দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে।

হ্যাচ আরও বলেন, এদের মত লোককে শিক্ষা দিয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করতে হলে সব কথা একবারে প্রকাশ করতে নেই, প্রথমে ততটুকুই এদের দেওয়া উচিত যতটা তারা আয়ত্ত করতে পারবে। হ্যাচ চান্ জানবার কৌতূহল তাদের মধ্যে থাকুক, এ নিয়ে তাড়াহুড়া করবার প্রয়োজন কিছু নাই। তারপর যা তারা এখান থেকে নিয়ে যাবে তার ন্যায্য মূল্য দিতে সক্ষম হোক। এমনি করেই স্থায়ী সহযোগিতা গড়ে ওঠে। এখানকার ইণ্ডিয়ানদের রীতিমত আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। তারা বিনামূল্যে চায় না কিছুই। হ্যাচ মনে করেন—এই সব ইণ্ডিয়ানের উপর ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানসমূহ, দেওয়ার বোঝা চাপিয়েই এদের আরও দরিদ্র করে রেখেছে। এই রকম করুণা প্রদর্শন অত্যন্ত ভুল পন্থা এবং এতে মানুষকে আরও পঙ্গু করে ফেলে।

হ্যাচ্ বিনা পয়সায় দেন না কিছুই। তেল মাখতে হলে কড়ি ফেলতে হবে এই তাঁর নীতি। তবে সে কড়ি যে আগেই ফেলতে হবে তার কোনও মানে নেই। যদি কোনও ইণ্ডিয়ান আসে তাঁর কাছে সেই সেরা শস্যের বীজের জন্ত যাতে দশগুণ বেশী শস্য ফলে, অথবা কয়েকটা ডিম নিতে যা থেকে আশ্চর্য্য রকমের বড় বড় মুরগী জন্মায় তখন হ্যাচ্ প্রয়োজন হলে তার নামে হিসাব খোলেন তাঁর খাতায়। সর্ত্ত থাকে এই—প্রথমে সেই বীজ থেকে যে শস্য জন্মাবে এবং ডিম থেকে মুরগী হবার পর সেই মুরগীর যে ডিম হবে প্রথমে—তা থেকে ধার নেওয়া শস্য ও ডিমের মূল্য শোধ দিতে হবে। হ্যাচ্ মনে করেন এই ভাবে সাহায্য করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় হয়তো কাজ মন্দ গতিতে চলবে। হয়তো বা এ ব্যবস্থা কঠোর বলেও মনে হতে পারে—কিন্তু এইটাই কৃতকার্য্যতা লাভের স্থায়ী ব্যবস্থা।

অনুর্ব্বর মাটি দারিদ্র্য সৃষ্টি করে—এটা চলতি কথা। আবার দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও ব্যাধি—এই তিনটি অভিন্ন সমস্যা। শুধু মেক্সিকো নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশ সম্বন্ধে এই কথা খাটে। হ্যাচ বলেন, এই তিনটি সমস্যার মূল থেকে সমাধান করতে হবে এবং তিনি মূল থেকেই আরম্ভ করেছেন—অর্থাৎ মাটি থেকে

যে মাটি শতাব্দীর পর শতাব্দীর অপব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

উদ্ভিজ্জ ও গোবর সার মিশ্রিত করে তিনি এক খণ্ড পোড়ো মরা মাটি তৈরি করে নিলেন চাষের উপযোগী করে। এই ধরণের সার দরিদ্রতম কৃষকও অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারে। তাঁর ক্ষেতে খাদ্য-শস্যের গাছ হ'ল আকারে সাধারণ গাছের দ্বিগুণ আর শস্যের ফলন হ'ল আশেপাশে তাঁর প্রতিবেশীদের ফলনের চারগুণ বেশী। তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে পোকার উপদ্রব থেকে গাছ রক্ষা পায়। তাঁর প্রতিটি খণ্ড জমিতে শাকসব্জি, ফলমূল প্রভৃতি এমন ভাবে জন্মাতে লাগল মাসের পর মাস যা দেখে লোকের তাক লেগে গেল।

তিন বছরের চেষ্টায় হ্যাচ্ সেই জীর্ণ উপত্যকাভূমিকে ছোটখাট একটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত করে ফেললেন। মাটির যৌবনপ্রাপ্তি হ'ল আবার— ফসল ফলতে লাগল অজস্র। চলতি ফসলের চাষ ছাড়াও নতুন নতুন ফসলের চাষও তিনি করতে লাগলেন। তিনি এক রকম সয়াবীনের চাষ করলেন যা থেকে সারা বৎসর উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য পাওয়া যাবে। মেক্সিকোবাসীকে তিনি দেখিয়েছেন, কি করে কুড়ি বর্গ ফুট জমিতে সয়াবীনের চাষ করে একটি পরিবারে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হতে পারে।

মাংসের জন্য বেপরোয়া হত্যার দরুন মেষকুল এ দেশ থেকে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। হ্যাচ্ আবার এই দেশে মেষ আমদানি করলেন এবং হাতের তাঁতে পশম বোনার পদ্ধতি তিনি প্রবর্ত্তন করলেন। এদেশের লোক প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পুরনো প্রথায় মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করত। হ্যাচ্ বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি পালন ও মধুচক্র নির্ম্মাণ-প্রণালী শিখিয়ে দিলেন। এখন ইণ্ডিয়ানরা আধুনিক মধুচক্র থেকে যে পরিমাণ মধু আহরণ ক'রে যে অর্থ পায়, আগে চল্লিশটি বন্য মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করেও সে অর্থ তারা পেত না। পোলট্রি ও পশুপালন বিষয়ে হ্যাচ্ বিশেষ কৃতকার্য্য হয়েছেন। তাঁর কার্ম্মের বাছাই-করা ভাল ষাঁড়, মেষ, মোরগ পালা করে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশু ও মুরগী প্রজননের সহায়তার জন্য।

গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতির উন্নতি সাধন হ্যাচের বৈশিষ্ট্য এবং এই ব্যাপারটি মেক্সিকোবাসী ইণ্ডিয়ানদের অত্যন্ত কুতূহলী করে তুলেছে। মাত্র দেড়শত টাকায় একটি ছোট পরিবারের আদর্শ গৃহনির্ম্মাণের প্ল্যান তিনি করেছেন। এই বাড়ীতে পরিস্রুত জলের চৌবাচ্চা, সেনিটারি পায়খানা, রান্নাঘর থেকে ধূম নির্গমনের ব্যবস্থা, কংক্রিটের মেঝে, এমন কি ধারা-স্নানের (shower bath) ব্যবস্থাও আছে।

হ্যাচের আদর্শ গৃহনির্ম্মাণকার্য্য শেষ হওয়ার কিছু আগেই নিকটের কোনও এক গ্রামের মোরগ তাঁরই আদর্শ অনুযায়ী নিজের গৃহের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করে—এমন কি তার মুরগীর ঘরটিও হ্যাচের মুরগীর ঘরের মত তৈরি করে। এই ব্যাপারের পর গ্রামের কুমারী মেয়েরা ঘোষণা করে যে তারা এমন যুবকদেরই বিবাহ করবে যারা এমনি সুন্দর গৃহনির্ম্মাণ করতে সক্ষম হবে।

হ্যাচের কার্ম্মে স্থায়ী প্রদর্শনী খোলা আছে—যেখানে ইণ্ডিয়ানরা কৃষিজাত পণ্যের উৎকর্ষ নিজেরা চোখে দেখে জ্ঞান লাভ করতে পারে। তা ছাড়া, বই এবং ছবির লাইব্রেরিও আছে তাঁর কার্ম্মে।

হ্যাচের জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে—আত্মনির্ভরতা এবং পরবশ্যতা থেকে উদ্ধার লাভ। জীবনে বারংবার ব্যাধি ও দুর্ঘটনায় তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে। তিনি বাঁচবেন না এবং বাঁচলেও সারা জীবন পঙ্গু হয়ে থাকবেন এই আশঙ্কা অনেকে অনেক বার করেছিল। কিন্তু নিজের চেষ্টায় এবং মনের বলে প্রত্যেক বারই তিনি আরোগ্যলাভ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—আত্মপ্রত্যয় কি অসাধ্য সাধন করতে পারে।

হ্যাচের আদর্শ কার্ম্ম দেখবার জন্য দলে দলে লোক আসছে নানা দেশ থেকে। পৃথিবীর প্রত্যেক অনুন্নত পল্লীর কৃষকেরা হ্যাচের আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করতে পারে। উন্নতি করতে হলে হাতে-কলমে কাজ করতে হবে—হ্যাচ্ এই শিক্ষাই দিচ্ছেন সবাইকে।

আমাদের দেশে—যেখানে মন্বন্তরের বিভীষিকা ভয় দেখাচ্ছে প্রতিক্ষণ—সেখানে হ্যাচের আদর্শ প্রত্যেক পল্লীতে গ্রহণ না করলে আর উপায় নাই। পল্লী-সংগঠন, গ্রাম-উন্নয়ন মুখের কথা নয়। গবর্ণমেন্টের তরফ থেকে কতকগুলো মোটা মাইনের কর্ম্মচারী পোষণ করে এবং শহরে বসে বক্তৃতা দিয়ে পল্লী-সংগঠন চলে না। এর জন্য চাই দরদী কৃষক-বন্ধু—যাঁদের দরদ শুধু হলনার নামান্তর নয়—যাঁরা উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে গ্রামে গিয়ে বসবেন, নিজের হাতে মাটি-মায়ের সেবা করবেন এবং তাঁদের আদর্শে অজ্ঞ পল্লীবাসীদের উদ্বোধিত করে পল্লীর প্রকৃত উন্নয়ন করবেন।

আকাশ-পথের অশ্বারোহী

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল অপরাহ্ণ। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার একটা রাস্তার পাশে ছোট একটি বন-ঝোপের ভেতরে শুয়ে ছিল এক তরুণ সৈনিক। সে শুয়েছিল সমস্ত দেহ প্রসারিত করে উপুড় হয়ে পেটের ওপর ভর দিয়ে, পা দুটোর ভার রেখেছিল সে আঙুলগুলোর ওপরে আর বাম বাহুটিকে উপাধান করে সে তার উপর ন্যস্ত করেছিল তার মস্তক, তার প্রসারিত দক্ষিণ বাহু আলগোছে তার বন্দুকটিকে ধরে রেখেছিল। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কতকটা সুশৃঙ্খল বিন্যাস এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে তার কোমরবন্ধের পেছন দিকে ঝুলানো কার্তুজের বাক্সটির ছন্দময় দোলনই শুধু সূচিত করছিল যে সে বেঁচে আছে, নৈলে যে স্থানে যে অবস্থায় সে পড়ে ছিল তাতে তাকে মৃত বলে মনে করার সম্ভাবনা ছিল ষোলো আনা। যেখানে সে গভীর নিদ্রায় অচেতন সেখানে সে প্রেরিত হয়েছিল সামরিক বিভাগের বিশেষ কোনো কর্তব্য সম্পাদন করবার জন্যে, কিন্তু নিদ্রামগ্ন হওয়ায় তার কর্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি হচ্ছিল। যদি সে ধরা পড়ত তা হলে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া তার পক্ষে ছিল অসম্ভব, কেননা সেই হ'ত তার অপরাধের ন্যায্য এবং আইনসঙ্গত শাস্তি।

সৈনিকটি যে বন-ঝোপের মধ্যে শায়িত ছিল সেটি একটি দুরধিগম্য চড়াইয়ের একটেরে অবস্থিত। চড়াইটি প্রথমে খাড়া দক্ষিণ দিকে ওঠে গিয়েছে, তারপর পশ্চিম দিকে বেঁকে আন্দাজ এক শ' গজ গিরিগাত্র বেষ্টন করে বরাবর পর্ব্বতশিখরাভিমুখে চলে গিয়েছে। সেখান থেকে রাস্তাটি আবার দক্ষিণদিকে ঘুরে সর্পিল গতিতে নিম্নাভিমুখে অবতরণ করে বনের ভেতরে গিয়ে আত্মগোপন করেছে। রাস্তাটির এই দ্বিতীয় বাঁকের মুখে, পশ্চাতের অনন্ত পর্ব্বতমালা থেকে উত্তর দিকে উন্নত একটি গিরিশৃঙ্গ যেন মৌনভাবে নীচেকার গভীর উপত্যকাভূমির শ্যামশোভা অবলোকন করছে। এই পর্ব্বতশৃঙ্গ এত উত্তুঙ্গ যে যদি এর তুঙ্গদেশ থেকে একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত হয় তা হলে সেটি পড়বে গিয়ে সোজা হাজার ফুট নীচে পাইন বনের শীর্ষদেশে। সৈনিকটি যেখানে শুয়েছিল সে জায়গাটি এই পাহাড়েরই বিপরীত দিকে। জেগে থাকলে এই পার্ব্বত্যভূমির সৌন্দর্য্যে সে একেবারে অভিভূত হয়ে যেত। শুধু বনপথের খানিকটা এবং পাহাড়ের উন্নতাংশই নয়, পর্ব্বতসানুদেশের সমগ্র দৃশ্যটাই এক সঙ্গে তার নজরে পড়ত এবং এই অপূর্ব্বসুন্দর দৃশ্য দেখে নিশ্চয়ই সে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হ'ত।

এই বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্যভূমির প্রায় সমস্তটাই জঙ্গলাকীর্ণ, কেবল উত্তর দিকে উপত্যকার এক প্রান্তে শস্যাবৃত একটি অনতিবৃহৎ শ্যামল প্রান্তর। এই শ্যামক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে প্রবহমাণ ক্ষুদ্র নদীটির রজতশুভ্র জলধারা উপত্যকার প্রান্তসীমা থেকে সুস্পষ্ট দৃশ্যমান হয় না। সেখান থেকে ঐ খোলা জায়গাটুকুকে সাধারণ একটি গৃহদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণ অপেক্ষা আয়তনে বড় দেখায় না, আসলে কিন্তু কয়েক একর জমি জুড়ে এর প্রসার। সন্নিহিত অরণ্য অপেক্ষা এর শ্যামশোভা অধিকতর নয়নানন্দকর। এরই এক প্রান্ত থেকে পাহাড়ের মালা ক্রমোচ্চভাবে ওঠে অভ্র ভেদ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং এই পর্ব্বতশ্রেণীর গা বেয়েই রাস্তাটি যেন বহু আয়াসে গিরিচূড়ায় গিয়ে আরোহণ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় উপত্যকাটি থেকে বহির্গমনের যেন কোনো রাস্তা নেই এবং যে রাস্তাটা উপত্যকার বাইরে অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় সেইটেই যে কি ভাবে দুর্গম বনানী অতিক্রম করে পাহাড়ের কোলে গিয়ে পৌঁছল তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

এমন অরণ্যপর্ব্বতসঙ্কুল দুরধিগম্য দেশ বিরল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মানুষ শেষ পর্য্যন্ত এই নিভৃত পার্ব্বত্যভূমিকেও যুদ্ধভূমিতে পরিণত করে ছাড়লে। এই দুর্গম পর্ব্বতমালার পাদমূলস্থ অরণ্যে আত্মগোপন করে অবস্থান করছিল ফেডারেল পদাতিক বাহিনীর পাঁচটি রেজিমেণ্ট। এই পার্ব্বত্য প্রদেশ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া এতই কঠিন যে, যদি মাত্র পঞ্চাশ জন সৈন্য বহির্গমন-পথ আগলে বসে থাকে তা হলে বিরাট সৈন্যবাহিনীকেও শেষ পর্য্যন্ত খাদ্যাভাবে তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতে হবে।

পূর্ব্বোক্ত সৈন্যবাহিনী পূর্ব্বদিবস সারা দিনরাত 'মার্চ্চ' করে এখন এই নিভৃত স্থানে এসে বিশ্রাম করছিল। রাত্রে আবার সুরু হবে তাদের পথ চলা, ধীরে ধীরে তারা পৌঁছাবে গিয়ে সেই জায়গায় যেখানে বনঝোপের আড়ালে শুয়ে আছে কর্ত্তব্যকর্ম্ম-অবহেলাকারী সেই সৈনিক-প্রহরী। তারপর গিরিগাত্রের অল্প ঢালু পথ বেয়ে ক্রমাবতরণ করে তারা মধ্যরাত্রি নাগাদ একটি শত্রু শিবিরে গিয়ে আচম্কা হানা দেবে। অতর্কিত আক্রমণে তাদের হতবুদ্ধি করে দেওয়াই এই অভিযাত্রী বাহিনীর অভিপ্রায়, কেননা প্রতিপক্ষ এই ভেবে নিশ্চিন্ত যে, তরুরাজির আড়ালে অদৃশ্য পথটি তাদের ঘাঁটির পেছন দিকে, সুতরাং এর অভিসন্ধি আক্রমণকারীদের পক্ষে জানা অসম্ভব। আক্রমণকারীরা চলছিল বিশেষ সন্তর্পণে, কেননা ব্যর্থকাম হলে তাদের অবস্থা হবে চূড়ান্ত ভাবে শোচনীয়; আর একথাও সত্যি যে, তাদের গতিবিধির কথা বিরুদ্ধ পক্ষ যদি দৈবক্রমে অথবা সতর্ক প্রহরার দরুন ঘুণাক্ষরেও টের পায় তা হলে তাদের সফলকাম হওয়ার কোনোই আশা নেই।

এখন বনঝোপে নিদ্রিত তরুণ সৈনিকটির পরিচয় দেওয়া

থাক। সে হচ্ছে ভার্জিনিয়ার অধিবাসী, নাম তার কার্টার ড্রিউস। সঙ্গতিপন্ন পিতামাতার একমাত্র সন্তান সে। প্রচুর বিত্ত এবং সুরুচি এ দুটির সমন্বয়ে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে যতটুকু শিক্ষা-সংস্কৃতি লাভ এবং আয়েসপূর্ণ, উন্নত ধরণের জীবনযাত্রা সম্ভবপর তারই অধিকারী সে হয়ে উঠেছিল। এখন যেখানে সে শুয়ে আছে সে জায়গা থেকে তার বাড়ী মাইল কয়েকের ব্যবধান মাত্র। বাড়ীতে একদিন সকালবেলা প্রাতরাশের সময় সে শান্তগম্ভীর সুরে তার পিতাকে বললে—"বাবা, গ্রাফটনে এক য়্যুনিয়ন রেজিমেণ্ট এসে উপস্থিত হয়েছে, আমি যাচ্ছি তাতে যোগদান করতে।"

পিতা দৃপ্ত ভঙ্গীতে মস্তক উত্তোলন করে নির্ব্বাকভাবে ক্ষণকাল পুত্রের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, তার পর জবাব দিলেন—"যাও কার্টার, আর মনে রেখো আমার একটি কথা, যাই ঘটুক না কেন, নিজের কর্ত্তব্য বলে যা মনে হবে সর্ব্ব প্রযত্নে তাই পালন করবে। ভার্জিনিয়ার নিকট তুমি বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু তোমাকে ছাড়াও তার চলবে। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমরা উভয়েই যদি বেঁচে থাকি তা হলে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলাপ-আলোচনা করতে পারব। ডাক্তার তো তোমাকে জানিয়েছে যে, তোমার মায়ের অবস্থা সঙ্কট-জনক। মাত্র কয়েক সপ্তাহের বেশী তাকে আর আমরা ধরে রাখতে পারব না। কাজেই এই সময়টি আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান্। এখন এ নিয়ে তাঁকে বিব্রত না করাই সমীচীন।"

অবশেষে এল বিদায়ের মুহূর্ত্ত। কার্টার ড্রিউস পরম শ্রদ্ধাভরে পিতাকে বিদায় অভিবাদন জানালে। পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বাহ্যতঃ শান্তভাব অবলম্বন করে তিনি দৃপ্তভঙ্গীতে সৌজন্যসহকারে তাকে প্রত্যভিবাদন করলেন। তারপর কার্টার তার শৈশবের সুখনীড় পরিত্যাগ করে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

কার্য্যক্ষেত্রে নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ সাহস এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা শীঘ্রই সে সহকর্ম্মী এবং অফিসারদের মন জিতে নিলে। এই সমস্ত গুণ এবং পার্ব্বত্য প্রদেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দরুনই তাকে এই সুদূর পাহাড়িয়া অঞ্চলের বিপৎসঙ্কুল ঘাঁটিতে প্রহরায় নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু একান্ত দৃঢ় সঙ্কল্প সত্ত্বেও কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে তার ত্রুটি হ'ল। গভীর ক্লান্তি তার সঙ্কল্পের দৃঢ়তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শীঘ্রই সে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ল। অবশেষে স্বপ্নে দেখা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলাজনিত তার অপরাধ ক্ষালন করবার সুযোগ করে দিলে শয়তান না দেবদূত, কে বলবে?

অবসন্ন অপরাহ্নের সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে নিঃশব্দ চরণে, নীরবে অদৃষ্টের কোনো অদৃশ্য দূত মোহন অঙ্গুলির স্পর্শ বুলিয়ে তার চৈতন্যের চক্ষুকে উন্মীলিত করলে; তার আত্মার কানে কানে এমন সব রহস্যময় ঘুম ভাঙানিয়া কথা মৃদু গুঞ্জরণে বলতে লাগল যা কখনও কোনো মনুষ্য-কণ্ঠে উচ্চারিত হয় নি, মানুষের স্মৃতিতে যা কোনো কালে গ্রথিত হয়ে থাকে নি। শান্তভাবে বাহু-উপাধান থেকে মস্তকোত্তোলন করে সে বন-ঝোপের অবকাশ-পথ দিয়ে সুমুখের পানে তাকালে, আর সহজ সংস্কার বশতঃই ডান হাতে বন্দুকের বাঁটটি শক্ত করে ধরলে।

সুন্দর দৃশ্য দর্শনে শিল্পীর যে আনন্দময় অনুভূতি হয় প্রথম সেই ধরণের অনুভূতিতে তার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। সে দেখলে আকাশের পটভূমিকায় অত্যুন্নত গিরিশিখর-সংলগ্ন একটি শিলাপট্ট যেন এক বিরাট পাদ-পীঠ রচনা করে রেখেছে আর তারই উপর চিত্ত অভিভূতকারী দৃপ্তভঙ্গীতে সমাসীন এক অশ্বারোহীর প্রস্তরমূর্ত্তি। অশ্বের উপর উপবিষ্ট সোয়ারটির দেহ ঋজুদীর্ঘ এবং সৈনিকোচিত বীরত্বব্যঞ্জক, কিন্তু তার আননে মর্ম্মরপ্রস্তরে খোদিত গ্রীক দেবতাদের মুখের স্নিগ্ধ প্রশান্তি। তার ধূসর পরিচ্ছদের সঙ্গে আকাশের পটভূমিকার বর্ণের অপূর্ব্ব সৌসামঞ্জস্য। অশ্বারোহীর ধাতুনির্ম্মিত রণসজ্জা এবং অশ্বটির ধাতব অঙ্গাবরণে আকাশের ছায়া পড়ে স্নিগ্ধ-মেদুর আভা ধারণ করেছে। একটা বিশেষ ধরণের ক্ষুদ্র বন্দুক ঘোড়ার জিনের উচ্চভাংশের পাশে ঝুলছে। অশ্বারোহীটি ডান হাত দিয়ে বন্দুকের বাঁট ধরে রেখেছে, ধৃত-বল্গা বাম হস্তটি অদৃশ্যপ্রায়। আকাশের পটে ঘোড়ার মুখের আদলকে দেখাচ্ছে যেন পাথর কুঁদে তৈরি অশ্বের আননের পার্শ্ব-দৃশ্যের মত। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে ছিল দুরবগাহ খদের দিকে। অশ্বারোহীর আনন বাঁদিকে ঈষৎ ফেরানো। তার কপালের পার্শ্বদেশ এবং শ্মশ্রুরাজিই কেবলমাত্র নিপুণ তুলিকায় আঁকা রেখা-চিত্রের মত দৃশ্যমান হচ্ছিল। তার দৃষ্টি ছিল নিম্নাভিমুখে, উপত্যকার গভীরতম তলদেশে নিবদ্ধ। আকাশের কোলে অবস্থিত অশ্বারোহীর বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তিটি যেন মনে বিরাটত্বের আভাস এনে দিচ্ছিল।

ক্ষণকালের জন্যে ড্রিউসের মনে এ ধরণের একটা অদ্ভুত অজানা অনুভূতি হ'ল যেন দীর্ঘ নিদ্রাবসানে একেবারে যুদ্ধ-বিরতির পর জেগে ওঠে সে ঐ উত্তুঙ্গ গিরিচূড়ায় স্থাপিত এমন একটি মহান ভাস্কর্য্য-শিল্প-কর্ম্মের নিদর্শনের পানে তাকিয়ে আছে, যা নির্ম্মিত হয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অতীতের বীরত্ব-কাহিনীকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে—আর সে যেন সেই মহিমা-মণ্ডিত অতীতের কলঙ্কস্বরূপ। কিন্তু হঠাৎ মূর্ত্তিটির মধ্যে ঈষৎ অঙ্গ-সঞ্চালনের আভাস পরিলক্ষিত হওয়ায় আচম্কা তার আচ্ছন্ন ভাব টুটে গেল। অশ্বটি তার পাগুলো স্থিরভাবে রেখেই গিরিশৃঙ্গের প্রান্ত থেকে দেহটাকে পশ্চাৎভাগে একটু সরিয়ে নিলে, সওয়ারটি কিন্তু পূর্ব্ববৎ অনড় অবস্থায়ই বসে রইল। ব্যাপারটির নিগূঢ় তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ড্রিউস এবার সম্পূর্ণ-রূপে সচেতন হয়ে উঠল এবং বন-ঝোপের ভেতর দিয়ে বন্দুকটিকে সন্তর্পণে টেনে এনে বাঁটটাকে নিজের গালের কাছে নিয়ে উঁচিয়ে ধরলে, তারপর গিরিশিখরের পানে

তাকিয়ে অশ্বারোহীর বক্ষ তাক করে গুলি ছুঁড়তে উদ্যত হ'ল। সব ঠিকঠাক। এখন শুধু ট্রিগারটি স্পর্শ করলেই কার্টার ড্রিউসের মতলব হাসিল হয়। কিন্তু হঠাৎ সেই মুহূর্তে অশ্বারোহীটি মস্তক ঘুরিয়ে বন-কোণে লুক্কায়িত তার আততায়ীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। ড্রিউসের মনে হ'ল সেই তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত দৃষ্টি তার মুখমণ্ডলের উপর, তার চোখের উপর নিবদ্ধ —যে দৃষ্টি যেন একেবারে তার মর্ম্মমূল পর্য্যন্ত ভেদ করে দেখছে। কার্টার ড্রিউসের ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল।... আততায়ীকে নিপাত করতে গিয়ে এ দোমনা ভাব কেন? বিশেষতঃ যে এমন একটি গোপন তথ্য জেনে নিয়েছে যা তার নিজের এবং তার সৈন্যবাহিনীর নিরাপত্তার প্রবল অন্তরায়। সেই শত্রু কি ভাবলেছে হন্তব্য নয় প্রতিপক্ষের মন্ত্রগুপ্তির রহস্য অবগত হওয়ার দরুন যে একা একটি সৈন্যবাহিনী অপেক্ষাও দুর্দ্ধর্ষ।

কার্টার ড্রিউসের মুখমণ্ডল মৃতের আননের মত বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে গেল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল, তার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাবার উপক্রম হ'ল, তার মনে হ'ল তার সুমুখের প্রস্তর-মূর্ত্তি দুটি যেন কতকগুলো কৃষ্ণবর্ণ শরীরী জীবে রূপান্তরিত হয়ে অগ্নিপূর্ণ আকাশে একবার উঠছে আর একবার পড়ছে—আর অস্থিরভাবে বৃত্তাকারে ঘুরছে। হাতিয়ার থেকে ড্রিউসের হাত আলগা হয়ে গেল, তার মাথা ধীরে ধীরে হেলে পড়তে লাগল। শেষে, যে পর্ণশয্যার উপর সে হেলান দিয়ে বসেছিল তারই উপর ন্যস্ত হ'ল তার মুখমণ্ডল। হৃদয়াবেগের আতিশয্যে এই সাহসী এবং কষ্টসহিষ্ণু সৈনিকটির সম্বিৎ প্রায় লোপ পাবার উপক্রম হ'ল।

কিন্তু তার এ আচ্ছন্নভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। ক্ষণকাল পরেই পর্ণশয্যা থেকে মুখ তোলে সে সোজা হয়ে বসল, তার হাত দুটি বন্দুকের ওপর যথাস্থানে ন্যস্ত হল, তার তর্জ্জনীটি যেন আপনা থেকেই ট্রিগার স্পর্শ করতে উদ্যত হ'ল। তার হৃদয় মন এবং চক্ষু দুটির উপর থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল; তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং বিচারশক্তি সব কিছুই আবার ফিরে এল। সৈনিকটি এবার তার কর্ত্তব্য স্থির করে নিলে—আসন্ন বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুহূর্ত্তমাত্র অবসর না দিয়েই জঙ্গলের আড়াল থেকে অশ্বারোহীটিকে অতর্কিতে গুলি করে মারতে হবে। আর মুহূর্ত্তমাত্র কালহরণও মারাত্মক, এত ক্ষিপ্র হস্তে অব্যর্থ সন্ধানে এই হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করতে হবে যেন তার অন্তিম প্রার্থনা অনুচ্চারিতই থেকে যায়।

কিন্তু না এর উল্টা দিকও তো আছে...লোকটিকে হত্যা না করলে কি চলে না। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ একটু আশার আলো তার মনে ঝিলিক দিয়ে যায়। এমনও তো হতে পারে যে, লোকটি শত্রুপক্ষের গতিবিধি তাদের অবস্থান-স্থল ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন তথ্যই আবিষ্কার করতে পারেনি। এটাও তো অসম্ভব নয় যে, তেমন কোনো মতলবও তার নেই—এই পার্ব্বত্য-প্রদেশের মহিমামণ্ডিত নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের আকর্ষণেই শুধু এখানে এসে সে মুগ্ধ বিস্ময়ে চতুষ্পার্শ্বের রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের পানে তাকিয়ে আছে। যদি তাকে রেহাই দেওয়া যায়, তা হলে হয় তো খানিক বাদে কোনও দিকে দৃকপাত না করে অশ্বারোহণপূর্ব্বক যেখান থেকে সে এসেছিল সেখানেই চলে যাবে। বস্তুতঃ চলে যাওয়ার সময় তার ভাব-ভঙ্গী থেকেই, সে আক্রমণোদ্যত শত্রুপক্ষের অভিসন্ধি জানতে পেরেছে কিনা তা বুঝা যাবে। হঠাৎ, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে জলযান-আরোহী যেমন করে কাচের মত স্বচ্ছ নীলাম্বুরাশির ভিতর দিয়ে তাকায়, তেমনি করে ড্রিউসও মাথা ঘুরিয়ে এনে দৃষ্টিকে একাগ্র করে, বায়ুস্তর ভেদ করে বর্ত্তনিমগ্ন উপত্যকাভূমির পানে তাকালে। নজরে পড়ল, সবুজ শস্যাবৃত প্রান্তরের ওপর অশ্ব ও মানুষের একটি চলন্ত রেখা যেন ক্রমশঃ সুমুখের পানে সম্প্রসারিত হচ্ছে। সে বুঝতে পারলে যে, কোনো অদূরদর্শী সৈন্যাধ্যক্ষ খোলা জায়গায় ঘোড়াগুলোকে স্নান করিয়ে আনবার জন্যে তার অধীনস্থ সৈন্যদের হুকুম দিয়েছে—গিরিচূড় থেকে সে দৃশ্য যে সুস্পষ্টরূপে নজরে পড়তে পারে সে বিষয়ে সে আদৌ সচেতন নয়।

উপত্যকা হতে দৃষ্টি সরিয়ে এনে ড্রিউস আবার বন্দুক বাগিয়ে ধরে আকাশের পটভূমিকায় দৃশ্যমান অশ্ব এবং অশ্বারোহীটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে, এবার কিন্তু অশ্বটি হ'ল তার লক্ষ্যবস্তু। তার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, তার পিতার বিদায়কালীন কথাগুলো যেন প্রত্যাদেশের মত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল: "যাই ঘটুক না কেন, নিজের কর্ত্তব্য বলে যা মনে হবে সর্ব্বপ্রযত্নে তাই পালন করবে।" এই কথাগুলো আবৃত্তি করতে করতে তার মনের ধৈর্য্য ফিরে এল, তার দাঁতগুলো দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হ'ল। তার স্নায়ুমণ্ডলী হ'ল নিদ্রিত শিশুর স্নায়ুর মত স্নিগ্ধ প্রশান্ত—তার দেহ হ'ল স্থির সর্ব্বচাঞ্চল্যমুক্ত, কোনো মাংসপেশীতে ঈষৎ কম্পনও অনুভূত হ'ল না। তার শ্বাসবায়ু ধীরে এবং নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হতে লাগল, অবশেষে লক্ষ্য স্থির করবার সময় তা হয়ে উঠল দীর্ঘায়িত। শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যবুদ্ধিরই জয় হ'ল, আত্মা যেন কানে কানে দেহকে বলে গেল—"শান্ত হও।"—সে গুলি ছুঁড়লে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ফেডারেল ফোর্সের একজন দুঃসাহসী সৈনিক-কর্ম্মচারী এই পাহাড় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করবার উদ্দেশ্যে, উপত্যকায় নিভৃত স্থানে অবস্থিত নৈশ সৈন্যশিবির পরিত্যাগ করে খেয়ালবশতঃ লক্ষ্যহীনভাবে চলতে চলতে গিরিপাদমূলের নিকটবর্ত্তী একটি নাতি-উচ্চ, অল্পপরিসর খোলা জায়গার নিম্নপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছিলেন। পাহাড়ের গহনগভীরে আরো এগিয়ে গেলে কোনও ফায়দা হবে কিনা তাই তিনি ভাবতে লাগলেন। তাঁর সামনে সিকি মাইল দূরে—কিন্তু

বৃত্তত: এক রশ্মিমাত্র ব্যবধানে, পাইনবনের শীর্ষদেশ থেকে বিশাল পাহাড়টি অভ্র ভেদ করে উঠেছে। দুর্নিরীক্ষ্য গিরি-শৃঙ্গের উচ্চতা তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলল, আকাশের গায়ে কুটিল রেখার মত দৃশ্যমান শৈলশিখরপ্রান্তের পানে সে মুগ্ধবিস্ময়ে তাকালে। ডানদিকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত পাহাড়ের একপার্শ্ব যেন নীল আকাশের পটে আঁকা, তার পেছনে কয়েক সারি সুনীল পাহাড়, গিরি-গাত্রস্থ তরুশ্রেণী যেন আকাশের কোলে বৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বনানীমণ্ডিত গিরিশীর্ষের অভ্রংলিহ মহিমা সৈনিক-কর্ম্মচারীটির হৃদয়কে নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিলে। আচমকা নজরে পড়ল তার চমকপ্রদ অভিনব এক দৃশ্য—একজন অশ্বারোহী যেন আকাশপথে অশ্বচালনা করে নীচেকার উপত্যকাভূমিতে অবতরণ করছে।

দৃঢ়পিনদ্ধ জিনের উপর অশ্বারোহীটি সামরিক কায়দায় ঋজুভাবে বসে আছে। গভীর গহ্বরে পতনের হাত থেকে বাহনটিকে রক্ষা করবার জন্তেই যেন সে বজ্রমুষ্টিতে বল্গা ধরে রেখেছে। তার শিরস্ত্রাণহীন অনাবৃত মস্তকের দীর্ঘ কেশরাজি ঊর্দ্ধাভিমুখী হয়ে যেন পালকগুচ্ছের মত আন্দোলিত হচ্ছে, অশ্বের উৎক্ষিপ্ত কেশরজালে ঢাকা পড়েছে তার দক্ষিণ হস্ত—অশ্বটি গতির এমন সমতা রক্ষা করে অবতরণ করছে যে, মনে হচ্ছে যেন তার প্রতিটি পদক্ষেপ নীচেকার মৃত্তিকার উপরে সমতালে গিয়ে প্রতিহত হবে। অশ্বটির গতিভঙ্গী থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে, সে মরিয়া হয়ে প্রচণ্ডভাবে নীচে লাফিয়ে পড়ছে, কিন্তু হঠাৎ সৈনিক-কর্ম্মচারীটির মনে হ'ল যেন সে গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করে সবগুলো পা সুমুখের পানে প্রসারিত করে দিয়েছে অর্থাৎ সে যেন এবার সংযতভাবে ধীরে ধীরে নিম্নাবতরণ করে গিরিগাত্রস্থ কোনো আশ্রয়-স্থলের উপর দেহ-ভার ন্যস্ত করবার প্রয়াস পাচ্ছে, কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে, এ তার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র—বায়ুস্তর ভেদ করে অতলস্পর্শ গহ্বরে পতন তার অনিবার্য্য।

আকাশপথে এই অশ্বারূঢ় মূর্ত্তিটি দেখে সৈনিক-কর্ম্ম-চারীটির অন্তর ভীতিমিশ্র বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ভাবা-বেগের গভীরতায় তিনি একেবারে অভিভূত হয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন—তাঁর পা দুটো যেন অবশ হয়ে এল, অবশেষে তিনি মাটির উপর শুয়ে পড়লেন। ঠিক তন্মুহূর্ত্তেই বনান্তরালে হুড়মুড় করে একটি ভারী জিনিষ পতনের শব্দ তাঁর কানে এসে পৌঁছুলো—সেই শব্দ অপ্রতি-ধ্বনিত হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল, তারপর বনতলে আবার সেই সুগভীর নিস্তব্ধতা।

কর্ম্মচারীটি কম্পিতচরণে উঠে দাঁড়ালেন। নিমেষমধ্যে তাঁর আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল। পা বাড়া দিয়ে ত্বরিতপদে ছুটতে ছুটতে তিনি গিরিপাদমূলস্থ সে স্থান থেকে আধ মাইল দূরবর্ত্তী এক জায়গায় এসে পৌঁছলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, কাছেপিঠে কোথাও ভূপতিত অশ্ব এবং অশ্বারোহীটিকে দেখতে পাবেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল না। আকাশ-পথে উড্ডীয়মান অশ্বারোহীর মূর্ত্তি-দর্শনের মুহূর্ত্তে, এই অভিনব দৃশ্যের বাহ্যিক সহজ সৌন্দর্য্য, এর সুঠাম ভঙ্গী এবং এই দুঃসাহসিক কর্ম্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য তার কল্পনাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তাই এটা তার খেয়ালই হ'ল না যে, এই উড্ডীন অশ্বারোহীর অবতরণ-পথ হচ্ছে বরাবর গিরিপাদমূলাভিমুখে এবং যেখানে তিনি অবস্থান কর-ছিলেন ঠিক সেখানেই তিনি তাঁর লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান লাভ করতে পারতেন।...আন্দাজ আধ ঘণ্টাটাক পরে তিনি ছাউনিতে ফিরে এলেন।

এই কর্ম্মচারীটি ছিলেন এক জন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, সহজে বিশ্বাস-যোগ্য নয়, এমন সত্য যে বলতে নেই তা তিনি ভালো করেই জানতেন। তাই যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার তিনি দেখে এসেছেন সে সম্বন্ধে কাউকে কিছু বললেন না। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, অরণ্য-পর্ব্বতে বিচরণের ফলে তিনি তাদের অভিযানের পক্ষে সহায়ক হতে পারে, এমন কোনো তথ্য অবগত হতে পেরেছেন কিনা তখন তিনি জবাব দিলেন, "হাঁ মহাশয়, দক্ষিণদিক থেকে সরাসরি এ উপত্যকায় অবতরণের কোনো পথ নেই।"

সৈন্যাধ্যক্ষ তার চেয়েও উত্তমরূপে একথা পরিজ্ঞাত ছিলেন, তিনি একটুখানি মুচকি হাসলেন মাত্র।

এদিকে গুলি নিক্ষেপ করে প্রাইভেট কার্টার ড্রিউস আবার তার বন্দুকে গুলি ভরলে, তারপর হাত-ঘড়িটি পুনরায় কব্জিতে বেঁধে নিলে। মিনিট দশেকও অতিক্রান্ত হয় নি এমন সময় সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে জনৈক ফেডারেল সার্জ্জেন্ট তার কাছে এসে হাজির হ'ল। ড্রিউস মুখও ফেরালে না, কিম্বা তার পানে তাকালেও না, স্থির নিশ্চল ভাবে বসে রইল। সে তাকে চিনতে পেরেছে কিনা এটা পর্য্যন্ত তার ভাবভঙ্গীতে পরিস্ফুট হ'ল না।

"তুমি গুলি ছুঁড়েছিলে?" সার্জ্জেন্ট চুপি চুপি ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলে।

"হাঁ"

"কিসের ওপর"

"একটা ঘোড়ার ওপর। সেটা দাঁড়িয়েছিল অনতিদূরবর্ত্তী ঐ পাহাড়ের উপর। কিন্তু এখন তাকে তুমি আর দেখতে পাচ্ছ না, গুলি খেয়ে সে পড়ে গেছে পাহাড়ের নীচেকার ঐ অতল গহ্বরে।"

ড্রিউসের মুখ ছাইয়ের মত সাদা, কিন্তু এ ছাড়া আবেগের আর কোনো চিহ্ন তার আননে পরিলক্ষিত হ'ল না। কথা-গুলো বলেই সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করলে। সার্জ্জেন্ট তার এই ভাবান্তরের হেতু বুঝতে পারলে না,

ব্যাপারটা যেন তার কাছে বড় হেঁয়ালিপূর্ণ বলে মনে হতে লাগল।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সে বললে—"শোনো ড্রিউস ব্যাপারটাকে রহস্যময়, জটিল করে তোলায় কোনো ফায়দা নেই। আমার হুকুম, সব কথা তোমায় খোলসা করে বলতে হবে। ঘোড়ার ওপরে কি কেউ ছিল?"

"হাঁ"

"কে"

"আমার বাবা"

সার্জেন্ট উঠে দাঁড়িয়ে চলতে সুরু করলেন—"হা ঈশ্বর!" এই দুটো কথা মাত্র তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল।*

* Ambrose Bierce-এর "A Horseman in the Sky" গল্প অবলম্বনে।

অপভ্রংশ-সাহিত্যে মুসলমানের দান

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

মুসলমানদের সংস্কৃত সাহিত্যে দান বিষয়ে স্থানান্তরে আলোচনা করেছি। এ দান স্বল্প পরিমাণ হলেও উচ্চাঙ্গের। এটাও সম্পূর্ণ ঠিক যে মুসলমান রাজত্বসময়ে জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ, অকবরীয় কালিদাস, বংশীধর মিশ্র, সর্ব্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্য্য সরস্বতী, লক্ষ্মীধর প্রভৃতি বড় বড় বড় কবি ও আলঙ্কারিক, জগদ্গুরু নারায়ণ ভট্ট প্রমুখ স্মার্ত্ত, জ্যোতিষ রায়, কেশব শর্ম্মা ও নীলকণ্ঠ প্রমুখ জ্যোতির্ব্বিদ, কল্যাণমল্ল প্রমুখ কামশাস্ত্রবিদ্ সর্ব্বশাস্ত্রে পারঙ্গম পণ্ডিতেরা ভারতীয় নবাব বাদশাহদের রাজসভা সমলঙ্কৃত করেছিলেন। অন্য দিকে নসীর মামুদ, ফকীর হাবিব, সৈয়দ মর্ত্তুজা, কাতন, চাঁদ কাজী, আলিরাজা, আকবর শাহা, কবীর, সেখ ভিখন, সেখ জালাল, সেখলাল প্রভৃতি চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানের মুসলমান কবিরা যেমন বঙ্গ-সাহিত্যে অনবদ্য প্রভূত দান করে গেছেন, তেমনি ছুটি খাঁ, পরাগল খাঁ প্রভৃতি শাসকবৃন্দের উৎসাহেও বাংলা-সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। পদ্মাবত-প্রণেতা মালিক মহম্মদ জায়সী, আমির খুসরো প্রভৃতি অতি উচ্চদরের কবিরাও ভারতীয় আধুনিক ভাষাসমূহের প্রভূত ইষ্ট সাধন করে গেছেন। ফলতঃ, সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ভাষা এবং হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষা—ভারতের যে-কোনও ভাষা মুসলমানদের বিশিষ্ট দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল একজন মুসলমান অপভ্রংশ কবির বিষয়ে আলোচনা করব। ইনি হচ্ছেন সন্দেশরাসক-প্রণেতা কবি আব্দুল রহমান।

মেঘদূত কালিদাসের অনবদ্য সৃষ্টি এবং বহুদিক থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। মেঘদূত ভারতীয় সাহিত্যে যে প্রভাব বিস্তার করেছে, সৃষ্টি মানসে পরবর্তী কবিদের হৃদয় যাদৃশভাবে আকৃষ্ট করেছে, কালিদাসের অন্য কোনও গ্রন্থ তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। মেঘদূতের অনুকরণে, বাক্যাবলম্বনে বা ভাবাবলম্বনে ন্যূনাধিক দু-হাজার গ্রন্থ বিরচিত হয়েছে এবং শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বীরা নন, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বীরাই এ দূত-সাহিত্যাবলম্বনে কাব্য, দর্শন ও ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যক্ষ পরমাত্মা, যক্ষিণী জীবাত্মা এবং মেঘ ভক্তি, শ্রদ্ধা, মন প্রভৃতি দূত রূপে পরের যুগে স্থান পরিগ্রহ করেছে। বঙ্গদেশে আমরা মেঘদূতের আদর্শাবলম্বনে যে পবন-দূত, মনোদূত, ভ্রমরদূত, উদ্ধবদূত, হংসদূত, পদাঙ্কদূত প্রভৃতির সৃষ্টি করেছি, সেগুলি বাঙালীদের সংস্কৃত সাহিত্যে স্থায়ী দান—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আব্দুল রহমানের সন্দেশ-রাসকও এ দূত-সাহিত্যের অন্তর্গত—মেঘদূতের বংশপরম্পরা-জাত, তবে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত।

আব্দুল রহমান জাতিতে তাঁতি, কিন্তু সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা ও সাহিত্যে সুনিপুণ। সন্দেশরাসক গ্রন্থের ছয় নম্বর কবিতায় তিনি বলেছেন—

> অবহট্টয়-সক্কয়-পইয়ংমি পেসাইয়ংমি ভাসাএ।
> লক্খণছংদাহরণে সুকইত্তং ভূসিয়ং জেহিং।
> [অপভ্রংশ-সংস্কৃত-প্রাকৃত-পৈশাচিক-ভাষাভিঃ।
> লক্ষণ-ছন্দ আভরণাভ্যাং সুকবিত্বং ভূষিতং যৈঃ।
> তেভ্যঃ নম ইত্যর্থ]

ফলতঃ, সন্দেশরাসক গ্রন্থের সর্ব্বত্র সংস্কৃত-প্রাকৃত বিষয়ক পাণ্ডিত্যের বিস্তর প্রমাণ বিদ্যমান। কবি তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন—এ গ্রন্থ অনুরাগীদের রতি গৃহ, বিরহিণীদের মকর-ধ্বজ, রসিকদের রস-সঞ্জীবনকর, প্রেমনির্ব্বাস ও শ্রুতিসুখ-সুধা-প্রবাহ-স্বরূপ। কবির প্রত্যেকটি কথা অতি ঠিক—স্বকীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি কিছুই অত্যুক্তি করেন নি।

বিজয়নগর থেকে কোনও বিরহিণী তাঁর কার্য্যে-প্রবাসী প্রিয়ের কাছে কোনও পথিকের মুখে তাঁর দুঃসহ অবস্থার বিষয়ে বার্ত্তা প্রেরণ করছেন। এ গ্রন্থে ভারতীয় ষড় ঋতু—গ্রীষ্ম-বর্ষা প্রভৃতি অতি নিখুঁত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে প্রিয় প্রয়াণ করেন, বৎসরান্তেও তিনি ফিরে আসেন নি। ঋতুর পর ঋতু এসে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বা প্রকট ভাষায় কত আবেদন-নিবেদন জানিয়ে গেল, দুঃখের হুতাশন প্রজ্বলিত করে সমস্ত দেহ-মন দগ্ধ করে দিয়ে গেল—নিষ্ঠুর পান্থ কিছুতেই ফিরে এল না। বিরহিণী ২১১ নং কবিতায়

বসন্তোপজনিত দুঃখ বর্ণন প্রসঙ্গে সত্যি বলেছেন—অশোক বৃক্ষ সমস্ত শোকের আধার; অথচ লোকে তাকে বলে অ-শোক; ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে—

অসু নাম অলিকউ কহই লোউ।
ন হু হরই খণদ্ধু অসোউ সোউ।

[যস্য নাম লোকঃ অশোক ইতি কথয়তি, তদলীকম্—যতোঽশোকঃ ক্ষণার্দ্ধমপি মম শোকং ন হরতি]।

কবি গ্রন্থের অন্তে সুমিষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর হৃদয়ের আশা—

সংবাদ-বাহককে প্রেরণ করার পরে দূর থেকে আগমনশীল প্রিয়কে দেখতে পেয়ে প্রিয়া যেমন আনন্দ-তরঙ্গে হাবুডুবু খেতে খেতে পাগলপারা মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন, তাঁর গ্রন্থখানা পাঠ করেও তেমনি যেন পাঠকবর্গ উল্লসিত হয়ে উঠেন। অনাদি অনন্ত পরম পুরুষের জয় হউক।

তং পড়ুংজিবি চলিয় দীহচ্ছি
অই তুরিয় ইৎস তরিয় দিদি দকৃখিণ তিদি
আসন্ন পহাবরিউ দিট্ঠু নাহু তিদি জাস দরসিও, কজ্জি হরসিয়।
জেম অচিন্তিউ কজ্জু তসু সিদ্ধু খণদ্ধি মহংতু,
তেম পঢ়ংত সুণংত য়হ জয়উ অণাই অণং তু। ২২০।

এ গ্রন্থ মূলতানের প্রভূত সমৃদ্ধি সময়ে বিরচিত হয় এবং ইহাও অত্যন্ত সম্ভব যে যখন পর্যন্ত অপভ্রংশ ভাষার সমাদর ছিল, সে সময়ের মধ্যে ঐ গ্রন্থ তৈরি হয়েছিল। সুলতান মাহমুদ ঘোরীর আক্রমণে মূলতান বিধ্বস্ত হয়। সুতরাং তার কিছু পূর্বে এ গ্রন্থের রচনা সম্ভবপর। এ সময়ে অপভ্রংশ ভাষার সমাদর ছিল। সুতরাং মনে হয়—খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে এ গ্রন্থ বিরচিত হয়।

বিরহাঙ্ক ও স্বয়ম্ভু অপভ্রংশ রাসক বা রাসার (সংস্কৃত রাসক) ব্যাখ্যানে বলেছেন যে এ জাতীয় গ্রন্থে বিশিষ্ট কতিপয় অপভ্রংশ ছন্দ অবলম্বনীয় এবং এ প্রকার গ্রন্থ আকারে ক্ষুদ্র হওয়া কর্ত্তব্য। ফলতঃ, আকারের দিক থেকে একে সংস্কৃত খণ্ড কাব্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

দরাফ খাঁ, আবদুল রহমান, মুজাফর শাহ, শায়েস্তা খাঁ, দারাশুকো প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকদের বিষয়ে ভাবতে গেলে আমার স্বতঃই এ কথাই মনে হয়—এঁরা কি কখনও ভেবেছিলেন যে বিধর্ম্মীর ভাষা বলে সংস্কৃত ও প্রাকৃত এঁদের উপেক্ষণীয়; অথবা এর বিরুদ্ধ প্রক্রিয়াই ওঁদের হৃদয়ে স্থান পেয়েছিল? কবীর, দাদূ প্রভৃতিরা যখন ভারতের মধ্য যুগে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে চরম সত্য বিষয়ে সন্ধান দেওয়ার জন্য দীক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন কি তাঁরা হিন্দু-মুসলমান বিষয়ক ভেদবুদ্ধিতে প্ররোচিত হয়েছিলেন? কত অগণিত হিন্দু আরবী, পার্সী গ্রন্থাদি প্রণয়ন করে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছেন। কোন্ বিচারবুদ্ধিবলে আজ হিন্দু মুসলমান ভারতবাসী এ অমূল্য ভারতীয় শিক্ষা ভুলতে বসেছে? জাতীয় অভ্যুন্নতি যদি ভারতীয়দের কাম্য হয়, এ সনাতন শিক্ষা কায়মনোবাক্যে আপনার বলে গ্রহণ করা তাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এতেই জাতির চরম ক্ষেম অন্তর্নিহিত রয়েছে।

প্রবাসী

শ্রীঅচলাপ্রসাদ দাসগুপ্ত

হেথা এই শৈলশিরে দেবদারু বনছায়া-তলে
নিঃসঙ্গ বিলাসলীলা; আদিগন্ত সিন্ধু ঘন নীল
বক্ষ দিয়ে প্রসারিত, ঊর্দ্ধাকাশে নির্ব্বাক মিছিল
রৌপ্য-মেঘ-শিশুদের, গ্রামখানি সানুগ্রামাঞ্চলে
রৌদ্রকরে ঘুম যায়—বহুদূরে কোন্ শস্য-ক্ষেতে
ধূসর মেষেরা চরে। তন্দ্রালস উত্তপ্ত বাতাসে,
প্রান্তর পারায়ে কোন্ রাখালের বংশীধ্বনি আসে—
পরিপূর্ণ মধ্যদিবা দিবাস্বপ্নে উঠিয়াছে মেতে।

হোথায় উটজ ঘিরে গুচ্ছে গুচ্ছে পার্ব্বত্য কুসুম
গালিচার মত পাতা। পশ্চাতের ফলের বাগানে
পুষ্পিত কমলাবীথি—একটি গবাক্ষে কোনোখানে
রক্তাভ আঙুর দোলে। কার পুষ্ট কপোলে কুঙ্কুম,
ঘনশ্যাম অরণ্যানী মর্ম্মরিত কার তাম্র-কেশে,
চক্ষের সমুদ্রনীলে উঠিয়াছে বাজ সর্ব্বনেশে।

দুর্গোৎসবের পুরাণের দেশ ও কাল

(সপ্তম প্রকরণ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

দুর্গোৎসবের প্রমাণ কি? কে দুর্গাপূজা করিতে বলিয়াছেন? যিনি বলিয়াছেন, তিনি প্রমাণ। যে পদ্ধতিতে দুর্গোৎসব হইতেছে, কে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন? যিনি করিয়াছেন, তিনি প্রমাণ (authority)। একজনে করেন নাই, বহুজনে করিয়াছেন, বহুজন প্রমাণ। যে পুরাণে লিখিত আছে, সে পুরাণ প্রমাণ। কোন্ পুরাণ মান্য, কোন্ পুরাণ নয়, তাহা স্মৃতির ব্যবস্থাপকের বিচার্য। প্রসিদ্ধি এই, বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ, তিনি পুরাণের বীজ দিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য-পরম্পরা অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিতে পারে না। উপপুরাণ ব্যাস-সম্প্রদায়ের বহির্ভূত অন্যের রচিত।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কতকগুলি পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, নন্দিকেশ্বর পুরাণ প্রধান। যে পুরাণই হউক, তাহার রচনার দেশ ও কাল না জানিলে দুর্গোৎসবের ইতিহাস সঙ্কলনের সাহায্য হয় না।

আমি এইখানে কয়েকটি পুরাণের রচনার দেশ ও কাল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। বলা বাহুল্য, এই কর্ম অতিশয় কঠিন। যদি বা পুরাণ-রচনার দেশ অনুমান করিতে পারা যায়, পুরাণ-রচনার কাল অনুমান দুঃসাধ্য। কারণ পুরাণ পুরাবৃত্ত, ইহাতে স্বসময়ের বৃত্তান্ত থাকে না, পূর্বকালের বৃত্তান্ত থাকে। আর এক বিঘ্ন আছে। জনপ্রিয় গ্রন্থে নূতন নূতন বিষয় যোজিত হয়। শ্লোক, অধ্যায়, সন্দর্ভ-যোগ হেতু পুরাতনের সহিত নূতন মিশ্রিত হইয়া যায়।

পুরাণকর্তাকে কবি বলা যাউক। তিনি পুরাবৃত্ত রচনা করিলেও কদাপি স্বদেশ ভুলিতে পারেন না। দেখিতে হইবে, কবি কোন্ দেব বা দেবীর, কোন্ তীর্থের মাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন, কোন্ কোন্ বৃক্ষ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে। সকল বৃক্ষ সকল দেশে জন্মে না। কিন্তু দেখিতে হইবে, যে যে বৃক্ষের উল্লেখ আছে, সে সে বৃক্ষ পুরাণের দেশের না কবির স্মৃতি। পুরাণ পুরাবৃত্ত বটে, কিন্তু কবি স্বসময়ের ও স্বদেশের আচার-ব্যবহার বর্জন করিতে পারেন না।

কাল-অনুমানের নিমিত্ত এরূপ সাহায্য অত্যল্প পাওয়া যায়। অমুক দেশে অমুক শতাব্দে এই আচার ছিল, কিম্বা পূর্বে ছিল না, পরেও ছিল না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। এই পুরাণ অমুকাল অমুক গ্রন্থের কিম্বা পুরুষের পূর্বে কিংবা পরে, এই সঙ্কেত ধরিতে হয়। বহু পুরাণ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে তাহার কাল-অনুমানের প্রজ্ঞা জন্মে। ভারতবর্ষ বিস্তীর্ণ না হইলে পুরাণসকল কালানুসারে সাজাইতে পারা যাইত। মরাঠী ভাষায় শ্রী ত্র্যম্বক-গুরুনাথ কালে "পুরাণ নিরীক্ষণ" লিখিয়াছেন। তিনি প্রায় অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও কয়েকখানি উপপুরাণের রচনার কাল অনুমান করিয়াছেন। আমি অতি অল্প পুরাণ দেখিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহাতে কালে মহাশয়ের মত গ্রাহ্য মনে হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণ ও নন্দিকেশ্বর পুরাণ দেখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পাইলাম না। দেবী ভাগবত বহু জনের আদৃত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ রঘুনন্দনের পূর্বে রাঢ়ে প্রণীত। এই দুই পুরাণেরও দেশ ও কাল চিন্তা করা যাইবে।

১। মৎস্যপুরাণ

মৎস্যপুরাণ মহাপুরাণ। মহাভারতে (বনপর্বে) বায়ু ও মৎস্যপুরাণের নাম আছে। মহাভারতের বর্তমান আকার খ্রি-পূ দ্বিতীয় শতাব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার পরে কোথাও কিছু প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা নগণ্য। অতএব মৎস্যপুরাণ প্রাচীন বলিতে হইবে। কিন্তু মৎস্যপুরাণের বর্তমান আকার কোনও এক সময়ে আসে নাই। ইহাতে বহুবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কোন্ বিষয় কবে যোজিত হইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই।

মৎস্যপুরাণ মহাভারত হইতে অনেক উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতোক্ত উপাখ্যানে নূতন রূপ প্রদত্ত হইয়াছে। দুই-একটা উদাহরণ দিতেছি। মহাভারতে তারকাসুর-বধের নিমিত্ত কার্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ আছে, মৎস্যপুরাণে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। চৈত্র মাসের অমাবস্যায় পার্বতীর কুক্ষি ভেদ করিয়া কুমার ষড়ানন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাভারতের মতে কার্তিক অমাবস্যায় শরবনে কুমারের জন্ম হইয়াছিল। মৎস্যপুরাণে কার্তিকেয় পার্বতীর পুত্র। মহাভারতে পার্বতী উমার নামও নাই। মৎস্যপুরাণ কুমারসম্ভব নামে কাব্য রচনা করিয়াছেন। কালিদাস তাহা অনুসরণ করিয়াছেন।

মৎস্যরূপী ভগবান্ মৎস্যপুরাণের বক্তা, বৈবস্বত মনু শ্রোতা। অতএব মৎস্যপুরাণ বৈষ্ণব পুরাণ হইবার কথা। কিন্তু বাস্তবিক ইহা শৈব পুরাণ। ইহাতে বিষ্ণুর পাঁচ দিব্য অবতার বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিষ্ণুর প্রাধান্য ও আরাধনা নাই। প্রতিমা-লক্ষণে উমা-মহেশ্বরের প্রতিমা

বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বিষ্ণুর হয় নাই। শুক্ল সপ্তমীতে বহুবিধ ব্রত করিতে বলা হইয়াছে। এই সকল ব্রতে দিবাকরের আরাধনা গ্রথিত হইয়াছে। এই সকল ব্রত ও বহুবিধ দানের আড়ম্বর দেখিলে মনে হয়, কোন স্থানের পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজমানের অর্থ দোহন করিতে মৎস্যপুরাণে এই সকল বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এইরূপ পুরাণের দেশ ও কাল অনুমান দুঃসাধ্য।

তথাপি মনে হয় মৎস্যপুরাণ দক্ষিণ-ভারতে প্রণীত হইয়াছিল। মৎস্যপুরাণে লিখিত শ্রাদ্ধকল্প প্রাচীন। লিখিত আছে, শ্রাদ্ধে দ্রবিড় ও কোকন ব্রাহ্মণ বর্জন করিবে (১৬)। কোকন কোঙ্কন, বোম্বাই নগর হইতে দক্ষিণে গোয়া পর্যন্ত পশ্চিম সাগরের উপকূল ভাগ। ইহার দক্ষিণে কেরল দেশ; বর্তমান নাম মালাবার। কেরল দেশের পশ্চিমে দ্রাবিড়। শ্রাদ্ধে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ও কোঙ্কন ব্রাহ্মণ বর্জনীয় হইয়াছে। অতএব মনে হয় মৎস্যপুরাণ কেরল দেশে প্রণীত হইয়াছিল। কোচিন রাজ্যে নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের বাস আছে। শুনিয়াছি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিম্বদন্তী এই, তাঁহাদের পূর্বপুরুষ বহুকাল পূর্বে উত্তর-ভারত হইতে সে দেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহে ও বর্ণে এখনও বৈদিকত্ব প্রমাণিত হইতেছে। শৈব ও শাক্তের বিরোধ নাই। তথাপি দ্রাবিড় দেশ শৈব দেশ, মহীশূর হইতে পশ্চিম-সমুদ্র ও কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত শাক্ত দেশ বলা যাইতে পারে। কেরলে গ্রামে গ্রামে কালীপূজা হইতেছে। নূতন হইতে পারে না। দ্রাবিড় পণ্ডিতেরা মনে করেন তাঁহাদের দেশ শিবপূজার আদিস্থান।

মৎস্যপুরাণে দুই তিন স্থানে আছে, উমা বিশ্বের অরণি (জনকজননী)। তিনি নীলোৎপলবর্ণা ছিলেন। তপস্যা করিয়া তিনি গৌরীত্ব লাভ করেন। কালিকাপুরাণ এই উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ ত্বক্ হইতে কৌশিকী মূর্তি আবির্ভূত হইয়াছিল। কৌশিকী কালীমূর্তি। লিখিত আছে, এই কৌশিকী মূর্তি বিন্ধ্যাচলে প্রসিদ্ধ। বোধ হয় এই কৌশিকী দেবী বিন্ধ্যাচলে বহু পুরাতন এবং ইনিই বিন্ধ্যবাসিনী। (বিন্ধ্যাচল ই. আই. রেল ষ্টেশন। সেখানে এক পাহাড়ের গুহায় দেবীমূর্তি আছে। বস্ত্রাবৃত থাকে, কেহ দেখিতে পায় না। সম্ভবতঃ অষ্টভুজা ভদ্রকালী, যিনি যশোদার কন্যা হইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বিন্ধ্যাচল-বাসিনী লিখিয়াছেন (৯১।৩৮)। মৎস্যপুরাণে দেউলের গোপুর (বহির্দ্বার) আছে। গোপুর দক্ষিণ-ভারতে প্রসিদ্ধ। একস্থানে দেউলে দেবদাসীর উল্লেখ আছে, ইহাও দক্ষিণ-ভারতের। এক স্থানে অন্যান্য ফলের সহিত তাল, নারিকেল, ও শমীর উল্লেখ আছে। তাল নারিকেল পূর্ব দিকেও আছে, কিন্তু বোধ হয় পূর্ব দিকে শমী নাই, শমী পশ্চিম দিকে আছে। এই সব কারণে মনে হয় মৎস্যপুরাণ কেরল দেশে রচিত হইয়াছিল। এই দেশ উত্তর-ভারত হইতে বহু দূরে অবস্থিত। উত্তর-ভারতের প্রচলিত উপাখ্যান, বহুদূরস্থিত দক্ষিণ-ভারতে ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। কালান্তরও বিস্তর হইয়া থাকিবে।

মৎস্যপুরাণে নানা ঋষিবংশ ও রাজবংশ বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল বংশের বর্ণনাদ্বারা মৎস্যপুরাণের প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হইতেছে। নারদপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণের সূচী আছে। আমি নারদপুরাণ দেখি নাই। শ্রীযুত কালে মনে করেন, বর্তমান নারদপুরাণের পুরাণ-সূচী ষষ্ঠ খ্রিষ্ট শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। তাহাতে বর্তমান মৎস্যপুরাণের কয়েকটি বিষয় ও ভবিষ্যৎ রাজবংশের বর্ণনা আছে। অতএব মৎস্যপুরাণ পঞ্চম খ্রিষ্ট শতাব্দে বর্তমান আকারে বিদ্যমান ছিল। মৎস্যপুরাণে প্রতিমা-লক্ষণ বর্ণিত আছে। প্রতিমা-লক্ষণ অধ্যায় চতুর্থ খ্রিষ্ট শতাব্দের মনে হইতেছে।

২। মার্কণ্ডেয়পুরাণ

আমরা যে মার্কণ্ডেয়পুরাণ পাইয়াছি তাহা খণ্ডিত। নারদপুরাণসূচী অনুসারে মার্কণ্ডেয়পুরাণে নয় সহস্র শ্লোক ছিল। বর্তমান বঙ্গবাসী-প্রকাশিত পুরাণে ৬৩০০ শ্লোক আছে। অবশিষ্ট ২৭০০ শ্লোকের অভাব পড়িতেছে। সে সব শ্লোকে কি ছিল তাহা নারদসূচী হইতে জানিতে পারা যায়। বর্তমান পুরাণের নরিষ্যন্ত চরিতের পর রামচন্দ্রের কথা, কুশবংশ, সোমবংশ, পুরুরবা, নহুষ, যযাতি, যদুবংশ, শ্রীকৃষ্ণবালচরিত, মাথুরচরিত, দ্বারকাচরিত, সর্বাবতার কথা ছিল। মনে হয় যেন কেহ ইচ্ছা করিয়া পুরাণের বৈষ্ণব অংশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তথাপি চতুর্থ অধ্যায়ে কবির বিষ্ণুপ্রীতি ও বাসুদেব-ভক্তি প্রকটিত আছে, কৃষ্ণের মাথুর মূর্তির উল্লেখও আছে। ইহা বৈষ্ণবপুরাণ কি শাক্তপুরাণ তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সূর্যেরও এত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, পুরাণ সৌর কিনা তাহাও তর্কের বিষয় হইতে পারে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে অনেক উপাখ্যান আছে। সে সব উপাখ্যান অন্য পুরাণে পাওয়া যায় না। উপাখ্যান মনোহর ও হিতোপদেশপূর্ণ। চতুর্দশ মনুর উৎপত্তি,—বিশেষতঃ অষ্টম মনু সাবর্ণি মনুর উৎপত্তি অন্য পুরাণে নাই। সাবর্ণি মনু সম্পর্কে চণ্ডীমাহাত্ম্য আসিয়াছে। নারদসূচীতে উল্লেখ আছে। বোধ হয় মার্কণ্ডেয়পুরাণ মৎস্যপুরাণ হইতে শুম্ভ-নিশুম্ভ, মধুকৈটভ ও মহিষাসুর লইয়াছেন। মহাভারত হইতে, বৃক্ষ পর্যন্ত লইয়াছেন। বলরাম রৈবতক বনে

নানাবৃক্ষ দেখিলেন (৬.১২-১৭)। যথা, আম্র, আম্রাতক; (আমড়া), ভব্য (চালতা), নারিকেল, তিন্দুক (গাব)। "আবিশ্বকান্ তথাজীরান্ দাড়িমান্ বীজপূরকান্।" ইত্যাদি মহাভারত বনপর্ব (যক্ষযুদ্ধপর্ব) হইতে গৃহীত।*

মার্কণ্ডেয় পুরাণ-রচনার দেশ-নির্ণয় সহজ। ইহা বিন্ধ্য পর্বতে নর্মদা নদীর নিকটে (৪২।২)। সে দেশ অতিশয় গ্রীষ্ম। সে দেশে করম্ভ-বালুকা (বালুকার সহিত অল্প কর্দম মিশ্রিত করিয়া নির্মিত) কুম্ভমধ্যস্থ শীতল সমীরণ সুখ-সেব্য হইত (১৩৫)। (বোধ হয় বালিয়া মাটির কলসীতে জল রাখিয়া তাহার উপরিস্থ বায়ু বায়ুপ্রেরক যন্ত্রদ্বারা ধনাঢ্য ও সুখী ব্যক্তির দেহে প্রেরিত হইত। আমি কটকে এক মোহন্তের দুই হাত ব্যাসের তাম্র-নির্মিত বায়ু-প্রেরক দেখিয়াছি। বোধ হয় ভিতরে পাখা আছে, বাহিরে একজন ঘুরায়।) তালবৃন্ত, অনিলস্থান, চন্দন, উশীর (বেনামূল, খস্‌খস্) অপহরণ করিলে নরকভোগ হইত (১৪।১৮)। ঘটিযন্ত্র দ্বারা কূপ হইতে জল উত্তোলিত হইত (১১।১৬)। ধান্য, যব, গোধূম, মুদ্গ ও তিল প্রভৃতির সহিত অতসীর চাষ হইত (১৫।১৮)। সে দেশে ক্ষৌম, দুকূল, কার্পাস, বিশেষতঃ কৌশেয় ও পত্রোর্ণ পাওয়া যাইত।

এই কয়েক লক্ষণ যথেষ্ট। 'মধ্যপ্রদেশ' এই নামে দেশ বুঝিতে পারা যায় না। নাগপুর প্রদেশ বলিব। এই প্রদেশের অনেক বিশেষত্ব আছে। বঙ্গদেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সর্বত্র একপ্রকার আচার-ব্যবহার, একপ্রকার সংস্কৃতি, একপ্রকার ভাষা। নাগপুর প্রদেশে এই তিন বিষয়ে ঐক্য নাই। সে প্রদেশে হিন্দী ও মরাঠী, দুই ভাষা। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত নামের কোন অর্থ নাই। ব্রাহ্মণ ও কুর্মী নিরামিষাশী, অন্য সকলে আমিষাশী। পূজা বলিতে এক গণেশ-পূজা আছে, অন্য পূজা নাই, পরব আছে। নবরাত্রে পূজা নাই, ইহা এক পরব। নবরাত্র কৃষকদের পরব। তাহারা নবরাত্রের পরের দিন গোধূম বপন করে। শারদীয়া পূজার সময় পনর দিন "রামলীলা" নামক যাত্রাগান হয়। অথচ কয়েক বৎসর হইতে কোথাও কোথাও কালীপূজা হইতেছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এক বিজ্ঞ বহুতীর্থদর্শী আমায় বলিয়াছেন, তিনি গত দুর্গা-পূজার মহাষ্টমীতে জব্বলপুর নগর হইতে টোঙ্গায় আরোহী হইয়া তের মাইল দূরে শ্বেত পাহাড় দেখিতে যাইতে-ছিলেন। পাঁচ মাইলের পর গ্রামপথে চারি-পাঁচখানি মৃন্ময়ী সিংহবাহিনী দশভুজার পূজা দেখিয়াছিলেন। বোধ হইতেছে এককালে কোথাও কোথাও শক্তিপূজা ও তান্ত্রিক পূজা ছিল। জব্বলপুরে যোড়শ যোগিনীর মন্দির আছে। কোন কোন দেশীয় রাজ্যে ভৈরবীর পূজা হয়। জব্বলপুর নগর হইতে নর্মদা ছয় মাইল দক্ষিণে। এইখানে পুরাণের উৎপত্তি হইয়াছিল।

জব্বলপুরের দিকে গোধূমের চাষ হয়, কূপ হইতে ক্ষেত্রে জলসেচন হয়। কেহ কেহ ঘটিযন্ত্রদ্বারা জল তোলে। অন্য উপায়ও আছে। কবি কামরূপ গিয়াছিলেন। সেখানে "সিদ্ধক্ষেত্রে" ভাস্করের মন্দির দেখিয়াছিলেন (১০৯।৩৯)। বিজয়নগর দেখিয়াছিলেন (৬৬.৮)। 'ময়নামতীর গানের' ও 'গোরক্ষবিজয়ে'র বিজয়নগর। কদলীরাজ্য আসামে। তিনি সিদ্ধক্ষেত্রে কেন গিয়াছিলেন? তান্ত্রিক মন্ত্র শিখিতে? তিনি উচ্চাটন মন্ত্র (৭০।২২) আভিচারিক ক্রিয়া (১১৭) ও তান্ত্রিক যোগের (৩৯) উল্লেখ করিয়াছেন।

নাগপুরে প্রখর গ্রীষ্ম। ভারতের আর কোথাও তত গ্রীষ্ম হয় না। বিশেষতঃ জলের অভাবে লোকের আরও কষ্ট হয়। নদীকূলে বালিয়া মাটিতে অল্প তালগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। তালবৃন্ত অল্প আসে। বাঁশের সরু চাঁচের পাখা অধিক প্রচলিত। সুখী ও ধনী লোকে খস্‌খসের পর্দা জলসিক্ত করিয়া গৃহের দ্বারে ঝুলাইয়া দেয়। বোধ হয় পুরাণের কালেও এই উপায় করিত। পুরাণে নাগকুলের অনেক বর্ণনা আছে। নাগেরা মানুষ, সর্প নহে। সেই নাম হইতে নাগপুর নাম হইয়াছে। পুরাণের কালে অতসীর চাষ হইত, অংশু দ্বারা ক্ষৌম ও দুকূল নির্মিত হইত। এই দুই বস্ত্র চারি শত বৎসর অজ্ঞাত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে নাগপুর প্রদেশে ক্ষুমার নিমিত্ত অতসীর চাষ আরম্ভ হইয়াছে। নাগপুর প্রদেশে কৌশেয় (তসর) উৎপন্ন হয়, কিন্তু পত্রোর্ণ (সাদা তসর) হয় কিনা, সন্দেহ। গঙ্গা ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যভাগে, বিশেষতঃ ছোট-নাগপুরে—যেমন চাইবাসায়, তসরের উৎপত্তি।*

* মহাভারতে এই সকল বৃক্ষ গন্ধমাদন পর্বতে ছিল, মার্কণ্ডেয়পুরাণের কবি রৈবতক বনে আনিয়াছেন। গন্ধমাদন পর্বত, বর্তমান নাম করকোরম। এই সকল বৃক্ষ সেখানে অসম্ভব। মহাভারতের পাঠে 'তথা জীরান্' স্থানে অক্ষীরান্ আছে, বিদ্বৎসমাজে তর্ক উঠিয়াছে। অক্ষীর নাম কার্সা, অর্থ সিরিয়া দেশের মধুর বড় ডুমুর। মহাভারতে ঐ নাম থাকা অতীব বিস্ময়কর।—মার্কণ্ডেয়পুরাণের পাঠ জীর.। এই জীর. বড় ফল-তরু; জীরক (জীরা) নামক শাক নহে। জীর. কেমন তরু তাহা অজ্ঞাত।

* নাগপুর প্রদেশের রাইপুরের কার্যাধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়র রায় সাহেব শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে নাগপুর প্রদেশের অনেক বিবরণ পাইয়াছি। এইরূপ শ্রীহট্টের কার্যাধ্যক্ষ ইঞ্জি-নিয়র শ্রীরাজমোহন নাথ তত্ত্বভূষণের নিকট হইতে কামরূপের অনেক বিবরণ পাইয়াছি। ইঞ্জিনিয়রকে নানা স্থান ঘুরিতে হয়, চোখ কান খুলিয়া রাখিতে হয়। এখানকার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ইঞ্জিনিয়র রায়সাহেব শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পুরাণে অগ্নিশুচি বস্ত্রের উল্লেখ আছে (৮৫।৫২), যে বস্ত্র অগ্নিদ্বারা শুদ্ধ হয়। সে কি বস্ত্র যাহা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় না? অগ্নির অস্পৃশ্য বস্ত্র একটি আছে। ইংরেজী নাম Asbestos. মিশর দেশের পুরোহিতেরা এই বস্ত্র পরিধান করিতেন। বোধ হয় সেই দেশ হইতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেশে আসিয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অগ্নির অস্পৃশ্য বস্ত্রের উল্লেখ বহু স্থানে আছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকালে রাজা বিক্রমাদিত্যের তালবেতাল নামক নিশাচর প্রসিদ্ধ হইয়াছিল (৭১)। ফলজ্যোতিষ (৭২), মেষাদি রাশি (৫৮) ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বালকৃষ্ণচরিত ইত্যাদি চিন্তা করিলে পঞ্চম খ্রিষ্ট শতাব্দ মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকাল মনে হয়।

৩। দেবীপুরাণ

দেবীপুরাণ উপপুরাণ। ইহাতে দেবীর পূজাবিধি ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, অন্য কথা প্রায় নাই। পুরাণের প্রথম কয়েক পাতা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, এক রাজগুরু রাজাকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত এই পুরাণ লিখিয়াছিলেন। তিনি গুরুপূজাবিধিও দিয়াছেন। বস্তুতঃ কোন রাজার পোষকতায় উপপুরাণের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। তিনি নানাছন্দে শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তান্ত্রিক মন্ত্র ও কবচ প্রকাশ করিয়াছেন।

রঘুনন্দন স্মার্তাচার্য্য দেবীপুরাণ হইতে অনেক গুরুতর প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। যেমন "ইষে মাস্যসিতে পক্ষে" ইত্যাদি ইষ মাসে আশ্বিন মাসে কৃষ্ণনবমীতে বিল্বশাখায় দেবীর বোধন। বর্তমান বঙ্গবাসী প্রকাশিত দেবীপুরাণে সে সব শ্লোক নাই। এক স্থানে (৮৯) আছে আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্ল নবমী পর্যন্ত সর্বমঙ্গলার পূজা করিবে। এখানে বোধন কিম্বা পত্রী-প্রবেশের উল্লেখ নাই। আশ্বিন শুক্লঅষ্টমী ও নবমীতে দেবীপূজা (২১), আশ্বিন শুক্লপ্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত পূজা (২২) বিহিত হইয়াছে। ইহার সহিত পুরাতন বিধির বিরোধ হইতেছে।

পুরাণের দেশ নর্মদা ও বিন্ধ্যপর্বতের নিকটবর্তী। সেখানে অনেক ব্রাহ্মণ শৈব ছিলেন (১০০)। নিকটে জৈনেরা থাকিত। কবি তাহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়াছেন (১৩।১০)। উষ্ট্র এক যান ছিল। ঘটিযন্ত্র দ্বারা কূপ হইতে জল উত্তোলিত হইত (৩৩।৭)। শমী কাষ্ঠের অরণি হইত। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে বর্বর, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির বাস ছিল। তাহারা বামাচারে দেবী পূজা করিত। তাহাদের দেহ কৃষ্ণ বর্ণ, তাহারা গুঞ্জাবীজের আভরণ পরিধান করিত। দ্রোণ, বিশ্ব, আম্র,* জাতি, নাগ ও চম্পকপুষ্পে পূজার বিধি ছিল। সে দেশে নাগরাক্ষর প্রচলিত ছিল না (৯১ ৫৩)। এই সকল লক্ষণ হইতে মনে হয় এই দেশ বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে, রাজপুতনার দক্ষিণে অবস্থিত। বোধ হয় উজ্জয়িনী এই পুরাণের দেশ (৩২)।

এই পুরাণ রচনার কাল অনুমানের কয়েকটি ক্ষীণসূত্র পাওয়া যায়, এই পুরাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণের পরবর্তী। কারণ, ইহাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত 'সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে' ইত্যাদি নামের নিরুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে (৩৭)। আরও লিখিত আছে, দেবী মহিষের বধার্থে দেবগণের তেজে পরিবৃত হইয়া জ্বালামালা সদৃশী (১৪২)। তিনি মহাদেবের তেজোময় শরীর হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনি স্বীয় তেজে জলন্তী। কালরাত্রি মহামায়া দীপ্তকাঞ্চন-সপ্রভাতা (১২৭)। এই পুরাণে চন্দ্র সূর্য গ্রহণের কারণ বিচারে বরাহমিহিরের অনুকরণ আছে। পুরাণের নানা-স্থানে নক্ষত্র তিথি করণের নাম আছে কিন্তু যোগের উল্লেখ নাই। (অষ্টম খ্রিষ্টশতাব্দে যোগ গণনা আসিয়াছে।) পুরাণকালে হূণ জাতি ভারতে আসিয়াছিল। একাদশ অবতারের নাম, যথা—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি (৬), অর্থাৎ তৎকালে দশ অবতার গণনা বিধিবদ্ধ হয় নাই। বোধ হয় দেবীপুরাণ সপ্তম খ্রিষ্টশতাব্দে রচিত হইয়াছিল।

এই পুরাণ মতে দেবী উগ্রসেন পুত্র কংসসেনকে নিহত করিয়াছিলেন (১০২)। গজাননের উৎপত্তি নূতন। বিষ্ণু স্বীয় পাণিতল মন্থন করিয়া গজাননের সৃষ্টি করিয়াছিলেন (১১২)। গণেশ মূর্তির বাম হস্তে পরশু ও মোদক, দক্ষিণ হস্তে অক্ষসূত্র ও অভয়দান অথবা দণ্ড ও মৎস্য (৫০,৩৯)। মূর্তির দক্ষিণ ভাগে রতি নাম্নী সুরূপা যুবতী মূর্তি। মহালক্ষ্মী কপাল-ধারিণী, নৃত্যমানা, হস্তে মুণ্ড ও খট্টাঙ্গ (৫০;৫২)। দেবীর রথযাত্রা ও দোলযাত্রা (২১) কোন পুরাণে নাই। একটা উৎসব করিতে হইবে, এই ভাবিয়া রথযাত্রা (৩১) আসিয়াছিল। এইরূপ নানাবিধ বিচিত্র কথা আছে।

কবি মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও মহাভারত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কবি মন্ত্রতন্ত্রের বহু প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু গারুড়ীর নিন্দা করিয়াছেন। (গারুড়ী মন্ত্র দ্বারা সর্পবিষ নষ্ট হয়)। কবি লিখিয়াছেন, পুলিন্দ, শবরাদি

কৈলাস দর্শনে গিয়াছিলেন। হিমাবৃত মানস সরোবরে স্নান ও রজতোজ্জ্বল কৈলাস গিরি পরিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে না শুনিলে বুরুবাদ্ পর্বতের সে পারে রুদ্রের আলয় আমার মানস নেত্রে স্পষ্ট হইত না।

---

*শরৎকালে আমের মুকুল কোথায় দেখা যায়? রঘুনন্দন-ধৃত ভবিষ্যপুরাণে দেবীকে আম্রফল দিতে বলা হইয়াছে। ইহা কি যো-কলা আম?

জাতি অষ্টবিদ্যা দেবীর বামাচারে পূজা করে। হূণদেশে, বরেন্দ্রে, রাঢ়দেশে ভোট্টদেশে, কামাখ্যায়, উজ্জয়িনীতে, ইত্যাদি স্থানে অষ্টবিত্যাদেবীর অধিষ্ঠান আছে (৬৯,১৪৩-১৪৫)। "গুরু ভিন্ন আর কেহ সংসার হইতে নিস্তার করিতে পারে না।" এই পুরাণে সেই গুরু বহু ধন রত্ন ব্যয়ে বিবিধ রূপধারিণী দেবীর পূজা প্রচার করিয়াছেন। পুরাণে নবরাত্রের উল্লেখ নাই। প্রতিমায়, পটে কিম্বা শূল খড়্গ বা পাদুকায় পূজা বিহিত হইয়াছে। বোধ হয় পুরাণের কালে ও দেশে নবরাত্র ব্রত প্রবর্তিত ছিল না। আশ্বিন কৃষ্ণনবমী হইতে শুক্লনবমী পর্যন্ত পূজায় নবরাত্র আসিতে পারিত না। কবি কতগুলি পীঠ স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ওড্রদেশ (ওড়িষ্যা), স্ত্রীরাজ্য (কেরল), কামরূপ, উড্ডিয়ান (আসাম) ও বরেন্দ্র নাম আছে (৪২।৮,৯)।

৪। কালিকাপুরাণ

কালিকাপুরাণ এক উপপুরাণ। পুরাণ হইতে উপপুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাণ মতে উপপুরাণ ব্যাস-প্রোক্ত নহে। ঋষির নাম না করিলে উপপুরাণ আদরণীয় হয় না। এই কারণে উপপুরাণের বক্তারূপে কোন দেব বা ঋষির নাম করা হইয়া থাকে। এইরূপে মার্কণ্ডেয় মুনি কালিকারপুরাণের বক্তা হইয়াছেন। রাজার আশ্রয় ব্যতীত উপপুরাণ লিখিত সদাচার, নীতিশাস্ত্র, পূজাবিধি প্রভৃতির বর্ণনার সার্থকতা থাকে না। কালিকাপুরাণ কামরূপে কোন রাজার অভিমতে রচিত হইয়াছিল।

কালিকাপুরাণ পাঠ করিলে মনে হয় ইহার কবি গ্রহ-বিপ্র ছিলেন। গ্রহবিপ্রেরা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। বঙ্গদেশে আচার্য নামে খ্যাত। কবি জ্যোতিষ চর্চা করিতেন। দৈবযুগ ও মানুষ যুগ, যুগ গণনার দুই ক্রম আছে। দুই যুগের পরিমাণে বহু অন্তর। কালিকাপুরাণে যেখানে কোন ঘটনার উল্লেখ আছে, সেখানেই কবি মানুষ যুগের উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষযুগ মানুষের ব্যবহার-যোগ্য। কবি সেই যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, দৈবযুগের করেন নাই। কবে দক্ষের কতগুলি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? কবি লিখিয়াছেন, মানুষ ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে (২২।১৩)। কবে পার্বতীর জন্ম হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, বসন্ত কালে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমী তিথিতে অর্ধরাত্রে পার্বতীর জন্ম হইয়াছিল (৪১)। অর্থাৎ সৌর চৈত্রমাস প্রবেশের দিন। তিনি চৈত্র বৈশাখ বসন্ত গণিয়াছেন। কবে শিব-পার্বতীর বিবাহ হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, বৈশাখ মাসে পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে, যেদিন সূর্য ভরণী-নক্ষত্রে প্রবেশ করেন (৪৪।৪৬)।*

কামরূপের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইয়াছিল। কেন হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, যেহেতু পুরাকালে ব্রহ্মা কামরূপে থাকিয়া নক্ষত্রচক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন (৩৮।১১৯)। এই ব্যাখ্যা সত্য নহে। মহাভারতে ও রামায়ণে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের দিক্‌-নির্ণয় আছে। সে দেশ শাকদ্বীপে, পেশোয়ারের উত্তরে, দিল্লীর পশ্চিমোত্তরে বোধ হয় বর্তমান চিত্রল নামক স্থানে ছিল। কবি স্বয়ং জ্যোতিষী না হইলে, শাকদ্বীপী না হইলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামের এই কাল্পনিক উৎপত্তি জানাইতে প্রয়াসী হইতেন না। মহাভারতে ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ছিলেন। কামরূপের এক বিখ্যাত রাজবংশ তাম্রশাসনে ভগদত্ত-বংশ নামে কীর্তিত হইয়াছে। বোধ হয় এই রাজবংশের পূর্ব পুরুষ আর্যেতর জাতি ছিলেন। ভগদত্তের পিতার নাম নরক। নরক দুইটি, একটি স্বর্গীয়, অপরটি ভৌম। স্বর্গীয় নরক বলির ন্যায় এক দৈত্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে। দেবী পুরাণে নরক যমের অনুজ। ভৌম নরক ভূমি জাত, ভূমিজ, মৃত্তিজ, অর্থাৎ যে অন্য দেশ হইতে আসে নাই। কবি দুই নরককে অভিন্ন মনে করিয়া ভৌম নরকের পিতা বরাহরূপী বিষ্ণু এবং মাতা পৃথিবী বলিয়াছেন। এইরূপে কবি স্বীয় প্রতিপালক রাজার মহত্ত্ব বাড়াইয়াছেন। তিনি রাজার পুরোহিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ পরে দিতেছি।

কালিকাপুরাণকে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম ভাগে পুরাণ, দ্বিতীয় ভাগে কামরূপের মাহাত্ম্য ও পূজাবিধি। রঘুনন্দন দুইখানা কালিকাপুরাণ পাইয়াছিলেন। তিনি একখানিকে 'দুষ্প্রাপ' বলিয়াছেন। তাহা হইতে প্রমাণ-উদ্ধার করিয়াছেন, সে পুরাণ লুপ্ত হইয়াছে। সে প্রমাণ পূজা-বিধির। বোধ হয় পুরাণের প্রথম ভাগে পরিবর্তন হয় নাই। পরিবর্তনের কারণ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় ভাগে দেবদেবীর ও কামরূপের বিশেষ বিশেষ স্থানের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির নিমিত্ত পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারিত। একটা উদাহরণ দিতেছি। মাঘ শুক্ল পঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী। এক স্থানে আছে সেদিন শিবার পূজা করিবে (৫১।২৫)। অন্য দুই স্থানে আছে লক্ষ্মীর পূজা করিবে (৮৫।১০,৮৮।২২)। দুইটিই পূজাবিধির ভাগে আছে।

উপাখ্যান ভাগের সহিত পূজাবিধি ভাগের ঐক্য নাই।

---

* গণিত দ্বারা জানিতেছি ইহা খ্রি-পূর্ব ৫৭১ অব্দে মহাবিষুব সংক্রান্তির পরদিন ও চন্দ্র নক্ষত্র আর্দ্রার পরদিন, বর্তমান পাঁজির ১০ই বৈশাখ। আশ্চর্যের বিষয় বাঁকুড়ায় বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরে মহাজনেরা সেদিন নূতন খাতা খুলেন। সেদিন তাঁহাদের 'হালখাতা'। এক উপাখ্যানে আছে, সেদিন ধর্মপূজা-প্রবর্তক রামাই পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার ডোমশিষ্যরা ১০ই বৈশাখ পুণ্যদিন মনে করে।

প্রথম ভাগে লবঙ্গলতা বৃথীর নাম (১০।৪২), দ্বিতীয় ভাগে লবঙ্গলতা না হইয়া বৃথী নাম আছে (৬৯।৫৯)।

কবি প্রথম ভাগে মৎস্যপুরাণ হইতে হর-পার্বতীর বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর মৎস্যাবতার, দশভুজাদেবীর রূপ ইত্যাদি, মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে দেবীর স্বরূপ বর্ণনা, "সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে" ইত্যাদি শ্লোক, দেবীপুরাণ হইতে "জয়ন্তী মঙ্গলা কালী" ইত্যাদি মন্ত্র ও পূর্ণিমান্ত আশ্বিন মাস গণনা ও আশ্বিন কৃষ্ণনবমীতে দেবীর পূজা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব কালিকাপুরাণ দেবীপুরাণের পরে রচিত হইয়াছিল। কত পরে তাহা বলা কঠিন। পূর্ব প্রকরণে লিখিয়াছি, কালিকাপুরাণের ভাদ্র কৃষ্ণ চতুর্দশীতে দেবীর আবির্ভাব হইতে মনে হয় ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মাহেশ্বর যুগের পর কালিকাপুরাণ রচিত হইয়াছিল। এই অনুমান অভ্রান্ত নয়। কারণ দেবী পুরাণেও কৃষ্ণ চতুর্দশীতে দেবীর পূজা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কালিকাপুরাণে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। সকল প্রমাণ একত্র করিলে কালিকাপুরাণ অষ্টম খ্রিষ্টশতাব্দের বলিতে হইতেছে। কত বৎসর ইহাতে নূতন বিষয় যোজিত হইয়াছে তাহা বলা আরও কঠিন। দ্বিতীয় ভাগে (৮৮।৭০) বিষ্ণুধর্মোত্তরের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ অষ্টম খ্রিষ্টশতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে বর্তমান কালিকাপুরাণ অষ্টম হইতে একাদশ খ্রিষ্টশতাব্দে রচিত হইয়াছিল। সপ্তম হইতে দশম খ্রিষ্টশতাব্দ পর্যন্ত আসামে শালস্তম্ভ বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজার নিমিত্ত রাজনীতি, দুর্গ নির্মাণ, পুষ্য স্নানাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি শ্রীহর্ষদেব (৭৩০-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে) প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। বোধ হয় কবি এই রাজার পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিতের জ্ঞাতব্য পূজার যাবতীয় উপচার ও পূজাবিধি এই পুরাণে বর্ণিত আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হোম ও যজ্ঞের বিধি নাই। তৎকালে ক্ষৌমবস্ত্র দুর্লভ হইতেছিল, শাণ (ভাঙ্গার অংশু দ্বারা নির্মিত) বস্ত্র সুলভ ছিল (৬৮।১২)।

৫। দেবীভাগবত

বঙ্গদেশে দেবী ভাগবতের তাদৃশ প্রচার নাই। দক্ষিণ-ভারতে শৈবদিগের মধ্যে ইহা এক প্রামাণিক গ্রন্থ। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ দেবী ভাগবতেরও টীকা লিখিয়াছিলেন।

বিষ্ণুভাগবত বঙ্গদেশে শ্রীমদ্ভাগবত নামে খ্যাত। বহুকাল হইতে একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে, বিষ্ণুভাগবত ও দেবী ভাগবত, এই দুই ভাগবতের মধ্যে কোন্‌টা পুরাণ, কোন্‌টা উপপুরাণ।

বৈষ্ণবদিগের মতে বিষ্ণু ভাগবতই পুরাণ, দেবী ভাগবত উপপুরাণ। শাক্তদের মতে ঠিক বিপরীত। কোন কোন পুরাণও দেবী ভাগবতকে অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। শ্রীযুত কাণে তাঁহার "পুরাণ নিরীক্ষণে" দুই ভাগবতের স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক মত তুলিয়াছেন। এখানে সে সব আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। দুই তিন প্রকারে উক্ত তর্কের নিরাশ করা যাইতে পারে। (১) কোন্ ভাগবতে পুরাণের লক্ষণ আছে, কোন্ পুরাণে নাই? (২) কোন্ ভাগবতের ভাষায় প্রাচীনতা দৃষ্ট হয়, কোন্ ভাগবতে হয় না? (৩) কোন্ ভাগবত পরে রচিত হইয়াছিল? এই তিন তর্ক যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমার বোধ হইয়াছে বৈষ্ণব ভাগবতই পুরাণ, দেবী ভাগবত উপপুরাণ।

বিষ্ণুভাগবত স্কন্ধে ও অধ্যায়ে বিভক্ত। দেবী ভাগবতও স্কন্ধে ও অধ্যায়ে বিভক্ত, উভয়েই দ্বাদশ স্কন্ধ। কবির মতে দেবী ভাগবত পুরাণ, বিষ্ণুভাগবত উপপুরাণ। তিনি উপপুরাণের নাম করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ভাগবত, কালিকাপুরাণ, নন্দিপুরাণের নাম আছে (১৷৩৷১৫)। অর্থাৎ কবি তাঁহার পুরাণকে উক্ত তিন পুরাণের পরে আনিয়াছেন। এই শ্লোক পরে যোজিত মনে করিবার হেতু নাই।

কবি নানাবিধ ছন্দে তাঁহার পুরাণ লিখিয়াছেন কিন্তু ভাষায় গাঢ়তা নাই। তিনি অনেক পুরাণ পড়িয়াছিলেন এবং সে সকল পুরাণ হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে মহিষাসুর বধ (৫ম স্কন্ধ), ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর ভূলোকে অবতার, তুলসীর উপাখ্যান (৯ম স্কন্ধ), বিষ্ণুভাগবত হইতে বৃত্রাসুর বধ, বোধ হয় দেবী পুরাণ হইতে সারস্বত বীজ (৩৷১১) গৃহীত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ হইতে কৃষ্ণ অবতার ইত্যাদি, মহাভারত হইতে রামায়ণ সংগ্রহ আশ্চর্যের বিষয় নহে, কিন্তু কালিকাপুরাণের অনুকরণে রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী পূজা লিখিত হইয়াছে। যজ্ঞকর্মে পশু-বধ অহিংসা। ইহাও দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণের অনুকরণ। বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের "যুদ্ধং বেদে প্রসিদ্ধঞ্চ তথা পুরাণে" (৬।২)। এখানে কবি আপনাকে বিষ্ণুভাগবতের পরে আনিয়া ফেলিয়াছেন, কারণ বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ বিষ্ণুভাগবতের এক লক্ষণ। কবির সময়ে পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল (৯।৩৬)। ইহাও তাঁহার অর্বাচীনত্বের প্রমাণ, শ্রীযুত কাণে লিখিয়াছেন, বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামী দেবী ভাগবতের নাম করিয়াছেন। তিনি একাদশ খ্রিষ্টশতাব্দে ছিলেন। এই সকল কারণে মনে হয় দশম খ্রিষ্টশতাব্দে এই পুরাণ রচিত হইয়াছিল।

কাশী কিম্বা নিকটস্থ কোন স্থান দেবী ভাগবত রচনার দেশ। কাশীর এবং কোশলের কয়েকটি উপাখ্যান এই

পুরাণে নূতন। বিষ্ণুভাগবত দক্ষিণ-ভারতে, দেবী ভাগবত উত্তর ভারতে প্রণীত হইয়াছিল। কবি নবরাত্র ব্রতবিধি আনুপূর্বিক লিখিয়াছেন (৩,২৬)। বসন্ত ও শরৎ দুই ঋতু যমদংষ্ট্রা। চৈত্র ও আশ্বিন দুই মাসেই দেবী পূজা কর্তব্য। "পুরাণং পঞ্চলক্ষণং" কবি এই পুরাণ পঞ্চ লক্ষণান্বিত করিয়াছেন। কবি বৈদিক গ্রন্থ হইতেও পুরাবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছেন। এই একখানি পুরাণ পাঠ করিলে বহু পুরাণ পাঠের ফল লাভ হইবে, এই ভাবিয়া রচিত হইয়াছে।

৬। বৃহদ্ধর্মপুরাণ

বৃহদ্ধর্মপুরাণ একখানি উপপুরাণ। ইহা রাঢ়ে গঙ্গার নিকটস্থ হুগলী জেলায় রঘুনন্দনের পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখের "ভারতবর্ষে" "পুরাণে রাঢ়ের ইতিহাস" ইতি নামে এক প্রবন্ধে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' হইতে ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলাম। আমরা কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-রামের চণ্ডীকাব্যে কালকেতু ব্যাধের, উজানী নগরের শ্রীমন্ত সদাগরের ও কালীদহে কমলে কামিনী আবির্ভাবের পুরাণ পাঠ করি। সে পুরাণ এক এক শ্লোকে বৃহদ্ধর্মপুরাণে আছে। কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র এই পুরাণ হইতে দক্ষযজ্ঞ নাশ ও আরও কতিপয় বিষয় লইয়াছেন।

পুরাণখানি পূর্ব, মধ্য ও উত্তর এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। পূর্বখণ্ডে তৎকাল প্রচলিত দেবদেবীর পূজার ও ব্রত আচরণের দিন নিরূপিত হইয়াছে। রঘুনন্দনে অধিক আছে। কোন কোন পূজায় প্রভেদ ঘটিয়াছে। একটা উদাহরণ দিতেছি। রঘুনন্দন মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা করিতে বলিয়াছেন। এই পুরাণের কবি সেদিন শিবা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কালিকা-পুরাণের এক স্থানে শিবার, অন্য স্থানে লক্ষ্মীর পূজা বিহিত হইয়াছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে এই দুই দেবীর সহিত সরস্বতী আসিয়াছেন। সরস্বতীর প্রতিমাতে প্রভেদ ছিল। এই পুরাণে সরস্বতী শুক্লবর্ণা, চতুর্ভুজা ও ত্রিনেত্রা। তাঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা, হস্তে সুধা বিদ্যা মুদ্রা অক্ষমালা (পূঃ ১৫, পূঃ ২৫।২৯) চৈত্রশুক্ল পঞ্চমী আর এক শ্রীপঞ্চমী (পূঃ ১৬)। সেদিন লক্ষ্মী পূজা।

কবি কালিকাপুরাণ মতে দুর্গোৎসবের প্রমাণ কিছু মানিয়া কিছু ছাড়িয়া রামরাবণের যুদ্ধকালের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন শ্রাবণ মাসে সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা হয়, এবং কার্তিকী পূর্ণিমায় সুগ্রীব ভল্লুক ও বানর-গণ আনাইয়া এক মাসের সময় দিয়া সীতা অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন (পূ. ১৯)। (বাল্মিকী রামায়ণে আছে চারিমাস বর্ষার পরে যখন আকাশ সলিল নির্মল হইয়াছিল, অর্থাৎ শরৎকালে সুগ্রীব দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কবি শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, এই চারি মাস বর্ষা ধরিয়াছেন। অতএব অগ্রহায়ণ পূর্ণিমার পর পৌষমাসে রামরাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল।) সেই কবিই লিখিয়াছেন, রাম ভাদ্র পূর্ণিমার পরদিন অর্থাৎ পূর্ণিমান্ত আশ্বিন কৃষ্ণ প্রতিপদে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন (পূ. ২১।২১)। সেদিন হইতে রাক্ষস ও বানরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ দেবীর অনুগ্রহ লাভার্থ আর্দ্রা নক্ষত্রসংযুক্ত কৃষ্ণনবমীতে বিল্ববৃক্ষে বোধন করিলেন। আশ্বিন শুক্ল নবমীর অপরাহ্ণে রাবণ ধরাতলে পতিত হইল।

কবি বিধান দিয়াছেন, বোধনের দিন হইতে ষষ্ঠী পর্যন্ত ত্রয়োদশ দিবস বিল্বশাখায় পূজা করিবে। সপ্তমীতে সে শাখা গৃহে আনিয়া দিবসত্রয় পূজা করিবে। পনর (ষোল) দিন পূজা করিতে না পারিলে অষ্টমী, নবমী কিম্বা নবমীতে পূজা করিবে। কবি এক রাজার সভা-পণ্ডিত কিম্বা গুরু ছিলেন। সে রাজ্যে নিশ্চয় উক্ত বিধি অনুসারে দুর্গার অর্চনা হইত। আশ্বিন শুক্ল ষষ্ঠী সায়ংকালে বোধন হইত না, পত্রী প্রবেশ হইত না, বোধ হয় দুর্গার প্রতিমাও নির্মিত হইত না।

পুরাণের উত্তর খণ্ড হইতে জানিতে পারিতেছি কবির কালে রাঢ়ে হিন্দুরাজ্য ছিল, পরিখা খনন দ্বারা দুর্গ নির্মিত হইত। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ বিভাগ ছিল, অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। তৎকালে যবনের বলবৃদ্ধি হইতেছিল। কেহ কেহ যবন সংসর্গ করিত, যবন ভাষায় কথা কহিত। এই সব লক্ষণ হইতে মনে হইতেছে পুরাণখানি চতুর্দশ খ্রিষ্টশতাব্দে রচিত হইয়াছিল।*

---

* এই প্রকরণ সমাপ্তি কালে বঙ্গবাসী প্রেসের স্বত্বাধি-কারী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুরাণশাস্ত্র-দান-কীর্তি স্মরণ করিতেছি।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২৭

কয়েক দিন পরের কথা। বোধ হয় অতিরিক্ত তদারকের ঝোঁকেই চম্পার সন্দেহ হইয়াছে যে ঠাণ্ডা লাগিয়া হীরকের অতিরিক্ত রকমের কিছু একটা হইয়াছে। যে কোন মুহূর্তেই বিপদ ঘটিতে পারে। বুড়ী টোট্‌কা-টুটকিতে খুব দুরন্ত, তাহারই ফর্দ অনুযায়ী বনমালী বেনের দোকান হইতে গাদাখানেক শেকড়, শুকনো পাতা আর গাছের ছাল কিনিয়া আনিয়াছে। সেগুলা বাঁধা ছিল একটা আস্ত খবরের কাগজে, হাতে হাতে সেটা কি করিয়া টুলুর বারান্দায় আসিয়া পড়ে।

টুলুর নজরে পড়িতে তুলিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে ও জিনিষটা দুর্লভই। বহুদিন পরে চলমান জগতের সঙ্গে একটা যোগসূত্র অনুভব করিতে করিতে টুলু অলসভাবে এক ধার হইতে পড়িয়া যাইতেছিল, একটা জায়গায় আসিয়া তাহার দৃষ্টি যেন আটকাইয়া গেল: কাতরাসগড় অঞ্চলে খনির কুলিদের একটা বড় রকম ধর্মঘট হইয়া গেছে—কিছু খুনজখম হইয়াছে এবং আশঙ্কা আছে যে ব্যাপারটা শীঘ্রই বাড়িয়া আর রাণীগঞ্জ অঞ্চলের স্থানে স্থানে ছড়াইয়া পড়িবে। উপরে তারিখটা দেখিয়া টুলু বুঝিল কাগজটা টাটকা। টুলুর ভ্রু-যুগল অল্পে অল্পে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সংবাদস্তম্ভে এ বিষয়ে আর কিছুই নাই, তবু এই খবরটুকু ধরিয়াই তাহার মাষ্টারমশাইয়ের কথা যেন বড় বেশী করিয়া মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল। মাষ্টারমশাইয়ের অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারটার কোন সম্বন্ধ থাকা সম্ভব কি? ভাবিয়া দেখিলে অসম্ভব নয়, তবু এত বড় একটা ব্যাপক কাণ্ড যে তিনি কি করিয়া ঘটাইতে পারেন যেন মাথায় আসে না। শুধু তাহাই নয়, একটা বেদনাও অনুভব করে টুলু—মাষ্টারমশাই এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন যাহার পরিণামে খুনজখমও আসিয়া পড়ে। সেই নিরীহ, শান্ত প্রকৃতির মানুষ, মুখে না হয় আবেগের মাথায় আসিয়াই পড়িত এখনকার রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু উগ্র মন্তব্য, তাই বলিয়া হাতে-কলমে এমন একটা কাণ্ড ঘটাইয়া বসিবেন যাহার পরিণাম নরহত্যা। টুলু নিজের মনের সঙ্গে তর্ক করে, যেন মাষ্টারমশাইয়ের হইয়া ওকালতি করিতেছে,—কৈ একটু-আধটু উগ্র মন্তব্য মাঝে মাঝে করিলেও এমন তো কিছু বলেন নাই বা করেন নাই যাহাতে তাঁহাকে এ ধরণের মানুষ বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়। খনির অভিজ্ঞতার সেই প্রথম দিনের কথা—টুলুই বরং ধ্বংসের কথা তুলিয়াছিল, প্রশ্ন করিয়াছিল—"ওগুলো বুজিয়ে দেওয়া যায় না মাষ্টারমশাই?" উত্তরে মাষ্টারমশাই বলিয়াছিলেন—"যদি সম্ভব হ'তই তবু উচিত হ'ত না টুলু।...সভ্যতার চাকা পেছন দিকে ঘোরাতে যাওয়া অস্বাভাবিক, আর সেই জন্যে বোধ হয় পাপও।" আরও মনে পড়ে টুলুর; বলিয়াছিলেন—"এবার দুঃখ দিয়ে তোদের মন্দিরে দেবতা-প্রতিষ্ঠার সময় এসেছে—আনন্দ-দেবতার।"...না, তাণ্ডবের মন্ত্র মাষ্টারমশাইয়ের মুখের মন্ত্র নিশ্চয় নয়। তাহার পর চিঠিতে টুলুকে যে কাজের নির্দেশ দিয়াছিলেন সে সবই তো মাত্র শান্ত, নিরুপদ্রব সেবার উপদেশ। তাহাতে সংঘর্ষের কথা যে না ছিল এমন নয়, কিন্তু সে তো সম্পূর্ণ অন্য ধরণের সংঘর্ষ। এই লোক ক্ষেপাইয়া অযথা কাজ অচল করিয়া তোলা নয়—এটা পুরাপুরি জানিয়াও যে যাহাদের ক্ষেপাইয়া তুলিলাম, শেষ পর্যন্ত পরিণামটা তাহাদেরই পক্ষে হইয়া পড়িবে সবচেয়ে মারাত্মক।...টুলুর স্বভাব-কোমল মনে বেদনা জাগে—যখন যাহা বলিয়াছেন সে সব হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের মনের কাছে সপ্রমাণ করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যায়—না, মাষ্টারমশাই ও-ধরণের মানুষ নয়; খুনজখম?—মাষ্টারমশাই আছেন তাহার মধ্যে?—না, অসম্ভব...

সমস্ত দিন তর্ক চলিল, বাছা বাছা প্রমাণ দিয়া মনটাকে শান্তও করিল টুলু। তাহার পর খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া সন্ধ্যার একটু পরে যখন বাসায় ফিরিল, দেখে বারান্দায় একটি লোক বসিয়া আছে। টুলুকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে প্রশ্ন করিল—"আপনার নাম টুলু বাবু?"

টুলু উত্তর করিল—"হ্যাঁ।"

"ভালো নামটা...?"

"নিতাইপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

লোকটি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কি যেন মিলাইতেছিল, বলিল—"আপনার একটা চিঠি আছে।" পকেট হইতে একটা খাম বাহির করিয়া হাতে দিল। টুলু প্রশ্ন করিল—"কার চিঠি?"

উত্তর হইল—"ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ে দেখুন, আমি ততক্ষণ বসছি এখানে।"

কেমন যেন একটু খাপছাড়া কাণ্ড। মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া টুলু ভিতরে চলিয়া গেল। খামটা বড়, ছিঁড়িয়া দেখিল চিঠিটাও বড় চিঠির কাগজের পাঁচখানা পাতা জুড়িয়া লেখা; প্রথমেই শেষের পাতাটা উল্টাইয়া দেখিল লেখক মাষ্টারমশাই। আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিল—

স্নেহাস্পদেষু,

আমার আচরণে আমি নিজেই অস্বস্তি বোধ করছি, কিন্তু কোন উপায় ছিল না, একবার বুদ্ধি করে আমায় অতিরিক্ত সাবধান হয়ে পড়তে হয়েছে; আমার প্রথম চিঠির কথা বলছি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। সেটা যে কোথায় পৌঁছাচ্ছে এবং কি

অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে, আমি কতক কতক টের পেয়ে বাকিটা আন্দাজ করে এখনও আতঙ্কিত হয়ে রয়েছি, অবশ্য তোমার জন্যে। ওর পরে আর ডাকের হেফাজতে ছেড়ে দেওয়া চলত না কোন চিঠিকে, অথচ এমন একজন নির্ভর-যোগ্য লোক পাচ্ছিলাম না যাকে এমন একটা দায়িত্ব দিয়ে এতদূর পাঠানো যায়। আরও ঠিক করে বলতে গেলে বলতে হয় লোক ছিল, তবে বাড়তি লোক ছিল না, যে কয়জন ছিল তাদের এ তল্লাট থেকে নড়বার উপায় ছিল না একটা দিন।

অথচ তোমার বলবার কত কথা।—গেট ভুলছিল আমার। শিক্ষা, সংস্কার বা তোমার মনের স্বাভাবিক প্রবণতা—যে জন্যেই হোক তুমি একটা রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করেছিলে। আমি তোমার সেই রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে এসেছি। তোমায় ধর্মান্তরিত করেছি বললেও ভুল হয় না। কি জন্যে এমন করা সেটা তোমায় ভালো করে জানিয়ে দেবার সময় এসেছে। তোমায় মাঝে মাঝে যে সব কথা বলেছি, যে সব তর্কবিতর্ক হয়েছে আমার সঙ্গে, আমার পূর্বেকার চিঠিতেও যে কথা লিখেছি সে সব থেকে তোমার একটা ধারণা দাঁড়িয়েছেই আমি কি প্রত্যাশা করি তোমার কাছ থেকে। কিন্তু সে ধারণাটা অসম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ এই মনে করে তুমি বসে থাকতে পার যে তুমি নিরীহ, নিরুপদ্রব সেবাধর্মে পাকা হয়ে উঠলেই আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হবে, আমি সন্তুষ্ট হব। এই রকম একটা অসম্পূর্ণ ধারণা থাকার কারণ এই যে আমার সম্বন্ধেই তোমার ধারণাটা অসম্পূর্ণ, সেইজন্যে আমার পরিচয়টা একটু পূর্ণতর করিয়ে দিয়ে আরম্ভ করি।

"পূর্ণতর" কথাটা আমি জেনে শুনেই ব্যবহার করলাম, কারণ আমার সম্পূর্ণ পরিচয়টা আজও দিতে পারব না, একটু ঢেকে-ঢেকে দিতে হবে; কিম্বা হয়তো দেওয়া নাও দরকার মনে করতে পারি, তবে তার জন্যে কিছু এসে যাবে না।

টুনু, আমি আমার নিজের চেহারাটা আর প্রকৃতিটা মনশ্চক্ষুর সামনে দাঁড় করিয়ে দেখছি। শুভ্র, শীর্ণ, বড় বড় চুলের ছায়ায় মুখটাতে একটা শান্তভাব; গায়ের রংটা গৌর, কিন্তু তাতে উজ্জ্বলতার উগ্রতা নেই—এই হ'ল আমার চেহারা। প্রকৃতির দিক দিয়ে আমি হাস্যপ্রবণ, কথা কিছু বলতে গেলে সেটাকে রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে হাল্কা করে ফেলি অনেক সময়। এক একবার লোকের কাছে কিম্বা নিজের মনের কাছে হঠাৎ জ্বলে উঠে কিছু একটা করে বসি—যেমন এই রকমই একবার জ্বলে ওঠবার ঝোঁকে তোমায় ধর্মান্তরিত করেছিলাম; কিন্তু মোটের উপর বাহিরে বাহিরে আমি শান্ত। এমন লোক যে নিরীহ সেবার বেশী কিছু প্রত্যাশা করতে পারে সহসা এমন খেয়াল আসতেই পারে না মনে। কিন্তু আজ তোমায় বলি, আমি অন্তরের দাহতেই শুদ্ধ, আর যে আগুন আমার দহন করে বাইরে তার প্রকাশ ঐ রকম ক্ষণিক আর আকস্মিক হলেও ভিতরে সেটা অনির্বাণই রয়েছে। কিন্তু যেন ভুল বুঝো না, এ আগুন আমার তৈরী নয়, সমস্ত প্রাণের প্রাণ; অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা নিয়েই আমি একে বাঁচিয়ে রেখেছি আমার অন্তরে। এই আগুনের দীক্ষা আমার সেই যুগে যে যুগটাকে নাম দেওয়া হয়েছে বাংলার অগ্নিযুগ। যেমন গালভরা নাম সে অনুপাতে কাজ হয়ে ওঠেনি। তার অনেক কারণ, আর সে দুঃখের গান গাইবার এটা অবসরও নয়, তবে এটা খাঁটি সত্য যে বাংলার যুব-চৈতন্য সেদিন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠিন সংকল্প নিয়েই দাঁড়িয়েছিল। সেদিন তার লক্ষ্য ছিল এক হিসেবে সঙ্কীর্ণ—বঙ্গভঙ্গ রোধ করা; কিন্তু বদ্ধপরিকর হয়ে উঠে দাঁড়াতেই তার দৃষ্টি হয়ে উঠল ব্যাপক, সে দেখলে মূল অন্যায় অন্যত্র, অর্থাৎ পরাধীনতার মধ্যে। বাঙালী ভারতের আর সবাইকে ডাক দিলে, আগুন পড়ল ছড়িয়ে।

এ ইতিহাসের এই পর্যন্ত থাক টুনু। তুমি এ রসের রসিক না হলেও কতক কতক জান। এর পরের যা ইতিহাস তা আমাদের পক্ষে বেদনাদায়ক। স্বাধীনতার সাধনা চলল, কিন্তু যে ধর্মকে আমরা বরাবর শুভ করতাম, তাই ঢুকে সাধনার ধারা দিলে বদলে। আমাদের ছিল গীতার ধর্ম—অন্যায়কারীকে করতে হবে দমন; তার জায়গায় যা এসে উপস্থিত হ'ল তা সেই একই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে থাকলেও একেবারে উল্টো প্রকৃতির—দমন বা হিংসার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এই "অতিশীতলমলয়ানিল"র দেশে তারই হ'ল জয়, আমাদের আসর ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হ'ল। অস্বীকার করব না, মনের আক্রোশেই আমি ভক্ত কবির রচনা থেকে এই উদ্ধৃতিটুকু করলাম, তুমি রাগ করো না কিন্তু; আমি তো অহিংসায় বিশ্বাসী নয়; আমরা যে আগুন জ্বেলেছিলাম সে তো বুঝুবুই রয়ে গেল ঐ দিক দিয়ে, মনের দুঃখে এটুকু আক্রোশ বা রাগ না প্রকাশ করলে আমি যে আমার ধর্মের কাছে পতিত হই।

যাক্, এটুকু অবান্তর। আমাদের অনেকেই গেল ধ্বংস হয়ে। অনেকের বুকের আগুন গেল চন্দনশীতল হয়ে, অনেকে আবার নিজের বুকের আগুনে দগ্ধ হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। কিছু রইল বেঁচে, তার মধ্যে আছি আমি। আমিও দগ্ধ, তবে নিঃশেষ হই নি, বুকের আগুন ছড়িয়ে বেড়াবার নেশা নিয়ে আছি বেঁচে।

কিন্তু লক্ষ্য গেছে বদলে। বদলে যাওয়া কথাটাও ঠিক নয়, এক লক্ষ্য ছিল, এখন হয়েছে অগণিত; মূলের সে এক তো আছেই। এক একবার যখন ভাবি, মনে হয় এই ঠিক হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধেই আগুন জ্বালানো, কিন্তু অন্যায় তো ঐ বিদেশীর অত্যাচারের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় নি টুনু। ওটা আমাদের দুঃখের মূল, জাতিহিসেবে একটা দুঃসঙ্গত পরিণতির অবস্থায় এটা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি, কিন্তু অন্যায় তো

ঐখানেই শেষ হয়ে গেল না ? স্বার্থের আকারে, লালসার আকারে, সে তো জীবনকে প্রতিনিয়তই নিষ্পিষ্ট করে চলেছে —যেথায়, সেথায়, সর্বত্রই। অন্যায়ের তো স্বাধীনতা পরাধীনতা নেই। সমাজে অন্যায়—নীচে থেকে যারা তোমার জীবনকে সুন্দর, সহনীয় করে তুলছে, ওপর থেকে তুমি তাদের পশুর চেয়েও নীচু করে রাখছ ; ধর্মে অন্যায়, উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রবল অন্যায়—বেশী দূর না গিয়ে গঙ্গাতিহির কর্তাপাড়া আর বস্তির তারতম্যটা মিলিয়ে দেখো, হীরকের জন্মের দৃশ্যটা মনে করো, গর্ভের বোঝার ওপর কয়লার বোঝার চাপে ওর মাকে পুত্রমুখ দেখবার আগেই চোখ বুজতে হ'ল। রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্যায়—সেখানে সাম্যের নামে যে কত বড় বৈষম্য মাথা উঁচু করে চলেছে তার হিসেব হয় না। এ সব শুধু আমাদের দেশের ব্যাপার নয়, স্বাধীন পরাধীন সব দেশেরই। মানুষের দুটো বড় বিভাগ স্বাধীন আর পরাধীন নয়—অত্যাচারী প্রবঞ্চক, আর অত্যাচরিত প্রবঞ্চিত। এখানে আবার তুমি আমায় ভুল বুঝতে পার, মনে করতে পার যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে জায়গা না পেয়ে আমরা বাজে কাজের বড়াই করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। মোটেই নয়। আমরা জানি স্বাধীনতা অর্জন করব আমরাই, ও বস্তু কেউ হাতে তুলে দেয় না—ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈব চ। সব চেয়ে বড় অন্যায় একদিন আমরাই সব চেয়ে বড় আগুন জ্বেলে দগ্ধ করব, ইতিমধ্যে আমাদের হুতাশনে ছোট ছোট আহুতি চলতে থাকবে। অগ্নিহোত্রী ছোট ছোট ইন্ধন দিয়ে প্রতি দিনের আগুন রাখে জ্বালিয়ে—তার পর একদিন বিশেষ ইন্ধনে করে বড় যজ্ঞের অনুষ্ঠান।

তোমাদের মাষ্টারমশাইয়ের একটা পূর্ণতর পরিচয় পেলে টুনু। এবার তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা যে কি তার বোধ হয় কতকটা আন্দাজ পেয়েছ। ব্যাপারটা আরও একটু স্পষ্ট করি।

আমি এই রকম একটা আহুতির আয়োজন করেছি সম্প্রতি ; খনি অঞ্চলে আমি অশান্তির আগুন জ্বালদাম। নানা কারণেই ভেবেছিলাম একেবারে বাড়াবাড়ি না করে ধীরে সুস্থেই এগুব—সেবার মধ্যে দিয়ে, শিক্ষার মধ্যে দিয়ে, যেমন তোমায় দিয়েছিলাম নির্দেশ, কিন্তু হীরকের জন্মের দৃশ্যটা আমার বুকের আগুন দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিয়ে আমায় ঘরছাড়া করে নিয়ে এল এখানে। আমি এখন ঝরিয়া-অঞ্চলের একটা জায়গায়। দিনচারেক আগে ছিলাম কাতরাসগড়ের দিকে, সেখানে কয়েকটা খনিতেই জ্বালিয়ে দিয়েছি বিদ্রোহের আগুন। কিছু লোককে পুড়তে হ'ল, তা পুড়ুক, না হয় আরও কিছু পুড়বে, তারা কিন্তু আর সবাইয়ের জন্যে মানুষের অধিকার অর্জন করে দিয়ে যাবে। এখানে এসেছি, দু'পাঁচ দিনের মধ্যেই জ্বলবে আগুন, তার পর অন্য প্রান্তে, তার পর আবার অন্যত্র—বাংলা-বিহারের বিরাট খনি-চক্রে আমি আগুনের মালা জ্বালব, বড় দামী মালা টুনু, অগ্নিমূল্যের অগ্নি-মাল্য বলতে পার। ক্ষমা করতে পারি যদি কথা পাই যে মানুষকে ওরা মানুষের মর্যাদা দেবে—ওদের এলাকায় হীরকের মায়ের মত মৃত্যু, চরণদাসের মত ধ্বংস, আর চম্পার মত অধোগতি আর সম্ভব হবে না। কি করে করছি কাজ ? বহুদিন থেকেই আমি আছি এ কাজে—অবশ্য মূল কাজের সঙ্গে সঙ্গে—অনেক জায়গায়ই তোমার মত ঘাঁটিদার বসিয়ে রেখেছি, অনেক দিন থেকে, যখন কাজ আরম্ভ করা দরকার বুঝলাম তখন আর বিশেষ বিলম্ব হ'ল না।

এবার তোমার কথায় আসা যাক। কোন এক সময় তর্ক-সূত্রে তুমি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে আমি শক্তিপূজায় বিশ্বাসী কিনা। তখন অন্য রকম উত্তর দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ তোমায় বলি আমার মত শক্তিসাধক আছে কে ? আমার খড়্গের তুচ্ছ বলিতে পিপাসা মেটে না তার চাই নর-বলি। আজ আমি খনি নিয়ে পড়েছি, কিন্তু এর আগে অনেক জায়গাতেই আসন পেতেছি আমার। অনেক বলি পায়ে দিয়েছি মায়ের—বাছা বাছা। তোমাকেও সেই রকম একটি বলি করে তোয়ের করব, তার পরে করব উৎসর্গ, এই আমার অভিলাষ। তোমাদের মত বলি দিলেই তো আমার সিদ্ধি হবে বিরাট, অমোঘ।

তোমায় তিনটি কাজ দিয়েছি—সেবা আর শিক্ষা অন্যের, তার কতদূর কি হয়েছে আমি অল্প অল্প খোঁজ পাই টুনু, কেমন করে সে রহস্য এখন ভাঙব না। অবসর পেলেই তোমার ওখানকার চিত্রটা মনে মনে এঁকে নিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি, কি সে অপরূপ ছবি! এর আগে তোমায় লিখেছি তোমায় আমি ধর্মান্তরিত করেছি, কিন্তু কৈ, তুমি তো সেই সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসীই আছ, শুধু এক নূতন রূপের সন্ন্যাস। তুমি গৃহহীন হয়েও গৃহী—নির্বিকার চিত্তে চম্পাকে দিয়েছ পাশে ঠাঁই, সন্তানহীন হয়েও তুমি যেন জনকের প্রতীকমূর্তি হয়েই হীরককে নিয়েছ নিজের বুকে তুলে। তোমরা সর্বান্তঃ-করণে পিতা-জননী-পুত্র, অথচ সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত। দেহাতীত শুভ্র সম্বন্ধের সূত্রে বাঁধা তোমরা তিন জনে। এমন অপরূপ জিনিষ আমি কল্পনায় আনতে পারতাম না—নিজের দরকারে কে যেন ঘটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, এই জিনিষের ব্যাপক পূর্ণতর রূপের কথা ভাবতে গেলে আমি আত্মহারা হয়ে যাই একেবারে।

কিন্তু হয়তো সেরূপ কোটবারই অবসর পাবে না, সেই কথাই বলছি :

আমার আর আর শিষ্যের সঙ্গে তোমার মনের প্রভেদ আছে বলেই এ জিনিষটি তোমার জীবনে সম্ভব হয়েছে। তুমি আরও শিশুকে বুকের কাছে টেনে নাও, আরও নারীর জীবনকে কলুষমুক্ত করো, চরণদাসের মত আরও যারা আছে তাদের এক এক করে তুলে ধরো। এই তোমার ব্রত হোক, কেননা এই তোমার জীবনের সত্য।

তবু যে এর মধ্যে একটা "কিন্তু" আছে—তোমার জীবনের সত্যের পাশে পাশে যে আছে ওদের জীবনের সত্য। ওরা তোমায় দেবে না সুশৃঙ্খলায় কাজ করতে। তাই সর্বক্ষণই তোমায় জেনে রাখতে হবে যে যা কিছুই করতে যাও, যত শান্ত ভাবেই করতে যাও, পরিণাম সংঘর্ষই। ভালো ভাবে লোককে ভালো হতে দেওয়া ওদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, তাই যদি কাজ করে যাও তো সংঘর্ষ এক দিন আসবেই, প্রস্তুত তোমায় অষ্টপ্রহরই থাকতে হবে। অনেক সময় আবার দেখবে যে সংঘর্ষটা যদি প্রয়োজন বুঝে তুমিই আরম্ভ করতে পার তো সেইটেই শ্রেয়ঃ। সংঘর্ষটা হবে ওদের সঙ্গে কিন্তু কাদের দিয়ে সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। খনির লোকেদের সঙ্গে মনপ্রাণ দিয়ে মেশো ধীরে ধীরে। দেখবে কি ওদের প্রাণ, কত মেশবার খুশি ওরা, কত অল্পে সাড়া দেয়। ওদের কানে মনুষ্যত্বের মন্ত্র দাও, নিজের অধিকার সম্বন্ধে ওদের সচেতন করে তোলো, দেখবে যখন সংঘর্ষ হবে তখন, যারা ওদের মানুষ বলে মানলে না, এক কথাতেই তাদের বিরুদ্ধে মাথা খাড়া করে উঠবে। কিন্তু এই সংঘর্ষে তোমার আত্মিক বা নৈতিক বিজয় সুনিশ্চিত হলেও যে দৈহিক ক্ষেত্রেও তুমি জয়ী হতে পারবে এমন তো বলা যায় না। কাতরাসগড় অঞ্চলে আমার একজন বিশিষ্ট শিষ্যকে হারালাম একদিন, বলি তুলে দিলাম আর কি, তোমাকেও তো ঐ পরিণামের জন্যে তোয়ের থাকতে হবে।

এই সঙ্গে আর একটা কথা বলে রাখি, কাকে আগে যেতে হবে কে জানে, হয় তো আমিই আর বলবার সময় পাব না। আমার টেবিলে অনেকগুলি মোটা মোটা ইংরেজী বই আছে, বহু নব নব 'ইজমে'র অর্থাৎ মতবাদের বই। আমার সব পড়া, তুমিও হয় তো পড়েছ কিছু কিছু. তাই থেকে মনে একটা ধারণা জন্মে যেতে পারে আমিও কোন একটা মতবাদের দাস। না, মোটেই নয়, ঐখানে আমি একেবারে মুক্ত রেখেছি নিজেকে; আর তুমিও চিরদিন রেখো। দেখলাম মতবাদে জড়িয়ে থাকলে তার মধ্যেকার গলদগুলোকেও জড়িয়ে থাকতে হয়। আজ আমি খনি নিয়ে পড়েছি, কয়েকটা কারণে আমি খনি-গত অভাবের সামনে এসে পড়েছি বলে, কোন 'ইজমে'র দাসত্ব করছি না। এর আগে অন্যত্র করেছি কাজ, আজ এখানে আবার কোথায় সুযোগ পাব অভাবের কোন্ অভিনব রূপের সামনা-সামনি হতে কে জানে? তখন ধ্বংস করবার জন্যে শক্তি-সাধনা করব নব ভাবে। এই আমার ব্রত।

এই শক্তি-সাধনার মধ্যে দিয়ে, শক্তিমত্তার জন্যই, ভ্রান্তি অভাব তো আমার নিজের মধ্যেও এসে বাসা বাঁধতে পারে, তখন ছিন্নমস্তার মত নিজেকেই বলি দেবার শক্তি যেন অবশেষে আসে একটু।

তুমি আমার প্রত্যাশার কথা জানলে এবার। কি তোমার উত্তর—ইঙ্গিতে অল্প কথায় এই লোক মারফত জানিও। যদি সাধ্যাতীত মনে করো তোমার রেহাই দোব।

আমি আরো কিছু দিন থাকব অনুপস্থিত। আশীর্বাদ নিও।

ইতি—মাষ্টারমশাই

২৮

নিতান্ত অস্বস্তিকর একটা পত্র—পড়িয়া বুঝা যায় না অনুভূতিটা ভয়, বিস্ময়, আনন্দ বা নিরাশার। হাতে করিয়া টুনু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, একটা চিঠি পড়ার পক্ষে এত বিলম্ব হইয়া গেল যে লোকটি উঠিয়া আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল, এবং তাহাতেও টুনুর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে না পারায় প্রশ্ন করিল—"হয়ে গেছে পড়া চিঠিটা?"

টুনু ফিরিয়া চাহিল, উত্তর করিল—"হ্যাঁ, হয়ে গেছে।"

"কি বলব তাঁকে? লিখে দেবেন কিছু?"

টুনু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর করিল—"বলো যেমন লিখেছেন সেই রকমই হবে।"

চিঠিটাতে আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল; পড়িতেছে না কিছু, ভাবিতেছে। একটু পরে যখন চোখ তুলিয়া তাকাইল, দেখে লোকটি নাই। ডাক দিতেও যখন উত্তর পাওয়া গেল না, তখন টুনুর ভাল করিয়া সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল।

লোকটা চলিয়া গেল নাকি? আহার না করিয়াই? আর সামনে রাত্রি! এতক্ষণে আর একটা কথা মনে পড়িল, বেশভূষায় লোকটা কুলি-কারকুন বলিতে যাহা বুঝায় অনেকটা সেই রকম, বারান্দার পাতলা অন্ধকারে মনেও হইয়াছিল সেই রকম টুনুর; এখন কিন্তু হঠাৎ মনে হইল, দরজায় আসিয়া সে যখন দাঁড়াইল, ঘরের আলোয় টুনু যেন তাহার মুখে ভদ্রশ্রেণীর কমনীয়তা লক্ষ্য করিয়াছিল। বড় অন্যমনস্ক ছিল, তখন ভাবিয়া দেখে নাই এতটা। এখন মিলাইয়া মনে হইতেছে—হ্যাঁ, ঠিকই তো তাই।

আর ভদ্রই হোক, কুলি-কারকুনই হোক, এইভাবে অনাহারে গেল! মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। তখনই বাহিরে গিয়া খানিকটা ডাকাডাকি করিল; একবার গঞ্জের দিকে একবার বালিয়াড়ির পথে খানিকটা আগাইয়াও গেল, কোনরকম সাড়া না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এই লইয়া মনের খুঁৎখুঁতানিটা কিন্তু অল্প সময়েই কাটিয়া গেল। একটু মনস্থির করিয়া ভাবিতেই বুঝিতে পারিল—নিশ্চয় মাষ্টারমশাইয়ের এই রকমই নির্দেশ ছিল—তা না হইলে এমন বেখাপ্পা কাজ কেন করিবে লোকটা? চিঠিটা পাঠাইতে মাষ্টারমশাই অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, একটা কালতো লোক বাসায় থাকিয়া কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে এটা নিশ্চয় চান না তিনি। অনুরোধ করিলেও নিশ্চয় থাকিত না; চতুর লোক, সুযোগ বুঝিয়া অনুরোধ

করিবার অবসরই ছিল না। টুলু আর এদিকটার মন দিল না, তবু মাষ্টারমশাইয়ের পার্শ্বচরদের চারি দিকেও কতটা রহস্য, সেটা উপলব্ধি করিয়া তাহার চিন্তাটা আবার তাঁহাকে গিয়াই আশ্রয় করিল। মাষ্টারমশাই তাহা হইলে একজন বিপ্লবী! টুলুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, তবে শোনা আছে বাংলার অগ্নিযুগের কথা—আলিপুর বোমার মামলা, অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকর; ক্ষুদিরামের ফাঁসি, গীতা হাতে করিয়া নাকি ফাঁসিকাঠে ওদের সবাই উঠিত; কে একজন, নাম মনে পড়িতেছে না—ফাঁসির হুকুম থেকে ফাঁসিকাঠে ওঠার কটা দিনের মধ্যে নাকি ওজন বাড়িয়া গিয়াছিল। টুলু যখন স্কুলের নিচের ক্লাসে তখন এ যুগ অস্তমিত তখনও কিন্তু গানের জের রহিয়াছে আকাশে-বাতাসে, —মেঠো সুরের দুটো লাইন এখনও কানে লাগিয়া আছে টুলুর —"একবার বিদায় দাও মা, ফিরে আসি, ভাই কানাইয়ের দ্বীপ চালান মা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি।" যতীন দাসও ঐ পন্থীই ছিল না? চৌষট্টি দিনের দিন রেখে অনশনব্রতে প্রাণ দিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষ্ফল আক্রোশ মিটাইয়া গেল।

যত নাম মনে আছে সবার একটা বিরাট মিছিল টুলুর চোখের সামনে দিয়া ধীরে ধীরে অনন্তের পানে মিলাইয়া গেল। গৌরবে কতবার বুক গেছে ভরিয়া, আজও যায়!

কিন্তু তবুও অস্বস্তি বোধ হইতেছে মাষ্টারমশাইয়ের এই নূতন রূপের সামনাসামনি আসিয়া। যাহাদের লইয়া এক দিন বাঙালী হইয়া জন্মানোর আসিত গৌরব—আজও আসে—তাহাদের একজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া মনটা যাইতেছে যেন সঙ্কুচিত হইয়া, ভয়ে নয় অশ্রদ্ধাতে ত নয়ই, তবে কিসে?

এর উত্তর টুলু খুঁজিয়া পাইল না তবে এটা বুঝিল যে যাহাদের বুকে এত জ্বালা তাহাদের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলায় মন তাহার সায় দিতেছে না। আগে কতবারই যেমন মাষ্টারমশাইকে পরিহার করিতে চাহিয়াছে—শ্রদ্ধা-সত্ত্বেও, আজও সেই রকম একটি দিন আসিয়াছে—আজ, এই চিঠি পাওয়ার পর শ্রদ্ধা যখন আরও কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে মাষ্টারমশাইয়ের নির্দ্দেশের অমর্য্যাদা করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া যাওয়া যখন নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতই অসম্ভব।

মনে তো পড়ে না এত বড় অশান্তিতে টুলু আর কখনও পড়িয়াছে কিনা। সমস্ত রাতটা এই ভাবেই কতকটা অনিদ্রায় মধ্যেই গেল কাটিয়া।

সকাল থেকে আবার কাজের মধ্যে চিন্তার উগ্রতাটা অনেকটা মিলাইয়া আসিল। আজকাল কিছু কিছু কাজ থাকে হাতে; নিতান্ত দরকারী যে কাজই এমন নয়, তবে এটা ওটা সেটা দিয়া একটা রুটিন গড়িয়া লইয়াছে; সময়টা কাটে এক রকম করিয়া, সকালে বুড়ীর ঘরে গিয়া ছেলে আর মেয়েটিকে তোলে, বুড়ী যদি উঠিয়া পড়ে একটু-আধটু গল্প হয়, বুড়ীর জীবনের যদি সে রকম কিছু আসিয়া পড়িল তো অনেকখানি; তাহার পর দুটিকে সঙ্গে করিয়া যায় বনমালীর বাসায়। বেশ বড় একটা জটলা হয়, এদিকে এরা তিন জন, ওদিকে বনমালী, চম্পা, প্রহ্লাদের বৌ। জটলাটা হয় হীরক আর প্রহ্লাদের শিশুটিকে কেন্দ্র করিয়া—দুটিতেই ধীরে ধীরে চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে—বিশেষ করিয়া প্রহ্লাদের শিশুটি আরও যত্নে আরও হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে, বেশী লোকের সাহচর্যে আরও বেশ চনমনে, খাঁটিয়া-খুঁটিয়া লুকিয়া দোলাইয়া বেশ সাড়া পাওয়া যায়। এ বাসার আসল টান অবশ্য হীরক। কয়দিনেরই বা? কিন্তু অপূর্ব-সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। আর একে লইয়াই তো জীবনের এদিকে পা বাড়ানো টুলুর, তার এমন দেবশিশুর মত হইয়াও ওর জীবনের ঐ সুগভীর ট্র্যাজেডি সব মিলাইয়া একটা অদ্ভুত মায়াজাল বিস্তার করিতেছে ছেলেটা। এই মায়ার জন্য এখনও ওকে লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করিতে সঙ্কোচ হয় টুলুর, স্নেহটা প্রকাশ করিতে এক ধরণের লজ্জা করে। চম্পা অনুযোগ করে—"আপনি আমার ছেলেকে একটু কম আদর করেন—বেশই একটু, তা মিতিনের সামনেই বলছি, যদি মনে করে হিংসে করছি ওর ছেলের তো নাচার। সত্যি কথাটা বলতে ছাড়ব নাকি?" যেটুকু করিতে চায় টুলু সেটুকুতেও বাধা পড়ে, একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া বলে—"আদর বোঝবার মতন হোক একটু, এখন তো কাদার ডেলা একটা তোমার ছেলে।"...মুক্ত ব্যবহারের মধ্যে প্রহ্লাদের বৌ আজকাল আর কথায় এড়ে না, হাসিয়া বলে—"ততদিন তো ওর মা হিংসায় ফেটে মরে যাবেক গো!" কথাটা শুনিয়া একদিন বনমালী মুখটা ভার করিয়া বলিল—"তুর ছাওয়াল! তুর ছাওয়াল কেমন করে হ'ল আমার বুঝায়ে দে ক্যানে, উর মা বিয়ালো, তার ছাওয়ালটি হোলোক নাই; ছোটবাবু উর ছাওয়াল হোলোক নাই; পেল্লাদর বৌ মাই দিচেঁ, উটির দিলেন, ছাওয়াল হোলোক নাই,—তুর ছাওয়াল! কোন্ আইনের কোন্ ধারায় আমায় বুঝায়ে দে ক্যানে!"

বেশ হাসি পড়িয়া গেল, তাহারই মধ্যে গাম্ভীর্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া চম্পা বলিল—"তা তুই যা না বুড়া জলদি করে উর মাকে সগ্গে থেকে পাঠায়ে দিগে; আমি দিয়াঁ দিব তার ছাওয়ালটিকে।"

বনমালী রাগিয়াই গেল, হাত নাড়িয়া বলিল—তা সিটি নাই, তু ছোটবাবুকে দিয়াঁ দে ক্যানে, উনি দিলেন, উঁর ছাওয়াল। দিখ্‌বো না, পরের ছাওয়াল দিয়া চোখ রাঙায় গো। তুর ছাওয়াল তো বিয়া হলে তু দিয়াঁ যাস তুর শ্বশুর-বাড়িতে; হঁ, আমি দিখবো!...

ছেলে লইয়া নাতনী ঠাকুরদাদায় বাক্‌বিতণ্ডা একরকম নিত্যকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকাল বেলার এই সময়টুকু লঘু রহস্যের মধ্যে দিয়া কাটে এই ভাবে।

এর পরে বেশ একটু শক্ত কাজ হাতে লইয়াছে। মাষ্টার মশাইয়ের বাসার সঙ্গে দেয়াল দিয়া ঘেরা বেশ খানিকটা জমি, সেটা শাকসব্জির বাগান করিবে। বনমালীকে লইয়া মেহনতে লাগিয়া যায়, কোদাল চালানো, ঢেলাভাঙা, আল-বাঁধা, ভাগাভাগি করিয়া সবই করে; ছেলে আর মেয়েটি সাহায্য করে। বর্ষা আসিতেছে, তাহার আগেই তৈয়ার করিয়া ফেলিবে বাগানটা, রৌদ্র যতক্ষণ না নিতান্ত কড়া হইয়া ওঠে ততক্ষণ লাগিয়াই থাকে, মাঝে একটা ছোটখাটো বৃষ্টি হইয়া গেছে, জমিটা নরম থাকিতে থাকিতে যতটা অগ্রসর হওয়া যায়।

ক্লান্তিটুকু অপনোদিত হইয়া গেলে স্নান করিয়া ঘরে ঢোকে। আজকাল হোমিওপ্যাথির দিকে একটু ঝোঁক গেছে; বুড়ীর আরোগ্যের ব্যাপারটা চম্পা এক গুণকে সাত গুণ করিয়া বস্তিতে রটাইয়াছে, দু'চার জন করিয়া জুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই সময়টা বই দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের ঔষধ বিলি করে। তাহারা চলিয়া যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীর নাতনী হীরককে আনিয়া হাজির করে।

টুলু কখনও এ কয়মাসটা করে নাই, এতে দুটি শিশুর মধ্যে সে পক্ষপাতিত্বের ভাবটুকু ফোটে তাহাতে তাহাকে সঙ্কুচিতই করে একটু; কিন্তু তবুও ব্যাপারটুকু নিয়মিত ভাবেই হইয়া আসিতেছে। টুলুর মনে হয় চম্পা যেন ওৎ পাতিয়া থাকে, ঘরটা খালি হইতে দেরি, হীরককে দেয় পাঠাইয়া। বুড়ীর নাতনীকে বারণ করে না, তবে চম্পাকে একদিন এই সময় একলা পাইয়া বলিল। চম্পা একটু বিস্মিতভাবে চাহিয়া থাকিয়াই হাসিয়া উত্তর করিল—"বেশ যাহোক। আমায় আপনি এতই বেয়াকেলে ভাবেন? সত্যি আমি এতই হিংসুটে নাকি?...মিতিন দেয় পাঠিয়ে; আমি বরং বারণই করেছি ক'দিন—উনি এখন একটু বই-টই নিয়ে থাকেন, কাজ নেই পাঠিয়ে।"

বুড়ীর কাছে কি একটা কাজে যাইতেছিল, চলিয়া গেল। ফিরিবার সময় আর একবার আসিল—"না হয় যাব নিয়ে হীরককে?" বলিয়া খুব অল্প একটু হাসির সহিত টুলুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

পরীক্ষার স্বচ্ছতায় টুলু মনে মনে একটু হাসিল, ঠোঁটেও তাহার একটু আভাস আসিয়া পড়িল, কিঞ্চিৎ অবহেলার ভাব দেখাইয়া বলিল—"থা—ক, কি আর ক্ষতি করছে?"

"না হয় বারণ করে দোব মিতিনকেই?"

এবার টুলু হাসিয়াই ফেলিল, কথায় কিন্তু পরাজয়টা স্বীকার করিল না, বলিল—"তোমারও যেন হঠাৎ জিদ বেড়ে গেল চম্পা, প্রহ্লাদের বৌয়ের কষ্ট হবে না মনে?—পাঠিয়ে দেয় বেচারি..."

—স্বীকার করিতে চায় না; চম্পা, যে সব চেয়ে বেশী জানে কথাটা, তাহার কাছেও নয়, তবে সত্যই হীরক যেন মায়ার নূতন নূতন তন্তু বুনিয়া চলিয়াছে তাহার চারি দিকে। বেশ মোটা মোটা ফুলতোলা গোটা দুই কাঁথার উপর শোয়াইয়া দেয় মেয়েটি, নিজে প্রায় থাকে না, ভাইয়ের সঙ্গে খেলা করিতে চলিয়া যায়। টুলু পড়েই এই সময়টা—হোমিও-প্যাথিই হোক বা অন্য কোন বই-ই হোক, মাঝে মাঝে ফিরিয়া ফিরিয়া চায় হীরকের পানে, হাত পা নাড়িয়া, হাতের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া নিজের খেয়ালে একটা একটানা শব্দ করিয়া যাইতেছে—এক একবার হঠাৎ উৎসাহের জোয়ার নামে, হাত-পা ছোঁড়ায় অতিরিক্ত ক্ষিপ্রতা আসিয়া যায়, একটানা শব্দটা টুকরা টুকরা হইয়া কাকলিতে ভাঙিয়া পড়ে। এক এক সময় চাহিতে গিয়া টুলু আর দৃষ্টি সরাইতে পারে না—কত নিশ্চিন্ত, অথচ কত অসহায় ও! এত অসহায়তার মধ্যে এত নিশ্চিন্ততা বড় বিস্ময়কর, বড়ই করুণ মনে হয় টুলুর—আজ ওকে লইয়া কাড়াকাড়ি, কিন্তু কে জানে যেমন বিক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছিল আবার তেমনি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে কি না। তিনটি আশ্রয়ের মধ্যে একটি প্রহ্লাদের বৌ, বাকি চম্পা আর টুলু। কি স্থিরতা চম্পার জীবনে? টুলুর জীবন তো আরও অনিশ্চয়—কোথাকার একটা কুটা, স্রোতের মুখে কোথায় আসিয়া লাগিয়াছে, আবার ভাসিয়া যাইতে কতক্ষণ?...সে আবার একটা কুটার সহায়!

আবার কখনও কখনও মনটা সংকল্পে হইয়া ওঠে দৃঢ়। না, যত যা-ই হোক, হীরককে ছাড়িবে না ও; যেমন বুকে করিয়া তুলিয়া লইয়াছিল, তেমনি করিয়াই বুকে জড়াইয়া রাখিবে, আর সব ব্রত যাক, ঐ একটি ব্রত সার করিয়া জীবনটা দিবে কাটাইয়া।...আবেগের মাথায় টুলু উঠিয়া গিয়া শিশুর উপর দৃষ্টি নত করিয়া দাঁড়ায়—মনে হয় ঐ নিশ্চিন্ততার অন্তরালে রহিয়াছে একটা বিশ্বাস—অবুঝ, কিন্তু অটল বিশ্বাস। টুলুর হাতটা কখন্ যেন আপনা হইতেই গিয়া ওর ললাট স্পর্শ করে, আশীর্বাদের মত একটি প্রতিজ্ঞা নামিয়া সঞ্চারিত হয় ললাটে—না, তুই নিশ্চিন্তই থাক, এ বিশ্বাস আমি দোব না ভাঙতে...

আহারাদি করিয়া একটু ঘুমাইয়া পড়ে, দেশের চেয়ে এখানকার গরমটা ঢের বেশী, আলস্যটা কোন মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারে না। উঠিয়া ছেলে আর মেয়েটিকে লইয়া পড়াইতে বসে। এই সময়টা কাটে বেশ ভাল। শুধু বসিয়া পড়া মুখস্থ করানো নয়, অবশ্য তাহাও একটু করাইতে হয় কেননা দুইটিই একেবারে অক্ষরজ্ঞানহীন, তবে বেশীর ভাগ গল্প বলা; গল্পের মধ্যে দিয়া ভূপরিচয়, দেশ-বিদেশের মানুষের পরিচয়, ইতিহাস, বিশেষ করিয়া নিজের দেশের ইতিহাস, পুরাণ—যতটুকু নিজের জানা আছে। যেটুকু বলে সেটুকু ওদের কাছ থেকে আবার শুনিয়া লয়। বড় চমৎকার লাগে, দুটি ফুটনোন্মুখ মনের পরিধি কেমন ধীরে ধীরে যাইতেছে বাড়িয়া!—সেই রকম একটি দুইটি করিয়া যেন পাপড়ি খোলা। ফুলের মতই যেন মনের একটা সৌরভও পড়িতেছে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া। এই সময়টা টুলুর সব চেয়ে ভাল কাটে; শুধু একটা অভাব বোধ করিয়া কষ্ট হয় যে মোটে দু'জন এরা,

—স্কুল দুটির নীচে আরও গোটাকতক ফুটিলে বড় ভাল হইত। পড়ার দিক দিয়া চুটকেই সেই "অ-আ" হইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছে। তবে এদিকে টুনু একটু বৈচিত্র্য আনিবে—একটি ক্লাসকে দুইটিতে ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য ছেলেটিকে ছুটি দেওয়ার পরও মেয়েটিকে বসাইয়া রাখে। রাত্রেও তাহাকে একটু খাটায়, ফলে এই অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম ভাগটা শেষ করিয়া সে প্রায় দ্বিতীয় ভাগের ক্লাসে আসিয়া পড়িল বলিয়া। বলে—তাড়াতাড়ি পড়িয়া ফেলিল তাই, নহিলে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে এক বই পড়া—মুখ দেখাইবার জো থাকিত?

ভদ্র জীবনের উপর একটু এই শিক্ষার স্পর্শে বেশ একটু মর্যাদাজ্ঞান হইয়াছে।

টুনু কিন্তু এ জ্ঞানটা একটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করে। বিকালবেলা ওদের একেবারেই দেয় ছাড়িয়া।

আগেকার সঙ্গী-সঙ্গিনীরা আসে, সেই রকম জোর খেলা জমে, তবে তিকে-তিকে জাতীয় নয়। এরা দুটিতে পরিচ্ছন্ন, ওরা প্রায় সেইরূপই, এদের দেখিয়া যদি সামান্য একটু ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে, কিন্তু পাছে পরিচ্ছন্নতার জন্য এক্ষেত্রেও মর্যাদাজ্ঞান ওঠে জাগিয়া সেজন্য টুনু প্রায় সর্বক্ষণ থাকে কাছে কাছে, যদি বাহিরে যায়, চম্পাকে বলিয়া যায়—"একটু লক্ষ্য রেখো, কাপড় একটু ময়লা বলে ওদের যেন ময়লার না ছোপ ধরে।"

সন্ধ্যার সময় সকলে কাঞ্চনতলাটিতে জড়ো হয়।

এই এখন সমস্ত দিনের রুটিন, খুব বেশী কিছু না হোক তবুও খানিকটা কাজ আছে। সেই প্রথম সপ্তাহের বন্দী-জীবনের জড়তা গিয়া উভয়ের খানিকটা পথ তো অন্তত পরিষ্কার হইয়াছে। সর্বোপরি আছে একটা আশা, নূতন যে জীবনকে অবলম্বন করিল তাহার একটা ভবিষ্যতের স্পষ্টতর ছবি।

মনে বেশ একটি তৃপ্তি জাগিয়া উঠিতেছিল, মাষ্টার-মশাইয়ের চিঠি এই তৃপ্তিটুকুকে যেন গ্রাস করিতে বসিল। ক্রমশঃ

স্বপ্ন ও জাগরণ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভুলিনি বন্ধু, ভুলিনি তোমায়, ভুলিনি আজো,
আমার উতল সমুদ্র-বুক উথলি রাজো
আনন্দ-সম, বেদনার সম, স্বপ্ন-সম,
আমার আশা ও আমার দুরাশা, নিরাশা মম।

সবার বেদনা—আমার বেদনা; সবার ব্যথা
আমার দুঃখ তাই ত এমন সৃষ্টি-ছাড়া।
হৃদয়-অতলে বিরাজিত চির চাঁদের ছবি,
আকাশের গান তাই আমি গাই ধরার কবি।

আছে সংসারে কর্ম্ম-মুখর চপল দিন।
নাই কি শান্ত মধুর রাত্রি স্বপ্ন-লীন?
আসে পূর্ণিমা, প্লাবিয়া পৃথিবী জ্যোৎস্না ফোটে,
জীবনের এই অশ্রু-সাগরে তুফান ওঠে।

সবার সঙ্গে যেথা আমি এক—দিবস সেথা,
প্রতি মুহূর্ত্ত কাজে কোলাহলে পূর্ণ যে তা।
বিজনে গোপনে রজত-রজনী জীবনে আসে,
আকাশ ধরার দূরত্ব ঘোচে, চন্দ্র হাসে।

জনতা-বিহীন নিভৃত নিশীথে—যেখানে একা,
হে আমার চাঁদ, তোমার আমার সেখানে দেখা।
দূর্ব্বা-তৃণ ধরণী শীতল শিশির যাচে,
তুমি আছ আর আমি আছি, আর কি-ই বা আছে?

আজিকে জীবনে জোয়ার এসেছে বাঁধন-ভাঙা,
ঊর্ম্মি-উতল থৈ থৈ জল, নাইকো ডাঙা।
এ কি স্পন্দন, এ কি অনুভূতি, কি বিস্ময়!
উচ্ছল স্রোতে ভেসে গেছে দূরে সর্ব্ব ভয়।

সকলের সাথে মাটির স্পর্শ দেখায় লক্ষি,
উদিত দেখি সে নূতন আকাশে নূতন রবি।
সবার মাঝারে আপনারে ভুলি আত্মহারা,
আমার তন্ত্রে কি সুর জাগায় নূতন সাড়া!

জীবন ভরিয়া দিন-রাত্রির চলেছে খেলা,
কখনো সেথায় পূর্ণিমা, কভু প্রভাত-বেলা।
সত্য যদি এ পৃথিবীর নব-সূর্য্যোদয়,
আমার রাতের চাঁদের স্বপ্ন মিথ্যা নয়।

নব-জাগরণে জেগে ওঠে হেথা নূতন প্রাণ,
সবার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে গাই যে গান!
বজ্র স্বরে নূতন যুগের সম্ভাবনা,
অনুভব করি নব-জীবনের উন্মাদনা।

আকাশ আকুল, মায়া-মঙ্গুল চৈত্র-নিশা,
জীবন-ভাসানো জ্যোৎস্না-প্লাবনে হারাই দিশা।
স্মৃতি-সমুদ্র উথলে তোমার মধুর ছবি,
হে আমার চাঁদ, আমি যে তখন তোমার কবি।

বাঙ্গলায় মঘদৌরাত্ম্যের বিবরণ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৬৬৬ খ্রীষ্টীয় সনে বাঙ্গলার বিখ্যাত নবাব সায়েস্তা খাঁ চাটিগ্রাম[*] জয় করিয়া মঘ-ফিরিঙ্গির চরম শাস্তি বিধান করেন এবং বাঙ্গালী জনসাধারণ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী দারুণ অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয় পারস্ত-ভাষায় লিখিত প্রামাণিক ইতিহাস হইতে চাটগাঁ বিজয় ও চাটগাঁর ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের বিবরণ প্রকাশ করেন। (*J.A.S.B.* 1907, pp. 405-25)। কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাসের এই তমসাচ্ছন্ন যুগের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এখনও লিখিত হয় নাই। কারণ, মঘদৌরাত্ম্যের সুদীর্ঘকাল ব্যাপী ঝটিকা নিম্নবঙ্গের প্রায় ঘরে ঘরে যে করুণ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল রাজদরবারে তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত পৌঁছিবার অবসর পায় নাই এবং অধিকাংশ স্থলে প্রজার বিলোল ক্রন্দনধ্বনি আকাশে সাময়িক তরঙ্গ তুলিয়াই শান্ত হইয়াছে, কচিৎ তাহার স্মৃতি তৎকালীন সমাজ-হৃদয়ে জাগরূক থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের সংগৃহীত অজ্ঞাতপূর্ব্ব কতিপয় ছিন্নপত্রের বিবরণ প্রকাশ করার পূর্ব্বে মঘদৌরাত্ম্যের উৎপত্তির বিচিত্র ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

পাঠান রাজত্ব কালে চাটিগ্রামের আধিপত্য লইয়া চতুঃশক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়—পাঠান, আরাকান, ত্রিপুর ও ফিরিঙ্গি। সোনারগাঁর সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-৪৯ খ্রীঃ) সর্ব্বপ্রথম চাটিগ্রাম জয় করেন। তাঁহার সময়ে অনেক ধর্ম্মমন্দিরাদি চাটিগ্রামে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহাদের ধ্বংসাবশেষ সায়েস্তা খাঁর সময় বিদ্যমান ছিল। (*J.A.S.B.* 1907, p. 421)। তখন হইতে চাটিগ্রাম বাঙ্গলার পাঠান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কালে চাটিগ্রামে একটি টঙ্কশালাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দনুজমর্দ্দনদেব, মহেন্দ্রদেব ও জালালুদ্দীনের চাটিগ্রামী মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে (Bhattasali : *Independent Sultans of Peng il*, pp. 119, 123-5)—ইহাদের তারিখ ১৪১৭-২০ সন মধ্যে। দশ বৎসর পরে পলায়িত আরাকানরাজ "মেঙ্‌ সৌ-মুন্" গৌড়ের সুলতানের আশ্রয়ে চব্বিশ বৎসর থাকিয়া তাঁহার সাহায্যে রাজ্যোদ্ধার করেন—ইহা জালালুদ্দীনের রাজত্বকালীন ঘটনা। আরাকানের ইতিহাসে পাওয়া যায় ৭৬৮ মঘী সনে (১৪০৬ খ্রীঃ) ঐ রাজা তৎকালীন "চাটিগ্রামের উজীরে"র সাহায্যে গৌড়সুলতানের আশ্রয় লাভ করেন। আরাকান-চাটিগ্রাম-সম্বন্ধের ইহাই প্রথম সূত্রপাত। চাটিগ্রামের ইতিহাসের এই তমসাচ্ছন্ন যুগের একমাত্র আলোকদাতা হইল আরাকানী ভাষায় লিখিত আরাকানের ইতিহাস গ্রন্থ এবং শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ১৮৪৪ সনে ফেয়ার (Phayre) সাহেব তাহা হইতে যে অতি সংক্ষিপ্ত সারসঙ্কলন করিয়াছিলেন তদতিরিক্ত কোন কথাই এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। পনের বৎসর পূর্ব্বে রেঙ্গুনে প্রকাশিত আরাকানের বিস্তৃত ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৪১৫) পাঠানযুগ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বিবরণ সংগৃহীত পাওয়া যায়। হন্দ-মালালঙ্কার রচিত ১২৯৩ বর্মাব্দে প্রকাশিত "রখইঙ্‌ রাজওয়াঙ্‌ থহ্-ক্যম্" অর্থাৎ আরাকানের নূতন ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করিয়াছি এবং তন্মধ্যে বহু নূতন কথা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[†] আরাকান রাজগণ পরে ক্রমশঃ চাটিগ্রামে অধিকার বিস্তার করিলেও রাজা-উজীরের এই সামান্ত সংঘর্ষে প্রজাসাধারণের শান্তিভঙ্গ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। গৌড়সুলতানের প্রতিভূ চাটিগ্রামের

---

[*] অনেকেই অবগত নহেন "চট্টগ্রাম" শব্দটি আধুনিক এবং ঊনবিংশ শতাব্দের পূর্ব্বে তাহার প্রয়োগ ছিল না। চট্টগ্রামের প্রাচীন ঐতিহাসিক রূপই 'চাটিগ্রাম' এবং সর্ব্বত্র তাহারই প্রয়োগ পাওয়া যায়। দনুজমর্দ্দনদেবের ১৩৩৯ শকাব্দের মুদ্রায় স্পষ্ট "চাটিগ্রামাৎ" উৎকীর্ণ আছে (ডঃ ভট্টশালীর *Independent Sultans of Bengal*, p. 119 ও pl. VIII দ্রষ্টব্য)। ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্যের ১৪৩৫ শকাব্দের "চাটিগ্রাম-বিজয়ি" মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাঠান যুগের একজন বিখ্যাত সংস্কৃত কোষকার "অভিধানতন্ত্র" রচয়িতা জটাধর ফেণী নদীর নিকটে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করেন—হন্মধ্যেও চাটি-গ্রাম রূপেই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ এই সকল উৎকৃষ্ট প্রমাণ ব্যতীত অসংখ্য বাঙ্গলা ও ফার্সি ("চাটগাম") গ্রন্থাদিতেও ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পরে, তন্ত্রগ্রন্থে "চট্টল" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া "চট্টগ্রাম" কল্পিত হইয়াছে এবং দেশমাতৃকার উদ্বোধনে কবির লেখনীতে "চট্টলা" রূপেও পরিণতি হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক সম্পদে সমৃদ্ধ চাটিগ্রাম রূপটি বর্জনীয় নহে।

[†] সুলতান প্রেরিত বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির নাম "উলুং খেঙ্" (পৃ. ৭) সম্ভবতঃ উলুঘ খাঁর অনুবাদ। মঘনরপতি মেঙ্-খারির প্রথম মুসলমানী উপাধি "অলিখাঁ" (পৃ. ২০, আলি শা নহে)। ইহাদের তিনটি করিয়া নাম থাকিত, যথা, পালি ও ফার্সি। ফার্সি নামগুলি এই:—বসৌপ্যু=কলিমা সা (পৃ. ৩১), মেঙ্‌ দোল্যা (১৪৮১-৯১)=মা থু সা (পৃ.৩৫), মেঙ্-র (১৪৯১ ৩)=মহামো (দ্) সা (পৃ. ৩৬), মেঙ্ রন্‌উঙ্ (১৪৯৩-৪)=নোরি সা (পৃ. ৩৬), ছলেঙ্গথু (১৪৯৪-১৫০১)=সকৃ-যোকৃদোলা সা (পৃ. ৩৭), মেঙ্‌ রাজা (১৫০১-১৩)=ইলি সা (পৃ. ৩৮), মেঙ্ সোউ (১৫১৫)=জল সা, থজাত (১৫১৫-২১)=ইলি সা (পৃ. ৪১)। মেঙ্-বেঙ্‌ (১৫৩১-৫৩)=শ্রীসূর্য্য-চন্দ্র-মহা-ধর্ম্ম-রাজা=জোক্‌পৌক্ সা পৃ. ৪৪)। সিকান্দর শাহ প্রভৃতি পরবর্ত্তী নামত্রয় প্রসিদ্ধ আছে। ডঃ হকৃকৃত আরাকান-রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য পৃ. ৬ ও *J.R.A.S.B.* 1945, p. 34 দ্রষ্টব্য।

উজীরগণ অবাধে আরাকানের সহিত আদান-প্রদান চালাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে সন্দেহ নাই। ১৬শ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই চাটিগ্রামের অন্তর্গত চক্রশালার যবনরপতি "রাজা জয়চন্দ" সভাপণ্ডিত ভবানীনাথ দ্বারা "লক্ষণ-দিগ্বিজয়" রচনা করাইয়াছিলেন।* রাঢ়ীয় সম্রান্ত শ্রোত্রিয় বংশীয় "দ্বিতীয়" বিপ্র জটাধর এই সময়েই কেশীনদীর নিকটে চাটিগ্রামের অন্তর্গত 'দেবগড়' গ্রামে "অভিধানতন্ত্র" নামক উৎকৃষ্ট কোষ রচনা করিয়াছিলেন।

১৫১৩ সনে বিখ্যাত ত্রিপুরনরপতি ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-২৬) প্রথম চাটিগ্রাম জয় করেন। হুসেন শাহার সহিত ধন্য-মাণিক্যের যুদ্ধবার্ত্তার বিবরণ রাজমালার দ্বিতীয় লহরে মুদ্রিত হইয়াছে (মূলের পৃ. ২২-২৮)। ধন্যমাণিক্যের ১৪৩৫ শকাব্দের "চাটিগ্রাম-জয়ি" মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই বিবরণের প্রামাণিকতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। হস্তলিখিত প্রাচীন রাজমালার পাঠ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় রাজমালার এই অংশের রচয়িতা ধন্যমাণিক্যের মুদ্রা দেখিতে পাইয়াছিলেন :—

শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা চাটিগ্রাম চলে
চৌদ্দস পাঁচত্রিস সকে নিজ বাহুবলে ।
'চাটিগ্রামবিজই' বলি মোহর মারিল।
গৌড়েশ্বরের সভ সব ভঙ্গ দিয়া গেল। (২১ পত্রে)

ধন্যমাণিক্যের বিরুদ্ধে অতঃপর দুইটি অভিযান প্রেরণ করিয়া হুসেন শাহ বিফল হইয়াছিলেন—প্রথমটির নেতা ছিলেন "গোরাই মল্লিক", সঙ্গে ছিল "বহুতর ভরিবর গোমন্তি কারণ"।+ ১৪৩৬ শকে ধন্যমাণিক্য কর্ত্তৃক চাটিগ্রাম পুনর্বিজিত হয়। এই সময়ে আরাকানরাজ হীনবল ছিলেন, নতুবা ধন্য-মাণিক্যের সেনাপতি কি করিয়া—

রাযূ আদি হয় সীক মারিয়া লইল।
রসাংক নিকটে যাইয়া পুকরিণি দিল।
রসাংক মারিতে গিয়াছিল সেনাপতি।
সেই হতে রসাংকমর্দ্দন নাম খ্যাতি। (ঐ)

পরে হুসেন শাহার সেনাপতি হৈতন খাঁ "সরালি"র পথে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। চাটিগ্রামের উপর ত্রিপুরার আধিপত্য "দিগ্বিজয়ী" অমরমাণিক্যের রাজত্বকাল (১৫৭৭-৮৬) পর্য্যন্ত অটুট ছিল। অমরমাণিক্যের ১৫০২ শকের "দিগ্বিজয়" মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ১৫১৭ সন হইতে পর্ত্তুগীজগণও ক্রমশঃ চাটিগ্রামে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। ১৫৮৬ সনে দুর্দ্দান্ত মগনরপতি সিকান্দর সাহ অমরমাণিক্যকে পরাজিত করিয়া রাজধানী উদয়পুর অধিকার করেন এবং অমরমাণিক্য আত্মহত্যা করেন। এই শোচনীয় রসাঙ্গযুদ্ধের তথ্যপূর্ণ বিবরণ রাজমালা তৃতীয় লহরে (মূল ২৭-৪৯) মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সত্যগোপনের কিছুমাত্র চেষ্টা করা হয় নাই, যদিও উজীর দুর্গামণি প্রাচীন রাজমালা সংশোধন করিতে গিয়া নানাবিধ ভ্রমাত্মক উক্তি করিয়াছেন। আরাকানের পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসেও 'ম ঙ্-পরাজয়ের' কথঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ৯০-২), তন্মধ্যে অনেক নূতন কথা পাওয়া যায়। অমরমাণিক্যের সৈন্য মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ফিরিঙ্গির উল্লেখ দৃষ্ট হয়—

ফেরেঙ্গি সকল চলে নৌকাতে ভরিয়া (প্রাচীন রাজমালা ৪০ পত্র)। এই যুদ্ধকালেই মগ-ফিরিঙ্গির মিলনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহারও আভাস রাজমালায় পাওয়া যায় :—

ত্রিপুরের সভ দেখী মগে ভঙ্গ দিল।
ফেরেঙ্গির সঙ্গে মগে প্রীত আরম্ভিল। (ঐ)

এই যুদ্ধে অমরমাণিক্য অপূর্ব্ব ক্ষাত্র তেজ দেখাইয়া পরাজয়ের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তদীয় শরণাগত মগবিদ্রোহী আদম সাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্বেও মগরাজার হস্তে সমর্পণ করেন নাই। অমরমাণিক্যের এই কীর্ত্তি চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই পরাজয় রাজার কিরূপ মর্ম্মঘাতী হইয়াছিল তাঁহার খেদোক্তিতে তাহা ব্যক্ত হয় :—

সর্ব্বকালে ত্রিপুরে নি মগধ জিনিল।
অমরমাণিক্যকালে ত্রিপুরে হারিল। (ঐ ৪৭ পত্র)

এই ঘটনার পর মগ-ফিরিঙ্গির অত্যাচারে বাধা দেওয়ার একটি প্রবল শক্তি তিরোহিত হইল, কিন্তু তখনও ঈশা খাঁ, কেদার রায়, গন্ধর্ব্বমাণিক্য প্রভৃতি বারভুঁঞার মহারথীগণ জীবিত থাকিয়া অত্যাচার স্রষ্টির অন্তরায় হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। এই শেষ অন্তরায়ও মানসিংহ ও ইস্‌লাম খাঁর বিজয় অভিযানে নির্ম্মূল হইলে মগরাজা সলীম সা, হুসেন সা প্রভৃতিরা একান্ত ভাবে দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ

---

* বাঙ্গলা সাহিত্যের সমস্ত ইতিহাসে রাজা জয়চন্দ ও ভবানীনাথের বিবরণ ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়া আছে—পৃথক্ প্রবন্ধে তাহার সংশোধন আবশ্যক। জটাধরের পরিচয় শ্লোক এই :— ভাগীরথীং ভলমরীং জগতামধীশং, যশোদমীরঘুপতী পিতরৌ চ নত্বা। দ্বিতীয়বিপ্রকুলজঃ স জটাধরোসা-রাচার্য্য এতদকরোদ-ভিধানতন্ত্রম্। শ্রীচন্দ্রশেখর-গিরিপ্রভবাম্ভি চাটি-গ্রামে কণীতি তটিনী নিকটেহদসীয়ে। উৎপত্তিভূমিরপি দেবকড়াভিধানো, গ্রামোস্তি যস্য পিতৃভূমিরতিপ্রসিদ্ধঃ। জটাধরের বংশ ও "অতি-প্রসিদ্ধ" জন্মস্থান বহুকাল নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। অথচ তাঁহার গ্রন্থ বাঙ্গলায় সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল। ভরত মল্লিকের মাঘ টীকায় আমরা জটাধরের বচন উদ্ধৃত পাইয়াছি।

+ গোরাই মল্লিক নিঃসন্দেহ তৎকালীন মুসলমান চাটি-গ্রামপতির আত্মীয় "Gromalle"-এর সহিত অভিন্ন। (Campos : *Portugese in Bengal*, p. 28) তাঁহার প্রকৃত নাম পর্ত্তুগীজ ও বাঙ্গলা বিকৃতি হইতে উদ্ধার করা কঠিন, সম্ভবতঃ করমুল্লা। তাঁহার নামে একটি গড় ছিল এবং কালক্রমে এই "করমুল্লার গড়" হইতেই Komulla ও বর্ত্তমান কুমিল্লা নগরীর নামকরণ হইয়াছে। ইহা কেবল কল্পনা নহে, ১৮৭৫ সনে মুদ্রিত ভগবচ্চন্দ্রবিশারদ রচিত "ত্রিপুরা সংবাদঃ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে (পৃ. ৫-৬) "কমিল্লানামপুর বিবরণ"-পরিচ্ছেদে অতি কৌতুক-জনক প্রবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—"আসীৎ পুরৈকস্ত্রিপুরানিবাসী, কমিল্লনাম্না যবনো মহীয়ান্।" ইত্যাদি।

ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গ নবাবের আরাকান অভিযান ব্যর্থ হইলে (বহারিস্তান, পৃ. ৬৩২-৩) দীর্ঘ ৪০ বৎসর (১৬২৫-৬৬) ধরিয়া মগ-ফিরিঙ্গির অত্যাচারলীলা চরমসীমায় পৌঁছিয়াছিল। আরাকানের পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসে মগরাজা সলীম সার ১১ রাণীর পরিচয় দেওয়া আছে (পৃ. ১৬৪)। তন্মধ্যে চাটিগ্রামপতির কন্যা ও 'মু-ডু-মেড্' অর্থাৎ ত্রিপুররাজের কন্যা ছাড়া একটি বিস্ময়কর নাম আছে "শ্রীপুরের রত্না রায়ের ভগিনী সুন্দরী" (থিরিপুত-চা রত্নারে নম শুন্দরে)। সলীম সা শ্রীপুরের কেদার রায়ের সমকালীন ছিলেন এবং আকবরনামায় লিখিত আছে (৩।১২৩৫ পৃ.) শ্রীপুরপতি ও মগরাজা একযোগে সপ্তগ্রাম আক্রমণ করিয়াছিলেন। মগরাজার সহিত কেদার রায়ের প্রীতিমিলন যে সামাজিক বন্ধনে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল, আরাকান-ইতিহাসের উক্তি সত্য হইলে, তাহার এক আশ্চর্য্যকর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইল। সলীম সার দুর্দ্দমনীয় পরাক্রম এতদ্দ্বারা বিশেষভাবে সূচিত হয়।

বাঙ্গলার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার মগের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। এই সূত্রে তৎকালে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার নাম মগদোষ। কুলপঞ্জীতে এই মগদোষের বিবরণ মধ্যে ঘটকগণ অজ্ঞাতসারে বহু করুণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই জাতীয় ঐতিহাসিক উপকরণ অন্য কোন গ্রন্থাদিতে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমরা উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিবরণ এখানে যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; ছয়টি বৃহদাকার হস্তলিখিত কুলগ্রন্থ হইতে ইহা সংগৃহীত হইল।* বর্ত্তমান যুগের সামাজিক প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধনে ইহাদের কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই এবং তজ্জন্য মুদ্রিত কুলগ্রন্থে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই।

১। 'বন্দ্যঘটী' অর্থাৎ বাঁড়ুয্যে বংশবৃক্ষের একটি প্রসিদ্ধ শাখা "সাগরদিয়া" নামে পরিচিত। এই শাখায় "জহু" প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন। তাঁহার এক পৌত্র (বলভদ্রের পুত্র) শ্রীপতির নাম পর্য্যন্ত ধ্রুবানন্দ উল্লেখ করিয়াছেন (মহাবংশাবলী পৃ. ১৩৬)। অর্থাৎ শ্রীপতি ১৫০০ সনে জীবিত ছিলেন। তাঁহার এক প্রপৌত্র রামচন্দ্রের কুলবিবরণ মধ্যে পাওয়া যায়:

"ততো বিষ্ণুপ্রিয়ানাম্নী কন্যা যবনেন নীতা সর্ব্বনাশাভাদিঃ"
(সাকা ৯৩।১, হুগলী ৮০।১)

এই ঘটনা ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে (১৬০০-৫০ সনে) পড়ে। রামচন্দ্রের বাড়ী কোথায় ছিল জানা যায় না। "রামচন্দ্রে শুভবিবাহ বিত্তালঙ্কারস্য কন্যা" এই উক্তি দেখিয়া অনুমান হয় নদীয়া কি যশোহর অঞ্চলে তাঁহার বাড়ী ছিল কারণ নদীয়া-যশোহরই গুড়গ্রামী শ্রোত্রিয়বংশের প্রধান সমাজ ছিল।

২। উক্ত রামচন্দ্রের এক ভ্রাতার নাম রাঘব। তাঁহারও "শুভবিবাহ ভবানীদাস চক্রবর্ত্তীনঃ কন্যা" সুতরাং তিনিও একই অঞ্চলের লোক। তাঁহার ৮ পুত্রের মধ্যে চতুর্থ চাঁদ, তিনি সদ্বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন—"চাঁদস্য পিতৃতন্ত্রকালে সুং যাদবেন্দ্র রায়স্য কন্যাবিবাহ অত্র সাধুঃ, পশ্চাৎ যবনে নীতা" (সাকা ৯৩।২, হুগলী ৮০।২)। তাঁহার বাকী চারি ভ্রাতাকেও যবনে লইয়া যায়—"চাঁদ বিনোদ রাজারাম যদু মধু যবনে নীতাঃ" (ঐ, ঐ)। কেবল তাহাই নহে, ইঁহাদের তিন ভগ্নীকেও যবনে লইয়াছিল, অর্থাৎ এক বাড়ী হইতে ৫ ভাই ও ৩ ভগ্নী যবনের কবলে পতিত হয়।

"ততঃ রূপা-মণিরূপা-কর্পূরমঞ্জরী এতাঃ কন্যাঃ যবনেন নীতা সর্ব্বনাশাভাদিঃ।" (ঐ,ঐ) তৎকালীন সম্ভ্রান্ত কুলীন পরিবারে মেয়েদের কিরূপ সুরুচিসম্পন্ন নাম রাখা হইত তাহারও একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এখানে কুলগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিষ্ণুপ্রিয়া নামটি মাত্র প্রচলিত দেখা যায়।

৩। সাগরদিয়াবংশেই ফুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন "রঘুরাম চক্রবর্ত্তী" ঐ সময়ের লোক। তাঁহার বংশধরগণ বাঙ্গলাদেশের নানা স্থানে এখনও সসম্মানে বাস করিতেছেন। তাঁহার কুলবিবরণে একটি মাত্র পুঁথিতে পাওয়া যায়,

"ততঃ পশ্চাৎ কন্যা যবনেন নীতা ইতি কেচিৎ" (কামাল বন্দ্য প্রকরণ ৪৫।২)। ইহা অন্য কোন পুঁথিতে নাই বলিয়া মনে হয় অমূলক প্রবাদ মাত্র।

৪। সাগরদিয়াবংশে খড়দহমেলের প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন ভগীরথপুত্র শ্রীমন্ত (মহাবংশাবলী পৃ. ১৩৩)। শ্রীমন্তের প্রপৌত্র কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে লিখিত আছে—"কৃষ্ণচরণস্য কিয়াদি অপবাদঃ বিক্রমপুর কাঁটালতলি গ্রামে।" (জয়ন্তী ৩৭৪।১) কৃষ্ণচরণের বংশ এখনও নানা স্থানে সসম্মানে বিদ্যমান আছে। মতান্তরে ঐ অপবাদ কৃষ্ণচরণের ভাই রামদেবের সম্বন্ধে ছিল,

"রামদেবস্য কামাদিতে নীতা যবনসম্পর্কঃ" (কামাল, বন্দ্য প্র, ৪১।২)। রামদেব নিঃসন্তান ছিলেন। একটি গ্রন্থে

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় বহু কুলগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটি শ্রেষ্ঠ। ২১০২ সংখ্যক পুঁথির পত্র সংখ্যা ৬১৮ অর্থাৎ ১২৩৬ পৃষ্ঠা এবং বৃহদাকার। মুদ্রিত করিলে প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠার এক বিরাট গ্রন্থ হয়। ইহা সাকা-ডাঙ্গার কুলাচার্য্য রামহরি তালুকদারের গৃহে ১২১০-১ সনে লিখিত। (সংক্ষেপে "সাকা" নামে উদ্ধৃত) ৭৮৭ সং পুঁথির পত্র সংখ্যা ৬৬৯, লিপিকাল ১৭২০ শক ('পরিষৎ' নামে উদ্ধৃত)। ১৮১৫ সং পুঁথির পত্রসংখ্যা ৪৮৪ ('চেতলা' নামে উদ্ধৃত, চেতলার এক ঘটক পরিবারের পুঁথি)। এক শত বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জজ কোর্টে একটি পুঁথি এক মোকদ্দমায় দাখিল হইয়াছিল—পত্র সংখ্যা ৪৫৬। বর্ত্তমানে ইহা শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট রক্ষিত আছে ('হুগলি' নামে উদ্ধৃত)। আমাদের নিকট ৫৫৮ পত্রের একটি পুঁথি আছে—যশোহর জয়ন্তীপুর ঘটক সম্প্রদায়ের পুঁথি ('জয়ন্তী' নামে উদ্ধৃত)। বর্দ্ধমান জিলার কামাল গ্রামের ঘটক সম্প্রদায়ের একটি পুঁথি বোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল মহাশয়ের কৃপায় পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম—ইহা 'কামাল' নামে উদ্ধৃত। প্রত্যেক পুঁথিতেই কিছু কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়, যাহা অপর পুঁথিতে অপ্রাপ্য।

কৃষ্ণচরণ-স্বামীর একটি সমসাময়িক কারিকায় অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে :—"

"কৃষ্ণচরণ মধ্যঘর, পাইয়া ফিরিঙ্গির ডর, কাঁঠালতলা করি পরিত্যাগ।" (ঢেক্ষলা ; ৬৫।২)

৫। চট্টবংশের একশাখা "বনো" চট্টনামে পরিচিত। এই বংশে শ্রীনাথের পুত্র গোবিন্দ খোঁড় হইতে বন্দ্যঘটীদের একটি ভাগ "গোবিন্দ খোঁড়ী" নাম লাভ করে। তাঁহার এক পৌত্র যোকড়ি সম্বন্ধে লিখিত আছে—"যোকড়ি মগেন নীতঃ" (পরিষদ ৩১১।১), "যোকড়িকস্ত ততো মগে প্রবেশঃ" (জয়ন্তী ৩১৩।১)। যোকড়ির বংশ বিদ্যমান নাই।

৬। উক্ত গোবিন্দ খোঁড়ের ভ্রাতা গদাদাসের এক প্রপৌত্র শ্রীকৃষ্ণ "মগে গতঃ" (পরিষদ ৩০১।১), অথবা "মগাক্রান্তঃ" (জয়ন্তী, ৩১২।১)। একটি পুথিতে কিছু বিবরণ আছে—"শ্রীকৃষ্ণো মগেন নীতঃ, পুনশ্চ গৃহমাগতঃ চিরদিনাৎ পরং, তৎপুত্রো মহাদেবো ব্যবহারকর্ত্তার। তত(ঃ) শ্রীকৃষ্ণো মৃত, অন্ত্যেষ্টিকার্য্যশ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা মহাদেবো জাতিহীন" (কামাল, চট্টপ্রকরণ, ৭।১-২)। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বহুকাল পরে মগের কবল হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পুত্র মহাদেব তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া এবং মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি করিয়া "জাতিহীন" হইয়াছিলেন। মহাদেবের বংশ বহুকাল বিদ্যমান ছিল। প্রথম উক্তিদ্বয়ে জাতিহীনতার প্রসঙ্গ নাই।

৭। অবসথী চট্টবংশীয় রবিকরপ্রকরণে গোবিন্দের পুত্র রমেশ (অথবা রামশরণ) সম্বন্ধে লিখিত আছে—"ততঃ পত্নী মগে নীতা" (হুগলী, ৩৪৩।২), "রমেশ চক্রবর্ত্তিনঃ পত্নী মগেন নীত" (জয়ন্তী, ২৫১।১)। একটি গ্রন্থে লিখিত আছে, এই পত্নী ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার কৌতুকজনক বৃত্তান্ত আমরা বিনা অনুবাদে উদ্ধৃত করিতেছি—"রামশরণস্য স্ত্রী হরিহরস্য কন্যা মগেন নীতা পিপ্পলী বন্দরে বিবাহিতা। সা কন্যা পুনরপি শান্তিপুরে আগতা রামশরণ গৃহে। তেন রামশরণেন গর্ভঃ কৃতঃ, সা পুনরপি মাটিয়ারিতে স্থিতা জনাপবাদ ইত্যাচার্য্যং" (কামাল, অবসথী প্রকরণ, ১৬।২)। বুঝা যায় মগের দৌরাত্ম্য মাটিয়ারি ও শান্তিপুর পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছিল। পিপ্পলী বন্দর মেদিনীপুরে সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল। মগেরা বন্দি-বন্দিনীদিগকে এখানে বিক্রয় করিত ("a place where captives were sold"—*Bengal : Past & Present* XIII. p. 39)।

৮। মুখবংশে কামদেব পণ্ডিতের ধারায় গৌরীকান্তের পুত্র পরমানন্দের "মগকবলদোষঃ" (জয়ন্তী ১৫৬।২), "পরমানন্দো মগেন নীতঃ" (কামাল, মুখবংশ, ৯।২)।

৯। উক্ত কামদেব পণ্ডিতের সন্তান বিশ্বনাথের পুত্র গণেশের সম্বন্ধে লিখিত আছে—"পশ্চাৎ কন্যা মগে নীতা সর্ব্বনাশঃ।" (সাকা ৫১৩।২, হুগলী ২৮৯।২)

১০। গাঙ্গুলীবংশে রামনাথের পুত্র রামেশ্বরের সম্বন্ধে লিখিত আছে—"ততোঽস্যা কন্যা মগেন নীতা, সর্ব্বনাশাজ্জাতিঃ।" (হুগলী, ৪৩৭।২)

১১। কাঞ্জীবংশে নীলকণ্ঠের পুত্র গোপীকান্তের "কন্যা হারমাগেন নীতা" (পরিষদ্ ৩৬৩।১)।

১২। কাঞ্জীবংশেই দামোদরের এক বৃদ্ধপ্রপৌত্র রমাপতির "ভক্তিবিবাহঃ, ততোঽস্যা কন্যা মগেন নীতা অত্র সর্ব্বনাশঃ।" (ঐ, ৩৬৪।১)।

১৩। আমাদের নিকট ঘটককেশরীর একটি কুলপঞ্জী আছে, পত্রগুলি গলিতপ্রায়। বনো-চট্টবংশের বিবরণে রাজীব চক্রবর্ত্তীর পুত্র শিবরাম চক্রবর্ত্তীর কৌতুকজনক বিবরণ আছে—"ইমং মগেন নীত্বা গতং, পশ্চাৎ মুদ্রাং দত্ত্বা আনিত্যবান্ বৈদ্যেন নীতঃ মগাবাসে যতদিনং ব্যাপ্য স্থিতং" (৫।২ পত্র)। অর্থাৎ মগেরা তাঁহাকে নিয়া বহুদিন রাখিয়াছিল, এক বৈদ্য মুদ্রা দিয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া লয়।

১৪। বনো-চট্টবংশীয় রাঘবপুত্র নারায়ণ নপাড়ীবন্দ্যবংশীয় রামচন্দ্রের পুত্র রঘুনন্দনের সহিত কুল সম্বন্ধ করিয়া "মগদোষ" প্রাপ্ত হন। কারণ, "বং রামচন্দ্রে মগে নীতা পলাইতবান্, জাতিভ্রংসো ন ভবতি, স্পর্শদোষে দুষ্টো ভবতি।" (সাকা ২৬৬।২)

কুলগ্রন্থে এই জাতীয় বহু মগদোষের উল্লেখ খুঁজিয়া বাহির করা যায়। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের প্রতিপাদ্য কেবল কুলীনদের কুলকথা, বংশজ ও শ্রোত্রিয়ের বিবরণ এই সকল গ্রন্থে নাই। অর্থাৎ বঙ্গের বিশাল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশের বিবরণ মধ্যেই উদ্ধৃত কথা পাওয়া যাইতেছে। সমগ্র বাঙ্গালীর মধ্যে সহস্রগুণ অত্যাচার যে সাধিত হইয়াছিল সহজেই অনুমান করা যায়। এই ভীষণ অত্যাচারের সময়েও নিম্নবঙ্গ হইতে জনসাধারণ বাড়ীঘর ছাড়িয়া বহুসংখ্যায় অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্গীর হাঙ্গামার সময়েও প্রায় কেহই চিরকালের জন্য পশ্চিম বঙ্গ ত্যাগ করিয়া যান নাই, কেবল সাময়িকভাবে অনেকে পলাইয়া গিয়াছিল।

মগদোষের উদ্ধৃত বিবরণসমূহে তৎকালীন সামাজিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। সর্ব্বনাশ ও জাতিনাশ শব্দের উল্লেখ দেখিয়া কেহ যেন ভ্রান্ত ধারণা না করেন। এই দুইটি শব্দ অতি সামান্য কারণেই আদর্শবাদী কুলাচার্য্যগণ প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় প্রয়োগ করিয়াছেন। বংশজের কন্যাগ্রহণ কিম্বা শ্রোত্রিয়ে কন্যা দান করিয়া বহুতর কুলীনের এইরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে। উদ্ধৃত শেষ ঘটনায় "জাতিভ্রংসো ন ভবতি" উক্তি প্রণিধানযোগ্য। কুলাচার্য্যগণ আদর্শবাদী হইলেও উচিত স্থলে উদারতা দেখাইতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ইহাই সমাজের সজীবতার লক্ষণ।

প্রকৃতি কি সত্যই নিষ্ঠুর?

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এই বিচিত্র জীব-জগতের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পরের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধটা অতিমাত্রায় পরিস্ফুট। আশেপাশে যে দিকে চোখ ফিরাই, সর্ব্বত্রই কেবল হানাহানি, রক্তারক্তির ব্যাপার নজরে পড়ে। বিড়াল ইঁদুরকে তাড়া করে; সাপ ব্যাঙকে উদরস্থ করে; হিংস্র পশুরা নিরীহ প্রাণী হত্যা করিয়া উদর পূরণ করে। নিম্নস্তরের কীট-পতঙ্গদের মধ্যেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই একই অবস্থা—ছলে, বলে, কৌশলে একে অন্যকে হত্যা করিয়া জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া লইতেছে। ইহার মধ্যে দয়া-মায়ার স্থান নাই। একের

সাপের কবলে পড়িয়া মুরগীর অবস্থা। এক চাপেই মুরগীর হাড়গোড় চূর্ণ হইয়া যায়

দেহ উদরসাৎ করিয়া অন্যের পুষ্টিসাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে—প্রকৃতির এই অলঙ্ঘ্য বিধান। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অপরের রস-রক্ত আহরণ এবং প্রবলের কবল হইতে দুর্ব্বলের বাঁচিবার উপায় অবলম্বন—ইহাই হইতেছে জীবন-সংগ্রামের একটা বৃহত্তর দিক। এই দিক দিয়া অভিব্যক্তির ধারায় জীব-জগতে বহু বৈচিত্র্য এবং যোগ্যতমের উদ্বর্তন সম্ভব হইয়াছে।

জীব-জগতের অভিব্যক্তি বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিধান সম্পর্কে আমাদের দায়িত্ব না থাকিলেও যে কারণেই হউক দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের মধ্যে সহানুভূতিমূলক একটা বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে। এই সহানুভূতির দিক হইতে প্রকৃতির রাজ্যের হানাহানি, কাটাকাটির ব্যাপারগুলি আমাদের কাছে গুরুতর নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক এবং পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। মানুষও যুক্তি করিয়া নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের নানা রকম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। এখন কথা হইতেছে—মানুষ বুদ্ধি-কৌশলে যে সকল নিষ্ঠুরতার অবতারণা করিয়া থাকে প্রকৃতির রাজ্যে এই হানাহানির মধ্যে সেরূপ কোন নিষ্ঠুরতার ব্যাপার ঘটে কি না।

বিভিন্ন ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে—প্রকৃতির রাজ্যে হানাহানি, কাটাকাটির মধ্যেও মনুষ্য-পরিকল্পিত নিষ্ঠুরতার সমতুল্য কোন গুরুতর নিষ্ঠুরতার স্থান নাই। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ মার্টিনার ব্যাটেন লিখিয়াছেন—তিনি একজন বিশিষ্ট শিকারীকে জানিতেন। দৈবক্রমে একবার এই শিকারী এক বাঘিনীর কবলে পড়েন। বাঘিনী তাহাকে জঙ্গলের মধ্যে বাচ্চাদের নিকটে লইয়া যায়। বিড়ালের বাচ্চারা যেমন ইঁদুর লইয়া খেলা করে বাঘিনীর বাচ্চাগুলিও সেইরূপ শিকারীকে লইয়া ঘণ্টাখানেকের বেশী সময় ধরিয়া খেলা করিতে থাকে। যত বারই শিকারী হামাগুড়ি দিয়া পলাইবার চেষ্টা করে ততবারই বাঘিনী তাহাকে বাচ্চাদের কাছে টানিয়া লইয়া আসে। এইরূপ ব্যাপার চলিবার সময় শিকারীর দলবল খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ভয় পাইয়া বাঘিনী শিকারীকে তুলিয়া লইয়া পলাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু চতুর্দ্দিকে লোকজনের হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে বেগতিক দেখিয়া শিকারীকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করে। শিকারী প্রায় অক্ষত দেহেই সে যাত্রা বাঁচিয়া যায়। শিকারী তাঁহার অভিজ্ঞতার বর্ণনায় বলিয়াছেন—বাঘিনীর কবলে পড়িয়া আমার যে মানসিক অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি বিষয় পরিষ্কার মনে আছে। বাঘিনীর নিকট হইতে হামাগুড়ি দিয়া পলাইয়া আসিবার জন্য আমার মানসিক শক্তি যেন ক্রমশঃই অত্যুগ্র হইয়া উঠিতেছিল। মনে তখন আমার ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। ভয়-ডরের বোধশক্তিই যেন মন হইতে লোপ পাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু দিনের আলো, চতুর্দ্দিকের গাছপালা এবং নিজের গুরুতর বিপজ্জনক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিভ্রম ঘটে নাই। দৈহিক বা মানসিক কোন যন্ত্রণাও অনুভব করি নাই। দাঁত তোলাইবার জন্য ডেন্টিস্টের চেয়ারে বসিয়া অনাগত বিপদের আশঙ্কায় যতটা মানসিক উদ্বেগ বা যন্ত্রণা অনুভব করা সম্ভব তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

রোগাক্রমণে অথবা কোন দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর প্রায় শেষ সীমায় উপনীত হইয়াও কোনক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন এরূপ অনেকের অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে, ঐরূপ সঙ্কটজনক

অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে মানসিক অবস্থার এমন একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে যেখানে ভয় এবং যন্ত্রণাবোধ সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হইয়া যায়। এরূপ চরমক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মেই মন এমন একটা সম্মোহিত অবস্থায় উপনীত হয় যেখানে দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-

কালো রঙের জল-পোকার বাচ্চা, ছোট একটা বাণমাছকে দাঁত ফুটাইয়া অসাড় করিয়া রক্ত চুষিয়া খাইতেছে

যন্ত্রণা বোধের প্রশ্নই উঠে না। বোধশক্তি মনের। জ্বালা-যন্ত্রণার অনুভূতি জাগে মনে, মন নিষ্ক্রিয় হইয়া গেলে যন্ত্রণা অনুভব করিবে কে? মনুষ্যেতর প্রাণীদের তুলনায় মানুষের মন অতি-মাত্রায় সচেতন এবং তাহার প্রসারতাও অসম্ভব রকমের বেশী। একটা ইঁদুরের মন মানুষের মনের তুলনায় অতি নগণ্য ব্যাপার মাত্র। কাজেই একথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে—বাঘের কবলে পড়িয়া মানুষকে যদি যন্ত্রণা ভোগ না করিতে হইয়া থাকে তবে বিড়ালের কবলে পড়িয়া ইঁদুরের অতি-সামান্য যন্ত্রণা ভোগ করিবারই কথা।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে—উদরসাৎ করিবার পূর্ব্বে শিকারীর দন্ত, নখরাঘাতে শিকার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠে কি না। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—এরূপ অবস্থায় যন্ত্রণা অনুভূত হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার মাত্র। গুরুতর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকার স্নায়বিক অসাড়তা সর্ব্ব-শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শিকারীর সম্মুখীন হইবামাত্র আঘাত করিবার পূর্ব্বেই কোন কোন ক্ষেত্রে আবার শিকার ভয়ে সম্পূর্ণ অসাড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হওয়া বা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ঘটনাও বিরল নহে। স্নায়বিক আঘাত, রক্তমোক্ষণ বা মানসিক দুশ্চিন্তা প্রভৃতি যে কোন কারণে সংজ্ঞাহীনতা বা অসাড়ত্ব ঘটুক না কেন ইহা যে প্রাকৃতিক করুণার নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। জীব-জগতে যেদিন হইতে পরস্পরের প্রতি এই শত্রুতার উন্মেষ ঘটিয়াছে সেই দিন হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মে সংজ্ঞাহীনতা বা অসাড়ত্ব উৎপাদনে দুঃখ, কষ্ট, যাতনা বোধ তিরোহিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবামাত্র মন হইতে ভয়ের ভাব কাটিয়া যায় এবং শরীরের যন্ত্রণাবোধ থাকে না অথচ আত্মরক্ষার্থ প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে খাদ্য উদরসাৎ করিবার প্রক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। সে সকল ক্ষেত্রে বিষপ্রয়োগে স্নায়বিক অবসাদ ঘটাইয়া বোধশক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। নিম্ন-স্তরের প্রাণীদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়।

আমাদের দেশে পুকুর, খাল, বিল প্রভৃতি অগভীর জলাশয়ে গুবরে পোকার মত বড় বড় একরকমের কালো রঙের জল-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় ইহাদের বাচ্চা-গুলিকে বড় রকমের মশার বাচ্চার মত মনে হয়। দিন দশ-

কুমীর মাছ শিকার করিয়াছে। সুদৃঢ় চোয়ালের এক আঘাতেই মাছের সর্ব্বশরীরে অসাড়তা ছড়াইয়া পড়ে, তখন আর যন্ত্রণাবোধ থাকে না

পনেরর মধ্যেই বাচ্চাগুলি প্রায় তিন ইঞ্চির বেশী লম্বা হইয়া যায়। শরীরের মধ্যাংশ বেশ মোটা কিন্তু মাথা ও লেজের দিকটা খুবই সরু। মাথাটা চেপ্টা এবং মুখের দুই দিকে দুইটি বাঁকানো সাঁড়াশীর ফলা। ইহারা মনোরম ভঙ্গীতে হেলিয়া-দুলিয়া জলের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। লেজটাকে

উপরের দিকে প্রসারিত করিয়া জলনিমজ্জিত ঘাসপাতার মধ্যে শিকারের আশায় নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করে। মাছ বা অন্য কোন প্রাণী নিকটে আসিলেই অকস্মাৎ ছুটিয়া গিয়া সাঁড়াশীর সাহায্যে চাপিয়া ধরে। আততায়ীর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য শিকার প্রাণপণে চেষ্টা করে বটে; কিন্তু তাহা কেবল এক-আধ মিনিটের জন্য। দেখিতে দেখিতেই সে যেন ঝিমাইয়া পড়ে এবং নড়াচড়া করিবার ইচ্ছাই যেন লোপ পায়। কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস-প্রক্রিয়া সমানভাবেই চলিতে থাকে। মাইক্রোস্কোপের পরীক্ষায় দেখা যায় শিকারীর সাঁড়াশী দুইটি সাপের বিষ-দাঁতের মত ফাঁপা, এবং তাহাদের গোড়ায় বিষের গ্রন্থি রহিয়াছে। সাঁড়াশী দিয়া চাপিয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই সূক্ষ্ম

সাপ ও বেজীর লড়াই। সুবিধা পাইলেই বেজী এমন ভাবে সাপের ঘাড় কামড়াইয়া ধরে যে সঙ্গে সঙ্গেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বেশীক্ষণ তাহাকে যাতনা ভোগ করিতে হয় না

ছিদ্রপথে বিষ আসিয়া শিকারের সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হয় এবং তাহার বোধ-শক্তি রহিত করিয়া ফেলে। এই পোকাগুলি শিকারের রসরক্ত চুষিয়া খায় এবং ইহাতে দীর্ঘ সময় লাগিয়া থাকে। প্রথম আঘাতের ফলে মৃত্যু ঘটিলে রক্ত জমাট বাঁধিয়া যাইবার সম্ভাবনা; তখন রক্ত চুষিবার সুবিধা হয় না। কাজেই প্রাকৃতিক বিধানেই যেন শিকারকে জীবিতাবস্থায় অসাড় করিয়া তাহার জ্বালা-যন্ত্রণা উপশমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কলিকাতার আশপাশে খাল, বিল, নালা-ডোবায় মেছো-মাকড়সার অভাব নাই। ইহারা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জলের উপর বিচরণ করে; পোকামাকড় শিকার করে এবং সুবিধা পাইলেই মাছ ধরিয়া খায়। কাচের চৌবাচ্চায় মাকড়সাগুলিকে পুষিয়া তাহাদের মৎস্য-শিকার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মাছ ধরিবার আশায় ইহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মাছ দেখিতে পাইলেই বিদ্যুৎ-গতিতে তাহার উপর পড়িয়া ঘাড়ের কাছে সাঁড়াশীর মত দাঁত দুইটাকে বিঁধাইয়া দেয় এবং প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট চাপিয়া ধরিয়া থাকে। দুই-চার সেকেণ্ড লাফালাফি করিয়াই শিকার নির্জীব হইয়া পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ দম লইবার পর শিকারকে চিবাইয়া মণ্ডের ডেলার মত তৈয়ারী করে এবং ধীরে ধীরে রস চুষিয়া খায়। এক্ষেত্রেও বিষ-প্রয়োগেই শিকারকে অসাড় করিয়া রাখা হয়। চৌবাচ্চার মধ্যে একবার একটি সুবর্ণরেখা মাছের উপর শিকারী মাকড়সা ঝাঁপাইয়া পড়ে। যে কারণেই হউক, ঘাড়ের কাছে না ধরিয়া মাছটার শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে সাঁড়াশী বিঁধাইয়া দেয়। মাছটা ছিল মাকড়সাটার অপেক্ষা বড়; কাজেই দুই-চার ঝটকানিতেই মাকড়সার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিল। কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ্য করিলাম সেই মাছটার লেজের দিকটা যেন ক্রমশঃই সাদা এবং অবশ হইয়া উঠিতেছে। প্রায় মিনিট পনের পরে মাছটাকে ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম শরীরের একপাশে বেশ ক্ষত রহিয়াছে বটে, কিন্তু বেশী গভীর নহে। ক্ষতের পর লেজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ সাদা হইয়া গিয়াছে এবং সে অংশটা সুস্থ অংশের মত কোমল বা নমনীয় নহে। এই অংশে ইলেকট্রো-থার্মেল ষ্টিম্যুলাস্ প্রয়োগে তেমন কোন সাড়া পাওয়া গেল না অথচ এই উপায়ে সুস্থ অংশে প্রবল উত্তেজনা লক্ষিত হয়। আংশিক ভাবে মাকড়সার বিষ সঞ্চালনের ফলেই যে মাছটার অর্দ্ধাংশ অবশ হইয়া গিয়াছিল এ কথা সহজেই বুঝা যায়।

ছোট ছোট গাছপালা-পরিপূর্ণ যে কোন বাগানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে—কালো রঙের ছোট ছোট পিপড়ের মত ডানাওয়ালা এক জাতীয় পোকা, হয় উড়িয়া বেড়াইতেছে, নয় লতাপাতার উপর ব্যস্তভাবে কি যেন খোঁজা-খুঁজি করিতেছে। ইহারা এক জাতীয় কুমোরে পোকা। এই পোকাগুলি কালো রঙের শুয়াপোকার শরীরের ভিতরে ডিম পাড়ে। ইহাদের শরীরের পশ্চাদ্ভাগে খুব সূক্ষ্ম সূচের মত একটি ফাঁপা নল আছে। এই নলটিকে শুয়াপোকার শরীরে প্রবেশ করাইয়া ডিম পাড়িয়া যায়। ইহাদের দেখিতে পাইলেই শুয়াপোকা প্রাণপণে ছুটিয়া কোথাও আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কুমোরে পোকার মুখোমুখি পড়িয়া গেলেই সে যেন ভয়ে কেমন এক রকম হতভম্ব হইয়া যায় এবং নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। কুমোরে পোকা তখন তার শরীরে হুল প্রবেশ করাইয়া ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ বাদেই শুয়াপোকাটা আবার স্বাভাবিক ভাবে চলা-ফেরা করিতে থাকে। দশ-পনের দিন পরে দেখা যায়—হঠাৎ আবার শুয়াপোকাটা অস্বাভাবিক ব্যস্ততার সহিত এক দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর তাহার স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে কোন নিরালা জায়গায় আসিয়া শরীরটাকে সঙ্কুচিত করিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে। এই সময়ে তাহার শরীরের বিভিন্ন স্থান হইতে চামড়া ভেদ করিয়া সূতার মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতকগুলি পোকা বাহির হইয়া আসে। পোকাগুলি বাহিরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই গুয়ার মধ্যে এখানে সেখানে সাদা গুটি তৈয়ারী করিয়া ফেলে। সাধারণতঃ পনের-বিশ মিনিটের মধ্যেই শুয়াপোকাটার সর্ব্বশরীর সাদা গুটিতে

ভর্তি হইয়া যায়। ওষ্ঠ নির্গত শেষ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, দুই-এক মিনিটের মধ্যেই শুঁয়াপোকার জীবনের অবসান ঘটে। এই ব্যাপারটার মধ্যেও সুস্পষ্ট ভাবে কোন অবসাদক পদার্থের ক্রিয়া লক্ষিত হয়।

বোটবিল পাখীর মাছ ধরিবার কৌশলই এমন যে, এক চাপেই মাছের যন্ত্রণার অবসান ঘটে

সামনের পা হইতে পিছনের পা পর্য্যন্ত প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা ধূসর বর্ণের এক রকম কাঁকড়া-মাকড়সা দেখা যায়। ইহারা জাল বোনে না। ডিম পাড়িবার সময় গাছের পাতা মুড়িয়া বাসা তৈয়ারী করে। মৌমাছির মত এক জাতীয় কুমোরে পোকা ইহাদের পরম শত্রু। শত্রুর আগমন টের পাইলেই মাকড়সাটি ছুটাছুটি করিয়া আত্মগোপনের চেষ্টা করে। কিন্তু কুমোরে পোকার নজর কিছুতেই এড়াইতে পারে না। কুমোরে পোকা যখন শিকার বাগে পাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে থাকে, মাকড়সাটা ভয়ে কাঠ হইয়া তখন নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকে। এই সময়ে কুমোরে পোকা তাহার ঘাড়ের কাছে হুল ফুটাইয়া বিষ ঢালিয়া দেয় এবং পরক্ষণেই পিঠের উপর একটিমাত্র ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইয়া মাকড়সার পিঠের উপর এঁটুলির মত লাগিয়া তাহার রস চুষিয়া খাইতে থাকে। প্রায় তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে বাচ্চাটা একটা বড় মুড়ির আকার ধারণ করে। মাকড়সাটা তখনও এদিক-ওদিক ঘোরা-ফেরা করে বটে, কিন্তু কিরূপ যেন একটা সম্মোহিত অবস্থা—ভয়-ডর, জালা-যন্ত্রণা বোধের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বাচ্চাটা আরও বড় হইয়া মাত্র ছয়-সাত ঘণ্টা সময়ের মধ্যে মাকড়সাটার সর্ব্বশরীর বেমালুম উদরস্থ করিয়া ফেলে। একটা জীবন্ত প্রাণীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধীরে ধীরে চুষিয়া চুষিয়া খাইয়া নিঃশেষিত করা ভয়ানক নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই—কিন্তু প্রাকৃতিক বিধানই এমন যে, ইহাকে জীবন্ত অথচ অবশ করিয়া রাখিবার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহার ফলেই যাতনা বোধও তিরোহিত হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মানুষের মনের প্রসারতা এতই বেশী যে, অন্য কোন জীবজন্তুর সঙ্গে তাহার কোন তুলনাই চলিতে পারে না। মানুষ যেমন একের অবস্থা দেখিয়া অন্যের অবস্থা যথাযথ অনুমান করিয়া লইতে পারে মনুষ্যেতর প্রাণীদের সে ক্ষমতা নাই। আমরা যেমন অন্যের মৃত্যু দেখিয়া নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন হই, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করিতে পারি, নিম্নশ্রেণী প্রাণীরা সেরূপ কিছুই পারে না। রক্ত দেখিলে বা রক্তের গন্ধ পাইলে তাহারা মৃত্যু বা ঐ রকমের কোন গুরুতর বিপদের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। আবার দৃষ্টিপথ হইতে রক্তাক্ত দৃশ্য অপসৃত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের ভাব কাটিয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুভয় ছাড়াও আর একটি ব্যাপার আছে, সেটি হইতেছে যাতনা-বোধ। কিন্তু তাহাদের যাতনা-বোধও মৃত্যুভয়ের চেয়ে বেশী কিছু গুরুতর

পাখীর ঠোঁটে ধরা পড়িয়া ইঁদুরটি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে

ব্যাপার নহে। আমাদের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে ভবিষ্যতে ইহা হইতে কত গুরুতর আশঙ্কার কারণ ঘটিতে পারে—পূর্ব্ব হইতেই তাহা অনুমান করিয়া যাতনায়, অশান্তিতে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ি, কিন্তু নিম্নস্তরের প্রাণীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে

এত অনুমান শক্তি নাই বলিয়াই তাহাদের যাতনার পরিমাণও কম হইয়া থাকে। বিচ্ছিন্ন বা কর্ত্তিতাঙ্গ শিয়াল, কুকুর, কাক, চিল প্রভৃতি প্রাণীকে আঘাতজনিত ক্ষত বিলুপ্ত হইতে না হইতেই স্বাভাবিক ভাবেই পরস্পর কামড়াকামড়ি বা খেলাধুলায়

ইগ্রেট পাখী ইঁদুর ধরিয়াছে। ঠোঁটের প্রথম আঘাতের পরই শিকারের শরীর অবশ হইয়া পড়ে

যোগদান করিতে দেখা যায়। মোটের উপর ঠিক যতক্ষণ পর্য্যন্ত যাতনার কারণ বিদ্যমান থাকে তাহার বেশী সময় তাহাদের যন্ত্রণাবোধ থাকে না; কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে যাতনার কারণ দূরীভূত হইলেও মানসিক দুশ্চিন্তায় তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

তা ছাড়া, নিম্নস্তরের প্রাণীদের যাতনা-বোধ যে খুবই স্বল্পকাল স্থায়ী কতকগুলি ব্যাপার হইতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আঘাত লাগিলে টিকটিকির লেজ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে রক্তপাত ঘটে। কিন্তু এরূপ গুরুতর আহত অবস্থায়ও টিকটিকির গতিবিধি দেখিয়া কোন উৎকট যাতনা-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হইলে মাকড়সার শরীর হইতে একাধিক পা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে দেখা যায়। কিন্তু ঘটনার অব্যবহিত পরে অবস্থাদৃষ্টে তেমন কোন যাতনা-বোধের লক্ষণ দেখা যায় না। মাছ, ব্যাঙ, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীদের কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রণা-বোধ করে বটে; কিন্তু অল্পকাল পরেই স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা আরম্ভ করে। ফড়িং বা অন্য কোন কীট-পতঙ্গের লেজ বা অন্য যে কোন অঙ্গবিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে কত অল্প সময়ের জন্য যন্ত্রণা অনুভব করে সে বিষয়ে অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে। পিপীলিকার শরীরের অর্দ্ধাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেও পরমুহূর্ত্তেই তাহারা যেভাবে প্রয়োজনীয় কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। মনে হয় যাতনা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য একটু অনুভূতি জাগে; কিন্তু পরক্ষণেই সেই অনুভূতি লোপ পায়। সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়াছি মাছির বেলায়। আকস্মিক আঘাতে মাছির মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার যেন কিছুই হয় নাই। মাছির একটা স্বভাব—বসিয়া থাকিলেই সে পা দিয়া ডানা, মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রসাধনে লাগিয়া যায়। মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে তথাপি সে বসিয়া বসিয়া প্রসাধন করিতেছে। চোখ নাই, মুখ নাই, সর্ব্বোপরি মাথা নাই—মস্তিষ্ক না থাকিলে তাহাকে চালাইবে কে? কাজেই সে এলোমেলোভাবে এদিক সেদিক হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। সময় সময় চিৎ বা কাত হইয়া পড়িয়া যায়, কিন্তু আবার উঠিয়া বসে এবং প্রসাধনে লাগিয়া যায়। এ অবস্থায় ঘণ্টা দুইয়েরও বেশী সময় ছিল। খাওয়াবার ব্যবস্থা করিতে না পারায় আর বেশী সময় বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইল না। ফর্কা জাতীয় একটা বিচ্ছিন্ন মস্তক পিঁপড়েকে গলনালীর মধ্যে তরল খাদ্য প্রবেশ করাইয়া জ্যানেট ঊনিশ দিন পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছিলেন। মিস্ ফিলডে পেনসিলভেনিকাস্ জাতীয় একটা পিঁপড়ের মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া উক্ত উপায়ে খাদ্যপ্রয়োগে ৪১ দিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

অপেক্ষাকৃত উন্নত-স্তরের শিকারী প্রাণীদের ব্যাপারেও দেখা গিয়াছে—দাঁত, ঠোঁট বা নখরাঘাতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিকারের শরীরে এক রকমের অসাড়তা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের যাতনা বোধ সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালন বা পেশীসমূহের ক্রিয়া সমান ভাবেই চলিতে পারে। এইজন্যই আমরা পাখীর ঠোঁট, সাপের প্যাঁচ, সাঁড়াশীর মত ধারালো দাঁড়া বা কুমীরের চোয়ালে আবদ্ধ প্রাণীকে উদরস্থ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রবল বেগে অঙ্গ সঞ্চালন করিতে দেখি। তা ছাড়া, শিকারী প্রাণীরা শিকার ধরে উদরপূর্ত্তি করিবার জন্য, শিকারের যন্ত্রণা উপভোগ করিবার জন্য নহে। কাজেই যতশীঘ্র সম্ভব তাহারা শিকারকে উদরস্থ করিবারই চেষ্টা করে। যন্ত্রণাবোধ যদিও বা কিছু থাকে এই কারণেই তাহা স্বল্পকাল স্থায়ী হইতে বাধ্য। মোটের উপর, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে জীবন-সংগ্রামের ব্যাপারগুলি আপাতঃ প্রতীয়মান নিষ্ঠুরতা হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতিতে নিষ্ঠুরতার স্থান খুবই কম।

প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা ঃ কেনিয়া ও টাঙ্গানায়িকা

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসের বর্ত্তমান যুগকে শ্বেত-প্রাধান্যের যুগ আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। জগতের রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ প্রভাব এবং কর্তৃত্বকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনধিক শতাব্দীকালের মধ্যে পীত জাপান রাষ্ট্র এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বলদর্পিত শ্বেত জাতি-সমূহের প্রতিস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যচক্রের প্রতিকূল আবর্ত্তন আজ তাহাকে যে অবাঞ্ছিত এবং অপ্রত্যাশিত দুর্দ্দশার গভীর গহ্বরে টানিয়া নামাইয়াছে, সেখান হইতে উঠিয়া কবে যে আবার সে পূর্ব্ব অবস্থা লাভ করিবে ঠিক করিয়া বলা সম্ভব নহে। কোন দিনই করিবে কিনা কে জানে!

বিশ্বগ্রাসী শ্বেতপ্রাধান্য অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ এবং উৎপীড়নের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তাহার বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপীড়িত মানব আত্মার অভিযোগ দিনের পর দিন মুখর হইয়া উঠিতেছে। মানব-মৈত্রী, জাতি-প্রেম প্রভৃতি শ্রুতিসুখকর কথাগুলির আবরণের অন্তরালে এতদিন পর্য্যন্ত যে নির্মম শোষণ চলিতেছিল, আজ তাহার মুখোস খুলিয়া গিয়াছে। শ্বেতজাতি নির্ম্মিত সম্পদসৌধের নিম্নে পুঞ্জীভূত অশ্বেতকায়গণের দুঃখ দুর্দ্দশা এবং ভাষাতীত অবমাননার স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। আজই হউক, কালই হউক, বিধাতার রুদ্ররোষ গণ-বিপ্লবের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্বেত সভ্যতার শ্মশানশয্যা রচনা করিবে। তাহার পর আবার নূতন করিয়া চির-অপরাজিত মানুষের জয়যাত্রা সুরু হইবে। বিশ্ব-সভ্যতার ধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইবে।

একদা ভারতবর্ষ ছিল বিশ্ব-সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র। ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছুরিত জ্ঞান এবং সভ্যতার রশ্মি বিশ্বের বিভিন্ন অংশকে আলোকোজ্জ্বল করিয়াছিল। সে যুগে প্রবাসী ভারতসন্তানের মর্য্যাদার আসন ছিল সর্ব্বজনস্বীকৃত।

আজিও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বহু ভারতীয় রহিয়াছেন। সংখ্যায় ইঁহারা প্রায় ৪০ লক্ষ। কিন্তু আজ সর্ব্বত্রই তাঁহারা অবহেলা এবং অবমাননার পাত্র। ইহার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলেই ভারতীয় বিদ্বেষ এবং নিপীড়ন চরমে উঠিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বিদ্বেষ ত সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু পূর্ব্ব-আফ্রিকাও কম যায় না। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও প্রবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা সুখের বা গৌরবের নহে। ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের পূর্ব্বে ইহাদের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। পণ্ডিত নেহরু যথার্থই বলিয়াছেন যে প্রবাসী ভারতসন্তানের অবস্থা কি প্রকার হইবে তাহা নির্ভর করে স্বদেশে ভারতীয়ের অবস্থার উপর ("The status of an Indian abroad must ultimately depend upon his status at home" অথবা "The question of Indians abroad is intimately connected with the independence of India and when independence is achieved the status of Indians everywhere will inevitably improve.") স্বাধীনতালাভের পরে ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রথম যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করিতে হইবে প্রবাসী ভারতীয় সমাজের অবস্থার উন্নতিসাধন এবং তাহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণ তাহার মধ্যে অন্যতম।

ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকার প্রদেশগুলির মধ্যে টাঙ্গানায়িকা অন্যতম। নামে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটের অধীন হইলেও ইহাকে ব্রিটিশ রক্ষণাধীন পূর্ব্ব-আফ্রিকার অপর দুইটি প্রদেশ কেনিয়া এবং উগাণ্ডার সমপর্য্যায়ভুক্ত করা অসমীচীন হইবে না। এই তিনটি প্রদেশের শুল্ক এবং ডাক ও তার বিভাগ সম্মিলিতভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয়। ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকার সমস্ত ডাক টিকিটের উপর একটি সিংহের প্রতিকৃতি অঙ্কিত এবং তাহার চতুর্দ্দিকে কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানায়িকা এই কথা কয়টি মুদ্রিত থাকে। ইহাদের সকলের মুদ্রার উপরই ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ। সামরিক প্রয়োজন ব্যতীত অর্থনীতিক কারণেও উপরি-উক্ত প্রদেশ তিনটির যুক্ত শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা চলে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য ইহাদের যুক্ত শাসন-ব্যবস্থা অপরিহার্য্য। কেনিয়া, টাঙ্গানায়িকা এবং উগাণ্ডার মোট আয়তন (১১ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার), ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক। কাঁচামালের যোগানদার এবং বাড়তি মূলধন নিয়োগের কেন্দ্র হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে ইহার অসাধারণ গুরুত্ব রহিয়াছে।

কেনিয়া এবং টাঙ্গানায়িকার মোট ৮,৪৩৪,১৯১ জন অধিবাসীর মধ্যে ৬৫,৭৯০ জন ভারতীয় এবং আনুমানিক ২৮,২১১ জন ইউরোপীয়।*

পূর্ব্ব-আফ্রিকার সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন হইলেও মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে ১৮৯৫ সালের পর হইতেই ভারতীয়গণ পূর্ব্ব-আফ্রিকায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর ইম্পিরিয়াল ব্রিটিশ ইষ্ট আফ্রিকা কোম্পানী কেনিয়া, উগাণ্ডা রেলপথ-নির্ম্মাণের জন্য ভারত সরকারের নিকট ভারতীয় শ্রমিক আমদানির প্রার্থনা করে। এই প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় এবং প্রধানতঃ পঞ্জাব প্রদেশাগত শ্রমিকের পরিশ্রমেই উক্ত রেলপথ-নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের নিকট পূর্ব্ব-আফ্রিকার ঋণের কথা বলিতে যাইয়া ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিলের মত গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী ও উগ্র ভারতবিদ্বেষীও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। *My African Journey* গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন,

* ১৯৩১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী। ১৯৪১ সালে নূতন করিয়া আদমসুমারির কথা থাকিলেও যুদ্ধের জন্য তাহা হইয়া উঠে নাই।

"It was the Sikh soldier who bore an honourable part in the conquest and pacification of these East African territories. It is the Indian trader, who penetrating and maintaining him in all sorts of places to which no whiteman would go or in which no whiteman could earn a living, has more than anyone else developed the early beginnings of trade and opened up the first slender means of communication. It was by Indian labour that one vital railway on which everything else depends was constructed."

অর্থাৎ পূর্ব্ব-আফ্রিকা বিজয় এবং তথায় শান্তি সংস্থাপনে শিখ সৈনিক একটি গৌরবময় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। যে সমস্ত অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গগণের গমন বা জীবিকার্জ্জন অসম্ভব ছিল ভারতীয় বণিকগণ সে সমস্ত জায়গায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটাইয়া চলাচল ব্যবস্থা সুগম করিয়াছেন। এ অঞ্চলের প্রধান এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ রেলপথটি ভারতীয় শ্রমিকের পরিশ্রমে নির্ম্মিত হইয়াছে।

কেবল পূর্ব্ব-আফ্রিকাই নহে, ফিজি, মরিশাস্, দক্ষিণ-আফ্রিকা ইত্যাদি প্রত্যেকেরই সমৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ ভারতীয় শ্রমিকের প্রাণপাত পরিশ্রম এবং ভারতীয় ব্যাবসায়ী সম্প্রদায়ের দুর্জ্জয় সাহস।

১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে টাঙ্গানায়িকা ইংরেজদের হস্তগত হয়। তৎপূর্ব্বে ইহা জার্ম্মানীর অধিকৃত ছিল। যুদ্ধাবসানে ইহাকে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটের অধীন করিয়া দেওয়া হইল। জার্ম্মান শাসনাধীন টাঙ্গানায়িকাতে প্রবাসী ভারতীয়গণকে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। ইংরেজ শাসনে ইহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরের কথা, পূর্ব্বাপেক্ষা অবনতিই ঘটিয়াছে। এই প্রদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে ইংরেজ, জার্ম্মান, ভারতীয় এবং স্থানীয় অধিবাসী রহিয়াছে। ১৯৩১ সালের আদমসুমারি অনুসারে টাঙ্গানায়িকায় মোট ৫১ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ভারতীয় এবং ইউরোপীয়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৩,৪২২ এবং ন্যূনাধিক ৯০০০। ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত এই প্রদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ ভারতীয়দিগের হাতে ছিল। কিন্তু ভারতীয়দিগকে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পঙ্গু করিয়া কালে সেই দেশ হইতে বিতাড়িত করা টাঙ্গানায়িকা সরকার কর্ত্তৃক অনুসৃত ভারতীয় নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯৩২ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আইনের বলে বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতীয়দিগকে কোণঠাসা করিয়া ফেলিবার চেষ্টার আর বিরাম নাই। ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদিগের ব্যবসায়ের পূর্ব্বতন স্থান পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন জায়গায় যাইতে বাধ্য করা হইতেছে। সরকারের মতে এই নূতন কেন্দ্রগুলি ব্যবসায়ের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। টাঙ্গানায়িকায় ইংরেজ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তত্রত্য ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের উক্ত প্রদেশের সর্ব্বত্র অবাধ বাণিজ্যের অধিকার ছিল। কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট নীতি এবং ব্যবহার ফলে বর্ত্তমানে এই অধিকার বহুলাংশে সঙ্কুচিত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত ব্রিটিশ উপনিবেশের ন্যায় টাঙ্গানায়িকাতেও ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং দোকানদারগণই সর্ব্বপ্রথম কৃষিজ পণ্য উৎপাদনকারী এবং শ্রমশিল্পজ পণ্য ক্রয়কারী স্থানীয় অধিবাসীদিগের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। নিজের প্রয়োজনেই তাহাদিগকে চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বেও টাঙ্গানায়িকার সর্ব্বত্রই ভারতীয় মালিকের ভারতীয় চালক পরিচালিত মোটর এবং অন্যবিধ যান দেখা যাইত। আয়তনে টাঙ্গানায়িকা একেবারে নগণ্য নহে। ইহার মোট আয়তন ৩৪০,০০০ বর্গ মাইল। এই বিশাল ভূখণ্ডে রেলপথ আছে মাত্র ১৪০০ মাইল। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যে একেবারেই অপর্য্যাপ্ত তাহা আর বলিয়া দিতে হয় না। ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত একমাত্র ভারতীয় পরিচালিত মোটরযানই ইহার অর্থনৈতিক জীবনকে সক্রিয় এবং সচল রাখিয়াছিল। ১৯৩১ সালে কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় মালিকের যানবাহনের উপর লাইসেন্স কর ধার্য্য করেন। ২ বৎসর পর ১৯৩৩ সালে বিধিবদ্ধ একটি আইনের বলে রেলপথের সমান্তরাল কোন রাজপথে ভারতীয় মালিকের মোটর চালানো নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অপ্রধান রাজপথগুলিতে তাহার অধিকার এখনও অক্ষুণ্ণ রহিল। ১৯৩৭ সালে ভারতীয় মোটর-মালিকের অধিকার আরও সঙ্কুচিত হইল। ৩ বৎসর যাইতে না যাইতে ১৯৪০ সালে অপর একটি আইন প্রণয়ন করা হইল। এই আইনে ব্যবস্থা হইল যে টাঙ্গানায়িকার দক্ষিণাংশের মালভূমিতে (Southern Highland of Tanganayika) যে সমস্ত মোটর চলাচল করিবে কোন ভারতীয় তাহাদের মালিক বা চালক হইতে পারিবে না। টাঙ্গানায়িকার কৃষি-সমৃদ্ধ এই অংশে প্রচুর চা, কফি, গম এবং ধান উৎপন্ন হয়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই আইন একটি পূর্ব্ব-পরিকল্পিত, সুচিন্তিত কার্য্য পদ্ধতির অংশ মাত্র।

টাঙ্গানায়িকার বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে ৫০০০-এরও অধিক ভারতীয় বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ইঁহাদের পদোন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই বলিলেও চলে। কেবল তাহাই নহে। সমপদস্থ ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা ইঁহাদিগকে কম বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। কাগজে কলমে প্রবাসী ভারতীয়গণ অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজার সমান অধিকার ভোগ করেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা নহে। আইন-পরিষদ (Legislative Council) এবং বিভিন্ন উপদেষ্টা সমিতিতে (Advisory Committees) ভারতীয় প্রতিনিধি রহিয়াছেন সত্য কিন্তু আইন-পরিষদের ১৩ জন সরকারী এবং ১০ জন বে-সরকারী মোট ২৩ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ২৫,০০০ ভারতীয়ের ৩ জন এবং ন্যূনাধিক ৯,০০০ ইউরোপীয়ের ২০ জন প্রতিনিধি আছেন।

তারপর কেনিয়া ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনি (Crown Colony)। এই প্রদেশটিতে ১৯৩১ সালের আদমসুমারির হিসাবে প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা ছিল ৪২,৩৬৮, ইহার মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৩,৩৩৪,১৯১, তন্মধ্যে ভারতীয় ব্যতীত ১৯,২১১ জন ইউরোপীয় আছে। টাঙ্গানায়িকার ন্যায়

কেনিয়ার অর্থনৈতিক জীবনেও এক সময়ে ভারতীয়গণের অপ্রতিহত প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের স্বার্থের প্রয়োজনে কেনিয়া হইতে আজ ভারতীয় বিতাড়ন অত্যাবশ্যক হইয়াছে। ঠিক একই কারণে টাঙ্গানায়িকাতে ভারতীয় দলন আরম্ভ হইয়াছে।

১৮৯০ সালে কেনিয়াতে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫ বৎসর পর ১৮৯৫ সালে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল ইষ্ট আফ্রিকা কোম্পানীর নিকট হইতে ইংরেজ সরকার ইহার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত কেনিয়া ব্রিটিশ রক্ষাধীন (Protectorate) অঞ্চলরূপে শাসিত হইত। ঐ বৎসর ইহা ক্রাউন কলোনিতে পরিণত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে দুই-এক জন করিয়া ইংরেজ ঔপনিবেশিক কেনিয়াতে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০২ সালের পর হইতে সরকারী উৎসাহ এবং অনুমোদনের ফলে ইংরেজ ঔপনিবেশিকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতেই কিছু ভারতবাসী কেনিয়াতে ঘর বাঁধিয়াছিলেন। প্রায় প্রথম হইতেই শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রেষারেষি আত্মপ্রকাশ করিল।

কেনিয়ার মোট আয়তন প্রায় ২২০,০০০ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরাংশ অনুর্ব্বর। কিন্তু নাইরোবি হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত পূর্ব্বাঞ্চল অতিশয় উর্ব্বর। সমগ্র কেনিয়ার প্রায় ১৮৫,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪,০০০ ফুটের কম উচ্চ বলিয়া শীতপ্রধান দেশাগত ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণের বাসোপযোগী নহে। এতদ্ব্যতীত অঞ্চলকে Highlands অর্থাৎ উচ্চ বা মালভূমি বলা হয়। এই অঞ্চলের ভূমি খুব উর্ব্বর। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও একান্ত মনোরম। এইখানে যথেষ্ট শিকার মিলে এবং প্রচুর পরিমাণে কফি, গম, চা ও ভুট্টা উৎপন্ন হয়।

১৯০৮ সালে ইংলণ্ডের তদানীন্তন উপনিবেশ সচিব লর্ড এলগিন কেনিয়ার মালভূমিতে এশিয়াবাসীদিগের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া সমীচীন নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

"Grants of land in the upland areas should not as a matter of administrative convenience be made to Asiatics."

ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মালভূমিতে কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গগণকেই জমি বন্দোবস্ত দিতে আরম্ভ করেন, তখনও লর্ড এলগিন তাঁহাদিগকে সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে কেনিয়ার আইন পরিষদে একজন বে-সরকারী সদস্য গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হইলেও পরে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। ১৯১৩ সালের একটি সরকারী রিপোর্টে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং সামাজিক সুবিধার অজুহাতে ভারতীয়গণকে ইউরোপীয়গণ হইতে সর্ব্বপ্রকারে স্বতন্ত্র করিয়া দিবার সুপারিশ করা হয়। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে কেনিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের একটি সুফল এই যে ইহার ফলে বিশ্বের সর্ব্বত্র এক অভিনব গণ-চেতনার সঞ্চার হয়। কেনিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণও নিজেদের অভাব অভিযোগ এবং অধিকার সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা সচেতন হইয়া উঠিলেন। এদিকে স্বার্থবান ক্ষমতা-ভোগীর দলও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-রক্ষায় পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কাজেই কেনিয়ার ভারতীয় সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিল। ১৯১৯ সালে কেনিয়ার গবর্ণর একটি ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে কেনিয়াতে ভারতীয় স্বার্থ একেবারে উপেক্ষিত না হইলেও ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ কেনিয়াতে ইউরোপীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং কেনিয়া শাসনে এই নীতিই অনুসৃত হইবে।

"The principle has been accepted that this country is primarily for European development, and that, whereas the interests of the Indians will not be lost sight of, in all respects the interests of the Europeans must predominate."

১৯২০ সালে লর্ড মিলনার প্রস্তাব করিলেন যে কেনিয়ার ব্যবস্থা পরিষদে এবং মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলসমূহে বিশেষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতীয় সদস্য নির্ব্বাচন করা হইবে, যে সমস্ত আইনের বলে কেনিয়াতে বৈদেশিকগণের আগমন নিয়ন্ত্রিত হইবে (Immigration Laws) তাহাতে ভারতীয়গণ সম্বন্ধে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না, কেনিয়ার মালভূমি কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গগণের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইবে সত্য, কিন্তু অন্যত্র উৎকৃষ্ট চাষের জমি ভারতীয়গণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গগণের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান এবং সম্ভব হইলে স্বতন্ত্র ব্যবসায়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার নীতি অনুসৃত হইবে।

এই প্রস্তাব কেনিয়া প্রবাসী ভারতীয় সমাজে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার করিল। ১৯২০ সালের ২২শে আগষ্ট নাইরোবিতে আহূত ভারতীয়গণের একটি বিরাট সম্মিলনে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইল। খুব সম্ভবতঃ ইহারই ফলে ভারত সরকারের চৈতন্যোদয় হইল। ভারত সরকার বলিলেন যে ব্রিটিশ ভারতীয়গণকে সাম্রাজ্যের অধীন কোন দেশেই ইংলণ্ডেশ্বরের অন্য কোন প্রজা অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

"There is no justification in a Crown Colony or Protectorate for assigning to British Indians a status in anyway inferior to that of any other class of His Majesty's subjects."

১৯২১ সালের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সেও প্রবাসী ভারতীয় সমস্যার আলোচনা হয়। কনফারেন্স মত প্রকাশ করিল যে ভারতবর্ষের বাহিরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন যে সমস্ত জায়গায় ভারতবাসী ঘর বাঁধিয়াছে, সাম্রাজ্যের স্বার্থেই সে সমস্ত জায়গায় তাহাদিগকে নাগরিকের মর্য্যাদা দেওয়া উচিত।

"That in the interests of the solidarity of the British Commonwealth it is desirable that the rights of such Indians—lawfully domiciled in some other parts of the Empire—to citizenship should be recognized."

ইহাতে সমস্যার সমাধান ত হইলই না, বরং সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়া এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল। কেনিয়াবাসী শ্বেতাঙ্গগণ বিদ্রোহের হুমকি দিলেন। অনন্যোপায় হইয়া ব্রিটিশ মন্ত্রি-সভা কেনিয়া সমস্যার একটা সমাধান করিবার চেষ্টা করিলেন।

"The British Cabinet gave this devision because the white people threatened rebellion."—*Srinivas Sastri.*

এই সমাধানে ভারতের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত কেনিয়া শ্বেতপত্রে (Kenya White Paper) নিম্নলিখিত প্রস্তাব করা হয়—

১। কেনিয়া ব্যবস্থা পরিষদে ১১ জন ইউরোপীয় এবং ৫ জন ভারতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন।

২। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্ব্বাচন হইবে অর্থাৎ ইউরোপীয় প্রতিনিধিগণ ইউরোপীয় ভোটে এবং ভারতীয় প্রতিনিধিগণ ভারতীয় ভোটে নির্ব্বাচিত হইবেন।

৩। ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলিবার ক্ষমতা ভোটাধিকার লাভের পক্ষে একটি বিশেষ যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪। কেনিয়ার মালভূমি ইউরোপীয়গণের জন্য এবং নিম্নভূমিতে অবস্থিত উৎকৃষ্ট চাষের জমি ভারতীয়গণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

১৯২০ সালে কেনিয়া সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে প্রবাসী ভারতীয় এবং ইউরোপীয়গণের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য করা হইবে না।

"They, *i.e.*, the Indians, were in error in supposing that the Government has any intention of drawing any distinction between Europeans and Indians so far as rights of mining, settling and acquiring lands are concerned."

১৯২০ সালের শ্বেত-পত্রে এই প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই।

শ্বেত-পত্রে বলা হইল যে স্থানীয় অধিবাসীদিগের স্বার্থ রক্ষা এবং তাহাদের উন্নতি সাধনই কেনিয়াতে অনুসৃত শাসন-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে।

"In the administration of Kenya, His Majesty's Government regard themselves as exercising a trust on behalf of the African population, and they are unable to delegate or share this trust—the object of which may be defined as the protection and the advancement of the native races."

এই সাড়ম্বরে ঘোষিত নীতি কেনিয়া শাসনে কতটা অনুসৃত হইতেছে বিগত ১৯শে ডিসেম্বর মস্কো বেতার কেন্দ্র হইতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় তাহা ফাঁস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বক্তা মিখাইল মিখালভ (Mikhail Mikhallov) বলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয় কেনিয়াতে স্থানীয় অধিবাসিগণের উপর তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়। নিজেদের জমি হইতে বিতাড়িত হইয়া ইহারা নাম মাত্র মজুরির বিনিময়ে ইউরোপীয়গণের দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়। ইহাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের হার শতকরা মাত্র ৫ জন। ১৯৪৫ সালে উপনিবেশ সরকার ৪,০০০,০০০, স্থানীয় অধিবাসীর শিক্ষার জন্য মাত্র ৫০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছেন।

"The British press, which certainly is not likely to paint the picture blacker than it is, reports that the position of the African population in Kenya is deteriorating from year to year. Driven from their land, native Kenyans have to sell their labour to European residents for next to nothing. Ninety-five per cent of the native population are illiterate. That is hardly surprising when you consider that the sum allowed last year for the education of 4,000,000 Kenyans was just £500."

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কেনিয়া শ্বেত-পত্রের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলিতে লাগিল। একাধিক কমিশন নিযুক্ত এবং একাধিক শ্বেত-পত্র প্রকাশিত হইল। ১৯৩২ সালে নিযুক্ত কার্টার কমিশন (Carter Commission) ১৯৩৪ সালে সুপারিশ করিলেন যে কেনিয়ার মালভূমি শ্বেতাঙ্গগণের জন্য সংরক্ষিত রাখা হউক। ১৯৩৯ সালে এই সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইল।

কেনিয়া-প্রবাসী শ্বেতাঙ্গগণ ১৯২৩ সালের ন্যায় এবারও বিদ্রোহের ভয় দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিলেন যে প্রবাসী ভারতীয়গণকে তাঁহাদের সমান মর্য্যাদা দিলে তাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে দ্বিধা করিবেন না। কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি-দল প্রেরণ করিয়া ঐ দুই দেশে ভারতীয়গণকে শ্বেতাঙ্গগণের সমান অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে জনমত প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেনিয়া এবং টাঙ্গানায়িকাতে স্থানীয় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একটি আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে সরকার নিযুক্ত একটি বোর্ডের অনুমোদিত যানবাহন ব্যবহারকেই মাত্র একচেটিয়া অধিকার দেওয়া চলিবে। ইহার ফলে সরকারের মর্জ্জি মাফিক মোটর এবং নৌকার মালিকগণকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলা যাইতে পারে। নৌকা এবং মোটর ব্যবসায় প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয়গণের হাতে। সুতরাং উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে।

পূর্ব্ব-আফ্রিকার ইংরেজ শাসনাধীন কেনিয়া, টাঙ্গানায়িকা, উগাণ্ডা এবং জাঞ্জিবারে ভারতীয় বিদ্বেষ চরমে উঠিয়াছে। এই চারিটি প্রদেশেই সরকার বৈদেশিকগণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত

করিবার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব ব্যবস্থা পরিষদে আইনের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। স্যার মহারাজ সিং, মিঃ কে. সারওয়ার হোসেন এবং মিঃ সি. এস. ঝা দ্বারা গঠিত ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি দলের মতে প্রস্তাবিত আইন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। জাঞ্জিবার ব্যতীত অন্য তিনটি প্রদেশেই বহু জনবিরল অঞ্চল রহিয়াছে। কাজেই তথায় এখনও বহু আগন্তুকের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে। প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে বলা হইয়াছে যে কঠোর বিধি নিষেধের দ্বারা বৈদেশিকগণের পূর্ব্ব-আফ্রিকা প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত না করিলে ভবিষ্যতে বৈদেশিকগণ দক্ষিণ-আফ্রিকা ছাইয়া ফেলিবে। অতীতের অভিজ্ঞতা কিন্তু এই যুক্তির পোষকতা করে না।

কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে অধিক সংখ্যক বৈদেশিক আমদানির ফলে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় বেকার সমস্যা দেখা দিবে। কিন্তু এ কথা মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। একথাও ভুলিলে চলিবে না যে বহিরাগতদের চেষ্টা এবং পরিশ্রমের ফলেই পূর্ব্ব আফ্রিকার অর্থনীতিক জীবন সমৃদ্ধতর হইয়াছে।

কেনিয়ার মালভূমিতে ইউরোপীয় ব্যতীত অন্যান্য জাতির চাষ এবং বাসের অধিকার স্বীকৃত হইলে বহু সহস্র প্রবাসী ভারতীয়ের কর্ম্মসংস্থান হইতে পারে। বর্ত্তমানে এই অঞ্চলের অতি সামান্য অংশ মাত্র চাষ করা হয়। কেনিয়াতে বর্ত্তমানে ২০০০ ইটালি দেশীয় যুদ্ধবন্দী রহিয়াছে। ইহারা শীঘ্রই অন্তরীণ মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তাহার ফলেও কিছু স্থানীয় অধিবাসী এবং বহিরাগতের কর্ম্মলাভের পথ প্রশস্ত হইবে। কেনিয়া, উগাণ্ডা, জাঞ্জিবার এবং টাঙ্গানায়িকা প্রত্যেক প্রদেশেই যুদ্ধোত্তর আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য ধন এবং জনবলের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে হইলে সহস্র সহস্র কর্ম্মীর সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে। সুতরাং বেকার সমস্যার অজুহাতে বৈদেশিকগণের পূর্ব্ব-আফ্রিকায় প্রবেশাধিকার সঙ্কুচিত করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

সমগ্র পূর্ব্ব-আফ্রিকায়, বিশেষ করিয়া কেনিয়া এবং উগাণ্ডায়, রাজনীতিক চেতনা জাগ্রত হওয়ার ফলে তথাকার অধিবাসীবৃন্দ বহিরাগত মাত্রকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। ভারতীয় এবং আফ্রিকাবাসিগণের মধ্যে অর্থনীতিক স্বার্থের সংঘাতও যে না আছে এমন নহে। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে ভারতীয় এবং আফ্রিকাবাসীর মধ্যে কোন বিদ্বেষ বা বিরোধ নাই। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই উভয় সম্প্রদায়ের যে সমস্ত অক্ষমতা (disabilities) রহিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে ইহারা সমবেত আন্দোলন করিয়াছে।

পূর্ব্ব আফ্রিকায়, আর কেবল পূর্ব্ব-আফ্রিকায় কেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র আজ ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয়গণ আজ শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছেন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর যুগে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে নূতন অর্থনৈতিক বিধান প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগে নূতন নূতন অঞ্চল কবলিত করিয়া লাভের অঙ্ক মোটা করা সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই যুগে কাঁচা মাল উৎপন্নকারী এবং শ্রমশিল্পজ পণ্য ক্রয়কারী দেশসমূহের সহিত সংযোগ স্থাপন এবং রক্ষার জন্য দুঃসাহসী ব্যবসায়িগণের সহায়তা একান্ত ভাবেই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সেই যুগে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষার প্রধান সহায় হইয়াছে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিকের চাহিদার একটা বড় অংশ ভারতবর্ষ মিটাইয়াছে। যখন পর্য্যাপ্ত সংখ্যক স্থানীয় বা অন্য কোন দেশীয় শ্রমিক পাওয়া যাইতেছিল না, তখন ভারতীয় শ্রমিকগণই বিভিন্ন উপনিবেশের কৃষিক্ষেত্র এবং কারখানা সমূহকে চালু রাখিতে সহায়তা করিয়াছে। আজও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র হাজার হাজার ভারতীয় বণিক এবং ক্ষুদ্র দোকানদার দেখা যায়। ইঁহারা স্থানীয় কাঁচামাল ক্রয় করিয়া বিভিন্ন শিল্পোৎপাদন কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া সাম্রাজ্যের উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল এবং সক্রিয় রাখেন। ইঁহারাই আবার স্থানীয় অধিবাসীদিগকে শ্রমশিল্পজ পণ্য সরবরাহ করেন। নূতন নূতন অঞ্চলে অর্থনীতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার যুগে এই সংগঠনই ছিল সর্ব্বোত্তম।

"Extensive agriculture and middlemen's profits could be permitted while imperialist capital could yet derive increasing profits out of newer areas."—*Indians in Foreign Lands* by Dr. Ram Manohar Lohia.

ব্রিটিশ পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে নূতন করিয়া গ্রাস করিবার মত স্থান আজ আর দেখা যাইতেছে না। তাই স্বীয় প্রভাবাধীন অঞ্চলসমূহের পরিপূর্ণ শোষণ আজ ইংলণ্ডের অনুসৃত নীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কবলিত অঞ্চলসমূহের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং দোকানদারগণের উৎসাদন, ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীদিগকে বিত্তহীনের পর্য্যায়ভুক্ত করিবার এবং স্থানীয় শ্রমিকদিগকে যতটা সম্ভব বেশী খাটাইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র আজ এই অভিনব নীতি অনুসৃত হইতেছে। এই সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক নববিধান জাতীয় (Racial) এবং অর্থনৈতিক (Economic) দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রথমতঃ এই নীতির ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রবাসী ভারতীয়গণই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার শেষ উপায় হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ আজ এই অভিনব নীতির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে।

প্রবাসী ভারতীয় সমাজকে এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের

স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আত্মরক্ষার জন্য সম্মিলিত চেষ্টা করিতে হইবে। মূলতঃ অর্থনৈতিক এই নববিধানের সহিত উপনিবেশবাসী যাবতীয় জাতির ভাগ্য জড়িত। ইহাদের সকলের সম্মিলিত চাপ ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদের চৈতন্যোদয় হইবে না। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের প্রগতিশীল বামপন্থী চিন্তাধারার বাহক দলগুলি এবং ভারতবর্ষ ও প্রবাসী ভারতীয় সমাজ এবং উপনিবেশবাসী নিপীড়িত জাতিসমূহের আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করিতে সাহায্য করিতে পারে। ১৯৩৭ সালের জাঞ্জিবার লবঙ্গ ধর্মঘট ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থন ব্যতীত সফলতা লাভ করিত না। নেহরু সরকার কর্তৃক সদ্য-সমাপ্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U. N. O.) অধিবেশনে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে প্রেরিত ভারতীয় প্রতিনিধিদলের কার্য্যকলাপ ও তাহার ফলাফল ত সর্ব্বজনবিদিত।

নোয়াখালি

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

নোয়াখালি ! তুমি আজি পুণ্যতীর্থস্থান
হিংসাজয় করিবার দিয়াছ সন্ধান,
জ্বালিয়াছ পথে আলো যে পথ অগম্য
পর্ব্বত সমান যাহা দুর-অতিক্রম্য।
ভীমকায় টলি যায় বিশ্বাসের বলে
অহিংসায় হিংসা লয় অপূর্ব্ব কৌশলে,
কঠিন তপস্যা এ যে কঠিন সাধনা
উন্মত্ত তুফান বুকে শান্ত উপাসনা।
দুঃসহ দুঃখের পথে আনো সমাচার
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যাহে করো দুঃখ পার,
মৃত্যুর দুয়ার খুলি দেখাও যে স্বর্গ
বিশ্বে তুলি ধরো আত্ম-বিশ্বাসের অর্ঘ্য।
নিরস্ত্রের অস্ত্র তার আত্মার আলোক
ধৌত করে ধরাতল দৃষ্টি অপলক,
অলক্ষ্যে মোক্ষের দ্বার হয় উদ্ঘাটন
মহাতীর্থ নোয়াখালি ঘোষে বিশ্বজন।

সঞ্জীবনী

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

ঘুমায়ো না, ঘুমায়ো না অপ্সরা উর্ব্বশী,
অনেক অনেক আলো আকাশে এখনো,
বাতাসের স্তরে স্তরে উঠিছে উছসি
হাজার আশার গান—কান পেতে শোনো।

অনেক অনেক আলো আকাশে এখনো,
জাগিছে হাজার চাঁদ রূপের নেশায়,
স্বপন-সাগর হতে পরীরা আভাসে
বিবর্ণ জীবন-পটে সবুজ মেশায়।

মানুষ মরিছে জানি প্রহরে প্রহরে,
ঝরে' ঝরে' পড়ে যত কামনা-মুকুল,
প্রলয়-তরঙ্গ ওঠে জীবন-সাগরে,—
জলচর পাখী যত হতেছে ব্যাকুল।

কোথা যাবে প্রাণতরী—পায় না নিশানা,
কোথায় স্বপনে দেখা সাগর-সুন্দরী,
কি নামে ডাকিব তারে—কি তার ঠিকানা ?-
জানি না ; সমুখে জাগে কঠিন শর্ব্বরী।

সাগরের বক্ষ হতে উঠি' মৃত্যু-ঢেউ
দুর্জ্জয় দাম্ভিক বেগে ছুঁয়েছে আকাশ,
আতঙ্কে হৃদয় কাঁপে, কোথা নাহি কেউ—
এ দুর্য্যোগে যে আনিবে বাঁচার আশ্বাস।

মানি, মানি, হে উর্ব্বশী, মৃত্যু ক্ষণে ক্ষণে
তোমার আমার মাঝে রচে ব্যবধান,
তবু ত' উঠিছে চাঁদ দূরের গগনে,
ভোরের আলোয় জাগে সৃজনের গান ;

এখনো অনেক আশা রয়েছে জীবনে,
হৃদয়ের মণিকোঠা হয়নি ত' ছাই,
ফাঁকা হোক—তবু আজো রাতের স্বপনে
সুদূরের পথরেখা নয়নে মেশাই ;

হেথা হোথা পান্থতরু জাগে সাহারায়,—
নব নব আশা জাগে পথিক-অন্তরে,
নিঃসঙ্গ নিশীথে আজো কি যেন মায়ায়
মরুর সীমান্তে বসি' পাপিয়া কুহরে !

আজিও পৃথিবী সব হয়নি শ্মশান,
আজিও যায়নি নিভে দিশারী প্রদীপ,
এখনো তোমার মত অমৃতের গান
ধূলার ধরারে নিত্য করে যে সজীব।

ঘুমায়ো না, ঘুমায়ো না অপ্সরা উর্ব্বশী,
নিভায়ো না হেম-দীপ লীলা-বাসরের,
পারিজাত-মালা বাঁধা দু'হাতে পরশি'
নিমেষে ঘুচাও আজ ক্লৈব্য পার্থের।

ম্যাট্রিকুলেশন সিলেবাস বা পাঠ্যতালিকা

এস. এম. ছদরুদ্দিন

বর্তমানে ম্যাট্রিকুলেশন সিলেবাস নিয়ে নানা রকম বাগ্-বিতণ্ডা চলছে। অনেকের মতে সিলেবাস অত্যন্ত গুরুভার হয়েছে। কথাটা আংশিক সত্য। আমাদের দেশে সিলেবাস করা হয় বেশ জাঁদরেল ধরণের, কিন্তু কাজ হয় খুব সামান্য; যাকে বলে---'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'। অথচ অন্যান্য দেশে এর থেকে কম সিলেবাসেই অনেক অধিক শিক্ষা করে ছাত্রেরা বেরিয়ে আসে। সিলেবাসই আসল কথা নয়, মুখ্য বিষয় হচ্ছে ছাত্র ও শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী। এখানে ছাত্রেরা নোট-বই ছাড়া এক পা-ও এগুতে চায় না। মুখস্থ—মুখস্থ—মুখস্থ—না বুঝে সুঝে মুখস্থ ছাড়া আর কোন কিছু তারা জানে না। ফলে ম্যাট্রিকুলেশন সিলেবাস আসলে যতটা কঠিন, তার চেয়ে দেখায় বহুগুণে বেশী। 'Cramming' (মুখস্থ-বিদ্যা) ও তোতাপাখীর মত আওড়ানো এই দু'টো জিনিষ কতকটা প্রতিরোধ করতে পারলে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষা হবে প্রকৃত শিক্ষা। এর জন্য এক সঙ্গে তিন দিক থেকে সংস্কারকার্য্য চালাতে হবে; যথা—

(ক) সিলেবাসের সংস্কার-সাধন;

(খ) পাঠ-দান ও পাঠ-গ্রহণের গতানুগতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন;

(গ) পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন।

মাতৃভাষা—ম্যাট্রিকুলেশনের বর্তমান সিলেবাস অনুযায়ী বাংলা ভাষার জন্য দুটি প্রশ্নপত্র ও এদের প্রত্যেকটির জন্য ১০০ নম্বর নির্দিষ্ট আছে। প্রথম প্রশ্নপত্রে গদ্যের জন্য ৬০ এবং পদ্যের জন্য ৪০ নম্বর নির্ধারিত আছে। গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ বিভিন্ন গ্রন্থকারের গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। সংকলনের উদ্দেশ্য হ'ল বড় বড় সাহিত্যিকদের রচনা-সম্ভার থেকে চয়ন করে কেবল মালা-গাঁথাই নয়, বরং এর সৌরভে ও সৌন্দর্যে ছাত্রমনকে আদর্শ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করা। মালাটাই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যসিদ্ধির পন্থা মাত্র। বড় বড় সাহিত্যিকদের বৈশিষ্ট্যমূলক দু-একটি লেখা পাঠে ছাত্রমনে তাঁদের গ্রন্থ পাঠের আকাঙ্ক্ষা জাগবে। কিন্তু বর্তমানে এই উদ্দেশ্য শতকরা ৯৯টি ছাত্রের ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হচ্ছে। ছাত্রেরা সংকলনগুলি বড় একটা পড়ে না, পড়ে শুধু নোট, তস্য নোট, পরীক্ষা পাসের হজমি দাওয়াই—যার মধ্যে বড়ির চেয়ে ফাঁকিই বেশী—ফলে ছাত্রেরাও ফাঁকে পড়ে।

দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে ব্যাকরণে ২৫ নম্বর, অনুবাদে ২৫, রচনায় ২৫ এবং দ্রুত পঠনের পুস্তক থেকে ২৫ নম্বর—মোট ১০০ নম্বর থাকে। গদ্য ও পদ্য সংকলন-পাঠের বেলায় যা ঘটে দ্রুত পঠনের বেলায় তার চেয়ে হয় অনেক বেশী। রচনা গোছের একটি প্রশ্ন আসবে, আসল-বইয়ের মূল গল্পের চেহারা না দেখে নোট থেকে মুখস্থ করাই 'মহাজনপন্থা' বলে পৌনে ষোল আনা ছেলেই মনে করে। ছেলে-মেয়েদের নিজস্ব রচনা পাঠ করলে তাহাদের ভাষা-শিক্ষার আসল রূপ চোখে পড়ে। শতকরা ৯৫টি ছেলের প্রকাশভঙ্গী (style) দূরে থাক, ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা নাই বললেই চলে। রচনা ছাড়া মুখস্থ-বিদ্যার মধ্যেও এটা বেশ নজরে পড়ে। হঠাৎ যদি কোথাও খেই হারিয়ে গেল, তবেই মুশকিল; ভাব জট পাকিয়ে যায়, হয়ে পড়ে 'দু'টি পাকা তেল সরিষার বেল' জাতীয়, তাহার দুরবস্থা হয় তার চেয়েও করুণ।

ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি সুষ্ঠুরূপে ভাবগ্রহণ ও ভাব-প্রকাশ হয়, তা হলে সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী সিলেবাস গঠন করলে কতকটা উপকার হতে পারে। মুখস্থ-বিদ্যা ফলানোর মধ্যে বিশেষ কোন বাহাদুরি নেই। ছেলেমেয়েরা অন্যের ভাব গ্রহণ করে নিজের কথায় সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করতে পারে কিনা, তারা বুঝে-সুঝে পড়তে পারে কিনা, দশ জনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ভাব গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারে কিনা—এইগুলির উপর নির্ভর করে তাদের ভাষা-শিক্ষার সার্থকতা ও সফলতা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলা ভাষার সিলেবাস নিম্ন-লিখিতরূপে সংস্কার করা যেতে পারে:—

প্রথম প্রশ্নপত্র (লিখিত)—	গদ্য (সংকলন)—	৩০ নম্বর
	পদ্য ,,	৩০ ,,
	ব্যাকরণ ,,	২০ ,,
		৮০ ,,
	হোম ওয়ার্ক—	২০ ,,
	মোট—	১০০ ,,
দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র—	রচনা (২টি)—	৪০ নম্বর
	অনুবাদ—	১৫ ,,
	পত্র ও মর্ম-লিখন—	১৫ ,,
		৭০ ,,
	হোম-ওয়ার্ক—	৩০ ,,
	মোট—	১০০ ,,

তৃতীয় প্রশ্নপত্র, প্রশ্নোত্তর—২০ নম্বর } নির্বাচিত
(মৌখিক) সরব পঠন—১৫ ,, } পুস্তক হতে
উপস্থিত বক্তৃতা—১৫ ,,

মোট— ৫০ নম্বর

প্রথম ও দ্বিতীয় 'পেপার' (প্রশ্নপত্র) লিখিত। এর মধ্যে প্রথম পেপারে 'প্যারোটিজ্‌ম'(তোতা পাখীর মত আওড়ানো)

অবকাশ যথেষ্ট থাকবে—যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষাদান ও প্রশ্ন-পদ্ধতির পরিবর্তন না হবে এবং বাজারে হরমি 'নোটে'র প্রচলন বন্ধ না করা যাবে। দ্বিতীয় পেপারে ছাত্রদের মৌলিকত্বের উপর জোর দিতে হবে। বস্তুতঃ, দ্বিতীয় পেপারে 'প্যারোটিং'এর অবকাশ অতি অল্প। তৃতীয় পেপারেও তথৈবচ। তা লিখিত না হয়ে মৌখিক হওয়ায় ছাত্রদের পঠন, কথন, ভাবগ্রহণ ও ভাব-প্রকাশ-ক্ষমতার বিচার করা যেমন সহজ তেমনি অনেকখানি সঠিকও হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ছাত্রেরা লেখার বেলায় কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য হলেও দুটো কথা মুখ ফুটে বলতে গেলে একেবারে হকচকিয়ে যায়। অথচ লেখার চেয়ে বলার প্রয়োজন সামাজিক জীবনে অনেক বেশী।

এ ছাড়া সিলেবাসের মৌখিক অংশের আরও কয়েকটি দিক আছে। দ্রুত পঠনের বইগুলি ছেলেরা একেবারে পড়ে না, এ কথা পূর্বেই বলেছি। সিলেবাসে মৌখিক প্রশ্নোত্তর ও সরব পঠনের স্থান থাকায় ছাত্রেরা তা না পড়েই পারে না; কারণ নোট-বুক এখানে অচল। পুস্তক থেকে ছোট ছোট প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দেবার জন্য এবং সুন্দর পঠনের জন্য মর্ম-গ্রহণের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ছাত্রকে আসল পাঠ্যপুস্তক পুনঃ পুনঃ পড়তেই হবে। মুখস্থের বালাই নেই, বারবার ভাল ভাবে পাঠ করলে পুস্তকের বিষয়বস্তু আপনা হতেই ছাত্রমনে বদ্ধমূল হবে।

উচ্চাঙ্গের যে-কোন সাহিত্য ভাবরাজ্যের জিনিষ। এ ছাড়া সাহিত্যিক হলেন স্রষ্টা, দ্রষ্টা ও ভাবুক। তাঁর প্রতিভা, ও খ্যাতি ছাত্রমনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি না এনে পারে না। কথায় বলে, ধারে ও ভারে কাটে। নামী সাহিত্যিকের ধারও আছে ভারও আছে। সংবাদপত্র ও সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ এইখানেই। সংবাদপত্রের লেখা যতই সুচিন্তিত ও সুন্দর হোক না কেন, যদি নামী লেখনী থেকে না বেরিয়ে থাকে তাহলে তার প্রভাব ছাত্রমনে ততটা দামী হয় না। এইজন্যই নামকরা সাহিত্যিকের লেখা ভাব-সম্প্রসারণে যতটা সাহায্য করে, অন্য কোন কিছুই ততটা করে না।

কবিতা-পাঠের মতই সাহিত্যপাঠেও যথেষ্ট সতর্কতা চাই, অন্যথায় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। আমরা সাহিত্যকে যে ভাবে ছাত্রের সামনে উপস্থিত করি তাতে তার উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে ব্যর্থ না হয়ে পারে না। ব্যাকরণের কচ্‌কচি ও সমালোচনা কপচানি দ্বারা আর যা-ই হোক সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য—শ্রেষ্ঠ মনীষার ভাব-সম্পদের অলক্ষ্য স্পর্শে নিজের মনোরাজ্যের ভাষাকে সোনা করা—নিষ্ফল হতে বাধ্য। অস্ত্রোপচার সফল হতে পারে, কিন্তু রোগী টেঁকে না। ছাত্র-মনে সাহিত্যের এই অদৃশ্য প্রভাব বাড়াতে হলে ছাত্রকে এক বার, দু' বার, দশ বার, বিশ বার সাহিত্য পড়তে হবে। যতই পড়বে সাহিত্যের রূপ, রস, গন্ধ ততই পরিস্ফুট হতে থাকবে; যতই দিন যাবে সাহিত্যের প্রভাব হবে ছাত্রজীবনে সুদূরপ্রসারী ও কার্যকরী। সিলেবাসে সরব পঠনের ব্যবস্থা রাখলে এ বিষয়ে সুফল পাওয়া যাবে।

ছাত্রের মৌলিক রচনাও এর ফলে সমৃদ্ধ না হয়ে পারে না। লিখনভঙ্গীকে বলা চলে হীরক-হার অথবা পুষ্পমাল্য। হার'ও মাল্যের সৌন্দর্য নির্ভর করে প্রথমতঃ বিভিন্ন বর্ণের জহরৎ অথবা পুষ্প-প্রাচুর্যের উপর এবং দ্বিতীয়তঃ এদের সংমিশ্রণ ও সংযোজনার উপর। লিখনভঙ্গী তেমনি নির্ভর করে শব্দসম্ভারের প্রাচুর্য, বাক্‌পদ্ধতি ভাষারীতি প্রভৃতির জ্ঞান ও এগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগের উপর। ছাত্র যত পড়বে তার বাক্‌-পদ্ধতি ও ভাষা-রীতি এবং সর্বোপরি প্রকাশভঙ্গী উন্নত না হয়েই পারে না। দু-দশ জন সেরা সাহিত্যিকের লিখনভঙ্গী ওতঃপ্রোতভাবে মনের উপর ক্রিয়া করতে থাকে, এবং শেষে সর্বসমন্বয়ে গঠিত হয় তার নিজস্ব ষ্টাইল। বর্তমানে ছাত্রদের নিজস্ব রচনার দারিদ্র্য এই ভাবে ঘুচানো যেতে পারে।

বর্তমান পদ্ধতিতে হোম-ওয়ার্ককে (গৃহে লিখন-পঠন) অবহেলা করা হচ্ছে। হোম-ওয়ার্কের জন্য পরীক্ষায় নম্বর নির্দিষ্ট না থাকায়, এর প্রতি ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই বড় একটা চাড় দেখা যায় না—একে তো শিক্ষকের সময়াভাব তাতে ছাত্রের আগ্রহের অভাব,—শিক্ষককে ফাঁকি দেবার সুযোগ কখনো সে পরিত্যাগ করে না। তার উপর বিভিন্ন বিষয়ের হোম-ওয়ার্কের কার্যক্রম বড় একটা দেখা যায় না। ফলে, কোন দিন বা ছাত্রের ঘাড়ে পাঁচ-ছয় বিষয়ের হোম-ওয়ার্ক পড়ল, অন্য দিন একেবারেই হয়ত ফাঁক গেল।

এর প্রতিকার করতে হলে সিলেবাসে অন্যান্য বিষয়ের মত হোম-ওয়ার্কেরও ঠাঁই করতে হবে এবং শিক্ষককে তা দেখবার সময় ও সুযোগ দিতে হবে। সুষ্ঠুভাবে হোম-ওয়ার্ক পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা চাই; শিক্ষক ও ছাত্র কারও উপর যেন অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। হোম ওয়ার্ক অতিমাত্রায় কঠিন বা সহজ না হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রত্যেকটি হোম-ওয়ার্কের জন্য ছাত্রকে ক্লাসেই কতকটা প্রস্তুত করাতে হবে, অবশ্য মৌলিক রচনার কথা স্বতন্ত্র। এই ভাবে এগোতে পারলে ছাত্রের চাড় না এসে পারে না।

হোম-ওয়ার্ক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারলে কাজ অনেকদূর এগিয়ে যাবে। এই কারণেই মাতৃভাষার এর জন্য ৫০ নম্বর রাখা হয়েছে। মাতৃভাষায় ছাত্রদিগকে স্বাবলম্বী করতে হলে মৌলিক রচনা ও হোম-ওয়ার্কের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। প্রথম পেপার অপেক্ষা দ্বিতীয় পেপারে হোম-ওয়ার্কের নম্বর এইজন্যই রাখা হয়েছে দেড় গুণ বেশী।

বাজারের চলতি নোট-বইয়ের প্রচলন বন্ধ করতে হবে, এ কথা বহু বার বলা হয়েছে। ছাত্রগণ স্বাবলম্বী হলে এ কাজ সহজ হবে। দু-ভাবে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে—শিক্ষকের নিকট হতে নোট গ্রহণ করে এবং নিজেরাই নোট তৈরি করে।

শিক্ষককে নোট দিতে হলে তাঁর পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন। বর্তমানে যে পাঠ-টীকা (lesson notes) রাখার ব্যবস্থা আছে তা একেবারে অকেজো। লোক দেখানো পাঠ-টীকায় আর যা-ই হোক সত্যিকারের কোন কাজ হয় না—কি শিক্ষকের কি ছাত্রের। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ভালভাবে কাজের উপযোগী পাঠ-টীকা রাখা হয় না কেন? এর জবাবের জন্য বেশী দূর যেতে হয় না। সপ্তাহে ৩৯ পিরিয়ড (পাঠ-ঘণ্টা) কাজের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষককে কমবেশী ২৯ পিরিয়ড ক্লাস নিতে হয়। অর্থাৎ দৈনিক গড়ে তিনি দেড় পিরিয়ড অবসর পান; ৪০ মিনিটে এক পিরিয়ড হলে তা হয় মাত্র এক ঘণ্টা। অনুপস্থিত শিক্ষকের জের টানার পর অবসরের যা ছিটা-ফোঁটা বাকী থাকে তার মধ্যে তাঁকে ক্লাসের হিসাবপত্র, হোম-ওয়ার্ক খাতা-পরীক্ষা প্রভৃতি সেরে নিতে হয়। কাজেই স্কুলে প্রস্তুতির সময় ও সুযোগ কোথায়? বাড়ীতে অবসর সময়ে যদি কেউ ইচ্ছাও করেন, তবু পূর্ণ প্রস্তুতি তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এর জন্য বেশ ভাল রকমের পুস্তক-সংগ্রহ প্রয়োজন—সেখানে থাকবে নানা রকমের দামী রেফারেন্স বই। কিন্তু এতদ্দেশীয় গরীব শিক্ষকের ব্যক্তিগত পুস্তক-সংগ্রহের কল্পনা আকাশ-কুসুম মাত্র।

ভাল ভাবে সমস্ত কাজ চালাতে হলে শিক্ষককে স্কুলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাববার ও প্রস্তুত হবার সময় ও সুযোগ দিতে হবে। অবসর সময়ে শিক্ষক স্কুলের লাইব্রেরি মন্থন করে ছাত্রদের জন্য নোট প্রস্তুত করবেন। এ ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর। এতে শিক্ষকের জ্ঞানের পরিসর বহুগুণে বাড়বে; ছাত্রেরাও বিশেষ উপকৃত হবে।

নোট কথা ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণে ও তার প্রয়োজন অনুযায়ী মানসিক খোরাক যোগানোর এ ধরণের নোট দেওয়ার ব্যবস্থা বিশেষ উপকারী। কিন্তু নোট দান ও নোট গ্রহণকে কার্যকরী করতে হলে শিক্ষককে দৈনিক কম পক্ষে তিন পিরিয়ড অর্থাৎ পুরা দুটি ঘণ্টা অবসর দিতে হবে। এর উপর কোনক্রমেই হাত দেওয়া চলবে না। প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষক-সংখ্যা দেড় গুণ না হোক, কম পক্ষে সওয়া গুণ বাড়াতে পারলে এই ভাবে কাজ করা সম্ভবপর হবে। কেরাণীর সংখ্যা বাড়িয়ে শিক্ষককে হিসাব-নিকাশের হাত থেকে রেহাই দিলেও কিছু কাজ হতে পারে। এ ছাড়া, প্রত্যেক ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা রাখতে হবে পঁচিশের কাছাকাছি। অন্য যে-কোন ভাবে কাজ করতে গেলে সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না।

ছাত্রেরা নোট গ্রহণে সমর্থ হলে তাদের নোট তৈরির পালা আরম্ভ হবে। শিক্ষক সব বিষয়ে নোট দেবেন না; তিনি কখনো নোট দেবেন, কখনো শুধু পুস্তকের উল্লেখ করবেন। ছাত্রগণ অবসর সময়ে লাইব্রেরিতে বসে উল্লিখিত পুস্তক থেকে বিষয়টি টুকে নেবে। এর জন্য দুটি জিনিষের প্রয়োজন—স্কুলের ভাল লাইব্রেরি এবং তা ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা। প্রত্যেক দিন ছাত্রদের কমপক্ষে এক ঘণ্টা 'লাইব্রেরি পিরিয়ড' রাখতে হবে। ক্লাস-লাইব্রেরিতে ক্লাস-টিচারের তত্ত্বাবধানে এই কাজ চালানো যেতে পারে, যদি প্রত্যেক শ্রেণীর উপযোগী বিভিন্ন ধরণের রেফারেন্স বই ও অন্যান্য পুস্তক দেওয়া সম্ভবপর হয়। তা না হলে একজন অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক রেখেও এ কাজ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পদ্ধতিই প্রকৃষ্ট। লাইব্রেরি ঘরে বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী পুথি-পত্র পৃথক পৃথক সাজানো থাকবে এবং এ ছাড়া সর্বপ্রকারের রেফারেন্স-বই সকলের অধিগম্য অবস্থায় রাখতে হবে।

পাঠ্য পুস্তকের গল্প প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি ছাত্রগণ যাতে পনর-বিশ বার সরবে পাঠ করে, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ বিষয়ে তাদের বিশেষরূপে উৎসাহিত করতে হবে। দ্রুত পঠনের পুস্তকগুলি বহুবার পাঠ করার যে সুফল হবে, সংকলনের গদ্য ও পদ্যাংশ পুনঃ পুনঃ পাঠেও ঠিক সেই একই ফল দিবে। এই সম্পর্কে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। গদ্য ও পদ্যাংশ সংখ্যায় অধিক হলে কাজও হবে ভাসা ভাসা, আর ফলও বিশেষ পাওয়া যাবে না। এইজন্য নাম-কা-ওয়াস্তে গালভরা সিলেবাস না করে ছাত্রের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা তৈরি করতে হবে।

অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে, মৌলিক রচনার প্রতিও বিশেষ নজর রাখতে হবে। ছাত্রকে শুধু মৌলিক রচনায় মৌখিক উৎসাহ দিলেই কাজ হবে না, তাকে মাঝে মাঝে পথও দেখাতে হবে। লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষক ছাত্রের সঙ্গে এমন ভাবে আলাপ-আলোচনা করবেন যেন মৌলিক রচনার প্রতি তার আগ্রহ দিন দিন বাড়ে এবং তার মাল-মশলারও অভাব না হয়। সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনারও বিশেষ প্রয়োজন।

সকল ছেলের মৌলিক রচনা সমান ভাবে উতরায় না। এ বিষয়ে পারদর্শী ছাত্রছাত্রীদিগকে বিশেষ ভাবে উপদেশ ও উৎসাহ দানের প্রয়োজন। উৎসাহ ও সুযোগ পেলে তারা অনেক কিছুই লিখতে পারবে, কিন্তু সব কিছু শিক্ষকের পক্ষে দেখা সম্ভবপর হবে না, সংশোধন করা ত দূরের কথা। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে রচনা সংশোধন করা না করায় বিশেষ কিছু আসে যায় না, আসল কথা হ'ল প্রেরণা যোগানো। বন্যার জলে কিছু কাদামাটি থাকবেই, পরিশ্রুত করতে গেলেই বন্যার জলে বাঁধ পড়বে এবং তা হবে বিলাস জল। আরো বিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত করতে হলে তাকে পুরতে হবে ছিপি-আঁটা বোতলে। পরিশ্রুতি এর উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য হ'ল পলি ফেলানো, যার ফলে ক্ষেতে ফলবে সোনার ফসল। প্রেরণার উৎসমুখ যদি খুলে রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে ঝরণাধারার মত তা নিজ গতিপথ বেছে নেবেই এবং পরবর্তী কালে নদীর মত সুপের জল বিতরণ করবে।

ইংরেজী :—গত শতাধিক বৎসর ধরে ইংরেজীর মারফত শিক্ষাদানের ফলে শিক্ষার গতি মন্থর হয়ে পড়েছে। এই ভুল অনেক আগেই ধরা পড়েছে এবং দু-এক জায়গায় সংশোধন-কার্য্যও ইতিমধ্যে সুরু হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নিজাম রাজ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে উর্দুর মারফত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও চলছে, কিন্তু বাংলাদেশ এ বিষয়ে বিশেষ পশ্চাৎপদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন স্তরে বাংলা ভাষার মারফতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কাগজে-কলমে করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তা চালু করার সুব্যবস্থা এখনো হয় নাই। অনেক পাঠ্য পুস্তক ইংরেজী ও বাংলার সংমিশ্রণে লিখিত হওয়ায় এক উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া ছাত্রেরা ক্লাসে শেখে আধা বাংলা আধা ইংরেজীর মারফত, কিন্তু পরীক্ষার হলে প্রশ্ন আসে পুরোপুরি ইংরেজীতে। প্রশ্নই বোঝে না তার উত্তর দিবে কি? জানা জিনিষও তাল-গোল পাকিয়ে গোলকধাঁধাঁর সৃষ্টি করে।

ম্যাট্রিকুলেশনে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা, কিন্তু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তা এখনো ইংরেজী। মজা মন্দ নয়। যে ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষার মারফতে শিক্ষালাভ করছে, তারা ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে গিয়ে হাবুডুবু খেতে থাকে—না বক্তৃতা বোঝে, না কিছু শোনে। কাজেই কি মাতৃভাষা, কি বিদেশী ভাষা কোনটাই এরা আয়ত্ত করতে পারে না। ফলে কলেজ দেয় স্কুলের শিক্ষার দোষ, স্কুল চাপায়, হয় প্রাথমিক শিক্ষার নয় কলেজের শিক্ষার ঘাড়ে। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দোষত্রুটি যথেষ্ট আছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই-নৌকায় পা-দেবার নীতিই যে মুখ্যতঃ এর জন্য দায়ী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এদেশে শিক্ষায় বিদেশী ভাষার প্রকৃত স্থান যত শীঘ্র নির্দ্ধারিত হয় ততই মঙ্গল। বিদেশী ভাষাকে কোনক্রমেই মাতৃভাষার সমান মর্য্যাদা দেওয়া উচিত নয়। এতে মাতৃভাষা প্রসারের যথেষ্ট অসুবিধা হয়। অথচ আমাদের দেশে বিদেশী বিমাতৃভাষাকে মাতৃভাষার অনেক উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। হাতে হাতে এর কুফলও ফলছে। "ইংরেজী ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্ত্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেইজন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাই নে। চারিদিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন, আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না।"(১) রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কতখানি সত্য তা বলে দেবার প্রয়োজন হয় না।

মাতৃভাষাকে অবহেলা করার ভাব ও ভাষা দুই-ই হচ্ছে পঙ্গু। মাতৃভাষায় যারা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেলে না তারা বিদেশী ভাষার মারফত তা করবে কিরূপে? গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার মতই এটা হাস্যকর। অ-বরেণ্যকে বরণ করবার জন্য অনিদ্রায় অনাহারে এই যে ব্যর্থ সাধনা, এর স্বরূপ উপলব্ধি দেশবাসীর কবে হবে, কবেই বা এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবসান ঘটবে?" বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে" রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও "বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মত উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি—তোমার অভ্রভেদী শিখর-চূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙালী চিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।"*

মাতৃভাষার সঙ্গে যে-কোন একটি বিদেশী ভাষা পাঠে মনের ও জ্ঞানের প্রসার ঘটে, এ কথা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু তাই বলে তা মাতৃভাষার সমকক্ষ কোনক্রমেই নয়। মাতৃভাষা চক্ষু, বিদেশী ভাষা চশমা; একটি হস্ত ও পদ, অপরটি লাঠি। চশমা অন্ধকে চক্ষুদান করতে পারে না, লাঠি হস্তপদহীনের কোনো কাজে আসে না। মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ভাব ও ভাষার উপর যতখানি দখল ও মৌলিকত্ব অর্জ্জন, বিদেশী ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্য ততখানি নয়। এর উদ্দেশ্য ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে সাধারণ রূপে ভাবের আদান-প্রদান—শুদ্ধ ভাবে পঠন, লিখন, ভাব গ্রহণ ও ভাব প্রকাশ। বিদেশী ভাষার স্থান তাই গৌণ।

এই দিক থেকে বিবেচনা করলে বর্ত্তমান ইংরেজী সিলেবাসে কিছু পরিবর্ত্তন দরকার। তা নিম্নলিখিত রূপে গঠন করা যেতে পারে :—

প্রথম পেপার	গদ্য	(সংকলন)—	৩০	নম্বর
(লিখিত)	পদ্য	"	২০	"
	ব্যাকরণ	"	১৫	"
	মর্ম্মলিখন	"	১০	"
	চিঠি	"	১০	"
			৮৫	"
		হোম-ওয়ার্ক	১৫	"
		মোট	১০০	নম্বর
দ্বিতীয় পেপার (২)	রচনা		২০	নম্বর
(লিখিত)	অনুবাদ		১৫	"
			৩৫	"
		হোম-ওয়ার্ক	১৫	"
		মোট	৫০	নম্বর

(১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শিক্ষার বিকিরণ।

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শিক্ষার বিকিরণ।

তৃতীয় পেপার—প্রয়োজন ২০ নম্বর } নির্বাচিত পুস্তক
(মৌখিক) সরব পঠন ১৫ " } হইতে
বক্তৃতা ১৫ " যদি অথবা পরিচিত বস্তু ও বিষয় সম্পর্কে

মোট ৫০ নম্বর

মাতৃভাষা ও বিদেশী ভাষা পঠন ও পাঠদানে ভাষাং উদ্দেশ্যের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যবহারিকত্ব ও মৌলিকত্ব উভয়ই, বিদেশী ভাষার উদ্দেশ্য শুধু ব্যবহারিকত্ব। সাধারণ ভাবে সাধারণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান এবং সাধারণ রকমের পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ করে মর্ম-গ্রহণ করতে পারলেই যথেষ্ট। এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী মাতৃভাষার পাঠদান ও পাঠগ্রহণ পদ্ধতি সামান্য রদবদল করে ব্যবহার করা চলে। বস্তুতঃ, নোট-দান, নোট-গ্রহণ ও নোট-প্রস্তুত-প্রণালী স্থান-কালপাত্র ভেদে ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংকোচন করে ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সকল বিষয়ে পাঠদানে ও গ্রহণে প্রযোজ্য।

অঙ্ক—গণিত ও জ্যামিতি এ দুটির আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তবু এর মধ্যেও কতকটা নির্বাচন ও সংকোচন প্রয়োজন। ব্যবহারিক জীবনে যে সমস্ত অঙ্ক এবং জ্যামিতিক উপপাদ্য ও সম্পাদ্য বিশেষ প্রয়োজনীয় তারই উপর ভিত্তি করে অঙ্কের সিলেবাসের সংস্কারসাধন করতে হবে। গণিতে খুব বেশী সংকোচন হয়ত সম্ভবপর হবে না, কিন্তু জ্যামিতিতে অনেকখানি ছাঁটাই ও বাছাই করতে পারলে ভাল। ব্যবহারিক দিক থেকে বীজগণিতের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তা একেবারেই বাদ দেওয়া যেতে পারে। যদি একান্তই বাদ দেওয়া না চলে, তবে অঙ্ক-শাস্ত্রের একটি শাখা হিসাবে তার মূল নীতি ও বেছে বেছে গুটি-কয়েক ফরমুলা শেখানো যেতে পারে। ছাত্রের স্কন্ধ থেকে অনাবশ্যক চাপ যতটা কমানো যায় ততই সুফল দেবে। এই হিসাবে অঙ্কের সিলেবাস নিম্নোক্তরূপ হতে পারে—

(ক)	গণিত	৫০	নম্বর
(বীজগণিত বাদ দিলে)	জ্যামিতি	৩০	"
		৮০	"
	হোম-ওয়ার্ক	২০	"
	মোট	১০০	নম্বর
(খ)	গণিত	৪০	নম্বর
(বীজগণিত রাখলে)	জ্যামিতি	৩০	"
	বীজগণিত	১৫	"
		৮৫	"
	হোম-ওয়ার্ক	১৫	"
	মোট	১০০	নম্বর

ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতি :—বর্তমানে ভারতের ও ইংলণ্ডের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতের শাসন-পদ্ধতি বিত্যালয়পাঠ্য ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। একে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নেওয়া চলে। ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতি একই পর্যায়ভুক্ত বিষয়, একটি না জানলে অপরটি ভাল ভাবে জানা যায় না। এই জন্য ইতিহাসের সিলেবাস নিম্নোক্তরূপ হওয়া উচিত—

ভারতের ইতিহাস	...	৫০ নম্বর	
ভারতের শাসন-পদ্ধতি	...	৩০ "	
চল্‌তি ঘটনা	...	১০ "	(মৌখিক)
		৯০ "	
হোম-ওয়ার্ক	...	১০ "	
মোট	...	১০০ নম্বর	

অনেকের মতে বিদেশী যে-কোন একটি ইতিহাস পাঠ না করলে নিজের দেশের ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মে না। এ কথা অতি সত্য। কিন্তু যারা নিজের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধেই অজ্ঞ, তারা অন্য দেশের ইতিহাসকে মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করবে কিরূপে? এইজন্য ইংলণ্ড, রোম অথবা গ্রীসের ইতিহাসের চেয়ে ভারতের শাসন-পদ্ধতি শিক্ষাদান বহুগুণে শ্রেয়ঃ। নাগরিকের পক্ষে দেশের শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। এ ছাড়া ভারতের ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতি ভাল ভাবে পাঠ ও এ বিষয়ে পাঠদান করতে গেলে ইংলণ্ডের ইতিহাস তুলনামূলক ভাবে কিয়ৎ পরিমাণে না এসে পারে না।

ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ সাধন করতে না পারলে এগুলোর শিক্ষা হয় অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ। বর্তমানের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মসংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহের সংমিশ্রণে নিত্য নূতন ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতি রচিত হচ্ছে। ইতিহাসের এই ধারার সঙ্গে ছাত্রের পরিচয় ঘটাতে না পারলে ইতিহাস-পাঠ হয় নিতান্ত নীরস বস্তু।

ভূগোল ও বিজ্ঞান :—ভূগোল ও বিজ্ঞানের জন্য দুটি বিভিন্ন প্রশ্নপত্রের প্রয়োজন নেই, যদিও এই বৈজ্ঞানিক যুগে এগুলোর যত বিশদ আলোচনা হয় ততই ভাল। ছাত্রদের সময় ও সামর্থ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। ছাত্রের মঙ্গলামঙ্গলই হ'ল আসল কথা। এখন প্রশ্ন, এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় এক প্রশ্ন-পত্রের মধ্যে রাখা যায় কিরূপে? এতে পাঠদানই বা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হবে? এর উত্তর এই যে 'সেকেন্দার শাহের মত গরডিয়ান-গিরা কাটা' ছাড়া এ সমস্যা সমাধানের আর কোন উপায় নেই, প্যাঁচ খুলতে যাওয়াই বোকামি। বর্তমান জগতে সকল নাগরিক জীবন যাপনের জন্য কোনটাই বাদ দেওয়া যায় না, অথচ পুরোপুরি শেখাও সম্ভবপর নয়; এ ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা ছাড়া উপায় কি? সিলেবাস নিম্নোক্ত রূপ হতে পারে—

ভূগোল— ৪০ নম্বর
বিজ্ঞান— ৪০ ,,
সাধারণ জ্ঞান— ১০ ,, (মৌখিক)
৯০ ,,
হোম-ওয়ার্ক— ১০ ,,
মোট— ১০০ নম্বর

এই ব্যবস্থায় ভূগোল প্রায় পূর্ববৎই রইল। শুধু যে-বিজ্ঞানকে একটা পুরো প্রশ্নপত্র করে বাধ্যতামূলক করার কথা হচ্ছে, তাকে বিশেষরূপে ছাঁটাই করতে হবে। ম্যাট্রিকুলেশন স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি নয়, বিজ্ঞানের মূলনীতি ও নিত্য ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির সাধারণ ভাবে আলোচনা, যাতে এই সাধারণ জ্ঞানের অভাবে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের পদে পদে বিড়ম্বিত হতে না হয়। এই উদ্দেশ্য সামনে রাখলে সিলেবাস রচনা কতকটা সহজ হবে।

ধর্ম-ভাষা :—সংস্কৃত ও আরবী হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম ও সভ্যতার আদি ভাষা হিসাবে এখনও বিশেষরূপে সমাদৃত। কোরাণ ও বেদ বুঝতে হলে সকলের এ দুটির চর্চা অত্যাবশ্যক। ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু এই ভাষা দুটি শিক্ষার বর্তমান পদ্ধতি দেখে মনে হয় এগুলোর চর্চা ধর্ম-ভাষা হিসাবে সিলেবাসে স্থান পায়নি। একমাত্র ধর্মের বাহন হিসাবে বিবেচনা করলে আরবীর পরিবর্তে ফারসী অথবা উর্দুর ব্যবস্থা রাখা উচিত নয়। অনেকে বলবেন, ধর্মের মূল ভাষা না হলেও উর্দু ও ফারসীর মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্ম ও সভ্যতার এত বিকাশ সাধিত হয়েছে যে, এগুলোকেও অংশত ধর্মভাষা বলা চলে। এর উত্তরে বলা যায়, আরবীর পরিবর্তে অন্য কোন ভাষার মারফত যদি ধর্ম-শিক্ষা করতে আপত্তি না থাকে, তবে বাংলার মারফতে শিক্ষা করলেই বা আপত্তি কি? দু'চার জায়গায় ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে কাজও সুরু হয়েছে। মাতৃভাষায় পুরোপুরি ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে ধর্ম সম্বন্ধে বর্তমান অজ্ঞতা অনেকখানি কমে আসত। মসজিদে খোতবা পাঠ ও নমাজ বর্তমানে শতকরা ৯৯ জন বাঙালী মুসলমানের কাছেই দুর্বোধ্য। প্রার্থনার বিষয়বস্তুই যদি অজ্ঞাত রইল, তবে চরিত্রের উপর তা প্রভাব বিস্তার করবে কিরূপে? অথচ মাতৃভাষায় ধর্মশিক্ষা ও প্রার্থনা প্রচলিত হলে তা সহজেই মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হবে।

মোট কথা, শুধু ভাষা শিক্ষা হিসাবে আরবী ও সংস্কৃতের স্থান সিলেবাসে না রাখাই উচিত। এতে অযথা ছাত্রমনকে পীড়িত করা হয়। কারণ, একে তৃতীয় ভাষা, তাতে সপ্তম শ্রেণী থেকে যে ভাবে তার চর্চা হয় তাতে চার বৎসরে ছাত্রদের এক রকম কিছুই শেখানো যায় না। চার বৎসর পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর চর্চা করবার সুযোগ আর না হওয়ায়, সংস্কৃত ও আরবী ফারসির যে চর্চা হয়েছে তাই ছাত্রেরা বে-মালুম ভুলে যায়। একে শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার ছাড়া আর কি বলা যায়? এরূপ ক্ষেত্রে হয় একে বাদ দিতে হয়, নয় উর্দু হিন্দী আরবী ফারসী ও সংস্কৃতকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীর পরিবর্তে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

সত্যিকার ধর্মভাষা হিসাবে সংস্কৃত ও আরবীর চর্চা হলে, এই দুই ভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষা নেওয়া চলবে না। কারণ সে ক্ষেত্রে এই ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। ধর্ম-শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি এই ভাষা-শিক্ষা দেওয়া হয়, তা হলে এর সিলেবাসের সংস্কার প্রয়োজন। তা নিম্নলিখিত রূপে করা যেতে পারে,—

ধর্মগ্রন্থ সংকলন (মূল ভাষায়)—৪০ নম্বর } লিখিত
মূল ভাষার ব্যাকরণ —২০ ,, }
হোম-ওয়ার্ক —১০ ,,
৭০

বাংলা ভাষায় স্বধর্মের সার ও } মৌখিক ও
অন্য ধর্মের উদার আলোচনা ৩০ } ব্যবহারিক

মোট ১০০ নম্বর

কলেমা-কালাম, রোজা নমাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপন করবার জন্য কোরাণ শরিফের বৈশিষ্ট্যমূলক গুটিকয়েক ছোট ছোট সুরা ও আয়াত দ্বারাই সংকলন রচিত হবে। তা সংখ্যায় অল্প হবে যেন এগুলির মর্ম ছাত্রেরা সঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারে। আর একখানি গ্রন্থে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও সৌন্দর্য এবং অন্য ধর্মের তুলনামূলক উদার আলোচনা বাংলার মারফত ছাত্রদের সামনে ধরতে হবে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের জন্যও ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

এই ব্যবস্থার ফলে ছাত্রগণ হবে নিজ নিজ ধর্মে আস্থাবান ও পরধর্মসহিষ্ণু। স্বধর্মে অজ্ঞতা ও পরধর্মে অসহিষ্ণুতাই হ'ল বর্তমান হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূল কারণ। স্বধর্মের আসল পরিচয়ের সহিত পরধর্মের সহানুভূতিপূর্ণ উদার আলোচনা মিলিত হলে এ বিরোধের অবসান হতে পারে। সর্বজাতীর ছাত্রদের জন্য সার্বজনীন নীরব প্রার্থনা এবং যদি পারা যায়, বিভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন আড়ম্বরহীন প্রার্থনার ব্যবস্থা করলে বিশেষ সুফল হবে। হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত স্কুলে আনুষ্ঠানিক ধর্ম এর চেয়ে খুব বেশী প্রচলন সম্ভবপর হবে না। এটা গৃহের কাজ। মোট কথা, ধর্ম-ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ভাষা-শিক্ষা বা ধর্মান্ধতা বৃদ্ধি নয়, ধর্ম-প্রাণতা ও উদারতা, মানসিক উৎকর্ষ নয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। ধর্ম-ভাষার প্রকৃত হোম-ওয়ার্ক হবে স্কুলের শিক্ষাকে সুসংস্কারযুক্ত ধর্মকর্মে রূপায়ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে, গৃহই হ'ল ধর্মশিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

বাধ্যতামূলক প্রশ্নপত্র—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ :—

ম্যাট্রিকুলেশনের জন্য পাঠ্য বিষয় দিন দিন বাড়ছেই এবং ছাত্রদের উপর অযথা ভার চাপানো হচ্ছে, এ অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। কথাটা কেলবার মত নয়। এইজন্য বর্ত্তমান সিলেবাসের সঙ্গে আমাদের প্রস্তাবিত সিলেবাসের তুলনা করা প্রয়োজন।

বর্ত্তমান কোর্স

বিষয়		নম্বর
বাংলা ভাষা (লিখিত)	—	২০০ নম্বর
ইংরেজী "	—	২৫০ "
অঙ্ক "	—	১০০ "
ইতিহাস "	—	১০০ "
ভূগোল "	—	৫০ "
ক্লাসিক "	—	১০০ "
মোট	—	৮০০ নম্বর

প্রস্তাবিত কোর্স

	লিখিত	মৌখিক	হোম-ওয়ার্ক	মোট নম্বর
বাংলা ভাষা—	১৫০	৫০	৫০	২৫০
ইংরেজী—	১২০	৫০	৩০	২০০
অঙ্ক—	৮০	—	২০	১০০
ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতি —	৮০	১০	১০	১০০
ভূগোল ও বিজ্ঞান—	৮০	১০	১০	১০০
ধর্ম-ভাষা—	৬০	৩০	১০	১০০
	৫৭০	১৫০	১৩০	৮৫০

আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবিত কোর্সকে খুবই গুরুভার বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে ততখানি মনে হবে না। কারণ হোম-ওয়ার্কের জন্ত ১৩০ নম্বর নির্দিষ্ট থাকায়, হোম-ওয়ার্কের প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ বাড়বে এবং শিক্ষা দান ও গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। তা ছাড়া ভাল ভাবে কাজ করলে শতের কাছাকাছি নম্বর সহজেই মিলতে পারে। বর্ত্তমানেও হোম-ওয়ার্ক হয়, তখনও হবে; খাটুনি সমান, অথচ পাসের পথ হবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকখানি প্রশস্ত। মৌখিকের জন্য ১৫০ নম্বর নির্দিষ্ট আছে। লিখিত অপেক্ষা মৌখিক বিষয়ে খাটুনি অর্দ্ধেক কম, অথচ নম্বর পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। অবশ্য কতকটা উপস্থিত-বুদ্ধি চাই।

নম্বরের তারতম্য ছাড়া আর এক দিক থেকে আপত্তি ওঠা স্বাভাবিক। সেটা হ'ল ম্যাট্রিকুলেশন কোর্সে পাঠ্য বিষয়ের প্রাচুর্য। বর্ত্তমানে চলতি ঘটনা ও সাধারণ জ্ঞান ম্যাট্রিকুলেশনের কোর্স-বহির্ভূত। কোর্সের মধ্যে এদের টেনে আনা হয়েছে। শাসন-পদ্ধতি ও বিজ্ঞান এখন ঐচ্ছিক বিষয়, এদের করা হয়েছে বাধ্যতামূলক। এতে মনে হবে ছাত্রের মাথায় কি গুরুতর ভার চাপানো হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে সিলেবাস রচনার উপর কোর্সের গুরুত্ব বা লঘুত্ব যতটা নির্ভর করে, বিষয়ের প্রাচুর্য্যের উপর ততটা নয়।

সাধারণ ভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন যাপন প্রণালী সুন্দর করতে গেলে যতটুকু প্রয়োজন, শুধু ততটুকুই প্রত্যেক বিষয়ের সিলেবাস রচনায় রেখে বাকীটা কেটে ছেঁটে বাদ দিতে হবে, এ কথা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনকেই যদি লক্ষ্য ধরা হয়, তা হলে সিলেবাস লঘু করা সহজ হবে। অনেকে আপত্তি করবেন, এতে জ্ঞান হবে ভাসাভাসা। কিন্তু আমার মনে হয়, সুষ্ঠুভাবে পাঠদান ও পাঠ গ্রহণ চললে এই সিলেবাসের মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা যতখানি শিক্ষালাভ করবে ও বর্ত্তমান জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে, বর্ত্তমান সিলেবাসে তা সম্ভবপর নয়।

ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, বিজ্ঞান, উর্দু ও হিন্দীকে (যদি ইংরেজীর পরিবর্ত্তে উর্দু ও হিন্দীর ব্যবহার না হয়) ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ম্যাট্রিকের পর যারা আর্টস পড়বে, তারা নেবে ইতিহাস, যারা বিজ্ঞান পড়বে তারা হয় অঙ্ক নয় বিজ্ঞান এবং যারা কমার্স পড়বে তারা নেবে ভূগোল। উর্দু, হিন্দী ও ক্লাসিক যে কেউ নিতে পারবে।

পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন—সিলেবাস পুনর্গঠন ও পাঠদান-পদ্ধতির অদল-বদল করতে পারলে পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন কতকটা আপনা হতেই হবে। প্রস্তাবিত সিলেবাসকে কার্যকরী করতে হলে দুই রকমের পরীক্ষার প্রয়োজন হবে—আভ্যন্তর ও বাহ্য (internal & external)। হোম-ওয়ার্ক বিষয়ে প্রধান ও সহকারী শিক্ষকগণই হবেন আভ্যন্তর পরীক্ষক। শিক্ষকের সততা, সত্যানুরাগ ও নিরপেক্ষতার উপর আভ্যন্তর পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করবে। শিক্ষক সততা ও বিবেকের দ্বারা চালিত না হলে বিভিন্ন স্কুলে হোম-ওয়ার্কের নম্বর দানে প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে। প্রবাদ আছে, কোন শিক্ষক নাকি খুশী হয়ে পরীক্ষার্থীকে ১০০ নম্বরের মধ্যে ১১০ নম্বর দিয়েছিলেন। তাঁর ছিল নিঃস্বার্থ ছাত্র-প্রতিভা-প্রীতি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হবে তার উল্টো—স্বার্থান্ধ ছাত্র-প্রীতি।

এর প্রতিকারের জন্ত প্রত্যেক জেলার প্রতিনিধিস্থানীয় চার পাঁচ জন প্রধান ও সহকারী শিক্ষক নিয়ে এক একটি জেলা আভ্যন্তর পরীক্ষক সমিতি গঠন করতে হবে। এই সমিতির কাজ হবে জেলার সমস্ত স্কুলের হোম-ওয়ার্কের নম্বর তদারক ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা। লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা এখনকার মত বাহ্য পরীক্ষক দ্বারাই চলতে থাকবে।

খাদ্য ও টনিক

আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সময়ে একটী উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অসুখেই হউক বা সুস্থ অবস্থাতেই হউক, যখনি কোনো কারণে আমাদের জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ একটী টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার প্রধান একটী কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন আহার্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনে দৈনিক আহার্য্যের এই অক্ষমতা টনিকের দ্বারা পূরণ হয়।

কিন্তু টনিক যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন তাহার একটী দোষ এই যে উহাদ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। সাময়িক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহা বিশেষ কার্য্যকরী হইলেও উহার প্রভাব অল্পকালেই নিঃশেষিত হয়। একমাত্র সুনির্ব্বাচিত কোনো খাদ্যদ্বারাই দৈহিক পরিপুষ্টির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর।

স্তানা-ভিটা এই সকল কারণেই একটী আদর্শ পানীয়-রূপে পরিগণিত। ইহা একাধারে একটী শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটী উৎকৃষ্ট খাদ্যকে আশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে। তাই ইহার নিয়মিত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে।

স্তানা-ভিটা সুনির্ব্বাচিত ও মূল্যবান উপাদানসমূহের সুষম সমন্বয়ে প্রস্তুত। ইহাতে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, ভিটামিন "বি" কমপ্লেক্স, মল্টযুক্ত সয়াসীম ও অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাযথরূপে বিদ্যমান। ইহা সুস্থ কি অসুস্থ যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী। বিশেষ করিয়া রোগান্তে, প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে, বার্দ্ধক্যে এবং বর্দ্ধিষ্ণু শিশু ও মস্তিষ্কজীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়া স্তানা-ভিটা রোগান্তে ও বর্দ্ধিষ্ণু শিশুদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য ও টনিক। রোগবিধ্বস্ত শরীরের দ্রুত সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করিতে ও শিশুদের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য-গুণটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাই প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত স্তানা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি সহজেই আমরা এই ভিটামিন যথাযথরূপে পাইতে পারি। অধিকন্তু খাঁটি দুগ্ধ ও কোকো থাকাতে স্তানা-ভিটা মস্তিষ্ক, পেশী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য করে।

স্তানা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিষ্কজীবীদের পক্ষে অপরিহার্য্য। বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কের পুষ্টি ও শক্তি-বর্দ্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মল্টযুক্ত সয়াসীম স্তানা-ভিটার আর একটি অপূর্ব্ব সম্পদ। বস্তুতঃপক্ষে সয়াসীম খাদ্যতত্ত্বের এক বিস্ময়কর অবদান। উদ্ভিজ্জ জাতীয় হইলেও ইহা আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ। স্তানা-ভিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ ও উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে অতুলনীয় বলা চলে। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে প্রোটিন ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও স্নায়ুমণ্ডলীর সুষ্ঠু পোষণ ও সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই অনুপাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন ২'৫ গ্রাম প্রোটিন। প্রোটিনের এই অপরিহার্য্য দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি কাপ স্তানা-ভিটাতে অন্যান্য নানা মূল্যবান্ উপাদান ছাড়াও দুইটী ডিমের সমান প্রোটিন থাকে। প্রত্যহ দুই কাপ স্তানা-ভিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। উপরন্তু মল্ট ও সয়াসীম থাকাতে স্তানা-ভিটা কেবল যে সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অন্যান্য খাদ্য পরিপাক করিতেও এই অপূর্ব্ব খাদ্য-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে।

প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে জননীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঐ সময়ে নিয়মিত স্তানা-ভিটা ব্যবহার করিতে দিলে যাবতীয় অশুভ উপসর্গ হইতে সহজেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। স্তানা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো ও অন্যান্য মূল্যবান উপাদান থাকাতে ইহা দ্রুত মাতৃদেহের সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করে। চর্ব্বি, প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ-গঠনোপযোগী ও শক্তিবর্দ্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত সহজপাচ্য অবস্থায় স্তানা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়।

স্তানা-ভিটা কি সুস্থ কি অসুস্থ সকলের পক্ষেই সমান উপকারী। যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। স্তানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও সুমিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্তিদায়ক। ইহা গরম বা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে।

বিজ্ঞাপন

পুস্তক-পরিচয়

(১) জপজী—অথবা নানক-গীতা।

(২) জাপজী—অথবা গুরুগোবিন্দ সিংহের অমর-বাণী।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ।০ আট আনা ও ১৲ এক টাকা।

দুইখানি সমপর্য্যায়ের বই, সুতরাং এক সঙ্গেই সমালোচনা করা চলে। দুইখানিতেই শিখদের ধর্ম্মগ্রন্থের কতক অংশের মূল বঙ্গানুবাদসহ প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদের সঙ্গে দেওয়া বাংলা টীকা ও ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত সমার্থক বাক্য বই দুইখানির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। দুইখানি বইয়েই গ্রন্থকারের দীর্ঘ 'মুখবন্ধ' রহিয়াছে। তাহাতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য এবং বিপুল অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। যেসব আলোচনা মুখবন্ধে তিনি করিয়াছেন তাহাতে অনেক জানিবার এবং ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে। বেদ, আবেস্তা, মহাভারত, ভাগবত, হাফেজ ইত্যাদি হইতে সমার্থক অথবা সমান-ভাব-ব্যঞ্জক বাক্য এত উদ্ধৃত হইয়াছে যে, এই পাণ্ডিত্যের গুরুভার সাধারণ পাঠকের পক্ষে বহন করা কঠিন হইলেও পণ্ডিত-পাঠকের তৃপ্তি বিধান করিবে; অধ্যয়নে একটু আয়াস প্রয়োজন হইলেও অধ্যাপনার সুবিধা হইবে।

গ্রন্থকারের ভাষা জ্ঞানীর ভাষা। কিন্তু দুই একটি নূতন শব্দ এবং নূতন অর্থে পুরাতন শব্দ ব্যবহার করিয়া তিনি এই ভাষার কিছু হানি করিয়াছেন, মনে হয়। যথা,—বাংলা 'এবং' 'অথবা' 'আর' এই সংযোগার্থক অব্যয়ের পরিবর্ত্তে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন কিঞ্চ, যথা—জপজী ৩র পৃষ্ঠা, চৈতন্য কিঞ্চ পরমহংস, ঐ ৩৬ পৃষ্ঠা, বুদ্ধ 'কিঞ্চ' জিন, ইত্যাদি। এই অর্থে 'কিঞ্চ' শব্দ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। দর্শন সম্বন্ধে প্রযুক্ত ইংরেজী orthodox শব্দের বাংলায় 'কুলীন' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে (জাপজী—পৃ. ১)। কেন? 'আস্তিক' কথাটার কি অপরাধ? কুলীন' শব্দের যে আরও একাধিক অর্থ রহিয়াছে। Epistemology শব্দের অনুবাদ তত্ত্বজ্ঞান না হইয়া প্রমাণ-জ্ঞান বরং সঙ্গত, তত্ত্বজ্ঞানের ইংরেজী ontology হওয়া ভাল। Prophet (জাপজী পৃ. ৪) অর্থ 'অবতার' নয়। 'নবী' বা 'পয়গম্বর' ইহার অনুবাদ। শুদ্ধ বাংলায় 'ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ' শব্দটিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবতারের ইংরেজী incarnation—মনে রাখা উচিত যে, ইসলাম অবতার মানে না, কিন্তু নবী মানে।

গ্রন্থকারের দুই একটি মন্তব্য সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। জাপজী ৪৩ পৃষ্ঠায় চতুর্থীতে বেগুন খাওয়ার কথা উঠিয়াছে। চতুর্থীতে নিষিদ্ধ ভক্ষ্য মূলা, বেগুন নয়; বেগুন নিষিদ্ধ ত্রয়োদশীতে। লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের এই সব বিশ্বাসের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকিতে পারে কিন্তু উল্লেখ করিলে জানিয়া লইতে দোষ কি?

জাপজী ১৬ পৃষ্ঠায় পাই 'mind and matter', সংস্কৃত দর্শনে বলা হয় 'প্রকৃতি ও পুরুষ।' এখানে অনুবাদে প্রথমতঃ ক্রম-ভঙ্গ হইয়াছে; বলা উচিত ছিল, 'পুরুষ ও প্রকৃতি।' দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত দর্শন অর্থ কি? ভারতের সব দর্শনই ত—জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন সমেত—সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে।

'প্রকৃতি' ত সাংখ্য ছাড়া আর কোন দর্শনই মানে নাই। 'জড়' আর 'প্রকৃতি' ঠিক এক জিনিস নয়।

'জপজী' ১৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার ইসলামের সঙ্গে পার্শীদের ধর্মের যে গভীর সাদৃশ্যের কথা বলিয়াছেন তাহা কোন প্রকারে দেখাইতে পারিলেও উভয়ের সম্পর্ক তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছেন, তাহা ইতিহাস-বিরুদ্ধ। ইসলামের নবী পরম্পরা মূশা হইতে আরম্ভ করিয়া মুহম্মদ পর্য্যন্ত আসিয়াছে, ইহাতে পার্শীদের কোন যোগ নাই। ঐ গ্রন্থেরই ৩৬ পৃষ্ঠায় তিনি বলিতেছেন—'গৌতমবুদ্ধ প্রচার করেন কর্ম্মযোগ, আর বর্দ্ধমান জিন প্রচার করেন জ্ঞানযোগ'। কোন্ অর্থে ঠিক বুঝিলাম না। সন্ন্যাসের সম্মান উভয়ত্রই সমান। জ্ঞানের কথা, দার্শনিক আলোচনা, বৌদ্ধদের অনেক উন্নত; আর, পূজা পার্ব্বণ ইত্যাদি বৌদ্ধদের অপেক্ষা জৈনদের বেশী। কোন্‌টা জ্ঞান আর কোন্‌টা কর্ম্ম?

আর উদাহরণ বাড়াইতে চাই না। গ্রন্থকারের এরূপ আরও মন্তব্য আছে যাহা আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করিতে পারি নাই।

গ্রন্থকারের অধ্যয়ন অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আমাদের মনে হয় তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি একটু দ্রুত-গঠিত, অনেক সময় সহসা-কৃত। একটা জিনিস তাঁহার দীর্ঘ আলোচনায় আমরা পাই না। শিখদের ধর্ম্ম শিখ-জাতি গঠন করিয়াছিল কি প্রকারে? শিখদের বর্ত্তমান সংখ্যা ৪০ লক্ষের মত হইবে। পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আরও কম ছিল। এই মুষ্টিমেয় লোক মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল যে শক্তিতে সে শক্তির উৎস কোথায়? নানককে চৈতন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—"চৈতন্যকে আমরা বলিতে পারি নির্ব্বাক নানক, নানককে বলিতে পারি সবাক্ চৈতন্য" (জপজী ৩৬ পৃ.)। এ সব উক্তিতে বাংলার মৃদঙ্গ আর পঞ্জাবের কৃপাণের প্রভেদ ব্যাখ্যাত হয় না। শিখদের ধর্ম্মকে শুধু ধর্ম্ম হিসাবে দেখিয়া ইহাতে ভক্তিরসের আস্বাদ উপভোগ করা এবং অবশ্যই, রামচন্দ্র এবং চৈতন্যের ধর্ম্মের সঙ্গে উহার ঐক্য আবিষ্কার করা ঐতিহাসিক গবেষণা হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের ঘটনার ব্যাখ্যা তাহাতে হয় না। বীর শিখজাতির উদ্ভব তাহাতে বুঝা যায় না।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাংলা ১৩৫০—শ্রীইন্দু গুপ্ত। বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। চিত্র-পুস্তক। মূল্য দশ টাকা।

শক্তিমান্ তরুণ শিল্পী ইন্দু গুপ্ত নন্দলাল বসুর ছাত্র। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের সংস্রবে আসিয়া তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানেও ছবি আঁকিবার সুযোগ পাইয়াছেন। এই চিত্র-পুস্তক সাতখানি ছবির সমষ্টি। প্রথমখানি সুজলা-সুফলা বঙ্গভূমির পল্লীশ্রী। দ্বিতীয়খানিতে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া শস্যহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। তৃতীয়খানিতে নগরের পথে শীর্ণদেহ তাহাদেরই করুণ খাদ্যের আশায় করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে। চতুর্থখানিতে নগরীর গ্যাসালোকিত অন্ধকারে ডাষ্টবিনের পাশে তিনটি বুভুক্ষু প্রাণী। পঞ্চম ছবিতে দেখি স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া মৃত্যুর মধ্যে স্ত্রীর দীর্ঘ যন্ত্রণার অবসান হইল। ষষ্ঠখানিতে নির্জ্জন নিশীথে ক্ষুধাতাড়িত পরিবারের অবশিষ্ট একটি মাত্র বালক নগর হইতে দূরে ধু-ধু মাঠের মধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া আছে। সপ্তম চিত্রে সমাপ্তি—একটি গাছের তলায় কয়টি কঙ্কাল; উদ্গত তৃণ এবং অরুণাভাস সমাপ্তির মধ্যেও

সূচনায় ইঙ্গিত করিতেছে। প্রচ্ছদপটে বাংলার সবুজ মানচিত্র; তৃণভূমিতে দুটি মড়ার মাথা এবং সবেমাত্র গজাইয়া উঠিতেছে একটি গাছ। বাংলার যে মর্মান্তিক ব্যথা রঙে ও রেখায় চিত্রকর ফুটাইয়াছেন, এই চিত্রমালা প্রত্যেক দরদীর মনে সেই বেদনা জাগাইয়া তুলিবে।

রহস্যময়ী—শ্রীতারাপদ রাহা। সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং L ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

এখানি ছোট গল্পের বই। আটটি গল্পে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ। গল্পগুলি গতানুগতিক নয়, প্রেমের কাহিনীও নয়। সচরাচর সাংসারিক জীবনযাত্রার মধ্যেও কখনও কখনও এমন মুহূর্ত আসে এবং এমন ঘটনা ঘটে যাহাকে প্রাত্যহিক এবং সাধারণ বলা চলে না। এই গল্পগুলিকে বিভিন্ন ঘটনা এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে জীবনের সেই অ-সাধারণত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেষ গল্পটির নামানুসারে বইখানির নামকরণ হইয়াছে। এ কাহিনী যে রহস্যে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে শুধু মরণই তাহার আবরণ উন্মোচন করিতে পারিয়াছে। মৃত্যু-ঘটনার মধ্য দিয়া "সাহিত্যিক" মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন। আর একটি গল্পে একটি ছয়-সাত বৎসরের ছোট মেয়ের দেওয়া ছেঁড়া কাগজের টিকেট তাপসের আত্মহত্যার ইচ্ছাকে শিথিল করিয়া দিল। একটি রোগক্লিষ্ট কচি মুখের আকর্ষণ দারুণ শুচিবায়ুগ্রস্ত মহীতোষের মানসিক ব্যাধির আরোগ্যের কারণ হইয়াছে। এক অদ্ভুত সমস্যা "উর্বশী" গল্পের পাঠকের নিকট সমাধান প্রার্থনা করিতেছে। গল্পগুলি পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। শ্রীতারাপদ রাহা ছোট গল্প লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। "রহস্যময়ী" তাঁহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

প্রান্তিক—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

'প্রান্তিক' উপন্যাসের প্রারম্ভে 'শ্রীমান তারাশঙ্কর' 'অবান্তর কথা'র মারফতে কিছু অভিযোগ আনিয়াছেন। নিতান্ত দৈববশে সাহিত্যক্ষেত্রে একই নামের দুই জন লেখকের আবির্ভাব ঘটিলে এইরূপ গোলযোগ অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য ব্যাপারটি ব্যক্তিগত লাভক্ষতির সীমানায় আবদ্ধ। মহাকালের দরবারে নিরপেক্ষ বিচারের আশ্বাসে আশ্বস্ত হওয়াটা আপাত কঠিন বলিয়াই দুই পক্ষ ইহাতে প্রচুর অশান্তি ভোগ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ কাহাকেও অযথা আক্রমণ না করিয়া (অর্থাৎ অশান্তির উপর অশান্তি না বাড়াইয়া) যথাসম্ভব রফা-নিষ্পত্তি করিয়া লইলে সব দিক দিয়া শোভন হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ বহু প্রমাণের নজীর বিরল নয়।

একটু সাবধানী পাঠক 'ধাত্রী দেবতা'র লেখকের সঙ্গে প্রান্তিকের লেখকের পার্থক্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। তবুও গল্পপ্রিয় পাঠকের কাছে 'শ্রীমান তারাশঙ্করে'র লেখা নিতান্ত সময়কাটানো বা নিদ্রা-সাধনার

উপায়-স্বরূপ বাছিয়া লওয়া কঠিনই ঠেকিবে। পুরাতন বিষয়-বস্তুকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লইবার দক্ষতা লেখকের আছে। গল্প বলার ভঙ্গী তাঁর আয়ত্ত এবং সবচেয়ে প্রশংসার বিষয় অত্যন্ত তরল বিষয়কেও কোথাও তিনি পঙ্কিল করিয়া তুলেন নাই।

এসব গুণাবলী সত্ত্বেও পাঠক বলিতে পারেন আত্মবিস্মৃত নায়ককে তিনি অত্যন্ত নির্লিপ্ত করিয়া গড়িয়াছেন। ভালবাসার স্পর্শ তার বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—তবু সে সম্পূর্ণ জাগ্রত নয়। নায়িকাও আত্ম-সচেতন স্বাধীন চিত্তবৃত্তিসম্পন্না—ভালবাসার অনুভূতিতে তার চিত্ত আলোড়িত, অথচ যে গৃহকে লাভ করিয়া সব দিক দিয়া যে সার্থক হইতে পারিত—মুক্তি আস্বাদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাবশতঃ সেই গৃহ সে ছাড়িয়া গেল। এই যে পরস্পরকে দূরে ঠেলিয়া দিবার আয়োজন—বাহিরের সামান্য মাত্র বাধার অভাবে এটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই। বাস্তবকে অবহেলা করিয়া কল্পনা-সৃষ্ট এই ব্যবধানের কি প্রয়োজনই বা ছিল—এ প্রশ্নও পাঠক সবিস্ময়ে করিতে পারেন।

বৃহত্তর জীবনের উদ্দেশ্য কি গৃহকে অস্বীকার করা? তেমন বৃহত্তর ক্ষেত্র নায়কনায়িকার সম্মুখে ধরা হয় নাই।

পার্শ্বচরিত্রগুলি স্বাভাবিক হইয়াছে এবং গল্প পড়ার কৌতূহল তাহারাই বজায় রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে সিনেমা-সুলভ ভাষার দ্বারা প্রকাশ-ভঙ্গীকে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টাকে সুষ্ঠু প্রয়োগ বলা যায় না।

বিচিত্র হৃদয়—শ্রীপ্রতিভা বসু। কবিতা ভবন, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। দাম—দুই টাকা।

এই সংগ্রহের মধ্যে স্ত্রীজনোচিত, খণ্ড কাব্য, বিচিত্র হৃদয় ও অন্তহীন এই চারিটি গল্প আছে। 'এই চারটি গল্পের মধ্যে একটি সুরই আমি নানা ভঙ্গিতে গেয়েছি।' লেখিকার এই স্বীকারোক্তি পাঠক সানন্দ চিত্তে মানিয়া লইবেন। মানবমনের বিচিত্র লীলা, প্রধানতম বৃত্তি ভালবাসাকে আশ্রয় করিয়া নিত্য প্রকাশিত। সংবেদনশীল মন ও নিপুণ প্রকাশ-ভঙ্গির দ্বারা লেখিকা এই সুরের ইন্দ্রজাল বুনিয়াছেন। মূলতঃ সুর এক হইলেও অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ও বিচিত্র রসমাধুর্য্যে প্রতিটি গল্প অভিষিক্ত। কেবলমাত্র প্রথম গল্পটির পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু অনুযোগ করা যায়। এ সম্বন্ধে লেখিকা সচেতন হইলেও বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসে অলৌকিক এক পারিপার্শ্বিকের সাহায্য লইয়াছেন। গল্পটির অন্তর্নিহিত রস একন্ত কিছু ফিকা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মণিকাঞ্চন (প্রথম খণ্ড)—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত। পাল প্রকাশনা নিকেতন, ২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

বিদেশী-সাহিত্যের অনুবাদে ও শিশুসাহিত্য-রচনায় গ্রন্থকার খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এই পূজা-বার্ষিকীর সম্পাদনা কিশোর-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আমরা তাঁহার সংগৃহীত, প্রখ্যাত ও উদীয়মান বহু সাহিত্যিকের নানা রসসম্ভারে পূর্ণ অজস্র কথা ও কাহিনীর একত্র সমাবেশ উপহার পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। যুগোপযোগী বহু কবিতা ও সচিত্র গল্প ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। এইরূপ একখানি বই ছেলেদের উপহার দিলে অর্থব্যয় সার্থক হইবে। একটি ত্রুটির কথা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা কিছু কম হইয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

গান্ধীজীর রাষ্ট্র-পরিকল্পনা—(গান্ধীজির ভূমিকা-সম্বলিত) শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবাল। অনুবাদক—শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। পূর্ব্বাশা লিঃ পি-১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু। মূল্য—দুই টাকা।

ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশনের আগমনের পর হইতে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দ্রুত পটপরিবর্ত্তন হইতেছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্ত্তমানে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সাম্প্রতিক ঘোষণার ফলে অনেকেরই মনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দিন আসন্ন বলিয়া আশার সঞ্চার হইতেছে। স্বাধীনতা সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতেই আমরা অর্জ্জন করিব। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলেই শুধু হয় না, অর্জ্জিত স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থাই হইতেছে রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য এবং সেইজন্যই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রবিধি কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে—বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারতের গঠন-তন্ত্র প্রণয়নের, ব্যাপক চেষ্টাও চলিতেছে। অধ্যক্ষ শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবাল তাঁহার ইংরেজী পুস্তকে যে পরিকল্পনাটি উপস্থাপিত করিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাহা একটি বিশিষ্ট অবদান বলিয়া গণ্য হইবে। প্রধানতঃ গান্ধীজীর চিন্তা ও আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়াই এই পরিকল্পনাটি রচিত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার পরিকল্পনার খুঁটিনাটি লইয়া গান্ধীজীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া যে নূতন তথ্যাদির সন্ধান পাইয়াছেন তৎসমুদয়ও এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহা শুধু গান্ধীজীর মতামতের প্রতিধ্বনিই নয়, লেখকের নিজস্ব চিন্তাধারাও ইহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। গান্ধীজী ভূমিকায় বলিয়াছেন "কাঠামোটি বাস্তবিক অধ্যক্ষ অগ্রবালই খাড়া করাইয়াছেন, তবে ইহাতে এমন কিছু লেখা হয় নাই যাহা আমার আদর্শের সহিত খাপছাড়া বলিয়া আমার মনে হইয়াছে।" অধ্যক্ষ অগ্রবালের ইংরেজী পুস্তকখানি বাংলায় অনুবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানির প্রকাশ বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিধির ব্যর্থতা আজ সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যান্ত্রিক ও নাগরিক সভ্যতা মানব-জাতিকে ধ্বংসের কোন অতল গহ্বরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, পর পর অনুষ্ঠিত দুইটি মহাযুদ্ধে তাহা দিবালোকের ন্যায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিধিই যে এই ধ্বংসলীলার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। তাই মহাত্মা গান্ধী আজ পাশ্চাত্যের অন্ধ-অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী অহিংসা ও বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্কবিরহিত স্বাধীন ভারতের যে রাষ্ট্র-পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে পৃথিবীতে আবার 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেদিন ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে গড়িয়া উঠিবে রাষ্ট্রের সুদৃঢ় বনিয়াদ। কুটির-শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের নিকট যন্ত্রদানবের উদ্ধত শির অবনত হইবে।

পুস্তকখানি রাজনৈতিক গঠনমূলক কর্ম্মে অনুরাগী, চিন্তাশীল পাঠকমাত্রের অবশ্যপাঠ্য। অনুবাদের ছত্রে ছত্রে ভাষার উপর লেখকের আধিপত্যের নিদর্শন রহিয়াছে। এরূপ দুরূহ বিষয়ের এমন স্বচ্ছন্দ অনুবাদ কম কৃতিত্বের কথা নহে।

শতাব্দীর লেখা—প্রকাশক শ্রীশরৎ দাস। মডার্ণ পাবলিশার্স। ৬ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

ইহা কিশোরপাঠ্য একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থ। ইহাতে রূপকথা, জীবনী, কবিতা, গল্প, অনুবাদ-সাহিত্য, নাটক, রাজনীতি ও অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, এবং সাহিত্য ইত্যাদি সকল প্রকারের লেখাই আছে। যে সমস্ত খ্যাতিমান লেখকের রচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' এবং শ্রীপরিমল গোস্বামীর 'বেগুনি সম্রাট' নামক গল্প দুইটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সঙ্কলন-গ্রন্থ সম্পাদকের আসল কৃতিত্ব নূতন লেখকদের রচনা-নির্ব্বাচনে। শান্তি রায় প্রমুখ কয়েকজন নূতন লেখকের রচনার মধ্যে আমরা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পরিচয় পাইয়াছি। এই পুস্তকে কিশোর-পাঠকদের জন্য শুধু যে আনন্দ-ভোজেরই আয়োজন করা হইয়াছে তাহা নয়, ইহার সুলিখিত চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা-সম্বন্ধে তাহাদের মনে গভীর ভাবনারও উদ্রেক করিবে এবং কিশোর-মনে আদর্শবাদের সঞ্চার করিয়া তাহাদের দৃষ্টিকে সুদূর ভাবীকালের দিকে সম্প্রসারিত করিবে। গোপাল হালদারের 'সোনার ভারত' নামক তথ্যবহুল প্রবন্ধটি পড়িয়া কিশোর পাঠক-পাঠিকা ইংরেজ-শোষিত ভারতবর্ষের আসল চেহারা সুস্পষ্টরূপে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইবে। পুস্তকখানি একদিকে যেমন বিচিত্র রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ। অন্য দিকে তেমনি রূপসজ্জায়ও অনবদ্য। পুস্তকের বহিরঙ্গ পরিকল্পনা, মুদ্রণ-পারিপাট্য ইত্যাদির দিক দিয়া মডার্ণ পাবলিশার্স অল্পকাল মধ্যে যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, 'শতাব্দীর লেখা' তাহাকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে এবং পুস্তকখানিও, বিশেষভাবে প্রবন্ধ-গৌরবে—বাংলা-কিশোর-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

কুড়ায়ে এনেছি ঝরা ফুল—শ্রীবারীন দাশগুপ্ত। শ্রীহর্ষ পাবলিশিং হাউস, ৫৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ছয়টি ছোট গল্পের সমষ্টি। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদপট সবই সুন্দর। পিতৃপরিচয়হীন সন্তান, অবজ্ঞাত অবহেলিত দরিদ্র মানব-সমাজের প্রতি লেখকের মন সহানুভূতিসম্পন্ন। ক্রিয়াপদের বানানে অভিনবত্ব দেখাইতে গিয়া যে পন্থা লেখক অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতে উৎসাহ দেওয়া যায় না। দুই চারিটি, যথা—চোলতে, কোরে, হোয়েছে,

বোলয়েছেন। বানান ভুলও আছে যথা—নির্ভিক, ভুল, তীর, যুবক ইত্যাদি। এ সব ত্রুটি সত্ত্বেও, এই সাম্প্রদায়িক সমতার দিন তাঁহার 'ভিখারী' নামক গল্পটি অন্তর স্পর্শ করে।

শ্রীতারাপদ রাহা

শেওলা—শ্রীসুশীল রায়। প্রকাশক—শ্রীকমল বসু, ৩০১, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

লেখক কয়েকটি গল্পে বর্তমান বাংলার দুঃখ-দুর্দশার এমন চমৎকার চিত্র অঙ্কন করিয়াছে যা শুধু মনকে দোলা দেয় না—হৃদয়ে স্থায়ী আসন পাইবার দাবি রাখে। সব গল্পই সমান সুন্দর না হইতে পারে কিন্তু সমগ্রভাবে এই গল্প-সংগ্রহ সত্যই উপভোগ্য। পল্লীবাংলার গণ-জীবনের

সঙ্গে শিল্পীর নিবিড় পরিচয় আছে এবং সে পরিচয়কে তিনি অন্তরের রঙে-রসে রঞ্জিত ও রসায়িত করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

মুকুলের স্বপ্ন—শামসুদ্দীন। চয়নিকা পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

শিশুমনে মহান স্বপ্ন জাগিয়ে তোলবার আগ্রহ কবিকে প্রেরণা দিয়েছে। রচনা সহজ, সুকুমার। প্রথম কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, চিত্তরঞ্জন, মোহনলাল প্রভৃতির পবিত্র স্মৃতি এবং পরবর্তী কবিতাগুলিতে মহৎ আদর্শ রূপ নিয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রভু জগদ্বন্ধু—ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমলবন্ধু দাস, কলিকাতা। ২৯ নং রামকান্ত মিস্ত্রি লেন হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ১১০+১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন-ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্বোধনকারী আবাল্য তপস্বী ব্রহ্মচারী প্রভু জগদ্বন্ধু মুর্শিদাবাদ-ডাহাপাড়ায় এক প্রসিদ্ধ ভক্ত ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর এবং ব্রাহ্মণকান্দা গ্রামে যথাক্রমে শৈশব ও বাল্য অতিবাহিত করিয়া পরিণত বয়সে নামধর্ম ও প্রেমধর্ম বিতরণে তিনি বঙ্গবাসীর হৃদয় যেভাবে জয় করিয়াছিলেন সেই সব অপূর্ব লীলাকথা আলোচ্য গ্রন্থে ভক্ত ব্রহ্মচারীজী কর্তৃক সুনিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মপ্রাণ নরনারী এই গ্রন্থ পাঠে প্রভু জগদ্বন্ধুর পুণ্যময় জীবন-কথা জানিয়া নিশ্চিত উপকৃত হইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

দেশ-বিদেশের কথা

নিখিল-ভারত কিশোর-সম্মেলন

পাটনার কিশোর-দলের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সম্প্রতি এক নিখিল-ভারত কিশোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে এ ধরণের অনুষ্ঠান ইহাই প্রথম।

তিন দিন যাবৎ সম্মেলনের অধিবেশন হয়। প্রথম দিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদ সিংহ। তাঁহার অভিভাষণে তিনি সরকারকে এই অভিনব আন্দোলনের প্রতি আনুকূল্য প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিশোর-দলের সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সমাদ্দারের অভিভাষণের পর, সংগঠক শ্রীরঞ্জিত সিংহ বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে শিশুকল্যাণ ও শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন শ্রীযুক্তা সুষমা সেন। সন্ধ্যার পর "ক্যাম্প-ফায়ার" হয়। দ্বিতীয় দিন "শিশু-দিবস" পালন করা হয়। শিশু-বাসর, "দেশ-বিদেশের-ছেলেমেয়ে" নামক সচিত্র প্রদর্শনী (যা ইতিপূর্ব্বে এদেশে আর কোথাও হয় নাই), নৃত্য-গীত-অভিনয় এবং ছায়াচিত্র প্রদর্শনের পর সেদিনকার আসর শেষ হয়। তৃতীয় দিন কিশোর-সংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ফ্লিকোর্ড আগরওয়ালা; প্রথমে অধ্যাপক শিবকুমার মিত্র "কিশোর ও

সংস্কৃতি" এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে "কিশোর-আন্দোলন" সম্পর্কে আলোচনা হয়। অধিবেশনটি বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে এবং দেশবাসীর সমক্ষে কিশোর কল্যাণমূলক প্রচেষ্টার নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে।

কিশোর সম্মেলনের প্রবেশ দ্বার

কিশোরদের পার্টি

মহেশ্বরি স্কুলের ছাত্রীদল

ডাক্তার অমর গুপ্ত

বিগত রবিবার ৯ই মার্চ শেষরাত্রে কলিকাতার প্রসিদ্ধ চর্মরোগ চিকিৎসক ডাক্তার অমর গুপ্ত পরলোকগমন করিয়া-ছেন। ডাক্তার গুপ্ত ১৮৯৬ সালে কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহ-নগরে এক সম্রান্ত বৈদ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে কৈশোরে খ্যাতিলাভ করিয়া ১৯১৮ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ইনি ডাক্তারী পাস করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে সাড়ে তিন বৎসর আই. এম. এস. রূপে কাজ করিয়া ক্যাপটেন পদবী লাভ করেন। পরে ইনি উক্ত কাজ ছাড়িয়া লণ্ডনে চর্মরোগ চিকিৎসায় বিশেষ শিক্ষা লাভের জন্য গমন
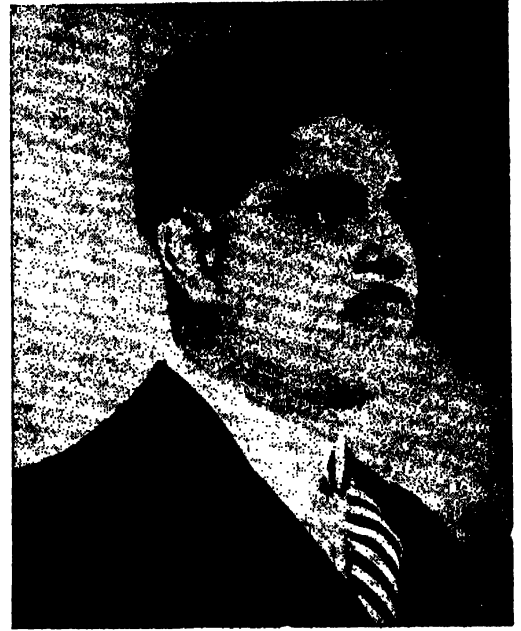
ডাক্তার অমর গুপ্ত

করেন। সেখানে ১৯২৩ সালে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া চেষ্টারফিল্ড পদক লাভ করেন। তিনি এখানে মেডিকেল কলেজ, কারমাইকেল কলেজ ইত্যাদিতে চর্মরোগ চিকিৎসা শিক্ষা দিতেন এবং যাবতীয় চর্মরোগের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বৎসরাধিককাল দুরারোগ্য ব্যাধিতে দারুণ কষ্ট পাইতেছিলেন, কিন্তু সে সময়েও তিনি অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত রোগী ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সহজভাবে কথাবার্তা বলিতেন। এই অমায়িক সজ্জনের মৃত্যুতে কলিকাতা নগরী একজন নিপুণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বিশিষ্ট নাগরিক হারাইল এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বিস্তৃত বন্ধুমণ্ডলীর অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

ভ্রম সংশোধন

৫৮১ পৃষ্ঠার 'প্রবাসী' কবিতার লেখকের নাম 'শ্রীঅচলা প্রসাদ দাসগুপ্তে'র স্থলে 'শ্রীঅর্চনাপ্রসাদ দাসগুপ্ত' হইবে।